বনফুল উপন্যাস সমগ্র

(ষষ্ঠ খণ্ড)

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়



নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ

৬৮, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রকাশক ঃ
শ্রী প্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারি ২০০০

প্রচ্ছদ ঃ
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

মুদ্রক ঃ
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটিড
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

সূচীপত্র

।। বনফুলের কথাশিল্প ।।

বাঙালি সাহিত্য-পাঠকের কাছে বহুকাল ধরে পরিচিত নাম 'বনফুল' তথা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। নিঃসন্দেহে অন্যতম প্রিয় নাম। কথা-সাহিত্যিক তিনি। বেশ কিছু কবিতা, বেশ কয়েকটি নাটক এবং আত্মকথাসহ কিছু প্রবন্ধ লিখলেও তাঁকে মনে রাখি তাঁর উপন্যাস ও ছোটোগল্পের জন্যে। ছোটোগল্পেই তাঁর প্রতিভার বিকাশ শিখর স্পর্শ করেছিল। বাংলা সাহিত্যে খুব ছোটো গল্প—তার মধ্যে কয়েকটিকে অণুগল্পও বলা যায়—তিনি যতটা সাফল্যের সঙ্গে সৃষ্টি করতে পেরেছেন তার কাছাকাছি আর কাউকে দেখা যায় না। বাংলা ছোটোগল্পের প্রাঙ্গণে এক নতুন গল্প-রূপবন্ধের সফল স্রষ্টা হয়ে ওঠার গৌরব তাঁরই। কিন্তু ঔপন্যাসিক বনফুলও বিভিন্ন দিক থেকে বিশিষ্ট। অনেক উপন্যাস তিনি লিখেছেন। গভীরতায় ও শিল্পগুণে সবগুলিই হয়তো সমুচ্চমান সম্পন্ন নয়। কিন্তু তবু তাঁর কোনো উপন্যাসকে তুচ্ছ করা যায় না। সবগুলির মধ্য দিয়েই কথাশিল্পী বনফুল নিজের স্বাতন্ত্র্যের বিভা প্রোজ্জ্বলবিকীর্ণ করে দিয়েছেন। বড়ো লেখক তাঁকেই বলি—যাঁর দুর্বল রচনাকেও উপেক্ষা করা যায় না। শিল্পের উত্তীর্ণতা অনেকটাই রহস্যামণ্ডিত। কোন্ লেখা কী-ভাবে শিল্পমায়ার যাদুস্পর্শটি হঠাৎ পেয়ে যায়, তা কেউই বলতে পারেন না। সব লেখা সব সময় সব পাঠকের মনের মতো না হতেও পারে। এক সময়ের অন-আদৃত লেখা ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন পাঠক-গোষ্ঠীর কাছে অত্যন্ত শিল্পগুণ-সম্পন্ন বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু একজন বড়ো লেখকের সব লেখার মধ্যেই আমরা তাঁর ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত জীবনবোধের আন্তরিক উদ্ভাস অনুভব করব। বনফুল ঠিক সেই জাতের ঔপন্যাসিক। আমরা সন্ধান করবার চেষ্টা করব তাঁর সৃষ্টিকর্মের সেই কেন্দ্রীয় শান্তির স্বরূপ। প্রসঙ্গত বলে রাখতে হয় যে, বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হয়েছে—এমন রচনাগুলিই এই মুখবন্ধ-লিখনের অবলম্বন।

কালানুক্রমিকভাবে প্রথম লেখা 'জঙ্গম' উপন্যাস। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে; দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে। পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ডটিতে উপন্যাসের প্রথম অধ্যায় স্থান পেয়েছে; বাকি চারটি অধ্যায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে সমানভাবে বিভক্ত হয়ে রূপায়িত হয়েছে। অনেকে 'জঙ্গম'-কে বনফুলের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস মনে করেন। অনেকের কাছেই মনে হয়েছে 'জঙ্গম' এপিক উপন্যাস। উপন্যাসটিতে এপিক

লক্ষণ কতটা আছে বা আদৌ আছে কিনা সে আলোচনায় আমরা যথাসময়ে আসব। প্রথমে উপন্যাসটির টেক্‌স্‌ট্‌ সামনে রেখে কোন্‌ কোন্‌ প্রসঙ্গ বিশেষভাবে মনে আসে সে দিকেই দৃষ্টি দেওয়া যাক।

উপন্যাসের রচনা-কাল এবং প্রকাশ-কাল যেহেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী—সে জন্য স্বাভাবিক ছিল এই প্রত্যাশা যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমি ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের তরঙ্গ ছায়া ফেলবে কাহিনির চরিত্রগুলির জীবনযাপনে। কিন্তু সে-দিক থেকে আমাদের কিছুটা হতাশ হতে হয়। এই উপন্যাসের চরিত্ররা প্রধানত দেখা দিয়েছে কলকাতা শহরের পথে, বস্তিতে, নিম্ন মধ্যবিত্তের জীর্ণ গৃহে এবং বিত্তবানের সাজানো বাড়ি এবং বাগানে। চরিত্রগুলি মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরিসরের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে।

এই জায়গায় এসে উপন্যাসটিকে ফিরে দেখি—যদি কোথাও পাওয়া যায় সময়ের সংকেত; যদি বোঝা যায় ঠিক কোন সময় ঘটে চলেছিল এই আখ্যানের ঘটনাবলি।

ক্রমশ বোঝা যায়, এই উপন্যাসের কালপর্ব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার আগেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সময়ের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা ক্যাপিটালিজম এবং কমিউনিজম—পুঁজিবাদ এবং সাম্যবাদের মতাদর্শজনিত বিতর্ককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। আমাদের সেই সূত্রটি অনুসরণ করেই চলতে হয় যখন ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং এতটা শক্তি অর্জন করেছে যে মানুষের মনে কিছুটা প্রভাবও বিস্তার করেছে। মোটের উপর ধরে নেওয়া যায় বিশ শতকের তিরিশের দশকের মধ্যভাগ এই উপন্যাসের কালপর্ব। উপন্যাসের কাহিনি শেষ হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার মুহূর্তে। মধ্যবিত্ত বাঙালি যুবকেরা তখন হয় দক্ষিণপন্থী, অথবা বামপন্থী, অথবা ঔপনিবেশিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে গিয়ে নিরাপত্তাপন্থী। এই তিন শ্রেণির যুবকদেরই পাওয়া যাবে এই উপন্যাসে।

এই উপন্যাসে লেখক কোনো দিক থেকেই সময়ের বহিরঙ্গ সংকেতকে স্পষ্ট করে তোলেননি। এই সময়ে ১৯৩৭-১৯৩৮-১৯৩৯-এ গান্ধী ও সুভাষচন্দ্র বসুর মতবিরোধ বাংলার রাজনীতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল। তার বিশেষ কোনো উল্লেখ নেই। এপিক কাব্যগুলির কেন্দ্রে প্রায়শই থাকে যুদ্ধ। এপিক উপন্যাসে ইতিহাসের নথিভুক্ত কোনো প্রত্যক্ষ যুদ্ধের সন্ধান সব সময়ে পাওয়া যায় না। তবু এপিক উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র একটি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। সেই যুদ্ধ রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে হতে পারে, সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে হতে পারে। বাংলা সাহিত্যে এপিক উপন্যাস বলে কথিত রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'-তে এই দুটি যুদ্ধই অনুভব করা যায়। পরবর্তী কালের এপিক উপন্যাস যদি 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-(১৯৬৫)কে বলি —সেখানে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কায়েমি অধিকারের বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদ ও সংগ্রামকেই উপজীব্য করা হয়েছে। এছাড়া সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই

চরিতমানস' এপিক লক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। ভারতীয় নিম্নবর্গের সামাজিব বিবর্তনের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য সংযোগেই সম্ভব হয়েছে উপন্যাসের এই বিস্তার। এছাড়া ছয় পর্বে বিস্তৃত অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'সত্যাসত্য' এবং বাংলার উনিশ শতকের ইতিহাসকে অবলম্বন করে লেখা বেশ কয়েকটি একাধিক পর্বে পরিকল্পিত উপন্যাসের নাম করা যায় যেগুলিকে মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত বলেছেন অনেকেই। সময়ের বিস্তার এবং একাধিক প্রজন্মের অধিনায়কত্বে উপন্যাসের এগিয়ে চলাকে সহজেই এপিক বলে ভাবা যেতে পারে। কিন্তু 'গোরা' কিংবা 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' কিংবা অন্নদাশঙ্করের 'সত্যাসত্য' কোনোটিতেই কালপর্ব তত বিস্তৃত নয়, নায়কও একজনই। তার একার ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়েই দেশকালের স্বরূপ এবং অগ্রগতি উদ্ভাসিত হয়েছে। গোরা এবং ঢোঁড়াই—দুজনেই এই অর্থেই মহাকাব্যের নায়ক।

এইবার আমরা 'জঙ্গম' উপন্যাসের নায়ক শঙ্করসেবক রায়-এর দিকে চেয়ে দেখতে পারি। বিহারের এক সম্পন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান শঙ্কর। পিতা অনেক ভূ-সম্পত্তির মালিক। সে কলকাতায় হস্টেল-এ থেকে কলেজে পড়ে, বিষয় বিজ্ঞান। এইখান থেকে শুরু হয়েছে উপন্যাস। তার লেখাপড়া, বন্ধুবান্ধব, বন্ধুদের সূত্রে পরিচিত হওয়া কলকাতার তথাকথিত এলিট ক্লাস, আবার দরিদ্র ভাগ্যান্বেষী গণক থেকে শুরু করে পানওয়ালি ও দেহজীবিনী নারীদের সে চিনেছে। জীবনকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখতে দেখতে এই গ্রাম থেকে আগত যুবক নাগরিক হয়ে ওঠে; পুরোনো সংস্কারগুলি পরিবর্তিত হতে থাকে; মানুষকে কোনো পূর্ব-নির্দিষ্ট আদর্শে নয়, তার নিজস্ব মূল্যে এবং পারিপার্শ্বিক অনুসারে তাকে বিচার করতে হবে—এই সত্য সে ধীরে ধীরে বুঝে নেয়। এভাবেই পরিণত হয় তার মন। উপন্যাসের শেষে দেখি গ্রাম ছেড়ে শহরে আসা শঙ্কর শহরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার সংগ্রাম জিতেই নিয়েছিল। পত্রিকা-অফিসে চাকরি হয়েছিল, লেখক হিসেবে নিজেকে খানিকটা পরিচিতও করেছে। কিন্তু তারপরেও সে শহর ছেড়ে ফিরে যায় তার গ্রামে। গ্রামে কলেরা লেগেছে, মারা গেছে চেনা মানুষ, গোপনে সহমৃতা হয়েছেন তার স্ত্রী, সে জন্য গোলমাল করছে পুলিশ। এই সময় সহসা শঙ্কর তার সমস্ত দুর্বলতা, কলকাতার জীবনের সমস্ত নাগরিক বিলাস এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি, লেখক হিসেবে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া—এই সমস্ত কিছু ছেড়ে ফিরে যায় তার গ্রামে এবং ঠিক করে নেয় নিজের কর্তব্য। উপন্যাসের অখণ্ড সংস্করণের শেষ পৃষ্ঠায় বনফুল শঙ্করের মনের চিত্রটি তুলে দিয়েছেন পাঠকের সামনে—"এবার ফিরিয়া গিয়া জমিদারির সর্বময় কর্তা সে আর হইবে না। উৎপলের জমিদারির ভার লইবে উৎপলের প্রজারাই। তাহারাই নিজেদের মধ্যে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া শাসন-পরিষদ গড়িবে, নিজেদের হিতাহিত চিন্তা নিজেরাই করিবে। তাহাকে যদি নির্বাচন করে, ভৃত্যের মত সেবা করিবে সে। তাহার বেশি আর কিছু নয়। নিজে সে

কৃষকজীবনযাপন করিবে। ফরিদ, কারু, বিষুণদের দলে মিশিয়া ঠিক উহাদেরই মতো বাস করিবে। উহাদেরই মতো নিজের হাতে চাষ করিয়া স্বোপার্জিত অন্ন স্বহস্তে পাক করিয়া খাইবে। বাবু আর সে থাকিবে না।''—এমনই এক আদর্শবাদের স্তরে শেষ হয়েছে উপন্যাস।

'জঙ্গম' উপন্যাসের গঠন-পরিকল্পনা থেকে বনফুলের আখ্যান রচনার রীতি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বনফুল প্রধানত নির্ভর করেন বিচিত্র মানুষের প্রতিরূপ নির্মাণের করণকৌশলে। শঙ্কর যদিও কেন্দ্রে অবস্থিত কিন্তু তার সঙ্গে কম-বেশি সম্পর্কের সূত্র ধরে বহু মানুষের মিছিল দেখা যায় এই উপন্যাসে। তারা সকলেই স্বতন্ত্র; তাদের বৈচিত্র্যের শেষ নেই; তারা অনেকেই রীতিমতো অদ্ভুত। তাদের মধ্যে অতীব স্বার্থপর ব্যক্তি আছে—অসহায়ের শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নিতেও যার দ্বিধা নেই; আবার এমন মানুষও আছে যে হাসিমুখে নিজের শেষ সম্বলটুকু অন্যের বিলাসের জন্য সমর্পণ করতে পারে। উপন্যাসের এই অপরূপ-বিচিত্র মানব-সংসারটিকে পাঠকেরা চিনে নেবেন নিজেরাই।

চরিত্রচিত্রণ প্রসঙ্গে বনফুলের দুটি প্রবণতা উল্লেখ করা যাক। এক হল মানুষকে ভালো এবং মন্দ—এই দুটি ঘরে একান্তভাবে আবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী তিনি নন। নায়ক শঙ্করকে দেহজীবিনীর আকর্ষণেও বাঁধা পড়তে দেখিয়েছেন তিনি। অধিকাংশ চরিত্রই স্থির সিদ্ধান্তের শক্ত ভিতের উপর দাঁড়াতে পারে না তাঁর উপন্যাসে। তাঁর উপন্যাসের কোনো কোনো নারী খোলাখুলিভাবেই দ্বিচারিণী। কিন্তু প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যেই আছে এক অদ্ভুত সততা। বাঁচতে গেলে মানুষ জীবনের সঙ্গে এক ধরনের সম্পর্ক পাতায়। সেই সম্পর্কটির ক্ষেত্রে তার একান্ত অকৃত্রিম না থাকলে চলে না। বনফুলের উপন্যাসের মানুষগুলি এভাবেই নিজেদের অস্তিত্বকে নিখাদ করে তুলতে পারে। এটাই তাঁর প্রতিভাব প্রধান শক্তি। যখন যাকে তিনি দেখান তখন সেই প্রবল জীবিত মানুষটি আমাদের সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে নেয়। তাঁর উপন্যাসের মৃত মানুষেরাও তেমনই জীবন্ত—যেমন নিঃসঙ্গ প্রাক্তন বেশ্যা পানওয়ালি এবং স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হওয়া প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কুন্তলা।

বনফুলের নারীচরিত্র চিত্রণের একটি প্রবণতা কিন্তু কিছুটা রক্ষণশীল। তাঁর উপন্যাসের মেয়েরা কেউ বিদ্রোহিনী, কেউ অনুগত। কিন্তু তারা সকলেই পুরুষের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে শেষ পর্যন্ত।

'জঙ্গম' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে খুব অভিনব বলা যায় না। বিহারের গ্রাম থেকে কলকাতায় আগত এক যুবক কেমন ভাবে নিজেকে পরিণত করে তুলছে নিজেকে মনের দিক থেকে এবং আদর্শের দিক থেকে—জীবন-পথে অনেক চোরাগলির মুখ উন্মুক্ত থাকলেও শেষ পর্যন্ত জীবনের সত্য পথ থেকে কিছুতেই ভ্রষ্ট হচ্ছে না—তারই চলচ্চিত্র এই উপন্যাস। প্রকৃত

পক্ষে উপন্যাসটি কিন্তু সরল এবং রৈখিক প্লটবিশিষ্ট। সেই রেখার দু পাশে মাঝে মাঝেই বিচিত্র কথা-বলয়ের বিন্যাস। কিন্তু সেই বলয়গুলি জীবনের বিচিত্র রূপের কারুকার্য সূচিত করে। বলয়গুলি শঙ্করের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে, কিন্তু বলয়গুলি এককভাবে অপরিহার্য নয়। অপরিহার্য কেবল নায়ক শঙ্করসেবক রায় এবং তার চরিত্রের অন্তর-উৎসারিত চলিষ্ণুতা। এজন্যই উপন্যাসটির 'জঙ্গম' নাম সার্থক।

প্রকাশ কালের বিচারে 'জঙ্গম'-এর পরবর্তী উপন্যাস 'ভীমপলশ্রী' (১৯৪৯)। কিন্তু এই উপন্যাসটির আলোচনায় আমরা আসব সব শেষে। কারণ প্রথমত এই উপন্যাসটি একটি বিদেশি উপন্যাসের ছায়া অনুসরণে রচিত; দ্বিতীয়ত এই উপন্যাসটি কমেডি জাতীয় রচনা। এর স্বাদ সম্পূর্ণ আলাদা। 'জঙ্গম'-এর পর 'স্থাবর' (১৯৫১) উপন্যাসটির প্রসঙ্গে সহজেই আসা যায়।

আগে স্থাবর পরে জঙ্গম—এমন একটি ভাবনা চকিতে মনে আসতে পারে। কিন্তু যে বিপুল জীবন এই দুটি উপন্যাসেরই অবলম্বন সেখানে প্রকৃত অর্থে জঙ্গমতাই ক্রিয়াশীল, স্থাবরতা নয়। তা হলে তিনি উপন্যাসের নাম 'স্থাবর' রাখলেন কেন? বহু ধরনের সম্ভাবনার কথাই মনে হয়। কিন্তু নিশ্চিত ব্যাখ্যা বোধ হয় পাওয়া যাবে না। কিছু অনুমান সম্ভব।

এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু মানবজাতির ইতিহাস। প্রাগৈতিহাসিক প্রাচীন কালে মানুষ একদা পশুর মতো বিচরণ করলেও, যেহেতু উন্নততর মস্তিষ্কের অধিকারী, তাই পশু-জীবন থেকে ক্রমশ মস্তিষ্ক-চালিত মানুষ-জীবনে ধীরে ধীরে পৌঁছে যেতে লাগল সে। এই অভিযাত্রার ইতিহাস বহু শতাব্দী ধরে প্রবাহিত হলেও তার ভিতরের বেগ কল্পনাতীত। তবু বনফুল উপন্যাসের নাম দিলেন 'স্থাবর'। ভূমিকায় এ বিষয়ে লিখেছেন কয়েকটি বাক্য—"মানবজাতির যে কাহিনী ইতিহাসের অন্ধকারে স্থাবর হইয়া আছে, তাহার সম্পূর্ণ রূপ এখনও অজ্ঞাত। যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহারই প্রাথমিক পর্ব লইয়া এই উপন্যাস রচিত হইল। স্থান কাল পাত্রের যে সীমাবদ্ধতা সাধারণ উপন্যাসকে রসোত্তীর্ণ করে, এ ক্ষেত্রে তাহা নাই। কারণ যিনি এই উপন্যাসের বক্তা, বিশেষ কোনো স্থান, কাল বা পাত্রে তিনি আবদ্ধ নহেন। যুগ যুগান্তরে বহু খণ্ডজীবনের সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি-কথা এই উপন্যাস।"

এই স্থাবর শব্দটির প্রতিন্যাসে সম্ভবত বনফুলের মনে পড়েছিল সেই সব প্রাচীন পাথর এবং পাথর হয়ে যাওয়া প্রাণের ভাস্কর্য ফসিল-এর কথা। এই সংগত অনুমান করেছেন বীতশোক ভট্টাচার্য তাঁর বিশ্লেষণে ('স্থাবর', বাণীশিল্প সংস্করণ, ২০০৫. 'অনুকথন', পৃষ্ঠা ৩০৭)। কিন্তু তাঁর অনুমানের যাথার্থ্য স্বীকার করেও বনফুলের ভাবনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হওয়া যায় না। পাথর এবং প্রস্তরায়ণকে সাধারণভাবে, সাধারণ মানুষের চোখে স্থাবরত্বের উপমা রূপে দাঁড় করানো যেতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কোনো কিছুই স্থাবর

নয়। পৃথিবীর ভূ-স্তর এবং পাথরের স্তরে স্তরে চিহ্নিত আছে গতির ইতিহাস; পৃথিবীর বয়সের অনেক সূত্র আপাত-স্তব্ধ পাথরের বুকে চলমানতার স্তরায়ণ থেকে স্থিরীকৃত করা সম্ভব হয়েছে। বনফুল, তথা চিকিৎসক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন যথার্থ বিজ্ঞানমনস্ক একজন চিন্তাবিদ ও লেখক। তার উপর তিনি এই উপন্যাসে সভ্যতার অনন্ত জঙ্গমতাকেই রূপদান করেছেন। তাহলে 'স্থাবর' নাম কেন এই জিজ্ঞাসা থেকেই যায়।

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শুরু করে ভূমি-নির্ভর সামন্ততন্ত্রের প্রথম যুগ পর্যন্ত মানব-জাতির ইতিহাস এখানে বর্ণিত। নগ্ন মানুষ কাঁচা মাংস খায় এবং অরণ্যের পশুর সঙ্গে সমমাত্রিক জীবন যাপন করে—এখান থেকে উপন্যাসের শুরু। সেই প্রাচীন কাল থেকেই অবশ্য জনগোষ্ঠীগুলির এলাকা চিহ্নিত করার প্রবণতা দেখা যায়। তারপর মানুষ নিজের দেহকে আবৃত করেছে পত্রে এবং পশুচর্মে। এমনকি হাড়ের সূচ দিয়ে সেলাই করতেও শিখেছে। মানুষ শিখেছে অগ্নিপক্ক খাদ্য গ্রহণ করতে, পশুপালন করতে, নৌ-বাহন ও কৃষিকার্য করতে। মানুষ আবিষ্কার করেছে ভেষজ, পূজাপদ্ধতি, কুলচিহ্ন টোটেম এবং বিবাহ। এই উপন্যাস যেখানে শেষ হয়েছে সেই সমাপ্তি মুহূর্তের যে কালখণ্ড তা-ও প্রাগৈতিহাসিক। আবিষ্কৃত হয়নি লিপিচিহ্ন, আবিষ্কৃত হয়নি বস্ত্র এবং চাকা। রাষ্ট্রের ধারণা অজ্ঞাত।

যে সুদীর্ঘ কাল-পরিসর এই উপন্যাসে দেখতে পাই সেখানে মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব এবং চলিষ্ণুতা দুটি ধারণাকে অবলম্বন করে বিচিত্র পথে তা যাত্রা করেছে। একটি হল ভূমির অধিকার তথা খাদ্য-সংকটের সমাধান-প্রয়াস। দ্বিতীয়টি হল নারীর উপর অধিকার এবং তারই অনুষঙ্গে নারী পুরুষ সম্পর্কের বিচিত্র প্রতিচ্ছবি। তাহলে কি বনফুল মানব সভ্যতার এই চলমানতার কেন্দ্রে—ঝড়ের কেন্দ্রের স্থির বিন্দুর মতো দুটি অ-পরিবর্তিত প্রবণতা অনুভব করেছেন? তাদেরই নাম দিয়েছেন স্থাবর?

এই উপন্যাস নৃতত্ত্ব এবং ভূ-তত্ত্বের বিজ্ঞানকে আত্মস্থ করেছে। সেই সঙ্গে অবলম্বন করেছে মনস্তত্ত্বকেও। বিবর্তনের স্পষ্ট প্রবাহ নৃ-তত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব, পরিবেশ এবং আবহাওয়ার ক্ষেত্রে যতটা প্রত্যক্ষ এবং অ-বিতর্কিত, ততটা মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে নয়। প্রভুত্ব-বাসনা, লোভ, ঈর্ষা, কামনা, প্রতিহিংসা বৃত্তি, প্রেম, আনুগত্য ইত্যাদি প্রাচীনকালে যেমন ছিল, পরবর্তী কালেও তেমনই আছে। মানুষের চিন্তার প্রকৃতি বদলায়। নতুন তত্ত্বের অবতারণা ঘটে, নতুন আবিষ্কারকে অবলম্বন করে ঘটে জ্ঞানের প্রসার। মানুষের তত্ত্ব-ধারণা, নৈতিকতার ধারণা, সংঘর্ষ ও বিবর্তনের পথ অতিক্রম করে। কিন্তু মানুষের আদি বাসনাগুলির, আদিম প্রবৃত্তিগুলির কি পরিবর্তন হয়? এই আদিম বাসনা-কেন্দ্রগুলি চঞ্চল, স্পন্দিত, ফেনায়িত, উচ্ছ্বসিত—কিন্তু পরিবর্তনশীল নয়। জঙ্গমতার তীব্র আবর্তনের কেন্দ্রে আদি বাসনার স্থাবরতা—এমন একটি অর্থ হয়তো করা যায় এই নামের।

উপন্যাসের কাহিনি-অংশের বিবরণে আমরা প্রবেশই করব না। কেমন করে আদিম মানুষ জীবনযাপন করেছে এবং সৃষ্টি করেছে প্রাণ—তার প্রতিটি বর্ণনা-খণ্ডই লেখকের সমৃদ্ধ, বিদগ্ধ এবং উদ্দীপ্ত কল্পনাশক্তির পরিচয় বহন করে। এই কল্পনা গভীর বিজ্ঞানভিত্তিক। কারণ বনফুল ছিলেন আগ্রাসী পাঠক। প্রাণীর বিবর্তনের ইতিহাস, মানুষ কেমনভাবে অতিক্রম করেছে বিভিন্ন পর্যায়; কৌম জীবন ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সংঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে মানুষের সভ্যতা—সে বিষয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে আগে। বনফুলের কল্পনায় সেই অধীত জ্ঞান পল্লবিত হয়ে উঠেছে বর্ণ-সমারোহে। পাঠককে প্রকৃত অর্থেই তা মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। নিজের অতীতকে জানবার জন্য সাধারণ মানুষের যে আগ্রহ লেখক বনফুল মানুষের সেই আত্ম আবিষ্কারের আবেগকে অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে তৃপ্ত করতে সমর্থ হয়েছেন। বিজ্ঞান-গ্রন্থের তথ্য জীবন্ত চরিত্র-চিত্রণে; অসংখ্য দৃশ্যমালায় এবং সজীব সংলাপে এ কালের সামাজিক উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। বস্তুত, বনফুলের উদ্দীপ্ত কল্পনা আমাদের সর্বাধিক বিস্মিত করে। বন্য মানুষের খাদ্য-সংগ্রহ, শিকার, অন্তরের গভীরে জেগে ওঠা বিশ্বাস ও সংস্কার, যৌন কামনার বিবিধ বিচিত্র প্রকাশ—সর্বোপরি পশুসুলভ এই জীবনযাপনের মধ্য থেকে মানব মনের সূক্ষ্মতার বিচিত্রচারিতা—মানুষের কল্পনাশক্তির বিকাশ এবং ধীরে ধীরে রোমান্টিক হয়ে ওঠা—অপূর্ব সূক্ষ্মতায় ব্যক্ত করেছেন বনফুল।

সমগ্র উপন্যাসটি প্রায় এক নিঃশ্বাসে শেষ করবার পর অবশ্য কোথাও কোথাও একটু অভাববোধ জাগে। যে ভূ-প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন লেখক সেখানে ভৌগোলিক বৈচিত্র্যময় বিস্তার লক্ষ করা যায় না। তুষারাবৃত পর্বত, সমুদ্রতটের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। মরুভূমি ইত্যাকার ভিন্ন ভূ-প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের প্রসঙ্গ অল্পস্বল্প থাকলেও বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর জীবনাচরণে যে পার্থক্য দেখা দেয়, তার বিস্তৃত নির্দেশ এই উপন্যাসে পাওয়া যায় না। বহু অতীতে ভূ-পৃষ্ঠের কোনো একটি উর্বর, নদীপ্রান্তিক বনভূমিতে প্রথম মানুষের উদ্‌ভব হলেও বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর দূরতম কোণে কোণে। মানুষের মুখাবয়ব ও দেহ গঠন হয়েছে ভিন্ন। মানুষ ও পরিবেশ পরিমণ্ডলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটি এই উপন্যাসে অনুপস্থিত। আদিম যুগে নর-নারী সম্পর্কের রহস্য আবিষ্কারের তুলনায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে অবিরাম শত্রুতাজনিত সংঘর্ষ ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই উপন্যাসে জীবনযাপনের প্রাত্যহিকতা এবং নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্রমবিবর্তন থেকে অধিকারবোধের বিচিত্র বিবর্তন; নিছক কামনা এবং জান্তবতা থেকে নর-নারী সম্পর্কের প্রেমে উত্তরণ—এই ক্রম পরম্পরা স্পষ্ট করে তোলার দিকে লেখক মন দিয়েছেন বেশি।

উপন্যাসের পরিকল্পনায় আপাত অ-লৌকিকতার গঠনরীতি ব্যবহৃত হয়েছে। কল্পিত হয়েছে একজন নায়ক—যে যুগে যুগে, শতাব্দীর পর শতাব্দী

অতিক্রম করে, কোটি কোটি বছর পার করে বিবর্তনের পথরেখা ধরে এগিয়ে চলেছে। উপন্যাসে তার নাম দেওয়া হয়েছে জংলা। যুগে যুগে এই নায়ক আবির্ভূত হয়ে চলেছে যে সাহসী, সক্ষম, কল্পনাপ্রবণ, বলশালী এবং নারীদের আকর্ষণ ও কামনার লক্ষ্য। এমন মানুষদের চলার পথ ধরেই সভ্যতা ধীরে ধীরে আধুনিক হয়ে উঠতে থাকে। এই মানুষেরা পারিপার্শ্বিকের উৎপাদন হয়েও পরিমণ্ডলকে একটু করে পরিবর্তিত করবার ক্ষমতা রাখে। জংলার আত্মকথনে উপন্যাসটি যেন কোটি কোটি বছরের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে পেরেছে। জংলা সেই নায়ক যে অনুভব করেছে—মানুষ একা বাঁচতে পারে না—তার গোষ্ঠীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেই গোষ্ঠীর আদিমরূপ বড়ো ভয়ংকর; কারণ, সেখানে একজন পুরুষ অপর পুরুষকে সহ্য করে না, তাকে বিতাড়িত করে এবং গোষ্ঠীর প্রতিটি নারীর উপর স্থাপন করে নিজের আবিষ্কার। গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব আর ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব এজন্যে এক চিরকালীন সত্য। কিন্তু একদিন এই একান্ত স্বার্থপরতা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে অনেকে মিলে দলবদ্ধ হতে পারে। তখন বড়ো হয়ে ওঠে একটি দলের সঙ্গে আর একটি দলের দ্বন্দ্ব। আর স্থাপিত হতে থাকে পুরুষ ও নারীর মধ্যে সম্পর্কের অ-ভাবিতপূর্ব ও বিচিত্র বিন্যাস। মানুষ ক্রমশই হৃদয়, মনন ও মস্তিষ্কের সম্মিলনে প্রাকৃত পাশব জীবন থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করে নিতে সমর্থ হয়। এই দীর্ঘ যাত্রা প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাহিত মানুষের মিছিলের পায়ে পায়ে সম্ভব হয়েছে। জংলা এই উপন্যাসে সেই নায়ক যে সর্বযুগেই মিছিলেরও একজন এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব রূপেও বিশিষ্ট।

এই উপন্যাসের চরিত্রগুলির জন্যে বহু নাম আবিষ্কার করেছেন বনফুল। বনফুলের চরিত্র-নামকরণ একটি স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। এখানে কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। পুরুষদের নাম—জুজুম, বিতং, দিস্কু, লেধু, ঘিসু, ধবল, মীংরা, উলম্ভন ইত্যাদি। নারীদের নাম—ইকা, গৌ, জোলমা, রাহুলা, নিনানি, শিলাঙ্গী ইত্যাদি। এত নামের মালায়, এবং কখনো কখনো একই ধরনের কথাবৃত্তের পুনরুক্তিতে উপন্যাসটি মাঝে মাঝে একটু খেই হারায়। কিন্তু যেহেতু সমগ্র আখ্যান একটি দৃঢ় এবং অবিচ্ছিন্ন, এক লক্ষ্য গতিপথ ধরে প্রবাহিত—সে জন্যে বিভিন্ন কথাবৃত্তের বিক্ষিপ্ত বিন্যাসে প্রকৃতপক্ষে কিছু আসে যায় না। আমরা উপন্যাসটির প্রারম্ভিক অংশের কয়েক পংক্তি, মধ্যবর্তী অংশের কয়েক পংক্তি এবং শেষ অংশের কয়েক পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি।—

উপন্যাসের সূত্রপাত —

সুদূর অতীতের নিবিড় অন্ধকার হইতে আমি তোমাদের সম্বোধন করিতেছি। আমি অমর আত্মা প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আকাশে-বাতাসে, সমুদ্র-নদীতে, অরণ্য-পর্বতে, মরুভূমির ঊষরতায়, শস্যক্ষেত্রের শ্যাম-শোভায় অহরহ সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছি। আমি মরি নাই। তোমাদের ধর্মে-কর্মে

সংস্কৃতিতে, কাব্যে শাস্ত্রে পুরাণে, চিন্তাধারার বৈচিত্র্যে, রক্তধারার অণু-পরমাণুতে আজও আমি স্পন্দিত হইতেছি। কবরভূমি খনন করিয়া আমাকে অনুসন্ধান করিও না, আত্মানুসন্ধান কর, তোমার মধ্যেই আমাকে পাইবে। তোমার মধ্যেই আজও আমি ওতপ্রোত হইয়া আছি। তাহাই আমার বৈশিষ্ট্য এবং সেইখানেই আমার জয়। আমি মরিয়াও মরি নাই। আমার আদিমতম রূপ কি ছিল তাহা আমি জানি না। আমি ছিলাম, আছি এবং থাকিব—এইটুকুই শুধু নিঃসংশয়ে জানি।"

মধ্যবর্তী অংশ

"পর্বতচূড়ায় উপস্থিত হইয়া দেখি বিরাট একটা গুহা মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। কিছুক্ষণ ইতস্তত করিয়া তাহারই ভিতর অবশেষে অবতরণ করিলাম। সেই গুহার সুড়ঙ্গপথে কতকাল যে চলিয়াছি তাহার ঠিক নাই। কত শতাব্দীর পর শতাব্দী। সেই অন্ধকার যাত্রার স্মৃতি অস্পষ্টভাবে কিছু মনে আছে। সমস্ত মুছিয়া গিয়াছে, মাঝে মাঝে কেবল এক-একটা ছবি স্পষ্ট হইয়া আছে। যদিও আমি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জীবন অতিবাহিত করিয়াছি। কিন্তু আমার মনে হইতেছে, আমি যেন সেই গুহার সুড়ঙ্গপথেই যুগযুগান্ত ধরিয়া চলিয়াছি। সুড়ঙ্গপথের বাঁকে বাঁকে যেন নূতন নূতন লোক ভিড় করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের সহিত কিছুকাল কাটাইয়া আবার আমার নূতন যাত্রা শুরু হইয়াছে। সমস্তটাই যেন স্বপ্নের মতো মনে হইতেছে।"

শেষ অংশ

"আমি মরি নাই, আমি মরিব না। নিনানিকে লইয়া আমি নীলাম্বু নদীর তীরে বিশাল অপরাজিতা বংশ স্থাপন করিয়াছিলাম। নিনানির পরও আরও কত নারী আসিয়াছিল, আরও কত নারীর তীব্র মধুর সঙ্গ-মদিরা আমার কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল, কিন্তু মনে মনে আমি ধরিতে চাহিয়াছিলাম সেই অধরাকে, যাহাকে আমি পাইয়াও পাই নাই। আজও তাহাকেই চাহিতেছি। দূর-দিগন্ত সীমায় দেখিতে পাইতেছি জোলমা ভাসিয়া যাইতেছে। বুঝিতে পারিতেছি বৃক্ষকোটরে শিলাঙ্গীর ছিন্নমুণ্ড আমার পথ চাহিয়া আছে, নিনানি কিন্তু আমার হাত ধরিয়া রহিয়াছে, কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেছি না। কিন্তু আশা আছে, মুক্তি একদিন আসিবেই আসিবে। হয়তো অভাবিতরূপে, কিন্তু আসিবে।"

এই তিনটি উদ্ধৃত অংশ থেকেই ধরে নেওয়া যায় উপন্যাসের সুর। সংক্ষিপ্ত একটি বাক্যে বলা যায়—মানব সভ্যতার প্রবহমানতা। এই প্রবহমানতার চাপ উপন্যাসটিতে কতটা তার কৌতূহল-উদ্দীপক একটি প্রমাণ পেশ করা যেতে পারে। বাণীশিল্প প্রকাশনা সংস্থা থেকে ডিসেম্বর ২০০৫ সালে প্রকাশিত 'স্থাবর' উপন্যাসের যে সংস্করণটি আছে তাতে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা দুশো নিরানব্বই। উপন্যাসটি যখন শুরু হয়েছে তখন দেখতে পাচ্ছি এক, দুই—এইভাবে সংখ্যা চিহ্নিত পরিচ্ছেদ বিভাগ করেছেন লেখক। 'এক'

সংখ্যক পরিচ্ছেদটি নয় পৃষ্ঠা থেকে একুশ পৃষ্ঠা, 'দুই' সংখ্যক পরিচ্ছেদ বাইশ পৃষ্ঠা থেকে তেতাল্লিশ পৃষ্ঠা, 'তিন' সংখ্যক পরিচ্ছেদ তেতাল্লিশ পৃষ্ঠা থেকে একষট্টি পৃষ্ঠা, 'চার' সংখ্যক পরিচ্ছেদ একষট্টি পৃষ্ঠা থেকে একশো এক পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু তারপর 'পাঁচ' সংখ্যক পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে একশো এক পৃষ্ঠা থেকে—তারপরে আর উপন্যাসটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত হয়নি। 'পাঁচ' সংখ্যক পরিচ্ছেদ একশো এক পৃষ্ঠা থেকে শুরু করে দুশো নিরানব্বই পৃষ্ঠায় গিয়ে শেষ হয়েছে। অন্যান্য সংস্করণগুলি মিলিয়ে দেখলাম সর্বত্রই পরিচ্ছেদ-বিভাগ এমনই।

লেখকের কিছুটা অসতর্কতা অস্বীকার করা যায় না। বনফুল অনেক লিখতেন, দ্রুত লিখতেন, এক এক বছর শারদ সংখ্যায় বেশ কয়েকটি উপন্যাস লিখতেন। কাজেই উপন্যাসটির প্রাথমিক পরিকল্পনা লিখতে লিখতে বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব নয়। সেই সঙ্গে একথাও মনে হয়—এই উপন্যাসটির ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমানতার বেগ এত প্রবল যে লিখতে লিখতে পরিচ্ছেদ-বিভাজন অপ্রাসঙ্গিক এবং অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়। জংলার বহু জীবন—কোটি কোটি বছরের জীবন প্রকৃতপক্ষে একটিই জীবনের ধারাবাহিকতা—তা হল মানুষের হাজার হাজার হাজার বছর ধরে পথ হাঁটার ভিতর-বাহিরের অভিজ্ঞতার রেখাচিত্র। এই সত্যটি আপনা থেকেই উঠে এসেছে উপন্যাসের অভ্যন্তর থেকে। তাই বিভাজন-চিহ্ন হয়ে গেছে নিশ্চিহ্ন।

'স্থাবর' উপন্যাসটি দীর্ঘ দিন ধরে সাধারণ পাঠকদের মধ্যে প্রায় সমান জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। তার কারণ উপন্যাসটিতে এমন অনেকগুলি দিক আছে, যেগুলির বৈচিত্র্য বিভিন্ন ধরনের পাঠকের কাছে রুচিকর বলে মনে হয়। গল্প-বিনোদনপ্রিয় পাঠকেরা মানবজীবন যাপনের বহু সুলিখিত কথাবৃত্ত পাঠ করতে পারবেন এখানে। ঐতিহাসিক আবহমণ্ডিত সমৃদ্ধ কল্পনার বর্ণসমারোহ সেই কথাবৃত্তগুলিকে রূপময় করে তুলেছে। ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের গবেষকেরা উপন্যাসটিতে স্বতন্ত্রভাবে আকৃষ্ট হবেন। কারণ, যদিও উপন্যাসের আধারেই বিন্যস্ত, যদিও মানবজাতির প্রাচীন ইতিহাসের প্রাপ্ত তথ্যসমূহের সত্যতা বিকৃত করা হয়নি কোথাও, এবং নৃ-বিজ্ঞানের সূত্রগুলিও বনফুল যথাযথ রাখতে পেরেছেন। তৃতীয়ত, উপন্যাসে যাঁরা মনস্তত্ত্বের গভীরতা, মানবজীবন-ধারার অন্তর্নিহিত কোনো তত্ত্ব, জীবনের কোনো দর্শন সন্ধান করেন— তাঁদেরও তৃপ্ত করে এই 'স্থাবর' উপন্যাস।

কিন্তু বনফুলকে এমন অনেক উপন্যাস লিখতে হয়েছে লেখক-জীবনের বিস্তৃত পর্যায়ে যেখানে এত সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত কথাশিল্প রচনা সম্ভব হয়নি। বাংলা সাহিত্যের যে ধারাটি পাঠকমুখী সেখানে প্রত্যেক বছর পত্রিকার শারদ সংখ্যা প্রকাশের একটি দায় থাকে; পুজো ও নববর্ষ উপলক্ষ্যে নতুন বই প্রকাশের আগ্রহ থাকে প্রকাশক ও লেখকদের। কাজেই যে লেখক পাঠকদের কাছে পরিচিত ও গৃহীত তাঁর কাছে বার বার আসে লেখার অনুরোধ। যে

লেখক লিখতে চান তিনিও খানিকটা নিজের ভালো লাগা থেকেই সম্পাদক ও প্রকাশকদের বিমুখও করেন না। ফলে অনেক উপন্যাস লেখা হয়ে যায় যেগুলি কোনো দিক থেকেই খুব গভীর নয়। যেগুলি নিতান্তই একটি গল্প মাত্র, সর্বশ্রেণির পাঠকের ভালো লাগার উপকরণ।

তেমন কাহিনি অনেক নির্মাণ করেছেন বনফুল। এরকম গল্প বানাতে তাঁর কোনো কষ্ট ছিল না, সময়ও লাগত না। কারণ সর্বদাই বহু ধরনের মানুষের সংস্পর্শে আসতেন তিনি; জীবন সম্পর্কে জাগ্রত কৌতূহল থাকার জন্য প্রতিটি মানুষই তাঁর কৌতূহল জাগিয়ে তুলত। কেউ-ই তাঁর কাছে তুচ্ছ ছিল না। দেশি-বিদেশি বহু রকমের উপন্যাস অবিরত পাঠ করতেন বলে একটি প্লট বানিয়ে নিতেও তাঁর সময় লাগত না বেশি। এরকমই দুটি উপন্যাস 'পঞ্চপর্ব' (১৯৫৪) এবং 'জলতরঙ্গ' (১৯৫৯)।

'পঞ্চপর্ব' উপন্যাসটিকে প্রায় ডিটেকটিভ উপন্যাসের আধারে বিন্যস্ত একটি প্রেমোপাখ্যান বলা যেতে পারে। 'পঞ্চপর্ব' নামটি সম্পূর্ণভাবে প্রাকরণিক। পাঁচটি পর্যায়ে লেখক উপন্যাসটিকে বিন্যস্ত করেছেন এবং পর্যায়গুলির নাম দিয়েছেন যথাক্রমে 'টেলিফোন পর্ব', 'পরিচয় পর্ব', 'গমনাগমন পর্ব', 'উদ্যোগ পর্ব' এবং 'মিলন পর্ব'। এই পর্ব-শিরোনামগুলি থেকেই উপন্যাসটির স্বরূপ অনেকটা স্পষ্ট হয়ে যায়। দূরভাষে কয়েকটি চরিত্র একে অপরের সঙ্গে কথা বলছে। সেখানেই ঘনীভূত হয় রহস্য। জানা যায় এক তরুণীর সম্পত্তি নিয়ে ও বিবাহ নিয়ে সমস্যার কথা। সে তার বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে। এই পর্বে একটি হত্যাকাণ্ডও সংঘটিত হয়েছে। সমগ্র পর্যায়টি দূরভাষ-বাক্যালাপের আঙ্গিকে সাজানো।

'পরিচয় পর্ব' অংশে লেখক চরিত্রগুলির পরিচয় দিয়েছেন; 'গমনাগমন-পর্ব' চরিত্রগুলির জীবনযাত্রার পথরেখা নিয়ে লেখা; 'উদ্যোগ পর্ব' অংশে দেখা গেছে সমস্যার সমাধানের তৎপরতা; শেষ পর্বে আছে প্রত্যাশিত মিলন। নামকরণ থেকে উপন্যাসটিকে সরল মনে হয়, কিন্তু পড়তে গিয়ে দেখা যায় যে উপন্যাসটির আখ্যানের মধ্যে অরণ্যের মতো বহু বৃক্ষ ভিড়াক্রান্ত এক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। 'পরিচয় পর্ব' এবং 'গমনাগমন পর্ব' থেকে উপন্যাসের কেন্দ্র-ধারণাটিকে অটুট রাখা পাঠকদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। প্রত্যেকটি চরিত্রকে নিয়ে এক একটি স্বতন্ত্র কথাবৃত্ত এবং সেই আখ্যানগুলিও যথেষ্ট ডালপালা সম্পন্ন। ফলে মাঝে মাঝে সেগুলির খেই হারিয়ে যায়। উপন্যাসের পটভূমিকায় আছে দেশ বিভাগ, দাঙ্গা, উদ্‌বাস্তু সমস্যা এবং সদ্য স্বাধীন দেশের দুর্বল প্রশাসনিক পরিস্থিতিতে অসাধু ব্যবসায়ী এবং কালোবাজারিদের রমরমা। এর মধ্যেই স্থাপিত হয়েছে উপকাহিনিগুলি; তাদের একটির সঙ্গে আর একটির সংযোগ আছে কোনো না কোনো সূত্রে।

উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ চরিত্রের বিচিত্রতা। আমরা লক্ষ করি কোনো চরিত্রকেই বনফুল ঠিক সরল, সৎ মানুষ করে গডেননি। প্রত্যেককেই জটিল

স্বার্থপর এবং অনেকেরই প্রকৃত বিবেক বলে কিছু নেই। তা সত্ত্বেও লেখক কিন্তু তাদের সম্পর্কে নির্মম নন। তাদের শাস্তির বিধান দিতেও তিনি চান না। *তিনি সব মানুষের মধ্যেই অদ্ভুত অসহায়তা অনুভব করেন। অনেকের মধ্যেই* সময় সময় অনুশোচনা এবং কৃতকর্মের প্রতিবিধান করবার ইচ্ছাও জাগিয়ে তোলেন। মনস্তত্ত্বের এই গতিপ্রকৃতিও মিথ্যা নয়। এখানে দেখি উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বিধুভূষণের পিতৃপরিচয় ছিল না বলে জ্ঞান হবার বয়স থেকেই সে সকলের কাছ থেকে কটু কথা শুনে এবং সকলের ঘৃণার পাত্র হয়ে বড়ো হয়েছে। জীবনের পথপরিক্রমায় অনেক আলো-অন্ধকার পার হয়ে যে মেয়েটিকে সে বিবাহ করবে বলে স্থির করে তখনই জানতে পারে সে-ও বহন করছে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের সন্তান। বিধুভূষণ কিন্তু মন স্থির করে নেয় এবং বলে—'তা হোক। আমার মা-ও কুমারী অবস্থায় অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলেন। আমি ছেলেবেলায় বড় কষ্ট পেয়েছি ভাই,...। সুলোচনার ছেলেকে বুকে করে মানুষ করব আমি ....।' দোষ-ক্রটি-দুর্বলতা এবং তাদের সঙ্গে সংঘাতে বক্তাক্ত হওয়া; এবং মনের মধ্যে সততা ও মঙ্গলকামনার একটু আলোর শিখা জাগিয়ে রাখা—এই ভাবেই এই উপন্যাসের চরিত্র ও আখ্যান পরিকল্পিত হয়েছে। জীবনের এই নির্মম সত্যের উদ্‌ঘাটন আছে বলেই উপন্যাসটিকে আমরা তুচ্ছ করতে পারি না।

'জলতরঙ্গ' (১৯৫১) উপন্যাসটিকেও বলা যায় বিচিত্র মানুষের সমাবেশের এক ঐকতান। অনেকগুলি চরিত্র। আত্মীয়তা এবং বন্ধুত্বের সূত্রে পরস্পর লগ্ন হলেও অন্তত চারটি স্বতন্ত্র আখ্যান নির্মিত হয়েছে তার প্রধান চরিত্রকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় সেই একই—বিচিত্র মানুষের বিচিত্র জীবন। উপন্যাসের কালপর্ব স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের প্রথম কয়েক বছরের মধ্যেই। পটভূমি গঙ্গাতীরবর্তী একটি গ্রাম এবং কলকাতা শহর। মানুষের জীবনে কখনও সু-সময় আসে, কখনও দুঃসময়। কীভাবে মানুষ তাতে সাড়া দেয়, পরিস্থিতির চাপের প্রতিক্রিয়ায় তাদের আচরণ কেমনভাবে উন্মোচিত করে দেয় তাদের অন্তর-সত্তাকে—এই বৈচিত্র্যের সমন্বয় দেখাতে চেয়েছেন লেখক। এ জন্যই উপন্যাসটির নাম 'জলতরঙ্গ'।

গঙ্গাতীরবর্তী গ্রাম সুখপুর। সেখানে বৃহৎ ভূসম্পত্তির অধিকারী গৃহপতি মিশ্র। সংসারে কোনো অভাব নেই। নাগরিক আধুনিকতার ভোগবিলাস এবং ব্যস্ত জীবনধারার স্পর্শ সেই নিশ্চিন্ত, কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রার প্রশান্তিকে ব্যাহত করেনি। গৃহপতির দুই পুত্র। বড়ো বাচস্পতি নিঃসন্তান। তিনি এবং তাঁর পত্নী সীমন্তিনী দুজনে মিলে 'সুখপুর পত্রিকা' নামে হাতে লেখা একটি পত্রিকা বার করেন। স্থানীয় সমস্ত সংবাদ তাতে লিপিবদ্ধ করতেন তাঁরা দুজনে মিলে। কনিষ্ঠ পুত্র বনস্পতি ছিলেন চিত্রশিল্পী। স্ব-গৃহে বসে ছবি আঁকতেন এবং মূর্তি গড়তেন। গৃহপতি দুই ছেলের কাউকেই উচ্চ শিক্ষার্থে শহরে পাঠাননি। কারণ উপার্জনের কোনো প্রয়োজন নেই; জমি থেকে আহৃত ফসল

এত অপর্যাপ্ত যে বহুজনে মিলেও বহুদিনে তা শেষ করতে পারবে না। দুই ভাইয়ের কেউ-ই নগরমনস্ক 'আধুনিক' ছিলেন না। বাইরে ছাপার জন্য লেখা ও ছবি পাঠিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন তাঁরা। তথাকথিত সমকালীন আধুনিক রুচির সঙ্গে তাঁদের সুভদ্র, ক্লাসিক ধরনের রুচির মিল ঘটেনি। তাঁরা তাঁদের নিজস্ব পরিমণ্ডলে নিজেদের সৃষ্টি নিয়ে তৃপ্তিতেই বাস করতেন: কোনো অভাববোধ ছিল না। এই দুই ভাই উপন্যাসের প্রধান দুই চরিত্র।

উপন্যাসের তৃতীয় প্রধান চরিত্র হেমন্তকুমার। সীমন্তিনীর পিতা বসন্তকুমারের একমাত্র পুত্র। শহরে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে গিয়ে তিনি অর্জন করেছিলেন কিছু উপরিতল-আশ্রিত জ্ঞান; সেই সঙ্গে প্রকৃত কর্ম প্রবণতা-বিহীন চতুরতা। পিতার বহু অর্থ নষ্ট করে তিনি গ্রামে ফিরে আসেন। পিতার মৃত্যু হয়। অনেকগুলি সন্তান এবং পত্নী সত্যবতী সহ তিনি সুখপুরের মিশ্র পরিবারের আশ্রিত হয়ে জীবনযাপন করেন। মিশ্র পরিবারের অঢেল সম্পত্তি এবং অকৃপণ হৃদয়। সে দিক থেকে কোনো অসুবিধা হল না। এই হেমন্তকুমারকে ঘিরে গড়ে উঠেছে উপন্যাসের তৃতীয় কথাবৃত্ত। তিনি সর্বদাই নতুন নতুন পরীক্ষা করেন বিভিন্ন কাজ নিয়ে, কোনোটিতেই সফল হন না এবং টাকা নষ্ট করেন। তিনি জ্ঞান দেবার চেষ্টা করেন সকলকে কিন্তু তাঁকে একবার জানা হয়ে গেলে তাঁর প্রদত্ত জ্ঞান কেউ গ্রহণ করে না। শারীরিক সংযমে তাঁর কিছুমাত্র আস্থা নেই। বহুসংখ্যক পুত্রকন্যার তিনি নাম রেখেছিলেন লাঠি, সোঁটা, বল্লম, কিরিচ, বন্দুক ইত্যাদি। বনস্পতির একমাত্র কন্যা বর্ণনা কলকাতায় থেকে কলেজে পড়ে এবং প্রকৃত অর্থে উচ্চ শিক্ষাকে গ্রহণ করেছে নিজের মনের মধ্যে। আর পরিবারে আছেন অত্যন্ত অনুগত ম্যানেজার এবং বনস্পতির অনুরাগী বন্ধু ভূষণ চক্রবর্তী।

উপন্যাসের সুখপুর পর্ব সমাপ্ত হল এক দারুণ-বিপর্যয়ের চাপে। একদা উন্মত্ত হয়ে উঠল নদী; তলিয়ে গেল মিশ্র পরিবারের অধিকাংশ জমি এবং তাদের আয়ের উৎস।

দ্বিতীয় পর্বের যবনিকা উঠল কলকাতায়। যেটুকু সঞ্চিত অর্থ ছিল তাই নিয়ে বনস্পতির কন্যা বর্ণনার সাহায্যে কলকাতার এক বস্তিতে ঘর ভাড়া করে তাঁর উঠে এলেন। এই বিপদের দিনেও হেমন্তকুমারের পরিবারকে ত্যাগ করবার কথা কারুরই মনে হল না। কলকাতার সংসারের প্রাত্যহিক অন্ন-সংস্থান হয়ে উঠল দুরূহ। কারোর-ই চাকরি নেই। বর্ণনা টিউশনি বাড়াতে চায়; বনস্পতি ছবি বিক্রি করতে চান। কোনোটিই সহজে হয় না। উপরন্তু বর্ণনার রূপ, বয়স এবং ব্যক্তিত্ব প্রলুব্ধ পুরুষদের সক্রিয় করে তুলতে থাকে। হেমন্তকুমার তাঁর সাধ্যমতো ছেলেমেয়েদের কাজে লাগাতে চান। তিনি তাদের মুটে-মজুরের কাজ করতে বলেন, রাস্তায় খাবার ফেরি করতে বলেন; মেয়েদের বলেন লোকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতে। নিজে ধরেন জ্যোতিষীর কাজ—অবশ্যই ভণ্ড। কিন্তু হেমন্তকুমারের প্রয়াস সফল হয় না।

তাঁর সন্তানেরা চিরকাল পরাশ্রিত, তাদের কোনো আত্মমর্যাদা-বোধ গড়ে ওঠেনি। তাঁর ছেলেরা চোর ও পকেটমার হয়ে যেতে থাকে; জেলে যায়, খুনও হয়। তাঁর মেয়েরা দাসীবৃত্তি থেকে ক্রমে দেহজীবিকার ব্যবসায়ে নেমে যায়। কেউ কেউ অসুখে মারা যায়। কেউ আত্মহত্যা করে। তবে শেষ পর্যন্ত হেমন্তকুমারের চৈতন্যোদয় হল। তিনি ভণ্ড জ্যোতিষীগিরি ছেড়ে রিকশা চালানের কাজ নিলেন। তাঁর সব সন্তানই মৃত। তিনি ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলে যে, আর সন্তান চান না।—'আমার মতো দরিদ্রের পিতা হবার যোগ্যতা নেই, এ লক্ষ্মীছাড়া সমাজে কোনও সন্তান মানুষ হবে না, মরুভূমিতে গাছ বাঁচে না। আপনি দয়া করে ব্যবস্থা করে দিন একটা, আমি নির্বংশই থাকব, আমার বংশে বাতি দিতে হবে না কাউকে। আপনি দয়া করে ব্যবস্থা করে দিন।'

শেষ পর্যন্ত মিশ্র পরিবার দুই ভাগ হয়ে যায়। বনস্পতি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে গেলেন সুখপুরের অবশিষ্ট অংশে, যার নাম ছিল বুড়ির জঙ্গল। সেখানে দুজনের খাবার মতো যথেষ্ট সম্পদ আছে, আছে প্রশান্ত নির্জনতা। ভূষণ চক্রবর্তীও সেখানে চলে যান। কিন্তু বাচস্পতি হেমন্তকুমারকে ফেলে কলকাতা ছেড়ে যেতে পারেন না। তিনি কলকাতায় বসেও 'সুখপুর সংবাদ' প্রকাশ করেন। তাতে তিনি সংবাদ লেখেন—'গঙ্গার গতি পরিবর্তন হইয়াছে। আমাদের জমি আবার হয়তো উঠিবে।'

উপন্যাসের চতুর্থ কথাবৃত্তটির কেন্দ্রে আছে বর্ণনা। এবং যদিও একটু অন্তরালে, তবু সেই কেন্দ্রেই আছেন আখ্যানের এক নেপথ্য নায়ক— লেখক সাত্যকি রায়। তিনি নিজের জবানিতে নবনী রায় নামক এক যুবককে উপস্থিত করেছেন এই কাহিনিতে। তিনি বর্ণনার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট। অন্তরালে থেকে বেনামে তাকে সাহায্য করেছেন। শেষ পর্যন্ত বর্ণনার বান্ধবী আকাশপরীর সাহায্যে দুজনের মধুর মিলন ঘটে।

যদিও উপন্যাসটি বহু আখ্যানবহুল, তবু আখ্যানগুলি জটিল নয়। উপন্যাসটিতে আগাগোড়া সুখপাঠ্যতার স্বাদ মাখানো। শিকড়বিহীন উচ্চাশা আর ভোগবিলাসের প্রলোভন সনাতন ভারতীয় জীবনধারার প্রশান্তিকে কীভাবে ব্যাহত করছে তা দেখিয়েছেন লেখক। কিন্তু তিনি এখানে রক্ষণশীল নন। কৃষিজমি-নির্ভর জীবনে যদি ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় তা হলে সেই ঝাপটা সামাল দেবার মত আধুনিক শিক্ষা অর্জন করাও যে জীবনে জরুরি তা নবনী রায় এবং বর্ণনার জীবনের আখ্যানে প্রমাণ করেছেন তিনি। গ্রাম এবং নগর—দুইয়ের সুসমঞ্জস বিন্যাসেই গড়ে ওঠে একালের সভ্যতা। এই সহজ, বাস্তব, সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি-ই এই উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক সম্ভারের মধ্যে 'ভীমপলশ্রী' (১৯৪৯) উপন্যাসটি ব্যতিক্রম বলে গণ্য হতে পারে। হাস্যরসের উপন্যাস সব সমেত হয়তো দশটির বেশি পাওয়া যাবে না বাংলায়। বনফুল এই নতুন শৈলীর

পরীক্ষা করেছেন এখানে। এই সূত্রেই বলে রাখা যায় এ কাহিনির উৎস এক পাশ্চাত্য উপন্যাস। লেখকের নাম বেন ট্রেভার্স (Ben Travers)। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে হাস্যরসাত্মক গদ্য রচনার ক্ষেত্রে বিখ্যাত। তাঁর উপন্যাসের নাম 'আ কাক্কু ইন দ্য নেস্ট' ('A Cuckoo in the Nest')। বইটি পড়ে ভালোলাগায় বনফুল লেখককে চিঠি লিখে—এই উপন্যাস অবলম্বনে একটি বাংলা আখ্যান রচনার অনুমতি চেয়েছিলেন। ট্রেভার্স তখনই অনুমতি দেন। এই তথ্য জানা যায় গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড থেকে প্রকাশিত 'বনফুল রচনাবলী'-র সপ্তম খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয় অংশ থেকে (সংস্করণ ১৯৯৫, পৃ.৪৮৮)।

বনফুলের ভালোলাগার কারণ স্পষ্টতই ছিল উপন্যাসটির প্লটের বৈচিত্র্য। সেই প্লট-এ আছে ঘটনানির্ভর কৌতুকজনক পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল হাস্যরস। এ জাতীয় ছোটো গল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। পার্থক্যের মধ্যে এই—এই উপন্যাসের আখ্যানভাগে মোটের উপর কিছুটা প্রাপ্তবয়স্ক। নর-নারী সম্পর্কের মধ্যে প্রবহমান প্রেম, ঈর্ষা, অধিকারবোধ, নির্বুদ্ধিতা ইত্যাদির টানাপোড়েনে গাঁথা এক কৌতুক-কথাবৃত্ত। যাদের নিয়ে কৌতুক তাদের স্বভাবধর্ম সম্পর্কে কিছুটা পরিহাস-কটাক্ষ থাকলেও কোনো আঘাত নেই এবং কোনো ক্ষুরধার ব্যঙ্গও নেই।

উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে সুশোভন ও অনীতা। এই দুই যুবক-যুবতী দুজনেই কমরেড এবং বর্তমানে দম্পতি। অনীতার মা স্বয়ম্প্রভা অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মহিলা এবং সকলের উপরেই নিজের অধিকার বজায় রাখতে উৎসুক। সমগ্র কাহিনিটি আলোকপ্রাপ্ত ব্রাহ্ম সমাজের পশ্চাৎপটে উপস্থাপিত। সেই আধুনিকতা নিয়েও কিছু সরস পরিহাস আছে। অনীতার মা অনীতার মনে সুশোভন সম্পর্কে সন্দেহের বীজ রোপণ করতে চান। অনিতা সুশোভনকে একান্ত ভালোবাসলেও মায়ের কথা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেবার মতো মনের জোর তার নেই।

একদা পরিচিত এক ধনী জমিদারের গৃহে সপ্তাহান্ত অতিবাহিত করবার আমন্ত্রণ পেয়ে অনিতা আর সুশোভন দুজনেই সেখানে গেল। কিন্তু দুজনে এক সঙ্গে যেতে পারেনি, গিয়েছিল আলাদা। পথে সুশোভনের সঙ্গে এক মহিলার এবং অনীতার সঙ্গে এক ভদ্রলোকের পরিচয় হয়। এবং তারা কিছুটা সময় ও একটি রাত্রি এক পান্থনিবাসে কাটাতে বাধ্য হয়। ঘটনাচক্রে সুশোভনের সঙ্গে পরিচিত মহিলা এবং অনিতার সঙ্গে পরিচিত ভদ্রলোক ছিল স্বামী-স্ত্রী। এই পরিস্থিতিতে স্বভাবতই সন্দেহ ও বিভ্রান্তি জাগতে পারে এমন কিছু পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। সেই পরিস্থিতি তীব্রতর করে তুলতে ইন্ধন জোগান অনীতার মা স্বয়ম্প্রভা। অতঃপর কীভাবে স্বয়ম্প্রভাও এক বিচিত্র পরিস্থিতি উদ্ভবে স্বল্পপরিচিত এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সংস্পর্শে আসতে বাধ্য হন—সম্পূর্ণ পরিস্থিতির ব্যাখ্যা জানা না থাকলে সে ক্ষেত্রে তাঁর চরিত্র

সম্পর্কেও সন্দেহজনক কথা উঠতে পারে। সেই পরিস্থিতির উদ্ভব অবশ্য পুরোপুরি আকস্মিক নয়। সুশোভন শ্বশ্রুমাতার ব্যবহারে ইতোমধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সেই সুযোগ বুঝে স্বয়ংপ্রভা এবং সদারঙ্গবিহারীকে এক ঘরে রেখে বাইরে থেকে লাগিয়ে দিয়েছিল তালা। মোটের উপর এই হল আখ্যান। এই কাহিনিতে গভীর চিন্তনযোগ্য কোনো বিষয় নেই; উল্লেখযোগ্য কোনো জীবনদর্শনও অনুপস্থিত। তবে সামাজিক, পারিবারিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে যে মৃদু উপদেশ হাস্যরসের মধ্য দিয়েই প্রতিভাত হয়েছে তা হল সম্পর্কের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বন্ধন স্বাস্থ্যকর নয় এবং সন্দেহ রোগটি অতীব ক্ষতিকর। দ্বিতীয় উপদেশ হল অন্যের সংসারে অকারণে নিজের মতামত চালাতে যাওয়া অনুচিত এবং বিপজ্জনক। অমৃতলাল বসুর রচিত নাটিকা 'ব্যাপিকা-বিদায়'-এর কথা এই সূত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। হয়তো মিল পাওয়া যাবে আরও কোনো কোনো আখ্যানের সঙ্গে। আগেই বলা হয়েছে আখ্যানের দিক থেকে উপন্যাসটি তেমন অভিনবত্ব দাবি করতে পারে না। কিন্তু তাতে পাঠকের কাছে আখ্যানটির আকর্ষণ কমেনি। সুশোভন, অনীতা এবং স্বয়ংপ্রভার যাত্রাপথে উদ্ভাবিত বিচিত্র কৌতুকময় ঘটনাবলি এবং সংলাপের নিবিড় সরসতা উপন্যাসটিকে উপভোগ্য করে তুলেছে। প্রথম থেকেই এই কৌশল সার্থকভাবে প্রযুক্ত। জমিদার দিগ্বিজয় সিংহরায় সুশোভন-অনিতাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র লিখেছেন। তিনি শুদ্ধ বাংলা ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী। তাই গেঁটেবাতকে লিখেছেন 'গ্রন্থিবাত'। এই ধরনের নির্দোষ কৌতুক উপন্যাসটির সর্বত্র ঝলমল করে। উল্লেখযোগ্য আরও একটি দিক—একটি পাশ্চাত্য উপন্যাসকে দেশীয়, বঙ্গীয় রূপ দিয়েছেন বনফুল। এই রূপান্তর এতই নিখুঁত স্বাভাবিক যে পাঠকের কখনও এক মুহূর্তের জন্য রস উপভোগে বাধা ঘটে না।

বনফুলের একগুচ্ছ বিচিত্রস্বাদী উপন্যাসের এই সংকলন যে-কোনো পাঠককেই তন্ময় করে রাখবে। প্রতিটি লেখাই সুখপাঠ্য এবং ভাবনা-উদ্দীপক। বনফুলের লেখা আমাদের চিরকালই মুগ্ধ করেছে। আমরা আরও একবার মুগ্ধ হব।

সুমিতা চক্রবর্তী

জঙ্গম

প্রথম অধ্যায়

।। এক ।।

শঙ্কর তন্ময় হইয়া পথ চলিতেছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। হ্যারিসন রোডে অসম্ভব রকম ভিড়। সেই ভিড় ঠেলিয়া শঙ্কর হাওড়া স্টেশনে চলিয়াছে। দ্রুতবেগেই চলিয়াছে। পাশের দোকানে একটা ঘড়ির দিকে চাহিয়া সে তাহার গতি-বেগকে আরও একটু বাড়াইয়া দিল। ট্রেনের বেশি সময় নাই। হস্টেলের ঘড়িটা নিশ্চয় স্লো ছিল। ফুলের তোড়াটা ভাল করিয়া কাগজ দিয়া ঢাকিয়া আবার সে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। চারিদিকে যা ভিড়—ধাক্কা লাগিয়া তোড়াটা নষ্ট হইয়া না যায়!

নিউ মার্কেট হইতে ফুল কিনিতে গিয়া তাহার দেরিও হইয়া গেল, পকেটের সমস্ত পয়সাও শেষ হইয়া গেল। ট্রামের পয়সা পর্যন্ত নাই, হাঁটিয়া যাইতে হইতেছে। অথচ আজিকার দিনে সে উৎপলের সহিত শুধু-হাতে দেখা করিতে পারে না তো! বাহিরের ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত জনতার মতো তাহার মনের মধ্যেও নানা চিন্তা আসিয়া ভিড় করিতে লাগিল। একদিন এই উৎপলই তাহার জীবনে সব ছিল। তাহার কৈশোর-জীবনটা উৎপলময় ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কি ভালই বাসিত তাহাকে! এই জনতার মধ্যে পথ চলিতে চলিতেও অকস্মাৎ তাহার মনে সেই বিগত জীবনের একটি স্মৃতি ভাসিয়া আসিল। দীর্ঘ দশ বৎসরেও তাহা মলিন হয় নাই। কত কথা বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই ছবিটুকু শঙ্করের অন্তরে অকারণে এখনও সজীব হইয়া আছে। একদিন দুপুরে টিফিনের সময় উৎপল স্কুলের পিছন দিককার বারান্দায় বসিয়া পা দুলাইয়া দুলাইয়া পেয়ারা খাইতেছিল এবং একফালি রোদ আসিয়া তাহার লাল ডোরা-কাটা জামায় পড়িয়া সর্বাঙ্গে একটা আলো-ছায়ার রহস্য সৃজন করিয়াছিল— এই ছবিটুকু শঙ্করের মনে কেমন করিয়া যেন এখনও অমলিন রহিয়াছে। আর একদিনের কথাও মনে আছে। সেদিন উৎপলের জন্মতিথি-উৎসব। তাহার কপালে ও গালে চন্দনবিন্দুর সমারোহ। উৎপলের বোন শৈল আসিয়া শঙ্করের পরামর্শ চাহিল—দাদার জন্মদিনে নূতন রকম কি উপহার দেওয়া যায়!

এই গ্যান্‌ঢঅ—গ্যান্‌ঢঅ—

শঙ্করের চিন্তাস্রোত ব্যাহত হইল।

ফিরিয়া এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিল। কাহাকেও দেখিতে পাইল না। ভণ্টুর গলা বলিয়া মনে হইল। ভণ্টুই নিশ্চয়। কারণ 'গ্যান্‌ঢঅ' শব্দটির এবং এই জাতীয় আরও নানা বিচিত্র শব্দের সৃষ্টিকর্তা ভণ্টুই। নিজের মনের ভাবকে স্বরচিত নানারূপ অদ্ভুত শব্দ সৃষ্টি করিয়া প্রকাশ করা ভণ্টুর একটা বিশেষত্ব। অভিধান-বহির্ভূত এই সকল শব্দের সৃষ্টিকর্তা বলিয়াই শঙ্কর ভণ্টুর প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হয়।

শঙ্কর এদিক-ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। আবার চলিতে শুরু করিবে, এমন সময় আবার ডাক আসিল—

চাম গ্যান্‌ঢঅ—

শঙ্কর আবার পিছু ফিরিয়া দেখিল, হ্যারিসন রোডের একটি অতি সঙ্কীর্ণ গলির অন্ধকারে ভণ্টু দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

গোলগাল মুখটিতে একমুখ হাসি, বাঁ হাতে বাইসিক্‌ল, ডান হাতে ছোট একটা প্যাকেট—নিতান্ত ছোটও নয়, মাঝারি-গোছের। শঙ্কর আগাইয়া যাইতেই ভণ্টু তাহাকে বলিল, বাইকটা একবার ধর্‌ তো, এই প্যাকেটটা বাঁধি পেছন দিকে।

বিস্মিত শঙ্কর বাইকটা ধরিয়া বলিল, তুই এখানে হঠাৎ?

দাড়ি কিনতে এসেছিলাম।

ভণ্টুর চোখ দুইটিতে হাসি উপচাইয়া পড়িল।

শঙ্কর আরও বিস্মিত হইয়া বলিল, দাড়ি?

দাড়ি। চরম লদ্‌কালদ্‌কি!

এই এক পুঁটুলি দাড়ি।

জটাও আছে। জটিল লদ্‌কালদ্‌কি!

শঙ্কর বলিল, তুই আজকাল কলেজ যাস না কেন? থিয়েটারে ঢুকেছিস নাকি?

ভণ্টু কিছু না বলিয়া নিপুণভাবে প্যাকেটটি বাইকের পিছন দিকে বাঁধিতে লাগিল। বাঁধা শেষ হইবার পূর্বেই শঙ্কর বলিল, তাড়াতাড়ি শেষ করে নে ভাই। আমাকে হাওড়া স্টেশনে যেতে হবে। উৎপল বিলেত যাচ্ছে আজ, জানিস না?

তাই নাকি? লদ্‌কালদ্‌কি করতে যাচ্ছিস বুঝি তুই? যা, আমার আজ আর সময় নেই। আটটার মধ্যে দাড়ি না পৌঁছলে প্যান্‌থার আমাকে খেয়ে ফেলবে।

প্যান্‌থার কে?

ছোটবাবু।

ছোটবাবু কে?

আরে গাড়োল, আমি যে আপিসে চাকরি করছি, সেই আপিসের ছোটবাবু। ইয়া চোয়াল, ইয়া লাল চোখ, চাম লদ্‌! থিয়েটারে ভারি ঝোঁক। প্যান্‌থার রসিক আছে। যাক, চললাম ভাই আমি। উৎপলকে বলে দিস্‌, বিলেতে যাচ্ছে যাক—দক্‌চে না যায়। চললাম, দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার।

ভণ্টু বাইকে সওয়ার হইল।

শঙ্করের বিস্ময় কাটে নাই।

সে বলিল, তুই চাকরিতে ঢুকেছিস নাকি? কিছু জানি না তো! পড়াশোনা ছেড়ে দিলি?

আসছে বছর আবার শুরু করা যাবে।

ভণ্টু বাইকে চড়িয়া জনতার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

শঙ্কর ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ভণ্টুদের অবস্থা সচ্ছল নয়। হয়তো দারিদ্র্যের জন্যই বেচারার পড়াটা হইল না। ভণ্টুর সহিত তাহার প্রথম পরিচয়ের কথা মনে পড়িল। বেঁটে মোটা আধময়লা-বুকখোলা জামা-পরা হাস্যমুখ ভণ্টুকে সে যেদিন প্রথম ক্লাসে দেখিয়াছিল, সেদিন তাহাকে ভারি অদ্ভুত মনে হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল, ভারি নোংরা ছেলেটা। এখনও ভণ্টু তেমনই নোংরা আছে। কিন্তু আর তো তাহাকে তেমন খারাপ লাগে না! শঙ্কর ভণ্টুর অন্য পরিচয় পাইয়াছে। তাহাদের বাড়িতেও সে গিয়াছে কয়েকবার।

হাওড়া পুলের উপর দ্রুতপদে হাঁটিতে হাঁটিতে শঙ্করের মনে পড়িতে লাগিল, উৎপলের

কথা নয়, ভণ্টুর কথা। তাহার হঠাৎ মনে হইল, ভণ্টুর বাবা তাহাকে একদিন যাইতে বলিয়াছিলেন। নানা রকম গোলমালে তাহার যাওয়া হয় নাই। বেলেঘাটাতে এক অতি এঁদো গলির মধ্যে ভণ্টুর বাসা। যাওয়াই মুশকিল। শঙ্কর ভাল করিয়া চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিত যে, ভণ্টুর ওখানে না যাওয়ার কারণ ভণ্টুর বাসার দূরত্ব নহে; অন্য কারণ রহিয়াছে। উৎপলের বিবাহের পর হইতেই শঙ্কর ভণ্টুর ওখানে যাওয়া একপ্রকার ছাড়িয়া দিয়াছে। উৎপলের বিবাহ হইয়াছে প্রায় মাস দুই হইল। উৎপলের শ্বশুর বড়লোক এবং শ্বশুরের অর্থে উৎপল বিলাত চলিয়াছে। শঙ্কর কিন্তু মাতিয়া উঠিয়াছে এসব কারণে নয়—শঙ্করের মাতিবার কারণ উৎপলের স্ত্রী সুরমা। সুশ্রী, তন্বী, যুবতী, সুশিক্ষিতা। কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে, পোশাক-পরিচ্ছদে সুরুচিসঙ্গত শোভন সৌষ্ঠব। সকল বিষয়েই বেশ কেমন একটা যেন সহজ অনাড়ম্বর কমনীয়তা আছে। এমন মেয়ে শঙ্কর ইতিপূর্বে কখনও দেখে নাই।

সে পাড়াগাঁয়ে মানুষ। মফস্বলের স্কুলে পড়িয়াছে। আই. এস-সি, বি. এস-সি-টাও মফস্বলের কলেজেই কাটিয়েছে।

সুরমার মতো মেয়ের সংস্পর্শে সে জীবনে কখনও আসে নাই। তাহার মোহগ্রস্ত মন তাই উৎপলের বিলেত যাওয়াটাকে উপলক্ষ করিয়া সুরমাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়াই ঘুরিয়া মরিতেছিল। কিন্তু সে নিজে এ বিষয়ে সজ্ঞান ছিল না। এ বিষয়ে সচেতন হইয়াছিল অনেক পরে।

হাওড়া স্টেশনে শঙ্কর যখন পৌঁছিল, তখন ট্রেন ছাড়িতে আর বেশি বিলম্ব নাই। মাত্র দশ মিনিট বুঝি বাকি ছিল। শঙ্কর দূর হইতেই দেখিতে পাইল, উৎপল একদল নরনারী পরিবৃত হইয়া প্ল্যাটফর্মের উপরেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শঙ্কর কাছাকাছি আসিতেই উৎপলও তাহাকে দেখিতে পাইল এবং বলিয়া উঠিল, এই যে শঙ্কু, তুইও এসে পড়েছিস তা হলে! আমি ভাবছিলাম, তোর সঙ্গে বুঝি আর দেখাই হল না। ওহো, একটা ভারি ভুল হয়ে গেছে। স্লিপিং সুটটা বাক্সের ভেতরে থেকে গেছে। সুরমা, বার করে ফেল না— ওই বড় সুটকেশটায় আছে, এখুনি তো দরকার হবে।

সুরমা একটু ইতস্তত করিয়া গাড়ির কামরার মধ্যে গেল। ঠিক এই সময়টাতে বাক্স ঘাঁটাঘাঁটি করিবার ইচ্ছা ছিল না তাহার।

শঙ্কর কাগজের আবরণ খুলিয়া ফুলগুলি বাহির করিল। বড় বড় লাল গোলাপ। দেখিলেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

উৎপল বিস্মিত সুরে বলিল, এ কার জন্যে এনেছিস তুই? আমার জন্যে? উঃ, এত সেন্টিমেন্টাল তুই! ফুল না এনে ভাল একটা সিগারেট কেস আনতিস যদি, কাজে লাগত। ফুল তো একটু পরে শুকিয়ে যাবে। সুরমা অবশ্য খুব খুশি হবে। সুরমা, শঙ্কর কি কাণ্ড করেছে দেখ!

সুরমা নামিয়া আসিয়া স্মিতমুখে ফুলগুলি লইল।

উৎপল বলিল, বিছানার একধারেই রাখ এখন। পরে ঠিক করে নিলেই হবে। সুরমাও যাচ্ছে আমার সঙ্গে বম্বে পর্যন্ত।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, ভালই তো।

ছদ্ম-গাম্ভীর্যভরে উৎপল কহিল, তুমি কবি মানুষ, তুমি তো বলবেই। কিন্তু শাস্ত্রকারগণ কিন্তু বলেছেন অন্য কথা—পথি নারী বিবর্জিতা—

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, নারীর বেলায় শাস্ত্রটা মানা সুবিধের স্বীকার করি। তবে বিলেত যাবার মুখে শাস্ত্র আলোচনা ঠিক মানাচ্ছে না। থাম্ তুই।

গাড়ির ভিতর ফুলগুলি গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে সুরমা শঙ্করের কথাগুলি মন দিয়া শুনিতেছিল। এই কথায় তাহার মুখে একটা স্নিগ্ধ হাসির আভা ছড়াইয়া পড়িল। সে গাড়ি হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে শঙ্করবাবু। সত্যিই গোলাপগুলো লাভ্‌লি। আপনার রসবোধকে প্রশংসা না করে পারলাম না।

শঙ্কর উত্তরে শুধু হাসিল।

উৎপলবাবু, আপনার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন না? বিলেত যাচ্ছেন, এসব আদব-কায়দাগুলো শিখুন।

উৎপল গাড়ির কামরায় ঢুকিয়া টিফিন-কেরিয়ারটা লইয়া কি যেন করিতেছিল। এই কথা শুনিয়া নামিয়া আসিল। যিনি কথাগুলি বলিলেন, তিনি একজন মহিলা। বয়স প্রায় পঁচিশ হইবে। পরিপাটিরূপে সুসজ্জিতা। কোথায় কি পরিলে এবং না পরিলে তাঁহাকে মানাইবে এ জ্ঞান যে তাঁহার আছে, তাহা একবার তাঁহার দিকে তাকাইলেই বোঝা যায়। তাঁহার সঙ্গে আরও দুইজন তরুণী ছিলেন। তাঁহাদের বয়স আরও কম। একজনের বয়স বছর কুড়ি এবং আর একজনের বছর আঠারো।

উৎপল নামিয়া আসিয়া কহিল, হ্যাঁ, আলাপ করিয়ে দেব বইকি। আমি বিলেত চললাম, আপনাদের ফাই-ফরমাশ খাটবার মতো একজন কাউকে দিয়ে যেতে হবে তো! এইবার আসুন, আদব-কায়দামতো আপনাদের পরস্পর পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হলেন শঙ্করসেবক রায়। আর ইনি হচ্ছেন মিসেস্ মিত্র—প্রফেসার বিশ্বেশ্বর মিত্রের স্ত্রী, আমাদের ইউনিভার্সাল মিষ্টিদিদি। আর ওই যে উনি—যিনি ওদিকে মুখ ফিরিয়ে মুচকি হাসছেন, উনি হচ্ছেন মিষ্টিদিদির মাসতুতো বোন, ওঁর নাম হচ্ছে মিসেস রায়, ওঁর স্বামী দিল্লীতে চাকরি করেন; ডাকনাম ওঁর সোনাদিদি। আর ওঁর পাশে যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি হলেন মিস মিত্র—বেথুনে বি. এ পড়ছেন; ওঁর ডাকনাম হচ্ছে রিনি। আর আপনারা সবাই শুনে রাখুন, আমার এই বন্ধুটি একটি অসাধারণ মেধাবী ছাত্র—ক্লাসের মধ্যে দল পাকাতে ওস্তাদ, সব দলেই পাণ্ডাগিরি করা চাই। তা ছাড়া পরোপকারী এবং সর্বোপরি কবি।

শেষের কথাটা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল।

উৎপল তাহার পর দণ্ডায়মান পুরুষ দুইটির দিকে ফিরিয়া বলিল, আর এই দুটি হচ্ছেন আমার বড় কুটুম্ব। এ দুজনকে দেখিসনি শঙ্কু। এঁরা দুজনেই আজ সকালে এসে পৌঁছেছেন। বিয়ের সময়ও আসতে পারেননি এঁরা— এত এঁদের পড়ায় মন। ইনি হচ্ছেন অশোক, আর উনি হচ্ছেন প্রবীর। দুজনেই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েন রুড়কিতে।

শঙ্কর সকলকেই নমস্কার করিল।

শঙ্কর এবং উৎপল একসঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছিল। তাহার পর কিন্তু উভয়ের ছাড়াছাড়ি হয়।

উৎপল কলিকাতায় চলিয়া আসে, শঙ্কর মফস্বলের কলেজে যায়। সেইজন্য উৎপলের কলিকাতাবাসী পরিচিতদের সহিত শঙ্করের পরিচয় ছিল না। এতগুলি অপরিচিতা তরুণীর মধ্যে শঙ্কর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অস্বস্তিকর নীরবতা।

মিষ্টিদিদি নীরবতা ভঙ্গ করিলেন।

সুমিষ্ট হাসিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কবিতার বই কোনো বেরিয়েছে নাকি?

না, কোনো কবিতা ছাপা হয়নি আমার।

ইহা শুনিয়া সোনাদিদি আগ্রহের সুরে বলিলেন, নিয়ে আসবেন আপনার কবিতা একদিন আমাদের বাড়িতে। এত ভাল লাগে আমার কবিতা—বিশেষ যে কবিতা ছাপা হয়নি। আসবেন একদিন! দিদি, ওঁকে চায়ে আসতে বল না একদিন।

মিষ্টিদিদি বলিলেন, কবিতার নাম যেই শুনেছে, অমনি সোনার মন উসখুস করছে। আসবেন আপনি শঙ্করবাবু একদিন। তা না হলে জ্বালিয়ে মারবে ও আমাকে।

শঙ্কর বলিল, হাঁ, যাব একদিন। ঠিকানাটা কি আপনাদের?

মিষ্টিদিদি ঠিকানা বলিলেন।

শঙ্কর উৎপলকে জিজ্ঞাসা করিল, তোর বাবা মা, শ্বশুর শাশুড়ি কাউকে দেখছি না যে?

বাবা মা বর্ধমানে দেখা করবেন, আর সুরমার বাবা মা উঠবেন আসানসোল থেকে। শ্বশুরমশায়কেও এইবার কাজে জয়েন করতে হবে তো।

উৎপলের শ্বশুর বম্বেতে চাকুরি করিতেন।

ঢং ঢং করিয়া ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা হইল।

উৎপল ও সুরমা গিয়া ট্রেনে উঠিয়া বসিল।

উৎপল বলিল, তুইও একটা বিয়ে করে চলে আয় বিলেতে, বুঝলি শঙ্কর?

তাহার পর কণ্ঠস্বর একটু নীচু করিয়া বলিল, শোন্, রিনি মেয়েটিকে কেমন লাগছে তোর? বিয়ে কর্ না ওকে। প্রফেসার মিত্র বলেছিলেন যে, ভাল পাত্র পেলে বিলেত পাঠাবেন।

চুপ কর্ তুই।

গার্ডের হুইস্‌ল্ বাজিল।

ট্রেন চলিতে শুরু করিল।

সুরমা হঠাৎ জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া শঙ্করকে বলিল, চিঠি লিখবেন আমায় বম্বেতে। মিষ্টিদিদির কাছে ঠিকানা আছে। লিখবেন তো?

শঙ্কর ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিল।

ট্রেনের গতি-বেগ বাড়িল। উৎপল জানালা দিয়া ঝুঁকিয়া যথারীতি রুমাল নাড়িতে লাগিল।

যতক্ষণ রুমাল দেখা গেল, সকলেই সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ক্রমশ রুমালও অদৃশ্য হইয়া গেল।

মিষ্টিদিদি তখন শঙ্করকে বলিলেন, এইবার আমরাও যাই, চলুন। আপনি থাকেন কোথায়?

হস্টেলে। হস্টেলের ঠিকানা সে দিল।

চলুন না, নামিয়ে দিয়ে যাই আপনাকে। গাড়ি আছে আমাদের সঙ্গে।

ধন্যবাদ। কিন্তু আমি এখন হস্টেলে ফিরব না। আর এক জায়গায় যেতে হবে আমাকে।

যাবেন কিন্তু আমাদের বাড়িতে। ভুলবেন না।

যাব।

মিষ্টিদিদিরা চলিয়া গেলেন।

উৎপলের শ্যালক দুইটিও তাঁহাদের গাড়িতে উঠিল।

সকলে চলিয়া গেলে শঙ্কর খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত মনটা যেন ফাঁকা হইয়া গেল। মনে হইল ভণ্টুর বাড়ি যাই। ভণ্টু হঠাৎ পড়া ছাড়িয়া চাকুরিতে ঢুকিল কেন? ভণ্টুর বৌদির মুখখানা একবার মনে পড়িল। এত রাত্রে ভণ্টুর বাড়ি হাঁটিয়া যাওয়াই মুশকিল। কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় যে পরিচিত টিকিট-কালেক্টরবাবুটির অনুগ্রহে শঙ্কর বিনা মাশুলে প্ল্যাটফর্মে ঢুকিয়াছিল, তিনি আসিয়া বলিলেন, এইবার আপনি বাইরে যান সার। আর একখানা ট্রেন ইন করবে এক্ষুনি। আমার ডিউটিও ওভার হল।

শঙ্কর বাহিরে চলিয়া আসিল।

বাইরে আসিয়াই তাহার চোখে পড়িল, কিছু দূরে কতকগুলি লোক কি একটা বস্তুকে ঘিরিয়া কোলাহল করিতেছে। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য শঙ্করও আগাইয়া গেল। গিয়া দেখিল, একটি রমণী মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে এবং সেই মূর্ছিতা রমণীর মাথা কোলে করিয়া লইয়া আর এক নারী বিলাপ করিতেছে। তাহাদের ঘিরিয়া কৌতূহলী জনতা দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিল। দুই মিনিটের মধ্যে কয়েকটা মতামত শঙ্করের কানে গেল।

একজন বৃদ্ধ-গোছের ভদ্রলোক মাথা নাড়িয়া বলিতেছিলেন, মৃগী রোগ বড় সঙিন ব্যায়রাম মশাই। ভালর মধ্যে এই—ছোঁয়াচে নয়।

একটি পাতলা লম্বা গোছের ভদ্রলোক তাঁহার অপেক্ষাও পাতলা ও লম্বা একটি ভদ্রলোকের কানে কানে ঘাড় উঁচু করিয়া বলিতেছিলেন, টেনেছে—জোর টেনেছে—বুঝলে খুড়ো, দেখেই বুঝেছি আমি।

খুড়ো কিছু না বলিয়া জিহ্বার প্রান্তটুকু তির্যকভাবে বাহির করিয়া বাম চক্ষুটি ছোট করিলেন। তাহা দেখিয়া পুলকিত ভাইপো খুড়োর পৃষ্ঠদেশে একটি চপেটাঘাত করিয়া সমস্ত দন্তগুলি বিকশিত করিয়া ফেলিলেন। মোটাগোছের বৃদ্ধ একটি ভদ্রলোকও মূর্ছিতা নারীটির সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়াছেন দেখা গেল, তাঁহার থিয়োরি কিন্তু অন্য রকম। তিনি বলিতেছেন, তারকেশ্বরে ধন্না দেওয়া কি সোজা ব্যাপার! সমস্ত দিনের কঠোর উপবাস!

শঙ্কর দেখিল, মেয়েটির যাহাই হউক, অবিলম্বে উহাকে জনতার চাপ হইতে উদ্ধার না করিলে দমবন্ধ হইয়াই মরিয়া যাইবে।

সে সোজা ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল ও বলিষ্ঠ দুই বাহু দ্বারা অজ্ঞান মেয়েটিকে তুলিয়া লইয়া অপর মহিলাটিকে বলিল, আসুন, এঁকে কলের কাছে নিয়ে যাই। মাথায় মুখে জল দেওয়া দরকার আগে। শঙ্করের সপ্রতিভ ভাব দেখিয়া সকলে মনে করিল, শঙ্কর বোধহয় ইহাদের নিজেদের লোক। সুতরাং জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

কলের কাছে লইয়া গিয়া চোখে মুখে জল দেওয়াতে মেয়েটির জ্ঞান হইল। জ্ঞান হইলে সে অসম্বৃত বেশবাস ঠিক করিয়া লজ্জিত হইয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিল। শঙ্কর দেখিল, মেয়েটি অল্পবয়সী—সতেরো-আঠারোর বেশি হইবে না। অপর মহিলাটি বয়স্থা। তিনি বলিলেন, বেঁচে থাক তুমি বাবা। মেয়েটির ফিটের ব্যায়রাম আছে। তুমি না থাকলে কি যে বিপদ হত আজ আমার!

শঙ্কর বলিল, আপনারা কোথা যাবেন?

আমরা কলকাতাতে যাব বাবা।

আপনাদের একটা গাড়ি করে দিই তা হলে?

তাই দাও।

শঙ্কর তাহাদের জন্য একটি ঘোড়ার গাড়ি ঠিক করিয়া দিল। বয়স্থা মেয়েটি শঙ্করকে আর এক দফা আশীর্বাদ করিয়া শেষে বলিল, তুমি একদিন যেও আমাদের ওখানে বাবা। যাবে?

কোন্‌খানে থাকেন আপনারা?

কেরানিবাগানে। ১৯ নম্বর কেরানিবাগান। যেও একদিন, কেমন?

যাব।

তরুণীটি চকিতে একবার শঙ্করের দিকে তাকাইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

ঘোড়ার গাড়ি চলিয়া গেল।

শঙ্কর বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, কে ইহারা? ওই যুবতী নারীটির শরীরের ভার কি লঘু? জীবনে ইতিপূর্বে সে আর কোনোদিন কোনো যুবতী নারীর শারীরিক ঘনিষ্ঠতা লাভ করে নাই। কত অক্লেশে সে মেয়েটিকে দুই হাতের উপর তুলিয়া কলের কাছে লইয়া আসিল, তাহার কোনো সংকোচ হইল না তো। ওই যে অপরা মহিলাটি ছিলেন, তিনিও তো কোনো আপত্তির কারণ দেখিলেন না ইহাতে! মহিলাটি মেয়েটির কে হন? মেয়েটি কি বিবাহিতা?

এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে শঙ্কর আবার হাওড়া পুল পার হইতে লাগিল। তাহার অন্তরের নিভৃতকন্দরবাসী কাহার যেন ঘুম ভাঙিয়া গেল। কিসের যেন বিসর্পিত সঞ্চরণ সে সর্বাঙ্গে অনুভব করিতে লাগিল। অদ্ভুত সে অনুভূতি!

হস্টেলে ফিরিয়া দেখিল, ভণ্টু তাহার অপেক্ষায় কমনরুমে বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া হাসিমুখে বলিল, ঘোর জালে পড়ে ফের এসেছি ভাই।

কি হল?

ভীম জাল।

মানে?

মানে, মেজকাকা ফিরে এসেছেন।

ভণ্টুর মেজকাকা সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন।

শঙ্কর বিস্মিত হইয়া বলিল, তাই নাকি?

একেবারে থলথলে কাণ্ড। মেজকাকার চেহারা যদি দেখিস এখন. ইয়া লদলদে ভুঁড়ি, মুখময় দাড়ি, গোঁফ, গেরুয়া লুঙ্গি—জমজমাট ব্যাপার!

শঙ্কর বলিল, তাই নাকি?

তাহার পর একটু থামিয়া বলিল, ভালই তো হয়েছে, মেজকাকা ফিরে এসেছেন। ভীম জাল বলছিলি কেন?

ভণ্টু হাসিয়া বলিল, মেজকাকা চাকরিটা যদি পায়, তবেই না ভাল। সেইজন্যেই তো তোর কাছে এসেছি ভাই। তুই যদি একটু বোস সাহেবকে অনুরোধ করিস, ঠিক হয়ে যাবে। চাকরি না হলেই ভীম জাল। আমার পক্ষে একা ম্যানেজ করা শক্ত। তার ওপর শুনছি, মেজকাকা আজকাল খাঁটি গব্যঘৃত ছাড়া ব্যবহারই করেন না অন্য কিছু। গুরুর আদেশ নেই।

শঙ্কর শুনিয়া নির্বাক হইয়া রহিল।

তাহার পর বলিল, তুই পড়া ছেড়ে চাকরিতে ঢুকলি কেন হঠাৎ? তোকে তখন জিজ্ঞেসই করা হয়নি। বিষ্ণুবাবু কেমন আছেন আজকাল?

দাদাকে নিয়েই তো মুশকিল। দাদার আবার জ্বর শুরু হয়েছে। ডাক্তার বললে, সমুদ্রের ধারে কোথাও চেঞ্জে পাঠাতে। সেইজন্যে বাধ্য হয়ে আমাকে চাকরি নিতে হল। পেয়েও গেলাম একটা। কি করি বল? দাদার হাফ পে-তে ছুটি। সংসার তো চালাতে হবে। তার ওপর মেজকাকা এসে হাজির হয়েছেন। বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখি, তিনি পদ্মাসনে বসে প্রাণায়াম করছেন। গভীর গাড্ডায় পড়ে গেছি ভাই। তুই উদ্ধার না করলে আর উপায় নেই। বোস সাহেবকে তুই যদি একটু বলিস, ঠিক মেজকাকার চাকরিটা হয়ে যাবে। যাবি এখন? এই সময় বোস সাহেব বাড়িতে থাকে।

এখুনি?

দেরি করে লাভ কি?

এখন ভাই রাত হয়ে গেছে। নটা বেজে গেছে বোধহয়। এখন এত রাত্রে হস্টেল থেকে চলে যাওয়া ঠিক নয়। এই মাসেই আরও দুবার আমি রাত্রে ছুটি নিয়েছি। কাল যাওয়া যাবে।

আচ্ছা।

ভণ্টু যেন বিমর্ষ হইয়া পড়িল।

সে যেন আশা করিয়া আসিয়াছিল, শঙ্কর এখনই তাহার সহিত বোস সাহেবের বাড়ি যাইবে।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব।

হঠাৎ ভণ্টু বলিল, গোটা চারেক পয়সা দিতে পারিস?

শঙ্করের পকেটে যাহা কিছু ছিল, ফুল কিনিতেই ফুরাইয়া গিয়াছিল। পকেটে একটি পয়সাও ছিল না। বলিল, কাছে তো নেই ভাই।

ওপর থেকে নিয়ে আয়।

কি করবি পয়সা নিয়ে?

কিছু খাব। সেই বেলা নটায় দুটি ভাত খেয়ে আপিসে বেরিয়েছিলাম। তারপর থেকে গ্লাস তিনেক জল ছাড়া আর কিছু খাইনি। পেটে এ রকম আগুন জ্বলছে যে, ফায়ার ব্রিগেড ডাকলেই হয়। যা, চট করে নিয়ে আয় চারটে পয়সা।

শঙ্কর উপরে গিয়া ভণ্টুকে পয়সা আনিয়া দিল।

ভণ্টু চলিয়া গেল।

শঙ্কর উপরে যাইতেছিল, এমন সময় একটি চাকর আসিয়া প্রবেশ করিল।

শঙ্করবাবু এখানে থাকেন?

হ্যাঁ আমিই। কি চাই?

চিঠি আছে।

কই, দেখি! আমার নামে?

চাকর একখানি পত্র তাহার হস্তে দিল। খামের উপর অপরিচিত নারীহস্তে লেখা। চিঠি খুলিয়া পড়িল—

শঙ্করবাবু,

নমস্কার। কাল বিকেল পাঁচটায় আমাদের বাড়িতে ছোটখাটো একটা টি-পার্টি আছে। আপনাকে আসতে হবে। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করলাম। কাল সমস্ত দিন হয়তো আপনি কলেজে

থাকবেন, কোথায় আপনাকে খবর দেব, তাই এখুনি জানিয়ে দিলাম। আসতে ভুলবেন না কিন্তু। সোনা বলেছে, আপনার কবিতার খাতাও যেন আনেন। খাতা আনুন আর নাই আনুন, নিজে কিন্তু নিশ্চয় আসবেন।

মিষ্টিদিদি

শঙ্করের সমস্ত অন্তরটা কেমন যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। চাকরটার দিকে ফিরিয়া সে বলিল, আচ্ছা যাব।

ভৃত্য চলিয়া গেল।

কমনরুমটায় শঙ্কর খানিকক্ষণ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেন সে যে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহা সে নিজেও বলিতে পারিত না। সে কি ভন্টুর কথাই ভাবিতেছিল? মিষ্টিদিদির কথা? আজ সকালে বাবার পত্র পাইয়াছিল, তাহার মায়ের পাগলামি এত বাড়িয়াছে যে, তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে হইতেছে। তাহার উন্মাদিনী মায়ের কথাই সে কি ভাবিতেছিল? হাওড়া স্টেশনের সেই মূর্ছিতা যুবতীর কথা? না, কিছুই তো নয়। জ্ঞাতসারে সে কিছুই ভাবিতেছিল না। তাহার চমক ভাঙিল, যখন টং টং করিয়া নয়টা বাজিল। সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল।

।। দুই ।।

ভন্টুর বউদিদি বসিয়া কুটনা কুটিতেছিলেন।

রান্নাঘর-সংলগ্ন একটি সঙ্কীর্ণ বারান্দা, এইমাত্র ধোয়া হইয়াছে। জল এখনও শুকায় নাই। সেই ভিজা বারান্দার ওপরেই একখানি পিঁড়ির ওপর বসিয়া বউদিদি তরকারি কুটিতেছিলেন। নিকটেই তাঁহার নবম বর্ষীয়া কন্যা বসিয়া আলুর খোসাগুলি জড়ো করিতেছিল। সেগুলির একটি তরকারি হইবে। খোসা-চচ্চড়ি ভন্টুর প্রিয় খাদ্য। রোজ তাহা হওয়া চাইই।

বারান্দা হইতে পা বাড়াইলেই যে ভূমিখণ্ড পদস্পর্শ করে, তাহাকেই উঠান বলিতে হয়। বাড়ির মধ্যে একমাত্র ঐ স্থানটুকুতে দাঁড়াইলেই মাথার ওপর আকাশ দেখা যায়। এই সঙ্কীর্ণ-পরিসর প্রাঙ্গণে তিনটি বালক, তাহার মধ্যে দুইটি একেবারে শিশু, খেলা করিতেছিল। আর একটি বছর এগারোর বালক হাঁটু গাড়িয়া দুই কান ধরিয়া সম্মুখস্থ মোড়ায় রক্ষিত 'উপক্রমণিকা' হইতে শব্দরূপ মুখস্থ করিতেছিল।

তাহার পড়া হয় নাই বলিয়া ভন্টু তাহাকে শাস্তি দিয়াছে। বউদিদিকে দেখিয়া বোঝা দুষ্কর যে, তিনি পাঁচটি সন্তানের জননী। তাঁহার মুখখানি এত কচি যে, আবার তাঁহার বিবাহ দিয়া আনা যায়। বউদিদিকে সুন্দরী হয়তো কেহ বলিবে না, কারণ তাঁহার রঙ কালো। এত কালো যে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলিয়া চালাইবার চেষ্টাও হাস্যকর হইবে। কিন্তু রঙে কি আসে যায়? বউদিদির হাসিমাখা গোলগাল ঢলঢলে মুখখানিতে, ডাগর চোখ দুইটিতে, তাম্বুলরঞ্জিত পাতলা ঠোঁট দুইটিতে যে শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সকলকেই মুগ্ধ করিবে। যাহাকে করিবে না, তাহার রূপ দেখিবার চোখ নাই। বউদিদি কুটনা কুটিতে কুটিতে কন্যা ফনতিকে আদেশ করিলেন, ফনতি আমার জন্যে একখিলি পান সেজে নিয়ে আয় তো আগে, দোক্তাও আনিস একটু।

ফনতি চলিয়া গেল।

পানের রঙে বউদিদির ঠোঁট দুইটি সর্বদা টুকটুক করিতেছে। এক বেলা না খাইয়া বরং বউদিদির চলিতে পারে, পান না হইলে তাঁহার এক দণ্ড চলা মুশকিল। ওইটুকুই তাঁহার জীবনের একমাত্র শখ, যাহা তিনি বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। জীবনের কত শখই তো পূর্ণ হয় নাই, আর হইবে না বোধহয়। পানের সরঞ্জামকে কেন্দ্র করিয়া তাই তাঁহার নানারূপ আয়োজন। নানারকম টুকিটাকি জিনিসে তাঁহার পানের বাটাটি পরিপূর্ণ। ভাজা মসলা, কমলালেবুর শুকনা খোলা , চুয়া-সুগন্ধি দোক্তা, এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, মৌরি, রকমারি পানের মসলা, নিখুঁত চুন, ভিজা ন্যাকড়ায় জড়ানো পান, মিহি করিয়া কাটা সুপারি, ভাল খয়ের—অতি নিপুণভাবে তিনি পানের বাটাটিতে শুছাইয়া রাখিয়াছেন। এই পিতলের বাটাটি কিনিয়া দিয়াছিল বলিয়াই শঙ্কর ঠাকুরপোর উপরে বউদিদি এত প্রসন্ন। ভণ্টু ঠাকুরপোর এই বন্ধুটি বেশ মানুষ।

ভণ্টুর ক্রুদ্ধ স্বর শোনা গেল।

এই, তোর পড়া হল? নিয়ে আয় দেখি।

খানিকক্ষণ পরেই সপাসপ বেতের শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে বালককণ্ঠের আর্তনাদ। মার এবং আর্তনাদ সমান বেগেই খানিকক্ষণ চলিল। তাহার পর আবার সমস্ত চুপচাপ। বালক আবার ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া শুরু করিল, নরঃ, নরৌ, নরাঃ—

বউদিদি অবিচলিতভাবে তরকারি কুটিয়া যাইতেছিলেন। পুত্রের এতাদৃশ নির্যাতনে তাঁহার কোনো বিকারই লক্ষিত হইল না। এসবে তাঁর গা-সওয়া হইয়া গিয়াছিল।

হঠাৎ পাশের ঘর হইতে দরাজ-কণ্ঠে আদেশ আসিল, বউমা, চায়ের জল চড়াও, আটটা বাজল।

তাহার পরই একটি বৃদ্ধ ধীরে ধীরে পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন। দীর্ঘাকৃতি। ঈষৎ-কুব্জ দেহ, গৌরবর্ণ, গোঁফদাড়ি কামানো, শুষ্কচঞ্চু নাসা, চক্ষু দুইটিতে তীক্ষ্ণদৃষ্টি, পুরু লেন্সের চশমা পরা, হস্তে একখানি খবরের কাগজ—'বঙ্গবাসী'। তিনি আসিয়া দাঁড়াইতেই বউদিদি উঠিয়া তাঁহার কানের কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিলেন, ডালটা নাবিয়েই চায়ের জল চড়িয়ে দিচ্ছি। বেশি দেরি নেই আর।

বৃদ্ধ বলিলেন, আচ্ছা।

সুরটা যেন অপ্রসন্ন।

বৃদ্ধ ভণ্টুর পিতা। কানে কম শোনেন। বহুকাল হইতে বিপত্নীক। চায়ের দেরি আছে শুনিয়া তিনি ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন এবং তামাক সাজিতে বসিলেন। ভোর তিনটায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। তখন হইতে শুরু করিয়া রাত্রি দশটা পর্যন্ত চা এবং তামাক লইয়া থাকেন। অবসর মতো সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পাঠ করেন। বৃদ্ধ চলিয়া গেলে ভণ্টু আসিয়া দর্শন দিল। কৌতুকপূর্ণ চক্ষু দুইটি বউদির মুখের ওপর স্থাপন করিয়া সে প্রশ্ন করিল, বাকু কি বলছিলেন—বৃদ্ধ বাকু?

ভণ্টুর ভাষায় বাকু মানে বাবা।

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, বাকুর আর কি অন্য কথা আছে এখন? আটটা বেজে গেছে, চা চাই।

ভণ্টু গা দোলাইয়া দোলাইয়া বলিতে লাগিল, বাকুর কুর কুর কুর—

বউদিদি মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, তুমি থামো ঠাকুরপো, এখুনি হয়তো এসে পড়বেন।

ভণ্টু ও বউদিদি সমবয়সী। বউদিদি যখন বধূ রূপে এ বাটিতে আসিয়া প্রথম প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার বয়স এগারো। ভণ্টুরও বয়স তখন এগারো। তখন হইতেই দুইজনে এক সংসারে একসঙ্গে মানুষ হইয়াছে। ছেলেবেলায় দুইজনে মারামারি পর্যন্ত করিয়াছে। এখনও কথায় কথায় ইহাদের মনান্তর ও ভাব হয়। বাড়ির গুরুজনস্থানীয় সকলের সম্বন্ধে ইহারা নিভৃতে যেসব আলোচনা করে, তাহা শুনিলে বিস্ময় জাগে। মনে হয়, গুরুজনদের প্রতি বুঝি এতটুকু শ্রদ্ধা ভালবাসা ইহাদের নাই। শ্রদ্ধার কথা বলিতে পারি না, কারণ শ্রদ্ধা জিনিসটা গুরুজনদেরও অর্জন করিতে হয়; কিন্তু ভালবাসায় ইহারা কাহারও অপেক্ষা কম নয়। বৃদ্ধ বাকুর সামান্য সুখ-সুবিধার জন্য ইহারা বহু কৃচ্ছ্রসাধন করিতে প্রস্তুত, করিতেছেও। বৃদ্ধ বাকুও বউমাকে ছাড়িয়া কখনও কোথাও থাকেন নাই, থাকিতে পারেনও না।

বউদিদি বলিলেন, বাকুর তামাক ফুরিয়েছে, এনো আজ।

এই তো পরশু তামাক এনেছি।

কি জানি, বাবাজি আসার পর থেকে বাবা ভয়ানক ঘন ঘন তামাক খাচ্ছেন।—বলিয়া বউদিদি ফিক করিয়া হাসিয়া মুখে কাপড় দিলেন। বাবাজি মানে ভণ্টুর মেজকাকা।

ভণ্টু পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া বলিল, এই নাও, আমার আজ আপিস থেকে ফিরতে দেরি হবে। শণ্টুকে দিয়ে তামাকটা আনিয়ে নিও ওই মোড়ের দোকানটা থেকে। বাবাজির জন্যে ঘিও আনিও কিছু। গাওয়া ঘির সঙ্গে অন্য ঘিও একটু মিশিয়ে চালাও না।

বউদিদি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, কাল চালিয়েছিলুম একটু।

আর এই নাও এক্স্ট্রা দু আনা। একটু ভাল মাছ আনিয়ে শণ্টুকে খেতে দিও। রাগের মাথায় বড্ড মেরেছি ছেলেটাকে। কাল ঘি খেয়ে কি বললে বাবাজি? ধরতে পারেনি?

বউদিদি মুখে কাপড় দিয়া হাসি চাপিতে চাপিতে বলিলেন, পারেননি আবার! বললেন—মানুষের অধর্মাচরণের চোটে গাইগুলো পর্যন্ত বিগড়ে গেছে। গাওয়া ঘিয়ে আর সে রকম গন্ধও নেই।

বাবাজি একেবারে চাম চামাটু! ফিরবে কখন বাবাজি?

গুরু-ভাইদের কাছে গেছেন, শিগ্‌গির কি আর ফিরবেন?

রান্নার কত দেরি?

ডালটা নাবিয়েই তরকারিটা চড়িয়ে দিচ্ছি। ভাত হয়ে গেছে। খোসা-চচ্চড়ি ও-বেলা খেও, কেমন?

আচ্ছা।

দুয়ারে কড়া নড়িল।

পিয়ন চিঠি দিয়া গেল।

ভণ্টু চিঠিখানি পড়িয়া বলিয়া উঠিল, লুদুর লুদুর—

বউদিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, কার চিঠি?

লুদুর লুদুর—

রান্নাঘর হইতে একটা পোড়া গন্ধ ছাড়িল।

বউদিদি শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ওই যাঃ, ডালটা বুঝি পুড়ল। ফনতি পোড়ারমুখীকে সেই যে একটা পান সাজতে বলেছি, যুগযুগান্তর কাটাচ্ছে মুখপুড়ী তাই নিয়ে!

তিনি তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন।

ভণ্টু বলিল, ফনতিকে তো কান ধরে উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছি। পায়ে পা ঠেকে গেছল, পেন্নাম করেনি।

বউদিদি কোনো উত্তর দিলেন না।

ভণ্টু পত্রখানি পুনরায় পড়িতে লাগিল।

বউদিদি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলে ভণ্টু প্রশ্ন করিল, ডাল গন?

'গন' কেন হবে? ফেনটা উথলে উনুনে পড়েছিল। ওটা কার চিঠি?

মোমবাতি আবার বিয়ে করেছে। এক পুলিশ-অফিসারের মেয়েকে বিয়ে করে সি. আই. ডি. হয়েছে, লুদুর লুদুর—

বউদিদি সবিস্ময়ে বলিলেন, আবার বিয়ে করলে মৃন্ময় ঠাকুরপো?

ভণ্টু গম্ভীরভাবে বলিল, এ বউটাও পালাবে।

বউদিদি বলিলেন, আচ্ছা, বউটার কোনো খবরই পাওয়া গেল না, নয়? মৃন্ময় ঠাকুরপো কিন্তু খুব ভালবাসত তাকে, যাই বল তোমরা।

লুদুর লুদুর—

ভণ্টু ভঙ্গিভরে শরীরের উপরার্ধ নাচাইতে লাগিল।

বউদিদি হাসিয়া ফেলিলেন।

ভালবাসত না?

নিশ্চয়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, বউ পালাবার এক বছর না যেতে যেতেই আবার বিয়ে করলে।

বউদিদি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, পুরুষেরা সব পারে। তোমাদের অসাধ্য কিছু নেই।

লুদুর লুদুর—

সত্যি, ভারি আশ্চর্য লাগছে কিন্তু।

হাসিয়া বউদিদি আবার রান্নাঘরে ঢুকিলেন।

ভণ্টু হাঁকিল, এই ফনতি, পান দিয়ে যা মাকে।

ফনতি পান লইয়া আসিল।

বাকু আবার একবার তাগাদা দিলেন, বউমা, ডাল নামল তোমার?

বউদিদি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বাকুকে বলিতে গেলেন যে, চায়ের জল চড়ানো হইয়াছে, আর অধিক বিলম্ব নাই। তাঁহার চোখেমুখে হাসি।

ভণ্টু একটি ময়লা লুঙ্গি পরিয়া তেল মাখিতে বসিল।

।। তিন ।।

শঙ্কর এতটা প্রত্যাশা করে নাই।

সামান্য চা খাওয়ানো ব্যাপারটা যে এতদূর কবিত্বময় করা সম্ভব, সদ্য মফস্বল-আগত শঙ্করের তাহা ধারণাতীত ছিল।

কি পরিপাটি আয়োজন।

গৃহসংলগ্ন উদ্যান-প্রাঙ্গণে ছোট ছোট কয়েকটি টেবিল। প্রত্যেক টেবিলে সুদৃশ্য আস্তরণ।

তাহার ওপর একটি ফুলদানি, প্রত্যেকটিতে দেশি-বিদেশি নানারকম ফুল। ইহা ছাড়া প্রতি টেবিলে সিগার, সিগারেট, ছাই ফেলিবার পাত্র ও ছোট ছোট কাচের জলপূর্ণ বাটি। বাটিগুলির পাশে পাট-করা পরিষ্কার ছোট ছোট তোয়ালে। প্রত্যেক টেবিলে দুইটি করিয়া বেতের চেয়ার। শঙ্কর অবাক হইয়া গেল, তাহার অজ্ঞাতসারেই তাহার মন এই মার্জিতরুচি পরিবারটির ওপর সশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল।

শঙ্কর একটু আগেই গিয়াছিল, তখনও অন্যান্য অতিথিবর্গ আসিয়া পৌঁছান নাই। এমনকি, প্রফেসার মিত্র তখনও পর্যন্ত কলেজ হইতে ফিরেন নাই। শঙ্কর গেটের ভিতর দিয়া ঢুকিয়া উদ্যানে সজ্জিত টেবিলগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিল, এমন সময় পিছন হইতে সলজ্জকণ্ঠে কে বলিল, এই যে, আপনি এসে গেছেন— আসুন, নমস্কার।

শঙ্কর পিছন ফিরিয়া দেখিল, রিনি।

একটা ট্রেতে অনেকগুলি খালি পেয়ালা প্রভৃতি লইয়া সে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। পিছনে একজন বেয়া।া তাহার হাতে একটি ট্রে এবং তাহাতেও পেয়ালা, দুধ রাখিবার পাত্র, ছাঁকনি প্রভৃতি চায়ের সরঞ্জাম।

শঙ্কর প্রতিনমস্কার করিয়া আগাইয়া গেল এবং রিনির হাত হইতে ট্রেটা লইবার জন্য হাত বাড়াইল— দিন, আমাকে দিন।

রিনি মৃদু হাসিয়া লজ্জায় মুখটি একটু নত করিল, ট্রে কিন্তু শঙ্করের হাতে দিল না। তাড়াতাড়ি নিজেই গিয়া তাহা একটি টেবিলের ওপর রাখিল এবং বেয়ারাটার দিকে ফিরিয়া বলিল, তুই এগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে রাখ ততক্ষণ। দেখিস, আবার যেন ভাঙিস না কিছু। তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, আসুন।

শঙ্কর রিনির পিছন পিছন চলিল।

একটু ইতস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর কাউকে দেখছি না!

বউদি সোনাদি সব ওপরে। দাদা এখনও ফেরেননি কলেজ থেকে।

ইহার পর আর কি বলিবে, শঙ্কর ভাবিয়া পাইল না। নীরবে রিনির দোদুল্যমান বেণীভঙ্গিমা দেখিতে দেখিতে তাহার পিছন পিছন আসিয়া সে ড্রয়িং-রুমে ঢুকিল। বেণীদোলানো রিনি আর স্টেশনে দেখা রিনি—দুইজনে যেন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। প্রসাধনের সামান্য ইতরবিশেষে মানুষটাই যেন বদলাইয়া গিয়েছে, অতি সাধারণ একটা আটপৌরে রঙিন শাড়ি, কাঁধের কাছে সাধারণ রকম এমব্রয়ডারি করা একটা ব্লাউজ, হাতে দুইগাছি করিয়া পাতলা সোনার চুড়ি, কানে দুল, পায়ে স্যান্ডাল, মাথায় দোদুল্যমান বেণী। এই অতি সাধারণ বেশেই রিনিকে অত্যন্ত অসাধারণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

ড্রয়িং-রুমে ঢুকিয়া রিনি বলিল, আপনি বসুন। আমি এগুলো ফেলে দিই ততক্ষণ।

কি ফেলে দেবেন?

এই যে।

শঙ্কর দেখিল, একটা ভাঙা পোর্সিলেনের বাসনের টুকরো চতুর্দিকে ছড়ানো রহিয়াছে।

রিনি বলিল, বেয়ারার হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল টি-পটটা।

রিনি টেবিল হইতে খবরের কাগজ লইয়া টুকরাগুলি কুড়াইতে লাগিল। শঙ্করও হেঁট হইয়া কুড়াইতে শুরু করিল।

রিনি বলিল, আপনি বসুন না।

সেটা ভাল দেখায় না।

রিনি কুণ্ঠিত মুখে চুপ করিয়া রহিল, প্রতিবাদ করিল না। দুইজনেই কুড়াইতে লাগিল।

কুড়ানো শেষ হইলে রিনি টুকরাগুলি খবরের কাগজটাতে মুড়িয়া বলিল, আপনি তা হলে বসুন একটু। আমি বউদিদিদের খবর দিই।

রিনি চলিয়া গেল।

শঙ্কর একা বসিয়া ড্রয়িং-রুমের আসবাবপত্রাদি লক্ষ্য করিতে লাগিল। সুন্দর দামি 'সেটি', মেঝেতে কার্পেট পাতা। সামনের দেওয়ালে একটি ছোট, কিন্তু দামি আয়না। সেই দেওয়ালেই দুইখানি বড় বড় অয়েলপেন্টিং ছবি—দুইখানিই নারীমূর্তি, এলিজাবেথান যুগের পোশাক-পরিহিতা স্বাস্থ্যবতী তরুণী দুইটি। চোখের নীলিমা ও গালের লালিত্য মুগ্ধ করে। অপর একটি দেওয়ালে বিরাট একখানা দেওয়াল-জোড়া ছবি, যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য—সেকালের যুদ্ধক্ষেত্র। নানাভাবে উত্তেজিত অশ্ব ও অশ্বারোহীর দল একটা নিষ্ঠুর সংঘর্ষকে যেন মূর্তিমান করিয়া তুলিয়াছে। ভিতর হইতে দেখা যাইতেছে, বাহিরের বারান্দায় একটি ছোট হ্যাট-র‍্যাক এবং তাহার সঙ্গেই ছড়ি রাখিবার র‍্যাক। ঘরের এক কোণে ছোট একটি গোল শ্বেতপাথরের টেবিলের ওপর কালো পাথরের নটরাজ, আর এক কোণে অনুরূপ টেবিলের ওপর একটি ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি—পাথরের নয়, পিতলের। আয়নার দুই পাশে ছোট ছোট দুইটি কাঠের সুদৃশ্য ব্রাকেট। ব্রাকেটের ওপর উন্মুক্তবক্ষা বঙ্কিমতনু প্রস্তরময়ী দুইটি রমণী—অজন্তা-শিল্পের নিদর্শন। দেওয়ালে একটি বড় ঘড়ি। পাশের ঘরেই টেবিলের ওপর ফোন দেখা যাইতেছে।

হঠাৎ ঝনঝন করিয়া ফোনটা বাজিয়া উঠিল। কাছে-পিঠে বোধহয় কেহ ছিল না, অন্তত ফোনের ডাকে কেহ সাড়া দিল না। একটু ইতস্তত করিয়া শঙ্কর অবশেষে উঠিয়া গিয়া ধরিল।

হ্যালো, কে আপনি?

আমি? আমি অপূর্ব। আপনি কে?

আমাকে চিনবেন না, চা-খাওয়ার নেমন্তন্ন পেয়ে এসেছি, আমার নাম শঙ্কর।

ও, আমারও যাওয়ার কথা, কিন্তু আই অ্যাম সো সরি, মিস রিনি দুঃখিত হবেন জানি, কিন্তু আই কান্ট হেল্প্। এইটে জানাবার জন্যেই ফোন করছি।

আচ্ছা, ওঁরা কেউ এখন নীচেয় নেই, এলে আমি বলে দেব।

শঙ্কর রিসিভারটা রাখিয়া দিল।

কে এই অপূর্ববাবু? মেয়েমানুষের মতো গলার স্বর।

তাহার একা ড্রয়িংরুমে বসিয়া থাকিতে আর ভাল লাগিল না। সে উঠিয়া বাহিরে আসিল।

বাহিরে আসিয়া দেখিল, বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম আদি সাজানো প্রায় শেষ করিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া সে বিনীতভাবে বলিল, বসুন হুজুর। দিদিকে ডেকে দিই।

না, ডেকে দেবার দরকার নেই। বাগানটা আমি ঘুরে ঘুরে দেখি, আমার জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

বেয়ারা ভিতরে চলিয়া গেল।

শঙ্কর এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নানাজাতীয় মরসুমী ফুলের বাহার দেখিতে

দেখিতে অন্যমনস্ক হইয়া সে গেট দিয়া আবার সদর রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। অকস্মাৎ তাহার মনে কৈশোরের একটা স্মৃতি ভাসিয়া আসিল। শৈলদের বাড়িতেও ঠিক এমনই একটা গেট ছিল। স্কুল হইতে ফিরিবার পথে প্রতি অপরাহ্নে শৈল গেটে দাঁড়াইয়া থাকিত। ছবিটা স্পষ্ট মনে আছে। মনে পড়িতেছে, একদিন শৈলকে সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কার জন্যে তুই রোজ এখানে দাঁড়িয়ে থাকিস শৈল, আমার জন্যে নাকি?

ভারি বয়ে গেছে তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার। দাদাদের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকি আমি।

শৈলর দুইটি দাদা—পঙ্কজ ও উৎপল শঙ্করের সহপাঠী ছিল। পঙ্কজ বেচারা মারা গিয়াছে। শৈলও কি বাঁচিয়া আছে? সেই দুরন্ত বালকস্বভাব শৈল, কোথায় আজ সে? সে স্বচ্ছন্দে পেয়ারা-গাছে চড়িত, পুকুরে ঝাঁপাই জুড়িত, প্রাচীর ডিঙাইয়া মিত্তিরদের বাগান হইতে ফলসা চুরি করিয়া আনিত, কথায় কথায় খামচাইয়া কামড়াইয়া খেলার সাথীদের অস্থির করিয়া তুলিত—সেই শৈলও তো আর বাঁচিয়া নাই। সেও মরিয়াছে। যে তরুণী আজ বোস সাহেবের পত্নী, সে অন্য লোক, অতিশয় নকল একটা আনন্দকে সে যেন জোর করিয়া চোখে মুখে ফুটাইয়া রাখিয়াছে। শঙ্করের কবি-মন এই গেটটাকে উপলক্ষ করিয়া বিগত কৈশোর জীবনের স্মৃতিস্বপ্নে বিভোর হইয়া পড়িল। অতীতকালে যে প্রশ্ন সে বহুবার নিজেকে করিয়াছে, সেই প্রশ্নটাই আবার তাহার মনে জাগিল— শৈল কি তাহাকে ভালবাসিত? কই, কোনোদিন তো তাহাকে বলে নাই! কিন্তু সে তাহার কবিতার খাতাখানা চুরি করিয়াছিল কেন? যখন তখন লুকাইয়া সে তাহার পড়িবার ঘরে আসিয়া হাজির হইত। কেন? সে বহুবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কোনো উত্তর পায় নাই; একটা না একটা ছুতা করিয়া শৈল প্রশ্নটাকে এড়াইয়া গিয়াছে। শঙ্কর কি তাহাকে ভালবাসিত? বাসিত বইকি। কমলারঙের শাড়িটি পরিয়া শৈল যেদিন শ্বশুড়বাড়ি চলিয়া গেল, শঙ্করের সে রাত্রে ঘুম হয় নাই। ইহা কি ভালবাসার লক্ষণ নয়? কিন্তু শঙ্করও তো শৈলকে কোনোদিন কিছু বলে নাই। বরং শৈল শ্বশুরবাড়ি যাইবার আগে যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমার জন্যে মন কেমন করবে শঙ্করদা? ছদ্ম বিদ্রূপের সুরে সে উত্তর দিয়েছিল, ঘুম হবে না আমার। সত্যিই তো ঘুম হয় নাই। অনর্থক বিদ্রূপ করিতে গেল কেন তবে? মনখানি মেলিয়া ধরিলে ক্ষতি কি ছিল? কিশোরকালের প্রথম প্রেম এমনভাবে নষ্ট হইয়া গেল কেন? এ 'কেন'র উত্তর নাই। পৃথিবীর বহু অমীমাংসিত প্রশ্নের মধ্যে ইহাও একটি—শৈলকে ভুলিতে দেরি হয় নাই তো! খল্‌সি আসিয়াছিল। শৈলর দূরসম্পর্কের বোন খল্‌সি। শৈল চলিয়া গেলে খল্‌সিই হইয়াছিল তাহার সঙ্গিনী। সেই একদিন অন্ধকার রাত্রে পিছন দিকের বারান্দার সিঁড়ির ধারে দুইজনে দুইজনের হাত ধরিয়া বসিয়া থাকা—অপূর্ব অনুভূতি! তাহার পর আর একদিন রাত্রে, সেদিনও গাঢ় ঘন অন্ধকার; শঙ্কর শ্মশানে বসিয়াছিল—সম্মুখে খল্‌সির চিতা। খল্‌সিও থাকে নাই। শঙ্করের আনন্দ-অনুসন্ধিৎসু অমৃত-পিপাসী কবি-মন সুধার সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। আজও মিলিল না। জ্যোৎস্নাস্নাত সাগরে, পর্বতে, প্রান্তরে তাহার মুগ্ধ মন মাতিয়া উঠে— জ্যোৎস্না কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না, চাঁদ ডুবিয়া যায়। নব-বর্ষার মেঘোদয়ে তাহার মনের ময়ূর পেখম মেলে। কিন্তু মেঘ কতক্ষণ থাকে? বৃষ্টি নামে, মেঘ মিলাইয়া যায়। সব আসে, কিন্তু থাকে না।

চাই কমলালেবু, ভাল কমলালেবু—

শঙ্করের স্বপ্ন টুটিয়া গেল।

সে অকারণে কমলালেবুওয়ালাকে ডাকিয়া কমলালেবু কিনিতে লাগিল। সুন্দর বড় বড় কমলালেবু। তাহার পকেটে ও হাতে যতগুলা আঁটিল, সে কিনিয়া লইল। তাহার পর গেট দিয়া সে আবার ভিতরে গেল, সহসা তাহার মনে হইল, এমনভাবে চলিয়া আসাটা ঠিক হয় নাই, কেমন যেন একটা সঙ্কোচ হইতে লাগিল। কিছুদূর আসিয়া দ্বিতলের একটা খোলা জানালা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল, অসম্বৃতবসনা একটি নারীমূর্তি, তাহাকে দেখিতে পাইবামাত্র জানালা হইতে সরিয়া গেলেন, প্রসাধন করিতেছিলেন বোধ হয়। শঙ্কর চোখ নামাইয়া লইল, ছি ছি, সে উপরের দিকে তাকাইতে গেল কেন? কি মনে করিলেন উনি? দেখিতে পাইয়াছেন কি? সে দ্রুতপদে আসিয়া ড্রয়িং-রুমে ঢুকিতে যাইবে, এমন সময় সোনাদিদির কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

আশ্চর্য লোক আপনি শঙ্করবাবু! এত আগে এলেনই বা কেন, আর এলেন যদি, বেরিয়েই বা গেলেন কেন?

শঙ্কর বলিল, এত আগে মানে? আমি এসেছি সাড়ে চারটের সময়।

সাড়ে তিনটের সময়।

শঙ্কর নিজের হাতঘড়িটা দেখিল, তাই তো! সাড়ে তিনটাকে তাহার সাড়ে চারিটা বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। একটু অপ্রস্তুতভাবে সে বলিল, আরে, সাড়ে তিনটেকে আমি সাড়ে চারটে ভেবে উর্ধ্বশ্বাসে এসে হাজির হয়েছি।

তাতে আর কি হয়েছে? ভালই তো, আসুন না, একটু গল্প করা যাক।

সোনাদিদির মুখে একটা চাপা হাসি চিকমিক করিতেছিল।

কমলালেবু কোথায় পেলেন?

কিনলাম রাস্তায়।

কিনলেন? খিদে পেয়েছে বুঝি আপনার? কলেজ থেকে সোজা এসেছেন বুঝি?

শঙ্কর মনে মনে একটু বিব্রত হইল। মুখে কিন্তু সে হটিবার পাত্র নয়। বলিল, কেমন সুন্দর দেখতে বলুন তো! দেখলে কি খাওয়ার কথাই মনে হয়? আমার তো কমলালেবু খাওয়ার চেয়ে হাতে করে বসে থাকতেই বেশি ভাল লাগে।

সোনাদিদি মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন।

আমাকে একটা দিন, খাই।

শঙ্কর তাঁহাকে একটা কমলালেবু দিল এবং প্রশ্ন করিল, মিষ্টিদিদি কোথায়, তাঁকে দেখছি না!

তিনি এইমাত্র স্নান করে এলেন, আসছেন এখুনি।

চকিতে শঙ্করের উন্মুক্ত বাতায়নের কথাটা মনে পড়িয়া গেল। সোনাদিদি লেবুটি ছাড়াইয়া শঙ্করের হাতে কয়েকটি কোয়া দিয়া বলিলেন, নিন, খেয়ে দেখুন।

আপনি খান আগে।

রিনি আসিয়া প্রবেশ করিল। কাপড়-জামা বদলাইয়া বেশ পরিচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে। কমলালেবু দেখিয়া সে কৌতূহল প্রকাশ করিল না। সোনাদিদিকে জিজ্ঞাসা করিল, বাইরে টেবলগুলো ঠিক সাজানো হয়েছে তো? দেখেছ সোনাদি?

আমি বাইরে যাইনি, তুই দেখ্ গিয়ে।

শঙ্কর বলিল, অপূর্ববাবু ফোন করেছিলেন, তিনি আসতে পারবেন না।

এই বার্তায় রিনির মুখখানি সলজ্জ হইয়া উঠিল। কিছু না বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

সোনাদিদি কমলালেবুর কোয়াগুলি পরিষ্কার করিতে করিতে উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কখন ফোন করেছিলেন অপূর্ববাবু?

এই একটু আগে। আপনারা কেউ নীচে ছিলেন না তখন।

ও। যাক্, বাঁচা গেল, নিন, খান দুটো কোয়া।

শঙ্কর গম্ভীরভাবে বলিল, আপনি খান আগে।

আচ্ছা একগুঁয়ে লোক তো আপনি!

মিষ্টিদিদি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। মিষ্টিদিদি আসিতেই সোনাদিদি অনুযোগমিশ্রিত বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, শঙ্করবাবুর কথা শুনেছ মিষ্টিদি? কমলালেবু নাকি ওঁর হাতে করে ধরে থাকতেই ভাল লাগে, খেতে ভাল লাগে না।

মিষ্টিদিদির আগমনে শঙ্কর মনে মনে একটু অস্বস্তিবোধ করিতেছিল, খোলা জানালার কথাটা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। মিষ্টিদিদির দিকে তাহার চাহিতেও সংকোচ হইতেছিল।

মিষ্টিদিদি হাসিয়া উত্তর দিলেন, ঠিকই তো বলেছেন উনি। কবির মতো কথাই বলেছেন।

সোনাদিদি বলিলেন, হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে, আপনার কবিতা এনেছেন? কই, দেখি!

না, আজ আনিনি, আর একদিন আনব এখন। কলেজ থেকে সোজা চলে এসেছি কিনা!

অভিমান-ভরা সুরে সোনাদিদি বলিলেন, কাল অত করে বললাম আপনাকে।

মিষ্টিদিদি ফোড়ন দিলেন, কবির মন অত সহজে পাওয়া যায় না সোনা।

এই স্বল্পপরিচিতা নারী দুইটির প্রগল্‌ভতা শঙ্করের ভাল লাগিতেছিল না, আবার ভাল লাগিতেও ছিল। তাহার ভদ্র মন এই ধরনের কথাবার্তায় সঙ্কুচিত হইতেছিল, কিন্তু তাহার অন্তরবাসী বন্য বর্বরটা ইহা উপভোগ করিতেছিল। শঙ্কর ভাবিতেছিল, কেমন মানুষ ইহারা?

মিষ্টিদিদি বললেন, আপনি অনেকক্ষণ এসেছেন না? বাগানে বেড়াচ্ছিলেন বুঝি?

শঙ্কর একটু সঙ্কুচিত হইয়া উত্তর দিল, হ্যাঁ, ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম আপনাদের ফুলগুলো।

এবার ডালিয়াগুলো তেমন ভাল হয়নি।

শঙ্কর এবার মিষ্টিদিদির দিকে চাহিয়া দেখিল, এতক্ষণ সে সঙ্কোচে তাঁহার দিকে তাকাইতে পারে নাই। মিষ্টিদিদির দিকে চাহিয়া শঙ্কর বিস্মিত হইয়া গেল। সত্যই ভদ্রমহিলা প্রসাধনশিল্পে নিপুণা। চোখের কোলে সূক্ষ্ম কাজলের রেখাটি কি সুন্দর মানাইয়াছে! পীতাভ জরিপাড় শাড়িটি পরিবার কি অপূর্ব ভঙ্গি, সর্বাঙ্গে তাহা যেন আবেশভরে স্বপ্ন দেখিতেছে। শঙ্করের কবি-মন প্রশংসা না করিয়া পারিল না।

মিষ্টিদিদি বলিতে লাগিলেন, ডালিয়াগুলো তেমন সুবিধা হয়নি যদিও, পিটুনিয়াগুলো কিন্তু খু—ব ভাল হয়েছে। দেখেছেন আপনি ওই দিকের কোণটাতে?

শঙ্কর সত্য কথা বলিল।

বিলিতি ফুল একটাও চিনি না আমি।

তাই নাকি? আসুন, এক্ষুনি চিনিয়ে দিচ্ছি আমি। চলুন যাই। আয় সোনা।

সোনাদিদি কিন্তু অভিমান করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা যাও, শঙ্করবাবু আমার একটা কথাও যখন রাখলেন না, তখন আমার সরে থাকাই ভাল।

মিষ্টিদিদি অভিনয়ের ভঙ্গিতে হাত দুইটি উল্টাইয়া হাসি চাপিতে চাপিতে বলিলেন, নিন, সামলান এখন।

শঙ্কর তাড়াতাড়ি বলিল, সে কি! কোন্ কথা রাখলাম না আপনার?

সোনাদিদি নীরব।

আচ্ছা, দিন, লেবু খাচ্ছি। আপনিও তো আমার কথা রাখলেন না। একটা কোয়া যদি আগে খেতেন, কি এমন ক্ষতি হত তাতে?

শঙ্কর হাসিয়া সোনাদিদির হাত হইতে কয়েকটি কোয়া লইয়া মুখে পুরিল। সোনাদিদি যেন বিগলিত হইয়া গেলেন। অপরূপ গ্রীবাভঙ্গি করিয়া অর্ধনিমীলিত নয়নে মৃদুহাস্যসহকারে তিনি বলিলেন, আমার জন্যেও রাখুন দু-একটা। সব খেয়ে ফেলছেন যে!

এই যে, নিন না। চলুন, বাগানখানা এইবার দেখা যাক। মিষ্টিদিদি, আপনিও নিন।

তিনজনে লেবু খাইতে খাইতে ড্রয়িং-রুম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বাহিরে রিনি চায়ের টেবিলগুলি সাজাইতেছিল।

মিষ্টিদিদি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বাবা রে বাবা, রিনির মতো খুঁতখুঁতে মেয়ে আর যদি দুটি দেখেছি আমি! সেই আড়াইটে থেকে মেয়ে লেগেছেন চায়ের টেবিল সাজাতে, এখনও পর্যন্ত পছন্দমত সাজানো হল না!

হয়ে গেছে আমার।

এই বলিয়া রিনি ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

রিনি চলিয়া গেলে সোনাদিদি মৃদুস্বরে বলিলেন, আহা, বেচারির এত যত্ন সাজ সব পণ্ড হল। অপূর্ব্ববাবু আজ আসবেন না, ফোন করেছেন।—বলিয়া তিনি একটু মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

ছদ্ম বিস্ময়ে মিষ্টিদিদি বলিলেন, তাই নাকি? আহা, বেচারি!

শঙ্কর এ বিষয়ে মনে মনে কৌতূহলী হইলেও মুখে কিছু বলিল না। তিনজনে মিলিয়া বাগানের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। শঙ্কর মরসুমী ফুল সম্বন্ধে যতটা না হউক, মিষ্টিদিদি ও সোনাদিদি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান অর্জন করিল। সুইট্-পির বর্ণ-বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য, রোপণ ও লালন করিবার প্রণালী ও কৌশল প্রভৃতি সম্বন্ধে মিষ্টিদিদি বক্তৃতা করিতেছিলেন, এমন সময় প্রফেসার মিত্রের মোটর গেটে প্রবেশ করিল। শঙ্কর একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল; কিন্তু মিষ্টিদিদির ব্যবহারে কোনো প্রকার চঞ্চলতা দেখা দিল না। তিনি সুইট-পির সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন, যেন স্বামীর আগমন সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে সচেতন হওয়াটা অতিথির সম্মুখে অশোভন। অবিচল ভাবটা বেশিক্ষণ কিন্তু টিকিল না। সোনাদিদি টিকিতে দিলেন না। সোনাদিদি বিস্মিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, ওমা, অপূর্ব্ববাবু যে এসেছেন দেখছি!

মিষ্টিদিদি বলিলেন, তাই নাকি?

সকলে তখন মোটরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

প্রফেসার মিত্র ব্যতীত মোটর হইতে আরও তিনজন ভদ্রলোক অবতরণ করিয়াছিলেন—একজন অপূর্ব্ববাবু এবং অপর দুইজন অবাঙালি। অবাঙালি দুইজন প্রফেসার মিত্রের প্রাক্তন বন্ধু, বিলাতে অবস্থানকালে ইহাদের সহিত বন্ধুত্ব হইয়াছিল। একজন মাদ্রাজি—মিস্টার পিলে এবং অপরজন পাঞ্জাবি—সর্দার প্রতাপ সিং। দুইজনেই উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং দুইজনেই

ছুটিতে কলিকাতায় বেড়াইতে আসিয়াছেন। ইহাদের সম্বর্ধনা-কল্পে এই টি-পার্টির আয়োজন। মিষ্টিদিদি সস্মিতমুখে ইঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। কথায় বার্তায় বোধ হইল, ইতিপূর্বেই ইঁহাদের আলাপ-পরিচয় ছিল, কারণ পাগড়িমণ্ডিত শ্মশ্রু-গুম্ফ-সমন্বিত প্রতাপ সিং মিষ্টিদিদির সহিত কি একটা রসিকতা করিয়া দরাজ গলায় অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। মিস্টার পিলে মুখে কিছু বলিলেন না বটে কিন্তু তাঁহারও হাস্য-দীপ্ত ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটিতে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা ফুটিয়া উঠিল। মিষ্টিদিদি এই আগন্তুকদ্বয়কে লইয়া যখন ব্যস্ত, সোনাদিদি তখন অপূর্ববাবুকে একটু অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া নিম্নস্বরে কি যেন বলিতে লাগিলেন।

প্রফেসার মিত্র আসিয়াই বন্ধুদ্বয়কে পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিয়া ভিতরে চলিয়া গিয়াছিলেন। শঙ্কর সুইট-পির বেডগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং বোধ করি এই সম্পর্কে যে জ্ঞানগর্ভ কথাগুলি সে মিষ্টিদিদির নিকট এইমাত্র শুনিয়াছিল, সেইগুলিই রোমন্থন করিতে লাগিল।

বেশিক্ষণ অবশ্য নয়। একটু পরেই সোনাদিদির কণ্ঠস্বর শোনা গেল—আসুন শঙ্করবাবু, অপূর্ববাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই, ইনিই ফোন করেছিলেন।

পরিচয় হইল।

শঙ্কর দেখিল, অপূর্বকৃষ্ণ পালিত সত্যিই একটি দেখিবার মতো বস্তু—খর্বকায় ক্ষুদ্র মানুষটি, কিন্তু সাজসজ্জা ছোট মাপের নয়। পায়ে জরিদার নাগরা, পরনে মিহি কোঁচানো ধুতি, গায়ে মিহি ফ্ল্যানেলের পাঞ্জাবি। সমস্ত মুখখানি একেবারে যেন চুনকাম করা। স্নো এবং পাউডারে কিন্তু তাঁহার বহুক্ষৌরীকৃত গণ্ডদেশের কর্কশতা ঢাকিতে পারে নাই। মুখখানি গোল, নাকটি খাঁদা-খাঁদা, নাকের নিম্নে সামান্য একটু গোঁফ। চক্ষু দুইটিতে বুদ্ধির জ্যোতি আছে, দৃষ্টি কিন্তু লাজুক। অপূর্ববাবু কাহারো মুখের দিকে বেশিক্ষণ তাকাইয়া থাকিতে পারেন না।

সোনাদিদি অপূর্ববাবুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন।

শঙ্কর শুনিল যে অপূর্ববাবু লোকটি বিদ্বান্, সাহিত্যরসিক, মার্জিতরুচি ও প্রগতিবাদী; সরকারি আপিসে চাকুরি করেন। শঙ্করের পরিচয় পাইয়া ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া অপূর্ববাবু চুপ করিয়া রহিলেন। বলিবার মতো কথা তাঁহার জোগাইল না, চক্ষু দুইটি নীচু করিয়া সস্মিতমুখে তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সোনাদিদি বলিলেন, আপনারা দুজনে আলাপ করুন ততক্ষণে, আমি রিনিকে ডেকে নিয়ে আসি।

সোনাদিদি চলিয়া গেলেন। ইহাদের আলাপ কিন্তু তেমন জমিল না। শঙ্কর মামুলি ভদ্রতাসূচক দুই চারিটি কথা বলিল এবং অপূর্ববাবু 'হ্যাঁ' 'না' প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়াই বিব্রত হইতে লাগিলেন। অপরিচিত লোকের কাছে অপূর্ববাবু বড়ই অস্বস্তিবোধ করেন। তাঁহার সর্বদাই মনে হয়, হয়তো এমন কিছু অনবধানতাবশত বলিয়া ফেলিবেন, যাহা অসঙ্গত; সুতরাং অপরিচিত লোকের সম্মুখে তিনি সাধারণত চুপ করিয়াই থাকেন।

শঙ্কর হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল, আপনার কতদিন আলাপ এঁদের সঙ্গে?

বছর দুই হবে।

তাহার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া স্বতঃপ্রবৃত্তভাবেই, কেন জানি না, অপূর্ববাবু বলিলেন, মিস মিত্রকে পড়াতাম।

ও।

শঙ্কর সহসা চুপ করিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল—ঠিক কি যে মনে হইতে লাগিল, তাহা ঠিক বর্ণনীয় নয়, কিন্তু একটা পোকা একটা মর্মর-প্রতিমার গা বাহিয়া উঠিতেছে দেখিলে একটা শিল্পীর যে ধরনের ক্ষোভ উপস্থিত হয়, শঙ্করের তাহাই হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শঙ্কর আকস্মিকভাবে অপূর্ববাবুকে আবার একটি প্রশ্ন করিল, প্রশ্নটির অসৌজন্যে মনে মনে সঙ্কুচিত হইলেও প্রশ্নটি না করিয়া পারিল না।

তখন আপনি ফোন করিলেন যে, আসতে পারবেন না, আবার এসে পড়লেন যে?

প্রশ্ন শুনিয়া অপূর্ববাবু নারীসুলভ লজ্জায় শির অবনত করিলেন এবং পরে অতি কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন, বড়বাবু ছুটি দিতে চাননি প্রথমে, শেষটা অনেক বলা-কওয়ার পর ছুটি দিতে যখন রাজি হলেন তখন দেখি, আর আসবার সময়ও নেই, শেষে—

শঙ্কর বলিল, আপনি এলেন তো প্রফেসার মিত্রের সঙ্গে দেখলাম—

অকারণে লজ্জিত অপূর্ববাবু বলিলেন, হ্যাঁ, উনি গাড়ি নিয়ে ভাগ্যিস আমার মেসে গিয়েছিলেন, তাই আসতে পারলাম।

কোথায় থাকেন আপনি?

নেবুতলায় একটা মেসে।

প্রফেসার মিত্র কাপড় বদলাইয়া বাহিরে আসিলেন। প্রায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রিনি ও সোনাদিদিও আসিলেন। মিষ্টিদিদি সর্দার প্রতাপ সিং ও মিস্টার পিলেকে লইয়া হাস্যপরিহাসে মশগুল হইয়া উঠিলেন।

প্রফেসার মিত্র কাছে আসিতেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; উঠিয়া দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইতেই তাঁহার শঙ্করের সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল। তিনি অভিভাবকী সুরে শঙ্করকে ডাকিয়া বলিলেন, আসুন না শঙ্করবাবু, আপনার সঙ্গে এঁদের পরিচয় করিয়ে দিই। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন?

সুইট-পিগুলো দেখছিলাম আর একবার। অপূর্ববাবুর সঙ্গেও আলাপ হল।

মিষ্টিদিদি শঙ্করের সঙ্গে সকলের পরিচয় করাইয়া দিলেন। প্রফেসার মিত্রকে শঙ্কর ইতিপূর্বে দেখে নাই, নাম শুনিয়াছিল। ইংরেজীর অধ্যাপক হিসাবে ভদ্রলোকের নাম আছে। দেখিলেই লোকটিকে ভাল লাগে, সদাহাস্যমুখ, উপরের দন্তপাঁতি সর্বদাই বিকশিত হইয়া আছে। শঙ্করের সহিত পরিচয় হইতেই তিনি উচ্ছ্বাসভরে তাহার হাত দুইটি ধরিয়া ঝাঁকানি দিতে দিতে বলিলেন, ভারী খুশি হলাম তোমার সঙ্গে আলাপ করে। উৎপলের বন্ধু তুমি, উৎপল আমাদের বাড়ির ছেলেদের মতো ছিল। সেদিন একটা মিটিঙে আটকে পড়লাম, তাই আমি উৎপলকে 'সি-অফ' করতে আর যেতে পারলাম না। বস বস।

এমন সময় আর একটি মোটর আসিয়া প্রবেশ করিল। সে মোটরে আরও কয়েকজন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনজন আধুনিক মহিলা ও তাঁহাদের সঙ্গে দুইজন পুরুষমানুষ।

শঙ্কর ও সোনাদিদি একটি টেবিলে বসিয়াছিলেন। ঠিক তাহার পাশের টেবিলেই ছিলেন রিনি ও অপূর্ববাবু। অপর পাশে ছিলেন দ্বিতীয় মোটরে সমাগত একটি মহিলা ও তৎসঙ্গে

আগত ভদ্রলোক দুইজনের মধ্যে একজন। এই ভদ্রলোক সোনাদিদিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মিসেস রায়, একটা খুব ভাল ফিল্‌ম হচ্ছে, দেখেছেন? Man Woman Marriage?

সোনাদিদি বলিলেন, কাগজে দেখেছি বটে, পর্দায় দেখা হয়নি।

দেখে আসুন তা হলে, ওয়ান্ডারফুল প্রোডাক্‌শান। আজই লাস্ট ডে।

সোনাদিদি হতাশভাবে বলিলেন, তা হলে আর হয় না। পার্টি শেষ হতেই তো সন্ধে হয়ে যাবে।

সেকেন্ড শোতে যেতে পারেন।

দেখি।

সোনাদিদি চুপ করিয়া গেলেন। কোথাও যাওয়া না-যাওয়ার মালিক তিনি নহেন। মিষ্টিদিদি যদি না যান, তাহা হইলে তাঁহারও যাওয়া হইবে না।

একটু পরে সোনাদিদি শঙ্করকে প্রশ্ন করিলেন, আপনি দেখেছেন ফিল্‌মটা?

না।

যান, দেখে আসুন।

হস্টেলে রাত্রিবেলা তো ছুটি পাব না।

একটু দুষ্টামি-ভরা হাসি হাসিয়া সোনাদিদি বলিলেন, ওহো, আপনি যে ভাল ছেলে, সে কথা মনে ছিল না।

শঙ্কর গম্ভীরভাবে বলিল, মনে থাকা উচিত ছিল।

সোনাদিদি পাশের টেবিলে রিনিকে বলিলেন, প্রকাশবাবু বলছেন, খুব ভাল একটা ফিলম্ হচ্ছে, যাবি?

তোমরা যাও তো যাব।

অপূর্ববাবু যাবেন?— সোনাদিদি প্রশ্ন করিলেন।

মিহি গলায় অপূর্ববাবু বলিলেন, খুবই সুখী হতাম যেতে পারলে। কিন্তু আমার টিউশনি আছে, মিস বেলাকে পড়াতে যেতে হবে।

শঙ্কর চকিতে একবার রিনির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করিল না।

সোনাদিদি বলিলেন, মিস বেলা? মানে, বেলা মল্লিক? সে তো দু-দুবার ম্যাট্রিক ফেল করে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল শুনলাম। আবার পড়া শুরু করেছে নাকি?

অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া নিতান্ত লাজুক কণ্ঠে অপূর্ববাবু বলিলেন, আমি গান শেখাই তাঁকে।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে রিনির দিকে চাহিয়া সোনাদিদি বলিলেন, ও।

ইহার উত্তরে অস্ফুটকণ্ঠে অপূর্ববাবু কি একটা বলিলেন, কিন্তু চতুর্থ টেবিলে উপবিষ্ট আনন্দিত সর্দার প্রতাপ সিংহের অট্টহাস্যে তাহা আর শোনা গেল না। চতুর্থ টেবিলে প্রতাপ সিং ও মিষ্টিদিদি বসিয়া আলাপ-আপ্যায়ন সহকারে চা-পান করিতেছিলেন।

শঙ্কর চাহিয়া দেখিল, অস্তগামী সূর্যের রক্ত-কিরণরেখা মিষ্টিদিদির জরির আঁচলটায় পড়িয়া জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে।

পাশের টেবিলের প্রকাশবাবু সোনাদিদিকে বলিলেন, এ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন না তো। এঁকে এর আগে আপনাদের বাড়িতে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না।

সোনাদিদি আলাপ করাইয়া দিলেন।

শঙ্কর লক্ষ্য করিল, এই সুসজ্জিত ফ্যাশান-দুরস্ত অধিবেশনে প্রকাশবাবু লোকটি একটু বেমানান-গোছের সাদাসিধা। গলাবন্ধ গরম কোট গায়ে এবং তদুপরি একটি মোটা গোছের খদ্দরের আধময়লা চাদর। দাড়িটা পর্যন্ত যেন দুই দিন কামানো হয় নাই।

সোনাদিদি পরিচয়সূত্রে বলিলেন, প্রকাশবাবু হচ্ছেন আমাদের অগতির গতি, কোনো বিপদে পড়ে প্রকাশবাবুর শরণাপন্ন হলে—বাস্, নিশ্চিন্ত। তা ছাড়া জানেন, উনি একজন খুব ভাল হোমিওপ্যাথ।

প্রকাশবাবু হাত জোড় করিয়া বলিলেন, মিসেস রায়, অনেক যোগ্যতর ব্যক্তি তো এই সভায় উপস্থিত রয়েছেন; আমার ওপর এত বেশি মনোযোগ দিলে ওঁদের অপমান করা হবে যে!

প্রকাশবাবুর টেবিলে যে মহিলাটি ছিলেন, তিনি এতক্ষণ কোনো কথাই বলেন নাই। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, ব্যাচিলার মানুষকে একটু জ্বালাতন করে মিসেস রায় আনন্দ পান, তার থেকে ওঁকে বঞ্চিত করবেন না।

বেশ, তা হলে করুন।

প্রকাশবাবু স্মিতমুখে আহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

শঙ্কর হেদুয়ার ধারে একটা বেঞ্চে একা বসিয়া ছিল। প্রফেসার মিত্রের বাড়ি হইতে সে হস্টেলে ফিরে নাই। আজিকার দিনে এই বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তাহার মন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। যাহাদের সংসর্গে তাহার বৈকালটা কাটিল, তাহারা যেন অন্য জগতের প্রাণী—স্বপ্ন-জগতের। কথাবার্তা ব্যবহার কেমন স্বচ্ছন্দ অনাড়ষ্ট সজীব সুন্দর! সুরমা এই জগতের লোক। ইহাদের সঙ্গলাভ করিয়া সে মনে মনে নিজেকে ধন্য মনে করিল। স্টেশনে উৎপল সেদিন যাহা বলিয়াছিল, তাহা তাহার মনে পড়িল। কিন্তু তাহা তো একেবারেই অসম্ভব। কল্পনা করাও বাতুলতা। রিনির মতো মার্জিতরুচি যুবতী তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি হইবে কেন? কিন্তু ওই অপূর্বকৃষ্ণ পালিতকে তো রিনি সহ্য করিতেছে! এই কথা মনে হওয়ায় শঙ্কর সোজা হইয়া বসিল। রিনিকে সে নিজে বিবাহ করিতে পারুক আর না পারুক, অপূর্বকৃষ্ণের হাত হইতে তাহাকে সে রক্ষা করিবে।

কে রে, শঙ্কর! এখানে একা কি করছিস? আজ কলেজ থেকে তুই হস্টেলে পর্যন্ত ফিরিস নি, ব্যাপার কি বল্ তো?

শঙ্করের রুম-মেট কানাই।

শঙ্কর বলিল, একটা নেমন্তন্ন ছিল।

চল্, এবার যাওয়া যাক, আটটা তো বাজে।

চল্।

দুইজনে গল্প করিতে করিতে হেদুয়া হইতে বাহির হইল। হেদুয়ার মোড়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে সহসা কানাই বলিল, ওহো, তোর তিরিশটা টাকা এসেছে আজ মনি-অর্ডারে। সুপারিনন্টেডেন্ট তোকে দিতে এসেছিলেন, তোকে না পেয়ে আমাকে দিয়ে গেলেন। বললেন, তোকে দিয়ে দিতে। সঙ্গেই আছে আমার, এই নে।

কানাই পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া তিনটি নোট ও একটি কুপন শঙ্করের হাতে দিল। শঙ্কর অন্যমনস্কভাবে তাহা পকেটে পুরিল।

ট্রাম আসিল।

উভয়েই চড়িয়া বসিল। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই শঙ্কর হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। কানাইকে বলিল, আমার একটু দরকার আছে, তুই যা, আমি আসছি একটু পরে।

চলন্ত ট্রাম হইতে শঙ্কর লাফাইয়া পড়িল।

ট্রাম চলিয়া গেল।

।। চার ।।

এই ট্যাক্সি!

ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইতেই শঙ্কর তাহাতে চড়িয়া বসিয়া প্রফেসার মিত্রের বাড়ির ঠিকানা বলিয়া দিল এবং জোরে চালাইতে বলিল। গলা বাড়াইয়া রাস্তার একটি ঘড়িতে দেখিল, আটটা বাজিয়া দশ মিনিট। বেশি সময় তো নাই।

ড্রাইভারকে আবার বলিল, জোর্‌সে হাঁকাও।

প্রফেসার মিত্রের বাড়ি পৌঁছিয়া শঙ্কর সোজা ড্রয়িং-রুমের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। ঢুকিয়াই সোনাদিদির সঙ্গে দেখা। মোটর থামিবার শব্দে তিনি বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন, শঙ্করকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন।

এ কি, শঙ্করবাবু, আবার ফিরলেন যে? আমি ভাবলাম, জামাইবাবু বুঝি ফিরে এলেন স্টেশন থেকে।

প্রফেসার মিত্র বাড়িতে নেই নাকি?

না, তিনি বন্ধুদের স্টেশনে তুলে দিতে গেছেন। আপনি এলেন যে আবার?

শঙ্কর বলিল, চলুন, ফিল্‌মটা দেখে আসি।

সোনাদিদির মুখ দেখিয়া মনে হইল, যেন এমনই কিছু একটা তিনি প্রত্যাশা করিতেছিলেন। মুখে কিন্তু সে কথা বলিলেন না। একটু ফিক্ করিয়া হাসিয়া তিনি বলিলেন, এই না তখন বললেন, হস্টেলের ছুটি পাওয়া যাবে না?

শঙ্কর কিছু না বলিয়া হাসিমুখে শুধু চাহিয়া রহিল।

সোনাদিদি বলিলেন, আপনি একটু বসুন তা হলে, ওদের খবর দিই আমি।

সোনাদিদি ভিতরে চলিয়া গেলেন। শঙ্কর নিকটস্থ সোফাটায় বসিয়া পড়িল। তাহার রগের শিরাগুলি দপদপ করিতেছিল।

ম্যান উওম্যান ম্যারেজ।

অদ্ভুত ছবি!

আদিম অসভ্য মানব-মানবী হইতে শুরু করিয়া মানব-সভ্যতার প্রতি স্তরে নরনারীর প্রেমলীলা নানা বর্ণে অপূর্ব শিল্পসম্পদে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। শঙ্কর তন্ময় হইয়া দেখিতেছিল। এক পাশে রিনি, এক পাশে সোনাদিদি। রিনির পাশে মিষ্টিদিদি বসিয়া ছিলেন। রিনির হাত মিষ্টিদিদির হাতের মধ্যে ছিল। ছবি দেখিতে দেখিতে অজ্ঞাতসারে রিনির হাতখানা মিষ্টিদিদি সজোরে চাপিয়া ধরিলেন, এত জোরে—যেন নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিতে চান। রিনি কাতরোক্তি করিয়া উঠিল।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে?

সলজ্জ রিনি কোনো উত্তর দিল না।

মিষ্টিদিদি বলিলেন, ও কিছু নয়।

ছবি চলিতে লাগিল। রোমের দৃশ্য। সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরূঢ় রোম তাহার অতুল ঐশ্বর্য দুই হাতে মুঠা মুঠা করিয়া ছড়াইয়াও শেষ করিতে পারিতেছে না। বিলাসসজ্জার প্রধান উপকরণ নারী নানা রূপে নানা ভঙ্গিতে স্বপ্নলোকে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে, লাবণ্যময়ী জ্বলন্ত-যৌবনা রূপসীর দল সবল-পেশী বলিষ্ঠদেহ পুরুষদের দৃপ্ত মহিমার নিকট নিজেদের বিলাইয়া দিয়া হাসিকান্নার ক্ষিপ্র স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। কেহ ক্রীতদাসী, কেহ সম্রাজ্ঞী। শঙ্কর অনুভব করিল, তাহার দক্ষিণ জানুটায় কিসের যেন চাপ লাগিতেছে। যদিও সে বুঝিতেছিল ইহা কিসের চাপ, তথাপি সে ভাল করিয়া একবার দেখিল, হ্যাঁ, সোনাদিদির জানুটাই এদিকে একটু বেশি সরিয়া আসিয়াছে যেন। সোনাদিদি একেবারে আত্মহারা হইয়া ছবি দেখিতেছেন। শঙ্কর একটু সরিয়া বসিল, সরিয়া বসিতে গিয়া আবার রিনির গায়ে গা ঠেকিয়া গেল। রিনি সলজ্জভাবে একটু সরিয়া বসিল। ছবি চলিতে লাগিল।

ইন্টারভ্যাল।

চতুর্দিকে আলো জ্বলিয়া উঠিল। শঙ্কর দেখিল, মিষ্টিদিদির চক্ষু দুইটি চকচক করিতেছে; সোনাদিদি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন; রিনি সাধারণতই একটু স্থিরভাব, ছবি দেখিয়া সে আরও গম্ভীর হইয়া গিয়াছে । শঙ্কর নিজেও কেমন যেন উন্মনা হইয়া পড়িয়াছিল। সোনাদিদির বাক্যস্ফূর্তি হইলে বলিলেন, একটু চা খেলে হত। রিনি, খাবি?

রিনি মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিল।

বাহিরে যাইতে যাইতে শঙ্করের হঠাৎ চোখে পড়িল যে, প্রথম শ্রেণীতে কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে গৈরিকধারী ভন্টুর মেজকাকাও বসিয়া রহিয়াছেন। শঙ্কর হঠাৎ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, চেহারার বেশ পরিবর্তন হইয়াছে। শঙ্করকেও মেজকাকা দেখিতে পাইলেন না। শঙ্কর বাহিরে চলিয়া গেল। বাহিরে গিয়া চায়ের ফরমাস দিতে দিতে আচম্বিতে মনে পড়িল, তাহার যে আজ ভন্টুর সহিত বোস সাহেবের বাড়ি যাইবার কথা মেজকাকার চাকুরির জন্য। হাতঘড়িটা দেখিল, দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

এখনও ভন্টু নিশ্চয় তাহার জন্য হস্টেলে বসিয়া নাই। এতরাত্রে হস্টেলে ফিরিয়াই বা সে কি জবাবদিহি করিবে? কানাইটা কি ভাবিবে, কে জানে! তাহাদের ব্লকের মনিটার রামকিশোরবাবু লোকটিও ভরসা করিবার মতো নহেন। যে স্বপ্নলোকে সে বিচরণ করিতেছিল, বাস্তবের রূঢ় আঘাতে তাহা চুরমার হইয়া গেল। কবিতার যে দুইটি লাইন মনের নিভৃত কোণে গুঞ্জন তুলিয়াছিল, তাহারা হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া পড়িল...। একটি ট্রেতে তিন পেয়ালা চা লইয়া একটি খানসামা একটু পরেই মিষ্টিদিদির সম্মুখীন হইল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করও আসিল, তাহার হস্তে একটি প্রকাণ্ড ঠোঙায় ডালমুট।

ইন্টারভ্যাল শেষ হইল।

আবার ছবি আরম্ভ হইয়া গেল। শঙ্করের কিন্তু মনের সুর কাটিয়া গিয়াছিল। এই যৌবনমত্ত নর-নারীদের নর্তন-কুর্দন আর তাহার ভাল লাগিতেছিল না। সমস্ত ছাপাইয়া তাহার মনে হইতেছিল, ভন্টু হয়তো অপিস হইতে ফিরিয়া তাহার আশায় প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

ভণ্টুর বউদিদির মুখখানিও তাহার মনে পড়িল, দারিদ্র্য-নিপীড়িতা—মুখের হাসিটি কিন্তু মরিয়া যায় নাই।

শঙ্কর আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া পড়িল। সোনাদিদিকে চুপিচুপি বলিল, আমি বাইরে থেকে এখুনি আসছি, আপনারা দেখুন।

সে বাইরে আসিল। এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল যে, বিশ্বাসযোগ্য চেনা-শোনা কাহাকেও যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই তিনটি নারীকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিবার ভার তাহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া সে ভণ্টুর খোঁজে বাহির হইবে।

হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল, অপূর্ববাবু বারান্দায় এক ধারে দাঁড়াইয়া আছেন। শঙ্কর আগাইয়া গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনিও ছবি দেখতে এসেছেন দেখছি!

অপূর্ববাবু কুণ্ঠিতভাবে বললেন, এইমাত্র এলাম আমি। টিউশনি থেকে ছুটি পেতেই বড্ড দেরি হয়ে গেল, তার ওপর ওঁদের ওখানে গিয়ে দেখি, ওঁরা সব চলে এসেছেন এখানে, রাস্তায় ট্রামটাও এমন আটকে গেছল—ভাবছি, এখন টিকেট কিনে আর ঢোকাটা কি ঠিক হবে?

শঙ্কর বলিল, না, এখন আর ঢুকে কি হবে? ছবি তো প্রায় শেষ হয়ে এল।

শঙ্কর আবার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। অপূর্ববাবুকে দেখিয়া সে মুহূর্ত মধ্যে স্থির করিয়া ফেলিল যে, ভণ্টুর খোঁজে যাওয়াটা এখন বৃথা। অপূর্ববাবু অপ্রস্তুতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বড়বাবুর অনেক খোশামোদ করিয়া চায়ের নিমন্ত্রণটা তিনি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন;, কিন্তু মিস বেলার নিকট হইতে ছাড়া পাইতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া গেল। তা ছাড়া ট্রামটা...

সিনেমা শেষ হইল প্রায় রাত্রি বারোটায়।

ট্যাক্সি করিয়া শঙ্কর যখন মিষ্টিদিদি, সোনাদিদি ও রিনিকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিল, তখন প্রফেসার মিত্র ফিরিয়াছেন। রিনি মৃদুকণ্ঠে বলিল, দাদা এখনও লাইব্রেরিতে রয়েছেন, আলো জ্বলছে।

শঙ্করের মনে একটু শঙ্কা ছিল, হয়তো প্রফেসার মিত্র রাগ করিবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে এ ভাবে সকলে মিলিয়া সিনেমায় যাওয়াটা শঙ্করের নিজের কাছেই একটু খারাপ লাগিতেছিল। কিন্তু শঙ্করের শঙ্কা শীঘ্রই অপসারিত হইল। মোটরের শব্দে প্রফেসার মিত্র বাহির হইয়া আসিলেন এবং নাক হইতে চশমা কপালের ওপর তুলিয়া বলিলেন, ও, শঙ্করবাবুর সঙ্গে তোমরা গিয়েছিলে! আমি প্রথমটা ভেবেছিলুম, অপূর্ব বুঝি এই হুজুক তুলেছে। কিন্তু তোমরা চলে যাওয়ার একটু পরেই অপূর্বও এসে হাজির, তখন বেয়ারাটাও বললে যে, তোমরা শঙ্করবাবুর সঙ্গে গেছ।—বলিয়া তিনি মোটা বইখানা টেবিলের ওপর রাখিয়া বিকশিত দন্তপাঁতিকে আরও বিকশিত করিয়া বলিলেন, কেমন ছবিটা?

সকলেই একবাক্যে বলিলেন যে, ছবিখানি সুন্দর।

প্রফেসার মিত্র তখন শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তুমি এখন কোথায় ফিরবে?

হস্টেলে।

শঙ্কর তাহার হস্টেলের নামটাও বলিল।

মিষ্টিদিদি হাসিয়া বলিলেন, তুমি এখন ওঁকে উদ্ধার কর, উনি হস্টেল থেকে ছুটি না নিয়েই চলে এসেছেন।

মিত্র মহাশয়ের চোখে ক্ষণিকের জন্য একটা কৌতুকদীপ্তি জ্বলিয়া নিবিয়া গেল। ভালমানুষের মতো হাসিয়া তিনি বলিলেন, আচ্ছ ফোনে বলে দেব আমি।

রিনি উপরে চলিয়া গেল।

প্রফেসার মিত্র মিষ্টিদিদির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তোমরা সব শুয়ে পড় গিয়ে। আমার শুতে আজও রাত হবে; শেলির উপরে ক্রিটিসিজ্‌মের এ বইখানা ভারি চমৎকার লিখেছে, শেষ না করে শোব না।

মুচকি হাসিয়া সোনাদিদি বলিলেন, দেখবেন, কালকের মতো আবার ইজিচেয়ারে শুয়েই থাকবেন না যেন।

প্রফেসার মিত্রের হাসি আকর্ণবিস্তৃত হইয়া উঠিল।

শঙ্কর নমস্কার করিয়া বিদায় লইল।

মিষ্টিদিদি শঙ্করের প্রতি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার আসছেন কবে?

আসব একদিন।

শঙ্কর বাহির হইয়া পড়িল।

প্রায় জনহীন রাজপথ দিয়া শঙ্কর একাকী হাঁটিয়া চলিয়াছে। কলিকাতা নগরী নিদ্রাচ্ছন্ন। রাস্তার দুইধারে ইলেকট্রিক বাতিগুলি শূন্য পথটিকে আলোকিত করিয়া কাহার যেন অপেক্ষা করিতেছে। সম্মুখের একটা প্রকাণ্ড বাড়ির দ্বিতল-কক্ষে সহসা একটা নীল আলো দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কাচের জানালা দিয়া অস্পষ্ট দেখা গেল, সেই নীলালোকিত আবেষ্টনীতে দুইটি মূর্তি সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। কলিকাতার পিচ-ঢালা রাজপথ দিয়া চলিতে চলিতে শঙ্করের মনে হইল, সে যেন তেপান্তরের মাঠ পার হইতেছে, আর একটু গেলেই যেন জটিল জটাজূটধারী বটবৃক্ষের দেখা পাওয়া যাইবে এবং তাহার শাখায় রূপকথার বিহঙ্গম-বিহঙ্গমী যেন বিশেষ করিয়া তাহারই জন্য কোনো অপরূপ বার্তা লইয়া বসিয়া আছে।

টুং টুং টুং টুং—

একটা রিক্‌শওয়ালা মন্থরগতিতে বাম দিকের গলিটা হইতে বাহির হইল। শঙ্কর রূপকথার রাজ্য হইতে সহসা আমহার্স্ট স্ট্রিটের ফুটপাথে নামিয়া আসিল।

।। পাঁচ ।।

ঝামাপুকুরের একটি সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে ছোট বাড়ি। সেই বাড়ির বাহিরের ঘরে একটি চৌকির ওপর বসিয়া গভীর মনোনিবেশ-সহকারে এক ব্যক্তি কোষ্ঠী বিচার করিতেছিলেন। বাম হস্তে একটি জ্বলন্ত সিগারেট। সম্মুখেই বোতলের মুখে গোঁজা একটি মোমবাতি জ্বলিতেছে। গভীর রাত্রি। ঘরটির মধ্যে আসবাবপত্র বিশেষ কিছুই নাই। চৌকিটির কাছে একটি শ্রীহীন কাঠের টেবিল এবং ঘরের কোণে প্রকাণ্ড একটা কাঠের আলমারি। আলমারির কপাট দুইটি খোলা রহিয়াছে। আলমারিতে বই ছাড়া বিশেষ কিছুই নাই। বইও নানারকম। অধিকাংশ অবশ্য পুরাতন পঞ্জিকা, কিন্তু অন্য নানাপ্রকার পুস্তকেরও অভাব নাই। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস, শেক্সপিয়রের একখানা নাটক, প্যারাডাইস লস্ট, ক্যাল্‌কুলাস, অ্যাস্ট্রনমি, ঘোড়দৌড় বিষয়ক দুই-চারিখানা পুস্তক, ছবির অ্যাল্‌বাম প্রভৃতি নানাজাতীয় বই অগোছালোভাবে আলমারিতে ঠাসা রহিয়াছে। আলমারির ঠিক নিচেই মেঝের উপরও দুই-একখানা বই পড়িয়া আছে। মেঝের ওপর অসংখ্য সিগারেট ও বিড়ির টুকরো ছড়ানো। টেবিলের ওপর খানকয়েক বিলাতি

মাসিকপত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং রহিয়াছে এক বোতল মদ ও তাহার পার্শ্বে কাচের একটি গ্লাস। গ্লাসটিও ফাটা। তক্তপোশটি নিতান্ত ছোট নয়—বেশ প্রশস্ত। তক্তপোশের ওপর কোষ্ঠী-বিচারক ব্যতীত আর একজন ছিল। সে ও-পাশে শুইয়া ঘুমাইতেছিল; এত ঘুমাইতেছিল যে, তাহার নাক ডাকিতেছিল। বেশ জোরেই ডাকিতেছিল, কিন্তু এই নাসিকাগর্জন সত্ত্বেও কোষ্ঠী-বিচারক নিবিষ্ট মনে আপন কার্য করিয়া যাইতেছিলেন।

কোষ্ঠী-বিচারকের নাম করালীচরণ বক্‌সি। ভদ্রলোকের চেহারা এমন যে, দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না— ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মস্তকে দীর্ঘ অবিন্যস্ত কেশ, শীর্ণ লম্বা দেহ। একটি চক্ষু কানা, অপরটি একটু বেশিরকম প্রদীপ্ত, যেন দপদপ করিয়া জ্বলিতেছে। চিবুকটা সুচালো এবং বক্রভাবে সম্মুখের দিকে আগাইয়া আসিয়াছে, মনে হইতেছে, যেন তাহা সূক্ষ্মাগ্র সুবৃহৎ নাসাটার অনুসরণ করিতেছে। মুখমণ্ডলে বসন্তের দাগ সুস্পষ্ট। বসন্তরোগেই একটি চক্ষু তাঁহার গিয়াছে। সমস্ত মুখে কোনো রোম নাই। শ্মশ্রু গুম্ফ তো নাইই, ভ্রূরও অভাব। অত্যধিক সুরাপানের ফলে ঠোঁট দুইটি হাজিয়া গিয়াছে। করালীচরণ বক্‌সিকে সকলেই ভয় পায় কিন্তু অনেকেই তাঁহার কাছে আসে তাহার কারণ, মন দিয়া গণনা করিলে তাঁহার গণনা নাকি একেবারে নির্ভুল। জ্যোতিষশাস্ত্রে এতবড় গুণীলোক সচরাচর নাকি দেখা যায় না।

পাশের বাড়ির একটা ঘড়িতে টং টং করিয়া বারোটা বাজিল। চকিত দৃষ্টিতে সেদিকে একবার তাকাইয়া বক্‌সি মহাশয় সিগারেটটা জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং উঠিয়া গিয়া টেবিল হইতে মদের বোতল তুলিয়া লইয়া গেলাসে খানিকটা মদ ঢালিলেন এবং নির্জলাই সেটুকু পান করিয়া ফেলিলেন। বিকৃত মুখটা র‍্যাপার দিয়া মুছিতে মুছিতেই তিনি পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিলেন এবং নিপুণভাবে সেটি ধরাইয়া স্বস্থানে আসিয়া পুনরায় বসিলেন। একটি পুরাতন পঞ্জিকা খোলা অবস্থাতেই কাছে পড়িয়া ছিল। সেটি হইতে একটি খাতায় তিনি নানারূপ অঙ্ক টুকিতে শুরু করিলেন। টুকিতে টুকিতে তাঁহার চোখে বিচিত্র এক কৌতূহল ফুটিয়া উঠিল। হঠাৎ কোষ্ঠীখানি আরও খানিকটা প্রসারিত করিয়া নিবিষ্ট মনে কি যেন তিনি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্রায়িত চিবুকটা কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে লাগিল। উত্তেজিত হইলেই করালীচরণের চিবুকটা কুঞ্চিত ও প্রসারিত হয়, অধরোষ্ঠ দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া ওঠে। কিছুক্ষণ কোষ্ঠীখানির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবার পর নীরব হাস্যে করালীচরণের মুখমণ্ডল ভরিয়া গেল। হাসিমুখে কিছুক্ষণ কোষ্ঠীখানির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া আবার তিনি উঠিলেন, বোতলটা হইতে আরও খানিকটা সুরা পান করিলেন এবং বোতলটা তুলিয়া দেখিলেন, আর কতটা অবশিষ্ট আছে। তাহার পর হঠাৎ তিনি ডাকিলেন, ভণ্টুবাবু উঠুন, কত ঘুমোবেন?

চেরা বাজখাঁই আওয়াজ।

ভণ্টুর নাসিকাগর্জন সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। পায়ের পাতাটা মৃদু মৃদু নাচাইতে নাচাইতে ভণ্টু বলিল, না, আমি ঘুমই নি তো।

কর্কশকণ্ঠে হাস্য করিয়া করালীচরণ বলিলেন, কি করা হচ্ছিল তা হলে এতক্ষণ? বাই নারায়ণ, এর নাম যদি ঘুম না হয়, তা হলে—

ভণ্টু উঠিয়া হাই তুলিয়া বলিল, থিঙ্ক করছিলাম।

করালীচরণ এই কথায় অত্যন্ত জোরে হাসিয়া উঠিলেন। মনে হইতে লাগিল, শুষ্ক শক্ত কাষ্ঠখণ্ডে কে যেন করাত চালাইতেছে।

ভণ্টু বলিল, লদ্‌কালদ্‌কি রাখুন, কুষ্ঠির কি হল?

দুটো কুষ্ঠিই দেখেছি।

দাদারটা কি রকম দেখলেন?

ভালই, কোনো ভয় নেই, ভাল হয়ে যাবেন। আপনার এই বন্ধুর কুষ্ঠি কিন্তু ভয়ানক— বাই নারায়ণ।

শঙ্করের? কেন?

উত্তরে করালীচরণ চিবুকটি একবার কুঞ্চিত ও প্রসারিত করিলেন এবং একমাত্র চক্ষুটির তীব্র দৃষ্টি ভণ্টুর মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

এর বেশি এখন আর কিছু বলব না।

ভণ্টু আর একবার হাই তুলিয়া বলিল, কি দেখলেন?

করালীচরণ নীরবে হাসিতেই লাগিলেন, কোনো উত্তর দিলেন না। ভণ্টু হাসিমুখে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল, দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ করালীচরণ উঠিয়া টেবিল হইতে মদের বোতলটা তুলিয়া লইলেন এবং বোতলে মুখ লাগাইয়া বাকি মদটুকু নিঃশেষ করিয়া বিকৃত মুখে বলিলেন, শেষ হয়ে গেল। পকেটও আজ একদম খালি। কিছু দেবেন নাকি ভণ্টুবাবু?

ভণ্টু দ্বিরুক্তি না করিয়া বুকপকেট হইতে মনিব্যাগটা বাহির করিয়া করালীচরণের হাতে দিল এবং হাসিয়া বলিল, আমার যথাসর্বস্ব দিচ্ছি। কালকের বাজার করবার জন্যে কিছু রেখে বাকি সবটা আপনি নিয়ে নিন।

করালীচরণ সাগ্রহে ব্যাগটি খুলিয়া মোমবাতির ওপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর ব্যাগটি টেবিলের উপর উপুড় করিয়া ধরিলেন। একটি সিকি ও দুইটি পয়সা বাহির হইল।

করালীচরণ ভণ্টুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, কত চাই আপনার বাজারের জন্যে?

যা দেবেন।

দু আনায় হবে?

হবে।

যান, তা হলে এই সিকিটা ভাঙিয়ে দু আনার সিগারেট আনুন, আর বাকি দু আনা আপনি নিয়ে নিন।

কোন্ সিগারেট আনব?

যা খুশি।

করালীচরণ প্যাকেট হইতে শেষ সিগারেটটি বাহির করিয়া ভণ্টুর দিকে পিছন ফিরিয়া সেটি ধরাইতে লাগিলেন। সেই সুযোগে ভণ্টু পিছন হইতে নানারূপ মুখভঙ্গি করিয়া করালীচরণকে ভ্যাংচাইতে লাগিল। করালীচরণ সিগারেট ধরানো শেষ করিয়া বাকি পয়সা দুইটিও ভণ্টুর হাতে দিয়া বলিলেন, এ দুটোও নিয়ে যান, একটি ছোট পাঁউরুটি কিনে আনবেন।

দিন।

ভণ্টু বাহির হইয়া গেল।

ভণ্টু চলিয়া গেলে করালীচরণ বাম হস্তে জ্বলন্ত সিগারেটটি ধরিয়া নিজের দক্ষিণ করতলটি নির্বাপিতপ্রায় মোমবাতিটির আলোকে প্রসারিত করিয়া ধরিলেন এবং সেই দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। খানিকক্ষণ এইভাবে থাকিয়া সহসা তাঁহার নজরে পড়িল, মোমবাতিটি আর বেশিক্ষণ টিকিবে না। আপন মনেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, দু-একটা মোমবাতি আনতে বললে ঠিক হত। বাই নারায়ণ, হাতে একদম কিছু নেই আজ।

নির্বাণোন্মুখ শিখাটি কাঁপিতে লাগিল। একচক্ষু মেলিয়া করালীচরণ সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

ক্যাঁচ করিয়া একটা মোটর বাহিরে থামিল।

করালীবাবু বাড়ি আছেন?

আছি।

করালীচরণ বাহিরে গেলেন। বাহিরে একটি প্রকাণ্ড মোটর দাঁড়াইয়াছিল। মোটরের ভিতর একজন মোটাগোছের ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। তাঁহার পাশে আর একজন যিনি ছিলেন, করালীবাবু আসিতেই তিনি নামিয়া আসিলেন এবং সবিনয়ে প্রশ্ন করিলেন আপনার নামই কি করালীচরণ বক্‌সি? রেস সম্বন্ধে আপনিই কি গণনা করেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সাল্‌কের পরেশবাবুকে কি আপনিই গণনা করে দিয়েছিলেন? তাঁর কাছে আপনার নাম শুনে আমরা এসেছি।

কি দরকার?

গোনাতে চাই।

করালীচরণ একেবারে কাজের কথা পাড়িলেন। বলিলেন, আমার কাছে গোনাতে হলে পঞ্চাশ টাকা লাগে। আপনাদের নির্ধারিত বলে দেব, রেস খেলে জিতবেন কি না।

মোটরে উপবিষ্ট স্থূলকায় ভদ্রলোকটি এইবার নামিয়া আসিলেন। ভদ্রলোক স্থূলকায় হইলেও অল্পবয়স্ক, মুখখানি নিতান্ত কচি। কচি মুখটিতেই বিজ্ঞতার ভাব ফুটাইয়া তিনি বলিলেন, আপনার দক্ষিণা নিশ্চয়ই দেব। তবে আমরা হলাম মধ্যবিত্ত লোক, ঠকতেও চাই না, ঠকাতেও চাই না।

করালীচরণ তাঁহার এক চক্ষুর দৃষ্টি তুলিয়া এমনভাবে তাঁহার দিকে চাহিলেন, যেন কোনো মহারাজা কোনো গরিব প্রজার নিবেদন শুনিতেছেন।

আমি পঞ্চাশ টাকা নিয়ে থাকি, তবে কাউকে পীড়ন করতে আমি চাই না। যা সাধ্যে কুলোয় দেবেন, দরকষাকষি করা আমার স্বভাব না।

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করিয়া দুইখানি দশ টাকার নোট বাহির করিলেন, এবং বলিলেন, এই আমার প্রথম কাজ আপনার সঙ্গে, যদি পরস্পর পটে যায় টাকার জন্যে আটকাবে না।

আচ্ছা, দিন।

করালীচরণ হস্ত প্রসারিত করিয়া নোট দুইটি লইয়া তাঁহার ছিন্ন জামার পকেটে রাখিলেন এবং তাহার পর বলিলেন, কাল সকালে আসবেন তাহলে, আজ এত রাত্রে হবে না।

নোট দুইটি এভাবে করালীচরণের পকেটে অগ্রিম চলিয়া গেল দেখিয়া স্থূলকায় ভদ্রলোকটি মনে মনে বোধহয় একটু বিচলিত হইলেন। বলিলেন, কাজটা আজ রাত্রেই মিটে গেলে ভাল হত না?

করালীচরণ উত্তর দিলেন, আজ হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে নোট দুইখানি ফেরত দিয়া বলিলেন, কালও আর আসবার দরকার নেই আপনার। আপনার কাজ আমি করব না। আমার ওপর যখন বিশ্বাসই নেই, তখন আমার কাছে আসাই আপনার পণ্ডশ্রম হয়েছে। বাই নারায়ণ, ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ আমি করি না।

সে কি কথা—সে কি কথা!

ত্রস্ত হইয়া উভয় ভদ্রলোকেই আগাইয়া আসিলেন। স্থূলকায় ভদ্রলোক নোট দুইটি করালীচরণের পকেটে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, রাগ করবেন না করালীবাবু, টাকাটা রাখুন। বেশ, কাল সকালেই হবে। কখন আসব বলুন?

করালীচরণ বক্‌সি কখনও কাউকে কথা দেয়নি আজ পর্যন্ত। কাল সকালে দশটার ভেতর আসবেন, যদি বাড়িতে থাকি এবং মেজাজ ঠিক থাকে দেখা হবে।

স্থূলকায় ভদ্রলোকের সঙ্গীটি আড়াল হইতে চোখের কি একটা ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিত অনুসারে স্থূলকায় ভদ্রলোক বলিলেন, আচ্ছা, বেশ বেশ তাই হবে। কাল সকালেই আসব এখন। আচ্ছা, চলি তবে, নমস্কার।

তাই আসবেন, নমস্কার।

মোটরকার চলিয়া গেল। মোটরখানার দিকে তাকাইয়া করালীচরণ স্বগতোক্তি করিলেন শ্‌শালা!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভণ্টু আসিয়া পড়িল। পাঁউরুটিটা করালীবাবুর হাতে দিয়ে ভণ্টু বলিল, দু আনায় হাতি ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না।

করালী বাবু সঙ্গে সঙ্গে ভণ্টুর হস্তে নোট দুইখানি দিয়া বলিলেন, এই নিন। হাতি ফেরত দিয়ে আসুন। এক টিন নাইন নাইন আর এক বোতল হুইস্কি চট্‌ করে এনে দিয়ে যান। আপনার পয়সাটাও ফেরত নিয়ে নেবেন। নিতান্ত নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলাম বলেই আপনার কাছে হাত পাততে হয়েছিল, বাই নারায়ণ।

ভণ্টু হাত জোড় করিয়া কহিল, এ সুখ থেকে বঞ্চিত করবেন না দাদা।

করালীচরণ বলিলেন, আপনার কাছ থেকে পয়সা নেওয়াটা সত্যিই আমার উচিত নয়। আমার বসন্তরোগে আপনি যে সেবাটা করেছিলেন, তার তুলনা হয় না। নৈহাটি স্টেশনে আপনার সঙ্গে দেখা না হলে মরেই যেতাম আমি, বাই নারায়ণ। সে কথা আমি জীবনে ভুলতে পারব না।

ভণ্টু আবার তাঁহার পায়ের ধুলা লইল।

করালীচরণ পদদ্বয় সরাইয়া লইয়া বলিলেন, যান, দেরি হয়ে গেছে। চিৎপুর অঞ্চলে না গেলে মাল পাবেন না।

ভণ্টু জিজ্ঞাসা করিল, টাকাটা পেলেন কোথা থেকে হঠাৎ?

করালীচরণের প্রদীপ্ত চক্ষুটি টর্চের মতো জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, এসেছিল দু শালা।

ভণ্টু আবার বাইকে চড়িয়া রওনা হইয়া পড়িল।

ভণ্টু চলিয়া গেলে করালীচরণ রাস্তায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই শুকনা পাঁউরুটিটা কামড়াইয়া কামড়াইয়া খাইতে লাগিলেন। নিমেষের মধ্যে রুটিটা শেষ হইয়া গেল। জল খাইবার জন্য ভিতরে ঢুকিয়া করালীচরণ দেখিলেন যে, মোমবাতি নিবিয়া গিয়াছে, ঘরের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার। এবারও ভণ্টুকে মোমবাতি আনিতে বলা হইল না—বাই নারায়ণ!

স্বল্পালোকিত গলিটির মধ্যে তৃষ্ণার্ত করালীচরণ একা একা প্রেতের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। করালীচরণের পৃথিবীতে আপনার জন কেহ নাই। থাকিবার মধ্যে আছে এই জীর্ণ বাড়িখানা। বিধবা মা কাশীতে ছিলেন, সেদিন দেহরক্ষা করিয়াছেন। বিধবা মা-ই বহু কষ্টে করালীচরণকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। বাবার কথা করালীচরণের মনেও পড়ে না। বাল্যকাল হইতে যতদূর মনে পড়ে, সবই মা। করালী একদা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। গণিতে প্রথম শ্রেণীর এম. এ.। কিন্তু এ কথা কেহ জানে না। করালীচরণও ইহা কাহাকেও বলেন না। আধুনিক পরিচিত মহলে করালীচরণ বক্‌সি বুদ্ধিমান জ্যোতিষী বলিয়া বিখ্যাত। কেহ বলে, লোকটা পাগল, কেহ বলে, পণ্ডিত, কেহ বলে, শয়তান।

ভণ্টু সেদিন রাত্রে যখন বাড়ি ফিরিল, তখন রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। বউদিদি জাগিয়া ছিলেন। তিনি উৎকণ্ঠিত মুখে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন।

উঃ, কত রাত তুমি করলে ঠাকুরপো?

ঘোর কেতুর পাল্লায় পড়েছিলাম, বাইকটা একটু ধর তো।

ভণ্টু বাইকটা দুহাতে ধরিয়া বউদিদির সাহায্যে সেটা বারান্দার ওপর তুলিয়া ফেলিল।

তোমার দাদার কুষ্ঠিটা নিয়ে গিয়েছিলে নাকি জ্যোতিষীর কাছে?

হ্যাঁ, কেতুশ্রেষ্ঠ করালীই তো ডোবালে আজ। বিরাট কৈতুকী অ্যাফেয়ারে ঢুকেছিলাম।

বউদিদির কোলের ছেলেটা ঘরের ভিতর কাঁদিয়া উঠিল। বউদিদি তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেলেন ও ছেলেটাকে চাপড়াইতে চাপড়াইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বললেন দেখে, কোনো ভয় নেই তো?

না।

বউদিদি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন, আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছে না তো? লুকিও না, লক্ষ্মীটি।

ইহার উত্তরে নেপথ্য হইতে ভণ্টু ঠোঁট দুইটি বিকৃত করিয়া বউদিদিকে ভ্যাংচাইতে লাগিল।

ঘরের ভিতর হইতে বউদিদি আবার প্রশ্ন করিলেন, কোনো উত্তর দিচ্ছ না যে?

ভণ্টু মুখটা বিকৃত করিয়া রাখিয়া বলিল, বাইরে এস।

বউদিদি বাহিরে আসিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

লদ্‌কালদ্‌কি রেখে এখন খেতে দাও।

খাবার তো ঢাকা রয়েছে ওই সামনেই, দেখতে পাচ্ছ না?

আর একটা থালায় কার খাবার?

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, আমিও এখনও খাইনি।

ভণ্টু আর একবার মুখবিকৃত করিয়া ভ্যাংচাইল।

আহা, মুখ করা হচ্ছে দেখ না।

ভণ্টু হেঁট হইয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল। বউদিদি বাতিটা একটু উস্কাইয়া দিয়া বলিলেন, জ্যোতিষীর নাম করালীচরণ! কী অদ্ভুত নাম গো!

সেই কানা করালী।

ও, সেই যাকে তুমি নৈহাটি স্টেশন থেকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলে? খুব ভাল জ্যোতিষী?

অসাধারণ—চাম লদ্‌।

উভয়ে খাইতে বসিল।

খাইতে খাইতে বউদিদি হঠাৎ বলিলেন, ওহো তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, শঙ্কর ঠাকুরপো এসেছিল, রাত বারোটার পর।

ভণ্টু বলিল, চোর কোথাকার! সমস্ত সন্ধেটা আমার মাটি করে দিয়ে রাত বারোটার পর আসা হয়েছে! কিছু বলে গেছি নাকি!

একখানা চিঠি দিয়ে গেছে।

কোথায় চিঠি?

বউদিদি এঁটো হাতেই উঠিয়া গিয়া ঘরের ভিতর হইতে একটি পত্র আনিয়া ভণ্টুর হাতে দিলেন। ক্ষুদ্র পত্র—

ভাই ভণ্টু, সন্ধের সময় এক জায়গায় আটকে পড়েছিলাম। কাল সকালে উঠেই বোস সাহেবের ওখানে যাব। তুই বিকেলে আসিস। —শঙ্কর

ভণ্টু পুনরায় বলিল, চোর কোথাকার।

কিছুক্ষণ পরে ভণ্টু জিজ্ঞাসা করিল, বাবাজির খবর কি?

বাবাজি আজ সিনেমা দেখতে গেছে, কে কে সব ডাকতে এসেছিল যেন, কোথায় নেমন্তন্ন আছে; বলে গেছে, সকালে ফিরবে।

পাশের ঘরে খুটখুট করিয়া আওয়াজ হইল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেশলাইকাঠি জ্বালার শব্দ পাওয়া গেল। বাকু উঠিয়া তামাক সাজিতেছেন। একটু পরেই দরাজ গলায় কাশিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, বড় বউমা উঠেছ নাকি? চা চড়াও তাহলে।

বউদিদি হাস্য-দীপ্ত চক্ষে ভণ্টুর পানে চাহিয়া বলিলেন, তুমি স্টোভটা ধরিয়ে দিয়ে শোও ঠাকুরপো। আমি ও ভাল ধরাতে পারি না, বড্ড তেল উঠে পড়ে। তোমাকে বলে বলে হেরে গেছি, কিছুতেই তুমি ওটা সারিয়ে আনলে না।

ভণ্টু উত্তরে কিছু না বলিয়া বউদিদির পাত হইতে মাছের একটা কাঁটা তুলিয়া লইয়া চিবাইতে লাগিল।

বাঃ, ওটা আমি চিবোব বলে আলাদা করে রেখে দিয়েছি, বেশ তো তুমি।

ভণ্টু বলিল, খুজবুজ।

।। ছয় ।।

সেদিন সকালে শঙ্কর যখন বোস সাহেবের বাড়ি গেল, তখন সবে সাতটা বাজিয়াছে। বোস সাহেব লোকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই—তিনি রেলে চাকুরি করেন, শঙ্করের বাল্যসখী শৈলর স্বামী এবং সাহেবি-ভাবাপন্ন। সাহেবিয়ানার নানা বাধা সত্ত্বেও তিনি সাহেবিয়ানা পরিত্যাগ করেন নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব সারবান মতামত আছে এবং সে মতামতগুলি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে অসঙ্গত বলিয়াও মনে হয় না। বোস সাহেব বাড়িতেও সাহেবি পোশাক পরিধান করিয়া থাকেন, আহারাদিও সাহেবি কেতায় টেবিল-চেয়ার-প্লেট-কাঁটা-চামচ

সহযোগে সম্পন্ন হয়। তাঁহার খাস বাবুর্চি তাঁহার জন্য বাহিরে পৃথকভাবে সাহেবিখানা প্রস্তুত করিয়া থাকে এবং তাঁহার আহারাদি বাহিরের ঘরেই নিষ্পন্ন হয়। বোস সাহেবের অন্দরমহলের সহিত সম্পর্ক কম। তাঁহার নিজের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি তিনি বাহিরের ঘরে বিভিন্ন আলমারিতে নিজের আয়ত্তের মধ্যে রাখিয়াছেন। স্নান করিবার সময় সাবান বা জামা পরিবার সময় বোতামের জন্য হাঁকাহাঁকি করিয়া তিনি বাড়িসুদ্ধ সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলা পছন্দ করেন না। এ সকল বিষয়ে তিনি স্বাবলম্বী ও স্বাধীন।

শঙ্কর গিয়া শুনিল, তিনি প্রাতরাশে বসিয়াছেন। বাহিরে দণ্ডায়মান চাপরাশির মারফত নিজের আগমন বার্তা জ্ঞাপন করিতেই বোস সাহেব তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বোস সাহেবের ধপধপে ফরসা রঙ। শক্তকফ-কলারওয়ালা ঘোর নীল রঙের শার্টটিতে তাঁহাকে মানাইয়াছিল ভাল। কোলের ওপর একটি সাদা ন্যাপ্‌কিন প্রসারিত, খাবার পড়িয়া পরিচ্ছদ যাহাতে নষ্ট না হইয়া যায়। শঙ্করকে দেখিয়া তিনি স্মিতমুখে প্রশ্ন করিলেন, এই যে, এত সকালে কি মনে করে? বসুন, বসুন।

তাঁহার প্রত্যেক কথাটি প্রয়োজন মাফিক ওজন করা। এত কৃত্রিমতাপূর্ণ যে, মনে হয়, যেন প্রত্যেক কথাটি কহিবার পূর্বে সেগুলির মুখ মুছাইয়া চুল আঁচড়াইয়া দিতেছেন। পুনরায় স্মিতমুখে বলিলেন, বসুন না ওই সামনের চেয়ারটাতে।

আসন গ্রহণ করিতে করিতে শঙ্কর বলিল, একটা দরকার আছে আপনার সঙ্গে।

অর্থাৎ?

পাঁউরুটির একখানা টোস্ট বাঁ হাতে ধরিয়া কামড়াইতে কামড়াইতে বোস সাহেব সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিলেন।

অর্থাৎ ভণ্টুর মেজকাকার জন্যে এসেছি। পারেন তো তাঁর চাকরিটা আবার করে দিন। বেচারিদের বড় কষ্ট। ভণ্টুকে সংসারের জন্যে লেখাপড়া ছেড়ে চাকরিতে ঢুকতে হয়েছে।

এই বলিয়া শঙ্কর ভণ্টুদের দুর্দশা, ভণ্টুর দাদার অসুখ প্রভৃতির যথাযথ বর্ণনা করিয়া বোস সাহেবের করুণা উদ্রেক করিবার প্রয়াস পাইল। ভণ্টুর মেজকাকার কথা শুনিয়া বোস সাহেব চা-পাঁউরুটি-বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, এক্‌স্‌কিউজ মি, হি ইজ এ হোপ্‌লেস চ্যাপ।

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপচাপ।

তাহার পর বোস সাহেব বলিলেন, নিন, এক কাপ চা খান।—বলিয়া তিনি নিজেই উঠিয়া দেওয়াল-আলমারি হইতে একটি পেয়ালা বাহির করিলেন এবং টি-পট হইতে চা ঢালিয়া শঙ্করকে দিলেন।

আর কিছু খাবেন? টোস্ট্, কি বিস্কুট? ডিম খাবেন?

না।

শঙ্কর নীরবে চা-পান করিতে লাগিল।

একটি হাফ-বয়েল্ড্ ডিম নিপুণভাব ভাঙিতে ভাঙিতে বোস সাহেব বলিলেন, দেখুন শঙ্করবাবু, পারসোনালি স্পিকিং, ভণ্টুর মেজকাকার মতো লোকের ওপর আমার এতটুকু শ্রদ্ধা নেই। আই উড লাইক টু কিক আউট সাচ ফেলোজ ফ্রম মাই অফিস। আই অ্যাম স্পিকিং ফ্র্যাঙ্কলি—একস্‌কিউজ মি। বলিয়া তিনি সাহেবি কায়দায় স্কন্ধযুগলকে ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া আবার নামাইয়া লইলেন।

শঙ্কর কোনো উত্তর না দিয়া নীরব রহিল।

বোস সাহেব আবার বলিলেন, আপনাকে যতদূর জানি, তাতে ও-রকম দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের ওপর সিম্প্যাথি হওয়ার কথা তো নয় আপনার।

শঙ্কর চায়ে একটা চুমুক দিয়া মৃদু হাসিল এবং বলিল, সত্যিকার সিম্প্যাথি হতভাগাদেরই উপর হওয়া উচিত।

বাধা দিয়া বোস সাহেব বলিলেন, এ তো হতভাগা ঠিক নয়, এ একটা 'রোগ'।

বিশেষ তফাত তো চোখে পড়ছে না—বলিয়া শঙ্কর একটু মিনতির কণ্ঠেই বলিল, আমার নিজের বড্ড কষ্ট হয় ভণ্টুটার জন্যে। ওদের বাড়ির সব অবস্থা জানি কি না আমি, ওর দাদা হাফ পে-তে ছুটি নিয়ে চেঞ্জে গেছেন—সংসার চলা দায়। আপনি যদি ভণ্টুর মেজকাকার চাকরিটা করে দেন, তা হলে ভণ্টুর লেখাপড়াটা হয়।

এই বলিয়া সে নীরব হইল। যদিও পরের জন্য, তথাপি ইহা লইয়া আর বেশি অনুরোধ করিতে শঙ্করের কেমন যেন আত্মসম্মানে আঘাত লাগিতে লাগিল। তাহার কেমন যেন সহসা মনে হইল, নিজের উচ্চ-পদের সুযোগ লইয়া বোস সাহেব যেন তাহাকে একটু কৃপামিশ্রিত দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। মনে হইবামাত্র শঙ্করের কান দুইটা গরম হইয়া উঠিতে লাগিল। বোস সাহেব বলিলেন, এখন দেবার মতো কোনো চাকরিও আমার হাতে নেই।

শঙ্কর নীরবেই রহিল। তাহার পর সহসা বলিল, আমার যা বলবার তা তো বললাম, এখন আপনার যদি কিছু করবার থাকে করুন।

বোস সাহেব আর এক পেয়ালা চা ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন, কিছুদিন পরে একটা কম্পিটিটিভ পরীক্ষা করে কতকগুলো লোক নেওয়ার কথা আছে। ভণ্টুর মেজকাকাকে বলুন না তাতে অ্যাপ্লাই করতে। আই মে সিলেক্ট হিম্, লেট হিম টেক আপ এ চান্স্।

আচ্ছা, বলব তাই। ধন্যবাদ। চলি তা হলে। নমস্কার।

শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। দ্বারের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় বাচ্চা গোছের একটি চাকর ভিতর দিক হইতে আসিয়া বলিল, মাঈজি একবার ডাকছেন আপনাকে ভেতরে।

এখন আমার সময় নেই, পরে আসব।

অকারণে রাগ করিয়া শঙ্কর হনহন করিয়া বাহির হইয়া গেল। প্রতীক্ষমানা শৈল চাকরের মুখে এই বার্তা শুনিয়া সামান্য একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, ও, আচ্ছা।

।। সাত ।।

নির্দিষ্ট সময়ে ভণ্টু আসিয়া হাজির হইল।

তাহার সহিত দীর্ঘাকার, গৌরবর্ণ, পাতলা, ছিপছিপে আর একটি ভদ্রলোকও ছিলেন। শঙ্কর ইঁহাকে ইতিপূর্বে দেখে নাই। দেখিবামাত্র কিন্তু আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তীক্ষ্ণ নাসা, ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, প্রশান্ত উন্নত ললাট, ধপধপে ফর্সা রঙ। মাথার চুলগুলো পর্যন্ত ঈষৎ কটা। দেখিলেই মনে হয়, যেন একটা শিখা। ভণ্টু পরিচয় করাইয়া দিল।

ইনি হচ্ছেন ক্যানড্‌ল অর্থাৎ মোমবাতি। আর ইনি হচ্ছেন চাম্ লদ্, চাম গ্যানড্অ বলতে পার।

শঙ্কর প্রতি নমস্কার করিয়া সহাস্যে বলিল, মোমবাতি?

আগন্তুক ভদ্রলোক মৃদুহাস্যসহকারে বলিল, ভণ্টুর কথা ছেড়ে দিন, মোমবাতি আমার নাম নয়, আমার নাম মৃন্ময়—মৃন্ময় মুখোপাধ্যায়।

ভণ্টু অকারণে মুখবিকৃতি করিয়া তাহার দিকে তাকাইল।

শঙ্কর বলিল, অমন করে তাকাচ্ছিস কেন? গাধা কোথাকার!

ভণ্টুর মুখ মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহার পর মৃন্ময়কে বলিল, তুই যেখানে যাচ্ছিলি যা, আমার এখানে দেরি হবে একটু। না হয় বস্, একটু লদ্‌কালদ্‌কি করা যাক।

মৃন্ময় হাতঘড়িটা দেখিয়া বলিল, না, আমাকে যেতে হবে, এমনই দেরি হয়ে গেছে দেখছি।

তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, আমি যাই তা হলে। পরে আলাপ হবে। আপনার নামটা নিশ্চয়ই চাম লদ্ নয়—

ভণ্টু পুনরায় মুখবিকৃতি করিল!

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, না, আমার নাম শঙ্করসেবক রায়।

আচ্ছা, নমস্কার।

মোমবাতি চলিয়া গেল।

তাহার প্রস্থান-পথের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া শঙ্কর বলিল, অদ্ভুত চেহারা ভদ্রলোকের! যেন জ্বলছে।

ওই জন্যেই তো ওর নাম আমরা দিয়েছি মোমবাতি। সাংঘাতিক চাম গ্যান্ঢঅ—

এমন সময়ে হস্টেলের চাকরটা কিছু জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিল। শঙ্কর বলিল, তুই আপিস থেকে আসছিস তো? খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই খুব। নে, খা।

ভণ্টু তৎক্ষণাৎ হেঁট হইয়া শঙ্করের পায়ের ধূলা লইয়া ফেলিল। শঙ্কর পা-টা সরাইয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, চা খাবি, না কোকো?

ভণ্টু সোৎসাহে বলিল, দুইই খাব।

চাকরটা খাবার রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শঙ্কর তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, দু কাপ চা আর এক কাপ কোকো দিয়ে যা চট্ করে।

ভৃত্য চলিয়া গেল।

ভণ্টু আহারে প্রবৃত্ত হইল।

সিঙ্গাড়ায় একটা কামড় দিয়া ভণ্টু বলিল, বাবাজির সম্বন্ধে কি সেট্‌ল্ করলি, বল্ সব। বোস সাহেবের ওখানে গিয়েছিলি? হল কিছু?

বলে—বলব এখন, অনেক কথা আছে।

মানে?

শঙ্কর কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময় 'শঙ্করদা, আপনিই বলুন তো ট্র্যাজেডি বড়, না, কমেডি বড়?' বলিয়া একটি ছোকরা চটি ফটফট করিতে করিতে আসিয়া হাজির হইল। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর একজন। উভয়ের হস্তে চায়ের পেয়ালা।

হস্টেলে শঙ্করের একটি দল আছে। যুবকদ্বয় সেই দলভুক্ত। ইহাদের মধ্যে একজন ভণ্টুকে দেখিয়া বলিল, এই যে ভণ্টুদা, আপনাকে আজকাল কলেজে তো দেখি না।

সিঙাড়া চিবাইতে চিবাইতে ভণ্টু উত্তরে শুধু একটু হাসিল।

শঙ্কর বলিল, হঠাৎ ট্র্যাজেডি-কমেডির কথা কেন?

একজন যুবক বলিল, কুমুদবাবু নিচের ঘরে খুব লেক্‌চার ঝাড়ছেন যে, কমেডিই হল শ্রেষ্ঠ জিনিস।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, তাই নাকি?

যুবকটি বলিল, ওঃ, নীচে মহা আস্ফালন লাগিয়েছেন কুমুদবাবু। তিনি বলেছেন, ট্র্যাজেডি হচ্ছে নগ্ন সত্য। সাহিত্যে নগ্ন সত্যের স্থান নীচে। সাহিত্যে আমরা চাই আনন্দ—কমেডিই নির্মল আনন্দ দিতে পারে। ট্র্যাজেডি তা পারে না।

শঙ্কর ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিল, কে বললে, পারে না? তবে ট্র্যাজেডির মধ্যে আনন্দ পেতে হলে মনটাও সেই রকম হওয়া দরকার। উঁচুদরের রসিক না হলে ট্র্যাজেডির রসাস্বাদন করতে পারে না।

আসুন না আপনি একবার নীচে।

ভণ্টু, তুই একটু বস— আমি আসছি এক্ষুনি।

শঙ্কর চলিয়া গেল। ভণ্টু সাহিত্যরসের ধার ধারে না। তাহার ভয়ানক ক্ষুধা পাইয়াছিল, সে গোগ্রাসে খাইতে লাগিল। ভৃত্য যথাসময়ে চা ও কোকো আনিল। শঙ্কর কুমুদবাবুর ঘরে গিয়াছেন শুনিয়া তাহার চা-টা সেখানেই সে লইয়া গেল।

শঙ্কর ফিরিয়া আসিল প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে। আসিয়া দেখিল, ভণ্টু অকাতরে ঘুমাইতেছে। জুতাসুদ্ধ পা চেয়ারের হাতলের ওপর তুলিয়া দিয়া গুটানো বিছানাস্তূপের ওপর দেহভার রক্ষা করিয়া ভণ্টু নিদ্রিত। দক্ষিণ বাহু দিয়া মুদ্রিত চক্ষু দুইটি ঢাকিয়া অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যেও ভণ্টু ঘুমাইতেছে।

শঙ্কর খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। বেচারা! আপিসের সারাদিন-ব্যাপী হাড়ভাঙা খাটুনিতে বেচারী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অত্যন্ত ক্লান্ত না হইলে এমনভাবে কেহ ঘুমাইতে পারে না।

এই ভণ্টু ওঠ্ ওঠ্। ঘুমুচ্ছিস কেন এই অসময়ে?

ভণ্টু জুতাসুদ্ধ পা দুইটা মৃদু মৃদু নাচাইতে লাগিল। তাহার পর চোখ হইতে হাতটা সরাইয়া বলিল, ক্ষেপেছিস? ঘুমোব কেন? থিঙ্ক্ করছিলাম।

চল্, বেরুনো যাক।

চল্। বাবাজির সম্বন্ধে কি সেট্‌ল্ করলি?

চল্, রাস্তায় সব বলছি।

উভয়ে বাহির হইয়া পড়িল।

।। আট ।।

কীর্তন খুব জমিয়া উঠিয়াছিল।

ভণ্টুর মেজকাকা অর্থাৎ বাবাজি খোল বাজাইতেছিলেন। মুদিত নেত্র; তন্ময় বিহ্বল ভাব। পরিধানে গৈরিক আলখাল্লা, মাথায় অবিন্যস্ত দীর্ঘ কেশভার, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুগুম্ফ সমাচ্ছন্ন। কীর্তন জমিয়াছিল বাবাজিরই এক বন্ধুর বাড়িতে। তিনি বড়লোক এবং ভণ্টুর মেজকাকাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। পুরাকালে অর্থাৎ যখন তাঁহার রক্তের তেজ ছিল, তখন এই বাড়িতে এই হলেই বহুবার বাইনাচ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন তাঁহার ধর্মে মতি হইয়াছে এবং ধর্মকে উপলক্ষ্য করিয়া যত

প্রকার সঙ্গীত-উৎসব করা সঙ্গত, তাহাই তিনি ইদানীং করিতেছেন। অর্থাৎ আসলে ভদ্রলোক সঙ্গীত-অনুরাগী। গীতবাদ্যে পারদর্শিতার জন্যই সম্ভবত তিনি ভণ্টুর মেজকাকাকে স্নেহ করেন। যাই হোক, কীর্তন খুব জমিয়া উঠিয়াছিল। কীর্তনীয়া পুরুষ হইলেও সুদর্শন ও সুকণ্ঠ। গৌর ললাটে চন্দনের তিলক, গলায় বেলফুলের শুভ্র মালা, পরিধানে পট্টবস্ত্র—ভারি সুন্দর দেখাইতেছিল। সুরসমারোহে সকলেই সম্মোহিত হইয়া একাগ্রচিত্তে কীর্তনীয়ার মুখের পানে চাহিয়া ছিলেন। হলের মধ্যে ভীষণ ভিড়। ভণ্টু ও শঙ্কর হলের বাহিরে বারান্দায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কীর্তনের সুরে শঙ্করও কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। বারান্দার একধারে স্বল্প অন্ধকারে একটি বেঞ্চি পাতা আছে দেখিয়া শঙ্কর ধীরে ধীরে গিয়া তাহারই ওপর উপবেশন করিল। তাহা দেখিয়া ভণ্টু মৃদু হাস্য করিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল, তুইও বসে পড়লি যে রে?

শঙ্কর কোনো উত্তর দিল না।

ভণ্টু কোনো জবাব না পাইয়া হাস্য-দীপ্ত চক্ষে শঙ্করের পানে চাহিয়া পুনরায় বলিল, কি রে, তুইও লদ্‌কে গেলি নাকি?

চুপ কর, কথা বলিস না।

ভণ্টু কপাল কুঞ্চিত করিয়া কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আমি তা হলে ততক্ষণ পেছনের চাকাটায় পাম্প্‌ করে নিই। এইখানে কার একটি বাইকে পাম্প রয়েছে দেখছি, এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়, কি বলিস?

শঙ্কর কোনো উত্তর দিল না।

ভণ্টু গিয়া অসঙ্কোচে নিকটে দেওয়ালে ঠেসানো অপর একটি বাইকের পাম্প্‌টি খুলিয়া লইল ও একটি থামের গায়ে নিজের বাইকটিকে দাঁড় করাইয়া উবু হইয়া বসিয়া পাম্প্‌ করিতে লাগিয়া গেল।

সেই স্বল্পান্ধকারে বেঞ্চির ওপর বসিয়া বসিয়াই শঙ্কর কিন্তু স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। অদ্ভুত সে অনুভূতি! তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন অশ্রুর বিরাট সাগর সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে। তরঙ্গসমাকুল ফেনিল সমুদ্র, তাহাতে যেন কোটি কোটি রক্তকমল ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কি সুন্দর কমলগুলি! এক-একটি দল যেন আগুনের শিখা; ফেনিল নীল জলে গাঢ় রক্তবর্ণ অগ্নিকমলদল ফুটিয়া রহিয়াছে। মদির গন্ধে ও নিরুদ্ধ উত্তাপে বিশাল সমুদ্র উদ্বেলিত।

দেখিতে দেখিতে সমুদ্র মিলাইয়া গেল। দিগন্তপ্রসারী জনহীন প্রান্তর। মৃদু জ্যোৎস্নায় গভীর রাত্রি স্বপ্নাতুর। প্রান্তর কে যেন একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কে সে? চেনা যায় না। প্রান্তরও অদৃশ্য হইল।.....চতুর্দিকে অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে সঙ্কীর্ণ একটি গলি দেখা যাইতেছে—সঙ্কীর্ণ অন্ধকার গলি। দুই পার্শ্বে বড় বড় অট্টালিকা প্রহরীর মতো দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রহরী-পরিবেষ্টিত সঙ্কীর্ণ গলিটি আঁকিয়া বাঁকিয়া কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে কে জানে! সহসা অন্ধকার শিহরিয়া উঠিল। গলিটা কাঁদিতেছে। তাহার অবরুদ্ধ ক্রন্দনবেগে অন্ধকার গুমরাইয়া উঠিতেছে, নক্ষত্রকুল স্পন্দিত হইতেছে। কীর্তনীয়া আবেগভরে গাহিয়া চলিয়াছে—'পাষাণ হইলে ফাটিয়া যেত'।

ভণ্টুর কণ্ঠস্বরে স্বপ্নভঙ্গ হইল।

পেছনের চাকাটা একেবারে দক্‌চে গেছে, হু-হু শব্দে হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। টায়ারটা জখম হয়েছে, বুঝলি?

শঙ্কর অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, তাই নাকি, তা হলে উপায়?

প্রোটোটাইপের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই। ওরিজিনাল সম্ভবত এখন বাড়ি গেছে। এই ফাঁকে প্রোটোটাইপকে তেলিয়ে যদি কিছু হয়! চল্, তাই করা যাক। কেত্তনের এখন ঢের দেরি, বাবাজির নাগাল পাওয়া শক্ত।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, প্রোটোটাইপ কে?

আয় না তুই।

শঙ্করের মন তখনও স্বপ্নের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করে নাই। তথাপি—কিংবা হয়তো সেইজন্যই বিনা বাক্যব্যয়ে সে ভণ্টুর অনুসরণ করিল। তাহার যাইবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এই লইয়া অধিক বাঙ্নিষ্পত্তি করিতেও তাহার ইচ্ছা করিতেছিল না। তাই সে নীরবে অনেকটা যন্ত্রচালিতবৎ ভণ্টুর পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল এবং এই চলমান অবস্থাতেও তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার শরীর যেন অত্যন্ত লঘু হইয়া গিয়েছে, সে যেন বাতাসে ভর করিয়া চলিয়াছে। কিছুক্ষণ এইভাবে চলিবার পর সহসা ভণ্টুর কনুইয়ের আঘাতে তাহাকে আবার কঠিন মাটিতে নামিয়া পড়িতে হইল।

তাহারা একটা গলিতে ঢুকিয়াছিল।

ভণ্টু বলিল, দেখ্, দেখ্, ওরিজিনাল বসে আছে। মাটি করলে, দাঁড়া এইখানে একটু।

শঙ্কর ভণ্টুর তর্জনীনির্দিষ্ট স্থানটায় দেখিল, একটা সাইকেলের দোকান রহিয়াছে এবং দোকানের সম্মুখভাগে এক কোণে চেয়ারে এক ব্যক্তি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ভদ্রলোকের পরিধানে একটি টাইট-ফিটিং গলাবন্ধ চকোলেট রঙের সোয়েটার এবং খাকি হাফপ্যান্ট। পায়ে আজানু কপিশবর্ণের গরম মোজা এবং মস্তকে কান-ঢাকা কালো টুপি। ভদ্রলোক চেয়ারে বসিয়া গড়গড়া হইতে ধূম্রপান করিতেছিলেন। ভণ্টু চুপিচুপি বলিল, ইনিই হচ্ছেন ওরিজিনাল মিস্টার ফাইভ।

মিস্টার ফাইভ? সাহেব নাকি?

বেনে। থাম্, একটু বসা যাক এখানে কোথাও। ওরিজিনাল বাড়ি না গেলে সুবিধে হবে না। প্রোটোটাইপ এলেই ওরিজিনাল খসবে—আসবার সময় হয়ে গেছে অলরেডি।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল।

ভণ্টু পুনরায় বলিল, প্রোটোটাইপ আসেনি বলে ওরিজিনাল রেগে টঙ হয়ে বসে তামাক খাচ্ছে। কি রকম নাক দিয়ে ভরভর ধোঁয়া ছাড়ছে, দেখ্ দেখ্—

শঙ্কর দেখিল।

ভণ্টু আবার বলিল, দেরি আছে দেখছি, প্রোটোটাইপ ডুব মেরেছে আজ। একটু বসতে হবে এখানে কোথাও।

নিকটেই একটি চায়ের দোকান ছিল। ভণ্টু বাইকটা ঠেলিয়া লইয়া সেই দিকেই অগ্রসর হইল। শঙ্করও পিছনে পিছনে গেল। চায়ের দোকানে খরিদ্দার কেহ ছিল না। যিনি দোকানের মালিক, তিনি এক কোণে চেয়ারের ওপর উবু হইয়া বসিয়া অপর একজন ওয়েস্ট্কোট-পরিহিত ব্যক্তির সহিত তন্ময় হইয়া পাশা খেলিতেছিলেন। দুইজনের মধ্যে একটা অয়েলক্লথ-পাতা টেবিল প্রসারিত। ভণ্টু রাস্তার ওপর দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ এই দৃশ্য দেখিল, তাহার পর বলিল, আসতে পারি দাদা?

কোনো উত্তর আসিল না।

ভণ্টু তখন বাইকের ঘণ্টা বাজাইয়া তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিল।

কচে বারো।—বলিয়া ভদ্রলোক ভণ্টুর দিকে তাকাইলেন। তাকাইবামাত্র ভণ্টু সহাস্যমুখে আবার বলিল, আসতে পারি দাদা?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুন আসুন—কি চান আপনারা?

এই যে আসি, এসে বলছি।

ভণ্টু বাইকটি সযত্নে দেওয়ালে ঠেসাইয়া রাখিল এবং শঙ্করকে চোখের ইঙ্গিত করিয়া ডাকিয়া বলিল, চল্, একটু বসা যাক।

ভণ্টু ভিতরে প্রবেশ করিয়া সর্বাগ্রে ভদ্রলোকের পদধূলি লইয়া মাথায় দিল। ভদ্রলোক ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

করেন কি, করেন কি মশায় আপনি—

ভণ্টু হাত দুইটি জোড় করিয়া সহাস্যমুখে বলিল, অগ্রজ আপনি—

বসুন বসুন, কি চান আপনারা?

একটু বসতে চাই শুধু দাদা, চা কিন্তু খাব না, পয়সা নেই। একজনের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে খানিকক্ষণ, যদি বসতে দেন একটু দয়া করে—

ছ-তিন নয়।

ওয়েস্টকোট-পরা ভদ্রলোকটি দান ফেলিলেন এবং চকিতে এই আগন্তুকদ্বয়কে একনজরে দেখিয়া লইয়া আবার পাশার ছকে মন দিলেন।

বেশ তো, বসুন না ওধারের বেঞ্চিটায়।

শঙ্কর বলিল, চা-ই দিন আমাদের, কাছে পয়সা আছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, খান না চা, পয়সার জন্যে কিছু আসছে যাচ্ছে না। এই চায়ের জন্যই সর্বস্বান্ত হয়েছি মশায়, পয়সার দিকে দেখলে আজ এমন অবস্থা হত না আমার, কি বল মাস্টের?

ওয়েস্টকোট-পরিহিত ভদ্রলোক এতদুত্তরে কেবল বলিলেন, হ্যাঁ!

ওরে কেলো, চা দিয়ে যা। তুমি খাবে নাকি আর এক কাপ মাস্টের?

মাস্টার দক্ষিণ তর্জনীটি দক্ষিণ কর্ণে ঢুকাইয়া মুখবিকৃত করিয়া সজোরে বেশ খানিকক্ষণ কর্ণ-কণ্ডুয়ন করিয়া লইলেন। তাহার পর ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন, দাও, আর একবার ইস্‌টিম করে নেওয়াই যাক।

ভণ্টু ও শঙ্কর একটু দূরে একটি বেঞ্চিতে উপবেশন করিয়াছিল। ভণ্টু এমন স্থানটিতে বসিয়াছিল, যেখান হইতে ওরিজিনালকে বেশ দেখা যায়।

দোকানের মালিক আবার হাঁকিলেন, ওরে কেলো, তিন কাপ চা দিয়ে যা,—আচ্ছা, চার কাপই আন, আমিও খাই আর এক কাপ, কি বল মাস্টের?

মাস্টার নীরবে সম্মুখের দন্তগুলি বিকশিত করিলেন।

এই চায়ের জন্যেই সর্বস্বান্ত হয়েছি মশায়, বুঝলেন, চা-কে আমি খেয়েছি, চা-ও আমাকে খেয়েছে।

ভণ্টু এই কথা শুনিয়া সস্মিতমুখে তাঁহার পানে চাহিয়া তাহার পর বলিল, এ আর নতুন

কথা কি শোনলেন দাদা? ভাল লোকের দুর্দশা চিরকালই। মহাভারতের আমল থেকে এ ঘটনা ঘটে আসছে। হাতটা একবার দেখাবেন দয়া করে?

হাত দেখতে জানেন নাকি আপনি?

যৎসামান্য।

তবে আপনি তো গুণী লোক মশায়।

পাশা ফেলিয়া দোকানের মালিক করতল প্রসারিত করিয়া ভণ্টুর নিকট আসিয়া বসিলেন। ওয়েস্টকোট-পরিহিত মাস্টার জমাটি খেলাটি এই ভাবে পণ্ড হইয়া যাইতে দেখিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং বলিলেন, তুমি আবার নতুন হুজুগে মাতলে দেখছি! আশ্চর্য লোক বটে তুমি।

কেহ ইহার কোনো উত্তর দিল না। ভণ্টু ভদ্রলোকের দক্ষিণ করতলটি লইয়া তাহাতে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়াছিল, কেলো নামক ভৃত্যটি ভিতরের একটি ঘর হইতে বাহির হইয়া চা দিয়া গেল।

সকলেই নীরবে চা পান করিতে লাগিলেন। ভণ্টু ও দোকানের মালিক ভদ্রলোক বাঁ হাতে চায়ের পেয়ালা ধরিয়া মাঝে মাঝে চুমুক দিতে দিতে করকোষ্ঠী ব্যাপারে নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। ওয়েস্টকোট-পরিহিত মাস্টার ডিশে ঢালিয়া ঢালিয়া অল্প সময়েই চাটুকু নিঃশেষ করিলেন। তাহার পর পকেট হইতে একটি মরিচা-ধরা কৌটা বাহির করিয়া তন্মধ্যস্থ অর্ধদগ্ধ সিগারেটটি অতি নিপুণতার সহিত ধরাইয়া বেশ জুত করিয়া বসিলেন এবং মুখের এমন একটা ভাব করিয়া ভণ্টু ও দোকানের মালিক ভদ্রলোকের দিকে তাকাইতে লাগিলেন যে, যেন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি দুইজন শিশুর ছেলেমানুষি কাণ্ডকারখানা নিরুপায় হইয়া সহ্য করিতেছেন এবং উপভোগও করিতেছেন।

কীর্তন শুনিয়া অবধি শঙ্করের মনটা কেমন যেন হইয়া গিয়াছিল, সে এসব কিছুই লক্ষ্য করিতেছিল না। সে অন্যমনস্কভাবে চা খাইতে খাইতে বাহিরে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া ভণ্টু অবশেষে দোকানের মালিক ভদ্রলোকের করতলটি ছাড়িয়া দিল এবং বামহস্তধৃত পেয়ালা হইতে বাকি চাটুকু পান করিয়া ফেলিল।

কি দেখলেন মশাই?

ভণ্টু কোনোও উত্তর না দিয়া পকেট হইতে একটি অত্যন্ত মলিন রুমাল বাহির করিয়া নির্বিকারচিত্তে মুখটি মুছিল এবং তাহার পর বলিল, যা দেখলাম, তাতে আপনার পায়ের ধুলো আর একবার নিতে হবে। এর বেশি আর কিছু বলব না এখন।—বলিয়া সে সত্যসত্যই আর একবার চট্ করিয়া তাঁহার পদধূলি লইল। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া লইলেন।

আহা, কি যে করেন আপনি খালি খালি। কি দেখলেন তাই বলুন?

কিছু বলব না দাদা, খালি পায়ের ধুলো নেব। শঙ্কর, পায়ের ধুলো নে এঁর—সঙিন ব্যাপার!

শঙ্কর মৃদু হাসিল। দোকানের মালিক ভদ্রলোক ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, আচ্ছা লোক তো আপনি মশায়!

ভণ্টু স্মিতমুখে বলিল, কিছু বলতে হবে না, হদিস পেয়ে গেছি দাদা আপনার। এখন মাঝে মাঝে এসে জ্বালাতন করব আপনাকে। আজ সময় কম।

ভণ্টু দাঁড়াইয়া উঠিল এবং মৃদুস্বরে শঙ্করকে বলিল, প্রোটোটাইপ এসে গেছে, ওঠ্।

শঙ্কর চায়ের দাম বাহির করিয়া দিতে গেলে দোকানি ভদ্রলোক নমস্কার করিয়া হাসিমুখে বলিলেন, মাপ করবেন, আপনাদের চা তো আমি বিক্রি করিনি। মনে রাখবেন অধীনকে, তা হলেই যথেষ্ট।

ভণ্টু হাসিয়া বলিল, হাত দেখেই সে বুঝেছি।

ভণ্টু ও শঙ্কর দোকান হইতে নামিয়া পড়িল। ভণ্টু স্মিতমুখে ওয়েস্টকোট-পরিহিত ভদ্রলোকের উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া বলিল, আপনাকে আর একদিন এসে চাঙাব দাদা, আজ সময় বড় কম।

নিশ্চয়, নিশ্চয়!—তিনিও প্রতিনমস্কার করিলেন।

শঙ্কর ও ভণ্টু বাইকের দোকানের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ভণ্টু বলিল, থাম্।

বাইকের দোকানের সন্নিহিত একটি স্বল্পান্ধকার স্থানে উভয়ে থামিল। শঙ্কর দেখিল, একটি যুবক দোকানে আসিয়াছে এবং ভণ্টু যাহাকে ওরিজিনাল নামে অভিহিত করিয়াছিল, তিনি যুবকটিকে উচ্চকণ্ঠে ভর্ৎসনা করিতেছেন।

সমস্ত বিকেলটা পার করে দিয়ে এলে, অথচ একটা পয়সা আদায় হয়নি—কি রকম? তাগাদায় বেরিয়েছিলে, না, আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছিলে? পাশের বাড়ি এক গাইয়ে মেয়ে জুটেছে, সে তো তোমার মাথাটি খেলে দেখছি! মৃগেনবাবুর ওখানে কি বললে? আজ তো তার দেবার কথা।

যুবক অপ্রতিভ হইয়া আড়চোখে চাহিতে চাহিতে উত্তর দিল, বাড়ি ছিলেন না।

বাড়িতে জনপ্রাণী কেউ ছিল না?

কেউ সাড়া তো দিলে না, অনেকক্ষণ কড়া-নাড়ানাড়ি করলাম।

ভূতের কাছে মাম্‌দোবাজি! দাও, বিলটা আমাকে দাও, ফেরবার মুখে দেখি যদি ধরতে পারি। স্পষ্ট কথাটি হচ্ছে, কোনো কাজেরই তুমি নও বাবা, বি. এ. পাস করলে কি হবে? ফিনফিনে জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়েছ কেন এই শীতে? সোয়েটার কোথা? ঠাণ্ডা লাগিয়ে আবার একটা অসুখ বাধাও, কিছু টাকা লম্বা হয়ে যাক আমার। সোয়েটার কোথা?

এইখানে আছে।

গায়ে দাও দয়া করে সোয়েটারটি। আর এই নাও, এই টুপিটাও পর, বেশ করে কান-টান ঢেকে-ঢুকে বস। দশটার আগে দোকান বন্ধ করো না যেন—বলিয়া ওরিজিনাল মঙ্কিক্যাপটি খুলিয়া ফেলিলেন।

ভণ্টু শঙ্করের কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপিচুপি বলিল, ঘোর জালে পড়েছে প্রোটাটাইপ। দেখ্ দেখ্, মিস্টার ফাইভকে দেখ্ এইবার।

শঙ্কর দেখিল, টুপি খুলিয়া ফেলাতে ওরিজিনালের অনাবৃত মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ দেখা যাইতেছে। মুখখানির বিশেষত্ব আছে। দেখিতে ঠিক বাংলা পাঁচের মতো। কিছু গোঁফদাড়িও আছে। শঙ্কর ইহাও লক্ষ্য করিল যে যুবকটির মুখও ওরিজিনালের অনুরূপ, কেবল গোঁফদাড়ি নাই।

ভণ্টু চুপিচুপি আবার বলিল, মিলিয়ে দেখ্ ওরিজিনাল আর প্রোটোটাইপ পাশাপাশি রয়েছে— দেখ্, দেখ্, ভাল করে দেখ্ না রাসকেল।

ভণ্টু শঙ্করকে একটা খোঁচা মারিল।

ওরিজিনাল বলিতেছেন শোনা গেল, দাও, আমার সাইকেলটা দাও, মৃগেনবাবুর বিলটাও দাও, দেখি যদি ব্যাটার নাগাল পাই।

প্রোটোটাইপ একটি সেকেলে ধরনের বাইক বাহির করিল এবং তদুপরি আরোহণ করিতে করিতে ওরিজিনাল পুনরায় প্রোটোটাইপকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিলেন।

তোমার একে কোফো ধাত, ঠাণ্ডা লাগিও না যেন, সোয়েটার আর টুপিটা পরে ফেল। যাই, দেখি মৃগেনবাবুকে যদি ধরতে পারি।

ওরিজিনাল চলিয়া গেলে শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, প্রোটোটাইপ ওরিজিনালের কে হয়?

ছেলে। আয়, এইবার যাওয়া যাক—কোস্ট্ ইজ ক্লিয়ার।

উভয়ে আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া বাইকের দোকানের সম্মুখবর্তী হইল। ভণ্টুকে দেখিবামাত্র প্রোটোটাইপ নমস্কার করিল এবং হাস্যমুখে প্রশ্ন করিল, সেদিন আপনি কোথায় চলে গেলেন ভণ্টুবাবু? আমি রাশিচক্রের ছকটা টুকে নিয়ে এসে প্রায় রাত দশটা পর্যন্ত আপনার অপেক্ষায় বসেছিলাম। কোথায় গেলেন বলুন তো, অবশ্য বলতে যদি বাধা না থাকে?

ভণ্টু হাস্য-স্নিগ্ধ মুখে কেবল তাহার দিকে একবার চাহিয়া বাইকটা ঠেসাইয়া রাখিল।

প্রোটোটাইপ আবার বলিল, কোথা গেলেন সেদিন বলুন দেখি, অবশ্য বলতে যদি বাধা না থাকে?

সব বলছি। ওই টিনের চেয়ারটা নাবান তো আগে।—বলিয়া ভণ্টু দোকানের অভ্যন্তরস্থ একটি টিনের চেয়ারের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

হ্যাঁ, এই যে।

প্রোটোটাইপ নানাভাবে জখম নানাবিধ বাইকের জঙ্গলের ভিতর হইতে টিনের চেয়ারটি বাহির করিয়া ভণ্টুর হাতে দিল। ভণ্টু সেটি ফুটপাতে পাতিয়া দিয়া শঙ্করকে বলিল, বস্ তুই। শঙ্কর বসিল। দোকানের ভিতরে এক কোণে একটা ময়লা চট পাতা ছিল, ভণ্টু তাহাতেই বেশ জমায়েত হইয়া বসিল এবং তাহার বুকখোলা জামার ভিতরের পকেট হইতে একটি ছোট নোটবুক বাহির করিয়া বলিল, কই, দেখি রাশিচক্রটা!

প্রোটোটাইপ কোমর হইতে চাবি বাহির করিয়া একটি টিনের বাক্স খুলিল এবং এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া ভণ্টুর হাতে দিল। উহাতেই রাশিচক্র টোকা ছিল। ভণ্টু কাগজখানি লইয়া একাগ্র দৃষ্টিতে সেটির দিকে তাকাইয়া রহিল এবং তৎপরে তাহা নোটবুকে টুকিয়া লইয়া বলিল, জটিল ব্যাপার দেখছি। এ বক্‌সি মশায়ের কাছে না গেলে হবে না। আমি বক্‌সি মশায়ের কাছে যাব ভাবছিলাম আজই, কিন্তু বাইকের পেছনের চাকাটা একেবারে দক্‌চে গেছে। রাম দক্‌চান দক্‌চেছে।

বাইক ঠিক করে দিচ্ছি আপনার, ভয় কি! কি হল বাইকের?

ভণ্টু হাসিয়া বলিল, কিন্তু আমাকে ঠেঙালেও আজ পয়সা বেরুবে না।

প্রোটোটাইপ আহত আত্মমর্যাদার সুরে বলিল, আপনার সঙ্গে কি আমার খদ্দের-দোকানি সম্পর্ক? কেবল দেখবেন, বাবা না জানতে পারেন—বাস্! জানেন তো সবই।

ভণ্টু কিছু না বলিয়া সহাস্যদৃষ্টি মেলিয়া প্রোটোটাইপের দিকে চাহিয়া রহিল।

দাঁড়ান, সোয়েটারটা পরে নিই আগে। তারপর আপনার বাইক ঠিক করে দিচ্ছি এক্ষুনি। ওরে মট্‌রা, বাইকটা তোল্ তো।

আড়ময়লা ফতুয়া ও লুঙ্গি পরা একটি ছোকরা বিড়ি টানিতে টানিতে পিছনেব একটি ঘর হইতে বাহির হইল এবং ভণ্টুর প্রতি একটা অপ্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, এ সব মেরামতির কাজ সকালের দিকে আনলেই সুবিধা হয় বাবু, বুঝলেন? মিসিনারির কাজ—

ভণ্টু কিছু না বলিয়া স্মিতমুখে চাহিয়া রহিল।

প্রোটোটাইপ ধমক দিয়া উঠিল।

তুই বাজে কথা ছেড়ে যা বলছি কর দিকিন—তোল্ বাইকটা।

বিড়িটাতে শেষ টান দিয়া মট্‌রা সেটা দূরে ফেলিয়া দিল, এবং অস্ফুটস্বরে গজর গজব করিতে করিতে বাইকটা তুলিয়া ফেলিল। প্রোটোটাইপ বাইকটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল।

শঙ্কর বলিল, চল্ না, ততক্ষণ আমরা মেজকাকার ব্যাপারটা সেরে আসি। কীর্তন শেষ হয়ে গেছে এতক্ষণ।

ভণ্টু প্রোটোটাইপের দিকে মিটিমিটি চাহিয়া বলিল, লক্ষ্মণবাবু রাজি হলেই যেতে পারি, উনিই এখন মালিক।

লক্ষ্মণবাবু অর্থাৎ প্রোটোটাইপ এই কথায় অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিল, কি যে বলেন আপনি ভণ্টুবাবু! কোথা যাবেন এখন আবার, অবশ্য বলতে যদি বাধা না থাকে?

ইহাতে ভণ্টু এমন একটা মুখভাব করিয়া শঙ্করের দিকে চাহিল, যেন মেজকাকার সহিত দেখা করাটা শঙ্করেরই প্রয়োজন এবং ভণ্টুকে বাধ্য হইয়া তাহার সহিত যাইতে হইবে।

শঙ্কর লক্ষ্মণবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, আমরা এক্ষুনি ফিরে আসছি,—বাইকটা ততক্ষণ সারা হোক। আয় ভণ্টু।

ভণ্টু করজোড়ে লক্ষ্মণবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, অনুমতি দিচ্ছেন তো? এ ছোকরা কিছুতেই ছাড়বে না।

সম্পূর্ণরূপে অপ্রতিভ হইয়া লক্ষ্মণবাবু বলিল, মানে? নিশ্চয়ই। তবে সেদিনকার মতন আবার করবেন না যেন, আসা চাই।

বাইক জামিন রহিল।

একবার তো বাইক ফেলে পালিয়েছিলেন। বাবার কাছে নানারকম মিথ্যে কথা বলে শেষটা নিস্তার পাই সেদিন।

না, ঠিক আসব।

ভণ্টু ও শঙ্কর মেজকাকাব উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। পথে যাইতে যাইতে ভণ্টু অযাচিতভাবেই ওরিজিনাল ও প্রোটোটাইপের কাহিনী শঙ্করকে শুনাইতে লাগিল। ওরিজিনালের নাম দশরথ। দশরথের দুই পুত্র—রাম ও লক্ষ্মণ। রাম মারা গিয়াছে, নিমোনিয়া হইয়াছিল। স্ত্রী বহু আগে মারা গিয়াছেন। লক্ষ্মণই এখন ওরিজিনালের সবেধন নীলমণি। ওরিজিনাল টাকার

কুম্ভীর। বাইকের দোকান আছে, মহাজনী কারবার আছে, কলিকাতায় দুইখানি বাড়ি আছে, ব্যাঙ্কে বেশ কিছু নগদ টাকাও আছে। তথাপি ওরিজিনালের এক পয়সা বাপ মা। এদিকে প্রোটোটাইপ অন্য প্রকৃতির। কৃপণ তো নয়ই—রসিক। পাশের বাড়ির একটি মেয়ের প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়াছে। কিন্তু জ্যোতিষে অগাধ বিশ্বাস থাকায় গোপনে মেয়েটির কোষ্ঠী সংগ্রহ করিয়াছে। মেয়েটির সহিত যদি প্রোটোটাইপের কোষ্ঠীর মিল হয়, তাহা হইলে প্রণয়-ব্যাপারে নিশ্চিন্ত মনে অগ্রসর হইবে এবং ওরিজিনালের নিকট কাহারো মারফত প্রস্তাবটা করিবে। ওরিজিনালও কোষ্ঠী পাগল লোক। সুতরাং কোষ্ঠীর মিল সর্বাগ্রে দরকার। কোষ্ঠীর মিল না হইলেই সর্বনাশ। তখন যে প্রোটোটাইপ কি করিবে, তাহা ভণ্টুর কল্পনাতীত।

গলিটা হইতে বাহির হইয়া শুনিতে পাইল, কীর্তন চলিতেছে। একটু কাছাকাছি যাইতেই শঙ্কর শুনিতে পাইল—'রসভরে দুঁহুঁ তনু থরথর কাঁপই'। আর একটু কাছে যাইতেই তাহারা দেখিতে পাইল, ভণ্টুর মেজকাকা বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন, অপর একজন খোল ধরিয়াছেন।

ভণ্টু কাছে গিয়া বলিল, মেজকাকা, শঙ্কর এসেছে।

শঙ্কর? কই, এই যে, এস এস এস।

মেজকাকা শঙ্করকে দুই হাত দিয়া বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। তাহার পর বলিলেন, ভিতরে বসবে নাকি তোমরা? বসিয়ে দেব?

শঙ্কর বলিল, না থাক। আমাকে আবার এক্ষুনি হস্টেলে ফিরতে হবে। তার চেয়ে আপনার সঙ্গে চলুন একটু গল্প করা যাক্, অনেক ঘুরে এলেন আপনি।

বেশ বেশ বেশ—চল, তাই চল। ও-দিককার ঘরটায় যাওয়া যাক, চল তা হলে।

শঙ্কর ও ভণ্টুকে সঙ্গে লইয়া তিনি পিছন দিকে একটা ঘরে গেলেন। ঘরের ভিতর একটি প্রকাণ্ড চৌকিতে ফরসা চাদর বিছানো ছিল। তিনজনে গিয়া তাহাতেই বসিলেন। ভণ্টু কপাটটা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিল।

মেজকাকা সহাস্যে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিতেই ভণ্টুও হাসিমুখে বলিল, আসুন নিরিবিলিতে একটু লদ্‌কালদ্‌কি করা যাক। শঙ্কর এসেছে—

মেজকাকা শঙ্করের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন এবং তাহার পর বলিলেন, ভণ্টুটা চিরকালই একরকম রইল। ওর শিশুত্ব আর ঘুচল না, কি বল?

শঙ্কর বলিল, কিন্তু ও হঠাৎ পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে বসে আছে, এটা তো ঠিক নয়।

না না না, পড়তে হবে ওকে। আমরা অর্থাভাবে পড়তে পাইনি; ভণ্টুকে কিন্তু পড়তে হবে। সেটি হবে না—বলিয়া মেজকাকা চক্ষু বুজিয়া কি যেন প্রণিধান করিতে লাগিলেন। 'অর্থাভাবে পড়তে পাইনি' কথাটা অবশ্য সত্য নয়—মেজকাকা খেয়ালবশত পড়াশুনা ছাড়িয়াছিলেন। সে যাই হোক, খানিক চক্ষু বুজিয়া থাকিবার পর পুনরায় মেজকাকা চাহিলেন এবং বলিলেন, ঠাকুর বলেন—অশিক্ষিত পুরুষ এবং বিধবা নারী সমান দুর্ভাগা। দুইজনেরই জীবনের সম্ভাবনা ছিল অনেক, কিন্তু হল না কিছুই। এ যেন প্রদীপে তেল সলতে সবই রয়েছে, কেবল শিখাটি কেউ জ্বালিয়ে দিলে না। নাঃ, ওসব কাজের কথা নয়, ভণ্টুকে পড়তে হবে। ভণ্টু কালই তুমি কলেজে ভর্তি হয়ে যাও।

ভণ্টু সহাস্যমুখে প্রশ্ন করিল, কিন্তু রুগির?

ওসব নিয়ে তুমি মাথা ঘামাবে কেন? সে দায়িত্ব আমাদের। কি বল শঙ্কর?

শঙ্কর সম্মতিসূচক মাথা নাড়িল।

তাহার পর বলিল, আপনি কি তা হলে আবার চাকরি নেবেন?

দেখি, তাই বোধহয় নিতে হবে শেষ পর্যন্ত। কর্মের বন্ধন ইচ্ছা করলেই তো আর ছিন্ন করা যায় না। বিষ্টুর অসুখ হয়েই মুশকিল হয়ে পড়েছে। অসুখ হবে না? ব্রহ্মচর্যই হল স্বাস্থ্যের ভিত্তি। বউমাই অন্তঃসারশূন্য করে ফেললেন বিষ্টুকে।—বলিয়া মেজকাকা সহসা গম্ভীর হইয়া গেলেন এবং চক্ষু বুজিয়া বাম হস্তের অঙ্গুলিগুলি কুঞ্চিত শ্মশ্রুরাজির মধ্যে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। শঙ্কর ও ভণ্টু নীরব হইয়া রহিল। ভণ্টু পিছন দিকে বসিয়াছিল, সে একবার ওষ্ঠভঙ্গি করিয়া মেজকাকাকে ভ্যাঙাইল।

কিছুক্ষণ পরে মেজকাকা চক্ষু খুলিয়া চাহিলেন এবং বলিলেন নাঃ, ভণ্টুর জন্যেই আমাকে শেষকালে চাকরি নিতে হবে। ওর পড়া বন্ধ হতে দিতে পারি না আমি। আবার তিনি চক্ষু বুজিলেন ও দাড়ির ভিতর আঙুল চালাইতে লাগিলেন। শঙ্কর বলিল, আমি আজ বোস সাহেবের বাড়ি গিয়েছিলাম। কথায় কথায় আপনার চাকরির কথা উঠল, বোস সাহেব বললেন—কিছুদিন পরে কয়েকজনকে নেওয়া হবে। কিন্তু তার জন্যে একটা কম্‌পিটিটিভ পরীক্ষা দিতে হবে। সে কি সুবিধে হবে আপনার?

ভণ্টু সহাস্যে বলিল, শুনলেন মেজকাকা শঙ্করের কথা? ও আপনাকে পরীক্ষার ভয় দেখাতে চায়।

মেজকাকা কিছু না বলিয়া দাড়িতে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কহিলেন, পরীক্ষার জন্যে ভাবি না, পরীক্ষা অনেক দিয়েছি, আরও দিতে হবে। সমস্ত জীবনটাই পরীক্ষা। পরীক্ষার ফলাফল ঠাকুরের হাতে। না, আমি পরীক্ষার জন্যে ভাবছি না, আমি ভাবছি ঠাকুরের কথা। চাকরি যদি নিতে হয়, তা হলে ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে নিতে হবে। তিনি এখন অনুমতি দেবেন কি না—সেইটে হল সমস্যা। এমনিই তো তাঁর বিনা অনুমতিতে এখানে এসেছি—থাকবার কথা আমার কাশিতে।

শঙ্কর বলিল, চিঠি লিখুন না একটা তাঁকে, কোথায় আছেন তিনি আজকাল?

ভণ্টু বলিল, শুনছেন মেজকাকা, শঙ্করের কথা? ঠাকুরকে চিঠি লিখে অনুমতি নিতে বলছে! ষাঁড়ের গোবর কি গাছে ফলে? ঠাকুর কি আপিসের বড়বাবু নাকি যে, করেস্‌পন্ডেন্স্‌ করলে জবাব পাওয়া যাবে! কি সুডোল গাড়োল রে তুই!

মেজকাকা একটু উচ্চাঙ্গের হাস্য করিয়া বলিলেন, আহা, সে শঙ্কর জানবে কি করে?

তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, না ভাই, চিঠিপত্র লিখলে কাজ হবে না। তিনি সন্ন্যাসী মানুষ, কোথায় পাবেন কাগজ দোয়াত কলম—তাঁর কাছে নিজেই যেতে হবে। কিন্তু তাঁকে ধরাই শক্ত। চল না সবাই মিলে যাই একদিন—আলাপও হয়ে যাবে। ভণ্টুও ঠাকুরকে দেখেনি এখনও। ভণ্টুকে দেখলে আর ভণ্টুর কথা শুনলে ঠিক অনুমতি দেবেন উনি।

ভণ্টু বলিল, আসছে শনিবার চলুন তা হলে, সোমবারও ছুটি আছে। কোথায় আছেন তিনি?

মেজকাকা উত্তর দিলেন, ভাগলপুরে।

ভণ্টু বলিল, শঙ্কর, যাবি? চল্‌ না, ঘুরে আসি।

এমন সময় হঠাৎ কে বাহির হইতে কপাটে জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগিল। কপাট

খুলিয়া দিতেই একজন ভদ্রলোক ব্যস্ত-সমস্তভাবে প্রবেশ করিয়া মেজকাকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, একবার আসুন তো, মৃন্ময়বাবু মূর্ছা গেছেন হঠাৎ কীর্তন শুনতে শুনতে।

ভণ্টু বলিয়া উঠিল, কে, মোমবাতি? সে কি কেত্তন শুনছিল নাকি এখানে বসে?

মেজকাকা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। বলিলেন, হ্যাঁ, সে তো সন্ধে থেকেই এসে বসেছে।

সকলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। ভণ্টু দেখিল, মোমবাতিই মূর্ছা গিয়াছে। তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, দৃঢ়নিবদ্ধ অধর দুইটিও মাঝে মাঝে কাঁপিতেছে। চক্ষু দুইটি মুদ্রিত।

মেজকাকা বলিলেন, ও কিছু নয়, ভাব লেগে গেছে, মুখে চোখে জল দিলেই এখনই ঠিক হয়ে যাবে।

তাহাই করা হইতে লাগিল।

একটু পরে শঙ্কর বলিল, আমাকে এইবার ফিরতে হবে, আটটা বেজে গেছে।

প্রোটোটাইপের ওখানে যাবি না?

না ভাই, আজ আর সময় নেই।

আমাকে কিন্তু যেতে হবে, তার আগে মোমবাতিটার একটা হিল্লে করতে হবে আমায়। রাস্কেলটার কাণ্ড দেখেছিস, আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসে কেত্তন শুনছিল! চল্ তোকে একটু এগিয়ে দিই।

পথে বাহির হইয়া ভণ্টু আবার বলিল, বাবাজিকে আর ঠাকুরের কাছে যেতে দেওয়া নয়, দেখা হলেই আবার ডুব মারবে। ক্ষেপেছিস দুই! অনুমতি-টনুমতি বাজে ওজর।

শঙ্কর কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল।

বলিল, আমি চলি ভাই এখন।

আচ্ছ, যা।

যদিও হস্টেলে ফিরিবার সময় হইয়াছিল, কিন্তু কিছুদূর গিয়াই শঙ্কর ঠিক করিয়া ফেলিল যে, এখন তাহার হস্টেলে ফেরা চলিবে না। তাহাকে একবার শৈলর সহিত দেখা করিতেই হইবে। সকালে অমন করিয়া চলিয়া আসাটা ঠিক হয় নাই। সে দ্রুতবেগে বোস সাহেবের বাড়ির দিকে চলিল। অনেকক্ষণ হাঁটিবার পর বোস সাহেবের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া সে ভাবিতে লাগিল, এই অসময়েও সে গিয়া শৈলকে প্রথমেই এক কাপ চা করিতে ফরমাশ করিবে। দোকানের চা-টা তেমন সুবিধার হয় নাই। তাহা ছাড়া শৈলকে খুশি করিবার সহজ উপায়ই হইতেছে এই—তাহাকে নানা ফরমাশে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলা। শৈল গনগন করিবে, উপদেশ দিবে, নানা অসুবিধার উল্লেখ করিবে; কিন্তু চা-টুকু শেষ পর্যন্ত করিয়া দিয়া মনে মনে পুলকিত হইয়া উঠিবে। ইহাই তাহার স্বভাব। শঙ্কর ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিল, শুধু চা নয়, শৈলকে দিয়া প্রস্তুত করাইয়া কিছু খাবারও খাইতে হইবে। ছেলেবেলার কথা তাহার মনে পড়িল। মিত্তির-বাড়ির উঠানে একটা পেয়ারা গাছ ছিল। মিত্তির বাড়িতে শৈলর যতটা অবাধ গতিবিধি ছিল, অপর কাহারও ততটা ছিল না। শৈলর মধ্যস্থতায় অনেকেই সেই পেয়ারা ভক্ষণ করিত। শৈলকে মিত্তির-বাড়ির পেয়ারা আনিয়া দিতে বলিলে, সে ঝঙ্কার দিয়া উঠিত বটে, কিন্তু মনে মনে খুশি হইত এবং নানা কৌশলে পেয়ারা চুরি করিয়া আনিয়া দিত। শৈলর সেই স্বভাব আজও বদলায় নাই। তাহাকে গিয়াই চা ও মোহনভোগের ফরমাস করিতে হইবে।

হঠাৎ একটা মোটর হর্নের চিৎকারে শঙ্কর সচকিত হইয়া উঠিল। দেখিল, বোস সাহেবেরই মোটর! মোটরখানা তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। শঙ্কর দেখিল, বোস সাহেব নিজেই ড্রাইভ করিতেছেন, পাশে সুসজ্জিতা শৈল বসিয়া আছে। শঙ্কর বিমূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া রহিল।

হস্টেলে ফিরিয়া শঙ্কর তিনখানি পত্র পাইল।

একখানি বাবার—মায়ের পাগলামি অত্যন্ত বাড়িয়াছে। একখানি মিষ্টিদিদির—আবার নিমন্ত্রণ। আর একখানি সুরমা বম্বে হইতে লিখিয়াছে—রহস্যময় পত্র।

॥ নয় ॥

শিয়ালদহ অঞ্চলে গলির মধ্যে ছোট একটি বাসা। সেই বাসার ক্ষুদ্র একটি ঘরে মৃন্ময় মুখোপাধ্যায় ওরফে মোমবাতি নিবিষ্ট চিত্তে একখানি পত্র লিখিতেছিল। ঘরটিতে আসবাবপত্রের মধ্যে ছোট একখানি সেক্রেটারিয়েট টেবিল, একটি দেওয়াল ঘড়ি, একখানি চেয়ার এবং কাছেই একটি রিভল্ভিং বুকশেল্ফ রহিয়াছে। টেবিলের ওপর একটি ইলেকট্রিক আলো। আলোর ডোমটি গাঢ় রক্তবর্ণ, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, যেন একটা প্রকাণ্ড রক্তজবা বাঁকা বৃন্তের ওপর বিদ্যুতায়িত হইয়া উঠিয়াছে। রঙিন চিঠির কাগজে গভীর মনোনিবেশ সহকারে মৃন্ময় যে পত্রখানি লিখিতেছিল, তাহা এই—

প্রিয়তমাসু,

কাল নানা গোলমালের মধ্যে ছিলাম বলিয়া তোমাকে চিঠি লিখিতে পারি নাই। লক্ষ্মীটি, তুমি রাগ করিও না। কাল এক জায়গায় কীর্তন শুনিতে গিয়াছিলাম। শুনিতে শুনিতে এমন আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, শেষ পর্যন্ত আমি মূর্ছা যাই। রাধাকৃষ্ণের চিরন্তর বিরহ-কাহিনীর মধ্যে আমি তোমারই গভীর বেদনা অনুভব করিতেছিলাম। আমার মনে হইতেছিল, যেন কীর্তনীয়ার কণ্ঠে রাধার জবানিতে তোমারই অন্তরের আকুলতা তুমি নিবেদন করিতেছ। সে নিবেদন এত করুণ, এত মর্মস্পর্শী যে, আমি নিজেকে ঠিক রাখিতে পারি নাই, জ্ঞান হারাইয়াছিলাম। জ্ঞান হইলে দেখিলাম, ভণ্টু আমাকে শুশ্রূষা করিতেছে। সে-ই আমাকে গভীর রাত্রে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। সেইজন্য কাল আর আমি তোমাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। কিন্তু সেই কীর্তন শুনিবার পর হইতে অহরহ তুমি আমার মন জুড়িয়া বসিয়া আছ। তোমার অশ্রুছলছল ডাগর চক্ষু দুইটি আমার মনের মধ্যে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। কোথায় তুমি? বিশ্বাস কর, আমি তন্নতন্ন করিয়া তোমাকে খুঁজিয়াছি। এখনও খুঁজিতেছি এবং চিরকাল খুঁজিব। তোমাকে খোঁজাই আমার জীবনের ব্রত। সেইজন্যই পুলিশ অফিসারের কন্যাকে বিবাহ করিয়া পুলিশে চাকুরি লইয়াছি—তোমাকে খুঁজিয়া আমি বাহির করিবই। ইহাই আমার জীবনের লক্ষ্য, পুলিশে চাকুরি করা অথবা পুনরায় বিবাহ করা উপলক্ষ মাত্র। এই কথাটি আমি প্রতিদিন লিখি, আজও আবার লিখিলাম। কারণ ইহাই আমার জীবনের মন্ত্র। মন্ত্রকে জাগ্রত রাখিতে হইলে প্রতিদিন তাহা জপ করিতে হয়। হাসিকে বিবাহ করিয়া তাহার প্রতি অবিচার করিয়াছি তাহা সত্য, কিন্তু আমি নিরুপায়। তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। আমি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছি, তাহাই আমাদের দেশে আমার মতো মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-সন্তানের পক্ষে এ ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। পুলিশে চাকুরি হইলে ভাল করিয়া তোমার

সন্ধান করিতে পারিব। কিন্তু পুলিশ অফিসারের জামাই হওয়া ছাড়া এ লাইনে ঢুকিবার অন্য কোনো প্রকার উপায় বা যোগ্যতা আমার ছিল না। হাসি নির্দোষ তাহা জানি, কিন্তু উপায় নাই। দেবীপূজায় চিরকাল নিরীহ জীবহত্যা হইয়া আসিতেছে—ইহা সনাতন নিয়ম। ইহা পরিবর্তন করিবার সাধ্য আমার ছিল না। হাসিকে মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ করিয়াছি বটে, কিন্তু অন্তরে স্থান দিতে পারি নাই। কারণ সেখানে তুমি বিরাজ করিতেছ। এক মুহূর্তের জন্যও আমার অন্তর তুমি ত্যাগ কর নাই। হাসিকে স্থান দিব কোথায়? পাশের ঘরেই সে আমার অপেক্ষায় শুইয়া আছে। একটু পরেই আমি তাহার পাশে গিয়া শয়ন করিব। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কিন্তু ঘুচিবে না। আমার এবং হাসির মধ্যে তুমি তোমার সমস্ত সত্তা লইয়া দাঁড়াইয়া আছ। তোমাকে অতিক্রম করে, এমন সাধ্য হাসির নাই।

কিন্তু তুমি কোথায় আছ? এস, আমার স্বপ্নের মধ্যে আজ। রোজই তো তোমায় স্বপ্নে দেখা দিতে বলি, কই, আস না তো? আমার জাগ্রত-লোকের প্রতি মুহূর্তটি তুমি অধিকার করিয়া থাক, স্বপ্নলোকে তোমায় তেমনভাবে পাই না কেন? ঘুমের ঘোরে তোমাকে যেন হারাইয়া ফেলি। তাই মনে হয়, জাগিয়া বসিয়া থাকি, জাগিয়া বসিয়া তোমার কথা চিন্তা করি। আমার মনের আকুলতা লিখিয়া বোঝানো অসম্ভব। তবু রোজ লিখি, না লিখিয়া পারি না। আজ স্বপ্নে নিশ্চয়ই দেখা দিও। তোমার জন্য তৃষিত হইয়া আছি। কবে তুমি আসিবে? ইতি—

তোমারই

মৃন্ময়

পত্রখানি শেষ হইলে মৃন্ময় একটি রঙিন খাম বাহির করিয়া পত্রখানি তাহার মধ্যে পুরিল এবং সেটি সিল করিয়া তাহার উপর লিখিল,—শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী। তাহার পর টেবিলের দেরাজ খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটি চন্দনকাঠের বাক্স বাহির করিল এবং সেই বাক্সের মধ্যে পত্রখানি রাখিয়া দিল। বাক্সে অনুরূপ আরও অনেক পত্র ছিল। চন্দনের বাক্সটি দেরাজে পুনরায় বন্ধ করিয়া রাখিয়া মৃন্ময় উঠিয়া পড়িল। ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া এগারোটা বাজিল। মৃন্ময় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একবার ঘড়িটার পানে চাহিল ও তৎপরে টেবিল-ল্যাম্পটি নিবাইয়া দিয়া ধীবপদসঞ্চারে অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেল। শুইবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, হাসি ঘুমাইতেছে। নিরীহ কিশোরী মূর্তি। বয়স বড় জোর চৌদ্দ কি পনেরো। পরনে একখানি রাঙা ডুরে শাড়ি। সুডোল হাতে সোনার চুড়ি। পাড়-বসানো গোলাপী রঙের একখানি র‍্যাপার গায়ের ওপর পড়িয়া আছে। নির্নিমেষ নেত্রে মৃন্ময় কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে ডাকিল হাসি, ওঠ, চল, এবার খাওয়া-দাওয়া করা যাক।

হাসি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল ও চক্ষু দুইটি কচলাইতে কচলাইতে বলিল, ওই দেখ, হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়েছি! তাহার পর বিছানা হইতে নামিয়া বলিল, চল, নেচি কেটেই রেখেছি, সেঁকে দিতে আর কতক্ষণ যাবে? গরম গরম সেঁকে দিইগে চল। অনেক রাত হয়ে গেছে, নয়? কি করছিলে এতক্ষণ বসে?

মৃন্ময় অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, আপিসের কাজকর্ম করছিলাম।

হাসি হাসিয়া বলিল, আর আমি শুয়ে কেমন ঘুমুচ্ছিলুম! সত্যি, ভারি স্বার্থপর আমরা। তোমরা মুখে রক্ত উঠিয়ে রোজগার করে আনবে, আর আমরা দিব্যি মজা করে তা খরচ

করব। তুমি বেচারি ও ঘরে খেটে মরছ, আর আমি কেমন আরাম করে ঘুমুচ্ছি! মুখে আগুন আমাদের।

ম্লান হাসি হাসিয়া মৃন্ময় বলিল, উপায় কি?

হাসি গা ভাঙিয়া সহাস্যমুখে বলিল, সত্যি, আমারও না ঘুমিয়ে উপায় নেই। বাপ-মা বাংলা লেখাপড়াটা পর্যন্ত শেখায়নি যে, বইটই পড়ে সময় কাটাই। নিজের বাপ-মা-ই মেয়েদের লেখাপড়া শেখায় বড়, আমার এ তো পাতানো বাপ-মা।—বলিয়া হাসি কাপড়টাকে বেশ করিয়া গায়ে জড়াইয়া বলিল, উঃ শীত করছে। র‍্যাপার জড়িয়ে রান্না-বান্না করা যে কি মুশকিল, তোমাকে তো বলে বলে হার মানলাম, সোয়েটার একটা তুমি কিনে দিলে না, চল উনুন-ধারে যাই, বড্ড শীত করছে।

রোজই ভুলে যাই, কাল কিনে আনব ঠিক।

নিজের বাপ-মা থাকলে শীতের তত্ত্ব করত, পাতানো বাপ-মা কিনা, তাই ওসব বাজে খরচের দিকে যেতে চায় না।

হাসি বড় পুলিশ অফিসারের কন্যা বটে, কিন্তু পালিতা কন্যা। আসলে ভদ্রলোক হাসির দূরসম্পর্কের পিসামহাশয়। অসহায়া পিতৃমাতৃহীনা বালিকাটিকে মানুষ করিয়াছিলেন এবং চাকুরির প্রলোভন দেখাইয়া মৃন্ময়ের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছেন।

মৃন্ময়ের পূর্বপত্নী যে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহা তিনি জানিতেন; কিন্তু হাসিকে সে কথা ঘুণাক্ষরে জানান নাই। মৃন্ময় প্রশ্ন করিল, চিনু খেয়েছে?

কোন্ সকালে খেয়ে নিয়েছে ঠাকুরপো, নটা বাজতে না বাজতেই। কলেজে সমস্ত দিন থাকে, ছেলেমানুষ তো, খিদে পেয়ে যায়। চল, উনুনও বোধহয় এতক্ষণ নিবে ধুস হয়েছে।

মৃন্ময়ের ভাই চিন্ময় মফস্বল হইতে ম্যাট্রিক পাস করিয়া আসিয়া এই বছর কলেজে ভরতি হইয়াছে। উপরের ঘরখানায় সে থাকে। সেইটাই তাহার পড়িবার ও শুইবার ঘর।

হাসি ও মৃন্ময় ঘর হইতে বাহির হইয়া রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইল। সামান্য একফালি উঠানের পরই রান্নাঘর। রান্নাঘরে ঢুকিয়াই হাসি বলিল, যা ভেবেছি তাই, উনুনে কি আর আঁচ থাকে? আঁচের আর অপরাধ কি? স্টোভটা জ্বালি, থাম।

হাসি স্টোভ বাহির করিয়া জ্বালিতে বসিল এবং স্পিরিট ঢালিতে ঢালিতে বলিল, এতে আবার রুটি ভাল হয় না।

মৃন্ময় নিকটস্থ একটি বালতি হইতে জল লইয়া হাত-মুখ ধুইতে লাগিল, এ মন্তব্যের কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ নীরবেই কাটিল। তাহার পর হাসি জ্বলন্ত স্পিরিটের দিকে চাহিয়া মৃন্ময়কে সম্বোধন করিয়া বলিল, হ্যাঁ গা, একটা কথা রাখবে আমার?

কি কথা?

সুরেশবাবুদের বাড়ি এমন সুন্দর সুন্দর বেড়ালছানা হয়েছে! তুমি যদি বল—নিয়ে আসি একটা চেয়ে।

বেশ তো। এনো।

একটা ধবধবে সাদা বাচ্চা—এমন মিষ্টি দেখতে যে কি বলব!

তাই নাকি?

স্টোভটায় পাম্প্ করিতে করিতে মহা উৎসাহে হাসি বলিল, দেখবে? নিয়ে আসব তো? এই তো পাশের বাড়ি, ওরা ঠিক জেগে আছে এখনও।

এখন থাক্, কাল এনো।

মায়ের ল্যাজে ছোট্ট ছোট্ট থাবা মেরে মেরে এমন সুন্দর খেলা করছিল আজ দুপুরে, যদি দেখতে? কি দুষ্টু-দুষ্টু চোখ!

হঠাৎ দুয়ারে কড়া নড়িল। এত রাত্রে কে আবার আসিল?

কে?

মৃন্ময় বাহির হইয়া গেল। কপাট খুলিতেই বড় বড় চুল-গোঁফ-দাড়িওয়ালা একজন ভদ্রলোক সহাস্য মুখে বলিলেন, মৃন্ময় নাকি! ভাল আছ তো সব?

কে? মুকুজ্জেমশাই? আসুন আসুন—এত রাতে কোথা থেকে?

মুশকিলে পড়ে এসেছি। চল ভেতরে, সব বলছি।

মৃন্ময়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুকুজ্জেমশাই আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইলেন।

হাসি একমুখ হাসি লইয়া বলিল, ওমা, আপনি!

তাড়াতাড়ি আসিয়া সে মুকুজ্জেমশাইয়ের পদধূলি লইল। তাহার দেখাদেখি মৃন্ময়ও প্রণাম করিল। মুকুজ্জেমশাই উভয়কে আশীর্বাদ করিয়া হাস্যস্নিগ্ধ মুখে হাসির দিকে তাকাইয়া বলিলেন, ভাল আছিস তো পাগলী?

ভুলেও তো খোঁজ নেন না একবার। আজ যে কি ভাগ্যি এলেন?

হাসি অভিমান ভরে ঠোঁট দুইটি ফুলাইল। মুকুজ্জেমশাই একটু হাসিয়া বলিলেন, স্বামীর কাছে আছিস—এখন আর খোঁজ নেবার দরকার নেই তো।

দরকার না থাকলে বুঝি আসতে নেই?

মুকুজ্জেমশাই সস্মিত মুখে চাহিয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না। মুকুজ্জেমশাইকে দেখিলেই আপনার জন বলিয়া মনে হয়। যদিও মুখময় কাঁচা-পাকা গোঁফদাড়ি, মাথায় তৈলবিহীন চুল—কিন্তু এমন একটি স্নিগ্ধ হাস্য-শ্রী তাঁহার সমস্ত মুখমণ্ডলকে ও আয়ত রক্তাভ চক্ষু দুইটিকে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে যে, দেখিবামাত্রই ভিতরকার স্নেহময় মানুষটিকে চিনিতে বিলম্ব হয় না।

হাসি বলিল, কোথায় এসে উঠেছেন আপনি? আজ আপনাকে ছাড়ছি না, এখানে খেয়ে যেতে হবে।

মৃন্ময়ও বলিল, আপনি কলকাতায় কবে এসেছেন? কিচ্ছু জানি না তো?

হাসি বলিল, ওঁর ওই রকমই কাণ্ড।

মুকুজ্জেমশাই আর একটু হাসিয়া বলিলেন, এসেছি তিন-চার দিন হল। শিরীষের ছেলের অসুখের খবর পেয়ে এসেছিলাম। ছেলেটি এই কিছুক্ষণ হল মারা গেছে। শিরীষ বেচারা পড়েছে মুশকিলে। তাকে তো এখানে এখনও বিশেষ কেউ চেনে না, সে এই অল্প কদিন হল এখানে বদলি হয়ে এসেছে। সৎকার করবার লোক জুটছে না, তাই আমাকে বেরুতে হল। তোমাদের দু ভাইয়ের মধ্যে একজনকে যেতে হয়। একজন বাড়িতে থাক্, পাগলীটা আবার না হলে ভয় পাবে। চিনি তো ওকে, ভয়ানক ভীতু।—বলিয়া মুকুজ্জেমশাই হাসির দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

হাসি এতক্ষণ বিস্ফারিত চক্ষে এই মৃত্যু-সংবাদ শুনিতেছিল। হঠাৎ ভীতু অপবাদে

মুকুজ্জেমশাইয়ের দিকে চোখ তুলিয়া একটু হাসিল এবং বলিল, এক্ষুনি যেতে হবে? তা হলে রুটি কটা তাড়াতাড়ি তৈরি করে দিই।

তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়নি বুঝি এখনও?

ঠাকুরপোর খাওয়া হয়ে গেছে, উনি এতক্ষণ কাজ করছিলেন।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, চিনুই চলুক, একজন হলেই হবে, তিনজন পেয়েছি, তা ছাড়া আমি আছি, পাড়া থেকেও দু-একজন হয়তো জুটতে পারে।

মৃন্ময় বলিল, আপনি যাবেন? যদি ঠাণ্ডা লেগে যায় আপনার?

মৃন্ময়ের চিন্তার কারণ ছিল। মুকুজ্জেমশাইয়ের অঙ্গে একটি সুতির বোম্বাই চাদর ভিন্ন আর কোনো আবরণ ছিল না, খালি পা। চিরকালই তাঁহার এই বেশ। মৃন্ময়ের কথা শুনিয়া মুকুজ্জেমশাইয়ের বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি হাস্য-দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন, আমার? আমার কিছু হবে না।

হাসি পাকা গিন্নির মতো পুনরায় মন্তব্য করিল, ওঁর ওই রকমই কাণ্ড।

মৃন্ময় বলিল, তার চেয়ে বরং আপনি হাসিকে আগলান, ঠিকানাটা বলে দিন, আমি আর চিনু যাই।

না না, সেটা ঠিক হয় না। চিনুকে ডাক তুমি, আমি না গেলে ভাল দেখায় না।

অগত্যা চিনুকে ডাকিতে হইল। ডাকাডাকিতে চিনু ঘর হইতে নামিয়া আসিল। সদ্য ঘুম-ভাঙা চোখে মিটিমিটি মুকুজ্জেমশাইয়ের দিকে চাহিয়া চিনিতে পারিবামাত্র সহাস্যমুখে আসিয়া পদধূলি লইল। এই বাড়িতে হাসি ছাড়া চিনুও মুকুজ্জেমশাইয়ের অতিশয় প্রিয়। চিন্ময়ের চেহারা মৃন্ময়ের অনুরূপ, কেবল তাহার বয়স কম ও মাথার চুল কটা নয়—কালো। সমস্ত শুনিয়া চিন্ময় অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল। মুকুজ্জেমশাইয়ের সাহচর্যে এই শীতের রাত্রে মড়া পোড়াইতে যাইতে হইবে। সে যেন স্বর্গ পাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি ওপরে গিয়া নিজের র‍্যাপারখানা লইয়া আসিল।

চিন্ময়কে লইয়া মুকুজ্জেমশাই চলিয়া গেলেন।

তাহারা চলিয়া গেলে হাসি মৃন্ময়কে বলিল, ওগো, তুমি আর একটু সরে এস, আমার ভারি ভয় করছে।

মৃন্ময় চোখ তুলিয়া একটু হাসিল।

না, তুমি সরে এস, লক্ষ্মীটি, মড়ার কথা শুনলে আমার বড্ড ভয় করে।

আর একটু হাসিয়া মৃন্ময় হাসির নিকটে গিয়া বসিল। হাসি রুটি সেঁকিবার আয়োজন করতে লাগিল।

।। দশ ।।

নির্জন দ্বিপ্রহর।

নিজের শয়নকক্ষে ঘন নীলরঙের একটি সুন্দর আলোয়ানে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া একটি গদি-আঁটা আরাম-চেয়ারে বসিয়া মিষ্টিদিদি একখানি উপন্যাস পাঠ করিতেছিলেন। বাড়িতে কেহ নাই। সোনা তাহার এক বান্ধবীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন। রিনি ও প্রফেসার মিত্র কলেজে। মিষ্টিদিদি তন্ময়চিত্তে উপন্যাসখানি পাঠ করিতেছিলেন—গ্রাস করিতেছিলেন

বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পিছনের জানালা দিয়া একফালি রোদ তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ও বামগণ্ডে আসিয়া পড়িয়াছে। বাম কর্ণের সোনার দুলটা রৌদ্রকিরণে চকমক করিতেছে। মিষ্টিদিদির চক্ষু দুইটিও চকমক করিতেছে, অধর মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে, ভ্রূযুগল আকুঞ্চিত। উপন্যাসে নিশ্চয়ই এমন কিছু ছিল, যাহা মুখরোচক এবং উত্তেজনাপূর্ণ। মিষ্টিদিদির নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিতেছে।

হঠাৎ একটা শব্দে মিষ্টিদিদি ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিলেন। বাতায়নপথে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, ছাদের ও-ধারে আলিসার ওপর একজোড়া পারাবত আসিয়া বসিয়াছে। পুরুষ পারাবতটি গলা ফুলাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বক্‌বকম ধ্বনিতে প্রণয় নিবেদন করিতেছে। তাহার স্ফীয়মাণ কণ্ঠদেশে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া ময়ূরকণ্ঠের শোভা ধারণ করিয়াছে, প্রতি গ্রীবাভঙ্গিতে ইন্দ্রধনুর সৌন্দর্য ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকাইয়া থাকিয়া মিষ্টিদিদি আমার পুস্তকে মন দিলেন।

এমন সময় নিচে ফোন বাজিয়া উঠিল। 'বয়' আসিয়া খবর দিল যে, সাহেব তাঁহাকে ফোনে ডাকিতেছেন। মিষ্টিদিদি নামিয়া গিয়া ফোন ধরিলেন। মিত্র সাহেব ফোনে তাঁহাকে জানাইলেন যে, তাঁহার ফিরিতে অনেক রাত হইবে। বৈকালেও আসিতে পারিবেন না, কলেজে একটা মিটিং আছে এবং তৎপরে তাঁহাকে এক বন্ধুর বাড়িতে ডিনার খাইতে যাইতে হইবে। মিষ্টিদিদি ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিলেন। বাতায়নপথে চাহিয়া দেখিলেন পারাবত-দম্পতি উড়িয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে ঘরের কোণে তেপায়ায় রক্ষিত ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটি সবল নগ্ন পুরুষ একটা বিকটাকার অজগরকে বিধ্বস্ত করিতেছে। তাহার শরীরের সমস্ত পেশী শক্তির উন্মাদনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। মিষ্টিদিদি কিছুক্ষণ প্রতিমূর্তিটির পানে তাকাইয়া উঠিয়া বিছানায় গেলেন ও সবলে পাশ-বালিশটাকে আঁকড়াইয়া শুইয়া পড়িলেন।

।। এগারো ।।

শঙ্কর সুরমার পত্রখানি আবার পড়িতেছিল। এখানি সুরমার দ্বিতীয় পত্র। প্রথম পত্রের উত্তর না পাইয়া আর একখানি পত্র লিখিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে জিনিসটা একটু অস্বাভাবিক, সাধারণত এ রকম হয় না। কিন্তু অসাধারণ ব্যাপারও পৃথিবীতে অসম্ভব নহে। সুরমাও সাধারণ শ্রেণীভুক্ত নহে। সুতরাং সুরমা-সংক্রান্ত ব্যাপারে এমন একটু-আধটু খটকাজনক ঘটনা ঘটিবেই। সাহিত্য-প্রীতিরূপ দুষ্টবায়ু যাঁহার স্কন্ধে ভর করিয়াছে, তাঁহার চাল-চলন আচার-ব্যবহার সাধারণ আইন-কানুন মানিয়া চলিবে না, ইহাই স্বাভাবিক— তা তিনি নারীই হউন আর পুরুষই হউন।

শঙ্করের দ্বিপ্রহরে দুই পিরিয়ড ছুটি আছে, কলেজ-স্কোয়ারের নির্জন কোণটুকুও ভারি সুন্দর লাগিতেছে। সুরমার পত্রখানি ইতিপূর্বে সে বহুবার পড়িয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ফিরিতেছে। সুরমা যাহা লিখিয়াছে, তাহার অর্থবোধ করা খুব কঠিন নহে। কিন্তু শঙ্করের মনে হইতেছে, পত্রখানিতে অর্থাতীত এমন কিছু আছে, যাহা একবার দুইবার পড়িয়াই নিঃশেষ করিয়া ফেলা যায় না, বারম্বার পড়িতে হয়। এক স্থানে সুরমা লিখিয়াছে—

'আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় কত অল্প, অথচ আপনার চিঠি না পেয়ে এত খারাপ লাগছে! এর থেকে কি প্রমাণ হয় বলুন তো? হয়তো কিছুই প্রমাণ হয় না, কিংবা হয়তো এর থেকেই কোনো নিপুণ মনস্তত্ত্ববিদ্ বড় কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলতে পারেন। সে যাই হোক্, এ কথা কিন্তু অস্বীকার করে লাভ নেই যে, আপনার চিঠি না পেয়ে ভারি খারাপ লাগছে। আপনার সঙ্গে আত্মীয়তাটা অবশ্য তত ঘনিষ্ঠ নয় যে, অভিমান আবদার করা চলে; তাই আপনাকে শুধু অনুরোধ করছি, চিঠির উত্তর দেবেন এবার নিশ্চয়ই। আপনার সঙ্গে আমার আলাপ অবশ্য স্বল্প। কিন্তু স্বল্প পরিচয়েই আপনার বিশিষ্ট রূপটি দেখেছি বলে মনে হচ্ছে যেন। আজকালকার দিনে বেশ তাজা জীবন্ত মানুষ কমই চোখে পড়ে। জীবন্ত মানুষ মানে—বাঘ-ভাল্লুকের মতো বন্য পশু নয়, জীবন্ত মানুষ মানে—যে মানুষ সভ্যতার অতিবর্ষণে গলিত হয়ে যায়নি, সভ্যতার রসে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রশংসা করছি বলে যেন অহঙ্কারে ফুলে উঠবেন না। আপনার সম্বন্ধে সত্যি যা মনে হয়েছে, তাই লিখলাম। আপনাকে আর একটা কথা বলব? রাখবেন কথাটা? আপনার যে কবিতাগুলো দেখিয়েছিলেন, সেগুলো ছাপিয়ে ফেলুন। সত্যিই ওগুলো ছাপাবার যোগ্য। আমাকে দিন বরং, আমি ছাপিয়ে দিই। এমন সুন্দর করে ছাপিয়ে দেব, দেখবেন তখন। আর নতুন কিছু লিখেছেন নাকি? লিখলে আমাকে পাঠাতে হবে কিন্তু। আপনি কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, মনে আছে তো? কবিতা লিখে আগে আমাকে দেখাতে হবে। আমাকে প্রথমে দেখিয়ে তবে অপরকে দেখাতে পারবেন। আমি হতে চাই আপনার কবিতার প্রথম পাঠিকা। কাল এখানে সমুদ্রের ধারে বসে বসে আপনার 'কলকল্লোল' কবিতাটার লাইনগুলো মনে পড়ছিল। কবিতাটা টুকে পাঠিয়ে দেবেন? সত্যি বলছি, ভারি সুন্দর কবিতাটি।'

এই কথাগুলি বারম্বার পড়িয়াও শঙ্করের তৃপ্তি হইতেছিল না। কয়েকবার পড়িয়া শঙ্কর পত্রখানি পকেটে রাখিয়া দিল ও স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, গতকল্য যে চিঠিখানা সে সুরমাকে লিখিয়াছে, তাহাতে ও-কথাটা সে না লিখিলেই পারিত। নানা কাজের ভিড়ে সুরমার কথা সে বিস্মৃত হইয়াছিল এবং সেইজন্য পত্র দিতে পারে নাই, এই সত্যভাষণটুকু সে না করিলেই পারিত। আর তা ছাড়া, সত্যই তো সে বিস্মৃত হয় নাই। সে সুরমাকে পত্র লেখে নাই সঙ্কোচভরে, পাছে কেহ কিছু মনে করে। সহজ সত্য কথাটা লিখিলেই চুকিয়া যাইত। অনর্থক একজন ভদ্রমহিলার মনে আঘাত দেওয়াটা ঠিক হয় নাই। কি করিয়া পরবর্তী পত্রে এই গ্লানিটুকু মুছিয়া ফেলা যায়, সে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ তাহার চোখে পড়িল, ও-ধারের গেট দিয়া রিনি আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার সঙ্গে আর একটি তরুণী। তাহারা কাছাকাছি আসিতেই শঙ্কর নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং প্রশ্ন করিল, কোথায় চলেছেন?

রিনি সলজ্জ হাসিয়া উত্তর দিল, পুরনো বইয়ের দোকানগুলো ঘুরব একটু।

চলুন, আমিও যাই, আমারও বই কেনার দরকার আছে কয়েকটা।

ইহা শুনিয়া অপর মহিলাটি বলিলেন, তবে আমাকে এইবার ছুটি দে রিনি, সঙ্গী তো একজন পেয়েই গেলি, তা ছাড়া অপূর্ববাবুও তো আসবেনই—বোধহয় এসেছেন এতক্ষণ।

রিনি তথাপি বলিল, না, তবু তুমি চল বেলাদি।

নামটা শুনিয়া শঙ্কর সহাস্যে তাহাকে নমস্কার করিল এবং বলিল, আপনার নাম শুনেছিলাম অপূর্ববাবুর কাছে, আজ দেখাটা হয়ে গেল।

বেলাদিদি একবার চকিতে চাহিয়া ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শঙ্করকে প্রতিনমস্কার করিলেন ও বলিলেন, আপনার পরিচয়টি দিন তা হলে।

রিনি বলিল, উনি শঙ্করবাবু, সেই যে মিষ্টিদিদি সেদিন তোমায় বলছিলেন। উৎপলবাবুর বন্ধু উনি।

ও আপনিই শঙ্করবাবু? বেলাদিদি স্মিতমুখে শঙ্করের পানে চাহিলেন ও দন্ত দ্বারা অধরোষ্ঠ ঈষৎ দংশন করিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে প্রশ্ন করিলেন, আপনি নাকি খুব বড় কবি? অপূর্ববাবু বলছিলেন।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, লিখি বটে মাঝে মাঝে, তবে সে এমন কিছু নয়।

তিনজনে গল্প করিতে করিতে কলেজ স্কোয়ার হইতে বাহির হইয়া গেল। শঙ্কর আবার রিনিকে প্রশ্ন করিল, পুরনো বইয়ের দোকানে কি বই কিনবেন আপনি?

বেলাদিদি অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া বঙ্কিম চাহনিতে রিনির পানে একবার চাহিলেন ও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

রিনি সঙ্কুচিত মুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ইতস্তত করিয়া উত্তর দিল, কিছু ঠিক করিনি এখনও। পুরনো বই আমার খুব ভাল লাগে। নতুন বই কেনার চেয়ে পুরনো বই কিনতে আমার বেশি ইচ্ছে করে।

বেলাদিদি এই উক্তিতে সহাস্য ওষ্ঠভঙ্গি করিলেন ও বলিলেন, সবাই কবি।

শঙ্কর বলিল, আপনিও নন কি?

আমি?—বেলাদিদি অধর দংশন করিয়া ভ্রূভঙ্গিসহকারে প্রশ্ন করিলেন।

নিশ্চয়। কবি না হলে ব্লাউজের রঙের সঙ্গে শাড়ির রঙের এমন সামঞ্জস্য করতে পারতেন? অমন সুন্দব নাগরা জোড়া, অমন সুন্দর দুল দুটি পছন্দ করা আপনার পক্ষে সম্ভবই হত না—যদি আপনি কবি না হতেন। কবি সবাই, কেউ কবিতা লেখে, কেউ লেখে না।

মোটেই না—ওসব বাজে কথা।

বেলাদিদি হাসিতে হাসিতে সজোরে মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

শঙ্কর কিছু না বলিয়া সস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল।

বেলাদিদি আবার অধর দংশন করিয়া সহাস্যে বলিলেন, আপনি শুধু কবিই নন দেখছি, আরও অনেক গুণ আছে আপনার।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, নিশ্চয়। আমি নির্গুণ ব্রহ্ম নই—এ কথা মুক্ত কণ্ঠেই স্বীকার করছি।

বেলাদিদির চক্ষু দুইটি ছদ্ম কোপে ভাষাময় হইয়া উঠিল।

তাঁহারা কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে পুরাতন পুস্তকের দোকানগুলির সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। বেলাদিদি ও শঙ্করই এতক্ষণ কথাবার্তা বলিতেছিল। রিনি চুপ করিয়াছিল, সে এবার কথা কহিল, অপূর্ববাবু এসেছেন দেখছি—ভোলেননি।

ভুলবে? বলিস কি?—বলিয়া বেলাদিদি চকিত দৃষ্টিতে একবার শঙ্করের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

শঙ্কর তাঁহার সে চাহনি দেখিতে পাইল না, কারণ সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অপূর্ববাবুকে দেখিতেছিল। দিবালোকে লোকটাকে আরও অদ্ভুত দেখাইতেছে। নাকের কাছে খানিকটা পাউডার লাগিয়া রহিয়াছে, লম্বা কোঁচাটা খর্বাকৃতির সহিত মোটেই খাপ খায় নাই, পাঞ্জাবিটাও

হাঁটু ছাড়াইয়া পড়িয়াছে। পাঞ্জাবির রঙও অদ্ভুত। এ রকম অদ্ভুত পাঞ্জাবি পরে নাকি পুরুষমানুষে! আশ্চর্য মেয়েলি রুচি লোকটার! লাজুক চক্ষু দুইটি তুলিয়া বিনয়নম্র মিহি কণ্ঠে অপূর্ববাবু বলিলেন, নমস্কার শঙ্করবাবু, আপনি এলেন কোথা থেকে?

প্রতিনমস্কার করিয়া শঙ্কর বলিল, কলেজে পড়ি, সুতরাং কলেজ স্ট্রিটে আমার আবির্ভাবের হেতু খুঁজে পাওয়া তো শক্ত নয়; কিন্তু আপনি তো ক্লাইভ স্ট্রিটের লোক, আপনাকেই কলেজ স্ট্রিটে দেখে আমার আশ্চর্য লাগছে।

অত্যন্ত কাঁচুমাচু হইয়া অপূর্ববাবু বলিলেন, তা বটে, মিস মিত্রের সঙ্গে এন্‌গেজমেন্টটা ছিল, তাই, মানে, ঘণ্টাখানেক ছুটি নিয়ে— আমাদের বড়বাবুরও আবার, অর্থাৎ—

অপূর্ববাবু কথা আর শেষ করিতে পারিলেন না, নতচক্ষু হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর পকেট হইতে একটি এসেন্স-সুগন্ধি রুমাল বাহির করিয়া মুখ ও কপাল মুছিতে মুছিতে চকিত দৃষ্টিতে একবার বেলাদিদির পানে চাহিয়া বলিলেন, আপনিও এসে গেছেন! ভালই হয়েছে। আপনাকেও এ সময় এ স্থানে দেখব প্রত্যাশা করিনি।

অপ্রত্যাশিত জিনিস তো অহরহই ঘটবে—কি বলেন শঙ্করবাবু?

বেলাদিদি শঙ্করের দিকে চাহিতেই শঙ্কর বলিল, নিশ্চয়।

মোড়ের ঘড়িটার দিকে চাহিয়া শঙ্কর বলিল, তা হলে চলুন, বইগুলো দেখা যাক্‌। আসুন।

একটা দোকানে তাহারা ঢুকিয়া পড়িল।

অনেক ঘাঁটাঘাঁটির পর শেলির কাব্যগ্রন্থাবলী এক খণ্ড রিনির পছন্দ হইল—বেশ সুন্দর দামি সংস্করণ। অপূর্ববাবু তাহার দাম দিলেন ও পুস্তকটি হস্তে লইয়া তিনি বলিলেন, পরশু ঠিক সময়ে নিয়ে যাব আমি। কিছু লিখে দিতে চাই, অর্থাৎ—। বলিয়া একটু অপ্রস্তুত মুখে থামিয়া গেলেন।

শঙ্কর ব্যাপারটি ঠিক বুঝিল না। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বেলাদিদির পানে চাহিতেই তিনি ব্যাপারটা খুলিয়া বলিলেন, পরশু রিনির জন্মদিন। অপূর্ববাবু রিনিকে একটা উপহার দেবেন। সাধারণত লোকে নিজেই কিনে নেয়ে যায় ওসব জিনিস, কিন্তু অপূর্ববাবুর সব বিষয়েই একটু বিশেষত্ব আছে তো—উনি রিনিকে দিয়ে পছন্দ করিয়ে তবে কিনবেন।—বলিয়া বেলাদিদি তাঁহার স্বাভাবিক রীতিতে অধর দংশন করিয়া অপূর্ববাবুর প্রতি একটা ব্যঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

ওমা, ঠিক এই এডিশনের একটা কীট্‌স্‌ও রয়েছে যে!

রিনি একটা বুক-শেল্‌ফের কোণ হইতে কীট্‌স্‌কে টানিয়া বাহির করিল। শুধু বাহির করিল না, লুব্ধভাবে তাহার পাতাগুলি উল্টাইতে লাগিল। অপূর্ববাবু একটা ঢোক গিলিয়া শঙ্কিত দৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া আছেন দেখিয়া গম্ভীরভাবে বেলাদিদি বলিলেন, ওটাও নেওয়া উচিত। ওটাও কিনে নিন অপূর্ববাবু।

বেশ তো, বেশ তো।

অপূর্ববাবু কিন্তু মনে মনে ঘামিতে লাগিলেন। তাঁহার কাছে আর পয়সা ছিল না।

এটাও নিই তা হলে?—ঘাড় ফিরাইয়া রিনি স্মিতহাস্যে অপূর্ববাবুকে প্রশ্ন করিল।

বেশ তো, বেশ তো। আমি নিয়ে যাব ওটা পাঁচটার পর এসে, মানে, এখন আমার কাছে দামটা ঠিক নেই—মানে দশটাকার নোট আনতে ভুলে একটা পাঁচ টাকার নোট—মানে, তাড়াতাড়িতে—

অপূর্ববাবু অকারণে মনিব্যাগটা বাহির করিয়া সেটা খুলিয়া সেই দিকেই নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলেন। শঙ্করের কাছে টাকা ছিল। সে তৎক্ষণাৎ একটা দশ টাকার নোট বাহির করিল ও অপূর্ববাবুকে বলিল, এই যে, নিন না, আমার কাছে আছে।

বেলাদিদির চক্ষু দুইটিতে দুষ্টামির হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

রিনি একটু কুণ্ঠিত সলজ্জ কণ্ঠে বলিলেন, থাক্, আর দরকার নেই তা হলে।

আমার দরকার আছে।

শঙ্কর বইখানি কিনিয়া লইল। অপূর্ববাবুর মুখ-চোখের ভাব এমন করুণ হইয়া উঠিল, যেন কেহ তাঁহার গালে চড় মারিয়া তাঁহার মুখের গ্রাসটি কাড়িয়া লইয়াছে।

বেলাদিদি হাসিয়া বলিলেন, এটা কিন্তু ঠিক হল না শঙ্করবাবু, অপূর্ববাবুকে ওটা কিনতে দেওয়া উচিত আপনার।

হ্যাঁ, অপূর্ববাবুর জন্যেই তো কিনলাম ওটা। এখন টাকা নেই ওঁর কাছে—বইটা যদি বিক্রি হয়ে যায় আবার! এই নিন!—শঙ্কর বইখানা অপূর্ববাবুকেই দিল।

ধন্যবাদ। দামটা, নিতে হবে কিন্তু।

বেশ, দেবেন।

শঙ্কর নূতন পুস্তকের খোঁজে একটা শেল্‌ফের পিছনের দিকে গেল। দেখিল যে, পিছনের দিকে একই সংস্করণের বায়রন ও বার্ন্‌সও রহিয়াছে। সে দুইটিও কিনিয়া লইল। তাহার পর একটু ভাবিয়া পকেট হইতে কলম বাহির করিয়া অপর সকলের অগোচরে বই দুই খানিতে কি যেন লিখিল। তাহার পর বই দুইটি বগল-দাবা করিয়া সে বলিল, এইবার যাওয়া যাক তা হলে? মিস মিত্র কি কলেজে যাবেন নাকি?

হ্যাঁ।

আর আপনি?—বেলাদিদিকে সে প্রশ্ন করিল।

আমিও ওই দিকেই যাব। অপূর্ববাবু তো আপিসে যাবেন?

হ্যাঁ, আমাকে আপিসে ফিরতে হবে।

চারিজনে বাহির হইয়া ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়াইলেন।

অপূর্ববাবুর ট্রাম আসিতে তিনি সবিনয়ে নমস্কারাদি শেষ করিয়া ট্রাম ধরিয়া আপিসে চলিয়া গেলেন।

শঙ্কর বলিল, চলুন না, হাঁটাই যাক একটু।

তিনজনে হাঁটিতে শুরু করিল।

বেলাদিদি বলিলেন, আপনি কি বই কিনলেন, দেখি!

দেখাচ্ছি, কিন্তু তার আগে আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে।

কি অনুরোধ?

অনুরোধটা সামান্যও বলতে পারেন, অসামান্যও বলতে পারেন। আপনার সঙ্গে আজ আমার প্রথম আলাপ, আজই আপনাকে একটা কিছু উপহার দেওয়া স্পর্ধার মতো দেখাবে; কিন্তু আজকের এই প্রথম আলাপটাকে স্মরণীয় করে রাখতে ইচ্ছে করছে। রাগ করবেন?

না, রাগ করব কেন?

তা হলে এইটে নিন।

বায়রনের কাব্য-গ্রন্থাবলীটি শঙ্কর তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিল।

বেলাদিদি অধর দংশন করিয়া মলাটটি খুলিয়া পড়িলেন, গোটা গোটা অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—Please accept Byron—Shankar. তাহার পর চক্ষু তুলিয়া হাসিয়া বলিলেন, I accept. Thanks.

তারপর রিনির হাতে বার্ন্‌সখানি দিয়া শঙ্কর বলিল, আপনার জন্মদিনের নেমন্তন্ন আমিও পেয়েছি মিস মিত্র। যাব ঠিক, কিন্তু একটা উপহার বগলে করে যেতে আমার লজ্জা করবে। ও জিনিসটা ভারি ভাল্‌গার ঠেকে আমার কাছে; তাই ব্যাপারটা এখনই সেরে দিলাম। আপনি যে এত কবিতা ভালবাসেন, তা তো জানা ছিল না আমার। আমার ধারণা ছিল, সোনাদিদিই বুঝি কবিতা-পাগল।

এই শুনিয়া বেলাদিদি বলিলেন, সোনাদি কবি দেখলে কবিতা-পাগল হন, শিল্পী দেখলে ছবি-পাগল হন, বৈজ্ঞানিক দেখলে বিজ্ঞান-পাগল হন।

রিনি কিছু বলিল না। লজ্জিত মুখে চুপ করিয়া রহিল।

বেলাদিদি রিনির হাত হইতে বার্ন্‌সখানি লইয়া বলিলেন, দেখি, তোর বইটাতে কি কবিত্ব করলেন উনি!

তার আগে, দাঁড়ান, আমি যাই।—বলিয়া শঙ্কর আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া একখানা চলন্ত ট্রামে উঠিয়া পড়িল।

বেলাদিদি খুলিয়া দেখিলেন, লেখা রহিয়াছে—It Burns—Shankar.

রিনিও দেখিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা করিতেছিল, মাটির সহিত মিলাইয়া যাইতে।

বেলাদিদি অধর দংশন করিয়া ধাবমান ট্রামটার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

।। বারো ।।

করালীচরণ বক্‌সি নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া কোষ্ঠী-গণনা করিতেছিলেন। সম্মুখে প্রসারিত একটি কাগজের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া তিনি বসিয়াছিলেন। কাগজটিতে রাশিচক্রের ছক টোকা। তাহার পাশেই শালপাতার ঠোঙায় কিছু তেলেভাজা ফুলুরি পড়িয়া রহিয়াছে। বক্‌সি মহাশয়ের কিন্তু ফুলুরির দিকে লক্ষ্য নাই, তিনি রাশিচক্রটির দিকেই নিবদ্ধদৃষ্টি। বাম হস্তে একটি জ্বলন্ত সিগারেট রহিয়াছে। পারিপার্শ্বিকের অবস্থা অনেকটা পূর্ববৎ—মদের বোতল এবং ফাটা গেলাস ঠিকই আছে, বোতলের মুখে গোঁজা মোমবাতিও জ্বলিতেছে, আলমারির কপাট দুইটি তেমনই উন্মুক্ত রহিয়াছে। নূতনত্বের মধ্যে আলমারির অধিকাংশ বই তক্তাপোশের ওপর স্তূপীকৃত। ঘরটাতে পুরাতন পুস্তকের গন্ধে, ধূলার গন্ধে, সিগারেটের গন্ধে ও মদের গন্ধে একটা গন্ধ-বৈচিত্র্য হইয়াছে। নূতন আসবাবের মধ্যে একটা নূতন সচিত্র ক্যালেন্ডার টেবিলের সম্মুখে ঝুলিতেছে। ছবিটি সুন্দর। একটি নয়-দশ বৎসরের সুন্দরী বালিকা কয়েকটি ধপধপে সাদা খরগোশকে কপিপাতা খাওয়াইতেছে। এমন সুন্দর ছবিখানি কিন্তু সুন্দরভাবে টাঙানো নাই, বাঁকাভাবে কোনোক্রমে ঝুলিয়া আছে। একটি সুদীর্ঘ টান মারিয়া বক্‌সি মহাশয় সিগারেটটি ফেলিয়া দিলেন এবং একটি পঞ্জিকা খুলিয়া তাহা হইতে কি সব টুকিয়া লইলেন ও ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বক্‌সি মহাশয়

যে ঘরটিতে বসিয়াছিলেন, সেই ঘর হইতে ভিতরের দিকে যাইবার জন্য একটি ক্ষুদ্র দ্বার ছিল। দ্বারটি আলমারির পাশে কোণের দিকে বলিয়া সহসা চোখে পড়ে নাই। সেই দ্বারপ্রান্তে স্বল্পালোকে একটি ছায়ামূর্তি আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া অস্পষ্ট স্বরে বিড়বিড় করিয়া কি যেন বলিতে লাগিল।

করালীচরণ কাগজের ওপর হইতে দৃষ্টি না সরাইয়া বলিলেন, মোস্তাক, তুমি উঠে এলে কেন?

ছায়ামূর্তি ইহার কোনো উত্তর দিল না, বিড়বিড় করিয়া বকিতে বকিতে আর একটু অগ্রসর হইয়া আসিল মাত্র। অগ্রসর হইয়া আসাতে তাহার গায়ে আলো পড়িল। আলোকপাত হইলে দেখা গেল, মোস্তাক লোকটি বলিষ্ঠ ব্যক্তি, কিন্তু উলঙ্গ। গায়ে বহুরকম তালি দেওয়া শতচ্ছিন্ন একটা কোট রহিয়াছে, আর কিছুই নাই। মুখময় গোঁফ-দাড়ি, ভাসা ভাসা চক্ষু দুইটি আরক্ত। একটু ঝুঁকিয়ে সে হস্তস্থিত একটি অর্ধদগ্ধ বিড়িকে লক্ষ্য করিয়াই আপন মনে কি যেন বকিয়া চলিয়াছিল।

বাই নারায়ণ, মোস্তাক, তুমি উঠে এলে কেন?

করালীচরণের এক চক্ষু মোস্তাকের মুখে নিবদ্ধ হইবামাত্র মোস্তাক যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল ও তৎক্ষণাৎ মিলিটারি কায়দায় দাঁড়াইয়া স্যালিউট করিল। তাহার পর বিড়িটা দেখাইয়া বলিল, জুত পাচ্ছি না।

করালীচরণ বলিলেন, জুত পাবে কি করে, ও যে নিবে গেছে। সরে এস, ধরিয়ে দিই।

মোস্তাক আবার মিলিটারি কায়দায় সেলাম করিল এবং বিড়িটা মুখে দিয়ে মুণ্ডটা আগাইয়া আনিল। বিড়িটি গোঁফ-দাড়ির জঙ্গলে একেবারে ঢাকা পড়িয়াছে দেখিয়া বক্‌সি মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, ও ধরাতে গেলে গোঁফ-দাড়িতে আগুন লেগে যাবে। ওটা ফেলে দাও, এই নাও, একটা সিগারেট নাও। মোস্তাক অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া ঘন ঘন মাথা নাড়িতে লাগিল।

বাই নারায়ণ, দাও তা হলে। ভোগালে দেখছি।

বিড়িটি জ্বলন্ত দিয়াশলাই-কাঠিতে খানিকক্ষণ ধরিয়া রাখিয়াও বক্‌সি মহাশয় যখন দেখিলেন, সেটি ধরিতেছে না, তখন তিনি মোস্তাককে বলিলেন, দেখছ তো?

মোস্তাক অত্যন্ত কৌতূহলভরে দেখিতেছিল।

বলিল, খাসা আগুন।

আগুন তো খাসা, বিড়ি ধরছে কই?

মোস্তাকও সঙ্গে সঙ্গে একমত হইয়া কহিল, জুত হচ্ছে না।

মোস্তাকের হাত হইতে সহজে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বক্‌সি মহাশয় তখন এঁটো বিড়িটাই মুখে লইয়া টান দিয়া ধরাইয়া দিলেন ও বলিলেন, এই নাও, এইবার শোওগে যাও। কম্বলটা কোথায়?

মোস্তাক জ্বলন্ত বিড়িটা লইয়া স্যালিউট করিয়া আলমারির পাশের সেই দরজাটা দিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। কম্বল সম্বন্ধে কোনোরূপ উত্তর দিল না।

বাই নারায়ণ!

বক্‌সি মহাশয় আবার একটি সিগারেট ধরাইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কোষ্ঠী-গণনায় মনোনিবেশ

করিলেন। চতুর্দিকে নীরবতা ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সহসা তিনি রাশিচক্রসমন্বিত কাগজখানা হাত দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া দিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, অসম্ভব।

তাহার পর সিগারেটটা ঠোঁটে চাপিয়া ধরিয়া গ্লাসে মদ ঢালিয়া পান করিতে লাগিলেন। মদ্যপান করিতে করিতে সহসা করালীচরণ নিজের দক্ষিণ হস্তটি আলোকে প্রসারিত করিয়া ধরিলেন এবং নিবিষ্টচিত্তে তাহাই দেখিতে লাগিলেন। এক চক্ষুর দৃষ্টি দিয়া তাঁহার সমস্ত অন্তর যেন তাঁহার হস্তরেখাগুলির উপর সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। ওষ্ঠদ্বয় দৃঢ় নিবদ্ধ হইয়া উঠিল। চিবুক কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে লাগিল।

আসতে পারি দাদা?

করালীচরণ চমকাইয়া উঠিলেন, প্রসারিত হাতটা উল্টাইয়া এমনভাবে বন্ধ দ্বারের দিকে চাহিলেন, যেন দ্বারে কোনো শত্রু হানা দিয়াছে। এক নিঃশ্বাসে মদটা নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া বলিলেন, কে?

আমি গ্যান্‌ঢঅ খুজ্‌বুজ্‌।

ও, ভন্টুবাবু! আপনি? আসুন আসুন।

বক্‌সি মহাশয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। ভন্টুর সহিত প্রোটোটাইপও আসিয়া প্রবেশ করিল এবং আসিয়াই ভক্তিভরে বক্‌সি মহাশয়কে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। ভন্টুর আগে হইতেই শেখানো ছিল।

বকসি মহাশয় প্রশ্ন করিলেন, ইনি কে?

ভন্টু বলিল, ইনি হচ্ছেন লক্ষ্মণবাবু, সেই যাঁর ছক সেদিন—

বুঝেছি। বসুন আপনারা।

বক্‌সি মহাশয় সিগারেটটি ফেলিয়া দিলেন ও বোতল হইতে পুনরায় গ্লাসে মদ ঢালিতে লাগিলেন. লক্ষ্মণবাবু অতিশয় ভয়ে ভয়ে এবং প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভরে উপবেশন করিল। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল, সে যেন কোনো রহস্যময় মন্দিরে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ভন্টুও লক্ষ্মণবাবুর পাশে বসিয়া চোখ টিপিয়া কি যেন একটা ইশারা করিল, ভাবটা—লক্ষ্মণবাবু যেন ব্যস্ত হইয়া কোনো কথা এখন না বলে। এ ইশারার প্রয়োজন ছিল না, কারণ লক্ষ্মণবাবু এমনিই নির্বাক হইয়া গিয়াছিল।

করালীচরণ নিঃশেষিতপ্রায় মোমবাতিটির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ধীরে ধীরে চুমুকে চুমুকে মদ্যপান করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিল। ভন্টু একবার সশব্দে গলা-খাঁকারি দিল। এই শব্দে বক্‌সি মহাশয় ভন্টুর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন ও মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, সর্দি হয়েছে নাকি? এই ঠাণ্ডায় বেরিয়েছেনও তো!

ভন্টু বলিল, লক্ষ্মণবাবু নাছোড়; তা ছাড়া আপনার এখানে আসার কোনো উপলক্ষ্যই তো আমি ছাড়ি না, জানেন।

করালীচরণ মদটুকু নিঃশেষ করিয়া বলিলেন, ওঁদের দুজনের রাশিচক্র মিলিয়েই দেখলাম, মিল হয়নি—অসম্ভব।

লক্ষ্মণবাবুর মুখখানি সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল।

ভন্টু বলিল, গভীর গাড্ডায় ফেললেন দেখছি।

করালীচরণ আর একটি সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন, গাড্ডা আবার কি? মনের মিল যখন হয়েছে, তখন সেইটেই আসল মিল। লাগান আপনি, কুষ্ঠির মিল নাই বা হল।

একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বক্‌সি মহাশয় হাসিতে লাগিলেন।

লাগিয়ে দিন।

ভণ্টু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, পারবেন?

লক্ষ্মণবাবু বিমর্ষভাবে একটু মৃদু হাসিল মাত্র, কিছু বলিল না।

ভণ্টু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, গভীর গাড্ডা, বুঝেছি।

করালীচরণ আবার ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, আলো কিন্তু আর বেশিক্ষণ টিকবে না। ভণ্টুবাবু, ওই বইগুলোর ওদিকে আর একটা মোমবাতি আছে, দেখুন তো, এটা তো গেল।

ভণ্টু মোমবাতির সন্ধান করিতে করিতে বলিল, এত বই সব বার করেছেন কেন?

নানারকমে বেয়ে-চেয়ে দেখছিলাম— কুষ্ঠি দুখানা যদি মেলাতে পারি, দেখলাম—ও অসম্ভব।

ভণ্টু মোমবাতি লইয়া নির্বাণোন্মুখ মোমবাতিতে ধরাইয়া সেটি যথাস্থানে স্থাপন করিল। লক্ষ্মণবাবু নীরবে বসিয়াছিল। তাহার ম্রিয়মাণ মুখের দিকে চাহিয়া করালীচরণ বলিলেন, দেখুন, জ্যোতিষচর্চা করি বটে, কিন্তু এটা আমি আপনাকে বলছি, মনের মিলই হল শ্রেষ্ঠ মিল। সেদিকে যদি আপনার কোনো গলদ না থাকে, লাগিয়ে দিন দুর্গা বলে।

পাশের বাড়ির ঘড়িতে টং টং করিয়া দশটা বাজিল। লক্ষ্মণবাবু উঠিয়া পড়িল।

অনেক রাত হয়ে গেল, এবার আমি উঠি। ভণ্টুবাবু, আপনি যদি বসতে চান তো বসুন, আমার জানেন তো—

ভণ্টু বলিল, হ্যাঁ, আপনি যান, কাল আপনার ওখানে যাব। আপনি দক্‌চে যাবেন না, ঠিক হয়ে যাবে।

বক্‌সি মহাশয়ের পদধূলি লইয়া লক্ষ্মণবাবু বিদায় হইল।

লক্ষ্মণবাবু চলিয়া গেলে ভণ্টু জিজ্ঞেস করিল, কি রকম বুঝলেন?

বোঝাবুঝি আর কি আছে এতে? ও-মেয়ের সঙ্গে এঁর বিবাহ জ্যোতিষ মতে অসিদ্ধ। তাছাড়া ও মেয়ের কপালে দুঃখ আছে—মানে, একাধিক পুরুষের সংস্রবে আসতে হবে ওকে। শুধু আসতে হবে নয়, অনেক দুঃখভোগও করতে হবে। একাধিক পুরুষের সংস্রবে এলে তাকে দুঃখভোগ করতে হবে বই কি!

ভণ্টু একটু ঝুঁকিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, ভীমজাল তা হলে বলুন। প্রোটোটাইপ অতি নিরীহ লোক। মেয়েটি দেখতে ভাল, গান-টান গায় শুনেছি, লেখাপড়াও কিছু জানে। গোবেচারি প্রোটোটাইপ একেবারে লদ্‌কে গেছে।

করালীচরণ কর্কশকণ্ঠে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। তাহার পর বলিলেন, শুক্রের কাণ্ডকারখানাই আলাদা।

ভণ্টু বলিল, এ যে সঙিন শুক্র দেখছি। বেচারী প্রোটোটাইপের মুণ্ডুটি একেবারে হাড়কাঠে গলিয়ে দিয়েছে।

করালীচরণ শালপাতার ঠোঙা হইতে একটা ফুলুরি মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, বিয়ের কথাবার্তা কি অগ্রসর হয়েছে?

পাগল! বাপ অরিজিনাল বসে আছে—খুন করে ফেলবে তা হলে। ছোকরা গোপনে প্রেমে পড়েছে। ওর নিজের কুষ্ঠিতে খুব বিশ্বাস, মেয়েটিরও নাকি খুব বিশ্বাস। মেয়েটিই নাকি নিজের কুষ্ঠির ছক প্রোটোটাইপকে দিয়েছে। বলেছে যে, কুষ্ঠির মিল যদি হয়, তা হলে সে তার দাদাকে বলবে, যেন অরিজিনালের কাছে কথাটা পাড়ে।

করালীচরণ হাসিয়া বলিলেন, প্রণয় ব্যাপারে এমন হিসেব করে চলার কথা আগে কখনও শুনিনি।

ভণ্টু বলিল, প্রোটোটাইপের কাণ্ডকারখানাই ফ্রগিশ।

করালীচরণ সহসা কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। তাহার পর আবার একটি ফুলুরি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, ভণ্টুবাবু, শ'পাঁচেক টাকা কি করে সংগ্রহ করতে পারি বলুন তো?

কেন, এত টাকার কি দরকার এখন?

দ্রাবিড় যাব।

দ্রাবিড়?

হ্যাঁ।

কেন?

শুনেছি, দ্রাবিড়েতে একজন জ্যোতিষী আছেন, তিনি হস্তরেখা দেখে জন্ম-সময় নির্ণয় করতে পারেন। তাঁর কাছে গিয়ে এ বিদ্যেটা আমি আয়ত্ত করতে চাই। যেমন করে হোক—

হঠাৎ এ খেয়াল চাপল কেন?

বাই নায়ারণ, খেয়াল বলছেন একে? দুনিয়ার লোকের কুষ্ঠি গুনছি, ভবিষ্যৎ বলছি, অথচ নিজের সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আমার নিজের জন্ম-সময়, এমন কি জন্ম-তারিখটা পর্যন্ত আমার জানা নেই। হস্তরেখা থেকে যদি জন্ম-সময় নির্ণয় করতে পারি, তাহলে নিজের কুষ্ঠিটা একবার দেখি ভাল করে।

আর একটি ফুলুরি তিনি মুখের মধ্যে দিলেন।

ভণ্টু নির্বাক হইয়া কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আপনি নিজে যা রোজগার করেন, তার থেকে তো অনায়াসে পাঁচশো টাকা জমে যেতে পারে, অবশ্য যদি একটু বুঝেসুঝে খরচপত্র করেন।

করালীচরণ ভণ্টুর দুইটি হাত ধরিয়া সাগ্রহে বলিলেন, দিন না আপনি জমিয়ে। আমার যা কিছু উপার্জন সব আমি আপনার হাতে দেব, আপনি যা আমাকে খরচের জন্যে দেবেন, তাতেই আমি চালিয়ে নেব। কিন্তু আমার কাছে টাকা থাকলে আমি খরচ না করে পারব না। নেবেন ভার?

এক চক্ষু ভণ্টুর মুখের ওপর স্থাপিত করিয়া করালীচরণ একদৃষ্টে সাগ্রহে চাহিয়া রহিলেন।

ভণ্টু কহিল, এ আর অসম্ভব কি? আপনি যা দেবেন, একটা পাস-বুক করে পোস্ট-আপিসে রেখে দিলেই চুকে যায়।

কিন্তু আপনার নামে। আমি নিজেকে একটুও বিশ্বাস করি না, বাই নারায়ণ!

ভণ্টু হাসিয়া বলিল, বেশ তো, এ আর বেশি কথা কি?

তা হলে আসুন, আজ থেকেই শুরু করুন।

করালীচরণ একটা পাঁজির ভিতর হইতে দুইখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন ও বলিলেন, এই এখন আমার যথাসর্বস্ব। কিছু মাল আর সিগারেট কিনে দিয়ে বাকিটা আপনি নিয়ে যান।

বেশ, কাল নিয়ে যাব এসে।

না না না—এখুনি নিয়ে যান আপনি, নিয়ে পালান।

করালীচরণের চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

বেশ, দিন।

ভণ্টু নোট দুইটি লইয়া পকেটে পুরিল।

আলমারির কোণের দ্বারপ্রান্তে আবার সেই ছায়ামূর্তি আসিয়া দাঁড়াইল ও বিড়বিড় করিয়া বকিতে শুরু করিল।

ভণ্টু চমকাইয়া উঠিল।

আর কেউ ঘরে আছে নাকি?

করালীচরণ হাসিয়া বলিলেন, ও মোস্তাক।

মোস্তাক! মোস্তাক কে?

ও আমার একজন বন্ধু, মাঝে মাঝে আসে। মোস্তাক, এদিকে এস।

মোস্তাক অগ্রসর হইয়া আসিল ও আসিয়াই মিলিটারি কায়দায় স্যালিউট করিল। এই উলঙ্গ মূর্তি দেখিয়া ভণ্টু তো বিস্ময়ে নির্বাক।

বক্‌সি মহাশয় বলিলেন, উঠে এলে কেন মোস্তাক, বিড়ি আবার নিবে গেছে নাকি?

জুত হচ্ছে না।

দাও, আবার ধরিয়ে দিই। কই বিড়ি?

মোস্তাক কিছুক্ষণ বক্‌সি মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার পর আকাশের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিল, হোথা চলে গেছে।

তা হলে একটা সিগারেট নাও।

সিগারেট খাইতে মোস্তাকের ঘোর আপত্তি, সে ঘন ঘন মাথা নাড়িতে লাগিল। তাহার পর বলিল, ছবি দেখতে এলাম।

ছবি? ও, তুমি একটা ছবি এনেছ বটে—ভুলেই গেছি। এই নাও, দেখ।

বক্‌সি মহাশয় উঠিয়া ক্যালেন্ডারের ছবিখানি পাড়িয়া তাহার হাতে দিলেন। মোস্তাক টেবিলের ওপর ছবিখানি প্রসারিত করিয়া তাহার ওপর ঝুঁকিয়া পড়িল। তাহার বিস্ফারিত চক্ষু দুইটিতে শিশুসুলভ বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ এইভাবে চাহিয়া থাকিয়া মোস্তাক বালিকাটির মুখের ওপর ময়লা আঙুলটা রাখিয়া বলিল, এ কে?

ও খুকি।

এগুলো কি?

খরগোশ।

এগুলো কি?

কপিপাতা, খরগোশরা খাচ্ছে।

খুকি—খরগোশ—খাচ্ছে—সব 'খ'

মোস্তাক এমন একটা মুখভাব করিয়া করালীচরণের দিকে তাকাইল, যেন সে ছবির মধ্যে 'খ'-এর প্রাধান্য আবিষ্কার করিয়া একটি মস্ত কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে।

করালীচরণ তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া বলিলেন, বাঃ, ঠিক বলেছ! যাও, এবার শুয়ে পড় গিয়ে—যাও। ছবিটা নিয়েই যাও।

সুন্দর ছবিখানা মুড়িয়া মোস্তাক সেটাকে বগলদাবা করিল, আবার স্যালিউট করিল এবং ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। কিছুদূর গিয়া সে আবার ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় স্যালিউট করিয়া প্রশ্ন করিল, কেন?

বাই নারায়ণ, কি কেন?

খুকি আর খরগোশ একসঙ্গে কেন?

করালীচরণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একটু চিন্তা করিবার ভান করিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, প্র্যাকটিস করছে। খুকি যখন বড় হবে, খরগোশগুলোও বড় হবে। বড় হলে খরগোশগুলোর চেহারা কিন্তু মানুষের মতো হয়ে যাবে। মানুষ খরগোশকে যাতে তখন ভাল করে পোষ মানাতে পারে, তারই রিহার্সাল দিচ্ছে আর কি!

এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইয়া স্যালিউট করিয়া মোস্তাক চলিয়া গেল, করালীচরণ হাসিয়া বলিলেন, কত অল্পে সন্তুষ্ট হয় ও!

ভণ্টু বলিল, এ কে বক্‌সি মশায়?

বললাম তো, আমার একজন বন্ধু। ছেলেবেলায় একসঙ্গে পড়তাম, এফ. এ. পর্যন্ত পড়েছিল ও, তারপর মিলিটারিতে চাকরি নিয়ে পাঞ্জাবের দিকে চলে যায়। হঠাৎ একদিন দেখি, কলকাতার রাস্তায় এইভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খোঁজ-খবর নিয়ে শুনলাম, পাগল হয়ে যাওয়াতে ওর চাকরি যায়। আত্মীয়স্বজনরা কে কোথায় আছেন, আছেন কি না, ভগবান জানেন। আমি রাস্তায় দেখতে পেয়ে ডেকে নিয়ে আসি, মাঝে মাঝে নিজেও আসে ও। আজ বিকেলে হঠাৎ ওই ক্যালেন্ডারের ছবিখানা নিয়ে এসে হাজির। বদ্ধ পাগল।

বক্‌সি মহাশয় আবার খানিকটা মদ গ্লাসে ঢালিলেন ও বোতলটা তুলিয়া দেখিয়া বলিলেন, ভণ্টুবাবু, রাত হয়ে গেলে মাল পাবেন না, আমার এদিকে ফুরিয়েছে।

ভণ্টু পশ্চাৎ হইতে ওষ্ঠভঙ্গি করিয়া তাঁহাকে ভ্যাঙাচাইল ও তৎপরে সশ্রদ্ধকণ্ঠে বলিল, এই যে যাই।

ভণ্টু বাহির হইয়া বাইকে সওয়ার হইল।

লক্ষ্মণবাবু বাইকটি নিখুঁতভাবে সারাইয়া দিয়াছিল।

।। তেরো ।।

শঙ্কর একমনে আপনার ঘরে বসিয়া ইতিহাস পাঠ করিতেছিল। এত একাগ্রচিত্তে সে তাহার নিজের পাঠ্য-পুস্তকও কোনোদিন পাঠ করে নাই। সে নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র, মডার্ন ইয়োরোপ তাহার পাঠ্যতালিকা অন্তর্ভুক্ত নহে। আগামী কল্য ফিজিক্স প্রাক্‌টিক্যাল ক্লাস আরম্ভ হইবে, অধ্যাপক মহাশয় সে সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনাও করিয়া আসিতে বলিয়াছেন। শঙ্করের সেদিকে কিন্তু খেয়াল নাই। মডার্ন ইয়োরোপের এই বইখানা সম্ভব হইলে আজ রাত্রের মধ্যেই

পড়িয়া শেষ করিতে হইবে। জ্ঞানপিপাসা নয়, রিনিকে তাক লাগাইয়া দিতে হইবে। রিনিকে দেখাইতে হইবে যে, অপূর্বকৃষ্ণ পালিতই যে কেবল ইতিহাসে কৃতবিদ্য তাহা নহে, শঙ্করও ইতিহাসের কিছু কিছু জানে—যদিও সে বিজ্ঞানের ছাত্র। গতকল্য রিনির জন্মতিথি-উৎসবে সে গিয়াছিল। মিষ্টিদিদি ও সোনাদিদি তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, রিনির পড়াশোনায় সাহায্য করিতে পারে এমন একটি ভাল ছেলে যদি শঙ্কর জোগাড় করিয়া দেয়, তাহা হইলে বড় উপকার হয়। প্রফেসার মিত্র নিজের পড়াশোনা লইয়া এত তন্ময় থাকেন যে, এসব দিকে—বস্তুত সংসারের কোনো দিকেই তাঁহার লক্ষ্য নাই।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল, আর কারও সঙ্গে তো আমার তেমন আলাপ নেই, আমাকে দিয়ে যদি চলে, বলুন।

আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত মিষ্টিদিদি বলিয়াছিলেন, ও মা, তা হলে তো সবচেয়ে ভাল হয়। পারবেন আপনি?

পারতে পারি।

সোনাদিদি সপ্রশংস দৃষ্টিতে একবার শঙ্করের দিকে ও একবার মিষ্টিদিদির দিকে তাকাইয়া বলিয়াছিলেন, একেই বলে—ভাল ছেলে। সায়েন্স্ কোর্সের স্টুডেন্ট্ আর্ট কোর্সের মেয়েকে পড়াবার ভার নিতে চায়! উঃ, আপনাদের মাথার ভেতরটাতে কি আছে একবার দেখতে ইচ্ছে করে, সত্যি বলছি।

উত্তরে শঙ্কর বলিয়াছিল, চেষ্টা করলে সব জিনিসই সবাই করতে পারে। আপনি কিংবা মিষ্টিদিদি যদি চেষ্টা করেন, মিস মিত্রকে নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারেন। মিষ্টিদিদি তো পারেনই—বি. এ. পাস করেছেন উনি।

মিষ্টিদিদি হাস্যতরল কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, রক্ষে করুন, আবার ওইসব। ওসব আপনাদের মতো ভাল ছেলেদেরই পোষায়। সেদিন রিনি কি একটা সামান্য জিনিস জিজ্ঞেস করেছিল রোমান হিস্ট্রির, কিছুতেই মনে এল না ছাই! ভাগ্যে অপূর্ববাবু ছিলেন, তিনি শেষকালে আমায় উদ্ধার করেন।

অপূর্ববাবু আসেন নাকি রোজ?

এ প্রশ্নটি অনিবার্যভাবে শঙ্করের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার উত্তরে সোনাদিদি মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়াছিলেন। মিষ্টিদিদিও রহস্যময় হাসি করিয়া বলিয়াছিলেন, হ্যাঁ, অপূর্ববাবু আসেন প্রায়ই। তাঁকে বললে, তিনি অবশ্য রিনিকে পড়াতে রাজি হয়ে যাবেন, কিন্তু সেটা তাঁর ওপর অত্যাচার করা হয়। তিনি বেলাকে সন্ধ্যাবেলা গান শেখান, আরও এক জায়গায় কোথাও পড়ান নাকি।

গম্ভীর মুখ করিয়া সোনাদিদি বলিয়াছিলেন, না, সেটা ঠিক হয় না।

শঙ্কর প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছে, সে রিনিকে পড়াইবে। সেইদিনই রিনিদের বাড়ি হইতে ফিরিয়া শঙ্কর প্রফেসর গুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। সাহিত্যরসিক বলিয়া প্রফেসার গুপ্ত শঙ্করের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কলেজ-ম্যাগাজিনে প্রকাশিত শঙ্করের লেখা 'ট্র্যাজেডি ও কমেডি' শীর্ষক প্রবন্ধটি তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছিল এবং তিনি নিজেই আসিয়া প্রবন্ধের লেখক শঙ্করসেবক রায়ের সহিত আলাপ করিয়া গিয়াছিলেন। সেই আলাপের পর হইতে শঙ্করও দুই-একবার তাঁহার বাসায় গিয়াছে। প্রফেসার গুপ্তের সহিত আলাপ করিয়া সুখ হয়।

লোকটি মার্জিতরুচি ও বিদ্বান। শুধু বিলাত নয়, ইয়োরোপের অনেক দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স হইয়াছে প্রায় পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি; কিন্তু আলাপ করিলে মনে হয়, ঠিক যেন সমবয়সী। শঙ্করের সহিত বেশ ভাব হইয়া গিয়াছে। শঙ্কর রিনিদের বাড়ি হইতে সোজা প্রফেসার গুপ্তের বাড়ি গিয়া ইতিহাসের এই বইখানি আউট-বুক হিসাবে পড়িবে বলিয়া চাহিয়া আনিয়াছে এবং তাহাই এখন তন্ময় হইয়া পড়িতেছে। বি. এ. কোর্সের ইতিহাসের বইগুলি তাহাকে চেষ্টা করিয়া পড়িয়া ফেলিতে হইবে। ইংরেজিটা তাহার মোটামুটি জানাই আছে। সংস্কৃতটা একটু-আধটু দেখিয়া লওয়া প্রয়োজন, কিন্তু তাহার জন্য তাহাকে বেশি পরিশ্রম করিতে হইবে না। সংস্কৃতে সে খুব ভাল ছেলে ছিল। ফিলজফি? ফিলজফিতে রিনিকে বিশেষ সাহায্য করিতে হইবে না। যদিও বা হয়, তাহা আয়ত্ত করা শঙ্করের পক্ষে অসম্ভব হইবে না।

শঙ্কর তন্ময় হইয়া পড়িতেছে। অন্তরের নিভৃত প্রদেশে অবনতমুখী রিনি বসিয়া রহিয়াছে। সেই লাজনম্রা স্বল্পভাষিণী শ্রীমণ্ডিতা তন্বীকে শুনাইয়া শুনাইয়া তন্ময় শঙ্কর পড়িয়া চলিয়াছে। ইতিহাসের কঠিন নাম ও তারিখগুলো সঙ্গীতের মতো মনে হইতেছে।

হঠাৎ শঙ্করের তপোভঙ্গ হইল।

নীচে কে তাহাকে ডাকিতেছে!

চাকরটা আসিয়া প্রবেশ করিল এবং বলিল যে, ভন্টুবাবু তাহার সহিত দেখা করিতে চান, নীচে কমন-রুমে বসিয়া আছেন।

শঙ্কর নীচে নামিয়া গেল। কমন-রুমে আর কেহ ছিল না, ভন্টু একাই বসিয়াছিল।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, কি রে, এমন সময় হঠাৎ?

ভীমজাল এবং গভীর গাড্ডা টু দি পাওয়ার থ্রী। মেজকাকা আবার সরেছে, বউদিদির খুব জ্বর, ট্যাক গড়ের মাঠ।

শঙ্কর কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। শঙ্করেব বিপন্ন মুখচ্ছবি দেখিয়া ওষ্ঠ বিকৃত করিয়া ভন্টু বলিল, অমন করে চেয়ে আছিস কেন গাড়োল? যা হবার হবে। এক কাপ চা খাওয়া তো আগে।

শঙ্কর চাকরকে ডাকিয়া দোকান হইতে চা আনাইয়া দিল।

চা পান করিতে করিতে ভন্টু বলিল, কানা করালীর কাছে যাবি?

কানা করালী কে?

সেই জ্যোতিষী, সেই যে তোর কুষ্ঠি দেখেছিল একদিন, এত ভুলিস তুই!

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ।

চল্ না, যাই সেখানে। তোর কুষ্ঠিটা গোনাবি বলেছিলি তো একদিন।

শঙ্করের তখন যাহা মনের অবস্থা, তাহাতে নিজের ভবিষ্যতের সম্বন্ধে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাহাকে হিস্ট্রির পড়া করিতে হইবে। সুতরাং সে বলিল, এখন যাওয়া অসম্ভব।

ভন্টু চাটুকু নিঃশেষ করিয়া বলিল, আজ কনসেশন ডে ছিল, সস্তায় হত। আজ বুধবার তো?

কনসেশন ডে মানে?

মানে বুধবার দিন হল তার হাফ ফী? অন্য দিন দশ টাকা নেয়, আজ পাঁচ টাকা।

তাই নাকি? বেশ তো পাঁচটা টাকা দিচ্ছি তোকে, তুই গুনিয়ে নিয়ে আয়—সব ঠিক ঠিক বলে দেবে তো?

ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভন্টু বলিল, বলে দেবে মানে? এ রকম নির্ভুল গণনা আর কোথাও পাবি না। করালী একেবারে চাম ল—দ্।

তুই তা হলে গুনিয়ে নিয়ে আয়, আমি টাকা দিচ্ছি তোকে।

শঙ্কর উপরে চলিয়া গেল ও পাঁচটা টাকা আনিয়া ভন্টুকে দিল। টাকা আনিল অবশ্য সে ধার করিয়া। তাহার নিজের কাছে কিছুই ছিল না। রিনির জন্মদিন উপলক্ষে তিনখানি দামি বই কিনিয়া তাহার যাহা কিছু ছিল নিঃশেষ হইয়াছে। টাকা দিয়া সে ভন্টুকে বলিল, নটা তো বাজে; এত রাত্রে তুই বাড়ি না গিয়ে জ্যোতিষীর ওখানে যাবি? বউদির জ্বর বলছিলি!

ভন্টু টাকা কয়টি ভিতর দিককার পকেটে রাখিতে রাখিতে বলিল, জ্বর তো বটেই—আমি আর বাড়ি বসে থেকে তার কি করবই? যা করবার তা তো করেই এসেছি। করালীর সঙ্গে একটু লদ্‌কালদ্‌কি করে আবার ফিরব এখুনি।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, মেজকাকা সরেছে কবে?

কাল সন্ধে থেকে না-পাত্তা।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

ভন্টু বলিল, একটা দেশলাই আন্ দেখি, বাইকের আলোটা জ্বালাতে হবে।

শঙ্কর পাশের ঘর হইতে দিয়াশলাই আনিয়া দিল ও ভন্টুকে আগাইয়া দিবার জন্য তাহার সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত আসিল। ভন্টুর বাইকটি গেটের কাছেই ঠেসানো ছিল। ভন্টু পকেট হইতে একটা সরু মোমবাতি ও একটি কাগজের ঠোঙা বাহির করিল, তাহার পর বাতিটি জ্বালাইয়া ঠোঙার ভিতর স্থাপন করিয়া শঙ্করকে বলিল, ধর দিকি, আমি বাইকে চড়ি, তারপর আমার হাতে দিস।

শঙ্কর সবিস্ময়ে বলিল, তোর ল্যাম্প কি হল?

ভন্টু হাস্য-দীপ্ত চক্ষে উত্তর দিল, খুজ্‌বুজ্।

খুজ্‌বুজ্ মানে।

মানে—বিক্রমপুর, এবং তস্য মানে বেচে ফেলেছি। সংসার চালাতে হবে তো!

ভন্টু বাইকে সওয়ার হইল।

ভন্টুকে বিদায় দিয়া শঙ্কর আবার আসিয়া পড়িতে বসিল।

রাত্রি অনেক।

হস্টেলের সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। সকলেই নিজের নিজের ঘরে খিল দিয়াছে। ষোল নম্বর ঘরের রামকিশোরবাবু খড়ম খট্‌খট্ করিতে করিতে বাথরুমের দিকে চলিয়াছেন। শঙ্কর নিজের ঘরে বসিয়া তাঁহার গলার-সাঁকি-বাহির-করা মূর্তি কল্পনানেত্রে দেখিতেছিল। হাত-কাটা ফতুয়া পরা, কানে পৈতা জড়ানো। রামকিশোরবাবু তিনবার বি. এ. ফেল করিয়া চতুর্থবারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রামকিশোরবাবুর খড়মের শব্দ পাইয়া শঙ্কর বুঝিল, এখনই আলো নিবিয়া যাইবে, কারণ আলো নিবিবার ঠিক দশ মিনিট পূর্বে রামকিশোরবাবু খড়ম পরিয়া বাথরুম অভিমুখে যান ও ফিরিয়া আসিয়া কুঁজ হইতে জল

ঢালিয়া সশব্দে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া শয়ন করেন—ইহা তাঁহার বাঁধা নিয়ম। রামকিশোরবাবু ফিরিয়া আসিলেন ও বিধিমত হস্তমুখ প্রক্ষালনান্তে নিজের ঘরে গিয়া খিল দিলেন। তখন শঙ্কর ধীরে ধীরে নিজের ঘর হইতে বাহির হইল ও এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে কপাটে তালা লাগাইতে লাগিল। ভন্টুর সহিত দেখা হইবার পর কিছুক্ষণ সে ইতিহাস পাঠ করিয়াছিল এবং পুস্তকটার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পড়িয়াও ফেলিয়াছিল, কিন্তু বেশিক্ষণ আর সে পড়িতে পারিল না। যে কারণে সে ইতিহাস পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, ঠিক সেই কারণেই তাহাকে এখন ইতিহাস পড়া স্থগিত রাখিতে হইল। সে আশা করিয়াছিল, ভন্টু একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া গণনা ও ফলাফল তাহাকে জানাইয়া যাইবে। কিন্তু ভন্টু তো কই আসিল না! এগারোটা প্রায় বাজে। ভন্টু তাহার সম্বন্ধে কি তথ্য আবিষ্কার করিল জানিবার জন্য তাহার মনটা ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল; ইতিহাস পড়ায় মন বসিতেছিল না। এতক্ষণ সে রামকিশোরবাবুর শয়নের প্রতীক্ষায় ছিল। রামকিশোরবাবু এই ব্লকের প্রবীণতম ছাত্র এবং 'মনিটার'। অনেক জোগাড়যন্ত্র করিয়া শঙ্কর একটি সিংগ্‌ল্‌-সিটেড রুম লইয়াছে, সুতরাং বাহিরে যাইতে হইলে তালা লাগাইয়া যাইতে হইবে। এ সময় শঙ্করের ঘরে তালা লাগানো থাকিলে তাহা রামকিশোরবাবুর দৃষ্টি এড়াইবে না। এ সকল বিষয়ে রামকিশোরবাবুর দৃষ্টি শ্যেনদৃষ্টি এবং তাঁহার এই শ্যেনদৃষ্টির ওপর নির্ভর করিয়া নব বিবাহিত সুপারিন্টেন্ডেন্ট মহাশয় (জনশ্রুতি, তিনি রামকিশোরবাবুর সহপাঠী ছিলেন) যখন-তখন কলিকাতাস্থ শ্বশুরালয়ে রাত্রি যাপন করিবার সুবিধা পান এবং রামকিশোরবাবুর রিপোর্টকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। সুতরাং রামকিশোরকে ভয় করিয়া চলিতে হয়।

ঘরে তালা লাগাইতে লাগাইতেই আলো নিবিয়া গেল। অন্ধকারে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শঙ্কর সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। নীচে গিয়া দারোয়ানকে চুপিচুপি কি বলিল। দারোয়ান প্রথমটা একটু আপত্তি করিয়া অবশেষে শঙ্করের পীড়াপীড়িতে রাজি হইল এবং গেট খুলিয়া দিতে দিতে নিম্নকণ্ঠে বলিতে লাগিল যে, শঙ্কববাবুর কথা অমান্য করিতে পারে না বলিয়া এই অন্যায় কার্যটি সে করিতেছে : কিন্তু এ 'বাত' প্রকাশ হইয়া পড়িলে তাহার 'নোক্‌রি' থাকিবে না। শঙ্কর তাহাকে আশ্বাস দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ভন্টুর সহিত আজ রাত্রে তাহার দেখা করিতেই হইবে। হাতে পয়সা ছিল না, সুতরাং হাঁটিয়াই সে চলিল। একা অন্যমনস্কভাবে চলিতে চলিতে শঙ্কর কখন যে একটা গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, তাহা তাহার খেয়াল ছিল না। যদিও অন্যমনস্কভাবে ঢুকিয়াছিল, কিন্তু ভুল গলিতে সে ঢোকে নাই। এই গলিটা দিয়া গেলেই সোজা সে বেলেঘাটার মোড়ে গিয়া হাজির হইতে পারিবে। অন্যমনস্কভাবে সে চলিতেছিল, সজ্ঞানভাবে পথের সম্বন্ধে সে সচেতন ছিল না। তাহার সমস্ত অন্তর একাগ্রভাবে যাহার দিকে উন্মুক্ত হইয়াছিল, সে রিনি। লজ্জিতা রিনি, কুণ্ঠিতা রিনি, স্বল্পভাষিণী রিনি, কাব্যানুরাগিণী রিনি, আয়তনয়না রিনি, ঈষৎ-হাস্যস্নিগ্ধা রিনি, বিরক্ত রিনি, বিপন্ন রিনি—রিনির নানা মূর্তি তাহার মনের মধ্যে আনাগোনা করিতেছে। আনাগোনার আর বিরাম নাই। অপলক দৃষ্টিতে শঙ্কর রিনির সঞ্চারমাণ নানা মূর্তির দিকে মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে, তাহার দেখারও আর বিরাম নাই, সে আর কিছু দেখিতেছে না। জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে সে রিনিকেই দেখিতেছে, ভাবিতেছে, মনে মনে স্পর্শ করিতেছে। তাহারই জন্য ইতিহাস অধ্যয়ন, তাহারই জন্য সমস্ত সত্তা উন্মুখ, তাহারই জন্য সে টাকা ধার

করিয়া ভন্টুকে দিয়াছে এবং তাহার মনের গোপন বাসনাটির ভবিষ্যৎ পরিণতি কোষ্ঠীগণনায় কিছুমাত্র আভাসিত হইয়াছে কি না— তাহাই অবিলম্বে জানিবার জন্য এত রাত্রে হাঁটিয়া সে চলিয়াছে। অথচ এই কয়েক দিন পূর্বেও সে রিনির কথা একবারও ভাবে নাই। দেখা হইলে সহজ শিষ্টতাসঙ্গত আলাপ-পরিচয় করিয়াছে, নমস্কারের পরিবর্তে প্রতিনমস্কার করিয়াছে। সহসা এ কি হইয়া গেল? অকারণে সহসা যেমন আকাশের একটা কালো মেঘ সূর্যকিরণ-রঞ্জিত হইয়া মহিমাময় হইয়া ওঠে, বায়ুতাড়িত ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সহসা যেমন বিরাট অগ্নিকাণ্ডের গরিমায় শিখায়িত হইয়া ওঠে, শঙ্কর তেমনই সহসা রিনির প্রেমে পড়িয়া আশা-আশঙ্কা তীব্র-মধুর উত্তেজনায় উন্মত্ত হইয়া পথ চলিতেছিল।

সহসা তাহার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল।

একটা খামের চিঠি সজোরে আসিয়া তাহার গায়ে লাগিল। রঙিন খামের চিঠি। গলির স্বল্পালোকে সে পড়িয়া দেখিল, উপরে লেখা রহিয়াছে—স্বর্ণলতা দেবী! ঘাড় ফিরাইতেই তাহার চোখে পড়িল, একটি খোলা জানালা। জানালার ভিতর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সে সবিস্ময়ে দেখিল, সেদিনকার সেই লোকটি অর্থাৎ ভন্টু যাহাকে মোমাবাতি বলিয়া পরিচয় করিয়া দিয়াছিল, সে এবং একটি কিশোরী কথাবার্তা বলিতেছে। টেবিলে রক্তজবার মতো একটি আলো। শঙ্কর সবিস্ময়ে পত্রখানা লইয়া ভাবিতেছিল, কি করা উচিত, পত্রখানা সে মৃন্ময়বাবুকে দিয়া যাইবে কি না! ওই উন্মুক্ত বাতায়নপথেই যে পত্রখানা আসিয়াছিল, তাহাতে শঙ্করের সন্দেহ ছিল না। কে এই স্বর্ণলতা!

হঠাৎ শঙ্করের কানে গেল, সেই কিশোরীটি বলিতেছে, ওটা কি ফেলে দিলে?

মৃন্ময় বলিল, ও একখানা বাজে কাগজ। তোমার রান্না হয়ে গেছে?

ওমা, রান্না তো ভারি! সব শেষ হয়ে গেছে কখন! তোমার রুটির নেচিগুলো করা আছে, এখনও বেলা সেঁকা হয়নি। ঠাকুরপো কখন খেয়ে নিয়েছে।

শঙ্করের মনে হইল, মৃন্ময় একটু যেন রূঢ়স্বরেই প্রশ্ন করিল, হঠাৎ এ ঘরে এলে কেন?

ইহাতে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া মেয়েটি হাসিয়া বলিতে লাগিল, একটা মজার জিনিস দেখাতে এলুম, চুপিচুপি এস এ ঘরে। বেড়াল-ছানাটা গোল হয়ে ফুলে তোমার বিছানার একধারে কেমন চোখটি বুজে বসে আছে, বেচারির শীত করছে বোধ হয়। তোমার মলিদার গলাবন্ধটা দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। দুষ্টু দুষ্টু মুখটি বেরিয়ে আছে খালি। দেখবে এস না, কেমন মজার দেখতে হয়েছে!

শঙ্কর আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। পত্রখানি পকেটে পুরিয়া সে অগ্রসর হইয়া গেল। নিজের তাগিদ ছিলই, তাহা ছাড়া এমনভাবে লুকাইয়া আড়ি-পাতাটা তাহার ভদ্র অন্তঃকরণে ভাল লাগিতেছিল না। পরে চিঠিখানা মৃন্ময়বাবুকে ফিরাইয়া দিলেই চলিবে। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর ভন্টুর বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কলিকাতা শহর ক্রমশ নীরব হইয়া আসিতেছে। মাঝে মাঝে এক একটা রিক্শর টুং টুং শব্দ, দুই-একটা ইতস্তত-অপেক্ষমাণ ফিটন-গাড়ির গাড়োয়ানের আহ্বান অথবা ধাবমান মোটরের আকস্মিক আবির্ভাব ছাড়া চতুর্দিক ঘুমন্ত। মাঝে মাঝে এক-আধটা পানের দোকানে কদাচিৎ দুই-একজন পুরুষ অথবা নারী দেখা যাইতেছে। কোনো বৃহৎ অট্টালিকার গাড়িবারান্দার নিচের আলোটা হঠাৎ নিবিয়া গেল। এই শীতে রাস্তার ফুটপাথের ওপর ঘুমন্ত দরিদ্র নরনারী স্থানে স্থানে

কুণ্ডলী পাকাইয়া রহিয়াছে। এই জাতীয় নানা জিনিস দেখিতে দেখিতে শঙ্কর অবশেষে ভণ্টুর বাসায় পৌঁছিল। পৌঁছিয়া দেখিল, গভীর নীরবতা চতুর্দিকে আচ্ছন্ন। ওদিককার একটা ঘরে যেন একটি আলো জ্বলিতেছে।

ভণ্টু ভণ্টু!—শঙ্কর ডাকিতে লাগিল।

অনেক ডাকাডাকির পর ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে শণ্টু—ভণ্টুর ভাইপো—মুখ বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে?

আমি শঙ্কর, ভণ্টু কোথায়?

কাকাবাবু এখনও বাড়ি ফেরেননি।

ইহার পর শঙ্কর কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

শণ্টুই আবার বলিল, এখুনি ফিরবেন বোধহয়। আপনি একটু বসবেন?

বেশ, চল।

বসিবার মতো বাহিরে কোনো পৃথক ঘর ছিল না। শঙ্করকে একেবারে অন্তঃপুরেই যাইতে হইল। গিয়াই তাহার বউদিদির সহিত দেখা হইয়া গেল। তিনি শঙ্করের সাড়া পাইয়া শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়াছেন। জ্বর হওয়াতে মুখখানি থমথম করিতেছে। কিন্তু তাঁহার ঢলঢলে কালো মুখখানি শঙ্করকে দেখিয়া হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, মেঘলা দিনে যেন সহসা এক ঝলক রৌদ্র দেখা দিল। তাম্বুলরঞ্জিত শুষ্ক অধর দুইটি সহসা যেন সজীবতা প্রাপ্ত হইল। শঙ্কর দেখিল, বউদিদির কালো ডাগর চক্ষু দুইটি জ্বরের উত্তাপে আরও যেন আবেশময় হইয়া উঠিয়াছে। শঙ্কর একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া গায়ের ছিন্ন র‍্যাপারটা সর্বাঙ্গে জড়াইতে জড়াইতে বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, দেখছ কি শঙ্কর ঠাকুরপো? এত রাত্রে হঠাৎ এলে যে?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া শঙ্কর বলিল, জ্বর হয়েছে নাকি?

হ্যাঁ।

ভণ্টু এখনও ফেরেনি?

ওষুধ আনছি বলে সেই যে সন্ধে থেকে বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি। চেনোই তো তাকে, একবার কোথাও বসলে আর ওঠবার নামটি করবে না।

শঙ্কর মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, ভণ্টু তো তাহারই জন্য জ্যোতিষীর বাড়ি গিয়াছে। কিছু না বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে বলিল, আপনার ওষুধ-বিষুধের কোনো ব্যবস্থা না করেই বেরিয়েছে সে? আশ্চর্য তো!

বউদিদি বলিলেন, সন্ধের সময় পাড়ার ডাক্তারবাবুকে ডেকে এনেছিল। একটু হাসিয়া বলিলেন, খুব ভাব করেছে তাঁর সঙ্গে। তিনিই এসে একটা প্রেসক্রিপ্‌সন লিখে দিয়েছেন, তাই আনতেই তো বেরুল। কোথাও আটকে গেছে বোধহয়। কিংবা, কি জানি—

বউদিদির মুখে ক্ষণিকের জন্য ছায়াপাত হইল।

মা, খিদে পেয়েছে।

শণ্টুর ভাই নণ্টু বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়াছে। দিগম্বর মূর্তি, বয়স বছর পাঁচেক হইবে। সে শঙ্করকে দেখিয়া একটু থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এই স্বল্প পরিচিত লোকটির সমক্ষে ক্ষুধার জন্য মাকে বিব্রত করা যে অশোভন হইবে, তাহা সে যেন অনুভব করিল।

মায়ের পাশটিতে দাঁড়াইয়া বাঁ হাতে চোখ কচলাইতে কচলাইতে আড়চোখে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে শঙ্করের দিকে সে চাহিতে লাগিল।

বউদিদি বলিলেন, তুমি একটু বস শঙ্কর-ঠাকুরপো, আমি এটাকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিই। চল্, খাবি চল্।

শিশুকে লইয়া বউদিদি ঘরের ভিতর ঢুকিলেন।

শঙ্কর শুনিতে পাইল, শিশু বলিতেছে—সাবু খাব না।

লক্ষ্মী সোনা আমার, কাল সকালে বেগুনভাজা দিয়ে ভাত করে দেব, কেমন? এখন এইটুকু খেয়ে শুয়ে পড় তো ধন,—নন্টুবাবু ভারি লক্ষ্মীছেলে, খেয়ে ফেলো তো বাবা চোঁ-চোঁ করে।

এত মিনতি সত্ত্বেও কিন্তু সাবু খাইতে সে সহসা রাজি হইল না। বায়না করিতে লাগিল। বউদিদিরও ধৈর্য অসীম, অনেক কষ্টে তাহাকে ভুলাইয়া সাবুটুকু খাওয়াইলেন ও বিছানায় শোয়াইয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া হাসিমুখে শঙ্করের সহিত গল্প করিতে বসিলেন, এমন সময় ফনতি উঠিয়া আসিল ও মায়ের কানে ফিসফিস করিয়া বলিল যে, তাহারও ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। শঙ্করকাকার সম্মুখে ক্ষুধার কথাটা চেঁচাইয়া বলিতে তাহার লজ্জা হইল। হাজার হোক্, সে একটু বড় হইয়াছে তো!

বউদিদি বলিলেন, ওই যে কড়াতে ঢাকা দেওয়া আছে, একটু ঢেলে নিয়ে খেয়ে শুয়ে পড় না মা, আমি শঙ্করকাকার সঙ্গে একটু কথা বলি।

ফনতি ভিতরে চলিয়া গেল। একটু পরে ভিতর হইতে সে প্রশ্ন করিল, একটু দুধ মিশিয়ে নেব মা?

দুধ আবার কেন ফনতু ! একটুখানি দুধ আছে, বাবা আবার এখুনি হয়তো চা চাইবেন।

ভিতর হইতে আর কোনো উত্তর আসিল না।

শঙ্কর প্রশ্ন না করিয়া পারিল না—এদের সবারই জ্বর নাকি, সব সাবু খেতে দিচ্ছেন যে?

বউদিদির মুখে যেন মেঘ নামিয়া আসিল। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য। সহাস্যমুখে তিনি বলিলেন,জ্বর না হলেও গা-ছ্যাঁক-ছ্যাঁক করছে সবগুলোরই; তাছাড়া নিজে জ্বরে মরছি, এদের জন্য আর ভাতের হাঙ্গাম করিনি রাত্তিরে। বাবাকে অবশ্য খানকতক লুচি করে দিয়েছি সন্ধেবেলা। আমাদের জন্যে আর কিছু করিনি এ বেলা।—বলিয়া বউদিদি হাসিয়া গায়ের কাপড়টা আর একটু জড়াইয়া জড়োসড়ো হইয়া বসিলেন।

শীত করছে বউদি? আমার গায়ের কাপড়টা নেবেন?

না না, থাক্—এতেই আমার বেশ গরম হচ্ছে।

পাশের ঘরে খুটখাট করিয়া শব্দ হইতে লাগিল।

বউদিদি বলিলেন, বাবা উঠেছেন।

পরমুহূর্তেই দরাজকণ্ঠে ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, বউমা, ভণ্টু এসেছে নাকি?

বউদিদি উঠিয়া ভিতরে গেলেন। একটু পরেই সে শুনিতে পাইল, বৃদ্ধ বলিতেছেন, কে—শঙ্কর এসেছে নাকি? এত রাত্রিরে হঠাৎ? খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো? জিজ্ঞেস কর সেটা। এখানেই ডেকে আন না, এই শীতে বাইরে কেন?

বউদিদি বাহিরে আসিয়া ডাকিতেই শঙ্কর ভিতরে গেল। গিয়া দেখিল, ভণ্টুর বাবা

কলিকায় ফুঁ দিতেছেন। গায়ে একটি দামি সাদা সোয়েটার। কলিকার আগুনের আভায় তাঁহার গৌরবর্ণ মুখখানি বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। শঙ্কর প্রবেশ করিতেই বলিলেন, 'এস এস, এত রাত্তিরে কি মনে করে? বাইরেই বা বসে কেন, যা ঠাণ্ডাটা পড়েছে!'

ভণ্টুর কাছে দরকার ছিল একটু।—বলিয়া শঙ্কর নিকটস্থ টুলটিতে বসিল। বউদিদি বৃদ্ধের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া শঙ্করের উক্তি তাঁহার কর্ণগোচর করিলেন। ভণ্টুর বাবা কালা। খুব চিৎকার করিয়া কথা না বলিলে তিনি শুনিতেই পান না। কানের খুব কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলে অবশ্য শুনিতে পান। সাধারণত ভণ্টুর বউদিদিই সকলের কথা তাঁহাকে এইভাবে শুনাইয়া থাকেন।

শুনিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, ভণ্টু এখনও ফেরেনি বুঝি? কটা বাজে?—এই বলিয়া বৃদ্ধ বালিশের নীচে হইতে চশমা বাহির করিয়া পরিধান করিলেন ও দেওয়ালের ব্রাকেটের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, রাত তো খুব বেশি হয়নি, দশটা বাজে মোটে, এইবার ফেরবার সময় হয়েছে ভণ্টুর।

শঙ্কর বিস্মিত হইল। সেই তো হস্টেল হইতে বাহির হইয়াছে এগারোটার পর। সে বলিতে যাইতেছিল যে, ঘড়িটা বোধহয় স্লো আছে—বউদিদি চোখ টিপিয়া নিষেধ করিলেন।

বৃদ্ধ কলিকাটি গড়গড়ার মাথায় বসাইয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, খাওয়া-দাওয়া সেরে এসেছ তো? না এসে থাক তো বউমা খানকয়েক লুচি ভেজে দিক।

আমি খেয়ে এসেছি।

বউদিদির মারফত এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, চা একটু হোক তা হলে। চায়ের তো আর সময়-অসময় নেই, কি বল বউমা? আমাকেও একটু দিও।

পুরু লেন্সের চশমায় আলো বিকিরণ করিয়া তিনি বউমার দিকে চাহিতেই বউদিদি বলিলেন, হ্যাঁ, দিচ্ছি করে।

বউদিদি একটু হাসিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

শঙ্কর বসিয়া বসিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল, ইহাদের সংসারে নানাবিধ অভাব সত্ত্বেও বৃদ্ধের কোনোরূপ অসচ্ছলতা নাই। তাঁহার পরিষ্কার বিছানাপত্র, নেটের ফরসা মশারি, সারি সারি কলিকা, দামি গড়গড়া, দামি চটিজুতা, আলনায় পরিষ্কার কাপড়-জামা, চকচকে গাড়ুর ওপর পাট-করা লাল গামছাখানি—দেখিয়া মনে হয়, যেন কোনো ধনী বৃদ্ধ দুই-চারিদিনের জন্য আসিয়া এই দরিদ্র পরিবারে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছে, ইহার ঘরের বাহিরেই যে দৈন্য নানা মূর্তিতে প্রকট হইয়া রহিয়াছে, তাহার লেশমাত্র আভাসটুকুও এ ঘরের মধ্যে নাই।

বৃদ্ধ চক্ষু বুজিয়া তামাক খাইতেছিলেন। হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া শঙ্করকে বলিলেন, তুমি এসেছে ভালই হয়েছে, নানাদিক থেকে চিঠিপত্র লিখে উত্যক্ত করে তুলেছে আমাকে—বলিয়া বৃদ্ধ চক্ষু বুজিয়া আবার তাম্রকূটে মন দিলেন। একটু পরেই আবার চোখ খুলিয়া বলিলেন, ভণ্টুর বিয়ের কথা গো। তোমরা দেখেশুনে একটা ঠিক করে ফেল। বয়সও তো হয়েছে। আজকালই সব ধেড়ে ধেড়ে ছেলের বিয়ে হয়, আমাদের কালে—। বৃদ্ধ আবার চক্ষু বুজিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ টানিয়া পুনরায় বলিলেন, আমার যখন বিয়ে হয়, তখন আমার বয়স ষোল বছর আর ভণ্টুর গর্ভধারিণীর বয়স তখন আট কি নয়! আমার পিতার বিবাহ হয় আরও সকাল সকাল—বারো বছর বয়সে। পুনরায় তামাকে মন দিলেন।

বাহিরে ভণ্টুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

বউদি! বউদি শন্টু!

শঙ্কর উঠিয়া বাহিরে যাইবার জন্য দাঁড়াইতেই ভণ্টুর বাবা চক্ষু খুলিয়া বলিলেন, যাচ্ছ কোথা, বস। এখানেই বউমা চা আনবে এখন।

শঙ্কর বলিল, ভণ্টু এসেছে।

অ্যাঁ, কি বললে?

শঙ্কর তখন তাঁহার কাছে গিয়া একটু চিৎকার করিয়াই তাহার কথার পুনরুক্তি করিল এবং বাহির হইয়া আসিল। বাহিরে আসিয়াই শুনিতে পাইল, বউদিদি বলিতেছেন—ছি ছি, এত রাত্তির করে মানুষে! তোমার অপেক্ষায় থেকে থেকে ছেলেমেয়েগুলো ঘুমিয়ে পড়ল, উনুনের আঁচ গেল। শঙ্কর-ঠাকুরপো এসেছে, বসে আছে বাবার ঘরে। এই যে—

শঙ্কর ও ভণ্টু মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইল ও নিমেষের জন্য নীরবে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার পর ভণ্টু বলিল, কিরে, তুই হঠাৎ?

জানতে এলাম।

জানতে এলি? আচ্ছা উন্মাদ তো তুই ! আয়, বাইকটা ধরে তুলি দুজনে।

বউদিদি বলিলেন, তা হলে তোমরা এস তাড়াতাড়ি, চায়ের জল হয়ে গেছে।

শঙ্কর বলিল, স্টোভের আওয়াজ পেলাম না, চায়ের জল করলেন কি করে?

বউদিদি বলিলেন, উনুনে আঁচ ছিল।

বউদিদি এই বলিয়া ভণ্টুর দিকে চাহিলেন। ভণ্টু ও বউদিদির ভাষাময় একটা দৃষ্টি বিনিময় হইয়া গেল। শঙ্কর একটু বিস্মিত হইয়াছিল। বলিল, ব্যাপার কি?

ওসব মেয়েলি ব্যাপারে তোর ঢোকবার দরকার কি? আয়, বাইকটা তুলি।

শঙ্কর ও ভণ্টু বাহিরে গেল।

বাহিরে গিয়া শঙ্কর দেখিল, বাইকটি বারান্দার নীচে ঠেসানো রহিয়াছে। অন্ধকারেই শঙ্কর দেখিতে পাইল যে, বাইকের পশ্চাতে ও সম্মুখে নানারূপ জিনিস বাঁধা ও ঝুলানো রহিয়াছে।

থাম্, মোমবাতিটা জ্বালি।

পকেট হইতে দিয়াশলাই বাহির করিয়া জ্বালিতেই শঙ্করের চোখে পড়িল, সেই কাগজের ঠোঙাটি বারান্দায় নামানো রহিয়াছে। তাহার ভিতর হইতে ক্ষুদ্র মোমবাতিটি বাহির করিতে করিতে ভণ্টু বলিল, উঃ, রাস্তায় এতগুলো জিনিস নিয়ে যেন সার্কাস করতে করতে এসেছি।

জিনিসপত্র সমেত বাইকটা দুইজনে ধরিয়া উপরে তুলিয়া ফেলিল। তাহার পর ভণ্টু বাইকটাকে ঠেলিয়া ভিতরে আনিতে আনিতে নিম্নকণ্ঠে শঙ্করকে বলিল, সব হদিস পেয়েছি তোর।

কি হদিস?

পরে সব বলব। এখানে সে সব কথা বলার সুবিধে হবে না।

দুই পেয়ালা চা লইয়া বউদিদি রান্নাঘর হইতে বাহির হইলেন ও ভণ্টুর কথার শেষার্ধ শুনিয়া বলিলেন, কি সুবিধে হবে না? নাও, চা নাও। কি সুবিধে হবে না?

ভণ্টু গম্ভীর মুখে বলিল, শঙ্করের সব ফ্রগিশ অ্যাফেয়ার, ঢুকো না ওতে।

বউদিদি হাস্য-দীপ্ত চক্ষে শঙ্করের পানে চাহিয়া আবার রান্নাঘরে ঢুকিলেন ও আর এক পেয়ালা চা লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ভণ্টু প্রশ্ন করিল, আবার কার চা?

বাবার।

চা লইয়া তিনি ঘরে ঢুকিলেন।

ভণ্টু মুখ সূচালো করিয়া তাহার স্থূল শরীরের উপরার্ধ নাচাইতে নাচাইতে বলিতে লাগিল, বা কুর কুর কুর কুর—

শঙ্করের চা খাওয়া হইয়া গিয়াছিল। ভণ্টু তাহার কি হদিস পাইয়া আসিয়াছে, না শোনা পর্যন্ত তাহার আর স্বস্তি ছিল না। ভণ্টুকে সে বলিল, চল, বাইরে যাই।

থাম্, জিনিসগুলো বিড়্ডিকারের জিম্মায় দিয়ে দিই আগে। বিড়্ডিকার মানে বউদিদি। চা দিয়া বৌদিদি বাহির হইয়া আসিলেন। ভণ্টু উঠিয়া বাইক হইতে খুলিয়া খুলিয়া জিনিসগুলি তাঁহাকে দিতে লাগিল। ভণ্টু জিনিস আনিয়াছিল কম নয়—চাল, ডাল, মশলা, শিশিতে করিয়া তেল, কিছু কমলালেবু, এক শিশি ঔষধ ও সেফ্‌টিপিন প্রভৃতি টুকিটাকি নানারকম জিনিস। সব নামাইয়া দিয়া ভণ্টু বলিল, তুমি এবার শুয়ে পড় বউদি। এই নাও, তোমার জন্য কমলালেবু এনেছি, শুয়ে শুয়ে ধ্বংস করগে যাও। চারটি ভাতে-ভাত আমিই ফুটিয়ে নিচ্ছি।

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, ও বাহাদুরি আর করে কাজ নেই। হাত-পা পুড়িয়ে সে বারের মতো শেষে এক কাণ্ড করে বস আর কি!

ভণ্টু মুখ বিকৃত করিয়া তাঁহাকে ভ্যাংচাইতে লাগিল। বউদিদি হাসিতে হাসিতে জিনিসপত্র তুলিতে লাগিলেন।

শঙ্কর বলিল, বউদি, আপনার জ্বর এখন কত?

আছে বোধহয় একটু—সামান্যই হবে।

ভণ্টু ভিতরে গিয়া একটা থার্মোমিটার লইয়া আসিয়া বলিল, এটা বাগিয়েছি আজ ধীরেনবাবুর কাছে। লাগাও তো দেখি।

বউদিদি প্রথমে রাজি হইলেন না, অনেক বলা-কহার পর হইলেন। থার্মোমিটার লাগাইয়া দেখা গেল, জ্বর ১০২ ডিগ্রি। শঙ্কর আশ্চর্য হইয়া গেল। এত জ্বর লইয়াও বেশ স্বচ্ছন্দে হাসিমুখে রহিয়াছেন তো! বলিল, আপনি শুয়ে পড়ুন।

ভণ্টু গম্ভীরভাবে বলিল, কেন ইউস্‌লেস অ্যাফেয়ারে ঢুকেছিস? চল, বাইরে যাই। বিড়্ডিকার is as obstinate as a mule.

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, পাগল হয়েছ তোমরা! অত জ্বর আমার নেই, ও থার্মোমিটার তোমাদের ভুল। ভাঙা থার্মোমিটার বলেই ধীরেন ডাক্তার দিয়ে দিয়েছে।

এতদুত্তরে ভণ্টু মুখ বিকৃত করিয়া একবার তাঁহাকে ভ্যাঙাইল ও শঙ্করকে টানিয়া লইয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে ভয়ানক শীত। শঙ্কর প্রথমেই প্রশ্ন করিল, কি হল কুষ্ঠির?

অনেক প্যাঁচ তোর; করালী বললে—একদিনে হবে না।

প্যাঁচ? কি প্যাঁচ?

সঙিন প্যাঁচ এবং রঙিন প্যাঁচ। এর বেশি করালী আর কিছু বললে না। সব খুলে বলবে বলেছে আর একদিন। তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব সেদিন।

শঙ্কর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভণ্টুর দিকে চাহিয়া রহিল।

আর কিছু বললে না?

না। উঃ, কি শীত রে! চল্, ভেতরে চল্।

আসিতে আসিতে শঙ্কর বলিল, কোনো খবর পেলি মেজকাকার?

কিচ্ছু না। ঘড়েল বাবাজি কোনো খবর রেখে যায়নি।

শঙ্কর আবার প্রশ্ন করিল, করালী লোকটা রিলায়েব্ল্ তো?

ভণ্টু দাঁড়াইয়া হাত দুইটি বিস্তার করিয়া সংক্ষেপে বলিল, গোদা চাম।

ভণ্টু গমনোদ্যত হইলে শঙ্কর বলিল, দাঁড়া, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তুই এত রাত্রে বাজার করে নিয়ে এলি মানে? ছেলেগুলো সব সাবু খাচ্ছে—

ভণ্টু দন্ত বিকশিত করিয়া হাসিয়া বলিল, নো মানি। দাদা টাকার অভাবে পড়ে পুরী থেকে টেলিগ্রাম করেছিলেন, তাঁকে টি.এম.ও. করতে গিয়ে অদ্য-ভক্ষ্য-ধনুর্গুণ গোছ হয়ে দাঁড়াল। কি করব বল? উপায় কি? অনেক কষ্টে ধারধোর করে জোগাড় করলাম কিছু টাকা। সব ফুরিয়ে গিয়েছিল, মায় চাল পর্যন্ত। চল্, ভেতরে চল্, বাইরে বড় ঠাণ্ডা।

ভিতরে আসিলেই বউদিদি ভণ্টুকে বলিলেন, আর একটু হলেই শঙ্কর ঠাকুরপো সব মাটি করেছিল। বাকুর ঘড়ি যে তুমি যাবার সময় দম দেবার নাম করে দু-ঘণ্টা স্লো করে দিয়েছিলে, আর একটু হলেই সব ফাঁস হয়ে গিয়েছিল।

ভণ্টু বলিল, সর্বনাশ! বাকুর ঘড়ি দরকার মতো স্লো-ফাস্ট আমরা হবদম করছি। খবরদার, ও বিষয়ে কক্ষনও কিছু বলিস্ না! বরং এমন ভাব করবি যে, ওইটেই বেস্ট্ ঘড়ি ইন্ ক্যাল্কাটা।

বউদিদি হাসিতে লাগিলেন।

ভণ্টু বলিতে লাগিল, মেজকাকা যে সরেছে, তাই বাকু জানে না এখনও। বাকু জানে, মেজকাকা প্রাণপণে চাকরির চেষ্টা করছে, সেইজন্যেই বাইরে যেতে হয়েছে। খবরদার বেফাঁস কিছু বলে ফেলিসনি কোনোদিন!

শঙ্কর একটু হাসিল। তাহার পর বলিল, আমি এখন যাই ভাই, রাত হয়েছে। এতটা আবার হাঁটতে হবে তো!

থেকে যা না আজ রাত্তিরে, লদ্‌কালদ্‌কি করা যাক্।

না, তা হয় না। হস্টেল থেকে পালিয়ে এসেছি তো, ফিরে না গেলে জানাজানি হয়ে যাবে। যা রামকিশোরবাবু আছে, সেই তোর বক।

ভণ্টু বলিল, ও, মিস্টার ক্রেন?

হ্যাঁ।

তা হলে যা! কাল আবার দেখা করব।

হ্যাঁ, নিশ্চয় আসিস। যাই তা হলে বউদি।

এস।

হ্যারিসন রোড দিয়া শঙ্কর একা হাঁটিয়া চলিয়াছিল।

নানারূপ এলোমেলো চিন্তার আলোছায়ায় সমস্ত মনখানা তাহার বিচিত্র। মৃন্ময় ও তাহার চিঠির কথাটা সে এতক্ষণ ভুলিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। চিঠিখানা পকেট হইতে বাহির করিয়া রাস্তার আলোকে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এ কি, এ যে রীতিমত

প্রেমপত্র! কে এই স্বর্ণলতা! হঠাৎ পিছন দিক হইতে একখানা মোটরকার আসিয়া তাহার পাশে থামিল।

শঙ্করবাবু যে, এখানে কি করছেন এত রাত্রে?

শঙ্কর চমকাইয়া তাড়াতাড়ি পত্রখানা পকেটস্থ করিল। ফিরিয়া দেখিল, অচিনবাবু। সেদিন প্রফেসার মিত্রের বাড়িতে রিনির জন্মতিথি-উৎসবের দিন ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। অচিনবাবু মোটরকারের দালাল। দালালি করবার মতো সঙ্গতি আছে, দক্ষতাও আছে। শ্যামবর্ণ নাতিস্থূল বলিষ্ঠ ব্যক্তি। মাথায় সুবিন্যস্ত কোঁকড়ানো চুল। ভাসা-ভাসা চোখে দামি সোনার চশমা। কালো রঙে সোনার চশমা মানাইয়াছিল ভাল। মোটরখানিও দামি।

এখানে কি করছেন?

একটি বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম, ফিরছি।

আসুন তা হলে, লিফট্ দিয়ে দিই।

চলুন।

মৃন্ময়ের বাড়িতে ফিরিয়া তাহার জানালা গলাইয়া পত্রটি তাহার বাহিরের ঘরটিতে ফেলিয়া দিয়া যাইবে—এই উদীয়মান ইচ্ছাটি আর পূর্ণ হইল না। শঙ্কর অচিনবাবুর গাড়িতে চাপিয়া বসিল। গাড়িতে উঠিয়াই একটা তীব্র এসেন্সের গন্ধ সে পাইল। হাসিয়া বলিল, খুব গন্ধের ছড়াছড়ি দেখছি আপনার গাড়িতে!

গাড়িটা স্টার্ট করিয়া খুব গম্ভীরভাবে অচিনবাবু বলিলেন, হ্যাঁ, এইমাত্র একজন সুরভিত প্রাণীকে নাবিয়ে দিয়ে এলাম।

জিজ্ঞেস করতে পারি কি, কে তিনি?

জিজ্ঞেস আপনি অবশ্যই করতে পারেন, কিন্তু উত্তর দেওয়ার স্বাধীনতা আমার নেই।

স্টিয়ারিং ধরিয়া গম্ভীরমুখে অচিনবাবু সম্মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। দ্রুত নিঃশব্দ বেগে গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে।

শঙ্কর মৃদুহাস্য করিয়া বলিল, আর প্রয়োজনও নেই, উত্তর পেয়ে গেছি।

অচিনবাবু তথাপি নীরব।

শঙ্করের মনে হইল, যেন তাঁহার চোখের কোণে একটা অতি চাপা মৃদুহাস্য উঁকি দিতেছে। মুখ কিন্তু গম্ভীর। একটা রিকশওয়ালা গলি হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে বাহির হইল। তাহাকে পাশ কাটাইয়া অচিনবাবু আপন মনেই যেন বলিলেন, মানুষমাত্রেই অহঙ্কারী। এইটেই বোধহয় মানুষের বিশেষত্ব।

শঙ্কর কিছু বলিল না। একটু পরেই গাড়ি আসিয়া শঙ্করের হস্টেলের সম্মুখে দাঁড়াইল। শঙ্কর নামিয়া পড়িল। অচিনবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, একটা ভুল ধারণা নিয়ে থাকবেন না যেন শঙ্করবাবু। যাঁর গন্ধ এতক্ষণ উপভোগ করতে করতে এলেন, তিনি নারী নন—পুরুষ।

এটা তা হলে কার?

শঙ্কর একটা সোনার মাথার কাঁটা অচিনবাবুর হাতে দিয়া হাসিয়া বলিল, গাড়ির সিটে ছিল।

অচিনবাবুর গাম্ভীর্য এতটুকু বিচলিত হইল না।

ও, ওটা আর একজনের। দিন। অনেক ধন্যবাদ। চলি তবে—গুড নাইট!

মোটর চলিয়া গেল।

শঙ্কর নির্বাক হইয়া সেইদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

।। চোদ্দো ।।

মুকুজ্জেমশাই যখন মৃন্ময়ের বাসায় আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আসন্ন অপরাহ্নের ম্লান রৌদ্রালোকে ক্ষুদ্র গলিটি তন্দ্রাতুর। চারিদিকে কোনো জীবনের লক্ষণ নাই। একেবারে যে নাই তাহা নহে, একটি ডাস্টবিনের ওপর উঠিয়া একটি লোম-ওঠা শীর্ণ কুকুর লুব্ধ আগ্রহে কি যেন খাইতেছে, কিছুদূরে একটা গলিতে ঢং ঢং শব্দ করিয়া একটা বাসনবিক্রেতা বাসন ফেরি করিতেছে। ইহা ছাড়া চতুর্দিকে আর বিশেষ কোনো চাঞ্চল্য নাই। মুকুজ্জেমশাই আসিয়া ডাকিতেই ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া গেল এবং তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন। মুকুজ্জেমশাই নামক ব্যক্তিটির সহিত অনেকেই পরিচিত, কিন্তু তাঁহার আসল পরিচয় কেহই বোধহয় জানে না। পরিচিত মহলে তিনি 'মুকুজ্জেমশাই' নামেই খ্যাত, নাম জিজ্ঞাসা করিলেই বলিয়া থাকেন—ভবতোষ মুখোপাধ্যায়। ইহার বেশি নিজের আর কোনো পরিচয় তিনি কাহাকেও দেন না। তাঁহার সম্বন্ধে কেহ বেশি কৌতূহল প্রকাশ করিলে বলেন, পৃথিবীর অনেক জিনিসই তো জান না, এটাও না হয় না জানলে! বলেন আর হাসেন। তাঁহার শ্মশ্রুগুম্ফসমাচ্ছন্ন মুখের হাসিতে অসামান্য একটি মাধুর্য আছে। আয়ত আরক্ত চক্ষু দুইটি সরল স্নিগ্ধ মধুর হাসিতে সর্বদাই যেন ঝলমল করিতেছে। মুকুজ্জেমশাইয়ের নিজের কাজ বলিয়া কিছু নাই, কারণ তাঁহার নিজস্ব সাংসারিক কোনো বন্ধনই নাই। কিন্তু মুকুজ্জেমশাই সর্বদাই বিব্রত ও ব্যস্ত, নানা কাজের চাপে তিনি নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর পান না। পরের জন্য চাকরি জোগাড় করা, কে আপিসের টাকা ভাঙিয়া জেলে গিয়াছে তাহার সংসারের তত্ত্বাবধান করা ও জেল হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার নানাপ্রকার তদ্বির করা, কোথায় কোন্ রোগী আছে তহার ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করা, ভিড়ের দিনে অল্প পয়সার মধ্যে থিয়েটারের জন্য টিকিট সংগ্রহ করা ইত্যাদি বহু বিচিত্র কর্মভারে মুকুজ্জেমশাই সর্বদাই নিপীড়িত। আজ তিনি কলিকাতায় আছেন, কাল রাজমহলে এবং তৎপরদিন দিনাজপুরে চলিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। সম্প্রতি তিনি কলিকাতা আসিয়াছিলেন শিরীষবাবুর পুত্রের অসুখের সম্পর্কে। পুত্রটি তো মারা গিয়াছে, এখন কন্যাটির বিবাহ ব্যাপারে তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছেন। মৃন্ময়ের সহিত মুকুজ্জেমশাইয়ের আলাপ বেশি দিনের নয়। হাসির বাবার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল এবং হাসির স্বামী হিসাবেই তিনি মৃন্ময়ের পরিচয় লাভ করিয়াছেন। যে বড় পুলিশ অফিসারটি হাসিকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তিনিও মুকুজ্জেমশাইয়ের একজন ভক্ত এবং মুকুজ্জেমশাইয়ের সুপারিশেই তিনি একদা হাসির ভার লইয়াছিলেন। সুতরাং মৃন্ময়ের অপেক্ষা হাসিই মুকুজ্জেমশাইয়ের বেশি আত্মীয়। মুকুজ্জেমশাই বাড়িতে ঢুকিয়া দেখিলেন, হাসি ছাড়া বাড়িতে কেহ নাই। হাসি মুকুজ্জেমশাইকে দেখিয়া বলিল, আপনি এলেন, তবু বাঁচলুম!

এরা সব কোথা?

ঠাকুরপো এখনও কলেজ থেকে ফেরেনি। আর জানেন, উনি আজ দু'দিন বাড়ি নেই! কি বিচ্ছিরি বলুন তো?

কোথা গেছে মৃন্ময়?

কি জানি! আপিসের কাজে কোথায় গেছে।

সি. আই. ডি-র কর্মে মৃন্ময়কে প্রায়ই বাহিরে যাইতে হয়। মুকুজ্জেমশাই হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, কবে ফিরবে কিছু বলে গেছে?

ঠোঁট ও হাত উল্টাইয়া হাসি বলিল, কিছু না। যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা করে পর্যন্ত যায়নি। অপিস থেকে বাইরে চলে গেছে। একটা কনস্টেবলের হাতে ঠাকুরপোকে একটা চিঠি লিখে দিয়ে গেছে যে, ফিরতে দু'চার দিন দেরি হতে পারে, আমরা যেন না ভাবি। দেখুন একবার আক্কেল!

মুকুজ্জেমশাই সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, কি করবে বেচারি, ও-চাকরিই হল ওই রকম। মুখে আগুন অমন চাকরির।—এই বলিয়া হাসি একটি কম্বল আনিয়া বিছাইয়া দিল। কম্বলে উপবেশন করিয়া মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, কই, তোর বেড়ালছানাটা কোথায়?

হাসির চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।

কাল সকালে সেটা মরে গেছে।

মরে গেছে! আহা! কি করে?

ঠাকুরপোর জন্যে। সদর-দরজাটা কখন খুলে রেখেছিল, আর ও অমনই সুট করে কখন বেরিয়ে গেছে রাস্তায়। বাস্, ওদের বাড়ির কুকুরটা এসে খ্যাঁক করে কামড়ে দিলে।

তক্ষুনি মরে গেল?

না, বেঁচেছিল খানিকক্ষণ।

সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, আহা!

ঠাকুরপোটা এমন পাষণ্ড—কি বললে, শুনবেন? বললে—বাঁচা গেছে, আপদ গেছে।

ইহার উত্তরে মুকুজ্জেমশাই কিছু বলিলেন না দেখিয়া অধিকতর উষ্মাভরে হাসি বলিল, আপনি আশকারা দিয়ে দিয়ে ঠাকুরপোকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিলেন।

ইহার উত্তরেও মুকুজ্জেমশাই কিছু বলিলেন না। উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব। বিড়ালের শোকে হাসি খুব বেশি ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে নাই, তাহার কারণ সে পরমুহূর্তেই বলিল, আচ্ছা আপনার চুলের দশা কি হয়েছে?

উত্তরে মুকুজ্জেমশাই হাস্য-দীপ্ত চক্ষুর দৃষ্টি তাহার মুখের ওপর স্থাপিত করিলেন।

হাসি আবার বলিল, আঁচড়ে দেব?

দে।

হাসি ঘরের ভিতর হইতে একটি বড় চিরুনি আনিয়া মুকুজ্জেমশাইয়ের কেশ-সংস্কারে লাগিয়া গেল। মুকুজ্জেমশাইয়ের কেশ-সংস্কার খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। একমাথা বড় বড় তৈলবিহীন রুক্ষ চুল আয়ত্তে আনা শক্ত। হাসি মরিয়া হইয়া চিরুনি চালাইতে লাগিল। মুকুজ্জেমশাই ধৈর্যসহকারে চোখ-মুখ কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিলেন। খানিকক্ষণ পরে হাসির হুঁশ হইল।

লাগছে আপনার?

পাগল! একটুও না।

এক কাজ করি বরং, আগে একটু তেল দিয়ে নিই, বেশ ভাল তেল আছে আমার।

মুকুজ্জেমশাইয়ের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া হাসি পুনরায় ঘরের ভিতর গেল এবং তৈল লইয়া আসিল। মুকুজ্জেমশাই আপত্তি করিলেন না। তৈল সহযোগে ক্রমাগত আঁচড়াইয়া আঁচড়াইয়া হাসি যখন মুকুজ্জেমশাইয়ের চুলের শ্রী অনেকটা ফিরাইয়া ফেলিয়াছে, তখন চিন্ময় কলেজ হইতে ফিরিল। ঢুকিতে ঢুকিতেই সে বলিল, ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে বউদি, শিগ্‌গির খাবার দাও!

তাহার পর মুকুজ্জেমশাইকে দেখিতে পাইয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল ও পরমুহূর্তে প্রণাম করিয়া বলিল, কতক্ষণ এসেছেন আপনি?

হাসি বলিল, মাথা যেন কাগের বাসা হয়েছিল, তবু অনেকটা পরিষ্কার হল।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, এইবার ছাড়্, চিনুর সঙ্গে আমার দরকারি কথা আছে কয়েকটা। চিনু, আমার কাজের কতদূর হল? আঃ, ছাড়্ আমাকে পাগলী।

দাঁড়ান না, সিঁথেটা ঠিক করে দিই।

চিনু বলিল, লিস্ট্ আমি তৈরি করেছি, অনেক হয়েছে।

কই, দেখি?

থামুন, বইগুলো রেখে আসি আগে।

চিনু বই রাখিতে ভিতরে চলিয়া গেল।

হাসি মুকুজ্জেমশাইয়ের প্রসাধন শেষ করিয়া বলল, কেমন হল বলুন দেখি? মাথাটা বেশ ঝরঝরে লাগছে না?

খুব।

যাই ঠাকুরপোকে খাবার দিই গে। আপনি কিছু খাবেন?

না। আমাকে খেতে দেখেছিস কখনও বিকেলে?

হাসি চিনুর জলখাবার আনিতে রান্নাঘরের দিকে গেল।

চিনু আসিয়া বলিল, সবসুদ্ধ পনেরো জন ছেলের নাম জোগাড় করেছি, দেখুন।

একটি ছোট খাতায় অনেকগুলি নাম টোকা ছিল। খাতাখানি সে মুকুজ্জেমশাইয়ের হাতে দিয়া বলিল, যার যতটা পরিচয় পেয়েছি সব টুকে নিয়েছি, ঠিকানাও আছে ওতে অনেকের।

চিনুর কার্যনিপুণতায় মুকুজ্জেমশাই খুশি হইলেন, বলিলেন, বাঃ!

চিনু বলিল, এদের মধ্যে শঙ্করসেবক রায় বলে ছেলেটি খুব ভাল। কলেজে ভাল ছেলে বলে খুব নাম। বাড়ির অবস্থাও ভাল শুনেছি।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, ঠিকানাটা টোকা আছে তো? কই?

হস্টেলে থাকে, এই যে ঠিকানা।

মুকুজ্জেমশাই ঠিকানাটা দেখিয়া লইলেন ও তাহার পর খাতাটা চিনুকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, আচ্ছা, এখন থাক্ তোমার কাছে। মেডিকেল কলেজ আর ল কলেজের দুজন ছেলেকেও দিয়েছি দুখানা খাতা। একদিন সব মিলিয়ে দেখি, তারপর বেরুনো যাবে। এখন তুমি চট করে খেয়ে নাও, এক দান বাঘ-বকরি খেলা যাক্, এস। সেদিন তুমি হারিয়ে দিয়েছিলে আমায়, তার শোধ না তুলে ছাড়ছি না।

চিনু হাসিয়া বলিল, আজও জিততে দেব না।

হাসি খাবার লইয়া আসিল।

সে বলিল, সাবধানে খেলবেন দাদামশাই, ভয়ানক চোর ও। মরা বকরিগুলো চুরি করে ঢুকিয়ে দেয়।

চিনু চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, মিথ্যুক কোথাকার। নিজে খেলতে পারেন না, আবার আমার নামে দোষ দেওয়া হচ্ছে!

মুকুজ্জেমশাই হাসিতে লাগিলেন।

বলিলেন, আমার কাছে সে সব চালাকি চলবে না। নাও, তুমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। চিনু কোনোক্রমে পরোটা কয়খানা গলাধঃকরণ. করিয়া মুকুজ্জেমশাইয়ের সহিত খেলিতে বসিয়া গেল।

হাসি মুকুজ্জেমশাইয়ের পক্ষাবলম্বন করিয়া চিনু কখন কিভাবে চুরি করে তাহা ধরিয়া ফেলিবার জন্য ওত পাতিয়া রহিল।

।। পনেরো ।।

মিস বেলা মল্লিক দাঁত দিয়া নীচের ঠোঁটটিকে চাপিয়া ভ্রূভঙ্গী-সহকারে একখানি পত্র পড়িতেছিলেন ও ভাবিতেছিলেন, কি করিয়া তিনি তাঁহার জীবনের এই আধুনিকতম সমস্যাটির সমাধান করিবেন। এই জাতীয় সমস্যা তাঁহার জীবনে নূতন অথবা আকস্মিক নহে। রূপ এবং যৌবন থাকিলে স্ত্রীলোকমাত্রেরই জীবনে এরূপ সমস্যার আবির্ভাব স্বাভাবিক। বেলা মল্লিক ইহাতে কোনোরূপ অভিনবত্ব অনুভব করিতেছিলেন না, তিনি ভাবিতেছিলেন, কি উপায়ে সমস্যাটির সুচারু সমাধান করিয়া ফেলা যায়। তাঁহার মনোভাব অনেকটা দাবা-খেলোয়াড়ের মনোভাবের অনুরূপ। এরূপ প্রেমিক তাঁহার জীবনে একাধিকবার আসিয়াছে এবং প্রতিবারেই তিনি সু-কৌশলে আত্মরক্ষা করিয়াছেন। সম্ভবপর হইয়াছে, কারণ নিজে তিনি কখনও কাহারও প্রেমে পড়েন নাই। নিজের রূপ, গুণ ও যৎসামান্য কাল্চারের প্রভাবে তিনি বহু পুরুষের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অদ্যাবধি তাঁহার মনোযোগ কেহ আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

সম্প্রতি দুইটি প্রণয়ী আলোকলুব্ধ পতঙ্গের মতো অহরহ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতেছে। ইহাদের একজনের সম্বন্ধে বেলা দেবী নিশ্চিন্ত আছেন, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তিটি তাঁহার ভাবনা উদ্রিক্ত করিয়াছে। এই দ্বিতীয় লোকটির উচ্ছ্বাসের মধ্যে এমন একটি আত্মসমর্পণের ভঙ্গি রহিয়াছে, যাহা উপেক্ষণীয় নহে। ইহা ঠিক নারীদেহ-লুব্ধ পুরুষের লালসাময় প্রলাপ নহে—এ আকুলতার মধ্যে মর্মস্পর্শী আন্তরিকতা রহিয়াছে, ঠিক সুরটি যেন বাজিতেছে। প্রথমোক্ত প্রণয়ীটির মধ্যে যে আন্তরিকতার অভাব আছে তাহা নহে। কিন্তু সে আন্তরিকতা মনকে নাড়া দেয় না। নারীর মনকে নাড়া দিবার ক্ষমতা অপূর্ববাবুর নাই। শ্রীযুক্ত অপূর্বকৃষ্ণ পালিত নারীস্তাবক, নারীসঙ্গ-লিপ্সু। নারীর বন্ধু হইবার মতো যোগ্যতা তাঁহার হয়তো আছে, কিন্তু প্রেমিক হইবার মতো বলিষ্ঠতা তাঁহার নাই। প্রলুব্ধ ভ্রমরের মতো প্রতি কুসুমের দ্বারে তিনি গুঞ্জন করিতেই পটু, আর কিছু করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। চাটুকার

ভ্রমরকে দিয়া কুসুম তাহার নানা অভীষ্ট সিদ্ধ করাইয়া লয়, কিন্তু কখনও ভ্রমরের কণ্ঠলগ্ন হয় না। কুসুম উপভোগ্য হয় সেই বলিষ্ঠ নিষ্ঠুরের, যে তাহাকে নির্মম হস্তে বৃন্তচ্যুত করে, নির্দয় সূচিকা আঘাতে মর্মস্থল বিদ্ধ করিয়া মালা গাঁথে। ইহা হয়তো বর্বরতা, কিন্তু এই বর্বরতার জন্যই বহু নারীহৃদয় সমুৎসুক। অতি-সভ্য, অতি-শৌখিন, অতি-মৃদু, অতি-নমনীয় পুরুষ নারীর কাম্য নহে—অন্তত বেলার নহে। সুতরাং অপূর্বকৃষ্ণ পালিত সম্বন্ধে তাঁহার কোনোরূপ দুর্ভাবনা ছিল না। তিনি গান শিখাইবার অছিলায় যে প্রতি সন্ধ্যায় তাঁহার সঙ্গসুখ লাভ করিতেই আসেন, তাহা বেলা দেবী জানেন এবং সহ্য করেন। সহ্য করিবার হেতু আছে। এত সস্তায় এরূপ গানের শিক্ষক পাওয়া শক্ত। অপূর্ববাবুর নিজের গলা যদিও খুব ভাল নয়, কিন্তু তিনি আধুনিক ও ক্লাসিকাল সঙ্গীত সম্বন্ধে সত্যই অভিজ্ঞ। শিক্ষক হিসাবেও তিনি ভাল। তা ছাড়া, আবেগের আতিশয্যে নানা রকম উপহারও তিনি আনিয়া দিতেছেন। সেদিন একটা ভাল এস্রাজ তাঁহাকে উপহার দিয়াছেন, নানা স্থান হইতে গানের স্বরলিপি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেন। বেলা মল্লিকের মতো সঙ্গতি-বিহীনার পক্ষে এসব অবহেলা করিবার নয়। সঙ্গীতবিদ্যায় বেলার অনুরাগ আছে, গলাও ভাল; এই সুযোগে, অর্থাৎ অপূর্বকৃষ্ণের দুর্বলতার সুযোগে যদি এই বিদ্যাটা আয়ত্ত করিয়া লওয়া যায়, ক্ষতি কি? মাত্র পাঁচ টাকা মাহিনায় অপূর্বকৃষ্ণবাবুর মতো একজন শিক্ষক পাওয়া সহজ নয়। মাত্র সঙ্গসুখ দান করিয়া এত অল্প বেতনে যদি অপূর্ববাবুর মতো লোক পাওয়া যায়, বেলা তাহাতে আপত্তি করিবেন কেন? অপূর্ববাবুর সম্বন্ধে সামান্যতম মোহও বেলার মনে নাই। অপূর্ববাবুর মোহের সুযোগ লইয়া তিনি নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইতেছেন মাত্র এবং আত্মসম্মান বজায় রাখিবার জন্যই তাঁহাকে একটা বেতন দিতেছেন। কারণ, এটা তিনি বেশ জানেন যে, বেতন না দিলেও অপূর্ববাবু তাঁহাকে গান শিখাইতে আসিবেন। তথাপি বেলাদেবী তাহাকে বেতন দেন এইজন্য যে, কৃতজ্ঞতার বন্ধনেও তাঁহাকে যেন অপূর্ববাবুর কাছে বাঁধা পড়িতে না হয়, ইচ্ছা করিলে যে কোনো দিনই যেন সম্পর্কটা চুকাইয়া দেওয়া চলে। সুতরাং অপূর্ববাবুকে লইয়া বেলার দুর্ভাবনা নাই।

কিন্তু এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে এত সহজে এড়ানো যাইবে না। এড়ানো শক্ত প্রথমত এই কারণে যে, সে প্রতিবেশী, সদা-সর্বদা তাহার সহিত দেখা হইতেছে। দ্বিতীয়ত, সে স্বজাতি পালটি ঘর। সামাজিকভাবেও তাহার সহিত বিবাহ হইতে পারে এবং সে চাহিতেছেও তাহাই। কিছুদিন পূর্বে সে বেলার দাদা প্রিয়বাবুর নিকট খোলাখুলিভাবেই এই প্রস্তাব করিয়াছিল। বেলার দাদাই বেলার একমাত্র অভিভাবক ও আত্মীয়। এই প্রস্তাবে তিনি খুশিই হইয়াছিলেন। এই বাজারে বোনটার যদি এমন একটা সদগতি হইয়া যায় মন্দ কি? বেলা কিন্তু বিবাহ করিতে রাজি নহেন এবং সে কথা দাদাকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন। ভগ্নীর বয়স হইয়াছে, কিছু লেখাপড়াও শিখিয়াছে, তাহার নিজের একটা মতামত হইয়াছে। প্রিয় মল্লিক সোজাসুজি ভগ্নীর মতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস করিলেন না। তিনি বাঁকা পথ ধরিলেন। বেলাকে একদিন বলিলেন, আলাপ করে দেখ্ না একদিন ভদ্রলোকের সঙ্গে। খাসা লোক, অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল, আমার তো বেশ লাগল লোকটিকে।

সুতরাং বেলার সহিত লক্ষ্মণবাবুর একদিন আলাপ-পরিচয় হইয়া গেল এবং তাহার পর হইতে লক্ষ্মণবাবু সুযোগ পাইলেই আসিয়া হাজির হইতেছে। এতদিন দূর হইতেই বেলাকে

দেখিয়া ও বেলার গান শুনিয়া মুগ্ধ হইতেছিল, এখন প্রিয়বাবু সে দূরত্বটুকু ঘুচাইয়া আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ভাবটা—যদি বেলার ছেলেটিকে ভাল লাগিয়া যায়। প্রিয়বাবু লেখাপড়া-জানা শিক্ষিত ভদ্রলোক—ব্যাচিলার মানুষ, এক শত টাকা বেতনের চাকুরি করেন, ভগ্নীটিকে লইয়া বিপন্ন হইয়া আছেন। ভগ্নীটি স্কন্ধ হইতে নামিলে তিনি এই আয়ে আরও একটু আরামে থাকিতে পারেন। কিন্তু মুশকিল এই যে, ভগ্নী কিছুতেই নামিতে চায় না। প্রিয়বাবু যত পাত্র আনিয়া জুটাইতেছেন, একটা-না-একটা অজুহাতে সে তাহাদের নাকচ করিয়া দিতেছে। মেয়েটা প্রেমেও পড়ে না! ওই গানের মাস্টারটা হন্যে কুকুরের মতো রোজ যাওয়া-আসা করিতেছে, একবার 'তু' করিয়া ডাকিলেই পায়ে আসিয়া লুটাইয়া পড়ে, কিন্তু সে তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহে না। যে আশায় প্রিয়বাবু মাসে মাসে নগদ পাঁচ টাকা করিয়া খরচ করিতে রাজি হইয়াছিলেন, সে আশায় বহুকাল পূর্বেই ছাই পড়িয়াছে। এখন টাকাটা অনর্থক খরচ হইতেছে বুঝিয়াও প্রিয়বাবু তাহা বন্ধ করিতে পারিতেছেন না। বেলাকে তিনি ভয় করেন।

দেখা যাক্, এ ছোকরা যদি কিছু করে উঠতে পারে— এই মনোভাব লইয়া তিনি লক্ষ্মণবাবুকে আনিয়া একদিন বেলার সহিত আলাপ করাইয়া দিয়াছেন।

বেলার মনোজগতে কোনো বিপ্লব হয় নাই।

লক্ষ্মণবাবু কিন্তু ক্ষেপিয়া গিয়াছে।

লক্ষ্মণবাবুর সহিত আলাপ করিয়া বেলা প্রথমেই বুঝিয়াছিলেন যে, ইহাকে লইয়া মুশকিলে পড়িতে হইবে। ছেলেটির বয়স কম বলিয়াই অতিশয় ভাবপ্রবণ, কাছে আসিয়া আলাপ করিতে পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছে। এই বিপদ হইতে কি কৌশলে ভদ্রভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ বেলার মাথায় একদিন একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। কোষ্ঠীখানাকে কাজে লাগানো যাক। বেলা লক্ষ্মণবাবুকে বলিয়া বসিলেন যে, তাঁহার কোষ্ঠীতে খুব বিশ্বাস, বিবাহ-ব্যাপারে লক্ষ্মণবাবু যদি সত্যই অগ্রসর হইতে চান, তাহা হইলে উভয়ের কোষ্ঠী দুইটা সর্বাগ্রে মিলাইয়া দেখা প্রয়োজন। নিজের কোষ্ঠীর সম্বন্ধে বেলা দেবীর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। কোষ্ঠীখানি এমন যে, কোনো জ্যোতিষীই সজ্ঞানে সেটিকে ভাল বলিতে পারিবেন না। বেলার বাবা যখন বাঁচিয়া ছিলেন এবং বেলার বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন এই কোষ্ঠীই বিবাহের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শেষটা বেলার বাবা ঠিক করিয়াছিলেন যে, এবার কেহ কোষ্ঠী চাহিলে একটা মিথ্যা কোষ্ঠী দিতে হইবে। সে প্রয়োজন অবশ্য আর হয় নাই। কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান, এবং বেলা নিজেই নিজের বিবাহের কর্ত্রী হইয়া পড়েন। মা আগেই মারা গিয়াছিলেন। বেলার দাদা প্রিয়বাবু লোকচক্ষে যদিও বেলার অভিভাবক, কিন্তু বেলার ব্যক্তিগত সকল ব্যাপারে বেলার মতই গ্রাহ্য, এবং সে মত এতই সুস্পষ্ট যে, প্রিয়বাবু ভাগ্নীর বিবাহের আশা একপ্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছেন। তিনি বেশ দেখিতে পাইতেছেন যে, বেলার বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই। সে ইচ্ছা থাকিলে এতদিন কোন্‌কালে বিবাহ হইয়া যাইত। পুরুষের সংস্পর্শে আসিলেই বিগলিত হইয়া পড়িতে হইবে—এ মনোভাব বেলার তো নাইই, বরং উল্টা। পুরুষের সংস্পর্শে আসিলে তিনি যেন আরও কঠিন হইয়া পড়েন। প্রিয়বাবু ভগ্নীর অদ্ভুত মনোবৃত্তির কোনো অর্থ খুঁজিয়া না পাইয়া শেষটা হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন।

লক্ষ্মণবাবুর হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বেলা দেবী নিজের সাংঘাতিক কোষ্ঠীখানি কাজে লাগাইয়াছেন। কয়েকদিন পূর্বে লক্ষ্মণবাবু তাঁহার কোষ্ঠীখানি লইয়া গিয়াছেন। আজ অকস্মাৎ এই পত্রখানি আসিয়াছিল—

বেলা,

এ কয়দিন আমি ক্রমাগত চিন্তা করিয়াছি। কোনো কূল-কিনারা দেখিতে পাই নাই। অবশেষে তোমার কাছেই আসিয়াছি, তুমিই ইহার শেষ নিষ্পত্তি করিয়া দাও। তুমি কুষ্ঠিতে বিশ্বাস কর, আমিও করি। কিন্তু বিধাতার এমনই নির্বন্ধ যে, কুষ্ঠি দুইটির কিছুতেই মিল হইতেছে না। আমি দুইজন জ্যোতিষীকে দেখাইয়াছি। দুইজনেই এ বিষয়ে একমত। একজন জ্যোতিষী কিন্তু বলিলেন যে, মনের মিলই শ্রেষ্ঠ মিল। আমার মন তাঁহার কথায় সায় দিয়াছে। জানি না, তোমার মনের কথা কি? তোমাকে বিবাহ করিলে সত্যিই যদি কোনো বিপদ ঘটে, আমার তাহাতে ভয় নাই। তোমার জন্য সমস্ত বিপদ বরণ করিতে আমি প্রস্তুত আছি এবং আজীবন থাকিব। যদি অনুমতি দাও, আবার তোমার নিকট যাইব। আমার মনের ভিতর যে কি হইতেছে, তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। দোকানের ঠিকানায় উত্তর দিও। ইতি—

লক্ষ্মণ

বেলা কিছুক্ষণ পত্রখানার পানে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে উত্তর লিখিতে শুরু করিলেন। সংক্ষিপ্ত উত্তর—

লক্ষ্মণবাবু,

শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। একদিন সময় করিয়া নিশ্চয় আসিবেন। আসিবেন না কেন? কুষ্ঠির বিরুদ্ধাচরণ করিতে ভয় হয়। দেখি, দাদা কি বলেন। নমস্কার। ইতি—

বেলা মল্লিক

পত্রখানা খামে মুড়িয়া ঠিকানা লিখিতে গিয়া বেলা দেবী টেবিলের ওপর দুই বাহু প্রসারিত করিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। উচ্ছ্বসিত হাস্যবেগে তাঁহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

।। ষোলো ।।

কলিকাতার বাহিরে একটি রেলওয়ে স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে বসিয়া মৃন্ময় তাহার ডায়েরি লিখিতেছিল। সি. আই. ডি-তে কিছুকাল কাজ করিয়া এবং তাহাতে দক্ষতা দেখাইয়া (কিছুটা শ্বশুর মহাশয়ের তদ্বিরের ফলেও) মৃন্ময় সম্প্রতি আই. বি.-তে ঢুকিয়াছে। আঠারো-উনিশ বছরের একটি ছোকরার পিছনে ঘুরিতে ঘুরিতে সে কলিকাতার বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। ওপরওয়ালার নির্দেশমতো সে ছেলেটির গতিবিধির ইতিহাস, নাম-ধাম, এমন কি একটি ফটোগ্রাফ পর্যন্ত সংগ্রহ করিয়াছে। এখন তো সে কিছুই এ ছোকরার মধ্যে দেখিতে পাইল না যাহা ভীতিকর, বরং ছোকরাকে দেখিলে অতিশয় নিরীহ বলিয়াই মনে হয়। ইহার ওপর কর্তাদের এত নজর কেন? যে জন্যই হউক, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার ইচ্ছা অথবা অবসর মৃন্ময়ের নাই। সে মনিবের হুকুম তামিল করিয়াছে, ওইখানেই তাহার কর্তব্যের শেষ হইয়াছে। কর্তব্যের জের টানিয়া আনিয়া ব্যক্তিগত নিভৃত জীবনকে ক্ষুব্ধ করিয়া তোলা

মৃন্ময়ের স্বভাব নয়। সুতরাং ডায়েরি ও রিপোর্ট লেখা শেষ করিয়া সে তাহার চাকুরি-জীবনের ওপর তখনকার মতো যবনিকা টানিয়া দিল এবং আরাম-কেদারায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া চক্ষু বুজিল।

একটু পরেই তাহার মনে স্বর্ণলতার ছবি ফুটিয়া উঠিল। সোনার মতো গায়ের রঙ, লতার মতো তন্বী—সত্যিই সে স্বর্ণলতা ছিল। সহসা কোথায় চলিয়া গেল? এমন করিয়া চলিয়া যাইবার হেতুই বা কি, মৃন্ময় আজও তাহা বুঝিতে পারে নাই। স্বর্ণলতার অন্তর্ধানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই—

স্বর্ণলতা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছিল এবং ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিবার পর তাহার সহিত মৃন্ময়ের বিবাহ হয়। বিবাহের পর সামান্য একটি অস্থায়ী চাকুরি পাইয়া স্বর্ণলতাকে লইয়া কলিকাতা শহরে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করে। মৃন্ময়ের সামান্য আয়ে কোনোক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন চলিত। কিন্তু কেবলমাত্র গ্রাসাচ্ছাদন চলিলেই মানুষ সন্তুষ্ট থাকে না। স্বর্ণলতার মনে নানারূপ শখ। মৃন্ময়ের স্বল্প আয়ে সেসব শখ মিটিত না। একদিন স্বর্ণলতা মৃন্ময়কে বলিল যে, দুইজনে মিলিয়া উপার্জন করিলে কেমন হয়—সে-ও চাকুরি করিবে। একটি কাগজে নাকি সে বিজ্ঞাপন দেখিয়াছে যে, একটি বালিকাকে পড়াইবার জন্য ম্যাট্রিকুলেশন-পাস একজন শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক। সকালে এক ঘণ্টা ও বিকালে এক ঘণ্টা বাড়িতে গিয়া পড়াইয়া আসিতে হইবে, বেতন মাসিক ত্রিশ টাকা।

মৃন্ময় হাসিয়া বলিয়াছিল, তুমি অতদূরে গিয়ে রোজ পড়িয়ে আসতে পারবে?

কেন পারব না? নিশ্চয় পারব।

ইহার দুই দিন পরে মৃন্ময় একদিন আপিস হইতে ফিরিয়া দেখে, স্বর্ণলতা নাই। পাড়ায় খোঁজ করিল, কেহ কিছু বলিতে পারিল না। যে ঠিকানা হইতে শিক্ষয়িত্রীর জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, সেখানে গিয়া খোঁজ করিল, সেখানেও স্বর্ণলতা যায় নাই। তাঁহারা বলিলেন যে, স্বর্ণলতা নামে কোনো শিক্ষয়িত্রী আসেন নাই। দুই দিন পরে খোঁজ লইতে গিয়া দেখিল, সে বাড়িতে কেহ নাই। বাড়ি খালি পড়িয়া আছে—'টু লেট' ঝুলিতেছে। স্বর্ণলতার বাপের বাড়িতে খবর দিতে তাঁহারা মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, স্বর্ণ সেখানেও যায় নাই তো! কোথায় গেল সে? পুলিশে খবর দেওয়া হইল, হাসপাতালগুলিতে সন্ধান লওয়া হইল—কোনো খবর পাওয়া গেল না। এমনভাবে চলিয়া যাইবার অর্থ কি? অস্থায়ী চাকুরির মেয়াদও ফুরাইয়া আসিল—চাকুরিবিহীন উদ্‌ভ্রান্ত মৃন্ময় সম্ভব অসম্ভব নানা স্থানে স্বর্ণলতার অন্বেষণ করিয়া ফিরিতে লাগিল।

আজও ফিরিতেছে।

আরাম-কেদারায় শুইয়া মৃন্ময় স্বর্ণলতার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। যে প্রশ্ন বহুবার সে নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, সেই প্রশ্নটি আবার তাহার মনে জাগিতে লাগিল। স্বর্ণলতা কি তাহার দারিদ্র্যকে ঘৃণা করিয়া চলিয়া গিয়াছে? সে কি তাহাকে ভালবাসিত না? নিশ্চয় বাসিত। তবে সে এমন করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল কেন? তাহার মানসপটে স্বর্ণলতার যে মূর্তি অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক। তাহাতে কোনো কলুষ নাই। তবে চলিয়া গেল কেন? এ 'কেন'র উত্তর মৃন্ময় আজও আবিষ্কার করিতে পারে নাই। মৃন্ময় স্বর্ণলতার প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছিল কি? মাত্র এক বৎসর তো বিবাহ হইয়াছিল। সহসা

তাহার মনে হইল, সে হয়তো স্বর্ণলতাকে মোটেই চিনিতে পারে নাই। তাহার মানসপটে স্বর্ণলতার যে মুখখানি আঁকা রহিয়াছে, তাহাতে অদ্ভুত মৃদু হাসি! ওই সলজ্জ স্নিগ্ধ হাসিটুকুর কোনো সদর্থই তো মৃন্ময় আজ পর্যন্ত করিতে পারিল না। উহা কি ব্যঙ্গের হাসি? অনুরাগের হাসি? অর্থহীন হাসি? মৃন্ময় ঠিক বুঝিতে পারে না। কিন্তু একটা কথা মৃন্ময় নিঃসংশয়ে জানে যে, সে নিজে স্বর্ণলতাকে আজও ভালবাসে এবং একদিন না একদিন সে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবেই।

ক্লিক!

শব্দটা শুনিয়া মৃন্ময় চক্ষু খুলিয়া দেখিল। শ্যামবর্ণ নাতি-স্থূল সুদর্শন একটি ভদ্রলোক আসিয়া ওয়েটিং-রুমে প্রবেশ করিয়াছেন। মৃন্ময়কে চক্ষু খুলিতে দেখিয়া একটি ছোট ক্যামেরা তিনি পকেটের মধ্যে ঢুকাইয়া ফেলিলেন। মৃন্ময় ব্যাপারটা ভাল বুঝিল না। আগন্তুক ভদ্রলোকটি ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রশ্ন করিলেন, কতদূর যাবেন আপনি?

কলকাতা।

ও।

মোটরের দালাল অচিনবাবু আবার বাহিরে চলিয়া গেলেন ও ক্ষণপরেই একটি কুলি-সমভিব্যাহারে ফিরিয়া আসিলেন। কুলির মাথা হইতে একটি সুটকেস ও হোল্ড্-অল নামাইয়া লইতে লইতে পুনরায় ঈষৎ হাস্য করিয়া অচিনবাবু বলিলেন, একটু অসুবিধে করলাম আপনার, মাপ করবেন। বেশ একা একা শুয়ে ঘুমাচ্ছিলেন, না?

না, আমার কিছু অসুবিধে হবে না। আপনি এলেন কোথা থেকে? এখন তো কোনো ট্রেন নেই।

আমি মোটরে এলাম। আমিও কলকাতা যাব।

তাই নাকি? তা হলে তো ভালই হল। একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

অচিনবাবুর ড্রাইভার আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল।

অচিনবাবু তাহাকে বলিলেন, তুমি ফিরে যাও, রাজাসাহেবকে বলে দিও আমার কাজ হয়ে গেছে। কলকাতায় আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করব আমি।

সেলাম করিয়া ড্রাইভার চলিয়া গেল।

অচিনবাবু ওয়েটিং রুমের দ্বিতীয় ইজি-চেয়ারটি দখল করিলেন। চক্ষু হইতে চশমাটি খুলিয়া রুমাল দিয়া চশমার কাঁচ দুইটি পরিপাটিরূপে পরিষ্কার করিয়া চশমাটি পুনরায় পরিধান করিলেন। তাহার পর হোল্ড্-অলের ভিতর হইতে একটি খবরের কাগজ বাহির করিয়া নিবিষ্টচিত্তে তাহা পড়িতে শুরু করিয়া দিলেন।

মৃন্ময় নির্বাক হইয়া আগন্তুক ভদ্রলোকটির পানে চাহিয়া রহিল। লোকটি কে? কাহার ফোটো তুলিল? মৃন্ময়ের? কেন?—এই জাতীয় নানা প্রশ্ন মৃন্ময়ের মনের শান্তি বিঘ্নিত করিতে লাগিল। অচিনবাবু কিন্তু আর মৃন্ময়ের প্রতি মনোযোগ দিলেন না। তিনি প্রকাণ্ড খবরের কাগজখানা মুখের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, মৃন্ময় তাঁহার মুখটাও আর ভাল করিয়া দেখিতে পাইল না। মৃন্ময়ের কৌতূহল ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মৃন্ময় উঠিয়া বাহিরে গেল। বাহিরে গিয়া দেখিল, দুই-একটি কুলি ছাড়া প্ল্যাটফর্মে আর কেহ নাই। তখন ধীরে ধীরে সে স্টেশনের বাহিরে গিয়া পিছন দিক হইতে ওয়েটিং রুমের বাহির

দিকে আসিয়া দাঁড়াইল। খোলা জানালা দিয়া সে দেখিল, অচিনবাবুর মুখখানা বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

মুখে হাসি নাই। চক্ষু দুইটি হইতে কিন্তু হাসি উপচাইয়া পড়িতেছে। মৃন্ময়ের কাছেও ছোট একটা ক্যামেরা ছিল। তাঁহার ডিটেকটিভ মন এ সুযোগ ত্যাগ করিতে চাহিল না। ক্ষিপ্রতার সহিত পকেট হইতে ক্যামেরাটি বাহির করিয়া অচিনবাবুর একখানা ফোটো সে তুলিয়া লইল।

অচিনবাবু কিছুই জানিতে পারিলেন না।

।। সতেরো ।।

শৈল চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

শঙ্করকে আজ সে খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছে; কিন্তু কই শঙ্কর এখনও পর্যন্ত আসিল না তো? ভুলিয়া গেল নাকি? না, শৈলর নিমন্ত্রণ শঙ্কর ভুলিয়া যাইবে—এ কথা শৈলর মন মানিতে প্রস্তুত নয়। যদি সে না আসিতে পারে, তাহা হইলে অন্য কোনো কারণ ঘটিয়াছে। শৈল ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিল, পৌনে আটটা বাজিয়াছে। রাত তো বেশি হয় নাই, অথচ শৈলর মনে হইতেছে, সে যেন যুগযুগান্তর বসিয়া রহিয়াছে। শঙ্করদার এত দেরি করিবারই বা কারণ কি? আজ একটু বকিয়া দিতে হইবে—এত আড্ডা দেওয়া ভাল নয়। চিরকাল শঙ্করদার এই স্বভাব, একপাল ছেলে জুটাইয়া দঙ্গল পাকানো।...আজ উনি বাড়ি নাই, কোথায় দুই দণ্ড বসিয়া গল্পসল্প করা যাইবে—তা নয়, কোথায় আড্ডা দিয়া বেড়াইতেছে! রাত-দুপুরে হয়তো হুড়মুড় করিয়া আসিয়া তাড়াহুড়া করিয়া খাইয়া চলিয়া যাইবে। আক্কেলকে বলিহারি যাই—খাওয়ার নিমন্ত্রণ শুধু যেন খাওয়ার জন্যই।...সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল। উৎকর্ণ শৈল উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে দ্বারের পানে চাহিল। শঙ্কর আসিল না, আসিল বাড়ির ঝি-টা।

সে বলিল, বেয়ারা বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। বলিতেছে, আম-সন্দেশ পাওয়া গেল না, এ তল্লাটের সব দোকানে সে খুঁজিয়াছে।

শৈল আগুন হইয়া উঠিল। বলিল, তাকে বল, যেখান থেকে পারে খুঁজে নিয়ে আসুক। এ তল্লাটে না পাওয়া যায়, অন্য তল্লাটে গেলেই হত; তল্লাটের তো অভাব নেই কলকাতা শহরে! গাড়িটা নিয়েই যেতে বল না হয়। শঙ্করদা আম-সন্দেশ খেতে ভালবাসে।

ঝি চলিয়া গেল, শৈল আবার বসিয়া ভাবিতে লাগিল। শঙ্করদা কি এখনও কবিতা লেখে? স্কুলে যখন পড়িত, তখন ঘরে খিল বন্ধ করিয়া দিনরাত কবিতা লিখিত। ইহার জন্য জ্যেঠামশাইয়ের কাছে বকুনিও কি কম খাইয়াছে! শৈলকে ডাকিয়া কত কবিতাই যে শুনাইত লুকাইয়া লুকাইয়া! এই তো সেদিনের কথা—দেখিতে দেখিতে কয়েকটা বছর চলিয়া গিয়াছে মনেই হয় না। অত শক্ত শক্ত কথাওয়ালা কবিতা শৈল বুঝিতেই পারিত না,—কথার মানে বুঝিত না বটে, কিন্তু আসল অর্থটা তাহার কাছে মোটেই অস্পষ্ট ছিল না। সে কথা স্বীকার করিতেও এখন লজ্জা করে। ছি ছি, যত সব ছেলেমানুষি। কিন্তু—

শঙ্কর আসিয়া পড়িল।

কি রে শৈল, ব্যাপার কি, হঠাৎ নেমন্তন্ন?

কেন, নেমন্তন্ন করতে নেই নাকি? ভুলেও তো খোঁজ নাও না একবার। বাধ্য হয়ে নেমন্তন্ন করতে হল।

শঙ্কর খাটের ওপর বসিয়া প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরে বলিল, তা বেশ করেছিস।

বেশ করেছি মানে?

আচ্ছা, বেশ করিসনি।—শঙ্কর হাসি ঢাকিতে মুখটা ঘুরাইয়া লইল।

রাগিও না আমায় বলছি শঙ্করদা, নিজে আসবে না একবারও ভুলে, নেমন্তন্ন করেছি বলে আবার খোঁটা দেওয়া হচ্ছে!

আলুর চপ করেছিস?

ভারি বয়ে গেছে আমার, সমস্ত সন্ধেটা বাইরে বাইরে আড্ডা দিয়ে এখন এসে রাত ন'টার সময় আলুর চপের ফরমাশ হচ্ছে!

সত্যি করিসনি?

করেছি গো করেছি। আচ্ছা পেটুক লোক বাপু তুমি, এসে থেকে আর কোনো কথা নেই, কেবল খাওয়ার কথা!

বোস সাহেব কোথা? ক্লাবে বুঝি?

না, তিনি এখানে নেই, দিল্লি গেছেন।

দিল্লি? হঠাৎ দিল্লি কেন? লাড্ডুর চেষ্টায়?

শৈল হাসিয়া ফেলিল। বলিল, লাড্ডুর চেষ্টাতেই বটে, কে এক সাহেব আছে নাকি সেখানে, তার সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। সেই সাহেব যদি ইচ্ছে করে, ওঁকে নাকি আরও একটা ভাল পোস্ট্ দিতে পারে।

শঙ্কর বলিল, ভালই তো।

ভাল, না, ছাই! চাকরির তদ্বির করতে করতেই নাকাল, বিয়ে হয়ে থেকে তো দেখছি, কেবল ছুটোছুটি আর ছুটোছুটি!

শঙ্কর কিছু বলিল না। পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইতে লাগিল। শঙ্করের মুখে সিগারেট দেখিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে শৈল বলিল, এ কি শঙ্করদা, তুমি সিগারেট ধরেছ নাকি?

ধোঁয়া ছাড়িয়া সহাস্যমুখে শঙ্কর বলিল, হ্যাঁ, বেশ সুন্দর লাগে। খাবি? খেয়ে দেখ্ না একটা, বেশ লাগবে।

আস্পর্ধা তোমার তো কম নয়।

শঙ্কর হাসিতে লাগিল।

ক্ষণপরেই কিন্তু মুখ গম্ভীর করিয়া শৈল বলিল, সিগারেট খাওয়া ভারি খারাপ শুনেছি, ওতে নাকি বুক খারাপ হয়ে যায়।

আমার বুক কি অত অপলকা ভেবেছিস, যে সিগারেটের ধোঁয়ায় খারাপ হয়ে যাবে? ছেলেবেলায় কত এক্সারসাইজ করতাম, মনে নেই—তোদের বাড়ির পেছন দিকের সেই মাঠটায়?

বাহাদুরি আর করতে হবে না, কখন যে কার কি হয় বলা যায় কিছু? মেজদার কথা মনে নেই? কত গায়ে জোর ছিল তার, দুদিনের জ্বরেই সব শেষ হয়ে গেল।

উৎপলের ভাই পঙ্কজের কথা শঙ্করের মনে পড়িল। মৃত পঙ্কজের স্মৃতি ক্ষণিকের জন্য উভয়ের মনে ছায়াপাত করিল, কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্যই।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শৈল বলিল, আচ্ছা, দাদার কোনো চিঠিপত্তর পাও তুমি শঙ্করদা? আমাকে সেই যা গিয়ে একখানি চিঠি লিখেছিল, আর লেখেনি।

উৎপলের চিঠি শঙ্করও অনেকদিন পায় নাই।

বলিল, কই, আমাকেও তো লেখে না বড় একটা।

শৈল মুচকি হাসিয়া বলিল, বউদিকে খুব লিখছে নিশ্চয়।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, ওই ভয়েই তো বিয়ে করব না। তোরা সব রাক্ষসী—

তবু তো রাক্ষসীদের মায়া এড়াতে পার না!

মানে?

আজকাল আর আস না কেন, বল তো?

পড়াশোনা নিয়ে ভারি ব্যস্ত থাকতে হয়।

পড়াশোনা নিয়ে? ডাহা মিছে কথাটা আর বলো না তুমি। এত মিছে কথাও বলতে পার!

মিছে কথা মানে?

আমি সব জানি গো, সব জানি। তোমার সোনাদিদির সঙ্গে সেদিন দেখা হয়েছিল এক চায়ের পার্টিতে।

তুই আবার পার্টিতে যাস্ নাকি? লায়েক হয়ে উঠেছিস্ তা হলে বল্!

শৈল হাসিল। বলিল, সত্যি, ভাল লাগে না আমার ওসব পার্টি-ফার্টিতে যেতে। কেবল ওঁর জেদে পড়ে যেতে হয়।

কোথায় চায়ের পার্টি ছিল, কিসের জন্য পার্টি?

উনিই পার্টি দিয়েছিলেন একটা ওঁদের ক্লাবে। সোনাদিদির স্বামীও তো রেলেতে চাকরি করেন দিল্লীতে, সেইজন্য সোনাদিকেও নেমন্তন্ন করেছিলেন উনি।

সোনাদিদির সঙ্গে আলাপ ছিল নাকি তোর?

ছিল বইকি, দাদার সঙ্গে প্রফেসার মিত্রের বাড়ি আমিও যে গেছি দু-একবার। মিষ্টিদিদি, রিনি—সবাইকে চিনি আমি।

শৈল শঙ্করের দিকে একবার চাহিয়া হাসিয়া বলিল, রিনি মেয়েটি বেশ, নয় শঙ্করদা?

শঙ্কর গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিল।

গম্ভীরভাবেই বলিল, ও-রকম মেয়ে আমি আর দেখিনি।

শৈল সহসা দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, যাই, আমি একবার দেখি, কতদূর কি হল, তুমি একটু বস।

অনাবশ্যক দ্রুতবেগে শৈল বাহির হইয়া গেল। শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, শৈলর কথা নয়—রিনির কথা। আজ তাহার সহিত ক্লাউড্‌স কবিতাটি পড়িবার কথা ছিল। শৈলর নিমন্ত্রণের ধাক্কায় সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। বাজে নিমন্ত্রণ ও লৌকিকতা রক্ষা করিতে গিয়া জীবনের কত পরম লগ্ন যে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা তো কেহ বোঝে না। নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিলে লোকে অভিমান করে। বিশেষত শৈলর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করা তো অসম্ভব। অথচ আজ সুন্দর সন্ধেটা কতগুলো দুষ্প্রাপ্য আহার গলাধঃকরণে কাটিয়া

যাইবে, ভাবিতেও দুঃখ হয়। রিনি বেচারী আমার অপেক্ষায় হয়তো বসিয়া থাকিবে। তাহাকে খবর দিয়া আসিবার সময়ও ছিল না।

শৈল ফিরিয়া আসিল।

ক্ষিদে পেয়েছে শঙ্করদা? রান্না তৈরি।

মোটেই না।

তা হলে এস, একটু গল্প করা যাক্। জান শঙ্করদা, মিত্তিরদের বাড়ির সেই ফলসাগাছটা ওরা কেটে ফেলেছে।

শঙ্কর অন্যমনস্ক ছিল।

কোন ফলসাগাছটা?

মিত্তিরদের বাড়ির সেই ফলসাগাছটা, এর মধ্যে ভুলে গেলে সব? কি ভাবছ তুমি?

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, না, কিছু না। বুঝেছি, কেটে ফেলেছে গাছটা। ভারি অন্যায় তো। কে কাটলে, চণ্ডী বুঝি? তা না হলে অমন বুদ্ধি আর কার হবে?

শঙ্কর আবার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। সহসা শৈল বলিল, আমি কেমন সোয়েটার বুনতে শিখেছি, দেখবে শঙ্করদা?

কই, দেখি।

শৈল একটি অর্ধসমাপ্ত সোয়েটার বাহির করিয়া পরম আগ্রহে শঙ্করকে দেখাইতে লাগিল।

এই নীল রঙটার সঙ্গে কি রঙ মানাবে, বল তো?

কোনো লাইট রঙ। কমলা কিংবা সাদা—সাদাই দে না, বেশ হবে দেখতে।

শঙ্কর আহারাদি শেষ করিয়া চলিয়া গেল। শৈল একা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার নূতন কৃতিত্ব সোয়াটার-বোনা, পটলের দোরমা কিছুই যেন শঙ্করদাকে তেমন মুগ্ধ করিতে পারিল না।... অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শৈল সহসা উঠিয়া পড়িল এবং স্বামীকে অকারণে পত্র লিখিতে বসিল। কালই লিখিয়াছে, আজ আর লিখিবার দরকার ছিল না। বার বার একটা কথাই নানাভাবে লিখিল—আমার একা একা একটুও ভাল লাগিতেছে না, তুমি শীঘ্র চলিয়া এসে। দেরি করিও না—একা ভারি ভয় করে আমার।

।। আঠারো ।।

শঙ্কর হস্টেলে ফিরিয়া দেখিল, তাহার অপেক্ষায় একটা মোটা খাম মেঝেতে পড়িয়া রহিয়াছে, কপাট খুলিতেই চোখে পড়িল। কলেজ হইতে শঙ্কর হস্টেলে ফিরিতে পারে নাই, প্রফেসার গুপ্তের বাড়ি গিয়াছিল। বয়সের এবং বিদ্যার অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও প্রফেসার গুপ্তের সহিত শঙ্করের হৃদ্যতা জন্মিতেছিল। উভয়ের প্রকৃতিতে কোথায় একটা মিল ছিল, হয়তো তাহা সাহিত্যপ্রীতি, হয়তো সৌন্দর্যলিপ্সা—ঠিক বলা শক্ত। উভয়ের মন কিন্তু বয়স এবং বিদ্যার প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। রিনির অধ্যাপনা করিবার জন্য অধ্যাপক গুপ্তের সাহায্য লওয়া শঙ্করের প্রয়োজন এবং সেজন্য প্রায়ই কলেজ হইতে সে প্রফেসার গুপ্তের বাসায় গিয়া হাজির হয়। আজও সে সেখানে গিয়াছিল এবং সেইখানেই তাহার সহসা মনে পড়িয়া যায় যে, শৈলর ওখানে তাহার নিমন্ত্রণ আছে।

শঙ্কর খামখানা তুলিয়া দেখিল, সুরমার চিঠি। সুরমা ছোট চিঠি লেখে না—দীর্ঘ পত্র। শঙ্কর কপাটটা বন্ধ করিয়া দিয়া ভাল করিয়া বিছানায় বসিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলে এ পত্রের অমর্যাদা করা হইবে।

সুরমা লিখিতেছে—

শঙ্করবাবু,

আপনার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি, কিন্তু আপনার চিঠির উত্তর দেওয়ার উপযুক্ত আবহাওয়া মনের মধ্যে ছিল না বলে উত্তর দিতে দেরি হল। এখনও যে আবহাওয়াটা খুব মনোরম হয়ে উঠেছে তা নয়, ঝঞ্ঝা-বিদ্যুতের উৎপাতটা কমেছে মাত্র। মনের যে সাম্য থাকলে সুন্দর চিঠি লেখা যায়, তা এখন আমার নেই। তবু আপনাকে চিঠি লিখছি এইজন্যে যে, চিঠির উত্তর না পেলে আপনি হয়তো অকারণে অনেক কিছু ভেবে বসবেন। অকারণে একটা কিছু ভেবে বসা আপনাদের স্বভাব, মাঝে মাঝে মনে হয়, ওইটেই আপনাদের বিশেষত্ব। আপনারা ঝোঁকের মাথায় একটা কিছু করে বসেন—অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবেই। আপনাকে চিঠি লেখার দ্বিতীয় কারণ, চিঠি লেখার অজুহাতে আপনাকে সামনে বসিয়ে (অবশ্য কল্পনায়) কলমের মুখে খানিকটা বকবক করব, মনের ভার তাতে হয়তো অনেকটা কমবে। এত লোক থাকতে এবং এত স্বল্প পরিচয় সত্ত্বেও আপনাকেই হঠাৎ কেন এসব কথা বলতে যাচ্ছি, তা ঠিক বুঝতে পারছি না; হয়তো আপনি আমার স্বামীর অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে, কিংবা হয়তো আর কিছু—ঠিক জানি না। জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, আপাতদৃষ্টিতে যা অঘটন মনে হয়, যার আকস্মিকতা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বাঁধা ফরমুলার সঙ্গে খাপ খায় না। কিন্তু ঘটনাকে তো অস্বীকার করা যায় না। যা প্রত্যক্ষ তা অবশ্য-স্বীকার্য, হেতুটা পরে আবিষ্কার করতে হয়।

যাক, যে কথাটা অতি প্রবলভাবে এখন মনে জাগছে এবং যার তাড়ায় আজ কাগজ কলম নিয়ে আপনার উদ্দেশ্যে এই আবোল-তাবোল প্রলাপগুলো লিপিবদ্ধ করছি, সেইটেই বলে ফেলা যাক। সেটা হচ্ছে এই, কথাটা অতি পুরাতন—আমরা নারীরা বড় অসহায়। বিধাতা কিন্তু অসহায় করে আমাদের পৃথিবীতে পাঠাননি, তিনি এমন সব অমোঘ অস্ত্রশস্ত্র আমাদের দিয়েছেন, যা সুনিপুণভাবে প্রয়োগ করতে পারলে পৃথিবীর বড় বড় বীরপুরুষরাও কাবু হয়ে পড়েন। কিন্তু আমাদের—অর্থাৎ সভ্যশ্রেণীর নারীদের মুশকিল হয়েছে এই যে, বিধিদত্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমরা মানুষ-মনিবদের মুখ চেয়ে আছি। তাঁদের হুকুম এবং সমর্থন না পেলে আমরা কিছুই করতে পারি না। তাঁরা বলে দেবেন, কোন্‌খানে, কখন এবং কতক্ষণ আমরা রণ-কৌশল দেখাতে পারব। কেউ কেউ হয়তো আজীবন সে অনুমতি পায় না। শুধু পায় না তাই নয়, বেচারিকে সমস্ত বাণ তূণে পুরে রেখে আজীবন অহিংসার গুণ গাইতে হয়। আর যেসব সৌভাগ্যশালিনী কোনো এক বিশেষ ব্যক্তিকে ত্যাগ করবার অনুমতি পেলেন, তাঁরাও যে সব সময়ে চরিতার্থ হয়ে গেলেন তা মনে করবেন না। প্রায়ই দেখা যায়, যে লোকটিকে সম্মোহিত করবার সামাজিক সমর্থন পাওয়া গেল, তিনি এ সম্মানের অনুপযুক্ত। অর্থাৎ হয় তিনি ইতিপূর্বেই আর কারোর দ্বারা জখম হয়েছেন, নয় তিনি এতই নিরীহ অথবা এতই হীন যে, অস্ত্রশস্ত্রের কোনো প্রয়োজনই হয় না তাঁর জন্য। এদের ক্ষেত্রে অস্ত্রশস্ত্র হয় নিরর্থক, না হয় অপমানিত। বিধাতা যাকে বিজয়িনী হবার সাজসরঞ্জাম দিয়ে সৃষ্টি করলেন, মানুষ বিধাতার পাকে-চক্রে তার সমস্ত কলা-কৌশল এমন একটা পরিণতিতে

গিয়ে পৌঁছল যে, তার জন্যে সে সর্বদাই শঙ্কিত। সত্যিই, আমাদের বড় মুশকিল। ইচ্ছে করলেই আমরা আমাদের আয়ুধ সম্বরণ করে রাখতে পারি না, কখন যে তা কাকে গিয়ে অতর্কিতে আঘাত করে বসে, তা অনেক সময় আমরা বুঝতেই পারি না। আহত ব্যক্তি কখনও আত্মপ্রকাশ করেন, কখনও করেন না। যখন করেন, তখন দেখা যায়, সামাজিক বিধি-নিয়ম অনুসারে লজ্জা পাবারই কারণ ঘটেছে, অহঙ্কৃত হবার নয়। সুতরাং জীবনযাত্রার সুবিধার জন্য বিধাতা যে বশীকরণবিদ্যা আমাদের প্রকৃতির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে সন্নিবিষ্ট করেছেন, সেটাকে নিয়ে আমাদের আশঙ্কা-অস্বস্তির সীমা নেই। বস্তুত এই বশীকরণশক্তি যার মধ্যে যত প্রকট, সমাজে সে তত নিন্দিত, বিশেষ করে মেয়েমহলে। অথচ ভেবে দেখুন, সে বেচারির দোষ কি? তার মাধুর্য সে অবলুপ্ত করবে কি করে? ফুল রূপ-রস-গন্ধের ঐশ্বর্যে সকলের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে—এই তো স্বাভাবিক নিয়ম; কিন্তু তার সুষমার জন্য তাকেই লজ্জিত করে যে অদ্ভুত বিধানের জবরদস্তি; আমরা তারই চাপে আজ ম্রিয়মাণ। কি করব বলুন, যে সমাজে বাস করি, সে সমাজের নিয়ম মেনে না চলেও শান্তি নেই, মেনে চলতেই হয় এবং নিয়মানুবর্তিতার দিকে সভ্য মহিলাদের একটু বেশি রকম প্রবণতাও আছে। এই প্রবণতার কথা চিন্তা করলে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। মেয়েদের নিয়মনিষ্ঠা সমাজকে অর্থাৎ পুরুষকে খুশি করবার জন্য ছাড়া আর কি? হায় রে, যার বিজয়িনী হওয়ার কথা, সেই হয়েছে আজ চাটুকার। আর সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার—সে যে চাটুকার, তা বোঝে না, জানে না, বুঝিয়ে দিলে রাগ করে। মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু কারা জানেন? মেয়েরাই। সম্ভবত হিংসার তাড়নায় একজন আর একজনের শত্রুতা করে। পুরুষেরা মেয়েদের এই হিংসা প্রবৃত্তিটাকে কাজে লাগিয়েছে। প্রকৃতির মোহিনী অস্ত্রগুলোকে মেয়েরা যাতে যথেচ্ছ ব্যবহার না করে, সে তার ব্যবস্থা করেছে; এবং সে ব্যবস্থা যথাযথ প্রতিপালিত হচ্ছে কি না, তা দেখবার ভার পড়েছে মেয়েদের ওপর। মা, দিদি, পিসি, জেঠির দলই পাহারার কাজে সবচেয়ে দক্ষ।

আজ অকস্মাৎ আপনাকে এত কথা লেখবার কি কারণ ঘটল, আপনি নিশ্চয়ই এতক্ষণ সবিস্ময়ে সে কথা ভাবছেন। কারণ একটা আছে বইকি। কিছুদিন পরে আপনিও হয়তো তা জানতে পারবেন। আমি বলতে পারলাম না। সে সব কথা বলতে আমার আত্মসম্মানে বাধে, যে কোনো মেয়েরই বাধে, সেজন্য সেগুলো আমার কলমের মুখে আত্মপ্রকাশ করতে কুণ্ঠিত। সুতরাং ও-প্রসঙ্গের ওপর আপাতত যবনিকাপাত করা যাক।

আপনার খবর কি, বলুন! মিষ্টিদিদির কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। তিনি তো আপনার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। শুনলাম, রিনির পড়াশুনার তদারক করে অত্যন্ত যশস্বী হয়ে উঠেছেন। নিজেরও তদারক করবেন একটু। কবিতা লেখা একেবারে বন্ধ করে দিলেন নাকি? ও-দেশের সব কাগজ এ-দেশে এসে পৌঁছোয় না। কোনো কাগজে যদি আপনার লেখা বেরোয়, সেটা আমার পাওয়া চাই কিন্তু। বোম্বেতে চাকচিক্যশালী ব্যক্তি আছেন অনেক, কিন্তু তাঁদের চাকচিক্য প্রায়ই লক্ষ্মীর প্রসাদে। ভারতীয় বীণার খবর বড় একটা মেলে না। মনের দিক থেকে একরকম নিঃসঙ্গ কারাবাস চলছে। মাঝে মাঝে এই নিস্তব্ধতা যদি ভঙ্গ করেন, কৃতজ্ঞ থাকব। আপনার বন্ধুর কোনো চিঠি পেয়েছেন কি? অনেকক্ষণ বকবক করে আপনার মূল্যবান সময়ের অনেকখানি হয়তো নষ্ট করলাম। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে বকবক শুরু করেছিলাম, তা সফল হল না দেখছি। মনের

মেঘ একটুও কাটল না। সময় করে উত্তর দেবেন তো? সময় যদি কম থাকে, ছোট উত্তর হলেও চলবে, কিন্তু একেবারে যেন নিরুত্তর হবেন না। ইতি—

সুরমা

পত্রপাঠ শেষ করিয়া শঙ্কর কিয়ৎকাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে ধীরে ধীরে সুরমার মুখখানি সজীব হইয়া দেখা দিল, হাওড়া স্টেশনে চলন্ত ট্রেনের জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া সুরমা বলিতেছে, চিঠি লিখবেন, ভুলবেন না কিন্তু। দুয়ারে টোকা পড়িতেই শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল। কপাট খুলিয়া দেখিল, সুপারিন্টেন্ডেন্ট একটি টেলিগ্রাম হস্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাহারই টেলিগ্রাম। শঙ্কর খুলিয়া পড়িল, মায়ের অসুখ খুব বাড়িয়াছে, বাবা অবিলম্বে বাড়িতে যাইতে বলিয়াছেন।

।। উনিশ ।।

গঙ্গার তীরে নির্জন বালুচরে একটি ছোট খড়ের ঘর। সেই ঘরের মধ্যে ইটের উনানে একটি ছোট মালসা চাপাইয়া ভণ্টুর মেজকাকা ভাত রাঁধিতেছিলেন। ঘুঁটেগুলো সম্ভবত ভিজা ছিল, উনুন ভাল ধরিতেছিল না। সুতরাং যুগপৎ উবু এবং হেঁট হইয়া ভণ্টুর মেজকাকা ওরফে মুক্তানন্দ ব্রহ্মচারী কয়েকটি সবল ফুৎকার চুল্লি মধ্যে প্রেরণ করিলেন। আশানুরূপ ফল ফলিল না। শিখার পরিবর্তে ধূমই প্রবলতর বেগে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। আরক্ত সজল চক্ষু দুইটি মার্জনা করিতে করিতে মুক্তানন্দ অবশেষে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। বস্তুত বাহির না হইয়া উপায় ছিল না, সমস্ত ঘরটি ধূমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। বাহিরে ঈষৎ-স্থূল ভক্তগোছের একটি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিলেন। ভণ্টুর মেজকাকা বাহিরে আসিতেই তিনি সবিনয়ে বলিলেন, স্বামীজী, কেন এমন করে কষ্ট পাচ্ছেন? আমাদের বাসায় ভাল বামুন দিয়ে আপনার রান্নার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়ে দিচ্ছি আমি। এখানে এই তেপান্তরের মাঠে থাকবার দরকার কি আপনার?

অজ্ঞ বালকের নির্বুদ্ধিতা দেখিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন করিয়া হাসেন, ভণ্টুর মেজকাকা সেই জাতীয় একটি হাসি হাসিলেন। ঈষৎ-স্থূল ভদ্রলোক একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, আপনার কিছু হবে না তা জানি, কষ্ট আমাদেরই হয়। তা ছাড়া—। কথা তিনি শেষ করিতে পারিলেন না। ভণ্টুর মেজকাকা হাত তুলিয়া এবং মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, অসম্ভব। ওসব অনুরোধ করবেন না। সন্ন্যাসীব্রত যখন গ্রহণ করেছি, তখন আর নিয়ম পালন করতে হবে, যতই দুরূহ হোক সে নিয়ম। তা ছাড়া, আপনারা যতটা দুরূহ বলে মনে করেন, তত দুরূহ এ নয়, এতে আনন্দও আছে যথেষ্ট।

একশো বার।

অপ্রস্তুত মুখে ভদ্রলোক পুনরায় চুপ করিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী দেখিলে সর্বেশ্বরবাবু বেশিক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। ইহা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ। সুতরাং ক্ষণপরে তিনি পুনরায় কথা কহিলেন, এতে আপনার অগৌরব কিছু নেই, আমাদেরই অগৌরব।

একটু কৃপা-নরম কণ্ঠে মুক্তানন্দ বলিলেন, আপনি তো বড় নাছোড়বান্দা লোক দেখছি! বেশ, কি করতে হবে বলুন? ভদ্রলোক যেন কৃতার্থ হইয়া গেলেন। মুক্তানন্দ পুনরায় বলিলেন, আপনি সজ্জন ভদ্রলোক, আপনার মনে কষ্ট দিতে চাই না আমি, তবে নিয়ম ভাঙতে পারব না।

আমাদের ওখানে চলুন, স্বপাকেরই সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেব। আলোচাল ঘি তরিতরকারি সমস্তই আনিয়ে রেখেছি। এখান থেকে কি বাজার কম দূর, কত কষ্ট হচ্ছে আপনার!

আমাদের আবার কষ্ট!

একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া ভণ্টুর মেজকাকা অবশেষে বলিলেন, দেখুন, যাচ্ছি বটে আপনার কথায়, কিন্তু ঝামেলা জোটাবেন না যেন। আমি একা নির্জনে থাকতে ভালবাসি, সেইজন্যই এই নিরালা জায়গাটি বেছে নিয়েছিলাম।

না না, কোনোও গোলমাল হবে না আপনার। আমার কোয়ার্টার্র এখন একদম খালি, পরিবার-টরিবার সব দেশে।

বেশ, চলুন তা হলে।

মুক্তানন্দ ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া মালসাটা উনানের উপর উল্টাইয়া দিলেন ও পুঁটুলি লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। জাহাজঘাটের বড়বাবু সর্বেশ্বর চক্রবর্তী এই সাফল্যে উল্লসিত হইয়া আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিলেন।

সর্বেশ্বরবাবুর সন্ন্যাসী-বাই আছে। গেরুয়াধারীর সন্ধান পাইলে তাহার সেবা না করিয়া তিনি ছাড়েন না। ইহা তাঁহার বাতিকবিশেষ। অনেক লোকের অনেক রকম বাতিক থাকে—কেহ মদ খায়, কেহ জুয়া খেলে, কেহ টিকিট সংগ্রহ করে, সর্বেশ্বরবাবু সন্ন্যাসীর সেবা করিয়া থাকেন। বহু প্রকার সন্ন্যাসীর সেবা তিনি করিয়াছেন—বদরাগী, মৌনী, উর্ধ্ববাহু, উলঙ্গ, অঘোরপন্থী। সর্বেশ্বরবাবুর অভিজ্ঞতা বৈচিত্র্যময়। সর্বেশ্বরবাবুর বাছবিচার নাই, সন্ন্যাসী হইলেই হইল। সব সন্ন্যাসী সেবা লইতে রাজিও হন না। কিন্তু অনিচ্ছুক সন্ন্যাসীদের উপরই সর্বেশ্বরবাবুর বিশেষ করিয়া ঝোঁক। কথিত আছে, একবার এক ক্রুদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁহাকে চিম্‌টা-পেটা পর্যন্ত করিয়াছিল, তথাপি সর্বেশ্বরবাবু তাঁহাকে ছাড়েন নাই, সেবা করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। অথচ সর্বেশ্বরবাবু কখনও সন্ন্যাসীর নিকট কোনো জিনিস প্রার্থনা করেন না, কাহাকেও হাতটা পর্যন্ত দেখান নাই। সন্ন্যাসীর খবর পাইলেই অনিবার্য টানে সর্বেশ্বরবাবু সেখানে যান, সাধ্যমত তাঁহার সেবা করেন, সুবিধা হইলে বাড়িতেও টানিয়া আনেন। ভণ্টুর মেজকাকা দিন তিনেক পূর্বে ওই খড়ের ঘরটিতে আশ্রয় লইয়াছিলেন, খবর পাইবামাত্র সর্বেশ্বরবাবু আসিয়া হাজির হইয়াছেন। নিকটেই যে জাহাজঘাট আছে, সেই ঘাটেরই তিনি বড়বাবু। যেখানে ভণ্টুর মেজকাকা ছিলেন, সেখানে কিছুকাল পূর্বেই একটা মেলা হইয়া গিয়াছিল; এবং যে ঘরটিতে তিনি ছিলেন, সে ঘরটা মেলারই যাত্রীদের জন্য নির্মিত একটা ভাল চালা। অল্প দূরেই জাহাজঘাট, সুতরাং মুক্তানন্দের সংবাদ সংগ্রহ করিতে সর্বেশ্বরবাবুকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। মুক্তানন্দ সর্বেশ্বরবাবুর পিছু পিছু চলিতে লাগিলেন।

ভণ্টুর মেজকাকা ওরফে মুক্তানন্দ ব্রহ্মচারীর আসল নাম উমেশচন্দ্র। ইনি ভণ্টুর বাবার বৈমাত্রেয় ভাই। বাল্যকাল হইতে উমেশের সাংসারিক ব্যাপারের প্রতি অনাস্থা দেখা গিয়াছিল। লেখাপড়ার দিকে মন তো ছিলই না, অন্যান্য সাংসারিক ব্যাপারেও কোনো আগ্রহ প্রকাশ পাইত না। ছেলেবেলায় নদীর ধারে, মাঠে অথবা বন-বাদাড়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানোটা তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান বিলাস ছিল। আর কিছু নয়, একা একা টো-টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো। এই বেড়াইয়া বেড়ানোর নেশাতেই বোধহয় এককালে তিনি এক যাত্রাদলের সঙ্গে ভিড়িয়া যান এবং কিছুকাল তাহাদের সঙ্গে কাটান। সেই সময়ে গান-বাজনাটা শিখিয়াছিলেন। কিন্তু যাত্রার

দলের জীবনও তাঁহার বেশিদিন ভাল লাগে নাই, তিনি বাড়ি ফিরিয়া আসেন এবং মনোযোগ দিয়া আবার লেখাপড়া শুরু করেন। সেই মনোযোগের যুগেই তিনি এনট্রান্সটা পাস করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং আরও হয়তো অগ্রসর হইতেন, যদি না তাঁহার ছোট ভাই রমেশ অকস্মাৎ বিসূচিকায় মারা যাইত। রমেশ মারা যাওয়ায় উমেশের জীবনে সহসা যেন ছন্দপতন ঘটিয়া গেল। উমেশ অনুভব করিলেন, সংসারে ফিরিয়া আসিয়া তিনি ভুল করিয়াছেন; সংসারের সাধারণ পথে স্বচ্ছন্দে তিনি চলিতে পারিবেন না। অনুভব করিলেন বটে, কিন্তু অসাধারণ পথও তিনি সহজে খুঁজিয়া পাইলেন না, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাধারণ পথেই তাঁহাকে আরও কিছুকাল চলিতে হইল। একটা চাকরি জুটিল, বড়দার ছোট ছেলে ভণ্টুটা ক্রমশ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিতে লাগিল। বড়দার বড় ছেলে বিষ্ণুচরণের সাতিশয় সঙ্কীর্ণ সাংসারিকতার জন্য তাঁহাকে উমেশ সহ্য করিতে পারিতেন না। বিশেষত বিবাহ হইবার কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিষ্ণুচরণ যখন কয়েকটি পুত্রকন্যার পিতা হইয়া জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন, তখন উমেশ আর তাহা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। প্রকাশ্যেই তাহাকে 'ঘুণ' 'কীট' প্রভৃতি নানা আখ্যায় অভিহিত করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুচরণ ও উমেশ সমবয়সী ছিলেন। এইভাবেই চলিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একদিন ঠাকুরের সহিত তাঁহার দেখা হইয়া গেল। পরিচয় হইলে উমেশ হৃদয়ঙ্গম করিলেন, ভগবান ইঁহাকেই তাঁহার পারের কাণ্ডারী করিয়া পাঠাইয়াছেন!

উমেশ আকুল অন্তরে ঠাকুরের শরণাপন্ন হইলেন। এই ঠাকুর নামক ব্যক্তিটি যদি সাধারণ শিষ্যলোলুপ ব্যবসায়ী গুরু হইতেন, তাহা হইলে সমস্যার সমাধান সহজে হইয়া যাইত, তিনি উমেশকে যথারীতি জীর্ণ করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু এই ব্যক্তিটি সম্ভবত সত্যসত্যই সংসারবিরাগী বলিয়া তাহা পারিলেন না। অতিশয় সহজভাবে উমেশকে বলিলেন, আমি তো কিছুই জানি না তোমাকে কি বলব?

ইহাতে উলটা ফল হইল। উমেশের ভক্তি বৃদ্ধি পাইল।

না, আপনাকে রাস্তা বলে দিতেই হবে, কিছু ভাল লাগছে না আমার।

কি ভাল লাগছে না?

সংসার।

বেশ তো, সংসার ত্যাগ কর।

সে তো এখুনি করতে পারি, তারপর কি করব?

কি করতে চাও?

ভগবানের নাম করতে চাই।

বেশ তো, তাই কর না, বাধা কিসের?

আপনি উপদেশ দিন।

ভগবানের অনেক নাম আছে, যেটা তোমার পছন্দ হয় বেছে নিয়ে তাই জপ কর কোনো নির্জন স্থানে বসে। উপদেশ আর কি দেব?

আপনি একটা মন্তর দিন আমাকে।

মন্তর? মন্তর নিয়ে কি হবে? তুমি কি মনে কর, সংস্কৃত ভাষায় না বললে ভগবান তোমার কথা বুঝতে পারবেন না? যিনি কীটের ভাষা বোঝান, তিনি তোমারও ভাষা বুঝবেন।

সহসা উমেশ ঠাকুরের পা দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। ঠাকুর বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

আহা, ও কি কর? পা ছাড়। কি মুশকিল! কি চাও তুমি?

মুক্তি চাই, আনন্দ চাই—

উমেশ হু-হু করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বেশ, মুক্তানন্দ নাম তোমার দেওয়া গেল, তুমি পছন্দসই একটা জায়গা বেছে নিয়ে ভগবানের নাম কর গিয়ে, মুক্তি আনন্দ—সব পাবে।

কি কি বিধিনিয়ম পালন করতে হবে বলে দিন তা হলে।

চক্ষুজল মুছিয়া উমেশ উন্মুখ হইয়া বসিলেন।

ঠাকুর দেখিলেন, কিছু একটা না বলিলে নিস্তার নাই। অপরের মুখনিঃসৃত একটা উপদেশের ভেলা না পাইলে এ লোকটা নিছক নিজের জোরে ভাসিয়া থাকিতে পারিবে না। উমেশের অসহায় মুখচ্ছবি তাঁহাকে বিচলিত করিল। একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, মাছ-মাংসের প্রতি কি তোমার খুব বেশি লোভ আছে?

আজ্ঞে না, মোটেই নেই।

তা হলে নিরামিষ আহারই কর—স্বপাক।

ঘি দুধ?

ঘি দুধ খাবে বইকি, কিন্তু গব্য। গেরুয়াও পর, সুবিধে হবে।

কোথা যাব বলে দিন।

ঠাকুরের হাসি পাইতেছিল। তথাপি কিন্তু তিনি গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া বলিলেন, কাশী যাও, সেখানে গিয়ে বিশ্বেশ্বরের নাম জপ কর।

আবার কবে আপনার দর্শন পাব?

আমি কোথায় কখন থাকি তার তো ঠিক নেই, আপাতত আমি ভাগলপুরে যাচ্ছি।

ঠিকানাটা আমাকে দিন।

একটু ইতস্তত করিয়া একটা ঠিকানা অবশেষে তিনি দিলেন এবং চলিয়া গেলেন। উমেশও চাকরি পরিত্যাগ করিয়া কাশীতে আত্মগোপন করিয়া মুক্তির সন্ধান কবিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদিন কাশীবাসের পর উমেশের ভবঘুরে মন আবার উসখুস করিতে লাগিল। কেবলমাত্র বিশ্বেশ্বরের নাম জপ করিয়া তিনি কেমন যেন তৃপ্তি পাইতেছিলেন না, ঠাকুরের নিকট নূতন একটা কিছু প্রেরণা লাভ করিবার আশায় তিনি ভাগলপুরে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া শুনিলেন, ঠাকুর যশোহরে গিয়াছেন, কিছুদিন পরে আবার ফিরিবেন। ভাগলপুরেই ফিরিবার কথা আছে। ভাগলপুরের গঙ্গার ঘাটে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া মুক্তানন্দ সহসা স্থির করিলেন, একবার কলিকাতাটা ঘুরিয়া আসা যাক্, ভণ্টুটা কেমন আছে কে জানে, অনেক দিন তাহার কোনো খবর পাওয়া যায় নাই। কলিকাতায় আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাকে বিচলিত হইয়া পড়িতে হইল। মুক্তানন্দের জীবনের এই অংশটুকুর পরিচয় আপনারা ইতিপূর্বেই পাইয়াছেন। মুক্তানন্দ দেখিলেন যে, সংসারের ব্যাপারে যেরূপ ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে হয় তাঁহাকে রীতিমত সংসারী হইতে হইবে, না হয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। চলিয়া যাওয়াই তিনি শ্রেয় মনে করিলেন এবং চুপিচুপি একদিন সরিয়া

পড়িলেন। পুনরায় ভাগলপুরে আসিয়া শুনিলেন, ঠাকুর আসিয়া একদিন মাত্র থাকিয়া কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা ফিরিয়া যাইতে আর তাঁহার সাহস হইল না, আবার যদি জড়াইয়া পড়েন? ঠাকুরের কাছে গিয়াই বা কি হইবে? তিনি যাহা করিতে বলিয়াছেন তাহা তো করা হয় নাই, কাশীতে বসিয়া বিশ্বেশ্বরের নাম এক মনে জপ করিতে পারিলাম কই? কিন্তু অত ভিড়ের মধ্যে মনঃসংযোগ করা যে অসম্ভব! ঠাকুর অবশ্য যে-কোনো নির্জন স্থানে বসিয়া নামজপের ব্যবস্থা দিয়াছেন। মুক্তানন্দ গঙ্গার ঘাটে বসিয়া ছিলেন। সহসা দেখিলেন, একটা মাল-বোঝাই নৌকা ছাড়িতেছে। মুক্তানন্দ দাঁড়াইয়া মাঝিকে ডাকিলেন। মাঝি আসিতে তাহাকে অনুরোধ করিলেন, তাহারা যদি তাঁহাকে কোনো গ্রামের কাছে নদীতীরে একটু নির্জন জায়গায় নামাইয়া দেয়, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। এখনও এ দেশে গৈরিক বসনের সম্মান আছে, ইহারই জোরে প্রায় নিঃসম্বল মুক্তানন্দ এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। মাঝিরা তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া লইল এবং কিছুদূর গিয়া একটি জাহাজঘাটের নিকট বালুচরে নামাইয়া দিল। চরটি নির্জন।

কিন্তু কিছুদূরেই জাহাজঘাট ছিল এবং জাহাজঘাটে সর্বেশ্বরবাবু ছিলেন, সুতরাং মুক্তানন্দকে বেশিদিন নির্জনতা উপভোগ করিতে হইল না।

এই অবসরে ঠাকুরেরও একটু পরিচয় দেওয়া যাক। ঠাকুর আমাদের পূর্বপরিচিত মুকুজ্জেমশাই। মুকুজ্জেমশাইয়ের বন্ধনহীন চলা-ফেরা, সহজ সহৃদয় ব্যবহার, থান কাপড়, খালি পা, একমাথা বড় চুল, একমুখ দাড়ি, শিক্ষিতজনসুলভ কথাবার্তা, পরোপকারপ্রবৃত্তি সমস্তটা মিলিয়া এমন একটা অসাধারণ যোগাযোগ, যাহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অনিবার্যভাবে কতকগুলি ভক্ত জুটিয়া যায়। এই ভক্তের দল মুকুজ্জেমশাইকে 'ঠাকুর' আখ্যা দিয়াছে। মুকুজ্জেমশাই কিন্তু এই ভক্তদের বড় ভয় করেন এবং যথাসাধ্য এড়াইয়া চলেন। ইহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই তিনি যা-হোক একটা ব্যবস্থা বাতলাইয়া দিয়া নিজেকে যথাসম্ভব দূরে রাখেন। নানা স্থানে মুকুজ্জেমশাইয়ের গতিবিধি, সুতরাং একটি ভক্তসম্প্রদায় তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্রমশ গজাইয়া উঠিয়াছে এবং বহমান নদীস্রোতে খড়কুটার মতই সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছে। মুকুজ্জেমশাই ইহাদের লইয়া নানা কৌতুক বিদ্রূপ করেন, ভর্ৎসনা করেন। কিন্তু ইহারা নাছোড়বান্দা। মুকুজ্জেমশাইয়ের ভর্ৎসনা যত তীব্র হয়, ইহাদের ভক্তিও তত প্রগাঢ় হইয়া ওঠে। দেখিয়া-শুনিয়া মুকুজ্জেমশাই হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন, বুঝিয়াছেন, ইহাদের সহিত অভিনয় না করিয়া উপায় নাই। ইহারা সত্য মানুষটাকে চায় না, একটা ছদ্ম কল্পমূর্তি পাইলেই ইহারা সন্তুষ্ট। সুতরাং অভিনয় করিতে হয়। এই জাতীয় কোনো ভক্তের সহিত দেখা হইলে (যথাসাধ্য চেষ্টা করেন যাহাতে দেখা না হয়) তিনি ঠাকুরোচিত গুরুগাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং উপদেশ প্রার্থনা করিলে তাহাকে যাহা হোক একটা কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া দেন। কাহাকেও বলেন—তেল মাখিও না; কাহাকেও বলেন—নেপালে পশুপতিনাথ দর্শন করিয়া এস; কাহাকেও কিছুদিন নির্বাক থাকিতে আদেশ করেন। তাহারাও যথাসাধ্য আদেশ পালন করে। ভক্তদের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার আর কোনো সদুপায় তিনি ভাবিয়া পান নাই। মুকুজ্জেমশাইয়ের আসল কর্মক্ষেত্র নানা দুঃখপীড়িত মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়, এবং সেখানেও তাঁহার অন্তরঙ্গ ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা।

সর্বেশ্বরবাবুর বাসায় পৌঁছিয়া মুক্তানন্দ ভোজ্য দ্রব্যগুলি পরিদর্শন করিলেন। সর্বেশ্বরবাবু আহারের ভাল জোগাড়ই করিয়াছিলেন।

আলোচাল, মুগের ডাল, আলু, পটল, দুধ, ঘি।

ওটা গাওয়া ঘি তো?

আজ্ঞে না, ভঁয়সা,—তবে উৎকৃষ্ট জিনিস।

হাজার উৎকৃষ্ট হোক, ভঁয়সা চলবে না।

যে আজ্ঞে।

গব্য ঘৃত পাওয়া যাবে না এখানে?

পাওয়া শক্ত। আচ্ছা, দেখছি তবু চেষ্টা করে।

ব্যস্তসমস্ত হইয়া সর্বেশ্বরবাবু বাহির হইয়া গেলেন এবং ক্ষণপরেই এক বালতি জল, একটি ঘটি এবং গামছা স্বহস্তে বহিয়া আনিয়া বিনীতকণ্ঠে বলিলেন, আপনি ততক্ষণ হাত-পাটা ধুয়ে ফেলুন। আমি ঘিয়ের চেষ্টায় বেরুচ্ছি।

সর্বেশ্বরবাবু চলিয়া গেলেন, এবং মুক্তানন্দ হস্তপদ প্রক্ষালনের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

।। কুড়ি ।।

করালীচরণ বক্সী তন্ময় হইয়া একখানি উপন্যাস পাঠ করিতেছিলেন। বামহস্তে জ্বলন্ত সিগারেট নিঃশব্দে পুড়িতেছিল। সিগারেটের ভস্মীভূত খানিকটা অংশ পতনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, ঝাড়া হয় নাই—করালীচরণের ঝাড়িবার অবসর ছিল না। একাগ্রচিত্তে তিনি বর্জাইস অক্ষরে ছাপা উপন্যাসখানি গ্রাস করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার চিবুক কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছিল, একমাত্র চক্ষুটিও কখনও নিষ্প্রভ কখনও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল।

নড়িয়া-চড়িয়া বসিতেই সিগারেটের লম্বা পোড়া ছাইটা পুস্তকের ওপর পড়িয়া গেল। করালীচরণ বিরক্তভাবে সিগারেটটার দিকে চাহিলেন এবং তাহাতে গোটা দুই লম্বা টান মারিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর ফুঁ দিয়া ছাইগুলি পুস্তকের পাতা হইতে পরিষ্কার করিতে গিয়া কিন্তু মুশকিলে পড়িয়া গেলেন, ফুৎকারে মোমবাতিটা নিবিয়া গেল!

বাই নারায়ণ!

হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দিয়াশলাই খুঁজিতে গিয়া একটা কাগজের তাড়া তাঁহার হাতে ঠেকিল। ভণ্টু যে ঠিকুজি-কোষ্ঠীগুলা সকালে দিয়া গিয়াছে, সেইগুলাই সম্ভবত তেমনই পড়িয়া আছে, খুলিয়া পর্যন্ত দেখা হয় নাই। দিয়াশলাইটা গেল কোথা? বসিয়া বসিয়াই হাত বাড়াইয়া হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া খুঁজিতে লাগিলেন, পাওয়া গেল না। বিরক্ত করালীচরণ অতিশয় অপ্রসন্নচিত্তে, শেষে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। মোড়ের ওই পানওয়ালীটার শরণাপন্ন হইতে হইবে শেষকালে—যদি অবশ্য তাহার দোকান এত রাত্রি পর্যন্ত খোলা থাকে। কাজল-পরা, মাথার ফুল-গোঁজা, দাঁতে-মিশি-লাগানো প্রৌঢ়া পানওয়ালীটাকে দেখিলে করালীচরণের আপাদমস্তক জ্বলিতে থাকে, অথচ এই পানওয়ালীটাই ছোটোখাটো আপদে বিপদে তাঁহাকে সর্বদা উদ্ধার করে। ধারে সিগারেট দিয়াশলাই তো সে ক্রমাগত দিয়া চলিয়াছে। ভণ্টুর হাতে টাকাকড়ি, আগের মতো যখন-তখন যেমন-তেমনভাবে খরচ করিবার উপায় নাই। ওই পানওয়ালীটির কৃপায় তবু মাঝে মাঝে ফাঁকি

দিয়া খানিকটা খরচ করিয়া ফেলিবার সুবিধা আছে। ধারে জিনিস দেয় এবং ভণ্টুকে বাধ্য হইয়া তাহা শোধ করিতে হয়। করালীচরণ অন্ধকারেই পথ খুঁজিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন, পানওয়ালী দোকান বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কি মুশকিল! সামান্য একটা দিয়াশলাইয়ের অভাবে পড়া হইবে না, সমস্ত মাটি হইয়া যাইবে? নির্লোম ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া তিনি গলির প্রান্তস্থিত পানওয়ালীর বন্ধ দোকানের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। ভণ্টুর বাইসিক্লের ঘণ্টা শোনা গেল এবং ক্ষণপরেই ভণ্টু আসিয়া সহাস্যমুখে বাইক হইতে অবতরণ করিল।

বাইরে দাঁড়িয়ে যে?

আরে, আমি তো মাটির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছি, মিস মার্‌গারেট কার্নিস ধরে শূন্যে ঝুলেছে।

মিস মারগারেট!

দেশলাই আছে কিনা আগে বলুন?

আছে। চলুন, ভেতরে যাওয়া যাক, আমার বাইকে লাইট নেই দেখে এক চাম চঙ্গু তাড়া করেছিল এখুনি, পালিয়ে এসেছি আমি, এখানে আবার না এসে পড়ে ব্যাটা। চলুন, ভেতরে ঢুকে পড়া যাক।

চঙ্গু মানে—পুলিশ? আপনি একদিন একটা কেলেঙ্কারি না করে ছাড়বেন না দেখছি। লাইট কিনে ফেলুন না একটা।

উভয়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ভণ্টু বাইকটাকেও টানিয়া ভিতরে ঢুকাইয়া লইল। পকেট হইতে দিয়াশলাই বাহির করিয়া মোমবাতিটা জ্বালিয়া দিল। বলিল, এ যেন নিতান্ত স্মলিশ গুট্‌কু দেখছি।

সত্যিই মোমবাতিটি অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছিল, বেশিক্ষণ টিকিবে বলিয়া মনে হয় না।

মোমবাতি জ্বলিতেই করালীচরণ পড়িতে শুরু করিয়াছিলেন, ভণ্টুর কথা শুনিয়া বলিলেন, দেখুন তো, ও-দিকের তাকটায় একটা মোমবাতি আছে বোধ হয়।

আলমারির পাশেই যে ছোট তাকটি তিনি দেখাইলেন, সেটিতে কতকগুলি ধূলিধূসর পুস্তক হেলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ভণ্টু সেগুলি সরাইয়া দেখিতে লাগিল, করালীচরণ ঝুঁকিয়া পড়িয়া পড়িতে লাগিলেন। বইটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া অসম্ভব। ওরে বাপ রে—চাম গ্যান্‌ঢঅ—

ভণ্টু সহসা চিৎকার করিয়া পিছাইয়া আসিল।

করালীচরণ সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন, কি, হল কি?

ভীষণ টিকটিকি একটা—গোদা চাম— দেখুন দেখুন।

সত্যই বেশ বড় একটা টিকটিকি দেওয়ালের ওপর উঠিয়া আসিয়াছিল, করালীচরণ বলিলেন, কেন বিরক্ত করছেন ওকে? ও অনেক দিন থেকে আছে আমার কাছে। আলোর কাছে এসে পোকামাকড় ধরে-টরে খায়, থাকে ওই বইগুলোর পিছনে, ছেড়ে দিন, বিরক্ত করবেন না ওকে।

করালীচরণ পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন। ভণ্টু মুখবিকৃত করিয়া তাঁহাকে পিছন হইতে ভ্যাংচাইতে লাগিল। বেশ খানিকক্ষণ ভ্যাংচাইয়া অবশেষে ভণ্টু সহজকণ্ঠে বলিল, কই, এখানে মোমবাতি তো নেই!

পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়া করালীচরণ বলিলেন, মোমবাতি জোগাড় করুন তা হলে একটা, এটা তো গেল।

ক পাতা বাকি আছে আপনার আর?

পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠাটি উল্টাইয়া দেখিয়া করালীচরণ বলিলেন, বেশি নেই, আর পাতা কুড়ি আছে। তাহার পর ভণ্টুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, অদ্ভুত বই, বাই নারায়ণ! শেষ করতে হবে এখুনি। যান, আপনি মোমবাতি নিয়ে আসুন। কথা বলবেন না, যান, সময় নষ্ট হচ্ছে আমার।

হ্রস্বায়মান মোমবাতিটির দিকে চকিতে চাহিয়া করালীচরণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আবার পড়িতে শুরু করিলেন। ভণ্টু চক্ষু দুইটি ছোট করিয়া বিকৃতমুখে খানিকক্ষণ করালীচরণের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর পকেট হইতে দুইটি আঙুলের মতো সরু সরু মোমবাতি বাহির করিল—একটি লাল, আর একটি সবুজ।

দেখুন তো, এতে হবে?

করালীচরণ কোনোও উত্তর দিলেন না, গল্পে আবার তিনি তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন।

ভণ্টু পুনরায় বলিল, দেখুন না, এতে হবে কি না!

বিরক্ত করালীচরণ মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, আঃ, কি গোলমাল করছেন বার বার। ও মোমবাতি পেলেন কোথা থেকে? ভয়ঙ্কর সরু যে, কোথা থেকে পেলেন বলুন তো?

আমার কাছেই ছিল। বাইকে বাতি নেই, কাগজের ঠোঙার ভেতর এইগুলো জ্বেলেই চালাতে হচ্ছে আজকাল।

করালীচরণ ভণ্টুর শেষের কথাগুলি শুনিলেন কি না সন্দেহ, কারণ আবার তিনি পড়িতে শুরু করিয়াছিলেন। ভণ্টু স্মিতহাস্যে তাঁহার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। একটু পরেই অবশ্য পড়া বন্ধ করিয়া নূতন একটি মোমবাতি ধরাইবার প্রয়োজন হইল।

ভণ্টু বলিল, আপনি এইটে জ্বালিয়ে পড়তে থাকুন, আমি আর একটা জ্বলিয়ে ততক্ষণ চট্ করে কিছু বড় মোমবাতি কিনে আনি, ঘোর জ্বালে ফেললেন দেখছি আজকে।

করালীচরণ কোনো উত্তর না দিয়া পড়িতে লাগিলেন। ভণ্টু বাইক লইয়া বাহির হইয়া গেল।

ভণ্টু যখন ফিরিল, তখন করালীচরণের উপন্যাস শেষ হইয়াছে। ভণ্টু দেখিল, তিনি নির্বাণোন্মুখ মোমবাতিটার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। ভণ্টু আসিতেই তিনি মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে তাকাইলেন। সেই স্বল্পালোকেই ভণ্টু লক্ষ্য করিল, তাঁহার চক্ষুটি অত্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, অক্ষিকোটরের মধ্যে একখণ্ড অঙ্গার যেন জ্বলিতেছে। ভণ্টু কেমন যেন ভয় পাইয়া গেল।

মোমবাতি এনেছেন?

এনেছি।

একটু থামিয়া ভণ্টু বলিল, আচ্ছা, আপনি রোজ মোমবাতি জ্বালান কেন বলুন তো? একটা লণ্ঠন কিনলে অনেক সস্তায় হয়।

সস্তা? হ্যাঁ, তা বোধহয় হয়।

করালীচরণ আর কিছু বলিলেন না, নির্বাণোন্মুখ কম্পিত শিখাটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

ভণ্টু মোমবাতির প্যাকেট হইতে একটি মোমবাতি তাড়াতাড়ি ধরাইয়া যথাস্থানে স্থাপন করিল।

কেমন সুন্দর দেখুন তো!

নূতন শিখাটির পানে করালীচরণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর বলিলেন, আপনি আরব্য উপন্যাস পড়েছেন ভণ্টুবাবু?

পড়েছি।

তাতে গোড়াতেই আছে, শাহরিয়ার নামে এক সুলতান রোজ একটা করে মেয়েকে বিয়ে করত, আর রোজ তাকে মেরে ফেলত। মনে আছে?

মনে আছে বইকি।

আমার যদি ক্ষমতা থাকত আমিও তাই করতাম। সে ক্ষমতা নেই, তাই তার বদলে রোজ নতুন নতুন মোমবাতি জ্বালাই। একটা নিঃশেষ হয়ে গেলে আর একটা জ্বালাই, সেটা নিঃশেষ হয়ে গেলে আর একটা। সারাজীবন ক্রমাগত মোমবাতি জ্বালিয়ে যাব একটার পর একটা, একটার পর একটা—

লণ্ঠন জ্বালালে একটু সস্তা হয়, তাই বলছিলাম।

লণ্ঠন! পুরনো কালিঝুলি-মাখা একটা লণ্ঠন সামনে জ্বালিয়ে আজীবন কাটিয়ে দেব সস্তায় হবে বলে? বলেন কি আপনি?

করালীচরণের কথাবার্তা ভণ্টুর ঠিক বোধগম্য হইতেছিল না। সে মোমবাতি প্রসঙ্গে আর কোনো উচ্চবাচ্য করা নিরাপদ মনে করিল না, খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, যে কুষ্ঠি দুটো দিয়ে গিয়েছিলাম, দেখেছেন? টাকা দিয়ে দিয়েছে তারা।

কই টাকা? দিন।

করালীচরণ হস্ত প্রসারিত করিলেন।

ভণ্টু পকেট হইতে কুড়িটা টাকা বাহির করিয়া বলিল, সব নেবেন নাকি? পাস-বুকে জমা করতে হবে না?

আজ থাক, সমস্ত দিন মদ খেতে পাইনি। আপনি কাল যেটুকু দিয়ে গেলেন, সকালেই শেষ হয়ে গেল, বাধ্য হয়ে তাই ও-বইটা নিয়ে বসতে হল।

কি বই ওটা?

ডিটেকটিভ আর পর্ণোগ্রাফি কম্বাইন্ড। চমৎকার নেশা হয়, ওয়ান্ডারফুল!

ভণ্টু আবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, দশটা টাকা আমাকে দিন, আপনার কাছে থাকলেই তো খরচ হয়ে যাবে।

না, আজ থাক।

করালীচরণ টাকাগুলি তাড়াতাড়ি জামার পকেটে পুরিয়া ফেলিলেন, যেন ভণ্টু ছিনাইয়া লইয়া যাইবে। তাহার পর অকস্মাৎ ভণ্টুর মুখের ওপর এক চক্ষুর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, আমার পাঁচশো টাকার আর বাকি কত? কত জমল?

এ রকমভাবে খরচ করলে আর জমবে কি করে? সেদিনও তো আপনি পঁচিশটা টাকা নিয়ে নিলেন। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে, আমাদের প্রোটোটাইপ গ্রহশান্তির জন্য কিছু খরচ করতে চায়, কত পড়বে বলুন তো?

টাকা পঁচিশেক।

তাই বলে দেব তা হলে। হবে কিছু?

কিছু হবে না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া করালীচরণ বলিলেন, আপনি তা হলে আজ যান ভণ্টুবাবু, কাল আমি কুষ্ঠি দুটো ঠিক করে রাখব।

আচ্ছা।

ভণ্টু বাহিরে আসিয়া বাইকের ওপর সওয়ার হইল।

ভণ্টু চলিয়া গেল। করালীচরণ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা আলোটা ফুঁ দিয়া নিবাইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন, খানিকক্ষণ হনহন করিয়া হাঁটিবার পর অবশেষে তিনি যে পল্লীতে উপনীত হইলেন, তাহা বেশ্যা-পল্লী! রাত্রি অনেক হইয়াছিল, স্বল্পালোকিত গলিটিতে বিশেষ কেহ ছিল না। একটা খোলার ঘরের সামনে একটিমাত্র রূপোপজীবিনী তখনও দাঁড়াইয়া ছিল। করালীচরণ সোজা গিয়া তাহারই সম্মুখীন হইলেন।

মেয়েটি ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিল।

করালীচরণ স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর দ্রুতবেগে আবার চলিতে শুরু করিলেন। দোতলার একটা ঘর হইতে গান-বাজনা হাসির হর্‌রা সহসা তাঁহার কানে ভাসিয়া আসিল, এক চক্ষু তুলিয়া করালীচরণ একবার আলোকিত জানালার পানে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর আবার চলিতে শুরু করিলেন। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে খানিকক্ষণ হাঁটিয়া করালীচরণ অবশেষে একটি হোটেলের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। সহসা অনুভব করিলেন, অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে। ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

খানিকটা মাংস আর রুটি দিন তো।

কতখানি মাংস, ক পিস রুটি?

প্রচুর দিন, ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে।

এক প্লেট মাংস আর চার পিস রুটি দিই?

দিন। মদ আছে?

আনিয়ে দিতে পারি।

হুইস্কি আনিয়ে দিন এক বোতল।

টাকা লইয়া একজন হুইস্কি আনিতে চলিয়া গেল এবং একটি বালকভৃত্য মাংস ও রুটি আনিয়া করালীচরণের সম্মুখে ধরিতেই করালীচরণ গপগপ করিয়া গিলিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার সেই পানওয়ালীটিকে মনে পড়িল। সেই কাজল-পরা, মাথার-ফুল-গোঁজা, দাঁতে-মিশি-লাগানো নীলাম্বরী কাপড়-পরা বুড়িটা—ছুঁড়ি সাজিয়া লোক ভুলাইতে চায়। অসহ্য! ভাবিলেও গায়ে জ্বর আসে। জ্বর আসুক, কিন্তু ওই বোধ হয় একমাত্র নারী যে করালীচরণকে একটু মমতার চক্ষে দেখে। বাকি সবাই তো তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, কেহই তো তাহাকে আমল দিতে চায় না, টাকা দিতে চাহিলেও প্রত্যাখ্যান করে—এমনকি বেশ্যারাও।

বাই নারায়ণ!

হিংস্র বুভুক্ষু শ্বাপদের ন্যায় করালীচরণ মাংসের হাড়গুলো কড়মড় করিয়া চিবাইতে লাগিলেন।

ভণ্টু সেদিন অত রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, দত্ত মহাশয় তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন। দত্ত মহাশয়ের মুদির দোকান আছে, এবং সেই দোকান ভণ্টুর সংসারে ধারে

জিনিসপত্র সরবরাহ করিয়া থাকে। অনেকগুলি টাকা বাকি পড়িয়াছে। ভণ্টু আজ নিশ্চয়ই কিছু দিবে বলিয়াছিল, সেই আশায় দত্ত মহাশয় বসিয়া আছেন।

দত্ত মহাশয়কে দেখিয়া ভণ্টু করজোড়ে বলিল, বড় লজ্জিত হলাম দাদা, বিশ্বাস করুন, কিছুতেই জোগাড় করতে পারলাম না। আজও এক জায়গা থেকে নির্ঘাত পাব ভেবেছিলাম, কিন্তু সব হোন্‌ডল-মোন্‌ডল হয়ে গেল।

দত্ত মহাশয় নীরবে সমস্ত শুনিলেন এবং নীরবে উঠিয়া গেলেন।

বউদিদি মুখ বাড়াইয়া হাসিমুখে বলিলেন, দত্ত কি বললে?

চুপসে গেল।

ওর টাকাটা কাল যেমন করে হোক দিয়ে দাও বাপু তুমি। না হয় আমার বালাটা কোথাও বাঁধা দাও।

গভীর গাড্ডা মিস্টার বিড্‌ডিকার, দুটো 'ড' নয়—পাঁচ-সাতটা 'ড'।

বালাটাকে দক্‌চে আর লাভ কি? চল, খেতে দেবে চল—ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে। আগে গিলি, তারপর অন্য কথা।

রান্না তো হয়ে গেছে, এস না।

উভয়ে ভিতরে চলিয়া গেল।

।। একুশ ।।

শঙ্কর বাড়ি পৌঁছিয়া দেখিল, মায়ের অবস্থা সত্যই অত্যন্ত ভয়াবহ। তাঁহার পাগলামি এত বাড়িয়াছে যে, তাঁহাকে একটা ঘরে জানালার গরাদের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। বাধ্য হইয়া বাঁধিতে হইয়াছে, কারণ তিনি এমন সব কাণ্ড করিতেছিলেন যে, বাঁধিয়া রাখা ছাড়া উপায় ছিল না। শঙ্কর দেখিল, তাহার বাবার মাথায় একটা ব্যান্ডেজ বাঁধা রহিয়াছে। শুনিল, মা নাকি উন্মত্ত অবস্থায় একটা বাসন ছুঁড়িয়া মারিয়া ছিলেন। শঙ্কর ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। দেখিল, বন্দী-অবস্থাতে মা বিড়বিড় করিয়া বকিয়া চলিয়াছেন।

মা!

কোনো সাড়া নাই, উন্মাদিনী অস্ফুটভাবে ক্রমাগত কি বকিতেছে।

মা, ও মা! দেখ, আমি এসেছি।

শঙ্কর হেঁট হইয়া পদধূলি লইল।

দূর হ, দূর হ, দূর হ,—যত সব পাপ আপদ বালাই—দূর হয়ে যা সব—

শঙ্করের বাবা বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, শঙ্কু, চলে আয় তুই, ওখানে বেশিক্ষণ থাকতে ডাক্তারে মানা করেছে। ওতে পাগলামি বাড়ে শুধু। বেরিয়ে আয়।

শঙ্কর বাহির হইয়া আসিল। তাহার অমন মা এই হইয়া গিয়াছে!

কোন্ ডাক্তার দেখছে?

কোনো ডাক্তার বাকি নেই, এ অঞ্চলে সবাই দেখেছে, এমনকি সিভিল সার্জন পর্যন্ত।

কি বলছেন তাঁরা?

বলবেন আর কি? কেউ বলছেন ডব্লিউ. সি. রায়, কেউ দিচ্ছেন ব্রোমাইড, কেউ বা আর

কোনো ঘুমের ওষুধ। ওই টেম্‌পরারি কিছু ফল হয়, তারপর যে-কে সেই। কবরেজিও করেছি—কিচ্ছু হয়নি।

শঙ্কর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার বাবা বলিলেন, চল, বাইরে চল—আরও কথা আছে তোর সঙ্গে।

বাহিরের ঘরে আসিয়া শঙ্করের বাবা একটি চেয়ারে উপবেশন করিলেন এবং আর একটি চেয়ার দেখাইয়া শঙ্করকে বলিলেন, বস্ তুই, দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ভেবে আর কি হবে বল্, সবই অদৃষ্ট।

শঙ্কর নীরবে উপবেশন করিল।

শঙ্করের পিতা অম্বিকাচরণ রিটায়ার্ড ডেপুটি, বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি, গম্ভীর রাশভারী লোক। দেখিলেই সম্ভ্রম হয়, মনে হয়, এ লোকটিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা চলিবে না। কোথাও বসিলে পা দোলানো তাঁহার স্বভাব, কিন্তু তাহাও এমন গম্ভীর চালে করিয়া থাকেন যে, ছন্দপতন হয় না, হাকিমী গাম্ভীর্যের সহিত বেশ মানাইয়া যায়।

চেয়ারে বসিয়া তিনি গম্ভীরভাবে পা দোলাইতে লাগিলেন। শঙ্কর নীরবে বসিয়া রহিল। একটু পরে অম্বিকাবাবু একটা মোটা সিগার বাহির করিয়া সেটা ধরাইলেন। কিছুক্ষণ নীরবেই ধূমপান করিলেন, তাহার পর বলিলেন, কেমন পড়াশোনা হচ্ছে?

ভালই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। অম্বিকাচরণই পুনরায় নীরবতা ভঙ্গ করিলেন। বলিলেন, তোমাকে টেলিগ্রাম করে আনলাম এইজন্যে যে, তুমি যদি পার কলকাতায় একটা বাসা ঠিক কর গিয়ে। ওকে নিয়ে যাবার মতো অবস্থা হলে কলকাতাতে নিয়ে যাই ওকে, সেখানে নানারকম স্পেশালিস্ট আছেন, দেখা যাক একবার চেষ্টা করে।

চুরুটে দুই-একটা টান দিয়া পুনরায় বলিলেন, আক্ষেপ থাকে কেন?

শঙ্করের বলিবার কিছু ছিল না, সে চুপ করিয়া রহিল।

আবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চুরুটের ছাইটা সন্তর্পণে ঝাড়িয়া অম্বিকাবাবু বলিলেন, আরও একটা কথা বলবার আছে তোমাকে। নানা জায়গা থেকে তোমার বিয়ের প্রস্তাব আসছে, আমি তাড়াতাড়ি তোমার বিয়েটাও দিয়ে দিতে চাই। কারণ, আমার ব্লাডপ্রেসারের যা অবস্থা, কখন কি হয় বলা যায় না। তা ছাড়া বিয়ে যখন করতেই হবে, তখন দেরি করার কোনো মানে হয় না। আরও একটা কথা আছে, দু-একজন ডাক্তার বলেছেন যে, বউয়ের মুখ দেখে ওঁর পাগলামি খানিকটা কমবে, অন্তত সম্ভাবনা আছে।

বিস্মিত শঙ্কর বলিল, এই অবস্থায় এখন বিয়ে!

ডাক্তারদের মতে অবস্থা পরিবর্তনের জন্যেই বিয়ের দরকার।

অম্বিকাবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সিগারে আরও একটা টান দিলেন এবং পুনরায় বলিলেন, তা ছাড়া, বেশি বয়সে বিয়ে করার আমি পক্ষপাতীও নই।

শঙ্করের মনে রিনির মুখখানি ভাসিয়া উঠিল; মনে হইল, তাহার সচকিত নয়ন দুইটি যেন ক্ষণিকের জন্য তাহার পানে চাহিয়া আবার আনমিত হইল।

শঙ্কর বলিল, এখন আমি বিয়ে করতে পারব না।

অম্বিকাবাবুর ভ্রূ আরও একটু কুঞ্চিত হইল। তিনি চোখ তুলিয়া পুত্রের মুখের ওপর দৃষ্টি

নিবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, আমাদের কালে বাপ-মা-রা বিয়ে দেওয়ার সময় ছেলেদের মত নেওয়ার প্রয়োজন মনে করতেন না। আজকাল আমরা ছেলেদের সে সম্মানটা দিয়েছি; এটাও প্রত্যাশা করি যে, ছেলেরাও আমাদের সম্মান রাখবে।

শঙ্কর বলিল, এতে সম্মানের কোনো প্রশ্নই উঠছে না।

উঠছে বইকি। আমি তোমাকে আদেশ না করে অনুরোধ করলাম, সে অনুরোধ তুমি যদি না রাখ, তা হলে আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে বইকি।

শঙ্কর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আমি এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। এত বড় একটা দায়িত্ব নেবার আগে আমি একটু ভেবে দেখতে চাই। সময় দিন আমাকে কিছু।

আবার রিনির মুখখানা মানসপটে ফুটিয়া উঠিল।

পিতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তিনি চক্ষু বুজিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সিগারটাতে ধীরে ধীরে টান দিতেছেন।

ভেবে দেখতে চাও, দেখ। দায়িত্বের কথা নিয়ে আস্ফালন করাটা আজকাল তোমাদের একটা ফ্যাশান হয়েছে বটে, আসলে কিন্তু ওটা অন্তঃসারশূন্য ডেঁপোমি। বিয়ে করার দায়িত্ব যে কতখানি আর সে ভার বহন করবার ক্ষমতা তোমার আছে কি না—এটা ভাল করে ভেবে দেখবার বয়স অথবা অভিজ্ঞতা তোমার হয়নি।

যখন হবে, তখনই বিয়ে করব।

যখন হবে তখন বিয়ে করাটা নিরর্থক—It is no good marrying at forty five or fifty. তার আগে অভিজ্ঞতা হয় না।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অম্বিকাবাবু পুনরায় বলিতে লাগিলেন, আসলে আজকালকার ছেলেরা অতিশয় স্বার্থপর। তাদের মতলবটা, হালকা মেঘের মতো গায়ে ফুঁ দিয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়াব, যা রোজগার করব নিজের সুখের জন্যেই সেটা খরচ করব, স্ত্রীপরিবারের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাব না। তারা ভুলে যায় কিংবা ভুলে থাকতে চায় যে, যে সমাজ তাদের মানুষ করেছে, সেই সমাজের প্রতিও তাদের একটা কর্তব্য আছে। সামান্য কুলি-মজুরও রোজগার করে তাদের স্ত্রীপরিবার পালন করছে। দুঃখভোগ করছে তা স্বীকার করি, কিন্তু দুঃখ-ভোগ করাটাও যে একটা ট্রেনিং, একটা প্রয়োজনীয় জিনিস, স্টিমুলাস ফর স্ট্রাগল—তোমরা আজকাল সেটা এড়িয়ে চলতে চাও।

কুলি-মজুরদের মতো জীবন-যাপন করাটা কি বাঞ্ছনীয়?

তা তো আমি বলছি না। আমি বলছি, দুঃখের সঙ্গে সম্মুখ-সংগ্রাম কর। ভীরুর মতো পালিয়ে যাওয়াতে কোনো বাহাদুরি নেই। লড়াই কর—লড়াই করে জেতো। হারলেও লজ্জা নেই। কিন্তু যুদ্ধে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করা কোনো কালেই গৌরবের নয়। আজকাল তোমরা তাই করছ।

শঙ্কর কোনো উত্তর দিল না।

অম্বিকাচরণ চোখ বুজিয়া সিগারে টান দিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন, বেশ, ভেবে দেখতে চাও, ভেবে দেখ। তুমি আমার একমাত্র ছেলে। আমার শরীর ভাল নয়, তোমার মায়ের অবস্থা তো দেখছই—বাড়িতে কোনো দ্বিতীয় স্ত্রীলোকও নেই যে, আমাদের দেখাশোনা করে।

শশাঙ্ক মারা যাওয়ার পরই তোমার মায়ের পাগলামি শুরু হয়েছে, তোমার বিয়ে হলে হয়তো সেরেও যেতে পারে—কিছু বলা যায় না। সমস্ত জিনিসটা ভাল করে ভেবে দেখ, টেক টাইম, দেয়ার ইজ নো হারি। আচ্ছা, যাও এখন। কয়েকখানা চিঠি লিখতে হবে আমাকে।

শঙ্কর উঠিয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল।

বাড়ির ভিতরে গিয়াই সে শুনিতে পাইল, মা চিৎকার করিতেছেন—শশাঙ্ক, শশাঙ্ক, শশাঙ্ক এসেছে। দেখতে পাচ্ছিস না তোরা, চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি সব?

শশাঙ্ক শঙ্করের ছোট ভাই, কিছুদিন পূর্বে মারা গিয়াছে।

শঙ্কর একা রাত্রে বিছানায় শুইয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল। পিতার কথাগুলো যুক্তিহীন নয়, কিন্তু রিনি? রিনিকে যে সে ভালবাসিয়াছে! যদিও মুখে সে রিনিকে কিছু বলে নাই, কিন্তু রিনি কি বোঝে না? একটুও না? অসম্ভব। তাহার মনে যে ঝড় উঠিয়াছে, তাহার একটু আভাসও কি রিনি পায় না? তাহার মনে সামান্যতম স্পন্দনও কি জাগে নাই? নিশ্চয়ই জাগিয়াছে। কিন্তু শঙ্কর তাহা জানিবে কি করিয়া? জিজ্ঞাসা করা তো অসম্ভব। অথচ—। হঠাৎ দারুণ একটা চিৎকারে শঙ্করের চিন্তাস্রোত ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। পাগলিনী চিৎকার করিতেছেন। সে চিৎকার এত করুণ, এত তীব্র, এত মর্মস্পর্শী যে, শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। উঠিয়া বিছানায় খানিকক্ষণ বিমূঢ়ের মতো বসিয়া রহিল; তাহার মনে হইল চতুর্দিকের অন্ধকার যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছে, নানারূপ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে। অদ্ভুত সব মূর্তি!...সহসা চিৎকারটা থামিয়া গেল; চতুর্দিকে নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। সহসা দালানের ঘড়িটার শব্দ স্পষ্টতর হইয়া উঠিল, দূরে চৌকিদার হাঁকিয়া গেল। শঙ্কর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আবার শুইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, সে যেন এ বাড়ির কেহ নহে, কোনো আগন্তুক যেন হঠাৎ আসিয়া এক রাত্রির জন্য আতিথ্য স্বীকার করিয়াছে, কাল সকালেই উঠিয়া চলিয়া যাইবে। পাশ-বালিশটা জড়াইয়া ঘুমাইবার জন্য সে ভাল করিয়া শুইল, কিন্তু ঘুম তাহার আসিল না। মুদিত নয়নের সম্মুখে রিনি আনত নয়নে সারারাত বসিয়া রহিল।

।। বাইশ ।।

দ্রুতগামী একটি এক্সপ্রেস ট্রেনের কামরায় বোস সাহেব বসিয়াছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা, কষ্ট হইবার কথা নয়, তথাপি বোস সাহেবের মুখখানি অত্যন্ত ক্লিষ্ট দেখাইতেছিল। তিনি দিল্লি হইতে ফিরিতেছিলেন, বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতেছিলেন। যে সাহেবটিকে তোয়াজ করিতে তিনি গিয়াছিলেন, নানারূপ তোয়াজ সত্ত্বেও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারেন নাই। এমন একটিও আশাপ্রদ কথা সাহেবের মুখ দিয়া নির্গত হয় নাই, যাহার উপর নিশ্চিতভাবে নির্ভর করা যায়; অথচ তাঁহার ধারণা ছিল, ক্যামেরন সাহেব...

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বোস সাহেব ভাবিতে লাগিলেন।

মিস্টার এল. কে. বোস (ললিতকুমার বোস) বাঙালি-সমাজের আদর্শ পুরুষ। বরাবর ভাল করিয়া পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন, সুপারিশ এবং বিদ্যার জোরে ভাল চাকুরি জোগাড় করিয়াছেন, চাকুরি বজায় রাখিবার জন্য নানাপ্রকার কলা-কৌশল শিখিয়াছেন, মোটা রকম পণ লইয়া সুন্দরী বধূ ঘরে আনিয়াছেন, ইহার মধ্যে কলিকাতা শহরে খানিকটা জমি কিনিয়া ফেলিয়াছেন,

আত্মীয়-স্বজন দুই-একজনের চাকরি করিয়া দিয়াছেন, করেন নাই কি? সুতরাং পরিচিত-মহলে নিদারুণ সাহেবিয়ানা সত্ত্বেও বোস সাহেবের নামে সকলের মনে শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমই জাগে। গোপনে গোপনে দুই-চারিজন বোস সাহেবের সাহেবিয়ানা লইয়া যে টিটকারি দেন না তাহা নয়, কিন্তু টিটকারিতে বোস সাহেবের কিছু আসে যায় না। সেইজন্যও বটে এবং সাহেবিয়ানাটা তাঁহার চাকরির একটা অপরিহার্য অঙ্গ—এই বিশ্বাসের ফলেও বটে, অধিকাংশ লোকই তাঁহার সাহেবিয়ানা লইয়া আর মাথা ঘামায় না। বোস সাহেব একজন বড় অফিসার, এই মহিমার জ্যোতিতেই সকলের চোখ ধাঁধিয়া আছে। তাঁহার চারিত্রিক নানা দোষও তাই মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। সত্যই বোস সাহেব উদ্যমশীল ব্যক্তি, নিত্য নব উপায়ে চাকুরির উন্নতি করিয়া চলিয়াছেন, শাসন যন্ত্রের কোন্ চাকাটিতে কখন কোন তৈল নিষেক করিলে সুফল ফলিবে—ইহা আবিষ্কার করাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য, এবং তাহাতে তিনি খানিকটা সফলকাম হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। শৈলকে তিনি সুখী করিতে পারিয়াছেন কিনা, তাহা নিতান্তই অবান্তর প্রশ্ন, তাহা লইয়া কেহ মাথা ঘামায় না, তিনি নিজেও না। শৈলকে তিনি মিসেস এল. কে. বোসের মর্যাদা দিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট নয় কি? ইহার অধিক আর কিছু করিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই, জীবনে তাঁহাকে অনেক উর্ধ্বে উঠিতে হইবে, বিবাহিত স্ত্রীকে লইয়া বেশি বাড়াবাড়ি করিবার অবসরই বা কোথায়?

একটা ছোট স্টেশনে এক মিনিট থামিয়া এক্সপ্রেস ট্রেন পুনরায় চলিতে শুরু করিল। অনেক দূরে তাহাকে যাইতে হইবে, অনেক স্টেশন পার হইতে হইবে, ছোট স্টেশনে বেশিক্ষণ দাঁড়াইয়া সময় নষ্ট করিবার তাহারও অবসর নাই।

এক্সপ্রেস ছুটিতে লাগিল।

।। তেইশ ।।

মিস বেলা মল্লিক তন্ময় হইয়া সঙ্গীতচর্চা করিতেছিলেন। গাহিতেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সেই পুরাতন গানখানা—মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখি, সখি জাগো। এই পুরাতন গানটাই বেলা মল্লিকের কণ্ঠে নূতন লালিত্যে অপরূপ হইয়া উঠিতেছিল। পাশের বাড়িতে মুগ্ধ লক্ষ্মণবাবু খবরের কাগজটা মুখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া তাহা শুনিতেছিল। তাহার তন্ময় নিস্পন্দ ভাবটা বেলাও লক্ষ্য করিতেছিলেন। লক্ষ্মণবাবুর সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় চুকিয়া গিয়াছে। সেদিন বেলা একটি পত্রযোগে স্পষ্টভাবেই লক্ষ্মণবাবুকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, কোষ্ঠীর অমিল সত্ত্বেও বিবাহ দিবার মত দৃঢ় মনোভাব তাঁহার দাদার অর্থাৎ প্রিয়বাবুর নাই, তাঁহার নিজেরও এ সম্বন্ধে কুসংস্কার আছে, সুতরাং বিবাহ হওয়া অসম্ভব। লক্ষ্মণবাবু যেন অনুগ্রহ করিয়া এ প্রস্তাব আর না উত্থাপিত করেন, কারণ তাহা এক্ষেত্রে অকারণ ক্ষোভেরই সৃষ্টি করিবে। প্রিয়বাবুও বেলার জেদে পড়িয়া এবং নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও লক্ষ্মণবাবুকে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কুষ্ঠির যখন মিল হচ্ছে না তখন আর উপায় কি? কিন্তু মনে মনে তিনি বলিতেছিলেন, আহা, এমন পাত্রটা ফসকাইয়া গেল! বেলাটা যে দিন দিন কি হইতেছে, বুঝিবার উপায় নাই।

গানটা খানিকক্ষণ গাহিয়া বেলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অঙ্গভঙ্গি সহকারে গা ভাঙিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাহার পর এস্রাজখানা পাড়িয়া বাজাইতে লাগিলেন। ওই

গানখানাই বাজাইতে লাগিলেন। লক্ষ্মণবাবু আর বাতায়নে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া গেলেন।

বেলা বাজাইতেছেন, এমন সময় প্রিয়বাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ট্রামের পয়সা বাঁচাইবার জন্য বেচারিকে অনেকটা দূর হাঁটিয়া আসিতে হইয়াছে, তাঁহাকে চাকরি ছাড়া ইন্সিওরেন্সের দালালিও করিতে হয়। একটি শিকারের সন্ধান পাইয়াছিলেন, কিন্তু অভিযান সফল হয় নাই, ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। সহসা সঙ্গীতনিরতা বেলাকে দেখিয়া তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, আমি খাটিয়া খাটিয়া গায়ের রক্ত জল করিয়া ফেলিলাম, আর এ দিব্যি বসিয়া এস্রাজ বাজাইতেছে! বিবাহ করিবার নাম নাই, পাত্র আনিলে কোনো না কোনো ছুতায় সেটাকে তাড়াইয়া দিতেছে। মেয়েমানুষ বলিয়া মাথা কিনিয়াছে একেবারে।

প্রিয়নাথ মল্লিকের সহসা ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। সম্প্রতি ভগ্নীর চালচলন ভাবগতিক এমন একটা বেপরোয়া মূর্তি ধারণ করিয়াছে যে, তিনি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, তোর মতলবটা কি, বল্ দেখি খুলে?

ভ্রূভঙ্গীসহকারে বেলা উত্তর দিলেন, কিসের মতলব?

কিসের আবার, বিয়ে-থা করবি, না, না?

সোজাসুজি বলিয়া ফেলিলেন তিনি।

বেলা ছড়টা পাশে রাখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তার জন্যে তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন? তুমি নিজে বিয়ে কর না, যদি ইচ্ছে হয়। কর না, বেশ আমার একটা সঙ্গী হোক।

প্রিয় মল্লিক ব্যঙ্গতিক্ত একটা হাসি হাসিয়া বলিলেন, আমি বিয়ে করব! এই কলকাতা শহরে একটা অবিবাহিত বোন ঘাড়ে নিয়ে একশো টাকা মাইনেয় বিয়ে করা চলে? বললেই হল—বিয়ে কর!

গ্রীবা বাঁকাইয়া অধর দংশন করিয়া বেলা বলিলেন, ঘাড়ে করে মানে? আমিই কি তোমার বিয়ের পথে বাধা নাকি?

তাঁহার চক্ষু দুইটি সহসা জ্বলিয়া উঠিল।

প্রিয়নাথও একটু উত্তেজিত হইয়াছিলেন, বলিলেন, সে কথা কি এখনও বুঝতে পারনি? আর কিছু না হোক্, তোমার বুদ্ধির ওপর আমার কিঞ্চিৎ আস্থা ছিল।

বেলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, বেশ, তুমি পাত্রী দেখ, আমি তোমার ঘাড় থেকে এখুনি নেবে যাচ্ছি। এ কথাটা আগে বললে আগেই ব্যবস্থা করতাম, মিছামিছি তোমার সময় নষ্ট হল এতদিন।—এস্রাজটা কোল হইতে নামাইয়া বেলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও কোনো কথা না বলিয়া সম্মুখের আলনাটা হইতে নিজের কাপড়-জামা প্রভৃতি টানিয়া নামাইয়া পাট করিতে শুরু করিয়া দিলেন।

প্রিয়নাথ বলিলেন, এর মানে?

বেলা কোনো উত্তর দিলেন না। একটির পর একটি কাপড় পাট করিয়া যাইতে লাগিলেন।

এর মানে কি?

তথাপি নিরুত্তর।

একটু বিব্রতকণ্ঠে প্রিয়নাথ আবার বলিলেন, হঠাৎ কাপড় গোছাবার মানে কি, আমি জানতে চাই।

বেলা ঘাড় ফিরাইয়া নির্বিকারভাবে বলিলেন, কাপড়গুলো কি তা হলে রেখেই যাব? তুমি এগুলো কিনে দিয়েছ অবশ্য, ইচ্ছে করলে কেড়ে নিতে পার।

ইচ্ছে করলে কেড়ে নিতে পারি।

বিহ্বল প্রিয়নাথ যন্ত্রচালিতবৎ কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন।

পার বই কি। বেশ, নেব না এগুলো, রইল।

দ্রুতপদে বেলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। হাতে লইলেন শুধু ছোট হাতব্যাগটা। স্তম্ভিত প্রিয়নাথ কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাহার পর উঠিয়া জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন, মেয়েটা সত্য-সত্যই গেল কোথা! কিছু দেখা গেল না। তখন তিনিও রাস্তায় বাহির হইলেন। দেখিলেন, দূরে দ্রুতপদে বেলা চলিয়াছেন। ঘাড় ফিরাইয়া প্রিয়নাথকে দেখিয়া ডানদিকের গলিটার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় প্রিয়নাথ কি করিবেন চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় লক্ষ্মণবাবু বাহির হইয়া আসিল এবং সস্মিত মুখে প্রশ্ন করিল, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন যে এমন করে? আসল কথাটা প্রিয়নাথ বলিতে পারিলেন না। কেমন যেন বাধিয়া গেল। বলিলেন, দেখছি, যদি রিক্‌শা-টিক্‌শা একটা পাওয়া যায়।

কোথাও বেরুবেন নাকি?

মনে করছি তো।

প্রিয়বাবু ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণবাবুও এ-দিক ও-দিক চাহিয়া অকারণে সামনের বাড়ির ভদ্রলোককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ছেলেটা কেমন আছে আজ?

লক্ষ্মণবাবুর কোনো উৎকণ্ঠা ছিল না, এমনি জিজ্ঞাসা করিল। সামনের বাড়ির ভদ্রলোক জানালার সামনে বসিয়া দাড়ি কামাইতেছিলেন, আবছা-গোছের একটা উত্তর দিলেন, চলছে।

উপরের বাতায়ন হইতে বেলাকে বাহির হইয়া যাইতে লক্ষ্মণবাবু দেখিয়াছিল, সুতরাং শীঘ্র আর সঙ্গীতের সম্ভাবনা নাই। সে বাইকটি বাহির করিয়া দোকানের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল।

খানিকক্ষণ দ্রুতপদে হাঁটিয়া বেলাকে অবশেষে গতিবেগ মন্থর করিতে হইল। শিয়ালদহের জনবহুল মোড়টাতে দাঁড়াইয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, এইবার কি করা যায়? এক রিনিদের বাড়ি ছাড়া চেনাশোনা আর কোনো স্থান তো কলিকাতা শহরে নাই! কিন্তু রিনিদের বাড়ি যাইতে তাঁহার কেমন যেন সঙ্কোচ হইতে লাগিল, সেখানে গিয়া কি বলিবেন? তাহা ছাড়া, তাঁহার দাদা নিশ্চয় সেখানে গিয়া খোঁজ করিবেন এবং অবশেষে একটা নাটকীয় ব্যাপার করিয়া তাঁহাকে পুনরায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন। এরূপ অপমানের পর আর তিনি দাদার আশ্রয়ে কিছুতেই ফিরিয়া যাইবেন না, তাহাতে অদৃষ্টে যত কষ্টই থাক্। কিন্তু অবিলম্বে একটা কিছু করা দরকার। রোদও ক্রমশ বাড়িয়া উঠিতেছে। শিয়ালদহের বড় ঘড়িটার পানে চাহিয়া দেখিলেন, সাড়ে বারোটা বাজিয়াছে, ক্ষুধারও একটু উদ্রেক হইয়াছে। সহসা বেলার মাথায় একটা বুদ্ধি জাগিল। দেখাই যাক না ভদ্রলোককে একটু পরীক্ষা করিয়া! হাতব্যাগটা খুলিয়া দেখিলেন, আনা তিনেক পয়সা রহিয়াছে। উহাতেই হইবে। একটু আগাইয়া গিয়া বড়গোছের একটা দোকানে বেলা উঠিলেন এবং স্মিতমুখে নমস্কার করিয়া বলিলেন, দয়া করে আপনার ফোনটা একটু ব্যবহার করতে দেবেন কি?

নিশ্চয়, এই যে আসুন।

দোকানদার ভদ্রলোক, ভদ্রতার আতিশয্যে টুলটা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং ফোনটা আগাইয়া দিলেন। নিকটেই ডাইরেক্টরিখানা ছিল, বেলা অপূর্ববাবুর আপিসের ফোন নম্বরটা বাহির করিয়া অপূর্ববাবুকে ফোন করিলেন। বলিলেন, তিনি বড় বিপদে পড়িয়া শিয়ালদহের মোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন। অপূর্ববাবুকে বিশেষ প্রয়োজন, তিনি যদি অবিলম্বে একবার আসিতে পারেন বড় ভাল হয়, না আসিলে বড় মুশকিলে পড়িতে হইবে।

অপূর্ব বলিলেন, খুব চেষ্টা করছি আমি যেতে, ছুটি পেলে নিশ্চয়ই যাচ্ছি।

ছুটি নিন যেমন করে হোক।

দেখি।

ফোনটা যথাস্থানে স্থাপন করিয়া বেলা দেবী ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে দুই আনা পয়সা বাহির করিয়া দিতে গেলেন, কিন্তু দোকানি ভদ্রলোক কিছুতেই তাহা লইতে রাজি হইলেন না। বেলা দোকান হইত বাহির হইয়া আসিলেন এবং অপূর্ববাবুর প্রতীক্ষায় ট্রাম-লাইনের ধারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্লাইভ স্ট্রিট হইতে শিয়ালদহের মোড়ে আসিতে একটু সময় লাগে, বেলা অলসভাবে দাঁড়াইয়া প্রাচীরগাত্রের এবং ল্যাম্পপোস্টের ওপর যে বিজ্ঞাপনগুলি ছিল, তাহাই পড়িতে লাগিলেন। হরেক রকমের নানাবিধ বিজ্ঞাপন, অধিকাংশই বাড়িভাড়া সংক্রান্ত। দেখিতে দেখিতে একটি বিজ্ঞাপন সহসা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। একটি ছোট মেয়েকে গান শিখাইবার জন্য ও পড়াইবার জন্য একটি শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক। দুই বেলা পড়াইতে হইবে, বেতন যোগ্যতা অনুসারে; আবেদনকারিণী যেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় স্বয়ং আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। বেলা অধর দংশন করিয়া খানিকক্ষণ বিজ্ঞাপনটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর রাস্তা পার হইয়া সেই ফোনওয়ালা দোকানে গিয়া সেই ভদ্রলোকটিকে বলিলেন, আপনাকে আর একবার বিরক্ত করতে এলাম। এক টুকরো কাগজ আর একটা পেনসিল যদি দেন—

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ কাগজ-পেনসিল দিলেন। বেলা কাগজে ঠিকানাটা টুকিয়া লইয়া হাতব্যাগে সেটা রাখিয়া দিলেন এবং পুনরায় ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়া ট্রামলাইনের ধারে গিয়া অপূর্ববাবুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরই অপূর্ববাবু আসিয়া পড়িলেন। ট্রাম হইতে নামিয়া কোঁচাটি ঝাড়িয়া পাঞ্জাবির পকেটে পুরিতে পুরিতে, মিহি গলায় মৃদু হাসিয়া অথচ একটু নিশ্চিন্ত কণ্ঠে অপূর্ববাবু বলিলেন, ব্যাপার কি বলুন তো?

ব্যাপার গুরুতর।

তার মানে?

তার মানে, দাদা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, রাস্তায় এসে তাই দাঁড়িয়েছি, আপনি এখন একটা ব্যবস্থা করুন আমার।

অপরূপ গ্রীবাভঙ্গিসহকারে অধর দংশন করিয়া বেলা অপূর্ববাবুর পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। অপূর্ববাবু ইহার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। বিনা মেঘে বজ্রপাত হইলেও বোধহয় তিনি এতটা বিস্মিত হইতেন না। আপিসে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে কাজ করিতেছিলেন, হঠাৎ এ কি কাণ্ড!

দাদা তাড়িয়ে দিয়েছেন? বলেন কি?

বলছি তো। কেন তাড়িয়ে দিয়েছেন, কি বৃত্তান্ত পরে শুনবেন। এখন আমার একটা

দাঁড়াবার জায়গা ঠিক করুন তো আগে। আপনি যে মেসে থাকেন, সেখানে সুবিধে হতে পারে কিছু? প্রস্তাবটার অসমীচীনতায় বেলা নিজেই হাসিয়া ফেলিলেন, কিন্তু পুনরায় বলিলেন, বলুন না, সেখানে আমার জায়গা হতে পারে কি না!

অপূর্ববাবু পকেট হইতে সুগন্ধি রুমালখানা বাহির করিয়া ঘর্মাক্ত কপালটা মুছিয়া ফেলিলেন ও আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, আমার মেসে? মানে সেটা একটু দৃষ্টিকটু হবে না? মানে, অন্য কিছু নয়, অর্থাৎ—

অপূর্ববাবু আবার ঘামিতে লাগিলেন।

বেলা পুনরায় হাসিয়া বলিলেন, আমার সম্বলের মধ্যে মাত্র তিন আনা রয়েছে এই ব্যাগে। তা না হলে আপাতত একটা হোটেলে উঠলেও চলত, কিন্তু—

অপূর্ববাবু পুনরায় মুখটা মুছিয়া বলিলেন, মাসের শেষ কিনা, আমারও হাত একদম খালি, মানে—

কুটিল হাসি হাসিয়া বেলা বলিলেন, তা ছাড়া সে দিন রিনিকে অমন দামি দুখানা বই কিনে দিতে হল তো। শঙ্করবাবুকে সে টাকাটা দিয়েছিলেন আপনি?

না, এখনও দেওয়া হয়নি, দেখাই হয় না ভদ্রলোকের সঙ্গে।

এমন সময় অভাবিত একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল।

রোক্‌কে— রোক্‌কে—

চলন্ত ট্রাম হইতে শঙ্কর লাফাইয়া পড়িল।

বিস্মিত বেলা বলিলেন, এ কি, শঙ্করবাবু যে! অনেক দিন বাঁচবেন আপনি, এই মাত্র আপনার নাম হচ্ছিল। হঠাৎ এখানে কোথা থেকে?

বাড়ি গিয়েছিলাম, এইমাত্র নাবলাম ট্রেন থেকে। হস্টেলে ফিরছিলাম, আপনাদের দেখে নেবে পড়লাম। অপূর্ববাবুকে একটু যেন বিব্রত মনে হচ্ছে, ব্যাপার কি?

অপূর্ববাবু বারম্বার ঘাড় ও মুখ মুছিতে লাগিলেন।

বেলা অপাঙ্গে সেদিকে একবার চাহিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, বিব্রত করেছি ওঁকে একটু। আপনিও শুনুন তা হলে ব্যাপারটা, এবং যদি ইচ্ছা করেন, বিব্রত হোন।

বেলা দেবী সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা পুনরায় বিবৃত করিলেন।

শঙ্কর বলিল, তার জন্যে আর ভাবনা কি? এই ট্যাক্সি!

ট্যাক্সি ডাকলেন যে?

চলুন আমার হস্টেলে। সেখানে একটা কমন-রুম আছে তো। সেখানেই না হয় বসবেন খানিকক্ষণ, তারপর খাওয়া দাওয়া করে যা হয় একটা ব্যবস্থা করে ফেললেই হবে। ওর জন্যে আর ভাবনা কি, চলুন।

সেখানে কি বলে আমার পরিচয় দেবেন?

বোন।

না, বোন আমি হতে চাই না কারও। একজনের বোন হয়েই যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে আমার।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, পরিচয় যা হোক একটা দিলেই হবে, ওর জন্যে কিছু আটকাবে না, এখন উঠুন।

বেলাকে লইয়া শঙ্কর ট্যাক্সিতে চড়িয়া বসিল।

বেলা অপূর্ববাবুকে একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া সহাস্যে বলিলেন, অনর্থক কষ্ট দিলাম আপনাকে, কিছু মনে করবেন না।

না না, কিছু না—

ট্যাক্সি চলিয়া গেল।

অপ্রস্তুত মুখে সেইদিকে চাহিয়া অপূর্ববাবু দাঁড়াইয়া রহিলেন।

।। চব্বিশ ।।

প্রফেসার গুপ্ত কালিদাসের কাব্যে নিমগ্ন হইয়া ছিলেন। সংস্কৃত কাব্য চর্চা করা তাঁহার জীবনের প্রথমতম বিলাস। যদিও তাঁহার পরিধানে রিমলেস চশমা, হস্তে বিলাতি সিগারেট, অঙ্গে মুসলমানি ঢিলা পাঞ্জাবি ও পায়জামা; কিন্তু মনে মনে তিনি উজ্জয়িনীবাসিনী মালবিকা-নিপুণিকা-চতুরিকার প্রণয়ী। তাঁহার কুশন-দেওয়া রিভল্‌ভিং চেয়ারে বসিয়া বসিয়াই তিনি নাগাধিরাজ হিমালয়ের গভীর গাম্ভীর্যের মধ্যে অথবা অলকাপুরীর মায়াময় স্বপ্নলোকে তন্ময়চিত্তে বিচরণ করিয়া থাকেন। ছন্দে গাঁথিয়া তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কবিতা যদিও তিনি অদ্যাপি লেখেন নাই, কিন্তু কোনো উল্লেখযোগ্য কবিতাও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই, ইহা সত্য কথা। তাঁহার নিজের জীবনটাতেই নানা কবিতার উপকরণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা কোনোদিন ছন্দোবদ্ধ হইবার সুযোগ পাইল না। ছাত্রস্থানীয় শঙ্করের সহিত তাঁহার বন্ধুত্বের কারণও এই কবিত্বপ্রীতি। শঙ্করের কবিতা যদিও ছাপা হয় নাই, কিন্তু তাহা অপরূপ। তাহার মধ্যে তিনি উদীয়মান কবি-প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন; তাহার সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া সুখ হয়, তাহার মনের সংস্পর্শে আসিলে নিজের মনের সুর বিচিত্র লীলায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। বয়স এবং সম্পর্কের অনৈক্য সত্ত্বেও তাই শঙ্করের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিয়াছে।

প্রফেসার গুপ্ত তন্ময়চিত্তে শকুন্তলায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, এমন সময় পিয়ন আসিয়া একখানি চিঠি দিয়া গেল। পত্রখানি বিলাত হইতে আসিয়াছে—পরিচিত হস্তাক্ষর। প্রফেসার গুপ্তের অধরে মৃদু একটি হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। ইভার চিঠি। সেই ইভা, যাহাকে ঘিরিয়া একদিন কত স্বপ্নই না পরিগ্রহ করিয়াছিল! সে স্বপ্নগুলি আজ কোথায়? লন্ডনবাসিনী বিপণি-পরিচারিকা ইভার মনেও কি এখনও তাহারা সজীব হইয়া আছে? হয়তো নাই। না থাকুক, কিন্তু একদিন এই ইভাই তাঁহার প্রবাস-জীবন অনন্ত মাধুর্যে ভরিয়া দিয়াছিল, তাহা সত্য কথা। একদিন ইহা জীবন্ত সত্য ছিল বলিয়াই আজও পত্রধারার নির্জীব অভিনয় চালাইতে হইতেছে। ইভাও তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া নাই, তিনিও ইভার ধ্যানে মগ্ন নহেন, চিঠি লেখাটা এখনও তবু চলিতেছে। অতীত জীবনের সেই পরম রমণীয় ভঙ্গুর স্বপ্নটি যদিও আজ ভাঙিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু তো তাহা একদিন ছিল। ইভার ছবিটা মনে ভাসিয়া উঠিল। তাহার নীল চক্ষু দুইটিতে, সোনালী অলকে, রক্তিম অধরে, পীবর বক্ষে এখনও কি সেই মাদকতা আছে? চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রফেসার গুপ্ত কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। টেবিলের ওপর মাথা রাখিয়া নিমীলিত নয়নে তিনি ইভাকেই দেখিতে লাগিলেন—যে ইভা তাঁহাকে বিবাহিত জানিয়াও

প্রত্যাখ্যান করে নাই, যে ইভা সর্বস্ব দিয়াও তাঁহাকে একটু খুশি করিতে পারিলে বর্তিয়া যাইত, সে ইভা কি এখনও বাঁচিয়া আছে? প্রফেসর গুপ্ত কেমন যেন তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন; মনে হইল, তিনি যেন কণ্বমুনির আশ্রমে গিয়াছেন, অদূরে আশ্রমবাসিনী বল্কলবসনা শকুন্তলা দুষ্মন্তের পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু এ কি, শকুন্তলার মুখখানা ঠিক যেন ইভার মতো! এ যে একেবারে অবিকল ইভা!

খুট করিয়া একটা শব্দ হইল, স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল।

প্রফেসার গুপ্ত তাড়াতাড়ি টেবিল হইতে মাথা তুলিলেন। সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, অধর দংশন করিয়া একটি তন্বী যুবতী অপরূপ গ্রীবাভঙ্গি করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন—পাশে শঙ্কর দাঁড়াইয়া।

শঙ্কর বলিল, এই অসময়ে ঘুমুচ্ছিলেন নাকি?

না, ঘুমাইনি ঠিক, একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল। বসো বসো। ইনি কে? আসুন, বসুন।

প্রফেসার গুপ্ত সম্ভ্রমভরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বেলাকে অভ্যর্থনা করিলেন। শঙ্কর পরিচয় করাইয়া দিল।

যথাবিধি নমস্কারান্তে সকলে যখন আসন পরিগ্রহ করিলেন, তখন শঙ্কর বলিল, আপনি মান্তুর জন্যে একজন গানের মাস্টার খুঁজছিলেন, ইচ্ছে করলে এঁকে রাখতে পারেন। গান-বাজনায় খুব ভাল ইনি।

বেশ তো।

শঙ্কর সংক্ষেপে বেলার পরিচয় দিয়া এবং তাঁহার গৃহত্যাগের কারণ জানাইয়া বলিল, অতিশয় স্বাধীন প্রকৃতির মহিলা ইনি। কারও গলগ্রহ হয়ে থাকতে চান না, নিজে রোজগার করে নিজের পায়ে দাঁড়াবেন—এই এঁর প্রতিজ্ঞা।

প্রফেসার গুপ্ত সোৎসাহে বলিলেন, এ তো খুব ভাল কথা। দেশের যা অবস্থা, তাতে মেয়েদের আত্মপ্রত্যয় জাগা খুবই উচিত। খালি গানই শেখান আপনি? পড়াতে পারবেন?

বেলা এতক্ষণ নীরব ছিলেন। এইবার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, না। খালি গানই শেখাই। পড়াশোনা আমার বেশিদূর নয়, ম্যাট্রিক দিয়েছিলাম, পাস করতে পারিনি। প্রাইভেটে বাড়িতে পড়ে পরীক্ষা দিয়েছিলাম, হল না।

প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, ম্যাট্রিকটা পাস করা কি আর এমন শক্ত ব্যাপার! একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যায়।

পড়াশোনায় কোনো দিনই বেশি মন নেই আমার। গান-বাজনাই বেশি ভাল লাগে, সেইটাই ভাল করে শিখেছি।

সহসা বেলা লক্ষ্য করিলেন, প্রফেসার গুপ্ত অপলক দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিয়াছেন।

বেলা দৃষ্টি নত করিলেন এবং ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেছি, এখন আপনারা একটু সাহায্য না করলে মুশকিলে পড়ব।

সাহায্য নিশ্চয়ই করব। মাইনে কত চান আপনি?

মাইনে যা হয় দেবেন, আপনার মেয়েকে বেশ ভাল করে গান-বাজনা শিখিয়ে দেব আমি। আমার খাওয়া-পরা-থাকার খরচটা চলে গেলেই হল।

বেলা দেবী আবার চক্ষু দুইটি আনত করিলেন।

প্রফেসার গুপ্ত কিছু না বলিয়া বেলার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

শঙ্কর বলিল, কি ভাবছেন?

একটু হাসিয়া গুপ্ত মহাশয় বলিলেন, ভাবব আবার কি?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রফেসার গুপ্ত পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, আপনি এখন কোথায় আছেন?

শঙ্করই উত্তর দিল, মহৎ আশ্রমে।

হোটেলে থাকা কি বেশিদিন সুবিধে হবে?

বেলা বলিলেন, সে তো অসম্ভব। ঠিক করেছি, কোথাও একটা রুম নিয়ে ইক্‌মিকে রেঁধে খাব। কিন্তু তার আগে রোজগারের একটা ঠিকঠাক করতে হবে, সেই অনুপাতেই সব বন্দোবস্ত করতে হবে তো! আরও দু-একটা টিউশানি জোগাড় করতে হবে। করে দেবেন তো শঙ্করবাবু?

দেখব চেষ্টা করে নিশ্চয়।—বলিয়া শঙ্কর শকুন্তলাটা টানিয়া লইয়া পাতা উল্‌টাইতে লাগিল। সকলেই মিনিটখানিক নীরব হইয়া রহিলেন।

তাহার পর বেলা বলিলেন, আপনার মেয়ে কোথা? ডাকুন না, আলাপ করি একটু।

তারা এখন এখানে কেউ নেই, মামার বাড়ি গেছে। এই কলকাতাতেই অবশ্য মামার বাড়ি, কালই বোধ হয় আসবে তারা।

আপনার মেয়ের বয়স কত?

বছর বারো হবে।

আগে গান শিখেছিল কারও কাছে?

তেমন কিছু নয়, এমনিই শুনে শুনে যা দু-একটা শিখেছে। তবে গলাটা মিষ্টি, সুর-বোধও আছে বলে মনে হয়, তাছাড়া বিয়ের বাজারেও গানটা দরকারে লাগবে।

প্রফেসার গুপ্ত একটু হাসিয়া পুনরায় বলিলেন, গোড়াতেই কিন্তু মাইনের ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যাওয়া ভাল। আমি টাকা কুড়ির বেশি এখন দিতে পারব না। তবে একটা কাজ আমি করতে পারি, আপাতত আপনার থাকবার ব্যবস্থা একটা আমি করে দিতে পারি। আমার এক বন্ধুর একটা ছোট বাড়ি আমার চার্জে আছে, ভাড়াটে এখনও পর্যন্ত জোটেনি। ভাড়াটে যতদিন না জুটছে, ততদিন সেটাতে আপনি পুট-আপ করতে পারেন।

বেলা জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়িটার ভাড়া কত?

ভাড়া পঁচিশ থেকে ত্রিশের্ মধ্যে। বাড়িটা ভাল।

কোন্ পাড়ায় বাড়িটা?

বাগবাজারে।

বেশ তো, যতদিন ভাড়াটে না জোটে, আমি না হয় থাকি; অত না পারি, কিছু ভাড়া দেব। আরও গোটা দুই টিউশনি যদি যোগাড় করতে পারি, আমিই না হয় থেকে যাব। কি বলেন শঙ্করবাবু?

হ্যাঁ।

শঙ্কর অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল। সে শকুন্তলায় নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

তা হলে কালই চলে আসুন সে বাড়িটাতে, মিছিমিছি হোটেলে আর পয়সা দিয়ে লাভ কি? দাঁড়ান, চাবিটা এনে দিই আপনাকে।

প্রফেসার গুপ্ত উঠিয়া ভিতরের দিকে গেলেন। কিছুদূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, চা আনতে বলি, কি বলেন?

শঙ্কর বলিল, বলুন।

প্রফেসার গুপ্ত চলিয়া গেলে শঙ্কর শকুন্তলাটা মুড়িয়া রাখিয়া দিল এবং বেলার মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিল।

হাসিলেন যে?

এমনিই।

আর একটু হাসিয়া শঙ্কর বলিল, প্রায় তো নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন দেখছি। আমার বিদায় নেওয়ার সময় আসন্ন হয়ে এল ভেবে দুঃখ হচ্ছে। হাসিটা ছদ্মবেশ মাত্র।

দেখুন, কবিত্বশক্তি ভগবান যতটুকু দিয়েছেন, সবটুকু আমার ওপর নিঃশেষ করে ফেলবেন না। রিনি বেচারিও তো আশা করে বসে আছে!

রিনি! রিনির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি?

সম্বন্ধ নেই বলেই সম্বন্ধ গভীর। সব জানি আমি, বৃথা লুকোচ্ছেন কেন?

অধর দংশন করিয়া বেলা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

শঙ্কর কিছু বলিল না, কেবল ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত করিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বিস্ময়ের ভাবটা ফুটাইতে চেষ্টা করিল।

প্রফেসার গুপ্ত চাবি লইয়া প্রবেশ করিলেন ও বলিলেন, এই নিন। আসুন, এইবার একটু গল্প করা যাক।

বেলা বলিলেন, আপনি পড়াশোনা করছিলেন, আপনাকে হয়তো বিরক্ত করছি।

না না, কিছু না। এসে তো দেখলেন, ঘুমুচ্ছিলাম। আসুন, একটু আড্ডা দেওয়া যাক।

আপনার সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার মতো বিদ্যে আমার নেই, শঙ্করবাবু হয়তো পারবেন।

বেলা দেবী হাসিলেন।

প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, আড্ডা দেওয়ার মধ্যে পাণ্ডিত্যের স্থান কোথায় তা তো বুঝি না! তা ছাড়া—আচ্ছা, থাক, এত অল্প পরিচয়ে সে কথাটা বলা ঠিক হবে না।

কি কথা?

থাক্, সে পরে বলব কোনোদিন, অবশ্য সে-দিন যদি আসে।

প্রফেসার গুপ্ত বেলার মুখের পানে চাহিয়া একটু রহস্যময় হাসি হাসিলেন। তাহাব পর অন্য কথা পাড়িলেন।

আপনি ম্যাট্রিকটা পাস করে ফেলুন।

কি আর লাভ হবে তাতে?

চাকরি। আপনার পড়বার আমি সুবিধে করে দিতে পারি। ম্যাট্রিকুলেশনটা অন্তত পাস করা থাকলে অনেক রকম স্কোপ পাওয়া যায়, কি বল শঙ্কর?

শঙ্কর পুনরায় শকুন্তলাটা উল্টাইতেছিল।

মুখ না তুলিয়াই বলিল, নিশ্চয়।

প্রফেসার গুপ্ত সোৎসাহে বলিতে লাগিলেন, পাস করে ফেলুন ম্যাট্রিকটা, ম্যাট্রিক পাস করা কি আর এমন শক্ত ব্যাপার? প্রাইভেটেই দিন আবার।

বেলা কিছু না বলিয়া প্রফেসার গুপ্তের মুখের পানে চাহিয়া শুধু একটু হাসিলেন। ভৃত্য চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল এবং বেলা নিজেই উঠিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চা প্রস্তুত করিলেন।

প্রফেসার গুপ্ত চা-পরিবেশনকারিণী বেলার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, আপনাদের এই মূর্তিই কিন্তু সবচেয়ে ভাল লাগে আমার।

ঘাড় ফিরাইয়া বেলা প্রশ্ন করিলেন, কোন্ মূর্তি?

অন্নপূর্ণা-মূর্তি।

শঙ্কর বলিল, আমার চায়ে একটু বেশি চিনি দেবেন, একটু বেশি মিষ্টি খাই আমি।

বেলা বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, আজ সকালে বলছিলেন, আপনি খুব ঝালেরও ভক্ত। মাংসে ঝাল না হলে ভাল লাগে না।

শঙ্কর কিছু না বলিয়া স্মিতমুখে চাহিয়া রহিল।

তিন চামচ দিয়েছি, আর দেব?

না, ওতেই হবে।

সকলে মিলিয়া গল্প করিতে করিতে চা পান করিতে লাগিলেন।

।। পঁচিশ ।।

ঘড়িতে টং টং করিয়া বারোটা বাজিয়া গেল। কই, আজও তো মৃন্ময় আসিল না। কোথায় গেল সে। তিনদিন তাহার কোনো খবর নাই। জানালার ধারে জনবিরল গলিটার পানে চাহিয়া হাসি চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আজ মৃন্ময় নিশ্চয় আসিবে, সে বড় আশা করিয়াছিল। রাত বারোটা বাজিয়া গেল। গুণিতে ভুল হয় নাই তো? সে উঠিয়া গিয়া ঘড়িটার পানে চাহিয়া দেখিল, না, ঠিক বারোটা বাজিয়াছে। আজও কি তাহা হইলে আসিবে না? শুষ্কমুখে হাসি পুনরায় জানালার ধারে আসিয়া বসিল। বড় ভয় করে তাহার। তিন-চারদিন হইতে ডান চোখের পাতাটা এমন নাচিতেছে! তিন দিন পূর্বে 'এখনই আসিতেছি' বলিয়া মৃন্ময় সেই যে বাহির হইয়া গিয়াছে, এখন পর্যন্ত ফেরে নাই। এই তিনদিন হাসি খায় নাই, ঘুমায় নাই, কেবল ঘর আর বাহির করিয়াছে। ঘরের এই জানালাটার ধারে সে সন্ধ্যা হইতে আসিয়া বসিয়াছে; দেখিতে দেখিতে বারোটা বাজিয়া গেল। ঠাকুরপোও তো এখনও পর্যন্ত ফিরিল না! ভণ্টুবাবুর বাড়ি কতদূর? অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া সহসা হাসির দুই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, টপ্‌টপ্ করিয়া কয়েকটা বড় বড় ফোঁটা কপোল বাহিয়া আঙুলের ওপর ঝরিয়া পড়িল। তাহার কপালে ভগবান এত দুঃখ লিখিয়াছেন কেন? কি দোষ করিয়াছে সে? অতি শৈশবেই বাপ-মা-ভাই তাহাকে ফেলিয়া একে একে মরিয়া গেল। সে মরিল না কেন? মরে নাই বোধহয় মেয়েমানুষ বলিয়া। অফুরন্ত পরমায়ু লইয়া অসীম দুঃখ সহ্য করিতে হইবে যে! মুকুজ্জেমশাইয়ের ওপর সহসা হাসির রাগ হইল, কেন তিনি তাহাকে লইয়া গিয়া দূর-সম্পর্কের বড়লোক পিসামহাশয়ের আশ্রয়ে রাখিলেন, কেন তাহাকে অনাহারে মরিয়া যাইতে দিলেন না? সে মরিয়া গেলে কাহার কি ক্ষতি হইত? কাহারও না। এমন তো কত লোক রোজ মরিয়া যাইতেছে। সকলকে কি মুকুজ্জেমশাই বাঁচাইতে যাইতেছেন? তাহাকে বাঁচাইতে গেলেন কেন? ছেলেবেলায় সব শেষ হইয়া গেলেই তো ভাল হইত। এখন মৃন্ময়কে ছাড়িয়া মরিতে ইচ্ছা করে

না। মরা দূরের কথা, তাহাকে একদণ্ড চোখের আড়াল করিতেও কষ্ট হয়। অথচ কপালগুণে এমন একটা চাকরি জুটিয়াছে যে, দিনরাত বাহিরে না থাকিলে উপায় নাই। এবারেও কি চাকরির কাজেই বাহিরে গিয়াছে? প্রতিবারেই তো যাইবার আগে বলিয়া যায়; তা ছাড়া এখনই ফিরিয়া আসিবে বলিয়া গিয়াছে যে! হঠাৎ কোনো জরুরি দরকারে যদি বাহিরে যাইতেই হয়, বাড়িতে আসিয়া সেটা বলিয়া যাইবারও কি অবসর ছিল না? না, আপিসের কাজ বলিয়া বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয়ই কোনো বিপদ ঘটিয়াছে।

হাসি অন্ধকারে একা একা বসিয়া অকূলপাথার ভাবিতে লাগিল। আগে অনেকবার মনে হইয়াছে, এখন আবার তাহার মনে হইল, মৃন্ময় তাহাকে ভালবাসে তো? তাহাকে পাইয়া সুখী হইয়াছে তো? তাহার মাঝে মাঝে কেমন যেন সন্দেহ হয়, মনে হয়, কেমন যেন কোথায় কিসের একটা অভাব রহিয়া গিয়াছে—সেটা যে কি, তাহা হাসি ধরিতে পারে না। ধরিতে পারে না, কিন্তু অনুভব করে। আর কাহাকেও কি মৃন্ময় ভালবাসে? কাহাকে? কেমন দেখিতে সে মেয়েটি? সহসা হাসির মনে হইল, ছি ছি, সে এ কি করিতেছে? স্বামীর সম্বন্ধে এসব কথা চিন্তা করাও পাপ। তিনি ভাল হোন, মন্দ হোন, সে সমালোচনা করিবার অধিকার আমার নাই। তাঁহাকে পাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে, ইহাই কি আমার মতো অভাগিনীর পক্ষে যথেষ্ট নয়? আমিই কি আমার স্বামীর যোগ্য? অমন সুন্দর সুপুরুষ বিদ্বান বুদ্ধিমান ব্যক্তির সহধর্মিণী হইবার মতো কি যোগ্যতা আছে আমার?

অন্ধকারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আবার তাহার চক্ষু দুইটি অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। চোখের পাতা উপচাইয়া গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল, সে মুছিবার চেষ্টা করিল না। পাথরের মূর্তির মতো স্থিরভাবে বসিয়া রহিল।

সঙ্কীর্ণ গলিটা রাত্রে একেবারে নির্জন। কোথাও কাহারও সাড়া নাই, সকলেই ঘুমাইতেছে। সহসা পদশব্দ শোনা গেল। ওই যে, চিন্ময় আর ভণ্টুবাবুর গলার স্বর শোনা যাইতেছে। আরও কে যেন একজন সঙ্গে রহিয়াছে, গলার স্বরটা হাসির ঠিক চেনা নয়।

ভণ্টু, চিন্ময় এবং শঙ্কর বাড়ির সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। হাসি যে এত রাত্রে বৈঠকখানায় আসিয়া রাস্তার ধারে জানালায় বসিয়া থাকিতে পারে, চিন্ময় তাহা কল্পনা করিতে পারে নাই। সুতরাং কোনোরূপ সাবধানতার প্রয়োজন অনুভব করিল না। অসঙ্কোচেই ভণ্টুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ভণ্টুদা, বউদিকে কি বলবেন, এখনই ঠিক করে নিন। দাদা যে ক্যাম্বেল হাসপাতালে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন—এ কথা তো বউদিকে বলা চলবে না।

হাসি রুদ্ধশ্বাসে শুনিতে লাগিল।

ভণ্টু বলিল, সে আমি সামলে নেব।

কি বলবেন?

শঙ্কর, বল্ না—কি করা যায়, তুই তো মিথ্যে কথার গুরুমশাই একটি।

শঙ্কর মৃদু হাসিয়া বলিল, সত্যি কথাটা বললে ক্ষতি কি?

ভণ্টু মুখটি সূচালো করিয়া কয়েক সেকেন্ড শঙ্করের দিকে চাহিয়া রহিল এবং মুখটি সূচালো করিয়া রাখিয়াই উচ্চারণ করিল, সত্যি কথা!

তাহার পর সহজভাবে বলিল, বাপের টাকায় মজাসে হস্টেলে আছিস—সত্যি-মিথ্যের হদিস তুই কি বুঝবি?

চিন্ময় বলিল, না শঙ্করবাবু, সত্যি কথা বললে বউদি ভয়ানক কান্নাকাটি করবেন, এমনিই না খেয়ে আছেন ক'দিন থেকে।

ভণ্টু বলিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, সে সব ঠিক করে দিচ্ছি আমি। ওর কথা শুনছিস কেন তুই? কড়া নাড়, বারোটা বাজে, ফিরতে হবে তো আবার।

তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, সত্যি-ফত্যি ভুলে যা—দাবকে ঢোঁক গিলে যা। রাস্তায় চলতে গেলে যেমন গায়ে ধুলো লাগবেই, সংসার করতে গেলে তেমনই ক্রমাগত মিথ্যে বলতে হবে। মিথ্যের হরির লুট দিতে দিতে যেতে পারলে আরও ভাল হয়।

হাসি আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, কপাট খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ওঁর কি হয়েছে বল না ঠাকুরপো? হাসপাতালে অজ্ঞান হয়ে আছেন উনি? আমার কাছে লুকিয়ো না কিছু, লক্ষ্মীটি, শিগ্‌গির বল, কি হয়েছে?

হাসির কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল। অপরিচিত শঙ্কর এবং স্বল্পপরিচিত ভণ্টুকে দেখিয়া সহজ অবস্থায় সে হয়তো ঘোমটা দিত, এখন কিছুই করিল না।

বলা বাহুল্য, সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

চিন্ময় বলিল, চল, ভেতরে চল, সব বলছি।

না, আগে বল তুমি।

সে অনেক কথা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি বলা যায়? ভেতরে চল, বলছি সব।

সকলে ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

চিন্ময় শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, শঙ্করবাবু, আপনি একটু বাইরের ঘরটায় বসুন, আমরা আসছি এখনি। আসুন ভণ্টুদা।

ভণ্টু, চিন্ময় ও হাসি ভিতরে চলিয়া গেল। শঙ্কর বাহিরের ঘরের চেয়ারটায় বসিয়া রহিল। সে বেলাকে মহৎ আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিয়া হস্টেলে ফিরিতেছিল, এমন সময়ে পথে ভণ্টুর সহিত দেখা। ভণ্টুর সহিত চিন্ময়ও ছিল। ভণ্টুর মুখেই শঙ্কর শুনিল যে, গত তিনদিন যাবৎ মোমবাতির কোনো খোঁজ পাওয়া যাইতেছিল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর এখন জানা গিয়েছে যে, ক্যাম্বেল হাসপাতালে অজ্ঞান অবস্থায় রহিয়াছে। একটা দ্রুতগামী ট্যাক্সি তাহাকে নাকি চাপা দিয়াছে। ভণ্টুর আগ্রহাতিশয্যে সে হস্টেল হইতে ছুটি লইয়া সেই হইতে ইহাদের সঙ্গে ঘুরিতেছে। রিনির কাছে যাইবার কথা ছিল, যাওয়া হয় নাই। তাহা ছাড়া আর একটি কর্তব্য এখনও পর্যন্ত অসমাপ্ত রহিয়াছে। বাবা একটি বাড়ি ভাড়া করিতে বলিয়াছিলেন, তাহার এখনও কিছু করা হয় নাই। বেলা এবং ভণ্টুর পাল্লায় পড়িয়া সমস্ত সন্ধেটাই তাহার মাটি হইয়া গিয়াছে। অথচ ইহাদের সঙ্গ এত লোভনীয় যে, জোর করিয়া চলিয়া যাইতেও ইচ্ছা হয় না। যাই হোক, কাল সকালে উঠিয়াই প্রথমে রিনির ওখানে যাইতে হইবে এবং যেমন করিয়া হোক একটা বাড়ির সন্ধান করিতে হইবে। সহসা তাহার মৃন্ময়ের মুখখানা মনে পড়িল। ভণ্টু ও চিন্ময়ের সঙ্গে সেও হাসপাতালে গিয়াছিল। অচেতন মৃন্ময় চক্ষু বুজিয়া শুইয়া ছিল, প্রশান্ত মুখখানায় কেমন যেন একটা আত্মসমাহিত ভাব। সেদিন রাত্রের সেই চিঠিখানার কথাও মনে পড়িল। চিঠিটা এখনও তাহার কাছে আছে। সেদিন রাত্রে ঘরে এই মেয়েটিই তো ছিল! স্বর্ণলতা; তাহা হইলে কে?

ভীম জাল।

ভণ্টু আসিয়া প্রবেশ করিল।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, কি হল?

ভীম জাল টু দি পাওয়ার এন।

মানে?

মানে, খুজবুজ হাসপাতালে যেতে চাইছে।

খুজবুজ কে?

মোমবাতির বউ। বলছে, আমি শুধু একটিবার নিজের চোখে দেখতে চাই তাকে। ভয়ানক উইপিং আপিস খুলেছে।

শঙ্কর বলিল, এত রাতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব? সেখানে ঢুকতে দেবে কি?

আমাদের পাড়ার ধীরেন ডাক্তার চেষ্টা করলে করতে পারে ব্যবস্থা। ইচ্ছে করলে সে সব করতে পারে, কারণ রিয়েলি সে চাম লদ্। চল্ যাই।

কোথায়?

ধীরেন ডাক্তারের কাছে।

আমাকে আবার টানছিস্ কেন ভাই?

উত্তরে ভণ্টু শুধু মুখ-বিকৃত করিল।

প্রভাত হইবার আর বেশি বিলম্ব নাই।

শঙ্কর একা দ্রুতপদে পথ অতিবাহন করিতেছিল। সে ক্যাম্বেল হাসপাতাল হইতে ফিরিতেছিল। হাসিকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে লইয়া যাইতে হইয়াছিল এবং অসময়ে রোগীর কাছে যাইবার অনুমতি সংগ্রহের জন্য কম বেগ পাইতে হয় নাই। অনেক বলাকহার পরে তবে অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। হাসি গিয়া মৃন্ময়ের শয্যা পার্শ্বে বসিয়াছে, এবং এখনও নড়ানো যাইতেছে না। এখন হাসি যাহাতে সেখানে থাকিতে পায়, নিরুপায় ভণ্টু অগত্যা নানাভাবে সেই তদ্বির করিতেছে।

ভণ্টুর সঙ্গে চিন্ময়ও আছে। শঙ্কর কিন্তু আর সেখানে থাকিতে পারিল না। বেদনাতুর হাসির অশ্রু ছলছল মুখখানি শঙ্করকে কেমন যেন উন্মনা করিয়া দিল। শঙ্কর কাহাকেও কিছু না বলিয়া চুপিচুপি রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

বহুক্ষণ হাঁটিবার পর সে যখন রিনিদের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন ভোরের মৃদু আলো ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে। রাস্তা হইতে বাড়িটা দেখা যায়, শঙ্কর বাড়িটার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে গেটের নিকট গিয়া দেখিল, গেট ভিতর হইতে তালা বন্ধ। শঙ্কর বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এভাবে এমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকাটা যে অশোভন, সে চেতনাও তখন তাহার ছিল না। সে অপলকদৃষ্টিতে বাড়িটার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা দ্বিতলের বাতায়ন খুলিয়া গেল এবং শঙ্কর সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে রিনি দাঁড়াইয়া আছে।

কেহ কোনো কথা বলিল না। নির্নিমেষ শঙ্কর ও নিস্পন্দ রিনির মধ্যে তালাবদ্ধ লোহার গেটটা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

।। ছাব্বিশ ।।

রাস্তাটি খুব বড় নহে, গলি বলিলেই চলে, বাড়িটা কিন্তু প্রকাণ্ড। রাত্রি গভীর হইয়াছে। একটি প্রকাণ্ড দামি মোটরকার নিঃশব্দে আসিয়া বাড়িটার সম্মুখে থামিল। মোটরের দালাল অচিনবাবু গাড়ি হইতে নামিলেন। গাড়িতে আর কেহ ছিল না। গাড়ি হইতে নামিয়া অচিনবাবু একবার ভাল করিয়া চতুর্দিকে দেখিয়া লইলেন। দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। তখন তিনি ধীরে ধীরে প্রকাণ্ড বাড়িটার বন্ধ দরজার ওপরে চারিটি টোকা দিলেন। টোকা দিবার মধ্যেও একটু কায়দা ছিল। প্রথম দুইটি টোকা ঘন ঘন এবং শেষ দুইটি বেশ দেরি করিয়া করিয়া। দরজা নিঃশব্দে খুলিয়া গেল, কিন্তু নিষ্কাশিত-অসি বিরাটকায় এক পাঠান আসিয়া পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল। অচিনবাবু তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া একটি টাকা, একটি আধুলি, একটি সিকি এবং একটি দুয়ানি তাহার হস্তে দিলেন। পাঠান পকেট হইতে একটি টর্চ বাহির করিয়া মুদ্রাগুলি উল্টাইয়া প্রত্যেকটির সাল দেখিতে লাগিল। তাহার পর মুদ্রাগুলি ফেরত দিয়া সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া একটি ইলেকট্রিক বেল টিপিল। সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির আলোটা জ্বলিয়া উঠিল এবং অচিনবাবু নিঃশব্দপদসঞ্চারে ওপরে উঠিয়া গেলেন। ওপরে যে ঘরে গিয়া তিনি হাজির হইলেন সেই ঘরের একটি কোণে বিস্তৃত ফরাশের ওপর সর্বাঙ্গে দামী শাল জড়াইয়া একটি বৃদ্ধ বসিয়াছিলেন। অচিনবাবুকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, আপনার কাজ হয়ে গেছে, তিনখানা কারের অর্ডার দিয়েছেন মালিক। একখানা নিজের জন্যে, একখানা জামাইবাবুর, আর একখানা যাবে এস্টেটের ম্যানেজারের ওখানে। তারপর সে ছোকরার খবর কি?

এখনও মরেনি, হাসপাতালে রয়েছে, এ যাত্রা বেঁচে গেল বোধহয়।

ড্রাইভারটা কিন্তু ধরা পড়েছে শুনলাম?

হ্যাঁ, তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

বৃদ্ধ বলিলেন, এ ঠিক সেই ছোকরাই তো, মৃন্ময় না কি নাম বলছিলেন? ভুলে অন্য কোনো লোককে চাপা দিলে না তো?

অচিনবাবু বলিলেন, না না, আমি নিজে তার ফোটো তুলে নিয়েছি, নিজে সেই ড্রাইভারকে ফোটো দিয়েছি, তা ছাড়া মৃন্ময়বাবুকে দেখিয়েও দিয়েছি একদিন। ভুল হয়নি।

একটু থামিয়া অচিনবাবু বলিলেন, ড্রাইভারটাকে কিন্তু বাঁচাতে হবে। আপনারই কথামত তাকে আমি আশ্বাস দিয়েছিলাম যে, টাকা দিয়ে যা করা সম্ভব, তা আমরা করব তাকে বাঁচাবার জন্যে।

নিশ্চয়। এসব ব্যাপারে ঢালা হুকুম আছে কর্তা। উকিল-টুকিল ব্যবস্থা করে দিন। ফাইন হয়, দেব আমরা। জেল হয়, তার পরিবারের ভরণপোষণের খরচা ছাড়াও কম্‌পেন্‌সেশন দেব। ওর জন্যে কোনো ভাবনা নেই। কত টাকা চাই, বলুন না?

শ পাঁচেক এখনই দরকার।

ভদ্রলোক উঠিয়া পড়িলেন ও দেওয়ালে পোঁতা একটা লোহার সিন্দুক খুলিয়া পাঁচ শত টাকার নোট বাহির করিয়া আনিয়া অচিনবাবুর হস্তে দিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, নতুন মাল কবে দিচ্ছেন? কর্তা যে ক্ষেপে উঠেছেন একেবারে!

অচিনবাবু বলিলেন, শিক্ষয়িত্রীর জন্যে বিজ্ঞাপন তো দিয়েছি। একটা সুবিধে মতো পেলে হাজির করে দেব।

হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি যা হয় করুন একটা।

সর্বদাই চেষ্টায় আছি। আচ্ছা, এবার চলি আমি, ব্যবস্থা করতে হবে অনেক।

আসুন তা হলে।

অচিনবাবু উঠিয়া পড়িলেন ও যথাবিহিত নমস্কারান্তে নামিয়া আসিলেন। বাহির হইবার সময় কোনোরূপ বেগ পাইতে হইল না। মোটরে চড়িয়া স্টিয়ারিং ধরিয়া মিনিট খানেক কি যেন ভাবিলেন। ভাসা ভাসা চক্ষু দুইটিতে অতি মৃদু চাপা একটি হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহার পর মোটরে স্টার্ট দিয়া নিঃশব্দ-গতিতে গলি হইতে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

অচিনবাবু চলিয়া গেলে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি উঠিয়া গিয়া দেওয়ালে লাগানো একটি বোতাম টিপিলেন। প্রকাণ্ড বাড়িটার দ্বিতলের সুদূর একটা অংশে ইলেকট্রিক বেল ঝনৎকার দিয়া উঠিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলিষ্ঠ গাঁট্টাগোঁট্টা গোছের একটা লোক আসিয়া দ্বারপথে উঁকি মারিল।

বৃদ্ধ বলিলেন, নিয়ে আয় এবার।

লোকটি চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে আরও দুইজন লোকের সাহায্যে একটি অজ্ঞান যুবতীর দেহ বহন করিয়া আনিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে ফরাশের ওপর শোয়াইয়া দিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

কতক্ষণ বাদে এর জ্ঞান হবে, ডাক্তার বলেছে কিছু?

গাঁট্টাগোঁট্টা লোকটি উত্তর দিল, ঘণ্টা দুই বাদে।

কিছু খাওয়ানো হয়েছে?

গ্লুকোজ না কি একটা ইন্‌জেক্‌শন দিয়েছেন, বলেছেন, আজ রাত্রে আর খাওয়াবার দরকার নেই কিছু।

আচ্ছা, যা তোরা, এখন কর্তার পছন্দ হলে হয়! ভ্যালা এক চাকরি হয়েছে আমার! তোরা সব বাড়ি চলে যা, ওই পাঠানটাকেও বাড়ি যেতে বল্। কর্তা আজ আসবেন।

আচ্ছা হুজুর।

ভৃত্য তিনজন বাহির হইয়া চলিয়া গেল। বৃদ্ধ উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহাদের পদশব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিল, একটু পরে আর শোনা গেল না। বৃদ্ধ তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শালখানা অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িল, কুব্জ দেহটাকে যথাসম্ভব উন্নত করিয়া কিছুক্ষণ মেয়েটির দিকে তিনি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, বলিরেখাঙ্কিত মুখমণ্ডলে পাশবিক ক্ষুধা মূর্তি পরিগ্রহ করিল, লুব্ধ চাহনি অচেতন মেয়েটির সর্বাঙ্গ যেন লেহন করিয়া ফিরিতে লাগিল, নিঃশ্বাসের গতিবেগ বাড়িয়া গেল। মেয়েটির দিকে কিছুক্ষণ অপলকদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া সহসা তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কেহ নাই, সকলে চলিয়া গিয়াছে। বাহিরের কপাটটা বন্ধ করিয়া চকিত দৃষ্টি মেলিয়া তিনি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। না, কেহ কোথাও নাই। ত্বরিতপদে আবার তিনি ওপরে উঠিয়া আসিলেন। মেয়েটি এখনও অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছে। একবার সেদিকে চাহিয়া আলমারি হইতে কয়েকটি

বড়ি বাহির করিয়া কি একটা আরক সহযোগে সেগুলি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর শাল মুড়ি দিয়া বসিলেন এবং অপলক দৃষ্টিতে মেয়েটির পানে চাহিয়া রহিলেন।

পূর্বপুরুষ বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন; টাকা দিয়া যাহা সম্ভব সব হইতেছে, এবং দেখা যাইতেছে, সবই বোধ হয় সম্ভব। এমনকি, সুনামটি পর্যন্ত বজায় আছে। চাকরবাকর পর্যন্ত জানে যে, কোন্ অজ্ঞাত লম্পটের জন্য এইসব আয়োজন; এই বৃদ্ধ তাহাদেরই মতো বেতনভুক একজন ভৃত্য মাত্র। বৃদ্ধ যে নিজেই কর্তা—এ কথা বৃদ্ধ ছাড়া আর কেহ জানে না।

নির্নিমেষ নয়নে বৃদ্ধ সংজ্ঞাহীন নারী-দেহটার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে শিকারলুব্ধ বৃদ্ধ অজগরের লোলুপতা মূর্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

।। সাতাশ ।।

রাত্রি গভীর হইয়াছে।

ছেলেমেয়েরা সকলে ঘুমাইতেছে, নিশাচর ভণ্টুও এই কিছুক্ষণ আগে আসিয়া খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়াছে এবং দালানে শুইয়া নাক ডাকাইতেছে। বাকু এখনও উঠেন নাই, যদিও উঠিবার আর বেশি দেরিও নাই। ভণ্টুর বউদিদি ধীরে ধীরে বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেন, আস্তে আস্তে নিজের তোরঙ্গটির নিকটে গেলেন এবং অতি সন্তর্পণে তোরঙ্গের চাবি খুলিলেন। তাহার পর তোরঙ্গের ভিতর হইতে কতকগুলি রঙিন চিঠির কাগজ বাহির করিলেন। মার্জিত-রুচি কোনো লোকের চোখে কাগজগুলি হয়তো তেমন সুদৃশ্য বলিয়া মনে হইবে না, বউদিদির নিকট উহাই কিন্তু যথেষ্ট সুন্দর। স্বামী যাইবার সময় কিনিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। কাগজ বাহির করিয়া বউদিদি ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন,—শণ্টুটা দোয়াত কলম যে কোথায় ফেলে, তাহার ঠিক নাই। ঠাকুরপোর কাছে এত মার খায়, তবু ছেলেটার স্বভাব বদলাইল না। ঘরের কোণে কমানো বাতিটি আস্তে উস্কাইয়া দিয়া সেটি হাতে করিয়া লইয়া বউদিদি সন্তর্পণে ঘরের তাকগুলি খুঁজিতে লাগিলেন। ভাগ্যক্রমে দোয়াত-কলম তাকেই ছিল, মিলিয়া গেল। বউদিদি প্রসন্নমুখে ঘরের মেঝেতে ছেঁড়া মাদুরটি বিছাইয়া তাহার ওপর বসিলেন এবং আলোটি কাছে সরাইয়া আনিয়া অতিশয় নিবিষ্টচিত্তে প্রবাসী স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিলেন। কলমের নিবটা ভাল নয়, কাগজ অতি সাধারণ, দোয়াতে কালি জলবৎ। বউদিদির চিঠির ভাষাও উচ্চাঙ্গের নহে। বানান-ভুল অজস্র হইতেছে। তথাপি কিন্তু এই নিস্তব্ধ মধ্যরাত্রে চুরি করিয়া স্বামীকে পত্র লেখার মধ্যে যে মাধুর্য, যে মহিমা, স্পন্দিত বিরহের যে আকুতি বউদিদির গোলগাল কালো মুখমণ্ডলকে মণ্ডিত করিয়াছে, তাহা তুচ্ছ করিবার নহে। স্বল্পালোকিত ঘরে ছিন্ন মাদুরের ওপর উপুড় হইয়া বউদিদি দীর্ঘ একখানি পত্র লিখিয়া ফেলিলেন। পত্র লেখা শেষ করিয়া পত্রখানি আর একবার পড়িলেন, পুনশ্চ দিয়া আবার খানিকটা কি লিখিলেন, অবশেষে খামের মধ্যে পত্রটি পুরিয়া শিরোনামা লিখিয়া সেটি বিছানার নীচে রাখিয়া দিলেন।

তাহার পর প্রাচীর-বিলম্বিত জগদ্ধাত্রীর ছবিটির নিকট গিয়া গলায় আঁচল দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিলেন। অনেকক্ষণ পরে যখন মুখ তুলিলেন, তখন তাঁহার চোখে অশ্রুবিন্দু টলমল করিতেছে।

পাশের বাড়ির ঘড়িতে টং করিয়া একটা বাজিল।

।। আটাশ ।।

শঙ্কর সকালে উঠিয়াই একখানি পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। উৎপল বিলাতে নাকি কোনো এক মেমসাহেবের প্রেমে পড়িয়াছে। পত্রখানি লিখিতেছেন উৎপলের একজন আত্মীয়। পত্রখানির প্রকৃত মর্ম বুঝিতে অবশ্য শঙ্করের দেরি হইল না। কারণ যদিও পত্রখানির ভাষায় আত্মীয়-সুলভ চিন্তা ও ক্ষোভই প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু ভাষার অন্তরালে যে অন্তর্নিহিত খোঁচাটি অপ্রত্যক্ষ রহিয়াও সুস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাহা হৃদয়গ্রাহী নহে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ভাবটি এই—ভারি যে উহার শ্বশুর উহাকে বাহাদুরি করিয়া বিলাত পাঠাইয়াছিল, এইবার মজাটা বুঝুক। শঙ্কর ভাবিয়া দেখিল, গিয়া অবধি উৎপলও তাহাকে বিশেষ কোনো চিঠিপত্র লেখে নাই। বিলাতে পৌঁছিয়াই সে একখানা দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার হৃদয়-কাহিনী কিছু ছিল না, ছিল ভ্রমণ-কাহিনী। তাহার পর যে দুই-একখানা পত্র সে লিখিয়াছে, তাহা নিতান্তই নিয়মরক্ষা করিবার জন্য, দুই-চারি ছত্রের মামুলি চিঠি। শঙ্কর নিজে যদি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিত, তাহা হইলে হয়তো উৎপলের ঔদাসীন্যে ব্যথিত হইত; কিন্তু উৎপলের বিলাত যাওয়ার পর হইতে তাহার নিজেরই মানসিক জগতে যে বিপ্লব ঘটিতেছিল, তাহাতে বাহিরের কোনো কিছুতে বিচলিত হইবার তাহার উপায় ছিল না। মায়ের এতবড় শোচনীয় অসুখও তাহার হৃদয় স্পর্শ করে নাই। সে যাহা করিতেছিল কর্তব্যের অনুরোধেই করিতেছিল, প্রাণের তাগিদে নহে। সহসা সুরমার কথা তাহার মনে পড়িল, সুরমার পূর্বপত্রের উচ্ছ্বসিত প্রলাপের কিছু অর্থও তাহার যেন বোধগম্য হইল। উৎপলের আত্মীয়ের পত্রখানি ডেস্কের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিয়া শঙ্কর কলেজের পড়া করিতে বসিল। অনেক দিন বই ছোঁওয়া হয় নাই। রিনির বই পড়িতেই সে এতদিন ব্যস্ত ছিল, নিজের পড়া কিছুই হয় নাই। ক্লাসে বসিয়া অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। অধ্যাপকের বক্তৃতা কানে প্রবেশ করে, কিন্তু মনে প্রবেশ করে না। ক্লাসে ভাল করিয়া মন দিয়া শুনিলে বাড়িতে পড়িবার ততটা দরকার হয় না, কিন্তু বিশেষ করিয়া ক্লাসেই সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। ক্লাসের জনতার মধ্যেই সে সেই নির্জনতা পায়, যাহা তাহার পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজন। ক্লাসের বাহিরে ভন্টু আছে, বেলা আছে, শৈল আছে, আরও কত অগণ্য প্রাণী আছে, যাহাদের সংস্পর্শে না আসিলে চলে না, যাহাদের সংস্পর্শ অবাঞ্ছনীয়ও নয়, কিন্তু যাহাদের সংস্পর্শে আসিলে ধ্যান ভাঙিয়া যায়, মনের প্রত্যক্ষলোক হইতে লজ্জিতা রিনি সরিয়া যায়। ক্লাসের এক কোণে বসিয়া মনের মধ্যে সে যে একাকিত্ব অনুভব করে, রিনিকে মনে মনে যেমন একান্তভাবে পায়, এমন আর কোথাও সম্ভব হয় না! ক্লাসে তাই তাহার পড়া হয় না। অথচ এই মোটা মোটা বইগুলা পড়িতে হইবে তো!

শঙ্কর বাহিরে গিয়া চাকরকে আর এক পেয়ালা চা আনিতে বলিল এবং ঘটা করিয়া ফিজিক্সের একখানা বহি লইয়া পড়িতে বসিল। নিশ্চিন্ত হইয়া দুই-চারি দিন এইবার পড়িতে হইবে। বাবা একখানা বাড়ি দেখিতে বলিয়াছিলেন,—তাহা সে দেখিয়াছে, বাবাকে চিঠিও লিখিয়া দিয়াছে। তাঁহার আসিবার পূর্বে পড়াটাও কিছুদূর আগাইয়া রাখিতে হইবে, কারণ তাঁহারা আসিলে পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা আছে। রিনি তো আছেই। কিন্তু হায় রে, বই খুলিয়া পড়িতে বসিলেই যদি পড়া হইত, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না। শঙ্কর খোলা বইটার ওপর নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল বটে, কিন্তু এক বর্ণও তাহার মাথার

ভিতর ঢুকিল না। চাকরে চা দিয়া গেল, চা পান করিয়াও বিশেষ ফলোদয় হইল না। বরং কিছুক্ষণ পরে সে সহসা স্থির করিয়া ফেলিল যে, এমনভাবে বসিয়া শুধু সময় নষ্ট হইতেছে মাত্র, আর কিছুই হইতেছে না। ইহার অপেক্ষা বরং রিনির কাছে যাওয়াই ভাল। তাহার মনে একটা কথা কয়েকদিন হইতে জাগিতেছে, সোনাদিদি-মিষ্টিদিদিকে আসল কথাটা খুলিয়া বলিলে ক্ষতি কি? এই মহিলা দুইজনের সহিত তরল হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিয়া তাহার এমন একটা অন্তরঙ্গতা হইয়াছে যে, ইঁহাদিগকে যেন মনের গোপন কথাটি বলা যায়। তবু কিন্তু সঙ্কোচ হয়। মনে হয়, ভাষায় প্রকাশ করিলেই যেন ইহার পবিত্রতা, ইহার মাধুর্য নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু আর তো চাপিয়া রাখা যায় না! এমনভাবে লুকাইয়া কতদিন আর থাকা সম্ভব! তাহা ছাড়া মনের ভাব এমন করিয়া গোপন করিয়া ওখানে প্রত্যহ যাতায়াত করা শুধু যে কষ্টকর, তাহা নয়—ভণ্ডামিও। তাহার তো কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নাই, সে রিনিকে বিবাহ করিতে চায়। তাহাকে ভালবাসিয়াছে বলিয়া পত্নীত্বে বরণ করিতে চায়। ইহাতে অগৌরবের বা অসম্মানের কিছুই নাই। প্রফেসার মিত্রকে সে কিন্তু নিজে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিবে না। রিনিকে কিছু বলা আরও অসম্ভব। সোনাদিদি অথবা মিষ্টিদিদিরই শরণাপন্ন হইতে হইবে। তাঁহারা ইহাতে যদি আপত্তিকর কিছু না দেখেন, তাহা হইলে তাঁহারাই প্রফেসার মিত্রকে বলিবেন এবং রিনির মনোভাব জানিয়া লইবেন। রিনির মনোভাব শঙ্করের জানাই আছে। মুখে কেহ কাহাকেও কোনোদিন কিছু বলে নাই সত্য, কিন্তু তথাপি তাহার মনের নিগূঢ় বার্তাটি নিগূঢ় উপায়েই সে যেন জানিয়াছে। তাহার বিশ্বাস হইয়াছে, এসব বিষয়ে অন্তর্যামী মনের কখনও ভুল হয় না। শঙ্করের বাবা সনাতনপন্থী লোক, তিনি হয়তো এ বিবাহে আপত্তি করিতে পারেন। শঙ্কর তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবে, তিনি যদি না বোঝেন, তাঁহার অমতেই বিবাহ করিবে সে। আজকাল কুল-গোত্র-গণ-কোষ্ঠী মিলাইয়া বিবাহের দিন চলিয়া গিয়াছে। পাত্রী হিসাবে রিনি—। শঙ্কর আর ভাবিতে চাহিল না। পাত্রী হিসাবে রিনি অযোগ্য কি সুযোগ্য—এ আলোচনা মনে মনে করিতেও শঙ্করের বাধিল। তাহার মনে হইল, পাত্রীর বাজারে রিনিকে দাঁড় করাইয়া অন্যান্য পাত্রীর সহিত তুলনামূলক সমালোচনা করিলে রিনিকে অপমান করা হইবে। তাহাকে এমনভাবে মনে মনে খাটো করিবারই বা তাহার কি অধিকার আছে? জামা জুতা পরিয়া শঙ্কর দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া দ্রুতপদে নামিয়া গেল বটে, কিন্তু পথে আসিয়া তাহার গতিবেগ পুনরায় মন্থর হইয়া আসিল। কেমন যেন সঙ্কোচ হইতে লাগিল। এখনই গিয়া এমনভাবে বলাটা কি ঠিক হইবে? প্রথমে কি বলিয়া কথাটা আরম্ভ করা যাইবে, তাহাই তো পরম সমস্যা। এই সব ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর দ্বিধাগ্রস্তচিত্তে আরও কিছুদূরে অগ্রসর হইল।

হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল, একটা রাস্তার মোড়ে একটা পাগলকে ঘিরিয়া বেশ ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। পাগল আমাদের পূর্বপরিচিত মোস্তাক। শঙ্কর ইহাকে ইতিপূর্বে দেখে নাই, সবিস্ময়ে দেখিতে লাগিল। অঙ্গে একটা ছেঁড়া কোট ছাড়া আর কিছু নাই, মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি, চক্ষু দুইটি লাল। নূতনত্বের মধ্যে খবরের কাগজের একটা শিরস্ত্রাণ বানাইয়া মাথায় পরিয়াছে এবং যাহাকে সম্মুখে দেখিতেছে, মিলিটারি কায়দায় সেলাম করিতেছে। একবার দুইবার নয়, 'রাইট অ্যাবাউট টার্ন' করিতে করিতে ক্রমাগত সেলাম করিয়া চলিয়াছে। জনতার মধ্যে দাঁড়াইয়া শঙ্করও কিছুক্ষণ মোস্তাকের পাগলামি উপভোগ করিল। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। এই উন্মাদটার সেলাম প্রবণতায় তাহার কবি মনে অদ্ভুত একটা রূপকের আভাস জাগিয়া

উঠিল। তাহার মনে হইল, এই উন্মাদটা যেন সমস্ত বাঙালি জাতির প্রতীক, কারণে অকারণে ঘুরিয়া ফিরিয়া সকলকে সেলাম করিয়া চলিয়াছে। বেশিক্ষণ ভাল লাগিল না, আবার সে চলিতে শুরু করিল।

ও শঙ্করবাবু!

শঙ্কর ফিরিয়া দেখিল, অপূর্ববাবু; আরও কে একজন তাঁহার সহিত রহিয়াছেন, অপর দিকের ফুটপাথ হইতে তাহাকে ডাকিতেছেন। শঙ্কর থামিতেই তাঁহারা রাস্তাটা পার হইয়া শঙ্কর যে ফুটপাথে ছিল তাহাতেই আসিয়া হাজির হইলেন।

নমস্কার শঙ্করবাবু, আপনাকেই খুঁজছি আমরা।

বিনীতকণ্ঠে আনতচক্ষে কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া অপূর্ববাবু শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিলেন। শঙ্কর দেখিল, অপূর্ববাবু ঠিক তেমনই আছেন। সেই কোঁচানো কাপড়, গিলে-করা পাঞ্জাবি, মুখে স্নো-পাউডার। সেই নম্রনত লীলায়িত হাবভাব। অপর ভদ্রলোকটিকে শঙ্কর আগে দেখে নাই। ভদ্রলোকটির চেহারা কেমন যেন শুষ্ক, রুক্ষ, উদ্‌ভ্রান্ত। দেখিলে মনে হয়, যেন রাত্রে ঘুম হয় নাই।

আমাকে খুঁজছেন? কেন বলুন তো?

মানে, ইনি হচ্ছেন বেলার দাদা, মিছিমিছি একটা রাগারাগি করে সামান্য জিনিস নিয়ে হঠাৎ এমন একটা—মানে, মিটে গেলেই—অনর্থক একটা—বুঝতেই পারছেন—

অপূর্ববাবু কোনো কথাই সম্পূর্ণভাবে শেষ করিতে পারেন না। কিছুদূর বলিয়া চুপ করিয়া যান, এবং এমন একটা ভাব করেন, যেন এত অধিক বাক্যব্যয় করিয়া তিনি অত্যন্ত একটা অন্যায় কার্য করিয়া ফেলিতেছেন, অথচ উপায় নাই।

প্রিয়বাবু সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, বেলা কোথায় আছে, জানেন আপনি?

শঙ্কর বলিল, এখন তো ঠিক জানি না। আমাদের কলেজের এক প্রফেসারের মেয়েকে গান শেখাবার ভার নিয়েছেন তিনি। সেই প্রফেসারের বন্ধুর একটা খালি বাড়ি আছে, তাতেই উঠে গেছেন পরশু দিন। ঠিকানাটা পরে এনে দিতে পারব আমি, এখন তো জানি না।

প্রিয়বাবু বলিলেন, আপনার প্রফেসারের ঠিকানাটা দিন না, আমরাই খুঁজে নিচ্ছি গিয়ে; আপনি আবার কষ্ট করবেন কেন?

বেশ।

প্রফেসার গুপ্তের ঠিকানাটা শঙ্কর বলিয়া দিল। উভয়েই শঙ্করকে অজস্র ধন্যবাদ দিলেন। অপূর্ববাবুর উচ্ছ্বাসটা কিছু যেন অধিক বলিয়াই বোধ হইল; অসম্পূর্ণ বাক্যাবলী অসংলগ্নভাবে খানিকক্ষণ বলিয়া বিনীত নমস্কারান্তে অপূর্ববাবু বিদায় হইলেন। প্রিয়বাবুও সঙ্গে গেলেন। শঙ্কর পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিল।

খানিকক্ষণ পরে সে যখন অবশেষে প্রফেসার মিত্রের বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিল, তখন এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। রিনি ও প্রফেসার মিত্র কলেজে চলিয়া গিয়াছেন। বাড়িতে সোনাদিদি ও মিষ্টিদিদি রহিয়াছেন। শঙ্করকে তাঁহারা এই সময়ে প্রত্যাশা করেন নাই, দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সোনাদিদি কোথায় যেন বাহির হইতেছিলেন, শঙ্কর আসাতে যাওয়া স্থগিত করিলেন ও সবিস্ময়ে বলিলেন, এমন সময়ে যে, মানে—এমন অসময়ে যে? এ কি অঘটন!

মিষ্টিদিদি বলিলেন, ছুটি আছে বোধহয়, নয়! বসুন।

শঙ্কর বলিল, না, ছুটি নয়, এমনিই এলাম।

সোনাদিদি কিছু না বলিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিলেন। শঙ্কর উপবেশন করিয়া বলিল, একটু চা খাওয়াতে পারেন?

নিশ্চয় পারি। কিন্তু এই অসময়ে চা কেন, ব্যাপার কি বলুন তো আজ?

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, ব্যাপার কিছু নয়, এমনি কিছু ভাল লাগছে না বলে এলাম এখানে। শরীরটাও ভাল নেই।

ডক্টর সেন বলছিলেন, কলকাতাতেও নাকি ম্যালেরিয়া হচ্ছে আজকাল, কুইনিন খাবেন?—বলিয়া সোনাদিদি পুনরায় হাসিয়া বলিলেন, সত্যি বলছি, ডক্টর সেন বলছিলেন সেদিন।

কুইনিন খাবার দরকার নেই, আপনি কথা বলে যান, তা হলেই কাজ হবে, কি বলুন মিষ্টিদি?

উভয়েই এই কথায় হাসিয়া উঠিলেন। তাহার পর সোনাদিদির পানে কোপকটাক্ষে চাহিয়া মিষ্টিদিদি বলিলেন, কেমন, জব্দ হয়েছিস তো এবার? থামুন, চায়ের কথাটা বলে দিই। এক মিনিটের মধ্যে আসছি।

মিষ্টিদিদি বাহির হইয়া গেলেন। সোনাদিদি হাসিভরা চক্ষু দুইটি শঙ্করের মুখের ওপর স্থাপিত করিয়া পুনরায় বলিলেন, ব্যাপার কি বলুন তো সত্যি করে?

শঙ্কর বলিয়া ফেলিল, থাকতে পারলাম না।

থাকতে পারলেন না? তার মানে?

তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন, আপনার না-থাকতে-পারার প্রতিকার কি এ বাড়িতে আছে নাকি?

তা কি আপনি জানেন না?

শঙ্কর গম্ভীরমুখে বাতায়ন-পথে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

সোনাদিদি বলিলেন, আপনার অজ্ঞাতসারে একটা কাজ করে ফেলেছি কিন্তু। রাগ করবেন না তো?

কাজটা কি?

আপনার সেই কবিতাটা একটা কাগজে দিয়ে দিয়েছি। সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ ছিল, তাঁকে দেখালুম, তিনি এক রকম জোর করেই নিয়ে গেলেন।

কোন্ কাগজে?

তা এখন বলছি না, বেরুলে দেখবেন।

কোন্ কবিতাটা দিয়েছেন? আমি তো অনেকগুলো কবিতা দিয়েছিলাম আপনাকে।

সেই যে, যার গোড়ার লাইনটা হচ্ছে—'রসনা নীরব মম চিত্ত মম নিত্য মুখরিত'—

ও।

শঙ্কর আবার গম্ভীর হইয়া পড়িল। মিষ্টিদিদি ফিরিয়া আসিলেন। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে তিনি প্রসাধনের একটু-আধটু পরিবর্তন করিয়া আসিয়াছেন দেখা গেল।

শঙ্করকে গম্ভীর দেখিয়া মিষ্টিদিদি বলিলেন, সোনা বুঝি আবার ঝগড়া করেছে আপনার সঙ্গে?

না।

শঙ্কর সস্মিত দৃষ্টি মিষ্টিদিদির দিকে ফিরাইল।

চায়ের কতদূর?

বলে দিয়েছি, এখুনি আসছে।

বলিতে বলিতেই চা আসিয়া পড়িল। সোনাদিদি উঠিয়া চা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। অলিখিত আইন অনুসারে সোনাদিদি এসব কার্য সাধারণত করিয়া থাকেন।

সহসা শঙ্কর গাঢ়স্বরে বলিল, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা আজ একটা বলব বলে এসেছি। আমার একটা শুধু অনুরোধ, হাসি-ঠাট্টা করে জিনিসটাকে হালকা করে ফেলবেন না। সেটা আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হবে।

চা ঢালিতে ঢালিতে সোনাদিদি চকিতে একবার শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন এবং একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন।

মিষ্টিদিদি বলিলেন, সে কি, আপনার কাছে যেটা এত সিরিয়াস ব্যাপার, তা আমরা হাসি-ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেব! ছি ছি, এতটা খেলো লোক ভাবেন আপনি আমাদের!

শঙ্কর গাঢ়স্বরেই বলিল, খেলো লোক ভাবলে আসতাম না আপনাদের কাছে। আপনারা খেলো লোক নন বলেই অসঙ্কোচে এত বড় একটা কথা বলতে এসেছি।

সোনাদিদি নীরবেই এক কাপ চা শঙ্করের দিকে আগাইয়া দিলেন। মিষ্টিদিদির দিকে চাহিতেই মিষ্টিদিদি বলিলেন, দে, আমিও খাই একটু—আচ্ছা, একটু কড়া হোক, পাতলা চা আমি খেতে পারি না বাপু।

সোনাদিদি নিজের জন্য এককাপ ছাঁকিয়া লইলেন।

শঙ্কর ধীরে ধীরে চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগিল।

মিষ্টিদিদি বলিলেন, কথাটা কি, শুনিই না?

শঙ্কর আরও খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, রিনিকে আমি ভালবেসেছি, তাকে আমি বিয়ে করতে চাই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

সোনাদিদি সহসা উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। শঙ্কর সেদিকে একবার চাহিয়া দেখিল, কিছু বলিল না, তাহার কান দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছিল এবং শরীরের শিরা-উপশিরায় রক্তস্রোত উন্মাদবেগে বহিতেছিল।

মিষ্টিদিদি উঠিয়া নিজের জন্য এক কাপ চা ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন, এ তো খুব আনন্দের কথা। আপনাকে আমরা নিজের আত্মীয়রূপে পাব—এর চেয়ে সুখের কথা আর কি হতে পারে? কিন্তু সকলের চেয়ে আগে রিনির মত নেওয়াটা দরকার নয় কি?

রিনির অমত হবে না।

জিজ্ঞেস করেছিলেন?

না, আমি জানি।

মিষ্টিদিদি শঙ্করের মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, তবু ফর্মালি জিজ্ঞেস করাটা একবার দরকার।

সে আপনি করবেন। প্রফেসার মিত্রকেও আপনি বলবেন—আমি পারব না, আমার ভারি

লজ্জা করবে। আমার বাবা হয়তো আপত্তি করতে পারেন। যদি করেন, তাঁর মতের বিরুদ্ধেই আমি বিয়ে করব।

সেটা কি ঠিক হবে?

বাবা হয়তো আপত্তি নাও করতে পারেন। যাই হোক, সে আমি বুঝব।

শঙ্কর বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সহসা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, মিষ্টিদিদি একাগ্রদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন।

এবার উঠি আমি, ক্লাস আছে। আসব কাল।

শঙ্কর হঠাৎ উঠিয়া আচমকা বাহির হইয়া পড়িল। বারান্দায় দেখিল, অতিশয় গম্ভীর মুখে সোনাদিদি এক প্রান্তে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সমস্ত মুখ বিবর্ণ। শঙ্করের পদশব্দ শুনিয়া একবার তাহার দিকে তাকাইলেন, এক নিমেষের জন্য তাঁহার চক্ষু দুইটি শঙ্করের ওপর নিবদ্ধ হইল। তাহার পর ত্বরিতপদে তিনি পাশের ঘরটায় ঢুকিয়া পড়িলেন। শঙ্কর সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

শঙ্কর কলেজে যায় নাই, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতেছিল। ঘণ্টা দুই পরে সে যখন হস্টেলে ফিরিল, তখন দেখিল, মিষ্টিদিদির চাকর একটি চিঠি লইয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। চাকরের ওপর আদেশ ছিল—শঙ্করবাবু ছাড়া অপর কাহাকেও যেন চিঠি দেওয়া না হয়। শঙ্কর তাড়াতাড়ি চিঠি খুলিয়া পড়িল—

শঙ্করবাবু,

আপনি এত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন যে, একটা দরকারি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবার অবসর পেলাম না। একটা গুজব রটেছে যে, বেলা মল্লিক নাকি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে আপনার আশ্রয়ে কোথায় আছে। বেলার দাদা বেলাকে খুঁজতে এসেছিলেন। অপূর্ববাবু বললেন, বেলা আপনার আশ্রয়ে আছে। রিনিও কথাটা শুনেছে। আসলে ব্যাপারটা কি, পত্রবাহক মারফত জানাবেন। কারণ এ বিষয়ে সবিশেষ না জানলে—বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা! আশা করি, এটা সিরিয়াস কিছু নয়। সব কথা খুলে লিখবেন।

ইতি—
মিষ্টিদিদি

বেলার সম্বন্ধে যাহা সত্য কথা, তাহাই শঙ্কর সংক্ষেপে লিখিয়া জানাইয়া দিল এবং লিখিল যে, তিনি প্রফেসার মিত্র ও রিনিকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফলাফল যেন তাহাকে পত্রযোগেই অনুগ্রহ করিয়া জানান। তৎপূর্বে সে ওখানে যাইবে না, অর্থাৎ যাইতে পারিবে না। মিষ্টিদিদির চাকর যাইবার পর হস্টেলের চাকর আসিয়া বলিল যে, বোস সাহেবের বাড়ি হইতে মাঈজি এই জিনিস ও চিঠি দিয়াছেন। শঙ্কর খুলিয়া দেখিল শৈলর চিঠি।—

শঙ্করদা,

তোমার জন্যে চুপিচুপি একটা সোয়েটার বুনেছি। তুমি যেমন বলেছিলে—নীল রঙের সঙ্গে সাদা রঙই দিয়েছি। বুনতে বড্ড দেরি হয়ে গেল, শীত প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। গায়ে ঠিক হয়েছে কি না জানিও। তুমি একদিন এস না সময় করে। একবারও তো এদিক মাড়াও না। কেমন আছ?

ইতি—
শৈল

শঙ্কর প্যাকেট খুলিয়া সোয়েটারটা বাহির করিল। বেশ বুনিয়াছে তো! গায়ে দিয়া দেখিল, ঠিক ফিট করে নাই। বগলের কাছটা আঁট, গলাটা ঢিলা। তবু কিছুক্ষণ শঙ্কর সেটা পরিয়া রহিল। সহসা তাহার মনে একখানি মুখ ভাসিয়া আসিল—একমাথা কোঁকড়ানো চুল, দুষ্টামি-ভরা হাসি-হাসি মুখখানি। সেই কতকাল আগেকার কিশোরী শৈল!

।। উনত্রিশ ।।

সমস্ত দিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর আপিস হইতে ফিরিয়া ভণ্টু যাহা শুনিল, তাহাতে তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়া গেল। অনেক কষ্টে অনেক রকম ফিকির-ধান্দা করিয়া কোনোক্রমে সে সংসারটিকে চালাইতেছে, তাহার ওপর যদি এই সব কাণ্ড ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে তো সে নাচার। নানারূপ ফন্দি করিয়া সে কিছু টাকা জোগাড় করিয়াছিল এবং সমস্ত মাসের চাল ডাল নুন তেল মশলা প্রভৃতি কিনিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। কিন্তু আজ বাসায় ফিরিয়া সে শুনিতেছে, শণ্টু ফনতি নাকি ভাঁড়ার-ঘরে লুকাচুরি খেলিতে গিয়া সমস্ত তেলের ভাঁড়টি উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়াছে। লুকাচুরি খেলিতে গিয়া! ভণ্টুর সমস্ত মুখখানা ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল!

বউদিদিকে প্রশ্ন করিল, তুমি ওদের ভাঁড়ার-ঘরে যেতে দিয়েছিলে কেন?

বউদিদি তরকারি কুটিতেছিলেন। বঁটি হইতে দৃষ্টি না তুলিয়াই বলিলেন, আমি কি করব? আমার কথা শোনে নাকি ওরা কেউ? তুমি বাড়ি থেকে যেই বেরুবে, আর অমনই সমস্ত বাড়ি মাথায় করে দাপাদাপি করবে ওরা। আমি কি করব, বল?

ভণ্টু কিছু না বলিয়া শণ্টু ও ফনতিকে একটা ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া খিল দিল। তাহার পর আলমারির মাথা হইতে বেতটা পাড়িয়া মার শুরু করিল। চোরের শাস্তি! দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মাদের মতো ভণ্টু বেত চালাইতে লাগিল। তাহার যেন খুন চাপিয়া গিয়াছে। শণ্টু ও ফনতির আর্ত হাহাকারে সমস্ত বাসাটা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বাকি শিশুগুলি ভয়ে শুষ্কমুখে নীরবে এক কোণে বসিয়া কাঁপিতেছিল, কারণ তাহারাও অপরাধী, তাহারাও লুকাচুরি খেলিয়াছিল। বউদিদি নীরবে নির্বিকারভাবে তরকারি কুটিয়া যাইতে লাগিলেন। বাকু কানে কিছুই শুনিতে পান না, সুতরাং তিনিও নির্বিকারভাবে তাম্রকূট-চর্চায় মগ্ন রহিলেন। ভণ্টু আজ যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছিল। মারিতে মারিতে বেতটা ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল, তবু তাহার রাগ কমিতেছে না। কতক্ষণ এভাবে চলিত বলা যায় না, এমন সময় শঙ্কর আসিয়া প্রবেশ করিল। দরজা খোলাই ছিল। শঙ্কর সন্ধ্যা পর্যন্ত মিষ্টিদিদির নিকট হইতে কোনো উত্তর না পাইয়া উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে রাস্তায় ঘুরিতেছিল। হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল, ভণ্টুকে লইয়া সেই জ্যোতিষীর বাড়ি গেলে হয়। ধার করিয়া কিছু টাকা জোগাড় করিয়া তাই সে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহার কোষ্ঠীর ছক তো ভণ্টুর কাছেই আছে। কিন্তু বাড়ি ঢুকিয়াই এই নিদারুণ কোলাহল শুনিয়া সে দ্বারের নিকটেই থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এ কি কাণ্ড!

শঙ্করকে দেখিয়া বউদিদি উঠিয়া পড়িলেন, প্রতিকারের যেন একটা উপায় দেখিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি শঙ্করের কাছে গিয়া চাপা-কণ্ঠে বলিলেন, ঠাকুরপো বড্ড রেগে গেছে, তুমি যদি পার একটু সামলাও ওকে। আমি বললে কিছু হবে না, বরং উল্টে আরও রেগে যাবে। সেইজন্যে আমি কখনও কিছু বলি না।

শঙ্কর স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বউদিদি পুনরায় বলিলেন, তুমি একটু ডাক ওকে শঙ্করঠাকুরপো, অনেকক্ষণ ধরে বড্ড মারছে, আহা, মরে গেল ওরা!

বউদিদির কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল।

শঙ্কর তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া বন্ধ দরজায় করাঘাত করিতে লাগিল—ভণ্টু, এই ভণ্টু, কপাট খোল্—করছিস কি তুই?

শঙ্করের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভণ্টুর যেন চৈতন্য হইল, সে বেতটা ফেলিয়া দিয়া কপাট খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, চল্, বাইরে চল্। থাম্, টিন্‌চার আইওডিনটা লাগিয়ে দিয়ে আসি আগে।

কিসে টিন্‌চার আইওডিন লাগাবি?

কেটে গেছে, ওই নিয়ে পরে আবার আমাকেই ভুগতে হবে।

ভণ্টু টিন্‌চার আইওডিন লাগাইয়া বাহির হইয়া আসিল।

চল্, বাইরে চল্।

বাহিরে আসিয়া শঙ্কর বলিল, ব্যাপার কী বল্ তো? হঠাৎ ক্ষেপে গেলি কেন?

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভণ্টু উত্তর দিল, শরীরে রক্তমাংস আছে বলে।

রক্তমাংস আছে বলে তুই খুন করবি?

ভণ্টু উত্তর দিল না। অন্ধকার গলিটা উভয়ে নীরবেই পার হইল। বড় রাস্তায় পড়িয়া শঙ্কর দেখিল, ভণ্টু দুই হাতে চোখ কচলাইতেছে এবং চোখ দিয়া অবিরলধারে জল পড়িতেছে।

কি হল?

পোকা না কি একটা পড়েছে মনে হচ্ছে।

রাস্তার একটা কলে তখনও জল ছিল এবং কলের মুখ হইতে জল পড়িতেছিল। ভণ্টু সেখানে গিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুখ ধুইয়া ফেলিল। পকেট হইতে মলিন রুমালটি বাহির করিয়া মুখ মুছিয়া সে বলিল, পয়সা আছে সঙ্গে?

আছে কিছু, কেন বল্ দেখি?

সহাস্যে ভণ্টু বলিল, ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে। চল্, একটা চায়ের দোকানে ঢোকা যাক।

চল্।

কাছে-পিঠে মনোমত চায়ের দোকান পাওয়া গেল না। উভয়ে পুনরায় হাঁটিতে লাগিল! হাঁটিতে হাঁটিতে ভণ্টু বলিল, উঃ, পেটের ভেতর যেন একটা শেয়াল ঢুকেছে, নাড়িভুঁড়িগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে!

শঙ্কর কিছু বলিল না। সে ভাবিতেছিল, এ অবস্থায় ভণ্টুকে লইয়া জ্যোতিষীর বাড়ি যাওয়া ঠিক হইবে কিনা! রিনির কথাটা এখন ভণ্টুকে বলা কি উচিত? তা ছাড়া—

শঙ্করের চিন্তাস্রোত ব্যাহত হইল। একটা ভাল চায়ের দোকান চোখে পড়িতেই ভণ্টু বলিল, চল, জেকলিশ অ্যাফেয়ারে ঢোকা যাক।

খাইতে খাইতে শঙ্কর প্রশ্ন করিল, তোর কানা করালীর ঠিকানাটা কি রে?

কেন?

যাব সেখানে, একটু প্রাইভেট দরকার আছে।

চল্‌, আমিও যাচ্ছি।

আমাকে একা যেতে দে আজ, পরে সব বলব তোকে।

মটন চপটা বাগাইতে বাগাইতে ভণ্টু সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলিয়া চাহিল।

পরে সব বলব তোকে, আজ আমাকে একা যেতে দে ভাই।

ভণ্টু চপে একটা কামড় বসাইয়াছিল, উত্তর দিল না। মাংসটা গলাধঃকরণ করিয়া বলিল, দেখিস, গাড্ডায় পড়িস না যেন, করালী সোজা লোক নয়।

শঙ্কর বলিল, সে আমি ঠিক করে নেব তাকে। আমার ছকটা কোথা?

আমার পকেটেই ডায়েরিতে টোকা আছে। আগে তুই খেয়ে নে না, সব দিচ্ছি আমি। উভয়ে আহার করিতে লাগিল।

।। ত্রিশ ।।

দ্বারে পদশব্দ শুনিয়া করালীচরণ তাড়াতাড়ি বাক্সটি লুকাইয়া ফেলিলেন ও হাতের আয়নাটি টেবিলের উপর উপুড় করিয়া রাখিয়া বলিলেন, কে?

আমি শঙ্কর, কপাটটা খুলুন একবার।

বাই নারায়ণ!

অস্ফুটস্বরে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া করালীচরণ উঠিয়া কপাট খুলিয়া দিলেন।

কি চান আপনি?

ভণ্টুর উপদেশ অনুযায়ী শঙ্কর হেঁট হইয়া প্রণাম করিল ও বলিল, কুষ্ঠি গণনা করাতে এসেছি।

এখন হবে না।

ভণ্টুর কাছ থেকে আসছি আমি। ভণ্টু এই টাকা দশটা আর ছকটা দিতে বললে আপনাকে।

ভণ্টুবাবু পাঠিয়েছেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

অসময়ে যত বখেড়া ভণ্টুবাবুর!

সহসা করালীচরণের চক্ষুটি দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

আমি কি ভণ্টুবাবুর চাকর? টাকা দশটা পাঠিয়ে দিয়ে তিনি কি আমার মাথাটা কিনে ফেলবেন ভেবেছেন নাকি?

ভণ্টুর নির্দেশ অনুযায়ী শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল ও সবিস্ময়ে এই একচক্ষু জ্যোতিষীর কাণ্ডকারখানা দেখিতে লাগিল। বোতলের মুখে গোঁজা মোমবাতি জ্বলিতেছে, কাছে আর একটা মদের বোতল, ফাটা একটা গ্লাস, চতুর্দিকে এলোমেলো স্তূপীকৃত একগাদা বই।

করালীচরণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ছকটা দেখিতেছিলেন।

কার কুষ্ঠি এটা?

আমার।

বেশ, কাল আসবেন।

শঙ্কর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বড় উদ্বেগের মধ্যে আছি, একটা কথা যদি শুধু বলে দিতেন, তাহলে বড় উপকার হত আমার।

ঘোড়াটা কি বাইরে বেঁধে রেখে এসেছেন? বাই নারায়ণ! এ সব কি তাড়াতাড়ির জিনিস? কি জানতে চান আপনি? একসঙ্গে হবে।

আমার বিয়ের ব্যাপারটা জানতে চাই খালি—কবে হবে আর কি রকম স্ত্রী হবে?

বাই নারায়ণ!

করালীচরণের চক্ষুটিতে বিদ্রূপ-করুণা-মিশ্রিত অদ্ভুত একটা চাপা হাসি ফুটিয়া উঠিল। আর একবার ছকটার পানে চাহিয়া বলিলেন, আচ্ছা, ঘুরে আসুন তা হলে।

কতক্ষণ পরে আসব?

ঘণ্টা দুই পরে। এখন কটা বেজেছে?

আটটা।

দশটা নাগাদ আসবেন। দশটার বেশি দেরি করবেন না যেন, দশটার পর আমি বেরিয়ে যাব।

আচ্ছা।

নমস্কার করিয়া শঙ্কর বাহির হইয়া গেল।

করালীচরণ খানিকটা মদ্যপান করিয়া মুখবিকৃতিসহকারে স্বগতোক্তি করিলেন, বাই নারায়ণ! এসব কান্ট্রি-ফান্ট্রি কি আমার পোষায়! ভণ্টুবাবুর ধাপ্পায় পড়ে প্রাণটা যাবে দেখছি আমার।

মুখটা মুছিয়া খানিকক্ষণ তিনি মোমবাতির শিখাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর সেই লুকানো ছোট বাক্সটি বাহির করিয়া আগ্রহভরে সেটি খুলিয়া চ্যাপ্টা সাদা-গোছের কি একটা বাহির করিয়া অতিশয় কৌতূহলভরে সেটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া টেবিলের ওপর হইতে উপুড়-করা আয়নাটা তুলিয়া লইয়া সন্তর্পণে সেই চ্যাপটা বস্তুটি চক্ষুহীন অক্ষিকোটরের ভিতর বসাইয়া দিয়া বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া দর্পণের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পাথরের চোখ। নিতান্ত মন্দ দেখাইতেছে না তো! স্পন্দিতবক্ষে করালীচরণ অনেকক্ষণ একদৃষ্টে আয়নাটার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পাশের বাড়িতে ঘড়িতে ঢং করিয়া শব্দ হইল—সাড়ে আটটা বাজিল বোধহয়। করালীচরণ চক্ষুটি খুলিয়া রাখিয়া শঙ্করের ছকে মনোনিবেশ করিলেন।

শঙ্কর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সমস্ত অন্তর যদিও একই চিন্তায় পরিপূর্ণ ছিল, জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে সে যদিও রিনির কথাই ভাবিতেছিল; কিন্তু পরিপূর্ণ নদীস্রোতে ভাসিয়া আসা একটা ফুল যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে, নদীকে কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়া ছোট ফুলটাকেই আমরা যেমন লক্ষ্য করি, আজিকার সন্ধ্যায় ভণ্টুর বাড়ির ব্যাপারটাও তেমনিই শঙ্করের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতেছিল। বউদিদির আর্ত অসহায় মুখচ্ছবিটা সে ভুলিতে পারিতেছিল না। এখনও যেন তাহার কানে বউদিদির করুণ কথাগুলি বাজিতেছে, আহা, মরে গেল ওরা! ভণ্টুটা সময়ে সময়ে এমন নিষ্ঠুরও হইতে পারে! অথচ সে বেচারারই বা দোষ কি? এমন অবস্থায় কাহার না রাগ হয়? কত দিক সামলাইবে সে? সমস্ত মাসের খরচ এক ভাঁড় তেল পড়িয়া নষ্ট হইয়া গেলে রাগ হয় বইকি! এই তো সে এখনই আবার হন্যে কুকুরের মতো টাকা ধার করিতে ছুটিল—দাদাকে টাকা পাঠাইতে হইবে, বাবাকে বালাপোশ করাইয়া দিতে হইবে। বাকুর জামা আছে, র‍্যাপার আছে, সোয়েটার আছে, কান-কাটা টুপি আছে, তথাপি

বালাপোশ দরকার। শীতটা ফুরাইয়া যাইবার পূর্বেই বালাপোশটা করাইয়া দেওয়া চাই, তাহা না হইলে বউদিদিরই মুশকিল—বাক্যবাণ তাঁহাকেই সহ্য করিতে হইবে। অথচ ভণ্টুর কতই বা আয়? ধার করিয়া চলিতেছে। সেই চায়ের দোকানের ভদ্রলোকের সহিত আলাপ জমাইয়াছে, উদ্দেশ্য—যদি কিছু সেখান হইতে হস্তগত করিতে পারে। ...সহসা শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল। মনিব্যাগটা খুলিয়া দেখিল, গোটা দশেক টাকা এখনও আছে। এক মাসে কত তেল খরচ হয়? কিছুই তো জানে না সে! পৃথিবী হইতে কোন্ নক্ষত্রের দূরত্ব কত 'লাইট ইয়ার', তাহা সে হয়তো নির্ভুল বলিতে পারিবে; কিন্তু একটা সাধারণ সংসারে মাসে কত চাল ডাল নুন তেল লাগে, এ সম্বন্ধে তাহার কোনো ধারণাই নাই। কিছু দূর হাঁটিয়া সে একটা মুদির দোকান পাইল। সেখানে গিয়া উপবিষ্ট দোকানদারটিকে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, সের পাঁচেক সরষের তেলে একটা সংসারে এক মাস চলা উচিত, কি বলেন?

মুদি যুক্তিযুক্ত উত্তরই দিল, সে সংসার বুঝে, রাবণের সংসারে পাঁচ সের তেলে কি হবে?

রাবণের সংসার নয়, ছোটখাটো সাধারণ সংসার, দু-তিনজন বড় লোক, চার-পাঁচটি ছেলেপিলে। পাঁচ সেরে হবে না?

ভেসে যাবে।

দিন তা হলে পাঁচ সের তেল আমাকে। আর একটা পাত্রও আপনাকেই দিতে হবে, একটা টিন-ফিন হলেই ভাল হয়।

দিচ্ছি সব ঠিক করে, বসুন আপনি। ওরে, মোড়াটা এগিয়ে দে, আর মহেশের দোকান থেকে পাঁচসেরী একটা টিন আন্‌গে চট করে।

দোকানের বালক ভৃত্যটি মোড়া আগাইয়া দিয়া টিন আনিতে চলিয়া গেল এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই টিন আনিয়া হাজির করিল।

মুদি টিনটি ওজন করিয়া তাহার পর তেল মাপিতে বসিল।

ভাল তেল তো? একটু ভাল দেখে দেবেন দয়া করে।

মুদি ওজন-দাঁড়ির পাল্লার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে রাখিতে সহাস্যে উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাল জিনিস দেব বইকি। খাঁটি ঘানির তেল। নসীরামের দোকানে চালাকিটি চলবার জো নেই। খেয়ে অপছন্দ হয়, নগদ মূল্য ফেরত দিয়ে দেব।

ওজন সমাপ্ত করিয়া পাঁচ সেরের ওপরে আরও এক পলা ফাউ দিয়া টিনের মুখটি মুদি বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া দিল এবং শঙ্করের প্রদত্ত মূল্য বেশ করিয়া বাজাইয়া নিরীক্ষণ করিয়া কাঠের বাক্সের ছিদ্রমুখে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

শঙ্কর মুদির কার্যতৎপরতায় খুশি হইয়াছিল।

জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নামই কি নসীরাম?

আজ্ঞে না, আমার ঠাকুরের নাম নসীরাম, অধীনের নাম কেবলরাম।

আচ্ছা, চলি তা হলে, নমস্কার।

কেবলরাম সবিনয়ে প্রতি-নমস্কার করিল।

তেলের টিন লইয়া শঙ্কর একটা রিক্‌শা করিল। রাস্তায় একটা ঘড়িতে দেখিল, পৌনে নয়টা বাজিয়াছে। রিক্‌শা এবং ট্রামের সহায়তায় সে অনায়াসে ভণ্টুদের বাড়িতে তেলটা দিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিবে। ভণ্টু এখন বাড়িতে নাই সে জানে, সুতরাং বেশি দেরি হইবে না।

ভণ্টুর বাড়ির সামনে রিক্শা হইতে নামিয়া শঙ্কর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেমন যেন সঙ্কোচ হইতে লাগিল। কিন্তু এত দূর যখন আসিয়াছে, ফেরা যায় না, —কড়া নাড়িতে হইল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কপাট খুলিয়া গেল।

আচ্ছা ঠাকুরপো, আপিস থেকে এসে না খেয়েই—

বউদিদি শঙ্করকে দেখিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

বন্ধুটি কোথায়?

সে এক জায়গায় গেছে, এই তেলটা কিনে দিয়ে আমাকে পৌঁছে দিতে বললে। এই নিন।

তেলের টিনটা সে নামাইয়া দিল।

পৌঁছে দিতে বললে?

হ্যাঁ।

বউদিদির মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। একটু থামিয়া বলিলেন, আপিস থেকে এসে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত মুখে দেয়নি। আমাকে এমন শাস্তি দেওয়া কেন?

শঙ্কর নির্বাক হইয়া রহিল।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এস, ভেতরে এস।

না, এখন আর বসব না, দরকারি কাজ আছে একটু আমার।

শঙ্কর আর দাঁড়াইল না। বউদিদির মুখের দিকেও আর চাহিতে পারিল না। মুখটা ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি রাস্তায় নামিয়া পড়িল। রাস্তা হইতে সে শুনিতে পাইল, বাকু দরাজ গলায় আদেশ করিতেছেন, বউমা, চায়ের জল চড়াও।

করালীচরণের গলিতে শঙ্কর আসিয়া যখন প্রবেশ করিল, তখন পৌনে দশটা। শীতকালের রাত্রি। গলিটা নির্জন হইয়া পড়িয়াছে। গলির মোড়ের পানের দোকানটা এখনও কেবল খোলা আছে। শঙ্কর কপাটে আঘাত করিতেই করালীচরণ বলিলেন, ভেতরে আসুন, কপাট খোলা আছে।

কপাট ঠেলিয়া শঙ্কর ভিতরে প্রবেশ করিল। এক চক্ষুর দৃষ্টি শঙ্করের মুখের ওপর স্থাপিত করিয়া করালীচরণ বলিলেন, আপনার বিয়ের এখন ঢের দেরি। বছর দেড়েকের আগে তো হতেই পারে না।

শঙ্করের পায়ের তলার মাটি সহসা যেন সরিয়া গেল। তথাপি সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং স্থিরকণ্ঠেই পুনরায় প্রশ্ন করিল, আমার স্ত্রী কি রকম হবে একটা আইডিয়া দিতে পারেন?

নিশ্চয় পারি। শ্যামবর্ণা নাতিদীর্ঘাঙ্গী—

লেখাপড়া কিছু জানবে কি?

বাই নারায়ণ, ওটা তো দেখিনি। দেখি, দাঁড়ান। বসুন আপনি।

করালী আবার ঝুঁকিয়া পুঁথিপত্র উল্টাইতে লাগিলেন। শঙ্কর চৌকির এক পাশে বসিল। কয়েক মিনিট পরে করালীচরণ বলিলেন, লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানবে বলে তো মনে হচ্ছে না। তবে মেয়েটি লক্ষ্মী হবে।

লেখাপড়া কিছু জানবে না?

কই, সে রকম তো মনে হচ্ছে না কিছু।

শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। লোকটার সম্বন্ধে তাহার ধারণাই সহসা বদলাইয়া গেল। মনে মনে 'বোগাস' কথাটা উচ্চারণ করিয়া মুখে সে বলিল, আচ্ছা, উঠি এখন তবে আমি—নমস্কার।

দ্রুতপদে সে বাহির হইয়া গেল।

তাহার প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া করালীচরণ স্বগতোক্তি করিলেন, ছোকরার বউ পছন্দ হল না। বাই নারায়ণ! জোটেও ভণ্টুবাবুর কাছে সব।

করালীচরণ উঠিতে যাইবেন, এমন সময়ে দ্বারপ্রান্তে একটি রমণীমূর্তি আসিয়া দর্শন দিল। কালো কুচকুচে রঙ, বয়স কত তাহা বলা অসম্ভব, গালের হাড় উঁচু হইয়া রহিয়াছে, খোঁপায় ফুল গোঁজা, চোখে কাজল, দাঁতে মিশি। মোড়ের সেই পানওয়ালী।

হাসিয়া বলিল, ও গণকঠাকুর, হারিয়েছে তোমার কিছু?

করালীচরণ রোষদীপ্ত চক্ষে নারীটার পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। ফের আসিয়াছে!

ফের তুই এসেছিস এখানে? মানা করে দিয়েছি না তোকে?

বাবা রে বাবা! এক চোখেই যেন আগুন ছুটছে! এসেছি কি নিজের গরজে নাকি? দশ টাকার নোটটা তখন সিগারেট কিনতে গিয়ে ফেলে এসেছিলে আমার দোকানে, তাই দিতেই এসেছি। ভালর কাল নেই। এই নাও।

করালীচরণের চোখের দৃষ্টি আরও প্রখর হইয়া উঠিল।

দূর হ তুই—চাই না নোট—দূর হ তুই।

পানওয়ালী নোটটা মেঝের ওপর ছুঁড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। মনে হইল, খুব রাগ করিয়াই যাইতেছে, কিন্তু পিছু ফিরিয়া হঠাৎ একটু মুচকি হাসিয়া গেল।

করালীচরণ গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন।

।। একত্রিশ ।।

সার্পেন্টাইন লেনের একটি বাড়ির বাহিরের ঘরে ভণ্টু ও নিবারণবাবু বসিয়াছিলেন। নিবারণবাবু লোকটির সহিত ইতিপূর্বে আমাদের যৎসামান্য পরিচয় হইয়াছে। নিবারণবাবু সেই চায়ের দোকানের মালিক, যে চায়ের দোকানে কিছুদিন পূর্বে ভণ্টু ও শঙ্কর প্রোটোটাইপের অপেক্ষায় বসিয়াছিল, এবং যিনি ওয়েস্টকোট-পরিহিত মাস্টারের সঙ্গে বসিয়া পাশা খেলিতে খেলিতে উঠিয়া আসিয়া ভণ্টুর দ্বারা করকোষ্ঠী বিচার করাইয়াছিলেন। সেই দিন হইতেই নিবারণবাবুর সহিত ভণ্টুর পরিচয়, এবং মাঝে মাঝে চায়ের দোকানে যাতায়াত করিয়া ভণ্টু সেই পরিচয়টিকে দৃঢ়তর করিয়াছে। নিবারণবাবু ভণ্টুর নানা গুণে মুগ্ধ। ভণ্টুও নিবারণবাবুর মধ্যে একটা সহৃদয় মানুষ দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছে। নানারূপ ধান্দা-ফিকির করিয়া ভণ্টুকে যে শুধু সংসার চালাইতে হয় তাহা নহে, অসুস্থ অগ্রজকে টাকা পাঠাইতে হয়। সুতরাং তাহার পক্ষে নানাজাতীয় লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা করা স্বার্থের জন্যই প্রয়োজন। কখন কাহার নিকট হইতে কোন্ উপকার পাওয়া যায় কে বলিতে পারে? নিবারণবাবু লোকটি কেবল সহৃদয় তাহাই নয়, শাঁসালোও। সুতরাং বারংবার তাঁহার পদধূলি লইয়া, করকোষ্ঠী বিচার করিয়া, তাঁহাকে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিয়া (ভণ্টু আজকাল হোমিওপ্যাথি লইয়া নাড়াচাড়া করে) এবং ছোটখাটো নানা ব্যাপারে তাঁহার উপকার করিয়া ভণ্টু নিবারণবাবুর অন্তরঙ্গ হইয়াছে।

নিবারণবাবু লোকটি পুরাকালে আসাম অঞ্চলে চা-বাগানে কাজ করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও নির্ঝঞ্ঝাট নন, দুইটি বিবাহযোগ্য কন্যা আছে, গৃহিণী সর্বদাই অসুস্থ।

এতদ্ব্যতীত মাস্টার নামক ব্যক্তিটি পূর্বপরিচয়ের সুযোগ লইয়া কিছুদিন যাবৎ তাঁহার স্কন্ধারূঢ় হইয়াছেন। আসামের চা-বাগানে যখন ছিলেন, তখনই এই মাস্টারের সহিত তাঁহার আলাপ। চমৎকার পাশা খেলিতে পারেন, চমৎকার চা বানাইতে পারেন, চমৎকার তবলা বাজাইতে পারেন এবং চমৎকার মাংস রাঁধিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই চতুর্বিধ গুণের সমাবেশ সত্ত্বেও মাস্টার বিশেষ কিছু রোজগার করিতে পারেন না। একটা অবশ্য সুবিধা আছে, তিনকুলে তাঁহার কেহ নাই। একটা পেট, কোনো রকমে চলিয়া যাইবার কথা, কিন্তু কালের গতিক এমনই হইয়াছে যে, তাহা চলাও দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময় পূর্বপরিচিত নিবারণবাবুর সহিত সাক্ষাৎকার ঘটায় সমস্যার অনেকটা সমাধান হইয়াছে। চক্ষুলজ্জাসম্পন্ন নিবারণবাবু গুণী মাস্টারকে তাড়াইয়া দিতে পারেন নাই। গৃহিণীর নিকট মিথ্যা কথা বলিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছেন। গৃহিণীকে বলিতে হইয়াছে যে, চায়ের দোকানে কাজ এত বেশি যে, ম্যানেজার-জাতীয় একজন লোক না রাখিলে চলিতেছে না। খাওয়া-পরা এবং মাত্র পাঁচ টাকা মাহিনায় এমন একজন ভাল পরিচিত লোক যখন পাওয়া গিয়াছে, তখন তাহাকে হাতছাড়া করা উচিত নয়। সস্তায় এমন একটা লোকের কর্মপটুতার সুযোগ পাওয়া গিয়েছে বলিয়া নিবারণ-গৃহিণী আপত্তি করেন নাই। মাস্টারের অবসর বিনোদনের জন্য চক্ষুলজ্জাসম্পন্ন নিবারণবাবুকে তাঁহার সহিত বসিয়া পাশা খেলিতে হয় এবং তবলা বাজাইবার সুযোগ দিবার জন্য সেতার বাজাইতে হয়। নিবারণবাবু আসাম-অঞ্চলে যখন ছিলেন, তখন তাঁহার একটু-আধটু সেতার বাজানোর শখ ছিল। কিন্তু বহুকাল চর্চা নাই, হাত আর তেমন চলে না। কিন্তু মাস্টারের প্ররোচনায় পড়িয়া আবার তাঁহাকে সাধনা করিতে হইতেছে, অর্থাৎ চায়ের দোকানে চা যত না বিক্রয় হউক, পাশা-খেলা এবং সেতার-তবলা পুরাদমে চলিতে থাকে।

এখনও মাস্টার দোকান হইতে ফেরেন নাই। ভণ্টু এই খানিকক্ষণ হইল আসিয়াছে। ভণ্টুর সাহচর্য নিবারণবাবুর অতিশয় প্রীতিপ্রদ। তিনি সহাস্যমুখে বলিলেন, চা হবে নাকি ভণ্টুবাবু?

ভণ্টু বলিল, কেন ফর নাথিং কথা বলে সময় নষ্ট করছেন?

ফর নাথিং মানে?

নিবারণবাবুর চক্ষু দুইটি প্রশ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিল। এতদিন আলাপের পরও তিনি ভণ্টুবাবু লোকটির কথাবার্তা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না।

চা তো না খাইয়ে ছাড়বেন না জানি, অনর্থক কচলা-কচলি করে লাভ কি? আপনাকে চিনি না!

ভণ্টু চট করিয়া নিবারণবাবুর পদধূলি লইয়া মাথায় দিল।

আহা-হা, কি যে করেন আপনি। এই অভ্যেসটা আপনার ভারি খারাপ, যাই বলুন, ওতে অপরাধ হয়।

অপরাধ কিসের? আমরা এক জাত, আপনিই বয়োজ্যেষ্ঠ—

তা হোক, তবু ঠিক নয় এটা। আপনাকে বলাও বৃথা।

ভণ্টু স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

তাহার পর বলিল, চা আনতে বলুন।

দর্জ্জি, দর্জ্জি, ওরে দর্জ্জি।

কোনো সাড়াশব্দ না পাইয়া নিবারণবাবু উঠিয়া গেলেন। নিবারণবাবুর কন্যা দুইটির নাম একটু অদ্ভুত। বড়টির নাম দার্জ্জিলিং, ছোটটির নাম আসাম। ভৌগোলিক কোনো কারণে নয়, দুই

প্রকার চায়ের নাম অনুসারেই তিনি কন্যা দুইটির এইরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, নাম দুইটি ডাকনাম। দার্জিলিংয়ের ভাল নাম শ্যামলী, আসামের ভাল নাম যমুনা। দুইজনেরই রঙ চায়ের পাতার মতো কালো, হয়তো চা-ব্যবসায়ী নিবারণবাবু সেইজন্যই তাহাদের চায়ের নামে নামকরণ করিয়াছেন। দৈবক্রমে উভয়ের নামের সঙ্গে চরিত্রও ভারি খাপ খাইয়া গিয়াছে। দার্জিলিং চায়ে যেমন গন্ধ বেশি লিকার কম। নিবারণবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যাটিও সেইরূপ—একটু ভাবময়ী, কাজকর্মে তেমন পটু নয়, ইংরেজিতে যাহাকে বলে আর্টিস্টিক। আসাম ঠিক ইহার উল্টা, ভাবের কোনো সম্পর্ক নাই, বাড়ির কাহারও সঙ্গে তাহার ভাব নাই—কোন্দল করাই তাহার স্বভাব, কিন্তু খাটিতে পারে অসম্ভব—রান্নাঘরের সে-ই সর্বময়ী কর্ত্রী। ...নাঃ, এ মেয়েটাকে নিয়ে আর পারা গেল না, হরদম সেলাই?—বলিতে বলিতে নিবারণবাবু ফিরিয়া আসিলেন। একটা বিরক্তির ভাব চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। চেয়ারে উপবেশন করিয়া বলিলেন, হাড়ির হাল হবে দেখছি মেয়েটার!

ভণ্টু সব বুঝিতেছিল, তথাপি প্রশ্ন করিল, কার?

কার আবার, দার্জির। গিয়ে দেখি, লণ্ঠনের আলোয় ঝুঁকে পড়ে একটা কাপড়ের ওপর রেশমি সুতো দিয়ে ফুল তোলা হচ্ছে। টেবিল-ক্লথ হবে। নিজেদেরই ক্লথ জোটে না, টেবিল-ক্লথ! আর টেবিলই কোথা যে, টেবিল-ক্লথ পাতবি। ঝঞ্ঝাট বুঝুন, কাল বলবে—টেবিল চাই, ক্লথ পাতব।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর ভণ্টু বলিল, জুতে দিন।

আরে মশাই, জুতে দিতে কি আমি অরাজি? কিন্তু পাত্র কই? এক-একটা খুঁজে-পেতে আনি, জলখাবার খায়, সরে পড়ে। এই আমরাও তো বিয়ে করেছিলাম মশাই, রঙ নিয়ে তো মাথা ঘামাইনি। আজকাল সবাই চায় গোলাপি রঙ, ভুলে যায়—এটা বাংলাদেশ, বসোরা নয়।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় সক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন, বাবাও আমার বেছে বেছে এমন একটি রক্ষে-কালীর বাচ্চার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন যে, বংশটাই কালো হয়ে গেল। মুক্তোকেশী বেগুনের গাছে আপেল ফলবে কি করে বলুন?

ভণ্টু স্মিতমুখে বসিয়া রহিল। এ সব কথায় সায় দেওয়াও বিপদ, প্রতিবাদ করাও বিপদ। আসল কথাটা অর্থাৎ টাকার কথাটা সে কখন কি ফাঁকে পাড়িবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। এতদিন নিবারণবাবুর সহিত আলাপ হইয়াছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত ভণ্টু তাঁহার নিকট টাকার কথা উত্থাপনও করে নাই কোনোদিন। অথচ উত্থাপন না করিলেও আর চলিতেছে না। কিছু টাকা অবিলম্বে চাই-ই। ধার-করা ব্যাপারে প্রথম সঙ্কোচটা কাটাইয়া কথাটা পাড়িয়া ফেলিতে পারিলে পরে আর কোনো গোলমাল হয় না। শুভ-অশুভ যাহা হউক, একটা মীমাংসা হইয়া যায়। কিন্তু নিবারণবাবুর এই ক্ষোভের মুখে কথাটা পাড়িতে তাহার কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। হঠাৎ একবার 'না' বলিয়া ফেলিলে সেটাকে 'হ্যাঁ' করিতে আবার বেশ কিছুদিন হয়তো সময় লাগিয়া যাইবে, হয়তো হইবেই না, ভণ্টু চুপ করিয়াই রহিল। হঠাৎ একটা কথা তাহার মনে পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা আপনার ছোট মেয়েকে চুলকুনির যে একটা ওযুধ দিয়েছিলাম—

অদ্ভুত ফল হয়েছে মশাই, একেবারেই সেরে গেছে। আমাকেও এক ডোজ দেবেন তো, আঙুলের গলিগুলিতে আমারও হয়েছে।—বলিয়া তিনি চুলকাইতে লাগিলেন।

আচ্ছা, কাল আনব।

মাস্টার আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং ভণ্টুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিয়া ভ্রূযুগল নাচাইলেন—ভাবটা এই যে, আসিয়াছেন দেখিতেছি!

নিবারণবাবু প্রশ্ন করিলেন, আমি চলে আসার পর খদ্দের-টদ্দের এসেছিল দু-একটা?

খদ্দের!

এমন একটা বিস্ময়সূচক ভঙ্গিতে মাস্টার কথাটি উচ্চারণ করিলেন যে, যেন নিবারণবাবু অতিশয় অসম্ভব একটি প্রশ্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। মাস্টারের দৃষ্টি দেখিয়া নিবারণবাবু একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, মানে, আসেও তো মাঝে মাঝে—

রাত্তির নটার পর কার দায় পড়েছে এই গলিতে চা খেতে আসবে! একদিনও তো দেখিনি।

নিবারণবাবু প্রত্যুত্তরে কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু এমন একটা মুখভাব করিয়া ভণ্টুর দিকে চাহিলেন যে, বোঝা গেল, তিনি কথা-কাটাকাটি করিয়া কথা বাড়াইতে চাহেন না বটে, কিন্তু নয়টার পর কখনও তাঁহার দোকানে খরিদ্দার আসে না—এ উক্তি তিনি মানিয়া লইতেও প্রস্তুত নহেন। ভণ্টু একটু হাসিল মাত্র। মাস্টার বসিলেন। এমন সময় দর্জি দুই পেয়ালা চা লইয়া প্রবেশ করিল। দার্জিলিঙের রঙ মায়ের মতো, মুখশ্রী বাবার মতো। বয়স বছর ষোল-সতেরো। অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে চায়ের পেয়ালা ভণ্টু ও নিবারণবাবুর হস্তে দিয়া সে চকিতে একবার মাস্টারের পানে চাহিয়া দেখিল। মাস্টার সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন, বলিলেন, আমি আর খাব না এখন, চার পেয়ালা হয়ে গেছে!

দর্জি ভিতরে চলিয়া গেল।

নিবারণবাবু পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়াই বলিলেন, কাণ্ডটা দেখেছেন!

ভণ্টু তখনও চুমুক দেয় নাই, বলিল, কি লাইট হয়েছে বুঝি?

খেয়ে দেখুন না মশাই, লাইট তো হয়েইছে, চিনি পর্যন্ত দেয়নি। ওরে আস্‌মি! আস্‌মি!

আসাম আসিয়া দ্বারপ্রান্তে উঁকি দিল।

চিনি নিয়ে আয় তো একটু। দর্জি চায়ে চিনি দেয়নি।

আসাম একটু পরেই চিনির টিন ও একটি চামচ লইয়া আসিয়া প্রবেশ করিল এবং হাসি চাপিতে চাপিতে উভয়ের পেয়ালায় চিনি মিশাইয়া দিয়া গেল। আসামের বয়স বছর চৌদ্দ হইবে, বেশ চালাক চটপটে মেয়ে, রঙ কালো হইলেও দর্জির মতো অতটা কুশ্রী নয়।

চা পান করিতে করিতে নিবারণবাবু বলিলেন, ভণ্টুবাবু, আপনি তো পাঁচ জায়গায় ঘোরেন—একটু খোঁজখবর রাখবেন, মেয়ে দুটোর বিয়ে দিয়ে দিতে পারলে একটু ঝাড়া হাত-পা হওয়া যায়।

ভণ্টু বলিল, বাজার বড় খারাপ। কি বলেন মাস্টারবাবু?

মাস্টার বলিলেন, হ্যাঁ।

চা পান শেষ করিয়া ভণ্টু উঠিয়া পড়িল। ভাবিয়া দেখিল, টাকার কথাটা এখন পাড়িলে ঠিক সুবিধাজনক হইবে না, অথচ প্রয়োজন কালই। কাল একবার আসিতে হইবে। উপায় কি?

এইবার উঠি আমি।

এরই মধ্যে উঠবেন?

হ্যাঁ, কাজ আছে, আবার আসব কাল।

ভণ্টু বাহির হইয়া গেল।

ভণ্টু চলিয়া গেলে মাস্টার খুব রহস্যময় একটি উক্তি করিলেন।

দাঁও মাফিক খুব একটা দামি কারবার করেছি আজ।

চায়ের সেই এজেন্টটা এসেছিল নাকি? আমি তাকে পাঁচ আনা পাউন্ডের বেশি দর দিতে রাজি নই, তুমি আবার বেফাঁস কিছু বলনি তো?

আরে, না না। তুমি যে ধাঁ করে একেবারে অন্য লাইনেই চলে গেলে!

অন্য লাইনে মানে? ঠিক লাইনেই আছি। ওই ডাস্ট চায়ের পাঁচ আনার বেশি দর দেওয়া যায়?

কি মুশকিল, কথাটা শোনই শেষ পর্যন্ত! আমি বলছি গৎ-এর কথা, তুমি একেবারে চায়ের এজেন্ট এনে ফেললে!

গৎ? কিসের গৎ?

কি আশ্চর্য, আকাশ থেকে পড়লে যে একেবারে! বলিনি তোমাকে পরশুদিন যে, হোসেন মিঞা সেতারীর খুব ভাল একটা গৎ-এর খাতার সন্ধান পেয়েছি একজনের কাছে? অনেক পৈরবি করে তিলোককামোদটা টুকে এনেছি আজ। দেখে এলাম, ইয়া মোটা খাতা—বহু গৎ আছে। দাঁড়াও না, সব হাতাব ক্রমশ; চা-টা খাইয়ে লোকটাকে খুব তোয়াজ করেছি আজ। একটু যেন ভিজেছে মনে হচ্ছে।

এতবড় একটা সুসংবাদ শুনিয়াও কিন্তু নিবারণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন না। নীরবে পকেট হইতে বিড়ির কৌটাটি বাহির করিয়া নীরবেই একটি বিড়ি ধরাইয়া ধূম্র উদগীরণ করিলেন। গৎ-এর খাতার মালিক সেই রোগা লম্বা লোকটিকে তিনি দেখিয়াছেন এবং মাস্টারের সঙ্গে ভাব জমাইয়া সে যে দোকানে মাঝে মাঝে বিনা পয়সায় চা খাইয়া যাইতেছে, তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। চা যাক, দুই-এক পেয়ালা চায়ে বিশেষ আসিয়া-যাইবে না, কিন্তু কাল হইতে উক্ত তিলোককামোদ গৎ তাঁহার উপর ভর করিবে—ইহাই ভাবিয়া নিবারণবাবু একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। 'পিলু'টাকে লইয়াই তো নাজেহাল হইতে হইয়াছে। এ বয়সে কি আর ওসব পোষায়! অথচ মাস্টার লোকটা না-ছোড়বান্দা, তবলা তিনি বাজাইবেনই; এবং মুশকিল এই যে, তবলা যন্ত্রটা একা একা বাজানো যায় না।

সঙ্গত করিবার জন্য নিবারণবাবুকে সেতার বাজাইতে হয়।

এককালে অবশ্য খুবই শখ ছিল, কিন্তু এখন আর ওসব পোষায় না। নিতান্ত মাস্টারের খাতিরেই তিনি রাজি হইয়াছেন। শরণাগত আশ্রিত লোককে ক্ষুণ্ণ করিতে ইচ্ছা হয় না, লোকটা গুণীও বটে। অথচ—

কাল থেকে গৎখানায় হাত দিয়ে ফেল, দু-তিন দিনে রপ্ত করে ফেলা চাই।

বিড়িতে একটা টান দিয়ে বিমর্ষ নিবারণ বলিলেন, দেখি।

সঙ্গীত-বিষয়ক আলোচনা আরও কিছুক্ষণ হয়তো চলিত, কিন্তু অকস্মাৎ ভণ্টুর পুনরাবির্ভাবে তাহা আর ঘটিল না। ভণ্টু প্রবেশ করিয়া বলিল, দাদা, ঘোর জালে পড়ে এসেছি।

কি হল?

হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখি, মনিব্যাগ গ্যাণ্ডিফায়েড।

গ্যাণ্ডিফায়েড! মানে? পকেট-মারা গেছে নাকি?

স্টোন ডেড।

এখানে ফেলে-টেলে যাননি তো?

দেখুন।

সম্ভব-অসম্ভব সকল স্থানেই খোঁজা হইল, মনিব্যাগ পাওয়া গেল না।

ভণ্টু বলিল, ওতেই আমার যথাসর্বস্ব ছিল দাদা। গোটা পঁচিশেক টাকা ধার দিন, কাল থেকে তা না হলে ফাসটিং আপিস খুলতে হবে। দয়া করুন দাদা।

ভণ্টু নিবারণের পদধূলি লইয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল।

আহা! টাকা আপনাকে দিচ্ছি, অমন করছেন কেন? বসুন।

ভণ্টু উপবেশন করিল।

।। বত্রিশ ।।

শিরীষবাবুর বাসায় বসিয়া মুকুজ্জেমশাই পত্র লিখিতেছিলেন। শিরীষবাবুর কন্যা অমিয়া আসিয়া হাজির হইল। অমিয়ার বয়স বারো বছরের বেশি নয়, বোধহয় কমই হইবে। অথচ ইহারই বিবাহের জন্য শিরীষবাবুর আহার নিদ্রা বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে এবং ইহারই জন্য পাত্র সংগ্রহ-কার্যে মুকুজ্জেমশাই কিছুদিন যাবৎ নিযুক্ত আছেন—এ কথা আমরা পূর্বেই শুনিয়াছি। এখনও মুকুজ্জেমশাই সেই কার্যেই ব্যাপৃত আছেন। মুকুজ্জেমশাইয়ের স্বভাবের বিশেষত্ব—যখন যাহাতে লাগেন, তাহার চরম করিয়া ছাড়িয়া দেন এবং কার্যসিদ্ধির জন্য সহজ কঠিন সরল জটিল যত প্রকার উপায় মাথায় আসে সবগুলিই করিয়া দেখেন। এক্ষেত্রেও তাহাই করিতেছিলেন। কলিকাতার এবং মফস্বলের যাবতীয় কলেজ হইতে অবিবাহিত কায়স্থ যুবকগণের নাম ধাম পরিচয় সংগ্রহ করিয়া ও তাহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর লইয়া কথাবার্তা চালাইতেছিলেন। ফলে, নানারকম চিঠিপত্র কোষ্ঠী জমিয়া এবং সেগুলি নানাভাবে শ্রেণীভুক্ত হইয়া নানা রঙের ফাইল স্ফীত করিয়াছিল। অর্থাৎ মুকুজ্জেমশাই ছোটখাটো একটা আপিস খুলিয়া বসিয়াছিলেন। এই ধরনের কার্যেই তিনি আনন্দ পান এবং কার্যটি যতই দুঃসাধ্য ও জটিল হয়, ততই যেন তাঁহার উৎসাহ বাড়িতে থাকে। মধ্যবিত্ত বহু গৃহস্থের বহু কঠিন সমস্যার সমাধান মুকুজ্জেমশাই বহুবার নিঃস্বার্থভাবে করিয়াছেন। করিয়া আনন্দ পান, এইটুকুই বোধহয় তাঁহার স্বার্থ।

এই সংক্রান্ত ছয়খানি চিঠি লেখা তিনি সকাল হইতে বসিয়া শেষ করিয়াছেন, সপ্তম চিঠিখানি লিখিতেছিলেন, এমন সময়ে অমিয়া আসিয়া বলিল, মা বললে—আপনি হাত পা ধুয়ে আহ্নিক করে নিন, আর বসে চিঠি লিখতে হবে না।

মুকুজ্জেমশাই লিখিতে লিখিতে একটু হাসিলেন।

এত চিঠি রোজ রোজ কোথায় লেখেন আপনি? এত লিখতেও পারেন!

মুকুজ্জেমশাই হাস্যস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, এই যে হয়ে গেল। এখন আর লিখব না, এইটে শেষ করে নিই। আবার তিনি পত্ররচনায় মনোনিবেশ করিলেন। অমিয়া মিনিটখানেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে নিকটস্থ একটি চেয়ারে বসিল। উজ্জ্বল শ্যাম মেয়েটির বর্ণ, স্বতন্ত্রভাবে দেখিলে নাক মুখ চোখে তেমন বিশেষ কোনো সৌন্দর্য নাই, কিন্তু সমগ্রভাবে মেয়েটির মুখশ্রীতে সুন্দর একটি লাবণ্য আছে। অতিশয় সরল পবিত্র অনাড়ম্বর অন্তরের

প্রতিচ্ছবি সমস্ত মুখখানিতে প্রতিফলিত হইয়া এমন একটি কোমল কমনীয়তার সৃষ্টি করিয়াছে যে, দেখিলেই মন স্নেহসিক্ত হইয়া ওঠে।

অমিয়া আর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, এত চিঠি আপনি রোজ কাকে লেখেন দাদামশাই?

তোর শ্বশুর-ভাসুরকে।

ধ্যেৎ।

ধ্যেৎ নয়—সত্যি তাই।

আমার তো বিয়ে হয়নি এখনও, শ্বশুর-ভাসুর পাবেন কোথা?

আছে এক জায়গায়।

কোথায়?

তা এখন বলব কেন?

মুকুজ্জেমশাই চিঠিখানি খামে পুরিতে পুরিতে খুব রহস্যময়ভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। একটি প্রশ্ন অনেক দিন হইতেই অমিয়ার অন্তর আলোড়িত করিতেছিল, নিজে সে ইহার সমাধান করিতে পারে নাই, অপর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা হয়। দাদামশাইকে জিজ্ঞাসা করা চলে বোধহয়। একটু ইতস্তত করিয়া অমিয়া শেষে প্রশ্নটা করিয়াই ফেলিল, আচ্ছা দাদামশাই, শিবপুজো করলে শিবের মতো বর হয়?

নিশ্চয়।

ওইরকম?

অমিয়া দেওয়ালে টাঙানো একটি মহাদেবের ছবি আঙুল দিয়া দেখাইল। একখানি ক্যালেন্ডারের ছবি, জটাজূটধারী ব্যাঘ্রচর্ম-পরিহিত ভীষণ এক মহাদেব চক্ষু কটমট করিয়া চাহিয়া রহিয়াছেন। মুকুজ্জেমশাই চকিতে একবার ছবিটার পানে তাকাইয়া ছদ্মগাম্ভীর্যভরে বলিলেন, অবিকল।

অমিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে ছবিটার পানে চাহিল। সে তো রোজ একাগ্রচিত্তে শিবপূজা করিয়া চলিয়াছে। ওইরকম বর হইবে শেষকালে! তাহার মনে আর একটি প্রশ্ন জাগিল।

আচ্ছা, সবাই তো শিবপুজো করে—বিলু, শান্তি, কমলি, টগর, সব্বারই শিবের মতো বর হবে?

সব্বারই।

রেণুদিও তো শিবপুজো করত, তার তো কেমন সুন্দর বর হয়েছে, ও-রকম তো হয়নি!

ভাল করে পুজো করতে পারেনি তোমার রেণুদি, পারলে ঠিক ওই রকম হত।

দরকার নেই বাবা ভাল করে পেরে। ওই রকম বর চাই না।

মুকুজ্জেমশাই চক্ষু দুইটি বড় বড় করিয়া বলিলেন, বলতে নেই অমন কথা। শিব-প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল। বীরেন—অমিয়ার দাদা—বই খাতা লইয়া প্রবেশ করিল। সে স্কুলে যাইতেছিল। অমিয়া বীরেনের পিঠোপিঠি, সুতরাং অহি-নকুল সম্পর্ক। বীরেনের ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, নঞতৎপুরুষ, গল্প করা হচ্ছে তো বসে বসে? মা ডাকছে।

অমিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মুকুজ্জেমশাইকে বলিল, দেখুন, ফের আমাকে নঞতৎপুরুষ বলেছে! আচ্ছা, এস তুমি ইস্কুল থেকে, দেখাচ্ছি তোমাকে।

বীরেন চিমটিটি কাটিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গিয়াছিল। মুকুজ্জেমশাই গম্ভীর মুখে বসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুইটি হইতে হাসি উপচাইয়া পড়িতেছিল। বীরেন সম্প্রতি ব্যাকরণ পড়িতে শুরু করিয়াছে। ন মিঞা=অমিয়া—এই বৈয়াকরণিক বিশ্লেষণ করিয়া সে অমিয়াকে নঞতৎপুরুষ আখ্যা দিয়াছে।

অমিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, ও কেন আমাকে নঞতৎপুরুষ বলবে খালি?

বীরেন বিদ্বান মানুষ, ব্যাকরণ-ট্যাকরণ কত কি পড়ছে, আমি মুখ্যু-সুখ্যু লোক ওর কথাবার্তা ভাল বুঝতেই পারি না, কি বলব, বল?

বিদ্বান, না হাতি,—এবার তো সেকেন হয়ে গেছে।

শিরীষবাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। আপিস যাইতেছেন। পোস্ট-আপিসে চাকরি করেন। ভদ্রলোকের উদার প্রশস্ত মুখচ্ছবিতে কেমন যেন একটা ভালমানুষি মাখানো রহিয়াছে। গোঁফ দাড়ি কামানো, ভারী মুখ। শক্তির ব্যঞ্জনা থাকিলে ভয় উদ্রিক্ত করিত। কিন্তু শিরীষবাবুকে দেখিলেই ভালমানুষ নিরীহ-প্রকৃতির লোক বলিয়া মনে হয়। আসলেও তিনি অতিশয় মৃদু অসহায় প্রকৃতির লোক, মোটেই শক্তিমান পুরুষ নহেন। দৃঢ়হস্তে সংসার-তরণীর হাল ধরিয়া থাকিবার মতো সামর্থ্য তাঁহার মোটেই নাই। ঘরের মধ্যে গৃহিণী এবং বাহিরে মুকুজ্জেমশাই তাঁহার অবলম্বন।

শিরীষবাবু বলিলেন, দশটা বেজে গেছে, আপনি আর দেরি করবেন না, সুশীল বসে আছে।

এই যে উঠি।

মুকুজ্জেমশাই উঠিয়া অমিয়ার সহিত বাড়ির ভিতরে গেলেন। অনেক কাজ এখনও বাকি। স্নান করিবেন, আহ্নিক করিবেন, স্বপাক ভাতে-ভাত দুইটি ফুটাইয়া লইবেন, আহারাদি করিয়া মৃন্ময়ের একবার খবর লইবেন। যদিও খবর পাইয়াছেন যে, মৃন্ময় সুস্থ আছে, তথাপি একবার যাইতে হইবে, তাহা না হইলে পাগলীটা অনর্থ বাধাইবে।

শিরীষবাবু ক্যালেন্ডারের শিব ও প্রাচীর-বিলম্বিত অন্যান্য ঠাকুরদেবতার ছবিকে প্রণাম করিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহারও আপিসের দেরি হইয়া গিয়াছে।

।। তেত্রিশ ।।

এত রূঢ় আঘাত প্রিয়বাবু জীবনে আর কখনও পান নাই। বেলা যে সত্য সত্যই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, ইহা তিনি ভাবিতেও পারেন নাই। কি একটা সামান্য কথা হইতে কি হইয়া দাঁড়াইল! প্রথম যেদিন বেলা চলিয়া গেলেন, প্রিয়বাবু আশা করিয়াছিলেন, কিছুক্ষণ পরেই রাগটা কমিলেই তিনি ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু ক্রমশ সন্ধ্যা হইয়া গেল, বেলা ফিরিলেন না। কি করিবেন ভাবিতেছিলেন, এমন সময় বেলার গানের মাস্টার অপূর্ববাবু আসিয়া হাজির হইলেন। অদ্ভুত লোক এই অপূর্ববাবু। বেলাকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছেন। মিনমিন করিয়া কথাবার্তা কন, ভদ্রলোকের মধ্যে কিছুমাত্র যদি পদার্থ আছে! ইহাকেই তিনি এ যাবৎ মাসে মাসে পাঁচটা করিয়া টাকা গণিযা দিয়াছেন, অথচ এই সামান্য উপকারটি ভদ্রলোক করিতে পারিলেন না। বেলা যখন তাঁহাকে ফোন করিয়া ডাকিলেন এবং সব খুলিয়া বলিলেন, তখন উনি কি হিসাবে তাঁহাকে অজ্ঞাতকুলশীল শঙ্করের সহিত যাইতে দিলেন, তাহা প্রিয়বাবু ভাবিয়া পাইলেন না। রাগ করিয়া

মেয়েটা চলিয়া গিয়াছে, বুঝাইয়া-সুঝাইয়া ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন না! লোকটা কেবল ছিমছাম পোশাক পরিয়া 'অনুগ্রহ করে' 'আশা করি' 'যদি কিছু মনে না করেন' প্রভৃতি কতকগুলি মোলায়েম অর্থহীন বুলি অসংলগ্নভাবে আওড়াইতে পারেন, আর কোনো কর্মের নন। নিরীহ অপূর্ববাবুর প্রতি একটা বিতৃষ্ণায় প্রিয়বাবুর সমস্ত অন্তঃকরণ পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল, ভদ্রলোকের পাউডার-মাখা মুখে ঠাস করিয়া একটা চড় মারিয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দেন। কিন্তু পর-মুহূর্তেই তাঁহাকে ইচ্ছাটি সম্বরণ করিতে হইল। কারণ, এই জাতীয় উত্তেজনাজনিত আকস্মিক ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া জীবনে তিনি বহুবার বিপন্ন হইয়াছেন। একবার একটা সাহেবকে মারিয়া চাকুরি গিয়াছিল; বেলাও যে বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন তাহাও এক হঠকারিতার জন্য। দ্বিতীয়ত, অপূর্ববাবুকে চটাইলে বেলার নাগাল পাওয়া শক্ত হইবে। অপূর্ববাবু শঙ্করবাবুকে চেনেন। তাই অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি অপূর্ববাবুর সাহায্যে বেলার সন্ধান করিতে লাগিলেন।

কে এই শঙ্করবাবু? বেলার সহিত তাহার পরিচয় কবে হইতে এবং কি সূত্রে— প্রিয়বাবু কিছুই জানেন না। অপূর্ববাবুও বিশেষ কিছু বলিতে পারিলেন না। প্রিয়বাবু যদি বেলাকে ভাল করিয়া না চিনিতেন, তাহা হইলে এই অজ্ঞাত শঙ্করবাবুর সহিত তাঁহাকে জড়াইয়া একটি সস্তাগোছের নাটকীয় পরিকল্পনা করিয়া ফেলিতে পারিতেন। কিন্তু বেলাকে তিনি ভাল করিয়াই চেনেন। তাঁহার অসীম অহঙ্কার এবং পুরুষ-জাতির প্রতি অসীম অবজ্ঞার কথা প্রিয়বাবুর অপেক্ষা বেশি আর কে জানে! সুলভ উচ্ছ্বাসে হাবুডুবু খাইবার মতো প্রকৃতি বেলার নয়। হালকা ফুলটির মতো তিনি তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইবেন, কিন্তু সহজে ডুবিবেন না। ডুবিলে এতদিন ডুবিয়া যাইতেন। তরঙ্গও অনেক আসিয়াছিল এবং উচ্ছ্বাসেরও অসদ্ভাব ছিল না। কিন্তু বেলাকে তাহারা স্পর্শ করিতে পারে নাই। বেলার এই পদ্মপত্র-জাতীয় অদ্ভুত প্রকৃতির জন্য প্রিয়বাবু মুখে অনেক চটাচটি করিয়াছেন বটে, কিন্তু মনে মনে তিনি এই জন্যই বেলাকে শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন এবং ভয়ও করেন। বেলার দুর্দমনীয় স্বভাব প্রিয়বাবুর অনেক উৎকণ্ঠার ও নানারূপ অসুবিধার কারণ হইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু সেই দুর্দমনীয় ব্যক্তিটি যখন তাঁহার সমস্ত একগুঁয়েমি লইয়া সহসা সরিয়া গেলেন, তখন প্রিয়বাবু চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। তিনি অনুভব করিলেন যে, বেলাবিহীন তাঁহার জীবন মস্তবড় একটা নিরর্থক শূন্যতা। বেলা ব্যতীত অপর কেহই সে শূন্যতা পূর্ণ কবিতে পারে না। সেদিন রাগের মাথায় তিনি বলিয়াছিলেন বটে যে, বেলার জন্যই তিনি বিবাহ করিতে পারিতেছেন না; কিন্তু কথাটা যে কত বড় মিথ্যা, তাহা এখন তিনি মনে মনে বুঝিতেছেন। বস্তুত বিবাহ করিবার কোনো কল্পনাই তাঁহার মাথায় নাই। প্রিয়বাবু বর্তমান যুগের সুবিধাবাদী সেই যুবকগোষ্ঠীর একজন, যাহারা নানা অজুহাতে নিজেরা বিবাহ করে না, কিন্তু যাহারা নিজেদের ভগিনীদের বিবাহ দিবার জন্য সর্বদাই সমুৎসুক—অর্থাৎ নিজেরাই শুধু যে কোনো দায়িত্ব লইতে চাহে না তাহা নয়, নিজেদের বিবাহযোগ্যা ভগিনী অথবা অন্য কোনো পোষ্যার দায়িত্বভারও ভদ্রভাবে অপরের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়। বর্তমান সমাজের শিথিল বিধিব্যবস্থার কল্যাণে অবিবাহিত থাকিলেও ইহাদের চলিয়া যায় এবং বর্তমান জীবনযাত্রার ব্যয়সাধ্য বিলাসপ্রবণতার স্রোতে কোনোক্রমে ভাসিয়া থাকিবার মতো সামান্য কিছু হয়তো ইহারা উপার্জন করে, কিন্তু সে উপার্জন সপরিবারে বিলাসের স্রোতে ভাসিবার মতো সুপ্রচুর নহে। বিলাস বর্জন করিয়া জীবনের বৃহত্তর সামাজিক আদর্শের যূপকাষ্ঠে নিজেদের বলি দিতে ইহারা অনিচ্ছুক। যতটা

সম্ভব হালকাভাবে এবং ভালভাবে ভাসিয়া থাকিতে পারাটাই ইহাদের লক্ষ্য, ঝামেলা জুটাইয়া নিজেদের ভারাক্রান্ত করিতে ইহারা চাহে না, পারেও না। সুতরাং প্রিয়বাবুর বিবাহ করিবারও কোনোরূপ কল্পনাই ছিল না। সেদিন শুধু রাগের মাথায় আর কোনো যুক্তি না পাইয়া এই মিথ্যা কথাটাকে তিনি জোর গলায় প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য এখনও মনে মনে তাঁহার অনুতাপের অন্ত নাই। বেলা চলিয়া যাওয়াতে আর একটা কথাও তাঁহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এতদিন ধরিয়া বেলাকে স্কন্ধ হইতে নামাইবার বহু প্রকার চেষ্টা তিনি করিয়াছেন; কিন্তু এখন অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছেন যে, সে চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন প্রথা-অনুযায়ী। আজ বেলার অনুপস্থিতিতে তিনি ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতেছেন যে, বেলাকে ছাড়িয়া তিনি এক দণ্ড থাকিতে পারিবেন না। সে মুখরা দুর্বিনীতা বোনটিকে তাঁহার চাই, সে তাঁহার জীবনের যে অংশটি জুড়িয়া বসিয়াছিল, সেখানে আর কাহাকেও বসানো চলিবে না। যে তীক্ষ্ণ দন্তটি সুযোগ পাইলেই কুট করিয়া জিহ্বাকে কামড়াইয়া দিত, সেই তীক্ষ্ণ দন্তটির অন্তর্ধানে জিহ্বা যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে, সেই শূন্যস্থানটায় বারংবার ডগাটুকু বাড়াইয়া আকুল হইয়া তাহাকে খুঁজিতেছে।

সেদিন শঙ্করবাবু লোকটিকে তো তেমন খারাপ বলিয়া মনে হইল না। রাস্তায় অবশ্য দুই মিনিটের জন্য দেখা, কিন্তু ওই দুই মিনিটেই তাহার সম্বন্ধে যে ধারণা হইয়াছে, তাহা মন্দ নহে। ভদ্রলোকের চোখেমুখে কি যেন একটা ব্যঞ্জনা আছে, যাহা আকৃষ্ট করে। শঙ্করবাবুর নিকট হইতে ঠিকানা লইয়া প্রফেসার গুপ্তের নিকটও প্রিয়বাবু গিয়াছিলেন এবং প্রফেসার গুপ্তের আচার-ব্যবহারেও নিছক ভদ্রতা ছাড়া আর কোনো কিছু পান নাই। প্রফেসার গুপ্ত তাঁহাকে বাগবাজারের বাসার ঠিকানা তো দিলেনই, আশ্বাসও দিলেন যে, তিনি মিস মল্লিককে বুঝাইয়া বলিবেন যেন তিনি এই সামান্য কলহটা মিটাইয়া ফেলেন। প্রফেসার গুপ্তের নিকট হইতে প্রিয়বাবু আরও দুইটি সংবাদ পাইয়া কিন্তু আতঙ্কিত হইলেন। প্রথম, বেলা আরও দুইটি টিউশনি জোগাড় করিয়াছেন, বর্তমানে তাঁহার মাসিক আয় পঞ্চাশ টাকা; এবং দ্বিতীয়, তিনি একটি বলিষ্ঠ ভোজপুরী দারোয়ান নিযুক্ত করিয়াছেন। সেই দারোয়ানকে অতিক্রম না করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করা যাইবে না দারোয়ান-প্রসঙ্গে প্রফেসার গুপ্ত যাহা বলিলেন, তাহা সংক্ষেপে এই।—দারোয়ানটি বৃদ্ধ হইলেও বলিষ্ঠ। খুব বিশ্বাসী। এককালে মিলিটারিতে ছিল, এখন পেন্‌শন পাইতেছে। প্রফেসার গুপ্ত তাহাকে কিছুদিন পূর্বে রাখিয়াছিলেন এবং প্রফেসার গুপ্তই বেলাকে দারোয়ানটি জোগাড় করিয়া দিয়াছেন। দারোয়ান বেলাকে 'বেটী' সম্বোধন করিয়াছে এবং নামমাত্র বেতন লইয়া তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। যোগাযোগ অতি সুন্দর হইয়াছে। জনার্দন সিংহের বয়স ষাটের কাছাকাছি। একটি মাত্র কন্যা ছিল, সেটিও কিছুদিন পূর্বে মারা গিয়াছে। দেশে ফিরিবার আর তাহার ইচ্ছা ছিল না। বাকি 'জিন্দ্‌গি'টা সে কলিকাতা শহরেই 'বিতাইয়া' দিতে অর্থাৎ অতিবাহিত করিতে চায়। সে পেনশন যাহা পায় তাহাতে তাহার খাওয়া-পরাটা বেশ স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, কিন্তু বাড়িভাড়া করিতে গেলে সঙ্কুলান হয় না। প্রফেসার গুপ্তের ওখানে সে আনন্দেই ছিল, কিন্তু মুখরা মাঈজির অত্যাচারে সে টিকিতে পারে নাই। কোথাও মাথা গুঁজিবার একটা ঠাঁই পাইলেই তাহার চলে, সামান্য কিছু বেতন পাইলে আরও ভাল, কিন্তু স-সম্মানে সে থাকিতে চায়। 'ছোট বাত' বলিয়া কেহ তাহার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করিলে সে সহ্য করিতে পারিবে না। সুতরাং বেলার সহিত তাহার বেশ খাপ খাইয়া গিয়াছে। অতবড় বাসাটায় বেলার পক্ষে এক

থাকা শক্ত এবং জনার্দনের পক্ষেও এমন একটা বাসা পাওয়া শক্ত। জনার্দন বৃদ্ধ, বলিষ্ঠ, স্নেহশীল। বেলাকে সে প্রকৃতই বেটীর ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। সমস্ত শুনিয়া প্রিয়বাবুর অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। তাঁহার আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, ভোজপুরী জনার্দন হয়তো তাহাকে ভিতরে যাইতেই দিবে না। অবশ্য জনার্দন না থাকিলেও যে প্রিয়বাবু নিঃশঙ্কচিত্তে যাইতে পারিতেন তাহা নয়, কিন্তু জনার্দন থাকাতে ব্যাপারটা আরও গুরুতর হইয়া উঠিল। বাড়িটার আশেপাশে আনাচে-কানাচে প্রিয়বাবু দুই-একদিন সঙ্গোপনে ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিবার মতো সাহস সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে স্থির করিলেন, অপূর্ববাবুকে দূত করিয়া প্রথমে প্রেরণ করিতে হইবে। বেলার জিনিসপত্র—এস্রাজ সেতার কাপড়-চোপড় অপূর্ববাবুর মারফত বেলার নিকট পাঠাইয়া দিয়া বেলার মনোভাবটা প্রথমে বুঝিতে হইবে। তাহার পর দেখা যাইবে। অপূর্ববাবুকে বেলা নিশ্চয়ই তাড়াইয়া দিবেন না।

রবিবার সকালে গাড়ির মাথায় জিনিসপত্র লইয়া অপূর্ববাবু বেলাদেবীর বাসাব দরজায় আসিয়া নামিলেন। দরজা খোলা ছিল। ঢুকিতে যাইবেন, এমন সময় জনার্দন সিং বাহিব হইয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, জেরাসে ঠহর যাইয়ে বাবুসাহেব।

জনার্দন সিংহের বিশাল বলিষ্ঠ শরীর ও গম্ভীর কণ্ঠস্বরে অপূর্ববাবু একটু ভড়কাইয়া গেলেন। মুখখানা সত্যই যেন সিংহের মতো। মোচার মতো কাঁচাপাকা একজোড়া গোঁফ মহিষের শিঙের মতো যেন উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। বলিষ্ঠ চোয়াল, মাংসল নাক এবং তীক্ষ্ণ-চক্ষুসম্পন্ন জনার্দন সিং কিন্তু যথোচিত বিনয় সহকারেই প্রশ্ন করিল।

কেয়া মাংতে হেঁ আপ হুজুর?

থতমত ভাবটা সামলাইয়া অপূর্ববাবু বলিলেন, মানে, মিস মল্লিকের জিনিসপত্রগুলো এনেছি। মাঈজি কাঁহা?

মাঈজি অন্দরমে হেঁ। আপ জেরা সে ঠহর যাইয়ে, হাম তুরন্ত্ খবর দে দেতে হেঁ। হুজুরকা নাম?

অপূর্ববাবু।

অপূরব্‌বাবু!

জনার্দন ভিতরে চলিয়া গেল।

মিনিটখানেক পরেই বেলা দেবী নিজেই বাহির হইয়া আসিলেন।

ও, আপনি এসেছেন, আসুন আসুন, ভেতরে আসুন। গাড়ির মাথায় ওসব কি?

গলা-খাঁকারি দিয়া অপূর্ববাবু বলিলেন, মানে, আপনারই জিনিসপত্রগুলো, অর্থাৎ প্রিয়বাবুর সিচুয়েশনটা একটু, আমাকে তাই রিকোয়েস্ট করলেন—

অপূর্ববাবু পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া সেটি মুখের সামনে ধরিয়া বার দুই কাশিলেন।

বেলার মুখভাব কঠিন হইয়া উঠিল; কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য। চক্ষু পুনরায় হাস্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

বলিলেন, আচ্ছা বেশ, নামাতে বলুন তাহলে ওগুলো।

জনার্দন সিং নিকটেই ছিল, বলিল, আপলোক ভিতর যাইয়ে, হাম বিলকুল্ বন্দোবস্ত্ কর দেতে হেঁ।

অপূর্ববাবু ও বেলা ভিতরে গেলেন।

অপূর্ববাবু দেখিলেন, ইহারই মধ্যে একখানি ঘর বেশ সুন্দরভাবে বেলাদেবী সাজাইয় রাখিয়াছেন। পাশের একটি ঘরে ইক্‌মিকে রান্না হইতেছে। বেলাদেবী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন কোনোরকমে মাথা গোঁজবার একটি জায়গা জোগাড় করেছি। আমার সবচেয়ে দুঃখ এইটে যে আপনাকে ছাড়তে হল। আমার আর একটা টিউশনি জোগাড় হলেই আবার আপনাকে খবর দে আমি। আরও শিখতে চাই।

অপূর্ববাবু যেন কৃতার্থ হইয়া গেলেন।

টাকার কথা পেড়ে আমাকে লজ্জা দেবেন না, মানে আপনার যদি দরকার হয়, এমনিই এে আমি—মানে, সন্ধ্যাবেলাটা ফ্রিও আছি আজকাল—

সন্ধ্যাবেলা আমি যে ফ্রি নেই। তা ছাড়া বিনা পয়সায় আপনাকে আমি খাটাব কেন, বাঃ!

না না, তার জন্য কি হয়েছে? পয়সাটাকেই সব সময় প্রমিনেন্স দেওয়াটা—অর্থাৎ—

অপূর্ববাবু গলা-খাঁকারি দিয়া নীরব হইলেন।

চা খাবেন এক কাপ?

বেশ তো, যদি আপনার অসুবিধে না হয়।

না, অসুবিধে আবার কিসের?

বেলা নূতন প্রাইমাস স্টোভটি জ্বালিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে, বোধহয় অজ্ঞাতসারেই তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইতে লাগিল এবং ওপরের দাঁত কয়টি অধরকে দংশন করিতে লাগিল অপূর্ববাবু নীরবে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। নিতান্ত নীরবতার মধ্যেই চা-প্রস্তুত পর্ব শেষ হইল চা পান করিতে করিতে অপূর্ববাবু ভাবিতে লাগিলেন, বেলাকে বিনা পয়সায় পড়াইলে তি কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না—এই কথাটি ঠিক কীভাবে বলিলে বেলার পক্ষে কন্‌ভিন্‌সিং হইবে অর্থাৎ—

আপনি যাবার সময় একখানা চিঠি নিয়ে যাবেন, দাদাকে দেব। আপনি চা খান ততক্ষণ, আ লিখে নিয়ে আসি ওঘর থেকে।

বেলাদেবী পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। নিজের ছোট কিন্তু সুন্দর করিয়া সাজানো টেবিলটি ওপর দুই কুনুইয়ের ভর দিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাহার পর লিখিলেন—

দাদা,

অপূর্ববাবুর কাছে তোমাকে খাটো করবার ইচ্ছে হল না বলেই জিনিসগুলো ফেরত দিলাম ন কিন্তু ওগুলো আমি ব্যবহার করতে পারব না, ওসব পড়ে থাকবে। নতুন বউদিদির যদি গা বাজনার শখ থাকে, এস্রাজ আর সেতারটা কাজে লাগতে পারে হয়তো। আমি ভদ্রভাবে মা গোঁজবার একটা জায়গা পেয়েছি, আমার জন্যে অনর্থক ভেবে তুমি ব্যস্ত হয়ো না। আমার এক পেট চলে যাবেই। ইতি—

প্রণতা বে

খামে মুড়িয়ে পত্রখানি অপূর্ববাবুর হাতে আনিয়া দিতেই একটু ইতস্তত করিয়া রুমাল দি বারকয়েক ঘাড় মুখ মুছিয়া অপূর্ববাবু অবশেষে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বসিয়া থাকিবার আর কো সঙ্গত অজুহাত নাই।

মিস মল্লিক, গানের জন্যে আমাকে যদি আপনার দরকার হয়, তা হলে অন্‌হেজিটেটিং মানে—

আচ্ছা, দরকার হলে খবর দেব।

নমস্কার করিয়া অপূর্ববাবু বাহির হইয়া পড়িলেন।

একটু পরেই প্রফেসার গুপ্তের মোটরখানা আসিয়া দাঁড়াইল। প্রফেসার গুপ্ত জনার্দন সিংয়ের পুরাতন মনিব। সুতরাং সে সেলাম করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। প্রফেসার গুপ্ত মোটর হইতে নামিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, মাঈজিকে একটু খবর দাও।

জনার্দন ভিতর চলিয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আপ্ জেরাসে ঠহর যাইয়ে হুজুর, মাঈজি আস্নান কর্ রহি হয়।

প্রফেসার গুপ্ত বাহিরের ঘরটিতে উপবেশন করিয়া রহিলেন। বেলার এখানে এখন আসিবার তাঁহার কোনোই প্রয়োজন নাই, কিন্তু প্রয়োজন নাই বলিয়াই আকর্ষণ বেশি। প্রয়োজনীয় কত জিনিসই তো করিবার আছে, কিন্তু করা হয় নাই। বেলার নিকট কোনো প্রয়োজন নাই, দেখা করাটাই প্রয়োজন। বাড়িতে ডিস্পেপ্সিয়া-গ্রস্ত খিটখিটে প্রৌঢ়া গৃহিণীর নানারূপ গঞ্জনা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া পলাইয়া বেড়ানোটাই প্রফেসার গুপ্তের স্বভাব। তিনি পারতপক্ষে বাড়িতে থাকেন না। খুঁটিনাটি তুচ্ছ জিনিস লইয়া কচকচি তাঁহার ভালই লাগে না। সুযোগ পাইলেই মোটরখানা লইয়া বাহির হইয়া পড়েন। সম্প্রতি বেলার বাসাটি তাঁহার আড্ডা দিবার স্থান হইয়াছে। বেলা মেয়েটিকে এখনও কিন্তু তিনি বেশ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। মেয়েটি কেমন যেন একটু রহস্যময়। কেমন যেন একটা স্বচ্ছ অথচ দুর্ভেদ্য আবরণের অন্তরালে বাস করেন। তাঁহার লীলা-চঞ্চল সজীবতা, উচ্ছল যৌবন-ভঙ্গিমা, পরিহাস-মুখর কথাবার্তা মনকে উতলা করিয়া তোলে, কিন্তু হাত বাড়াইলেই কোথায় যেন ঠেকিয়া যায়। ব্যবধানটা ঠিক যেন কাচের প্রাচীর, স্বচ্ছ অথচ শক্ত—সব দেখা যায়, কিন্তু অগ্রসর হইবার উপায় নাই। সেইজন্যই বোধহয় মনকে আরও লোলুপ করিয়া তোলে। প্রফেসার গুপ্ত এখনও ঠিক লোলুপ হইয়া ওঠেন নাই, কিন্তু মনে মনে অতিশয় ঔৎসুক্যভরে তিনি এই তরুণীটিকে লক্ষ্য করিতেছেন। বেলার শুধু যে তারুণ্য আছে তাহা নয়, বৈশিষ্ট্যও আছে।

স্নান সমাপন করিয়া বেলা আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

আপনি এমন সময় হঠাৎ যে আজ?

প্রফেসার গুপ্ত কয়েক সেকেন্ড কোনো উত্তরই দিলেন না, চুপ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন।

হঠাৎ? আজকের আসাটাকে 'হঠাৎ' বলে মনে হল যে হঠাৎ?

এমন সময় আর কোনোদিন আসেন না তো?

আজ রবিবার, ছুটি আছে। নিছক গল্প করতেই শুধু আসিনি, কাজের কথাও আছে। অচিনবাবু বলে যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে আপনি কথাবার্তা চালাচ্ছেন, সেটা বন্ধ করে দিন।

কথাবার্তা বিশেষ চালাইনি, একটা শুধু দরখাস্ত করেছি।

ওর সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখবেন না, খবর পেলাম, লোকটা সুবিধের নয়।

তাই নাকি?

প্রশ্ন করিয়া বেলা ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। তাহার পর বলিলেন, আমাকে এখুনি এক জায়গায় বেরুতে হবে।

বেশ ও-বেলা আসা যাবে, আমারও একটা কাজ আছে গড়পারের দিকে, সেরে ফেলি সেটা। আপনি কোন্ দিকে যাবেন? ওই দিকে হয় তো আসুন, আপনাকে একটা লিফ্‌ট দিয়ে যাই।

না, ওদিকে নয়, আমি যাব ভবানীপুরের দিকে। আপনি যান।

প্রফেসার গুপ্ত চলিয়া গেলেন।

বেলা কোথাও গেলেন না, কারণ তাঁহার কোথাও যাইবার প্রয়োজন ছিল না।

।। চৌত্রিশ ।।

প্রোটোটাইপ ওরফে লক্ষ্মণবাবু অত্যন্ত উন্মনা হইয়া গড়ের মাঠে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। তাহার জীবনের প্রথম প্রেম যে স্বপ্ন-সৌধ নির্মাণ করিয়াছিল, তাহা সহসা বিচূর্ণিত হইয়া গিয়াছে। বেলা শুধু যে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন তাহা নয়, তিনি পাড়া ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আকস্মিক অন্তর্ধানের কারণ প্রিয়বাবুকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ হয়। ভদ্রলোক কেমন যেন একরকম হইয়া গিয়াছেন। বেলার কথা জিজ্ঞাসা করিলে কেমন যেন অর্থহীনভাবে চাহিয়া থাকেন এবং শেষে অসম্ভব রকম একটা উত্তর দিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়েন। লক্ষ্মণবাবু দুইবার প্রশ্ন করিয়া দুই রকম উত্তর পাইয়াছেন। প্রিয়বাবু প্রথমবার বলিয়াছিলেন যে, বেলা মামার বাড়ি গিয়াছেন, দুই-চারি দিন পরেই ফিরিয়া আসিবেন। দুই-চারি দিন পরে বেলা যখন আসিলেন না, তখন লক্ষ্মণবাবু অতিশয় সঙ্কোচভরে পুনরায় প্রশ্ন করিয়া যে উত্তর পাইয়াছে, তাহা মর্মান্তিক। অত্যন্ত তিক্তকণ্ঠে প্রিয়বাবু বলিয়াছেন, আপনাদের পাঁচজনের জন্যেই তো সে চলে গেল। সে ঠিক করেছে, চাকরি করে স্বাধীনভাবে থাকবে।

আমাদের জন্যে?

প্রিয়বাবু কোনো উত্তর না দিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

লক্ষ্মণবাবু কিন্তু সেই হইতে কথাটা চিন্তা করিতেছেন। তাহার নিজের মনেও ক্রমশ সন্দেহটা দৃঢ়তর হইতেছে। বেলা হয়তো উত্যক্ত হইয়াই চলিয়া গিয়াছেন। এ কথা তো সে নিজের কাছে অস্বীকার করিতে পারে না যে, বেলাকে একবার দেখিবার জন্য, তাঁহার গান শুনিবার জন্য সে নানা ছুতায় জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইত। কোনো অজুহাতে বেলার সান্নিধ্যলাভ করিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিতে পারিলে সে ধন্য হইয়া যাইত। হয়তো তাহার এই মনোযোগ বেলার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল; হয়তো তাহার এই কাঙালপনার জন্য বেলা মনে মনে তাহাকে ঘৃণা করিতেন। লুব্ধ ভিখারিকে এড়াইবার জন্য লোকে যেমন সরিয়া যায়, বেলাও হয়তো তেমনই তাহার পথ হইতে সরিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্মণবাবু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আলোকিত চৌরঙ্গির বিচিত্র সৌন্দর্য, দ্রুতগামী অসংখ্য মোটর, নানা বেশে সজ্জিত চঞ্চল জনতা —সমস্ত যেন তাহার নিকট নিরর্থক বোধ হইতে লাগিল। মনের ভাল-লাগা, মন্দ-লাগার মানদণ্ডটি সহসা যেন বিকল হইয়া গিয়াছে। মনে পড়িল, সেবার যখন অনার্স পাইল না, তখনও মনের এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল, সমস্ত পৃথিবী যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে। সে পড়াশোনায় অবহেলা করে নাই, দিন রাত্রি যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছিল, অথচ অনার্স পাইল না। কোনো আশাই তো জীবনে তাহার পূর্ণ হয় নাই। ইচ্ছা ছিল, এম. এ-টা ভাল করিয়া পাশ করিয়া অন্তত একটা ফার্স্ট-ক্লাস অর্জন করিয়া অনার্স না পাওয়ার ক্ষোভটা দূর করিতে হইবে। কিন্তু বাবা তাহাতে বাদ সাধিলেন।

বলিলেন, আর পড়াশোনা করিয়া কাজ নাই, দোকান দেখ গিয়া। পিতার অবাধ্য হইবার মতো শিক্ষা অথবা যোগ্যতা লক্ষ্মণবাবুর ছিল না। পিতার আদেশ মানিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই রূঢ় আঘাতটা কম বেদনাদায়ক হয় নাই। প্রথম শ্রেণীর এম. এ. হইয়া কোনো কলেজের অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করিবার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে সহসা ভাঙা সাইকেলের দোকানের ময়লা চটের ওপর বসিয়া ফাটা টিউব-টায়ার মেরামত করিতে লাগিয়া যাওয়া লক্ষ্মণবাবুর পক্ষে মোটেই রুচিকর হয় নাই। কিন্তু বিপত্নীক পিতার মনে কষ্ট দিবার সাধ্য লক্ষ্মণবাবুর ছিল না। মা অনেকদিন আগেই মারা গিয়াছেন, দাদাও সেদিন মারা গেলেন, বাবার মনে একটুও শান্তি নাই। দোকান দেখিবার মতো মনের অবস্থা নয়। তাঁহাকে এ অবস্থায় সাহায্য করা কর্তব্য বলিয়াও লক্ষ্মণবাবু দোকানে বসিতে রাজি হইয়াছিল। কিন্তু কই, দোকানে বসিয়াও সে বাবাকে সুখী করিতে পারিয়াছে বলিয়া তো মনে হয় না! বাবা রোজই তাহাকে অকর্মণ্য বলিয়া গালাগালি দেন, উপহাস করেন। শেষে নিজেই পুনরায় দোকানে আসিয়া বসিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

সামান্য একটা সাইকেলের দোকানের ভার লইবার মতো যোগ্যতাও তাহার নাই? সত্যই নাই। অনর্গল মিথ্যা সে বলিতে পারে না, অথচ সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে হইলে যে চরিত্রবল থাকা প্রয়োজন, তাহারও অভাব। সমস্তই কেমন যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছে। পিতার আদেশ পালন করিবার জন্য নিজের আদর্শ খর্ব করিয়াছে। কিন্তু পিতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। জীবনের জন্মলগ্নে বসিয়া কোন্ দুষ্টগ্রহ যে জীবনটাকে ছারখার করিয়া দিতেছে, তাহা জানিয়াও তো লাভ নাই। বক্সী মহাশয়কে দিয়া গ্রহস্বস্ত্যয়ন করাইয়া কি লাভ হইয়াছে? কিছু যে হইবে না, তাহা অবশ্য বক্সী মহাশয় বলিয়াছিলেন। বক্সী মহাশয়ের কথাগুলা লক্ষ্মণবাবুর মনে পড়িতে লাগিল—কুড়ি-পঁচিশ টাকা খরচ করলেই যদি রুষ্টগ্রহ তুষ্ট হত, মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা সম্ভবপর হত, তা হলে আর ভাবনা ছিল না। আপনারাও নাছোড়, আমারও টাকার দরকার—তাই এইসব প্রহসনের অভিনয় করতে হয়।

অদ্ভুত লোক এই বক্সী। স্বস্ত্যয়ন করিয়া কিছু তো হয় নাই। সহসা মৃতা জননীর মুখখানা লক্ষ্মণবাবুর মনে পড়িল। তিনি সর্বদাই যেন শঙ্কিত হইয়া থাকিতেন। ব্রত, উপবাস, আচাব, নিয়ম করিয়া তিনি আজীবন শঙ্কিতচিত্তে সকলের মঙ্গলকামনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার পিতা যে আবার বিবাহ করিয়া মায়ের স্মৃতিকে লাঞ্ছিত করেন নাই, এইজন্যই সে পিতার প্রতি এতকাল শ্রদ্ধাবান ছিল এবং তাহার গৌরবহীন আদর্শচ্যুত জীবনে পিতার পত্নী-নিষ্ঠাই একমাত্র জিনিস ছিল যাহা গৌরব করিবার মতো। কিন্তু কয়েক দিন পূর্বে তাহাও বিনষ্ট হইয়াছে। লক্ষ্মণবাবু নিঃসংশয়রূপে জানিতে পারিয়াছে, প্রতি সন্ধ্যায় পিতা তাহাকে দোকানে বসাইয়া যেখানে যান, তাহা ভদ্রপল্লী নহে। সেখানে তাঁহার একজন রক্ষিতা আছে। লক্ষ্মণবাবুর জীবনে গৌরব করিবার মতো আর কিছু রহিল না। সমস্ত জীবনটা একটা ভাঙা সাইকেলের দোকানে ময়লা চটের ওপর বসিয়া অনুতাপ করিতে করিতে কাটাইয়া দিতে হইবে। যে ব্যক্তি তাহার সাধ্বী মাতাকে প্রত্যহ এতবার অপমান করিতেছে, তাহারই খোশামোদ করিয়া, তাহারই সঞ্চিত সম্পত্তির উত্তরাধিকারীরূপে নিজেকে ধন্য মনে করিতে হইবে। তাহার পর হয়তো কালক্রমে এক অপরিচিতা বালিকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া বেলার স্মৃতি সুগোপনে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার সহিত আজীবন প্রেমের ভান করিতে হইবে। দিব্যচক্ষে লক্ষ্মণবাবু তাহার ভবিষ্যৎ-জীবনের এই সম্ভাব্য আলেখ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। চৌরঙ্গির প্রতি সৌধশীর্ষে নানাবর্ণের আলো

জ্বলিতেছে, নিভিতেছে—আবার জ্বলিতেছে। সম্মুখের পিচ-ঢালা চকচকে রাস্তা দিয়া বিচিত্র আকারের কত মোটর আসিতেছে, যাইতেছে। জনতার স্রোত নির্বিকার সমারোহে বহিয়া চলিয়াছে। নির্নিমেষ নয়নে লক্ষ্মণবাবু মানব-নির্মিত পথের দিকে চাহিয়া রহিল। আকাশের দিকে চাহিল না। চাহিলে দেখিতে পাইত, অন্ধকার মহাশূন্য; কেবল অন্ধকারই নহে, সেখানে জ্যোতিষ্কও আছে।

।। পঁয়ত্রিশ।।

প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের হাড়ভাঙা খাটুনির পর শঙ্কর যখন হস্টেলে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার সমস্ত শরীর অবসন্ন। কিন্তু সমস্ত অবসাদ মুহূর্তে অপসারিত হইয়া গেল—যখন সে দেখিল, মিষ্টিদিদির বালক ভৃত্যটি তাহার জন্য একটি পত্র লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। তাড়াতাড়ি চিঠিখানা লইয়া সে খুলিতে গিয়া থামিয়া গেল। যদি দুঃসংবাদ থাকে? যদি মিষ্টিদিদি লিখিয়া থাকেন যে, বিবাহ হওয়া অসম্ভব? তখন সে কি করিবে? আর যাহাই করুক, প্রফেসার মিত্রের বাড়ি আর যাওয়া চলিবে না। রিনির সংস্পর্শ এড়াইয়া চলিতে হইবে। এই নিদারুণ পরিণতির কথা মনে হওয়া মাত্র শঙ্করের চতুর্দিকে অন্ধকার নামিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, কেন সে মিষ্টিদিদিকে এসব কথা বলিতে গেল? যেমন চলিতেছিল, আরও কিছুকাল তেমনি ভাবেই না হয় চলিত। আরও কিছুকাল রিনির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাহার মনের কথাটা ভাল করিয়া জানিয়া লইয়া তাহার পর কথাটা প্রকাশ করিলেই ভাল হইত। তাড়াহুড়া করিয়া সমস্ত জিনিসটাকে এমনভাবে আবিল করিয়া তোলা ঠিক হয় নাই। পত্রখানি হাতে করিয়া শঙ্কর স্পন্দিতবক্ষে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। কিন্তু বেশিক্ষণ বসিয়া থাকাও অসম্ভব। পত্রটি খুলিতে হইল —

শঙ্করবাবু,

সুসংবাদ আছে। আমাদের দিক থেকে কোনো আপত্তি উঠবে না। আপনি আপনার দিকটা সামলান। অনেক কথা আছে, যা চিঠিতে লেখা ঠিক নয়। আপনি যদি আসেন আজ একবার, বড় ভাল হয়। হ্যাঁ, আর একটা কথা। সোনা দিল্লিতে তার স্বামীর কাছে ফিরে গেছে। আপনি সেদিন সেই দুপুরে এসেছিলেন, তার পরদিনই সন্ধের ট্রেনে সোনা চলে গেল। অনেক অনুরোধ করলাম, কিছুতেই থাকল না। কি যে তার হল, জানি না। আপনি আজ সন্ধের সময় নিশ্চয় আসবেন। আমি ঘটকালি করছি, আমার কিছু মজুরি চাই, অমনই ছাড়ছি না। আসবেন নিশ্চয়ই।

—মিষ্টিদি

একবার নয়, বার বার শঙ্কর পত্রখানি পড়িল। নিজের উত্তেজনার আতিশয্যে সোনাদিদির অকস্মাৎ দিল্লি চলিয়া যাওয়ার কোনো বিশেষ অর্থ সে বুঝিতে পারিল না। বরং তাহার মনে হইল, বিবাহের সময় সোনাদিদিকে নিশ্চয়ই নিমন্ত্রণ করিতে হইবে।

সন্ধ্যার পর সে প্রফেসার মিত্রের বাড়ি গিয়া দেখিল, মিষ্টিদিদি ছাড়া বাড়িতে আর কেহ নাই। মিষ্টিদিদিও আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন না, তিনি স্নান করিতেছিলেন। সেই বালক ভৃত্যটি আসিয়া তাহাকে উপরের ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল এবং বলিল যে, মাঈজি এখনই আসিতেছেন, আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। শঙ্কর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর তাহার

নজরে পড়িল—টেবিলের ওপর কি একখানা বই রহিয়াছে। বইখানা টানিয়া লইয়া দেখিল, জেম্‌স্ জয়েসের 'ইউলিসিস'। বইটার নাম শুনিয়াছিল, পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। পিছনে এক জায়গায় পেজ-মার্ক দেওয়া ছিল, সেইখানে তাহার দৃষ্টি আটকাইয়া গেল; এবং কখন যে সে উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাবলীর স্রোতে তলাইয়া গেল, তাহা সে জানিতেও পারিল না। সম্বিত ফিরিয়া আসিলে চাহিয়া দেখিল, মিষ্টিদিদি সামনে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। ফিকে সবুজ রঙের অদ্ভুত পাতলা একটা শাড়ি তাঁহার সর্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। মন্ত্রমুগ্ধবৎ শঙ্কর চাহিয়া বসিয়া রহিল, তাহার কথা বলিবার শক্তি পর্যন্ত কে যেন অপহরণ করিয়াছে।

মিষ্টিদিদিই নীরবতা ভঙ্গ করিলেন।

খুব চটছেন তো একা বসে বসে? কি বই ওখানা, দেখি? ও, 'ইউলিসিস'। যা-তা সব গাঁজাখুরি গল্প। অমন আবার নাকি হয়? কেন যে বইখানার অত নাম, আপনারাই বলতে পারবেন। আপনারা সাহিত্যিক মানুষ।

একটু হাসি গোপন করিয়া মিষ্টিদিদি সম্মুখের চেয়ারটায় উপবেশন করিলেন ও শঙ্করের হাত হইতে বইখানা লইয়া পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ নীরবতার পর প্রশ্ন করিলেন, পড়েছেন বইটা?

না।

নিয়ে যান তাহলে। অনেক খবর পাবেন। এইবার বিয়ে করতে যাচ্ছেন, এসব খবর জানাও দরকার এখন আপনার।

শঙ্কর একটু হাসিল।

মিষ্টিদিদি তাহা দেখিয়া ছদ্ম-কোপ-কটাক্ষে হাস্য-বর্ষণ করিয়া বলিলেন, হাসছেন যে বড়? অনেক কিছু শিখতে হবে এবার। নারী নিয়ে কবিত্ব করা এক জিনিস, আর তাকে বিয়ে করে সুখী করা আর এক জিনিস।—বলিয়া লীলায়িত ভঙ্গিতে বইখানি মুড়িয়া সেটি শঙ্করের হাতে তুলিয়া দিলেন।

শঙ্কর বলিল, আপনিই বলুন না, মেয়েরা কিসে সুখী হয়? অত বড় বই পড়বার দরকার কি? আপনি তো পড়েছেন বইখানা, নিজের অভিজ্ঞতাও আছে কিছু—

মিষ্টিদিদি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, এসব ব্যাপারে পরের মুখে ঝাল খেলে কিছু হয় না। নিজের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।

বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল ও টেবিলের ওপর সেগুলি রাখিল। সে-ই ছাঁকিতে যাইতেছিল, মিষ্টিদিদি বলিলেন, আমিই ছাঁকছি, তুই নিচেয় যা, সাহেব হয়তো এখুনি আসবেন।

বেয়ারা চলিয়া গেল।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, প্রফেসার মিত্র আসবেন কখন? কোথা গেছেন তিনি?

একটু বিরক্তকণ্ঠে মিষ্টিদিদি বলিলেন, কলেজ, মিটিং, ডিনার, লেকচার, শেলি, শেক্সপিয়ার—এইসব নিয়েই আছেন উনি, আর কারও দিকে ফিরে চাইবার অবসর নেই ওঁর। একটা মানুষের চেয়ে বইয়ের আলমারিটা ওঁর কাছে বেশি দরকারি।

মিষ্টিদিদি চা ছাঁকিতে লাগিলেন।

রিনি কোথা?

শঙ্কর অবশেষে মরিয়া হইয়া প্রশ্নটা করিয়া ফেলিল। এতক্ষণ সে মনে মনে ছটফট করিতেছিল।

রিনি? আপনি আসবেন শুনেই সে পালিয়েছে।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। মিষ্টিদিদি পুনরায় হাসিয়া বলিলেন, যা লাজুক মেয়ে, দেখবেন, ওর লজ্জা ভাঙাতেই একযুগ কাটবে আপনার।

ইহার উত্তরে শঙ্কর কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

শঙ্করকে এক কাপ চা ও এক প্লেট খাবার আগাইয়া দিয়া মিষ্টিদিদি বলিলেন, আপনি জোলা পড়েছেন?

না।

মোপাসাঁ?

না।

কি পড়েছেন তাহলে?

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ।

মিষ্টিদিদি নিজের কাপে একটা চুমুক দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ভারতচন্দ্র?

না, এখনও পড়িনি।

মিষ্টিদিদি অবজ্ঞাভরে হাসিয়া বলিলেন, নিতান্ত শিশু আপনি। ফিডিং বটলে দুধ খাবার অবস্থা পার হয়নি এখনও আপনার। আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়', 'ঘরে বাইরে' পড়েছেন তো?

পড়েছি।

কেমন লেগেছে?

অতি চমৎকার।

বিমলার ওপর রাগ হয়নি তো আপনার?

না।

'নষ্টনীড়ে'র বউদিদির ওপরেও তো চটেননি?

চটব কেন? কি যে বলেন আপনি!

মিষ্টিদিদি আর কিছু না বলিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে চা-টুকু পান করিয়া ফেলিলেন।

শঙ্কর তখনও চা পান করে নাই, খাবারগুলি খাইতেছিল। মিষ্টিদিদি বলিলেন, চা খান, চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আরও খাবার আনতে বলি? প্যাটিগুলো কেমন হয়েছে? আরও আনুক দুখানা, কি বলেন?

আনুক।

মিষ্টিদিদি ঘণ্টা বাজাইলেন ও বলিলেন, গরম চা-ও একটু আনতে বলি, এ চা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বোধহয়।

হাত দিয়া শঙ্করের কাপের উত্তাপ অনুভব করিয়া মিষ্টিদিদি হাসিয়া বলিলেন, এ তো একেবারে হিম।

বেয়ারা আসিয়া প্রবেশ করিল ও আদেশ লইয়া চলিয়া গেল। শঙ্কর শেষ প্যাটিখানিতে কামড় দিয়া বলিল, সুন্দর হয়েছে প্যাটিগুলো।

মাথা নাড়িয়া মিষ্টিদিদি বলিলেন, আসলে আপনার খিদে পেয়েছে খুব।

খিদে পাবে না? সেই কখন কলেজ থেকে ফিরে মাত্র খানছয়েক লুচি খেয়েছি।

বুঝেছি, আপনার খিদে একটু বেশি। চেহারা দেখলেই তা মনে হয়।

চেহারা দেখে খিদে বোঝা যায়? আপনি ফিজিওনমিও চর্চা করেন নাকি?

তা একটু একটু করি বইকি। আপনার পুরু পুরু ঠোঁট দুটো দেখলেই মনে হয়, ভয়ানক লোভী আপনি।

মিষ্টিদিদি শঙ্করের মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। বেয়ারা আরও প্যাটি ও গরম চা দিয়া গেল।

শঙ্কর বলিল, ও প্যাটি কি আপনার বাবুর্চি তৈরি করেছে? চমৎকার করেছে কিন্তু।

আমি করেছি, সোনার কাছে শিখেছিলাম।

হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছি, সোনাদিদি হঠাৎ চলে গেলেন কেন বলুন তো?

মিষ্টিদিদি ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর বলিলেন, কি করে বলব বলুন? আপনিও সেদিন দুপুরে চলে গেলেন, সোনাও বাক্স গোছাতে বসল, পরদিনই সন্ধের ট্রেনে চলে গেল। এত করে থাকতে বললুম, কিছুতেই রইল না।

একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন, স্বামীকে ছেড়ে আছেও তো অনেক দিন, দোষও দেওয়া যায় না বেচারাকে।

মিষ্টিদিদি মুখ টিপিয়া হাসিলেন। শঙ্কর প্যাটি ও চা লইয়া ব্যস্ত ছিল, হাসিটুকু দেখিতে পাইল না। হঠাৎ মিষ্টিদিদি বলিলেন, মোপাসাঁর Une Vie পড়েননি, না?

না।

পড়ুন তা হলে। পড়া উচিত আপনার, আমার প্রাইভেট লাইব্রেরিতে আছে বইখানা, দাঁড়ান দিচ্ছি, এই ঘরেই আছে।

ঘরের কোণে একটা আলমারি ছিল, তাহার কপাটগুলাও কাঠের, কাচ নাই। মিষ্টিদিদি উঠিয়া সেই আলমারিটা খুলিয়া বই খুঁজিতে লাগিলেন। শঙ্কর দেখিল, আলমারিতে এক-আধখানা নয়, বহু পুস্তক রহিয়াছে। বই দেখিলেই শঙ্কর কেমন যেন প্রলুব্ধ হইয়া উঠে। পড়ুক আর নাই পড়ুক, উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। সে চা-টুকু এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া মিষ্টিদিদির পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। মিষ্টিদিদির পাতলা ফিকা সবুজ শাড়িটার ওপর ইলেকট্রিক আলো পড়িয়া শঙ্করের মনে কেমন যেন একটা অপরূপ মোহ সৃজন করিতেছিল। মিষ্টিদিদি হেঁট হইয়া বই খুঁজিতেছিলেন।

এই নীচের তাকেই কোথায় যে রেখেছি, মনেও থাকে না ছাই।

শঙ্কর উপরের তাক হইতে মোটা চামড়া-দিয়া-বাঁধানো একখানি বই লইয়া খুলিয়া দেখিতে গেল বইখানা কি, খুলিয়াই কিন্তু সে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল; সমস্ত শরীরের রক্তস্রোত মুহূর্তের জন্য গতিহীন হইয়া আবার উন্মাদবেগে বহিতে লাগিল। বই নয়, ফোটো-অ্যালবাম। এসব কি ফোটো? শঙ্করের সমস্ত শরীরে যেন একটা বিদ্যুৎ শিহরন বহিয়া গেল। মিষ্টিদিদি আর একটু হেঁট হইয়া বই খুঁজিতে লাগিলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় শঙ্কর অ্যালবামটা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিল। তাহার সমস্ত শরীর যেন ঝিমঝিম করিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, মিষ্টিদিদি দেখিয়া ফেলেন নাই তো? কিন্তু তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ লোলুপ হইয়া উঠিয়াছিল, যেমন করিয়া

হউক, ফোটোগুলি আর একবার দেখিতে হইবে। মিষ্টিদিদির পানে সে চাহিয়া দেখিল, মিষ্টিদিদি তেমনই হেঁট হইয়া বই খুঁজিতেছেন। ফিকা সবুজ পাতলা শাড়িটার ওপর প্রখর বৈদ্যুতিক আলো পড়িয়াছে। স্পন্দিতবক্ষে শঙ্কর বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল।

না, এ ঘরে নেই দেখছি। দাঁড়ান, নীচে আছে বোধহয়, দেখে আসি। একটুখানি বসুন আপনি, বেশি দেরি হবে না আমার।

মধুর হাসিয়া মিষ্টিদিদি বাহির হইয়া গেলেন। আলমারি খোলাই রহিল। সন্তর্পণে শঙ্কর চোরের মতো উঠিয়া গিয়া অ্যালবামটি বাহির করিয়া ফোটোগুলি দেখিতে লাগিল, রোগী যেমন করিয়া আচার চুরি করিয়া খায়।

...হঠাৎ বাহিরে পদশব্দ। শঙ্কর তাড়াতাড়ি অ্যালবামটি যথাস্থানে রাখিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিল। মিষ্টিদিদি নয়, রিনি আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইল। শঙ্করকে দেখিয়া একটু সলজ্জ অথচ গম্ভীর হাসি হাসিয়া তাড়াতাড়ি সে পাশের একটা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিষ্টিদিদিও আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

রিনি এসেছে, দেখা হয়েছে আপনার সঙ্গে? কি লজ্জা মেয়ের, কিছুতে ওপরে আসবে না।

শঙ্কর বলিল, বইটা পেলেন?

না, বইটা নীচেতেও তো নেই। এই আলমারিটাতেই তো যেন রেখেছিলাম। দাঁড়ান, দেখি আর একবার। ওদিককার ওই সুইচটা টিপে দিন তো, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না ভাল।

শঙ্কর অবশ্য আলোর অভাব অনুভব করিতেছিল না, তবু আরও একটা আলো জ্বালিয়া দিল। মিষ্টিদিদি পুনরায় বইখানা খুঁজিতে লাগিলেন। হয়তো আলোর অভাবেই এতক্ষণ বইখানা পাওয়া যাইতেছিল না, এইবার পাওয়া গেল।

মিষ্টিদিদি বইখানা শঙ্করের হাতে দিয়া বলিলেন, আর কাউকে দেবেন না কিন্তু। বইখানা একজন আমাকে উপহার দিয়েছিল। অনেক দাম ওর।

শঙ্কর বইটা খুলিয়া দেখিল, টকটকে লাল কালিতে লেখা রহিয়াছে—To sweet Ye from sweet O, নীচে প্রায় বছর পাঁচেক আগেকার একটা তারিখ।

মিষ্টিদিদি বলিলেন, বেচারি মারা গেছে। ওরই সঙ্গে প্রথমে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল।

তাই নাকি?

বইখানা পকেটে পুরিয়া শঙ্কর বলিল, যত্ন করে পড়ব। এখন উঠি।

এর মধ্যেই উঠবেন কি? রিনির সঙ্গে একটু গল্প করুন। কোনো কথাই হলো না যে।

না, অনেক রাত হয়ে গেছে, কাল আসব। আজ থাক।

বিয়ের কথা লিখেছিলেন বাড়িতে?

না, এখনও লিখিনি, লিখব এবার। ওর জন্যে কিছু ভাববেন না।

শঙ্কর উঠিয়া পড়িল ও তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। তাহার মাথার মধ্যে, মনের মধ্যে, সমস্ত শরীরের মধ্যে যাহা হইতেছিল তাহা শুধু যে অবর্ণনীয় তাহা নহে, অভূতপূর্ব। এমন উন্মাদনা তাহার জীবনে আর কখনও হয় নাই।

নেশায় টলিতে টলিতে সে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিল।

॥ ছত্রিশ ॥

যদিও মৃন্ময় হাসপাতাল হইতে ভাল হইয়া বাড়িতে আসিয়াছে, তবু হাসির মনে স্বস্তি নাই। হাঁটিতে গেলে এখনও হাঁটুতে খচখচ করিয়া যখন একটু বেদনা লাগিতেছে, তখন আরও কিছুদিন বিছানায় শুইয়া থাকিয়া একেবারে সম্পূর্ণ সারিয়া গিয়া উঠা-হাঁটা করিলেই তো ভাল হয়। কিন্তু মৃন্ময় কিছুতে তাহার কথা শুনিবে কি! ওই পা লইয়াই বিশ্ব জয় করিয়া বেড়াইতেছে। প্রতিবেশী পরেশবাবুর বাড়িতে একটি ছেলে ডাক্তারি পাশ করিয়াছে। পরেশবাবুর পিসিকে ধরিয়া অনেক বলিয়া কহিয়া একটি মালিশের প্রেসক্রিপশন হাসি লিখাইয়া লইয়াছে। ডাক্তার বলিয়াছে, এই মালিশটি দিন কয়েক ঘষিয়া ঘষিয়া লাগাইয়া দিলেই ওই সামান্য ব্যথাটুকু সারিয়া যাইবে। হাসি আজ তিনদিন ধরিয়া মালিশ আনাইয়া রাখিয়াছে, মৃন্ময়ের কিন্তু ফুরসত হইতেছে না। রোজই একটা না একটা কোনো বাধা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।

আজ হাসি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া বসিয়া আছে যেমন করিয়া হউক মালিশ করিবেই। রাত্রে শুইবার সময় মালিশ করিয়া দিলে চলে, কিন্তু মৃন্ময় তাহাতে কিছুতেই রাজি হয় না। বলে, বিছানা নষ্ট হইয়া যাইবে। প্রাণের চেয়ে বিছানা বড় হইল? অদ্ভুত লোক। অথচ দিনের বেলায় নানা কাজের ছুতায় কিছুতেই করিতে দিবে না। এমন কাজ-পাগল মানুষ হাসি আর কখনও দেখে নাই। আজ বৈকালে খাকী হাফপ্যান্ট-হাফশার্ট-পরা কে একটা মিন্‌সে আসিয়াছিল, তাহার সহিত গল্প করিতে করিতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। তাহার পর তাহারই সহিত আবার বাহির হইয়া গিয়াছে। কখন যে ফিরিবে, তাহার ঠিক নাই। মাথামুড় খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা করে হাসির। তিন দিন ধরিয়া ওষুধটা পড়িয়া আছে, পড়িয়া পড়িয়া শেষটা হয়তো খারাপ হইয়া যাইবে। ঝাঁজ চলিয়া গেলে কখনও ফল হয়?

এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা ও স্বগতোক্তি করিতে করিতে হাসি রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া তরকারি কুটিতেছিল। চিন্ময় নিজের দ্বিতলের ঘরটিতে বসিয়া পড়াশোনা করিতেছিল। মুকুজ্জেমশাই আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

পাগলী কই রে?

যান, আমি আপনার সঙ্গে কথা কইব না। আপনি আপনার অমিয়াকে নিয়ে থাকুন গিয়ে।—বলিয়া হাসি উঠিয়া একখানা আসন পাতিয়া দিল।

হাসি চাপিতে চাপিতে আসনে উপবেশন করিয়া মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, চলে যেতে বলছিস, আবার আসন পেতে দিলি যে?

ইহার উত্তর না দিয়া হাসি ঘসঘস করিয়া বেগুন কুটিতে লাগিল।

একটু পরে বলিল, ভারি ওঁর এক অমিয়া হয়েছেন, সেই ছুতোয় আর এদিকে মাড়ানোই হয় না! একেবারে সেইখানে গিয়ে বাসা বেঁধেছেন। আমরা যেন কেউ নই!

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, তোর তো বিয়ে দিয়ে দিয়েছি, কেমন সুখে আছিস। অমিয়া বেচারির বিয়েটা দিয়ে দিই, থাম। তোর তো দুঃখু নেই আর।

বিয়ে আর দিতে হবে না কারুর। বিয়ে দিয়ে ভারি স্বর্গে তুলেছেন আমাকে! এক অন্যমনস্ক

দামাল দুরন্ত লোক, কখন কি যে করে বসে তার ঠিক নেই; তাকে সামলাতে সামলাতে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার জোগাড় হয়েছে আমার।

মুকুজ্জেমশাই কিছু না বলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

হাসছেন যে বড়? থামুন, আপনার অমিয়ার সঙ্গে দেখা করে একদিন বলে দিয়ে আসছি, সে যেন কিছুতে না বিয়ে করে। এমন পাপের ভোগ আর নেই।

হঠাৎ ক্ষেপে গেলি কেন, কি হয়েছে তাই বল না?

না, ক্ষেপবে না! তিন দিন ধরে মালিশের ওষুধ নিয়ে বসে আছি, ফুরসতই হচ্ছে না বাবুর। তারপর হাঁটু ফুলে পেকে একাকার হয়ে উঠুক, আবার তাই নিয়ে ভুগি আমি কিছুদিন।

কিসের মালিশ?

আপনি আজ যেতে পাবেন না, আপনি বললে আপনার কথা শুনবে তবু। আজ মালিশ না করলে ও-ওষুধে আর ফলই হবে না। ওষুধ বেশি বাসী হয়ে গেলে কি আর ফল হয়?

আরে পাগলী, কিসের ওষুধ তাই বল্ না।

মালিশ, মালিশ। সে হাঁটুর ব্যথা এখনও সারেনি, তাই নিয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়ানো হচ্ছে। মালিশের ওষুধ আনিয়ে রেখেছি সেই কবে, আজ পর্যন্ত লাগাতে পারলাম না। আজ আপনি এসেছেন, ভালই হয়েছে, একটু বসুন, আপনি বললে আপনার কথা শুনবে।

আমাকে যে এখুনি উঠতে হবে রে!

লক্ষ্মীটি, একটুখানি বসুন, এক্ষুনি এসে পড়বে ও। তামাক খাবেন? আপনার জন্যে হুঁকো কল্‌কে তামাক টিকে সব আনিয়ে রেখেছি, কিন্তু আপনারই দেখা নেই, তামাক খাবে কে? ঠাকুরপো, ও ঠাকুরপো, নেবে এস না একবার।

চিন্ময় নামিয়া আসিল ও মুকুজ্জেমশাইকে দেখিয়া পুলকিত হইল।—আপনি কখন এলেন?

মুকুজ্জেমশাই তাহার দিকে চাহিয়া প্রথমে একটু হাসিলেন, তাহার পর বলিলেন, এই এখুনি।

হাসি চিন্ময়কে বলিল, তুমি ওঁকে নিয়ে ওপরের ঘরটায় বস গিয়ে, আমি তামাক সেজে নিয়ে যাচ্ছি এখুনি। উনি এসেই পালাই পালাই করছেন।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, কেন? বেশ তো বসে আছি।

না, এখানে বসতে হবে না, যা ঠাণ্ডা, ভিজে সপসপ করছে। আপনি ওপরেই গিয়ে বসুন।

মুকুজ্জেমশাই পুনরায় বলিলেন, তোর তরকারি কোটা হয়ে গেল?

ভারি তো তরকারি কোটা! হাতে কোনো কাজ ছিল না বলে কাল সকালকার জন্যে কুটে রাখছিলুম।

চিন্ময় বলিল, চলুন ওপরে।

মুকুজ্জেমশাইকে উঠিতে হইল।

একটু পরে কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে হাসি ওপরে আসিয়া দেখিল, বাঘ-বক্‌রির ছক পাতিয়া মুকুজ্জেমশাই চিনুর সহিত খেলিতে বসিয়াছেন। হাসি মুকুজ্জেমশাইয়ের হাতে হুঁকাটা দিয়া বলিল, দেখুন, জল ঠিক হয়েছে কি না! তাহার পর বক্রকটাক্ষে চিন্ময়ের দিকে চাহিয়া বলিল, এখন বুঝি পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে না, আমি খেলতে চাইলেই যত ক্ষতি হয়?

বাঃ, রোজ সন্ধেবেলা তোমার সঙ্গে বাঘ-বক্‌রি খেললে আমার ক্লাসের টাস্ক্ কে করে দেবে? আর ভারি তো খেলতে জানেন, খেলতে বসলেই তো হেরে যান।

তোমার মতো চুরি করতে পারি না বলেই হেরে যাই। মিথ্যুক কোথাকার, ক্লাসের টাস্ক, না হাতি। ক্লাসে তোমাদের গীতা পড়া হয়, না, আনন্দমঠ পড়া হয়? জানেন দাদামশাই, লুকিয়ে লুকিয়ে খালি যা-তা বই পড়বে বসে।

মুকুজ্জেমশাই হুঁকার জল ঠিক করিয়া এবং হুঁকার ওপর কলিকাটা স্থাপন করিয়া চক্ষু বুজিয়া ধীরে ধীরে টান দিতেছিলেন, ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত এবং মুখে মৃদু হাসি। আরও দুই-একবার টানিয়া চিন্ময়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, বাড়িতে আবার অত পড়া কেন? বাঘ-বকরি খেলাই তো ভাল। এস, এবার শুরু করা যাক, তুমি বাঘ হবে, না, বকরি?

চিন্ময় বলিল, আসুন, টস করা যাক।

হাসি বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে বলিল, টস! টস আবার কি?

একটা পয়সা দাও না তুমি। আচ্ছা থাক্, আমার কাছেই আছে একটা পয়সা।

চিন্ময় উঠিয়া টেবিলের ড্রয়ার হইতে একটা পয়সা বাহির করিল এবং যথারীতি টস করিল। চিন্ময় বাঘ হইল এবং মুকুজ্জেমশাই বকরি হইলেন। হাসি নীরবে সমস্ত ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করিতেছিল; এইবার বলিল, জোচ্চুরির নতুন একটা ফন্দি শিখেছে দেখছি। বকরি হলে ও কিছুতে পারে না, খালি হেরে যায়,—কেমন চালাকি করে বাঘ হয়ে গেল, দেখলেন?

মুকুজ্জেমশাই যেন বুঝিতে পারিয়াও কিছু বলিতেছেন না এইরূপ একটা মুখভাব করিয়া হাসির দিকে চাহিয়া বলিলেন, সব চালাকি বার করছি, দেখ না।

এতে আবার জোচ্চুরি কোথা দেখলে তুমি?

চিন্ময় খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। চিন্ময়ের অকৃত্রিম হাসির তোড়ে হাসি বেচারা একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু মুখে সে হটিবার পাত্রী নয়। বলিল, তোমাকে চিনি না আমি যেন!

খেলা চলিতে লাগিল।

হাসি মুকুজ্জেমশাইয়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার কাছে ঘেঁষিয়া বসিল।

মৃন্ময় যখন বাড়ি ফিরিল, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। মুকুজ্জেমশাই খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, চিন্ময়ও আহারাদি শেষ করিয়া শুইয়া পড়িয়াছে, হাসি কেবল একা জাগিয়া বসিয়া আছে। মৃন্ময় ভিতরে ঢুকিতেই হাসি কিছু না বলিয়া কেবল তাহার চোখের ওপর চোখ রাখিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল।

মৃন্ময় বলিল, কি, হল কি?

হবে আর কি, রোজ যেমন হয়, খাও-দাও শুয়ে পড়, মালিশটা পচুক।

দরকার কি মালিশের? ব্যথা তো কমে গেছে, প্রায় নেই বললেই হয়।

তবু একেবারে সারেনি তো? চল, আগে মালিশ করে দিই, তারপর খাবে। খুব খিদে পায়নি তো?

খিদে? না, খিদে খুব পায়নি। কিন্তু এখনও আমার একটু কাজ বাকি আছে, কদিন থেকে করাই হচ্ছে না, তাড়াতাড়ি সেরে নিই সেটা। এক্ষুনি আসছি আমি।

মৃন্ময় বাহিরের ঘরে চলিয়া গেল এবং ঘরে খিল দিয়া স্বর্ণলতাকে চিঠি লিখিতে বসিল। বাঁকা বৃন্তের ওপর রক্তজবার মতো বৈদ্যুতিক টেবিল-ল্যাম্পটি জ্বলিয়া উঠিল। লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে মৃন্ময় খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এ কয়দিন চিঠি লিখিতে পারে নাই বলিয়া সে

যেন স্বর্ণলতার কাছে অপরাধী হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল প্রায়ই চিঠি লেখায় বাদ পড়িয়া যাইতেছে। কই, আগে তো এমন হইত না! একটু ইতস্তত করিয়া সে লিখিতে শুরু করিল—

প্রিয়তমাসু,

আমার অপরাধ অমার্জনীয় তাহা জানি; কিন্তু আমি তোমাকেও জানি, সেইজন্য আমার ভয় নাই। একটা কথা আজ তোমাকে বলিতে চাই। একথা আমার সহকর্মী মিস্টার মজুমদার ছাড়া আর কেহ জানে না। হাসিকেও জানাই নাই। হাসি নিতান্ত ছেলেমানুষ, শুনিলে হয়তো কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিবে এবং বলিবে, পুলিশের চাকরি ছাড়িয়া দাও। কিন্তু তোমার জন্যই পুলিশে চাকরি লইয়াছি এবং তোমাকে যতদিন না খুঁজিয়া পাইতেছি, ততদিন এ চাকরি আমি ছাড়িব না। ইহাতে যদি আমার প্রাণ যায়, তাহাতেও আপত্তি নাই। প্রাণ তো যাইতেই বসিয়াছিল, সেই কথাই আজ তোমায় বলিব। কয়েক দিন পূর্বে আমি মোটর-চাপা পড়িয়াছিলাম। ভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছি। আমি অন্যমনস্ক লোক বটে, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অন্যমনস্কতার জন্য আমি চাপা পড়ি নাই। যে লোকটা আমাকে চাপা দিয়াছিল, সে যেন পিছু পিছু ছুটিয়া তাড়া করিয়া আমাকে চাপা দিয়া গেল। আমি বেশ বুঝিয়াছি, লোকটা ইচ্ছা করিয়াই আমাকে চাপা দিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে একবার এক ওয়েটিং-রুমে একটা লোক লুকাইয়া আমার ফোটো লইয়াছিল। তাহা জানিতে পারিয়া আমিও গোপনে তাহার ফোটো লই। সেই ফোটোর সাহায্যে মিস্টার মজুমদার আবিষ্কার করিয়াছেন যে, লোকটার নাম অচিনবাবু, মোটরের দালালি করে। লোকটার কি উদ্দেশ্য বুঝা যাইতেছে না। পুলিশে চাকরি করা বিপজ্জনক, কিন্তু তোমার জন্য আমি সমস্ত বিপদই বরণ করিব। একটা সুসংবাদও আছে। কর্তৃপক্ষ আমার শরীররক্ষী হিসাবে দুইজন সশস্ত্র লোক দিয়াছেন এবং আমাকে মোটরে ভ্রমণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন, খরচ তাঁহারাই দিবেন। একটা বড় বম্ব-কেসের অনুসন্ধানের ভারও আমার ওপর পড়িয়াছে। যদি ইহাতে দক্ষতা দেখাইতে পারি, কাজে উন্নতি হইবে। তখন তোমাকে খোঁজার আরও সুবিধা হইবে। মাঝে মাঝে আমার ভয় হয়, তোমাকে হয়তো আর খুঁজিয়া পাইব না। হয়তো তুমি আর বাঁচিয়া নাই, কিংবা হয়তো বাঁচিয়া থাকিলেও আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ। তুমি আমাকে খুঁজিতেছ কি? নানারকম অসম্ভব কথা মনে হয়। আমার এ দুর্বলতার জন্য আমাকে মাপ করিও। আমার যতদিন শক্তি আছে ততদিন তোমাকে খুঁজিব, এবং যতদিন পাগল না হইয়া যাই, তোমার আশায় থাকিব...

মৃন্ময় তন্ময় হইয়া লিখিয়া চলিল।

হাসি রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া ঢুলিতেছিল।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

শৈল আপন মনে বসিয়া আলপনা দিতেছিল। প্রতি বৃহস্পতিবার উপবাস করিয়া সে লক্ষ্মীপূজা করে, তাহারই আয়োজন চলিতেছিল। ঠাকুর-দেবতার প্রতি শৈলর খুব যে একটা ভক্তি আছে তাহা নয়, ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্যও তাহার আকাঙ্ক্ষা জাগে নাই, শৈল লক্ষ্মীপূজা করে সময় কাটাইবার জন্য। সোয়েটার বোনা, লক্ষ্মীপূজা করা, আচার জেলি প্রস্তুত করা, কার্পেটে ফুল তোলা, এমন কি ঝিয়ের মেয়ের ফ্রক বানাইয়া দেওয়া—সমস্তই শৈল করে

তাহার সত্যকার কিছু করিবার নাই বলিয়া। একা একা বসিয়া থাকিলে অন্তরের মধ্যে কেমন যেন একটা শূন্যতা অনুভব করে, এত ঐশ্বর্যের মধ্যেও সমস্ত জীবন কেমন যেন দৈন্যনিপীড়িত ব্যর্থতা বলিয়া মনে হয়। কিছুই করিবার নাই। স্বামী নিজে এমন স্বয়ং-সম্পূর্ণ যে, তাঁহার জন্য কিছু করিবার প্রয়োজন নাই; এমন কি তাঁহার জামায় বোতাম লাগাইবার পর্যন্ত প্রয়োজন হয় না। তাঁহার নিজের প্রয়োজনীয় যাহা-কিছু সমস্তই বাহিরের ঘরে থাকে, তাঁহার আপিসের চাপরাসি সে সমস্ত তত্ত্বাবধান করে; এবং তাঁহার খাস চাকরটি এমন ভাল যে, শৈলর কোনো কিছু করিবার, এমনকি দেখিবার পর্যন্ত প্রয়োজন হয় না। মিস্টার বোস হাবজা-গোবজা শাকচচ্চড়ি সুক্তো-ডালনা পছন্দ করেন না। সাহেবি খানাই তাঁহার পছন্দ। বেশি মসলা-পেঁয়াজ-দেওয়া মাংস অথবা তরকারি তিনি বরদাস্তই করিতে পারেন না। একটু ঝাল বেশি হইলেই মেজাজ এবং অর্শ বিগড়াইয়া যায়। সাহেবদের মতো রোস্ট-স্টু প্রভৃতি লঘু অথচ পুষ্টিকর আহার্যই তাঁহার খাদ্য। তরিতরকারিও শুধু সিদ্ধ করিয়া খান এবং এসব জিনিস তাঁহার বাবুর্চিই ভালমতো করিতে পারে। একেবারে মসলা না দিয়া রান্না করিতে শৈল ঠিক কেমন যেন পারে না। বাবুর্চিরা টুকিটাকি কি সব জিনিস দিয়া মাংসের রঙ গন্ধ করে, তাহা শৈলর জানা নাই। শৈল যেন ইচ্ছা করিলে এসব শিখিতে পারে না তাহা নয়, বরং সে শিখিবার চেষ্টাও একদা করিয়াছিল, কিন্তু সামান্য একটু ত্রুটি হইলেই বোস সাহেব এমন টিটকারি দিতেন যে, রাগ করিয়া শৈল শেষকালে বাবুর্চির হাতেই সব ছাড়িয়া দিয়াছে। শুধু টিটকারির জন্যই নয়, বাবুর্চি রাখাটা বোস সাহেবের স্টাইলের পক্ষেই অপরিহার্য। মিসেস বোস রান্নাঘরে উবু হইয়া বসিয়া রান্না করিতেছে, ইহা মিস্টার বোসের পক্ষে সম্মান-হানিকর। সুতরাং বাহিরের জন্য বাবুর্চি এবং অন্দরের জন্য রাঁধুনি রাখিতেই হইয়াছে। একজন পদস্থ অফিসারের পক্ষে যাহা অশোভন, তাহা কি করা চলে? গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে শৈলর প্রথম প্রথম কেমন যেন লাগিত। স্বামীকে রান্না করিয়া খাওয়াইতে পারিবে না, এ আবার কি রকম ব্যবস্থা? কিন্তু ক্রমশ এই সাহেবিয়ানা তাহার সহিয়া গিয়াছে। মেয়েদের সবই সহিয়া যায়। এখনও ক্বচিৎ-কদাচিৎ দুই-একটা শৌখিন খাবার, তাহাও জ্যাম-জেলি-প্যাটি-কাটলেট জাতীয় বিজাতীয় খাবার সে প্রস্তুত করিয়া থাকে, এবং বোস সাহেব তাহা একটু চাখিয়া প্রশংসা করিলে সে খুশি হয়। মাঝে মাঝে রান্না করিবার অর্থাৎ দিশি ধরনের রান্না করিবার শখ হইলে শঙ্করদাকে সে নিমন্ত্রণ করে। কিন্তু শঙ্করদারও আজকাল দেখা পাওয়া মুশকিল। কখন সে যে কোথায় থাকে, বলা যায় না। ...শৈলর সময় কাটে কি করিয়া? যে পাড়ায় তাহারা থাকে, তাহাও বাঙালিপাড়া নহে যে, পরনিন্দা পরচর্চা করিয়া খানিকটা সময় কাটিবে। আশেপাশে সকলেই অফিসার শ্রেণীর, সকলেই কেতা-দুরস্ত। পরনিন্দা পরচর্চা তাহারা যে করে না তাহা নহে, কেতা-দুরস্তভাবে করে। শৈল তাহা ঠিক পারে না। যখন-তখন যাহার-তাহার বাড়িতে যাওয়াই যায় না। তা ছাড়া অধিকাংশই অ-বাঙালি। হয় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, না হয় মাদ্রাজী, না হয় মারহাটি। ইংরাজিতে কথা না বলিতে পারিলে আলাপ করাই চলে না। এই সব অসুবিধার জন্য শৈল পারতপক্ষে ইহাদের সান্নিধ্য এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সময় কাটে কি করিয়া? বৃহস্পতিবারটা অন্তত লক্ষ্মীপূজার কল্যাণে ভালভাবেই কাটিয়া যায়। কিন্তু অন্য দিনগুলি যেন আর কাটিতেই চায় না। বোস সাহেব সমস্ত দিন আপিসে থাকেন, সন্ধ্যায় আসিয়াই ক্লাবে চলিয়া যান। যেদিন ক্লাবে যান না, সেদিন হয় কোনো পার্টি বা কোনো বন্ধুর বাড়িতে ডিনার থাকে। শৈলর কেমন যেন মনে হয়, এই ক্লাব-পার্টি-ডিনার প্রভৃতিও চাকরির একটা অঙ্গ। ভালভাবে চাকরি বজায় রাখিতে হইলে

ক্লাব-পার্টি-ডিনারে যোগ না দিলে চলে না। বড় বড় সাহেব-সুবো সেখানে আসে। অন্যান্য অফিসারের স্ত্রীরা কেমন তাহাদের স্বামীদের সঙ্গে পার্টিতে যায়, টেনিস খেলে, তাস খেলে, কিন্তু শৈল ঠিক ওসব পারে না। তাহার শিক্ষা-দীক্ষা অন্যরূপ । তাহার স্বামীর সঙ্গে অন্যান্য অফিসারের স্ত্রীরা কেমন স্বচ্ছন্দে হাসি, ঠাট্টা গল্পগুজব করে, সে তেমন পারে না। সে যে ইংরেজি বলিতে পারে না বলিয়াই পারে না তাহা নহে, ইংরেজি বলিতে পারিলেও সে পারিত না। যখন-তখন অমন হাসি, অমন বিস্ময়, অমন ওজন-করা ভাবভঙ্গি প্রকাশ করা তাহার সাধ্যাতীত। কিন্তু এইবার সে ঠিক করিয়াছে, ইংরেজি শিখিবে। বোস সাহেবের তাহাতে শুধু যে অমত নাই তাহা নয়, পূর্ণ উৎসাহ আছে। শৈল ঠিক করিয়াছে, শুধু ইংরেজি নয়, গানবাজনাও কিছু শিখিতে হইবে। কিছু একটা না করিলে সময় যে কাটে না। বোস সাহেব বলিতেছেন, শৈল ইংরেজিতে কথাবার্তা বলিতে পারিলে চাকরির নাকি সুবিধা হয়। উপরওয়ালা সাহেবদের সহিত শৈল যদি সহজভাবে আলাপ-টালাপ করিতে পারে, উন্নতির শিখরে উঠিবার ধাপগুলা তাড়াতাড়ি অতিক্রম করা নাকি সহজ হইবে। কি করিয়া হইবে, তাহা শৈলর বুদ্ধির অতীত। কিন্তু অপর দুই-একজন প্রতিবেশী অফিসারের উন্নতি নাকি তাহাদের পত্নীদের সাবলীল স্বচ্ছন্দতার জন্যই এত তাড়াতাড়ি হইয়াছে। ইহা সত্য, মিথ্যা অথবা সম্ভবপর কি না তাহা শৈল জানে না, কিন্তু ইহাই গুজব। কোনো অফিসারের কার্যনিপুণতার সহিত যদি একটু আপ-টু-ডেট ধরনের চটুলা পত্নী যুক্তা থাকে তাহা হইলে উপরওয়ালাদের ওপিনিয়ন নাকি তাড়াতাড়ি ভাল হয়, উন্নতির জন্য বেশি নাকি বেগ পাইতে হয় না। অর্থাৎ দাঁড়ি-মাঝি একটা নৌকাকে চালাইয়া লইয়া যাইতে নিশ্চয়ই সক্ষম, কিন্তু একখানা নিখুঁত পাল থাকিলে অনুকূল হাওয়ার মুখে আরও সুবিধা হয়। শৈল ইংরেজি শিখিতে রাজি হইয়াছে বটে কিন্তু সে বোস সাহেবকে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছে যে, সাহেব-সুবোর সঙ্গে মিশিতে-টিশিতে সে পারিবে না। সে ইংরাজি শিখিতে চায় এবং বিশেষ করিয়া এস্রাজ বাজাইতে শিখিতে চায় নিজের সময় কাটাইবার জন্য। সময়কে লইয়াই যত সমস্যা। দীর্ঘদিন এবং দীর্ঘতর সন্ধ্যা আর কাটিতে চায় না। আরও একটা কাজ সে করিয়াছে, অবশ্য খুব লুকাইয়া। ঝিয়ের মারফত সন্তান কামনায় একটি মাদুলি সে গোপনে সংগ্রহ করিয়াছে। বোস সাহেব ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছু জানেন না। এত ঘটা করিয়া লক্ষ্মীপূজা করিবার ইহাও একটা কারণ। যিনি মাদুলি দিয়াছেন, তিনি লক্ষ্মীপূজাও করিতে বলিয়াছেন। আজ বৃহস্পতিবার, শৈল উপবাস করিয়া লক্ষ্মীপূজার আয়োজন করিতেছে। এমন সময় বেয়ারা আসিয়া খবর দিল যে, মিস মল্লিক বাহিরের ঘরে আসিয়াছেন, সাহেব তাঁহাকে সেলাম দিতে বলিলেন। শৈল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, বাইরের ঘরে আর কেউ আছে?

না।

এই আলপনাটুকু দিয়ে যাচ্ছি আমি। বলগে যা, আমার হাত জোড়া।

বেয়ারা চলিয়া গেল। শৈল খানিকক্ষণ আলপনা দিল। কিন্তু তাহার নারীপ্রকৃতি এই শিক্ষিতা এবং গীতিবিদ্যা-পারদর্শিনী মহিলাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। আলপনা অসমাপ্ত রাখিয়াই সে উঠিয়া পড়িল এবং হাত ধুইতে লাগিল। কিন্তু ড্রইংরুমে তাহাকে যাইতে হইল না, বোস সাহেবই মিস মল্লিককে সঙ্গে করিয়া ভিতরে আসিয়া হাজির হইলেন এবং ইংরেজি কেতায় পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাহার পর বলিলেন, আপনারা তাহলে আলাপ করুন, আমায়

কতকগুলো ফাইল ক্লিয়ার করতে হবে, আমি একটু আপিস-ঘরে যাই। এক্‌সকিউজ মি মিস মল্লিক।

বোস সাহেব সহাস্যে 'নড' করিয়া চলিয়া গেলেন। বেলা তাঁহার স্বাভাবিক রীতিতে অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া সবিস্ময়ে শৈলর পানে চাহিয়া রহিলেন। এত উগ্র সাহেবের পট্টবস্ত্রপরিহিতা পত্নী আলপনা দিতেছে!

শৈল হাসি মুখে বলিল, চলুন, আমরা ওপরে যাই।

চলুন।

উভয়ে উপরে চলিয়া গেল।

।। আটত্রিশ ।।

সেদিন হইতে শঙ্কর আর মিষ্টিদিদির কাছে যায় নাই। ঔদাসীন্য ইহার কারণ নয়, বরং ঠিক উল্‌টা, আগ্রহাতিশয্যের অতি-প্রবণতার প্রতিক্রিয়া। ধাবমান তুরঙ্গ ছুটিতে ছুটিতে সহসা সম্মুখে অতলস্পর্শী অলঙ্ঘনীয় গহ্বর দেখিয়া যেমন সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, বিহ্বল শঙ্করও তেমনই নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল। অগ্রসর হওয়া নিরাপদ মনে হইতেছিল না, কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা এবং মোহ তাহাকে প্রলুব্ধও করিতেছিল। এতদিন রিনিই তাহার অন্তরদেশ আলোকিত করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মানস-বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অপরূপ সুর সৃষ্টি করিতেছিল, প্রতি মুহূর্তে রিনিকে ঘিরিয়াই নানা বিচিত্র স্বপ্ন তাহার কল্পলোককে আবেশময় করিয়া তুলিতেছিল, মিষ্টিদিদি তাহার মনোজগতে কোনো বিপ্লব সৃষ্টি করেন নাই। মিষ্টিদিদি এতদিন নিতান্তই বাহিরের পরিজন ছিলেন এবং রিনির জন্যই শঙ্কর মিষ্টিদিদির সঙ্গ কামনা করিয়াছিল। কিন্তু সেদিন মুখে না বলিলেও হাবভাবে আকারে-ইঙ্গিতে মিষ্টিদিদি যেন স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। অন্তত শঙ্করের তাহাই মনে হইয়াছে। মিষ্টিদিদির এই স্বরূপ এতই ভয়ঙ্কর ও মনোরম, এতই অপ্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক, এতই প্রচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট, এতই লোভনীয় ও অনুচিত যে, শঙ্কর দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। এত দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে যে, এ কয়দিন সে কিছুই করিতে পারে নাই। দৈনন্দিন কর্তব্যকর্ম করিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহা যন্ত্রচালিতবৎ। ক্লাসে যাইতেছে, লেকচার শুনিতেছে, প্র্যাকটিগকাল ক্লাস করিতেছে, পরিচিত লোকের সঙ্গে কথাবার্তাও বলিতেছে, কিন্তু আসলে মনে মনে সে এই অতলস্পর্শী গহ্বরটার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইতস্তত করা ছাড়া আর কিছুই করিতেছে না।

বাড়িতেও চিঠি লিখে নাই। বাড়ি হইতে বাবার পত্র পাইয়াছে যে, এখন মাকে কলিকাতায় লইয়া আসা সম্ভবপর হইবে না। এ পত্র পাইয়া সে নিশ্চিন্তই হইয়াছে। নিজের মায়ের এই নিদারুণ অসুখেও সে উদ্বিগ্ন হইতে পারিতেছে না ভাবিয়া মনে মনে লজ্জিত হইতেছে, নিজেকে ধিক্কার দিতেছে, কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করিতে পারিতেছে না। চিন্তিত হইবার ভান করিয়া একখানা পত্র লিখিবে ভাবিয়াছে, তাহাও ঘটিয়া উঠিতেছে না। অর্থাৎ কোনো কিছু করিবার মতো মানসিক সক্রিয়তা তাহার নাই। তাহার সম্মোহিত মন একটা অভূতপূর্ব উন্মাদনার ঘূর্ণিপাকে যেন তলাইয়া গিয়াছে, সহজভাবে কোনো কিছু করিবার শক্তি লোপ পাইয়াছে। রিনিকে দেখিবার প্রবল বাসনা সত্ত্বেও সে রিনিদের বাড়ি আর যায় নাই। শুধু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই যে

যায় নাই তাহা নহে, মনে মনে প্রলুব্ধ হইয়াছে তো! মনের কাছে কিছুই তো অগোচর নাই! নিজের মনের এই দুর্বলতায় নিজের কাছেই সে অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছে এবং নিজের ক্ষুদ্রত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে বলিয়াই রিনির নিকট যাইতে সঙ্কুচিত হইতেছে। নিজের সঙ্কোচ তো আছেই, তাহার ওপর মাঝে মাঝে ইহাও তাহার মনে হইতেছে যে, হয়তো তাহার চোখে মুখে ব্যবহারে রিনি তাহার অপরিচ্ছন্ন মনের পরিচয় পাইবে, হয়তো ভাবিবে—কি ভাবিবে তাহা আর ভাবিতে চাহে না, জোর করিয়া অন্য কিছু ভাবিতে চেষ্টা করে। কিন্তু কল্পনার সঙ্গে জবরদস্তি চলে না। রিনির বিস্মিত ব্যথিত নির্বাক মুখচ্ছবি মানসপটে ফুটিয়া উঠে। মনে হয়, রিনি যেন তাহার কলুষিত সত্তার পানে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে, কিছু বলিতেছে না। তাহার চোখের দিকে আর সে তাকাইতে পারে না। কল্পনা করিতেও কষ্ট হয়। রিনি তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করিতেছে, ইহা চিন্তা করা তাহার পক্ষে অসহ্য। কল্পনার আকাশকুসুমে ক্ষুদ্রতম ধূলিকণা, সামান্যতম গ্লানিও স্পর্শ করিতে পারিবে না, ইহাই ছিল আদর্শ। সেই আদর্শকে সহসা মলিন দেখিয়া শঙ্কর শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।

আজ রবিবার। সমস্ত দিন কিছু করিবার নাই। গত কয়েক দিন ক্লাস প্রভৃতি লইয়া সময়টা একরূপ কাটিয়া গিয়াছে, আজ এই অস্বস্তিকর অবকাশ তাহাকে পীড়ন করিতেছে।

আশ্চর্য মানুষের মন! একই মন তাহাকে কত রকম পরামর্শই না দিতেছে! কত পরস্পরবিরোধী যুক্তি একসঙ্গে এক নিঃশ্বাসে বলিতেছে ও খণ্ডন করিতেছে। তাহার মনে পড়িল, অনেক দিন আগে সে একবার যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। তাহাতে দ্বিধাগ্রস্ত নায়কের সম্মুখে সুমতি-কুমতির তর্ক শ্রবণ করিয়া ভাবিয়াছিল, এ আবার কি অদ্ভুত কাণ্ড! যাহা কর্তব্য, যাহা ন্যায়সঙ্গত, তাহা যে কোনো সুস্থ ব্যক্তি অবিচলিত চিত্তে করিবে। শুধু যে, উচিত বলিয়াই করিবে তাহা নয়, করিয়া আনন্দ পাইবে বলিয়া করিবে। সুস্থ সবল ব্যক্তির মনে সুমতিরই স্থান আছে, কুমতির সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। নিজেকেও এতদিন সুস্থ সবল বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজ সে নিজের মনের ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। সেখানে শুধু সুমতি-কুমতি নয়, বহুপ্রকার মতি আসিয়া ভিড় করিয়াছে এবং সকলের যুক্তিই সে সমান আগ্রহে শুনিতেছে। তাহার কার্যের সমর্থক একটা যুক্তিই কিন্তু ক্রমশ মনের মধ্যে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছিল। বৈজ্ঞানিক মন লইয়া সে ভাবিতেছিল, পুরুষত্বের জন্য লজ্জিত হইবার কি আছে? যে লোলুপ কামনা তাহার মনের মধ্যে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রেরণা যোগাইতেছে প্রকৃতি। প্রকৃতির বিরুদ্ধে কতক্ষণ মানুষ যুদ্ধ করিতে পারে? সমাজ সংস্কার সমস্তই কৃত্রিম। কৃত্রিমতার জবরদস্তিতে অকৃত্রিম পৌরুষকে, বলিষ্ঠ যৌবনের ন্যায্য দাবিকে অস্বীকার করিবার কোনো সঙ্গত হেতু নাই।

আর একটা কথাও সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইতেছিল। মিষ্টিদিদিকে সে যাহা ভাবিতেছে, তিনি তাহা নাও হইতে পারেন। জোলা, মোপার্সাঁ পড়িলেই যে খারাপ হইতে হইবে অথবা কতকগুলি ছবি গোপনে রাখিলেই যে নিঃসন্দেহে তাহা দুশ্চরিত্রের প্রমাণস্বরূপ ধরিয়া লইতে হইবে—এমন কোনো ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। নিছক আর্ট-প্রীতির বশেই এসব করা অসম্ভব নহে। অকারণে হয়তো সে...। তাহার মনের মধ্যে একটা লুব্ধ পশু, একটা ক্ষুব্ধ ঋষি এবং একটা আর্ত প্রেমিক পাশাপাশি বসিয়া তিন রকম চিন্তা করিতে লাগিল। প্রেমিক চিন্তা করিতেছিল না, ধ্যান করিতেছিল,

প্রার্থনা করিতেছিল—এ সমস্তই একটা দুঃস্বপ্নের মতো মিলাইয়া যাক। নির্মল মনের মধ্যে রিনির হাস্য-স্নিগ্ধ সলজ্জ মুখখানি সগৌরবে আবার বিরাজ করিতে থাকুক।

সহসা বাহিরে পদশব্দ হইল।

শঙ্কর ফিরিয়া দেখিল, মিষ্টিদিদির বালক-ভৃত্যটি পত্র লইয়া আসিয়াছে। সেলাম করিয়া জানাইল, মাঈজি জবাব চাহিয়াছেন।

শঙ্কর খুলিয়া পড়িল—

শঙ্করবাবু,

এর মধ্যেই যে পুরোদস্তুর জামাই হয়ে উঠলেন দেখছি, নেমন্তন্ন না করলে আর আসাই হয় না! রিনি বেচারা কয়েক দিন থেকে মনমরা হয়ে আছে, আমার কথা আর নাই বললাম। উনি কাল এক বন্ধুর সঙ্গে গিরিডি গেলেন এই উইক-এন্ডটা কাটিয়ে আসতে। ভারি একা লাগছে আমাদের। আজ সন্ধেবেলা আসবেন নিশ্চয়ই। খাওয়া-দাওয়া এখানেই করবেন। আপনাদের সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্টের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। তাঁকে ফোন করে আজও রাত্তিরের মতো ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছি। আসবেন কিন্তু নিশ্চয়ই। কটা নাগাদ আসবেন, এর মারফত জানাবেন। প্রস্তুত থাকব। —ইতি

মিষ্টিদিদি

চাকরের হাতেই জবাব দিতে হইল, বেশিক্ষণ গবেষণা করিবার অবসর মিলিল না। লিখিয়া দিল, সন্ধ্যা সাতটায় যাইবে। ব্যাপারটার একটা সুনিশ্চিত মীমাংসা হইয়া যাওয়ায় মনের ভার লাঘব হইয়া গেল। টেবিলে আঙুলের টোকা দিতে দিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া সে অপটুভাবে শিস দিতে লাগিল।

।। উনচল্লিশ ।।

ওরিজিনাল অর্থাৎ দশরথ সাইকেলের দোকানে বসিয়াছিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার বেশবাস আগের মতই—টাইট-ফিটিং গলা-বন্ধ চকোলেট রঙের সোয়েটার, খাকি হাফপ্যান্ট, পায়ে আজানু কপিশবর্ণের মোজা, মাথায় কান-ঢাকা কালো রঙের টুপি। প্রতিদিনকার অভ্যাসমত তিনি চেয়ারে বসিয়া গড়গড়া হইতে ধূমপান করিতেছিলেন।

ভণ্টু আসিয়া উপস্থিত হইল। ভণ্টুরও সেই সাবেক মূর্তি। মালকোঁচা-মারা ধুতি, গায়ে বুকখোলা জামা এবং পার্শ্বে সাইকেল। ভণ্টু যথাবিধি নমস্কার করিয়া (ওরিজিনালের পায়ের ধূলা লইবার ইচ্ছা এবং সাহস ভণ্টুর কোনোদিন হয় নাই) বিনীত ভদ্রভাবে বলিল, লক্ষ্মণবাবুর সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল।

ওরিজিনাল কোনো উত্তর না দিয়া একদৃষ্টে খানিকক্ষণ ভণ্টুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভণ্টু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল যে, ওরিজিনালের চোখ দুইটি লাল, হঠাৎ দেখিয়া মনে হয়. চোখ উঠিয়াছে। হয়তো বরাবরই তাঁহার চক্ষুর বর্ণ এইরূপ, কারণ ভণ্টু ইতিপূর্বে এত কাছে আসিয়া তাঁহার চক্ষু লক্ষ্য করিবার সুযোগ পায় নাই। ওরিজিনালকে চিরকালই সে দূরে পরিহার করিয়া চলিয়াছে। লক্ষ্মণবাবুর সহিতই তাহার কারবার এবং তাহা এ যাবৎ ওরিজিনালের অগোচরেই হইয়াছে। গত তিন-চার দিন হইতে সে কিন্তু লক্ষ্মণবাবুর পাত্তা পাইতেছে না। নিবারণবাবুর চায়ের

দোকানে রাত্রি দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ভণ্টু দেখিয়াছে, লক্ষ্মণবাবু সন্ধ্যার সময় আসে না। লক্ষ্মণবাবুর বাড়িটাও ঠিক কোন্‌খানে, তাহা ভণ্টুর জানা নাই। সাইকেলের দোকানেই তাহার সহিত আলাপ হইয়াছিল এবং প্রয়োজন হইলে এই সাইকেলের দোকানেই তাহার সহিত দেখা হইত। গত দুই দিন হইতে কিন্তু প্রোটোটাইপের দেখা নাই। হয়তো তাহার দোকানের ডিউটির সময় বদলাইয়াছে, হয়তো আজকাল সে সন্ধ্যায় না আসিয়া দুপুরে আসিতেছে। ব্যাপারটা ঠিক জানিয়া লওয়া দরকার, কারণ সাইকেলটি পুনরায় অচল হইয়া পড়িয়াছে। অবিলম্বে প্রোটোটাইপের হদিস না পাইলে হাঁটিয়া অফিস যাইতে হইবে। নিতান্ত বাধ্য হইয়াই তাই আজ ভণ্টুকে ওরিজিনালের সম্মুখবর্তী হইতে হইয়াছে।

ওরিজিনাল কোনো উত্তর দিলেন না। রক্তচক্ষু মেলিয়া ভণ্টুর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন।

ভণ্টু অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিল এবং পুনরায় সবিনয়ে বলিল, লক্ষ্মণবাবুর সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল।

আমি কি লক্ষ্মণবাবু?

এ প্রশ্নের জন্য ভণ্টু প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর সে অবিলম্বে দিল, আজ্ঞে না।

তা হলে আমার কাছে ঘুরঘুর করছেন কেন?

লক্ষ্মণবাবু কখন দোকানে আসেন, তাই জানতে চাইছিলাম।

তিনি দোকানে আর আসেন না, আসবেনও না।

কোথায় তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে তা হলে?

দেখা হবে না।

ওরিজিনাল আবার তাঁহার গড়গড়ায় মন দিলেন।

ভণ্টু বুঝিল, এখন সুবিধা হইবে না, ভদ্রলোক চরম তিরিক্ষি হইয়া রহিয়াছেন। সে সাইকেলটি ঠেলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, ওরিজিনাল বলিলেন, লক্ষ্মণবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হলে বসুন ওইখানে।

ওরিজিনাল বাম হস্ত দিয়া তাঁহার গোঁফদাড়িটা একবার চুমরাইয়া লইলেন এবং নাক দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে দোকানের সম্মুখে ফুটপাতের ওপর যে টিনের চেয়ারটি ছিল, সেইটি দেখাইয়া পুনরায় বলিলেন, ওইটে একটু এদিকে টেনে এনে বসুন। সাইকেল সারাবেন তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু এখন নয়, পয়সা সঙ্গে নেই। কত পড়বে, সেইটে লক্ষ্মণবাবুর কাছে জেনে নিতে এসেছিলাম।

আমি বলে দিচ্ছি। যে সাইকেলের দোকানে লক্ষ্মণবাবু নেই, সে সাইকেলের দোকান কি চলছে না?

নীরব থাকাই ভণ্টু সমীচীন মনে করিল।

ওরিজিনাল পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, বলুন আপনি, সে সাইকেলের দোকান কি চলছে না?

আজ্ঞে হ্যাঁ, চলছে বইকি।

ওরিজিনাল তাঁহার রক্তচক্ষু দুইটি ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া গড়গড়ায় সুদীর্ঘ একটি টান

দিলেন এবং আদেশ করিলেন, মটরা, সাইকেলটা তুলে দেখ্, কি করতে হবে আর কত পড়বে! আপনি বসুন, চেয়ারটা আর একটু টেনে আনুন এদিকে।

পিছনের ঘর হইতে লুঙ্গি-পরা মটরা বাহির হইয়া আসিয়া ফুটপাতের ওপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই সাইকেলটি পর্যবেক্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু ওরিজিনালের ধমকে নিরস্ত হইল। ওরিজিনাল দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন, সাইকেলটা দোকানের ওপর তুলতে কি কষ্ট বোধ হচ্ছে বাবুর? গতরে কি আগুন লেগেছে হুজুরের?

মটরা অবিলম্বে সাইকেলটা দোকানের ওপর তুলিয়া ফেলিল এবং কাঠের আলনার মতো জিনিসটার ওপর চাপাইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল।

ভণ্টু বলিল, সামনের চাকার টায়ার-টিউব দুটোই নষ্ট হয়েছে, পেছনের চাকার অ্যাকসেলের নাটটাও বদলাতে হবে। এখন থাক্, পয়সা সঙ্গে আনিনি—

বেশ তো, কাল পয়সা দিয়ে নিয়ে যাবেন, কটার সময় চাই কাল?

কাল সকালবেলা পেলেই ভাল হয়।

বেশ, সকালেই পাবেন, তৈরি থাকবে।

মটরা বলিল, নতুন টায়ার ফুরিয়েছে।

চৌধুরীর ওখান থেকে নিয়ে এস গিয়ে। যাও, এখুনি যাও, কাল সকালেই ওঁর চাই।

সিলিপ দেবেন?

এক ডজন টায়ারের অর্ডার আমার দেওয়াই আছে, গেলেই পাবে তুমি, পা চালিয়ে যাও।

মটরা চলিয়া গেল।

ওরিজিনাল গড়গড়ায় মন দিলেন। ভণ্টুও উঠিবে কি না ভাবিতেছিল, এমন সময় ওরিজিনাল তাহাকে একটি কঠিন প্রশ্ন করিয়া বসিলেন।

পৃথিবীতে ক রকম লোক আছে জানেন?

মঙ্গোলীয়, ককেসীয়, নিগ্রো প্রভৃতি কয়েক রকম শ্রেণীবিভাগের কথা ভণ্টু পাঠ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সব তাহার মনে ছিল না। নিজের বিস্মরণ-শক্তির পরিচয় দিবার তাহার ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং সে সাধারণভাবে বলিল, অনেক রকম।

অনেক রকম নয়; দু রকম —জুয়াচোর আর খাঁটি।

ভণ্টু স্তম্ভিত হইয়া ওরিজিনালের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। ওরিজিনাল বলিয়া চলিলেন, জুয়াচোরের সংখ্যাই অধিক। খাঁটির সংখ্যাই অল্প। অল্প কয়েকটি খাঁটি লোক একদল জুয়াচোরের পাল্লায় পড়ে অহরহই কষ্ট পাচ্ছে, এইটেই হলো সার কথা।

এই সারকথা শুনিবার জন্য ভণ্টু প্রস্তুত ছিল না, আগ্রহান্বিতও ছিল না। কিন্তু ওরিজিনালকে কথায়-বার্তায় সন্তুষ্ট করিতে পারিলে ভবিষ্যতে হয়তো সুবিধা হইতে পারে, এই ভাবিয়া সে তাহার প্রিয় বচনটির পুনরুক্তি করিল। এই জাতীয় লোকের কাছে এই বচনটি আওড়াইয়া ভণ্টু প্রায়ই সুফল পাইয়াছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, সে কথা আর বলতে, মহাভারতের আমল থেকে এ ঘটনা ঘটে আসছে।

ওরিজিনালও মহাভারত হইতে উদাহরণ আহরণ করিয়া বলিলেন, গোটা মহাভারতে মাত্র দুটি খাঁটি লোকের দেখা পাবেন, দুর্যোধন আর ভীম। বাকি সব জুয়াচোর।

ভণ্টু আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, উঠিয়া ওরিজিনালের পদধূলি লইয়া মাথায় দিল।

ও কি?

পায়ের ধুলো নিলাম আপনার, এমন ভাল কথা একটা শোনালেন।

ওরিজিনাল ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভণ্টুর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, বুঝিবার চেষ্টা করিলেন যে ভণ্টু ব্যঙ্গ করিল কি না! কিন্তু ভণ্টু সুদক্ষ অভিনেতা, সমস্ত মুখচ্ছবিতে এমন একটা গদগদ শ্রদ্ধার ভাব ফুটাইয়া তুলিল যে, শেষ পর্যন্ত ওরিজিনাল মনে মনে পুলকিত না হইয়া পারিলেন না। মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন দেখিয়া ভণ্টু বলিল, ওর জন্যে কিছু মনে করবেন না, আপনি লক্ষ্মণবাবুর বাবা, আপনার পায়ের ধুলো নিলে দোষ আর এমন কি আছে? লক্ষ্মণবাবু আমার বন্ধু।

ওরিজিনাল মুখ ফিরাইয়া গড়গড়াতে আর একটা টান দিলেন এবং তাহার পর বলিলেন, আপনার বন্ধুটি একটি প্রকাণ্ড জুয়াচোর ছিলেন।

কে, লক্ষ্মণবাবু?

হ্যাঁ, লক্ষ্মণবাবু।

মানে?

মানে, আমি তাদেরই জুয়াচোর বলি, যাদের মনে মুখে এক নয়, যারা ভাবে একরকম, করে আর এক রকম। গাঁটকাটাদের আমি জুয়াচোর বলি না, তারা খাঁটি লোক।

জুয়াচোরের এবম্বিধ সংজ্ঞা ভণ্টু এই প্রথম শুনিল। তাহার ইচ্ছা হইল, ওরিজিনালের আর একবার পদধূলি সে লয়, কিন্তু ওরিজিনালের কথাবার্তায় এমন একটা আন্তরিকতা ক্রমশ ফুটিয়া উঠিতেছিল যে, তাঁহাকে অপদস্থ করিতে ভণ্টুর ইচ্ছা হইল না। ওরিজিনাল গড়গড়ায় আবার একটা টান দিয়া বলিলেন, দেখুন, আমি বেশ্যাসক্ত। রীতিমতো মাইনে দিয়ে একজন রক্ষিতাকে আমি রেখেছি, তার কারণ স্ত্রীবিয়োগের পর দেখলাম, ওসব সংযম-টংযম আমার দ্বারা পোষাবে না, বিয়ে করাও পোষাবে না, তাই আইনত যেটা অন্য উপায় আছে, সেইটেই আমি নিলাম। পেটে খিদে মুখে লাজ—এ রকম ভণ্ডামির কোনো মানে আমি বুঝি না। এতে কি যে এমন চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যায়, তাও আমার মাথায় আসে না। তুইও একটা রাখলে পারতিস, যার তার আনাচে কানাচে অমন ছুং ছুং করে না বেড়িয়ে পছন্দমতো একটা মেয়েমানুষ রাখলেই পারতিস। টাকার তো অভাব ছিল না, ন্যায্য খরচে আমি আপত্তিও করিনি কোনো দিন।

ওরিজিনাল পুনরায় গড়গড়ায় টান দিলেন।

ভণ্টু অবাক হইয়া শুনিতেছিল। ওরিজিনালের এই স্বীকারোক্তির প্রকৃত তাৎপর্য সে ঠিক ধরিতে পারিতেছিল না।

হঠাৎ ওরিজিনাল বলিয়া উঠিলেন, জুয়াচোর, পাজি, নচ্ছার! এতকাল খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলাম, এত বড় একটা দাগা দিতে লজ্জা করল না ওর? উনি আবার লেখাপড়া শিখেছিলেন, কচু শিখেছিলেন! গ্র্যাজুয়েট! ঝাড়ু মারি আমি অমন গ্র্যাজুয়েটের মাথায়।

ভণ্টু ভাবিল, প্রোটোটাইপ নিশ্চয় কিছু টাকা মারিয়া সরিয়াছে। কি ভাবে কি ঘটিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া সহসা ভণ্টু লক্ষ্য করিল যে, ওরিজিনালের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছে এবং তিনি নিষ্পলকভাবে সামনের দেওয়ালটার দিকে চাহিয়া আছেন। কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া ভণ্টু বলিল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার কথা।

ওরিজিনাল হঠাৎ যেন ক্ষেপিয়া উঠিলেন।

খাঁটি লোকের কথা জুয়াচোরেরা বুঝতে পারে না, আপনি বুঝবেন কি করে? আপনি তো লক্ষ্মণেরই বন্ধু! আমার এই পোশাক দেখে আপনারা হাসেন, কিন্তু আমার শীত করে বলে এই পোশাক আমি পরি। লোকের মন রাখবার জন্যে আপনার মতো বুক-খোলা জামা পরে শীতে কেঁপে মরি না। আপনাদের মতো ময়্যাল সেজে ভদ্দরলোকের বাড়ির জানালার পানে হাঁ করে চেয়ে থাকি না, সোজা বেশ্যাবাড়ি যাই। আমি ক্ষিদের সময় চাই খাবার, চা নয়। চটলে লাথি মারি, ভালবাসলে জড়িয়ে ধরি। ঢাক্‌-ঢাক্‌, গুড়-গুড় পছন্দ করি না। আমার কথা আপনারা বুঝবেন না কোনো জুয়াচোরই কোনো খাঁটি লোকের কথা বোঝেনি, বুঝতে পারবে না—পারবে না—পারবে না।

ওরিজিনাল প্রায় আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। ভণ্টু ভয় পাইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ওরিজিনালের হাত দুইটি ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিল, আপনি অমন করছেন কেন, কি হয়েছে খুলে বলুন না, লক্ষ্মণবাবু কি করেছেন?

রাস্‌কেল আত্মহত্যা করেছে। ভেবেছে, আমাকে দমিয়ে দেবে। কিন্তু দমবার লোক আমি নই।

ওরিজিনাল দুই হাত দিয়া চক্ষু দুইটি কচলাইতে লাগিলেন।

নির্বাক ভণ্টু দাঁড়াইয়া রহিল, কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

।। চল্লিশ।।

শঙ্কর দ্রুতবেগে পথ অতিবাহন করিতেছিল।

এত দ্রুতবেগে যে, মনে হইতেছিল, কেহ তাহাকে তাড়া করিয়াছে, সে ছুটিয়া পলাইতেছে। যে পথে সে চলিতেছিল, তাহা অপেক্ষাকৃত জনবিরল, যান-বাহনের তেমন ভিড় নাই, থাকিলে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া যাওয়া অসম্ভব ছিল না, কারণ শঙ্কর পথ দেখিয়া চলিতেছিল না। আত্মরক্ষার জন্য, যে অদৃশ্য শত্রুটা তাহাকে তাড়া করিয়া ফিরিতেছে তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য শঙ্কর উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে। লক্ষ্য ঠিক নাই, গন্তব্যপথ অনির্দিষ্ট, কোথাও পলাইয়া লুকাইতে পারিলেই সে যেন বাঁচে। কিন্তু ইহাও সে বুঝিতেছে, কোথাও পলাইবাব তাহার উপায় নাই, কোথাও লুকাইয়া সে নিস্তার পাইবে না, কারণ শত্রু নিজের মধ্যেই রহিয়াছে; যে বৃশ্চিকটা তাহাকে দংশন করিয়াছে, তাহার বাসা তাহার হৃদয়-বিবরেই, অন্য কোথাও নহে। কিন্তু ছি ছি, কি লজ্জা, কি লজ্জা, কি অপরিসীম লজ্জা—রিনি দেখিয়া ফেলিয়াছে! তাহার মহিমার ছদ্ম মুখোশটা খুলিয়া যে মুহূর্তে ক্লিষ্ট কদর্য পশুটা আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই রিনি তাহার স্থূল রূপটা দেখিয়া ফেলিয়াছে। উত্তেজনার আধিক্যে ওদিককার জানালাটা বন্ধ করা হয় নাই।

এতদিনকার সাধের প্রাসাদ নিমেষের মধ্যে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। অতর্কিতে একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্প আসিয়া সব যেন ওলট-পালট করিয়া দিয়াছে, কোনো কিছুর ওপর নির্ভর করিবার আর যেন সাহস নাই। এতদিনকার সমস্ত নীতি, সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত যুক্তি, সমস্ত শক্তি অপ্রত্যাশিত প্লাবনে কোথায় যেন তলাইয়া গিয়াছে; যে ভিত্তির ওপর মন এতকাল পরম নির্ভরতার সহিত

দাঁড়াইয়া ছিল, সহসা সে ভিত্তি নড়িয়া উঠিয়াছে; যাহাকে ভূমি বলিয়া মনে হইয়াছিল, এখন দেখা যাইতেছে, তাহা বিরাটকায় অন্ধ একটা সরীসৃপের কুণ্ডলীকৃত ক্লেদাচ্ছন্ন দেহ—নড়িয়া-চড়িয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

অকস্মাৎ জীবনের সমস্ত পটভূমিকাই যেন পরিবর্তিত হইয়া গেল। যে রিনিকে পত্নী কল্পনা করিয়া সে এতদিন, এই কিছুক্ষণ পূর্বে পর্যন্ত, স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তরে নীত হইয়াছিল, সেই রিনিকে সে আর জীবনে মুখ দেখাইতে পারিবে না। যে মিষ্টিদিদি এই খানিকক্ষণ আগে পর্যন্ত তাহার অত্যন্ত আপনজন ছিলেন, তাঁহাকে সে জীবনে ক্ষমা করিতে পারিবে না। মিষ্টিদিদির একারই দোষ? তাহার নিজের লোভ ছিল না? ছিল বইকি। কিন্তু মিষ্টিদিদি না থাকিলে তাহা এমন কুৎসিতভাবে আত্মপ্রকাশ করিত না। স্ফুলিঙ্গ হয়তো ছিল, মিষ্টিদিদি তাহাকে দাবানলে পরিণত করিয়াছেন; ওই ক্ষুধিতা রমণীটির আকস্মিক কামনার ঝটিকায় লেলিহান শিখা আকাশ-বিসর্পী হইয়া উঠিয়াছে। মিষ্টিদিদির প্রতি নিদারুণ ঘৃণায় তাহার সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছিল, তবু সে মিষ্টিদিদিকে ভুলিতে পারিতেছিল না। দ্রুতবেগে চলিতে চলিতে পারিপার্শ্বিকের-সম্বন্ধে-অচেতন মন মিষ্টিদিদির সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন ছিল। সেই দৃশ্যটি সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না, সেই—

সহসা শঙ্কর থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কোথায় চলিয়াছে সে? মনে হইতেছে, যেন এ রাস্তায় সে আর কখনও আসে নাই! কোন্ গলি এ? গলিটা হইতে বাহির হইয়া সে সার্কুলার রোডে আসিয়া পড়িল। সম্মুখেই দেখিল সমাধিক্ষেত্র, যে সমাধিক্ষেত্রে কবি মধুসূদন সমাহিত রহিয়াছেন। সে অন্যমনস্কভাবে ভণ্টুর বাড়ির উদ্দেশ্যেই যাত্রা করিয়াছিল, কিন্তু এখন দেখিল বেলেঘাটার মোড় ছাড়াইয়া অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে। রাস্তাটা পার হইয়া সে সমাধিক্ষেত্রের পাশে আসিয়া একবার দাঁড়াইল, একবার ইচ্ছা হইল, সমাধিক্ষেত্রের ভিতরে ঢুকিয়া মধুসূদনের সমাধির পাশে খানিকক্ষণ বসে। কবি মধুসূদনের জীবনে নানা দুঃখ নানা মূর্তি ধরিয়া আসিয়াছিল, হয়তো জীবনের পরপারে গিয়া তিনি সান্ত্বনা পাইয়াছেন, হয়তো সে সান্ত্বনার ক্ষীণতম আভাস অন্ধকারে মৌন সমাধির ধারে একা কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে পাওয়া যাইবে। শঙ্কর আর একটু গেল, গিয়া দেখিল, গেট বন্ধ। গেটের সামনে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা সে নিজেও জানে না। চেতনা হইলে হঠাৎ সে দেখিল, ওদিকের ফুটপাথে চলমান একটি নারীমূর্তির পানে সে আগ্রহে চাহিয়া আছে। আঁটসাঁট-পোশাক-পরা একটি মেমসাহেব ওদিকের ফুটপাত দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছে এবং তাহার অন্তরগুহাবাসী নারীদেহলুব্ধ পশুটা তাহারই চোখ দিয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে আপাদমস্তক তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। নারীমূর্তি চলিয়া গেল, শঙ্কর সহসা স্থির করিল, ভণ্টুর বাড়ি সে আর যাইবে না। তাহার কলুষিত মন লইয়া সে এখন বউদিদির সম্মুখীন হইতে পারিবে না। ভণ্টুর সম্মুখেই বা সে দাঁড়াইবে কি করিয়া? অন্যমনস্ক উদ্‌ভ্রান্ত শঙ্কর আবার হন হন করিয়া হাঁটিতে শুরু করিয়া দিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা রাস্তা নানা গলি অতিক্রম করিয়া শঙ্কর আবার সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল। দেখিল, একটা ল্যাম্প-পোস্টের ধারে একফালি সরু বারান্দার ওপর রঙিন-কাপড়-পরা কয়েকটি মেয়ে হাসাহাসি করিতেছে। তাহাদের মধ্যে আবার একজন কোমরে হাত দিয়া সিগারেট খাইতেছে। দৃশ্যটা শঙ্করের কেমন দৃষ্টিকটু লাগিল, সে একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মেয়েটির পানে

চাহিল। শঙ্করকে দাঁড়াইয়া পড়িতে দেখিয়া মেয়েগুলিও তাহার পানে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। যে মেয়েটি সিগারেট খাইতেছিল, সে আরও একটু কায়দা করিয়া মুখ তুলিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল, একটি মেয়ে বঙ্কিম ভঙ্গিতে অল্প একটু অন্ধকারে বারান্দার উপর দাঁড়াইয়া ছিল, সে রাস্তায় নামিয়া আসিল এবং শঙ্করের দিকে চকিতে একবার চাহিয়া সঙ্গিনীদের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর একজন সঙ্গিনীকে ডাকিয়া বলিল, আমার খোঁপাটা একটু ঠিক করে দে তো, বার বার এলিয়ে যাচ্ছে।

সঙ্গিনী খোঁপা ঠিক করিয়া দিল।

মেয়েটি আবার শঙ্করের দিকে ফিরিয়া চাহিল ও আবার একটু হাসিল। শঙ্কর অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। শঙ্করকে এমন বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সেই চটুলা মেয়েটিই প্রশ্ন করিল, আপনি কাউকে খুঁজছেন?

শঙ্কর আগাইয়া গেল এবং মেয়েটির মুখের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল, আপনি কি ১৮ নম্বর কেরানিবাগানে থাকেন?

'আপনি' শুনিয়া মেয়েটি গম্ভীর হইয়া গেল। তাহার পর আবার চোখ মিটিমিটি করিয়া হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

শঙ্কর কিছু বলিতে পারিল না, তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন তাহার তালু শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, নিদারুণ তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া যাইতেছে।

মেয়েটি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

শঙ্কর সহসা বলিয়া ফেলিল, আমাকে এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন?

খুব পারি, আসুন।

মেয়েটির পিছন পিছন শঙ্কর অগ্রসর হইল।

বাকি মেয়েগুলির মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, মুক্তোটার কপাল ভাল। আমাদের আর কতক্ষণ ভোগান্তি আছে, কে জানে বাপু!

আর একজন একটু হাস্যতরল কণ্ঠে বলিল, ওলো, মুক্তো, শুধু জল দিসনি, একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে দিস বাবুকে।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াই মুক্তো প্রশ্ন করিল, আমার ঠিকানা আপনি জানলেন কি করে?

আপনারাই দিয়েছিলেন।

কবে?

কিছুদিন আগে হাওড়া স্টেশনে। আমাকে আসবার জন্যে নেমন্তন্ন করেছিলেন, ভুলে গেছেন?

মুক্তো হাসিয়া বলিল, ভুলে গেছি।

আপনি হাওড়া স্টেশনে মূর্ছা যান, আমি আপনার মুখে জল দিয়ে মূর্ছা ভাঙাই। আপনার সঙ্গে আরও যেন কে ছিলেন একজন।

মুক্তো মন দিয়া কথাগুলি শুনিল; তাহার পর ভঙ্গিভরে স্কন্ধযুগল ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া আবার নামাইয়া লইয়া বলিল, মনে নেই।

অতবড় একটা ঘটনা ভুলে গেছেন? বেশিদিনের তো কথা নয়।

মুক্তোর সমস্ত মনে ছিল, কিন্তু সে স্বীকার করিল না। জিজ্ঞাসা করিল, শুধু জল খাবেন? খাবার-টাবার—

না, শুধু এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল।

ঘরেই কুঁজায় জল ছিল, মুক্তো কাচের গ্লাসে ঢালিয়া দিল, এবং শঙ্কর তাহা ঢকঢক করিয়া পান করিয়া ফেলিল।

কতক্ষণ বসবেন?

কতক্ষণ আর, এই খানিকক্ষণ, মানে—আপনার কি অসুবিধে করছি?

কিছুমাত্র না। ঘণ্টা পিছু দু-টাকা করে লাগবে, এই আমার রেট।

শঙ্কর ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, ও।

পকেট হইতে ব্যাগটা বাহির করিয়া দেখিল, একটি দশ টাকার নোট রহিয়াছে, সেইটি বাহির করিয়া মুক্তোর হাতে দিতেই মুক্তো খিলখিল করিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

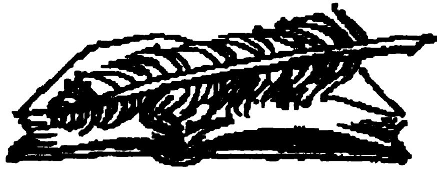
বাবা! রাগ তো আপনার কম নয় দেখছি!

তাহার পর গম্ভীর হইয়া বলিল, না, ছি, আপনি অতিথি মানুষ, আমাদের নেমন্তন্ন পেয়ে এসেছেন বলছেন, আপনার কাছে কি টাকা নিতে পারি? সব জায়গায় কি আর ব্যবসাদারি চলে? দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বিছানায় বসুন না, আমি আসছি এক্ষুনি।

মুক্তো বাহির হইয়া গেল।

একটু দেরি করিয়াই ফিরিল। ফিরিয়া দেখিল, ক্লান্ত শঙ্কর তাহার বিছানায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

মুক্তো নির্নিমেষ নয়নে তাহার মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।



ভীমপলশ্রী

।। এক ।।

প্রথমেই জেনে রাখা ভাল, যে কাহিনীটি বিবৃত করতে উদ্যত হয়েছি তার স্থানকাল পাত্রপাত্রী সমস্তই কাল্পনিক। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক কোন রকম ফাঁদে পা দেবার ইচ্ছে নেই। স্থান অবশ্য আমাদেরই দেশ, কালও বর্তমান— হোটেল, মোটর, ফোন, রেডিও, রেলগাড়ি, সবই আছে—পাত্র-পাত্রীও বাঙালী। তরুণ-তরুণী, সেকেলে, দুই-কালের-সীমারেখায়-দণ্ডায়মান সব রকম ব্যক্তিই আছেন।

সুশোভন গল্পের নায়ক। সার্থকনামা ব্যক্তি। কোথাও কখনও অশোভন হয়নি। কান্তি অনিন্দ্য, ব্যাঙ্ক-বালান্সও অনিন্দ্য। ভবিষ্যৎও নিন্দনীয় নয়। কারণ বাপ মা ভাই বোন প্রভৃতি কোনও রকম ঝামেলা নেই। মাত্র কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় স-সম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে; একটি সুনির্বাচিত সহৃদগোষ্ঠী আছে। চাকরি কিংবা ব্যবসা করে অর্থোপার্জন করবার প্রয়োজন হয় না। এ অবস্থায় সুতরাং যা অনিবার্য তাই তিনি হয়েছিলেন—'কমরেড'। সুদের টাকা উপভোগ করতে করতে ক্যাপিট্যালিজমের নিন্দে করে তিনি অবসর এবং চিত্ত বিনোদন করতেন। কমরেড বান্ধবীও জুটেছিল কয়েকটি। বিয়ের সামাজিক বাজারে মন্দা আজকাল। বুদ্ধিমতী বাঙালী মেয়েরা রাজনৈতিক বাজারে ভিড় করেছেন। সুতরাং তর্ক, গান, গল্প-গুজব, থিয়েটার, সিনেমা, সাহিত্য, দেশোদ্ধার প্রভৃতি নিয়ে সুশোভনের দিন ভালই কাটছিল। এমন সময় হঠাৎ—ঠিক হঠাৎ না —কমরেড অনীতার সঙ্গে আলাপ অনেক দিন আগেই হয়েছিল— তবে অভিনব অনুভূতিটা হঠাৎ উথলে উঠল একদিন এবং শেষ পর্যন্ত সামলানো গেল না। বিয়েই করতে হল। অনীতার মা শ্রীযুক্তা স্বয়ম্প্রভা সরকারের ঘোর আপত্তি ছিল বিয়েতে। কিন্তু উভয়েই যখন কমরেড, তখন আটকাল না কিছু।

শ্রীযুক্তা স্বয়ম্প্রভা সরকারকে বরবর্ণিনী বললে ব্যাকরণ ভুল তো হবেই না, অত্যুক্তিও হবে না। কিন্তু একটু বিস্তৃততর পরিচয় না দিলে সাধারণ পাঠক-পাঠিকারা তাঁর স্বরূপটি ঠিক ধরতে পারবেন না হয়তো। আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান না হলেও স্বয়ম্প্রভা সরকার সত্যিই অসাধারণ মহিলা। ঘাড়ে গর্দানে বেঁটে মোটা বলিষ্ঠ-চোয়াল, ছোট-চুল, ঘন-ভুরু, তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি যে রমণীটি বর্তমানে পাড়ার সকলের অন্তরে অবিমিশ্র ভীতি ছাড়া অন্য কোন ভাব উৎপাদন করতে ইচ্ছুক নন, তিনিই যে চল্লিশ বৎসর পূর্বে কুমারী স্বয়ম্প্রভা মিত্র ছিলেন এবং বেণী দুলিয়ে জিতু সরকারের হৃদয়-হরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন তা অকুণ্ঠিতচিত্তে না পারলেও জিতু সরকারকে স্বীকার করতে হবে বই কি? স্বয়ম্প্রভা মিত্রের বাবা যখন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন—তখন তা নিয়ে খুবই হৈ চৈ হয়েছিল, কিন্তু তার কিছুদিন পরেই যখন তাঁর মাইনার-পাস আলোকপ্রাপ্তা দুহিতাটি গোঁড়া হিন্দু পরিবারের নিরীহ যুবক জিতেন্দ্রনাথকে কবলস্থ করলেন তখন যে আন্দোলন, হট্টগোল, দলাদলি, চিৎকার প্রভৃতি সৃষ্টি হয়েছিল সংযুক্তা-পৃথ্বীরাজ সম্পর্কেও ঠিক ততটা হয়েছিল কিনা সন্দেহ। বলা বাহুল্য জিতেন্দ্রনাথের বাবা তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করলেন।

পিতৃবিত্ত-বঞ্চিত জিতেন্দ্রনাথ স্বকীয় পুরুষকার-বলে কি করে অকূল সমুদ্রে পাড়ি জমাতে পেরেছিলেন তা এ কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রসঙ্গত একটি কথা শুধু বলা যেতে পারে। যে আলোকপ্রাপ্ত সমাজে স্থান পাবেন আশা করে স্বয়ম্প্রভা বেণী দুলিয়েছিলেন এবং জিতু সরকার সমাজ ত্যাগ করেছিলেন সে আলোকপ্রাপ্ত সমাজে তাঁরা ঢুকতেই পারেননি। কারণ প্রথম জীবনে সে সমাজে ঢোকবার চাবিই সংগ্রহ করতে পারেননি তাঁরা। জিতু সরকার টাকা রোজগার করেছিলেন শেষ বয়সে। সুতরাং প্রায় সারাজীবন স্বয়ম্প্রভাকে রূপকথা-বর্ণিত আঙুর-লুব্ধ শৃগালের ভূমিকায় অভিনয় করে যেতে হয়েছে। এবং তার ফলে যা হয়েছে তা মনস্তাত্ত্বিকদের মর্মরোচক হলেও জিতু সরকারের পক্ষে হয়েছিল মর্মান্তিক। অনীতা ও সুশোভনের পক্ষেও তা সুখকর হয়নি।

আর একটি ব্রাহ্ম দম্পতিও এই কাহিনীটিকে অলঙ্কৃত করেছেন। তাঁদেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় আগে থাকতে জেনে রাখা ভাল। শ্রীযুক্ত দিগ্বিজয় সিংহরায় অভিজাত বংশীয় জমিদার। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমবয়সী না হলেও সমসাময়িক ছিলেন। এখনকার শিক্ষিত সমাজে আধুনিক হতে হলে যেমন 'কমরেড' হতে হয়, তখনকার শিক্ষিত সমাজে তেমনি ব্রাহ্ম হতে হত। মদ খাওয়াটাও আধুনিকতার আর একটা লক্ষণ ছিল। দিগ্বিজয়ের পিতা জগদ্বিজয় নিজের ইয়ার-বক্‌শি মহলে ছিলেন অত্যাধুনিক। সুতরাং তিনি ব্রাহ্মও হয়েছিলেন, মদও খেতেন। তাঁর কীর্তিকলাপ তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা অনেকেই এখন গতাসু হয়েছেন, সে কীর্তিকাহিনীও এখন অবলুপ্তপ্রায়। তবু এখনও কিছু কিছু শোনা যায় মাঝে মাঝে। তিনি যেদিন বাগানবাড়ি করতেন সেদিন নাকি—যাক্, সে সব কথা অবান্তর এ গল্পের পক্ষে। বাধ্য পুত্রের মত দিগ্বিজয় পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছিলেন কিছুদিন। কিন্তু পারলেন না। তিনি ছিলেন অন্য চরিত্রের লোক। হল্লা হল্লোড় বরদাস্তই করতে পারতেন না। কোলকাতা শহরের কোলাহলই অতিষ্ঠ করে তুলল তাঁকে শেষ পর্যন্ত। বিশেষত যখন অলিগলিতে ট্যাক্সির দৌরাত্ম্য শুরু হল তখন তিনি পত্নী সুরেশ্বরীকে নিয়ে সরে পড়লেন দেহাতে নিজেদের জমিদারিতে। কোলকাতায় ক্বচিৎ আসতেন। খবরের কাগজ মারফৎ কোলকাতার যে সব খবর পেতেন তাতে আসবার প্রবৃত্তিও আর হত না। সুরেশ্বরী দেবীও অভিজাত-বংশীয় আলোকপ্রাপ্ত মহিলা। তবে আলোকটা সেকেলে আলোক। হাব-ভাব পোশাকে তখনকার দিনের ঠাকুর-বাড়ির মেয়েরাই তাঁর আদর্শ ছিল। হঠাৎ দেখলে স্বর্ণলতা দেবী বলে ভুল হতো। এই নিঃসন্তান দম্পতি পরস্পরকে নিয়ে দেহাতে নিজেদের জমিদারিতে সুখেই থাকতেন। একঘেয়ে সুখও বেশিদিন ভাল লাগে না। সুরেশ্বরীর আগ্রহাতিশয্যে দিগ্বিজয়কে তাই বাইরের জগতের সঙ্গে যোগ-স্থাপন করতে হত মাঝে মাঝে। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করতেন সুযোগ পেলেই। দিগ্বিজয় মোটরকার পছন্দ করতেন না, কিন্তু সুরেশ্বরীর জন্যে কিনতে হয়েছিল একটা। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্যে সেটা চড়ে শাল গায়ে দিয়ে বেরুতেনও তিনি মাঝে মাঝে। কিন্তু তা কদাচিৎ।

আর একটি অসাধারণ ব্যক্তির পরিচয়ও আগে থাকতে করা উচিত। স্বয়ম্প্রভা দেবীর দূর সম্পর্কের আত্মীয় সদারঙ্গবিহারীলালের নামটি শুধু নয়, প্রকৃতিও অসাধারণ। বিবাহ করেননি ভদ্রলোক। তিন কুলে কেউ নেইও। সামান্য কিছু জমিজমা আছে, তার থেকেই গ্রাসাচ্ছাদন চলে যায়। গ্রাসাচ্ছাদনের বেশি ইনি কামনাও করেন না কিছু। অত্যুৎসাহী আদর্শবাদী এই লোকটি

পরোপকারকেই জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছেন। বাড়িতে স্থবিরা পাঁচির মা এবং রাস্তার ভাঙা একটি মোটর বাইক এঁর ভার বহন করে। অহোরাত্র ইনি পরোপকার করে বেড়ান। কারণ-অকারণ সুযোগ-দুর্যোগ ভাল-মন্দ উচ্চ-নীচ কোন কিছুরই তোয়াক্কা করেন না ইনি। সকলেই এঁর পরিচিত, সকলের সঙ্গেই আত্মীয়তা, সকলের উপকার করবার জন্যে ইনি সর্বদা প্রস্তুত। কোন বাছবিচার নেই। মাঝে মাঝে জটিলতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সদারঙ্গবিহারীলাল অকুতোভয় অদম্য ব্যক্তি, তাঁর গতিরোধ করবার সাধ্য তাঁর নিজেরই নেই বোধ হয়, অন্যে পরে কা কথা।

।। দুই ।।

সুশোভনের যা স্বভাব, চা ঠাণ্ডা হচ্ছিল সেদিকে খেয়াল নেই, সদ্য-আগত ডাক নিয়েই ব্যস্ত. হয়ে পড়ল সে। অনীতারও চিঠি এসেছিল একখানা। মায়ের চিঠি। স্বয়ম্প্রভা দেবীর মেজাজে আর যা-ই থাক, রসোচ্ছলতা নেই। চিঠিতে তিনি যে ধরনের কাটা-কাটা ভাষা ব্যবহার করেন তাতে কারও চিত্ত প্রফুল্লিত হয় না। অনীতারও হচ্ছিল না। সুশোভন একখানা খামের চিঠি খুলে পড়ছিল, আর হাসছিল মুচকি মুচকি।

"কার চিঠি ওটা"

"দিগ্বিজয় সিংহরায়ের"

"সে আবার কে"

"রায় বাহাদুর দিগ্বিজয় সিংহরায়"

"সিংহরায়? বিয়ের সময় কে একজন সিংহরায় আমাকে ঝকমকে বেনারসী শাড়ি দিয়েছিলেন একখানা। তাঁরাই নাকি?"

সুশোভন পড়তে পড়তে জবাব দিল—"হ্যাঁ, তাঁরাই"

"খুব বড়লোক, নয়"

"হ্যাঁ, কিন্তু কি মুশকিল, ছি ছি—। ঠিক এই সময় মোটরটা বিগড়ে বসে আছে"

"কেন, কি লিখেছেন"

"নিমন্ত্রণ করেছেন"

"হঠাৎ"

"কি জানি। এই শোন না"

সুশোভন পড়তে লাগল।

কল্যাণীয়েষু—

তোমার পিতার সহিত আমাদের এত আত্মীয়তা ছিল অথচ তোমার সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। তোমাকে সেই একবার ছেলেবেলায় দেখিয়াছিলাম। তোমার বিবাহে আমরা সস্ত্রীক যাইব মনস্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার কাকীমাতার গ্রন্থী-বাত প্রবল হওয়াতে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল। আমাদের মতো মফঃস্বলবাসী ব্যক্তিদের পক্ষে কলিকাতা যাওয়াই বিপদ। পথে অজস্র ভিড়, তাহার উপর গাড়ি ঘোড়া ট্রাম ট্যাক্সি চিৎকার গোলমালে খেহি হারাইয়া যায়।... খেহি— Sic"

"খেহি সিক্ মানে?"

"মানে খেহিই লিখেছেন। ভদ্রলোকের ধারণা বোধ হয় খেই শব্দের শুদ্ধ হচ্ছে 'খেহি'। বেচারা। শোন তারপর—"

"তোমার বিবাহের পর তোমাকে নিমন্ত্রণ করিব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু এমন বর্ষা নামিল যে ফাঁক পাইলাম না। এখন শীত পড়িয়াছে, পথ ঘাট শুকাইয়াছে। শিকার করিবার জন্য দুই-একজনকে আসিতে বলিয়াছি। তুমিও যদি বধূমাতাকে লইয়া আসিতে পার সুখী হইব। শুনিয়াছি বধূমাতা একজন আধুনিকা। যাঁহারা আসিতেছেন তাঁহারাও হাল-ফ্যাসানের, কোন অসুবিধা হইবে না। আগামী বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ১৮ই মাঘ শিকার পার্টির আয়োজন করিয়াছি। শুনিয়াছি তুমি একজন ভাল শিকারী। তোমার বাবাও খুব ভাল শিকার করিতেন। যদি আসিতে পার আমরা খুবই আনন্দিত হইব। আমার স্নেহাশীর্বাদ লও। ইতি আশীর্বাদক শ্রীদিগ্বিজয় সিংহরায়।"

অনীতা 'কমরেড' হলেও মনে মনে রায়বাহাদুর জাতীয় লোকদের সম্বন্ধে তার কিঞ্চিৎ সম্ভ্রমই ছিল। মুখে সে যতই শ্রমিকদের দুঃখে বিগলিত হোক, বেনারসী শাড়িখানার ঝলকে সেদিন তার চোখ ঝলসে গিয়েছিল। যে রায়বাহাদুর সেই শাড়ি তাকে দিতে পারেন তাঁকে ক্যাপিটালিস্ট বলে তাচ্ছিল্য করবার মতো মনের জোর তার নেই— মুখে যতই সে সাম্যবাদ নিয়ে আস্ফালন করুক।

"বেশ তো, চল না যাওয়া যাক, কতদূর এখান থেকে"

"প্রায় দেড়শ' মাইল"

"হাসছ যে"

"খেহিটা ভুলতে পারছি না"

সুশোভন হো হো করে হেসে উঠল।

"একে গ্রন্থি-বাত—তার উপর খেহি! যেতেই হবে সেখানে। কিন্তু গাড়ি যে গ্যারেজে, ব্যাটারা বলেছে একমাসের আগে হবে না। কি মুশকিল বল তো"

"মোটর নিয়ে যাবে। ট্রেনে যাওয়া যায় না"

"যায়। কিন্তু তার চেয়ে হেঁটে যাওয়া ভাল। একে প্যাসেঞ্জার গাড়ি, তার উপর চেঞ্জ আছে! অবশ্য ট্যাক্সি একটা নেওয়া যেতে পারে অনায়াসে"

"দেড়শ' মাইল ট্যাক্সি করে যাবে!"

অনীতা বিস্ফারিত চক্ষে অবাক হয়ে চেয়ে রইল সুশোভনের দিকে। বলে কি লোকটা। সে ট্রামে বাসে ঝুলে ঝুলে শিক্ষয়িত্রীগিরি করে কাটিয়েছে কিছুকাল আগে পর্যন্ত। এ ধরনের অমিতব্যয়িতা তার কল্পনাতীত।

"ট্রেনে টিকিস্ টিকিস্ করে যাওয়ার চাইতে—"

"বেশ তাই যেও। চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে খেয়ে নাও আগে"

চেয়ার ঠেলে অনীতা উঠে দাঁড়াল। ট্যাক্সিতে ধাবমান সুশোভনের কিছুদিন আগেকার একটা চিত্র চকিতে ফুটে উঠল মানসপটে। লিলুয়ার একটা শ্রমিক সভায় যাচ্ছিল সবাই। সুশোভনের একপাশে ছিল কমরেড মণিকা, আর এক পাশে সে নিজে। সেদিন সুশোভনের সঙ্গে মণিকার প্রগল্ভ আলাপ—কম্যুনিজম নিয়েই আলাপ—সর্বাঙ্গে তার জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল যেন। রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে কেঁদেছিল সে।

ঠাণ্ডা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে অনীতার দিকে আড়চোখে চেয়ে সুশোভন বললে—"তুমি যাবে না? দিগ্বিজয় নাম শুনে ভয় পেও না, শুনেছি লিকলিকে রোগা লোকটা—"

অনীতা কোন উত্তর না দিয়ে আর এক পেয়ালা চা ঢালতে লাগল টি-পট থেকে। ভয় যে তার হয়নি তা নয়, কিন্তু তার কারণ দিগ্বিজয় নামটা নয়। অন্য আর এক কারণে এই রায়বাহাদুর জমিদারের নিমন্ত্রণ তাকে যুগপৎ প্রলুব্ধ ও ভীত করে তুলেছিল। যাঁর কোলকাতা শহরে পদে পদে 'খেহি' হারিয়ে যায় তাঁর চোখের সামনে সর্বদা নিজেকে প্রকট রেখে সম্ভাব্য সমালোচনার খোরাক জোগানো একটু ভীতিকর তো বটেই। আধুনিক যুগের আপটুডেট্ 'কমরেড' হলেও সমালোচনা সম্বন্ধে ঔদাসীন্য অর্জন করতে পারেনি সে এখনও। অথচ যেতে লোভও হচ্ছিল বেশ। হঠাৎ তার মনে হল কিসের এত ভয়। যত বড় লোকই হোক, অসঙ্কোচে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে সে। শাড়ি সেমিজ সায়া ব্লাউজ—কি তার নেই? রূপও আছে যৎকিঞ্চিৎ। বুদ্ধিও। মা যদি শোনেন যে অত বড় একটা রায়বাহাদুর জমিদার নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছেন খুশিই হবেন।

"দু'জনেই যাই চল, বুঝলে—"

"বেশ চল, ছাড়বে না যখন। ট্রেনে যাব কিন্তু"

"ওই অতগুলো চেঞ্জ করে! খানিকটা বাসেও যেতে হয় শুনেছি—"

অনীতা কোন উত্তর না দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

সুশোভন বুঝলে ট্রেনেই যেতে হবে।

মাত্র তিন মাস বিয়ে হয়েছে তার। এর মধ্যেই 'প্রেমের নিগড়', 'প্রেমের ফাঁস', 'প্রেমের ফাঁদ' প্রভৃতি প্রচলিত বাক্যগুলির রূপকবর্জিত প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হচ্ছে তাকে বার বার। প্রেমে পড়ে অনীতাকে বিয়ে করে সে যে ভুল করেছে, একথা কারও কাছে স্বীকার করেনি সে— এমন কি নিজের কাছেও না। কিন্তু কেমন যেন প্রতিপদেই খটকা লাগছে। তার যা ভাল লাগে অনীতার ঠিক তাতেই যেন আপত্তি। বাধাহীন স্বাধীনতা-চর্চার সুযোগ আছে বলেই সে কমিউনিস্ট, অনীতাও সেই জাতের লোক এই তার ধারণা ছিল। কিন্তু বিয়ের পর দেখা যাচ্ছে অনীতার ভাবগতিক ঘোরতর ইম্পিরিয়ালিস্টিক গোছের। একাধিপত্য চায়। সুশোভনকে সর্বপ্রকারে নিজের শাসনাধীন রাখাই তার একমাত্র লক্ষ্য। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে তার শাসনাধীন থাকতে মন্দ লাগে না। বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু তা পুনরায় শাসিত হয়ে আনন্দলাভের জন্য। ভারী আশ্চর্য কাণ্ড! একদিন কিন্তু সত্যিই দুঃখ হয়েছিল তার। যে অনীতার আর্টের প্রতি এত অনুরাগ; তার কাছে এ ব্যবহার মোটেই প্রত্যাশা করেনি সে।

সেদিন ধীরেনের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ। বিয়ের পর বন্ধুরা তাকে একরকম ত্যাগ করেছে বললেই হয়। নাগালই পায় না। তবু আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায় এখনও কেউ কেউ। নাগাল পেলেই ছোঁ মেরে ধরে নিয়ে যায়।

ধীরেন বললে—"তোর কাছেই যাচ্ছিলাম। বিশু আজ নগেনকে চা খাওয়াচ্ছে প্লাজাতে"

"সত্যি"

"তোকে নিয়ে যেতে বলেছে। চল"

সিনেমা-গগনের উদীয়মান জ্যোতিষ্কটিকে সামান্য একটু সঙ্গদান করে অভিনন্দিত করা এমন কিছু নিন্দনীয় কাজ নয়। কিন্তু বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গেল। ফিরেও জমল না।

"কোথা ছিলে এতক্ষণ?"

সুশোভন সোচ্ছ্বাসে বর্ণনা করে গেল।

"নগেন আবার কে! যত সব বাজে লোকের সঙ্গে আড্ডা দিতে ভালও লাগে তোমার—"

"নগেন মানে নগেন্দ্রমোহিনী। শ্রমিক থিয়েটারে 'ঝি'য়ের পার্টে প্রথম নাম করলে যে, মনে নেই?"

অনীতার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল।

বাঁকা হাসি হেসে বললে, "তোমার যে নগেন্দ্রমোহিনীর সঙ্গে এত ভাব ছিল তাতো জানতুম না"

"কোনকালে ভাব ছিল না। আজই প্রথম আলাপ"

অনীতা স্মেলিং সল্টের শিশিটা বার দুই শুঁকে একটা অ্যাসপিরিনের বড়ি খেয়ে ফেললে।

"সন্ধে থেকে মাথার যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি—"

সুশোভন এটা প্রত্যাশা করেনি। এই অনীতাই বিয়ের আগে এই নগেন্দ্রমোহিনীর সম্বন্ধে কি উচ্ছ্বাসই না প্রকাশ করেছিল। সেদিন রাত্রেই প্রতিজ্ঞা করতে হল যে ওই জাতীয় স্ত্রীলোকের আর ছায়া মাড়াবে না সে। প্রতিজ্ঞা করবার পর কেমন একটা অদ্ভুত ধরনের আনন্দও অনুভব করতে লাগল। আশ্চর্য। অনীতার মোহিনীশক্তি প্রভুত্বশক্তিসহযোগে খাদসংযুক্ত সুবর্ণের মতো আরও বেশি যেন মুগ্ধ করে।

সত্যিই পরস্পরকে ভালবেসেছিল তারা। অনেকেই অনীতাকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপেছিল। কিন্তু অনীতা এক সুশোভনকে ছাড়া আর কাউকে আমোল দেয়নি। সুশোভনকে সাধ্যসাধনাও করতে হয়নি বেশি। সুশোভনের প্রাগ্‌বিবাহ প্রণয়লীলাকে সংক্ষিপ্ত বললে কিছুই বলা হয় না। 'সংক্ষিপ্ত' বললে তবু খানিকটা বোঝান যায়। স্বয়ম্প্রভা দেবীর অনিচ্ছা-ব্যূহ ভেদ করে ঝড়ের বেগে অনীতাকে উড়িয়ে এনেছিল সুশোভন।

স্বয়ম্প্রভা সরকার তাঁর একমাত্র সন্তানটির জন্যে ঠিক কি জাতীয় রাজপুত্র যে কামনা করেছিলেন তা খুলে বলেননি কাউকে কোনদিন। সুশোভন সোমও পাত্র হিসাবে নিন্দনীয় নয়। প্রথম প্রথম তার দামী মোটরখানা দেখে বিচলিতও হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কিছুদিন মেলামেশার পর তিনি বুঝলেন সুশোভন 'আজকালকার' ছেলে। চটে গেলেন। কিন্তু অনীতাও আজকালকার মেয়ে এবং ওই মায়েরই মেয়ে। সে-ও জিদ ধরে বসল সুশোভন ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। অনীতার বাবার যদিও বিশেষ কিছু কর্তৃত্ব ছিল না মেয়ের উপর, কিন্তু যতটুকু ছিল তাও তিনি ব্যবহার করলেন না। অনীতারই জয় হল শেষ পর্যন্ত। জিতুবাবু মনে মনে খুশিই হলেন। যদিও বাইরে আনন্দ প্রকাশ করবার মতো বুকের পাটা ছিল ভদ্রলোকের। তাছাড়া জীবনে নানারকম ঘা খেয়ে এইটুকু তিনি সার বুঝেছিলেন যে অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই। যা হবার তা হবেই। পাঁচজনের কাছে খামখা আনন্দ বা উত্তেজনা প্রকাশ করলে অকারণ জটিলতা সৃষ্টি করা হয় মাত্র। কোন লাভ হয় না।

বাপ যখন ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন তখন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে তাঁকে বাল্যবন্ধু ইয়াসিন মিঞার শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। বড়বাজারের এক গলির মধ্যে ইয়াসিন মিঞার লোহা-লক্কড়ের ছোট একখানা দোকান ছিল। তাতেই ক্রমশ নিজেকে সংশ্লিষ্ট করেছিলেন জিতুবাবু। ইয়াসিন বললে একদিন, কি হবে পাঁচ-জায়গায় ঘোরাঘুরি করে। তিনি আর আপত্তি করলেন

না। বিনা আয়াসে যা পাওয়া যাচ্ছে তাই ভাল এ বাজারে। কোন রকম অসন্তোষ প্রকাশ করলেন না, নীরবে লেগে রইলেন কেবল। স্বয়ম্প্রভাদেবী অবশ্য তাঁকে আলোকপ্রাপ্ত সমাজের উপযোগী ভদ্রতর একটা চাকরি নেওয়ার জন্যে উৎসাহিত করতে কসুর করেননি। এই প্রসঙ্গে যে সব বাক্যাবলী তিনি ব্যবহার করেছিলেন তা সাধারণ-ধৈর্য বিশিষ্ট যে কোন লোককে পাগল করে দিত। কিন্তু জিতুবাবর কিচ্ছু হয়নি। তিনি অদৃষ্টকে মেনে নিয়ে লোহা-লক্কড়ের দোকানে লেগে রইলেন। আত্মরক্ষার দু'টি উপায় তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। সাধ্যপক্ষে বাড়ি আসতেন না এবং যখন আসতেন পারতপক্ষে স্বয়ম্প্রভার কোনও কথার প্রত্যুত্তর দিতেন না। শেষ বয়সে অদৃষ্ট হঠাৎ সুপ্রসন্ন হল তাঁর উপর। যুদ্ধ বাধল। লোহার দাম হু হু করে বাড়তে লাগল। স্বয়ম্প্রভা তো ওৎ পেতে ছিলেনই, অনীতাও দেখতে দেখতে নৃত্য-গীত-পটীয়সী 'কমরেড' হয়ে পড়ল। আলোকপ্রাপ্ত সমাজের যে দ্বার এতদিন রুদ্ধ ছিল তা হঠাৎ যেন খুলে গেল খানিকটা। তারপর এল সুশোভন। জিতুবাবু ইয়াসিন মিঞাকে যেমন মেনে নিয়েছিলেন, সুশোভনকেও তেমনি মেনে নিলেন। সুশোভনের ডিগ্রি, চেহারা, মোটর, কোলকাতায় বাড়ি প্রভৃতি দেখে স্বয়ম্প্রভাও পুলকিত হয়েছিলেন প্রথমটা। যে সভ্য সমাজে তিনি মিশতে চেয়েছিলেন কিন্তু মেশবার সুযোগ পাননি, সুশোভনের হাতে সেই কাম্যলোকে ঢোকবার চাবিকাঠিটি দেখে বড় আশায় আশান্বিত হয়েছিলেন তিনি। সুশোভনের মোটর আছে, পয়সা আছে, অনেক বড় বড় পরিবারের সঙ্গে হৃদ্যতাও আছে। ইচ্ছে করলে অনায়াসে পারত সে। কিন্তু কিছুতেই নিয়ে গেল না তাঁকে। সাজিয়ে গুছিয়ে অনীতাকে নিয়ে গেল বারবার, তাঁকে একবার ডাকলেও না। আর না ডাকলে নিজে সেধে তার মোটরে যাবেনই বা কেন তিনি। সুশোভনের না নিয়ে যাবার সঙ্গত কারণ ছিল একটা অবশ্য। সুশোভনের পরিচিত মহলের কেউ প্রত্যাশাই করতে পারেনি যে সুশোভনের মতো ছেলে জিতু সরকারের মেয়েকে বিয়ে করে বসবে। অনীতা যে স্ত্রীরত্ন তাতে কারও সন্দেহ ছিল না কিন্তু একালে দুষ্কুলাদপি তা আহরণ করাটা ভব্য সমাজে সুরুচিসঙ্গত নয়—অন্তত সুশোভন যে সমাজে ঘোরাফেরা করে সে সমাজে নয়—সকলেরই মানসিক নাসা ঈষৎ কুঞ্চিত হয়েছিল। সুশোভন তাই নানা কৌশলে স্বয়ম্প্রভা দেবীকে এড়িয়ে চলত। স্বয়ংপ্রভাও বেশ বুঝতে পারলেন সুশোভন তাঁকে এড়িয়ে চলছে। ক্রমশ তাঁর সমস্ত মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। এতদিন যা তিনি সন্দেহ করতেন ক্রমশ তা বিশ্বাস করতে লাগলেন। স্বার্থপর ছোটলোক চরিত্রহীন সব। ওদের পার্টি, সিনেমা, সভা-সমিতি, সম্মিলন সব যথেচ্ছাচারের নামান্তর মাত্র। কোন ভদ্রমহিলাকে তাই নিয়ে যেতে সাহস করে না ওরা। কোনও ভদ্রমহিলার যাওয়াও উচিত নয় ওদের সঙ্গে। জিতুবাবুকে এসব কথা বললেনও একদিন তিনি সালঙ্কারে। জিতুবাবু টুঁ শব্দটি করলেন না। চুপ করে রইলেন। জিতুবাবুকে কিন্তু সুশোভন নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিল একদিন। নিমন্ত্রণ সেরে রাত্রে ফিরে এসে জিতুবাবু এমন অস্বাভাবিক রকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে লাগলেন যে স্বয়ম্প্রভার কেমন যেন সন্দেহ হল। খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন। লোহার দালাল এই নিরীহ ভদ্রলোকটিকে এত উচ্ছ্বসিত হতে তিনি ইতিপূর্বে দেখেছেন বলে মনে পড়ল না। মদটদ খাইয়ে দেয়নি তো! সব পারে ওরা। সুশোভনের উপর রাগ আরও বেড়ে গেল। কিন্তু কন্যারও অনুরাগ বাড়ছিল এবং সে 'কমরেড', সুতরাং বিয়ে আটকাল না।

।। তিন ।।

গার্ড হুইস্‌ল দিয়ে সবুজ নিশান নাড়তে লাগলেন।

"উঠে এসে বস না। কি যে তোমাদের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা ফ্যাসান। ট্রেন ছাড়ছে যে—" প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে গলা বাড়িয়ে অনীতা বললে।

"এই যে যাচ্ছি"

বেশ কায়দা করে সিগারেট ধরিয়ে দেশলাই কাঠিটি নেড়ে নেড়ে নিবিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে হাসিমুখে চেয়ে রইল সুশোভন। কমরেড অনীতার এই ভীতু-ভাবটা বেশ উপভোগ করছিল সে। আর একবার হুইস্‌ল পড়ল। গার্ডের দিকে চাইতে গিয়েই কিন্তু অঘটন ঘটে গেল।

"আরে—আরে—আহা—এ কি—"

ছুটল সুশোভন সেদিকে।

নিঃশব্দ গতিতে ট্রেনটি ছেড়ে দিলে। প্রথমটা মনে হয় ছাড়েই নি। অনীতা বুঝতেই পারেনি প্রথম। কিন্তু বুঝতে পারামাত্রই দাঁড়িয়ে উঠল এবং জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে অঙ্গভঙ্গীসহকারে যা করতে লাগল তাতে একটি ফল হল শুধু, প্ল্যাটফর্মে দণ্ডায়মান স্থূলকায় একটি মাড়োয়ারি বণিকের প্রাণে রস-সঞ্চার হল। গদগদ হয়ে হলদে রঙের এককুড়ি দাঁত বার করে হেসেই ফেললে সে। অনীতা ভিড়ের মধ্যে আবছাভাবে সুশোভনকে দেখতে পেলে একবার। একটি মেয়ের দু'হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে। মনে হল মেয়েটির রং ধপধপে ফরসা।...

ট্রেনের গতিবেগ বাড়ল।

মেয়েটিকে তুলেই সুশোভন পুলকিত হয়ে উঠল। কমরেড সান্ত্বনা! খুব মাখামাখি ছিল কিছুদিন আগে।

"আরে, সান্ত্বনা যে! হঠাৎ পড়ে গেলে কি করে—"

"কলার খোলা বোধ হয়। অনেক ধন্যবাদ"

সান্ত্বনা ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে লাগল পিছন দিকে শাড়িটা নষ্ট হয়েছে কিনা।

"না, শাড়ি কিছু হয়নি, ঠিক আছে। আরে, মাথায় সিঁদুর দেখছি যে—বিয়ে হল কবে?"

"মাস তিনেক"—মুচকি হেসে জবাব দিলে সান্ত্বনা।

"কোথায়"

"বরিশালে। তবে উনি এখন কোলকাতাতেই আছেন"

"কি করেন"

"প্রফেসারি। আপনারও বিয়ে হয়েছে শুনেছি। আপনার স্ত্রী কোথায় এখন"

"এস না, আলাপ করিয়ে দিই—ওই যে বসে আছে—"

ঘাড় ফিরিয়েই সুশোভন থেমে গেল এবং অপসৃয়মান গার্ড-গাড়িটার দিকে চেয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল।

"যাচ্চলে"

"কি হল?"

"আমার স্ত্রী ওই গাড়িতে চলে গেল"

"আপনারা এই গাড়িতেই যাচ্ছিলেন নাকি"

"হ্যাঁ"

"কোথায়"

"দিগ্বিজয়বাবুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে"

"ওমা, আমিও যে সেইখানেই যাচ্ছি—আমাদেরও নিমন্ত্রণ আছে—"

"একমাত্র ট্রেনটি তো চলে গেল। এখন উপায়"

পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল।

"মাসীমা ভাববেন খুব"—ক্ষুণ্ণকণ্ঠে সান্ত্বনা বললে।

"তোমার মাসীমা সেখানে আছেন নাকি"

"দিগ্বিজয়বাবুর স্ত্রীকে আমি মাসীমা বলি। মায়ের খুব বন্ধু উনি। আমার ছেলেবেলাটা তো ওঁর কাছেই কেটেছে"

বাক্স বিছানা স্যুটকেস ট্রাঙ্ক কুঁজো পুঁটুলি এবং একটি কুকুরবাচ্ছা বহন করে কুলীর সারি এসে দাঁড়াল।

"সব তোমার জিনিস নাকি"

"হ্যাঁ, কি করি বলুন তো এখন। কালকের আগে তো আর ট্রেন নেই"

"না। সত্যিই কি করা যায়। অনীতা আবার তাদের কাউকে চেনে না। আজ রাত্রেই আমার যেমন করে হোক পৌঁছতে পারলে ভাল হতো"

"কিন্তু তা আর কি করে সম্ভব বলুন"

"একেবারে যে অসম্ভব তা নয়, থাম—একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে। এখন কটা বেজেছে? একটা। একটা ট্যাক্সি নিলে হয়। ভাল একটা ট্যাক্সিতে যেতে কত সময় লাগবে। শার্দুল সিংয়ের সঙ্গে আমার খুব জানাশোনা আছে। ফোন করলে ভাল গাড়ি দেবে, অনেক গাড়ি তার। কতক্ষণ লাগবে দেড়শ' মাইল যেতে— দেড়শ' ডিভাইডেড্ বাই টোয়েনটি—সাত ঘণ্টা, আট ঘণ্টাই ধর—নটার মধ্যে নির্ঘাত পৌঁছে যেতে পারি। তুমি কি এখন বাসায় ফিরবে? অধ্যাপক মশায় কোথায় এখন"

"তিনি এখানে নেই। তিনি থাকলে তো ভাবনাই ছিল না, একসঙ্গে যেতাম। তিনি এক কংগ্রেস সভায় গেছেন রংপুরে। আজ রাত্রে ফেরার কথা। ফিরে তিনি যাবেন সেখানে। তাই অন্তত কথা আছে। আমরা একসঙ্গেই যেতাম, কিন্তু তিনি আসবেন কি না ঠিক নেই, কেউ না গেলে মাসীমা দুঃখিত হবেন খুব, তাই আমি একাই যাচ্ছিলাম, উনি যদি আসেন পরে আসবেন।"

"আমি ট্যাক্সি করেই যাচ্ছি। তুমি যদি যেতে চাও আসতে পার আমার সঙ্গে। আপত্তি আছে?"

"না, আপত্তি আর কি"

"সুশোভন সহসা উৎসাহিত হয়ে উঠল খুব। কুলীদের দিকে ফিরে বললে—"এই—মাইজিকো চীজ একঠো ট্যাক্সিমে চড়াও—জলদি—"

তারপর সান্ত্বনার দিকে ফিরে বললে—"আগে আমার বাসায় ফেরা যাক চল। স্টেশন থেকেই শার্দুল সিংকে ফোন করে দিচ্ছি আমার বাড়িতে একখানা ভাল ট্যাক্সি পাঠাতে। বাসায় গিয়ে চা খেতে খেতেই গাড়ি এসে পড়বে, তারপরই—ব্যস্।"

মুচকি হেসে সান্ত্বনা বললে, "আপনার স্ত্রী কি—"

"আমার স্ত্রীর সম্ভাব্য মানসিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করবার সময় এখন নয়, সান্ত্বনা। যদি কিছু হয় দেখা যাবে পরে তখন—"

"না, আমি জিজ্ঞেস করছিলাম আপনার স্ত্রী কি সোজা দিগ্বিজয়বাবুর ওখানেই যাবেন"

"সোজা দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে যাওয়া যায় না কি। তবে শেষ পর্যন্ত সেইখানেই যাব বলে বেরিয়েছিলাম তো। টাইম-টেবেলখানাও তার কাছে। আমার বাক্স বিছানা সবই তার সঙ্গে। চটছে খুব নিশ্চয়"

"আজ রাত্রেই পৌঁছাচ্ছেন তো! রাগ আর কতক্ষণ থাকবে"

"তা বটে। অনীতা লোক ভাল—আলাপ হলে দেখবে—ওয়াণ্ডারফুল"

সান্ত্বনা কিছু না বলে মুচকি হাসল একটু।

সুশোভনের বাসায় যে চাকরানীটি ছিল সে শত্রুপক্ষীয় লোক। স্বয়ম্প্রভা দেবীরও চাকরানী ছিল সে কিছুদিন আগে। জামাইবাবু লোকটি যে ডুবে ডুবে জল খান এ সন্দেহ স্বয়ম্প্রভাই তার মনে সঞ্চারিত করেছিলেন তখন। নিজের মুখে তাকে বলেননি কিছু যদিও, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে এ নিয়ে যে আলাপ করতেন তিনি, তা নিম্নকণ্ঠে করতেন না। সুতরাং চাকরানীটি সুশোভনের সম্বন্ধে যে ধারণা করেছিল তা স্বায়ম্প্রভিক। সেই সুশোভন যখন হঠাৎ একটি রূপসী যুবতীকে নিয়ে ট্যাক্সি চড়ে এসে হাজির হল তখন সন্দেহের আর অবকাশ রইল না। সান্ত্বনার দিকে দু-চারবার যে দৃষ্টি সে নিক্ষেপ করলে তার অর্থ পরিষ্কার। সান্ত্বনা অবশ্য বেশি বিচলিত হল না। এ জাতীয় দৃষ্টির সম্মুখীন সে বহুবার হয়েছে জীবনে। ফিটফাট রূপসী মেয়েদের ভাগ্যই এই—বিশেষত তার যদি দামী গয়না শাড়ি থাকে এবং সে যদি একটু পুরুষ-ঘেঁষা হয়। বিপদেও পড়তে হয় বেচারাদের। সমালোচনা তারা অগ্রাহ্য করতে পারে, কিন্তু বিপদকে এড়াতে পারে না সব সময়। সান্ত্বনাকে বিপদেই পড়তে হয়েছিল একবার। জনৈক লেখকের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে নিছক সাহিত্য-প্রীতিবশতঃই সে উক্ত বিবাহিত ভদ্রলোকের সঙ্গে কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা করেছিল। সমাজহিতৈষীদের টনক নড়ে উঠল অমনি। ওঠাটাই স্বাভাবিক। প্রথমত সে সুন্দরী, দ্বিতীয়ত শিক্ষিতা, তৃতীয়ত কমরেড্, চতুর্থত কাউকে কেয়ার করে না, পঞ্চমত এক নাইট স্কুলে পড়াবার ছুতোয় রোজ সন্ধেবেলা বেরিয়ে যায়, ফেরে অনেক রাত্রে। ষষ্ঠত ওই লেখক ভদ্রলোকের সঙ্গে মাখামাখি করে তার পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি করেছে। তুমুল তুফান উঠল। সান্ত্বনা কিন্তু গ্রাহ্য করলে না কিছু। সমস্ত সমালোচনা তুচ্ছ করে নিবিষ্ট চিত্তে লেগে রইল সে তার নাইট স্কুলে। যুবকদের মধ্যে জনকয়েক ভক্তও জুটে গেল তার এজন্যে। সে কিন্তু কাউকে আমল দিল না। দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্যের অন্তরালে আত্মগোপন করে সে তার নাইট স্কুলেই লেগে রইল। দু'একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া আর কারও সঙ্গে মিশত না। কথা পর্যন্ত বলত না কারও সঙ্গে। লেখকটির সংস্রব আগেই ত্যাগ করেছিল। এই সময়েই সুশোভনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয় তার। বিরাট কোলকাতা শহর। সে-ও সুশোভনের খবর রাখেনি, সুশোভনও তার খবর পায়নি। সান্ত্বনার আপন বলতে ছিলেন এক বিধবা মা। কিন্তু তিনি থেকেও ছিলেন না। বুড়ো বয়সে টি.বি. হয়ে ধরমপুর স্যানাটোরিয়াম্ আশ্রয় করেছিলেন তিনি। সান্ত্বনা থাকত মামার বাড়িতে। কিন্তু মামা যখন দেখলেন ভাগ্নী 'কমরেড' হয়ে উঠেছে তখন স্পষ্ট ভাষায় নিজের সেকেলে অভিমত ব্যক্ত করলেন তিনি একদিন। ফলে, সান্ত্বনা গিয়ে এক হোটেলে উঠল। হোটেলেই

হয়তো থাকতে হতো তাকে, যদি না সুরেশ্বরী দেবী সে সময় কোলকাতায় এসে পড়তেন। সুরেশ্বরী দেবী এসেই সান্ত্বনার কলঙ্ককাহিনীর সালঙ্কার বর্ণনা শুনলেন। শুনেই চটে গেলেন তিনি। সান্ত্বনার মা তাঁর বাল্যসখী, সান্ত্বনাকে একটুকু বয়স থেকে দেখছেন তিনি, সান্ত্বনার সম্বন্ধে এসব কথা বিশ্বাসযোগ্যই মনে হল না তাঁর। সান্ত্বনা ওরকম কিছু করতেই পারে না। বাজে কথা সব। সান্ত্বনাকে নিয়ে চলে গেলেন তিনি দেহাতে নিজেদের জমিদারিতে। সান্ত্বনা ফিরে এল অবশ্য কিছুদিন পরে। তখন ঝড়টা থেমে গেছে। তার কিছুদিন পরেই অধ্যাপক ব্রজেশ্বরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরীতে আর যায়নি সে। মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরীই দিগ্বিজয়বাবুর জমিদারি। সুরেশ্বরী ব্রজেশ্বরকে দেখেননি, তাই নিমন্ত্রণ করেছিলেন যাবার জন্যে।

শার্দূল সিং প্রেরিত ট্যাক্সিখানা সুশোভনের বাড়ির সামনে এসে হর্ন দিয়ে দাঁড়াল। ড্রাইভারটি বাঙালী কিন্তু বলিষ্ঠ। কাইজারি ছাঁদের গোঁফ। হর্ন শুনে চাকরানীটি কপাট খুলে মুখ বাড়াল।

"সুশোভনবাবুর কি এই বাড়ি"

"হ্যাঁ"

"খবর দাও যে শার্দূল সিং গাড়ি পাঠিয়েছেন"

"ট্যাক্সি করে কোথা যাবে আবার এখন। এই তো এল"

"অনেক দূর যেতে হবে, তুমি খবর দাও না"

"তোমায় ডাকল কে"

"ফোনে খবর দিয়েছিলেন বাবু"

"ফোনে? কোথা থেকে?"

"আরে খবর দাও না তুমি"

মুক্ত দ্বারপথে সান্ত্বনার জিনিসপত্র ড্রাইভারের নয়নগোচর হল।

"ওই সব মাল যাবে নাকি"

"ওঁরা যদি যান, মালও যাবে বই কি"

ড্রাইভার নেমে এসে মালগুলি পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

"শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন নাকি"

"কোথা যাবেন তা কেমন করে বলব"

চাকরানী খবর দিতে উপরে চলে গেল। ড্রাইভার জিনিসপত্র তুলতে লাগল ট্যাক্সিতে। একটু পরেই সুশোভন নেবে এল সান্ত্বনাকে নিয়ে। ড্রাইভারের দিকে চেয়ে সুশোভন বললে, "তোমাকে চিনি বলে তো মনে হচ্ছে না। শার্দূল সিংয়ের প্রায় সব ড্রাইভারের সঙ্গেই আলাপ আছে আমার"

"আমি নতুন বাহাল হয়েছি সার"

"তোমার নাম কি?"

"গণেশ সরকার"

"জোর হাঁকাতে পারবে তো"

"পারব না কেন সার। কিন্তু ধরুন যদি কোন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় তার খেসারত দেবে কে?"

"সে ঝুঁকি আমার"

গণেশ গোঁফজোড়া একবার চুমরে নিয়ে বলল, "বেশ! পৌঁছবার পর গরিবকে যেন ভুলে যাবেন না সার।"

"শার্দুল সিংয়ের পুরোনো কোন ড্রাইভার এসে একথা বলতো না। তারা চেনে আমাকে।"

"বেশ"

সুশোভন সান্ত্বনা উঠে বসল।

গণেশ আর একবার গোঁফ চুমরে গাড়িতে স্টার্ট দিলে।

।। চার ।।

বিবেকানুমোদিত সৎকর্ম সুসম্পন্ন করবার পর যে জাতীয় সুনিদ্রা হওয়া উচিত সদারঙ্গবিহারীলালের নিদ্রা তার চেয়েও গাঢ়তর এবং দীর্ঘতরই হয়েছিল, কারণ বেচারাকে পরিশ্রমও করতে হয়েছিল যথেষ্ট। সমস্ত দিন মোটরবাইকে টো টো করে ঘুরে বেড়ানো কম ক্লান্তিজনক নয়। কিন্তু কোন কাজ ক্লান্তিজনক বলেই তার থেকে নিবৃত্ত হবেন এমন লোক সদারঙ্গ-বিহারীলাল নন। উমেশ চৌবে যেই তাঁকে এসে ধরলেন যে তাঁর হয়ে ভোট ক্যানভাস করতে হবে—অমনি রাজি হয়ে গেলেন তিনি।

...পাঁচির মায়ের ঠেলাঠেলিতে নিদ্রাভঙ্গ হল।

"জনার্দনবাবু ডাকছেন যে তোমাকে। কতক্ষণ আর ঘুমুবে, রোদে কাঠ ফাটছে যে চারিদিকে—"

"ও! রোদ উঠে গেছে নাকি। অ্যাঁ—ছি—ছি"

অপ্রস্তুতমুখে সদারঙ্গবিহারীলাল বিছানায় উঠে বসলেন এবং বালিশের তলা থেকে চশমাটি বার করে পরিধান করলেন।

"বড্ড বেলা হয়ে গেছে—অ্যাঁ—ছি—ছি—"

হাসিমুখে পাঁচির মায়ের দিকে চাইলেন একবার। চশমার পুরু লেন্স থেকে আলো ঠিকরে পড়ল।

"জনার্দনবাবু বাইরে অনেকক্ষণ থেকে ডাকাডাকি করছেন"

"জনার্দনবাবু? অনেকক্ষণ থেকে? ও—"

তাড়াতাড়ি চটিটা পরে সদারঙ্গবিহারীলাল বাইরে যেতে উদ্যত হলেন, চোখে মুখে জল না দিয়েই।

"কালকের মতো না খেয়ে বেরিও নি যেন। চায়ের জল চড়িয়েছি, বেশি দেরি কোরোনি যেন বাইরে।"

"চায়ের জল? ও—হ্যাঁ—না—আসছি এখুনি"

বেরিয়ে গেলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"জনার্দনবাবু যে। বাঃ—চা খাবেন তো নিশ্চয়ই—সিঙাড়া—"

হঠাৎ থেমে যেতে হল তাঁকে। জনার্দনের মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল, চক্ষু অগ্নিবর্ষী। অদম্য সদারঙ্গ-বিহারীলালও দমে গেলেন ক্ষণকালের জন্য। এ কি হল।

"উমেশলালের জন্য ক্যানভাস করে বেড়িয়েছেন শুনলাম"

প্রত্যেকটি কথা ছর্‌রার মতো নির্গত হল জনার্দনের মুখ থেকে।

"হ্যাঁ—"

"লজ্জা করে না আপনার"

"লজ্জা? লজ্জা করবার কিছু আছে নাকি, জানি না তো, ভদ্রলোক ধরলেন এসে"

"উমেশলাল ভদ্রলোক? ভদ্রলোক কি পরের খাসি চুরি করে খায়?"

"খাসি? না—না—কি যে বলেন আপনি—বি.এ. বি.এল—গড্!"

"গ্রামের প্রত্যেকটি খাসি ওর পেটে গেছে। তাছাড়া মিউনিসিপাল কাউন্সিলার হবার কি যোগ্যতা দেখলেন ওর? যার নিজের বিষয় দেনার দায়ে বিকিয়ে যাচ্ছে সে মিউনিসিপালিটি সামলাবে"

জনার্দন চক্ষু দু'টি অত্যন্ত ছোট করে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তাঁর চোখের দিকে। সদারঙ্গবিহারীলাল অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। চোখের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন, কানে কড়ে আঙুল ঢুকিয়ে সজোরে কানটা চুলকুলেন, কাশলেন একবার। কিন্তু নাঃ—কোনও লাভ হল না। জনার্দন নির্নিমেষ।

"ভদ্রলোক ধরলেন এসে সকালবেলা—"

"ওই হনুমানটা যদি ধরে এসে আপনাকে, ক্যানভাস করবেন তার হয়ে?"

নিকটবর্তী বৃক্ষে উপবিষ্ট হনুমানটিকে দেখিয়ে জনার্দন পুনরায় প্রশ্ন করলেন।

সদারঙ্গবিহারীলাল আড়চোখে হনুমানটির দিকে চাইলেন একবার।

"বলুন—"

"হনুমানের কথা বলছেন? আরে নাঃ—কি যে বলেন—ছি ছি—"

নিজের ক্ষুদ্রায়িত চক্ষুকে স্বাভাবিক আকৃতি দান করে জনার্দন বললেন—"শুনুন, যা করবার তা তো করেইছেন। এখন ভুল সংশোধন করতে হবে।"

"ভুল মানে? ভুল—মানে"—

"মানে প্রত্যেক লোককে গিয়ে আবার বলে আসতে হবে যে আমি আসল খবর জানতাম না—তাই উমেশ চৌবের হয়ে ক্যানভাস করেছি। এখন তাঁর কীর্তিকলাপ শোনবার পর তোমাদের আবার মানা করতে এসেছি তাকে একটি ভোট দিও না কেউ। সমস্ত ভোট বৈজুপ্রসাদকে দেবে।"

"বৈজুপ্রসাদ? ঘিয়ে সাপের চর্বি অনর্গল মেশায় শুনেছি লোকটা"

"তা মেশাক। কিন্তু ওকে যদি তোমরা কমিশনার করে দিতে পার ও একটা গার্লস স্কুল করে দেবে বলেছে নিজের খরচে। উমেশ চৌবে পারবে?"

"দেবে বলেছে নাকি"

সদারঙ্গবিহারীলালের মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

"না বললে অমনি আপনার কাছে এসেছি"

"অত বড় ভাল কাজ যদি একটা হয় তাহলে আমি—"

"করতেই হবে"

"বেশ"

সদারঙ্গবিহারীলাল চিরকালই স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তারের পক্ষপাতী।

আলো ঠিকরে পড়ল তাঁর চশমার লেন্স থেকে।

।। পাঁচ ।।

ফাৎনাফিরিঙ্গিপুরের নাম বাইরের লোকের কাছে অজ্ঞাত হলেও স্থানটি নগণ্য নয়। অন্য কোন কারণে না হোক, গোঁসাইজির হরিমটর নিরামিষ হিন্দু পান্থনিবাসের জন্যেই ও অঞ্চলে ফাৎনাফিরিঙ্গিপুর বিখ্যাত। হোটেলের নামের সঙ্গে হরিমটর শব্দটি যে অশোভন সে জ্ঞান যে গোঁসাইজির নেই তা নয়। কিন্তু হরিহর গোস্বামী ধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন লোক। প্রিয়বন্ধু মটর বৈরাগীর টাকা নিয়ে তিনি হোটেলটি শুরু করেছিলেন। তখন হোটেলটির নাম ছিল 'নিরামিষ হিন্দু পান্থনিবাস'। এখন মটর বৈরাগী গত হয়েছেন। বিশেষ করে সেইজন্যেই বন্ধুর স্মৃতিরক্ষাকল্পে হোটেলটির নূতন নামকরণ করেছেন তিনি। নিজের নামটিও অবশ্য সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। টাকা মটর বৈরাগীর, কিন্তু পান্থনিবাসের আসল স্রষ্টা তো তিনিই। হরিমটর শব্দটির এই ইতিহাস। নামটি লিখে প্রকাণ্ড একটি সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছেন সামনেই। কারও দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

অর্থ উপার্জন করবার জন্যে গোঁসাইজি হোটেল খুলে অন্ন বিক্রয় করেছেন এ কথা যাঁরা মনে করেন তাঁরা শ্রীযুক্ত হরিহর গোস্বামীকে ঠিক চেনেন না। অতিশয় নিষ্ঠাবান আস্তিক্য-বুদ্ধি-সম্পন্ন শ্লীলমনা নিষ্কাম ব্যক্তি ইনি। গীতার উপদেশ অনুসারেই কর্মযোগ অবলম্বন করেছেন কেবল। পয়সার চেয়ে নীতির দিকেই এঁর লক্ষ্য বেশি। মাছ মাংস ডিম পেঁয়াজ হোটেলের ত্রিসীমানায় ঢুকতে পায় না। হোটেলে রাত্রিবাস করবার জন্যে যদি কেউ আসে, তাহলে পয়সা ফেললেই রাত্রিবাস করবার অধিকার লাভ করে না সে। তার চালচলন কথাবার্তায় গোস্বামী মশায় ঘুণাক্ষরে যদি সন্দেহজনক কিছু আবিষ্কার করেন, তাহলে আর স্থান হয় না তার হোটেলে। রাত্রিবাস করবার জন্যে দ্বিতলে দু'খানি ঘর আছে। ত্রিতলের ঘরটিতে গোঁসাইজি নিজে শয়ন করেন। বর্তমানে দ্বিতলের দু'খানি ঘরই অধিকৃত। একটিতে শয্যাশায়ী বৈষ্ণবী রোগিণী আছেন একজন। ইনি গোস্বামী মহাশয়ের গুরুভগ্নী। গুরুভ্রাতার সঙ্গে দেখা করতে এসে গুরুতর অসুখে পড়ে গেছেন। দ্বিতীয় ঘরখানিতে আছেন এক শিক্ষক-দম্পতি। ফাৎনাফিরিঙ্গিপুরের মাইনর স্কুলের হেডমাস্টার যোগজীবন বণিকও সজ্জন ব্যক্তি। উপর্যুপরি দু'টি ঘটনা যুগপৎ ঘটায় ভদ্রলোক বিপন্ন হয়েছেন সম্প্রতি। তাঁর বাসাটি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের। তার বার্ষিক জীর্ণ-সংস্কার শুরু হয়েছে। একটি ঘরের খাপরা নামানো হয়েছে, দ্বিতীয় ঘরটি তিনি ব্যবহার করছিলেন। দিন দুই আগে তার মা হঠাৎ এসে পড়েছেন কোনও খবর না দিয়ে। যোগজীবনবাবু সজ্জন লোক। মায়ের সঙ্গে এক ঘরে স-স্ত্রীক শুতে পারেন না তিনি। এই শীতে বারান্দায় শোওয়াও অসম্ভব। মুশকিলে পড়েছিলেন। গোস্বামী মহাশয় আশ্রয় দিয়েছেন তাঁকে দ্বিতীয় ঘরটিতে।

রাস্তার ধারে হোটেলটির একটি আপিসও আছে। গোঁসাইজি খুঁত রাখেননি কিছু। আপিসে আপিসোচিত সমস্ত কিছুই বর্তমান। পাঁজি, ক্যালেন্ডার, হিসাবের খাতা, লেখবার সরঞ্জাম, লাল-

কালো দু'রকম কালি এবং কলম, হাতবাক্স একটি, টেবিল চেয়ার কোনও জিনিসের ত্রুটি ছিল না। কিছুদিন থেকে গোঁসাইজি নূতন একটি খাতা খুলেছেন। অ্যাডমিশন রেজিস্টার। ইংরেজি নাম দেবার ইচ্ছা ছিল না। কেবল 'অ্যাডমিশন' শব্দটির লোভে ম্লেচ্ছ ভাষার শরণাপন্ন হতে হল তাঁকে। 'অ্যাডমিশন' শব্দটি দ্ব্যর্থক। 'স্বীকৃতি' এবং 'প্রবেশ' দুই অর্থই করা যায় এর। এক ঢিলে দু পাখি মারা যায় এরকম বাংলা বা সংস্কৃত শব্দ গোঁসাইজির জানা ছিল না। তাঁর হোটেলের উক্ত ঘর দু'টিতে প্রবেশকারীকে স্বহস্তে নিজের পূর্ণ পরিচয় এই খাতায় লিখতে হয়। কিছুদিন পূর্বে গোঁসাইজি এক নিরীহ আকৃতির ছোকরাকে আশ্রয় দিয়ে বিপদে পড়েছিলেন। ছোকরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ এসে হাজির। ছোকরা নাকি এক ফেরারি অ্যানার্কিস্ট। ভাগ্যে দারোগার সঙ্গে জানাশোনা ছিল তাই রক্ষা পেয়ে গেলেন। তারপর থেকেই গোঁসাইজি সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।

গোঁসাইজির আপিসের জানলা কাচ-দেওয়া। কিন্তু ধুলায় ধোঁয়ায় কাচের স্বচ্ছতা নষ্ট হয়ে গেছে। রাস্তার দিকের ঘর বলে সেটিকে মনোহর করবার চেষ্টা করেছিলেন গোঁসাইজি যথাসাধ্য। কাচ দিয়েছিলেন, চৌকাঠের ফ্রেমে সবুজ রঙও লাগিয়েছিলেন। কিন্তু দেশের জলহাওয়া এমন বদ যে সবুজ ক্রমশঃ ধূসর হয়ে অবশেষে এমন একটি রঙে পরিণত হয়েছে যা বর্ণনা করা কঠিন। শুধু তাই নয়, জানলার কপাটগুলো এমন 'যাম্' হয়ে গেছে যে খোলেই না সহজে। খোলবার বিশেষ চেষ্টাও করেন না গোঁসাইজি। যা ধুলো, বন্ধ থাকাই ভাল।

..... সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। শীতের কনকনে বাতাস উঠেছে একটা। নিজের আপিস ঘরে মঙ্কিক্যাপ পরে হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বেলে গোঁসাইজি তন্ময়চিত্তে দৈনিক হিসাব লিখছিলেন। জানালাটি বন্ধ। সুতরাং সুশোভন-সান্ত্বনার আগমন বা কথোপকথন টের পেলেন না তিনি।

"যাক্"—

সুশোভন বলে উঠল। আর পারছিল না বেচারা। দু'হাতে সান্ত্বনার দুটো ভারি স্যুটকেস। অপেক্ষাকৃত ছোটটি রাস্তায় নামিয়ে রেখে সে ঊর্ধ্বমুখে সাইনবোর্ডটা পড়তে লাগল।

"বলিনি তোমাকে, কাছে-পিঠে ঠিক একটা হোটেল আছে? এই দেখ—হরিমটর নিরামিষ হিন্দু পান্থনিবাস। স্বত্ত্বাধিকারী বৈষ্ণবাচার্য শ্রীহরিহর গোস্বামী—"

"এর নাম কাছে পিঠে? অন্তত চার মাইল হেঁটেছি"

"যাক এসে তো পড়া গেছে! নিরামিষ হিন্দু হোটেল—তা হোক"

"হরিমটর কথাটির তাৎপর্য কি?"

"কি জানি?"

"যাই হোক্ চলুন, ঢোকা তো যাক্"

সান্ত্বনা এগিয়ে গিয়ে কপাটটা ঠেলতেই খুলে গেল সেটা। সুশোভন রাস্তা থেকে স্যুটকেস দুটো তুলে নিলে আবার। বেশ ভারি। কি এনেছে সান্ত্বনা। আপিসের জানালার অস্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়ে যৎসামান্য আলো প্রবেশ করছিল বাইরের ঘরটিতে।

"যাক্ শেষ পর্যন্ত—" কথা অসমাপ্ত রেখে সুশোভন স্যুটকেস দু'টি মেঝেতে নামিয়ে ফেলল।

"উফ্—সর্বাঙ্গ ধুলোয় ভরে গেছে একেবারে। কথা বলছ না যে"

"বড় ক্লান্ত লাগছে"

"ক্ষিদে পায়নি?"

"খুব পেয়েছে। আপনার।"

"আমার! ফাৎনাফিরিঙ্গিপুরের এই হোটেলের খবর না জানলে তোমার ঝুনুকেই গিলে ফেলতাম রাস্তায় আমি। যাক্, আর কোন চিন্তা নেই। এসে যখন পড়া গেছে, তখন রাত্রের মতন আহার বাসস্থান জুটে যাবেই যা হোক্ করে। সকাল নাগাদ গণেশ এসে পড়বে—কি বল—অ্যাঁ—"

চেষ্টা সত্ত্বেও সুশোভনের কণ্ঠস্বরে আশার সুর ঠিক বাজল না যেন। চার মাইল দু'দুটো ভারি স্যুটকেস বয়ে কেমন যেন দমে গিয়েছিল বেচারা। উঁচু-নীচু মেঠো রাস্তা, সূচীভেদ্য অন্ধকার। তার উপর কনকনে পুবে হাওয়া। সান্ত্বনা বেচারাও বেশ কাবু হয়ে পড়েছিল। যে সপ্রতিভতা তার চোখে মুখে সর্বদা দেদীপ্যমান থাকে তা নিবে গিয়েছিল যেন। যাবারই কথা। শখ করে মেঠো রাস্তায় হেঁটে বেড়ানো এক, আর হঠাৎ পথের মাঝখানে মোটর বিগড়ে হাঁটতে বাধ্য হওয়া—আকাশপাতাল তফাৎ যে। আর এ কি যে সে মাঠ! তেপান্তর ছেলেমানুষ এর কাছে। সুশোভন প্রথমটা দমেনি। "এতে আর কি হয়েছে। মোটরে অমন হয়েই থাকে, এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে সব" গোছের একটা ভাব দেখিয়ে হালকা হাসি হেসে হাঁটতে শুরু করেছিল সে। কিন্তু ক্রমেই গম্ভীর হয়ে পড়তে লাগল। বেশ ভারি স্যুটকেস দুটো। সান্ত্বনা ঝুনুকে বুকে করে নিয়েছিল।

খানিকক্ষণ হেঁটে সে বলল, "চলুন, ওই মোটরেই ফেরা যাক্। অন্ধকারে কোথা যাচ্ছেন"

সুশোভন বললে, "শুনলে না, ফাৎনাফিরিঙ্গিপুরে গোঁসাইজির ভাল হোটেল আছে। রাত্রে মাঠের মাঝখানে থাকা ঠিক নয়"

হোটেল যে আছে হরিমটর নিরামিষ পান্থনিবাসে প্রবেশ করবার পর তা আর অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু সেজন্য সুশোভনকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রবৃত্তি হল না সান্ত্বনার।

তরকারি রান্নার গন্ধ ভেসে আসছিল একটা। কলের তেলের দুর্গন্ধ! নিশ্চয় গোয়াল কিম্বা আস্তাবলও আছে কাছে কোথাও। তেলে গোবরের গন্ধ ছাড়বে কি করে। সান্ত্বনা বসে পড়ল একটা স্যুটকেসের উপর।

"দাঁড়িয়ে আছেন কেন, যাহোক একটা ঠিক করে ফেলুন এবার। চারটি খেয়ে শুতে পারলে বাঁচি"

"যা বলেছ"

সুশোভন এগিয়ে গিয়ে একটু ঝুঁকে জানলার কাচের ভিতর দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে।

"কিছু দেখতে পাচ্ছেন?"

"কালো মতন কি যেন একটা"

"ডাকুন"

বাঁ হাতটি মুখের উপর রেখে ছোট্ট একটি হাই তুললে সান্ত্বনা। সুশোভন বার দুই ডেকে কোন সাড়া না পেয়ে ধাক্কা দিলে জানলায় শেষে।

"কে—"

বেরিয়ে এলেন গোঁসাইজি।

"আপনিই কি গোঁসাইজি—"

মঙ্কি-ক্যাপ দেখে সুশোভনের সন্দেহ হচ্ছিল একটু।

"হ্যাঁ?"

"নমস্কার। রাত্রের জন্যে আমরা দু'জন—"

"ক্ষমা করবেন। আপনাদের সৎকার করতে অক্ষম আমি আপাতত"—

গোঁসাইজি যথাসাধ্য শুদ্ধ কথা ব্যবহার করে থাকেন।

"অক্ষম! কেন?"

"স্থানাভাব। আমার দু'টি ঘরেই অতিথি রয়েছেন।"

"একটু জায়গা হবে না কোথাও?"

"না"

গোঁসাইজি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন।

"কচু খেলে যা—" অর্ধস্বগত উক্তিটা বেরিয়ে পড়ল সুশোভনের মুখ থেকে।

"খাবার কিছু পাওয়া যাবে অন্তত আশা করি"—

গোঁসাইজি কটমট দৃষ্টিতে সুশোভনের দিকে চেয়েছিলেন।

"ওই ধরনের অশ্লীল কথা ফের যদি উচ্চারণ করেন, তাহলে খাবারও পাওয়া যাবে না"

"মাপ করবেন, আপনাকে শুনিয়ে কথাটা বলিনি—মানে—"

"ভগবান কিন্তু শুনেছেন"

"কি করে জানলেন আপনি?"

মেজাজ আর ঠিক রাখতে পারছিল না সুশোভন।

গোঁসাইজি সান্ত্বনার দিকে ফিরে বললেন—"ভদ্রলোকের মুখ থেকে আমি এ রকম কুৎসিত ভাষা প্রত্যাশা করিনি।"

"খুব অন্যায় হয়েছে ওঁর। খাবার কি পাওয়া যাবে"—সান্ত্বনা জবাব দিলে।

গোঁসাইজি সুশোভনের দিকে চেয়ে বললেন, "কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। খাতায় ঠিক ঠিক টোকা থাকে সব।"

"কিছু খাবার কি পাওয়া যাবে?"

পুনরায় বললে সান্ত্বনা।

"দেখি। সাধারণত বাড়তি খাবার থাকে না আমার। আর তাছাড়া আর একটি কথা শুনে রাখুন গোড়াতেই হোটেল আমার, মনোমত লোক ছাড়া ঢুকতে দিই না আমি কাউকে এখানে।"

সুশোভন বলে ফেললে—"তবু এখানে স্থানাভাব। আশ্চর্য কাণ্ড!"

গোঁসাইজির ভ্রূ কুঞ্চিত হল। সান্ত্বনারও হল।

"বড় ক্লান্ত আমরা, ক্ষিদেও পেয়েছে, কিছু খাবার যদি থাকে...শোবার জায়গা কোথায় যে আবার যোগাড় হবে এত রাত্রে"

একটু কাতর কণ্ঠেই বললে সান্ত্বনা।

"এখানে টেলিফোন করবার ব্যবস্থা আছে কোন?" —সুশোভন জিজ্ঞেস করলে।

"না।"

"কাছাকাছি কোথা থেকে টেলিফোনে করা সম্ভব?"

"কোথাও থেকে নয়। হ্যাঁ হতে পারে—পাঁচ মাইল দূরে একটা পোস্টাপিস আছে, সেখানে থেকে হতে পারে"

"পাঁচ মাইল! রামচন্দ্র!"—বলেই সামলে নিলে সুশোভন।

"রামচন্দ্র বলে আমার চেনাশোনা লোক আছে একজন, তাকে টেলিফোন করব ভাবছিলাম। কিন্তু তার তো কোন উপায় নেই আপাতত। গাড়িটাড়ি পাওয়া যেতে পারে?"

"না"

"এখানে ঘোড়ার গাড়ি গরুর গাড়ি কিছু পাওয়া যায় না?"

"না"

"লে হালুয়া—ও মানে— হালুয়াগঞ্জে যাবার কোনও উপায় নেই তাহলে"

গোঁসাইজির ভ্রূর কুঞ্চন ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল ক্রমশ।

"হালুয়াগঞ্জ বলে কোন স্থানের নাম তো শুনিনি"

"আপনি শোনেন নি হয়তো, কিন্তু আছে"

সান্ত্বনা অধীর হয়ে উঠল।

"ওসব বাজে কথা থাক্ এখন। আমাদের খাবার ব্যবস্থাটা করে দিন দয়া করে"

গোঁসাইজি সান্ত্বনার দিকে ফিরে চাইলেন। ছোঁড়াটা যদিও অসভ্য, মেয়েটি কিন্তু শ্রীমতী। দ্বারের দিকে চেয়ে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন—"ফদ্‌কা—"

তারপর সান্ত্বনার দিকে ফিরে বললেন—"আপনার মুখ চেয়েই আমি খাবারের ব্যবস্থা করলাম।" তারপর সুশোভনের দিকে চেয়ে বললেন—"আপনার স্বামী যদি একা আসতেন, খেতে পেতেন না আমার হোটেলে। যেন তেন প্রকারেণ পয়সা লোটাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য নয়।"

"শুনুন এই মহিলাটি"—সংশোধন করতে গিয়ে সুশোভন থেমে গেল। সান্ত্বনা চোখের ইঙ্গিতে বারণ করলে তাকে।

"এই মহিলাটি কি—"

"এই মহিলাটি আজ রাত্রে আর হাঁটতে পারবেন না। রাত্রের মতো কোনও ব্যবস্থা কি—"

দ্বার খুলে গোঁসাইজির ভৃত্য ফদ্‌কা প্রবেশ করল। তাকে দেখবামাত্রই গোঁসাইজি তেড়ে গেলেন।

" 'হলে' আলো জ্বালিস্‌নি কেন এখনও? বাঁদর কোথাকার"

"আলো জ্বালছিলাম। আনছি—"

ফদ্‌কা বেরিয়ে যাচ্ছিল, গোঁসাইজি বললেন—"আর শোন, ঠাকুরকে বলে দে আরও দু'জনে খাবে। চাল ডাল বার করে নিয়ে যাক্—তরকারি যা আছে ওতেই হবে—"

ফদ্‌কা চলে গেল। স্ত্রীকে 'মহিলা' বলে উল্লেখ করাতে গোঁসাইজি আরও চটেছিলেন। সুশোভনের দিকে ফিরে বললেন, "মহিলাটির কষ্ট হবে বুঝতে পারছি। কিন্তু কি করি বলুন, যাঁরা রয়েছেন তাঁদের তো তাড়িয়ে দিতে পারি না।"

ফদ্‌কা একটা ভাঙা হ্যারিকেন নিয়ে প্রবেশ করল।

গোঁসাইজি আর অধিক বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করে বেরিয়ে গেলেন।

॥ ছয় ॥

কলাইয়ের ডাল এবং চচ্চড়ি সহযোগে খানিকটা কড়কড়ে ভাত গলাধঃকরণ করার পর

সান্ত্বনার প্রসন্নতা অনেকটা ফিরে এলে যেন। সুশোভনের দিকে ফিরে সে বললে—"হয়তো রূঢ় ব্যবহার করেছি ক্ষমা করবেন। সত্যিই বড্ড খিদে পেয়েছিল। কিছু মনে করেননি তো"

"এতে মনে করাকরির কি আছে। ক্ষিদে কি আমারই কম পেয়েছিল? তুমি আবার রূঢ় ব্যবহার করলে কখন, মনে পড়ছে না তো। বরং বেফাঁস কথাবার্তা বলে আমিই সব মাটি করেছিলাম আর একটু হলে"

"বিশেষ করে আপনি যখন বলতে যাচ্ছিলেন যে মহিলাটি আমার স্ত্রী নয়। উনি যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারতেন যে আমরা স্বামী-স্ত্রী নই, তাহলে আস্তাবলে শোয়ার অনুমতিও বোধ হয় দিতেন না"

"যাক্ সে কথা। এখন শোয়ার কি করা যায় বল তো। তোমার পরামর্শ অনুসারে আমরা এখন যদি চলে যাই এখান থেকে, গণেশ আমাদের খুঁজে পাবে না সকালে—"

"কিন্তু পোস্টাপিস থেকে আমরা ফোন করতে পারতাম মাসীমাকে"

"মাসীমার ফোন আছে?"

"আছে। মাসীমার অসুখের সময় অনেক খরচ করে ফোন কানেকশন্ করা হয়েছিল"

কিন্তু এখন পাঁচ মাইল হাঁটতে পারবে তুমি? পুঁইশাকের চচ্চড়ির সাংঘাতিক ক্ষমতা দেখছি"

চারটি ভাত পেটে পড়ার পর সান্ত্বনার স্ফূর্তি সত্যিই ফিরে এসেছিল যেন। সত্যিই তার মনে হচ্ছিল এত দমে যাবার কি হেতু ঘটেছে। 'আউটিং' করতে গেলে এমন মোটর-অ্যাক্সিডেন্ট তো হয়েই থাকে। তারা জলেও পড়েনি। না হয় দু'জনে গল্প করেই কাটিয়ে দেবে রাতটা। না হয় হাঁটবে। চিন্তার কি আছে...। হঠাৎ সুশোভনের দিকে ফিরে সে বললে—"সত্যি ভারী স্বার্থপর আমি। আমার চিন্তার কোন কারণই নেই, কিন্তু আপনার আছে।"

"কি?"

"আপনার স্ত্রী"

সুশোভন গম্ভীরভাবে বললে—"সত্যি, ভয়ানক চিন্তা হচ্ছে" বলেই হেসে ফেললে।

"এখন হাসছেন, কিন্তু আজ রাত্রে পৌঁছবার জন্য ব্যস্ত হয়ে নিজেই তো ট্যাক্সি করলেন—তা না হলে কাল ট্রেনে এলেই চলত"

"বড় বিপজ্জনক প্রসঙ্গ আরম্ভ করেছ। চুপ চুপ, ঠাকুর আসছে বোধ হয়"

মৈথিল ঠাকুরটি আরও চারটি করে ভাত এবং আর একটু তরকারি দিয়ে গেল।

সান্ত্বনা হেসে বললে, "ভয় নেই, আমি সাক্ষী দেব যে আপনি মহদুদ্দেশ্যেই ট্যাক্সি নিয়েছিলেন"

"এ আলোচনা থাক্ এখন। যদি শুনতে পেয়ে যায় তাহলে—" দু'জনে নীরবে খেতে লাগল। অনীতার কথা উঠে পড়াতে সুশোভন একটু দমে গিয়েছিল। সান্ত্বনা সহাস্যদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললে—"আচ্ছা সত্যি করে বলুন তো, বিবাহিত জীবনটা কেমন লাগছে"

গোঁফের প্রান্ত বাঁ হাত দিয়ে পাকাতে পাকাতে সুশোভন বললে, "অনেকটা যেন ধৌতি গোছের"

"ধৌতি? সে আবার কি!"

"বিশুদ্ধীকরণ"

"মানে?"

"মানে বিশুদ্ধ হওয়া। অর্থাৎ বিয়ের আগে যে সব জিনিস মস্ত বড় বলে মনে হয়, বিয়ের পর দিব্যদৃষ্টি লাভ করে দেখা যায় যে সমস্ত বাজে। বিবাহ করবার পর মানুষ খাঁটি হয়, খাঁটি চেনে। বিয়ের আগে যা সোনা ছিল বিয়ের পর দেখা যায় সমস্তই ভ্রম—তা তামাও নয়, পাঁক—সেরেফ খাদ। কেমন, কবিত্বপূর্ণ হল না জবাবটা?"

মৃদু হেসে সান্ত্বনা বললে—"খুব"

"অনীতার মননশক্তি (চিৎশক্তিও বলতে পার) আমার চেয়ে বেশি। এখন আমাকে যা করতে হচ্ছে, বিয়ের আগে যদি জানতাম যে তা করতে হবে—তাহলে বিয়েই করতাম না বোধ হয়। কিন্তু ওর মধ্যে একটু মজা আছে; এখন যা করছি তা যে বাধ্য হয়ে করছি তা-ও নয়, তা করতে ইচ্ছেও হচ্ছে। ধরতে পারলে কথাটা?"

"খুব পেরেছি। যে বিয়ে করেছে সে-ই পারবে।"

"বিয়ের আগে যা ভাল লাগত তাই করতাম, এখন যা করি তাই ভাল লাগে।"

"আপনার স্ত্রীরও ভাল লাগে?"

"লাগা উচিত। অনীতার ভাবগতিক ঠিক বোঝা যায় না যদিও। তোমার কিন্তু যায়। তোমাকে দেখলেই মনে হয় যে তুমি সুখী। তোমার চোখে-মুখে সে কথা লেখা রয়েছে"

"বহু ধন্যবাদ—"

ঠাট্টার সুরে বললেও অকৃত্রিম আনন্দে সান্ত্বনার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"অনীতাও সুখী হয়েছে আশা করি"—একটু ইতস্তত করে বলেই লজ্জিত হয়ে পড়ল যেন সুশোভন।

সান্ত্বনা হেসে বলল—"সুখী না হবার কোন কারণ তো নেই—"

"চুপ চুপ, পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মৈথিল আসছে"

"খট্টা লিবেন?"

"নিশ্চয় লিব। চারটি ভাতও আন"

"আমার আর ভাত চাই না—" সান্ত্বনা বললে।

বড়ির টক দিয়ে সুশোভন আর এক প্রস্থ শুরু করতে যাচ্ছিল, সান্ত্বনা হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল।

"শুনতে পাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ। ঘোড়ার গাড়ি"

"যান, থামান ওটাকে"

"এখানেই থামবে হয়তো"

"আর 'হয়তো'র দরকার নেই—যান যেমন করে পারেন থামান ওটাকে"

"বেশ"

উঠতে হল সুশোভনকে। দ্বার পর্যন্ত গিয়ে বললে—"কিন্তু এঁটো হাতে একটা ঘোড়ার গাড়ির পিছনে পিছনে দৌড়ানোটা কি একটু—"

"যান যান শিগ্‌গির যান—চলে গেল। না, থামল বোধ হয়"

"বাঁচা গেল। ভগবান আছেন"

"ওকি, আবার বসলেন যে এসে"

"অম্বলটুকু শেষ করে নি"

"ছি, ছি, কি আপনি!"

অম্বল শেষ করে সুশোভন বেরিয়ে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এসে বললে— "ভগবান আছেন সত্যিই"

"ঠিক করে ফেললেন গাড়িটা?"

"তার আর দরকার হবে না। আর একটু অম্বল আনতে বলি বরং। বেড়ে হয়েছে টকটা"

"কি হল বলুন না"

"ওপরের একটা ঘর খালি হয়ে যাচ্ছে এক্ষুণি"

"কি করে?"

"ওপরে কে একজন হেডমাস্টার আছেন, তাঁর মায়ের ভয়ানক হাঁপানি উঠেছে। তাঁকে নিতেই এসেছে গাড়ি"

"হেডমাস্টার এখানে ছিলেন?"

"হ্যাঁ, স-স্ত্রীক"

"কি রকম?"

"কি রকম আবার। স-স্ত্রীক ছিলেন, চলে যাচ্ছেন। এই খবরটুকুই যথেষ্ট আনন্দজনক আপাতত, আর অধিক জানবার প্রয়োজন কি? অম্বলটা ফেলে রাখছ কেন, খাও, ভাল হয়েছে"

অম্বলের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সান্ত্বনা বললে—"কিন্তু তাতে আমাদের কি সুবিধে হল?"

"সুবিধে হল না? তিন মিনিটের মধ্যে একটা ঘর খালি হয়ে যাচ্ছে এক্ষুনি"

"কিন্তু মাত্র একটা ঘর খালি হলে সুবিধে হবে তাতে"

ব্যাপারটা এতক্ষণে স্পষ্ট হল সুশোভনের কাছে।

"ও, আচ্ছা বেশ, বেশ আমার ঘর চাই না, আমি বাইরে কাটিয়ে দেব কোথাও রাতটা। এই গুরু-ভোজনের পর স্যুটকেস হাতে ঝুলিয়ে যে পাঁচ মাইল হাঁটতে হল না, তাই যথেষ্ট আমার পক্ষে"

মৃদু হেসে সান্ত্বনা বললে, "আমার স্যুটকেস দুটো বয়ে আনতে আপনার খুবই কষ্ট হয়েছে বুঝতে পারছি। কিন্তু কি করি বলুন। অত গয়না কাপড় মোটরে ফেলে রেখে আসাটা কি ঠিক হত?"

কিছুমাত্র কষ্ট হয়নি আমার। তোমার কষ্টের কথাই ভাবছি। তোমার একটা শোবার ব্যবস্থা হয়ে গেলে বাঁচলুম।"

"বাইরে আপনার অসুবিধে হবে খুব"

"কিছুমাত্র না। এরা চলে গেলে গোঁসাইজির সঙ্গে দেখা করে সব ঠিক করে ফেলছি দেখ না"

বলেই সুশোভন থেমে গেল। পরস্পরের দৃষ্টিবিনিময় হয়ে গেল একটা।

"গোঁসাইজির সঙ্গে কিন্তু সাবধানে কথাবার্তা কইতে হবে"

"নিশ্চয়, উনি যদি কোনক্রমে টের পেয়ে যান যে আমরা স্বামী-স্ত্রী নই, তাহলে—"

"তাহলে আর এখানে স্থান হবে না রাত্রে"

"উপায়?"

খানিকক্ষণ ভেবে সুশোভন বললে—"ভাই-বোন বলে পরিচয় দিতে ক্ষতি কি—"

"গোড়ায় ওঁকে সে কথা তো বলা হয়নি, উনি ধারণা করে নিয়েছেন যে আমরা স্বামী-স্ত্রী। এখন যদি আবার—"

"বেশ দেখা যাক্ কি হয়"

"না না, ঠিক করে ভেবে দেখুন। আমরা যদি স্বামী-স্ত্রী হই, আপনি বাইরে শোবেন কি অজুহাতে"

"বেশ, অজুহাত যদি না খাড়া করতে পারা যায় এক ঘরেই শোয়া যাবে। কি হয়েছে তাতে। তোমার আপত্তি না থাকলেই হল। কিম্বা তোমার যদি আপত্তি থাকে, গোঁসাইজির সামনে আমরা দু'জনে ঘরটায় একসঙ্গে ঢুকব—গোঁসাইজি আমাদের সমস্ত রাত পাহারা দেবেন না নিশ্চয়ই— তারপর উনি গিয়ে শুলেই আমি বেরিয়ে আসব। তারপর তুমি শুয়ে পোড়ো—আমি বারান্দায় থাকব।"

"তারপর সকালে"

"সকালে আবার কি। ভোরে তোমাকে উঠিয়ে দু'জনে একসঙ্গে নেমে আসব। তারপরেই তো গণেশ এসে পড়বে"

সান্ত্বনা চুপ করে রইল। বিয়ের আগে সেই লেখক ভদ্রলোকের সঙ্গে মিছামিছি তার নাম জড়িয়ে সবাই যে কলঙ্ক রটিয়েছিল তার গ্লানিকর স্মৃতি আজও তার মন থেকে মোছেনি। আমার না কিছু হয়। হঠাৎ সে মন-স্থির করে ফেলল—"বেশ, তাই হবে। এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই যখন। কিন্তু একথা গল্পচ্ছলেও কাউকে বলবেন না যেন কখনও।"

"পাগল নাকি!"

শিক্ষক-দম্পতির ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস, বিছানা প্রভৃতি নামতে লাগল উপর থেকে। তাঁরাও নামলেন এবং অযথা বিলম্ব না করে চলে গেলেন। তাঁদের বিদায় দেবার জন্যে গোঁসাইজিও নির্গত হলেন নিজের ঘর থেকে। তাঁরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার গিয়ে ঢুকলেন অবশ্য।

সুশোভন সান্ত্বনাকে বললে, "এবার যাও, বুঝলে, গোঁসাইজিকে একটু চোমরাও গিয়ে।"

"আপনি যাবেন না?"

"আমার চেয়ে তুমি গেলে বেশি কাজ হবে"

একটু মুচকি হেসে সান্ত্বনা বেরিয়ে গেল।

মঙ্কি-ক্যাপটি খুলে ফেলে গোঁসাইজি তাঁর আপিস ঘরের চেয়ারে বসে ক্যালেন্ডার অঙ্কিত ওঁ-বিজড়িত রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তিকে প্রণাম করছিলেন। প্রতিদিন শয়নের পূর্বে তিনি এই পুণ্যকাজটি করে থাকেন। প্রণামান্তে মুখ তুলে দেখতে পেলেন সান্ত্বনা শ্রদ্ধা-গদগদ মুখে তাঁর দিকে চেয়ে আছে।

"কি চমৎকার যে খেলাম আপনার এখানে। এমন চমৎকার রান্না অনেকদিন খাইনি।"

"গোড়াতেই তো বলেছি, পয়সা রোজগার করবার জন্যে আমি হোটেল খুলিনি"

স্নেহভরে সান্ত্বনার মুখের দিকে চাইলেন তিনি।

"আপনাদের ওপরের একটা ঘর খালি হয়ে গেল নাকি এখুনি"

"হ্যাঁ, ইচ্ছে করেন তো নিতে পারেন ঘরখানা"

এত সহজে হয়ে যাবে সান্ত্বনা আশা করেনি।

গোঁসাইজি সান্ত্বনার মুখের দিকে চেয়েই ছিলেন। বেশ একটা লক্ষ্মীশ্রী আছে মেয়েটির, অথচ পড়েছে একটা অসভ্যের হাতে। অদৃষ্ট!

সহসা প্রশ্ন করলেন—"বিয়ে কতদিন হয়েছে?"

"তিন মাস"

"ও। আচ্ছা, বেশ ওপরের ঘরটা নিন আপনারা। আমি ফদ্‌কাকে বলে দিচ্ছি—"

ঘর থেকে বেরিয়েই হল-ঘরে সুশোভনকে দেখতে পেলেন। ভ্রূ কুঞ্চিত করে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তার দিকে। তারপর বললেন, "অ্যাডমিশন খাতায় আপনাদের পরিচয় লিখে দিতে হবে"

অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে সুশোভন বলল, "বেশ তো, দেব, চলুন"

"ভিতরে আসতে পারি?"

বাইরে থেকে অপরিচিত কার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বেশ পুরুষ কণ্ঠস্বর। দ্বার খুলতেই সদারঙ্গবিহারীলাল প্রবেশ করলেন।

"আশা করি বিরক্ত করলাম না। একটু মোবিল হবে কি আপনাদের কাছে"

সদারঙ্গবিহারীলালের আপাদমস্তক ধুলোয় পরিপূর্ণ। কিন্তু সেদিকে তাঁর মোটেই ভ্রূক্ষেপ নেই। আবেগে উৎসাহে চোখের দৃষ্টি জ্বলজ্বল করছে।

"একটু তেল হবে—সামান্য একটু—"

"না"

ভ্রূ কুঞ্চিত করে গোঁসাইজি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন। আপিস ঘরে থেকে সান্ত্বনা বেরিয়ে এল।

"আরে, সান্ত্বনা দেবী যে—অ্যাঁ—একেবারে অপ্রত্যাশিত—ছি ছি—বাঃ! বিয়ের খবর পেয়েছিলাম, কিন্তু যেতে পারলাম না কিছুতে। অধ্যাপক মহাশয়ের নামটি কি যেন, 'দেবী চৌধুরাণী'তে আছে—হ্যাঁ, গট ইট—ব্রজেশ্বর —ব্রজেশ্বর দে। প্রবন্ধ পড়লাম তাঁর একটা সেদিন—খাসা লেখা। ভারি খুশি হলাম আপনাকে দেখে। চমৎকার—বাঃ—"

তাঁর পুরু লেন্সের চশমা থেকে অজস্র রশ্মিরেখা বিচ্ছুরিত হতে লাগল। বিরক্তিকে বিস্ময়ে রূপান্তরিত করে সান্ত্বনা বললে—"আপনার সঙ্গে যে এখানে দেখা হয়ে যাবে তা ভাবিনি সত্যিই। এখানে কোথায় এসেছেন"

"বৈজুপ্রসাদের জন্যে ভোট ক্যানভাস করছি—লোকটি ডিজার্ভিং ক্যান্ডিডেট আমি প্রথমটা ধরতে পারিনি, উমেশ চৌবের জন্যে প্রথমটা—ছি ছি—যাক্, সে লম্বা কাহিনী—আপনি এখানে কি করে এলেন?"

"এসে পড়া গেছে এ অঞ্চলে। রাতটা কাটাচ্ছি এখানে"

"আমার কাছে মোবিল নেই"—গোঁসাইজি আবার বললেন। কিন্তু তাঁর কথা শুনবে কে। সদারঙ্গবিহারীলাল সান্ত্বনার দিকে চেয়ে বলে চলেছেন—"এ অঞ্চলে এসে পড়েছেন যখন রাউতপুরের হিস্টরিক্যাল রিমেন্‌স্‌গুলো দেখে যাবেন, যদি না দেখে থাকেন। দু'একদিনের মধ্যে আমারও যাবার কথা আছে। একাই এসেছেন? ও—আই সি—সো সরি"

"আমার এখানে তেল নেই মশাই, শুনছেন"

সদারঙ্গবিহারীলালের তখন শোনবার মতো অবস্থা নয়। উচ্ছ্বাস অনুতাপ আনন্দ বিস্ময় প্রভৃতি বিবিধ ভাবে তাঁর চিত্ত আলোড়িত হয়ে উঠেছিল সুশোভনকে দেখে। চশমার আলোর ফুলঝুরি কাটছিল।

"আরে রাম রাম—আমার ভাবাই উচিত ছিল—মানে—বাঃ, যাক্। খুব খুশি হলাম—খুব। নামই শুনেছিলাম শুধু—লেখাও পড়েছি একটা—চমৎকার—রাউতপুরে যান যদি—যাওয়া উচিত—মানে ওঁরাও-দের সম্বন্ধে নতুন ক্লু পাওয়া যেতে পারে—আপনি আমার চেয়ে ভাল বুঝবেন অবশ্য। মোবিল অয়েলের খোঁজে এসে—হঠাৎ এখানে—অ্যাঁ—ছি ছি—দেখুন দিকি—বাঃ—বাঃ—"

।। সাত ।।

অনীতা প্রথমটা বিব্রত হয়ে পড়লেও শেষ পর্যন্ত মাথা ঠিক রাখতে পেরেছিল। চেন টানবার কথা একবার মনে হয়েছিল অবশ্য, কিন্তু পঞ্চাশ টাকা জরিমানার কথাটা চোখে পড়তে সে চেষ্টা আর করেনি সে। তাছাড়া ট্রেন থামিয়েই বা কি হবে। সুশোভনকে তুলে নেবার জন্যে গার্ড ট্রেন ব্যাক করে নিয়ে যাবে না নিশ্চয়। তাছাড়া সুশোভনই কি স্টেশনে থাকবে? বিশেষত একটা মেয়ের সঙ্গ পেয়েছে যখন। সমস্ত ছাপিয়ে ওই একটা কথাই মনে কাঁটার মতো খচখচ করছিল। আঃ—।

ট্রেন চলতে লাগল। বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল অনীতা। কঠিন সংযম-সহকারে বসে রইল, বসে বসে তেজ সংগ্রহ করতে লাগল। সাধারণ যে কোনও মেয়ে হয় চেন টানত, না হয় চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে নামবার চেষ্টা করত, কিন্তু স্বয়ম্প্রভার কন্যা কোন রকম আত্মসম্মান-হানিকর ইতরামির মধ্যে গেল না। নীরবে বসে বসে শক্তিসংগ্রহ করতে লাগল কেবল। যদিও সে এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত একজন উৎসাহী 'কমরেড' ছিল, সোভিয়েট রাশিয়ার বন্ধন-বিদ্রোহী বিবাহের যুক্তিগুলো এখনও কণ্ঠস্থ আছে তার, কিন্তু বিবাহের তিনমাস পরেই তার স্বামী যে আর-একজনের পাল্লায় পড়ে বেহাত হয়ে যাবে, স্বাধীনতা-নামধেয় এ যথেচ্ছচারিতার প্রশ্রয় দেবে না সে কিছুতেই। অতটা আলট্রা মডার্ন হবার প্রবৃত্তি নেই তার। পরের স্টেশনে নেমেই সুশোভনকে টেলিগ্রাম করতে হবে যে সে ফিরে যাচ্ছে। টেলিগ্রামটা পেয়ে আর কিছু না করুক—মেয়েটাকে অন্তত সরিয়ে রাখবে সে। বাড়ি ফিরে গিয়ে যদি দেখতে হয় যে আর একটি সুন্দরী মেয়ে তার টেবিলে বসে চা খাচ্ছে, আর সুশোভন হেসে হেসে গল্প করছে তার সঙ্গে—উঃ, তার চেয়ে মরণ ভাল। তাছাড়া সুশোভনকে একলা নিজের এক্তিয়ারের মধ্যে পেলেই যা খুশি করা সম্ভব। আর একজনের সামনে কি বলবে সে! সুশোভনের বক্তব্যটা ধীরভাবে শুনবে সে প্রথমে, তারপর যথাকর্তব্য করবে। দরকার হলে মা-কেও খবর দিতে হবে। হ্যাঁ, মাকে খবর দিতে হবে বইকি! নিজের শক্তি-সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সোজা হয়ে বসল সে।

পরদিন সন্ধ্যায় ট্যাক্সি থেকে নেমে অনীতা দেখলে বাড়িতে কেউ নেই। এমন কি চাকরাণিটা পর্যন্ত অনুপস্থিত। ড্রাইভারের সাহায্যে জিনিসপত্রগুলো নামিয়ে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত ঠায় বসে রইল সে সিঁড়ির উপর। ঘরে তালা বন্ধ। চাবি চাকরাণির কাছে। ঘরদ্বার

পরিষ্কার করবে বলে চাবিটা তার কাছে রেখে যেতে হয়েছিল। মায়ের কাছে গেল না, কারণ সুশোভনের মুখ থেকে সব কথা শোনবার আগে মাকে সে কিছু জানাবে না। সুশোভনের উপর কোনও অবিচার করবে না সে। খুব ক্ষিদে পেয়েছিল, খুব ক্লান্ত লাগছিল, সমস্ত দেহমন ভেঙে পড়েছিল তার যেন। একটুও ভালবাসে না সুশোভন তাকে—একটুও না। এই তো সবে তিনমাস বিয়ে হয়েছে...এর মধ্যেই সে...। ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তি অভিমান সত্ত্বেও সে বার বার আবৃত্তি করছিল মনে মনে—না, না, আমারই ভুল হচ্ছে হয়তো, সুশোভনের দেখা পেলেই বোঝা যাবে কেন সে অমন করে ছুটে চলে গেল—মেয়েটি কে... এখনও আসছে না কেন—সুশোভন... কোথা গেল। পরিচিত পদশব্দের আশায় উৎকর্ণ হয়ে বসে রইল সে। গাল বেয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। মশা ছেঁকে ধরল। অন্ধকার ঘনিয়ে এল চতুর্দিকে।

...সুশোভন কিন্তু এল না। অশ্রু শুষ্ক হল। হৃদয়ও শুষ্ক হতে লাগল ক্রমশ। সে যা সন্দেহ করেছে তাহলে তাই ঠিক। চাকরাণিটা ফিরে এল এগারোটার সময় এবং দিদিমণিকে তদবস্থ দেখে অবাক হয়ে গেল।

নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন হল।

"উনি কখন গেলেন?"

"বেলা আড়াইটের সময়"

"একাই গেছেন?"

হাসি গোপন করে চাকরাণি বললে, "না, সঙ্গে আর একজন ছিলেন"

"একটি মেয়ে কি?"

"হ্যাঁ"

"ফরসা গোছের?"

"হ্যাঁ। একটা কুকুরও ছিল তার সঙ্গে। আমি কুকুরটাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে চাইনি, কিন্তু জামাইবাবু মানলেন না—সব একাক্কার করেছে"

"মেয়েটির সঙ্গে জিনিসপত্র ছিল?"

"অনেক। সব বোঝাই করে নিয়ে গেছে মোটরে"

"নিজেদের মোটর?"

"না, ট্যাক্সি। শার্দূল সিং না কে পাঠিয়েছিল বললে"

"কপাট খোল। আমার টেলিগ্রামটা লেটার বক্সে রয়েছে দেখছি"

"একটু চা কর দিকি। মীট-সেফে কয়েকটা ডিম ছিল, ভাজ সেগুলো। বিস্কুটগুলো বার কর। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে"

"ঘরে কিছু নেই। সব ওনারা খেয়ে গেছেন"

অনীতার সমস্ত মুখ অন্ধকার হয়ে গেল।

"বাজার থেকে কিছু খাবার আন তাহলে। এত রাত্রে পাওয়া যাবে কি কিছু?"

"মোড়ের দোকানটা খোলা আছে"

চাকরাণি কপাট খুলে খাবার আনতে গেল। অনীতার মনে সন্দেহের আর কোন অবকাশ রইল না। মেয়েটাকে নিয়ে এইখানে এসেছিল। আমার শোবার ঘরে। লজ্জা করল না একটু।...তিনকাপ চা, গোটা চারেক রসগোল্লা, ছ'টা সিঙাড়া এবং গোটা পাঁচেক হিঙের কচুরি

খাবার পর অনীতার ম্রিয়মাণ হৃদয় কথঞ্চিৎ সঞ্জীবিত হল। মনে হল আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়। অবিলম্বে কার্যে অগ্রসর হওয়া উচিত।

মাকে ফোন করল সে।

অনেকক্ষণ বকবক করে স্বয়ম্প্রভা দেবী সবে ঘুমিয়ে পড়েছিল। জিতুবাবু তাঁর পাশে চোখ বুজে পড়ে ছিলেন এবং আশা করছিলেন যে এইবার ঘুমুল বোধ হয়। তাঁরও একটু তন্দ্রা আসছিল। কিন্তু হঠাৎ পেটে কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে তড়াক করে উঠে বসতে হল আবার তাঁকে।

"কি—"

"ফোন শুনতে পাচ্ছ না?"

"ফোন?"

আবার বেজে উঠল ফোনটা। বিছানা ছেড়ে উঠলেন জিতুবাবু। ফোন নীচের ঘরে।

"ফোনে তোমাকে ডাকছে"

জিতুবাবু ফিরে এসে বললেন। প্রতিহিংসার একটা চাপা হাসি তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠেছে মনে হল।

"আমাকে? এত রাত্রে কে ডাকছে আমাকে"

"অনীতা"

"অনীতা! সে তো দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে গেছে"

"হয়তো সেখান থেকেই ফোন করছে"

"তাই বললে?"

"না, জিগ্যেস করিনি"

"যাও জিগ্যেস করে এস। আমি ততক্ষণ গায়ে একটা জড়িয়ে নিই কিছু"

"তুমিই যা জিগ্যেস করবার কর না গিয়ে। তোমাকেই চাইছে সে"

"বেশ আমিই যাচ্ছি। কিন্তু তুমি শুয়ো না যেন"

"আমি কি করব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে"

"তোমাকে দরকার হতে পারে হয়তো"

"আমাকে এত রাত্রে কি দরকার হতে পারে"

"কেন ফোন করছে জানি না তো। নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছে, তা না হলে এত রাত্রে ফোন করবে কেন! শুয়ো না তুমি"

"ছি ছি, কাপড়টা ভাল করে পর। চাকররা দেখতে পেলে ভাববে কি"

"চাকররা ঘুমিয়েছে। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত শুয়ো না"

স্বয়ম্প্রভা দেবী চলে গেলেন। ফিরলেন বেশ কিছুক্ষণ পরে এবং জিতুবাবুর দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, "আমি জানতাম"

"এই শীতে মেঝেতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় নাকি" বিছানার ভিতর থেকে করুণ কণ্ঠে বললেন জিতুবাবু।

"সে কথা বলছি না। এ আমি গোড়া থেকেই জানতাম। যাও তাড়াতাড়ি কাপড়জামা পরে নাও, আর একমুহূর্ত দেরি করা চলবে না। করছ কি তুমি, ওঠ না। এ রকমটা যে হবে, গোড়া থেকেই বুঝেছিলাম আমি"

"কি বুঝেছিলে? কি হবে? কাপড়জামা পরব, মানে। ব্যাপারটা কি খুলেই বল না"

স্বয়ম্প্রভা গায়ের র‍্যাপারটা বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে আলনা থেকে একটা গরম ব্লাউজ তুলে নিলেন এবং তার সরু লম্বা হাতায় নিজের বলিষ্ঠ বাহুটি প্রবেশ করাতে করাতে বললেন—"অনীতাকে হাওড়া স্টেশনে ফেলে তার স্বামী পালিয়েছে। আগেই আমি জানতাম। উঠছ না এখনও? এ শুনেও শুয়ে আছ কি করে তুমি? উঠে তাড়াতাড়ি ওভারকোটটা পরে নাও, বেশি কিছু পরবার দরকার নেই এখন। সময়ও নেই। ওঠ, ওঠ, ওঠ না—শুয়ে থাকতে পারছও তো এসব শোনবার পর"

"কবে পালিয়েছে?"

"আজ। উঠবে, না শুয়েই থাকবে লেপের তলায়"

"কোথায় পালিয়েছে?"

"বললাম না, হাওড়া স্টেশনে। আমার হয়ে গেছে—নাও তুমি"

"অনীতা কোথায়? দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে?"

"রসিকতা করছ নাকি?"

নিজেই তিনি জিতুবাবুর ওভারকোটটা এনে দিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে যে অবস্থায় তাঁরা গিয়ে কন্যাকে দেখলেন তাতে অতি-আধুনিকতার কোন চিহ্নই ছিল না। সেই সনাতন আলুলায়িত কেশ, দর-বিগলিত অশ্রু, বুক-ফাটা হা-হুতাশ। হৃদয়বিদারক লজ্জাকর কাহিনীটা বিবৃত করতে করতে কণ্ঠস্বরও অবরুদ্ধ হয়ে আসছিল অনীতার মাঝে মাঝে। ওষ্ঠাধর দৃঢ়-নিবদ্ধ করে স্বয়ম্প্রভা দেবী নীরবে সব শুনে যাচ্ছিলেন এবং মাঝে মাঝে ঘাড় নেড়ে যা প্রকাশ করতে চাইছিলেন তার সরল অর্থ—ঠিক এই আমি ভেবেছিলাম।

"কুসুম আর কি কি বললে?"

কুসুম চাকরাণিটার নাম।

রুমাল দিয়ে চোখ মুছে অনীতা বললে, "সবই তো বললুম"

'ট্যাক্সির নম্বরটা দেখেছিল?

"না। শার্দূল সিং ট্যাক্সি দিয়েছিল শুনলাম"

"শার্দূল সিং? সে তো আমাদের চেনা লোক। দিন সাতেক আগে মনে হচ্ছে তারই একটা ভাঙা মোটরের লোহাগুলো আমরা কিনলাম। শার্দূল সিং-ই তার নাম, না?"

স্বয়ম্প্রভা দেবী জিতুবাবুর দিকে চাইতেই সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন তিনি। নেড়েই অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু স্বয়ম্প্রভা রেহাই দিলেন না।

"কি করছ এখন?"

"কি"

"হ্যাঁ—কি—কি"

"কি মুশকিল। আমি কি—"

"এক কথা বার বার আউড়ে লাভ হবে না কোন। অনীতা যা বললে, শুনলে তো। এখন কি করতে চাও"

"চাইব? চেয়েই তো আছি"

সত্যি জিতুবাবুর ঘুমের ঘোর কাটেনি তখনও।

"তুমি মানুষ না পাথর? এ সব শুনেও কিছু করবে না?"

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন স্বয়ম্প্রভা দেবী।

"কি করব বল। তাই তো জানতে চাইছি—কি করব?"

"পুলিশে খবর দাও"

"পুলিশে। মাথা খারাপ নাকি। এই রাত্রে পুলিশ। পুলিশ কি বস্তু তা চেন?"

"যেমন করে হোক ওকে ধরতে হবে। যেমন করে হোক। এ অপমান কিছুতেই সহ্য করব না আমি"

জিতুবাবু তাঁর কেশবিরল মস্তকে ধীরে ধীরে হস্তসঞ্চালন করছিলেন। ঈষৎ হেসে তিনি বললেন, "কিন্তু তার অপরাধের অকাট্য কোনও প্রমাণ দেখতে পাচ্ছি না আমি এখনও"

মাতা-পুত্রী উভয়েই সমস্বরে বলে উঠলে, "এখনও প্রমাণ দেখতে পাচ্ছ না।"

আর একটু কেসে জিতুবাবু উত্তর দিলেন, "ট্রেন ধরতে না পেরে সে বাড়ি ফিরে এসেছিল, ফিরে এসে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে গেছে। সাধারণ বুদ্ধিতে তো মনে হয় অনীতার উদ্দেশ্যেই গেছে"

অনীতা ক্রোধভরে ঘাড়টা ফিরিয়ে নিলে। বাবার সরলতা সীমা অতিক্রম করছে যেন।

স্বয়ম্প্রভা দেবী জিতুবাবুর মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে হাত নেড়ে বললেন, "আহা, কি বুদ্ধি! মরি মরি"

"আর একটি মেয়ের কথা যা বলছ, তারও হয়তো ওই পথে যাওয়ার দরকার ছিল, হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে হয়তো স্টেশনে—কিম্বা—"

"তুমি থাম, বাবা"—অভিমান-অনুযোগ-ভরা কণ্ঠে অনীতা বললে।

স্বয়ম্প্রভা বললেন, "লোহার কারবার ছেড়ে ব্যারিস্টারি কর গে যাও তুমি। সেই তোমায় মানাবে ভাল"

"আমি বাজি রাখতে পারি"—হঠাৎ চটে গিয়ে জিতুবাবু বলে উঠলেন—"আমি বাজি রাখতে পারি, সুশোভন এতক্ষণে দিগিন্দ্র না দিকপাল সেই ভদ্রলোকের ওখানে পৌঁছে গেছে, আর অনীতাকে সেখানে দেখতে না পেয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে, সকালেই আমি টেলিগ্রাম করব সেখানে"

স্বয়ম্প্রভা বললেন, "তাহ'লে তো সোনায় সোহাগা হবে। টি টি পড়ে যাবে চারিদিকে"

"যাই হোক সমস্ত রাত এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ হবে না এখন। বাড়ি চল। আমি পা-জামা পরেই চলে এসেছি। আমার বিশ্বাস সকাল নাগাদ সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর এখন করবারই বা কি আছে"

"আমি অনীতার কাছে থাকব"

"বেশ থাক। ভালই তো"

"না, মা তুমি যাও। আমার কোনও কষ্ট হবে না"

"কেন, থাকি না"

"না"

জিতুবাবু অধীর হয়ে উঠলেন।

"আঃ, যা হয় ঠিক করে ফেল একটা। ঘুম পাচ্ছে আমার"—তারপর অনীতার দিকে ফিরে বললেন, "মিছিমিছি ভাবছিস, কিছু হয়নি। তাছাড়া আর একটা কথাও মনে রাখা উচিত আমাদের। সুশোভন ঠিক আমাদের মতো নয় তো, সে যে সমাজে মানুষ সে সমাজে স্ত্রীলোক নিয়ে অত শুচিবাই নেই, কারও সঙ্গে একবার ট্যাক্সিতে উঠলেই যে চারিদিকে ঢি ঢি পড়ে যাবে এ কথা ভাবতেই পারে না সে হয়তো"

"এই ঘুমের জন্যে অস্থির হচ্ছিলে, আবার বক্তৃতা শুরু করলে কেন। কত রঙ্গই যে জান—"

"কাল সকালেই টেলিগ্রাম করব আমি। রায় বাহাদুর দিগিন্দ্রমোহন?"

"দিগ্বিজয় সিংহরায়—মুচুকন্দ-কুণ্ডলেশ্বরী"

"আচ্ছা। টুকে দে আমায় একটা কাগজে, ভুলে যেতে পারি"

উভয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। ফিবে এসেই স্বয়ম্প্রভা দেবী ফোন ডাইরেক্টারী খুঁজে শার্দূল সিংকে ফোন করলেন। কোন জবাব পেলেন না। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল তাঁকে। না, সে ট্যাক্সি এখনও ফেরেনি। কোনও খবরও আসেনি এখনও। না, কোথায় গেছে তা জানেন না তাঁরা ঠিক। সুশোভনবাবু শুধু বলেছিলেন অনেক দূরে যেতে হবে, সুশোভনবাবু চেনাশোনা লোক, তাই তাঁরা নির্ভয়ে তাঁর হাতে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়েছিলেন—বিশেষ খোঁজ-খবর করেননি। ড্রাইভারের নাম গণেশ, যদিও নতুন লোক কিন্তু নির্ভরযোগ্য। গণেশ ফিরে এলে তাকে মিসেস সোমের কাছে পাঠিয়ে দেবে তারা।

জিতুবাবু আপিসে পৌঁছে টেলিগ্রাম করবার ফর্ম চাইলেন এবং বেশ কায়দা করে চেয়ার টেনে বসলেন। ব্যবসায় সংক্রান্ত চিঠিপত্র লিখতে আটকায় না তাঁর, কিন্তু এ ধরনের সূক্ষ্ম সামাজিক লিপিকুশলতা তাঁর ধাতে নেই। ব্যাপারটা একটু ঘোরালো গোছেরও। টেলিগ্রাফিক ভাষায় সংক্ষেপে লিখতে হবে। উপর্যুপরি গোটা ছয়েক ফর্ম নষ্ট করবার পর ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে রইলেন তিনি কিছুক্ষণ। অনুচ্চকণ্ঠে বার বার বললেন, "বেশ বেগ দেবে দেখছি।" বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হলেন।

প্রথমত জানা দরকার সুশোভন সেখানে গেছে কিনা। দ্বিতীয়ত জানানো দরকার অনীতা কেন যায়নি, তৃতীয়ত সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা সংক্ষিপ্ত অথচ ভদ্র চেহারা দিতে হবে। ভদ্র চেহারা দিতেই হবে, কারণ ওই দিকপাল ভদ্র বনেদী ঘরের ছেলে—দারুণ ইয়ে—। সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিতে এটি জানানোও দরকার যে অনীতা সামান্য একটু চিন্তিত হয়েছে বটে কিন্তু আতঙ্কিত হয়নি।

পেন্সিল দিয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে মুখবিকৃত-সহকারে তিনি মনে মনে ভাঁজতে লাগলেন—ক্যান ইউ কাইন্ডলি সেন্ড্ নিউজ সুশোভন থিঙ্ক সাম মিস্টেক—ওয়াইফ্ কট্ ট্রেন হি মিস্ড্ সো রিটার্নড্। পছন্দ হল না। আবার ভাঁজতে লাগলেন—ইজ সুশোভন উইথ্ ইউ ওয়াইফ্ মিস্ড্ হিম স্টার্টেড টু কাম বাট্ মিস্ড্ হিম সো রিটার্নড্ হোম্ বাট্ মিস্ড—

তাঁর আপিস ঘরের বাইরে কয়েকজন কর্মচারী জরুরী ফাইলপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এবং অধীরতাসূচক যে সব শব্দ করছিল তাতে আরও গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল যেন সব। অবশেষে বিরক্তভরে অর্ধলিখিত আর এক গোছা টেলিগ্রাফ ফর্ম ছিঁড়ে কুচোকুচি করে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিলেন। দুপুর পর্যন্ত যদি কোন খবর না আসে তখন দেখা যাবে।

"আসুন আপনারা—"

।। আট ।।

অত্যুচ্ছ্বসিত সদারঙ্গবিহারীলালের নমস্কারের প্রত্যুত্তরে সুশোভনকে প্রতিনমস্কার করতে হল, কিন্তু মনে মনে বিব্রত হয়ে পড়ল সে। সদারঙ্গবিহারীলাল? নামটা শোনা-শোনা ঠেকছে। অনীতারই সম্পর্কে কোথায় যেন শুনেছে। ঠিক মনে পড়ল না।

"আপনার বিয়েতে যেতে পারিনি। সেটা আমার দুর্ভাগ্য। আমার 'তারটা' পেয়েছিলেন তো?"

সুশোভনের আবছাভাবে মনে পড়ল বিয়ের সময় অনীতাদের বাড়িতেই এ নামটা সে শুনেছিল যেন। কে যেন বলেছিল সদারঙ্গবিহারীলাল আসতে পারবে না।

"হ্যাঁ, আপনার 'তার' পেয়েছিলাম বইকি"—সান্ত্বনা জবাব দিলে।

"হ্যাঁ, পেয়েছিলাম" সায় দিতে হল সুশোভনকেও। সুশোভনের দিকে চেয়ে সদারঙ্গ-বিহারীলাল শুরু করলেন তখন।

"আপনার কথা অনেক শুনেছি"

"আমার কথা? আমার স্ত্রীর কাছ থেকে বুঝি"

"হ্যাঁ, আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে তো বটেই, আরও অনেক জায়গা থেকে। আপনাদের মতো লোক কি লুকিয়ে থাকতে পারে কখনও—হেঁ হেঁ হেঁ—"

এ কথা শুনে বেশ একটু ঘাবড়ে গেল সুশোভন। একটু ইতস্তত করে চুপ করে রইল, আড়চোখে সান্ত্বনার দিকে চাইলে একবার।

"আপনাদের বিয়ের আগে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একবার নাইট স্কুলে দেখা হয়েছিল, কেমন না?"

প্রশ্নের ভঙ্গীতে সান্ত্বনার দিকে চেয়ে সোচ্ছ্বাসে ভুরু নাচালেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"ও, নাইট স্কুলে"—ক্ষীণভাবে প্রতিধ্বনি করলে সুশোভন।

"হ্যাঁ, নাইট স্কুলে। আপনারও সেখানে আসবার কথা ছিল, কিন্তু কি একটা ব্যাপারের জন্য আপনার আসা হয়নি। সম্ভবত কোনও জরুরি মিটিং-এ আটকে পড়েছিলেন।"

সদারঙ্গবিহারীলাল এমনভাবে চাইলেন সুশোভনের দিকে, যেন কোন দেবদুর্লভ ব্যক্তিকে দর্শন করছেন তিনি।

বিদ্যুৎ-চমক-বৎ সুশোভনের হঠাৎ মনে পড়ল এঁদের চক্ষে সে অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে (যিনি সম্প্রতি উৎসাহী কংগ্রেসকর্মী হয়ে উঠেছেন)—অনীতার সঙ্গে তার বিয়ে হয়নি, হয়েছে সান্ত্বনার সঙ্গে। অপ্রত্যাশিত নেপথ্যলোকে সহসা পরকীয়া লাভ করে সুশোভনের অবচেতন মানসে বেশ একটু পুলক সঞ্চার হল। মন্দ কি। উৎসাহী কংগ্রেসকর্মী অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে হবার শখ নেই তার, কিন্তু সান্ত্বনার স্বামী হওয়াটা—অদ্ভুতগোছের ঠেকলেও—লোভনীয়। বেশ, অভিনয় যদি করতেই হয় ভালভাবেই করতে হবে। বিব্রতভাবটা ঝেড়ে ফেলে বেশ সপ্রতিভ হয়ে উঠল সুশোভন।

সদারঙ্গবিহারীলাল মিনিট দশেকের বেশি ছিলেন না। কিন্তু সেই দশ মিনিটেই তিনি জটটি বেশ পাকিয়ে গেলেন। গোঁসাইজি বুঝলেন যে তাঁর নবাগত অতিথিটির নাম অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে, কথাবার্তা থেকে এ-ও বুঝলেন যে ইনি একজন কংগ্রেসকর্মী। অনেকদিন থেকে সদারঙ্গ-

বিহারীলালের একটি বদ্ধ ধারণা ছিল যে মহাত্মা গান্ধীর পাল্লায় পড়ে যদিও অধিকাংশ কংগ্রেসকর্মী অহিংসাকেই স্বদেশ-উদ্ধারের পন্থা বলে ঘোষণা করে বেড়াচ্ছেন কিন্তু সত্যি সত্যি কেউ অহিংসায় আস্থাবান নন। সুযোগ পেলেই সবাই আস্তিন গুটিয়ে ঘুষি তুলতে প্রস্তুত অর্থাৎ মনে মনে সবাই হিংস্র। তাই যদিও রাত অনেক হয়েছিল এবং তাঁর মোটর বাইকে 'মোবিল' ছিল না তবু এমন একটা সুযোগ ছাড়তে পারলেন না তিনি। এমন একজন নামজাদা কংগ্রেসকর্মীকে এত ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়া গেছে যখন, তখন এ সন্দেহের একটা নিরসন না করে কি ছাড়া যায়? প্রশ্ন শুরু করলেন। প্রশ্নের ধরন থেকেই কি উত্তর তিনি প্রত্যাশা করেন তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল অবশ্য। বিশেষ বেগ পেতে হল না সুশোভনকে।

"আচ্ছা, সত্যিই কি আপনি অহিংস-পন্থায় বিশ্বাস করেন নাকি? মানে, রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে বলছি। কাগজে অবশ্য আপনাদের পোশাকী বক্তৃতা অনেক পড়েছি, কিন্তু কাজ হাসিল করবার জন্যে বক্তৃতায় অনেক সময় অনেক কথাই বলতে হয়—অ্যাঁ, কি বলেন—কিন্তু সত্যি কি আপনি বিশ্বাস করেন যে নিছক অহিংসাতেই আমাদের দেশ উদ্ধার হয়ে যাবে?"

"মোটেই না"—একটু হেসে সুশোভন জবাব দিল—"কিন্তু ও কথা বলা ছাড়া আমাদের এখন গত্যন্তর কি আছে বলুন"

"দ্যাট্স্ ইট্! আপনাদের অহিংস মুখোশের তলায় তাহলে—কিছু মনে করবেন না উপমাটার—মানে—"

"না, মনে করবার কি আছে"

"আপনাদের অধিকাংশ দক্ষিণপন্থীদের আসল মনোভাব তাহলে ওই"

"আমার তো তাই বিশ্বাস"

"সত্যি? বাঃ! আমিও বরাবর ঠিক এই কথা ভেবে এসেছি। প্রকাশ্যে আপনারা অবশ্য স্বীকার করবেন না, করতে পারেন না—"

"তা পারি কি"

"চমৎকার, চমৎকার। যাক্ সন্দেহটা মিটে গেল। অবশ্য ব্যাপারটার মধ্যে বেশ খানিকটা ইয়ে আছে, মানে ভণ্ডামিই বলতে হবে—প্লীজ একস্কিউজ মি—ঠিক জুতসই কথাটা মনে আসছে না। মানে, বুঝতে পেরেছেন আশা করি আমার মনের ভাবটা"

সুশোভন স্মিতমুখে চুপ করে রইল। কথা বাড়াবার ইচ্ছে আর তার ছিল না।

সদারঙ্গবিহারীলাল গলার স্বর খুব খাটো করে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, সুভাষবাবুর সম্বন্ধে মহাত্মাজির আসল মনোভাবটা কি বলুন তো"

"আমি—আমি ঠিক জানি না"

"আপনি জানেন না? বিশ্বাস করলাম না। অবশ্য বলতে বাধা থাকতে পারে। আছে নাকি?"

"তা আছে একটু, মাপ করবেন আমাকে"

"না, না, তাহলে জোর করতে চাই না। সারটেন্‌লি—"

সদারঙ্গবিহারীলাল উদ্ভাসিত মুখে সান্ত্বনার দিকে চাইলেন—চশমার লেন্স থেকে আনন্দ ঠিকরে পড়ছিল যেন।

"সত্যি ভারি আনন্দ পেলাম আপনার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করে। আমাদের মতো লোকের

সঙ্গে অমন সরলভাবে আলাপ করবেন তা কল্পনাতীত ছিল। বাঃ— বাঃ— ভারি আনন্দ হচ্ছে। সব দক্ষিণপন্থীই তাহলে মনে মনে বামপন্থী—বাঃ চমৎকার। রাগ করলেন নাকি?"

"না, রাগ করবার কি আছে এতে—ঠিকই তো বলেছেন"

"বাঃ বাঃ, ভারি খুশি হলাম। আচ্ছা এবার চলা যাক। গোঁসাইজি সত্যি তেল নেই আপনার? একটু হলেই হবে"

"সর্ষের তেল হলে হবে"

"সর্ষের? রাম কহো। তা কি হয়? লুব্রিকেটিং অয়েল চাই"

"আজ্ঞে না আমরা গেঁয়ো লোক, ওসব রাখি না"

সান্ত্বনার দিকে চেয়ে করুণস্বরে সদারঙ্গবিহারীলাল বললেন, "বিপদে যে পড়তে হবে তা বুঝেছিলাম, বুঝলেন। কিন্তু বিপদ যে এমন ঘনীভূত হয়ে উঠবে তা ভাবিনি। একটু মোবিল না পেলে মারা যাব যে একেবারে। মাইল খানিক হেঁটে আসছি। বেশ গরম হয়ে উঠেছিল গাড়িটা। দুর্গতি যাকে বলে। পিস্টন থেকে এমন সব অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে বুঝলেন, মোটেই সুবিধাজনক নয়—শেষকালে কি— এইখানেই রাতটা—"

"আপনার হাজার অসুবিধা হলেও এখানে তো রাত্রে জায়গা দিতে পারব না আপনাকে"—একটু গলা খাঁকারি দিয়ে গোঁসাইজি বললেন—"আপনার সৎকার করতে অক্ষম আমি আপাতত। একটিমাত্র ঘর ছিল সেটি ব্রজেশ্বরবাবুরা নিয়েছেন"

সুশোভন অস্বস্তিবোধ করল একটু।

"আপনি যাবেন কোথা"—সান্ত্বনা জিগ্যেস করলে।

"ছিপছররামারি। ছিপছররামারিতেই থাকি আমি। ওই যে বললাম না, ক্যানভাস করতে বেরিয়েছি। উমেশ চৌবে লোকটা সুভাষ বোসের খুব প্রশংসা করত তাই ভেবেছিলাম লোকটা খুব ভাল, তারই হয়ে ক্যানভাস করেছিলাম প্রথমে। তারপর জনার্দনবাবু আমার চোখ খুলে দিলেন—এখন দেখছি যদিও একটু ঘুঁতঘুঁতে ধরনের তবু বৈজুপ্রসাদ লোকটাই ডিজার্ভিং ক্যান্ডিডেট। ভুল সংশোধন করতে বেরিয়েছি তাই। অনেক ঘুরতে হল—তা হোক। ব্রজেশ্বরবাবু, আপনারও এ অঞ্চলটা একবার ঘুরে দেখা উচিত—ঐতিহাসিক মানুষ আপনি—এদিকের ইন্টিরিয়ারে চমৎকার চমৎকার পুরোনো মন্দির আছে, কতকগুলি মূর্তিও। এসেছেন কখনও এদিকে আগে? আসা মুশকিল অবশ্য। কাছে-পিঠে কোন স্টেশন নেই কিনা। আপনারা বাই রোড এসেছেন নিশ্চয়—"

"হ্যাঁ, আমাদের কারটা বিগড়ে পড়ে আছে কয়েক মাইল দূরে, আমরা হেঁটে এসেছি এখানে রাতটা কাটাবার জন্যে"

"আমাকেও আপনাদের সঙ্গী না হতে হয়, কি বিপদ দেখুন তো"

"না আপনি ঠিক পৌঁছে যাবেন" আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গীতে বলে উঠল সান্ত্বনা।

"আমি আপনার সৎকার করতে অক্ষম আপাতত"—গোঁসাইজি বললেন।

"তা-ও বটে, ঘর খালি নেই আপনার। যদি থাকতেই হয় বারান্দায় পড়ে থাকতে হবে হয়তো—কিম্বা বাইবে—হা-হা-হা-হা"

"হা-হা-হা-হা"—জোর করে হেসে উঠল সুশোভন।

লোকটা সত্যি সত্যি থেকে না যায়।

গোঁসাইজি ভ্রূকুটি করলেন।

"পাঁচ মাইল তো মোটে"—সান্ত্বনা বললে।

কণ্ঠস্বর প্রায়-অকৃত্রিম আন্তরিকতার সুর ফুটিয়ে উৎসাহ দিল সুশোভন—"হ্যাঁ, ঠিক পৌঁছে যাবেন আপনি"

সদারঙ্গবিহারীলাল এর পর যা বললেন তা আশ্বাসজনক।

"হ্যাঁ, মোটে পাঁচ মাইল, পৌঁছে যাওয়া উচিত তো। তাছাড়া গাড়িখানা এতক্ষণে ঠাণ্ডাও হয়েছে খানিকটা, গর্মে ছিল ভয়ানক। বেরিয়ে পড়া যাক্ তাহ'লে, কি বলেন"

"হ্যাঁ রাত হয়েছে, আর দেরি করা উচিত নয়"

"আচ্ছা তাহলে নমস্কার। নমস্কার, সান্ত্বনা দেবী। অপ্রত্যাশিত আনন্দ পেলাম। সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল যেন। ভাগ্যে গাড়িটা খারাপ হয়েছিল তাই দেখা হয়ে গেল আপনাদের সঙ্গে। গাড়িটা কিন্তু ঘাবড়ে দিয়েছিল বেশ। মনে হচ্ছিল ইন্‌লেট্ ভালভের স্প্রিংই গেছে বুঝি একটা। এখন বুঝতে পারছি ওভারহিটেড্ হয়েছিলাম। মিকশ্চারটা আর একটু রেগুলেট করে নিতে হবে তার মানে। একটু 'রিচ' হয়ে গেছি সম্ভবত। আচ্ছা, নমস্কার তাহলে, নমস্কার—"

ঝুল-কালি মাখা হাত তুলে সবাইকে নমস্কার করলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"বড় আনন্দ পেলাম। আবার আলাপ-আলোচনার সুযোগ ঘটবে আশা করি শিগ্‌গির। আপনাদের মতো লোকের সঙ্গে আলাপ করলে মনের রঙই বদলে যায়। চমৎকার। আচ্ছা চলি, নমস্কার। নমস্কার, সান্ত্বনা দেবী"

"নারায়ণের কৃপায় পৌঁছে যান ভালয় ভালয়। আমার এখানে স্থান নেই মোটে"

গলা-খাঁকারি দিয়ে কথাটা মনে করিয়ে দিলেন আবার গোঁসাইজি।

"খানিকটা গিয়ে বাইক যদি ফেল করে তাহলেও দেবেন না?"

"আপনার হার্ট যদি ফেল করে তাহলেও দেব না, মানে দিতে পারব না। স্থানাভাব। গোড়া থেকেই বলছি তো সৎকার করতে অক্ষম আমি আপাতত।"

"তাহলে যা থাকে কপালে বলে বেরিয়ে পড়া যাক্ এইবার। কি বলেন। গাড়িটা ঠাণ্ডাও হয়েছে, আর বেগ দেবে না বোধ হয় আশা করি"

সদারঙ্গবিহারীলাল মরিয়া হয়ে অগ্রসর হলেন দ্বারের দিকে। একটু এগিয়েই ফিরলেন আবার।

"আচ্ছা তাহলে নমস্কার, সান্ত্বনা দেবী, নমস্কার, ব্রজেশ্বরবাবু, বাঃ বাঃ চমৎকার কুকুরটি তো—খাসা। কি সুন্দর লোম। আপনার কুকুর বুঝি, সান্ত্বনা দেবী—বাঃ"

সান্ত্বনা মাথা নেড়ে জানালে যে ঝুনু তারই কুকুর।

"বাঃ—"

সদারঙ্গবিহারীলাল একটু ঝুঁকে ঝুনুকে আদর করলেন। ঝুনু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে মনিবের দিকে তাকালে একবার। তারপর হাঁচলে।

"বাঃ, সুন্দর কুকুরটি। আচ্ছা, চলি তাহলে এবার, নমস্কার, ঝুনু, চলি বুঝলে, নমস্কার"

গোঁসাইজি গলা-খাঁকারি দিয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন এবং দরজাটা খুলে দিলেন ভাল করে।

"এতক্ষণে গাড়িটা ঠাণ্ডা হয়েছে আশা করি। হওয়া উচিত অন্তত, আচ্ছা চলি এবার, নমস্কার তাহলে"

গোঁসাইজির রগের শিরাগুলো ফুলে উঠেছিল। একটি কথা না বলে নীরবে তিনি তাঁর অনুগমন করলেন। সুশোভন সান্ত্বনার দিকে চেয়ে ম্লান হাসি হাসলে একটু। ভোজকাজের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া চুকে যাবার পর বাড়ির গিন্নীর যে রকম মুখভাব হয় সান্ত্বনার মুখভাব অনেকটা সেই রকম হয়ে উঠেছিল দড়াম করে সদর দরজা বন্ধ হবার শব্দ পাওয়া গেল। গোঁসাইজি ফিরে এলেন। তাঁর দুই ভ্রূর মাঝখানে গভীর দুটি রেখা ফুটে উঠেছে।

"আপনি তাহলে কংগ্রেসের লোক একজন"

সুশোভন রুমালটা বার করে নাক ঝাড়তে লাগল। সান্ত্বনাই জবাব দিলে।

"হ্যাঁ, আমার স্বামী একজন কংগ্রেসকর্মী"

"ও, আমি ধরতে পারিনি ঠিক। আপনি কোন্ দিকে?"

"কিসের কোন্ দিকে—মানে আপনি যে দিকে—মানে"

"আপনি অফিস অ্যাক্সেপ্টান্সের সপক্ষে না বিপক্ষে"

সুশোভন ভ্রূকুঞ্চিত করে গোঁসাইজির দিকে চকিতে দৃষ্টিপাত করলে একবার। তার মনে হল গোঁসাইজির মতো লোকের অফিস অ্যাক্সেপ্টান্সের সপক্ষে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

"আমি সপক্ষে"

"ও, সপক্ষে! বটে—"

ওষ্ঠ দ্বারা অধরকে নিষ্পিষ্ট করে গুম হয়ে গেলেন গোঁসাইজি। তাঁর চক্ষুর দৃষ্টি থেকে যা বিচ্ছুরিত হতে লাগল তা ক্রোধ ও ব্যঙ্গের এক অস্বস্তিজনক সমন্বয়।

"সিংহাসনে সবাই বসতে চায়। চাওয়াটাই স্বাভাবিক" এইটুকু বলে একটু থেমে 'হ্যাঁঃ' বলে গোঁসাইজি তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন। তারপর কি মনে হলো হঠাৎ ঘুরে বললেন—"সিংহাসনে বসছেন বসুন, কিন্তু ঘুষ নেওয়াটি বন্ধ করতে পারবেন? এই যে আপাদমস্তক সবাই চোর, দিনদুপুরে পুকুর চুরি করছে তার হিল্লে করতে পারেন যদি তাহলেও বুঝব কাজ করলেন একটা"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক ওই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি ঢুকতে চাই"

"ভাল। আমার অ্যাডমিশন রেজিস্টারে যখন নাম লিখবেন তখন নিজের পরিচয়টাও লিখে দেবেন দয়া করে। একজন বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী আমার হোটেলে পদার্পণ করেছিলেন এ নজির পাঁচজনকে দেখাবার মতো"

পুনরায় অধর দিয়ে ওষ্ঠকে চাপলে। সুশোভন সান্ত্বনার দিকে চেয়ে মুখে একটা প্রশংসা-সঙ্কুচিত হাসি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করলে। কিন্তু পারলে না ঠিক।

সান্ত্বনার দিকে চেয়ে গোঁসাইজি বললেন, "আপনারা শোবেন কখন। আমাদের এখানে সকাল সকাল শোওয়াই নিয়ম"

"বেশ তো, বলেন তো এখনি যেতে পারি"

সান্ত্বনা ঝুঁকে ঝুনুকে কোলে তুলে নিলে। গোঁসাইজি শিউরে উঠলেন।

"ও কি, কুকুর নিয়ে যাচ্ছেন কোথা"

"শুতে"

"ও আপনার সঙ্গে শোবে।"

"হ্যাঁ, কেন"

"এক বিছানায়"

"গোঁসাইজির কণ্ঠস্বরের গ্রাম দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল।

"তাই তো শোয় বরাবর"

"আপনি, ব্রজেশ্বরবাবু আর কুকুরটা সবাই এক বিছানায় শোয় বরাবর।"

"নিশ্চয়। এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? আপনার আপত্তি আছে নাকি?"

"আপত্তি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করছেন।"

তারপর সুশোভনের দিকে প্রায় চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলেন—"এই কুকুরটার সঙ্গে শোন আপনি।"

"আমি—মানে হ্যাঁ, তা শুই বইকি। বাচ্চাবেলা থেকে পুষেছি কিনা—"

গোঁসাইজির দৃষ্টি থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটে বেরুল। অষ্টধাতু-অঙ্গুরীশোভিত তর্জনী তুলে বললেন—"এখানে শোবার ঘরে কুকুর নিয়ে যাওয়া চলবে না। এ খৃস্টান হোটেল নয়, হিন্দু পান্থনিবাস। কোন ভদ্রলোক যে কুকুর নিয়ে এক বিছানায় শুতে পারেন তা ধারণারই অতীত ছিল আমার—"

সুশোভনের ধৈর্যরক্ষা করা এমনিতেই কঠিন হয়ে উঠেছিল, এ কথা শুনে সে ঈষৎ চটেই উঠল।

বলে উঠল—"আপনার ধারণার সীমা সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল নেই আমাদের। আমাদের কুকুর নিয়ে শোয়াই অভ্যাস"

"অভ্যাস? এই ম্লেচ্ছ অভ্যাসের কথা জোর গলায় বলছেন আবার! আপনি একজন কংগ্রেসকর্মী না? ও কথা বলতে লজ্জা করে না আপনার"

"কেন, কংগ্রেসকর্মীর কুকুর নিয়ে শুতে বাধা কি"

"এই কি স্বদেশী আচরণ? যাই হোক আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। আমার ঘরে আমি কুকুর ঢুকতে দেব না, সোজা কথা"

"অদ্ভুত হোটেল আপনার।"

"এটা হোটেল নয়, হিন্দু পান্থনিবাস—দয়া করে মনে রাখবেন সেটা"

বেগতিক দেখে সান্ত্বনা বলল—"বেশ তো এত আপত্তি যখন, আপনার ঘরে না হয় না-ই গেলাম। কিন্তু ঝুনুসোনার শোবার ব্যবস্থা করে দিন একটু"

"ঝুনুসোনা! ওই কুকুরের নাম নাকি"

"হ্যাঁ। রাত্রে কোথায় রাখি একে"

পিছনে একটা পোড়ো গোয়াল আছে তাতেই থাকতে পারবে স্বচ্ছন্দে"

"বেচারা!"

ঝুনুর দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে গোঁসাইজি বললেন, "গোয়ালের কোণে খড়ও আছে কিছু। খাসা থাকবে। আপনাদের বিছানায় ঢুকে গুঁতোগুঁতি করার চেয়ে আরামে থাকবে। কি আপদ"

ঝুনুর লোমে হাত বুলিয়ে একটু আবদারের সুরে সান্ত্বনা শেষ চেষ্টা করলে আর একবার।

"একা থাকা অভ্যেস নেই, কাঁদবে হয়তো"

"কাঁদুক। গোয়ালঘর থেকে ওর কান্না শোনা যাবে না"

"আমাদের ঘরের মেঝেতে যদি শোয়াই?"

"না, শোবার ঘরে আমি কুকুর ঢুকতে দেব না। ফদ্‌কাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে ওটাকে গোয়ালঘরে রেখে আসুক গিয়ে। আর আপনি অ্যাডমিশন রেজিস্টারে নাম সই করে তবে শুতে যাবেন"

কমানো বাতিটা উসকে দিয়ে সুশোভনের দিকে চেয়ে গোঁসাইজি ফদ্‌কাকে ডাকতে গেলেন।

"দেখ সান্ত্বনা, বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। তোমার স্বামীর নাম জাল করতে পারব না। সীমা অতিক্রম করছে"

"বেশ, আমিই লিখে দিচ্ছি। অর্ধাঙ্গিনীর আশা করি স্বামীর নামে নিজেকে চালাবার অধিকার আছে, অর্ধেক অধিকার অন্তত থাকা উচিত আইনত"

"নিশ্চয়"

"খাতাটা কোথা—"

"এই যে। তবে আমি আর এক কাজ করলেও পারি। এমনভাবে হিজিবিজি করে লিখে দিতে পারি যে কাউকে আর তা পড়তে হবে না"

"দরকার নেই, আমিই লিখে দিচ্ছি"

খাতাটা খুলে সান্ত্বনা লিখতে লাগল।

"ব্রজেশ্বর দে। তারিখ ১৮ই সেপ্টেম্বর—ব্যস্‌"

"নামের পর উইদিন ব্রাকেট লেখ কংগ্রেসকর্মী। না লিখলে ভয়ানক কাণ্ড করবে"

সান্ত্বনা মুচকি হেসে তাও লিখে দিলে।

"রুম নম্বরের ঘরে কি লিখি? নম্বর তো জানি না"

"চেপে যাও"

চেপে যাওয়ার কিন্তু উপায় রইল না। কলমটি রাখার সঙ্গে সঙ্গে গোঁসাইজি এসে প্রবেশ করলেন এবং প্রবেশ করেই ঝুঁকে অ্যাডমিশন রেজিস্টারটি পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর সুশোভনের দিকে ফিরে বললেন, "এই ঘরে লিখুন—টু। আপনাদের রুম নম্বর টু"

সুশোভন কলমটি তুলে ভালোমানুষের মতো 'টু' লিখলে, তারপর সান্ত্বনার দিকে ফিরে সলজ্জভাবে হাসলে একটু।

"ওরে ফদ্‌কা, কোথা গেলি আবার, কুকুরটাকে গোয়ালে রেখে আয়, কামড়াবে না তো"

"না, ঝুনু ভারী লক্ষ্মী। আহা বেচারাকে কোথায় পাঠাচ্ছেন নির্বাসনে"

বলা বাহুল্য সান্ত্বনার ঈষৎ অনুনাসিক আবদারমাখা এই অনুযোগে গোঁসাইজি বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না।

ফদ্‌কা এসে ঝুনুকে নিয়ে চলে গেল। গোঁসাইজি ধূমাঙ্কিত হ্যারিকেনটি সুশোভনের দিকে তুলে ধরে বললেন, "এবার তাহলে শুয়ে পড়ুন আপনারা। এটা নিয়ে যান, কমিয়ে রেখে দেবেন, তেল বেশি নেই। আপনারা ওঠেন কটায়?"

"আজ বোধ হয় দেরি হবে উঠতে। সমস্ত দিন পরিশ্রান্ত আছি কিনা"

"শুয়ে পড়ুন তাহলে, আর দেরি করবেন না।"

হরিমটর হিন্দু পান্থনিবাসের রুম নম্বর 'টু'টি গঠনশিল্পের একটি অদ্ভুত নিদর্শন বলে মনে হল সুশোভনের। দ্বারটি সঙ্কীর্ণ। এত সঙ্কীর্ণ যে দু'জন লোকের পক্ষে পাশাপাশি ঢোকা অসম্ভব। জানালাগুলি চতুষ্কোণ ঘুলঘুলি বিশেষ। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত এবং অদ্ভুত উপায়ে এই ঘরের মধ্যেই বৃহদাকৃতি এত আসবাবপত্র সমাবিষ্ট হয়েছে যে মেঝে বলে কোনও কিছু আর অবশিষ্ট নেই। যা আছে তা খাট, আলমারি, ড্রেসিং-টেবিল প্রভৃতির মাঝে মাঝে গলির মতো জায়গা। সম্ভবত আসবাবপত্রগুলি খণ্ডীকৃত অবস্থায় ঘরে ঢুকিয়ে তারপর ফিট করা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলির নিরেট চেহারা দেখলে সে সম্ভাবনার কথাও মন থেকে তিরোহিত হয়ে যায়। মেঝের অধিকাংশ স্থানই দখল করে আছে জগদ্দল একটি ছাপ্পরখাট। মজবুত কাঁটাল কাঠের তৈরি। খাটের উপর একটি গদি, গদির উপর একটি পাংশুবর্ণের চাদর। গদিটির প্রকৃত অবস্থা যে কি তা চাদর না তুলেই স্থানে স্থানে উঠের পিঠের মতো উঁচু উঁচু ঢিবিগুলি দেখেই বোঝা যাচ্ছিল বেশ। দেওয়ালে ছবি ছিল। ক্যালেন্ডার থেকে কেটে নেওয়া দেবদেবী মূর্তি। বিছানার শিয়রের দিকে মজবুত-ফ্রেমে-বাঁধানো অন্য আর একটি বেশ বড় ছবিও ছিল অবশ্য—রুদ্রমূর্তি দুর্বাসা শকুন্তলাকে অভিশাপ দিচ্ছেন।

সুশোভন এবং সান্ত্বনা পরস্পরের দিকে নীরবে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর একসঙ্গে হেসে উঠল দু'জনেই। সুশোভন বলে উঠল—"বাপস্, শুতে এসেও নিস্তার নেই, শিয়রের কাছে ওই দুর্বাসা তর্জনী তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে। কি সর্বনাশ"

"শুনুন" সান্ত্বনা বললে, "গোঁসাইজি শুয়ে পড়লেই আপনি নেমে যান আস্তে আস্তে। যে ঘরটায় আমরা খেলাম সেই ঘরেই রাতটা কাটিয়ে দিন কোনক্রমে। আশা করি আপনার খুব বেশি কষ্ট হবে না"

"তোমারও হবে না আশা করি। কিন্তু দেখ, সান্ত্বনা, আমার খুব ভাল ঠেকছে না। ব্যাপার যদি গড়ায়, অনেক দূর পর্যন্ত গড়াবে কিন্তু"

"কি যে বলেন! এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে আসছেই বা কে, আর এলেও এই হোটেলের খাতা উল্‌টে দেখতেই বা যাচ্ছে কে। আর দেখলেই বা কি, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে এখানে একরাত্রি কাটিয়ে গেছি এতে আশ্চর্য হবার কি আছে"

"কিন্তু ব্রজেশ্বরবাবু জানতে পারলে কি ভাববেন।"

"কি আর ভাববেন, আমাদের কাণ্ড শুনে বড় জোর হাসবেন একটু"

"দেখ ঠিক তো"

"এটা ঠিক যে আপনি যা ভয় করছেন সে রকম কিছু তিনি মনে করবেন না। ব্যাপারটা বুঝবেন"

সান্ত্বনা ঘাড়টা একদিকে হেলিয়ে সুশোভনের দিকে দৃষ্টিপাত করে গম্ভীরকণ্ঠে বললে, "আশা করি অনীতা দেবীও বুঝবেন।"

"অনীতা? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, বাঃ নিশ্চয়ই সমস্ত শোনার পর বুঝবেন বইকি"

"ব্যস তবে তো মিটেই গেল। ব্যাপার গড়ালেই বা"

সুশোভন তবু যেন কেমন নিশ্চিন্ত হল না।

"কিন্তু ওই দুর্দমনীয় ব্যক্তিটি—ওই জগঝম্প না কি নাম ভদ্রলোকের—"

"সদারঙ্গবাবু? ওঁর জন্য ভাবনা নেই। এর পর দেখা হলে সব খুলে বলব ওঁকে। খুশি হবেন, ভারি আমুদে লোক—"

"আমার কিন্তু দেখে মনে হল, উনি ঠিক সেই জাতীয় বেকুব অথচ মহাপুরুষ লোক যাঁরা অস্থানে অকারণে অকার্য করে অঘটন ঘটিয়ে বেড়ান। অর্থাৎ 'অ'-এর অনুপ্রাস আরও অনুসরণ করলে বলতে হয় আস্ত একটি অজ। তাছাড়া আমার আর একটা সন্দেহ হচ্ছে, উনি অনীতা এবং অনীতার বাপের বাড়ির লোকেদের চেনেন। মনে হচ্ছে..."

"অনীতার বাপের বাড়ির লোকেদের?"

সান্ত্বনার অধরে মৃদু একটা হাসির ঢেউ উঠে মিলিয়ে গেল।

"তা চিনলেই বা ক্ষতি কি। ওঁর জন্যে আপনার চিন্তা নেই। সদারঙ্গবাবুকে সব খুলে বললে তিনি কি বুঝবেন না? সে ভার আমার রইল"

"তোমার জন্যেই আমার চিন্তা"—সুশোভন বললে।

"চিন্তা করবার দরকার নেই তাহলে"—হেসে জবাব দিলে সান্ত্বনা—"আপনি বরং আস্তে আস্তে বেরিয়ে দেখুন একটু গোঁসাইজি শুলেন কিনা। আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না, একটু হাত-পা ছড়াতে পারলে বাঁচি"

কেবল সুশোভন এবং সান্ত্বনাই যে সদারঙ্গবিহারীলালের সম্বন্ধে চিন্তা করছিল তা নয়, গোঁসাইজিও নিশ্চিত ছিলেন না। বাইরের কপাটে তালা লাগিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি ক্ষণকাল। কি মনে হওয়াতে তালাটা খুললেন আবার। কপাট খুলে গলা বাড়িয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে উৎকর্ণ হয়ে চেয়ে রইলেন। না, মোটরবাইকের কোন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। গোয়ালঘর থেকে ঝুনুর করুণ কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কোনও শব্দ কানে এল না। কপাট বন্ধ করে পুনরায় তালা লাগালেন এবং সম্ভবত সম্পূর্ণ নিরাপদ হবার জন্য বৈঠকখানা ঘরটাতেও তালা লাগিয়ে, তালাটা টেনে দেখে চাবির গোছাটা নিয়ে উপরে উঠে গেলেন নিজের শোবার ঘরে।

।। নয় ।।

সুশোভন সন্তর্পণে বাইরে এসে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খড়মের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। গোঁসাইজি উপরে উঠছেন। ঘরে ঢুকে কপাট বন্ধ করলেন। খিল দেওয়ার শব্দ পাওয়া গেল।

"ভদ্রলোক শুলেন বোধ হয় এবার, বুঝলে"—কপাটের বাইরে দাঁড়িয়ে নিম্নকণ্ঠে এইটুকু জানিয়ে সুশোভন নীচে নেমে গেল।

সান্ত্বনা ইতিমধ্যে অন্য ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিল, কাপড়চোপড় না ছেড়ে শুলে ঘুমই হয় না তার। যে স্যুটকেসটি সুশোভন বয়ে এনেছিল সেটি ফদ্‌কা দিয়ে গিয়েছিল শোবার ঘরে। তার থেকে কাপড় ব্লাউজ প্রভৃতি বার করে পরিচ্ছদ-পরিবর্তনের প্রাথমিক প্রক্রিয়াগুলি অর্থাৎ সেমিজের বোতাম খোলা জাতীয় কাজগুলি সব শেষ করেছে, এমন সময় কপাটের কাছে খুট করে শব্দ হল। এক লাফে সে একটা আলমারির কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

"কে, সুশোভনবাবু"

"হ্যাঁ, আসব ভিতরে?"

"না। আসবেন মানে?"

"গত্যন্তর নেই"

"থামুন একটু তাহলে"

"বেশ"

"গত্যন্তর নেই মানে? বুঝতে পারলাম না।"

"যে ঘরে আমরা খেয়েছিলাম সে ঘরে শোয়া যাবে না"

"কি যে বলেন"...সান্ত্বনার কণ্ঠস্বর একটু উত্তাপ সঞ্চারিত হল যেন..." এর মধ্যেই কি করে বুঝলেন যে শোয়া যাবে না। মিনিট তিনেকও তো হয়নি এখনও। চেষ্টা করে দেখুন, ঠিক ঘুমুতে পারবেন"

"হয়তো পারতাম! কিন্তু চেষ্টা করবার 'স্কোপ' নেই। গোঁসাইজি সে ঘরটিতে তালা লাগিয়ে চাবিটি নিয়ে শুতে গেছেন। সে চাবি এতক্ষণ বোধ হয় তাঁর বালিশের তলায়"

"ওমা, তাই নাকি? মুশকিল হল তো। কোথায় শোবেন তাহলে"

"তাই তো ভাবছি"

"করতে হবে যা হোক্ একটা ব্যবস্থা। এ ঘরে তো আসা চলবে না"

"কপাটটা খুলি একটু? একটু..."

"না"

"কথা কইবার সুবিধা হতো। আর কিছু নয়"

"কথা ক'য়ে কাটাবেন নাকি সারারাত"

"একটু খুলি কি বল। চোখ বুজে থাকছি না হয়। সামান্য একটু। খুলতে আপত্তি কি"

"না না, যতক্ষণ না বলি খুলবেন না। দাঁড়ান না একটু। আমি কাপড় ছাড়ছি"

"উঃ কি যন্ত্রণা"

অস্ফুট কণ্ঠে বললে সুশোভন।

"সিঁড়ির উপরে গিয়ে একটু বসুন না, দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হয় যদি"

"কতক্ষণ"

"মিনিট পাঁচেক"

"ঠিক করব কি করে, আমার হাতঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে"

"তাহলে এক থেকে পাঁচশ পর্যন্ত গুণুন বসে"

"বল কি? ছেলেবেলায় উদ্দালকের গল্প শুনেছিলাম, তাই করলে দেখছি শেষ পর্যন্ত"

"কি যে ছেলেমানুষি করছেন। বিপদের সময় মাথা ঠিক রাখুন"

"মাথা আমার ঠিকই আছে, তার জন্যে ভাবনা নেই"

"তাহলে অমন করছেন কেন, সিঁড়িতে বসুন গিয়ে"

"কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে জোরে"

সিঁড়ির উপরই কাটাতে হবে হয়তো আজ রাতটা। তবে ভিতরে এসে গল্প করতে পারেন একটু। একটু থামুন, আমি কাপড় ছেড়ে বিছানায় উঠে পড়ি, তারপর আসবেন"

"গোঁসাইজি যদি হঠাৎ বেরিয়ে এসে দেখেন আমি সিঁড়ির উপর গুঁড়ি মেরে বসে এক দুই গুনে যাচ্ছি, কি ভাববেন তিনি"

"ঢেউ দেখেই নৌকো ডোবাচ্ছেন কেন আগে থাকতে"

"নৌকোডুবির ব্যাপার যাতে না ঘটে, সেই চেষ্টাই তো করছি সকাল থেকে।"

বিরক্ত হয়ে সুশোভন সিঁড়ির উপর গিয়ে বসল। সিঁড়ির উপর বসে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে বেচারা। নৈশ-সমীরণবাহিত হয়ে এই দীর্ঘনিশ্বাসটি যদি পূর্বদিকে ভেসে যেত তাহলে আর একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে হয়তো দেখা হতো তার। কোলকাতায় তার বাড়ির সিঁড়িতে বসে অনীতাও ঠিক এই সময় দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করছিল।

...সিঁড়িতে বসে বসে সুশোভনের বাঁ পাটায় খিল ধরে গেল। একটু চটেই উঠে দাঁড়াল সে। এতক্ষণেও শোয়া হয়নি? হোক মেয়েমানুষ... বিছানায় শুতে এত দেরি হবে... আশ্চর্য কাণ্ড। উঠে গিয়ে দুয়ারে নখ দিয়ে আঁচড়ালে। কড়া নাড়তে এমন কি টোকা মারতেও ভয় করছিল। গোঁসাইজি যদি উঠে পড়েন। সান্ত্বনার কোনও সাড়াই পাওয়া গেল না। তারপর কপাটটা একটু ফাঁক করতেই...

"থামুন, হয়নি এখনও। বসুন না গিয়ে আর একটু—"

"আমি এইখানেই অপেক্ষা করছি, তোমার যখন হবে বোলো"

"অত শব্দ কিসের"—পরমুহূর্তেই প্রশ্ন করল সে... "কি হল"

"আমি বিছানায় উঠছি। স্প্রিং দেওয়া গদি, তারই শব্দ"

"বাসন্তী শব্দ? বাবা:"

"বাসন্তী শব্দ মানে"

"বি এ পাশ করেছ, স্প্রিং মানে বসন্ত জান না!"

"আসুন আপনি"

সান্ত্বনা বিছানার উপর বসে ছিল। চুলটি আঁচড়ে সাদা শান্তিপুরে শাড়িটি প'রে বেশ দেখাচ্ছিল তাকে। একটু সানুকম্প হাসি হেসে ডাগর চোখের দৃষ্টি তুলে সুশোভনের দিকে চেয়ে দেখলে সে। সুশোভনের দৃষ্টি থেকে বিচ্ছুরিত হল শিল্পসমালোচকের কৌতূহল। বিছানার একপ্রান্তে অনাহূতই বসল গিয়ে সে।

"কাপড় ছেড়ে বেশ দেখাচ্ছে তোমাকে"

"তা হয়তো দেখাচ্ছে, কিন্তু এই কথা বলতেই আসেননি আশা করি"

"না, না, কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সত্যিই তোমায় মানিয়েছে ভালো। তোমাব প্রসাধন রুচি সরল হলেও শিল্পীজনোচিত—"

"সমস্ত দিনের এত দুর্গতির পরও আপনার রসবোধ অক্লান্ত আছে দেখছি। আমার কিন্তু ঘুম পাচ্ছে"

"বেশ তো ঘুমোও না, মানা করেছে কে। সাদা শাড়িটা হঠাৎ ভাল লেগে গেল তাই বললাম। অনীতা কখ্‌খনো সাদা শাড়ি পরে না, ডগমগে রঙ ছাড়া পছন্দই হয় না তার। সেদিন একখানা শাড়ি কিনেছে মেরুন রঙের সোনালি জরির পাড় বসানো। জমকালো ব্যাপার। বললে বিশ্বাস করবে না, দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে যাবে বলে ছ'খানা শাড়ি নিয়েছে—সবগুলিই রঙিন, আর কোনটাই ফিকে রঙ নয়—"

সান্ত্বনা ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে ঘাড়টা কাত করলে একটু।

"একটা কথা আপনার মনে রাখা উচিত। অনীতা যা করে, আপনাকে খুশি করবার জন্যেই করে। তার এত মাথা-ঘামিয়ে শাড়ি পছন্দ করা যে এমনভাবে মাঠে মারা গেছে তা বোধ হয় বেচারি ঘুণাক্ষরেও জানে না"

সুশোভনের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। উসখুস্ করে নড়ে-চড়ে বসল সে।

"আমাকে কি তাহলে গোয়ালঘরে গিয়ে ঝুনুর সঙ্গে শুতে হবে?"

"তাই যান তবে। এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি আছে—"

সুশোভন নিজের ডান কানটা টানতে টানতে অভিনিবেশ সহকারে সান্ত্বনার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"আচ্ছা, ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টা দুই এই ঘরের মেঝেতে যদি একটু গড়িয়ে নি—"

"কি যে বলেন—"

"আচ্ছা, এ কি কুসংস্কার তোমাদের। আমি তোমাকে 'কারে' 'লিফ্‌ট্‌' দিলে দোষ হয় না, তোমার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেলে দোষ হয় না, তোমার সঙ্গে এক বিছানায় বসতেও দোষ নেই। কেবল এই মেঝেতে শুলেই চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যাবে। আশ্চর্য! তোমার খাটের উপর পা তুলব না, সত্যি বলছি খাটের ত্রিসীমানায় যাব না"

"যা হয় না—হতে পারে না— তা নিয়ে কেন বৃথা সময় নষ্ট করছেন"

"কমরেডদের মধ্যেও হয় না? রাশিয়ায় তো হয় শুনেছি"

"এটা রাশিয়া নয়, বাংলাদেশ"

"ও"

সুশোভন নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সান্ত্বনার দিকে। মাথার কাপড় সরে গেছে, খোঁপাটা এলিয়ে পড়েছে। লণ্ঠনের মৃদু আলোতে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। মনে হচ্ছিল একটা নিষ্ঠুর আনন্দে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে তার। সত্যি ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল।

"আচ্ছা, চললাম তাহ'লে—"

"বিশ্বাস করুন, আপনার জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছে আমার—"

"হ্যাঁ, তোমার মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছে বটে—"

"কি করব বলুন উপায় নেই। সমাজে বাস করি যখন, লোকাচার মেনে চলতেই হবে"

"এখন এই ঘরে সমাজ কোথায়। ঘণ্টাখানেক বড় জোর ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করলেই আমার—"

"না, মাপ করুন সুশোভনবাবু। একবার এই করতে গিয়ে কি বিপদে পড়েছিলাম মনে নেই। আপনার তো মনে থাকা উচিত"

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। বুঝেছি। আচ্ছা যাচ্ছি আমি। হ্যাঁ...ঠিক। কি বিপদ—আচ্ছা চলি—"

দ্বার পর্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়াল সে আবার। তারপর হেসে বললে—"তখন আর এখন কিন্তু তফাত আছে অনেক। এখন আমি তুমি এবং ব্রজেশ্বরবাবু ছাড়া এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কারও অধিকার নেই "

"কেন অনীতার?"

"হ্যাঁ অনীতার অবশ্য আছে"

"দেখুন যুক্তি দিয়ে এসব ব্যাপারের মীমাংসা হয় না। আপনি যুক্তির অবতারণা করে স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন আমি যদি শুধু সেমিজ পরে হ্যারিসন রোড দিয়ে হেঁটে যাই কার কি বলবার থাকতে পারে। কিন্তু পাঁচজনের মুখ বন্ধ হবে না তাতে"

"সত্যি যদি সাহস করে যাও, আমার মনে হয় না এ নিয়ে খুব একটা আন্দোলন করবে লোকে—"

সান্ত্বনা মুচকি হেসে বললে —"আপনার শোবার কষ্ট হলে তার জন্যে খুবই দুঃখিত আমি। আর ওই মেঝেতে শুলেই কি আরাম পাবেন আপনি? ওর চেয়ে গোয়ালঘরে শোয়া ঢের ভাল"

সুশোভন ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখলে একবার।

"আমার বিশ্বাস এখানে শুলে একটু ঘুম হত। একটা 'র‍্যাগ' আর একটা বালিশ পেলে বেশ একঘুম দিয়ে নিতে পারতাম ওই কোণের দিকটায়"

"র‍্যাগ আর বালিশ দিচ্ছি আপনাকে। ওগুলো নিয়ে আপনি গোয়ালেই যান, সেখানেও বেশ ঘুমুতে পারবেন"

"অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু শব্দটব্দ শুনে গোঁসাইজি যদি উঠে আসেন, তাহলে বালিশ-বগলে আমাকে ঝুনুর কাছে দেখে ভাববেন কি"

"কি আবার ভাববেন"

"একটা কথা ভুলে যাচ্ছ কেন যে গোঁসাইজির চক্ষে আমরা স্বামী-স্ত্রী। যদি ঘুণাক্ষরে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে আমরা তাঁর সঙ্গে চাতুরী খেলছি তাহলে দুজনকেই এই রাত্রে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। কিছু শুনবে না লোকটা। অ্যাডমিশন রেজিস্টারে আমরা স্বামী-স্ত্রী বলে নাম সই করেছি। আর সেই ভদ্রলোক—গুম্ফ গোবিন্দ না কি যেন—"

"সদারঙ্গবিহারীলাল?"

"হ্যাঁ, তিনি আমাদের স্বামী-স্ত্রী বলে জেনে গেছেন। জানাজানি হয়ে গেলে তোমার স্বামীর কাছে যে এর কি জবাবদিহি করব জানি না"

"সে আমি করব। আপনাকে করতে হবে অনীতা দেবীর কাছে"

সুশোভনের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল একটা।

"ব্রজেশ্বরবাবু আর অনীতা এ দু'জনের সম্বন্ধে যদি আমাদের চিন্তা না থাকে তাহলে আর কে কি মনে করবে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি। আর এতক্ষণ আমরা যা করেছি তাতে ওরা যদি কিছু মনে না করে তাহলে আমার মেঝেতে শোয়াটাও ওরা আশা করি অনুমোদন করবে। ওরা অমানুষ নয় তো। নিতান্ত বাধ্য হয়ে যে একাজ করেছি তা বোঝাবার মতো সহৃদয়তা ওদের নেই? ওই ড্রেসিং টেবিলের তলায় মাথা গুঁজে আর ছাপ্পরখাটের তলায় পা চালিয়ে শোয়াটা যে আরামের নয় তা কি ওরা বুঝবে না? নিতান্ত বাধ্য হয়েই শুতে হচ্ছে। স্বপ্নের ঘোরে জখমও হয়ে পড়তে পারি; হাসছ কি, খুবই সম্ভব সেটা"

সান্ত্বনা মুচকি মুচকি হাসছিল।

"উনি অবশ্য কিছু মনে করবেন না"

"ব্যস তাহলে তো হয়েই গেল। আমার স্ত্রীর ঝক্কি আমি সামলাব"

"উনিও মোটেই কানপাতলা লোক নন। তাছাড়া আমার যাতে কষ্ট হতে পারে এমন কোন কাজ মরে গেলেও করবেন না উনি। আড়ালেও আমার সম্বন্ধে কখনও কোন কটু মন্তব্য করেন না"

"আমিও করি না। অনীতাকে আমি যত ভালবাসি এত বোধ হয় কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে

বাসে না। সত্যি বলছি বড্ড ভালবাসি। যাক্ বালিশ আর 'রাগ' দাও তাহ'লে, চেষ্টা করে দেখি ঘুম হয় কিনা—"

"কপাটে খিল দিন"

খিল দিতে গিয়ে সুশোভন আবিষ্কার করলে যে খিলটি ভাঙা।

"ভালই হয়েছে এক হিসেবে"

মুচকি হেসে সান্ত্বনা পাশ ফিরে শুল।

* * *

"সুশোভনবাবু"

"অ্যাঁ—কি"

"ঘুমুচ্ছেন?"

"কেন"

ড্রেসিং টেবিলের তলা থেকে সন্দিগ্ধকণ্ঠে উত্তর দিল সুশোভন।

"কিছু মনে করবেন না, জানলাটা যদি খুলে দেন দয়া করে। আমি শোবার সময় খুলতে ভুলে গেছি"

"জানলা খুলে কি হবে। হু-হু করে হিম ঢুকবে যে ঘরে। আমাকে মেরে ফেলতে চাও নাকি"

"সব জানলা বন্ধ। বাইরের হাওয়া একটু ঢোকা দরকার।"

"ঘরে যা হাওয়া আছে তাই তো যথেষ্ট মনে হচ্ছে আমার। আবার বাইরের হাওয়া কেন"

"জানলা খুলে না শুলে সকালে মাথা ধরে থাকে আমার। খুলে দিন লক্ষ্মীটি"

"ও। আচ্ছা দিচ্ছি তাহলে। দাঁড়াও উঠি আগে। রীতিমত কসরত করতে হবে। এই ড্রেসিং টেবিলের তলা থেকে মাথাটা বার করাই মুশকিল, তারপর আলমারির তলা থেকে হাতটা—"

জানালা খুলে মিনিট দুই পরে সুশোভন আবার মেঝের উপর এসে বসল, অস্ফুটস্বরে গজগজ করতে করতে হাত থেকে ধুলো ঝাড়লে, তারপর নিজের ওভার কোটটি গায়ে দিয়ে ড্রেসিং টেবিলের তলায় মাথা গলিয়ে শুয়ে পড়ল আবার। মনে হল সান্ত্বনা নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে 'ধন্যবাদ' না কি একটা বললে। তারপর নীরবতা ঘনিয়ে এল আবার, সান্ত্বনার মৃদু নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। হঠাৎ নৈশ নীরবতা বিদীর্ণ করে ঝুনুর করুণ আর্তনাদ শোনা গেল। ওই আবার! থামছে না—চলেইছে একটানা—।

"সুশোভনবাবু"

"কি"

"শুনতে পাচ্ছেন? মরে যাই মানিক আমার"

"আমাকে বলছ?"

"ঝুনুর ডাক শুনতে পাচ্ছেন না? আহা বেচারি"

"কই না"

"পাচ্ছেন না? ওই যে"

"ও প্যাঁচা ডাকছে"

"কি যে বলেন। ঝুনু কাঁদছে। আহা, কি যে করি"

"জানলাটা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া আর কি করা যেতে পারে"

"না, না। বেচারি সমস্ত রাত ওই রকম করে কাঁদবে আর আমরা চুপচাপ শুয়ে থাকব এখানে—"

সুশোভন উঠে বসল।

"ওর কান্না বন্ধ করবে কি করে বল। ও চেঁচাবেই। কুকুরের স্বভাবই ওই"

তারপর অস্ফুটকণ্ঠে বললে, লক্ষ্মীছাড়া কুকুর"

"উনি হলে ঠিক উঠে গিয়ে নিয়ে আসতেন"

"আমি 'উনি' হলে এই ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে আমার শিরদাঁড়া এমন জখম হতো না"

"সুশোভনবাবু, উঠুন, যান লক্ষ্মীটি"

"যেতাম। কিন্তু যাবার উপায় নেই"

"কেন এই একটু আগেই তো আপনি ওখানে শুতে যেতে চাইছিলেন"

"চাইছিলাম কিন্তু পারতাম না। আমি হলপ করে বলতে পারি এখন ওই খিড়কি দুয়ার পেরিয়ে গোয়ালঘরে যাওয়া যাদুকর পি. সি. সরকারের পক্ষেও অসম্ভব"

"কেন, বড়জোর খিল দেওয়া আছে—"

"দেখ যে লোক বৈঠকখানায় ডবল তালা লাগাতে পারে সে নিশ্চয় খিড়কিতে এলার্ম লাগিয়েছে"

"শুনুন, আহা কি কান্নাটাই কাঁদছে বেচারি। ছি, ছি, এত নিষ্ঠুর আপনি। বোবা জানোয়ারের প্রতি দয়া হচ্ছে না একটু—"

"ওর নাম বোবা জানোয়ার!"

"আপনি যদি না যান আমাকে উঠতে হবে। ওর কান্না শুনে স্থির থাকতে পারব না"

সুশোভনকে উঠতে হল। জুতো পরে জামা গায়ে দিয়ে বারান্দা থেকে কমানো লণ্ঠনটি তুলে নিয়ে নেমে গেল সে। নামতে নামতে তার মনে হল—অনীতার কুকুরের শখ নেই, আর যাই থাক! উঃ—!

॥ দশ ॥

খিড়কির দরজার সামনে সুশোভন এসে দাঁড়াল। লণ্ঠন তুলে দেখল একটা নয়, দুটো ছিটকিনি। উপরে একটা, নীচে একটা। লোহার ছিটকিনি। নীচেরটা হলহলে গোছের, একটা আঙুল দিয়েই তোলা গেল। কিন্তু এত বেশি হলহলে যে একটুতেই পড়ে যাচ্ছে, আর এমন একটা খড়-খড় আওয়াজ করছে যে বিরক্তিকর। শুধু বিরক্তিকর নয় আশঙ্কাজনকও। গোঁসাইজির ঘুম ভেঙে যেতে পারে। উপরের ছিটকিনিটা আবার ঠিক বিপরীত, এমন আঁট যে মনে হচ্ছে রিপিট করা আছে। সুশোভনের বাঁ হাতে লণ্ঠন ছিল, ডান হাত দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করেও সে ছিটকিনিটিকে এক চুলও সরাতে পারলে না। তখন লণ্ঠনটা মাটিতে রেখে এক হাত দিয়ে কপাটটা চেপে ধরে দাঁতে দাঁত দিয়ে খুব জোরে হ্যাঁচকা টান মারলে একটা। ক্যাঁ...চ্ করে বিরাট একটা আওয়াজ হল কিন্তু খুলল না। অর্ধেকটা খুলে থেকে গেল।

আলোটাও নিভে গেল দপদপ করে। সুশোভন আলোটা তুলে নেড়ে দেখলে তেল নেই। তারপর উপরে তেতলার দিকে চেয়ে দেখলে কারও ঘুম ভেঙেছে কিনা। না, ভাঙে নি। পকেটে দেশলাই ছিল তাই বার করে জ্বাললে। বাঁ হাতে জ্বলন্ত কাঠিটা দিয়ে আর একবার টান দিলে ছিট কিনিটাতে। নড়বার কোনও লক্ষণ নেই, মনে হল 'জাম' হয়ে এঁটে বসেছে আরও। বাঁ হাতের আঙুলে ছ্যাঁকা লাগতেই ফেলে দিতে হল দেশলাই কাঠিটা। আঙুলে ফুঁ দিতে দিতে ভাবতে লাগল কি করা যায়। কুকুরের একটা হিল্লে না করে সান্ত্বনার কাছে ফেরা যাবে না। ছিটকিনি খুলতেই হবে যেমন করে হোক্। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। পকেট থেকে রুমাল বার করে রুমালটা ছিটকিনিতে বেঁধে ঝুলে পড়ল সেটা ধরে সে। ক্যাঁ—চ্ খটাৎ...ভীষণ শব্দ করে খুলে গেল। যাক্ উপরের দিকে আবার চেয়ে দেখলে না, গোঁসাইজির নিদ্রাভঙ্গ হয়নি। কপাটটা খুলে বেরিয়েই সুশোভনের পা পড়ল ন্যাতার মতো একটা জিনিসের উপর। দেশলাই জ্বেলে দেখলে জায়গাটা আস্তাকুড় গোছের। ভাঙা টিন, তরকারির খোসা, কাগজের টুকরা, গোবর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। রান্নাঘরের জলও বোধ হয় পড়ে এইখানে। স্যাৎস্যাৎ করছে চতুর্দিক। আবার একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে সেটা তুলে ধরে সুশোভন দেখলে...সর্বনাশ, সামনে আর একটা দেওয়াল এবং তাতে আর একটা কপাট। মনে হল এইটেই বোধ হয় আসল খিড়কি। এটা পার হতে পারলে তবে গোয়ালঘরে পৌঁছানো যাবে। ভাগ্যক্রমে এ কপাটের ছিটকিনি সহজে খোলা গেল, বিশেষ বেগ পেতে হল না। কপাট খুলে বেরিয়েই গোয়ালটা পেলে। ঝুনুর আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। বৃষ্টি শুরু হল ঝিরঝির করে। কনকনে হাওয়া তো ছিলই। রুমালটা মাথায় দিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালতে জ্বালতে গোয়ালটার দিকে অগ্রসর হল সুশোভন। ছাপ্পরখাট-শায়িতা কম্বলাবৃতা সান্ত্বনার ছবিটা অনিবার্যভাবে ফুটে উঠল মনের উপর। কি অদ্ভুত মেয়ে! একটু আগে তার শয্যাপ্রান্তে বসে তার ছিমছাম ঘরোয়া মূর্তি দেখে একটু অভিভূত সে যে হয়নি তা নয়। বিলাসী, জেদী, 'খর্চে' অনীতার সঙ্গে তুলনা করে সান্ত্বনার সাদাসিধে ভাবটা ভালই লেগেছিল তার। কিন্তু সুশোভনের মনে পড়ল সান্ত্বনাও এককালে কম করেনি। সেই লেখক-ঘটিত ঘটনাটা ঘটে যাবার পর থেকেই ও বদলে গেছে এবং বোধ হয় আবিষ্কার করেছে যে সাদাসিধে চালচলনই ভাল। একটু আগে—সত্যি কথা বলতে কি—সান্ত্বনার ধীর স্থির শান্ত গার্হস্থ্য লক্ষ্মীশ্রী দেখে এবং অনীতার উদ্দাম প্রকৃতির সঙ্গে তার তুলনা করে সুশোভনের মনটা সান্ত্বনার দিকেই ঝুঁকেছিল একটু। কিন্তু এখন সে দ্রুত হৃদয়ঙ্গম করছিল এইসব লক্ষ্মী-শ্রী মার্কা স্ত্রীদের স্বামী হওয়া কি সঙ্গীন ব্যাপার। তাকে স্বেচ্ছায়, শুধু স্বেচ্ছায় নয়, সানন্দে, এই ঠাণ্ডায় অন্ধকার রাত্রে বৃষ্টি মাথায় করে লক্ষ্মীছাড়া একটা কুকুরের সন্ধানে বেরুতে হবে। কি রকম দাম্পত্য-জীবন এদের? ভদ্রহাসি-মাখানো শাস্ত্রীয় মাধুর্যের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কি! না, তার অনীতা ঢের ভাল এর চেয়ে। উদ্দাম জেদী আবদেরে বদরাগী অনীতা কখনও, কিন্তু প্রাণ আছে, বৈচিত্র্য আছে— আর এতটা অবুঝ স্বার্থপর নয়। তাকে এমনভাবে কুকুর আনতে পাঠাতো না। কখনও না।

কিন্তু সান্ত্বনার সঙ্গে—সেই সেকালের কমরেড সান্ত্বনার সঙ্গে—একরাত্রি কাটানোর অভিজ্ঞতা নিতান্ত মন্দও লাগল না সুশোভনের। বেচারি! কি বদনামটাই রটিয়েছিল সবাই ওর নামে। তারই চাপে বোধ হয় গৃহলক্ষ্মীটি হয়ে গেছে একেবারে। এরকম আরও দেখেছে সে, বিয়ের আগে যে সব মেয়ে খুব বেশি প্রগতিশীলা থাকে, বিয়ের পর আর চেনা যায় না

তাদের। একেবারে সটান তুলসীতলা আশ্রয় করে তারা। সান্ত্বনার উপর যেন একটা সহানুভূতি হচ্ছিল তার।

এইবার ঝুনুর খোঁজ করা যাক।

ঝুনুর কান্না শোনা যাচ্ছিল, তার কারণ গোয়ালের কপাটটা খোলা ছিল। সুশোভন কপাটের কাছে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলে একটু। কিছু দেখা গেল না। খড়ের খড়-খড় শব্দ আর ঝুনুর আর্তনাদ ছাড়া শোনাও গেল না কিছুই। সুশোভন ভিতরে ঢুকে দেশলাই জ্বাললে। সুশোভনকে দেখে ঝুনু হাহাকারের সঙ্গে সম্বর্ধনাসূচক একটা হর্ষোচ্ছ্বাস মিশিয়ে অদ্ভুত ধরনের শব্দ করতে করতে এগিয়ে এল। সুশোভন হাতটা বাড়িয়ে দিতে চাটলে দু'একবার ভয়ে ভয়ে। আহা, আপাদমস্তক থরথর করে কাঁপছে। লোমগুলো পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠেছে। বেঁড়ে ল্যাজের কাছটায় খুব জোরে জোরে অদ্ভুত ধরনে নড়ছে। করুণ দৃষ্টি তুলে সুশোভনের দিকে একবার চেয়ে তারপর সভয়ে এদিক ওদিক চাইতে লাগল। চিৎকার বন্ধ করেছিল, কিন্তু তার বদলে এমন একটা অনুনাসিক কোঁতানি আরম্ভ করল যা অতিশয় শ্রুতিকটু।

"চুপ কর"

"কুঁই-কুঁই-কুঁক-কুঁক"

ভয়ে ভয়ে চাইতে লাগল এদিক ওদিক। সুশোভনকে বিশ্বাস করতে পারছিল না ঠিক।

"চুপ কর"

সুশোভন ডান হাত দিয়ে আস্তে আস্তে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল তার। কুকুর যে এরকম ছিঁচকাঁদুনে হতে পারে তা সুশোভনের ধারণার অতীত ছিল। হঠাৎ ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল ঝুনু।

"চুপ কর বলছি। মারব না হলে—"

সুশোভন যে-ই একটু হাত তুলেছে ঝুনু "কেঁউ" করে বেরিয়ে গেল একছুটে অন্ধকারের দিকে।

"আরে, এ কি হল"

কপাটের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল সুশোভন।

"আঃ আঃ চু চু চু"

টুসকি দিতে লাগল, কোনো ফল হল না। বেরুতে হল গোয়াল থেকে। বৃষ্টিও নামল বেশ জোরে।

"আয় আয় ঝুনু—আঃ—আঃ..."

নাতি-উচ্চ কণ্ঠে ডাকতে ডাকতে অন্ধকারে এগুচ্ছিল, হুড়মুড় করে হোঁচট খেলে। একটা প্রকাণ্ড গামলা গোছের কি ছিল, গরুর জাব খাওয়াবার ডাবা বোধ হয়!

"ঝুনু ঝুনু আয় বলছি। এস লক্ষ্মীটি। মারব না, কিচ্ছু বলব না, আঃ আঃ। আয় না—উঃ কি লক্ষ্মীছাড়া কুকুর বাবা—ধরতে পারি যদি একবার। ঝুনু—ঝুনু"

দূরে বহুদূরে সর্ষে-ক্ষেতের ভিতর ছুটতে ছুটতে একটা খেজুর গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে "কেঁউ" করে উঠল ঝুনু। সেইদিকে ঘাড় ফিরিয়ে সুশোভন চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। আপাদমস্তক রি-রি করে উঠল রাগে। কিন্তু করবারই বা কি আছে। এগুতে হল। শব্দটা যেদিক থেকে এল সেইদিকেই অগ্রসর হতে লাগল সে হন-হন করে। আবার হোঁচট খেয়ে পড়ল

কিসের উপর একটা। তলপেটে গুঁতো লাগল। টিউব-ওয়েলের পাম্প নাকি এটা। আর একটু গিয়ে আবার হোঁচট—আর একটা পিপে। ঝনঝন শব্দ করে টিনও পড়ে গেল একটা। সমস্ত জায়গাটা জবজবে ভিজে, পা বসে যাচ্ছে। সেখানটা অতিক্রম করতে গিয়ে আর একবার ঠোক্কর খেতে হল, শান-বাঁধানো জায়গা ছিল একটা সামনেই। বোধ হয় স্নান করবার জায়গা। একটা ঝাঁটা পায়ে ঠেকল, লাথি মেরে সরিয়ে দিলে সেটাকে। তারপর সে দাঁড়াল একটু। এ কোথায় এসে পড়ল। আর তো কোনও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। চতুর্দিকে অন্ধকার। একটা গাছের ডাল থেকে ফোঁটা কয়েক জল পড়ল টপটপ করে নাকের ডগায়। সরে দাঁড়াতে হল।

"উঃ, কি ফ্যাসাদে পড়লাম। এর পর যদি কুকুরটাকে ধরতেও পারি, কি যে হবে তা দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। ওই ভিজে কুকুরকে সান্ত্বনা কিছুতেই বিছানায় উঠতে দেবে না, আমাকেই ওকে নিয়ে মেঝেতে শুতে হবে, শুয়ে ঘুম পাড়াতে হবে। ধরতে পারলে হয়, জন্মের মতো ঘুম পাড়িয়ে দেব একেবারে। "ঝুনু—আঃ আঃ— ঝুনু-ঝুনু-ঝুনু-ঝুনু-ঝুনু-ঝুনু—"

কোনও সাড়াশব্দ নেই। আর একটু এগিয়ে সুশোভন দেখলে একটা বেড়া রয়েছে। তারের বেড়া। এর ওপারেই মাঠ। মাঠে পুঞ্জীভূত অন্ধকার। বেড়াটায় ভর দিয়ে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর শব্দ নেই।

বেড়াটায় ঠেস দিয়ে সুশোভনের মনে হল আর পারছে না সে। সীমা অতিক্রম করেছে এবার। এর চেয়ে দুরবস্থা আর হতে পারে না, হওয়া সম্ভবই নয়। ওই গোয়ালে ঢুকেই শুয়ে পড়া যাক। থাকুক গোবরের গন্ধ, ওই খড়ের গাদায় শুয়ে রাতটা কেটে যাবে কোনক্রমে। ভাবলে বটে কিন্তু যেতে পারলে না। দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। কোলকাতায় তার নিজের বিছানার কথা মনে পড়ল, ধপধপে সাদা চাদর, ঝালর-দেওয়া বালিশ, নেটের মশারিটি ফেলে অনীতা শুয়ে আছে। কল্পনা করেও যেন আরাম হল একটু। কিন্তু একটা কথা সহসা হৃদয়ঙ্গম করে একটু দমেও গেল সে। এ সমস্তের জন্যে সে ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়। রাগ পড়ে গেল। একটা শূন্য বিমর্ষভাব খাঁ-খাঁ করতে লাগল সারা বুক জুড়ে। ঘুমও পাচ্ছিল খুব...! বেড়াটা পেরিয়ে খুঁজে দেখবে নাকি আর একটু? কিন্তু আর পারছিল না সে। আর এতে লজ্জারই বা কি আছে। ফিরে গিয়ে সত্যি কথাটা বললেই চুকে যাবে। ঘুম না হয় নাই হবে। ঘুম হবেই না বা কেন, নিশ্চয় হবে, সমস্ত শরীর ভেঙে পড়ছে ক্লান্তিতে।

কিন্তু না, তার মনের অন্তরতম প্রদেশে আর একটা কি যেন খচখচ করছিল। কি সেটা? সে এমন কিছুই করেনি এখনও পর্যন্ত যা অন্যায়, যাতে অনীতার ন্যায়ত রাগ হতে পারে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে অনীতা বুঝবেই নিশ্চয় শেষ পর্যন্ত। কিছুই তো করেনি সে। কিন্তু তার মনের এই বিমর্ষভাবের সঙ্গে অনীতাই যে নিগূঢ়ভাবে জড়িত এ ধারণাটাও সে ত্যাগ করতে পারছিল না কিছুতে...।

"ঠিক"—হঠাৎ মনে হল তার—"আসলে অনীতার জন্যে মন কেমন করছে। মানে বিরহ"

"হ্যাঁ, বিরহই। নিজের বান্ধবীদের কাছে যে অনীতার বুদ্ধি সম্বন্ধে নানা সমালোচনায় সে পঞ্চমুখ সেই অনীতাকে বিয়ের পর এক রাত্রিও ছেড়ে থাকেনি সে। নিজের বুদ্ধিতে চলতে গিয়ে তো এই হয়েছে—পরের স্ত্রীর কুকুরের পিছু পিছু ছুটে একটা হতভাগা হোটেলের পিছনে মাঠে দাঁড়িয়ে ভিজতে হচ্ছে রাতদুপুরে। অনীতার সম্বন্ধে সে আবার সমালোচনা করতে গেছে সান্ত্বনার কাছে!

অনীতার মেজাজটা অবশ্য একটু কড়া। কিন্তু ওই অনীতাকেই তো সে ভালবেসেছিল। ওই অম্লমধুর অনমনীয়াকেই তো সে জয় করেছিল একদিন। আহা, তার এই মুহূর্তের বিগলিত মনোভাবের খবরটা যদি অনীতা পেত কোনক্রমে —একরাত্রি তাকে ছেড়ে কি রকম মন কেমন করছিল তার—তাহলে তার কড়া মেজাজ নরম হয়ে যেত ঠিক।

সান্ত্বনা বড্ড বেশি নরম—একটা কুকুরের জন্যেই হেদিয়ে মরছে। চুলোয় যাক তার কুকুর। হোটেলের দিকে ফিরল সে মরিয়া হয়ে। পত্নী-নিষ্ঠা, স্বামীর নিষ্কলুষ চরিত্র-মাধুর্য প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের ভাবে তার সমস্ত চিত্ত তখন পরিপূর্ণ। যথাসম্ভব কম শব্দ করে দুটি দুয়ারের ছিটকিনি বন্ধ করলে, বলাবাহুল্য প্রথম দুয়ারের উপরের ছিটকিনি স্পর্শ পর্যন্ত করলে না। লণ্ঠনটি তুলে নিয়ে অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। কাঠের সিঁড়ি—ক্যাঁচ্-কোঁচ একটু আধটু শব্দ নিবারণ করা গেল না কিছুতে। উপরে উঠে সিঁড়ির উপর বসে ভিজে জুতো দুটো খুলে ফেললে সে সর্বাগ্রে। ইস্, জলে কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে একেবারে। জুতো খুলে ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল সে একটু। এইবারই তো—। উপরের ঘরে (মানে গোঁসাইজির ঘরে) খুটখাট শব্দ শোনা গেল দুএকবার। চকিতে উপরের দিকে একবার চেয়ে নিঃশব্দে কপাট ঠেলে ঢুকে পড়ল সে ভিতরে। সান্ত্বনার কোনও সাড়াশব্দ নেই। দেশলাই জ্বাললে, তবু সান্ত্বনার কোনও সাড়া নেই। হঠাৎ নজরে পড়ল একটা তাকের এককোণে মোমবাতি রয়েছে একটা। হেডমাস্টারের সম্পত্তি, বোধ হয় তাড়াতাড়িতে ফেলে গেছেন ভদ্রলোক। চট্ করে মোমবাতিটা তুলে জ্বেলে ফেললে সে।

বালিশে মাথাটি রেখে সান্ত্বনা ঘুমুচ্ছে—বেশ আরামেই ঘুমুচ্ছে বলে মনে হলো—অধরে শান্ত প্রসন্ন হাসি। মাথাটা একদিকে সামান্য কাত হয়ে থাকাতে গণ্ডের ও গ্রীবার এমন একটা লোভনীয় ভাব প্রকাশ হয়েছে যা শুধু মনোহর বললেই সবটা বলা হয় না। সুশোভন হাত দিয়ে আলোটা আড়াল করে ঝুঁকে দেখতে লাগল।

সামান্য একটু নড়েচড়ে উঠল সান্ত্বনা, বাঁ হাতখানা বুকের উপর ছিল, নেমে এল কয়েক ইঞ্চি। অনামিকায় বিয়ের আংটিটা ছিল, আলো পড়াতে চকমক করে উঠল তার পাথরখানা। সুশোভন সোজা হয়ে দাঁড়াল, চোখের দৃষ্টি গম্ভীর হয়ে এল। অনীতার কথা মনে পড়ল তার। সে বেচারীও বোধ হয় একা একা শুয়ে ঘুমুচ্ছে এখন। কিন্তু সে হয়তো জেগে আছে, তারই কথা ভাবছে...বিয়ের পর এই প্রথম বিচ্ছেদ...একটা অভূতপূর্ব বেদনা আকুল করে তুলছে হয়তো। সুশোভনের শীত করছিল, জামাটা ভিজে সপসপ করছে। অসহায়ভাবে চারিদিকে তাকাল সে একবার। না, সে শোবে না এখানে। সান্ত্বনা, সান্ত্বনার স্বামী এসব সমস্ত শোনবার পর অনীতাও তার এখানে শোওয়ার সমর্থন করবে সে জানে, কিন্তু তবু তার মনে হল শোয়াটা উচিত নয়, সিঁড়িতে কিংবা ওই গোয়ালঘরেই রাতটা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করা উচিত। কেন উচিত তা বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা ছিল না তার। ক্ষমতা হয়তো ছিল, উৎসাহ ছিল না। ঘুমে ক্লান্তিতে চোখ দুটো জড়িয়ে আসছিল। তার কেমন যেন আবছাভাবে মনে হচ্ছিল সান্ত্বনার খাটের নীচে পা ঢুকিয়ে শুয়ে অনীতার সঙ্গে আত্মিক যোগ ছিন্ন হয়ে যাবে। ঘুমন্ত সান্ত্বনার দিকে আর একবার চেয়ে দেখলে সে। না, রূপসী বটে। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তখনই মনে হল সেইজন্যে আরও চলে যাওয়া উচিত। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

"উঃ, কি সাংঘাতিক প্যাঁচেই যে পড়েছি! ভিজে জামা, ভিজে কাপড়, ঘুম পাচ্ছে, মন

ছুঁকছুঁক করছে, বিবেক-দংশন, রাম রাম! কি যে করি এখন ঘোড়ার ডিম" স্বগতোক্তিটা জোরেই হয়ে গেল একটু।

"কে, ও আপনি, কি বলছেন"—জেগে উঠল সান্ত্বনা।

"বলছি, কি করি এখন"

"কি আবার করবেন, শুয়ে পড়ুন, ঝুনু কই"

"ঝুনু এল না। বাইরে খেলা করছে, কিছুতেই আসতে চাইছে না, থাক্ না বেশ আছে, বাইরে আরামে থাকবে।"

"খেলা করছে! না, না, সুশোভনবাবু নিয়ে আসুন তাকে, ঠাণ্ডায় অসুখ করে যাবে।"

"কিছু হবে না। বেশ খেলা করছে। তাছাড়া বাইরে গিয়ে এখন ধরাই যাবে না তাকে।"

"কেন"

"যা অন্ধকার। সূচীভেদ্য বললে কিছুই বলা হয় না। আলকাতরার মতো বললে তবু খানিকটা– "

"ঝুনু কোথায়"

"শেষবার তার যে সাড়া পেয়েছি তার থেকে অনুমান করছি সর্ষেক্ষেতে ঢুকেছে"

"সর্ষেক্ষেতে, বলেন কি! ওমা, আপনি যে ভিজে গেছেন একেবারে দেখছি"

সান্ত্বনা বিছানায় উঠে বসল এবং তার সিক্ত কোটের দিকে শুভ্র বাহুটি প্রসারিত করে বলল—"ছি, ছি, জামার দশা কি হয়েছে আপনার"

"তাতে কি হয়েছে"—ঔদাসীন্যভরে সুশোভন জবাব দিলে—"বেশি ভেজেনি, সামান্য একটু"

"সামান্য একটু কি। ভিজে সপসপ করছে, এর নাম সামান্য একটু? এত ভিজলেন কি করে? বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে নাকি?"

"আজ্ঞে না। পুকুরে ডুব দিয়ে এলাম"

"কাপড় জামা ছেড়ে ফেলুন এক্ষুনি। অসুখ করে যাবে না হলে। কিন্তু ছাড়বেনই বা কি করে— আপনার স্যুটকেস তো আসেনি—সে তো অনীতার সঙ্গে চলে গেছে। মুশকিল হল দেখছি, কি করা যায়।"

সান্ত্বনা তাড়াতাড়ি এলো খোঁপাটি ঠিক করে নিলে, তারপর সোৎসাহে বললে, "হয়েছে, এক কাজ করুন। আলোটা নিবিয়ে দিন। তারপর কাপড়জামা ছেড়ে সেগুলো শুকুতে দিন চেয়ারের উপর। আমি একটা কম্বল দিচ্ছি, সেইটে জড়িয়ে-মড়িয়ে শুয়ে থাকুন—ওগুলো শুকুক ততক্ষণ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শুকিয়ে যাবে"

"যা বলছ তাতে মনে হচ্ছে না যে আমরা ঘুমোবার আয়োজন করছি। মনে হচ্ছে 'মগ্নতরী' বা ওই গোছের কোনও ছায়াচিত্রে অবতীর্ণ হবার আয়োজন করছি"

"যা বলছি শুনুন। কোটটা খুলে ফেলুন আগে। কিন্তু তার আগে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিন দয়া করে। ওটা পেলেন কোথা"

সুশোভন কাতর দৃষ্টিতে বিছানার দিকে চাইলে একবার। তারপর ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিলে। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। কোটটা খুলে ফেললে। তারপর একটু ঝুঁকে হাত দিয়ে দেখলে মোজাও ভিজেছে, খুলতে হবে। এক পায়ে দাঁড়িয়ে খুলতে গিয়ে টাল সামলাতে পারলে

না, পড়ে গেল। হাতের কাছে যা পেল তাই ধরতে গিয়ে ভীষণ কাণ্ড করে বসল একটা। ড্রেসিং টেবিলের উপর চীনে মাটির প্রকাণ্ড ফুলদানি ছিল, সেইটে ঝনঝন করে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

"কি করছেন আপনি, সুশোভনবাবু"—চাপা কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল সান্ত্বনা।

"কিছু না, কিছু না। হাত লেগে কি যেন পড়ে গেল। হয়নি কিছু'

"ভীষণ শব্দ হল যে।"

"ভীষণ শোনাল। ভীষণ কিছু হয়নি।"

"ভেঙে গেছে?"

"দেখতে পাচ্ছি না। ভাঙলেও একটু আধটু কোণটোন হয়তো ভেঙেছে।"

"যাক, যা হবার হয়েছে, এবার শুয়ে পড়ুন। কম্বলটা জড়িয়ে নিন। খাটের রেলিংয়ে ঝুলছে কম্বলটা। জড়িয়ে শুয়ে পড়ুন মেঝের উপর। আর দেরি করবেন না।"

"চুপ চুপ"—সুশোভন রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল—"শুনতে পাচ্ছ?"

হ্যাঁ, শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল বেশ। খড়মের শব্দ। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। দুয়ারের সামনে এসে দাঁড়াল। অজ্ঞাতসারে সুশোভনের মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল। কপাটের ফাঁক দিয়ে আলো দেখা গেল। রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইল সুশোভন। এই পরিস্থিতিতে এই বেশে এতরাত্রে গোঁসাইজির সম্মুখীন হওয়ার 'তাগত' তার আর ছিল না। সে গুঁড়ি মেরে সন্তর্পণে বিছানার ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল। গোঁসাইজি কড়া নাড়লেন। আর দ্বিধা না করে সুশোভন হুড়মুড় করে বিছানায় উঠে সটান শুয়ে পড়ল সান্ত্বনার পাশে আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে। সান্ত্বনাও চুপ করে রইল। টুঁ শব্দটিও করলে না। গোঁসাইজি আরও দু'বার কড়া নাড়লেন। কোনো সাড়া পেলেন না।

"ঘুমের ভান কর", চুপি চুপি বললে সুশোভন। চতুর্থবার কড়া নেড়েও যখন কোন সাড়া পাওয়া গেল না তখন গোঁসাইজি কপাটটা একটু ঠেলে মুণ্ডটি ঢোকালেন কপাটের ফাঁক দিয়ে। জোরে জোরে নিশ্বাস নেওয়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কপাট আর একটু ফাঁক করে আর একটু ভিতরে ঢুকে লণ্ঠনটি তুলে দেখলেন। দেখতে পেলেন যে তাঁর অতিথি দু'জন শুয়ে ঘুমুচ্ছে। পাশাপাশি মাথা দুটো বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। কংগ্রেসকর্মী ব্রজেশ্বরবাবু আগাগোড়া ঢাকা দিয়েছেন, মুখ দেখা যাচ্ছে না। তাঁর স্ত্রীর মুখটা বেশ দেখা যাচ্ছে। অধরে যেন ঈষৎ হাসির আভাসও দেখতে পেলেন মনে হল।

তাঁর পিছু পিছু ফদ্‌কাও উঠে এসেছিল। সে-ও উঁকি দিয়ে দেখলে সব। অত্যধিক আগ্রহবশত নিজেকে স্থির রাখতে পারছিল না সে সম্ভবত, কনুইটা কড়ায় লেগে বেশ শব্দ হল আবার। গোঁসাইজি চাপা-কণ্ঠে তর্জন করে উঠলেন।

"তুই ফোঁপরদালালি করতে এলি কেন এখানে? শুগে যা। এখানে কিছু হয়নি। ফের যদি আওয়াজ হয়, ঠাকুরকে উঠিয়ে নীচটা দেখতে হবে ভাল করে"

"বোধ হয় বেড়াল"

"বেড়াল না হাতি! ফাজিল কোথাকার—"

ফদ্‌কা নীচে চলে গেল। গোঁসাইজি কপাটটা সন্তর্পণে বন্ধ করে দিলেন। তারপর আলোটা একটু তুলে নীরবে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন বাইরের বারান্দায়। ওধারের যে ঘরটায় তাঁর গুরু-ভগ্নী আছেন সেদিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। না, ওধারে কিছু হয়নি। বাইরে থেকেই

নাক-ডাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। স্ত্রীলোকের এত জোরে নাক-ডাকা একটা দুর্লক্ষণ। তাঁর গুরুভগ্নী পুণ্যবতী নারী...ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইলেন গোঁসাইজি চিন্তামগ্ন হয়ে। তারপর তাঁর মনে হল ওটা রোগের জন্য সম্ভবত। আরও আধ মিনিট দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখলেন। না, সন্দেহজনক কিছু দেখা গেল না। নিজের শয়নঘরের দিকে অগ্রসর হলেন। সিঁড়িতে ওঠার শব্দ পাওয়া গেল। ঘরে ঢুকে খিল দিলেন তা-ও শোনা গেল স্পষ্ট।

"সুশোভনবাবু, নীচে যান। শিগ্‌গির যান বলছি—"

"হায় ভাগবান! প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যেতেই হবে?"

"কি যে ছেলেমানুষি করেন, উঠুন, কি করছেন, উঠুন না"

"যাচ্ছি, যাচ্ছি, খোঁচা মেরো না, দোহাই তোমার"

"কম্বলটা বেশ করে জড়িয়ে শুয়ে পড়ুন নীচে"

"বেশ"

"দেরী কর্চ্ছেন কেন"

"নাবছি তো। অত চেঁচিয়ো না, চেঁচামেচি শুনলে ও ব্যাটা এক্ষুনি নেবে আসবে আবার। আঃ, ঠেলছ কেন, পা ঝুলিয়ে মোজাটা খুঁজছি—ঘুমটা বেশ এসে গিয়েছিল"

"মেঝেতেও এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বেন।"

"কাল সকালে কি হবে বল দিকি? ভোর না হতে হতেই ওই ফদ্‌কা এসে হাজির হবে ঝাড়ু দিতে ড্রেসিং টেবিলের নীচে মাথা গলিয়ে আমি কম্বল জড়িয়ে প'ড়ে আছি দেখলে কি ভাববে বলতো। কি জবাবদিহি করব তার কাছে"

"করবেন যা হোক্ কিছু। বুদ্ধির তো অভাব নেই আপনার। বলবেন মোজা খুঁজছি ওর তলায়..."

"মোজা তো আমার পায়ে"

"এক পাটি খুলে তাহলে ঢুকিয়ে দিন এখন থেকে"

"কি যে তোমার ইয়ে, সান্ত্বনা—মানে—এরকম—"

"কথা বলে সময় নষ্ট করছেন কেন বৃথা। আমাকে চেঁচাতে মানা করে নিজে তো চেঁচিয়ে চলেছেন দিব্যি। বেশ গুটিয়ে সুটিয়ে আরাম করে শুয়ে পড়ুন না। হ্যাঁ, দেখুন—"

"কি আবার—দাঁড়াও—দুত্তোর—এক মিনিট—হ্যাঁ—কি বল—"

"ওই ফুলদানি-ভাঙার উপর শোবেন না যেন, হাত দিয়ে সরিয়ে দিন টুকরোগুলো কেমন?—"

।। এগারো ।।

বৃষ্টিটা থেমেছিল কিন্তু মেঘ কাটেনি। মনে হচ্ছিল যে-কোনও মুহূর্তে শুরু হতে পারে আবার। প্রকৃতিদেবী কান্নাটা থামিয়েছেন বটে—সম্ভবত মানবজাতির শোচনীয় অধঃপতনে ব্যথিত হয়েই বিগলিত হয়েছিলেন তিনি—কিন্তু সমস্ত মুখ থমথম করছে এখনও। বিশাল বিশাল মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে আকাশে। সূর্যকিরণের প্রসন্ন হাসি সুদূরপরাহত মনে হচ্ছে। চতুর্দিকে বেশ ঘন-ঘোর এখনও।

একজন কিন্তু বেশ পুলকিত হয়ে উঠেছেন। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "রাত্রে বৃষ্টি হয়ে গেছে দেখছি—বাঃ চমৎকার। দরকার ছিল, রাস্তায় যা ধুলো। বেশ মেঘলা মেঘলা আছে, রাস্তায় বাইক করতে কোনও কষ্ট হবে না। রোদ নেই—খাসা! আজ হনুমানপুরাটা সেরে ফেলব তাহলে, রামতারণবাবু, বুঝলেন? জলখাবার প্রস্তুত বলছেন? এর মধ্যেই? ছোলা গুড়? খুব ভালবাসি। অতি পুষ্টিকর খাদ্য। নারকেল? বলেন কি! নারকেল নাড়ু? তাহলে তো আরও চমৎকার—তোফা! কোথা? পাশের ঘরে—ও চলুন—ঠিক—"

রামতারণ ত্রিবেদী নরসিংহপুর গ্রামের আপার প্রাইমারি স্কুলের পণ্ডিত। সদারঙ্গবিহারীলাল এ অঞ্চলে এলে এঁরই আতিথ্য গ্রহণ করেন। অতিশয় সজ্জন লোক। শুধু তাই নয়, খুব নিরীহ। ভদ্রলোকের সদা সন্তুষ্টভাব অথচ ব্যস্তবাগীশ। নিজের চারদিকে একটা স্নিগ্ধ আবহাওয়া বজায় রাখবার জন্যে সর্বদাই আগ্রহান্বিত তিনি। কোন কিছু উগ্র অমসৃণ এলোমেলো বরদাস্ত করতে পারেন না—তাড়াতাড়ি সমস্ত শান্ত না করা পর্যন্ত শান্তি পান না কিছুতে। বেঁটে পরিপুষ্ট লোকটি সর্বদা সব সামলাতে ব্যস্ত যেন। ছোট ছোট বেঁটে হাত দুটি দিয়ে হয় কোঁচকানো বিছানার চাদর ঠিক করছেন, না হয় টেবিলে বই গুছিয়ে রাখছেন। অভাবে নিজের কোটের সম্মুখভাগটার উপরই হাত বুলিয়ে বুলিয়ে মসৃণতর করবার চেষ্টায় আছেন সেটা। ভারি মিষ্টি স্বভাব। তাছাড়া নিরপেক্ষ নির্বিবাদী লোক। ঝগড়া-তর্কের সীমানায় থাকেন না কখনও।

সদারঙ্গবিহারীলাল ত্রিবেদী মহাশয়ের আহ্বানে সোৎসাহে পাশের ঘরে ঢুকলেন। ত্রিবেদী মশায় সরে দাঁড়িয়ে পথ দিলেন তাঁকে, তারপর সন্তর্পণে গোঁফে হাত বুলুতে বুলুতে অনুসরণ করলেন। টেবিলের উপর খাবার ছিল। সদারঙ্গবিহারীলাল চেয়ার টেনে বসলেন এবং আনন্দের আতিশয্যে করতালি দিলেন একবার।

"বাঃ—তোফা—"

রামতারণ ধীর কণ্ঠে বললেন—"আপনি কিছু সঙ্গে নিয়ে যাবেন কি, ছোট একটা বিস্কুটের টিনে পুরে যদি দি'—ওখানে কতক্ষণ থাকবেন স্থিরতা নেই তো, ওখানে খাদ্যদ্রব্য কি পাওয়া যায় তারও স্থিরতা নেই—যদিই বা যায়, কি মূল্যে পাওয়া যাবে স্থিরতা নেই—"

সদারঙ্গবিহারীলাল অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। তিনবার 'স্থিরতা' শুনে ভাবছিলেন, যে পণ্ডিতের শব্দের সঞ্চয় এত কম সে কি করে ছেলেদের ভাষা শিক্ষা দিতে পারে—ছেলেরাই তো দেশের ভবিষ্যৎ—তাদের যদি ভাষাজ্ঞান ঠিকমতো না হয় তাহলে তো শিক্ষার ভিত্তিই অমজবুত হয়ে যাবে—অথচ লোকটা ভাল—

"কিছু নিয়ে যাওয়াই ভাল, কি বলেন"

"ও—হ্যাঁ—নিশ্চয়ই। এ তো খুবই সুযুক্তি"—নারকেল নাড়ু দাঁতে আটকে গিয়েছিল, সেটা ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"বেশ তো, কি দিচ্ছেন সঙ্গে"

"নারকেল নাড়ু"

"আবার নারকেল নাড়ু। বেশি খেলে আবার—মানে—নারকেল অবশ্য খুবই ভালবাসি আমি, ডাক্তাররা বলেন খুবই পুষ্টিকর—কিন্তু আপনাদের সব নাড়ুগুলো আমিই যদি খেয়ে ফেলি—"

"নারকেল নাড়ু প্রচুর আছে। কলাও দিচ্ছি গোটা চারেক"

"কলা? বলেন কি, খাসা হবে"

"একটু মোহনভোগও করিয়ে দিতে পারি যদি বলেন"

ইতিপূর্বে মোহনভোগ খাইয়েছেন তাঁকে রামতারণ ত্রিবেদী। কালো চটচটে আঠার মতো বস্তুটির ছবি মানসপটে ফুটে উঠল সদারঙ্গবিহারীলালের।

"কি দরকার মোহনভোগের। কলাই যথেষ্ট"

"কটার সময় আপনি বেরুবেন বলুন না"

"বেরুবো? দাঁড়ান তাহলে—সর্বাগ্রে ওই সাইকেলওয়ালা মিঠ্ঠুর কাছে যাওয়া দরকার। সে একবার গাড়িটা ঠিক করে দিয়েছিল। বেরুবার আগে ভাল করে তেলটেল দিয়ে নিতে হবে আজ। কাল একটু লুব্রিকেটিং তেলের অভাবে—উফ্! মিঠ্ঠু কারবুরেটার খুলে সাফ করতে চাইবে নিশ্চয়। প্লাগও বদলাতে পারে। হ্যাঁ, দশটাই ধরুন—তার আগে বেরোনো যাবে না।"

"মোহনভোগ হয়ে যাবে তার মধ্যে"

কোটের সম্মুখভাগে হাত বুলোতে বুলোতে রামতারণ স্থিরকণ্ঠে বললেন কথা কটি। চকিতে রামতারণের দিকে একবার চেয়ে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে ছোলাগুলি চিবোতে লাগলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

প্রায় সওয়া দশটা নাগাদ রওনা হয়ে গেলেন তিনি। সাইকেলের পিছনে স-মোহনভোগ বিস্কুটের টিনটি বেঁধে দিয়েছিলেন ত্রিবেদী মশায়। মিঠ্ঠুও নিখুঁতভাবে ঠিক করে দিয়েছিল সাইকেলটি। ফট্-ফট্-ফট্-ফট্ শব্দে চতুর্দিক সচকিত করে প্রধাবিত হল মোটরবাইক। যদিও মেঘলা দিন, তবু কোথা থেকে একটু আলো লুকিয়ে এসে ঝিলিক তুলেছিল তাঁর চশমার লেন্সে। হরিমটর পান্থনিবাসের সামনের রাস্তা দিয়েই হনুমানপুরে যেতে হয়। পান্থনিবাসের সামনা-সামনি এসে গাড়ির গতিবেগ কমিয়ে হোটেলের দিকে চাইতেই দেখতে পেলেন প্রচুর গলাখাঁকারি দিয়ে উপরের জানলা থেকে গোঁসাইজি নিষ্ঠীবন ত্যাগ করছেন। হোটেলের জানালা-কপাট সব খোলা, কিন্তু সান্ত্বনা দেবী বা আর কাউকে দেখা গেল না। সদারঙ্গ-বিহারীলাল ভাবলেন নিশ্চয় তাঁরা চলে গেছেন। গাড়ির বেগ বাড়িয়ে দিলেন আবার। এই সুখী দম্পতির কথাই ভাবতে ভাবতে ভীমবেগে চলেছিলেন তিনি। যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী। অত বড় অধ্যাপক, অমন নামজাদা কংগ্রেসকর্মী—কিন্তু এতটুকু অহঙ্কার নেই... সান্ত্বনাও ভারী লক্ষ্মী মেয়ে। মণি-কাঞ্চন। দেখতে দেখতে এক মাইল পার হয়ে গেল, সান্ত্বনার শুধু রূপ নয় গুণও আছে...অনেক গুণ। সামনে রাস্তাটা বেঁকেছে.....ঘুরেই কি কাণ্ড!—সজোরে ব্রেকটা চেপে ধরলেন... গাড়িটা টাল খেয়ে পড়েই যেত হয়তো পাশের খানায়—যদি না বাঁ পা-টা রাস্তায় পাশের একটা ঝোপে ঢুকিয়ে সামলে নিতেন তিনি কোনক্রমে। ছোঁড়া রাস্তার ঠিক মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে আছে। এখনও দাঁড়িয়ে আছে—দাঁত বার করে হাসছে আবার।

ঝোপ থেকে পা বার করে নিলেন তিনি। একটু মচকেছে বোধ হয়। পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালটা মুছলেন, চশমাটা ঠিক করে নিলেন। তারপর ছেলেটার দিকে চেয়ে অনুকম্পা হল একটু—এরা এমনিভাবেই বেঘোরে মারা যায়—আর একটু হলে গেছল। বেঁটে গোছের ছেলেটা। পরনে ময়লা খাকি হাফপ্যান্ট, গায়ে ছেঁড়া সোয়েটার, হলদে রঙের দাঁত। হাসছে—হাসি দেখে মনে হয় বিচ্ছু। শহর থেকে আমদানী সম্ভবতঃ, পাড়াগাঁয়ে ভীতুভাব মোটেই নেই।

"এই ছোকরা, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এখনি চাপা পড়তে যে—"

ছোঁড়া দাঁত বার করে হাসল আবার।

"হাসছ কি, সাবধান না হলে মারা যাবে একদিন। আরে—"

ছোঁড়া সরে পড়বার উপক্রম করছিল। তার ডান হাতে একটা দড়ি ছিল, সেটা আর এক পাক দিয়ে জড়িয়ে নিলে সে ভাল করে—সঙ্গে সঙ্গে তার পিছন দিক থেকে আর্ত কেঁউ কেঁউ ধ্বনিত হয়ে উঠল। কুকুর—হ্যাঁ কুকুরই তো— ছোট কুকুরের বাচ্চা একটা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। ছোঁড়াটা তার গলায় দড়ি বেঁধে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলেছে সেটাকে। ভ্রূকুঞ্চিত করে সদারঙ্গ-বিহারীলাল দৃশ্যটা নিরীক্ষণ করলেন একটু ঝুঁকে। বাচ্চাটা কিছুতে যাবে না। ছোঁড়াও ছাড়বে না, হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

"এই থাম থাম"—আদেশের ভঙ্গিতে বললেন সদারঙ্গবিহারীলাল—"আরে, এ কুকুর যে চেনা। এ তো তোমার কুকুর নয়। এ তো চেনা কুকুর"

"চীনা নেই, বিলেইতি"

সদারঙ্গবিহারীলাল অবিলম্বে বুঝলেন ছোঁড়া বিহারী। শুধু তাই নয়, কুকুরের জাতও চেনে।

"চীনা নেই বোলতা, চেনা চেনা"

"নেই বিলেইতি"

ভারী ডেঁপো তো!

"আরে বাবা তাই সই। কুত্তা কাঁহা পায়া"

ছোঁড়া সদারঙ্গবাবুর দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে কুকুরটার দিকে চাইল। ঝুনু যেন মানুষের মতো এড়িয়ে গেল তার দৃষ্টিকে। ভয়ে কাঁপছিল বেচারি।

'ই কুত্তা কো কাল রাতমেই হাম আদর কিয়া হ্যায়, গায়ে হাত বুলায়া হ্যায়, ইস্ কো মালিককে সাথ বহুক্ষণ গল্প কিয়া হ্যায়। ই কুত্তা কাঁহা মিলা"

'ই কুত্তা নেহি হ্যায়"

"নিশ্চয়ই কুত্তা হ্যায়। ইস্‌কো ল্যাজ নেহি দেখকে তুম্ হয়তো ভাবতা হ্যায় ই কুত্তা নেহি হ্যায়। কিন্তু ই কুত্তাই হ্যায়—ল্যাজ কাট দিয়া। কাঁহা পায়া ই কুত্তা—"

'ই কুত্তা নেহি হ্যায়"

"আরে বলে কি! কুত্তা নয় তো কি বিল্লি? বোলে কাঁহা পায়া ই কুত্তা'

'ই কুত্তা নেহি হ্যায়।"

"আরে! তুম্ কি হামরাসে বেশি জানতা হ্যায়। বোকাকা মাফিক তর্ক করকে ফল কি। ইস্ কুত্তাকে হাম চিনতা হ্যায়, ইস্‌কো মালিককো ভি হাম চিনতা হ্যায়, আজসে নেই, অনেক দিনসে"

"আগর আপ জবরদস্তী ইস্‌কো কুত্তা বানাইয়ে তো ম্যয় নাচার হুঁ। মগর ই কুত্তা নেহি হ্যায়"

"আরে তুমরা মাফিক এইসা ডেঁপো ছোকরাকে পাল্লামে ইতিপূর্বে পড়া বোলকে তো ইয়াদ নেহি হোতা হ্যায়। কুত্তা নেই তো ই কি হ্যায়"

"কুত্তী হ্যায়, হুজুর। দেখিয়ে—"

চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হয়ে গেল সদারঙ্গবিহারীলালের। এটা প্রত্যাশাই করেন নি তিনি। অপ্রস্তুত ভাবটা সামলে নিয়ে বললেন—"তা হো সেকতা হ্যায় অবিশ্যি। কাঁহা পায়া"

"রস্তে মে"

"কি করেগা ইস্‌কো লেকে"

"পোষেঙ্গে। শিখাওয়েঙ্গে —"

"উস্‌কো শিখানে কো কুছ দরকার নেই হ্যায়। যথেষ্ট শিক্ষা হ্যায় উস্‌কো—"

"কুছ নেই জানতি। দেখিয়ে না ঠিকসে চল ভি নেহি সক্‌তি—"

"বাজে বক বক মত্‌ করো—ই কুত্তা হামকো দেও"

"ফির আপ কুত্তীকো কুত্তা কহতে হে"

সাধারণ কথাবার্তায় হামলোগ ওতনা লিঙ্গ বিচার নেহি করতা হ্যায়। আসল কথা হাম ইস্‌কো লে যায়গা, লে করকে আসল মালিক কো ঘুরায় দেগা, বুঝা?"

"কুছ্‌ বকশিশ মিলনা চাহিয়ে"

"বকশিশ? কাহে? দোসরা আদমিকো কুত্তা লেকে ভাগতা হ্যায়, থানামে খবর দেনেসে কি হোগা জানতা হ্যায়?"

"দিজিয়ে তব থানে মে খবর"

"আরে—এ তো ভারী ত্যাঁদড় ছোঁড়া দেখছি!"

সদারঙ্গবিহারীলালের মাথায় চকিতের মধ্যে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন—"দেখো, বকশিশ ফকশিশ নেই দেগা, তবে একটো চিজ দে সেকতা হ্যায়"

"ক্যা—"

"নাড়ু"

"নাড়ু"

"হাঁ। ঘরকা তৈরি নারকেলকা নাড়ু"

"দেখলাইয়ে তো"

সদারঙ্গবিহারীলাল বাইকের পিছন থেকে বিস্কুটের টিনটা খুলে একটি নাড়ু বার করে দিলেন তাকে। ছেলেটি একটু কামড়ে আগে পরখ করে দেখলে, তার পর সবটা মুখে পুরে ফেললে।

"আওর একঠো হুজুর"

আরও একটি নাড়ু দিলেন। ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে ছোঁড়াকে উপদেশও দিলেন কিছু। ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা কইতে হয়, যখন তখন অমন দাঁত বার করে হাসাটা অভদ্রতা, দাঁত মাজাও উচিত প্রত্যহ, অমন ছেতো-পড়া হলদে দাঁত দেখতে বিশ্রী নয় কি? সব শুনে ছোঁড়া দাঁত বের করে বললে—"আউর একঠো লাড্ডু দিজিয়ে, হুজুর—"

তৃতীয় নাড়ুটি দিয়ে ঝুনুকে উদ্ধার করলেন তিনি। ভুরু কুঁচকে ভাবলেন একটু। সমস্যা, কি করে নিয়ে যাওয়া যায় এখন। পরমুহূর্তেই কিন্তু মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। হয়েছে! গায়ে একটা ঢিলে গোছের কোট পরেছিলেন তিনি। বুকের বোতামগুলো খুলে ফেললেন এবং ঝুনুর আপত্তি সত্ত্বেও কোটের ভিতর পুরে নিলেন তাকে, পুরে বোতাম এঁটে দিলেন। এ ছাড়া গত্যন্তরও ছিল না। সোৎসাহে মোটরবাইকে সওয়ার হলেন সদারঙ্গবিহারীলাল এবং সবেগে ধাবিত হতে লাগলেন হরিমটর হোটেলের উদ্দেশ্যে।

।। বারো ।।

শার্দুল সিং-এর ম্যানেজার প্রীতম্ সিং ফোন ধরেছিলেন। পাঞ্জাবী হলেও বাংলা ভাষায় বেশ কথাবার্তা বলতে পারেন ভদ্রলোক। গণেশের টুকরো টুকরো কথা থেকে তিনি মোটামুটি একটা ধারণা খাড়া করেছিলেন গণেশ ছিপসরকারী থেকে কথা বলছে, কিছুক্ষণ পরে পোস্টমাস্টারের সঙ্গে কথা কয়ে বুঝলেন, ছিপসরকারী নয়, ছিপছররামারী। লাইনটা কোথায় যেন লীক করছে। সুশোভনবাবুরা রাত্রে যে হোটেলে ছিলেন তার নাম—প্রীতম্ সিং প্রথম শুনলেন হরমটর পান্থনিবাস।

"জায়গাটার নামগুলো একটু অদ্ভুত গোছের, নয়"—প্রীতম্ সিং বললেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ অদ্ভুতই। মান্ধাতার আমলের ব্যাপার"

গণেশ তখন পোস্টমাস্টারকে জিজ্ঞেস করলে, যে জায়গাটা তারা ছেড়ে এলেন তার নাম কি?

পোস্টমাস্টার প্রবীণ লোক। মাথার একটি চুলও কালো নেই। তার উপর একচক্ষু। অনেকদিন চাকরি করে ঘাগী হয়েছেন, চট করে কথার জবাব দেন না, বেফাঁস না বেমক্কা হয়ে যেতে পারে। যা বলেন ভেবেচিন্তে ধীরেসুস্থে বলেন। এই যে সব মোটরে চড়ে শহর থেকে বাবুরা আসেন, ফড়ফড় করে যা তা জিগ্যেস করেন, এদের উপর মনে মনে হাড়ে-চটা তিনি। যত সব ফক্কর দালাল জ্বালাতে আসে খালি। সকালে ওই ভদ্রমহিলাটি বেশ জ্বালিয়েছেন এক চোট। টেলিফোন ডাইরেকটারিখানাকে তচনচ করে তবে ঠিক করলেন যে দিগ্বিজয় সিংহরায়ের ফোন নেই। তিনি গেছেন, এবার ইনি এসেছেন!

"যেখান থেকে আপনারা এলেন সে জায়গাটার নাম জিগ্যেস করছেন?"—সংযত কণ্ঠেই প্রশ্নটা করলেন।

"হ্যাঁ"—মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে জবাব দিলে গণেশ।

"কোন্ রাস্তা দিয়ে এলেন আপনারা?"

"এই যে এই রাস্তায় এক্ষুনি এলাম।"

পোস্টমাস্টারের একচক্ষুর দৃষ্টিটি নিবদ্ধ হল গণেশের মুখের উপর।

"এই রাস্তায় মেলা গ্রাম আছে, একটা নয়, মেলা। আপনি কোথা থেকে এলেন, তা আমি কি করে বলব? যেখান থেকে এলেন সে জায়গার নাম আপনি যদি না জানেন আমি কি করে জানব? একটা নয়, মেলা গ্রাম আছে এ রাস্তায়, মেলা—মেলার চেয়েও বেশী—"

"ধরে থাকুন," গণেশ বললে প্রীতম্ সিংকে—"আমি মান্ধাতাকে জিগ্যেস করছি। দেখছি স্বয়ং তিনিই এখানে আছেন।"

"লোকে যদি আপিসে ঢুকে ক্রমাগত জিগ্যেস করে আমি এই রাস্তা দিয়ে যেখান থেকে এলাম তার নাম কি—তাহলে কী করে জবাব দিই বলুন। সেকথা তাদের নিজেদেরই তো জানা উচিত। তারাই সেখান থেকে এসেছে, আমি আসিনি। আপনি যেখান থেকে এলেন কি রকম সে জায়গাটা—"

পোস্টমাস্টার বকে চলেছিলেন।

অনেক ধস্তাধস্তির পর প্রীতম্ সিং যে সংবাদটি সংগ্রহ করলেন তা এই যে, সুশোভনবাবুরা

যে হোটেলে রাত্রিবাস করেছিলেন, তার নাম হরিমটর এবং হোটেলটি যে গ্রামে অবস্থিত তার নাম ফতিমারঙ্গপুর। এর পর তাঁরা কোথা যাবেন তা গণেশ কিছুতে বলতে পারলে না। মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরীর নাম কিছুতেই মনে এল না তার।

"আমাদের আপিসে যে ম্যাপটা আছে সেটা দেখলে নামটা পাবেন বোধ হয়। চমৎকারকুণ্ড বা ওই গোছের কিছু একটা—মচকানকাণ্ডও হতে পারে। দেখবেন, ম্যাপে থাকা সম্ভব। ম্যাপেই ওই ধরনের নাম থাকে। এখান থেকে খুব দূর নয় এইটুকুই শুনেছি—এর বেশি কিছু জানি না। ফিরতে কত দেরি হবে তা বলতে পারি না। ফোন কি করে পেলাম? এরকম অজ পাড়াগাঁয়ে ফোন পাব আশাই করিনি। শুনলুম এদিকে মিলিটারির একটা ছাউনি ছিল, তারাই নাকি পোস্টাপিসে ফোনটা বসিয়েছিল। হ্যাঁ, আপনারা ভাববেন তাই ফোনটা করে দিলাম—"

"ভাবনা অবশ্য ঘুচল না"—উত্তর দিলেন প্রীতম্ সিং।

"তা কি করব বলুন, সার। ভাল বুঝলাম তাই করলাম—"

এদিকে পোস্টমাস্টার, অন্যদিকে ম্যানেজার—গণেশের মেজাজ ক্রমেই চড়ে উঠছিল।

"মিছামিছি ফোন করে অতগুলো পয়সা নষ্ট না করলেও পারতে—"

"খবর না দিলে বলতেন, ফোন করবার যখন সুবিধে ছিল একটু খবর দিলেই পারতে। ফোন করেছি—এখন বলছেন অনর্থক পয়সা খরচ করছ কেন, আপনাদের অন্ত পাওয়া ভার"

"যাক্ তাড়াতাড়ি ফিরে এস"

ফোনে কথাবার্তা শেষ হল।

এক হিসেবে এই অবশ্য যথেষ্ট হল। যতটুকু খবর পেলেন প্রীতম্ সিং, তা পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্বয়ম্প্রভা দেবীকে জানিয়ে দিলেন। সুতরাং লোহার দালাল জিতু সরকার লৌহসংক্রান্ত ব্যাপারে যদিও তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর তন্ময়তা বাধাপ্রাপ্ত হল। একটি কেরানী এসে চুপি চুপি খবর দিয়ে গেল যে মিসেস সরকার ফোনে ডাকছেন।

"ডাকছেন? আমাকে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

জিতুবাবুর মুখের বিপন্ন ভাবটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

"ওকে ফোনটা ধরে থাকতে বল। আর ওই টেলিগ্রাফের ফর্মগুলো দাও তো—"

ফর্ম দিয়ে কেরানি চলে গেল।

জিতুবাবুর মাথায় চুল বেশি ছিল না, যা ছিল তাই তিনি মুঠো করে ধরে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর মরিয়া হয়ে শুরু করে দিলেন—"সুশোভন কট্ ট্রেন বাট মিস্ড্, ওয়াইফ কট্ বাট্ রিটার্নড্"

কেরানি পুনঃপ্রবেশ করে বলে গেল মিসেস সরকার আপনার ফোনেই কথা বলছেন। জিতুবাবুর নিজের প্রাইভেট ফোনটা পাশেই ছিল, পরমুহূর্তেই ঝনঝন করে বেজে উঠল সেটা। জিতুবাবু ধীরেসুস্থে রিসিভারটা তুলেই বুঝলেন স্বয়ম্প্রভা ইতিমধ্যে অনেক কিছু বলে ফেলেছেন।

"তুমি শুনছো?"—হঠাৎ থেকে প্রশ্ন করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"শুনছি বই কি"

"সাড়া দিচ্ছ না কেন তাহলে। টেলিগ্রাফ করেছ?"

"নিশ্চয়"

"তাহলে বেকুবি করেছ। তখনই তোমাকে পই পই করে মানা করলাম যে টেলিগ্রাফটা কোরো না, করা বৃথা—"

"বল তো এখনও বন্ধ করে দিতে পারি"

"ও, পাঠাওনি এখনও! বহুক্ষণ আগেই তো পাঠাবার কথা—"

"তোমার ইচ্ছেটা কি তা-ই বল না। টেলিগ্রাফ করব, কি করব না"

"কি—"

"করব, না করব না"

"কি—"

"টেলিগ্রাফ গো"

"টেলিগ্রাফ করে আর কি হবে। এখনও করনি তাহলে?"

"মানে, যদি চাও বন্ধ করে দিতে পারি এখনও"

"বন্ধ করবে কি করে! কখন পাঠিয়েছ?"

"চেষ্টা করে দেখতে পারি। টেলিগ্রাফ করতে মানা করছ কেন"

"কেন? কারণ, আমি বলছি সে সেখানে নেই। কোথায় আছে তাও জেনেছি আমি। বুঝলে? শুনছ?"

"কোথায় আছে, বল না"

"সে সেই মাগীকে নিয়ে একটা হোটেলে গিয়ে বাস করছে—"

"বল কি! হোটেলে? বাস করছে? বাস করছে মানে কি—মোটে কালই তো গেছে—"

"মানে, কাল রাত্রে তারা দুজনে সেখানে বাস করেছিল"

"কি বলছ যা তা"

"কি?"

"কি বলছ যা তা"

"জাঁতা কি? শুনতে পাচ্ছি না কিচ্ছু। ব্যাপারটা বোঝ একবার! হোটেলে গিয়ে বাস করছে!"

"কি যা-তা বলছ, সম্পূ—"

"অসম্পূ? অসম্পূ কি! অসম্ভব বলছ? কি অসম্ভব?"

"এই হোটেলে বাস করা। মানে, সম্পূ—"

"যা বলছ, স্পষ্ট করে উচ্চারণ কর না। মুখটা ফোনের কাছে এগিয়ে আন—"

"আমি বলছি সম্পূর্ণ বাজে কথা এটা"

"খোকামি না করে বাড়ি চলে এস। বেরুতে হবে এক্ষুনি—"

"যাব না। একটি কথা বিশ্বাস হচ্ছে না আমার"

"মুখে কিছু পুরেছ নাকি, সুপুরি-টুপুরি?"

"না। শোন—"

"শুনব কি করে যা ফোন তোমার! অফিসের ফোনটা ঠিক করে রাখতে পার না? কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না; বানান কর—বানান করে বল—"

"কি"

"বাড়ি চলে এস"

"এখন যাওয়া অসম্ভব। কেন ঘাবড়াচ্ছ, আমি বলছি তেমন কিছু হয়নি। সে হোটেল কোথায়—"

"মফঃস্বলে। হরিকোটর না কোথা—"

"তার মানে অনীতার খোঁজেই গেছে। বলিনি আমি?"

"অনীতার খোঁজে? কি বুদ্ধি তোমার মরি মরি! অনীতাকে ফেলে পালিয়েছে সে কথাটা ভুলে যাচ্ছ..."

"ইচ্ছে করে তো পালায় নি। ট্রেন ছেড়ে গেল, কি করবে বেচারা—"

"খুব হয়েছে! লোহার ব্যবসা ছেড়ে ওকালতি কর গিয়ে।"

"না না, জিনিসটা ভেবে দেখ আগে"

"আমি বলছি ওই মাগীর খপ্পরে ও পড়েছে। ও রকম লোক পড়েই থাকে"

"না পড়েনি। যেটুকু শোনা গেছে, তার থেকে ও কথা বলা যায় না"

"যায়, খুব যায়। আমি চিনি ওদের। আমি যা বলছি ভদ্রভাষায় এর চেয়ে বেশি আর বলা যায় না"

"কি প্রমাণ আছে তোমার?"

"ওরা দু'জনে মফঃস্বলের একটা হোটেলে কাল একসঙ্গে রাত্রিবাস করেছে এ প্রমাণ আমার আছে। এই যথেষ্ট মনে করি আমি। পুরুষদের চিনতে আর বাকি নেই। তোমাকে আর ওকালতি করতে হবে না ওর হয়ে। বাড়ি চলে এস। ওই মাগীর সঙ্গে ও যে বাস করছে, তাতে আর সন্দেহ নেই—"

"কিন্তু ছি ছি, সম্পূ—এমনভাবে একজন ভদ্রসন্তানের নামে—" এখানে বলা প্রয়োজন, স্বয়ম্প্রভাকে জিতু সরকার আদর করে 'সম্পূ' বলে ডাকেন!

"কি? স্পষ্ট করে বল না, কি বলছ"

"বলছি সুশোভন অনীতার উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছে ট্যাক্সি করে। সে তো আর জানে না যে অনীতা পরের স্টেশনে নেবে ফিরে এসেছে। তাছাড়া অনীতার সঙ্গে ওর সব জিনিস রয়েছে যে"

"জিনিস?"

"হ্যাঁ"

"কি জিনিস"

"কাপড়চোপড়, এই সব জিনিস"

"কি?"

"কাপড়চোপড় এই সব জিনিস। জিনিস—জিনিস। সুশোভনের জিনিস। বুঝতে পারছ না?"

"কি কি জিনিস"

"আরে, কি বিপদ, তার সমস্ত জিনিস। যা যা নিয়ে সে বেরিয়েছিল। হোটেলটা কি সিংহরায়েদের বাড়ির কাছাকাছি?"

"তোমার কথা কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। তোমাকে যা বলছি ভাল করে শোন। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে সুশোভন ওই মাগীর সঙ্গে একটা হোটেলে গিয়ে বাস করছে—"

"ছি—ছি—সম্পূ—যা বলছ তা ভদ্রতাবিরুদ্ধ—ভদ্রতাবিরুদ্ধ। ভুল হচ্ছে তোমাদের। সে অনীতাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। সে মনে করেছে যে অনীতা সিংহরায়বাবুদের ওখানেই গেছে—"

"তাহলে সিংহরায়বাবুদের ওখানে না গিয়ে হোটেলে গেল কেন"

"হয়তো কিছু—"

"এবং একটি যুবতীকে সঙ্গে নিয়ে"

"মানে হয়তো কিছু—"

"বাড়ি চলে এস। আপিস বন্ধ করে দাও"

পোস্টাপিসে টেলিফোন-গাইডটি রেখে সান্ত্বনা সেলুনের দিকে অগ্রসর হল। ভিতরে ঢোকবার আগেই কানে এল অনেকগুলি লোক একসঙ্গে কথা কইছে। দ্বারের কাছে গিয়ে দেখতে পেল সুশোভনের দাড়ি অর্ধেক কামানো হয়েছে, বাকি অর্ধেকটায় এখনও সাবানের ফ্যানা লেগে রয়েছে, নাপিতটি ক্ষুর হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। পিলে-রোগা একটি ছোকরা এক হাতে কাঁচি এবং আর এক হাতে আয়না নিয়ে নিকটস্থ টুলটির উপর বসে নিজেই তার হিটলারি গোঁফজোড়াকে আরও হিটলারি করবার চেষ্টা করছে, কোণের দিকে টেবিলে আর একটি নাপিত ভুঁড়িওয়ালা এক স্থূলকায় ব্যক্তির বগল কামাচ্ছে—এবং সকলে মিলে যুগপৎ কথা কইছে। সুশোভনও। বস্তুতঃ সুশোভনই আলোচনাটা শুরু করেছিল। অন্য কিছু নয়—মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরী যাবার কোন শর্টকার্ট আছে কিনা—।

সান্ত্বনা বুঝলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা বৃথা। তার চেয়ে ইতিমধ্যে বরং আর একটা কাজ সেরে ফেলা যাক। সদারঙ্গবিহারীবাবু এইখানেই যেন থাকেন কোথাও, তাঁর সঙ্গে দেখা করে কালকের রাত্রির ঘটনাটা খুলে বলা যাক। সান্ত্বনার মনে হতে লাগল অবিলম্বে এটা করা দরকার। আর এই ফাঁকেই সেটা সেরে ফেলা ভাল। সদারঙ্গবিহারীলালের ঠিকানা যোগাড় করতে বেগ পেতে হল না বিশেষ। মোটরবাইক-বিহারী সদারঙ্গবিহারীকে এ অঞ্চলে আবাল-বৃদ্ধবনিতা সবাই চেনে। খোঁজ করতেই একজন বললে যে আজ সকালে তিনি নরসিংহপুরে ত্রিবেদী পণ্ডিতের বাড়িতে এসেছেন। নরসিংহপুর বেশি দূরে নয়। সোজা কিছুদূর গিয়েই বাঁ-হাতি।

বড় রাস্তাটা ধরেই সোজা হাঁটতে লাগল সে এবং বলাবাহুল্য অল্পক্ষণের মধ্যেই বেশ একটি দৃশ্য হয়ে উঠল। মফঃস্বলের রাস্তায় একটি লম্বা ফরসা যুবতী জুতো পরে ফার-কোট গায়ে দিয়ে অসঙ্কোচে খটখটিয়ে হেঁটে যাচ্ছে—এ অতি চমকপ্রদ দৃশ্য। সান্ত্বনা নিজেও সেটা বুঝতে পারছিল। তার ঘাড়ের কাছে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল যেন। দরিদ্রনারায়ণ, পল্লী-উন্নয়ন, নৈশবিদ্যালয়, শিশুমঙ্গল প্রভৃতি ব্যাপারে বরাবরই উৎসাহ তার—কিন্তু এখন রাস্তার দুধারে সারি সারি দণ্ডায়মান ব্যায়ত আনন দরিদ্রনারায়ণদের দেখে মনে মনে বেশ একটা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ল বেচারি। তাকে দেখে কি ভাবছে এরা কে জানে!

জনমতকে চিরকালই ভয় তার। জনমত-ভীমরুলের দংশন একবার সহ্য করতে হয়েছে তাকে। অবশ্য কাল রাত্রে যা ঘটেছে তার কৌতুকজনক বিবরণ জনসাধারণের গোচর হবার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়, কে আর অত খোঁজ করতে যাচ্ছে। কিন্তু কোনক্রমে এটা যদি প্রচার হয়ে যায় যে, কাল রাত্রে সে সুশোভনবাবুকে স্বামী বলে চালিয়েছে এবং হরিমটর পান্থনিবাসে

একঘরে রাত্রিবাস করেছে—তাহলে যা হবে তা আর কহতব্য নয়। তাছাড়া অপরে যা-ই বলুক, তার নিজের মনের ভিতরই খচ-খচ করছিল যে! কি যে কাণ্ড হল!

অবশ্য স্বামীর সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত ছিল। উদার গম্ভীর শান্ত মিতভাষী ব্রজেশ্বরের মুখখানা মনের উপর ভেসে উঠল—না, ও কিছু মনে করবে না। স্ত্রীকে সন্দেহ করবার মতো নীচতা ওর নেই। কিন্তু তা না থাকলেও উনি একজন কংগ্রেসকর্মী জননায়ক। সেদিক থেকে ভেবে দেখলে জনমতকে মোটেই অগ্রাহ্য করা যায় না। এ কথা যদি রটে যায় যে কংগ্রেস-কর্মী অধ্যাপক ব্রজেশ্বরের যুবতী পত্নী সুশোভন সরকারকে স্বামী বলে পরিচয় দিয়ে তাঁর সঙ্গে এক হোটেলে একঘরে রাত্রি বাস করেছিল, তাহলে তো ঢি-ঢি পড়ে যাবে। এমনিতেই তো কংগ্রেস পার্টিতে শত্রুর অভাব নেই, এ খবর পেলে তো নেচে উঠবে তারা। কাল এই হতভাগা হোটেলটা দেখে প্রথমে কি আনন্দই হয়েছিল তার! না এলেই হতো। বেশ কেটে যেত মোটরে। মোটর-ড্রাইভার ছিল, সন্দেহের কোন কারণই ঘটত না। ভারি অন্যায় হয়ে গেছে—ছি, ছি—

সদারঙ্গবিহারীলালের অর্থাৎ ত্রিবেদী মশায়ের বাড়ির কাছাকাছি এসে অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত বোধ করতে লাগল সে। ওই হড়বড়ে বাক্যবাগীশ লোকটার মুখ বন্ধ করতে পারলে আর কোনও ভয় থাকবে না। তার স্বামীর বিরুদ্ধপক্ষীয়দের ফাৎনা-ফিরিঙ্গিপুরে হরিমটর হোটেলে আসবার সম্ভাবনা নেই। আর যদিই বা আসেন কেউ, গোঁসাইজির কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করার সম্ভাবনা আরও কম। গোঁসাইজির কাছে আমল পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। সান্ত্বনার ভয় এই অদূরদর্শিতার ফলে তার অমন স্বামীর সুনাম পাছে নষ্ট হয়। মিতবাক্ খদ্দরধারী ব্যক্তিটির মূর্তি আর একবার ফুটে উঠল মনে।

বেশ সপ্রতিভভাবেই সে বন্ধ দরজার কড়াটা নাড়তে লাগল। ভাবটা যেন যাবার আগে দেখা করতে এসেছে, প্রসঙ্গতঃ শুধু বলে যাবে—কাল রাত্রে কি বিপদেই পড়েছিল তারা। অতদূর হেঁটে ওই হোটেলে এসে তারা গোঁসাইজির ভাববঙ্গি দেখে বুঝল যে স্বামী-স্ত্রী বলে নিজেদের পরিচয় না দিলে নিষ্ঠাবান গোঁসাইজি নির্ঘাত বলে বসবেন—'সৎকার করতে অক্ষম।' সুতরাং তাই পরিচয় দিতে হয়েছিল। সদারঙ্গবিহারীলাল এসে অজ্ঞাতসারে তাতে বাস্তবতার এক পোঁচ রঙ চড়িয়ে দেওয়াতে তাদের সুবিধেই হয়ে গেল—সেজন্যেও ধন্যবাদ দেবে সে। আর বেশি কিছু বলবার দরকার নেই। ওইটুকুতেই যথেষ্ট হবে।

ত্রিবেদী মশায় গামছা পরে সর্ষপ তৈল-যোগে নিজের অঙ্গমর্দন করছিলেন। নিজের গাল দুটিতে হাত বুলুতে বুলুতে এসে ধীরেসুস্থে কপাট খুললেন এবং খুলেই সান্ত্বনাকে দেখে একটু হকচকিয়ে গেলেন। বুঝলেন সাবধানে কথা বলতে হবে। হ্যাঁ, সদারঙ্গবিহারীবাবু ছিলেন, কিন্তু বেরিয়ে গেছেন। তা প্রায় ঘণ্টাখানেক হবে।

সান্ত্বনা ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইল ক্ষণকাল।

"কখন ফিরবেন বলতে পারেন"

"সে বিষয়ে সঠিক কিছু বলতে সাহস পাচ্ছি না"

হাতের চেটো দুটো উভয় গণ্ডে আর একবার বুলিয়ে ন যযৌ না তস্থৌ অবস্থায় এমনভাবে দাঁড়িয়ে আড়চোখে চাইতে লাগলেন ত্রিবেদী মহাশয় যে সান্ত্বনার পক্ষে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা আর সম্ভব হল না।

ধীরে ধীরে ফিরে এল বেচারি। ফিরে এসে মোটরে বসে সুশোভনের অপেক্ষা করতে লাগল। মনটা কেমন যেন খারাপ লাগছিল। নানা কথা মনে হচ্ছিল। কাল রাত্রে সদারঙ্গ বিহারীলালের কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল সে। এখন নানারকম বিপজ্জনক সম্ভাবনার কথা মনে হতে লাগল। যা বাক্যবাগীশ লোক, কি বলতে কোথায় যে কি বলে বসবে! কোলকাতার কারও যদি কানে ওঠে, তবেই তো হয়েছে।

সুশোভনের মেজাজও ক্রমশঃ খারাপ হয়ে আসছিল। সেলুনে মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরী সম্পর্কে যে ভৌগোলিক আলোচনা চলছিল, তা শুনে ক্রমেই যেন ঘাবড়ে যাচ্ছিল সে। ভাবছিল, সান্ত্বনার মুখও গোমড়া হয়ে আসছে ক্রমশঃ। কাল যখন মোটরে উঠল কি হাসিহাসি মুখ, ভাসা-ভাসা চোখে কি উদ্ভাসিত দৃষ্টি! এখন যেন একেবারে আলাদা লোক। নারীচরিত্র! দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ! কিন্তু তার অনীতা এরকম 'ভেতর-বুজে' নয়, আর যা-ই হোক। এরকম ক্ষণে ক্ষণে বদলায় না সে। তাকে বুঝিয়ে দিতে পারলেই হল যে সুশোভন এক চুল টলেনি, টলতে পারে না, ব্যস্ তাহলেই মিটে যাবে। এ বিষয়ে সুশোভনের সন্দেহ ছিল না। আর তো ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যাবে, তখন দেখা যাবে। আগে থাকতে ভেবে লাভই বা কি। তার বিশ্বাস অনীতা বুঝবে।

নাপিত গলায় তোয়ালে জড়িয়ে গালে ক্ষুর চালাতে লাগল। সুশোভন ভাবতে লাগল অনীতার সঙ্গে দেখা হলে কি বলে শুরু করবে।

।। তেরো ।।

মাঠের মাঝখানে একটা বটগাছের ছায়ার সদারঙ্গবিহারীলাল তাঁর মোটরবাইক থেকে অবতরণ করলেন, রুমাল দিয়ে কপালটা মুছে চারদিকে চাইলেন একবার। রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে গেছে, কোন্‌টা ধরবেন ঠিক করতে পারছিলেন না। মনে হল কাছাকাছি এসে গেছেন এইবার, এসব সম্ভবতঃ দিগ্বিজয়বাবুরই জমিদারি। তবু একটু খোঁজ করতে হবে। ঝুনু ভাবলে তার বিলম্বিত-হলেও-অনিবার্য মৃত্যু এবার আসন্ন হয়ে এসেছে— হঠাৎ কোটের ফাঁক থেকে বেরিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে সে একবার প্রাণপণে—পারলে না। সদারঙ্গবাবু দেখলেন অদূরে আর একটি বটগাছের নীচে একটি গরুর গাড়ি রয়েছে এবং তাতে এক বৃদ্ধ বসে আছেন। ভদ্রলোক বলেই মনে হল। এগিয়ে গেলেন সেদিকে। বৃদ্ধের দৃষ্টিশক্তি তাদৃশ প্রখর নয়, সদারঙ্গবিহারীলাল যে তাঁর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তা তিনি বুঝতে পারছেন বলে মনে হল না। আপন মনেই কি যেন বলছিলেন তিনি এবং মাথা নাড়ছিলেন। সদারঙ্গবিহারীলাল তাঁর কাছে এসে দাঁড়াতে তিনি মুখ তুলে চাইলেন। প্রথমেই চোখে পড়ল ঝুনুর মুখটা। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিলেন অন্যদিকে। দাড়ি-গোঁফওয়ালা একটা জানোয়ার একজন ভদ্রলোকের কোটের ফাঁক থেকে উঁকি দিচ্ছে এ দৃশ্য অপ্রত্যাশিত এবং অস্বস্তিকর। এ আবার কি বিপদ জুটল এসে! নিজের জ্বালাতেই তিনি অস্থির হয়ে আছেন—এ আবার—

'নমস্কার। আচ্ছা, একটা খবর বলতে পারেন—''

''খবর? একটিমাত্র খবরই এখন মস্ত হয়ে রয়েছে আমার কাছে, সেটা যদি শুনতে চান বলতে পারি''

সদারঙ্গবিহারীলালের পরোপকার-চিকীর্ষু অন্তঃকরণ কৌতূহলী হয়ে উঠল, মনে হল ভদ্রলোক বিপদে পড়েছেন হয়তো।

"নিশ্চয় শুনব, কি বলুন"

"ধানের চেষ্টায় বেরিয়েছিলাম, দাম শুনে চক্ষু কপালে উঠেছে। খালি বোরাগুলো নিয়ে মানে মানে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তা-ও যেতে পারছি না। জল খেয়ে আসি বলে গাড়োয়ান ব্যাটা সেই যে কোথায় সরেছে এখনও তার পাত্তা নেই।"

"ও। তাহলে তো মুশকিলে পড়েছেন আপনি"

"সারাজীবনই এক-নাগাড়ে মুশকিল চলেছে, মশাই। এই করেই সত্তরটা বছর কাটিয়ে দিলাম, আরও যে ক'টা দিন কর্মভোগ আছে করতে হবে। কিন্তু ধানের অবস্থা যদি এই দাঁড়ায়, তাহলে লোকে বাঁচবে কি করে বলতে পারেন।"

সদারঙ্গবিহারীলাল বুঝতে পারলেন এ ব্যক্তির উপকার করা তাঁর সাধ্যাতীত। ধানের দর কমাতে তিনি পারবেন না।

"আচ্ছা, একটা খবর—"

"খবরই তো বলছি, মশাই, শুনুন না। এই খবরই তো আসল খবর। আপনারা শহুরে বাবু, এসব খবরের ধার ধারেন না হয়তো, কিন্তু ধানের খবরই আসল খবর। ধানের এই অবস্থা হলে জান বাঁচবে না কারও তা বলে দিচ্ছি—বাইশ টাকা মণেও দিতে চাইলে না, মশাই—"

"ও, তাই নাকি। তাহ'লে চালের দর আরও চড়বে? বার্মা-রাইস না আসাতে এরকম হচ্ছে—"

"ওই এক ধুয়ো তুলেছেন আপনারা। বার্মা-রাইস না-ই এল, বিনু মোড়লের গোলায় ধান ঠাসা রয়েছে দেখে এলাম, বদমাইসি করে ছাড়বে না। আমি দেখব কেমন খদ্দের জোটে ওর, লক্ষ্মণ ব্যাপারীকে চেনেননি বাছাধন এখনও—"

আপন মনেই আর একবার মাথা নাড়লেন। সদারঙ্গবিহারীলালের হঠাৎ একবার মনে হল, বার্মা-রাইসের সঙ্গে বিনু মোড়লের গোলার ধানের অর্থনৈতিক যোগাযোগটা কোথায় তা চট করে ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দিলে মন্দ হয় না।

"সেদিনকার ছোঁড়া বিনে—এখন বিনু মোড়ল হয়েছেন। তার বাপকে চরিয়েছি, ঠাকুরদাকে চরিয়েছি—সে ওপর-টপকা চাল মারবে আমার ওপর—"

সদারঙ্গবিহারীলালের উপস্থিতিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে বৃদ্ধ নিজের মাথার টাকে হাত বুলোতে বুলোতে উল্লিখিত অর্ধস্বগতোক্তি করাতে সদারঙ্গবাবু থমকে গেলেন একটু। তাঁর রসনায় যে অর্থনৈতিক বক্তৃতাটা উদ্যত হয়ে উঠেছিল তা বাধ্য হয়ে সংযত করে ফেলতে হল তাঁকে।

"আচ্ছা, একটা খবর বলতে পারেন। মুচুকু—"

"এই বলে দিলাম আপনাকে, ওই বিনেকে গলবস্ত্র হয়ে পৌনে একুশ টাকায় ছাড়তে হবে—না যদি হয় নাক কেটে ফেলব আমি—"

বলে ভদ্রলোক নিজের নাকে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে সদারঙ্গবিহারীলালের দিকে চাইলেন। সদারঙ্গবিহারীলাল আড়চোখে একবার তাঁর নাকের দিকে চেয়ে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিলেন অন্যদিকে।

"তোর ধান তুলসীমঞ্জুরিও নয়, রূপশালিও নয়—"

"মচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরী এখান থেকে কতদূর বলতে পারেন?"

"পারি বই কি। সেখানে যাওয়া হচ্ছে কেন?"

"এই কুকুরটাকে পৌঁছে দিতে হবে"

"ওটা কি কুকুর নাকি"

"হ্যাঁ, কুকুর বই কি, বিলিতি-কুকুর"

"তাই বলুন, বিলিতি-কুকুর! বিলিতি-কুকুর কুকুর নয়, বিলিতি-কুকুর। বিলিতি-বেগুন যেমন বেগুন নয়, বিলিতি-বেগুন। মাল নিয়ে কেনা-বেচা করি আমি, আমার কাছে বেফাঁস কথা চলবে না"

সদারঙ্গবাবু অবাক হলেন। ভদ্রলোকের শুধু অর্থনীতি নয়, প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান নেই। আশ্চর্য! এঁর মনে আলোকপাত করা কর্তব্য। অন্ততঃ চেষ্টা করা কর্তব্য—নিশ্চয়ই!

"কুকুর বলতে আপনি কি বোঝেন"

"ওতে আবার বোঝাবুঝি কি আছে। আপনি যা বোঝেন আমিও তাই বুঝি"

"তবু শুনি না আপনার ধারণাটা কি রকম"

"আপনার ধারণা যে রকম"

"আমি যদি বলি আমার ধারণা এটাও কুকুর"

সদারঙ্গবাবু ঝুনুকে দেখিয়ে হাসলেন একটু।

তাহলে আমি বলব আপনার ধারণা ভুল। ওটা বিলিতি-কুকুর"

"বিলিতি-কুকুর কি কুকুর নয়?"

আপনিই আগে বলুন বিলিতি-আমড়া কি আমড়া? বিলিতি-দুধ কি দুধ? বিলিতি-রুটি কি রুটি?"

সদারঙ্গবিহারীলাল উপলব্ধি করলেন এ ব্যক্তির মনে আলোকপাত করতে হলে অনেক ধৈর্য এবং সময়ের প্রয়োজন। ধৈর্য তাঁর আছে, কিন্তু সময় আপাততঃ নেই। অন্য সময়ে চেষ্টা করা যাবে—করতেই হবে—ভদ্রলোকের বাড়িটা কোথা জেনে নেওয়া যাক।

"আচ্ছা, এ বিষয়ে পরে আলোচনা করবার ইচ্ছে রইল। আপনার নিবাস কোথা?"

"কেন?"

"সুবিধে পাই তো গিয়ে পড়ব একদিন"

সদারঙ্গবিহারীলালের চক্ষু প্রদীপ্ত এবং হাসি আকর্ণ হয়ে উঠল।

"আমার বাড়ি কাঁট্‌কে।"

"সে কোন্ দিকে?"

"কাঁট্‌কের নাম শোনেন নি! শালিকপুর কাঁট্‌কে।"

"এখান থেকে কতদূর?"

"এখান থেকে বারো ক্রোশ হবে। সোজা উত্তর দিকে গিয়ে ভগবানগঞ্জের কাছ বরাবর পশ্চিমে বেঁকতে হবে। মাঝে নদী আছে গোটা দুই। বৈতি আর চাঁকা—"

"মহাশয়ের নাম কি?"

"লক্ষ্মণচন্দ্র কুণ্ডু"

"আচ্ছা, যেতে চেষ্টা করব একদিন"

নোটবুক বার করে সব টুকে নিলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"আচ্ছা, মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরী কতদূর এখান থেকে"

"গরুর গাড়িতে গেলে ঘণ্টা দুই লাগবে—তাও অবশ্য নির্ভর করবে গরু কেমন তার উপর, শুধু তাই নয়—গাড়োয়ান কেমন হাঁকায় তার উপরও। আমার ভাগ্যে যেমন জুটেছে এইরকম পক্ষিরাজ গরু আর সুমন্ত্র গাড়োয়ান যদি হয় তাহলে—"

"কোন দিকের রাস্তাটায় যাব"

"সোজা চলে যান না"

"বাঁদিকে, না ডানদিকে"

"ডানদিকের রাস্তাটা কি সোজা? বেঁকে গেছে দেখছেন না?"

সদারঙ্গবিহারীলাল আর অধিক বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করে বাইকে সওয়ার হলেন।

আর মিনিট পাঁচেক আগে যদি তিনি পৌঁছতে পারতেন তাহলে দিগ্বিজয়দম্পতির সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। সুশোভন এবং ব্রজেশ্বরবাবুদের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে অবশেষে তাঁরা যে কজন এসে পৌঁছেছিলেন তাঁদের নিয়েই বেরিয়ে পড়েছিলেন শিকার অভিযানে। সুরেশ্বরী দেবী গিয়েছিলেন নানাবিধ আহারের সরঞ্জাম নিয়ে। তিনি তাঁবুতে থাকবেন।

সুশোভন এবং ব্রজেশ্বরবাবুরা না আসাতে দিগ্বিজয় ভাবছিলেন তিনিই বোধ হয় গোলমাল করে ফেলেছেন সব। কোনও কারণে না আসতে পারলে তারা একটা খবর দিত নিশ্চয়ই। দুজনে দুজায়গা থেকে আসবে, দুজনেই যখন আসেনি এবং কোনও খবর দেয়নি, তখন তিনিই গোলমাল করে ফেলেছেন নিশ্চয়।

"বুঝলে, তারিখের গোলমাল করে ফেলেছি সম্ভবত। দুজনকেই একসঙ্গে চিঠি লিখেছিলাম তো, দুজনকেই ভুল তারিখ জানিয়েছি, মানে দু-দুবার ভুল করেছি। তারা বেরোয়নি। হঠাৎ কবে এসে পড়বে কে জানে! তারা ভাববে তাদের প্রত্যাশায় আছি, আমি যে তারিখ ভুল করেছি তা তো জানবে না তারা—"

সুরেশ্বরী দেবীর কণ্ঠে হাসির জলতরঙ্গ বেজে উঠল।

দিগ্বিজয় বললেন—"কিন্তু তাদের চিঠি এসেছিল তো। তাতে লেখাও ছিল কোন্ তারিখে কোন্ ট্রেনে আসছে তারা। চিঠি দুখানা তোমাকেই দিলাম সেদিন?"

"হ্যাঁ, দিলে তো"

'সুরেশ্বরী টেবিলে', 'তাকে' এবং অন্যান্য সম্ভাব্য স্থানে খুঁজলেন। পাওয়া গেল না।

"পেলে?"

"কই না। টেবিল থেকে মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল বোধ হয়। চাকরটা হয়তো পাঁশগাদায় ফেলে দিয়েছে"

"কোথায়?"

পাঁশগাদায়—ওই যে বাগানের ওধারে ছেঁড়া কাগজপত্তর ওঁচলা ফেলে দেয় যেখানে"

"ও, ছাইগাদায়"

"ছাইগাদাও বলতে পার। পাঁশগাদা বললেও ভুল হয় না বোধ হয়। আমি তো বরাবর পাঁশগাদাই বলি। আমার বাপের বাড়িতেও পাঁশগাদাই বলে"

সুরেশ্বরীর কণ্ঠে অভিমানের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠল। পত্নীর দিকে চকিত দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দিগ্বিজয় বললেন—"ও, তাই নাকি"

"আমরা মুখ্যু মানুষ, যা শুনে এসেছি বরাবর, তাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে"

দিগ্বিজয় প্রমাদ গণলেন মনে মনে।

"তাতে আর হয়েছে কি। পাঁশগাদাও বলে তো অনেকে। ওইটেই সম্ভবতঃ বেশি শুদ্ধ, পাংশু কথার অপভ্রংশ—"

"তা হোক, পাঁশ পাড়াগেঁয়ে কথা। ছাইটাই শুদ্ধ বাংলা"

"যাক ও নিয়ে তর্কাতর্কি করে আর কি হবে। অনর্থক সময় নষ্ট শুধু। তবে এটা আমি ঠিক জানি পাঁশ অশুদ্ধ নয়। সে যাক গে, এখন কি করা যায়—"

সুরেশ্বরী দেবী বললেন—"নিজে দাঁড়িয়ে পাঁশগাদাটা—মানে, ছাইগাদাটা—একবার খোঁজই না হয় ভাল করে। যদি পাওয়া যায় চিঠি দুটো—"

"না, তার দরকার নেই। চিঠি পেলেও তারা তো আর আসছে না। আমি তারিখেই গোলমাল করেছি ঠিক। কিন্তু কি করে যে গোলমাল করলাম। ছকুবাবু আর গোবর্ধনবাবু, এঁরা দুজন তো ঠিক এসেছেন। এঁদের তো আমিই লিখেছিলাম—"

ছকুবাবু এবং গোবর্ধনবাবু দুজনেই সুরেশ্বরী দেবীর বাপের বাড়ির সম্পর্কিত লোক। অনেকদিন থেকে আসতে চেয়েছিলেন বলে এঁদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল।

সুরেশ্বরী বললেন, "কিন্তু তুমি তো সাধারণতঃ ভুল কর না এরকম। আমারই বরং ভুলো মন—"

"না না, কি যে বল, সুরো। তোমার আবার ভুলো মন হল কবে থেকে। ভুলো মন আমার—"

"কেন বাড়িয়ে বলছ মিছিমিছি। কোথায় কোন্ পেরেকটি কুড়িয়ে রাখ তা মনে থাকে তোমার—তুমি ভুল করবে তারিখ"

সুরেশ্বরীর কণ্ঠস্বরে ঈষৎ ঝাঁজের আমেজ পাওয়া গেল। বাইরের কোন লোক উপরোক্ত কথোপকথন শুনলে ভাববে যে ভুলো মন হওয়াটা যেন একটা লোভনীয় গুণ এবং তা না হতে পেরে সুরেশ্বরী দেবী যেন ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

দিগ্বিজয় বললেন—"আমার স্বভাবই গোলমাল করে ফেলা। তুমি ঠিকমতো সামলে নাও বলেই গোলমাল হয় না"

"কি যে বাজে কথা বল! আমি আবার কখন সামলাতে যাই তোমাকে? তোমার কোন্ কাজটায় আমি হাত দিতে চাই? দেবার দরকারই হয় না, দিলেই বোধ হয় গোলমাল হত। এমনিতে তো কখনও কোন বিষয়ে গোলমাল হতে দেখিনি তোমার—"

দৃঢ়কণ্ঠে দিগ্বিজয় বললেন, "একটা কারণে মনে হচ্ছে যে চিঠিতে ভুল তারিখ দিইনি। চিঠি খামে ঢোকাবার আগে তোমাকে দেখিয়েছিলাম যে। ভুল থাকলে নিশ্চয়ই চোখে পড়ত তোমার"

"মোটেই না। তোমার চিঠি শোধরাবার দরকার হবে একথা ভাবতেই পারি না—"

"যাই বল, গোলমালটা আমিই করেছি। ট্রেন ফেল করলে সান্ত্বনা অন্ততঃ টেলিগ্রাম করত একটা। সুশোভন ছোকরার সঙ্গে তেমন আলাপ নেই অবশ্য, কিন্তু ওর বাপকে চিনতাম তো,

ট্রেন ফেল করে চুপচাপ থাকবে একথা তার সম্বন্ধেও ভাবা যায় না। তারিখেই গোলমাল করে ফেলেছি আমি—"

।। চৌদ্দ ।।

রায়বাহাদুর দিগ্বিজয় সিংহরায় লোকটি ক্ষীণকায়, খর্বাকৃতি। গায়ের রঙ ঘোর কালো, এত কালো যে তাঁর পাকা গোঁফ ও ভুরুকে অস্বাভাবিক দেখায়, মনে হয় তুলো দিয়ে তৈরি করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে বুঝি। মাথায় টাক, পালিশ-করা আবলুস কাঠের মতো চকচকে। ঘাড়ের ধারে ধারে এবং কানের পাশে পাশেও অল্প-স্বল্প তুলোর সারি আছে; ছিমছাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি। নিজের রঙ কালো বলেই সাদা জিনিসের দিকে সম্ভবতঃ বেশি ঝোঁক। পায়ের চটিটা পর্যন্ত সাদা চামড়ার এবং সমস্তই নিখুঁত রকম নির্মল। সুরেশ্বরী দেবী যৌবনে সুন্দরী ছিলেন। এখন বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনও গাল দুটি টুকটুক করছে। এখনও একটু সাজগোজ করতে ভালবাসেন।

দিগ্বিজয় সিংহ রায় বরাবর মফঃস্বলেই বাস করছেন। নিজের ক্ষুদ্র জমিদারির গণ্ডি ছেড়ে কদাচিৎ বাইরে গেছেন তিনি। সেই যে বহুকাল আগে কোলকাতায় একবার ট্যাক্সি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিলেন, তারপর থেকে আর শহরমুখো হয়নি। ট্যাক্সি অবশ্য চাপা দেয়নি তাঁকে, তিনি যে পড়ে গিয়েছিলেন তা-ও নয়। কোন রকম অঙ্গচ্যুতি বা পদচ্যুতি না ঘটলেও আর একটা অভূতপূর্ব দুর্ঘটনা ঘটেছিল যা তাঁর তেষট্টি বছরের জীবনে আর কখনও ঘটেনি—তিনি ধৈর্যচ্যুত হয়েছিলেন।

দিগ্বিজয় সিংহ রায়ের একটা সন্দেহ কিন্তু মাঝে মাঝে জাগে এবং জাগলেই আকুল হয়ে পড়েন তিনি। তাঁর সন্দেহ পত্নী সুরেশ্বরীকে। সুরেশ্বরী বরাবর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে আসছেন যে তাঁর নাকি শহরের প্রতি ঘোর বিতৃষ্ণা। কিন্তু ওই মোটর দুর্ঘটনা হওয়ার ফলে শহরের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরীতে এসে বসবাস করতে আসার আগে যখন তিনি কোলকাতায় ছিলেন তখনকার সুরেশ্বরীর মুখচ্ছবিটা মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে দিগ্বিজয়ের মানসপটে। তখনকার সেই উদ্ভাসিত চোখমুখ, উচ্ছ্বসিত কথাবার্তা থেকে অনুমান করা শক্ত যে সুরেশ্বরী সত্যিসত্যিই উচ্ছৃঙ্খল নাগরিক-জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছিলেন। দিগ্বিজয়ের সন্দেহ যে সুরেশ্বরীর বিতৃষ্ণা আসলে বোধ হয় আত্মত্যাগমূলক স্বামিভক্তির নিদর্শন। তা যদি হয়, তাহলে ভয়ানক ব্যাপার। ছোটবড় অনেক ব্যাপারেই দিগ্বিজয়ের সন্দেহ হয় যে সুরেশ্বরীর আচরণ সব সময়ে অকৃত্রিম নয়। উদাহরণস্বরূপ শিমের ব্যাপারটাই ধরা যেতে পারে। শিম জিনিসটা দিগ্বিজয় দুচক্ষে দেখতে পারেন না এবং কোনও এক দুর্বল মুহূর্তে বহুকাল আগে-বিবাহের ঠিক অব্যবহিত পরেই কথাটা তিনি সুরেশ্বরীকে বলে ফেলেছিলেন। ফলে, সুরেশ্বরীও শিম বর্জন করলেন, শুধু তাই নয়—বলে বেড়াতে লাগলেন কোন তরকারিতে সামান্য একটু শিম থাকলেও তাঁর গা গুলিয়ে ওঠে। দশ বৎসর এইভাবে কাটল। তারপর একদিন কোনও কারণে দিগ্বিজয়কে একবার দুদিনের জন্য বাইরে যেতে হয়েছিল। ফেরবার সময় খবর দিতে পারেন নি। হঠাৎ দুপুরে বাড়ি ফিরে অবাক হয়ে গেলেন। সুরেশ্বরী ভাত খেতে বসেছেন—পাতে থরে থরে সাজানো শিম-ভাতে, শিম-ভাজা, শিমের চচ্চড়ি, শিমের সুক্তো। শিম সীমা

অতিক্রম করেছে। সীমন্তিনীর এবম্বিধ ব্যবহারে 'থ' হয়ে গেলেন দিগ্বিজয়। সেইদিন থেকে সুরেশ্বরীকে আর বিশ্বাস করেন না তিনি। যে স্ত্রীলোক সামান্য একটা শিমের ব্যাপারে এতটা করতে পারে তার অসাধ্য কিছু নেই। হয়তো তার মনে কত বাসনা গোপনে ক্ষুধিত হয়ে রয়েছে, তিনি কিছুই জানতে পারছেন না, জানবার উপায় নেই মোটে। শহরের থিয়েটার, সিনেমা, পাড়া-বেড়ানো প্রভৃতি সম্বন্ধে সুরেশ্বরীর আসল মনোভাব যে কি তা কে বলতে পারে? ফলে এই হয়েছে—কোনও বিষয়ে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করলেই দিগ্বিজয় তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা দেখতে পান। সুতরাং সুরেশ্বরী যখন একদিন বললেন যে তিনি তাঁদের পুরোনো 'কম্পাস' গাড়ি বাতিল করে দিয়ে কিছুতেই মোটর কিনবেন না, তখন দিগ্বিজয় বুঝলেন সুরেশ্বরী মনে মনে মোটর কেনবার জন্যে লোলুপ। নিজের আন্তরিক মোটর-বিতৃষ্ণাকে দমন করে তাই তাঁকে প্রকাশ্যে মোটরের জন্যে লালায়িত হয়ে উঠতে হল। এছাড়া সুরেশ্বরীর শখ মেটাবার আর অন্য উপায় ছিল না। বহু অর্থব্যয় করে মোটর কিনলেন একখানা। সুরেশ্বরীর চোখে জল এসে পড়েছিল। দিগ্বিজয়ের মনে হল এ আনন্দাশ্রু। কিন্তু সুরেশ্বরী বাইরে প্রকাশ করলেন রাগ। কেন, কি দরকার ছিল মোটর কিনবার? 'কম্পাস' গাড়িই ভাল লাগে তাঁর। তাঁদের অনাবিল দাম্পত্য-কৌমুদী মেঘাবৃত হয়ে উঠেছিল ক্ষণিকের জন্যে। অবশ্য তা ক্ষণিকের জন্যেই এবং একবার মাত্র। তখন থেকেই এঁরা পরস্পরের নিঃস্বার্থপরতার প্রকোপ থেকে পরস্পর বাঁচবার চেষ্টা করেছেন সুকৌশলে। নেপথ্যে দুজনের মধ্যে অদ্ভুত একটা দ্বন্দ্ব চলেছে নিরন্তর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই আটত্রিশ বৎসরব্যাপী দাম্পত্য জীবন নিঃস্বার্থপরতার এই অনমনীয় দ্বন্দ্বে একটি দিনের জন্যে মনোমালিন্য হয়নি দুজনের মধ্যে। একটি রূঢ় কথা কেউ কাউকে বলেননি। কোনও নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারে আশু মীমাংসা করা অপরিহার্য হয়ে পড়লে— যেমন কোনও দুঃস্থ প্রতিবেশী বা বন্ধুকে সাহায্য করা সম্পর্কে উপায় নির্ধারণ বা ঐ জাতীয় কিছু —তখন জটিলতা না বাড়িয়ে দিগ্বিজয় সটান সুরেশ্বরীর মত সমর্থন করেন। এছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু এ-ও খুব সহজে হত না। সুরেশ্বরী চাইতেন দিগ্বিজয়ের কথায় সায় দিতে। এমন ভাব প্রকাশ করতেন যে দিগ্বিজয় যদি সুরেশ্বরীকে তাঁর মতে (দিগ্বিজয়ের মতে) সায় দিতে দেন, তাহলে সুরেশ্বরী যেন চরিতার্থ হয়ে যাবেন। কিন্তু দিগ্বিজয় আত্মত্যাগের দুর্গে অবিচলিত থেকে সুরেশ্বরীর মতটাকেই সমর্থন করতেন, সুরেশ্বরীকে শেষ পর্যন্ত আত্মমতবিসর্জনের সুখ থেকে বঞ্চিত হতে হত। ব্যাপারটা সহজে মিটে যেত।

বন্ধুবান্ধবদের তাঁরা খুব যে একটা নিমন্ত্রণ করতেন, তা নয়। সুরেশ্বরী তাঁর দু-চারজন অন্তরঙ্গকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করতে পেলে খুশি হতেন, কিন্তু তাঁর সন্দেহ হতো হয়তো তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা দিগ্বিজয়ের বিরক্তির কারণ হবে। তিনি এ-ও জানতেন দিগ্বিজয় কিছুতেই সে কথা স্বীকার করবেন না। নিজের মনের টুঁটি চেপে ধরে মেরে ফেলবেন তবু স্বীকার করবেন না। দিগ্বিজয়ও শিকার-পার্টি আহ্বান করতে ইতস্ততঃ করতেন, কারণ তাঁর ধারণা সুরেশ্বরী জীবহত্যা-ব্যাপারে কষ্ট পান মনে মনে। বলা বাহুল্য, সুরেশ্বরী কখনও বলেননি একথা। বলেননি—তার কারণ সুরেশ্বরীর ধারণা দিগ্বিজয় শিকারে আনন্দ পান, যদিও দিগ্বিজয় তাঁকে লক্ষবার বলেছেন, শিকার-টিকার মোটেই ভাল লাগে না তাঁর। উচ্চ উচ্চতর উচ্চতম কণ্ঠে বলেছেন। সুরেশ্বরী বিশ্বাস করেননি। পতিপরায়ণা আত্মত্যাগশীলা রমণীর স্বামী হওয়া যে কি

দুর্ভোগ তা দিগ্বিজয়কে হাড়ে হাড়ে বুঝতে হয়েছে। সুখের বিষয়, দিগ্বিজয় সুরেশ্বরীকে বেশি ভালবাসেন, না সুরেশ্বরী দিগ্বিজয়কে বেশি ভালবাসেন এ প্রশ্ন একদিনও ওঠেনি। উঠলে জটিলতম সমস্যার সৃষ্টি হত।

...সেদিনকার শিকার পার্টিতে তিনজন শিকারী যোগদান করেননি। সুশোভন এবং ব্রজেশ্বরবাবুর যোগ না দেবার কারণ অজ্ঞাত থাকলেও ছকুবাবুর যোগ না দেবার কারণটা জেনে ফেলেছিলেন সবাই। ছকুবাবু সুরেশ্বরীর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। যৌবনকালে তিনি ইন্‌কিলাবপুরের স্বনামধন্য বিহারী জমিদার পোখমন সিংহের অন্তরঙ্গ পারিষদ ছিলেন। তিনি গিয়েছিলেন সেখানকার স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক হিসেবে, কিন্তু হয়ে পড়েছিলেন পারিষদ। তাঁর যকৃৎ, পায়ের গাঁটগুলি এবং ভাষা এখনও সে অন্তরঙ্গতার পরিচয় বহন করছে। ভাষার মধ্যে ঢুকেছে অদ্ভুত ধরনের বিহারী বুক্‌নি, লিভারে প্রায়ই ব্যথা হয়, হাঁটুটি ফুলে ওঠে মাঝে মাঝে। সেদিন সকালেই তিনি সকলকে জানিয়েছিলেন বাতটা আবার 'উখড়েছে'। শিকারে যেতে পারবেন না। আসলে হয়েছিল লিভারে ব্যথা— এ কথাটা সকলকে সব সময় জানাতে চাইতেন না তিনি।

তিন-তিনজন শিকারী অনুপস্থিত হওয়াতে 'পার্টি' জমল না মোটে। তবু দিগ্বিজয় দমলেন না। গ্রাম থেকে আরও দুজন যোগাড় করলেন। গোবর্ধনবাবু সম্বন্ধে কিন্তু খুব আশা পোষণ করতে পারছিলেন না তিনি। বড্ড বেশি গোবরগণেশ গোছের লোকটা। ও কি শিকারে সুবিধে করতে পারবে?

সুরেশ্বরী দেবীও খাবার-টাবার সঙ্গে নিয়ে যাবেন। সহধর্মিণীত্ব রক্ষা করা হবে। তাছাড়া আর একটা গোপন উদ্দেশ্যও ছিল তাঁর। ওঁরা যে অঞ্চলে শিকার করতে যাচ্ছেন সেখানে মাধব গোমস্তার বাড়ি। মাধবের একটি ছেলে হয়েছে কদিন হল। সুরেশ্বরী ঠিক করেছিলেন ওঁরা যখন হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকবেন তখন তিনি গিয়ে মাধবের ছেলেটিকে দেখে আসবেন।

যারা আসেনি তারা যে খবর না দিয়েও এসে পড়তে পারে, এ কথা মনেই হল না সুরেশ্বরীর।.....

বাইরে গেটের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। দিগ্বিজয় এবং গোবর্ধন গাড়ির কাছে অপেক্ষা করছেন সুরেশ্বরী দেবীর জন্যে। অসুস্থ ছকুবাবুর যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয় সুরেশ্বরী তার নানারকম ব্যবস্থা করে দিলেন; যাবার আগে আরো একবার সব নিজে তদারক করছিলেন।

ছকুবাবু লোকটিকে দেখলেই শুকনো বাসী তেলেভাজা খাবারের কথা মনে পড়ে যায়। শীর্ণ চেহারা। চোখের সাদা অংশে হলদে রঙের ছোপ। গালের হাড়গুলি উঁচু। চোখের দৃষ্টি লুব্ধ। সমস্ত মুখে কেমন যেন একটা মার্জার-ভাব। গোঁফজোড়া ঈষৎ কটা এবং অনেকটা বিড়ালের গোঁফের মতোই। ছকুবাবু লাঠি ধরে ধরে সুরেশ্বরীর পিছু পিছু দ্বার পর্যন্ত এলেন। শিকার-প্রসঙ্গে দিগ্বিজয়ের মুখে এতক্ষণ তুবড়ী ফুটছিল। আসন্ন শিকারের কাল্পনিক উল্লাসে নিজেকে এবং গোবর্ধনকে এতক্ষণ চাঙ্গা করে তোলবার চেষ্টা করছিলেন তিনি বক্তৃতার চোটে। হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে বলে উঠলেন—"শিকার জিনিসটাই কিন্তু ভাল লাগে না আমার মোটেই।" গোবর্ধন বিস্মিত হয়ে আড়চোখে চাইলেন একবার তাঁর দিকে। সুরেশ্বরী দ্বারপ্রান্তে এসে ঘাড় ফিরিয়ে ছকুবাবুকে বললেন, "বাড়ি নিয়ে আপনি থাকুন তাহলে, আমরা ঘুরে আসি। খাবার খাবেন কিন্তু, রেখে গেলুম সব"

"খাবার! না, ও বাত আর বোলো না, দোহাই মহাবীরজির। খেতে আর পারব না"

"না, না, চেষ্টা করবেন তবু। আপনার জন্যেই বিশেষ করে কম মশলার তরকারি করলাম। দেখবেন একটু চেখে। তিনটে নাগাদ নিশ্চয় খিদে পেয়ে যাবে। সকালে তো খাননি তেমন কিছু"

"খিদে এখনই পেয়েছে। ভুখের কিছু কমি নেই, কিন্তু ডর লাগছে। এর পর যদি পেটের বাইও উখড়ে যায় খতম হয়ে যাব"

"না, না, কি যে বলেন—কিচ্ছু হবে না। পায়ের উপর হট ব্যাগটা চাপিয়ে একটু ঘুমুন দেখি। এখানে কেউ বিরক্ত করবে না আপনাকে। সেক দিয়ে একটু যদি ঘুমুতে পারেন ব্যথাটা কমে যাবে, ভাল লাগবে তখন"

'সেটা মুম্‌কিন্ বটে। দেখি, কিন্তু তোমার যে মেহ্‌মানরা আসেনি, তারা হুড়মুড় করে এসে অগর পৌঁছে যায়"

"তা সম্ভব নয়। এখন ট্রেন নেই তো। এলে কালই আসত"

"হল তোমার"—দিগ্বিজয় তাগাদা দিলেন—"শিকারে যদি যেতেই হয় একটু তাড়াতাড়ি করাই ভাল"

"এই যে"

খাবারের ঝুড়ি, টিফিন-কেরিয়র প্রভৃতি সমভিব্যাহারে গাড়ির কাছে এগিয়ে এলেন সুরেশ্বরী।

"চল, যাওয়া যাক এইবার। ছকুদা ভয় পাচ্ছেন যে ওরা যদি আবার সব এসে পড়ে কি করবেন উনি। আমার মনে হয় না কেউ আসবে। বড় জোর একটা টেলিগ্রাফ আসতে পারে। যদি আসে রেখে দেবেন, জবাব দেবার থাকে যদি কিছু জবাবও দিয়ে দেবেন যা হয় একটা—"

শিক্ষক ছকুবাবুর ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত হল।

"টেলিগ্রাফ আবার কি? টেলিগ্রাম মীন করছ নিশ্চয়। টেলিগ্রাফ গলৎ হ্যায়—"

"তাই যদি বলতে চান বলুন"—সুরেশ্বরী দেবী গাড়িতে উঠে কম্বলের বিচিত্র আবেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে স্থাপিত করে বললেন, "আমরা মুখ্যুসুখ্যু লোক, আমরা টেলিগ্রাফই বলি। ওতে খুব বেশি দোষ হয় না বোধ হয়"

"কিছু দোষ হয় না"—বলে উঠলেন দিগ্বিজয়। তিনি আর ধৈর্য ধরতে পারছিলেন না। এই নূতন ঝামেলা সৃষ্টি করার জন্যে ছকুবাবুর দিকে একটা রোষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি বললেন—"আমার তো মনে হয় টেলিগ্রাফই বেশি শুদ্ধ। টেলিগ্রাফটা হচ্ছে—ঐ যে সংস্কৃতে কি বলে যেন—নামধাতু—না না—প্রক্ষিপ্ত? উহুঁ, কথাটা ঠিক মনে পড়ছে না, যোগরূঢ়ও নয়—যাক গে—সোজায় এই দেখুন না আমরা খাতায় যা সই করি তার নাম অটোগ্রাফ, অটোগ্রাম নয়"

"রাম কহো, রাম কহো, রাম কহো"—খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে ফেললেন ছকুবাবু—"মহাবীরজিকি ভালা হো। আরে মশাই, টেলিগ্রাফ হল যন্ত্রটার নাম। বিশেষণ রূপেও ওর ব্যবহার হতে পারে—যেমন টেলিগ্রাফ লাইন"

"মরুক গে"—ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলেন দিগ্বিজয়—"আমরা অভিধানও

লিখছি না, পরীক্ষাও দিচ্ছি না। চিরকাল টেলিগ্রাফ করে এসেছি, চিরকাল টেলিগ্রাফ করবও, কি বলেন গোবর্ধনবাবু অ্যাঁ?"

গোবর্ধনবাবু গাড়িতে চড়বার জন্যে কসরত করছিলেন। দিগ্বিজয়ের ঘোড়ার গাড়িটি একটু অসাধারণ গোছের। পা-দানিটা বেশ একটু উঁচুতে। দিগ্বিজয়ের কথা শুনে নিরীহ গোবর্ধন বললেন—"তা বই কি। ও সব হল কথার মারপ্যাঁচ—ওতে কি আসে যায়—"

"আগে বাঁ পা-টা দিন, তারপর হাতলটা ধরুন। হ্যাঁ—"

ছকুবাবুর পীতাভ চক্ষু দুটি ব্যঙ্গ-দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি বললেন, "অত হাঙ্গামা না করে "তার" বললেই মিটে যায়। তার যদি আসে তাহলে খুলব সেটা। কিন্তু কি জবাব দিতে হবে তা তো মালুম নেই।"

সুমিষ্ট হাসি হেসে সুরেশ্বরী বললেন—"দেবেন না তাহলে। আমরা এসে যা হয় করব। তোমরা সব বসেছ তো ঠিক করে? চল আর দেরি করা নয়—উঃ, শিকারের কথা ভেবে যা আনন্দ হচ্ছে"

"থাম, থাম, এক লহমা। শোন—"

ছকুবাবু গাড়ি থামালেন আবার।

"আপনার যে মেহমানদের আসবার কথা, তাদের মধ্যে যেটি বালিয়া জেলায় গিয়েছিলেন তাঁর নামটি কি"

"বলেছি তো আপনাকে। ব্রজেশ্বর—সান্ত্বনার স্বামী"

"ব্রজেশ্বর। আচ্ছা, আর রুক্‌ব না তোমাদের। দিগ্বিজয়—দিগ্বিজয় করে এস তাহলে। রাম রাম"

"শিকার-টিকার ভালই লাগে না আমার"—দিগ্বিজয় আর একবার বললেন সুরেশ্বরীর দিকে চেয়ে।

গাড়ি বেরিয়ে গেল। ছকুবাবুর বাতও সেরে গেল সঙ্গে সঙ্গে। দিগ্বিজয় যে হুইস্কির বোতলটি দিয়েছিলেন তাঁকে এবং যার প্রায় সবটাই শেষ হয়ে এসেছিল সেইটি বার করে লিভারের চিকিৎসা শুরু করলেন তিনি। একটু পরেই চমকে উঠতে হল তাঁকে। এ কি, গেটের সামনে 'মেসিন গান' দাগছে কে! অস্ফুটকণ্ঠে একটা অশ্লীল বিহারী গাল উচ্চারণ করে উঠলেন তিনি, জানলা দিয়ে উঁকি দিলেন। দেখেই চেয়ারে এসে বসলেন আবার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ভৃত্য পরেশ এসে দেখলে, ছকুবাবু যুগবৎ ভীত এবং কুপিত হয়ে বসে আছেন। পরেশ বাঙালী চাকর, বেশ কায়দাদুরস্ত।

"বাইরে একজন বাবু একটা কুকুর নিয়ে এসেছেন। আপনি তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করবেন কি? নিয়ে আসব এখানে?"

"আমি?" ওয়াজে?"

'ওয়াজে' কথার তাৎপর্য পরেশ ঠিক বুঝতে পারলেন না। 'ওয়াজে' কথার অর্থ 'হেতু'।

"তিনি বললেন খুঁজে পেয়েছেন"

"কি খুঁজে পেয়েছেন?"

"কুকুরটা"

"বুঝলাম। কিন্তু আমি তার সঙ্গে মোলাকাৎ করি, এ তুমি চাইছ কেন"

"উনি চাইছেন। উনি ব্রজেশ্বরবাবুর স্ত্রীর খোঁজে এসেছেন বললেন, কিন্তু তিনি এখানে—"

"কার স্ত্রীর খোঁজে? ব্রজেশ্বরবাবুর? ও হ্যাঁ ব্রজেশ্বরবাবুর। তাঁর স্ত্রীর খোঁজে এসেছেন? তারপর?"

"ব্রজেশ্বরবাবুর স্ত্রী এখানে নেই শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তারপর আমি যখন বললাম মা বাবু দুজনেই বেরিয়ে গেছেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে বাড়িতে আর কেউ আছে কিনা। আমি আপনার নাম করাতে উনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন"

"যিনি এক্ষুণি ঝরঝরে মোটর-বাইকে চড়ে এলেন তিনি? চেন তুমি ওঁকে?"

ছকুবাবু অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে দক্ষিণ নাসারন্ধ্রটি চেপে রেখে বাম রন্ধ্র দিয়ে ভীষণ জোরে নাক ঝাড়লেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। সদারঙ্গবাবু"

"আচ্ছা, ডাক। কুত্তা এনেছে একটা? হে ভগবান"

একটু পরেই দ্বারপ্রান্তে সদারঙ্গবিহারীলাল আবির্ভূত হলেন। আপাদমস্তক ধূলোয় ঢাকা, বগলে ঝুনু, চোখেমুখে আনন্দ এবং উৎসাহ ঝলমল করছে। চশমাটা ঠিক করে নিয়ে তিনি ছকুবাবুর দিকে চাইলেন।

"বকুবাবু?"

"ছকু"

"ও, ছকু, মাপ করবেন, ঠিক ধরতে পারিনি তাহলে। আমার নাম সদারঙ্গবিহারীলাল"

"আসুন, বসুন। ওটা আপনার 'চাইনিজ-পুড়ল্' দেখছি"

"বাঃ, আপনি তো কুকুর চেনেন! হ্যাঁ, 'চাইনিজ -পুড়ল্'ই"

"চিনি বই কি। পোখমনবাবুর ছিল যে একটা—"

"পোখমনবাবু কোথায় থাকেন"

"বিহারে"

" ও, বিহারে। পোখমন? ও বিহারী, ন্যাচারালি! বিহারী ভদ্রলোকের নাম পোখমন তো হবেই। ঠিক। পোখমন—"

ছকুবাবুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল হঠাৎ।

"মনে হচ্ছে এর পর বলবেন রামায়ণের নায়কের নাম তো রামচন্দ্র হবেই, ন্যাচারালি"

ঘাবড়ে গেলেন সদারঙ্গবিহারীলাল। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। চশমায় আলোকরশ্মি বিকিরণ করে আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি হাসলেন একটা।

ছকুবাবু বললেন—"মাপ করবেন, মেজাজটা ভাল নেই। লিভার—মানে—বাতে বড় কষ্ট পাচ্ছি! আপনি বিহারে কখনও যাননি মনে হচ্ছে"

"না যাইনি। তবে যাবার ইচ্ছা আছে। খুব। শুনেছি চমৎকার জায়গা"

"মোটেই চমৎকার জায়গা নয়, ভয়ানক ধুলো। চমৎকার জায়গায় একবার জীবনে গিয়েছিলাম, ওই পোখমনবাবুর সঙ্গেই"

"দার্জিলিং কিংবা কাশ্মীর নিশ্চয়"

"না, সিঙ্গাপুর। গেছেন কখনও"

"না, তবে যাবার ইচ্ছে আছে। ক্লাইমেট্‌টা খারাপ শুনেছি"

"মোটেই খারাপ নয়"

"ও, নয়?"

"চমৎকার ক্লাইমেট্। এসব দেশের ক্লাইমেট্ কি ক্লাইমেট্? মাতাহারির কি জানেন আপনি?"

"আজ্ঞে"

"বলছি, মাতাহারির বিষয় কিছু জানেন?"

"মাতাহারির? একজন বিখ্যাত স্পাই শুনেছি। একটা ফিল্‌মেরও এই নাম আছে—ওই স্পাইয়ের গল্প নিয়েই লেখা সম্ভবতঃ। দেখিনি, আন্দাজ করছি"

"মাতাহারি মানে সূর্য। মালয় ভাষা"

"ও, তাই না কি। বাঃ!"

"হুবহু অনুবাদ করলে হয় 'দিনের চোখ'। মাতা—চোখ, হারি—দিন। মাতাহারি—দিনের চোখ—সূর্য"

"বাঃ! দিনের চোখ! চমৎকার—পোয়েটিক্—"

"তাই বলছি এ হতভাগা দেশে সূর্যের কতটুকু পরিচয় পান আপনারা"

"ও, হ্যাঁ—তা বটে! হা—হা—হা! তবে এখানেও গরম খুব"

"একে গরম বলেন? আপনার সিঙ্গাপুরে যাওয়া উচিত"

"যাবার ইচ্ছে আছে"

"যাবেন একবার। এখন আপনার দরকারটা কি বলুন। 'স্ত্রিংগাহ্' চলবে একটা?"

"আজ্ঞে?"

"এক 'পেগ' দেব? সিঙ্গাপুরে ড্রিঙ্ক্‌কে স্ত্রিংগাহ্ বলে। এই যে—"

নিজের গ্লাসটা দেখালেন।

"ও! না, ধন্যবাদ—"

"পোখমনবাবুর স্মৃতি এটি"—এই বলে ছকুবাবু গ্লাসটি তুলে আর এক ঢোঁক খেলেন। "এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, এ ছাড়া একটি দিন চলবার উপায় নেই"

"ঠিক। বিহারে যেতে হবে একবার। সিঙ্গাপুরেও। এখন এই কুকুরটাকে এনেছি। রাস্তায় কুড়িয়ে পেলাম এটাকে"

"পুষুন। আমার দরকার নেই। আমি নিজের জ্বালাতেই অস্থির, আমি ও-নিয়ে কি করব"

"না—না—ঠিকই তো। তা নয়—মানে এ কুকুরটা আমার চেনা কুকুর—হঠাৎ রাস্তায় দেখতে পেলাম। অদ্ভুত ঠেকছে, নয়? কি হয়েছে তাহলে শুনুন সব"

পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করে সব বললেন তিনি। ছকুবাবু ব্রজেশ্বর-দম্পতির নৈশ অভিযানের কাহিনী শুনে পুলকিত তো হলেনই না, উপরন্তু তারা যে-কোনও মুহূর্তে এসে পড়তে পারে শুনে চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

"সীয়ারাম, সীয়ারাম—তারা তো তাহলে এলো বলে—অ্যাঁ"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই তো আশা করছি। আসবেন নিশ্চয়ই। তাঁদের এখানে দেখতে পাব আশা করেই তো এসেছিলাম আমি—"

"কিন্তু আমি তো তাহলে মহা মুশকিলে পড়ে যাব দেখছি। তাঁদের কোন্ ঘরে থাকতে দেব কি করব আমার তো কিছুই জানা নেই। সুরো হয়তো চাবি নিয়েই চলে গেছে। হনুমানজি বোম বখেড়ায় ফেলে দিলে দেখছি ঝড়াক্সে"

ছকুবাবু চেয়ার থেকে উঠে অস্থির ভাবে ঘরের চারদিকটা পরিক্রমণ করে নিলেন একবার।

"এতে ভাবনার কি আছে"—সদারঙ্গবাবু বললেন—"চাকরটা নিশ্চয় জানে সব। জানা উচিত অন্ততঃ। নিশ্চয়। ডাকব?"

"ডাকুন, ডাকুন। কিছু করুন একটা। অপরিচিত লোক সব হুড়মুড় করে এসে পড়লে দিল্ ঘাবড়ে যায় আমার। এই ঘণ্টাটা টিপুন। আচ্ছা, আপনি বাইক করে গিয়ে সুরেশ্বরীকে ডেকে আনতে পারেন?"

"শুনুন, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। এদেব জানি, অতি অমায়িক লোক ওরা। এসেই ঘরের লোকের মতো হয়ে যাবে দেখবেন। কিচ্ছু বেগ দেবে না। এসেই খুব সম্ভবতঃ শিকারে চলে যাবে"

"তা হতে পারে। যাক্, ব্রজেশ্বরবাবু আসছেন তবু ভাল। উনি বালিয়া জেলায় ছিলেন কিছুদিন শুনেছি। ধরবার ছোঁবার মতো কিছু পাব আশা করি। খাঁটি কলকাতিয়া লোককে বড় ভয় করি। কেমন যেন ফসকে ফসকে যায়—"

"উনি বালিয়া জেলায় গিয়েছিলেন নাকি? হিস্ট্রির রিসার্চের জন্যে, না কংগ্রেস ক্যামপেন্?"

"মালুম নেই"

পরেশ এসে প্রবেশ করল।

সদারঙ্গবিহারী তার দিকে চেয়ে বললেন—"ব্রজেশ্বরবাবুরা যদি এসে পড়েন—আসবেনই—তাহলে তাঁরা কোন্ ঘরে থাকবেন, তাঁদের জন্যে কি কি ব্যবস্থা করতে হবে — তুমি জান তো সব?"

"জানি"

পরেশ মিতবাক্ ব্যক্তি। বহুকাল থেকে সে সুরেশ্বরী দেবীর কাছে আছে। তার এই ছোট্ট 'জানি'র মধ্যে সে কতখানি যে প্রকাশ করলে তা বাইরের লোকের বোঝবার উপায় নেই। সদারঙ্গবিহারীলালের দিকে সে যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তার প্রাঞ্জল অর্থ—আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারের মধ্যে আপনি ফোঁড়ন কাটছেন কেন মশাই।

"জান? ও, তাহলে তো মিটেই গেল। ব্যস্—"

"গলা খাঁকারি দিয়ে সদারঙ্গবিহারীলাল আড়চোখে একবার ছকুবাবুর দিকে চাইলেন। তাঁর মনে হল ছকুবাবুর অন্তরে সাহস সঞ্চার করতে হলে ব্যাপারটা আর একটু বিশদ করা দরকার বোধ হয়। পরেশের দিকে চাইলেন তিনি।

"তাঁদের খাবার বসবার শোবার হাতমুখ ধোবার ইত্যাদি ইত্যাদি সব ব্যবস্থা করতে পারবে তাহলে?"

"পারব। ইত্যাদি ইত্যাদি। কি বুঝলাম না—"

"না, ও কিছু নয়। মানে, তারা আসছে—মানে আই মীন, পথে আছে—একটু ইয়ে তো হবেই নিশ্চয়। তবে লোক খুব ভাল। দুজনেই। আমি তাদের সঙ্গে কাল রাতটা কাটিয়েছি কিনা—ঠিক পুরো রাত নয়, খানিকটা, তবু, ধাতটা জানা হয়ে গেছে—বিশেষ বেগ পেতে হবে

না—সাদাসিধে একদম। তোমাকে তো বলেইছি গোড়ায় সব। কেবল বকুবাবু—ও ছকুবাবু—তোমাকে ডাকতে বললেন কিনা তাই—"

"চুপ করুন"—ছকুবাবু বললেন—"আপনি সমস্ত গোলমাল করে দেবেন দেখছি। শোন পরেশ, ব্রজেশ্বরবাবুরা আসছেন, সব ঠিক করে রাখ। আমাকে কোনও ঝামেলা যেন পোয়াতে না হয়? ব্যস্। অত বক্তৃতা করবার দরকার কি—"

সদারঙ্গবিহারীলালের দিকে ভ্রূকুটি করে চেয়ে রইলেন তিনি।

"সব ঠিক আছে"

পরেশও ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলন করে চাইলে সদারঙ্গবিহারীর দিকে।

সদারঙ্গবিহারী একবার ছকুবাবুর দিকে, একবার পরেশের দিকে চেয়ে অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। হাসলেন। পরেশের দিকে চশমার লেন্স থেকে এক ঝলক আলো ফেললেন। হাত দুটো ঘষলেন।

"যাক্, সব ঠিক থাকলেই হল। চমৎকার ব্যবস্থা আছে তাহলে। থাকাটাই স্বাভাবিক। বাঃ—খাসা! এইবার আমাকে উঠতে হবে কিন্তু। ওঠা উচিত। যেতে হবে অনেকদূরে কিনা—হনুমানপুর। বৃষ্টিও নামবে মনে হচ্ছে। যাচ্ছেতাই কাণ্ড। কিন্তু উপায় নেই, যেতেই হবে। একটু দেরি হয়ে গেল—তা হোক—এখানে এসে সব ব্যবস্থা যে করে দিয়ে যেতে পারলাম তাতে ভারি আনন্দ হচ্ছে। খুব। আচ্ছা, এবার চলি তাহলে—নমস্কার বকুবাবু। এ কুকুরটা—"

ছকুবাবু বললেন—"পরেশকে দিন। পরেশ, কুকুরটা নাও"

"ও—হ্যাঁ—পরেশ—তোমার নাম পরেশ বুঝি। এই যে নাও, ধর ভাল করে। না, কামড়াবে না। হ্যাঁ—। আচ্ছা, চলি তাহলে এবার, নমস্কার ছকুবাবু—"

কম্পমান ঝুনুকে পরেশের হাতে সমর্পণ করে চলে গেলেন সদারঙ্গবিহারীলাল। যাবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে ছকুবাবুর দিকে চেয়ে আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি হাসলেন আর একবার। তিনি চলে যেতেই ছকুবাবু হাত উলটে মন্তব্য করলেন—"আজব দুনিয়া?"

পরেশ মৃদু হেসে বললে—"উনি বরাবরই একটু কিম্ভূত গোছের"

"কিম্ভূত নয়, বুদ্ধু। দিল্ ঘাবড়ে দিয়েছে একদম। আর একটা স্ট্রিংগাহ্ বানাও। সোডাটা একটু সমঝে দিও,—বুঝলে"

"আজ্ঞে"

স্ট্রিংগাহ্ শব্দটা কোন্ দেশীয় তা ঠিক না জানলেও, পরেশ এটুকু বুঝেছিল যে 'স্ট্রিংগাহ্ বানাও' মানে 'মদ ঢাল'।

ঢালতে লাগল।

।। পনেরো ।।

দুদিনের মধ্যেই অনীতাকে আবার ট্রেনে চড়তে হল। এবার সঙ্গে মা বাবা। স্বয়ম্প্রভা দেবী একটি কোণে গিয়ে বসেছিলেন। তাঁর বলিষ্ঠ-চোয়াল-নিবদ্ধ মাংসপেশীগুলির কুঞ্চন-প্রসারণ দেখে মনে হচ্ছিল অদূর ভবিষ্যতে তাঁকে যে সব বক্তৃতা করতে হবে তারই মহলা দিচ্ছেন যেন তিনি মনে মনে। অনীতার বাবা জিতুবাবু গাড়ির আর এক প্রান্তে বসেছিলেন। সুখের বিষয়

গাড়িতে আর কেউ ছিল না। সঙ্গে জিনিসপত্রও ছিল না বিশেষ। স্বয়ম্প্রভা একটিমাত্র বড় ব্যাগ এনেছিলেন। ব্যাগটি তাঁর এবং অনীতার শাড়ি-ব্লাউজ-সায়া-সেমিজেই ভরে উঠেছিল প্রায়। জিতুবাবুর একটি কাপড় এবং গেঞ্জিও ছিল অবশ্য তার মধ্যে। কোট কামিজ ছিল না। এক কোটে এবং এক কামিজেই তিনি চালিয়ে দিতে পারবেন সম্ভবতঃ স্বয়ম্প্রভা এই প্রত্যাশা করেছিলেন। জিতুবাবু কিছুই আনতে চাননি, এমনকি নিজেকেও না। তাঁকে জোর করে টেনে এনেছেন স্বয়ম্প্রভা। গাড়ির এক কোণে চুপ করে বসেছিলেন তিনি বাইরের দিকে চেয়ে। বর্ষাকালে নির্জন মাঠে গাছতলায় একক গাধাকে ভিজতে দেখেছেন কখনও? জিতুবাবুর অবস্থা কতকটা সেইরকম।

অনীতাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। কালো চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি মর্মভেদিনী হয়ে উঠেছিল যেন। মেজাজ সপ্তমে চড়েছিল তার। সমস্ত পৃথিবীর উপরই চটে ছিল সে। সবচেয়ে বেশি রাগ হচ্ছিল নিজের উপর। এত কেলেঙ্কারি কেন করতে গেল সে। রাগ হচ্ছিল খাণ্ডার মায়ের উপর। মা যেন তার এই দুর্দশাটা উপভোগ করছে মনে মনে! ক্ষেপে বসেছিল সে। সুশোভনের উপর প্রথমে তার যে রাগটা হয়েছিল তা রূপান্তরিত হয়ে অন্য রকম হয়ে দাঁড়িয়েছিল এখন। অর্থাৎ তার হৃদয়নাট্যমঞ্চে যে নিদারুণ নাটক অভিনীত হচ্ছিল সে নাটকে সুশোভনই এখন একমাত্র পাষণ্ড নয়। সুশোভনের বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড ক্রোধাগ্নি প্রথমটা প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল তার শিখা অনেকটা কমে এসেছে এখন। প্রদাহও নেই আর তেমন। এখন আর একটি সূক্ষ্মতর এবং অধিকতর মর্মান্তিক জ্বালায় তার সমস্ত বুকটা পুড়ে যাচ্ছিল। এতক্ষণ এ বিষয়ে সে তেমন সচেতনও ছিল না। স্বয়ম্প্রভার কুঞ্চিত চোখের নিষ্পলক দৃষ্টি এবং চোয়াল-চিবুকের নীরব সঞ্চালন দেখে হঠাৎ সে ব্যাপারটা উপলব্ধি করলে। করবামাত্রই সমস্ত চিত্ত তিক্ত হয়ে উঠল নিমেষে, স্কন্ধযুগল আপনিই উঠে পড়ল কানের দিকে। সুশোভন? হ্যাঁ, সুশোভন তো তাকে দাগা দিয়েইছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, যদিও মনে মনে সে এখনও সঙ্গোপনে আশা করছে যে হয়তো সন্দেহটা অমূলক, হয়তো তার ব্যবহারের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে একটা। মায়ের এ কি ব্যবহার? সুশোভনের দোষ ধরতে পেরে এবং বিনা প্রমাণে সে বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে বিজয়োল্লাসে তাকে শাস্তি দিয়ে যাওয়ার আগ্রহে মায়ের চোখে যে দৃষ্টি ফুটে উঠেছে তা ঠিক যেন জালবদ্ধ পশুকে দেখে প্রলুব্ধ শিকারীর দৃষ্টির মতো। হিংস্র! ...অনীতা অজ্ঞাতসারে কখন যে তার দোষী স্বামীর পক্ষ অবলম্বন করেছে মনে মনে তা সে নিজেও টের পায়নি প্রথমে। ছি, ছি, এমন বোকামি সে করতে গেল কেন! রাগের মাথায় কেন সে সব কথা বলতে গেল মাকে? ওই বলিষ্ঠ নীতিবাগীশ নির্মম মহিলাটিকে সে কি চেনে না? না, সুশোভনের উপর আর রাগ ছিল না তার। ঈর্ষার একটা কাঁটা খচখচ করছিল যদিও মনের ভিতর কিন্তু রাগ আর ছিল না তার। বরং সমস্ত ব্যাপারটাকে অবিশ্বাস করে ক্ষমা করবার জন্যেই উন্মুখ হয়ে উঠেছিল সে ভিতরে ভিতরে। মায়ের এই 'কত্তাত্তি' করতে যাওয়ার মানে কি? সুশোভনের বিরুদ্ধে যদি কিছু করতেই হয় সে নিজেই করবে। সুশোভনের নাগাল পেলে মা তাকে থুড়বে, ধুনবে, নাস্তানাবুদ করে ফেলবে সকলের সামনে। তার বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল—না, যা করবার সে নিজেই করবে। পাঁচজনে মিলে তার স্বামীকে সকলের সামনে অপমান করবে—এ কিছুতেই হতে দেবে না সে। সুশোভনকে সে চায় আবার, তাকে সে ভালবাসে এখনও, তার সব দোষ সত্ত্বেও।

"মা—"

অনীতার কণ্ঠস্বর এত তীক্ষ্ণ শোনাল যে স্বয়ম্প্রভা চমকে উঠলেন। গাড়ির অপর প্রান্ত থেকে জিতুবাবুও ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন।

"কি? হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলি কেন আচম্‌কা! হলো কি"—স্বয়ম্প্রভা প্রশ্ন করলেন।

অনীতা মায়ের দিকে একটু ঝুঁকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে। সে দৃষ্টিতে কেবল রাগ নয়, গভীরতর আর একটা কি যেন প্রতিভাত হচ্ছিল। আত্মসম্বরণ করবার চেষ্টা করছিল সে প্রাণপণে, কিন্তু পারছিল না। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরে চেষ্টা করছিল তবু।

"মনে হচ্ছে এতে তুমি যেন খুশিই হয়েছ"

"কি বলছিস্ বুঝতে পারছি না ভাল। কি একটা ভাবছিলাম তোর চিৎকারে গুলিয়ে গেল সব। খুশি? মানে?'

'উনি যে এই কাণ্ড করেছেন তাতে যেন আনন্দই হয়েছে তোমার মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা তুমি যেন উপভোগ করছ বেশ"

স্বয়ম্প্রভা ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে বাতায়ন-পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তাঁর নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হল। তারপর হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে বললেন—"তোমার মাথার ঠিক নেই, কথা বোলো না বেশি। এত বড় আঘাতের পর মাথা ঠিক রাখা কঠিন। তবু চেষ্টা কর। নিজের জামাই বাস্তুঘুঘু এ আবিষ্কার করে খুশি হয় না কেউ। আমিও হইনি। তবে আশ্চর্যও হইনি। এ আমি গোড়া থেকেই জানতাম—"

"কি—"

জিতুবাবু ওদিক থেকে সরে এলেন একটু।

"তুমি ওদিকেই থাক না। তোমাকে কিছু বলছি না—"

অনীতা বললে, "গোড়া থেকেই যদি জানতে তাহলে বিয়ের সময় আপত্তি করনি কেন। তখন তো খুশিই হয়েছিলে—"

স্বয়ম্প্রভার মুখে তিক্ত হাসি ফুটে উঠল একটা। গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন তিনি।

"একটি দিনের তরেও খুশি হইনি। গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছি। গোড়া থেকেই আমল দিতে চাইনি"

অনীতা এবার ফেটে পড়ল।

"মিছে কথা। এখন তুমি ওঁর শত দোষ দেখছ কিন্তু গোড়ায় গোড়ায় প্রথম যখন উনি আমাকে বিয়ে করতে চাইলেন তখন তুমি কিচ্ছু বলনি। বরং যখন জানা গেল যে ওঁদের অবস্থা বেশ সচ্ছল, ব্যাঙ্কে বেশ টাকা আছে, কোলকাতায় বাড়ি আছে, মরিস 'কার' আছে, বড় বড় লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে তখন তো তুমি থল-থল করে উঠেছিলে আনন্দে, গলে পড়েছিলে—"

"মুখ সামলে কথা বল্। ভদ্রভাবে কথা বলতেও শিখিস্‌নি? আমি গলে পড়েছিলাম? থল-থল!"

"কি ব্যাপার কি—"

জিতুবাবু আর একবার এদিকে আসবার প্রয়াস পেলেন। কিন্তু স্বয়ম্প্রভার উত্তোলিত তর্জনীর নিষেধাত্মক আন্দোলনে থেমে যেতে হল তাঁকে আবার।

অনীতা বললে—"উনি সত্যি খারাপ এ সন্দেহ থাকলে কিছুতেই বিয়েতে রাজি হতে না তুমি। সে সন্দেহ তোমার ঘুণাক্ষরে ছিল না। আর উনি যে সত্যিই খারাপ তা এখনও প্রমাণিত হয়নি—"

"এই যদি তোমার বুদ্ধি হয়, মা, তাহলে বুঝতে হবে অনেক দুঃখ নাচছে তোমার কপালে। এ দেশের ঘরে ঘরে যে সব সতীসাধ্বী অপমানিত হয়েও স্বামীদের অধঃপতনে বাধা দেয় না তোমাকেও শেষ পর্যন্ত তাদের দলে গিয়ে হায় হায় করতে হবে সারাজীবন—"

"না, হবে না। তুমি যা ভাবছ তা নয়। ওঁর কোনও অধঃপতন হয়নি। বাবা যেমন নিষ্কলঙ্ক আমার বিশ্বাস উনিও তেমনি—"

"দেখ, মা, পুরুষমাত্রেই উড়তে চায়। সে উড়বে কিনা তা নির্ভর করে তার স্ত্রীর উপর। সব ঘোড়ার চালই বদচাল, তাকে ঠিক চালে চালাতে পারে ভালো সওয়ার—" বলিষ্ঠ গর্দান ফিরিয়ে স্বামীর দিকে চাইলেন একবার।

"বিশ্বাস করি না ওসব কথা আমি। উনি যা করছেন তার কারণ আছে নিশ্চয়ই একটা। গেলেই বোঝা যাবে"

"যেমন বাপ তেমনি মেয়ে। একটা মাগীকে নিয়ে হোটেলে গিয়ে পড়ে আছে তবু বলে কিনা—"

"বিশ্বাস করি না আমি"—চিৎকার করে উঠল অনীতা—"হয়তো ভুলিয়ে নিয়ে গেছে—কিংবা—"

"ভুলিয়ে নিয়ে গেছে? আগে থাকতে সড় করে স্টেশনে এসেছে, বলে কিনা ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। কচি খোকা। মোয়া দেখে ভুলে গেলেন।"

"সে যাই হোক, তুমি এ নিয়ে মাতামাতি করছ কেন?"

"কর্তব্য করছি। মাতামাতিটা কোন্‌খানে দেখলি তুই?"

"যখন থেকে ব্যাপারটা শুনেছ তখন থেকে তো উন্মত্ত হয়ে উঠেছ। তোমার জামাই দুশ্চরিত্র এটা আবিষ্কার করে দিগ্বিজয় করে ফেলেছ যেন একটা—"

"মুখ সামলে কথা বল্, অনি। ছোটমুখে বড়কথা মানায় না। চুপ করে বসে থাক্ একধারে"

"এ সব থিয়েটারি কাণ্ড ভাল লাগে না আমার"

থিয়েটারি কাণ্ড করছে কে—আমি না তুই"

"বাবাকে নিয়ে এই যে তুমি ছুটছ এর কোনও মানে হয়?"

"এসব কথা শোনবার পরে কি ঘরে বসে থাকা সম্ভব?"

"আমার একা এলেই যথেষ্ট হত। আমি একাই তার সঙ্গে দেখা করতে চাই"

"ও! একা দেখা করতে চাও?"—স্বয়ম্প্রভার বলিষ্ঠ চিবুকের পেশীগুলি কুঞ্চিত হল—"একা দেখা করে তার বানানো গল্পগুলো বিশ্বাস করতে চাও? এমনি করেই তো আরম্ভ হয়! একবার যদি ওদের বানানো গল্প বিশ্বাস করতে আরম্ভ কর —ব্যস, তাহলেই হয়ে গেল—জন্মের মতো হয়ে গেল। বেশিদিন লাগবে না, ছমাস" —হঠাৎ স্বয়ম্প্রভা বাম করপল্লবটি বিস্ফারিত এবং দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি উত্তোলন করে চিৎকার করে উঠলেন—"ছয়মাসের মধ্যেই ডুব মারবে। টিকিটি দেখতে পাবে না আর"

"আমার স্বামীর সঙ্গে আমি নিজের মতো করে বোঝাপড়া করব। তাও করতে দেবে না আমাকে? এ কি জবরদস্তি তোমার"

"যারা অসুস্থ তাদের জবরদস্তি করেই ওষুধ গেলাতে হয়। এ জবরদস্তি নয়, বাঁচাবার উপায়। তোমার নিজের মতো করে করতে গেলেই হয়েছে। তোমার চোখে ধুলো দিতে কতক্ষণ?"

কিন্তু এরকম কেলেঙ্কারী করার কি দরকার ছিল? গুষ্টিসুদ্ধ মিলে—"

"কেলেঙ্কারী যাতে বেশীদুর না গড়ায় তারই ব্যবস্থা হচ্ছে। এখন থেকে ব্যবস্থা না করলে—ঢিঢি পড়ে যাবে। লোকসমাজে আর মুখ দেখানো যাবে না। তখন—"

"কি ব্যাপার কি'—জিতুবাবু আবার বললেন।

"তোমার আর শুনে কাজ নেই। ওইখানেই থাক তুমি"

"তাই তো আছি"

"তাই থাক"

জিতুবাবু মেয়ের দিকে চাইলেন। তাঁর দৃষ্টি থেকে সহানুভূতি যেন উপচে পড়ছিল। অনীতাও আড়চোখে একবার চাইলে বাবার দিকে। জিতুবাবুর মনে হল সে যেন নীরবে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছে। স্ত্রীর দিকে চেয়ে কিন্তু জিতুবাবু কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়লেন।

"কি নিয়ে এত বকাবকি করছ তোমরা"—একটু ইতস্ততঃ করে আর একবার বললেন তিনি। একটু সরেও এলেন।

"তুমি আবার আসছ এদিকে! ওই দিকে থাক না যেমন আছ—আরও সরে যাও বরং কোণের দিকে। আমাদের কথায় ফোড়ন দিতে হবে না তোমাকে"

"তোমাদের কাছে বসতেও দেবে না নাকি। সমস্ত পথটা একা একা আমাকে বসে থাকতে হবে ওই কোণে!"

"সারাটা জীবনই তো আমাদের কাছে বসে আছ। কিছুক্ষণ দূরেই থাক না। সিগারেট খাও না"

"আমাকে সঙ্গে করে আনবার কি দরকার ছিল।"

হঠাৎ দুহাত তুলে বলে উঠলেন জিতুবাবু।

অনীতা মায়ের দিকে চেয়ে বললে, "কেন, বাবা আমাদের কাছে এসে বসলে ক্ষতি কি?"

"মেয়ে হয়ে তুমি মাকে যে সব কথা বলছ তা যাতে ওঁর কানে না যায় তাই ওঁকে দূরে থাকতে বলছি—"

"এমন কিছুই বলা হয়নি তোমাকে। সব কথা শুনলে বাবা আমার দিকেই সায় দেবেন"

"কি কথা—"

আর একটু এগিয়ে এলেন জিতুবাবু।

"বাড়িতে সিগারেট ফুঁকতে পেলে তো আর কিছু চাও না। ইঞ্জিনের মতো ফসফস করে ধোঁয়া ছাড় খালি। তখন তো বকেও থামানো যায় না তোমাকে। এখন সুযোগ পেয়েছ, তাই করগে যাও না"

অনীতা বাবার দিকে চেয়ে বললে—"আমি মাকে বলছি, ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দাও তোমরা। তোমরা এর মধ্যে মাথা গলাতে যাচ্ছ কেন?"

"ঠিকই তো"—জিতুবাবু মৃদুকণ্ঠে বললেন।

স্বয়ম্প্রভার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়ে উঠল। দাঁতের ভিতর দিয়ে একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস টেনে বসে রইলেন তিনি গুম হয়ে।

অনীতা বলতে লাগল—"মা বলছে যে একা তার সঙ্গে দেখা করলে আমি নাকি কিছু বলব না। যদি দেখি সত্যিই তেমন কিছু নয়, বলব কেন, কি বল"

"সত্যি সত্যি তার কোনও দোষ আছে কিনা সেইটেই তো সর্বাগ্রে নির্ণয় করা দরকার। আমার মনে হয় ও কিছু নয়"

"ও!"

ফোঁস করে উঠলেন স্বয়ম্প্রভা। তারপর উঠে দাঁড়ালেন, ট্রেনের ঝাঁকানি সত্ত্বেও নিজের ভারসাম্য এবং গাম্ভীর্য রক্ষা করে বললেন—"তাহলে আমিই ওদিকে গিয়ে বসি। তোমরা বাপ-বেটিতে বসে পরামর্শ কর। কিন্তু আমার একটা কথা লিখে রাখ—দুর্দশা চরমে পৌঁছবে, টিটিক্কার পড়ে যাবে চুতর্দিকে..."

পরের বড় জংশনটাতে নাবলেন তাঁরা। আগে থাকতেই এই প্ল্যান ছিল; অবশ্য স্বয়ম্প্রভা দেবীর প্ল্যান। তাঁর আর তর সইছিল না যেন। চলতি ট্রেন থেকেই লাফিয়ে নাবলেন তিনি। তাঁর গালের চিবুকের এবং শরীরের অন্যান্য চর্বিবহুল অংশের স্পন্দন দেখে মনে হল লাফিয়ে নাবতে গিয়ে সমস্ত দেহে বেশ একটু নাড়া খেয়েছেন ভদ্রমহিলা। কিন্তু তাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। নেবেই একটা কুলিকে এক ধমক দিলেন তিনি। সে বেচারা ছুটে এসে তাঁর পতনোন্মুখ দেহকে জাপটে ধরতে গিয়েছিল।

অনীতা চুপ করে ছিল। তার কেমন যেন অবসন্ন মনে হচ্ছিল। জিতুবাবুর কানের ডগাটা লাল হয়ে উঠেছিল। ফাঁকি ধরা পড়ে যাবার পর বড়বাবুর কাছে বকুনি খেয়ে ফাঁকিবাজ কেরানির যেমন মুখভাব হয়, জিতুবাবুর মুখভাব সেই রকম দেখাচ্ছিল অনেকটা।

"আমরা এইখান থেকেই মোটর নেব, বুঝলে"—স্বয়ম্প্রভা বললেন—"তুমি আগেই ট্যাক্সি ঠিক করে ফেল একটা। পরে হয়তো না-ও পাওয়া যেতে পারে। আমরা স্টেশনের ধারের ওই হোটেলটায় খেয়ে নি, তুমি ততক্ষণ একটা মোটর দেখ। কাছাটা ঠিক করে দাও"

"কি"—ট্রেন থেকে নাবতে নাবতে জিজ্ঞেস করলেন জিতুবাবু। ভিড়ে গোলমালে ভাল করে সব কথা শুনতেই পাননি তিনি।

স্বয়ম্প্রভা আবার সব বললেন।

"আঃ, চেঁচিও না অত। লোকে চেয়ে দেখছে"

"দেখছে তোমাকে। কাছাটা ঠিক করে দাও"

"দোহাই তোমার, থাম। ইস্—কি বিশ্রী স্টেশনটা। এখানে হোটেল কোথা? স্টেশনে তো মোটর দেখছি না একটাও, সব ছ্যাকড়া গাড়ি—"

"একটু দূরে ট্যাক্সি-স্ট্যান্ড আছে, আমি খবর নিয়েছি"

"কোথায় সে স্ট্যান্ড, জানব কি করে। তাছাড়া কোথায় আমরা যাচ্ছি তাই তো জানি না। ট্যাক্সিওয়ালাকে বলতে হবে তো জায়গাটার নাম। কি বলব তাকে।"

"কাকে?"

"তাকে। ট্যাক্সিওয়ালাকে।"

"ডেকে আন না। কোথায় যেতে হবে আমি তাকে বুঝিয়ে বলে দেব।"

"কিন্তু ট্যাক্সি ডাকলে তক্ষুণি জানতে চাইবে কোথা যেতে হবে।"

"সে আমি বলব তাকে।"

"কিন্তু তুমি তো থাকবে হোটেলে। আমি তাকে হোটেলে ডেকে নিয়ে আসব? সে হয়তো আসতেই চাইবে না, ড্রাইভারগুলো প্রায়ই তেরিয়া মেজাজের লোক হয়।"

"সামান্য একটা ড্রাইভারের ভয়ে তুমি যদি অস্থির হও পুরুষমানুষ হয়ে, তাহলে আমার আর—"

"মোটেই না। কিন্তু একটা কথা আমি জানতে চাই—আগে থাকতেই ট্যাক্সি ডাকবার দরকার কি। চল না, আমিও হোটেলে গিয়ে খেয়েনি, তারপর ট্যাক্সি ডাকলেই হবে। আমারও খিদে পেয়েছে।"

"সমস্ত লুচিগুলো তো রাস্তায় একা তুমিই খেলে। এর মধ্যেই খিদে পেয়ে গেল?"

"দেড়টা বাজে, খিদে পাবে না? খেয়ে নিয়ে ট্যাক্সি খুঁজলেই হবে। এতে আপত্তি কি তোমার?"

"খাবার পর ট্যাক্সি খুঁজতে গেলে ট্যাক্সি পাবে না। এ তো আর কোলকাতা নয়। দুটো-চারটে ট্যাক্সি হয়তো আছে, ভাড়া হয়ে যাবে।"

"তার মানে ট্যাক্সি খুঁজে না আনা পর্যন্ত খেতে পাব না আমি—"

"তুচ্ছ খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে চেঁচামেচি করতে লজ্জা করে না তোমার বুড়ো বয়সে! সবাই চেয়ে চেয়ে দেখছে যে। আমরা হোটেলে যতক্ষণ খাব, ততক্ষণ তুমি যদি একটা ট্যাক্সি ডেকে আনতে পার এক-ঢিলে দুই পাখি মারা হবে?"

"তুমি দেখছি আমাকেই মারতে চাও। আমি তাহলে খাব না?"

"ট্যাক্সিটা ডেকে এনেই খেও। খুব যদি খিদে পেয়ে থাকে রাস্তায় কেক বা সন্দেশ যা পাও কিনে নিয়ে খেতে খেতে যাও।"

"সেটা কি—"

"এই কুলি, হোটেলে চল্। আমরা হোটেলে চললুম, বুঝলে। তুমি ট্যাক্সি দেখ একটা।"

ঈষৎ চিন্তার পর জিতুবাবু উপলব্ধি করলেন গত্যন্তর নেই। হোটেলের দিকেই অগ্রসর হলেন তাঁরা। অনীতা একটু পিছিয়ে রইল। এসব কোন কিছুর মধ্যে থাকবে না সে। থাকতে ভাল লাগছিল না।

জিতুবাবু বেরিয়েই গোটা চারেক কেক কিনে নিলেন এবং স্বয়ম্প্রভার অগোচরে অনীতাকে দুটো দিতে এলেন।

"আমি খাব না, বাবা"

"দেখ না চেখে।"

অগত্যা অনীতাকে নিতে হল।

"ট্যাক্সিওয়ালা যদি জানতে চায় কোথায় যেতে হবে, কি বলব। জানতে চাইবেই"

"বোলো ফতিমারং যাব।"

"ফতিমারং? ফতিমারং কোনও জায়গার নাম হতে পারে না।"

"রংপুর যদি হতে পারে ফতিমারং হতে বাধা কি।"

"রংপুর আর ফতিমারং আকাশ-পাতাল তফাৎ"

"যাক, সে আমি তাকে বুঝিয়ে বলব এখন। ওই দিকে গেলেই নামটা জানা যাবে। ফতিমারং কিংবা ফাৎনারঙ্গ—ওই ধরনেরই নাম সে গ্রামের। ওদিকে গেলেই জানা যাবে।"

"কোন্ দিকে যেতে হবে তাও হয়তো সে জানতে চাইবে"

"কেন"

"কি কেন"

"কেন তাই তো আমি জানতে চাইছি। আমি তাকে নিয়ে যাব, তার আগে থাকতে জানবার দরকার কি।"

"না জেনে সে যদি না আসতে চায়"

"দেখ কুঁড়ে লোকেরাই 'যদি' 'হয়তো'—এই-সবের আশ্রয় নেয় তুমি গিয়েই দেখ না"

"জায়গাটা কতদূর হবে এখান থেকে"

"ঠিক জানি না। তবে কাছেই। বেশী দূর হতে পারে না"

"হবার বাধা কি"

"হলে কোলকাতা থেকে ওরা মোটরে করে গিয়ে সেখানে রাত্রিবাস করছে কি করে? ঘটে কি একেবারে কিছু নেই!"

"কি বললে"

"কিছু নয়। যাও তুমি। এমন তক্ক করা স্বভাব হয়েছে—"

জিতুবাবু গেলেন। ফিরে আসতে বেশ একটু সময় লাগল। ফিরে দেখলেন স্বয়ম্প্রভা মারমুখী হয়ে বসে আছেন। হোটেলওয়ালা, হোটেলের চাকর-চাকরাণি, হোটেলের ঠাকুর সকলের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া বাধিয়েছেন। প্রায় ফৌজদারি কাণ্ড। অনীতা চুপ করে বসে আছে একধারে। চারদিকে নোংরা, মাছি ভনভন করছে, সমস্ত গা ঘিনঘিন করছিল তাঁর। জিতুবাবু কিন্তু বেশ উল্লসিত এবং উদ্দীপ্ত হয়ে ফিরেছেন মনে হল।

"চলে এস। ট্যাক্সি পেয়েছি—"

"উঃ, একটা গাড়ি ডাকতে যে কারও এতক্ষণ লাগতে পারে তা ধারণার অতীত ছিল"

"কেউ আসতে চায় না। জিগ্যেস করে করে বার করলাম গ্রামটার নাম। ফাৎনা ফিরিঙ্গিপুর। কেউ যেতে চায় না। অনেক কষ্টে এই লোকটাকে রাজি করেছি। জায়গাটি বেশ দূর, ভাড়াতে ফতুর করে দেবে। যাক্, চল—যেতেই যখন হবে"

" 'ডিভোর্স' করতে হলে উকীলের ফী যা লাগবে ট্যাক্সিভাড়া তার চেয়ে বেশি হবে না আশা করি"

"না"—ফোঁস করে উঠল অনীতা।

"যাক্। তুমি আবার শুরু কোরো না। কোথায় মোটর"

"বাইরে। তুমি কি আশা করেছিলে মোটর এসে রান্নাঘরে ঢুকে পড়বে?"

জিতুবাবু বেরিয়ে গেলেন। অনীতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ম্প্রভাও বেরিয়ে এলেন। জিতুবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে দু-একবার নাক কুঁচকে নিঃশ্বাস নিয়ে স্বয়ম্প্রভা অবশেষে তাঁর মুখের দিকে চাইলেন।

"মদ খেয়েছ নাকি?"

"খেয়েছি। মানে, খেতে বাধ্য হয়েছি। শরীর আর বইছে না। আমি উট নই, মানুষ"

"খাওয়ার ইচ্ছে যদি ছিল স্টেশনের কেল্‌নারে ঢুকে ভদ্রভাবে খেলেই হতো। আমাদের হোটেলে বসিয়ে রেখে একটা বাজে তাড়িখানায় ঢুকে ধাঙড়ের মতো তাড়ি না গিললে চলছিল না"

"তাড়িখানা নয়, ভাল দোকান। 'বিয়ার' পেয়ে গেলাম"

"কতটা খেয়েছ? মাতলামি করবে নাকি রাস্তায়"

"কোয়ার্ট-খানেক খেয়েছি। ওতে নেশা হয় না। ভাল বোধ করছি বরং"

"আমরা নোংরা হোটেলে এক ঝাঁক মাছির মধ্যে বসে একদল অসভ্য লোকের সঙ্গে বকাবকি করছি, আর তুমি গিয়ে ওদিকে মদ মারছ! লজ্জা করে না তোমার?"

"না"—মরিয়া হয়ে বলে উঠলেন জিতুবাবু—"আমার সঙ্গ যদি তোমার পছন্দ না হয় বল এক্ষুনি বাড়ি চলে যাচ্ছি"

"ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বস। তোমার পাশে বসতে পারব না। গন্ধে বমি আসছে"

"বল তো বাড়ি ফিরে যাই"

"যা বলছি কর"

।। ষোলো ।।

ছকুবাবু পিছনে হাত দিয়ে লাইব্রেরী ঘরে উত্তেজিতভাবে পদচারণ করছিলেন। ব্রজেশ্বরবাবুদের কিভাবে অভ্যর্থনা করবেন তারই নানা রকম মক্‌শ করছিলেন তিনি মনে মনে। কি এক ফ্যাসাদ এসে জুটল, রাম কহো! অভ্যর্থনা! এসে পড়লে করতেই হবে, উপায় নেই এবং যদি করতে হয় একহাত দেখিয়ে দেবেন তিনি। সুচারুরূপে সংক্ষেপে এবং অভিনবত্ব সহকারে যাকে বলে! মাঝে মাঝে থেমে ঝাঁকড়া ভ্রূ কুঞ্চিত করে গেটের দিকে চাইছিলেন। এখনই আসবে! ওই বোধ হয়! অনতিবিলম্বেই একটা মোটরকার সশব্দে এসে দাঁড়াল। ছকুবাবুও এক নিমেষে গ্লাসে যেটুকু অবশিষ্ট ছিল সেটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং যে সাদর সম্ভাষণ করবেন ঠিক করেছিলেন সেটা আওড়ালেন আর একবার মনে মনে।

মোটরের ভিতরও রিহার্সাল চলছিল একটা। ভিন্ন রকমের। নেমেই প্রথম আলাপের মোহড়ায় কতটা প্রকাশ করা উচিত এবং কতটা চেপে যাওয়া উচিত—তারই আলোচনা চলছিল দু'জনের মধ্যে। দু'জনেই বেশ একটু চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। সান্ত্বনা অবশ্য চোখেমুখে খুব একটা সহজ ভাব ফুটিয়ে রেখেছিল, রাখবার চেষ্টা করছিল অন্ততঃ। মুখে খুব একটা সপ্রতিভ হাসি ফুটিয়ে জানলা দিয়ে ঝুঁকে চেয়ে দেখছিল সে বাড়ির সামনেটা।

সুশোভন ঝোঁকেনি। একটা সিগারেট ধরিয়ে সে গাড়ির এক কোণে সেঁটে বসেছিল—চোখেমুখে একটা বে-পরোয়া ভাব ফুটিয়ে।

রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে উইংসের ধারে দণ্ডায়মান নূতন অভিনেতাদের যে মনোভাব—এদের উভয়ের মনোভাব অনেকটা সেই রকম হয়ে উঠেছিল প্রায়।

"প্রথম ঝোঁকটা তুমিই সামলে নাও, বুঝলে সান্ত্বনা, যা কৈফিয়ত টৈফিয়ত দেবার দিয়ে

ফেল তুমিই প্রথমে। 'উঃ, কি বিপদে যে পড়েছিলাম' গোছের একটা কিছু—বুঝলে। বারান্দাটা দেখতে পাচ্ছ?"

"হ্যাঁ"

"কেউ দাঁড়িয়ে আছে নাকি।"

"না। সামনের দরজাটা তো বন্ধ"

"বাঁচা গেল। অনীতা দাঁড়িয়ে থাকলেই হয়েছিল আর কি! একটু দম না নিয়ে অনীতার সামনাসামনি দাঁড়াতে পারব বলে তো মনে হয় না। কিন্তু দেখো, ঠিক তার সঙ্গেই আগে দেখা হয়ে যাবে! যা কপাল"

"সে যা হয় হবে। আচ্ছা, আমিই আগে নাবি। আপনি ভিতরেই থাকুন এখন। আমি আগে দেখে আসি— হাওয়া কিভাবে কোন্ দিকে বইছে।"

"বেশ। তাই যাও। গুছিয়ে সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলে দিও আগে, বুঝলে। তারপর আমাকে এসে টেনে বার কোরো—'এই যে সুশোভনবাবু এখানে রয়েছেন'—এই গোছের কিছু একটা, বুঝলে। সব নির্ভর করছে অনীতা কোথা আছে তার উপর। প্রথমেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে কেলেঙ্কারি—"

মোটর এসে বারান্দার সামনে দাঁড়াল। গণেশ একটা আড়ামোড়া ভেঙে স্টিয়ারিং ছেড়ে নাবল নীচে।

সান্ত্বনা নাববার আগেই বারান্দার দরজাটা খুলে গেল। বেরিয়ে এল পরেশ। পরেশ ঘাড় ফিরিয়ে কাকে যেন হেঁকে বললে—"ছুটু—এই ছুটু—ব্রজেশ্বরবাবুরা এসে গেছেন, খবর দাও ভিতরে"—বলে নিজেই চলে গেল আবার ভিতরে।

একটা অজানা আতঙ্কে দুজনেরই বুক কেঁপে উঠল। কিন্তু পরমুহূর্তেই আতঙ্কের সঙ্গে মিশল বিস্ময়। কপাট খুলতে না খুলতেই ঝুনু বেরিয়ে এল। তখনও থর থর করে কাঁপছে। কান দুটো খাড়া। বারান্দায় একটু দাঁড়িয়েই এক ছুটে নেবে এল নীচে। আনন্দে কৃতজ্ঞতায় আবদারে গদগদ একেবারে। কি যে করবে ভেবে পেল না বেচারি, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে অস্থির হয়ে উঠল।

"ওমা ঝুনু যে"—বলে উঠল সান্ত্বনা।

"ও আবার জুটল কি করে"—গলা বাড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করলে সুশোভন।

"আপনাদের সেই কুকুরটা দেখছি যে"—গণেশ বললে—

"কেউ কুড়িয়ে দিয়ে গেছে বোধ হয়"

"হ্যাঁ। জিনিসপত্রগুলো নাবিয়ে ফেল"

সুশোভনের দিকে চেয়ে সান্ত্বনা বললে—"কেউ এসেছিল এখানে তাহলে"

"হ্যাঁ এবং সে ফাঁস করে দিয়েছে হয়তো"

"কে হতে পারে"

সুশোভন গম্ভীরভাবে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে গোঁফজোড়ার উপর 'তা' দিতে লাগল।

"ওই চাকরটাকে জিগ্যেস করলে হয় না? উঁকি মেরেই সরে পড়ল কোথায় লোকটা।"

"আমি যাই। আপনি অপেক্ষা করুন।"

পরেশ আবার বেরিয়ে এল। ঠোঁটে মধুর একটি হাসি ফুটিয়ে সান্ত্বনা এগিয়ে গেল তার দিকে।

বিনীত নমস্কার করে পরেশ বলল—"আপনারা যে এ সময়ে এসে পড়বেন তা আমরা আন্দাজ করতে পারিনি। ওঁরা তাই শিকারে বেরিয়ে গেছেন সবাই। গিন্নীমাও সঙ্গে গেছেন। আপনারা আসবেন জানলে উনি অন্ততঃ থাকতেন"

"তাতে কি হয়েছে। বরং ভালই হয়েছে এক হিসেবে। আমাদের আসবার খবর পেলে হয়তো শিকার-পার্টিটাই মাটি হয়ে যেত। ট্রেন ফেল করে আসতে পারিনি আমরা। ঝুনুকে কে দিয়ে গেল? কাল রাত্রে হারিয়ে গিয়েছিল। সে কি মুশকিল"

পরেশ সস্নেহে চাইলে একবার ঝুনুর দিকে।

"সব শুনেছি আমরা। একটু আগেই এ অঞ্চলের একজন ভদ্রলোক দিয়ে গেলেন ওঁকে। তিনি আপনাদেরও চেনেন। কাল রাত্রের সব খবরও বললেন। তাঁর কাছে খবর পেয়ে আমরা বুঝলাম ব্যাপারটা—তখন গিন্নীমা চলে গেছেন—"

"কে বল তো ভদ্রলোকটি"

"সদারঙ্গবিহারীবাবু"

"ও"—সান্ত্বনা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল একটু, তারপর তাড়াতাড়ি বললে—"জিনিসপত্রগুলো নাবিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা কর তা'লে"

"হ্যাঁ, এই যে"

"সুশোভনবাবুর স্ত্রীও শিকারে গেছেন নাকি।"

"তাঁরা তো আসেনই নি। কোনও খবরও আসেনি।"

সান্ত্বনা মোটরের দিকে এগিয়ে গেল ধীরে ধীরে। বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে একটু ইশারা করতেই সুশোভন মুণ্ডু টেনে নিলে গাড়ির ভিতর। সে অধীর হয়ে উঁকি দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছিল ব্যাপার কতদূর গড়াল।

"আচ্ছা"—সান্ত্বনা আবার পরেশকে জিজ্ঞাসা করলে—"সদারঙ্গবাবু আসবার আগেই মেসোমশায়রা শিকারে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, নয়? আমাদের খবর ওঁরা তাহলে কিছুই পাননি"

"না। পেলে কি আর বেরিয়ে যেতেন! ছকুবাবু আর আমি ছাড়া কেউ জানে না।"

"ছকুবাবু?"

"হ্যাঁ, গিন্নীমার দূর সম্পর্কের কে যেন হন। বেড়াতে এসেছেন।"

"ও। ছকুবাবুর সঙ্গে সদারঙ্গবাবুর দেখা হয়েছে তাহলে"

"হ্যাঁ, অনেকক্ষণ বসে গল্পসল্প করলেন দুজনে"

"ও। আচ্ছা, জিনিসগুলো নাবিয়ে ফেল।"

গণেশ ও পরেশ দু'জনে মিলে জিনিসগুলো সামনের 'হলে' রাখতে লাগল। সান্ত্বনা এগিয়ে গেল মোটরের দিকে।

"সুশোভনবাবু, আপনার নাবা চলবে না, শুধু তাই নয়, চাকরটা যেন আপনাকে দেখতে না পায়"

"অদৃশ্য হব কি করে। যাদুবিদ্যা তো জানা নেই। কেন, কি হল?"

"পরেশ হরিমটর হিন্দু পান্থনিবাসের সমস্ত কথা শুনেছে"

"সমস্ত?"

"কতটা ঠিক জানি না। কিন্তু সদারঙ্গবিহারীবাবু যখন ঝুনুকে এনেছিলেন তখন—"

"সেই ব্যাটাচ্ছেলে বাক্যবাগীশ এখান পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল? অ্যাঁ, বল কি? আর অনীতার খবর কি?"

"অনীতা এখানে নেই"

"যাক, এটা সুখবর। কোথা সে এখন? শিকারে—"

"সে আসেইনি"

"আসেইনি? বল কি? আসেনি? কোথায় গেল সে তবে?"

"তা এরা কি করে জানবে। পরেশ বলছে, আপনাদের আসবার কথা ছিল কিন্তু আপনারা কেউ আসেননি।"

"কি হল অনীতার তাহলে। কি হতে পারে?"

অতিশয় বিচলিত চিত্তে গাড়ির মধ্যেই উঠে দাঁড়াল সুশোভন।

"সে হয়তো আর একটা হোটেলে আর কারও সঙ্গে রাত কাটিয়ে আসছে একটু পরে।"

অতিশয় স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা-কটি বলে নির্বিকারভাবে চেয়ে রইল সান্ত্বনা।

"না, রসিকতা ভাল লাগছে না, সান্ত্বনা। ব্যাপার মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না। আচ্ছা, সে কি ফিরে গেল নাকি? তাহলে তো—আমি বরং চলে যাই, বুঝলে।"

"আমি তো তাই বলছি। পরেশের দৃষ্টি থেকে সরে থাকতেও বলছি সেইজন্যে। হিন্দু পান্থনিবাসের কীর্তি ওঁরা যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শুনে থাকেন তাহলে আপনার আত্মগোপন করে এই মোটরেই সরে পড়া উচিত। আমি বলব বিশেষ একটা জরুরি দরকারের জন্যে আমার স্বামীকে এই মোটরেই ফিরে যেতে হল—"

"এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্বামী হয়তো হাজির হয়ে যাবেন পরের ট্রেনে"

"কালকের আগে তাঁর আসবার সম্ভাবনা নেই"

"কিন্তু শোন, আমরা সত্য কথাটা অকপটে বলব বলেই তো প্রস্তুত হয়ে এসেছি। তাই করি না কেন। কি দরকার এই লুকোচুরির? এক হোটেলে দুজন রাত্রিবাস করলেই চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যাবে এমন কথা নেই। সে কথা যদি কেউ ভাবে, তাহলে নিতান্ত ইয়ে বলতে হবে তাকে—"

"কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখুন"—সান্ত্বনা শান্তভাবে বোঝাতে লাগল—"ঝুনুকে সদারঙ্গবাবু এখানে যখন দিয়ে গেছেন তখন এখানকার ঠিকানা সংগ্রহ করতে হয়েছে তাঁকে গোঁসাইজির কাছে। গোঁসাইজি তাঁকে কতটা কি বলেছেন তা তো জানা নেই— তার ওপরই সব নির্ভর করছে।"

"পরেশকে জিগ্যেস করেছিলে কিছু এ বিষয়ে?"

"নিশ্চয় না। তা কি করা যায়?"

"ধর যদি গোঁসাইজি সদারঙ্গবাবুকে সব কথা বলেই থাকেন যে আমরা একঘরে দুজনে শুয়েছিলাম, তাহলে সে কথা কি গাড়োলটা এখানে এসে চাকরদের কাছে গল্প করবে—এও কি সম্ভব নাকি"

"ইচ্ছে করে না করলেও কথায় কথায় বেরিয়ে পড়তে পারে বই কি? বলা যায় কি কিছু! ঝুনুকে নিয়ে কম কাণ্ড তো হয়নি, ঝুনুর গল্প করতেই হয়তো বেরিয়ে পড়েছে সব। আমি

আমার স্বামীর সঙ্গে হোটেলে ছিলাম, এর বেশি অন্য লোককে জানতে দেবার দরকারই বা কি। আপনি যদি এখন ফিরে যান লুকিয়ে, মানে, কেউ যদি আপনাকে দেখে না ফেলে, তাহলে আমি স্বচ্ছন্দে এখানে প্রচার করতে পারি যে আমি আমার স্বামীর সঙ্গে হিন্দু পান্থনিবাসে ছিলাম, সকালে এখানে মোটরে করে এসেছিলাম, হঠাৎ একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে যাওয়াতে আমার স্বামীকে ফিরে যেতে হল, কাল নাগাদ আবার হয়তো তিনি এসে পড়বেন। তারপর কাল যদি উনি সত্যি সত্যি আসেন তখন আমি ওঁকে খুলে বলব সব। তারপর আপনারা সস্ত্রীক এসে পড়ুন, কেউ ঘুণাক্ষরে কিছু জানতে পারবে না।"

"তুমি দেখছি পাকা মিথ্যুক একটি। ওফ—! বেশ, ব্যাপারটা যদি এইভাবে দাঁড় করাতে পার মন্দ হবে না নিতান্ত।"

সান্ত্বনা হেসে বললে, "এ সব ব্যাপারে মিথ্যে কথা বলায় দোষ নেই। সব দিক যাতে বক্ষা পায় তাই করাই ভাল নয় কি?"

"বেশ. কিন্তু ভেবে দেখ আমি চলে গেলেই সব দিক রক্ষে হবে তো! ফাঁকি ধরা পড়ে গিয়ে শেষকালে আরও জটিল কিছু না হয়ে পড়ে"

"না, তা হবে না। অনীতার খবর নেবার জন্যে আপনি তো যেতেই চাইছেন। আমি কেবল বলছি এখানে আত্মপ্রকাশ করবেন না। লুকিয়ে চলে যান, আমি সব ঠিক করে নিতে পারব"

"তা পারবে। যদি না ওই সরগরমবাবু হুড়মুড় করে এসে আবার—"

"সে তখন দেখা যাবে। কিন্তু আপনি আর দেরি করবেন না। পরেশ আসছে এ দিকে, ডাকতেই আসছে বোধ হয় আমাদের। তাহলে ঠিক হল, কি বলব আমি এখানে"

"যা তোমার খুশি। কিন্তু আমি যদি অনীতাকে নিয়ে ফিরি আবার, কি করে জানব তুমি কি বলেছ"

"আমি কি বলব, সেটা নির্ভর করছে এরা কতটা কি জেনেছে তার ওপর। এখানে পরেশ ছাড়া আর একজন ভদ্রলোক আছে কিনা"

"আবার কে ?"

সান্ত্বনাকে আর বুঝিয়ে বলতে হল না। অতিশয় নাটকীয় ভাবে ছকুবাবু স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করলেন। হঠাৎ বারান্দায় বেরিয়ে এসে সামনের দিকে দুই হাত প্রসারিত করে তিনি বলে উঠলেন—"আঁই, আঁই রৌঁয়া আঁয়ি আঁয়ি—এতানা দেরি কাহে ভইল—আঁয়ি, উপর পাধারি—"

হাস্যোদ্ভাসিত মুখ তাঁর। খোঁচা খোঁচা গোঁফগুলো পর্যন্ত হর্ষ-কণ্টকিত।

"সর্বনাশ, ও কি!"

সান্ত্বনাও সবিস্ময়ে ফিরে তাকিয়েছিল।

"বেহারের ভাষা বোধ হয়। উনি বালিয়া জেলায় ছিলেন, কিছুদিন ওর মুখে এই ধরনের কথা শুনেছি।"

"যাব কিনা একটু দ্বিধা হচ্ছিল, কিন্তু এ ভাষা শোনার পর আর দ্বিধা নেই। বুঝলে, আমি চললাম। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন। গণেশ"

"এই যে"—

"আঁয়ি, আঁয়ি, রৌঁয়া, আঁয়ি—"

সান্ত্বনা দাঁড়িয়ে রইল স্মিতমুখে।

গণেশ দ্রুতহস্তে 'গিয়ার' বদলে গাড়ি স্টার্ট করে দিলে এবং স্টিয়ারিং ধরে সোঁ করে গাড়িটা ঘুরিয়ে একেবারে পঁচিশ মাইল বেগে শুরু করলে চালাতে। গাড়িটা দৃষ্টির বাইরে বেরিয়ে যেতেই সান্ত্বনা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল বারান্দায়। পরেশের দিকে চেয়ে বললে— "একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়তে উনি ফিরে গেলেন এই গাড়িতে"

"ও"

"কালই ফিরবেন সম্ভবতঃ"

জনৈকা মহিলার সান্নিধ্য সত্ত্বেও ছকুবাবু আত্মসংবরণ করতে পারলেন না। তাঁর ভাষা বদ্‌লে গেল। তিনি বলে ফেললেন— "আরে মোলো, এ যে চোঁচা দৌড় দিলে! তাজ্জব কি বাত!"

তারপর সান্ত্বনার নমস্কারের উত্তরে প্রতিনমস্কার করে ছকুবাবু বললেন—"ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না তো। আসুন, ভিতরে আসুন"

শুনে দমে গেলেন ছকুবাবু। চলে গেলেন ভদ্রলোক। আফসোস কি বাত!

"আপনি বালিয়া জেলার ভাষা বোঝেন?"

"না, আমি বুঝি না।"

ভদ্রমহিলার সঙ্গে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় আলাপ করে যেতে হবে নাকি ক্রমাগত? সর্বনাশ। তাহলে তো শক্তি-সংগ্রহ করা দরকার। শক্তি-সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে তিনি লাইব্রেরির দিকে যাচ্ছিলেন—এমন সময় সান্ত্বনা কথা কয়ে উঠল।

"আমাদের বন্ধু সদারঙ্গবাবু খুব বিরক্ত করে গেছেন নিশ্চয় আপনাকে"

"না না, বিরক্ত আর কি। আপনার কুকুরটা যে পাওয়া গেছে এতে খুশিই হয়েছি বরং"

"হ্যাঁ কুকুরটার জন্য আমরা—বিশেষ করে আমি—বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। সব শুনেছেন নিশ্চয়"

"নিশ্চয়। শুনতে বাকি নেই আর। সব শুনেছি, ভদ্রলোক শুনিয়ে তবে ছেড়েছেন।"

সান্ত্বনা একটু ইতস্ততঃ করতে লাগল, তারপর ছকুবাবুর দিকে মাথা নেড়ে এমন একটা প্রত্যাশাসূচক ভঙ্গি করে রইল যার অর্থ—যা শুনেছেন বলুন না সব।

"উঃ কি রাতই কেটেছে আপনাদের কাল"—মুচকি হেসে বললেন ছকুবাবু।

ঈষৎ অনুনাসিক আবদার-তরল-কণ্ঠে সান্ত্বনা বললে, "আপনি হাসছেন কিন্তু কাল রাত্রে কি বিপদেই যে পড়েছিলাম আমরা"—

"বহুবচনটা কি গৌরবে ব্যবহার করছেন? বিপদে তো পড়েছিলেন আপনার স্বামী ভদ্রলোক। শীতকালে রাতদুপুরে বিছানা ছেড়ে কুকুর আনতে দৌড়ানো, অ্যাঁ? হা-হা-হা"—

"হা—হা—হা"—কলকণ্ঠে সান্ত্বনাও হেসে উঠল—"হ্যাঁ, তা দৌড়েছিলেন বটে। কুকুরটা এত কাঁদছিল আমরা ঘুমুতেই পারছিলাম না যে"

"তাই ভদ্রলোক বিছানা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। সমঝেছি। আমারও এ অভিজ্ঞতা হয়েছিল একবার। কিন্তু কুকুরের জন্যে নয়, শেরের, মানে বাঘের জন্যে। দিল্‌ ঘাবড়ে দিয়েছিল একেবারে"

"ও"—সান্ত্বনার চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

"পোখমনবাবুর সঙ্গে শিকারে যেতে হয় কিনা। বাঘের সে কি আবাজ—ভর রাত বসে কাটাতে হয়েছে—ভয়ে দিল্‌ কাঁপছে। আপনার স্বামী এতটা বিপদে পড়েননি। কুকুরটাকে খুলে দিয়ে এসে বিছানায় আবার এসে তক্ষুনি শুলেন তো—দু-চার লহমার ব্যাপার—"

চোখ মটকে আবার হাসলেন ছকুবাবু।

"আপনাদের কাণ্ড সব শুনেছি, কি ভাবছেন, সব জানি! হা-হা-হা—"

মুখে স্মিতহাসি ফুটিয়ে আনত নয়নে বসে রইল সান্ত্বনা। ছকুবাবু সোৎসাহে লাইব্রেরির দিকে চলে গেলেন।

খাসা মেয়ে। অচেনা এক ভদ্রমহিলাকে নিয়ে বিকেলটা কেমনভাবে কাটবে ভাবনায় পড়েছিলেন ছকুবাবু। এখন মনে হচ্ছে—খাসা কাটবে। চোঁ চোঁ করে তিনি সান্ত্বনার স্বাস্থ্য পান করে ফেললেন খানিকটা।

...একটু পরে তিনি দেখলেন সান্ত্বনা কাপড়চোপড় বদলে একটি বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে লনের দিকে মুখ করে বারান্দায় এসে বসল। বেশ ছিমছাম মেয়েটি। ছকুবাবু তর্জনীটি নাকের উপর লঘুভাবে রেখে লাইব্রেরির জানলা থেকে সান্ত্বনার গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন। সান্ত্বনাও যেন বুঝতে পারছিল আড়াল থেকে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে। আড়ষ্টতাটা কিছুতেই সে যেন কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করতে গিয়ে আরও যেন অস্বাভাবিক হয়ে উঠছিল।

...আকাশটা কেমন যেন ঘোলাটে গোছের। বাতাসে ইউক্যালিপ্‌টাস গাছের ডালপালাগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে। চিৎকার করে চলেছে একদল দাঁড়কাক, সান্ত্বনার কিন্তু প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ করার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না। জটিল পরিস্থিতিটার কথাই সে ভাবছিল লনের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি হয়ে। নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে কি জটই না সে পাকিয়ে তুলেছে! কি করে যে এখন ছাড়ানো যায়? ভ্রূ কুঞ্চিত করে নিবিষ্টচিত্তে ভাবছিল সে। মনে হচ্ছিল সে যেন কোন অদৃশ্য দাবার ছকের দিকে চেয়ে চাল ভাবছে। দিগ্বিজয়বাবুর পল্লীভবনের নিবিড় শান্তি কিন্তু ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার মনে। অর্ধবিস্মৃত রূপকথালোকের স্নিগ্ধ মায়া চারদিকে ছড়িয়ে আছে, সংসারের দুঃখ-যন্ত্রণার জ্বালাকে জুড়িয়ে দিচ্ছে যেন। সান্ত্বনার ছেলেবেলার খানিকটা এখানে কেটেছে। কোলকাতার অত্যুগ্র কোলাহলের পর এখানকার শান্তি যে কি মধুর তা অজানা নেই তার। চুপ করে বসে রইল সে। গাছের মর্মর আর পাখির ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। অনেক দূরে একটা মালী ফুলের গামলাগুলো নিয়ে কি যেন করছে। আরও দূরে একটা ছোট বাছুর মনের উল্লাসে ছুটে বেড়াচ্ছে লেজ তুলে। নানা রকম দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে চোখ বুজে এল সান্ত্বনার। পল্লীপ্রকৃতির স্নেহক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করল সে ধীরে ধীরে।

...এখানে কেউ ছলচাতুরি করবে কেন? কিসের প্রয়োজন? কুকুর হারিয়ে গিয়েছিল—একজন বন্ধু সেটা পেয়ে ফেরত দিয়ে গেলেন—এ আর এমন কি একটা ঘটনা যার জন্যে তার গত চব্বিশ ঘণ্টার গতিবিধির তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করা প্রয়োজন? ভাবনা কি! তাকে কেউ জেরা করতেও আসছে না। মাসীমাকে সমস্ত ঘটনাটা খুলেই বলবে সে লুকিয়ে। আর বাকি সকলের জন্য অত মিথ্যার জাল বোনবার দরকারই বা কি!

...নিজের স্বামীর উপর আস্থা আছে। মনে মনে ছবিটা কল্পনা করছিল সে। সবিস্ময়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে শুনবে, তারপর ছোট্ট হাসির আভায় মিলিয়ে যাবে সমস্ত ভ্রূকুটি।

...গোঁসাইজীর সঙ্গে জীবনে আর দেখাই হবে না হয়তো।

...সদারঙ্গবিহারীলাল? হ্যাঁ, ও ভদ্রলোককে সামলাতে হবে। মোটরবাইকে চড়ে আর অধিক দূর অগ্রসর হবার পূর্বেই ওঁকে রুখ্‌তে হবে! ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেই হবে না-হয় তাঁর বাড়িতে একদিন। এখান থেকে কত দূরই বা। কিন্তু না, একটু সাবধানতার প্রয়োজন আছে। গোঁসাইজির হিন্দু পান্থনিবাসে অবস্থিত সেই অতিকায় ছাপ্পর খাটে যে রহস্য নিহিত আছে তার খবরটা ভদ্রলোক জানেন যে। একটু সাবধানতার প্রয়োজন আছে বই কি। যিনি তাদের এই খাটে পাশাপাশি শুয়ে থাকতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি ছাড়া সদারঙ্গবিহারীলালই এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বেশি ভয়ঙ্কর সাক্ষী। পরেশ কিংবা ছকুবাবু তার সাজানো স্বামীটিকে চাক্ষুষ করেননি বটে কিন্তু সদারঙ্গবিহারীলাল রীতিমতো গল্প করেছেন তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে উচ্ছ্বসিত হয়ে। গোঁসাইজি নিশ্চয় তাঁর কাছে তাদের পাশাপাশি শুয়ে থাকার গল্পটাও করেছেন। গোঁসাইজি যে রকম নিখুঁত প্রকৃতির লোক—নিজের গল্পকে বাস্তব রূপ দেবার জন্যে সদারঙ্গবিহারীলালকে উপরে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে ছাপ্পর-খাটটা দেখিয়েছেনও হয়তো। মোট কথা, যা জানবার সবই তিনি জেনেছেন এবং যে রকম উর্বরমস্তিষ্ক উৎসাহী লোক, হয়তো অনেক কিছু রংও চড়িয়েছেন তাতে কল্পনা থেকে। না, সদারঙ্গবিহারীলাল সম্বন্ধে সাবধানতার খুবই প্রয়োজন আছে।

...সুশোভন সম্বন্ধেও। ওই স্বল্পবুদ্ধি দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকটিকে রীতিমতো তামিল না দিয়ে অমন হুড়মুড় করে পাঠানোটা ঠিক হয়নি মোটেই। কোন্ অবস্থায় কি বলতে হবে, তা অন্ততঃ বলে দেওয়া উচিত ছিল। অনীতার কাছে সাফাই গাইবার জন্যে উলটোপালটা যা-তা বলে বসবে হয়তো।

...ইউক্যালিপ্‌টাস গাছগুলোর মাথায় আকাশটা ঘন-ঘটাচ্ছন্ন হয়ে এল বেশ। দাঁড়কাকগুলো আরও জোরে চিৎকার করছে। মালীটা ঘাড় তুলে চেয়ে দেখলে একবার, তারপর টবটা মাটিতে নাবিয়ে ছুটল তার ঘরের দিকে। বাছুরটাও ছুটে পালাল। বৃষ্টি এল। মানুষের বহুবিধ ভ্রান্তির জন্যে রোষে ক্ষোভে দুঃখে' প্রকৃতি যেন কেঁদে ফেললেন।

সান্ত্বনা উঠে ভিতরে গেল। তার চিত্ত তখন রীতিমতো বিচলিত।...

পরেশ এসে সসম্ভ্রমে খবর দিলে খাবার দেওয়া হয়েছে। সান্ত্বনা গিয়ে দেখলে ছকুবাবুও চায়ের টেবিলে সমাসীন। সান্ত্বনার হাবভাব দেখে দমে গেলেন কিন্তু ছকুবাবু। যে রকম উচ্ছলতা তিনি আশা করেছিলেন তা তো মোটেই নেই। মিইয়ে গেল যেন হঠাৎ! তবু তিনি হাল ছাড়লেন না। নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ভাব জমাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ছোট ছেলের সঙ্গে ভাব করবার জন্যে লোকে যেমন নানা উপায় উদ্ভাবন করে, ব্যাপারটা অনেকটা সেই গোছের দাঁড়াল। কিন্তু তেমন জুত করতে পারলেন না তিনি। তাঁর মনে হতে লাগল একটা অদৃশ্য যবনিকা যেন সান্ত্বনার মনকে তাঁর রসিকতা-কিরণ থেকে আড়াল করে রাখছে। মনে মনে চটতে লাগলেন খুব, অথচ মুখে দেঁতো হাসি হেসে নানা রকম রসিকতাও করে যেতে লাগলেন। সান্ত্বনাও গম্ভীরভাবে শুনে যেতে লাগল। খাদ্যপ্রসঙ্গে অবতীর্ণ হলেন শেষে ছকুবাবু। কোনও দিক থেকে সুবিধে করতে না পেরে মনের নেপথ্যলোকে রাগটা জমে উঠেছিল বেশ। ঝালটা ঝাড়লেন ডালের উপর। লুচির সঙ্গে ঘন বুটের ডাল ছিল খানিকটা।

"ডালটা ভাল লেগেছে আপনার? রাম কহো, এর নাম কি ডাল! এরা কি ডালের মর্ম

বোঝে! বুটের ডাল বলে চেনবার উপায় আছে! ঘেঁটেঘুঁটে লেই বানিয়েছে একটা। আমার 'খাওয়াশ'টা যদি থাকত, ডাল কাকে বলে দেখিয়ে দিতাম আপনাদের। আপনাদের 'খাওয়াশ' কি বাঙালী? 'খাওয়াশ' আছে নিশ্চয়"

"না বোধ হয়। 'খাওয়াশ' জিনিসটা কি"

"সীয়ারাম, আপনি বুঝি বাইরে এক ডেগও যাননি। 'খাওয়াশ' মানে চাকর"

"ও। না, বাংলার বাইরে আমি যাইনি কখনও"

"তাহলে ডালের মর্মই বোঝেননি। ওদেশের বুটের ডাল, বুটের হালুয়া, পুদিনার চাটনি, লিট্টী, ডালরুটি, তিলুয়া, ঠেকুয়া, সিদ্ধির সরবৎ—অপূর্ব জিনিস সব। আবার ওদেশে ফিরতে হবে দেখছি। ডালই আমাকে তাড়াবে এদেশ থেকে"—

"ওদেশের ডাল খুব ভাল বুঝি"

"বেশক্"

"শুনে আমারও যেতে লোভ হচ্ছে"

মুচকি হেসে বললে বটে সান্ত্বনা, কিন্তু তার একটুও ভাল লাগছিল না। একটু আগে সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ারটিতে একা বসে তার মনে যে শান্ত স্নিগ্ধ ভাবটি এসেছিল তা যেন খিঁচড়ে গেল। একটা অজানা আশঙ্কা তার মনের শান্তিকে বিঘ্নিত করছিল, এই ছকুবাবু লোকটির অসহ্য আস্ফালনও নষ্ট করছিল এখানকার নির্জন স্নিগ্ধতাকে। মনে হচ্ছিল একটা বাঁদর যেন এসে মন্দিরে ঢুকেছে।

আহারান্তে ছকুবাবু উঠলেন এবং দাঁড়ালেন গিয়ে জানলার ধারে। বৃষ্টিটা থেমেছে। একটু-আধটু রোদ দেখা যাচ্ছে। প্রকৃতির মেজাজটা একটু যেন প্রসন্ন হয়েছে মনে হল। ছকুবাবুর মেজাজও প্রসন্ন হয়েছিল। সে কথা বললেনও তিনি। এমন কি বৈকালিক ভ্রমণের ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন। বললেন—"দেখে আসি ওরা কোন্‌দিকে গেল। আপনি যাবেন? চলুন না।" সান্ত্বনা ভদ্রভাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করাতে একাই বেরিয়ে পড়লেন তিনি।... বারান্দায় সূর্যালোক এসে পড়ল আবার। মালীটা তাই ঘর থেকে বেরিয়ে আবার গামছাগুলো পরিষ্কার করতে লাগল। সুরেশ্বরী দেবীর বুড়ো স্প্যানিয়েলটা থাবার উপর মুখ রেখে শুয়েছিল গম্ভীরভাবে। ঝুনু তার চারদিকে লাফালাফি করে তাকে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু উৎসাহের লক্ষণ প্রকাশ করল না সে। প্রবীণ দাদামশাই দামাল নাতনীর দুরন্তপনা সহ্য করেন যেমনভাবে—তেমনি একটা মুখভার করে সে থাবার উপর মুখ রেখেই শুয়ে রইল। সাইকেল দেখা গেল দূরে একটা। টেলিগ্রাফ পিওন। সুরেশ্বরী দেবীর নামে টেলিগ্রাম। সান্ত্বনাই সই করে নিলে। হলদে খামটার দিকে চেয়ে রইল সে খানিকক্ষণ ভ্রূ-কুঞ্চিত করে। কার টেলিগ্রাম হতে পারে? খুলবে? না, সেটা উচিত হবে না। ভিতরে গিয়ে পরেশের হাতে দিয়ে দিলে সেটা। পরেশ সুরেশ্বরী দেবীর চিঠি লেখার টেবিলে এমনভাবে সেটা রেখে দিলে—যাতে এসেই তিনি দেখতে পান।

মৃত্যুর সম্বন্ধে যেমন, ঝড়বৃষ্টির সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি। প্রত্যেক মানুষের ধারণা আমি ঠিক বেঁচে যাব। বৃষ্টিটা অপ্রত্যাশিতভাবে মোটেই আসেনি। আকাশ অনেকক্ষণ থেকেই ঘনঘোর হয়েছিল। তবু কিন্তু অনেকগুলি লোক ভিজে গেলেন এতে। রায়বাহাদুর দিগ্বিজয় একজন।

সুরেশ্বরী দেবী আর একজন। মাধব গোমস্তার বাড়ি থেকে বেরিয়েই বৃষ্টিটা পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি ফিরলেন না, কারণ একটু-আধটু বৃষ্টিতে ভিজলে তাঁর কিছু হয় না, এই তাঁর ধারণা। দ্বিতীয় কারণ শিকারীদের জন্যে যে খাবার তিনি এনেছেন, তিনি না গেলে সেগুলো অভুক্তই পড়ে থাকবে। গ্রামের আরও যে দুজন লোক শিকারে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরাও ভিজেছিলেন বেশ। গোবর্ধনবাবু ভিজে ন্যাতা হয়ে গিয়েছিলেন বললেই হয়। শিকারে উৎসাহ-বহ্নিতেও জল পড়েছিল প্রচুর। প্যাচপেচে কাদায় ছপছপ করতে করতে একটা বড় গাছতলায় সবাই সমবেত হলেন এসে।

"যাচ্ছেতাই কাণ্ড"—দিগ্বিজয় বললেন সুরেশ্বরীর দিকে চেয়ে... "এঃ—বড্ড ভিজে গেলে যে তুমি! আর শিকারে কাজ নেই, চল বাড়ি ফেরা যাক"

"আমি? আমি কিচ্ছু ভিজিনি। কিন্তু আমার মনে হয় ফেরাই ভাল, তুমি বড্ড ভিজেছ—এঁরাও—"

"কি যে বল, আমি একটুও ভিজিনি"

"তোমার গা থেকে টপটপ করে জল পড়ছে দেখতে পাচ্ছি, আর তুমি বলছ ভিজিনি!"

"টপটপ করে জল পড়ছে ওয়াটার-প্রুফ বেয়ে। ভাগ্যে ওটা সঙ্গে এনেছিলাম। ভিতরে কিছু ভেজেনি আমার। শোন, গাড়ি করে তুমি বরং ফিরে যাও, তোমার শাড়ি ভিজে সপসপ করছে"

সুরেশ্বরী দেবী চুপ করে রইলেন।

"সত্যি, তোমাদের শিকারটা মাটি হল"

"বিশ্রী দিন আজ! কিচ্ছু ভাল লাগছে না আমার"

এ সুযোগ সুরেশ্বরী দেবী উপেক্ষা করলেন না। দিগ্বিজয় নিজমুখে স্বীকার করেছেন তাঁর কিছু ভাল লাগছে না!

"চল, তবে ফেরাই যাক"

তার কণ্ঠস্বর বিজয়িনীসুলভ সুর বেজে উঠল।

অন্যান্য পথিকরাও ভিজেছিলেন এ বৃষ্টিতে। একটা বুড়ো চাষা ভিজতে ভিজতে ছুটছিল। শুধু ছুটছিল না, চিৎকারও করছিল প্রাণপণে।

গণেশ খুব ভেজেনি। তার গাড়ির রেডিয়েটার আবার খারাপ হয়েছিল। ঝুঁকে তারই তদারক করছিল সে, এমন সময় বৃষ্টিটা এল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ভিতর ঢুকে সে জানলার কাচগুলো তুলে দিল—আর বিরক্ত মুখে ভাবতে লাগল কী অশুভক্ষণেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল!

সুশোভন বেশ ভিজেছিল। কিন্তু নিজের চিন্তাতেই এত তন্ময় ছিল সে যে বৃষ্টি নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিল না তার। সে হাঁটছিল। দ্রুতবেগে হাঁটছিল ফাৎনাফিরিঙ্গিপুর অভিমুখে; আর মনে মনে ভাববার চেষ্টা করছিল কোন্ ট্রেন কখন পাওয়া যাবে, কাকে কি টেলিগ্রাম করবে, আর ফোন করবার সুযোগ যদি পাওয়া যায়, কি বলবে ফোনে।

স্বয়ম্প্রভা দেবী যে ট্রেনটায় আসছিলেন সেটাও ভিজেছিল বৃষ্টিতে। জিতুবাবু সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে স্বয়ম্প্রভা বললেন, "তুমি বাজে কথা বলে অন্যদিকে আমার মন ফেরাবার চেষ্টা করছ বুঝতে পারছি। কিন্তু অন্য কোনও কথা ভাবব না আমি এখন। ভাবতে

চাই না"—জিতু সরকার আর কিছু না বলে বাতায়ন-পথে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন। সেই একই ট্রেনে—ঠিক তিনটি কামরা পরে—অধ্যাপক ব্রজেশ্বরবাবুও ছিলেন। তিনি এককোণে বসে সেদিনকার কাগজটা পড়ছিলেন নিবিষ্টচিত্তে। কাচের জানলাটা বন্ধ ছিল। বৃষ্টির শব্দে বাইরের দিকে ভ্রূ কুঞ্চিত করে চাইলেন তিনি একবার, তারপর আবার কাগজে মন দিলেন।

বাইক-বিহারী সদাবঙ্গবিহারীলালেরই সবচেয়ে বেশি ভেজা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি উর্ধ্বশ্বাসে বাইক চালিয়ে হনুমানপুরে পৌঁছে গিয়েছিলেন ঠিক। বিশেষ ভেজেননি।

যাঁর ভেজবার কথা নয়, যিনি কখনও কোনও উচ্ছৃঙ্খল ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে চান না, সেই গোঁসাইজি ভীষণভাবে পড়ে গেলেন এই উচ্ছৃঙ্খল ঝড়বৃষ্টির খামখেয়ালী খপ্পরে। গোঁসাইজি কদাচিৎ বাড়ি থেকে বের হন। কিন্তু সেদিন প্রিয়বন্ধু নিতাই বৈরাগী নিমন্ত্রণ করেছিল তাঁকে। বাড়িটা একটু দূরে হওয়াতে যাবেন কিনা ইতস্ততঃ করছিলেন—কিন্তু জনৈক সহৃদয় গাড়োয়ান বিনাভাড়ায় নিজের গরুর গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে যেতে রাজি হয়ে গেল যখন, তখন আর দ্বিধা রইল না। ফিরতি মুখে গাড়োয়ান নিয়েও আসবে তাঁকে। তিনি ফদ্‌কা এবং পার্শ্ববর্তী তাড়ির দোকানের চাকর গোকুলের হাতে তাঁর হিন্দু পান্থনিবাস ও অসুস্থ গুরুভগ্নীর ভার নিয়ে নিতাই বৈরাগীর সঙ্গসুখ লাভ করতে বেরিয়ে পড়েছিলেন। একটি ছাতাও ছিল তাঁর—রেলি-ব্রাদার্সের বৃহত্তম ছাতা, উপরে সাদা কাপড়ের মলাট দেওয়া—তবু কিন্তু তিনি রক্ষা পেলেন না। ঝড়-বৃষ্টির সমস্ত তোড়টা তাঁর উপর পড়ল এসে।

।। সতেরো ।।

সদারঙ্গবিহারীলাল যে ঐতিহাসিক মন্দির ও মূর্তিগুলির উল্লেখ সুশোভনের কাছে করেছিলেন সেগুলি দেখতে হলে যে স্টেশনে নাবা দরকার সেই স্টেশনে নেবেই মুচুকুন্দ-কুণ্ডেলেশ্বরীর জন্য গাড়ি বদল করতে হয়। সুতরাং অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে সেই স্টেশনে নেবেছিলেন। নেবে নিজের খদ্দরী ঝোলা থেকে কিছু ফলমূল বের করে এবং স্টেশনের নিকটবর্তী দোকানটা থেকে কিছু লুচি ভাজিয়ে নিয়ে আহারটা সমাধা করে নিলেন তিনি প্রথমে। তারপর হাতঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলেন। ট্রেনের জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে এখনও। স্টেশনের দেওয়ালে টাঙানো টাইম-টেবলটা দেখলেন আর একবার। হ্যাঁ, এখনও অনেক দেরি আছে ট্রেনের। স্টেশন-মাস্টারের কাছে গেলেন। তাঁর কাছে নিজের খদ্দরের ঝোলাটি এবং স্যুটকেসটি গচ্ছিত রেখে বেরিয়ে পড়লেন তিনি স্টেশন থেকে। বেশ দ্রুত পদক্ষেপেই বেরিয়ে পড়লেন। অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে আস্তে হাঁটেন না কখনও। ঐতিহাসিক মানুষ তিনি। রাউতপুরের উক্ত প্রাচীন মন্দির ও মূর্তিগুলির কথা তিনিও শুনেছিলেন। এ সুযোগ ত্যাগ করা অনুচিত হবে তাঁর মনে হল। একটু দূর গিয়ে স্থানীয় একটি লোকের সঙ্গে দেখা হল তাঁর। লোকটি তাঁকে সোজা একটি রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে বললে—"এ রাস্তা দিয়ে গেলে ঘুর হবে একটু, মাঠামাঠি গেলে শিগ্‌গির পৌঁছবেন।" অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে মাঠে নেবে পড়লেন।

....মন্দিরের কাছে পৌঁছে হাতঘড়িটার দিকে চাইলেন একবার। তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর একবার হাতঘড়িটা দেখলেন। অবাক হলেন একটু! মোটে তিন মিনিট কাটল।

হঠাৎ তাঁর মনে হল সুবিশাল মন্দিরটা যেন আধুনিকতার সমস্ত হৈ-চৈ হুড়োমুড়িকে অগ্রাহ্য করে অচঞ্চল গাম্ভীর্যসহকারে সময়ের গতিরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে! কথাটা মনে হতেই তাঁর ডানদিকের ভ্রূর শেষ প্রান্তটা তড়াক করে উপরের দিকে উঠে গেল খানিকটা। তারপর সচেতন হলেন তিনি—সময় নষ্ট হচ্ছে—কবিত্ব করে সময় নষ্ট না করে মন্দিরটাকে দেখা উচিত আগে ভাল করে নানা দিক থেকে।

একটু এগিয়ে একটা কোণ ঘুরেই থমকে দাঁড়াতে হল তাঁকে। যা চোখে পড়ল তা অপ্রত্যাশিত। সামনেই একটা মোটর-বাইক স্ট্যান্ডের উপর দাঁড় করানো রয়েছে। তার সামনেই মন্দিরের একটা সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশেই প্রকাণ্ড একটা সুড়ঙ্গ-গোছের, মাটির নীচে চলে গেছে। তার ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকেছেন কে একজন। তাঁর দেহের নিম্নার্ধ—বিশেষ করে পশ্চাদ্‌ভাগটা—দেখা যাচ্ছে কেবল। এই সুযোগে একটা ছোঁড়া পা দিয়ে তার মোটর-বাইকটা ফেলে দেবার চেষ্টা করছে। ব্রজেশ্বরবাবুর বুঝতে দেরি হল না যে মোটর-বাইক ওই ভদ্রলোকের, ছোঁড়াটা দুষ্টুমি করবার চেষ্টায় আছে। বাইকটা পড়ে গেলে জখম হতে পারে। পুরুষকণ্ঠে ধমকে উঠলেন তিনি—"এই—কি হচ্ছে—"

ছোঁড়াটা ছুটে পালাল এবং নানা রকম কসরত করে সুড়ঙ্গ থেকে নিজের দেহকে অতি কষ্টে মুক্ত করে বেরিয়ে এলেন সদারঙ্গবিহারীলাল। হাতে টর্চ।

"কি! বলছেন কি! সুড়ঙ্গের ভিতরেও খানিকটা কারুকার্য আছে কিনা আমি সেইটে দেখছিলাম। মানে, আশা করি অন্যায় হয়নি তাতে কিছু। আপনি কি প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কেউ?"

"না। আমি—"

"এই মন্দিরের কারুকার্য সম্বন্ধে কিছু লেখবার ইচ্ছে আছে আমার। আপনি যদি প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কেউ না হন তাহলে হঠাৎ অমন ধমকে উঠলেন যে! মাথাটা এমন ঠুকে গেছে আমার। উঃ—"

মাথার পিছন দিকে হাত বুলোতে লাগলেন তিনি।

"আমি আপনাকে কিছুই বলিনি। এ মোটর-বাইক কি আপনার?"

"হ্যাঁ, আমারই। কিন্তু এ কথাই বা জিজ্ঞেস করছেন কেন তাও তো বুঝতে পারছি না। আমি এ নিয়ে চটাচটি করতে চাই না, কিন্তু অমন আচম্‌কা চিৎকার করবার সত্যি কি কোনও দরকার ছিল? আমার মোটর-বাইক নিশ্চয় আপনার কোনও ক্ষতি করেনি। আশেপাশে প্রচুর জায়গা রয়েছে, স্বচ্ছন্দে আপনি চলে যেতে পারতেন। কিছু মনে করবেন না, কিন্তু ওখানে মোটর-বাইক আমি কেন রাখতে পাব না তা আমি বুঝতে পারছি না। বিশেষ আপনি প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কেউ নন তখন অমন করে চেঁচাবার—"

"মশাই, আমার কথাটা শুনুন আগে শেষ পর্যন্ত। শুনলে হয়তো আপনার রাগ আর থাকবে না—"

"না না, রাগ আমার হয়নি, রাগের প্রশ্নই উঠছে না। আপনার চিৎকারে এমন চম্‌কে উঠেছি যে মাথাটা ঠুকে গেছে। সুড়ঙ্গের ভিতর সব পাথর কিনা—"

"একটা ছোঁড়া আপনার বাইকটা ফেলে দেবার চেষ্টা করছিল, আমি তাকেই একটা ধমক দিয়েছিলাম"

"ও, তাই নাকি! আরে বাঃ—সো সরি, কিছু মনে করবেন না, মশাই, ক্ষমা করুন, মানে করতেই হবে। ছি ছি, ধারণার অতীত ছিল—ঠিক—মানে, আচম্‌কা মাথা ঠুকে গেলে মানসিক অবস্থা একটু—বুঝতে পারছেন। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ, অসংখ্য।"

এগিয়ে এসে বাইকটা নেড়েচেড়ে দেখলেন একবার। ব্রজেশ্বরবাবু লক্ষ্য করলেন তাঁর দুটি হাতেই প্রচুর কাদামাটি লেগে রয়েছে। গবেষণার ফল সম্ভবতঃ। সদারঙ্গবিহারিলাল ব্রজেশ্বরবাবুর মুখের দিকে চেয়ে ক্ষমাপ্রার্থনাব্যঞ্জক অদ্ভুত রকম ছোট্ট হাসি হাসলেন একটা—যেন হারমোনিয়ামের একটা 'রীড'কে গ্যাঁক করে টিপে দিলে কে একবার। ব্রজেশ্বরবাবু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন কেবল। তাঁর মুখে কোমলতার আভাস ফুটল না।

"আপনার মাথায় চোট লেগেছে অবশ্য, কিন্তু আপনার বাইকটা চোট থেকে বেঁচেছে"

"নিশ্চয়, আর কোনও ক্ষোভ নেই আমার—একদম না। ছোঁড়াটা গেল কোন্ দিকে? ছোঁড়া?"

ব্রজেশ্বরবাবু ঘাড় নাড়লেন।

"এ অঞ্চলের ছোঁড়াছুঁড়ি সব পাজি। আপাদমস্তক। পরশু দিন বাইকটা রাস্তায় রেখে একজনের বাড়িতে গেছি, ইতিমধ্যে একটা ছোট্ট ছুঁড়ি এসে হর্নটা বাজাতে শুরু করেছে। আর একটা গ্যাং বাইকটা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই দে ছুট। হা-হা-হা—"

"এটা ছোঁড়া। আমার ধমক খেয়ে ছুটে পালাল"

"পালিয়ে বুদ্ধিমানের কাজই করেছে"—পাশে ঘন ঝোপটার দিকে চেয়ে সদারঙ্গ বিহারীলাল বললেন। এমনভাবে বললেন, যেন ছোঁড়াটা পাশের ঝোপেই লুকিয়ে আছে এবং তাঁর কথা শুনছে।

"প্রত্নতত্ত্ববিভাগের উচিত এইসব হতভাগ্য ছোঁড়াদের এখানে ঢুকতে না দেওয়া। এখানে গরু চরাচ্ছে, ছাগ চরাচ্ছে—যা তা। একদিন দেখি একটা ছোঁড়া দমাদ্দম কাটি ঠুকছে মন্দিরের গায়ে—একটা চমৎকার বিষ্ণুমূর্তি ছিল সেখানে—বিষ্ণুর কপাল ফেটে চৌচির—দেখবেন? আসুন না। প্রত্নতত্ত্ববিভাগে লেখা উচিত। লিখব ভাবছি। একে ধর্ষণ করলে কিন্তু অন্যায় হয় না। হয়?"

বলা বাহুল্য সদারঙ্গবিহারীলাল একটা আলঙ্কারিক উপমা মাত্র দিয়েছিলেন। এই আগন্তুক ভদ্রলোক কিন্তু যেভাবে সেটা নিলেন তা অপ্রত্যাশিত। রীতিমতো ঘাবড়ে গেলেন সদারঙ্গ-বিহারীলাল। দ্বিতীয়বার যেন তাঁর মাথা ঠুকে গেল।

"হয়"—ব্রজেশ্বরবাবু বললেন—"আপনি যখন প্রশ্ন করলেন তখন আমাকে বলতেই হচ্ছে আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল নেই"

অপ্রস্তুত সদারঙ্গবিহারীলাল সবিস্ময়ে এই খদ্দরপরিহিত ব্যক্তিটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন বার দুই। আশ্চর্য! বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই যে আসলে ইনি এত বড় একটি কালাপাহাড়।

"মিল নেই? সত্যি? প্রত্যাশা করিনি। ভারী আশ্চর্য কিন্তু"

"আপনাদের মতো লোকই কেবল এসব জায়গায় আসতে পারবে, অন্য কেউ পারবে না—এটা খুব যুক্তিযুক্ত মনে হয় না আমার"

"হয় না? আশ্চর্য কাণ্ড! এটা নিশ্চয়ই আপনাকে মানতে হবে, অতীতের এই গৌরবময়

মন্দিরে এমন লোকের প্রবেশ করা উচিত নয় যারা এর মূল্য সম্বন্ধে সচেতন নয় এবং সেইজন্যেই যারা সশ্রদ্ধ নয়, মানে, এককথায় চাষার স্থান এ নয়। চাষারা এখানে এসে যে কি কাণ্ড করে—উঃ, কি-সাংঘাতিক জানেন? কে একজন হারাধন বসাক ছুরি দিয়ে নিজের নাম খোদাই করেছে একটা মূর্তির পেটের উপর। চোয়াড়ের দল সব! স্বচ্ছন্দে সরে থাকলেই পারে। অতীতের প্রতি যাদের শ্রদ্ধাই নেই তাদের এখানে দরকার কি—তারা আসবেই বা কেন! হারাধন বসাকের দল যখন এসবের দফা নিকেশ করে দেবে তখন কি হবে বলুন তো? আর কি ফিরে পাওয়া যাবে? এসব কি বাজারে পাওয়া যায় যে আর একটা কিনে এনে বসিয়ে দিলেই চলবে? আমার মতে এমন কোনও বাজে লোককে এখানে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয় যারা এসবের মর্ম বোঝে না, এসবকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না—"

সদারঙ্গবিহারীলালের কণ্ঠস্বরে উষ্মা যথেষ্ট ছিল, কিন্তু আসলে যে সুর তাতে বাজছিল তার উদ্দেশ্য এই অদ্ভুত প্রকৃতির আগন্তুকটিকে স্বমতে আনয়ন করা।

ব্রজেশ্বরবাবু মন্দিরের ভগ্নস্তূপের দিকে অতিশয় তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন একবার। তারপর পরিষ্কার শান্তকণ্ঠে বললেন, "মাপ করবেন, এইসব চুন-সুরকির স্তূপকে শ্রদ্ধা করতে আমি প্রস্তুত নই।" তিনি আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বললেন না। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে চাইলেন। সদারঙ্গবিহারীলাল নাকের মাঝখানটা চুলকুলেন একবার এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন হঠাৎ। নির্বাক হয়ে গেলেন ক্ষণকালের জন্যে। লোকটা বলে কি!

ব্রজেশ্বর পুনরায় মুখ ফেরালেন এবং নিজের দৃষ্টিকে ধীরে ধীরে পুনঃস্থাপিত করলেন সদারঙ্গবিহারীলালের রশ্মিবিকিরণশীল চশমার উপর। একটা অতি ক্ষীণ হাসি—যা ঠিক হাসি নয়, হাসির আভাস—তাঁর অধরে ফুটি ফুটি করেও যেন ফুটল না।

"না"—নিজের চিন্তাধারাকে বাঙ্ময় করে তিনি যেন বললেন—"এমন সব মন্দির আছে যার গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত কাটতে পারে না কেউ—ধ্বংস করা দূরে থাক্। কিন্তু সে সব মন্দির হাতে-তৈরি চুন-সুরকির মন্দির নয়। বিজ্ঞানের মন্দির, সাহিত্যের মন্দির, যে সব মন্দিরে পূজারীরা জ্ঞানলাভ করে প্রকৃত আনন্দ পান সেই সব মন্দিরই পবিত্র, সেই সব মন্দিরকেই আমি শ্রদ্ধা করি। একটা পচা পুরোনো শিবমন্দির বা বিষ্ণুমন্দির"—ভগ্নস্তূপের দিকে হস্ত প্রসারিত করলেন তিনি—"থাকল বা গেল কি এসে যায় তাতে? একটা হাত-পা-ভাঙা মূর্তির চেয়ে জীবন্ত হারাধন বসাক ঢের বেশি শ্রদ্ধেয় আমার চোখে"

সদারঙ্গবিহারীলাল ঈষৎ ব্যায়ত-আননে দাঁড়িয়ে রইলেন, কোন জবাব দিলেন না। অদ্ভুত লোক! আর একবার কৌতূহলভরে আড়চোখে চেয়ে দেখলেন দীর্ঘাকৃতি লোকটির দিকে। এদেরেই কি গোঁয়ার-গোবিন্দ বলে? অসম্ভব নয়। সরু লম্বা মুখখানা। মনে হল ছেলেবেলায় সমস্ত মুখখানা ধরে লেবুর মতো নিংড়ে দিয়েছে কেউ যেন। ছুঁচলো থুতনিটাতে ফুটে উঠেছে ভদ্রলোকের চরিত্র—ঠিক দৃঢ়তা নয়—একগুঁয়েমি। চোখ দুটি কিন্তু ঠিক উলটো। আশ্চর্য! যদিও বসা কিন্তু চোখে একগুঁয়েমি বা রুক্ষতার কোন চিহ্ন নেই। বরং দৃষ্টি থেকে যা ক্ষরিত হচ্ছে তা স্নিগ্ধ। সদারঙ্গবিহারীলাল এও লক্ষ্য করলেন ভদ্রলোক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন খুব। খদ্দরের জামাকাপড় ধপধপ করছে। পোশাকে আড়ম্বর নেই, কিন্তু মার্জিত রুচির পরিচয় আছে। এঁকে দেখে তো মনে হয় না যে ইনি কোনও মূর্তি নষ্ট করতে পারেন বা কোনও

অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের গবেষণায় বাধা দিতে পারেন। মোটেই মনে হয় না। অথচ কথাবার্তা থেকে—! আশ্চর্য!

এ কথাটা ব্রজেশ্বরবাবুরও মনে হল সম্ভবতঃ। কারণ এর পরই তিনি যা বললেন তার সুর অন্যরকম। বেশ নরমই—অনেকটা ক্ষমাপ্রার্থনার মতো শোনাল।

"আমার মতামত তা বলে জোর করে চাপাতে চাই না আপনার ঘাড়ে। প্রত্যেকেরই নিজের মত পোষণ করবার অধিকার আছে"

"তা আছে বই কি! বাঃ। ভাল লাগল এ কথাটা—" চশমাটা ঠিক করে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন সদারঙ্গবিহারীলাল হাস্যোদ্ভাসিত মুখে।

ব্রজেশ্বরবাবু বললেন, "খাপছাড়া ভাবে আমার অভিমতটা শুনে আপনার একটু বেখাপ্পা ঠেকছে বোধ হয়। একটু হকচকিয়ে গেছেন মনে হচ্ছে। যদি আপত্তি না থাকে আপনাকে একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলি।"

"আপত্তি ? মোটেই না, ভারি ইন্‌টারেস্টিং বরং—"

"আপনার কি ধর্মবাই আছে? কারণ ও ব্যাধি আক্রমণ করেছে যাঁকে, তাঁর কাছে যুক্তির অবতারণা করা বৃথা। তিনি চাইবেন সকলে তাঁর প্রলাপকে যুক্তিযুক্ত বলে মেনে নিক"

সদারঙ্গবিহারীলালের হাসি আকর্ণবিস্তৃত হয়ে উঠল।

"বিপক্ষের যুক্তিকে সবাই প্রলাপ বলে প্রতিপন্ন করতে চায়। সে কথা যাক্। আপনি কি বলতে চাইছেন বলুন না। বেশ লাগছে"

"দেখুন"—ধীরে ধীরে শুরু করলেন ব্রজেশ্বরবাবু—"যে আধ্যাত্মিকতা, অর্থাৎ যে সূক্ষ্ম আত্মোপলব্ধি প্রত্যেক ধর্মেরই মূল কথা, তার সঙ্গে এই পাথরের স্তূপের সম্পর্ক নির্ণয় করা একটু কঠিন নয় কি? ধর্মটা হল আত্মিক ব্যাপার—আর এগুলো—পাথরের শিবলিঙ্গই হোক বা সোনার ষাঁড়ই হোক—হাতে-তৈরি স্থূল ব্যাপার—"

"এক মিনিট"—সোৎসাহে বলে উঠলেন সদারঙ্গবিহারী—"থামুন—বাঃ, চমৎকার জমবে মনে হচ্ছে। কিন্তু গোড়াতেই একটা কথা জিগ্যেস করে নিই। আপনার এবং আমার ধর্মমত কি এক"

"হওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না"

"ব্রাহ্ম না কি আপনি"

ব্রজেশ্বর ঘাড় নাড়লেন।

সদারঙ্গবাবু তাঁর মুখের দিকে ক্ষণকাল নির্নিমেষে চেয়ে থেকে আবার যেন সঞ্জীবিত হয়ে উঠলেন।

"তা হোক। হিন্দু বলে পরিচয় দেন নিশ্চয় নিজেকে"

"নিশ্চয়"

"ভারতীয় বলেও"

"অবশ্য"

"তাহলে, মানে, শুনুন আপনার কাছ থেকেও এরকম আচরণ তো প্রত্যাশা করা যায় না। সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতার তর্ক তুলব না—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পড়ে দেখুন গিয়ে—তুললে অনেক সময় নষ্ট হবে। আমি শুধু এই কথা বলছি যে একটা প্রত্যাশা করা যায় না আপনার কাছ

থেকেও যে হিন্দু হয়ে আপনি হিন্দুত্বের গায়ে কাদা ছিটিয়ে বেড়াবেন, ভারতীয় হয়ে ভারতের গৌরব সম্বন্ধে উদাসীন থাকবেন। হারাধন বসাককে আপনি অল্‌রেডি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখছেন, যে ছোঁড়াটা আমার বাইক ফেলে দেবার চেষ্টা করছিল তাকেও দলে টানবেন নাকি!"

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সদারঙ্গবিহারীলালের মুখ। চোখ দুটো বুজে গেল।

ব্রজেশ্বরবাবু উত্তর দিলেন, 'টানতে আপত্তি নেই। আমি যদি বুঝতে পারতাম যে আপনি ওই সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুকে ভারতীয় হিন্দুত্বের পরিচয় দেবার চেষ্টা করছেন, তাহলে মৃদু প্রতিবাদস্বরূপ আমি নিজেই হয়তো আপনার সাইকেলকে লাথি মেরে ফেলে দিতাম"

"দিতেন? বাঃ, চমৎকার তো! ব্যাপার কি বলুন দেখি! আপনার মনোভাবটা বুঝতে পারছি না ঠিক"

"সংক্ষেপে তা হচ্ছে এই। আপনি যখন একটা ভাঙা কার্নিশ বা অন্ধকার সুড়ঙ্গ নিয়ে আপনার হিন্দুশক্তি ব্যয় করেন, তখন ভেবে দেখেন না যে আরও কত দরকারি কর্তব্য অকৃত রয়েছে। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, পাপের বিরুদ্ধে, তামসিকতার বিরুদ্ধে কত যুদ্ধ করতে হবে—"

"ঠিক। এসব তো জানিই—বাঃ"—উচ্ছ্বসিত হয়ে উর্দু কথা বলে ফেললেন সদারঙ্গ—"ওসবের বিরুদ্ধেই তো আমারও জেহাদ। আমিও যোদ্ধা একজন, পলাতক নই, রোজ যুদ্ধ করছি। কিন্তু এটা হচ্ছে বিশ্রাম—অবসর-বিনোদন—ইংরেজিতে যাকে 'রিল্যাক্‌সেশন' বলে"

"কিন্তু আপনার এই অবসর-বিনোদন দেশের অনিষ্ট করছে তা জানেন? যা আপনি মুগ্ধনেত্রে দেখছেন তা-ই প্রেরণা জোগাচ্ছে আপনার শত্রুপক্ষকে—সেই শত্রুপক্ষকে যারা কুসংস্কারের বেড়াজালে ঘিরে, ধর্মের ভয় দেখিয়ে, নানারকম আইন অজুহাত খাড়া করে লক্ষ লক্ষ লোকের শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলছে। তাদের সংস্কার-ধর্ম আইনও এই ধ্বংসস্তূপের মতো সেকেলে, কিন্তু একটু তফাৎ আছে—ধ্বংসস্তূপের মতো নিষ্ক্রিয় নয় সেগুলো, কারাগারের মতো ভীষণ। ভেবে দেখেছেন এসব কথা কখনও?"

সদারঙ্গবিহারীলাল কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু ব্রজেশ্বরবাবু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে উচ্চতর কণ্ঠে বললেন, "আপনারা অতীত-অতীত বলে লাফিয়ে বেড়ান, কিন্তু ইতিহাস উল্টে দেখুন অতীতে আনন্দজনক তেমন কিছু নেই। ডাকাতদের লোমহর্ষণ কাহিনী কেবল। আমার মতে অতীতের অধিকাংশই পুঁছে ফেলার উচিত, উপড়ে ফেলা উচিত, বর্তমানের জীবনযাত্রায় অতীতের ছায়াপাত অসহ্য। অতীতের যেটুকু শ্রদ্ধেয় তার কথা আগেই বলেছি—সাহিত্য আর বিজ্ঞান। এইসব ইঁটের টুকরো, সুরকির গুঁড়ো, প্রথার হুমকি, কুসংস্কারের দাসত্ব—এরা প্রাণহীন মৃত এবং সেইজন্যই অনিষ্টকর। এদের ঝেঁটিয়ে পুড়িয়ে ফেলে দিলে তবে আমাদের বর্তমান জীবন হালকা ঝরঝরে হবে"

"সর্বনাশ! আপনি কি সোশালিস্ট?"

"নিশ্চয়। যদিও এই লেবেল গায়ে এঁটে দেশের সর্বনাশ করে বেড়াচ্ছেন অনেকে"

"অ্যাঁ? আপনার চেয়েও বেশি ঝাঁঝালো সোশালিস্ট আছে নাকি! ও বাবা।"

মৃদু হাসি ফুটে উঠল ব্রজেশ্বরের মুখে। চোখ দু'টো মিটমিট করতে লাগল।

"কোন বিষয়েই বেশি ঝাঁঝ আমি ভাল মনে করি না। আমি—"

কি একটা বলতে গিয়ে ইতস্ততঃ করে থেমে গেলেন তিনি। নিজের কথা বলতে সঙ্কোচ হল বোধ হয়।

"কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা বলতে লোভ হচ্ছে"

"কি বলুন"

"প্রগতিশীল নামে আজকাল একটা যে দল হয়েছে আপনাকে সেই দলে ফেলতে ইচ্ছে করছে আমার। ভুল করলাম বোধ হয়, না?"

"না, মারাত্মক ভুল হয়নি। তবে এটাও ঠিক, তেমন প্রগতি হয়নি আমার। বেশি প্রগতি বরদাস্তই হয় না। কাজ করার চেয়ে হাততালির লোভ যাঁদের বেশি তাঁদেরই প্রগতি হু হু করে বেড়ে যায়। হাঁপিয়েও পড়েন তাঁরা চট করে। পেছিয়ে যান শেষে—প্রগতি পশ্চাৎগতি হয়ে দাঁড়ায় শেষটা। সত্যি যারা কর্মী তারা হুড়োহুড়ি করে এগিয়ে যেতে চায় না, পেছিয়েও পড়ে না। আমি কোনটাই করিনি।"

"ও। যাক্, আপনাকে দেখে খুশি হয়েছি খুব। মানে, খুব। আমি রাজনৈতিক কর্মী নই—সে যোগ্যতাই নেই সম্ভবতঃ আমার। কিন্তু রাজনীতি বিষয়ে কৌতূহল আছে—ভীষণ। আমি আমার ভাঙা তক্তাপোশের উপর বসেই রাজাউজির লাটবেলাট গান্ধি জহরলাল সব্বাইকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছি হরদম!"

সদারঙ্গবিহারীলালের হাসি আকর্ণবিশ্রান্ত হয়ে উঠল আবার।

"আমার মতামত কিন্তু সেকেলে—নিতান্ত সেকেলে। আমি আভিজাত্যকে শ্রদ্ধা করি, ঠাকুর দেবতা মানি, অতীতকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবার পক্ষপাতী নই—কুসংস্কারাচ্ছন্নই বলতে পারেন—হা-হা-হা—। আপনাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি, ভারি আনন্দ হচ্ছে, মনে হচ্ছে তর্কটা বেশ জমবে। কিন্তু তর্ক করবার আপনার সময় নেই হয়তো--"

"দেখুন"—একটু ইতস্ততঃ করে লঘু হাস্যসহকারে ব্রজেশ্বরবাবু বললেন—"আমি আমার মতামত জোর করে কারও ঘাড়ে চাপাতে চাই না। এর পর এ-ও আপনি যেন না মনে করেন যে আমি লোক দেখলেই তাড়া করে তার সঙ্গে তর্ক করি। মোটেই তা নয়। ঘটনাচক্রে এটা হয়ে গেল—"

"না—না—বাঃ মোটেই না"—উচ্ছ্বসিত উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করলেন সদারঙ্গবিহারীলাল—"আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়াতে বাস্তবিকই খুশি হয়েছি আমি। বাস্তবিক বলছি। অত্যন্ত। কাউকে স্বমতে আনবার চেষ্টা করা বাতুলতা, তা জানি, কিন্তু আলোচনা করে একটা সুখ আছে, কি বলেন, অপ্রিয় হলেও বেশ লাগে। অনেকটা ঝাল খাওয়ার মতো, নয়? শিক্ষাও হয়, অনেক সময়। আলো কখন কোন্ ফাঁক দিয়ে এসে পড়ে কে বলতে পারে। তাছাড়া আমরা পাড়াগাঁয়ে থাকি। প্রগতিশীল লোকের নাগাল পাই না তো বড় একটা। তাঁরা কি ভাবেন তা জানবার খুব আগ্রহ আমার। প্রচণ্ড। কাগজে যা পড়ি তাতে তৃপ্তি হয় না, মনে হয় ভেজাল আছে। আজকাল ঘি থেকে আরম্ভ করে খবর পর্যন্ত সব ভেজাল—হা—হা—হা—"

"এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে মতদ্বৈধ নেই আমার। আসল প্রগতিশীলদের মতবাদ শুনতে পান না আপনারা। যাঁরা প্রকৃত প্রগতিশীল তাঁরা কর্মে আস্থাবান, বাক্যে নয়। তাই তাঁদের কথা শুনতে পান না। কিন্তু এটা জেনে রাখুন সত্যিকার প্রগতিশীল আছেন এবং থাকবেনও চিরকাল"

"বাঃ, চমৎকার!"

সদারঙ্গবিহারীলাল উত্তেজনাভরে চশমাটা খুলে পরলেন আবার। হঠাৎ একটা কথা মনে

পড়ে গেল তাঁর। একটা মোক্ষম কুঠার তো আছে তাঁর হাতে। হ্যাঁ, ঠিক তো। কোপটি মারবার জন্যে প্রস্তুত হলেন পরমুহূর্তেই।

"আপনি আশা করি দক্ষিণপন্থীদেরই প্রগতিশীল বললেন"

"নিশ্চয়ই"

"আপনি বোধ হয় একটা কথা জানেন না যে দক্ষিণপন্থীরা আসলে সুবিধাপন্থী—যেদিকে ছাঁট সেইদিকে ছাতা—এই হল তাঁদের মন্ত্র"

"কে বললে আপনাকে এ কথা!"

"দেখুন আপনাদের জন্যে দুঃখ হয় আমার"— বলে চললেন সদারঙ্গবিহারীলাল—"সত্যি দুঃখ হয়। আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো সাঁচ্চা লোক, কিন্তু আপনাদের নেতারা যে ক্রমাগত আপনাদের ধাপ্পা দিয়ে চলেছেন এ খবরই রাখেন না আপনারা, রাখা সম্ভবও নয়, কাগজে তো এসব খবর বেরোয় না—"

"আপনি জানলেন কি করে! নেতাদের মধ্যে যে এত গলদ আছে আমি তা ঘুণাক্ষরে জানি না তো"

"জানবার কথাও নয়"—ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মুচকি হেসে খুব মুরুব্বিয়ানা সহকারে বললেন সদারঙ্গবিহারীলাল—"আমি এত জোর করে বলতে পারছি কারণ মুরগীর ঠিক পেটের তলা থেকেই ডিমটি পেয়ে গেছি কিনা। পেয়ে যাবার সুযোগ হয়ে গেল হঠাৎ। আমার এক দক্ষিণপন্থী বন্ধুর সঙ্গেই কথা হচ্ছিল; তিনি নিজে একজন নামজাদা দক্ষিণপন্থী, তিনি নিজে আমাকে বললেন—দলকে দল তাঁরা ছাতা ঘাড়ে করে ওৎ পেতে বসে আছেন, যেদিকে ছাঁট আসবে সেইদিকে ছাতা খুলবেন বলে।"

"বলেন কি!—সবিস্ময়ে বলে উঠলেন ব্রজেশ্বর দে— "আমি তো কিচ্ছু জানি না। দক্ষিণপন্থীদের ভিতরের খবর আমিও রাখি কিছু কিছু। এরকম কথা তো কখনও শুনিনি। আপনার এই বন্ধুটির নাম জিগ্যেস করতে পারি কি?"

"না, মাপ করবেন নামটা বলা ঠিক হবে না। ক্ষতি হতে পারে তাঁর। আপনি যদি কাউন্সিলার হতেন তাহলে বুঝতে পারতেন হয়তো, মানে—"

"ও কথা যখন তুললেন তখন আমাকে পরিচয় দিতেই হচ্ছে। আমিও একজন কাউন্সিলার।"

"ও"

নির্বাক বিস্ময়ে একটু মুখ ফাঁক করে চেয়ে রইলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"দক্ষিণপন্থী?"

"হ্যাঁ"

"ও বাবা, তাহলে এ নিয়ে বেশি কথা বলা উচিত হবে না আর"

"যতটা বলেছেন ততটা বলাও কি উচিত ছিল?"

"তার মানে?"

"রাগ করবেন না, কিন্তু এটা কি আপনার ভাবা উচিত ছিল না যে আপনার বন্ধুর এই খবরটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন হতে পারে"

"তিনি সাধারণ লোক হলে তাই ভাবতাম। কিন্তু তিনি একজন নামজাদা ব্যক্তি। তিনি নিজের মুখে বললেন আমি শুনলাম। স্বকর্ণে। এতে অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠতেই পারে না"

"আপনার কথা বিশ্বাস করলে এই কথাই আমাকে তাহলে বলতে হয় যে তিনি আপনার বন্ধু হতে পারেন, কিন্তু পার্টির বন্ধু নন"

"আসল কথা বোধ হয়"—বলে উঠলেন সদারঙ্গবিহারীলাল—"অনেকের চেয়ে আপনি একটু বেশি গোঁড়া। যাঁর কথা আমি বলছি, তাঁর সঙ্গে অবশ্য এই আমার প্রথম আলাপ হল। কাল রাত্রে। যদিও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বহুদিন আগে থাকতেই আলাপ ছিল। তিনি সস্ত্রীক এইখানে একটা হোটেলে রাত কাটাচ্ছিলেন কাল। আমি হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলাম সেখানে। তাঁর স্ত্রী-ই আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। চমৎকার লোক, ভারি মনখোলা, দেমাক-অহঙ্কার কিছুই নেই। ঢাকঢাক গুড়গুড়ও নেই—খাসা! অবশ্য তিনি এ কথাও বললেন যে প্রকাশ্যে তিনি এসব কথা স্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু তাঁর কথাবার্তা থেকে যতটুকু বুঝলাম—পার্টির অধিকাংশ লোকেরই উপর আস্থা নেই তাঁর"

"ও বুঝেছি"—ব্রজেশ্বরবাবুর একটা কথা যেন মনে পড়ে গেল—"বুঝেছি। আপনাকে আর বলতে হবে না। আপনি যাঁর কথা বলছেন তিনি শিগ্‌গিরই বোধ হয় রিজাইন করবেন"

"কই সে কথা তো কিছু বললেন না"—সদারঙ্গবিহারীলালের কণ্ঠস্বরে বিস্ময় এবং ক্ষোভ দুই-ই ফুটে উঠল—"আশ্চর্য তো! তাঁর স্ত্রী অন্ততঃ নিশ্চয় বলতেন আমাকে ও কথাটা। বলা উচিত ছিল"

"আপনি মৃন্ময় ঘোষালের কথা বলছেন তো"

"না। আচ্ছা, বলছি আপনাকে তাহলে নামটা, কিন্তু দেখবেন যেন কথাটা বেশি চাউর না হয়। অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে"

ব্রজেশ্বর দের হাতে একটা লাঠি ছিল। তিনি দু'হাত দিয়ে লাঠির মাথাটা চেপে ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন একটু। তারপর সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন আবার। তাঁর গম্ভীর মুখে শাণিত ইস্পাতের দীপ্তি যেন চকমক করে উঠল, চোখের দৃষ্টিতে খেলে গেল ব্যঙ্গের বিদ্যুৎ। একটু হেসে তিনি বললেন, "কেউ আপনাকে ঠকিয়ে গেছে। এটা আমি নিশ্চিত জানি যে অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে—যিনি কাউন্সিলার—কাল রাত্রে তিনি এ অঞ্চলে ছিলেন না, থাকতে পারেন না"

"আরে, কি যে বলেন মশাই আপনি! জলজ্যান্ত আমি তাঁকে দেখলাম স্বচক্ষে, ওকথা বললে শুনব কেন আমি তাঁদের দু'জনকে—"

"সে ভদ্রলোক কেন নিজেকে ব্রজেশ্বর দে বলে পরিচয় দিয়েছেন তা জানি না, কিন্তু এটা আমি ঠিক জানি কাল রাত্রে ব্রজেশ্বর দে কোলকাতায় ছিলেন"

"কোলকাতায় ছিলেন? বললেই মানব? মানতেই পারি না এ কথা"—সদারঙ্গ বিহারীলালের কণ্ঠস্বরে উষ্মার উত্তাপ ফুটে উঠল একটু—"আমি আপনাকে গোড়াতেই বলেছি যে ভদ্রলোক সস্ত্রীক ছিলেন। তাঁর স্ত্রীকে আমি চিনি বহুকাল থেকে—তিনি যখন সান্ত্বনা পাল ছিলেন তখন থেকে। একটা নাইট-স্কুলে পড়াতেন বউবাজারে। আমি এম-এ দিচ্ছি যেবার সেইবারেই আলাপ—"

"এসব ঠিকই বলছেন। নাইট-স্কুলে মাস্টারি করবার সময়ই তাঁর বিয়ে হয় ব্রজেশ্বর দের সঙ্গে—"

"আপনিও তো জানেন তাহলে। ওই সান্ত্বনা দেবীই কাল রাত্রে তাঁর স্বামীর সঙ্গে

ফাৎনাফিরিঙ্গিপুরে হরিমটর পান্থনিবাসে ছিলেন। তাঁর স্বামীর সঙ্গে ইতিপূর্বে আলাপ হয়নি, কারণ বিয়ের সময় যেতে পারিনি আমি। শুনলাম তাঁরা মোটরে করে কোলকাতা থেকে আসছিলেন। কিন্তু রাস্তায় মোটর বিগড়ে যাওয়াতে রাত্রে তাঁদের আশ্রয় নিতে হয়েছিল গোঁসাইজির হোটেলে। আজ সকালে তাঁরা মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরী গেলেন রায়বাহাদুর দিগ্বিজয় সিংহরায়ের বাড়িতে। দেখুন, এত কথা জানি আমি"

বিজয়গর্বে চাইলেন তিনি ব্রজেশ্বরবাবুর দিকে। ভদ্রলোকের কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব দেখে নিজের বিজয় সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না তাঁর।

ব্রজেশ্বরবাবুর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে গেল ক্রমশঃ। চোখ দুটোও ছোট হয়ে এল। মনে হল মনে মনে হিসেব করছেন তিনি যেন কিছু।

প্রতিপক্ষকে কবলে পেয়ে নিরস্ত হবার লোক সদারঙ্গবিহারীলাল নন। রাজনৈতিক তর্ক-দ্বন্দ্বে তিনি একজন দক্ষিণপন্থীকে কাবু করে ফেলেছেন, ভাঁওতা দেবার চেষ্টা করে লোকটা হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে, এই উপভোগ্য অনুভূতিটা সঞ্চারত হচ্ছিল তাঁর দেশের শিরায় উপশিরায়।

বক্তব্যটা আরও জোরালো করবার জন্যে তিনি আবার বললেন, "আপনি বলছেন আপনি সান্ত্বনা দেবীকে জানেন। কিন্তু আমি যতটা জানি ততটা যদি আপনার জানা থাকে—তাহলে এটা আপনি নিশ্চয়ই মানবেন যে পরপুরুষকে নিজের স্বামী বলে চালাবার চেষ্টা আর যে-ই করুক, তিনি করবেন না, করতে পারেন না। আন্‌থিঙ্কেব্‌ল্‌"

"তা ঠিক। তাঁর সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই আমার"

"শুনে সুখী হলাম। তাঁর সম্বন্ধে আমার ধারণা খুবই উচ্চ। খুবই। একবার তাঁর বদনাম রটেছিল অবশ্য, কিন্তু সে-সব বাজে রটনা। মূলে ছিল বোধ হয় ঈর্ষা। সে এক যাচ্ছেতাই কাণ্ড। এইসব বখেড়ায় পড়ে ভদ্রমহিলা প্রায় সন্ন্যাসী হয়ে যাবার মতো হয়েছিলেন—কারও সঙ্গে মিশতেন না পর্যন্ত—একদিন গিয়ে দেখি 'পিল্‌গ্রিম্‌স্‌ প্রগ্রেস' পড়ছেন—গোপনে গোপনে জনহিতকর কাজ করে বেড়াতেন ক্রমাগত। এই সময়ে আমি কোলকাতা থেকে চলে আসি। তারপর 'ফরচুনেট্‌লি' ব্রজেশ্বরবাবুর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল তাঁর। ওয়ান্ডর্‌ফুল লোক। আশ্চর্যরকম ভাল লাগল কাল। গুজব শুনেছিলাম লোকটা গাধাগোছের, কিন্তু দেখলাম, না, তা নয়. দামী কাকাতুয়া—মানে, জানোয়ারের উপমা যদি দিতে হয়"

আবার আকর্ণ হাসি হাসলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

আসল ব্রজেশ্বরবাবু ছড়ি দিয়ে নিজের জুতোর ডগায় টোকা মারলেন দু-একবার অধীরভাবে। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলেন চারদিকে। মনে হল ভদ্রলোক যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন।

সদারঙ্গবিহারীলালের কিন্তু আনন্দের সীমা ছিল না। তাঁর মনে হচ্ছিল ভদ্রলোককে নিয়ে এখন যা খুশি করা যায়।

"আমি যা বললাম তাতে যদি আপনার সন্দেহ না ঘোচে তাহলে আমি আরও বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারি"—বলতে লাগলেন সদারঙ্গবিহারীলাল—"ওঁরা কাল রাত্রে ফাৎনাফিরিঙ্গিপুরে যে হরিমটর পান্থনিবাসে ছিলেন আপনি সেখানে খোঁজ করতে পারেন ইচ্ছে করলে। এখান থেকে বেশি দূর নয়। সেখানে অনেক কিছু ঘটেছিল কাল ওঁদের কেন্দ্র করে। রাতদুপুরে

ব্রজেশ্বরবাবুকে বিছানা ছেড়ে উঠতে হয়েছিল তাঁদের কুকুরটাকে খুলে দেবার জন্যে। কুকুরটা গোয়ালঘরে বাঁধা ছিল। কাঁদছিল খুব। খুলে দেবামাত্র কুকুরটা অন্ধকারে কোথা সরে পড়ল। রাত্রে তো পেলেনই না, সকালেও পাওয়া গেল না। একটু আগে আমি সেটাকে পেলাম রাস্তায়, নিয়ে গিয়ে দিয়েও এসেছি তাঁদের। হিন্দু পান্থনিবাসের মালিক গোঁসাইজি রাত্রে অদ্ভুত শব্দ শুনে উঠে পড়েছিলেন—শব্দটা সম্ভবতঃ কুকুরটাই করেছিল—শব্দ শুনে উঠে তিনি ব্রজেশ্বরবাবুদের ঘরে যান। গিয়ে দেখেন ওঁরা দুজন পাশাপাশি শুয়ে ঘুমুচ্ছেন। আপনি যখন সান্ত্বনা দেবীকে জানেন বলছেন, তখন এর বেশি বলা নিষ্প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, মনে হচ্ছে ব্রজেশ্বরবাবুকেও আপনি আমার চেয়ে ভাল করে চেনেন। সুতরাং—"

একটু হেসে নিজের বাইসিক্‌লের দিকে অগ্রসর হলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

বিস্ফারিতচক্ষে চেয়ে রইলেন ব্রজেশ্বরবাবু। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে যে অমায়িকতা ছিল এতক্ষণ, তা যেন উপে গেল। ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন তিনি। তাঁর গম্ভীর মুখমণ্ডলে ক্রোধের কোনও চিহ্ন ফুটে উঠল না। বরং মুখের উপর ক্ষীণ হাসির একটা আভাস ফুটেই মিলিয়ে গেল। মনে হল যেন তাঁর জটিল মনে কৌতুকজনক কিছু একটা জেগেছে। সদারঙ্গবিহারীলালের মনোযোগ পুনরায় আকর্ষণ করবার জন্যে তিনি হাতটা একবার তুললেন; কিন্তু তুলেই থেমে গেলেন এবং ধীরে ধীরে আবার চেপে ধরলেন লাঠির মাথাটা। সদারঙ্গ বিহারীলাল ঝুঁকে বেঁকে উবু হয়ে হেঁট হয়ে নানাভাবে তাঁর বাইকটি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তাঁর দিকে নীরবে চেয়ে রইলেন ব্রজেশ্বরবাবু—লোকে যেমন নিস্পৃহভাবে তীরে দাঁড়িয়ে ভাসমান পালতোলা নৌকোর দিকে চেয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠলেন।

"এইবার চলি তাহলে—"

"ও, চললেন, আচ্ছা"—ঘাড় ফিরিয়ে হেসে সদারঙ্গ বললেন—"আমরা পাঁয়তাড়াই করলুম অনেকক্ষণ ধরে, আসল তর্কটা আর হল না"

ব্রজেশ্বর মুচকি হাসলেন এবং ছড়ি ঘুরিয়ে অগ্রসর হলেন স্টেশনের দিকে।

"দেখবেন মশায়"—দুষ্টুমিভরা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন সদারঙ্গবিহারী—"ব্রজেশ্বরবাবুর সঙ্গে যদি দেখা হয় এসব বলবেন না যেন। আর দেখুন পলিটিকস্‌কে অত সিরিয়াস্‌লি নেবেন না, কেউ নেয় না। আচ্ছা, নমস্কার"

"নমস্কার"

ব্রজেশ্বরবাবু এগিয়ে গেলেন এবং স্বগতোক্তি করলেন—"স্বপ্ন দেখছি নাকি!" তারপর সোজা হন হন করে এগিয়ে গেলেন স্টেশনের দিকে। গিয়েই পেয়ে গেলেন একটা ট্যাক্সি। আর কালবিলম্ব না করে স্টেশন থেকে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সদারঙ্গবিহারীলালও হাজির হলেন স্টেশনে এবং ট্যাক্সি-আরূঢ় ব্রজেশ্বরকে দেখতে পেলেন। ট্যাক্সিটা তাঁর চেনা ট্যাক্সি। এ অঞ্চলের সমস্ত ট্যাক্সিওলাই তাঁর চেনা। কৌতূহল হল। কে ভদ্রলোকটি? কাউন্সিলার? গেলেন কোথায়? খোঁজ করতেই যে কুলিটা তাঁর জিনিসপত্র ট্যাক্সিতে তুলে দিয়েছিলেন সে বলল—"নাম ঠিক জানি না বাবু"

"গেলেন কোথায়"

"ট্যাক্সিওলাকে তো বললেন ফাৎনাফিরিঙ্গিপুর যেতে"

"ফাৎনাফিরিঙ্গিপুর?"

"আজ্ঞে! তাই তো শুনলাম"

নিপুণভাবে একটি বিড়ি ধরিয়ে কুলিটি চলে গেল।

"ফাৎনাফিরিঙ্গিপুরে কী প্রয়োজন থাকতে পারে ভদ্রলোকের। অদ্ভুত ঠেকছে তো। মতলব কি ওঁর!"

সদারঙ্গবিহারীলাল পুনরায় আরোহণ করলেন তাঁর মোটরবাইকে। স্টার্ট করতেই পিস্তলের মতো আওয়াজ হল গোটা দুই। কুণ্ডলীকৃত হয়ে একটা কুকুর কাছেই নিদ্রাসুখ উপভোগ করছিল। চম্‌কে উঠে পালাল সে। সদারঙ্গবিহারীলাল এই অদ্ভুত প্রকৃতির কংগ্রেসকর্মীটির পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

।। আঠারো ।।

ছিপছররামারি সন্নিহিত সেই পোস্টাপিসে সুশোভন হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল পুনরায়। দেখে মনে হল যেন ডাকাতে তাড়া করেছে তাকে। পোস্টমাস্টার তার দিকে এক নজর চেয়ে যখন তাকে সেই তার্কিক মেয়েটির এবং গুঁফো ড্রাইভারটির সঙ্গী বলে চিনতে পারলেন তখন তাঁর মনোভাব বেশ একটু উষ্ণ হয়ে উঠল। মুখে কিছু বললেন না বটে, কিন্তু চোখের কোণে আগুনের ঝলক দেখা গেল।

"কোলকাতায় আমি এক্ষুনি একটা ফোন করতে চাই। কোলকাতা পেতে সাধারণতঃ কত দেরি হয় বলুন তো--

পোস্টমাস্টার যে আড়ময়লা খাতাটির মধ্যে টিকিট রাখেন সেটি তুলে টেবিলের ড্রয়ারে ঢোকালেন। ড্রয়ারটা বন্ধ করতে গিয়ে আটকে গেল সেটা, টানাটানি করে আবার খুললেন, আবার ঢোকাবার চেষ্টা করলেন, আবার আটকে গেল। আবার টানাটানি করে খুললেন। সম্পূর্ণ ড্রয়ারটাই বার করে ফেললেন এবার। ড্রয়ারের ভিতরের প্রত্যেকটি জিনিস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখলেন, গোছালেন, তারপর টেবিলের যে ফাঁকে ড্রয়ারটা বসানো ছিল সেখানে ফুঁ দিলেন বারকয়েক। তারপর ড্রয়ারটাকে ঢোকাবার চেষ্টা করলেন। কয়েকবার চেষ্টা করে সফলকাম হলেন অবশেষে। ঝড়াস করে ড্রয়ারটা ঢুকে বসে গেল স্বস্থানে। আবার টেনে দেখলেন 'জাম্' হয়ে গেল কিনা। জাম্ হয়েছে। আবার টেনে বার করলেন, আবার ঢোকালেন, আবার টানলেন। বেশ সড়গড় হয়ে যাবার পর টিকিটের খাতাটি পুনরায় বার করে টেবিলের উপর রাখলেন তারপর চোখের কোণ থেকে আর এক ঝলক উষ্ণতা বিকিরণ করে চাইলেন সুশোভনের দিকে।

"দেরি?"

"হ্যাঁ, কোলকাতা পেতে কত দেরি হয় সাধারণতঃ"

"কি ভাবে পেতে চান?"

"ফোনে, মশাই। তাছাড়া আর কি ভাবে পাব? আপনি কি ভাবছেন আমি এখান থেকে সুড়ঙ্গ কেটে কোলকাতা যেতে চাইছি? দোহাই আপনার, দাঁড় করিয়ে রাখবেন না আমাকে, আমার তাড়া আছে—

পোস্টমাস্টার টিকিটের খাতাখানি ঘুরিয়ে অন্যভাবে রাখলেন আবার।

"ফোনে কোলকাতা কতক্ষণ লাগে বলছেন?"

"হ্যাঁ মশাই। এই সোজা কথাটা আপনার বুঝতে এত দেরি হচ্ছে?"

"বুঝেছি। ঢুকেছে মাথায়, কিন্তু কি জবাব্ দেব তাই ভাবছি। কত দেরি হয় তা কি বলা হয়? কখনও সাঁৎ করে চলে যায়, আবার কখনও যুগযুগান্তর কাটে—। কত দেরি হবে তা কি বলা যায় ঠিক?—যায় না। অথচ প্রত্যেকেই এসে ওই এক কথা জানতে চাইবে। আমার যদি জানাবার সামর্থ্যই থাকবে—"

আর অধিক বিতণ্ডায় লিপ্ত না হয়ে সুশোভন এগিয়ে গিয়ে ফোনটা তুলে নিলে। ভয়ানক দুশ্চিন্তা হচ্ছিল তার। তার নিজের গাফিলতির জন্যে অনীতা বেচারী হয়তো কত কষ্ট পাচ্ছে, এই চিন্তাটা পাগল করে তুলেছিল তাকে। অনীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে যে-সব সম্ভাব্য দুর্গতি তার কপালে নাচছে সে কথা মনেই হচ্ছিল না তার। অনীতা হয়তো তার একটি কথাও বিশ্বাস করবে না, এ কথা জেনেও সে ফোন করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। ঠিক করেছিল, তার সঙ্গে কথা না কওয়া পর্যন্ত এইখানেই সে দাঁড়িয়ে থাকবে। স্থানটা যদিও সুখকর নয়— তার উপর ওই পোস্টমাস্টার—সাংঘাতিক লোক—বেশিক্ষণ ওর সাহচর্যে থাকলে ক্ষেপে যেতে হয়, ক্ষেপে হয়তো খুনও করে ফেলতে পারে—কিন্তু না, আত্মসংবরণ করা দরকার। যে চিঁড়ে সে মেখেছে, তাই তোলাই দুষ্কর হয়ে উঠেছে—সেটাকে আর জটিলতর করে লাভ নেই। পোস্টমাস্টারের কথায় কর্ণপাত না করে সে ফোনে কর্ণ সংলগ্ন করে দাঁড়িয়ে রইল ধৈর্যভরে।

ফোনে নানারকম আওয়াজ হাচ্ছে। মনে হচ্ছে ক্যানারি পাখি ডাকছে—ফট ফট করে পিস্তলের মতো আওয়াজ হল বারকয়েক—সোঁ সোঁ সোঁ—আবার ক্যানারি—!

অনেকক্ষণ পরে সুশোভন ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে একটা। ক্ষীণ হলেও স্পষ্ট। অনীতার সেই চাকরাণিটি। যে সব ক্ষমাস্নিগ্ধ চরিত্র পৃথিবীতে মানবজাতির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে, অনীতা দেবীর দাসী কুসুমের চরিত্র ঠিক সে ধরনের নয়। সুশোভনের সম্বন্ধে তার নিজস্ব এমন একটি ধারণা আছে যার তুলনায় স্বয়ম্প্রভা দেবীর ধারণা নিতান্ত নিষ্প্রভ। সুশোভন যে তাকে ফোন করতে পারে এ আশা কুসুম করেনি অবশ্য। কিন্তু যখন সুযোগটা পেয়ে গেছে তখন নিজের কেরামতিটুকু নিজস্ব ঝাঁঝসহযোগে জাহির করতে সে ছাড়লে না। আনাড়ী পল্লীবালা নয় সে, কোলকাতার ঘাগী ঝি। ফোন-ধরা অভ্যাস আছে।

নিজের মনোভাব সরাসরি প্রকাশ না করে সুশোভনকে বেশ বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলে, ফিরে এসে তাকে কি নিদারুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। একাকিনী ভগ্নহৃদয়া অনীতার হৃদয়-বিদারক প্রত্যাবর্তনের করুণ কাহিনী বর্ণনা করলে সে। স্বয়ম্প্রভার আবির্ভাবের কথা জানালে সবিস্তারে। তিনি কি কি অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করেছেন তা বললে এবং পরিশেষে নিপুণভাবে বর্ণনা করলে সমস্ত পরিবারের উত্তেজিত অভিযান কাহিনী। টেলিফোনের তার বাহিত হয়ে শ্রীমতী কুসুমের জিঘাংসা ক্রূর কণ্ঠস্বরে যে উল্লাস উদ্বেলিত হয়ে উঠল তা অবর্ণনীয়।

সে কোথায় আছে তা স্বয়ম্প্রভা জানলেন কি করে? তিনি জানবেন না তো কে জানবে! তাঁর চোখে ধুলো দিয়ে কি পার পেয়েছে কেউ আজ পর্যন্ত? স্বয়ম্প্রভা দেবীর মহতী বুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করার জন্যে কুসুমের কণ্ঠস্বর ঈষৎ ভর্ৎসনার সুর ধ্বনিত হল যেন। কি করে স্বয়ম্প্রভা তার গতিপথ আবিষ্কার করেছেন তার সাড়ম্বর বর্ণনা করে গেল সে।

টেলিফোন রেখে দিলে সুশোভন। পোস্টমাস্টারের দিকে দশ টাকার একটা নোট ছুঁড়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়ল সে পোস্টাপিস থেকে। ওরা আসছে! সর্বনাশ। রাস্তায় এ মোড় থেকে ও মোড় পর্যন্ত ছুটোছুটি করে বেড়ালে যদি একটা ট্যাক্সি পেয়ে যায়। পাওয়া গেল না। একজন খবর দিলেন এখানে 'বাইক' ভাড়া পাওয়া যায়।

কোথায়? ওই যে দোকানটায়। ছুটল সেদিকে সুশোভন। দরদস্তুর করবার সময় ছিল না। সুশোভন এ অঞ্চলে পরিচিত ব্যক্তিও নয়। বাইকওয়ালা বেশ একটু চড়া দরই হাঁকলে। ঘণ্টা পিছু দুটাকা। বাইকের দামটাও দোকানে জমা করতে হবে। তাতেই রাজি হয়ে গেল সুশোভন। বাইকের সীট্‌টি উষ্ট্রাকৃতি। তা হোক, তার উপরই চড়ে বসল সে অবিলম্বে এবং ধাবিত হল হরিমটর হিন্দু পান্থনিবাসের উদ্দেশ্যে। ক্ষুধায় ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর ভেঙে পড়ছিল, কিন্তু সেসব দিকে মন দেবার অবসর ছিল না তার। সে ছুটছিল যদি স্বয়ম্প্রভাকে এড়িয়ে কোনক্রমে অনীতার দেখা পেয়ে যায় এই আশায়। স্বয়ম্প্রভার সঙ্গেই যদি যাওয়ামাত্র দেখা হয়ে যায়, তাহলে আর রক্ষে নেই। অনীতার সঙ্গে দেখা হলে তাকে বুঝিয়ে বলতে পারে, যদি বোঝান সম্ভব না হয় কাকুতি-মিনতি করতে পারে। অনীতাকেই যে সে ভালবাসে, তাকে ভালবাসার পর অপরকে ভালবাসা যে অসম্ভব, এ কথাটা কি অনীতা বুঝবে না? অক্ষয় অকৃত্রিম প্রেম কি কেতাবেরই বুলি কেবল? তাকে বোঝাতেই হবে যেমন করে হোক। প্রাণপণে বাইক চালিয়ে ছুটে চলল সুশোভন। তার মানসপটে কিন্তু স্বয়ম্প্রভার ছবিটাই ফুটে উঠতে লাগল কেবল। 'অ্যাডমিশন রেজিস্টার' পর্যবেক্ষণ শেষ করে সিঁড়ি দিয়ে এইবার উঠছেন হয়তো শয়নকক্ষ পরিদর্শন-মানসে। কি ভয়ানক। যথাসম্ভব দ্রুতবেগে 'প্যাডল' চালাচ্ছিল সে, মাঝে মাঝে 'ফ্রি-হুইল' করছিল ক্লান্ত পদদ্বয়কে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দেবার জন্যে, আবার খুব জোরে চালাচ্ছিল দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে। ভাগ্যে রাস্তায় ভিড় ছিল না, একটু পরে সুশোভন দেখতে পেলে কে একজন আসছে যেন তার দিকে। তাকে দেখতে পেয়ে রাস্তার একধার ঘেঁষে সরে দাঁড়াল লোকটা। দ্রুতগামী বাইক থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য কোন উপায় ছিল না আর। সুশোভন তাকে যখন অতিক্রম করে গেল, তখন ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে তার দিকে চেয়ে। আরে এ যে ফদ্‌কা! বাইক থেকে নেবে পড়ল সে।

"ফদ্‌কা নাকি—"

আসবার সময় সুশোভন প্রচুর বকশিশ দিয়ে এসেছিল তাকে।

দন্তপাঁতি বিকশিত করে ফদ্‌কা এগিয়ে এল।

"হ্যাঁ বাবু"

"কোথা যাচ্ছিস"

"গোঁসাইজিকে ডাকতে"

"কেন? কোথায় তিনি"

"নিতাই বৈরাগীর বাড়ি"

"তাহলে হোটেলে নেই তিনি?"

"বললাম যে তিনি নিতাই বৈরাগীর বাড়ি গেছে। তেনাকে ডাকতেই তো যাচ্ছি"

গোঁসাইজি হোটেলে নেই শুনে সুশোভন আশ্বস্ত হল খানিকটা।

"তাঁকে ডাকতে যাচ্ছিস কেন?"

"বুড়ি ডাকছে"

"বুড়ি? অ্যাঁ?"

সুশোভন সম্মুখে প্রসারিত কর্দমাক্ত রাস্তাটার দিকে চাইলে একবার সভয়ে।

"কোথায় আছে সে বুড়ি"

"ওপরে শোবার ঘরে"

"ওপরে শোবার ঘরে! সর্বনাশ! গোঁসাইজিকে ডাকছে কেন? শোন ফদ্‌কা, গোঁসাইজিকে কষ্ট দিয়ে আর কি হবে? আমিই তো যাচ্ছি সেখানে, বুড়িকে যা বলবার আমিই বলব এখন"

মনোভাব প্রকাশ করবার মতো মুখ যদিও ফদ্‌কার নয়, তবু তাতে যেন বিস্ময়ের একটু আভাস ফুটে উঠল।

"আজ্ঞে না বাবু, আপনাকে দিয়ে হবে না। গোঁসাইজি ছাড়া তেনাকে সামাল দিতে পারবে না কেঁউ। গোঁসাইজি নেই শুনে যা কাণ্ড করছে—"

"তা তো করবেই। কিন্তু আমি দেখি না কি করতে পারি। আমাকে দিয়েই যদি হয় যায়। তাহলে গোঁসাইজিকে আর কষ্ট দিবি কেন শুধু শুধু। হাজার হোক বুড়ো মানুষ তো। তোকেও আবার যেতে হবে এতটা। বুড়ি কি চায় আমি জানি। গোঁসাইজিকে পেলে ভয়ানক কাণ্ড করবে ও। গোঁসাইজি যে হোটেলে নেই, ভালই হয়েছে এক হিসেবে"

"আজ্ঞে না, গোঁসাইজিকে ডাকতেই হবে। আমার মনে হচ্ছে বুড়ি হয়তো বাঁচবে না। দেখে ভয় লাগছে বাবু"

"বাঁচবে না? যাঃ—কি বলছিস্ যা-তা। যদিও আমি—মানে, ওকে দেখে ওই রকমই মনে হয়, মনে হয় বুঝি মাথার শির-টির ছিঁড়ে যাবে এখনই—ও কিছু নয়"

"আজ্ঞে না বাবু, গতিক সুবিধার নয়। বিড়বিড় করে কি বকছে, চোখ দুটো ঘুরপাক খাচ্ছে"

"ওরে বাব্বা! ভয়ানক কাণ্ড করছে তো তাহলে! তোকে কিছু জিগ্যেস করেছিল?"

"আমাকে? না তো। কেবল বললে গোঁসাইজি কোথা, বাইরে চলে গেছে কেন, ডেকে আন এক্ষুনি গিয়ে, এক্ষুনি যাও—"

সুশোভন গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মিনিটখানেক।

"বুঝেছি। ওই রকমই করে। চিনি তো"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, যবে থেকে এসেছেন তবে থেকে ওই রকমই"

"তার আগে থেকেও। তুই সবটা তো জানিস না। অসুখ-টসুখ নয়। ধরন-ধারণই ওই রকম"

"আজ্ঞে না। অসুখ করেছে, সেটা মিথ্যে নয়। আমার ভয় মরে না যায় শেষটা"

"কি বলিস্ যে! মরবে কেন"

"একদিন না একদিন তো মরতে হবেই ওনাকে"

হঠাৎ দার্শনিক উত্তর দিয়ে ফেললে ফদ্‌কা।

"তা তো হবেই। কিন্তু এখন ভগবান তা কি করবেন? ছোট ছেলেদের গল্পের বইতে ওসব হয়, বুঝলি। আজ উনি কিছুতেই মরবেন না, আমার ভাগ্যই সেরকম নয়"

"আমাকে ডাক্তার ডেকে আনতে বলছে যখন—"

"ডাক্তার? কে ডাক্তার ডাকতে বলছে?"

"তিনি। ওই বুড়ি"

"তিনি বললেন, তাঁর একজন ডাক্তার চাই? তাহলে নিশ্চয় হয়েছে কিছু।

"অ্যাঁ, বলিস্ কি? কষ্টটা কি?"

"তা তো আমায় বললেন না। হাঁপ বোধ হয়"

"হাঁপ? হাঁপাচ্ছে? সর্বনাশ। এসে থেকেই হাঁপাচ্ছে, না, আসবার পর হয়েছে? ওঁর সঙ্গে আরও দু'জন আছে নয়? গোঁপওলা ভদ্রলোক একটি, আর মেয়েছেলে একজন—"

"না, উনি তো একাই এসেছেন, একাই আছেন। ওঁর আপন লোক কেউ নেই বোধ হয়"

"তা না থাকাই সম্ভব। কিন্তু তাঁর স্বামী, মানে জিতুবাবু বলে একটি, ভদ্রলোক সঙ্গে নেই?"

"না"—ফদ্‌কা সজোরে মাথা নেড়ে বললে—"কেউ নেই ওঁর সঙ্গে"

"ওঁর মেয়ে? ওঁর মেয়ে আমার, মানে—আচ্ছা, কটার সময় এসেছিল বল্ তো"

ফদ্‌কা ভ্রূ কুঁচকে ভাববার চেষ্টা করলে একটু।

"সন্ধে হয়ে গেছল। সাতটা বোধ হয়"

"কি বলছিস্ যা-তা। সে সময় আসতেই পারে না"

"ঠিক মনে নেই"—দাঁত বার করে বললে ফদ্‌কা—"অনেক দিন হয়ে গেল কিনা। তবে সন্ধে—"

"অনেক দিন? মানে?"

"আজ্ঞে, তা মাসখানেক হবে বই কি"

"কে এসেছে মাসখানেক আগে"

"ওই দোতালায় আছেন যে মা-ঠাকরুণ। আপনি যে ঘরে ছিলেন, ঠিক তার পাশের ঘরেই তো আছেন"

"ও..."

সুশোভনের ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত ভ্রূ সেইভাবেই স্থির হয়ে রইল খানিকক্ষণ।

"তাঁর অসুখ করেছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

"ও, যাক্—আর কেউ আসেনি তাহলে?"

ফদ্‌কা মাথা নাড়লে শুধু।

"বাঁচা গেল"—বাইকের উপর চড়ে বসল আবার সুশোভন—"তুই গোঁসাইজিকে গিয়ে বেশি ঘাবড়ে দিস্ না যেন। গোঁসাইজি বেরিয়ে গেছেন বলেই বুড়ি চটেছে সম্ভবত। তিনি ধীরে-সুস্থে এলেও চলবে। তুই বরং ডাক্তারকে খবর দে আগে"

ফদ্‌কা ঘাড় নেড়ে চলে গেল। তার দৃঢ় বিশ্বাস গোঁসাইজি না এসে পড়লে বুড়ি বাঁচবে না।

"যাক্—কেউ তাহলে আসেনি এখনও পর্যন্ত"—বাইকে ভাবতে ভাবতে চলল সুশোভন— "গোঁসাইজিও নেই। ফদ্‌কাও চলে গেল। গুড্। আমি বোধ হয় প্রথমে হাজির হব সেখানে। একঘরে শোওয়ার ব্যাপারটা কোনরকমে যদি চাপা দিয়ে ফেলতে পারি, তাহলে বাকিটা সামলে নিতে বেগ পেতে হবে না বিশেষ। গোঁসাইজি এসে পৌঁছবার আগে যদি ওদের এখান থেকে বার করে ফেলতে পারি তাহলে তো কথাই নেই। ইতিমধ্যে তাদের আবার সেই

সৎরঙ্গবাবু না কি—তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই তো হয়েছে! যাক্, আপাততঃ যতটা দেখা যাচ্ছে হতাশাজনক নয় খুব—"

প্রাণপণে বাইক চালাতে লাগল সে।

॥ উনিশ ॥

হোটেলের সামনের দরজাটি আস্তে আস্তে খুলে সুশোভন খুব সন্তর্পণে ভিতরে গলাটি ঢুকিয়ে চেয়ে দেখলে। কোনও সাড়াশব্দ নেই। ঢুকে পড়ল পা টিপে টিপে। সামনের ঘরে কেউ নেই। সিঁড়ি দিয়ে উঠল খানিকটা। উপরে একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ শোনা যাচ্ছে। হাঁপানি-রোগীর শ্বাসকষ্টের শব্দ। নেবে এসে দেখলে ওদিকের বারান্দার বেঞ্চিতে গোকুল শুয়ে আছে। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো। চোখ চেয়ে আছে কিন্তু স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব। সুশোভনকে দেখে সে হাসল একটু, তারপর কি মনে হওয়াতে হাত তুলে নমস্কার করলে। হোটেলের কিছু দূরে যে তাড়িখানাটা আছে গোকুল সেখানকার চাকর। ঝুনুকে খোঁজবার সময় সকালে ওর সঙ্গে ভাব হয়েছিল সুশোভনের। সুশোভনের কাছ থেকে মোটা রকম বকশিশ পাওয়ার পর ভাবটা বেশ গাঢ় রকমই হয়েছিল।

"গোকুল যে, এখানে কেন"

"ফদু আমায় বসিয়ে রেখে গেল"

"ফদু" শুনেই সুশোভন বুঝলে গোকুল তাড়ি খেয়েছে।

"আমি আবার ফিরে এলাম, গোকুল"

"আজ্ঞে। কিন্তু ফদু যে নেই, আপনার খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে? ঠাকুর নেই, গোঁসাইজিও নেই"

"ঠাকুর কোথা গেল"

"হাটে গেছে বোধ হয়"

"খাব না এখন কিছু। দেখ গোকুল, এখানে কয়েকজনের আসবার কথা আছে। শুনছি তারা তোমাদের তাড়ির দোকান খানাতল্লাশ করবার মতলবে আসছে। আমাকেও ওই সঙ্গে জড়াবার মতলব তাদের। গোঁসাইজিকেও জড়াতে চায় শুনলাম! ওরা যদি এসে তোমাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করে—বোলো, আমি কিছু জানি না। বুঝলে"

"আজ্ঞে"

সুশোভন পকেট থেকে ব্যাগ বার করে আর একটি টাকা গোকুলের হাতে দিলে। গোকুল টাকাটা নিয়ে চোখ মিটিমিটি করে তাকাতে লাগল।

সুশোভন আবার বললে, "বলবে আমি কিছু জানি না"

"আজ্ঞে"

"দূরে একটা মোটরের শব্দ শোনা গেল। আসছে বোধ হয়। "ওই আসছে বোধ হয় বুঝলে"

"আজ্ঞে"

"যদি কিছু জিগ্যেস করে, স্রেফ বলবে আমি কিছু জানি না"

"আজ্ঞে"

"শুয়ে ঘুমোও তুমি, বুঝলে"

মোটরটা এসে থামল। সুশোভন তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে জানলার কপাটটা একটু ফাঁক করে দেখলে। বেশ দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ একটি লোক মোটর থেকে নেবেছেন। হরিমটর পান্থনিবাসের দিকে একনজর চেয়ে ড্রাইভারকে কি যেন বললেন। এগিয়ে এলেন তারপর।

"ডাক্তার এল"—সুশোভন ভাবলে—"এত শিগ্‌গির ডাক্তার এসে পড়বে তা তো ভাবিনি। এতে জট আরও না পাকিয়ে যায়"

একটা গম্ভীর বেপরোয়া ভাব মুখে ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। বাইরের কপাট খুলল, বন্ধ হল। তারপর পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বেশ দৃঢ় পদক্ষেপ। তারপর যে ঘরে সে দাঁড়িয়ে ছিল সেই ঘরের কপাটটা 'ঝড়াম্' করে খুলে গেল।

'ও'—ব্রজেশ্বরবাবু বললেন—গম্ভীর ধীরস্থির প্রকৃতির লোক ব্যস্ত হলে যেরকম দেখায় ব্রজেশ্বরবাবুকে সেইরকম দেখাচ্ছিল।

"নমস্কার"—এগিয়ে এল সুশোভন।

"এই হোটেল কি আপনার"

"না"

"হোটেলের মালিক কোথায়"

"তিনি বেরিয়ে গেছেন। যে রোগীটিকে দেখতে এসেছেন তিনি আছেন ওপরে। একটু গিয়ে বাঁ ধারে সিঁড়ি। উঠে ডান হাতে একটা ঘর, তার পরের ঘরটাই। উঠলে শব্দই শুনতে পাবেন"

ব্রজেশ্বরবাবুর তাড়া ছিল যদিও তবু ধীরভাবে দাঁড়িয়ে তিনি সুশোভনের অনাবশ্যক কথাগুলো শুনলেন শেষ পর্যন্ত। সকলের সব কথা শেষ পর্যন্ত শোনাই তাঁর স্বভাব। সুশোভনের কিন্তু অস্বস্তি লাগছিল।

"আমি তো রোগী দেখতে আসিনি"—মৃদু হেসে বললেন ব্রজেশ্বরবাবু সব শুনে।

"ও"

"আপনি কি এই হোটেলে থাকেন?"

"না, থাকি না। তবে—মানে—এসে পড়েছি—"

"এই হোটেলের বিষয়ে দু-চারটা খবর জানতে চাই। কার কাছ থেকে জানা যায় বলুন তো। কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না। কোন সাড়াশব্দও নেই"

"আর কিছুক্ষণ সবুর কর, দাদা"—মনে মনে বললে সুশোভন—"সাড়া এবং শব্দ দুই-ই প্রচুর পরিমাণে পাবে"

তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে হেসে বললে—"গোঁসাইজি হলেন এই হোটেলের মালিক। তিনি কার সঙ্গে যেন দেখা করতে বেরিয়েছেন। আজ বিকেলটা ছুটি নিয়েছেন আর কি। কিন্তু দোতলায় যে ভদ্রমহিলাটি থাকেন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন হঠাৎ। তাই এই হোটেলের চাকর ফদ্‌কা ছুটেছে গোঁসাইজিকে আর একজন ডাক্তারকে ডেকে আনতে। তাই আমি আপনাকে ডাক্তার ভেবেছিলাম।"

ব্রজেশ্বরবাবু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন।

"গোঁসাইজি আর ফদ্‌কা ছাড়া হোটেলে আর কেউ থাকে না?"

"ঠাকুর হাটে গেছে। ওইদিকে বেঞ্চিতে শুয়ে আছে একজন। তবে সে লোকটা—"

"তাকে দিয়েই কাজ চলে যাবে আমার। ধন্যবাদ"

ব্রজেশ্বরবাবু ভিতরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

"না, শুনুন—আমার মনে হয় চলবে না। মানে, সে লোকটা একটু—"

ব্রজেশ্বরবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। বাধা পেয়ে তাঁর মুখভাবে ঈষৎ বিরক্তিও ফুটে উঠল।

"এ হোটেলের কিছু কিছু খবর আমিও বলতে পারব। কি জানতে চান বলুন না"

"না, তার দরকার নেই। ধন্যবাদ! আমি যে খবর জানতে চাই তা একটু গোপনীয়। বাইরের লোকের কাছে বলা চলবে না। কোন্‌দিকে লোকটি শুয়ে আছে বললেন?"

অনিচ্ছাসহকারে সুশোভনকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হল।

"এইদিক দিয়ে সোজা চলে যান। বেঞ্চিতে শুয়ে আছে। কিন্তু গোকুলের কাছ থেকে কোনও খবর যোগাড় করা কঠিন। নিজেই সেটা বুঝতে পারবেন এখুনি। যান—সোজা ঢুকে পড়ুন—"

ব্রজেশ্বর ভিতরের দিকে চলে গেলেন। সুশোভনের এই উক্তিতে তাঁর মুখভাবে ঈষৎ অপ্রসন্নতা ফুটে উঠল আবার। ভাবটা যেন—আরে বাপু, আমাকে দেখতেই দাও না, তুমি ফোঁপর দালালি করছ কেন।

"গোপনীয় খবর?"

ঈষৎ উৎসুক হয়ে সুশোভন চলে এল বাইরে। লোকটার চলচলন মোটেই ভাল লাগছিল না সুশোভনের। হরিমটর পান্থনিবাসে কি গোপনীয় খবর সংগ্রহ করতে এল লোকটা? উকিল-টুকিল নয় তো? না, উকিলের চেহারা এ রকম হতেই পারে না। ডিটেকটিভ? সুশোভন আস্তে আস্তে আবার ভিতরের দিকে গেল। কান পেতে রইল দরজার কাছে, যদি কিছু শোনা যায়।... কিচ্ছু শোনা গেল না। আবার বাইরে চলে এল সে। জানলাটা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে। যে মোটরে ভদ্রলোক এসেছিলেন সেটি দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভারটি সিগারেট টানছে বসে বসে। মোটরের পিছনে ভদ্রলোকের স্যুটকেস বিছানাপত্র বাঁধা রয়েছে। সুশোভন সেইদিকেই এগিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

"তুমিই কি গোকুল"

ব্রজেশ্বরবাবু তাঁর ঈষৎ অনুনাসিক অথচ দৃঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

গোকুল চম্‌কে উঠল।

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

ব্রজেশ্বরবাবু তাঁর ছড়িটির উপর দুহাতে ভার দিয়ে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলেন।

"হোটেলের মালিক শুনছি বাইরে গেছেন। তোমারই উপর সব ভার দিয়ে গেছেন নাকি"

গোকুল ফ্যালফ্যাল করে একবার চাইলে তাঁর মুখের দিকে। স্বভাবতঃই চোখের দৃষ্টি তার সজল। বিস্ফারিত হওয়াতে, জোলো ভাবটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। হঠাৎ খুব কুণ্ঠিত হয়ে ঘাড় চুলকোতে লাগল সে।

"তোমারই ওপর সব ভার নাকি"

"জানি না"

"এ অঞ্চলে এটি ছাড়া আর হোটেল আছে কি"

"জানি না"

"কাল রাত্রে কে কে ছিল বলতে পার"

"জানি না"

"তোমার জ্ঞান খুব সীমাবদ্ধ দেখছি। ক-আনায় এক টাকা তা জান কি "

"জানি না—আজ্ঞে না, সেটা জানি"

ব্রজেশ্বর পকেটে হাত ঢুকিয়ে মনিব্যাগটি বার করলেন।

"বাইরে ওই যে ভদ্রলোকটি রয়েছেন উনি কে বলতে পার"

"জানি না"

ব্রজেশ্বর মনিব্যাগটি পকেটে ঢুকিয়ে ফেললেন।

"জানি না, সত্যি"

"উনি কি কাল রাত্রে ছিলেন এখানে"

"জানি না—হয়তো ঠিক মনে পড়ছে না"

"ওঁর সঙ্গে কি—"

"হঠাৎ থেমে গেলেন ব্রজেশ্বর। কথাটা আটকে গেল যেন মুখে। তারপর প্রাণপণে শক্তি সংগ্রহ করে এগিয়ে এলেন তিনি আর একটু। অনাবশ্যক উচ্চকণ্ঠে প্রায় ধমকের সুরে প্রশ্ন করলেন—"ওঁর সঙ্গে কি কোনও মেয়েছেলে ছিল?" ইতস্ততঃ করতে লাগল গোকুল। বোকার মতো একটু হেসে ঘাড়টা আর একবার চুলকে ব্রজেশ্বরবাবুর দৃষ্টি এড়িয়ে অন্যদিকে চাইবার চেষ্টা করতে লাগল।

"উত্তর দিচ্ছ না কেন"

"ওনাকেই আপনি জিগ্যেস করুন না"

"মেয়েলোকটি কোথায় এখন"

"তা কি করে বলব"

"মেয়েটি দেখতে কি রকম ছিল"

"এই মেয়েরা যেমন হয়"

"ভদ্রলোকের মেয়ের মতো"

"তা বলতে হবে বই কি"

"তার সঙ্গে কি একটা কুকুর ছিল"

"আজ্ঞে—তা—"

হঠাৎ থেমে গেল গোকুল। ব্রজেশ্বরবাবু যে হাতটি পকেটের ভিতর মনিব্যাগ ধরে ছিল সেইদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হল তার।

"তা ঠিক বলতে পারছি না"

ব্রজেশ্বরবাবু পকেট থেকে হাত বার করে নিলেন। বার করে নিজের থুতনিতে হাত বুলোতে লাগলেন। গোকুলের দৃষ্টিও তাঁর পকেট থেকে থুতনির দিকে গেল। গোকুল মুখটা ভাল করে দেখল এইবার। লম্বা গোছের মুখ। তার মনে হল মুখে রাগের ভাব তো নেই, বরং একটু চিন্তিতই যেন। হাত কিন্তু আর পকেটের দিকে নামল না।

"আজ্ঞে তা ঠিক বলতে পারছি না"

ব্রজেশ্বরবাবু আর কোনও প্রশ্ন করলেন না। গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েকমুহূর্ত। তারপর নিজের বিবেকেরই বিরুদ্ধে শক্তিসংগ্রহ করে ফেললেন সহসা যেন সম্ভবতঃ। পকেট থেকে ব্যাগ বার করে গোকুলকে একটি টাকা দিয়ে তিনি বললেন, "এই হোটেলের আপিসটা কোথায় তা আমাকে দেখিয়ে দিতে পার"

"ওই যে—"

"তালাবন্ধ রয়েছে দেখছি। চাবি কোথায়"

টাকা পেয়ে গোকুল পুলকিত হয়েছিল। আপিস ঘরের চাবি যে হুকটিতে গোঁসাইজি টাঙিয়ে রাখতেন তা গোকুলের জানা ছিল। সে তাড়াতাড়ি চাবি এনে ঘর খুলে দিয়ে বললে, "এই যে, আপনি বসুন এসে। গোঁসাইজি এসে পড়বেন এখুনি। কেউ যদি এসে পড়ে তাকে বসবার জন্যেই চাবি রেখে গেছেন তিনি। এখুনি এসে পড়বেন। আপনার কিছু দরকার আছে কি? জলটল—"

"কিছু না। তুমি এস আমার সঙ্গে"

ঠিক এই সময় সুশোভন বাইরে থেকে এসে ভিতরে ঢুকল। ব্রজেশ্বর সুশোভনের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে একনজর চেয়ে দেখলেন। তারপর আপিস ঘরে ঢুকে গেলেন।

সুশোভন হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হেঁট হয়ে বাঁ পায়ের গোছটা একবার চুলকে নিলে। সে যে কি করবে তা ভেবে পাচ্ছিল না—এক কথায় যাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বলে সেই অবস্থা। তার মনে হচ্ছিল গোঁসাইজিও যদি এখন এসে পড়েন সে যেন বাঁচে। মোটরের পিছনে যে স্যুটকেসটি ছিল তাতে বেশ বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে—ব্রজেশ্বর দে। ব্রজেশ্বর দে? সান্ত্বনার স্বামী। সর্বনাশ! সে কি করবে ঠিক করতে পারছিল না প্রথমটা। হোটেলের দিকে ব্যায়ত-আননে চেয়ে ছিল খানিকক্ষণ। বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবে, না হোটেলের দিকে এগিয়ে যাবে, না সরে পড়বে কিছুই ঠিক করতে পারছিল না।

"গোপনীয় খবর? ব্রজেশ্বর দে গোপনীয় খবর সংগ্রহ করতে এসেছে! সারলে দেখছি! গোঁসাইজিও তো এল বলে। আর আমিও একটা ঝরঝরে বাইক হাঁকিয়ে ঠিক এসে পড়লাম এই সময়ে। লে হালুয়া! কি করা যায় এখন—"

ভ্রূ কুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইত্যাকার চিন্তা করলে সে খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ তার মনে হল গতরাত্রে সে-ই যে সান্ত্বনার সঙ্গে এখানে ছিল তা ব্রজেশ্বরবাবু টের পাননি এখনও। তার আসল নামটাও তো কেউ জানে না এখানে। ব্রজেশ্বরবাবু বড় জোর কারও মুখ থেকে! (কে সেই রাস্‌কেল?) এইটুকু শুনে থাকতে পারেন যে গতরাত্রে তাঁর স্ত্রী কোনও অজ্ঞাতনামা যুবকের সঙ্গে এই হোটেলে রাত কাটিয়ে গেছেন। সে যে এই যুবক এ কথা ব্রজেশ্বরবাবু এখনও জানেন না। জানা সম্ভব নয়। এই কথাটা মনে হওয়াতে তার মনে ভরসা হল খানিকটা। মনে হল ব্রজেশ্বরবাবুর এই অনুসন্ধানে একটু সাহায্য করবার ভান করলে ব্রজেশ্বরবাবুর সন্দেহও হয়তো হবে না তার উপর। কিন্তু ব্রজেশ্বরবাবুর ভাবভঙ্গি দেখে ঘাবড়ে গেল সে। একনজরে চেয়েই সুশোভন বুঝতে পেরেছিল ভদ্রলোক ব্যাপারটা জেনেছেন কিছু। কিন্তু কতটা? কি করে জানলেন?

ব্রজেশ্বর আপিসের ভিতর ঢুকে গেলেন। সুশোভন বাইরে দাঁড়িয়ে উসখুস করতে লাগল।

ভয়ঙ্কর রাশভারী লোক মনে হচ্ছে। দুষ্টুমি ধরা পড়ে গেলে দুষ্টু ছেলের শিক্ষকের সামনে যেরকম মনোভাব হয় সুশোভনের অনেকটা সেইরকম হতে লাগল। মনে হতে লাগল যে সে ব্রজেশ্বরবাবুর চেয়ে অনেক ছোট, শুধু বয়সে নয়, উচ্চতাতেও। একটু এগিয়ে এসে জানালা দিয়ে আপিসের ভিতর আস্তে উঁকি দিয়ে দেখল সে। ব্রজেশ্বরবাবু 'অ্যাড্‌মিশন রেজিস্টার'খানা ওল্টাচ্ছেন, নামের পর নাম দেখে যাচ্ছেন। হঠাৎ এক জায়গায় আঙুল দিয়ে থেমে গেলেন তিনি। পরিচিত হস্তাক্ষর চিনতে দেরি হল না। নির্নিমেষে গম্ভীরভাবে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। মুখের একটি পেশী বিচলিত হল না কিন্তু। যেন জীবন্ত মানুষের মুখ নয়, মুখোশ। বিরাট খাতাটা সশব্দে বন্ধ করে অন্যদিকে চাইলেন তিনি।

সুশোভন সরে এল জানলা থেকে। গোকুলই প্রথমে আপিস থেকে বেরুল এবং বেরুবামাত্র সুশোভনের সামনে পড়ে গেল। এই ব্যাটাই সব ফাঁস করে দিলে নাকি! বকশিশ-টকশিশ সব মাঠে মারা গেছে সম্ভবতঃ। গোকুলের একটা গরু-চোর-গোছ ভাব দেখে আরও সন্দেহ হল সুশোভনের।

"কাল রাত্রে আমি যে ওই মেয়েলোকটির সঙ্গে ছিলাম তা বলনি তো ভদ্রলোককে"—ফিসফিস করে জিগ্যেস করলে সুশোভন।

"না"—অনুরূপ ফিসফিসে উত্তর দিলে গোকুল—"আমি বলিনি কিছু। কিন্তু জিগ্যেস করেছিল"

"উত্তরে কিছু বলেছ নাকি"

"না বলিনি। কিন্তু কতবার জিগ্যেস করেছে যে"

ঢোঁক গিলে থেমে গেল গোকুল দ্বারের দিকে চেয়ে। ব্রজেশ্বরবাবুর দীর্ঘদেহ আপিসের দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল।

সুশোভন সোজা ঢুকে পড়ল সামনের হলটায়।

।। কুড়ি ।।

সান্ত্বনা দোতলায় ছিল, শব্দ শুনে দ্রুতপদে নাবতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। সামনের হলটায় দিগ্বিজয় সিংহরায়, সুরেশ্বরী দেবী, কতকগুলো ভিজে কাপড়, বর্ষাতি প্রভৃতি মিলে যাচ্ছেতাই কাণ্ড হচ্ছিল একটা।

"সান্ত্বনা কই, কোথায় সে"—বার বার জিজ্ঞাসা করছিলেন সুরেশ্বরী দেবী।

"ওগো, তুমি ওই কাদামাখা জুতোটা বাইরে ছেড়ে এস না। গরম জল করতে বলেছি, তোমরা স্নান করে ফেল সব"

সকলের দিকে চেয়ে বললেন তিনি আদেশের ভঙ্গিতে।

ট্যাঁশ হিন্দিতে উত্তর দিলেন ছকুবাবু—"মরে গেলেও আমি তো আস্নান করছি না বাবা"

"যাঁরা ভিজেছেন তাঁদের বলছি। আপনাকে নয়"

"আমি একটুও ভিজি নি"—সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন দিগ্বিজয়—"ভিজেছ বরং তুমি। তোমারই আগে স্নান করা উচিত"

"গোবর্ধনবাবু, আপনিও তো খুব ভিজেছেন। আপনি করবেন না?"

গোবর্ধনবাবুর দিকে চেয়ে সুরেশ্বরী প্রশ্ন করলেন।

"বেশ তো, করব"—হাসিমুখে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন গোবর্ধন।

"ওমা, এই যে সান্ত্বনা, ওপরে ছিলি বুঝি—"

সান্ত্বনা প্রণাম করতেই সুরেশ্বরী দেবী জড়িয়ে ধরলেন তাকে এবং সকলের সমুখেই চুম্বন করলেন।

দিগ্বিজয়কে প্রণাম কবতেই তিনি বললেন, "ছকুবাবুর মুখে যখন শুনলাম যে তোমরা এসেছ তখন কি যে আনন্দ হল! আমার ভয় হচ্ছিল আমি বুঝি ভুল তারিখ জানিয়েছিলাম তোমাদের—"

"আমি কিন্তু তখনই বলেছিলাম তা জানাওনি"—ঘাড় ফিরিয়ে সুরেশ্বরী বললেন—"তোমার ভুল কখনও হয় না। তারপর, সান্ত্বনা, তুই আছিস্ কেমন?"

"ভুল করেছি কিনা তার অকাট্য প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। সুশোভনদের তো পাত্তাই নেই কারও। সান্ত্বনা তুমি এঁদের চেনো কি—ইনি হলেন ছকুবাবু। আর ইনি হলেন গোবর্ধনবাবু। দুইজনেই সম্পর্কে আমার"—সম্পর্কটা হঠাৎ গুলিয়ে ফেললেন দিগ্বিজয়বাবু—"মানে শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে আত্মীয়"

সুরেশ্বরী বললেন, "আচ্ছা, ব্রজেশ্বর এসেই চলে গেল কেন? ছকুদা বলছিলেন—এসে নাবেননি পর্যন্ত। আর তোর কুকুর নিয়ে কি কাণ্ড হয়েছিল? ভাগ্যিস্ ভদ্রলোক পেয়ে দিয়ে গেলেন। লোকটি খুব ভাল বলতে হবে। ব্রজেশ্বর আবার আসবে তো"

"আসবেন বই কি, শিগ্‌গিরই আসবেন"—সান্ত্বনা জবাব দিলে চট করে "খুব জরুরি একটা দরকারের জন্যে চলে যেতে হল। কোথাকার একটা জরুরি ফাইল নাকি তাঁর কাছে থেকে গিয়েছিল। সেইটে দিয়েই ফিরে আসবেন"

"দরকারি ফাইলটা না দিয়েই চলে এসেছিল। কি যে সব ভুলো মন তোমাদের হয়েছে আজকাল"—সুরেশ্বরী দেবী তারপর দিগ্বিজয়ের দিকে ফিরে বললেন—"তুমি যদি স্নান না-ও কর, কাপড়চোপড়গুলো ছাড় অন্ততঃ"

"ছাড়ছি। স্নান করলেও মন্দ হয় না। কিন্তু তুমি নিজে করছ কি। ভিজে সপসপ করছে যে তোমার কাপড়—"

"কি যে বাজে কথা বল! আমি একটুও ভিজি নি। এ যা দেখছ ওপর-ওপর। তবে এগুলো ছাড়ব আমি। স্নানও করতে পারি—"

ছকুবাবু পাইপ ধরিয়েছিলেন, দিগ্বিজয়ও মোটা সিগার বার করলেন একটা। গোবর্ধনের দিকে চেয়ে বললেন—"নেবেন নাকি"

"ও কি, তোমরা স্নান করে ফেল আগে। সিগার বার করছ যে মোটা মোটা"

"থাক তবে। স্নান সেরেই খাব"

কুণ্ঠিত গোবর্ধন প্রসারিত হস্ত গুটিয়ে নিলেন।

"টেলিগ্রাম"

দ্বারপ্রান্তে পিওন এসে দাঁড়াল।

দিগ্বিজয় তাড়াতাড়ি গিয়ে টেলিগ্রামটা নিলেন এবং পড়েই সান্ত্বনাব দিকে চেয়ে বলে উঠলেন—"এ কি, ব্রজেশ্বর কোলকাতা থেকে টেলিগ্রাম করছে"

"খুব চট করে পৌঁছে গেছেন তো"—সান্ত্বনা বললে। টেলিগ্রামটা আর একবার পড়ে দিগ্বিজয় বললেন, "টেলিগ্রাম করেছে আজ সকালে। লিখছে আজ সাড়ে চারটের ট্রেনে আসছে"

"তা কি করে সম্ভব—" নিরীহ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে সান্ত্বনা। "তাহলে কাল বোধ হয় করেছিলেন, আজ এসে পৌঁছল"

"কিন্তু টেলিগ্রামেই তো তারিখ রয়েছে। এই যে নাইন্‌টিন্‌থ্। আমি আবার বোধ হয় গোলমাল করে ফেলছি। দেখ তো, এটা নাইন্‌টিন্‌থ্ই তো মনে হচ্ছে—না এইটিন্‌থ্, দেখ তো। কিংবা কালই বোধ হয় নাইন্‌টিন্‌থ্ ছিল তাহলে—তা হবে—"

"নেহি"—মাথা নেড়ে ছকুবাবু বললেন—"আজই নাইন্‌টিন্‌থ্"

"হ্যাঁ, আজই নাইন্‌টিন্‌থ্", দিগ্বিজয় বললেন আবার আমাদের নন্দর জন্মদিন নাইন্‌টিন্‌থ্, তাকে চিঠি লিখলাম যে আজ সকালে—"

"কাল হয়তো তার জন্মদিন ছিল," সুরেশ্বরী বললেন।

"না গো না, নাইন্‌টিন্‌থ্ই তার জন্মদিন"

"তা অস্বীকার করছি না, কিন্তু কাল হয়তো নাইন্‌টিন্‌থ ছিল। কিন্তু না, তুমি তো ভুল করবার লোক নও"

"না, না, থাম আমারই ভুল হচ্ছে বোধ হয়। গোলমাল করে ফেলছি, কালই বোধ হয় নাইন্‌টিন্‌থ্ ছিল—থাম, ক্যালেন্ডার একখানা দেখলেই তো চুকে যায়—"

"চল, মাসীমা, তুমি কাপড়চোপড় ছেড়ে ফেলবে চল আগে। টেলিগ্রামের কি আজকাল কোনও ঠিকঠিকানা আছে! হয়তো কেরানিই লেখবার সময় ভুল তারিখ বসিয়ে দিয়েছে, কিংবা চাকরে হয়তো দেরি করে দিয়েছে। উনি এলেই বোঝা যাবে সেটা। তুমি এখন ও-ঘরে চল।"

সুরেশ্বরীকে প্রায় টানতে টানতে সান্ত্বনা পাশের ঘরে নিয়ে যাচ্ছিল।

"তোরা কলকাতায় চাকর পেয়েছিস্ নাকি। কোলকাতায় শুনেছি আজকাল চাকর পাওয়াই যায় না। মানুদের চিনিস্?"

"ব্যাপারটার কিন্তু একটা 'ফায়সালা' হওয়া দরকার। শুনুন সান্ত্বনা দেবী"— ছকুবাবু এগিয়ে এলেন, "আপনার স্বামী আজ সাড়ে চারটের সময় পৌঁছুচ্ছি বলে চাকরকে দিয়ে কি করে টেলিগ্রাম পাঠাতে পারেন তা তো আমার মগজে ঘুসছে না। মোটর না বেগড়ালে তো আপনাদের কালই এখানে পৌঁছবার কথা। তা-ও ট্রেনে নয়, মোটরে—"

"সত্যি, ব্যাপারটা এমন ঘোরালো গোলকধাঁধার মতো দেখাচ্ছে যে মাথায় কিছু ঢুকছে না আমার"—একটু শুষ্ক হাসি হেসে জবাব দিলে সান্ত্বনা।

"আমারও ঢুকছে না"—দিগ্বিজয় বললেন।

"গোপালভাঁড়ের একটা গল্প আছে"—হেসে শুরু করলেন দিগ্বিজয়, করেই ভ্রূ কুঞ্চিত করে থেমে গেলেন আবার—দাঁড়াও, গোপালভাঁড়ের না বীরবলের, আবার গুলিয়ে ফেললাম—"

অপ্রস্তুত মুখে থেমে গেলেন তিনি। সুরেশ্বরীও এ নিয়ে বাদানুবাদ করবার সুযোগ পেলেন না। টেলিগ্রামটার দিকে তর্জনী আস্ফালন করে ছকুবাবু যা বলতে লাগলেন, তাতেই মনোনিবেশ করতে হল তাঁকে।

"আপনি এবং আপনার স্বামী এখানে আসবার জন্যে কাল একটা হাওয়া-গাড়িতে রওয়ানা হয়েছিলেন কোলকাতা থেকে। হাওয়াগাড়ির কল বিগড়ে যাওয়াতে আপনারা কাল রাতে ধরমশালা না কোথায় রাত কাটিয়েছিলেন। এ খবর আপনার নোকরদের মালুম হতে পারে না। তারা এ বিষয়ে তার ভেজতেও পারে না। আপনার স্বামী আজ সমস্ত সকাল আপনার সঙ্গে মহজুদ ছিলেন, এতদূর তক্ এসেছিলেন, তিনিও ও তার ভেজতে পারেন না। তাছাড়া তিনি লিখছেন ট্রেনে করে আজ সাড়ে চার বাজে পহুঁছ যাউঙ্গে। বড় তাজ্জব লাগছে আমার।"

"মরুক গে, চান করে ফেল সব একে একে। প্রথমে কে ঢুকছে বাথরুমে"

"মাফ কিজিয়ে মালকাইন"—ছকুবাবু সুরেশ্বরীর দিকে অভিবাদনের ভঙ্গিতে ঈষৎ মাথা ঝুঁকিয়ে সরে গেলেন।

সুরেশ্বরী দিগ্বিজয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি যাচ্ছ তো বাথরুমে এবার"

প্রকাণ্ড সিগারটার দিকে এক নজর চেয়ে দিগ্বিজয় উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ, এই যে হয়ে গেল আমার। তুমি কিন্তু ভিজে কাপড়ে কেন যে দাঁড়িয়ে আছ এখনও, তা বুঝতে পারছি না।"

"তুমি চল, মাসীমা, ও ঘরে"—সান্ত্বনা আর একবার সুরেশ্বরীকে পাশের ঘরে নেবার চেষ্টা করলে।

"চল যাচ্ছি। ব্রজেশ্বর তাহলে সাড়ে চারটের ট্রেনে আসছে না তো? কি ঠিক হল, সেইরকম ব্যবস্থা তো করতে হবে আবার—"

ছকুবাবু বিস্ফারিত চক্ষে সান্ত্বনার দিকে চেয়ে ছিলেন। এই কথায় এগিয়ে এসে পরিষ্কার বাঙলায় তিনি বললেন, "সাড়ে চারটের ট্রেনে আসা কি করে সম্ভব তাঁর পক্ষে! ঘণ্টা দুই আগে তিনি তো এখান থেকেই মোটরে রওনা হয়েছেন কোলকাতার দিকে"

"কি জানি, বুঝতে পারছি না ঠিক। সে যা হয় হবে, চল মাসীমা, তুমি ও-ঘরে, কাপড়টা ছাড়বে চল।"

সান্ত্বনা সুরেশ্বরী দেবীকে পাশের ঘরে নিয়ে চলে গেল।

অপসৃয়মান দুটি নারীমূর্তির দিকে ছকুবাবু বড় বড় চোখ করে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর কাঁকড়ার মতো পাশ দিয়ে সরে সরে ঘরের কোণের টেবিলের কাছে গিয়ে আর এক ডোজ 'স্ট্রিংগাহ' পান করে ফেললেন।

"চীজ বটে মেয়েমানুষ! উফ! বেশ একটি 'ওঝরা' পাকিয়ে ফেলেছে। কিন্তু সেদিকে কারও লক্ষ্য নেই। দিমাগই নেহি হ্যায় কিসি কো"

রায়বাহাদুর দিগ্বিজয় সিগারটি একটি অ্যাশ-ট্রের উপর সন্তর্পণে নামিয়ে রেখে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে স্নান করতে যাচ্ছিলেন। ছকুবাবুর শেষ কথাগুলো শুনতে পেলেন তিনি। সুদীর্ঘকাল দাম্পত্য জীবন ভোগ করার ফলে স্ত্রীর সম্বন্ধে তাঁর যে মনোভাব হয়েছিল তা ঠিব বর্ণনা করা শক্ত। অনেকটা অন্ধবিশ্বাস গোছের। ছকুবাবুর শেষ কথাগুলো শুনতে পেলেন তিনি। পেয়ে বললেন, "ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরছেন কেন। সুরোর হাতে ছেড়ে দিন, সব ঠিক হয়ে যাবে—"

উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে তাঁর এই উপদেশ সান্ত্বনার কানে ঢুকল। শুধু কানে নয়, মরমেও। অকূল পাথারে পড়ে সে যে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না, হঠাৎ যেন ভেলা দেখতে পেল একটা। ঠিক! মাসীমারই শরণাপন্ন হওয়া যাক। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই তো 'উনি' এসে

পড়বেন। ইতিমধ্যে যা হোক একটা ব্যবস্থা করে ফেলতেই হবে। ওই বেরাল-গুঁফো ছকুবাবুটি মোটেই সুবিধার লোক নয়। সমস্ত ঘটনা উনি যদি জানতে পারেন তাহলে ত্রিভুবনে আর কারও জানতে বাকী থাকবে না। "ওঁর" সঙ্গে স্টেশনেই দেখা করে আগে থাকতে সব ঘটনাটা খুলে বলা দরকার, তা না হলে উনিই সব ফাঁস করে দেবেন এখানে এসেই। মাসীমাকেই সব খুলে বলতে হবে, তাছাড়া উপায় নেই।

সুরেশ্বরী দেবী বাথরুমে ঢুকে গায়ের চাদরটা ছেড়ে বেরিয়ে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা খুলতে লাগলেন। একটা স্মৃতিও ভেসে উঠছিল তাঁর মানসপটে। তাঁর সখী, সান্ত্বনার মা, তাঁর চুল বেঁধে দিতে কি ভালো না বাসত!

"মাসীমা, আসলে কি হয়েছে জানো"

"কি"

"উনিই ওই টেলিগ্রাম করেছেন"

"ব্রজেশ্বর? কিন্তু সে তো বলছিস্ একটু আগে মোটরে করে—"

"মোটরে উনি ছিলেন না"

"কে ছিল তবে"

"সুশোভনবাবু"

"অ্যাঁ! বলিস্ কি"

তাঁর পিঠের উপর সাদা রেশমের মতো একরাশ চুল আলুলায়িত হয়ে পড়েছিল। ঈষৎ বেঁকে চিরুনি চ'লাচ্ছিলেন তিনি তাতে। সান্ত্বনার কথা শুনে চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে গেল, সোজা হয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি সান্ত্বনার দিকে।

"সব খুলে বলছি, শোন না, কি যে বিপদে পড়েছি! আমাকে বাঁচাও তুমি, মাসীমা"

সুরেশ্বরীর হাতের চিরুনি দ্রুততর বেগে চলতে লাগল। সান্ত্বনা বলতে লাগল সব। সুরেশ্বরী দেবী কেবল মাঝে মাঝে অস্ফুটকণ্ঠে কাতরোক্তি করে উঠছিলেন, মনে হচ্ছিল বুঝি চুলের জটে চিরুনি আটকে গিয়ে লাগছে তাঁর। অবিরাম চিরুনি চালনায় হয়তো সত্যিই লাগছিল।

সান্ত্বনা কিছু গোপন কবলে না। যা যা ঘটেছিল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করে গেল সব। সুরেশ্বরী দেবীও ঘাড় বেঁকিয়ে চিরুনি চালাতে চালাতে সব শুনলেন।

"এই হয়েছে। এখন কি করি বল, মাসীমা। আমাকে উদ্ধার করো তুমি এখন কোনরকমে— আমি মনে করলুম আগে পৌঁছে যাব—তাই"—সান্ত্বনার গলার স্বর কেঁপে গেল।

"তোর বয়স কি কোনদিনই বাড়বে না, পোড়ামুখী, বুদ্ধি কি কোনদিন হবে না। এই সেদিনই কত কাণ্ড হয়ে গেল, আবার তুই এই করলি—"

ক্ষিপ্তহস্তে চিরুনিটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন সুরেশ্বরী। মাথার সমস্ত চুল বিস্রস্ত, চোখের দৃষ্টি জ্বলন্ত। সে এক অদ্ভুত মূর্তি হল তাঁর।

"কি হবে এখন"—ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন তিনি।

"কিচ্ছু হবে না, যদি ব্যাপারটা গোপন রাখা যায়। ওই ছকুবাবুর কাছ থেকে গোপন রাখলেই হবে"

"ব্রজেশ্বর যদি শোনে কি মনে করবে সে"

"সব শুনলে কি আর মনে করবে। মেসোমশায়ের মতো লোক উনিও, মহাদেবতুল্য—"

"তা যদি হয় তাহলে ভাবনা নেই। কিন্তু আমি তোর আক্কেলের কথা ভাবছি কেবল! কি বলে তুই সুশোভনবাবুর সঙ্গে একা এলি! তার বউ যদি শোনে কি ভাববে। ছি ছি, এতটুকু হুঁশ নেই তোদের! এক-ঘরে শুতে গেলিই বা কি করে। মনে পাপ ছিল না মানলাম না হয়, কিন্তু দৃষ্টিকটু তো। ছি ছি ছি! আর ওই সুশোভনই বা কি রকম ছেলে। তারও তো ভাবা উচিত ছিল আজকালকার ছেলেমেয়ে কি যে হচ্ছ, মা, তোমরা। সেদিন এত কেলেঙ্কারি হল, আবার তুই এই করলি—"

"আমি তোমার কাছে তাড়াতাড়ি এসে পড়ব বলেই তো ওঁর সঙ্গে ট্যাক্সিতে এলাম। আমি ইচ্ছে করে তো আর কিছু করিনি, হয়ে গেল, কি করব"

অভিমানে সান্ত্বনার গলার স্বর কেঁপে উঠল একটু। সুরেশ্বরী একনজর তার দিকে তাকালেন। মা-হারা মেয়েটা। একেবারে ছেলেমানুষ এখনও।

"তুমি ভিজে সেমিজ কাপড় ছেড়ে ফেল আগে। ঠাণ্ডা লেগে যাবে তোমার"

"আমার অত সহজে ঠাণ্ডা লাগে না। গরম বোধ হচ্ছে। তুই এখন কি করতে চাস্ বল!"

"আমি গাড়ি করে স্টেশনে যাই। আর কারও সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমার সঙ্গে ওঁর দেখা হওয়ার দরকার। তারপর উনি আবার হঠাৎ এত শিগ্‌গির কি করে ফিরে এলেন তার কারণ একটা বার করা যাবে দুজনে মিলে"

"মিছে কথা বলবি?"

"বলব না?"

"না। মোটামুটি সত্যি কথাটাই বলতে হবে সকলকে। কিন্তু এমনভাবে বলতে হবে যাতে—ওই যে কি একটা কথা আছে—সাপও না ভাঙে—না না ঠিক উল্‌টো বুঝি"

"সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে? কিন্তু কি করে করবে সেটা"

"তা জানি না, মা। তারই বা দরকার কি? এখানে সবই তো ঘরের লোক"

"ছকুবাবু"

"ওঁকে বলে দিলে উনি কাউকে কিছু বলবেন না। উনি সম্পর্কে আমার দাদা—"

সান্ত্বনা মাথা নাড়লে।

"না, ওঁকে বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। আচ্ছা, ওঁকে বিকেলে কোনও রকমে সরিয়ে ফেলতে পারা যায় না বাড়ি থেকে ঘণ্টা খানেকের জন্যে?"

"তুমি কোথায় কি কাণ্ড করে এসেছ তার জন্যে আমি ওঁকে কোথায় তাড়াই বল এখন"

"তাড়াতে বলছি না তো। সরিয়ে দিতে বলছি। তুমি কাপড় সেমিজ ছেড়ে ফেল না আগে"

আলনা থেকে একটা শুকনো সেমিজ এবং শাড়ি নিয়ে জোর করে সুরেশ্বরীর হাতে গুঁজে দিল সে।

"এই বাড়িতেই যদি ওঁকে কোনও ঘরে অন্যমনস্ক করে রাখতে পার তাহলেও হবে"

"চেষ্টা করব"

কাপড় এবং সেমিজ নিয়ে পাশের ঘরে গেলেন সুরেশ্বরী। সেখান থেকেই কথা বলতে লাগলেন।

"ছি ছি এতটুকু বুদ্ধি কি নেই! এই সেদিন এত কেলেঙ্কারি, আবার এই! আমারই শুনে কেমন করছে! আর কারও ব্যাপার হলে বিশ্বাসই করতাম না যে এর মধ্যে কোনও কু-মতলব

নেই। এ কথা বাইরের লোক যদি শোনে তোকে কি ছেড়ে কথা কইবে এবার? চিনি তো সবাইকে। সেবার কিছুই ছিল না তাতেই অত—"

"আমার নিজের জন্যে হলে আমি কোনও তোয়াক্কাই করতাম না", এ ঘর থেকে জবাব দিলে সান্ত্বনা, "আমার খালি ভয় হচ্ছে ওঁর সুনামে যদি কোন আঁচড় লাগে। আমার জন্যে যদি ওঁর বদনাম হয় তাহলে আমি গলায় দড়ি দেব"

"হয়েছে হয়েছে, খুব হয়েছে। চুপ কর"

"তখন থেকে কেবল বকে যাচ্ছ আমায়"

সুরেশ্বরী কোনও উত্তর দিলেন না। কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টি থেকে স্নেহ উপচে পড়তে লাগল। সেমিজ কাপড় ছেড়ে পাশের ঘর থেকে যখন বেরিয়ে এলেন তখন একেবারে আলাদা লোক।

"আচ্ছা, যা হয়েছে হয়েছে। এখন কি করা যায়—"

"তুমি যা বলবে তাই করব"

"কিন্তু কি বলব তাই যে ভেবে পাচ্ছি না। ব্রজেশ্বর আব সুশোভনের স্ত্রী যদি জিনিসটাকে ভালভাবে নেয় তাহলে ব্যাপারটা সোজা হয়ে যায়। তার পর ওই লোকটাকে সামলাতে হবে—বজরং না কি নাম—সে বোধ হয় মোটরসাইকেল ছুটিয়ে ছিপছররামারিতে গিয়ে বক্তৃতা করছে এতক্ষণ"

তাঁর এ অনুমান মোটেই মিথ্যা নয়।

"যাক গে। এখন ওঁকে ব্যাপারটা বলা দরকার। আমিই বলি। উনি কি বলেন শোনা যাক। তারপর দুজনে মিলে উপায় বার করতে হবে একটা। করতেই হবে"

হঠাৎ যেন একটা প্রেরণা পেলেন সুরেশ্বরী দেবী। বিপদের সময় এই ধরনের প্রেরণা পান তিনি মাঝে মাঝে। সেবার যেমন হল। এক হাঁড়ি পোলাওয়ের তলা ধরে গেল। সবাই যখন মহা চিন্তিত কি হবে—মান্য অতিথিরা খেতে বসেছেন—তখন সুরেশ্বরীই উপায় বার করলেন। বললেন—থাক, নেড়ো না, একটা হাঁড়িতে ঘি গরম-মশলা চড়িয়ে দাও—আর পোলাওটা উপর উপর থেকে ঢেলে দাও তাতে। তাই করা হল। টের পর্যন্ত পেল না কেউ।

সুরেশ্বরী 'ওঁকে' বলতে গেলেন। ব্যাপারটা খুব সহজ হল না কিন্তু। দিগ্বিজয় ব্যাপারটা বুঝতে প্রথমতঃ অনেক দেরি করলেন। বারংবার সব গুলিয়ে যেতে লাগল তাঁর। তারপর অনেক কষ্টে যদি বুঝলেন, বিশ্বাস করতে চান না। সুরেশ্বরী যখন তাঁকে অবশেষে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে অবিশ্বাস্য হলেও ব্যাপারটা সত্য, তখন সমস্ত দোষটা সুশোভনের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করে অনেকক্ষণ সময় নষ্ট করলেন তিনি। কিন্তু সুরেশ্বরী যেই বললেন যে তাঁর মতে সান্ত্বনার দোষও কিছু কম নয় অমনি তিনি সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, সান্ত্বনারই তো সব দোষ!"—তখন সুরেশ্বরীকে বাধ্য হয়ে আবার সুশোভনের দোষ-কীর্তন করে সান্ত্বনার অপরাধ লঘু করবার প্রয়াস পেতে হল। আধ ঘণ্টার মধ্যে অবস্থা এমন দাঁড়াল, যাকে খবরের কাগজের ভাষায় 'সঙ্কটজনক পরিস্থিতি' বলা যেতে পারে। সুরেশ্বরী প্রথমে যা বলেছিলেন দিগ্বিজয় বদ্ধপরিকর হয়ে তাই সমর্থন করতে লাগলেন এবং সুরেশ্বরী নানাভাবে প্রমাণ করতে লাগলেন যে দিগ্বিজয় প্রথমে যা বলেছিলেন তাই ঠিক, ভুল সুরেশ্বরীরই হয়েছিল। কেউ এক-ইঞ্চি হঠতে রাজি নন।

এ সমস্যা অমীমাংসিত রেখে সুরেশ্বরী তখন দ্বিতীয় প্রসঙ্গে মনোনিবেশ করলেন। ছকুবাবুর কৌতূহল কি করে ভিন্নমুখী করা যায়। দিগ্বিজয় বললেন ছকুবাবুর কৌতূহল ভিন্নমুখী করতে হলে ওঁকে ভিন্ন স্থানে চালান করে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ বাড়িতে রেখে ওঁকে সামলানো অসম্ভব। এর থেকে নূতন একটা প্রেরণার উদ্ভব হল। প্রেরণাটা আসলে দিগ্বিজয়ের মনেই প্রথম উদ্ভুত হয়েছিল, কিন্তু দিগ্বিজয় কৌশলে কৃতিত্বটা সুরেশ্বরীর উপরই আরোপ করলেন। সুরেশ্বরীও মেনে নিলেন সেটা। কারণ এর সঙ্গে সামান্য একটু মিথ্যা জড়িত ছিল। স্বামীর নাম তার সঙ্গে জড়াতে ইচ্ছা হল না তাঁর এবং বুদ্ধি করে সে কথাটা চেপে গেলেন তিনি। প্রকাশ করলে মুশকিল হতো। দিগ্বিজয় যদি ঘুণাক্ষরে টের পায় যে তাঁকে বাঁচাবার জন্য সুরেশ্বরী নিজের ঘাড়ে এই মিথ্যা-দুষ্ট প্রেরণার কৃতিত্ব নিতে চাচ্ছেন তাহলে নিজেই দাবি করে বসতেন সেটা। আর একটা সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হতো।

রীতিমত একটা নাটকের অভিনয় করবার সুযোগ পেয়ে দিগ্বিজয় মনে মনে খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন (যৌবনে তিনি সত্যিই ভাল অভিনেতা ছিলেন একজন) এবং এমন একটা অপ্রস্তুত ভাব মুখে ফুটিয়ে বৈঠকখানায় প্রবেশ করলেন যার অকৃত্রিমতায় সন্দেহ করার ক্ষমতা ছকুবাবুর অন্ততঃ ছিল না।

"ও মশায়, ভারী একটা মুশকিলে পড়ে গেছি"

"মুশকিল? কিস্ কিসিম্ কি?" ভ্রূযুগল উত্তোলন করে প্রশ্ন করলেন ছকুবাবু।

"কি হল"—ক্ষুধার্ত গোবর্ধনবাবু বললেন। তাঁর ভয় হল জলযোগ ব্যাপারেই গোলযোগ হল বুঝিবা।

"আমারই দোষ। ছি ছি, কি যে করা যায় এখন"

"আরে বাতাইয়ে না, জনাব, ক্যা হুয়া"

"আপনার হুইস্কি আনা হয়নি"

"অ্যাঁ—"

বাঙলায় চিৎকার করে উঠলেন ছকুবাবু। তারপর দম নিয়ে বললেন, "বলেন কি!"

"একদম ভুলে গেছি। আমার নিজের তো অভ্যাস নেই। অবশ্য বীরু সার কাছে লোক পাঠালে এখনও পেয়ে যাব"

"তবে আর দেরি করছেন কেন। ভেজিয়ে, জল্‌দ্ ভেজ দিজিয়ে"

"কাকে পাঠাই। মুশকিল সেইখানেই। আমি নিজেই যেতাম কিন্তু আমার গোটা দুই জরুরি চিঠি লিখতে হবে এক্ষুনি! সাড়ে পাঁচটায় ডাক বেরিয়ে যায়। চিঠি লিখে যেতে গেলে বীরু সা দোকান বন্ধ করে চলে যাবে"

"বীরু সা-র দোকান কতদূর"

"তা মাইল ছয়েক। বগেন্দ্রপুর। গাড়িটা নিয়ে যেতে হবে, মানে বগিটা। মোটরে তেল আনতে গেছে। যোগেন সাধারণতঃ করে এসব—কিন্তু সে বেরিয়ে গেছে পীরনগরের হাটে। কোচোয়ানটা বিয়ে করতে গেছে, আজও ফিরল না। পরেশ ছাড়া বাড়িতে দ্বিতীয় চাকর নাই। তাছাড়া পরেশ বগি হাঁকাতে পারে না।"

"আরে, আমি তো পারি"—বলে উঠলেন ছকুবাবু।

"না, না, আপনার শরীর খারাপ—আপনার যাওয়াটা কি ঠিক হবে"

"শরীর খারাপ! পোখমনবাবুর সঙ্গে যখন থাকতাম তখন ১০৪ জ্বর নিয়ে বুনো রাস্তা দিয়ে দশ মাইল বগি হাঁকিয়ে গেছি"

"তবু আপনার একলা যাওয়া ঠিক হবে না। তবে গোবর্ধনবাবু যদি সঙ্গে যান। বগেন্দ্রপুরের রাস্তা চেনেনও উনি—"

"বেশ তো জলযোগ করে নিই। যাব সঙ্গে—"

"তাহলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ছকুবাবু নিজে গেলে বীরু বাজে জিনিস দিতে পারবে না"

এই কথায় ছকুবাবুর চোখেমুখে অবজ্ঞা ও ব্যঙ্গ মিশ্রিত এমন একটা হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল যারা অর্থ বীরু তো ছেলেমানুষ বীরুর ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ যদি সমবেতভাবে চেষ্টা করেন তাহলেও ছকুবাবুকে বাজে জিনিস গছাতে পারবেন না।

মুখে তিনি বললেন—"আজকাল বাজারেই ভাল জিনিস নেই। সমস্ত আফ্রিকান মাল—"

আপনার যেতে কষ্ট হবে না তো, দেখুন। আমারই উচিত ছিল আনিয়ে রাখা—ছি ছি—"

"আরে না, না—কুচি ভি নেই—ইয়ে তো মামুলি বাত হ্যায়—"

"আপনার বাতটা বেড়েছে শুনলাম"

"বাত? না। লিভারটা গড়বড়িয়েছিল, কিন্তু এখন আর কিছু নেই। আর দেরি করবেন না। গোবর্ধনবাবু তৈরি হন—"

"জলখাবারটা আসুক। জলযোগটা সেরেই বেরুই"

"আরে জলযোগ পরে করবেন মশাই। জলের অভাব কোনও দিন হবে না। নিন তৈরি হয়ে নিন। চটপট—"

জলখাবার এসে পড়ল।

দিগ্বিজয় বগির ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে গেলেন।

।। একুশ ।।

ধীর দৃঢ় পদক্ষেপে ব্রজেশ্বরবাবুও যখন 'হল'-ঘরে প্রবেশ করলেন তখন প্রমাদ গুনতে হল সুশোভনকে। কি বলবে ভগবানই জানেন। সরে পড়ারও উপায় নেই কোনও। ব্রজেশ্বর 'হলে' ঢুকেই পকেট থেকে রুমাল বের করে হেঁট হয়ে পায়ের গোছ আর জুতো থেকে ধুলো ঝাড়লেন। তারপর স্থিরদৃষ্টিতে সুশোভনের দিকে চাইলেন তিনি। সুশোভনের দৃষ্টি অবশ্য স্থির ছিল না মোটেই। একটা জিনিস তার মনে হল। ভদ্রলোকের ভাবভঙ্গি বেশ ভদ্রই, শত্রুতার কোন আভাস তো পাওয়া যাচ্ছে না। দৃষ্টি থেকে যা বিকীর্ণ হচ্ছে তা বেশ ভদ্র। বিস্মিত হল।

"মশায়ের নামটি কি জানতে পারি"—আচমকা যদিও প্রশ্নটা করলেন তিনি, কিন্তু শান্তভাবে।

যথাসম্ভব সাহস সংগ্রহ করে মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করলে সুশোভন, তারপর জবাব দিলে, "কেন বলুন তো"

"যতদূর মনে হচ্ছে আপনি আমার স্ত্রীর বন্ধু একজন। কৌতূহলটা সুতরাং অহেতুক নয় নিতান্ত"

"আমার নাম সুশোভন নন্দী"

"ও নমস্কার"

সুশোভন এটা প্রত্যাশা করেনি। প্রতি-নমস্কার করলে সে।

"আমার স্ত্রীর সঙ্গে কতদিন থেকে আলাপ আপনার? অনেক দিনের, নয়?"

"হ্যাঁ, তা হবে বই কি"

"আমার পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই, আশা করি"

"না। আপনার নাম তো আপনার বাক্সেই লেখা রয়েছে"

"ও, ওটা আমারই বাক্স তাহলে"

ব্রজেশ্বরবাবুর বাম ভ্রূটা ঈষৎ নড়ে উঠল উপরের দিকে।

"ওটা, আপনার বাক্স নয়?"

"কি জানি! হয়তো ওটাও আপনি দাবি করে বসবেন এখনি স্বচ্ছন্দে"

পুনরায় ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত হল বাম ভ্রূ।

কাছে-পিঠে অপ্রত্যাশিত গন্ধ ছাড়লে আমরা যেমনভাবে নাক কোঁচকাই, সুশোভন তেমনি করলে দু'একবার। কোনও জবাব দিলে না।

ব্রজেশ্বরবাবু বললেন, "দেখুন, গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এমন একটা কাণ্ড হয়ে গেছে যার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না আমি। আপনি হয়তো কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে পারবেন। মনে হচ্ছে—আমার স্ত্রী কাল তাঁর গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারেননি এবং এখানে কাল রাতটা কাটিয়ে গেছেন। আপনিও ছিলেন নাকি তাঁর সঙ্গে?

"থাকবার বাধাটা কি"—হঠাৎ বেখাপ্পা এবং ঈষৎ অভদ্র জবাবটা বেরিয়ে পড়ল সুশোভনের মুখ থেকে।

"ছিলেন তাহলে?"

"ছিলাম"

"ছিলেন। কেন?"

"থাকবার বাধাটা কি"—আবার বললে সুশোভন। ব্রজেশ্বরের ভ্রূটা আবার নড়ে উঠল উপরের দিকে।

"বাধা কোনও নেই জানি। আমার প্রশ্নটা সে সম্পর্কে নয়। আমি শুধু জানতে চাইছি আমার স্ত্রী এবং আপনি কি করে এই হোটেলে এসে পড়লেন একসঙ্গে"

"কারণ আমরা দুজনে একসঙ্গে একই ট্রেন ফেল করেছিলাম"

"ও তাই বুঝি? তারপর"

"আমরা দুজনে ফেল করলাম। কিন্তু আমার স্ত্রী করল না"

"আপনার স্ত্রী"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার স্ত্রী। আমারও স্ত্রী আছে"

"ও"

এই 'ও'টার মধ্যে সুশোভন একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুর শুনতে পেলে যেন। চটে গেল তৎক্ষণাৎ।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারও স্ত্রী আছে একটি, নেহাত খারাপও নয়। আশা করি আমার স্ত্রী থাকায় আপত্তি নেই আপনার"

"মোটেই না। কিন্তু ঘটনাটি কি শুনি। আপনার স্ত্রী ট্রেন ফেল করেননি, কিন্তু আপনি করেছিলেন। আমার স্ত্রীও করেছিলেন"

"হ্যাঁ। আমরা সবাই দিগ্বিজয় সিংহরায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছিলাম। আমি ট্রেন ফেল করে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করলাম, আপনার স্ত্রীও আসতে চাইলেন আমার সঙ্গে। এখান থেকে মাইল দুই দূরে ট্যাক্সিটা বিগড়ে গেল। তখন কি আর করি— খবর পেলুম এখানে এই হোটেলটা আছে—দুজনে এসে আশ্রয় নিলাম এখানে। মোটামুটি এই হল ব্যাপার। আর কিছু জানতে চান কি"

"বেশি কিছু না। এইটেই যদি আর একটু বিশদ করে বলেন বাধিত হব"

ব্রজেশ্বর ভ্রূ কুঞ্চিত করে নিজের লাঠিটার দিকে চেয়ে রইলেন।

সুশোভনের মনে হল লাঠির গাঁটের মতো লোকটির ভ্রূতেও গাঁট পড়ে গেল যেন। বিশদভাবে শুনতে চায় সব। মানে সুশোভনের বুকের ভিতরটা কেমন যেন জ্বালা করতে লাগল। আচ্ছা কাঠখোট্টা বেরসিক লোক তো! বিশদ করে বলা যায় নাকি সব! সান্ত্বনার মতো মেয়ে কি করে এই নীরস লোকটাকে পছন্দ করে বিয়ে করেছে! আশ্চর্য।

"আপনি নিজে যখন বিবাহিত"—ব্রজেশ্বর বললেন ধীরে ধীরে—"তখন আমার মনোভাব নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন। এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার ফলে আমার স্ত্রীর কোনও অসুবিধা হয়েছিল কিনা তা জানতে চাওয়াতে আশা করি আপনি রাগ করছেন না। এখানে তো দেখছি স্থানাভাব খুবই। আপনাদের শোওয়ার খাওয়ার কষ্ট হয়নি তো"

"সে আমরা ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম একরকম করে"—

সুশোভন যতটা সম্ভব ভদ্রভাবে বললে।

"ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন? নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এখানে ঘর তো মোটেই নেই দেখছি। একটিমাত্র স্পেয়ার রুম, শোবার জায়গাও পেয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ"—ব্যাপারটা যেন কিছুই নয়, এমনই একটি ভাব দেখিয়ে সুশোভন এগিয়ে গেল জানলার দিকে।

"পেয়েছিলেন? আপনাকে তাহলে গোঁসাইজির সঙ্গে শুতে হয়েছে বলুন। কারণ দ্বিতীয় ঘরটিতে তো একটি অসুস্থ মহিলা রয়েছেন, তৃতীয় ঘর তো আর চোখে পড়ল না! তাহলে আপনি—"

প্রত্যুত্তরে সুশোভন বোঁ করে ঘুরে এমন কয়েকটা কথা বলে ফেললে যা অনুত্তেজিত অবস্থায় সে বলতো না হয়তো।

"বিশ্বাস করুন মশাই, কোনও রকম নোংরামির মধ্যে ঢুকিনি আমরা। সান্ত্বনা দেবীর মতো সতীলক্ষ্মী স্ত্রীকে আপনার যদি সন্দেহ হয়, তাহলে এ-ও আমি বলব যে আপনি ও-রকম স্ত্রীর যোগ্য নন"

ব্রজেশ্বরের মুখভাবে কোনও রকম উষ্মার লক্ষণ দেখা গেল না। তাঁর শান্ত চোখ দুটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল শুধু। মনে হল ক্ষণিকের জন্যে যেন তিনি ঈষৎ অসংযত হলেন যখন এগিয়ে গিয়ে সুশোভনের কাঁধে হাত রেখে বললেন, "চটবেন না—"

"কোনও রকম নোংরামি ছিল না বিশ্বাস করুন"

"নোংরামির কথা বার বার বলছেন কেন। ও-কথা তো আমি একবারও ভাবিনি! আমার স্ত্রীকে আমি চিনি ভাল করে"

সুশোভন ক্ষণকাল হাঁ করে চেয়ে রইল এ-কথা শুনে।

"ভালভাবে চেনেনই যদি, তাহলে আর এত জেরা করবার মানেটা কি!"

"তাহলে আর এত সব খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজনটা কি বলুন"—না বলে পারলে না সে।

"ব্যাপারটা কি ঘটেছে জানতে চাই। সব খুলে বলুন দিকি"

"খুলে বলবার তো কিছু নেই। আপনি অনর্থক এ-রকম একটা গোয়েন্দা-গোয়েন্দা ভাব নিয়েছেন কেন বুঝতে পারছি না। এ-রকম ঠেস দিয়ে দিয়ে কথা বলবারই বা মানে কি। আপনার স্ত্রীর যাতে কোনও রকম কষ্ট বা অসুবিধা না হয় আমি তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। প্যাঁচেও পড়েছি তার জন্যে, বেশ কিছু ঘোল খেয়েছি, খাচ্ছি এবং আরও কিছু খেতে হবে সম্ভবতঃ। আর এতক্ষণ পরে আপনি এসে অনুসন্ধান করছেন! আপনি কি মনে করেন যে সুবোধ বালকেরা যেমন দাঁড়িয়ে স্কুলে গড়গড় করে পড়া বলে যায় তেমনি করে আমি কালকে রাত্রে যা যা ঘটেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করে যাব? তা করলে সান্ত্বনার প্রতি একটু অবিচার করা হবে না কি?"

মাথাটি ঈষৎ ঝুঁকিয়ে ব্রজেশ্বর বললেন, "মানছি—আপনাদের কথা! যতটুকু খোঁজ করেছি তাতে বুঝেছি যে শোওয়ার ব্যাপার নিয়ে বিপদে পড়েছিলেন আপনারা। হয়তো আমার অজ্ঞাতসারে এমন দু-একটা কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে যা আপনার 'ঠেস' বলে মনে হচ্ছে, মাপ করবেন সেজন্য। আপনার অবস্থাটা বুঝতে পারছি আমি, আপনিও আমার অবস্থাটা বুঝুন। কি হয়েছিল বলুন দেখি সব খুলে'

উত্তরে সুশোভন অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যে নাকের ডগাটা ধরে কচলালে একটু। তারপর ঢোঁক গিয়ে বললে, "বললে আপনি বিশ্বাস করবেন কি"

"খুব যদি অবিশ্বাস্য হয়"—গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ব্রজেশ্বর—"তাহলে স্ত্রীর মুখ থেকে সমস্ত না শোনা পর্যন্ত খুব সম্ভব বিশ্বাস করতে পারব না। তবুও শুনিই না, শুনতে তো ক্ষতি নেই"

"ছাড়বেন না যখন শুনুন"—আবার নাকটা চুলকুলে সুশোভন—"কিন্তু অগেই বলে রাখছি বিশ্বাস হবে না। মনে হবে বানিয়ে বলছি"

"বলুনই তো"

দুজনে বসলেন দুটো চেয়ারে।

"কিন্তু দেখুন, বলবার আগে, মানে আমি আবার জিগ্যেস করতে চাই আপনাকে—সান্ত্বনার, মানে আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে যে মনোভাব আপনি এইমাত্র প্রকাশ করলেন, অর্থাৎ তাকে ভালভাবেই চেনেন আপনি, সেটা ঠিক তো, মানে তার চরিত্র সম্বন্ধে আপনার কিছুমাত্র সন্দেহ যদি হয়ে থাকে তাহলে, মশাই, আমি—কারণ—"

"দেখুন অনেক বিষয়েই হয়তো আপনার সঙ্গে আমার মতের গরমিল হবে। ধরুন যেমন, শোওয়ার ব্যাপারটা সম্বন্ধে, যতদূর বুঝতে পারছি, আপনার ব্যবস্থাটা হয়তো সুবুদ্ধিসঙ্গত মনে হবে না আমার। কিন্তু যে বিষয়ে সামান্যতম মতদ্বৈধ হবার সম্ভাবনা নেই তা নিয়ে আপনি অত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন। আপনি যদি বারংবার বলেন যে আমি আমার স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে

সন্দিহান, তাহলেই বরং আপনার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যেতে পারে আমার। আমি যখন বলছি যে আমি আমার স্ত্রীকে ভালভাবে চিনি তখন তাই কি যথেষ্ট নয়"

"বেশ, বলছি তবে সব। দেখুন, 'লোকতঃ ধর্মতঃ' বলে যে কথাটা আছে, তার ধর্মতঃ অংশটুকু ঠিক আছে, লোকতঃ অংশটুকু হয়তো নেই। ওটুকু বাঁচাতে গিয়ে যথেষ্ট দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে, তবু হয়তো বাঁচাতে পারিনি; তা আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি। এতে যদি আপনি চটে ওঠেন তাহলে"

"আহা, আপনি শুরুই করুন না—"

শুরু করাটাই শক্ত মনে হতে লাগল সুশোভনের। তবে ব্রজেশ্বরবাবুর কথাবার্তা থেকে মনে বল পেয়েছিল সে। ভদ্রলোক শত্রুভাবাপন্ন নন মোটেই। তবু কাহিনীর যে অংশটুকু ঈষৎ ইয়ে-গোছের সেখানটায় সে বারংবার হোঁচট খেতে লাগল। ব্রজেশ্বর গম্ভীরভাবে শুনে যেতে লাগলেন। মুখের একটি পেশীও বিকম্পিত হল না তাঁর। সুশোভন গোপনও করলে না কিছু, একাধিক স্থানে হোঁচট খেতে হল যদিও, তবু গোড়া থেকে সমস্ত ব্যাপারটার বিশদ বর্ণনা করে গেল সে। ব্রজেশ্বর দেওয়ালের দিকে চেয়ে নির্বিকারভাবে শুনলেন সব।

সমস্ত বলবার পর সুশোভন হাত উলটে বললে, "এই হয়েছে। বিরাট জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেছে একটা। এর জন্যে আপনি আমাকেই যদি দায়ী করতে চান—চাইবেন নিশ্চয়ই—তাহলে তাই করুন"

ব্রজেশ্বরবাবুর চোখ দেওয়ালেই নিবদ্ধ হয়ে রইল। কেবল বিস্ফারিত হল ঈষৎ।

একটু থেমে তিনি বললেন, "হ্যাঁ। দায়ী আপনাকেই আমি করব। কিন্তু জগাখিচুড়ির চেয়ে ঢের বেশি গুরুতর জটিলতার সৃষ্টি করেছেন আপনি। উপযুক্ত কথা খুঁজে পাচ্ছি না"

"খুবই দুঃখিত আমি, সত্যি বলছি"—এ ছাড়া আর অন্য কোনও কথা যোগাল না সুশোভনের মুখে।

"দেখুন আমার পরিবার, মানে সান্ত্বনা দেবী"—ব্রজেশ্বর ধীরে ধীরে চেয়ার ঠেস দিয়ে বসলেন এবং এতক্ষণ পরে সুশোভনের দিকে চাইলেন—"অত্যন্ত সহৃদয় মহিলা। চলতি বাঙলায় যাকে 'বুঝদার' বলে। তার জন্যে কারও কোনও কষ্ট বা অসুবিধা হচ্ছে এ সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। কিন্তু তার এই কোমলতার সুযোগ নেওয়াটা আপনার উচিত হয় নি"

"আমি নিই নি তো"

"নিয়েছেন বই কি। যাক, আমরা দুজনে এখনই মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরী যাচ্ছি. সান্ত্বনার সঙ্গে দেখা হলে একথা তাকে বলবেন না যেন। তার এই সদয় সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারে যে আমি আপত্তি করেছি একথা যেন সে না শোনে"

"আরে, গ্র্যান্ড লোক তো"—হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল সুশোভনের মুখ থেকে। তারপর সামলে নিয়ে বলল, "সত্যি, চমৎকার লোক আপনি, মশাই। সাধারণতঃ, এ-রকমটা চোখে পড়ে না। বাঃ, গ্র্যান্ড"

সুশোভনের ভীতু-ভাবটা কেটে গেল।

"আমি ভাল লোক কিনা জানি না, তবে আমি যুক্তিকে অনুসরণ করতে ভালবাসি। যুক্তিকে অনুসরণ করতে ভালবাসি বলেই একটা অনুরোধ আপনাকে করছি, আশা করি তা আপনি প্রত্যাখ্যান করবেন না।"

"নিশ্চয় না। কি বলুন"

"আপনি চলুন আমার সঙ্গে মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরীতে। আর একটা কথাও বলছি, ক্ষমা করবেন, আপনি এতক্ষণ যা বললেন তা এমনই অদ্ভুত যে আমার স্ত্রীর মুখ থেকে তার সমর্থন না পাওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছি না"

হঠাৎ ব্রজেশ্বরবাবুর মুখভাব ঈষৎ কঠিন হয়ে উঠল।

"বেশ তো"—সুশোভন হেসে উত্তর দিলে বটে, কিন্তু তার হাসিটা কাষ্ঠহাসির মতো দেখালো—"বেশ, চলুন যাই আপনার সঙ্গে"

"দেখুন, সুশোভনবাবু, আপনি যা বললেন তার সঙ্গে সান্ত্বনা দেবীর বর্ণনা যদি না মেলে অর্থাৎ আমি যদি বুঝতে পারি যে আপনি জোর করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সহৃদয়তার সুযোগ নেবার চেষ্টা করেছেন, তাহলে হয়তো হঠাৎ আমি মধ্যযুগীয় হয়ে পড়ব অর্থাৎ আপনাকে নাগালের মধ্যে পেলে খুশি হব"

"ভয় নেই, পালাব না আমি, কারণ একটি কথাও আমি গোপন করিনি"

"ধন্যবাদ। এ ব্যবস্থায় আপনার আপত্তি নেই জেনে সুখী হলাম"

"কিছু আপত্তি নেই। কিন্তু একটা কথা আছে। আমার স্ত্রী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকদের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করতে হবে আমাকে। আপনার যদি আপত্তি না থাকে আমার স্ত্রীকেও আমি তুলে নিতে পারি আমাদের সঙ্গে। আমার স্ত্রী হয়তো বেঁকে দাঁড়াবে প্রথমটা, যেতে চাইবে না, কারণ আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ নানা কথা বলে এতক্ষণ তাকে হয়তো এমন করে তুলেছেন যে"

"আপনার শাশুড়ী ঠাকরুণ কি সব ঘটনা জানেন?"

"এখনও জানেন না। কিন্তু জেনে ফেলবেন"

"আমার মনে হয় যতক্ষণ না আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একা দেখা করছেন ততক্ষণ তাঁকে, মানে আপনার শাশুড়ী ঠাকরুণকে, ব্যাপারটা পুরোপুরি জানতে না দেওয়াই ভালো"

"তা তো বুঝছি। কিন্তু ঠেকাব কি করে"

"বলছি। আমি একজনের কাছ থেকে খবর পেয়ে তবে এখানে এসেছি, তা না হলে তো আমি এখানে আসতামই না। এখন বুঝতে পারছি তিনি অপর কেউ নন, তিনি আপনাদের বন্ধু সদারঙ্গবিহারীলাল।

"ও, সেই বাক্যবাগীশ লোকটা"

"আপনার স্ত্রী এবং শাশুড়ীর সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। তা যদি হয়ে থাকে তাঁরা হয়তো নানা রকম সন্দেহ করছেন আপনার সম্বন্ধে। আমাদের ধরে নেওয়াই বোধ হয় ভালো— যে তাঁরা শুনেছেন সব এবং তদনুসারে চলা উচিত"

"কি করে?"

"মানে, সত্যকে যদি একটু—"

"তাতে আমার আপত্তি নেই। শাশুড়িকে ভাঁওতা দেবার জন্যে অনর্গল মিছে কথা বলতে রাজি আছি আমি। কিন্তু তাঁকে আপনি চেনেন না। একটি 'চীজ' যাকে বলে। সহজে তাঁকে বাগানো যাবে বলে মনে হয় না। অথচ সত্যি কথাও বলা যাবে না, তাতে ভয়ানক বিপদ। আপনি যেমন ভদ্রভাবে

ব্যাপারটা নিলেন উনি তেমনভাবে নেবেনই না। আমি অবশ্য আপনাকে আমার জন্যে মিছে কথা বলতে অনুরোধ করতে পারি না, নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু মানে—''

ব্রজেশ্বরবাবু তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। তড়াক করে ওঠাটা ব্রজেশ্বরবাবুর মতো লোকের পক্ষে বেমানান একটু। মনে হল কোন প্রয়োজনীয় ব্যাপারে যেন ভুলে গিয়েছিলেন, হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তাঁর মুখের ভাবও বদলে গেল। কণ্ঠস্বরে নূতন সুর বাজল একটা।

''দেখুন সুশোভনবাবু, অত্যন্ত ভীত হয়ে আমি এই হোটেলে ছুটে এসেছিলাম। মনে হয়েছিল আবার বুঝি নূতন আর একটা বিপদ ঘনিয়ে এল। সান্ত্বনার সুনামের চেয়ে প্রিয়তর আমার আর কিছু নেই। সে সুনাম ইতিপূর্বে একবার বিপন্ন হয়েছিল। আপনাকে অবশ্য ধন্যবাদ দেওয়ার বিশেষ কিছু নেই যদিও আপনি আপনার দিক দিয়ে সে সুনাম রক্ষা করবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিপদ এখনও কাটেনি এবং সেটুকু কাটাবার জন্যে যে কোনও উপায় অবলম্বন করতে আমি পশ্চাৎপদ হব না—তা সে 'সু' 'কু' যাই হোক—''

''বাঃ, চমৎকার! আমি যে জটটা পাকিয়ে ফেলেছি, বিশ্বাস করুন, তার জন্যে অত্যন্ত দুঃখিত আমি। কিন্তু এ-ও বিশ্বাস করুন সে জট ছাড়াতে প্রাণপণে সাহায্যও আমি করব আপনাকে''

ব্রজেশ্বরবাবু কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন। তিনি বললেন, ''বেশ, আপনি তাহলে আপনার স্ত্রীকে বুঝিয়ে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন। তাঁর সঙ্গে কে কে থাকবেন আশা করেন''

''শাশুড়ী তো থাকবেনই, শ্বশুরও হয়তো আছেন। শ্বশুরমশাই লোক ভালো, তিনি কোনও গোলমাল করবেন না, কিন্তু শাশুড়ীকে সামলানোই মুশকিল''

''তাঁকে আমি সামলাব''

''ও তাহলে তো বেঁচে যাই। টেলিফোনে আমি যা শুনলাম তাতে তো তাঁদের এতক্ষণ এখানে এসে পড়া উচিত ছিল। কিভাবে 'প্রসিড্' করব তা আগে থাকতে একটু ঠিক করে নিলে হত না?''

ব্রজেশ্বরবাবু সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন।

গম্ভীরভাবে তিনি বললেন, ''একটু চায়ের চেষ্টা করা যাক আগে''

''ঠিক বলেছেন''

।। বাইশ ।।

''এই সেই জায়গা''—স্বয়ম্প্রভা চেঁচিয়ে উঠলেন এবং ড্রাইভারের মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে নিজের বেঁটে ছাতার বাঁট দিয়ে মোটরের জানলার কাছে আঘাত করতে লাগলেন।

''থামাও, থামাও গাড়ি, এই ড্রাইভার, শুনতে পাচ্ছো না, নাকি। থামতে বলো ওঁকে, ঘুমুচ্ছ নাকি তুমি—''

জিতুবাবু ঢুলছিলেন। চমকে উঠে অপ্রস্তুত মুখে বললেন, ''কতদূর এলাম আমরা? ঢুল ধরেছিল একটু''

"ফৎমোরংপুর। নাব"—বেশ ঝেঁজে জবাব দিলেন স্বয়ম্প্রভা। জিতুবাবু অবিশ্বাসভরে ড্রাইভারের দিকে চাইলেন।

"আমরা এসে গেলাম নাকি?"

ড্রাইভারও ঠিক করতে পারছিল না কিছু। হোটেলের মতো কি একটা সে এইমাত্র অতিক্রম করে এল। পিছন দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে সেই দিকেই চাইতে লাগল সে।

জিতুবাবু আবার জিগ্যেস করলেন, "আমরা এসে গেলাম নাকি"

"তাই তো মনে হচ্ছে"

"বেশ দূর আছে তো। সেই কখন চড়েছি—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, দূর আছে বই কি। যতটা আন্দাজ করেছিলাম তার চেয়েও দূর"

"বাঙলা দেশ পার হয়ে এলাম নাকি?"

"আজ্ঞে প্রায় তাই বটে। রাস্তাও দারুণ খারাপ"

"কি কাণ্ড"—অস্ফুট কণ্ঠে বললেন জিতুবাবু।

"তুমি নাববে কিনা"—ধমকে উঠলেন স্বয়ম্প্রভা এবং অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে চাইলেন ভর্তার দিকে।

"নাবব, কিন্তু একটু সবুর কর। ড্রাইভার গাড়ি ব্যাক করবে এখুনি। ওহে, গাড়িটা ব্যাক করে ওই হোটেলটার সামনে নিয়ে চল। নাবছি, একটু সবুর কর না। গাড়ি ব্যাক করার সময় নাবতে গিয়ে একজনের পা ভেঙে গিয়েছিল আমি জানি"

"তা তো জানবেই। যত সব উজবুক গাড়োলের খবরই তো রাখ তুমি"

স্বয়ম্প্রভার চোখের দৃষ্টি থেকে আর এক ঝলক আগুন নির্গত হল।

"দেখো দেখো"— জিতুবাবু ড্রাইভারকে বললেন—"আর একখানা মোটর রয়েছে। ধাক্কা মেরো না যেন"

ড্রাইভার নানারকম কৌশল করে অবশেষে গাড়িটা ব্রজেশ্বরবাবুর মোটরের পিছনে এনে লাগালে—স্বয়ম্প্রভা অবতরণ করলেন এবং নাক কুঁচকে এমনভাবে নিঃশ্বাস টানতে লাগলেন যেন তাঁকে আঁস্তাকুড়ের মাঝখানে নাবিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনীতাও নাবল। জিতুবাবু ড্রাইভারকে কি যেন বলছিলেন। বলতে বলতে ভীতভাবে একবার স্ত্রীর দিকে চাইলেন। ব্যাপারটা বুঝতে স্বয়ম্প্রভার দেরি হল না।

"কি? থাকতে চাইছে না ও? আচ্ছা, আমি ওর সঙ্গে কথা কইছি। গাড়ি থেকে ব্যাগটা নাবিয়ে নাও, আর তুমি দয়া করে সরে থাক একটু"

দৃঢ় পদবিক্ষেপে স্বয়ম্প্রভা এগিয়ে গেলেন মোটরের দিকে এবং সম্মুখ-সমরে আহ্বান করলেন ড্রাইভারকে।

জিতুবাবু সরে এসে ঘাড় উঁচু করে হোটেলের সাইনবোর্ডটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। অনীতা হোটেলের কপাটটা খোলা দেখে ঢুকে পড়ল ভিতরে। ভিতরে বাঁ-হাতি একটা ঘর, তার কপাটটাও খোলা। ঘরে ঢুকেই কিন্তু চেঁচিয়ে উঠল সে, পিছন থেকে কে যেন জড়িয়ে ধরল তাকে, ঘাড় ফিরিয়ে দেখে সুশোভন।

"তুমি! ওঃ—" সুশোভনের ঘাড়ে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

"বস, বস, লক্ষ্মীটি—এই চেয়ারটায় বস। ক্লান্ত হয়ে পড়েছ নিশ্চয়ই, যা রাস্তা!

একটু জিরিয়ে নাও আগে, তারপর সব বলছি। চা আনাব?"

"না, তুমি বস। কোথাও যেও না তুমি"

"ও, আচ্ছা—"

পিছনের দিকের কপাটটি সন্তর্পণে ঠেলে দীর্ঘাকৃতি ব্রজেশ্বরবাবু ঢুকলেন। ঢুকেই বেরিয়ে গেলেন।

"উনি কে"—চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করলে অনীতা।

"ব্রজেশ্বরবাবু। আমাদের বন্ধু একজন। উনিও প্যাঁচে পড়েছেন। ওঁর স্ত্রীই তো স্টেশনে কলার খোলায় পা পিছলে পড়ে যান এবং তাঁকে তুলতে গিয়েই তো ট্রেনটা ছেড়ে গেল। ছি, ছি, কি কাণ্ড"—একটু থেমে— "রাগ করেছ তো খুব?—"

অনীতার রাগ আর ছিল না। মুখে বরং হাসি ফুটেছিল। যে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে সুশোভনকে জড়িয়ে কত কথাই না সে ভাবছিল তার স্বামীর সঙ্গে সুশোভনের বন্ধুত্বও যখন অক্ষুণ্ণ আছে তখন ভাববার কিছু নেই।

পিছনের দরজায় দু-তিনটি টোকা শোনা গেল। সুশোভন উঠে গেল এবং দরজা খুলে বললে, "আসুন না আপনি ভিতরে, অনীতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই"

"না, আমি জিগ্যেস করতে এসেছি, চা আনাব কি?"

"সে সব পরে হবে, এখন ভিতরে আসুন"

ব্রজেশ্বরবাবু ভিতরে এলেন। অনীতা দাঁড়িয়ে উঠল। নমস্কার বিনিময় হল। কি বলবেন ভেবে না পেয়ে স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন ব্রজেশ্বরবাবু। বাম ভ্রূটা ঈষৎ লাফিয়ে উঠল একবার।

"ও! তুমি এখনও এখানে আছ"

স্বয়ম্প্রভা দ্বারপ্রান্তে আবির্ভূতা হয়েছিলেন এবং বরবপু দিয়ে সমগ্র দ্বারপথটা প্রায় অবরুদ্ধ করে পরিস্থিতিটা হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করছিলেন। মনে হচ্ছিল হাতে একটা বায়নাকুলার থাকলে আরও যেন মানাত। তাঁর গাম্ভীর্য কিন্তু অটুট রইল না, মনে হল পিছন থেকে কেউ ঠেলছে তাঁকে।

সুশোভন এগিয়ে এল তাড়াতাড়ি।

"হ্যাঁ। আপনারা আসছেন খবর পেয়ে ফিরে এলাম আবার এখানে। আপনারা এসে পড়েছেন, খুব ভাল হয়েছে, এমন আনন্দ হচ্ছে আমার! আসুন পরিচয় করিয়ে দিই। ইনিই অধ্যাপক ব্রজেশ্বরবাবু—আমার একজন বন্ধু—"

স্বয়ম্প্রভা দু'পা এগিয়ে এলেন এবং গম্ভীরভাবে দায়-সারা-গোছ নমস্কার করলেন একটা।

"বাবা কোথায় গেলেন, তাঁর সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দি এর"

"ভিতরে এস না তুমি, বাইরে কি করছ"—আদেশ করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"ঢুকতেই পারছি না যে। সর একটু"

স্বয়ম্প্রভা পথ করে দিতে জিতুবাবু ভিতরে প্রবেশ করলেন।

"কপাট বন্ধ করে দাও"

"দিচ্ছি দিচ্ছি"

স্বয়ম্প্রভা ব্রজেশ্বরবাবুর দিকে ফিরে বললেন—'ইনি আমার স্বামী"

ব্রজেশ্বরবাবু নমস্কার করলেন।

সুশোভন অনীতার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

"গোড়াতেই একটা কথা জানিয়ে দেওয়া দরকার"—সুশোভন বললে—"যে মহিলাটির সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে আমার দেখা হয়েছিল এবং যাঁর জন্যে শেষ পর্যন্ত আমাকে ট্রেন ফেল করতে হল তিনি এই ভদ্রলোকটির স্ত্রী"

এই সংবাদে স্বয়ম্প্রভা একটু মুষড়ে পড়লেন। কি ভাষায় সুশোভনকে তিনি আক্রমণ করবেন তা এতক্ষণ মনে মনে ভাঁজছিলেন। অনেকগুলো তীরই সুশাণিত করে রেখেছিলেন তিনি, কিন্তু এই কথা শুনে সব যেন গুলিয়ে গেল তাঁর।

"সুশোভনবাবুর স্ত্রী যে কত অসুবিধায় পড়েছিলেন তা আমি শুনেছি। এ জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত এবং লজ্জিত"—এই কথাগুলো উচ্চারিত হল ব্রজেশ্বরবাবুর মুখ থেকে। আড়চোখে একবার অনীতার দিকে চেয়ে একটু থেমে এবং ঈষৎ হেসে আবার বললেন তিনি—"আমার দিক দিয়ে অবশ্য খুবই সুবিধা হয়ে গিয়েছিল, উনি সান্ত্বনাকে মোটর করে নিয়ে এসছিলেন। সুশোভনবাবু ট্রেন ফেল করে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করেছিলেন—সময়মতো যাতে গিয়ে পড়তে পারেন, মিসেস নন্দী যাতে অপরিচিত স্থানে গিয়ে অসুবিধায় না পড়েন। আমি পরে আর একটা মোটরে এদের অনুসরণ করি"

সুশোভন সবিস্ময়ে চেয়ে ছিল। এই মার্জিত মিথ্যেকটি শুদ্ধ সংক্ষিপ্ত ভাষায় ব্যাপারটিকে বেশ গুছিয়ে এনেছেন তো! অনীতার চোখমুখ দিয়েও আনন্দের আভা ফুটে বেরুচ্ছিল জিতুবাবুও অস্ফুট ভাঙা-ভাঙা জোড়া-তালি লাগানো বাক্যাবলীর দ্বারা নিজের সন্তোষ প্রকাশ করছিলেন। স্বয়ম্প্রভা বাম হস্ত উত্তোলন করে নীরব করে দিলেন তাঁকে এবং ফোঁস করে নিঃশ্বাস টেনে নিলেন সজোরে।

"ও। কিন্তু একটা কথা আমার মাথায় ঢুকছে না। আপনার স্ত্রী আপনার সঙ্গে এলেন না কেন? তিনি তো অপেক্ষা করতে পারতেন একটু"

"নিশ্চয় পারতেন। অপেক্ষা করতে চাইছিলেনও, কিন্তু আমারই আসার ঠিক ছিল না যে। অ্যাসেমব্লীর ব্যাপারে আমাদের কংগ্রেসের পার্টি মিটিং হবার কথা ছিল একটা, যদিও শেষ পর্যন্ত হল না সেটা"

"আপনিই কি বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে!"—জিতুবাবু সসম্ভ্রমে বলে উঠলেন।

"হ্যাঁ, উনিই"—মাথা নেড়ে সমর্থন করলে সুশোভন।

ব্রজেশ্বরবাবু বিনীতভাবে নমস্কার করে বললেন—"আমি বিখ্যাত কিনা, জানি না, তবে আমি কংগ্রেসের একজন কর্মী বটে, অধ্যাপনাও করে থাকি"

জিতুবাবু হঠাৎ কামিজের গলার বোতামটা লাগিয়ে নিয়ে বিস্ফারিত চক্ষে দেখতে লাগলেন লোকটিকে!

স্বয়ম্প্রভার চিবুক ও স্কন্ধযুগল অস্থির হয়ে উঠেছিল। "ও, আপনি বুঝি শুনলেন তারপর—যে আমার জামাইয়ের সঙ্গে আপনার স্ত্রী চলে এসেছেন"

ঘাড়টি ঈষৎ কাৎ করে সসম্ভ্রমে উত্তর দিলেন ব্রজেশ্বরবাবু।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি এ খবর পেলাম পরে যে, পথে ওদের মোটরে কি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এবং ও'রা এই হোটেলটায় এসে আশ্রয় নিয়েছেন। শুনে আমিও চলে এলাম একটা ট্যাক্সি নিয়ে"

"ভাগ্যে এসেছেন"—মৃদুকণ্ঠে বলতে হল স্বয়ম্প্রভাকে—যদিও সুশোভনের দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তিনি। সুশোভনের মনে হল তাঁর নাকের ডগাটা কাঁপছে। ঠাণ্ডায় না রাগে গবেষণা করতে লাগল সে মনে মনে।

"কি যে সব কাণ্ড"—জিতুবাবু বললেন—"তখনই বলেছিলাম আমি। হোটেলওলা কোথা?"

"তিনি বেরিয়ে গেছেন। হোটেলে কেউ নেই"—সুশোভন বললে।

"কে একজন যে উঁকিঝুঁকি মারছিল"

"ও গোকুল। পাশে ওর তাড়ির দোকান আছে। ওকে বসিয়ে রেখে হোটেলের চাকরটা সুদ্ধ বেরিয়ে গেছে"

"কেন, কি করবে তুমি ওকে নিয়ে"—স্বয়ম্প্রভা চোখ পাকিয়ে জিগ্যেস করলেন জিতুবাবুকে।

"না, কিছু নয়। ওকে বলব ভাবছিলাম যে আমাদের কিছু চাই না"

"কি দরকার তা বলবার"

ব্রজেশ্বরবাবুর দিকে ফিরে তারপর স্বয়ম্প্রভা বললেন, "দেখুন মেয়েকে নিয়ে আমরা এমনভাবে এসে পড়লাম এখানে, কারণ আমরা খবর পেয়েছিলাম যে সুশোভন না কি"—একটু ইতস্ততঃ করে থেমে গেলেন তিনি, ঠিক কথাগুলো মুখে যোগাল না। উপরের ঠোঁট দিয়ে নীচের ঠোঁটটাকে চেপে সামনের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।

"আমাদের সঙ্গে আছেন?"—ব্রজেশ্বরবাবু ধীরকণ্ঠে বাক্যটা সম্পূর্ণ করবার প্রয়াস পেলেন। স্বয়ম্প্রভা তথাপি নিরুত্তর হয়েই রইলেন। তিনি ঠিক কেন যে তাঁর মেয়েকে নিয়ে এতদূর ধাওয়া করেছেন তা এই শান্ত গম্ভীর লোকটির কাছে প্রকাশ করা উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল।

সুশোভন নীরবতা ভঙ্গ করলে। সে আর আত্মসংবরণ করতে পারছিল না।

"এদের সঙ্গে থাকাটা কি গর্হিত বলে বিবেচনা করছেন আপনি?"

স্বয়ম্প্রভার ইতস্ততঃ-ভাবটা কেটে গেল।

"না বাবা, তা মনে করছি না। কিন্তু আমরা শুনেছিলাম যে তুমি নাকি অনীতাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আর একটি মেয়ের সঙ্গে ট্যাক্সি করে চলে এসেছ এবং এখানে নাকি রাত কাটিয়েছ। কিছু মনে কোরো না, বাবা, কিন্তু তোমার বিষয়ে যে-সব কানাঘুষো শুনি তাতে এই খবর শুনে আমাদের—"

"ও"—সুশোভন এর বেশি আর বলতে পারলে না কিছু।

ব্রজেশ্বরবাবু বললেন—"যাক্, এখন আপনাদের ভুল ধারণাটা ভেঙে গেছে আশা করি। আমি এখন দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে যেতে চাই। সুশোভনবাবু যদি সস্ত্রীক সেখানে যেতে চান আমার মোটরে আসতে পারেন"

এই শুনে অনীতা বললে, "কিন্তু আমি কাপড়-চোপড় যে কিছু আনিনি। এ অবস্থায় সেখানে যাওয়া চলে কি"

"তাতে কি হয়েছে"—সুশোভন বললে—"ফোনে বলে দিলে কাপড়-চোপড় কালই চলে

আসবে। এক রাত্রে এমন আর কি এসে যাবে। কাপড়-চোপড় আনবার জন্যে এখন কোলকাতা ফিরে যাওয়া যায় না তো"

.অনীতা সুশোভনের দিকে চেয়ে দেখলে একবার ভ্রূ কুঁচকে। মায়ের সঙ্গে আবার কোলকাতা ফিরে যেতে তারও ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে এক-কাপড়ে যাওয়া যায় কি?

"ওপরে ক-খানা শোবার ঘর আছে"—হঠাৎ জিগ্যেস করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"দুখানা"—সুশোভন জবাব দিলে।

"নীচে থেকে দেখে তো মনে হয় না। খুব ছোট ঘর বুঝি"

"খুবই ছোট। শোবার খুব কষ্ট হয়েছে আমাদের"—ব্রজেশ্বরবাবু বললেন।

"হুঁ"

"ওষ্ঠ দিয়ে অধরকে পুনরায় নিষ্পিষ্ট করতে লাগলেন স্বয়ম্প্রভা।

"আমাকে এবার যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। আপনারা যাচ্ছেন না তাহলে"—একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ব্রজেশ্বর।

"না আমাদের যাওয়া হবে না। অনেক ধন্যবাদ"—মৃদু হেসে জবাব দিলে অনীতা।

"আচ্ছা, আমি তাহলে ওপর থেকে ঘুরে আসি"

ব্রজেশ্বরবাবু কপাটটা ভেজিয়ে দিয়ে ভেতরের দিকে চলে গেলেন।

"কোথা গেলেন উনি? দোতলায় উঠলেন বলে মনে হচ্ছে"—সুশোভনকে প্রশ্ন করলে অনীতা।

"দোতালার ভদ্রমহিলাটি কোথাও যেতে পারবেন না এখন। কাল রাত্রে তাঁর একেবারে ঘুম হয়নি, সমস্ত রাত বসে কেটেছে। তিনি এখনই আবার মোটরে যেতে চাচ্ছেন না। তিনি ব্রজেশ্বরবাবুকে বলছেন—মোটরে বসে দিগ্বিজয়বাবুর কাছে গিয়ে একবার ঘুরে আসতে। একেবারে না গেলে খারাপ দেখাবে। তাঁরা কোনও খবর তো পাননি, ভাবছেন হয়তো। উনি আজ জিবিয়ে কাল ওখানে যাবেন ঠিক করেছেন"

"সে মাগী এখনও আছে নাকি এখানে?"—প্রশ্ন করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"আছেন"

"আর তার স্বামী তাকে এখানে ফেলে যাচ্ছে?"

"উনিই তো ব্রজেশ্বরবাবুকে জোর করে পাঠাচ্ছেন"—সুশোভন উত্তর দিলে নিরীহভাবে।

"তেমন কিছু অসুখ হয়নি তাহলে"—অনীতা বললে।

"অসুখ তো হয়নি। ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন"

"বিছানায় শুয়ে আছে?"

"হ্যাঁ"

সুশোভনের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল একটা।

অনীতা হঠাৎ জিগ্যেস করল—"আচ্ছা, দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে কে কে আছে"

"বিশেষ কেউ না। আমরা আর ব্রজেশ্বরবাবুরা। কেন?"

"ভাবছি, চল না হয় চলেই যাই তোমার সঙ্গে। ছোট একটা স্যুটকেসে আছে খানকয়েক শাড়ি, তাতেই না হয় চালিয়ে নেব কোনরকমে"

হঠাৎ মত বদলে ফেললে অনীতা। রাগ দুঃখ কিছু ছিল না তার আর। সুশোভন যে তাকে

ছাড়া আর কাউকে ভালবাসে না, এর প্রমাণ সে পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ব্রজেশ্বরবাবুর স্ত্রীর সম্বন্ধে কথা বলার সময় তার মুখে একটু হাসির আভা ছড়িয়ে পড়বার মানেটা কি! না, চোখে চোখে রাখাই উচিত। ও ডাকিনীর কাছ থেকে যত শীঘ্র সম্ভব দূরে সরে যাওয়া যায় ততই ভাল। এখানে আর এক দণ্ড থাকা নয়।

জিতুবাবুরা যে গাড়িতে এসেছিলেন সুশোভন বেরিয়ে গিয়ে সেই গাড়ির ড্রাইভারকে গোপনে বলে এল সে যেন তাড়া দিয়ে স্বয়ম্প্রভাকে নিয়ে চলে যায় এক্ষুনি। ক্রমাগত তাড়া দেয় যেন। ড্রাইভারের নিজেরই ফেরবার তাড়া ছিল, সুশোভনের কাছে থেকে কিছু বকশিশ পেয়ে সানন্দে রাজি হয়ে গেল সে।

।। তেইশ ।।

স্বামী সমভিব্যাহারে স্বয়ম্প্রভা দেবী বাইরের ঘরটাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মোটরের 'গিয়ার' বদলানো হল, হর্নও শোনা গেল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন। খানিকটা ধোঁয়া এবং ধুলো ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না। সুশোভন আর অনীতাকে নিয়ে ব্রজেশ্বরবাবু মোটরে চলে গেলেন। চেয়ারটায় এসে বসলেন স্বয়ম্প্রভা। গুম হয়ে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। পরাজয়ের গ্লানিতে সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ। গ্লানিটা আরও তিক্ত হয়ে উঠল জিতুবাবুর মুখের দিকে চেয়ে। তাঁর বিরক্ত চোখমুখ যেন নীরব ভাষায় বলছে—তখনই বলেছিলাম।

"হাসছ?"—হঠাৎ প্রশ্ন করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"না তো"

"হাতের নখগুলোকে কামড়াচ্ছ কেন! কি যে মুদ্রাদোষ তোমার"

"দেখ সম্পু, আর মন খারাপ করে লাভ নেই। বরং যা হয়েছে তাতে আমাদের আনন্দিতই হওয়া উচিত"

"কে মাথা খারাপ করছে"

"সুশোভন ছেলেটি যে ভাল এ আমি বরাবরই জানি, কিন্তু তোমার ধারণা ঠিক উলটো। তোমার ধারণা যে ভুল তা তো প্রমাণ করেছি, এইবার বাড়ি চল"

"তুমি প্রমাণ করেছ? আমি না জোর করলে কি তুমি বাড়ি থেকে নড়তে?"

"বাজে ব্যাপারে অনেকখানি সময় নষ্ট হয়েছে, এবার বাড়ি চল"

"আমি একটু চা খাব"

"তাহলে তো ওই গোকুল না কে—তারই শরণাপন্ন হতে হয়, তাড়ির দোকানে চা-ও বিক্রি করে হয়তো। দেখি—"

"এই ছুতোয় তুমি গিয়ে আর যেন তাড়ি খেও না"

"আমার একটা কিছু খাওয়ার দরকার কিন্তু। শরীর আর বইছে না। এখানে 'বিয়ার' পাওয়া যাবে কি? তাড়ি জিনিসটাও অবশ্য খারাপ নয়—"

"তুমি কি আপিসে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিয়ার খাও নাকি!

"জিনিসটা খারাপ নয়। প্রস্রাব সরল রাখে"

"লজ্জা করে না তোমার!"

"লজ্জার কি আছে এতে"—মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন জিতুবাবু—"দেখি চা পাওয়া যায় কিনা—"

প্রজ্বলিত-দৃষ্টি জিতুবাবু বেরিয়ে গেলেন।

স্বয়ম্প্রভা চেয়ারে ঠেস দিয়ে চোখ বুজলেন, মনে হল যেন প্রার্থনা করছেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই চোখ খুলতে হল। রাস্তায় 'মেশিনগান'-এর শব্দ!

"আরে—তুমি"

"আরে বাঃ"

জিতুবাবু এবং সদারঙ্গবিহারীলালের কণ্ঠস্বর যুগপৎ ধ্বনিত হয়ে উঠল।

"সম্পুও পাশের ঘরে মজুত"—জিতুবাবু বলছেন স্বয়ম্প্রভা শুনতে পেলেন। 'মজুত'—আহা কথা বলবার কি শ্রী, মনে হল তাঁর। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হল ঈষৎ।

"তুমি এখানে হঠাৎ! কি মনে করে? এস, ভেতরে এস"—সোজা হয়ে বসে সদারঙ্গ বিহারীলালকে আহ্বান করলেন স্বয়ম্প্রভা!

"আমি কিন্তু এখানে আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না, মশাই। যেতে হয়তো চলুন, আর আপনাদের দেরি থাকে তো ভাড়া মিটিয়ে দিন আমার"

ড্রাইভার জিতুবাবুকে বললে।

"এক্ষুনি যাব আমরা। একটু সবুর কর"—জিতুবাবু মৃদু হেসে বললেন।

"নিশ্চয় সবুর করবে। তাড়া দিতে মানা কর ওকে। আস্পর্ধা তো কম নয়। ওকে আমরা ভাড়া করে এনেছি, কাজ শেষ করে যাব। ওয়েটিং চার্জ যা লাগে তা দেওয়া যাবে। তারপর, সদারঙ্গ, তুমি এখানে এলে কোথা থেকে"

সদারঙ্গবিহারীলাল হেঁট হয়ে প্রণাম করলেন। স্বয়ম্প্রভা সম্পর্কে তাঁর দিদি হন।

"আপনিও এখানে! যাচ্চলে—বাঃ—আরে রাম রাম—কল্পনাতীত—মানে—বা"

"শ্‌শ—শ্‌শ্—আস্তে— হ্যাঁ, নিশ্চয়ই"—জিতুবাবুর গলা শোনা গেল বাইরে, ড্রাইভারকে শান্ত করছেন।

"তুমি এখানে এলে হঠাৎ যে"—পুনরায় প্রশ্ন করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"আমি? অনেকক্ষণ আগেই আসা উচিত ছিল আমার। বাইকটা গড়বড়িয়ে দিলে। মিঠ্ঠু যে কেমন করে সারালে তা জানি না। একটা না একটা ট্রাবল লেগেই আছে। আজকেরটা বোধ হয় স্প্রোকেট্স (sprokets) গুলোর দরুনই প্রধানতঃ। ম্যাগ্‌নেটোর ভিতর কিছু তেলও ঢুকে ছিল। ম্যাগ্‌নেটোতে তেল ঢুকলেই ব্যস্। সমস্ত খুলে সাফ করতে হল। তারপর থেকে ক্রমাগত লাফাচ্ছি। এমন এক-একটা জার্ক দিচ্ছে—"

"বাইকের কথা থাক। এখানে কেন এসেছ—তাই বল"

ড্রাইভারের গলা আবার শোনা গেল।

"ভাড়া করেছেন বলে কি সমস্ত দিন থাকতে হবে নাকি। মোটর কি আপনার নিজের—"

"আরে, চেঁচাচ্ছ কেন, বাপু। সম্পু, আমরা কতক্ষণ আর—"

"ভেতরে এস। কপাট বন্ধ করে দাও"

"ও কেবল জানতে চাইছে আমরা কতক্ষণ—"

"তুমি ভেতরে এস। কপাট বন্ধ করে দাও"

"আসছি। এখুনি আসছি"—ড্রাইভারকে আশ্বাস দিয়ে জিতুবাবু ঘরে ঢুকলেন।

"দেখুন, কিন্তু একটা কথা, আমি আপনাদের আটকাচ্ছি না তো! না, না, তার দরকার নেই মোটেই—যাই হোক, আটকাতে চাই না। আমি আর একজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। আপনাদের সঙ্গে দেখা হওয়াটা বিনামেঘে বজ্রপাত গোছ—মানে, প্রায় অ্যাটম বম্—"

"কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে তুমি"—স্বয়ম্প্রভা জিজ্ঞেস না করে পারলেন না।

"দেখা করতে, মানে, অকপটে বলতে গেলে খোঁজেই এসেছিলাম। একটি ভদ্রলোককে খুঁজে বেড়াচ্ছি। সমস্ত ব্যাপারটাই বেশ অদ্ভুত গোছের মনে হচ্ছে। ভদ্রলোকটির সঙ্গে রাউতপুর রুইন্‌সে আলাপ হল। এই হোটেলেই পরশু রাত্রে আর একজন ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী এসেছিলেন, আমার সঙ্গে তাঁদেরও আলাপ হয়েছিল। তাঁদের কথা প্রথম ভদ্রলোককে বলতেই তিনি কেমন যেন হয়ে গেলেন; তারপর চট্ করে একটা মোটর ভাড়া করে ঊর্ধ্বশ্বাসে এইদিক পানে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পিছু পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি, হয়তো তাঁকে এমন কিছু বলে থাকব যা হয়ত বলা উচিত ছিল না। একটু কেমন যেন গোলকধাঁধা-গোছ লাগছে। শুনবেন ব্যাপারটা, যদি অবশ্য আপনাদের যাবার তাড়া না থাকে"

"শুনব বই কি। যাবার কিছু তাড়া নেই"—স্বয়ম্প্রভার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে এসেছিল—"ওগো, তুমি বোসো—না। জানলার দিকে হাত নাড়ছ কেন—"

"ড্রাইভারটা জানলার কাছে এসেছে"

স্বয়ম্প্রভার নাসারন্ধ্র থেকে ঘোঁৎ করে একটা শব্দ বার হল। উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

"ভয়ে ভয়েই সমস্ত জীবনটা কাটল তোমার"—এই কথাগুলো বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। দু মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলেন। ড্রাইভার নিজের সীটে গিয়ে বসতে পথ পেল না। কেঁচো হয়ে গেল একেবারে নিমেষের মধ্যে।

"এইবার বল"—স্বয়ম্প্রভা সদারঙ্গবিহারীলালকে আদেশ করলেন।

...কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই ড্রাইভারের আত্মসম্মান প্রবুদ্ধ হল আবার। লজ্জাও হল একটু। ছি, ছি, সামান্য একটা মেয়েমানুষের ধমকে ঘাবড়ে গেল সে। নেবে বুকটা একটু চিতিয়ে আবার এগিয়ে গেল সে জানলার দিকে।

...স্বয়ম্প্রভা ঈষৎ ঝুঁকে সদারঙ্গবিহারীলালের কথা শুনছিলেন। স্মিতমুখে একাগ্রদৃষ্টিতে এমনভাবে চেয়ে ছিলেন তিনি, মনে হচ্ছিল যেন কোন অপরূপ আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করছেন। শুধু প্রত্যক্ষ করছেন না, যেন উপভোগও করছেন সেটা।

জিতুবাবু টেবিলের এক কোণে বসে নিরুপদ্রবে নিবিষ্টচিত্তে নখ কামড়াচ্ছিলেন। সদারঙ্গ বিহারী বক্তৃতা করে চলেছিলেন। হঠাৎ স্বয়ম্প্রভা থামিয়ে দিলেন তাঁকে।

"বুঝেছি। তুমি উপরে গিয়ে দেখে এস কেউ আছেন কি না, আর যদি থাকেন, তিনি সান্ত্বনা দেবী কিনা"

সদারঙ্গ একটু আমতা আমতা করে বললেন, "একজন ভদ্রমহিলার ঘরে উঁকি দেওয়াটা কি ঠিক হবে—মানে—"

"বাজে কথা বোলো না, যা বলছি কর। যাও, দেখে এস"

সদারঙ্গ তাঁর কোটের গলার বোতামটা খুললেন, আবার লাগালেন। আবার খুললেন।

"করছ কি তুমি, যাও না"

"অন্য কোনও উপায়ে যদি"

অনন্যোপায় সদারঙ্গবিহারীকে যেতে হল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে উপরে যে ঘরটিতে গোঁসাইজির অসুস্থা গুরুভগ্নীটি হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছিলেন সেই ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। বদ্ধদ্বারে সন্তর্পণে টোকা দিলেন একবার। ভিতর থেকে যে ধরনের শব্দ এল তাতে ভীত হয়ে পড়লেন তিনি। ভব্যতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ল তাঁর পক্ষে। জানলা দিয়ে উঁকি দিলেন।

যাবার সময় সদারঙ্গবিহারীলাল ঘরের দ্বারটি ঈষৎ খুলে রেখে গিয়েছিলেন। সেই দ্বারপথে সাহস করে ড্রাইভারটি এসে ঢুকল। দ্বারের দিকে পিছন ফিরে বসে ছিলেন বলে স্বয়ম্প্রভা দেখতে পেলেন না। ড্রাইভারটি কথা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় দাম্পত্যালাপ শুরু হয়ে গেল। ড্রাইভার কথা না বলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল সব।

"শুনলে তো এইবার? বলেছিলাম না?"

"ও-সব আমি বিশ্বাস করি না। আমি ফিরে যাচ্ছি—"

"ফিরে যাচ্ছ? আমি কিন্তু যাব না। আমি মুচুকুণ্ডুতে যাব"

"পাগল নাকি! সেখানে কি এমনভাবে যাওয়া যায়—"

"খুব যায়"

"যাও তাহলে। আমি ফিরে যাচ্ছি। সদারঙ্গ সমস্ত ব্যাপারটা জানে না, কি বুঝতে কি বুঝেছে, কি বলতে কি বলেছে, ওর মধ্যে আমি আর নেই"

পুরুষমানুষ হয়ে এ কথা বলতে লজ্জা করে না তোমার? একটা লম্পটের হাতে নিজের মেয়েকে ফেলে পালিয়ে যাবে তুমি? যেতে চাও যাও, আমি যাব না"

"সুশোভন যে লম্পট তা এখনও প্রমাণিত হয়নি। আর তোমার ওই সদারঙ্গবিহারীও যে অভ্রান্ত যুধিষ্ঠির এ কথাও মানতে রাজি নই আমি। নিশ্চয়ই কোথাও কোন গোলমাল আছে, তাই ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না"

"সেই গোলমালটা যে কি তাই জানতেই তো মুচুকুণ্ডু যেতে চাইছি"

সে ধীরেসুস্থে পরে জানা যেতে পারে, তার জন্যে একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে হুড়মুড় করে যাওয়ার দরকার নেই"

"আছে"

"কি যে পাগলের মতো করছ, তুমি, সম্পু"

"পাগল আমি নই, পাগল তুমি। শুধু পাগল নয়—পাষাণ। বাপ হয়ে মেয়েকে এমনভাবে একটা গুণ্ডার হাতে ফেলে পালাতে পার"

"ছি, ছি, অত চেঁচিও না, লোকে বলবে কি"

"লোকের বলার কি হয়েছে এখন! যখন ঢিঢিক্কার পড়ে যাবে তখন শুনতে পাবে"

"ছি ছি, কি করছ তুমি সম্পু! আচ্ছা, এখন ওই দিগিন্দ্রবাবর ওখানে গিয়ে কি করতে চাও তুমি শুনি"

"আমি অনীতাকে বলতে চাই যে তার স্বামী ওই ব্রজেশ্বরবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে এক ঘরে এক বিছানায় রাত কাটিয়েছে। আমি অনেক কিছু করতে চাই সেখানে গিয়ে। আমি সুশোভনের সঙ্গে দেখা করতে চাই, ব্রজেশ্বরবাবুর সঙ্গেও বোঝাপড়া করতে চাই। ওপরের ঘরে যিনি আছেন তিনি যদি ব্রজেশ্বরবাবুর স্ত্রী না হয়—খুব সম্ভবতঃ নন—তাহলে ব্রজেশ্বরবাবুর

সঙ্গেও দেখা করতে চাই। এদের আমি বুঝিয়ে দিতে চাই যে যদিও আমরা আমাদের মেয়েকে ভুল করে একটা পাষণ্ডের হাতে দিয়ে ফেলেছি, কিন্তু সব কথা জানবার পর আমরা তাকে তার কাছে থাকতে দেব না"

"কি করে যাবে তুমি মুচকুন্‌পুরে?"

"ওই মোটরে। এই ড্রাইভার-ই নিয়ে যাবে"

"না, আমি যাব না"—নাটকীয়ভাবে বলে উঠল ড্রাইভার দ্বারপ্রান্ত থেকে।

স্বয়ম্প্রভা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন এবং তড়াক্ করে উঠে দাঁড়ালেন। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হল, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটতে লাগল চোখের দৃষ্টি থেকে।

"আমাদের কথা দাঁড়িয়ে শুনছিলে তুমি?"

"শুনছিলাম"

তারপর জিতুবাবুর দিকে ফিরে সে বললে—"আপনি যদি আমার সঙ্গে আসতে চান আসুন। আমি এখুনি ফিরে যাচ্ছি"

জিতুবাবু কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়লেন।

"সম্পু, ব্যাপারটা ভেবে দেখ, বুঝলে—"

"যাও না তুমি। যাও। ব্যাগটা রেখে চলে যাও"

"না, না, আমি যেতে চাইছি না—কিন্তু —"

"হ্যাঁ, তুমি যেতেই তো চাইছ, তাই তো বলেছিলে এতক্ষণ। যাও, আমাকে ফেলে রেখে চলে যাও"

"সম্পু, দেখ আমি—"

"আমি মোটর স্টার্ট করছি, মশাই। এত ফৈজত বরদাস্ত হয় না আমার—"

হঠাৎ মনস্থির করে ফেললেন জিতুবাবু।

"বেশ আমি চললাম তাহলে—"

দ্বারপ্রান্তে একটু ইতস্ততঃ করলেন ভদ্রলোক। গোঁফ ঝুলে পড়েছে, সর্বাঙ্গে ধুলো, চোখে কাতর মিনতি। বড় করুণ দৃশ্য। স্বয়ম্প্রভা কিন্তু বিচলিত হলেন না। জিতুবাবুকে একাই চলে যেতে হল।

সদারঙ্গবিহারীলাল নেমে এলেন।

বললেন, "আমি যা আশঙ্কা করছিলাম তাই। বাঃ—এ যে অদ্ভুত মনে হচ্ছে—মানে"—তারপর একটু থেমে হাত দুটো ঘসে হঠাৎ বলে উঠলেন—"ছি, ছি, যাচ্ছেতাই"

"ওপরে কে রয়েছে দেখে এলে? সান্ত্বনা দেবী?"

"সান্ত্বনা দেবী তো নেই। একটি হাঁপানী রুগী রয়েছেন। আপনারা শুনতে ভুল করেননি তো"

"ভুল? মোটেই না"

"ওকি, মোটরটা স্টার্ট করছে দেখছি। চলে যাচ্ছে নাকি"

"উনি ফিরে যাচ্ছেন"

"ও। আর আপনি?"

"আমি মুচুকুণ্ড যাব। তোমাকেও যেতে হবে আমার সঙ্গে"

"মুচুকুণ্ড? মানে, মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরী? দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে?"

স্বয়ম্প্রভা মাথা নাড়লেন।

সদারঙ্গ মাথা চুলকে বললেন, "কিন্তু দেখুন, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না সেখানে"

"আমারও করছে না"—দৃঢ়কণ্ঠে স্বয়ম্প্রভা বললেন—"কিন্তু মায়ের কর্তব্য আমাকে করতেই হবে, তা সে যতই না কেন অপ্রিয় হোক"

"ও। কিন্তু আমাকে যদি বাদ দেন, ক্ষতি কি"

"তোমাকে যেতেই হবে। উনি তো আমাকে ফেলে চলে গেলেন। আমার প্রতি অনীতার প্রতি তোমারও তো একটা কর্তব্য আছে। তা ছাড়া তোমার মুখেই খবর পেলাম যে কত বড় ধড়িবাজ ওঁরা। তুমিই হলে প্রধান সাক্ষী। তোমাকে যেতে হবে"

"চিঠি লিখে দিলে কিংবা অন্য কোনও উপায়ে যদি—মানে—জনার্দনবাবুকে কথা দিয়েছি ভোটগুলো যোগাড় করে দেব—হনুমানপুরটা সেরে ফেলেছি যদিও—"

"ওসব পরে কোরো। এখন যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের মুচকুন্‌পুরে পৌঁছতে হবে। ওই দুটো লোক আমাকে ভাঁওতা দিয়ে অনীতাকে নিয়ে সরে পড়েছে। অনীতার বিপদ চরমে পৌঁছবার আগে আমাদের সেখানে পৌঁছতেই হবে, যেমন করে হোক"

"পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল দেখছি। দেখুন, দিদি, মাপ করুন আমাকে, আমি মানে, এসবে নিজেকে জড়াতে চাই না"

"এখুনি বললে ওই লোকটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আবার বলছ এসবে নিজেকে জড়াতে চাই না। বুঝলাম না ঠিক"

"ও ভদ্রলোক যে কে তা তো আমি জানতাম না। এখনও ঠিক জানি না। আমার বিশ্বাস হয় না যে সান্ত্বনা দেবী—না, এখন মনে হচ্ছে, আমি বোধ হয় আসলে সান্ত্বনা দেবীকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছিলাম। মনে হচ্ছে—"

"বুঝেছি। মেয়েটির যাদু করবার ক্ষমতা আছে দেখছি। বেশ, তাকে রক্ষা করাই যদি তোমার উদ্দেশ্য তাহলেও তো এই সুযোগ। কারণ আমি তাকেও ছেড়ে কথা কইব না। তুমি যদি রক্ষা করতে চাও তাকে, চল আমার সঙ্গে"

সদারঙ্গবিহারীলাল গলার সাঁকিটায় হাত বুলোতে লাগলেন।

"বেশ"—তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রাজি হয়ে গেলেন অবশেষে।

"তুমি কোথায় থাক এখানে"

"বেশি দূর নয়, পাঁচ মাইল হবে এখান থেকে"

"সেখানেই চল যাই আগে। সেখান থেকে একটা মোটর ভাড়া করতে হবে। তারপর যাওয়া যাবে মুচুকুণ্ডু"

সদারঙ্গ ঘাড় নাড়লেন। তিনি যেখানে থাকেন সেখানকার হালচাল বেশ ভালভাবেই জানা আছে তাঁর।

"কিন্তু অত দূরই বা আপনি যাবেন কি করে, আমি তো হাঁটতে পারব না। একবার চেষ্টা করেছিলাম। ভয়ানক ক্লান্তিজনক। আপনি যাবেন কি করে? হাঁটতে পারবেন কি?"

"দরকার হলে আমি দৌড়তাম"—স্বয়ম্প্রভা বললেন—"কিন্তু এখন দৌড়েও যে কূল পাব না। দৌড়লেও দেরি হয়ে যাবে—"

ঘাড়টা বেঁকিয়ে রাস্তার দিকে চাইলেন তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করে—যেন শত্রুকে নিরীক্ষণ করছেন।

"তোমার পেছনে সেটা নেই?"

"আমার পেছনে? মানে?"

ঘাড় ফিরিয়ে নিজের পেছন দিকটা দেখবার চেষ্টা করলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"তোমার বাইকের পেছনে"

"ও, ক্যারিয়ার। হ্যাঁ, তা আছে একটা চলনসই গোছ। আপনি তার উপর চেপে যাবেন বলছেন? গড্! তা কি সম্ভব? তা ছাড়া আমার বাইক মোটে আড়াই-হর্স-পাওয়ার"

"তোমার বাড়ি পর্যন্ত যাব"

"কিন্তু সেটাও কি—"

"জিনিসপত্র এখানেই থাক। রাত্রে এখানেই ফিরে আসব। চল। সময় নষ্ট করলে চলবে না"

"কিন্তু, দিদি, শুনুন একটা কথা। সত্যি বলছি—"

"প্রতিবাদ কোরো না, যা ঠিক করে ফেলেছি তা করবই, কথা বললে সময় নষ্ট হবে খালি। চল। বাইকে চড়। দাঁড়াও, তোমার কোটটা খুলে দাও, পেতে বসব তার উপর। দেরি করছ কেন, দাও"

সদারঙ্গ তাড়াতাড়ি কোটটা খুলে দিলেন।

বাইরে বাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন দুজনে।

"আমার ক্যারিয়ারটা তেমন বড়ও নয় তো, মানে—"

"চড়"—আদেশ করলেন স্বয়ম্প্রভা।

।। চব্বিশ ।।

শাস্ত্রকারগণ ঠিকই ধরেছিলেন—স্ত্রীলোকেরাই শক্তি। ওঁরাই শক্তির ধারক বাহক—সব। পুরুষেরা মাঝে মাঝে যে শক্তির পরিচয় দেন তা স্ত্রীলোকদের গর্ভোদ্ভূত বলেই সম্ভবতঃ। তা না হলে পারতেন কিনা সন্দেহ। হলদিঘাটের যুদ্ধই বলুন ক্ষুদিরামের ফাঁসিই বলুন, আসল উৎস নারী।

স্বয়ম্প্রভা মোটর-বাইকের পেছনে ঝুলতে ঝুলতে চলেছিলেন। এত কষ্ট স্বীকার করে তিনি যে সুশোভন আর তার দলকে হাতেনাতে ধরতে যাচ্ছিলেন তার কারণ এ নয় যে তারা ওঁকে একটু আগে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে। গোড়া থেকেই তিনি অনুমান করেছিলেন—অনুভব করেছিলেন যে সুশোভনকে বিয়ে করে অনীতা একটা গুণ্ডার ষড়যন্ত্রে পড়েছে। সেই গুণ্ডার দলকে তাড়া করে ছত্রভঙ্গ করে ছিন্নভিন্ন করে উৎখাত করে তবে তিনি থামবেন। তাদের দেখিয়ে দেবেন যে মেয়েমানুষ বলে তিনি দুর্বল নন এবং এ মুলুক মগের মুলুক নয়। সদারঙ্গবিহারীলালের মোটর-বাইক মফঃস্বলের বন্ধুর রাস্তায় লাফাতে লাফাতে ছুটছিল। বাইকের ঝাঁকানিতে স্বয়ম্প্রভার বলিষ্ঠ চোয়াল-সংলগ্ন মাংসমেদ কাঁপছিল থলথল করে। সমস্ত চোখেমুখে অদ্ভুত রকম ভয়ানক একটা দুর্ধর্ষ শক্তির ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছিল। সদারঙ্গবিহারীর কোমরটা জাপটে ধরেছিলেন তিনি। এতে যে অসুবিধা বা অশোভনতার সৃষ্টি হয়েছিল সে

সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপও ছিল না তাঁর। যে কোনও মুহূর্তে যে একটা বিপদ ঘটে যেতে পারে সে আশঙ্কাও ছিল বলে মনে হচ্ছিল না। একাগ্রচিত্তে একটা কথাই কেবল তিনি ভাবছিলেন—কেমন করে কত শীঘ্র তিনি মুচুকুন্দকুণ্ডলেশ্বরীতে পৌঁছবেন। যদি কেউ এরোপ্লেনে করে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে প্যারাসুটে করে তাঁকে সেখানে নাবিয়ে দিত, তাতেও তিনি রাজি হয়ে যেতেন সানন্দে।

...একটু আগে যে জন্যে ওঁরা হাত ফসকে পালিয়েছে তাতে এক হিসেবে লাভই হয়েছে বলতে হবে। ঝড়াং। ব্রজেশ্বর লোকটাকে চেনা গেল। ওদেরই দলের লোক নিশ্চয়। সান্ত্বনার স্বামী সেজে এসেছে, কিংবা ...ঝড়াং...ঝড়াং...। কিংবা হয়তো সান্ত্বনাকে নিয়েই হল্লা করে সবাই, আজকালকার মেয়ে তো, কিছুই বলা যায় না—

অনীতাকেও ওই রকম করতে চায়—ভোঁক্—ভোঁক্—উঃ, ভাবা যায় না...ঝড়াং—ভোঁ-ও-ও-ক্...মানুষের এত অধঃপতন হতে পারে!

হঠাৎ স্বয়ম্প্রভা উলটে গেলেন বোঁ করে এবং মুহূর্তের মধ্যে ডিগবাজি খেয়ে রাস্তার ধারে মাঠের মাঝখানে বসে পড়লেন একটা ঝোপের ভিতর। কাঁটার ঝোপ। সামনে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা গরুর গাড়ি এসে পড়ায় এবং ধাক্কা বাঁচাবার চেষ্টা করায় এই কাণ্ড। গরুর গাড়িতে গোঁসাইজি, ফদ্‌কা আর নিতাই বৈরাগী।

সদারঙ্গবিহারীলাল পড়ে যায়নি। তিনি গাড়ি থেকে নেমে তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন ঝোপটার কাছে।

"ইস! লাগেনি তো? ওই গরুর গাড়িটা, বুঝলেন। আনাড়ি গাড়োয়ান, ষাঁড়ও আনকোরা সম্ভবতঃ। লেগেছে?

"না"

"যাক্। কিন্তু ভারী দুঃখিত আমি। জোরে ব্রেক করা ছাড়া উপায় ছিল না। দুরন্ত ষাঁড়"

"আমাকে তোল"

"কারও লেগেছে না কি গো"—গাড়ির গাড়োয়ান জিজ্ঞেস করলে রাস্তা থেকে।

"আমার হাতটা ধরে নিজেকে একটু টেনে তোলবার চেষ্টা করুন। শক্ত বুঝতে পারছি, ঝোপে আট্‌কা পড়ে গেলে নিজেকে টেনে বার করা খুবই কঠিন। আমার অভিজ্ঞতা আছে। লাগে টাগেনি তো"

"না"—দাঁতে দাঁত চেপে স্বয়ম্প্রভা বললেন এবং নিজেকে টেনে তোলবার নিষ্ফল প্রয়াস করতে লাগলেন।

"ছি ছি—হ্যাঁ—এইরকম—আবার করুন—হেঁইও—"

"জখম হল নাকি কেউ গো"—গাড়োয়ান প্রশ্ন করলে আবার।

"না, চোট-টোট লাগেনি কারও। এইবার—হেঁইও হেঁইও—"

"না, পারছি না। চুপ কর, হেঁইও-হেঁইও কোরো না"

"ও আচ্ছা। সত্যি ভারী ইয়ে হয়ে গেল তো! ছি ছি, কি মুশকিলে পড়ে গেলেন আপনি। একটু গুঁড়ি মেরে—হামাগুড়ি-দেওয়া-গোছ—পারবেন?"

"না"

"কি করা যায় তাহলে। কোমরে-টোমরে লাগেনি তো? ব্যথা করছে কোথাও? অনেক

সময় প্রথমটা 'ফীল' করা যায় না। আচ্ছা, এক কাজ করুন, আমার দুটো কাঁধের উপর ভর দিয়ে উঠতে পারবেন কিনা দেখুন তো"

"না। দিক্ কোরো না আমাকে"

"ও, আচ্ছা। আচমকা পড়ে গেলে অনেক সময় কিছু জোর পাওয়া যায় না—মানে নার্ভাস-গোছের হয়ে যেতে হয়—তা হয়নি তো"

"না"

"তবে? কিছু একটা হয়েইছে নিশ্চয়। চেষ্টা করুন, পারবেন ঠিক উঠতে। উঠতে হবেই, কারণ একটা ঝোপের ভিতর আর কতক্ষণ বসে থাকবেন! আমাকে একটু চেষ্টা করতে দিন না, আমি টেনে তুলে দি আপনাকে"

"থাম। কোথাও আটকে গেছি মনে হচ্ছে"

"আটকে? ও, থামুন, বুঝেছি, 'জাম' হয়ে গেছে। এক মিনিট। টানাটানি করলে শাড়ি ছিঁড়ে যেতে পারে—দাঁড়ান। যন্ত্রতন্ত্র জাম হয়ে গেলে তার তলার দিকটা বেশ করে লুব্রিকেট করে দিলে খুলে যায় অনেক সময়—কিন্তু আপনাকে—"

"তুমি চুপ কর। ওদিকে সরে যাও তুমি। আমি নিজেই ঠিক করে নিচ্ছি। দূরে সরে যাও। এদিকে দেখো না"

"ও, আচ্ছা আচ্ছা। মহা বিপদে পড়া গেল তো! ছি ছি"—মুখ ঘুরিয়ে সদারঙ্গবিহারীলাল রাস্তার দিকে চাইলেন।

"আরে গোঁসাইজি যে! নমস্কার নমস্কার। কি কাণ্ড! আপনি এখানে"

"ওদের এখান থেকে সরে যেতে বল"—ঝোপের ভিতর থেকে নিদারুণ-কসবত-রতা স্বয়ম্প্রভার তর্জন শোনা গেল।

"আরে, বৈরাগী মশাইও যে। নমস্কার। আপনি এ অঞ্চলে হঠাৎ যে আজ?"

"ওই লোকগুলোকে সরে যেতে বলবে কিনা?"

"মা-ঠাকরুণের লেগেছে নাকি"

গাড়োয়ানটিও গাড়ি থেকে নেবে এসে দাঁড়াল।

"না, লাগেনি। আটকে গেছেন। কিন্তু উনি চান না যে—"

"আটকে গেছেন?"

বলিষ্ঠ ঘোঁতন গাড়োয়ান ঈষৎ ঝুঁকে এমন ভাবে এগিয়ে এল যেন তাকেই এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। অনেক আটকানো গাড়ির চাকা তুলেছে সে জীবনে।

"আটকে গেছেন? তাতে কি হয়েছে। পাঁজকোলা করে টেনে তুলে দিলেই মিটে যায়"

"কিন্তু উনি চান না যে আমরা কোনো রকম সাহায্য করি—চটে যাচ্ছেন—ঠিক করে নেবেন এখন নিজেই বোধ হয়—হয়তো একটু সময় লাগবে—কিন্তু—"

"চলে যাও এখান থেকে সব"—আবার চেঁচিয়ে উঠলেন স্বয়ম্প্রভা। নিজেকে মুক্ত করবার প্রয়াসে সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠেছিল তাঁর।

ঘোঁতন নীরবে দন্ত বিকশিত করে হাসল একবার। তারপর কোমর বেঁধে মালকোঁচা মারল। তারপর অগ্রসর হল ধীরে ধীরে।

"ছটফট করবেন না, মা-ঠাকরুণ। সব ঠিক করে দিচ্ছি। বৈরাগী মশাই, একটু সরে দাঁড়ান দিকি"

ঘোঁতনের দক্ষতা সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল না কারও। সসম্ভ্রমে সকলেই সরে দাঁড়ালেন। গোঁসাইজির মুখে নানা ভাবের সংমিশ্রণে বিচিত্র ছবি ফুটে উঠেছিল একটা।

"সদারঙ্গ! এই—এই গাড়োয়ান—খবরদার—খবরদার আমার গায়ে হাত দিও না বলছি—এ কি আস্পর্ধা—"

ঈষৎ ঝুঁকে ঘোঁতন খপ্ করে স্বয়ম্প্রভার কোমরটা জাপটে ধরেছিল। জবাই করবার পূর্বে হাঁস বা মুরগী ঘাতকের মুঠোর মধ্যে যেমন ছটফট করে, স্বয়ম্প্রভাও অনেকটা তেমনি করতে লাগলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় সদারঙ্গবিহারী ঈষৎ-ব্যায়ত আননে ঘোরাফেরা করছিলেন কেবল চঞ্চল হয়ে।

"ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও"—তারস্বরে আদেশ করতে লাগলেন স্বয়ম্প্রভা।

"ঘোঁতন, ছেড়ে দাও বুঝলে—যদিও তুমি ওর ভালোর জন্যেই করছ—তবু বুঝলে—উনি যখন সেটা চাইছেন না তখন—বাঃ প্রায় তুলে ফেলেছিলে যে। বাঃ—আর একবার"

"সদারঙ্গ, যেতে বল ওকে। তুমিও ওকে ওসকাচ্ছ? ছেড়ে দাও, ছাড় বলছি— ছাড়—"

"না, না, করুক। আপনি বুঝছেন না দিদি, ও ঠিক টেনে তুলে ফেলবে। ঘোঁতন আর একবার"

"আমি মেয়েমানুষ, আমার গায়ে একটা পরপুরুষ হাত দিচ্ছে আর তুমি দাঁড়িয়ে দেখছ সেটা—"

"না, না, ব্যাপারটা ওভাবে নেবেন না। আপনার ভালোর জন্যেই ও করছে—ঝোপের মধ্যে বরাবর বসে থাকবেন নাকি! ঘোঁতন—হ্যাঁ—ঠিক—টান। হেঁই—ও না! হয়েছে—হয়েছে—বাঃ"

"মারো জোয়ান হেঁইও"—ঘোঁতন বলে উঠল।

"হেঁইও—" বৈরাগী মশাইও বললেন।

"হেঁইও—" ফদ্‌কাও বললে।

"হেঁইও হেঁইও হেঁইও"—আত্মবিস্মৃত সদারঙ্গবিহারীলাল নৃত্য করতে লাগলেন দুহাত তুলে।

"চর্‌র্‌র্‌র্—! কাপড় ছেঁড়ার একটা শব্দ হল এবং পরমুহূর্তেই স্বয়ম্প্রভা ঝোপমুক্ত হলেন। ঘোঁতন তাঁকে পাঁজকোলা করে তুলে এনে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে মাথার ঘাম মুছলে।

"অসভ্য বখাটে গুণ্ডা জানোয়ার"—ক্রোধে স্বয়ম্প্রভার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল —"শাড়িটা ছিঁড়ে ফ্যাতাফুঁতি করে দিলে একেবারে—"

"শাড়ি যে আট্‌কে গিয়েছিল, মা-ঠাকরুণ। তলার দিকে হাত চালিয়েও বাঁচানো গেল না, ছিঁড়ে গেল কি করব, ওর কোনো চারা ছিল না। শাড়ি বাঁচাবার জন্যেই তলার দিকে হাত চালিয়েছিলাম, কিন্তু হল না"

"সরে যাও এখান থেকে। চলে যাও সবাই"

স্বয়ম্প্রভার চোখে জল এসে গিয়েছিল।

সদারঙ্গবিহারীলালের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি বললেন, "গাড়োল কোথাকার"

"আমি কি করব বলুন"

"তুমি ওসকাচ্ছিলে কেন? আবার বলা হচ্ছে কি করব"

"ওসকানো কথাটা ঠিক হচ্ছে না না, না—ওসকানো—বাঃ। এক্ষেত্রে ও-ছাড়া উপায়ই বা কি ছিল বলুন। ঘোঁতন না এসে পড়লে সমস্ত দিন ওই ঝোপে বসে থাকতে হতো—হয়তো সমস্ত রাতও। মারত্মক আটকে পড়েছিলেন যে"

"ওদের চলে যেতে বল। আমার শাড়ি একেবারে ছিঁড়ে গেছে"

"ওদের উপর চটবেন না। আমার পরিচিত লোক সব। আর প্রত্যেকটি ভাল লোক। উঁচু দরের। বৈরাগী মশাই ভক্ত লোক একজন। ইনি হচ্ছেন গোসাঁইজি, এঁরই হরিমটর হোটেল, সেইখানেই আজ রাত্রে আপনাকে থাকতে হবে হয়তো"

গোসাঁইজি ভ্রূ কুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "ক্ষমা করবেন, আপাততঃ আমি অতিথি সৎকার করতে অক্ষম"

"কিন্তু একটা ঘর তো খালি আছে দেখে এলাম।"

"সে ঘরে আমার বন্ধু বৈরাগী মশাই থাকবেন আজ রাত্রে। আমার গুরুভগ্নী অসুস্থা। ওঁকে নিয়ে যাচ্ছি রাত্রে, সেবার দরকার হতে পারে। সে বিষয়ে সিদ্ধহস্ত উনি"

"ও"

সদারঙ্গবিহারীলাল একটু থতমত খেয়ে গেলেন।

"শুনছেন দিদি, এ আবার এক প্যাঁচ হল। বেশ, উঁচুদরের প্যাঁচ—"

স্বয়ম্প্রভা সরে গিয়ে আর একটি ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে স্বীয় শাড়ি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এই ছেঁড়া শাড়ি পরে তাঁকে যে হোটেলে ফিরতে হবে না, এ সংবাদে তিনি আশ্বস্ত হলেন কিঞ্চিৎ। এ শাড়ি পরে ভদ্রসমাজে বেরোনো অসম্ভব।

বৈরাগী মশায়ের মনে হল হোটেলের ঘরটি এঁরা যে পেলেন না সেজন্যে পরোক্ষভাবে তিনিই সম্ভবত দায়ী। সুতরাং একটু জবাবদিহি করা প্রয়োজন। এগিয়ে এসে মৃদু হেসে হাত কচলে বললেন, "দেখুন, গোঁসাইজির গুরুভগ্নীটি অসুস্থ হয়ে পড়া গতিকেই আমাকে আসতে হল। গোঁসাইজির কথা ঠেলা যায় না, তা ছাড়া এটা একটা সামাজিক কর্তব্যও বটে—অ্যাঁ, কি বলেন। খালি ঘরও তো মাত্র একটি—তা নইলে না হয়—"

"তা তো বুঝলাম। কিন্তু আমি কি জঘন্য প্যাঁচে পড়লাম সেটা ভাবুন। গোঁসাইজি, কোন রকমেই কি হয় না?"

"না"—গোঁসাইজি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—"প্রকাশ্য দিবালোকে যে স্ত্রীলোক একজন পুরুষের কোমর ধরে তার বাইসিকলের পিছনে চড়ে আসতে পারেন তাঁকে কিছুতেই আমি স্থান দিতে পারি না, ঘর খালি থাকলেও পারি না। কেবল পয়সা পেটবার জন্যেই যে আমি হোটেল খুলিনি একথা এ অঞ্চলের সবাই জানে। আমার ওটা হোটেল নয়, হিন্দু পান্থনিবাস"

ঝোপের আড়াল থেকে স্বয়ম্প্রভা বললেন, "ওখান থেকে চলে এস তুমি"..... গোঁসাইজির দল গিয়ে শকটে আরোহণ করলেন।

সদারঙ্গবিহারীলাল এগিয়ে গিয়ে নিজের বিরক্তি, অস্বস্তিজনক পরিস্থিতি, মহিলার অপমান, তার অনিবার্য কারণ, ক্ষমা-প্রার্থনা প্রভৃতি উপকরণ নিয়ে একটি লম্বা বক্তৃতা শুরু করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু স্বয়ম্প্রভার এক ধমকে থেমে যেতে হল তাঁকে।

"চুপ কর। বাইকটা ঠিক আছে তো?"

"হ্যাঁ, ওটাকে বাঁচিয়েছি কোনক্রমে। এক-আধটা স্পোক সম্ভবত গেছে। ব্রেকটা গোড়া থেকেই খুব ভাল নয়, তবে চলবে আপাততঃ"

"চল তবে"

"কিন্তু আপনি এখন যেতে পারবেন কি"

"বাজে কথা না বলে বাইকটা আন"

"কিন্তু এই অবস্থায় যাওয়াটা সঙ্গত হবে কি, ভেবে দেখুন"

সদারঙ্গবিহারীলাল নিজের চশমাটা ঠিক করে নিয়ে বাইকটার দিকে এগিয়ে গেলেন। বাইকটা কাত হয়ে পড়ে ছিল একধারে। সেটা তুলে স্বয়ম্প্রভার দিকে আর একবার চাইলেন তিনি।

"দেখুন, এই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়তো ভগবানের ইঙ্গিত হতে পারে। হয়তো তাঁর ইচ্ছে নয় যে আমরা এভাবে আর অগ্রসর হই"

"ভগবানেব দোহাই দিতে লজ্জা করে না তোমার। আমাকে একটা ঝোপের মধ্যে উলটে ফেলে দিয়ে কতকগুলো অসভ্য লোক জুটিয়ে আমার অপমানের চূড়ান্ত করে এখন ভগবানের দোহাই দিচ্ছ?"

"না--না—বাঃ...কথাটা ওরকম ভাবে নিচ্ছেন কেন"

"বাইকে চড়"

সদারঙ্গবিহারীলাল আর আপত্তি করতে সাহস করলেন না।

পথে উল্লেখযোগ্য কোনও বিপদ হল না আর। ঝড়াং ঝড়াং করতে করতে সদারঙ্গ বিহারীলাল নিজের আস্তানায় পৌঁছলেন শেষ পর্যন্ত। বাইকের পিছনে দোদুল্যমানা স্বয়ম্প্রভাকে দেখে গ্রামের দু-চারজন অসভ্য লোক দু-একটা মন্তব্য অবশ্য করেছিলেন, কিন্তু স্বযম্প্রভা তাতে কান দেননি। মুখ বুজে গুম হয়ে বসেছিলেন তিনি সদারঙ্গবিহারীলালকে আঁকড়ে। নেবেই তিনি সদারঙ্গবিহারীলালকে গাড়ির খোঁজে পাঠালেন। একটা মোটব চাই-ই যেমন করে হোক। সদারঙ্গবিহারী গেলেন (প্রতিবাদ করবার সাহস ছিল না তাঁর আর) এবং একটু পরে ফিরে এলেন। এ তল্লাটে কোনও গাড়ি নেই। কোনও রকম গাড়িই না। বেচুর একটি গরুর গাড়ি ছিল, কিন্তু একটি গরু দু-দিন আগে মারা যাওয়াতে সে গাড়িটিও অচল হয়েছে।

...অল্পক্ষণের মধ্যেই স্বয়ম্প্রভা সদারঙ্গবিহারীলালের গৃহস্থালিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেললেন। ধমকের চোটে পাঁচির মায়ের প্রাচীন পিলে ঘন ঘন চমকাতে লাগল। তাকে শায়েস্তা করে তারপর তিনি ভাল করে দেখলেন শাড়িটা কতখানি ছিঁড়েছে। ইস্—কোনও পদার্থ নেই একেবারে। শাড়ির দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে স্বয়ম্প্রভা মতিস্থির করে ফেললেন।

"আমি এইখানেই থাকি, বুঝলে সদারঙ্গ। অনীতাকে আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, সেইটে নিয়ে তুমিই চলে যাও। গিয়ে অনীতাকে সঙ্গে করে নিয়ে এস। মোটর দেবার মতো ভদ্রতা যদি ওদের না-ও হয়, বাইকে চড়িয়েই নিয়ে এস। কাগজ কলম দাও"

সদারঙ্গ বিনা বাক্যবায়ে কাগজ কলম এনে দিলেন। চশমাটা কপালে তুলে নাক ঝাড়লেন একবার। তারপর লিপি-রচনা-নিরতা স্বয়ম্প্রভার দিকে চেয়ে রইলেন ভ্রূ কুঞ্চিত করে। তাঁর মনে হল কোনও প্রতিবাদ করলে ভয়ঙ্কর কিছু করে বসবেন স্বয়ম্প্রভা। এখানে থাকাটাও

নিরাপদ নয়। অস্বস্তিজনক তো বটেই। খুব। সরে পড়াই ভাল। তা ছাড়া তাঁর নিজেরও যাবার ইচ্ছে করছিল ভিতরে ভিতরে। সান্ত্বনা দেবীর ব্যাপারটা বেশ রহস্যময় হয়ে উঠেছে, জানতে কৌতূহল হচ্ছিল বই কি। নিশ্চয়। স্বয়ম্প্রভা দেবী যা সন্দেহ করেছেন তা অবশ্য করেননি তিনি—কিন্তু ব্যাপারটা বেশ একটু ইয়ে গোছের হয়ে দাঁড়িয়েছে।

"নাও। মনে রেখো ভদ্রসন্তান তুমি, আমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছ যে, এ চিঠি তুমি অনীতাকে দেবে এবং সে যদি তোমার সঙ্গে চলে না আসে, তার নিজের হাতের জবাব নিয়ে আসবে"

"বেশ"—আড়চোখে চিঠিটার দিকে চেয়ে ঘাড় চুলকে উত্তর দিলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"ইচ্ছে কর তো চিঠিটা তুমি পড়তে পার"

সদারঙ্গ পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে তাঁর মুখভাব গম্ভীর হয়ে এল ক্রমশঃ। স্বয়ম্প্রভা সাগ্রহে তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিলেন। চিঠি পড়া শেষ হতেই তিনি বললেন, "ঠিক হয়েছে তো?"

"হয়েছে, মানে—"

চিঠিটা পকেটে পুরলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"মানে, আবার কি!"

"একটা জিনিস বুঝতে পারছি না। অনীতার দাম্পত্যজীবনের সুখশান্তি নষ্ট করবার জন্যে কেন এত তোড়জোড় করছেন। মানে, আপনি যা ভাবছেন তা যদি সত্যিও হয়—"

"অনীতার সুখশান্তি নষ্ট করবার জন্যে? তার সুখশান্তি বাঁচাবার জন্যেই এত করছি। ওর স্বামীটিকে সিধে করতে হলে রীতিমতো শিক্ষা দিতে হবে"

"ও"

সদারঙ্গবিহারীলালের তর্ক করবার ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু তা না করে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হাত দুটি ওলটালেন একবার।

"যাও, আর দেরি কোরো না"

"কাপড় জামা ছেড়ে গেলেই ভাল হত না?"

"কাপড় জামা ছেড়ে আর কি করবে। রাস্তায় বেরুলেই তো ধুলোয় কালিতে আবার সব একাকার হয়ে যাবে। কিছু দরকার নেই, যেমন আছে চলে যাও"

"বেশ, তাই যাচ্ছি। কিন্তু দেখুন একটা কথা মনে রাখবেন, আমি সেখানে হয়তো না-ও পৌঁছতে পারি! গাড়ির যা অবস্থা, হয়তো 'অযেল্‌ড আপ্‌' হয়ে যাব, কিছুই বলা যায় না। আপনি তো পিছনে বসেছিলেন, নিশ্চয়ই শুনেছেন কি রকম 'পপ্‌' করছিলাম, ভাল্‌ভের ভিতরও অদ্ভুত আওয়াজ দিচ্ছিল একটা—"

স্বয়ম্প্রভা হাত দুটো মুঠো করে বিস্ফারিত চক্ষে এমনভাবে চাইলেন তাঁর দিকে যে সদারঙ্গ পালাবার পথ পেলেন না।

সদারঙ্গবিহারী চলে যাবার পর পাঁচির মার সাহায্যে ছুঁচসুতো যোগাড় করে স্বয়ম্প্রভা নিজের শাড়িটি সেলাই করতে বসলেন। সায়াটি পরে নিবিষ্ট চিত্তে সেলাই করে যেতে লাগলেন। ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর ভেঙে পড়ছিল, ঘাড় ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছিল ঘুমে, তবু কিন্তু তিনি থামলেন না। শাড়িটি মেরামত না করা পর্যন্ত থামবেন না। সেলাই চলতে লাগল।

ক্রমশঃ কেমন যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন তিনি। নিজেরই বিগত জীবনের স্বপ্ন সব ভিড় করে এল মনের মধ্যে— যখন টাকা ছিল না কিন্তু শান্তি ছিল, তখন ফ্যাসান-দুরস্ত সমাজের মোহ-মরীচিকা তাঁকে প্রলুব্ধ করে হতাশ করেনি। স্বয়ম্প্রভার চিত্ত দ্রব হয়ে এল ক্রমশঃ। অশ্রু টলমল করতে লাগল চোখের কোণে।

অপরাহ্ন ক্রমশ সন্ধ্যায় পরিণত হল। জানলার ফাঁকে অস্তগামী সূর্যের কিরণজাল উঁকি দিয়ে অন্তর্হিত হল অবশেষে। অন্ধকার নামল, অন্ধকার গাঢ়তর হল, সদারঙ্গবিহারীলাল কিন্তু ফিরলেন না।

।। পঁচিশ ।।

মোটরে যাবার সময় সুশোভন অনীতাকে সব কথা খুলে বলবার সুযোগ পায়নি। এ মোটরটিতে গোপন আলাপের কোন সুবিধে ছিল না। অনীতাও এমন একটা উত্তেজিত অবস্থায় ছিল যে, আর বিশেষ কিছু জানবার ইচ্ছে ছিল না তার। মনে হচ্ছিল যতটুকু সে শুনেছে তাই যথেষ্ট। সুশোভন দু-একবার একটু চেষ্টা করে থেমে গেল। ভাবলে দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে গিয়ে বললেই হবে।

সুরেশ্বরী যে-কোনও দুর্ঘটনার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন ইতিমধ্যে। যুগল স্বামী এবং একটি স্ত্রীর এই যুগপৎ আবির্ভাবে তিনি সুতরাং ঘাবড়ে গেলেন না। স্বামী-যুগলের মধ্যে মনোমালিন্যের কোনও লক্ষণ না দেখে আশ্বস্তই হলেন বরং একটু। স্ত্রীর অনুকরণে দিগ্বিজয়ও এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন তাঁদের। সান্ত্বনাকে দেখা গেল না কোথাও। ব্রজেশ্বরবাবু নেবেই সান্ত্বনার খোঁজ করলেন এবং সে পাশের ঘরে আছে শুনে সোজা সেখানে চলে গেলেন। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন বেড়াতে। অনীতা সান্ত্বনাকে দেখবার অবসরই পেলে না।

সুরেশ্বরী দেবীর অকৃত্রিম স্নেহপূর্ণ আতিথেয়তায় অনীতার শঙ্কা অপনোদিত হল। কেতা-দুরস্ত বড়লোকী আড়ষ্টতা মোটে নেই। নিতান্তই ঘরোয়া ব্যাপার যেন। সান্ত্বনা কেমন লোক জানা যায়নি যদিও এখনও—খুব সম্ভব ভাল নয়—কিন্তু তাতেও কিছু যায় আসে না অনীতার মনে হল। সুরেশ্বরী দেবীর আন্তরিকতায় এত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সে যে, তাঁর বাড়িতে কোনও কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবার কল্পনাই করতে পারছিল না সে। তারা দুজনে কাপড় বিছানা কিছু আনেনি, কিন্তু সুরেশ্বরী দেবীর তাতে যে শুধু ভ্রূক্ষেপ নেই তা নয়, এতে যেন আরও বেশি আনন্দিত তিনি। এইটেই যেন প্রত্যাশিত ব্যাপার তাঁর কাছে।

এক ঘণ্টা পরে।

দ্বিতলের একটি শয়নকক্ষে অনীতা বিছানার উপর বসেছিল দুই হাতের উপর নিজের মুখভার রক্ষা করে এবং সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে। মাথায় ঘোমটা ছিল না। কপালের উপর গালের উপর দুলছিল অবিন্যস্ত কালো কুঞ্চিত অলকদাম। চোখের দৃষ্টি সপ্রশ্ন, ভ্রূযুগল কুঞ্চিত। অদ্ভুত একটা বন্যশ্রী ফুটে উঠেছিল তার মুখে। সুশোভন সামনের একটা টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

"তোমরা শুধু শুধু মিছে কথা বললে কেন বলতো"—অনীতা প্রশ্ন করছিল—"সান্ত্বনা

বরাবর এখানেই ছিল, সে কথা তুমি জানতে, অথচ আমাকে এ মিছে কথা বলবার কি দরকার ছিল''

''তোমার কাছে মিছে কথা বলা উদ্দেশ্য ছিল না আমার''

''স্পষ্ট বললে, আর বলছ উদ্দেশ্য ছিল না''

''তোমার কাছেঁ বলা উদ্দেশ্য ছিল না। তোমার মায়ের জন্যেই বলতে হল''

''দেখ, তোমাকে অবিশ্বাস করিনি কখনও। তোমাকে বিশ্বাস করতেই চাই। কিন্তু এর পর কি করে তা করব বল। মা অবশ্য তোমার উপর চটা, তোমাকে সন্দেহ করেন, সবই ঠিক। এজন্যে মায়ের সঙ্গে আমার ঝগড়াও হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি মিথ্যে কথা বলবে কেন। মায়ের কাছেই বা বলবে কেন! কি দরকার—''

''ছেড়ে দাও না ও-কথা। দরকাব ছিল বলছি—''

''কি দবকার''

''কি''

অনীতা উঠে পড়ল। মাথার এক ঝাঁকানিতে মুখের চুলগুলো সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর মেঝেতে নেবে জানলার ধারে দাঁড়াল সুশোভনের দিকে পিছন ফিরে। পরমুহূর্তেই বদ্ধ দ্বারেব সামনে পরেশ এসে বলে গেল—''চা দেওয়া হয়েছে, মা, আপনারা আসুন''

সুশোভন টেবিলের উপর ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল এবং অনীতাকেই দেখতে লাগল ভুরু কুঁচকে। ভাবতে লাগল এই সামান্য ব্যাপারেই অনীতা যদি এমন বেঁকে দাঁড়ায তাহলে শেষ পর্যন্ত তাকে সব কথা সে বলবে কি করে। সে অকপটে সব কথা বলতেই চায় তাকে। কিন্তু—

''ওই সান্ত্বনা নাকি' —হঠাৎ অনীতা জিজ্ঞেস করলে।

সুশোভন জানলার ধারে গিয়ে তার পাশে দাঁড়াল। দেখল সান্ত্বনা এবং ব্রজেশ্বরবাবু পাশাপাশি আসছেন মন্থর গতিতে। সান্ত্বনা হাত নেড়ে নেড়ে কি যেন বলছে, ব্রজেশ্বর শুনছেন। ডাক্তাররা যে রকম সহানুভূতিপূর্ণ ভদ্র মনোযোগ সহকারে রোগীর মুখ থেকে রোগের বিবরণ শোনেন, ব্রজেশ্বরের মুখভাব অনেকটা সেই রকম দেখাচ্ছিল।

''হ্যাঁ, ওই সান্ত্বনা। আলাপ হলে দেখবে চমৎকার মেয়ে''

''বেশ বয়স হয়েছে তো। আমি ভেবেছিলাম বুঝি...''

''হ্যাঁ। কিন্তু আলাপ হলে দেখো লোক খুব ভাল''

''ব্রজেশ্বরবাবুও মিথ্যে কথা বললেন। আচ্ছা, তোমরা দুজনেই মিথ্যে কথা বলতে গেলে কেন বুঝতে পারছি না।''

অনীতা ঘুরে দাঁড়াল এবং চোখের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে নিলে।

''সত্যি কথা বল তো। আরও কিছু কি লুকোচ্ছ আমার কাছ থেকে''

ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলন করে ক্ষণকাল নীরব হয়ে রইল সুশোভন। তারপর বললে—''সবটা বলা হয়নি অবশ্য এখনও''

''ও''

কিছুক্ষণ নীরবতা।

''সব বল আমাকে''

"বলব বই কি। বলতেই তো চাই। কোনও অন্যায় কাজ করিনি তো। কিন্তু সবটা বুঝিয়ে বলতে একটু সময় লাগবে। তুমি চুলটা আঁচড়ে নাও। কাপড় ছাড়বে না? চা দিয়েছে যে—"

ঘরের এক কোণে ড্রেসিং টেবিল ছিল একটা। সেইটের দিকে ফিরে অনীতা বললে—"আমি চুলটা আঁচড়ে নি চট করে। তুমি ততক্ষণ যতটুকু পার বল না, আঁচড়াতে আঁচড়াতে শুনি—"

ঈষৎ বেঁকে অনীতা বেণী রচনায় মন দিলে। সুশোভন গলা খাঁকারি দিলে একবার সাড়ম্বরে। কোনও দরকার ছিল না। আড়চোখে একবার আয়নায় প্রতিফলিত অনীতার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। মনে হল সুবিধের নয়। চোখের দৃষ্টি চকমক করছে। যে-কোনও মুহূর্তে ফেটে পড়তে পারে। বিপজ্জনক মুখভাব।

"ঠিক কোন্ জায়গাটা থেকে আরম্ভ করি বুঝতে পারছি না। ট্রেন তো ফেল করলাম, তোমার কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছবার জন্যে ট্যাক্সি ভাড়া করলাম একটা, সান্ত্বনাও জুটল সঙ্গে। এ সব তো শুনেইছ—"

"হ্যাঁ। তুমি সান্ত্বনাকে নিয়ে হোটেলে এলে। সেখানে কাল সমস্ত রাত্রি ছিলে। সমস্ত রাত্রি ছিলে কি? সান্ত্বনা কখন এসেছে এখানে? এইটেই আমি জানতে চাই"

"আজ"

"কি করে"

"মোটরে করে। যে মোটরে আমরা এসেছিলাম। সেই ট্যাক্সিটা—"

"মোটর তাহলে খারাপ হয়নি?"

"হয়েছিল। গণেশ সেটাকে ঠিক করলে"

"গণেশ? ব্রজেশ্বরবাবুর ডাকনাম?"

"গণেশ হচ্ছে সেই ট্যাক্সি ড্রাইভার"

"সান্ত্বনার সঙ্গে এখানে এল কে তবে? তুমি এলে না কেন"

"আমিই এসেছিলাম"

অনীতা ঘাড় ফিরিয়ে চাইলে সুশোভনের দিকে। এক গোছা কোঁকড়ানো চুল এসে পড়ল গালের উপর। সেটা সরিয়ে দিলে অনীতা ক্ষিপ্রহস্তে।

"আবার মিছে কথা বলছ নিশ্চয়। আচ্ছা, তোমরা তখন থেকে এত মিছে কথা বলছ কেন"

"তোমার মায়ের ভয়ে"

"মাকে ভয় কি"

"এমন অমিতবিক্রমে এতদূর পর্যন্ত যিনি ধাওয়া করে আসতে পারেন তাঁর উপর ভরসা করি কি করে বল"

"যেজন্যে তিনি এসেছেন মিছে কথা বললেই সেটা মিথ্যে হয়ে যাবে? তা ছাড়া ব্রজেশ্বরবাবু মিছে কথা বলছেন কেন? তাঁর তো মাকে ভয় করার দরকার নেই"

"ওটা বোধ হয় ওঁর স্বভাব। রাজনীতি করেন কি না। তা ছাড়া সান্ত্বনার—মানে, নিজের স্ত্রীর সম্মান রক্ষা করার জন্যেই মিছে কথা বলছেন বোধ হয়। ওঁর স্ত্রীকে কেউ সন্দেহ করে এটা বোধ হয় উনি চান না"

"হ্যাঁ, সে বিষয়ে একটু বেশি সজাগ মনে হচ্ছে। আসবামাত্রই স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে

গিয়েছিলেন। কিন্তু এতে সন্দেহ করবারই বা কি আছে। মোটর অ্যাক্সিডেন্ট হয় না? মোটর অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে তোমরা একটা হোটেলে এসেছিলে এতে মা-ই বা দোষ ধরবেন কেন—সব কথা যদি তাঁকে খুলে বল তোমরা—"

"তিনি দোষ ধরবেন বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে এসেছেন। তাঁকে নিরস্ত করা সহজ কাজ নয়। বদ্ধপরিকর পুরুষকেই সামলানো শক্ত, উনি তার উপর স্ত্রীলোক—"

"উনি সম্পর্কে তোমার মা হন সে কথাটা মনে রেখ! বিয়ে হয়ে থেকে তুমি ওঁর সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারছ না; তুমি যদি ওঁকে শ্রদ্ধা না কর উনি তোমাকে ভালোবাসেন কি করে! হাজার হোক, তুমি ওঁর জামাই—"

অনীতা এমনভাবে খোঁপায় কাঁটা গুঁজলে যেন শত্রুর বুকে ছুরি হানছে।

"ও-রকম স্ত্রীলোক আমি আর কখনও দেখিনি। পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কিনা জানি না। প্রতিহিংসা না জিঘাংসা—ওই যে কি একটা কথা আছে—তা যে কোনও নারীর হৃদয়ে এতখানি থাকতে পারে আমার কল্পনাতীত ছিল। ওঁর সামনে আমি দাঁড়াতেই পাবি না। মোপলা দস্যুদল, মারাঠা বীর বা পাঞ্জাবী গুণ্ডা হয়তো পারে, আমি পারি না। আমি নিরীহ ভদ্রলোক—সাংঘাতিক কিছু কবা আমার সাধ্যাতীত। উনি আমার কথা বিশ্বাস করতেন না জানি, তাই মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তুমি করবে, কিন্তু উনি করবেন না, উনি আলাদা জাতের লোক"

"আমার মায়ের সম্বন্ধে খবরদার ও-রকম করে বোলো না বলছি"—কেঁপে উঠল অনীতার ঠোঁট দুটো—"তিনি আমার জন্যেই এত করছেন, আমাকে ভালোবাসেন বলে"

"এবং আমাকে ঘৃণা করেন বলে"

অনীতা ক্ষিপ্রহস্তে খোঁপাটা জড়িয়ে ঘুবে দাঁড়াল।

"এর বেশি আর কিছু নেই আশা কবি তোমার বলবার"

"এখন এই পর্যন্তই থাক না। চা খেয়ে বাকিটা—"

অনীতা এর পর যা করলে তা অপ্রত্যাশিত। দড়াম করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল সে উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে।

"অনীতা, ছি ছি, কি করছ তুমি—"

"যাও, তুমি নীচে গিয়ে সান্ত্বনা'র সঙ্গে চা খাও গিয়ে"

"তুমিও চল"

"আমি যাব না। চা খাব না আমি। মাথা ধরেছে আমার"

মিনিটখানেক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সুশোভন নীচে নেবে গেল অবশেষে।

সব শুনে সুরেশ্বরী বললেন, "আহা, মাথা ধরবেই তো। আসামাত্রই ওকে এক কাপ চা খাইয়ে দেওয়া উচিত ছিল আমাদের। সে কথাটা মাথাতেই এল না কারও"

"আমারই আসা উচিত ছিল। সব গুলিয়ে ফেলেছি"—দিগ্বিজয় বললেন।

"তোমার দোষ কি? আমি বাড়ির গিন্নী, আমারই ভাবা উচিত ছিল"

সমস্যা জটিলতর হবার পূর্বেই সুরেশ্বরী দেবী ভাবলেন আগে অনীতাকে চা-টা খাইয়ে আসা যাক, তারপর ধীরেসুস্থে ঠিক করা যাবে দোষটা আসলে কার।

নিজেই এক কাপ চা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন। ডিসে খান-দুই মাখন-মাখানো

টোস্টও ছিল। কিন্তু চা চল্‌কে পড়ে সেগুলোর এমন জবজবে অবস্থা হল যা প্রায় অনীতারই মনোভাবের অনুরূপ। সুরেশ্বরী এই রকম একটা কিছু আশঙ্কাও করেছিলেন। হাত কাঁপছিল তাঁর। যখন তিনি উপরে উঠে অনীতার ঘরের দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হলেন তখন টোস্ট পুডিং হয়ে গেছে প্রায়।

তাঁর গলা শুনে অনীতা তাড়াতাড়ি উঠে কপাট খুলে দিলে। একটু লজ্জিতও হল। চা খেলে।

"চল না নীচে"—সুরেশ্বরী দেবী ইতস্ততঃ করে বললেন একবার।

"যাচ্ছি একটু পরে"

"সুশোভনকে পাঠিয়ে দেব কি"

"না থাক। মাথাটা বড্ড ধরেছে। একটু ঘুমুই"

"সেই ভাল। ঘুমোও তাহলে"

সুরেশ্বরী দেবী নেবে এলেন ভয়ে ভয়ে। সান্ত্বনা চুপি চুপি এসে জিগ্যেস করলে, "আমি গিয়ে আলাপ করব একটু?"

"না। একলা থাক খানিকক্ষণ"

সুশোভন চা খেয়ে দিগ্বিজয়বাবুর দিকে চেয়ে বললে, "একটা চক্কোর দিয়ে আসা যাক, কি বলেন"

"হ্যাঁ, বেশ তো। ওই পশ্চিম দিকটায় যাও। বেশ ফাঁকা মাঠ আছে। ঝোপ-ঝাড়ও আছে। বেশ নির্জন ওদিকটা। একটা ছড়ি নেবে?"

একটা ছড়ি দিলেন তাকে। ছড়ি হাতে বেরিয়ে পড়ল সুশোভন। কিছুদূর গিয়েই সে ছড়ি চালাতে লাগল পথের দুধারের গাছপালার উপর। অনুপস্থিত স্বয়ম্প্রভার উপরেই লাঠি চালাচ্ছে যেন। না, আর সে খাতির করবে না, লড়েই যাবে সে এবার ভদ্রমহিলার সঙ্গে। এস্‌পার ওস্‌পার করতেই হবে যা হোক একটা। অনীতাকে নিয়ে সরে পড়বে সে—বিলাতে পালাবে—।

...অনেক দূর হাঁটলে সে। একটা গাছতলায় বসে পড়ল অবশেষে। হাত-পা আর চলছে না যেন। উপরের দিকে চেয়ে দেখলে নির্মেঘ নীলাকাশ। একটু আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে। সোঁদা-সোঁদা মাটির গন্ধ উঠছে চারদিকে। চমৎকার। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সুশোভন গাছতলায়। ভাবতে লাগল—ইংরেজ-সমাজে শুনেছি পুরুষদের কাছে শাশুড়ী একটি ভয়ঙ্কর চীজ। আমাদের সমাজে মেয়েরা শাশুড়ীর ভয়ে অস্থির হয়। আমি ইংরেজও নই, মেয়েও নই, অথচ আমার কপালেই এ-রকম খাণ্ডার শাশুড়ী জুটে গেল। উঃ। জ্বালিয়ে মেরেছে! ওহো, গোঁসাইজির হোটেলে সেই দোকানদারের সাইকেলটা পড়ে আছে। কেউ আবার নিয়ে না যায়। কাল যা হয় ব্যবস্থা করতে হবে একটা। অনীতার রাগটা কমলে এখন বাঁচা যায়। সব কথা বুঝিয়ে বলার সময়ও দিচ্ছে না যে—এমন অবুঝ আর অভিমানী—কি করা যায়। ভাবতে লাগল। ধীরে ধীরে চোখের পাতা বুজে এলে তার।

অনেকক্ষণ পরে সুশোভন যখন ফিরল তখন সুরেশ্বরী দেবী বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুশোভনের জামা ভিজেছে, কাপড়ে কাদা লেগেছে—চুল উসকো-খুসকো, চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত-গোছের। সুরেশ্বরী দেবীর আশঙ্কা হল আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করছিল না তো।

সুশোভন একটু অপ্রস্তুত ভাবে বললে—"একটা গাছতলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম"

"ওমা, সে কি!"

"ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম বড্ড"

"তা তো হবেই। বিছানায় শুয়ে ঘুমুলেই হতো"

"অনীতা এখনও ঘুমুচ্ছে বোধ হয়"

"সে তো চলে গেছে"

"চলে গেছে?"

"হ্যাঁ, সে চলে গেছে"

"কোথায়"

"সদারঙ্গবাবু এসেছিলেন—তিনি এর আগেও বোধ হয় এসেছিলেন একবার আজ। তিনি—"

"সেই লোকটা আবার ধাওয়া করেছে এখান পর্যন্ত! সাংঘাতিক তো! ভদ্রলোককে চেনেন আপনারা?"

"হ্যাঁ, একটু-আধটু চেনা আছে। ভাবি পরোপকারী লোক শুনেছি। তোমার সঙ্গেও আত্মীয়তা আছে শুনলুম শ্বশুরবাড়ির দিক দিয়ে"

"থাকলেই বা! এমনভাবে এসে অনীতাকে নিয়ে যাওয়াটা ভারী অদ্ভুত লাগছে কিন্তু"

সুশোভনের কথার সুরে থতমত খেয়ে গেলেন সুরেশ্বরী একটু। এই রকমই কিছু একটা আশঙ্কা করছিলেন তিনি। সামলে নিয়ে তবু বললেন, "না না, ভয়ের কিছু নেই। তিনি অনীতার মায়ের কাছ থেকে চিঠি এনেছিলেন একটা। সেই চিঠি পেয়ে অনীতা চলে গেল। আমি অনীতাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে তোমাকে না বলে এমনভাবে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে। কিন্তু রাগ হয়েছে মেয়ের, কিছুতে শুনলে না আমার কথা, চলে গেল"

"কতক্ষণ হল গেছে?"

"তা অনেকক্ষণ হবে! আমার মোটরটা করেই গেল। মোটর ফিরেছে বোধ হয় এতক্ষণ"

"সদারঙ্গবিহারীও গেল সেই মোটরে?"

"না। তাঁর তো নিজের মোটর-বাইক ছিল, তাতেই গেছেন তিনি। আমি তাঁকে বলে দিয়েছি যে তিনি যেন অনীতাকে আর তোমার শাশুড়ীকে বুঝিয়ে বলেন যে, এ নিয়ে রাগারাগি করবার কিছু নেই। অনর্থক কেন মাথা খারাপ করছেন তাঁরা। কিছুই তো হয়নি। সান্ত্বনার কাছে সব শুনেছি আমি।"

"কি বললেন শুনে"

"বললেন, আমি এসব ব্যাপারে জড়াতে চাই না নিজেকে"

"কিন্তু সমস্তক্ষণই তো এসব ব্যাপারেই জড়িয়ে রেখেছেন নিজেকে দেখছি। উঃ, আচ্ছা এক চিটেগুড়ের পাল্লায় পড়া গেছে কাল থেকে। অনীতা কোথায় গেছে বলতে পারেন? মানে, তাঁর মা কোথায় আছেন এখন? সেই হোটেলেই, না আর কোথাও"

"তা তো জানি না, বাবা। গাড়িটা ফিরলে ড্রাইভার বলতে পারবে। তবে অনীতার মা অনীতাকে যে চিঠিটা লিখেছিলেন সেটা পড়ে ছিল ওপরের শোবার ঘরে। আমি তুলে রেখে দিয়েছি, পড়িনি। তুমি যদি পড়তে চাও তো—"

"হ্যাঁ চাই—"

সুরেশ্বরী দেবী চিঠিটা এনে দিলেন।

"ব্রজেশ্বরবাবুরা কোথা"

"তারাও বেরিয়ে গেছে। স্টেশনে গেছে ফেরবার ট্রেনের খবর নিতে। আসবে এখুনি"

সুশোভন ভ্রূকুঞ্চিত করে চিঠিখানা পড়ছিল।

"উঃ—"—হঠাৎ সে বলে উঠল।

"কি"

"পড়ছি শুনুন! কি ভয়ঙ্কর"

সুশোভন চিঠিখানা পড়তে লাগল।

কল্যাণীয়াসু,

এতক্ষণ তুমি নিশ্চয় আবিষ্কার করিয়াছ যে সুশোভন এবং ব্রজেশ্বরবাবু আমাদের যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সর্বৈব মিথ্যা।

আমি সদারঙ্গের বাসায় বসিয়া এই পত্র লিখিতেছি। ফাৎনাফিরিঙ্গিপুরের পাশের গ্রাম ছিপ্‌ছররামারিতে সে থাকে। তাহার মোটর-বাইকের পিছনে চড়িয়া এখানে পৌঁছিয়াছি। পথে অসীম দুর্গতি ভোগ করিতে হইয়াছে। মোটর-বাইক উলটাইয়া একটা ঝোপের ভিতর পড়িয়া যাই। গা ছড়িয়া গিয়াছে, কাপড়-চোপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে। এই দুর্ঘটনাটি না ঘটিলে আমি নিজেই তোমাকে আনিতে যাইতাম।

কাল রাত্রে যখন সুশোভন এবং সান্ত্বনা গোঁসাইজির হোটেলে ছিল তখন দৈবক্রমে সদারঙ্গ সেখানে গিয়ে পড়ে। সান্ত্বনার সহিত পূর্ব হইতেই তাহার আলাপ ছিল। সান্ত্বনা নিজে সদারঙ্গের কাছে সুশোভনকে নিজের স্বামী বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। তাহারা যে এক-ঘরে এক-বিছানায় রাত্রি কাটাইয়াছে, একথাও সদারঙ্গ পরে বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছে।

তোমাকে এসব কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম—কারণ সত্যকে অস্বীকার করিয়া লাভ নাই; যতই অপ্রিয় এবং কঠোর হউক না কেন, সাহস সংগ্রহ করিয়া তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে। সৎসাহস ভিন্ন ব্রহ্মেরও কৃপালাভ করা যায় না।

অনেক জেরা করিয়া সদারঙ্গের নিকট হইতে এ কথাও আমি জানিয়াছি যে সান্ত্বনা মেয়েটি নাম-করা মেয়ে। আর একটি ভদ্রলোকের সঙ্গেও উহার নাকি বদনাম রটিয়াছিল। ক্ষীণভাবে মনে পড়িতেছে আমি যেন সমাজে গুজবটা শুনিয়াছিলাম।

তুমি অবিলম্বে আমার কাছে চলিয়া এস। দিগ্বিজয়বাবুর মোটর আছে শুনিলাম। সম্ভব হইলে সেইটা লইয়া এস। আশা করি এ উপকারটুকু তাঁহারা করিবেন। যদি না করেন তুমি সদারঙ্গের মোটর-বাইকের পিছনে চড়িয়াই চলিয়া আসিবে। তাহাকে বলিবে খুব সাবধানে যেন চালায়। বেশি জোরে চালাইবার দরকার নাই।

তুমি আসিলে পরামর্শ করিব, কি করা উচিত এখন। সুশোভনের বিলাস-লালসার বহু উপকরণের মধ্যে তুমিও যে একটি, তাহার এই ভ্রান্ত ধারণা চূর্ণ করিতে হইবে। সর্বাগ্রে যেমন করিয়া হোক তাহাকে এ বিষয়ে সচেতন করিতে হইবে—আমি করিবই—তাহার পর তুমি যাহা চাও তাহাই হইবে।

আমি গোড়াতেই সন্দেহ করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত কর নাই। ব্রহ্মের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।

তুমি অবিলম্বে চলিয়া এসো। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষিণী
তোমার মাতা।

পুনশ্চ ঃ তোমার বাবা কলিকাতা ফিরিয়া গিয়াছেন।

"এখন আমি সেখানে যাই কি করে? মানে, যেতে হবেই যেমন করে হোক"— চিঠি পড়া শেষ করে সুশোভন জিগ্যেস করলে।

"এখনই যাবে? সে কি। কাপড়-জামা ছাড়, খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম কর, তারপর ওসব হবে-খন। ওদের মনটা একটু থিতুক না"

"না। আমাকে এখনই যেতে হবে। অনীতার সঙ্গে এখনই দেখা করা দরকার—"

"কিন্তু গাড়িটা তো ফেরেনি এখনও"

"আমি হেঁটেই বেরিয়ে পড়ছি। রাস্তায় যদি আপনার গাড়ির সঙ্গে দেখা হয় নিয়ে নেব সেটা। আচ্ছা, চলি—নমস্কার"।

।। ছাব্বিশ ।।

"অনীতা কোথা? এত দেরি কেন তোমার! এতক্ষণ আমাকে কি দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে রেখেছ বল তো। তোমার পাঁচির-মাকে আমি দূর করে দিয়েছি। অত্যন্ত অবাধ্য। অনীতা কই?"

সদারঙ্গবিহারীলাল ঢুকতেই স্বয়ম্প্রভা উপরোক্তভাবে সম্ভাষণ করলেন। ক্লান্ত সদারঙ্গ চশমা খুলে লেন্স থেকে ধুলো পরিষ্কার করলেন আগে। এত ধুলো জমে ছিল যে ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলেন না তিনি।

"অনীতা আসেনি?"

স্বয়ম্প্রভা আত্মসংবরণ করে রইলেন যতটা পারলেন। তারপর সংযত কণ্ঠেই বললেন, "তুমি গিয়েছিলে তাকে আনতে—ফিরে এসে আমাকে জিগ্যেস করছ সে এসেছে কিনা। তুমি—"

"এতক্ষণ তার আসা উচিত ছিল। আশ্চর্য তো। ফানি। সে আমার আগে মোটরে করে বেরিয়েছে, বাঃ—"

"সে বেরিয়েছে ঠিক তো?"

"ঠিক বই কি। মোটরে করে"

"আমার চিঠি পড়ে কি বললে"

"তা শুনিনি। শুনলাম চুপ করে ছিল। কিন্তু বেশ মজা হল তা। বাঃ হয়তো—"

"তুমি তার সঙ্গে দেখা করনি?"

"সে দোতলায় ছিল। আমি সেখানে উঠব কি করে। সুরেশ্বরী দেবী চিঠিটা নিয়ে তাকে দিয়েছিলেন"

"বাবাজী ছিলেন কোথা"

"বাবাজী? মানে, ওদের ঠাকুর?"—বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"ইয়ার্কি করছ নাকি"

"ঠাকুরকেই তো বাবাজী বলি আমরা, মানে এ অঞ্চলে সবাই বলে"—বিস্মিত সদারঙ্গ উত্তর দিলেন—"ওদের ঠাকুরটা কোথায় ছিল জানতে চাইছেন?"

"ওর স্বামী কোথা ছিল"

"কার স্বামী? সুরেশ্বরী দেবীর?"

"আরে, না না,—কি গাড়োলের পাল্লাতেই পড়েছি। অনীতার স্বামী সুশোভন"

"জানি না"

"সে ওর কাছে ছিল না?"

"কার কাছে?"

"অনীতার কাছে। তুমি কি ভেবেছিলে সুরেশ্বরী দেবীর কাছে বলছি?"

"হ্যাঁ"

"সুরেশ্বরী দেবীর কাছে ছিল?"

"না। আমি ভেবেছিলাম সুরেশ্বরী দেবীর কাছে সুশোভন আছে কিনা আপনি জানতে চাইছেন?"

"আহ্হ্। ওকে দেখেছিলে?"

"কাকে?"

"কি বিপদ। সুশোভনকে,—সুশোভনকে"

"বললাম তো। ওর খবর জানি না"

"না বলনি তুমি"—অযথা ধমকে উঠলেন স্বয়ম্প্রভা। তারপর একটু থেমে আসল প্রসঙ্গে এলেন আবার।

"অনীতা আমার চিঠি পড়ে মোটরে করে বেরিয়েছে সেখান থেকে?"

"হ্যাঁ। এ কথাও তো বলেছি আপনাকে। দেখুন, বড্ড খিদে পেয়েছে আমার। কিছু খেয়ে নি। শরীর আর বইছে না"

"সুশোভন কোনও সুলুক-সন্ধান পায় নি তো?"

"সুলুক?"

"সুলুক-সন্ধান। ও টের পায়নি তো যে অনীতা চলে এসেছে?"

"না। এক মিনিট, একটু সবুর করুন। গোড়া থেকে সব বলব আবার। হাত মুখ ধুয়ে একটু কিছু খেয়ে নিতে দিন আমাকে"

"অনীতাকে আনতে গেলে, কিন্তু সে-ই এখনও এলে না। তার খবরটা পর্যন্ত দিতে পারবে না?"

"এক্ষুনি আসবে। ড্রাইভার হয়তো রাস্তা চেনে না, কিংবা বাড়ি চেনে না। ঘুরছে। এক্ষুনি এসে পড়বে"

"ঠিক বলেছ। আশপাশেই ঘুরছে হয়তো। তুমি এক কাজ কর না হয়"

"কি"

"রাস্তায় গিয়ে তোমার মোটর-সাইকেলের হর্নটা বাজাও। তাহলে ওরা বুঝতে পারবে। অন্ধকারে রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না ঠিক। যাও—"

"দেখুন বড্ড খিদে পেয়েছে আমার। আর পেরে উঠছি না। সেই সকাল থেকে সমস্ত দিন—মানে এক নাগাড়েই প্রায়। তা ছাড়া আপনি এমন অস্থির হচ্ছেন কেন তাও তো বুঝছি না। আমি গোড়া থেকেই তো বলছি—সান্ত্বনা মেয়েটি খুব ভাল—একা একটা নাইট-স্কুল চালাত—রীতিমতো 'গুড' যাকে বলে—সুরেশ্বরী দেবীও 'কনফার্ম' করলেন এ কথা"

"বাজে বক্তৃতা না করে যা বলছি কর গে যাও। রাস্তায় হর্ন বাজাও গিয়ে। যাও, আর দেরি কোরো না"

সদারঙ্গ আর প্রতিবাদ করতে সাহস করলেন না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে হর্ন বাজাতে লাগলেন। কোনও ফল হল না। ফিরে এসে খেতে বসলেন। স্বয়ম্প্রভার তাড়ায় খেতে খেতেও বার দুই উঠে গিয়ে হর্ন বাজিয়ে আসতে হল তাঁকে। কিন্তু অনীতার মোটর এল না।

গোঁসাইজি প্রাত্যহিক নিয়ম অনুসারে হোটেল বন্ধ করবার পূর্বে চারদিকটা দেখে নিচ্ছিলেন একবার। দোরগোড়ায় ঠেসানো বাইসিকলটার দিকে একবার চাইলেন। কখন এসে ভদ্রলোক নিয়ে যাবেন কে জানে। বাইরের ঘরে একটা ব্যাগ আর একটা বেঁটে ছাতা রয়েছে, সেই মেয়েটির বোধ হয়, যিনি হোটেলে এসে রাত্রিবাস করতে চাইছিলেন। নাক কুঁচকে এমনভাবে চাইলেন সেগুলোর দিকে যেন সেগুলো থেকে কোনও দুর্গন্ধ নির্গত হচ্ছে। তারপর উপরে গেলেন। গুরুভগ্নীর খোঁজ নিলেন একবার। নাবছেন এমন সময় দেখলেন একটি মোটর এসে দাঁড়াল তাঁর হোটেলের সামনে। আবার কে জুটল এসে এমন সময়? বাইরের ঘরটাতে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি যে আপাততঃ অতিথি-সৎকার করতে অক্ষম এই কথাগুলো আর একবার উচ্চারণ করবার সুযোগ পেয়ে ঈষৎ পুলকিতও হলেন মনে মনে।

অনীতা মোটর থেকে নেবে এল।

"আপনিই কি এই হোটেলের মালিক"

"হ্যাঁ। কিন্তু আপাততঃ অতিথি-সৎকার করতে অক্ষম আমি। আমার দুটি ঘরেই লোক আছে"

"এখানে সকালের দিকে আমি এসেছিলাম একবার। তখন আপনি ছিলেন না—"

"ও। এই জিনিসগুলি আপনার তাহলে"

"হ্যাঁ"

"তাহলে নিয়ে যান। এখানে তো স্থান নেই। আর একজন মহিলাও আসতে চেয়েছিলেন—তিনি সদারঙ্গবাবুর বাইকের পিছনে চড়ে যাচ্ছিলেন—আমি ভেবেছিলাম এগুলো তাঁরই বুঝি"

"হ্যাঁ, আমাদেরই। আমি তাঁর মেয়ে"

"ও! এই বয়সেও আপনার মায়ের বুকের পাটা আছে বলতে হবে। বাইসিকলের পেছনে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া কম সাহসের কাজ নয়, বিশেষতঃ এ বয়সে। জিনিসগুলো নিতেই এসেছেন তাহলে আপনি"

"হ্যাঁ। আর একটু কাজও আছে—"

"আবার কি"

"একটা খবর যদি দিতে পারেন"

"কিসের খবর"

"দেখুন, আপনার এই হোটেলকে কেন্দ্র করে নানা রকম অদ্ভুত খবর শোনা যাচ্ছে। আমিও তার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি। আপনার মুখ থেকে সত্যি কথাটা শুনতে চাই"

"আমার হোটেল সম্বন্ধে অদ্ভুত খবর। শুনে স্তম্ভিত হচ্ছি। কে বলেছে—"

"সদারঙ্গবিহারীলাল বলে এক ভদ্রলোক। তিনি নাকি কাল রাত্রে এখানে এসেছিলেন। তিনি বলেছেন—"

"ও, তিনি। তাঁর অসাধ্য কিছু নেই"

"তিনি কাল রাত্রে এখানে নাকি একজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে দেখেন। তাঁরা এখানে নাকি কাল রাত্রে ছিলেনও। তাঁদের সঙ্গে আর কোনও তৃতীয় ব্যক্তি ছিল কি?"

"কংগ্রেসকর্মী অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে আর তাঁর স্ত্রী কথা বলছেন কি?"

হ্যাঁ। অন্ততঃ—তাঁরা দুজনে কি ছিলেন এখানে?"

"আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই আমি জানবেন। ও রকম ভাবে জেরা যদি করেন কিছু বলব না। তবে ভদ্রভাবে যদি জানতে চান বলছি, হ্যাঁ, তাঁরা ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি আব কেউ ছিল না। একটা হতচ্ছাড়া কুকুর ছিল অবশ্য—"

"দেখুন সমস্ত ঘটনা আমার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা দরকার। আপনি দয়া করে যা জানেন খুলে বলুন। খবরগুলো আমাকে জানতেই হবে যেমন করে হোক। দরকার হলে আইনের সাহায্যও নিতে হবে শেষ পর্যন্ত—"

"আইনের সাহায্য। আপনি কি বলতে চান আমার হোটেলে বে-আইনী কিছু করি আমি? আইন দেখাচ্ছেন আমাকে। জানেন আমার হোটেল যে আইন অনুসারে চালাই আমি—তা একেবারে নিখুঁত। সন্দেহজনক কোন কিছুকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় না এখানে"

"তা জানি বলেই তো আপনাকে এত কথা জিজ্ঞেস করছি"

গোঁসাইজির ভাবভঙ্গি দেখে অনীতা ঈষৎ মোলায়েম সুর ধরলে। তা না হলে কার্যোদ্ধার হবে না। আর এ কথায় প্রীতও হলেন গোঁসাইজি। বললেন, "কোনও বাজে লোককে ঢুকতে দিই না আমি এখানে। এখানে ও-সব চালাকি চলবার উপায় নেই"

ঈষৎ হেসে অনীতা বললে—"কিন্তু আপনাকে কেউ ঠকাতেও তো পারে"

"ঠকাবে। আমাকে? আমি কি কচি খোকা?"

"ধরুন, কাল যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা যে ব্রজেশ্বরবাবু আর তাঁর স্ত্রী এ কি করে জানলেন আপনি"

"সদারঙ্গবাবু এই সব বলে বেড়াচ্ছেন বুঝি। দেখুন আমি প্রমাণ না রেখে কোনও কাজ করি না। একবার এক অ্যানার্কিস্ট ছোকরা আমাকে ফাঁকি দিয়েছিল, তারপর থেকে আমি সাবধান হয়েছি। তাছাড়া কংগ্রেসকর্মী অধ্যাপক কি মিছে কথা বলবেন?"

"তিনি হয়তো বলবেন না, কিন্তু তাঁর নাম করে অপর কেউ আপনাকে ঠকিয়ে যেতে পারে"

"তাঁর নাম করে?"—ঈষৎ থতমত খেয়ে গেলেন গোঁসাইজি, তারপর অযৌক্তিকভাবে বলে উঠলেন—"দেখুন, আপনি যদি আইনের সাহায্য নেন, আপনার বন্ধু সদারঙ্গবাবু মানহানির দায়ে পড়ে যাবেন বলে দিচ্ছি। আমার হোটেলের নামে এ-রকম যা-তা কথা রটিয়ে পরিত্রাণ পাবেন না উনি—"

"না, তাঁর কথায় বিশ্বাস করিনি আমি। আমি শুধু জানতে চাইছি, যিনি এসেছিলেন তিনিই যে ব্রজেশ্বরবাবু এর কোনও প্রমাণ আছে কি আপনার?"

"প্রমাণ? তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একঘরে একখাটে শুয়ে ছিলেন আমি তা স্বচক্ষে দেখেছি—মানে, দৈবাৎ দেখে ফেলেছি"

"এটা কি একটা প্রমাণ হল? আপনিই বলুন"

ভ্রূ কুঞ্চিত করে গোঁসাইজি চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ অনীতার দিকে। সঙীন মেয়ে তো! কালে কালে হচ্ছে কি।

"আরও প্রমাণ আছে, আসুন আমার সঙ্গে। আমি যতটা পেরেছি প্রমাণ রেখেছি। আসুন—"

অনীতার চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গোঁসাইজির পিছু পিছু আপিস ঘরে ঢুকল সে। আশা আর আশঙ্কার দ্বন্দ্ব চলছিল তার মনে। বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করছিল।

গোঁসাইজি তাঁর 'অ্যাড্‌মিশন রেজিস্টার'খানি পাড়লেন।

"এই খাতায় প্রত্যেক অতিথিকে স্বহস্তে নিজের নাম এবং পরিচয় লিখে দিতে হয়। আমি স্বচক্ষে ব্রজেশ্বরবাবুকে এই খাতায় নিজের নাম এবং পরিচয় লিখতে দেখেছি। এই দেখুন—"

"দেখি"

দেখেই অনীতার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"আপনি স্বচক্ষে তাঁকে লিখতে দেখেছেন?"

"তিনি যখন লিখছিলেন আমি ঘরে এসে ঢুকলাম। স্বচক্ষে দেখেছি বই কি—"

অনীতার বুকের ভেতরটা সহসা মুচড়ে উঠল অনুতাপে। ছি, ছি, সুশোভনের প্রতি কি অবিচারই করেছে সে! এ হাতের লেখা সুশোভনের হতেই পারে না। এমন স্পষ্ট গোটাগোটা করে লিখতেই পারে না সুশোভন। তার লেখা তো অর্ধেক পড়াই যায় না, এমন হিজিবিজি করে লেখে সে।

খাতা বন্ধ করে অনীতা বেরিয়ে এল আপিস-ঘর থেকে। গোঁসাইজিও এলেন।

"দেখুন, আমার হোটেলের বদনাম দেবার সাহস হয় নি আজ পর্যন্ত কারও—তা তিনি সদারংই হোন বা সদ্বিক্রমই হোন। কোনও খুঁৎ রাখি নি আমি। এটা হোটেল নয়, পান্থনিবাস—"

"না, আপনার ব্যবস্থা সত্যিই খুব ভাল। আমাদেরই ভুল হয়েছিল। অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার—"

অনীতা মোটরে চড়ে বসল। কতকগুলো সমস্যার সমাধান হল না এখনও। সুশোভন কাল রাত্রে কোথায় শুয়েছিল? সুশোভন বললে কাল রাত্রে সে এখানে ছিল। কোথা শুয়েছিল তাহলে? যাই হোক, একটা ব্যাপার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল—সুশোভনকে মিছে সন্দেহ করেছিল তারা। কাল রাত্রে সুশোভন যাই করে থাক, সে নির্দোষ। বেচারী বার বার চেষ্টা করেছে নিজের দোষস্খালন করবার—কিন্তু সে তার কথায় কর্ণপাত পর্যন্ত করেনি।

"এখন কোথায় যাব, মা?"—ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল।

"ফিরে চল—"

"বাড়ি?"

"হ্যাঁ"

"এই, থাম থাম—"

চিৎকার করে উঠল সুশোভন।

"দিগ্বিজয়বাবুর গাড়ি নাকি"

ক্যাঁচ করে থেমে গেল গাড়িটা।

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—ড্রাইভার জবাব দিলে মুখ বাড়িয়ে।

"শোন, আমি গাড়ি নিয়ে ছিপছর্‌রামারি বা ফাৎনাফিরিঙ্গিপুরে যাব—মানে, অনীতাকে যেখানে রেখে এসেছ সেইখানে রেখে এসো আমাকে। জরুরি দরকার"

"তুমি।"

"অনীতা?"

"এস, ভিতরে ঢোক"

তড়াক করে মোটরে উঠে বসল সুশোভন।

"দেখ, আমি সব বুঝিয়ে বলতে চাই। তুমি অমন অবুঝের মতো করছ কেন। বুঝিয়ে বলছি সব, শোন আগে—"

"দরকার নেই। কিচ্ছু বলবার দরকার নেই। পরে বোলো কোন সময়ে যদি তোমার ইচ্ছে হয়। আমি সব খবর নিয়েছি। বড় অন্যায় হয়ে গেছে আমার। রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটি। প্রথমটা মনে হয়েছিল—আমায় মাপ কর তুমি—মাপ কর—বল, মাপ করেছ?"

সুশোভন এটা প্রত্যাশা করেনি। ঘটনা-পরম্পরা যে এমন নাটকীয়ভাবে হঠাৎ ডিগবাজি খেয়ে যাবে তা তার কল্পনাতীত ছিল।

"মাপ? মোটেই না, মানে, ও প্রশ্নই ওঠে না। আমাকে ভুল বুঝে তোমরা কেন যে এমন করছ—"

"আর কক্ষণো করব না। এইবারটি মাপ কর"

"না, না, মাপ মানে—উঃ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে উঠলাম মনে হচ্ছে। যাক, এখন কি করা যায় বল তো"

সুশোভনের ইচ্ছে করছিল বেলুনের মতো উড়তে।

"চল, দুজনে কোলকাতা ফিরে যাই"

"তা তো যাবই। রাতটা কোথায় কাটানো যায়? এখানে ভাল হোটেল আছে কোথাও বলতে পার"

"দীঘড়াতে আছে। কাছেই"—ড্রাইভার উত্তর দিলে।

"তাহলে সেইখানেই নিয়ে চল আমাদের"

গাড়ি দীঘড়া অভিমুখে ধাবিত হল।

"এইবার সব বলি তাহলে খুলে"—অনীতার দিকে ঘুরে বসল সুশোভন।

"কি দরকার—আসল কথাটা জেনেই গেছি যখন"

"কি করে জানলে"

"গোঁসাইজির সঙ্গে দেখা করে। অ্যাড্‌মিশন রেজিস্টারটা দেখেছি। দু-একটা কথা যদিও স্পষ্ট হয়নি এখনও, কিন্তু সে পরে হলেও চলবে"

গাড়ি দীঘড়ায় এসে পৌঁছল।

নেবেই সুশোভন চেঁচিয়ে উঠল—"আরে, গণেশ যে। তুমি এখনও যাওনি?"

গোঁফ চুমরে গণেশ বললে, "এইবার যাব। সমস্ত দিন লেগে গেল রেডিয়েটারটা সারাতে। এখানকার মিস্ত্রী সব অতি বাজে। ঝালতেই জানে না"

"ঠিক হয়েছে এখন?"

"হয়েছে"

"গাড়ি কোথায় তোমার"

"মিস্ত্রীর বাড়ির সামনে"

"চল তাহলে তোমার গাড়িতেই ফিরি। এখনি যাব কিন্তু"

"বেশ। গাড়িটা আনি তাহলে"

গণেশ চলে গেল।

সুশোভন অনীতার দিকে ফিরে বললে, "দিগ্বিজয়বাবুকে একটা চিঠি লিখে দি তাহলে— যে, পরে কোনও এক সময়ে আসব আমরা। এখন ফিরে চললুম"

"বেশ"

পকেট বুক থেকে একখানা পাতা ছিঁড়ে সুশোভন একখানা চিঠি লিখে দিলে। ড্রাইভারকে বকশিশও দিলে। তারপর হোটেলে ঢুকল। গরম ভাত, মুগের ডাল, আর গরম মাছভাজা পাওয়া গেল। যথেষ্ট।

খাওয়া-দাওয়া সেরে অনীতা বললে—"কোলকাতা যাবার আগে মাকে কিন্তু খবরটা দিতে হবে"

"হ্যাঁ, সদারঙ্গবিহারীলালকেও।"

"আমি গিয়ে দেখা করে এলে কেমন হয়। কাছেই তো, না?"

সুশোভন ইতস্ততঃ করতে লাগল।

"তোমার গিয়ে দরকার নেই। এখানকার পথঘাট ভাল নয়, তাছাড়া তোমাকে তোমার মা হয়ত ছাড়তে চাইবে না—সে আবার এক বখেড়া হবে। তার চেয়ে আমিই যাই বরং। খবরটা দেওয়া তো কেবল—"

"আমি মাকে একটা চিঠি লিখে দিই না হয় যে ভয়ের কোনও কারণ নেই। আমাদের আশঙ্কা অমূলক—কি বল—"

মুচকি হেসে সুশোভনের দিকে চাইলে অনীতা।

"বেশ, তাই দাও"

হোটেলওয়ালার কাছ থেকে কাগজ চেয়ে অনীতা চিঠি লিখতে বসল। লিখতে লিখতে অনীতা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা, কাল রাত্রে তুমি ছিলে কোথা? তুমিও ওখানেই ছিলে?"

"সে অনেক কথা। পরে শুনো"

"এইটুকু বল না এখন—"

"হ্যাঁ, ওই হোটেলেই ছিলাম। তবে নানা স্থানে। ঘর তো একটি। কখনও বারান্দায়, কখনও খাবার ঘরে, কখনও উঠোনে, কখনও সিঁড়িতে—এইভাবে কাটিয়েছি আর কি। ভিজেওছিলাম বেশ—"

"ছি, ছি, কি দুর্গতি"

"চরম"

"অসুখ না করে"

"না, কিচ্ছু হবে না"

"কিন্তু তোমরা দুজনে মিলে মিথ্যে কথাটা বললে কেন তা এখনও বুঝতে পারছি না আমি। সান্ত্বনা হোটেলে আছে—মিছে করে এ কথা বলতে গেলে কেন"

"না বললে তুমি আমাদের সঙ্গে মোটরে আসতে না"

"আহা"

"নাও, চিঠিটা লিখে ফেল চটপট"

"এ তো সঙীন প্যাঁচ হলো দেখছি"—সদারঙ্গবিহারী চিবুক চুলকে বলে উঠলেন।

"প্যাঁচ! মেয়ে অন্ধকারে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে, সেটা তোমার প্যাঁচ মনে হচ্ছে। আবার যাও, দেখ কি হল"

"রাস্তায় গিয়ে আর কি করব। ছ-বাব তো গেলাম। দিগ্বিজয়বাবুর 'কারে' এসেছে, চিন্তার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। প্যাঁচ অন্য কারণে বলছিলাম। আমাদের কি হবে"

"আমাদের?"

"মানে শোবার কথা ভাবছি। দোতলায় পাঁচির মায়ের ঘরটায় অবশ্য আপনি শুতে পারেন"

"আমি ঘুমুব না। চিন্তায় আমার ঘুম আসবে না। যেখানেই আমাকে শুতে দাও—খাড়া বসে থাকব আমি সারারাত"

"ও। তাহলে, মানে রাগ করবেন না, আমি ভাবছিলাম পাঁচির মায়ের ঘরটায় শোব। আপনার সেখানে হয়তো কষ্ট হবে। কিন্তু আপনি যদি জেগে থাকাই 'ডিসাইড' করে থাকেন তাহলে—ঘরটা কিন্তু—"

"আমি দেখেছি সে ঘর, রাতটা কাটিয়ে দিতে পারব"

"বেশ। কিন্তু আপনি গায়ে কি দেবেন? পাঁচির মায়ের লেপ ছিল একটা—"

"চল, দেখি গিয়ে"

"সেই ভাল। না হয় পাড়া থেকে চেয়ে-চিন্তে আনব একটা। জনার্দনবাবু একটা এক্‌সট্রা লেপ করিয়েছেন এবার জানি।"

"চল"

একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন দুজনে। পাঁচির মা থাকত ছাতের ছোট্ট ঘরটায়। সিঁড়ির দুয়ারে মিলারের তালা লাগানো ছিল একটা, চাবি লাগামাত্র লাফিয়ে খুলে যায় যেগুলো—আবার টিপলেই বন্ধ হয়ে যায়। সদারঙ্গ চাবিটা খুললেন। রিং-সমেত তালাটা 'সুসো'তে ঝুলতে লাগল।

...পাঁচির মার তক্তপোশের উপর কোণের দিকে বিছানার মতো কি একটা গোটান ছিল। স্বয়ম্প্রভা খুলে দেখলেন সেটা। দেখে নাক সেঁটকালেন।

সদারঙ্গবিহারী বললেন, "আপনি যদি ওটা গায়ে না দিতে চান, আমিই দেব না-হয়। আমার লেপটা আপনি নিন। তাহলে পাড়ায় বেরিয়ে ছুটোছুটি করতে হয় না আর। রাত প্রায় দশটা হল তো—"

"বেশ, তাই হবে। চল নীচে যাই। সিঁড়ির কপাট আবার বন্ধ করতে গেলে কেন। খোল"

"বন্ধ তো করিনি। হাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে বোধ হয়। খুলছি। আরে— এ কি—"

"কি হল"

"এ যে বন্ধ। বাইরে থেকে বন্ধ—আরে"

"শিগ্‌গির কপাট খোল বলছি। রসিকতা করবার সময় এ নয়"

"খুলছে না। এ কি—আরে"

"খোল বলছি"

"পারছি না, বাইরে খেকে বন্ধ করে দিয়েছে কেউ। তালাটা বাইরে ঝুলছিল"

"বাজে কথা। ধাক্কা মার। বন্ধ করতে আসবে কে? আর করবেই বা কেন? ঠেল, জোরে ঠেল, ধাক্কা দাও"

সদারঙ্গবিহারীলাল ধাক্কা দিলেন, তারপর ঠেললেন, স্বয়ম্প্রভার দিকে চাইলেন একবার। মুখে করুণ হাসি। মাথা নাড়লেন। আবাব ঠেললেন। কিন্তু না, কপাট খুলল না।

"বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছে কেউ। তালাটা বাইরে ঝুলছিল কি না। কেউ হয়তো ঠাট্টা করে, কিংবা কি জানি—"

"আবার ঠেল। ঠেল। গুঁতো মারো। গায়ে জোর নেই না কি? সরো—"

"দেখুন আপনি যদি পারেন। দেখুন। পারবেন না। অসম্ভব"

স্বয়ম্প্রভা চেষ্টা করলেন। দাঁতে দাঁত দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করলেন। হল না। তারপর হঠাৎ তিনি রুখে দাঁড়ালেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—"তুমিই ষড় করেছিলে বোধ হয় কারও সঙ্গে—"

"ষড়! রামঃ—না—না—ছি—বাঃ। পা ছুঁয়ে বলতে পারি আপনার"

"কে তবে বন্ধ করলে কপাট"

"কি করে বলব। আপনিও যেখানে আমিও সেখানে। হয়তো পাড়ার কেউ ঢুকেছিল, ইয়ার্কি করে গেছে। অন্যায় কিন্তু। খুব। ভাবতেই পারি না"

"যেমন করে হোক বেরুতেই হবে"

"কি করে তা তো বুঝতে পারছি না"

"সমস্ত রাত এখানে থাকব বলতে চাও তোমার সঙ্গে। বেরুতে হবে যেমন করে হোক। অনীতা যে কোনও মুহূর্তে এসে পড়তে পারে"

"তা পারে। কিন্তু—ছি—কি কাণ্ড। কি করি বলুন তো"

"চেঁচাও। পাড়ার সবাইকে জাগাও, চেঁচাও—"

"না, না, ছি, সে কি হয়। আমি এখানে বাস করি, আমার একটা মানসম্ভ্রম আছে এখানে।

না—চেঁচানো চলবে না। লোকে হাততালি দেবে। চেনেন না আপনি এদের। গুজবের চোটে কান পাতা যাবে না, সে ভয়ানক ব্যাপার হবে। আপনার পক্ষেও। ঘাবড়ে যা-তা করবেন না। দাঁড়ান—"

স্বয়ম্প্রভা পাঁচির মার খাটের উপর বসে পড়লেন। বিস্রস্তকেশ, স্ফীত-নাসারন্ধ্র। সদারঙ্গ বিহারীলাল চশমাটা খুলে মুছলেন। তারপর সেটা পরে সভয়ে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

"সমস্ত রাত তোমার সঙ্গে এই ঘরে থাকতে হবে নাকি"—চিৎকার করে উঠলেন স্বয়ম্প্রভা।

"দোহাই আপনার, চেঁচাবেন না অমন করে"

"কপাট খোল এক্ষুনি। তা না হলে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করব আমি—"

"না না, লোকে হয়তো ভাববে আমি বলাৎ—মানে, খারাপ কিছু করছি বুঝি একটা। একটু সবুর করুন। আমি দূরে থেকে দৌড়ে গিয়ে ধাক্কা মেরে মেরে দেখি। হয়তো ভেঙেও যেতে পারে—ভয়ানক শব্দ হবে কিন্তু—"

"যা কববার কর। আমি এখানে আর একদণ্ড থাকতে চাই না"

ছোট ঘব। দৌড়বার বেশি স্থান ছিল না। মালকোঁচা মেরে সামান্য একটু ছুটে এসে সদারঙ্গবিহারী যে ধাক্কাটা মারলেন তা নিতান্তই হাস্যকর। কপাট খোলা দূরে থাক তেমন শব্দও হল না।

"ঠেল, ঠেল, জোরে, আরও জোরে"—চেঁচাতে লাগলেন স্বয়ম্প্রভা।

"হেঁইও—হেঁইও"—সদারঙ্গ চেঁচাতে লাগলেন ঠেলতে ঠেলতে।

"ঠেল, ঠেল, আরও জোরে—"

"বাপ্‌স্—উঃ। চেঁচাবেন না অত জোরে, দোহাই আপনার। পাড়ার লোকে যদি শুনে ফেলে—বুঝতেই পারছেন"

॥ সাতাশ ॥

অনুসন্ধান করতে করতে সুশোভন সদারঙ্গবিহারীর বাসায় এসে দেখলে কপাট খোলা। আলো জ্বলছে। ঘরে কেউ নেই। ছাতাটি এবং ব্যাগটি সে মেঝেতে নাবিয়ে রাখলে। তারপর অনীতার চিঠিটা বার করে টেবিলের উপর ঠিক সামনেই এমনভাবে রাখলে যাতে ঘরে ঢুকলেই চোখে পড়ে।

উপরে শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে—সিঁড়ি রয়েছে একটা বারান্দার দিকে। আলো দেখা যাচ্ছে, কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে। ঘর থেকে বেরিয়ে সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল সে। পায়ে ছিল রবার-সোল্‌ড জুতো, কোন শব্দ হল না। সিঁড়ির কপাটটা হাওয়াতে আপনি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দোদুল্যমান মিলারের তালাটা চোখে পড়ল। সদারঙ্গবিহারীলাল এবং স্বয়ম্প্রভার কথার টুকরা শুনতে পেলে দু-একটা। ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুশোভন। পরমুহূর্তেই হাসি চিকমিক করে উঠল তার চোখে। আস্তে আস্তে উঠে তালাটি কুট্ করে লাগিয়ে দিয়ে নেবে এল সে। চাবির রিংটি টেবিলের উপর রেখে বেরিয়ে পড়ল। মিনিট দশেকের মধ্যেই হোটেলে পৌঁছে গেল আবার।

"খুব চট্ করে ফিরলে তো"

"হ্যাঁ, চিঠিটা সদারঙ্গবাবুকে দিয়েই চলে এলাম। কথাবার্তা হল কিছু"

"মাকে কেমন দেখলে"

"তিনি পাশের ঘরে ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আর দেখা করি নি"

"চটবেন খুব"

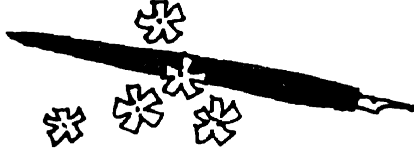
"গণেশ এসেছে?"

"হ্যাঁ"

"চল তবে, আর দেরি কেন"

"চল"

মোটর ছুটে চলেছে নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে অন্ধকার ভেদ করে। ঘেঁষাঘেঁষি করে পাশাপাশি বসে অনীতা আর সুশোভন। সুশোভনের ঘাড়ে মাথা রেখে অনীতা ঘুমুচ্ছে।



পঞ্চপর্ব

টেলিফোন পর্ব

।। এক।।

"হ্যালো—"

"হ্যালো, কে, আরে ভূপেশ না কি! কোথা থেকে ফোন করছ?"

"কোলকাতা থেকে। তুমি হঠাৎ দিল্লী চলে গেলে কবে?"

"দিন সাতেক হল এসেছি। বিজনেসের ব্যাপারে। কিছুদিন থাকতে হবে এখন।"

"তাই শুনলাম তোমার বাড়ি গিয়ে। একটা জরুরী দরকারে ফোন করছি সেই জন্যে। একটা খবর আমার এখনি চাই।"

"কি খবর।"

"তুমি কি আবার বিয়ে করবে ঠিক করেছ?"

"আমি! কে বললে!"

"পরেশ মল্লিকের সঙ্গে ট্রামে দেখা হল, তার কাছেই শুনলাম।"

"একবার বিয়ে করেই তো নাজেহাল হয়েছি। আবার!"

"এবার হয়তো সুখী হবে। দ্বিতীয় বার বিয়ে তো লোকে হরদম করছে।"

"আমার পক্ষে সেটা কি উচিত এই বয়সে।"

"নয় কেন। কিই বা এমন বয়স হয়েছে তোমার! পঁয়তাল্লিশ? ও, চল্লিশ। তা হলে তো তুমি ইয়ংম্যান হে। শরীরও অপটু নয়, বিয়ে করবে না কেন। ছেলেপিলে নেই, টাকার অভাব নেই, বিয়ে না করবার কোনও সঙ্গত কারণ তো দেখতে পাচ্ছি না। সেদিন বাড়ি কিনেছ অতবড়। বিয়ে না করলে অত বড় বাড়ি ভরাবে কি দিয়ে।"

"পাগল না কি। লোকে কি বলবে।"

"লোকে যা খুশি বলুক তাতে কিছু এসে যায় না। তোমার নিজের ইচ্ছেটা কি শুনি—"

"এই তোমার জরুরী দরকার? রাত দুপুরে এরই জন্যে ফোন করেছ—"

"আগে শোন সবটা, তার পর মন্তব্য কোরো। শুনলে বুঝবে ব্যাপারটা আমার পক্ষে কত মারাত্মক রকম জরুরী। তা না হলে কি আমি শুধু শুধু ট্রাঙ্ক কল করে পয়সা নষ্ট করছি।"

"কি বল।"

"আমার এক মাসতুতো মেজো শালীর একটি বয়স্থা মেয়ে হঠাৎ এসে আমার ঘাড়ে পড়ে গেছে। মেয়েটির বাপ মারা গেছে অনেকদিন আগেই। সে মানুষ হচ্ছিল তার এক বিধবা মাসীর কাছে। সে মাসীও মারা গেছে মাসখানেক হল! মেয়েটি বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে আমার কাছে হাজির হয়েছে। হ্যালো,—শুনছ? কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবছিলাম কি করি, এমন সময় শুনলাম তুমি বিয়ে করবে ঠিক করেছ।"

"বাজে কথা শুনেছ—"

"পরেশ মল্লিক বললে ওই উদ্দেশ্যে তুমি নাকি একটি অনাথা মেয়েকে বাড়িতে আশ্রয়ও দিয়েছ।"

"বাজে কথা বলেছে—"

"পরেশকে যতটুকু চিনি তাতে—"

"কাউকে চেনা অত সহজ নয়, ভাই। যতই দিন যাচ্ছে ততই এ কথাটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি।"

"তা মানছি। কিন্তু পরেশের মতো একজন গম্ভীর লোক বানিয়ে বানিয়ে অতগুলো মিছে কথা বলবে, এ কথা ভাবাও ঠিক নয়—"

"পরেশ তোমাকে ভাঁওতা দিয়েছে। তোমার শালীর মেয়ের অন্য কোনও ব্যবস্থা কর। তুমি চেষ্টা করলে কোথাও চাকরি জুটিয়ে দিতে পারবে। হেলথ কেমন?"

"খুব ভাল। একেবারে নিটোল চেহারা। আমি তাকে নার্সিং শেখাবার জন্যে কোথাও ভরতি করবো ভেবেছিলাম। সব ঠিকই করে ফেলেছি, কাল ভরতির লাস্ট ডেট। এমন সময় পরেশের মুখে শুনলাম যে তুমি বিয়ে করছ। সত্যিই যদি বিয়ে কর আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর না ভাই। মেয়েটি তোমার ঠিক উপযুক্ত। বয়স প্রায় পঁচিশ, স্বাস্থ্যবতী, কর্মঠ। হ্যালো—আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা তাতে লোকে প্রথম প্রথম কিছুদিন বলে যে বিয়ে করব না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত করে। তুমি যদি আশা দাও তা হলে অপেক্ষাও করতে পারি আমি। টেক ইওর টাইম, তাড়াতাড়ি কিছু নেই—"

"তুমি আমার ঠিকানা পেলে কোথা?"

"সেদিন বরেন বলে যে ছোকরাটিকে তুমি উদ্ধার করেছ তার কাছ থেকেই পেলাম। প্রথমে দিতে চায়নি, বলছিল তুমি নাকি মানা করে গেছ। খুব জরুরী দরকার আছে বলাতে ঠিকানা, ফোন নম্বর সব লিখে দিলে। ঠিকানা দিতে মানা করে গেছ কেন বুঝলাম না।"

"বিজনেস ব্যাপারে অনেক সময় অনেক কিছু করতে হয় তাই। না, না, আমি এখন কোনও কিছু ঠিক করিনি। পরেশকে এমনই বলেছিলাম ঠাট্টা করে—"

"কিন্তু পরেশ যে বললে তুমি ওই উদ্দেশ্যে একটি অনাথা মেয়েকে আশ্রয় দিয়েছ—"

"কাউকে আশ্রয় দিলেই বিয়ে করতে হবে তাকে! কি আশ্চর্য! পরেশ কি কি বলেছে বলতো—"

"সে বললে একদিন একটি লেখাপড়া-জানা অনাথা মেয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বেরুচ্ছিল, এমন সময় সেই খবরের কাগজের আপিসের সামনে তার সঙ্গে তোমার নাকি দেখা হয়। তারপর কথা কইতে কইতে রাস্তায় এসে তুমি নাকি আশ্বাস দিয়েছ যে তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবে। নিজের ঠিকানা দিয়ে একথাও বলেছ যে দরকার হলে সে যেন তোমার সঙ্গে দেখা করে। মেয়েটি তোমার সঙ্গে দেখাও করেছে এবং তুমি নাকি তাকে আশ্রয়ও দিয়েছ। পরেশকে তুমি নিজেই বলেছ যে যদি আবার বিয়ে কর তা হলে ওই রকম একটি মেয়েকেই বিয়ে করবে। একসঙ্গে বউ, স্টেনো এবং প্রাইভেট সেক্রেটারী হবে সে। এসব বলনি তুমি পরেশকে?"

"বলেছি। ঘটনা সবই ঠিক! উপকরণ ঠিক আছে। আলু এবং পটল দিয়ে ছেঁচকিও বানান যায়, দমও বানান যায়। পরেশটা দমবাজ দেখছি।"

"আমার তা হলে কোনও আশাই নেই?"

"তুমি যে রকম আশা চাইছ তা দেওয়া তো অসম্ভব আমার পক্ষে। মেয়েটিকে নার্সিং শিখতেই পাঠাও না।"

"তাইতো ঠিক করেছিলাম। এখনও তাই ঠিক আছে। ভরতি হয়তো করতে পারব, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত ও পালিয়ে আসবে। ভয়ানক ভীতু, তার উপর ছুঁচিবাই আছে।"

"ও বাবা! এই মালটিকে তুমি আমার ঘাড়ে চড়াতে চাইছ। খুব হিতৈষী বন্ধু তো—"

"হিতৈষী বলেই চাইছি। এই বয়সে তুমি যদি কোনও নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা রূপসীকে বিয়ে কর তা হলে সেটা কি ঠিক হবে? সুলোচনার মতো মেয়েই তোমার উপযুক্ত। মহিষের মতো খাটবে আর কৃতজ্ঞচিত্তে সারা জীবন তোমার সেবা করবে।"

"দেখ ভাই ভূপেশ, ইতিপূর্বে বিয়ে তো করেছি একবার। আমাব পরিবারটি অপ্সরীও ছিল না, কুবের-কন্যাও ছিল না। এক বন্ধুর স্ত্রীর অনুরোধে হা-দরিদ্রের ঘর থেকে সাদা-মাটা দেখেই বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু সে যে খুব কৃতজ্ঞ ছিল তাতো বলতে পারি না। আমাকেই বরং সারা জীবন হাতজোড় করে থাকতে হয়েছে, যেন তাকে বিয়ে করে আমি ঘোর অপরাধ করেছি—"

"এখন যদি শিক্ষিতা রূপসী মেয়ে বিয়ে কর তা হলে হাঁটুও গাড়তে হবে—"

"কি আপদ। আমি যে বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়েছি এ ধারণা তোমার হল কি করে। আশ্চর্য কাণ্ড দেখছি। পরেশ মাস্টারের মুখে একটা উড়ো খবর শুনে রাতদুপুরে ফোনে কি কাণ্ড।"

"আমার মতো অবস্থায় পড়লে তুমিও ঠিক এই কাণ্ডই করতে। আচ্ছা, একটা কথা অন্তত দাও। বিয়ে যদি কর আমার কথাটা মনে রাখবে।"

"তুমি পুলিশে চাকরি কর, তোমার পক্ষে একটা পাত্র যোগাড় করা কি এতই শক্ত।"

"পুলিশে চাকরি করলেই যে সর্বশক্তিমান হওয়া যায় এ ধারণা কি কবে হল তোমাব?"

"দেখেশুনে তাই তো মনে হয়—"

"ভুল ভুল, অত্যন্ত ভুল। নিজেদের জন্যে আমাদের কিছু করবার উপায় নেই। লক্ষ জোড়া চোখ আমাদের প্রতিটি কার্য দেখছে। একাধিক মনিবের মন জুগিয়ে চলতে হচ্ছে সর্বদা। সেদিন তোমার বরেন ছোকরাকে ছেড়ে দিয়েছি, তাই নিয়ে নানারকম কানাঘুষো শুরু হয়ে গেছে। বিশ্বাস কর ভাই আমি অন্তত অত্যন্ত অসহায়। ঋণে মাথার চুলটি পর্যন্ত বিকিয়ে আছে। আমার এ দায়টা তুমি উদ্ধার কর, বিধু। ইচ্ছে করলেই তুমি পার। হ্যালো—হ্যালো—কেটে দিলে না কি—"

।। দুই ।।

"হ্যালো, হ্যালো, কে বরেন, আমি বিধু, হ্যাঁ খবর সব ভাল তো?"

"ভালই সার।"

"তোমাকে যে কাজটি করতে মানা করে এসেছিলাম তুমি ঠিক সেইটি করেছ দেখছি।"

"আজ্ঞে না সার! আপনি যেমন যেমন বলে গেছেন সব ঠিক তেমনি তেমনি করে যাচ্ছি।"

"ভূপেশকে আমার ঠিক্‌না আর ফোন নম্বর দিলে কেন—"

"ও ভূপেশবাবুকে! তিনি বললেন যে খুব জরুরী খবর দিতে হবে আপনাকে একটা, না দিলে ভয়ানক ক্ষতি হবে। তাই আমি ভাবলাম—"

"কোন কারণেই আর কাউকে তুমি আমার ঠিকানা দেবে না।"

"আচ্ছা সার।"

"ফোন নম্বরও না।"

"আচ্ছা সার।"

"বিশাখা দেবীর খবর কি?"

"ভালই।"

"তোমার সঙ্গে কোনও কথা-টথা হয়েছে?"

"আজ্ঞে হয়েছে। তবে ফোনে। তিনি ওপর থেকে মোটে নামেনই নি।"

"ও। খাবার-টাবার সব ওপরে পাঠিয়ে দিচ্ছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তা ভাল। আমি যে দিল্লী এসেছি একথা বলনি তো ওঁকে।"

"আপনি যখন মানা করে গেলেন তখন কি করে বলব। বলেছি আপনি জামশেদপুর গেছেন।"

"দ্যাট্‌স গুড্‌। আর কেউ খোঁজ করতে এসেছিল?"

"আজ্ঞে না, এখনও পর্যন্ত তো কেউ আসেনি।"

"ফোনে তোমার সঙ্গে ওর কি কথা হয়েছে?"

"বিশেষ কিছুই না। তিনি আমাকে এটা ওটা আনতে বলেছেন, আমি আনিয়ে দিয়েছি।"

"কি কি আনতে বলেছেন?"

"খানকয়েক তাঁতের শাড়ি, একটা লক্ষ্মীবিলাস, এক বাক্স সাবান আর কিছু ফুল। ফুল দু'বেলাই দিতে হচ্ছে।"

"পুজোটুজো করেন নাকি?"

"ঠিক বলতে পারি না সার।"

"যা যা চান ঠিকমতো দিও, বুঝলে। আর কোনো বেয়াদপি যেন কোরো না। গিয়ে যদি শুনি—।"

"আজ্ঞে না, আমি ভদ্রবংশের ছেলে।"

"কথাটা শেষ পর্যন্ত শোন। গিয়ে যদি শুনি যে তুমি ওর মনে কোনও আঘাত দিয়েছ, তা হলে তৎক্ষণাৎ তোমাকে দূর করে দেব। তোমার এম. এ. ডিগ্রি তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। আবার গিয়ে পুলিশের খপ্পরে পড়তে হবে। মনে রেখো যে উনি অনাথা এবং আমার অতিথি—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, মনে রাখব বই কি। তা ছাড়া ওর মনে আঘাত দিতেই বা যাব কেন শুধু শুধু। আপনার ফিরতে কত দেরি হবে সার?"

"দিন পনেরো তো হবেই, বেশিও হতে পারে।"

"তা হলে কিছু টাকার ব্যবস্থা করুন, সার। আমার হাতে আর মাত্র ৭০/৭৫ টাকা আছে—।"

"তিনশ' টাকা ফুরিয়ে গেল এর মধ্যে?"

"প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। বিশাখা দেবীর জন্য নানারকম জিনিসপত্র কিনতে হল যে। ওর স্যুটকেসটা কি আপনি এনেছিলেন? সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। সেইজন্যে নানারকম জিনিস কিনতে হচ্ছে। শাড়িতেই তো দেড়শ' টাকা বেরিয়ে গেছে। কয়েকটা রেডিমেড শায়াও কিনে দিতে বলছেন। ওর স্যুটকেসটা পেলে এত খরচ হত না,। আপনি কি হোটেল থেকে সেটা আনেননি?"

"ঠিক মনে পড়ছে না। যাক আমি ফিরে গিয়ে সেটা খুঁজে বের করব। এখন ওর যা যা দরকার কিনে দাও সব। কাল শ'পাঁচেক টাকা পাঠিয়ে দেব। চেক পাঠাব। তোমার কি একাউন্ট আছে কোনও ব্যাঙ্কে?"

"আজ্ঞে না। বেয়ারার চেক পাঠাবেন। না হয় আপনি আপনার আপিসে যদি বলে দেন সেখান থেকেও নিয়ে নিতে পারি। আপনার আপিসটা কোথায় বলুন তো, সার! আপনি বলেছিলেন ধর্মতলা স্ট্রীটে, কিন্তু নম্বরটা বলেননি।"

"থাক, তোমাকে আপিসে যেতে হবে না। আমি তোমার নামে বেয়ারার চেকই পাঠাব। আমার খোঁজে আর কেউ আসেনি তা হলে।"

"ভূপেশবাবু ছাড়া আর কেউ আসেনি।"

"সাবধানে থেকো, বুঝলে। হ্যালো—"

"আচ্ছা।"

"হ্যাঁ, আর একটা কথা শোন। বিশাখা দেবী কোথাও যদি যেতে চান তুমিও সঙ্গে সঙ্গে থেক, বুঝলে।"

"উনি যদি আমাকে সঙ্গে নিতে না চান, সার। না চাইতেও তো পারেন—"

"চাইবেন না কেন! সেটা তোমাকে একটু কৌশলে ম্যানেজ করতে হবে। উনি বেরুতে চাইলে ট্যাক্সি আনাবে। তুমিও চড়ে বসবে তাতে ড্রাইভারের পাশে। একলা ছেড়ে দিও না, বুঝলে—"

"আচ্ছা সার—"

"উনি কোলকাতা শহরে নূতন এসেছেন কিনা, আর আজকাল পথে-ঘাটে চতুর্দিকে বিপদ, তাই বলছি। হ্যালো—"

"বুঝেছি সার।"

।। তিন ।।

"হ্যালো, বিশাখা দেবী, আমি কিছুদূর গিয়ে ফিরে এলাম। আপনার শায়ার মাপ তো বলে দেননি।"

"প্রমাণ সাইজের বললেই হবে।"

"ও। মোটা রোগা সকলেরই এক সাইজের লাগে না কি। আমি ঠিক জানি না—।"

"আপনি প্রমাণ সাইজ বলুন, তা হলেই হবে—।"

"আচ্ছা। সাদা রঙেরই নেব তো?"

"সাদা রং নেবেন না। গোলাপী বা ফিকে নীল।"

"গোলাপী বা ফিকে নীল—ও আচ্ছা।"

"আমার জন্যে ফুল আর কিনতে হবে না।"

"কেন বলুন তো। এ বাজারে জবা ছাড়া কিছু পেলামই না। তখনই মনে হয়েছিল রোজ রোজ জবা দেওয়াটা ঠিক হচ্ছে না, বলেন তো নিউমার্কেট থেকে পদ্মটদ্ম এনে দি—"

"না দরকার নেই—।"

"রাগ করলেন?"

"না, না, রাগ করব কেন। এমনিতেই আপনাদের খরচ হয়ে যাচ্ছে, ফুল কিনে আর বাজে খরচ করতে হবে না।"

"পুজোর জন্যে ফুল তো দরকারই, বাজে খরচ বলছেন কেন।"

"আমি পুজো করি কে বললে আপনাকে।"

"ফুল নিয়ে কি করেন তা হলে—"

"সাজি। ছেলেবেলা থেকে ফুলের গয়না পরা অভ্যাস আমার। আমাদের একটা বড় বাগান ছিল, নানারকম ফুল ফুটত তাতে। তাই আপনাকে কিছু ফুল কিনতে বলেছিলাম। থাক, আর দরকার নেই।"

"দরকার নেই কেন? কি কি ফুল আপনার পছন্দ, বলুন না, এনে দিচ্ছি।"

"কি হবে বাজে খরচ করে—।"

"আপনি যাঁর অতিথি তিনি বারবার বলে গেছেন আপনার কোনও প্রকার অসুবিধা যেন না হয়। এসে যদি শোনেন যে তাঁর পয়সা বাঁচাবার জন্যে আপনাকে ফুল কিনে দেওয়া হয়নি, তা হলে আমারই চাকরিই থাকবে না। কি ফুল আপনার পছন্দ, বলুন, এখনই এনে দিচ্ছি। জবাগুলো আমারও তেমন পছন্দ হয়নি। কি ফুল ভালবাসেন আপনি?"

"আমি যে ফুল ভালবাসি তা কি এখানে পাওয়া যাবে!"

"পয়সা ফেললে কোলকাতা শহরে কি না পাওয়া যায়!"

"তাহলে পুটুস ফুল যদি কিছু পান আনবেন—"

"পুটুস? নামই তো শুনিনি কখনও, কি রকম দেখতে বলুন তো—"

"জঙ্গুলে ফুল। অনেকে বেড়াতেও লাগায়। ছোট ছোট ফুল এক সঙ্গে থোকায় থোকায় হয়, রং অনেক রকম দেখেছি, লালেতে হলদেতে মেশানো, ফিকে গোলাপী, শাদা!"

"পুটুস ফুল! আচ্ছা দেখব চেষ্টা করে—থোকো থোকো হয়? ধরুন যদি না পাই। বড্ড শক্ত টাস্ক্ দিয়ে দিলেন, একটা অলটারনেটিভ দিন।"

"বেশ কুন্দ আনবেন তাহলে।"

"পদ্ম বা গোলাপ আপনার পছন্দ নয় বুঝি?"

"হ্যাঁ। পান তো আনবেন।"

"গোলাপ অনেক রকম পাব।"

"ছোট ছোট গোলাপ একরকম পাওয়া যায়। খোঁপায় বা বাটন হোলে লাগাবার জন্য"
"হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেছি।"
"পান তো তাই আনবেন।"
"আচ্ছা শায়াগুলা এখনি এনে দিচ্ছি।"

॥ চার ॥

"হ্যালো, কে, হ্যালো বিষ্ণুচরণ?—"
"আমাকে বিষ্ণুচরণ বলে আর ডেকো না। আমি এখন জমিরুদ্দিন। কি বলছ।"
"আমার চিঠি পাওনি?"
"পেয়েছি।"
"বাড়িগুলো নিয়ে কি করি বলতো।"
"করবে আবার কি। দখল করে ভোগ করগে যাও। চাবি তো তোমায় দিয়ে দিয়েছি।"
"চাবি তো দিয়েছ, কিন্তু দাবি শেষ পর্যন্ত টিকবে কি?"
"টেকা তো উচিত। ও মেয়ে যে নবেন্দুবাবুর তার কোনও প্রমাণ আছে?"
"সেই প্রমাণ সংগ্রহ করবার জন্যেই তো দিল্লী এসেছি।"
"পেলে কিছু?"
"অকাট্য প্রমাণ পেয়েছি।"
"কি রকম।"
"বেশ ঘাবড়ে গেছে তাই।"
"শুনিই না ব্যাপারটা কি।"

"এখানে এসে শুনলাম, নবেন্দুবাবু যখন লাহোরে ছিলেন তখন লুকিয়ে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করেছিলেন একটি। সে স্ত্রীকে কখনও দেশে নিয়ে যাননি। সেই বিবাহের ফল ওই বিশাখা। উনি দ্বিতীয়বার আর বিবাহ করেননি, তাই দেশের লোকে জানত যে উনি আজন্ম-ব্রহ্মচারী।"

"মেয়েটির খবর তোমাকে দিলে কে?"

"শোন তবে, ধরে থাক। আমাদের বাড়ির কাছেই যে ছোট হোটেলটা আছে তার মালিক নকুলেশ্বর আমার খুব পরিচিত লোক। সে একদিন এসে গল্পচ্ছলে আমাকে বললে লাহোর থেকে একটি রেফিউজি মেয়ে এসেছে তার হোটেলে। এসে তার বাবাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার বাবা নাকি পূর্ববঙ্গের লোক, সেখানে তার প্রকাণ্ড বাড়ি, জমিদারি প্রভৃতি ছিল, রায়টের সময় তিনি নাকি কোলকাতায় চলে এসেছিলেন এবং একজন মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করে কোলকাতাতেই বাস করছিলেন। ভদ্রলোকের নাম নবেন্দু বিশ্বাস। নামটা শুনেই আমার ভুরু কুঁচকে গেল। মনে পড়ল তুমি যে বাড়ি আমাকে বেচেছ সে-ও তো কোন এক নবেন্দু বিশ্বাসের। চুপ করে রইলাম কয়েক মিনিট! কিন্তু মনে হল ব্যাপারটা খোঁজ করা উচিত। নকুলেশ্বরকে আমার আসল মনোভাবটা অবশ্য জানতে দিলাম না। বললাম, আমি এক নবেন্দু বিশ্বাসকে চিনতাম চল তো দেখি মেয়েটির যদি উপকার করতে পারি। তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লাম মেয়েটির খোঁজে। হোটেলে গিয়ে শুনলাম সে নাকি একটা চাকর সঙ্গে নিয়ে

কোথায় বেরিয়েছে। ফিরে আসছিলাম, হঠাৎ রাস্তাতেই দেখা হয়ে গেল। নকুলেশ্বর বলে উঠল—ওই যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। একটা খবরের কাগজের আপিসের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। মেয়েটি রূপসী, বয়সও খুব বেশি বলে মনে হল না। নকুলেশ্বরের অন্য কোথায় কাজ ছিল, সে মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে চলে গেল। মেয়েটি বললে সে তার নিরুদ্দিষ্ট বাবার জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে এসেছিল। আলাপ করে বুঝলাম যে নবেন্দু বিশ্বাসের বাড়ি তিনটি তুমি আমাকে বিক্রি করেছ, এ তারই মেয়ে। শুধু তাই নয়, তার বাবা যে তাদের পূর্ববঙ্গের সম্পত্তির বিনিময়ে কোলকাতায় বাড়ি কিনেছিলেন এ কথাও সে জানে। তবে বাড়ির ঠিকানা তার জানা নেই। নবেন্দুবাবু মাস ছ'য়েক আগে জানিয়েছিলেন যে বাড়িগুলোর সব ব্যবস্থা করে তারপর ওকে নিয়ে আসবেন। তারপর থেকে কিন্তু আর কোনও চিঠি পায়নি সে। সামনে পরীক্ষা ছিল বলে আসতেও পারেনি। এখন পরীক্ষা হয়ে গেছে তাই বাপের খোঁজে বেরিয়েছে।"

"মেয়েটির মা বেঁচে আছেন?"

"না। তিনি মারা গেছেন সম্প্রতি। সেইজন্যে মেয়েটিকে আরও চলে আসতে হয়েছে। কারণ মায়ের দিকে যে দু'একজন আত্মীয় ছিল, তারা লাহোর রায়টে মারা গেছে। এরা দু'জনে, মানে, মা আর মেয়ে, দিল্লীতে পালিয়ে আসতে পেরেছিল। মা-টিও মারা গেছে সম্প্রতি। সুতরাং মেয়ে এখন অসহায় হয়ে পড়েছে। হ্যালো—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনছি, তুমি বলে যাও না। মেয়েটি এখন কোথায়?"

"তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আমার বাড়িতে এনে রেখেছি"—

"এখনও সেইখানেই আছে?"

"হ্যাঁ। আমি বিজনেসের ছুতোয় এখানে চলে এসেছি কিন্তু আসলে আমি এসেছি ওর সম্বন্ধেই খোঁজ-খবর নিতে। তার কাছ থেকেই কয়েকটা ঠিকানা পেয়েছিলাম। তুমি যে নবেন্দু বিশ্বাসের বাড়ি আমাকে বেচেছ, বিশাখা যে তারই মেয়ে, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।"

"বিশাখা কি তোমার বাড়িতে একাই আছে?"

"হ্যাঁ। আমার দোতলার ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিয়েছি তাকে। দাই, চাকর আছে। সম্প্রতি আমি একটি প্রাইভেট সেক্রেটারী বাহাল করেছি, সে-ও দেখাশোনা করছে মেয়েটির। না, বাড়িতে মেয়েছেলে কেউ নেই। আমি তো বিয়ে করিনি আর। এখন কি করা যায় বল তো—"

"করবে আবার কি? যা কিনেছ তা ভোগ কর—"

"বাড়ি যদি নবেন্দু বিশ্বাসের হয় আর তার যদি এখন ওয়ারিশ বেরোয়—"

"বেরুলেই বা। নবেন্দু বেঁচে থাকলে বাড়ি তার হত, কিন্তু সে যখন মারা গেছে তখন বাড়ি আমার। কারণ তার সঙ্গে আমার মৌখিক কথা হয়েছিল শুধু। দলিল করে, তাকে আমি বাড়ি লিখে দিইনি। সে বেঁচে থাকলে দিতাম হয়তো, কিন্তু সে যখন বেঁচে নেই তখন ও-বাড়ি আইনত আমার থেকে গেছে। তুমি স্বচ্ছন্দে নিতে পার।"

"কিন্তু তুমি পাকিস্তানে নবেন্দুর বিষয়-সম্পত্তিগুলি ভোগ করছ কোন্ অধিকারে তা হলে—"

"নবেন্দু আমাকে সেগুলো লিখে দিয়ে গিয়েছিল যে। তার দলিল আমার কাছে আছে। আমিও তাকে লিখে দিতুম, কিন্তু সেকেন্ড রায়টের সময় সে মারা গেল বলে হয়ে উঠল না!"

"আমাকেও তো তুমি দলিল করে দাওনি কিছু।"

"তোমাকে দেব। বীরেনবাবুর কাছে দলিল-পত্র সব ড্রাফট করাই আছে, যেদিন বলবে সেইদিনই রেজেস্ট্রী করে দেব।"

"বীরেন মল্লিক?"

"হ্যাঁ হে, আমার উকিল।"

"তা হলে তুমি বলছ যে বিশাখা তার পূর্ববঙ্গের বিষয়-সম্পত্তিও পাবে না, কোলকাতার বাড়িও পাবে না?"

"সে যদি পূর্ববঙ্গে এসে বাস করতে চায় এখুনি তাকে আমি সব ছেড়ে দিতে রাজি আছি। তা সে চাইবে কি।"

"ধর সে যদি বিক্রি করে—"

"এখনি বিক্রি করলে সে যে দাম পাবে তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। সে দাম দিতে আমার আপত্তিও নেই। এখন এখানে হিন্দুদের সম্পত্তি জলের দামে বিক্রি হচ্ছে। ও সম্পত্তির এখন দু'হাজার টাকাও দাম হবে কিনা সন্দেহ। দু'হাজার টাকা নিতে সে যদি রাজি থাকে আমাকে খবর দিও, টাকা পাঠিয়ে দেব।"

"ন্যায়ত ধর্মত এটা কি ঠিক হবে?"

"দেখ ভাই, ন্যায় আর ধর্মে আমার আর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। আমার স্ত্রীকে হত্যা করে ওরা যখন আমাকে মুসলমান করে তখন ন্যায় বা ধর্ম আমার কোনও কাজেই লাগেনি। আমার শক্তিশালী প্রতিবেশী জমিদার ওদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমাকে ফেলে পালিয়েছিলেন, আমার কথা ভাবেননি। আমার স্ত্রী ধর্মরক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিলেন, আমার মুখের দিকে তাকালেন না অথচ হিন্দুধর্মে স্ত্রী নাকি সহধর্মিণী। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আমি মুসলমান হতে চাইলাম, তিনি চাইলেন না। তাঁর অহঙ্কারে ঘা লাগল। অহঙ্কারই সকলকে চালায়, ন্যায় বা ধর্ম নয়। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। আমি বিষ্ণুচরণরূপে তোমাদের সমাজে যে সুখ পাইনি, জমিরুদ্দিনরূপে তা পেয়েছি। সুতরাং আমি জমিরুদ্দিনই থাকব।"

"তুমি করাচি থেকে ফিরবে কবে?"

"মাসখানেক পরে।"

"তুমি ফিরে তা হলে আমাকে দলিল-পত্র করে দেবে বলছ?"

"হ্যাঁ, তাই দেব। সব ঠিক করাই আছে—"

"তোমার সেই মাসাজ বারের কি হল?"

"বাড়ি ঠিক করে এসেছি। ফার্নিচার অর্ডার দিয়েছি। এইবার গিয়ে সেটারও ব্যবস্থা করব—"

"খুব লাভজনক ব্যবসা না কি। আমার কোন ধারণাই নেই। তুমি বলেছিলে বটে—"

"যদি চলে খুব লাভজনক। মেয়েরা গা, হাত, পা টিপে স্নান করিয়ে দেবে, বুঝছ না? খদ্দেরের অভাব হবে না। তবে 'শো' চাই। ভাল বাড়ি, ভাল ফার্নিচার, সুন্দরী মেয়ে, আভিজাত্যের ভড়ং—এ সব দরকার। আমি গিয়ে ব্যবস্থা করব সব। তুমিও এস, আবার পার্টনারশিপে নতুন ব্যবসা শুরু করা যাক—"

"দেখি। অনেক রকম ব্যবসা ফেঁদেছি কিনা, তা ছাড়া এ সম্বন্ধে জ্ঞানও নেই তেমন—"

"জ্ঞান হতে দেরি লাগবে না। আচ্ছা সে ফিরে গিয়ে হবে এখন।"

"আচ্ছা—"

।। পাঁচ ।।

"কে—"

"আমি, আমি বরেন।"

"ও বরেনবাবু, কি বলছেন?"

"বলছি, মানে তেমন বিশেষ কিছু না। এই একটু আগে বেরিয়েছিলাম। একটা জিনিস চোখে পড়ল, মনে হল ভুল করেছি, মানে ঠকেছি। তবে আপনি যদি ইচ্ছে করেন সেটা সংশোধনও করা যেতে পারে।"

"ঠিক বুঝতে পারছি না কোথায় বেরিয়েছিলেন—"

"কোথাও না, রাস্তায় বেরিয়েছিলাম একটু।"

"রাস্তায়? কি এমন দেখলেন?"

"গ্লাসকেসে চমৎকার একটা শাড়ি অথচ দাম মাত্র ছাব্বিশ টাকা। ওই দামেই আজ সকালে যে শাড়ি আপনার জন্য এনেছি এটা তার চেয়ে অনেক ভাল। আপনি যদি বলেন বদলে আনতে পারি।"

"তা কি আর এখন সম্ভব?"

"সম্ভব অসম্ভবের কথা ছেড়ে দিন। আপনি যদি বলেন অসম্ভবকেও সম্ভব করব। যে দোকান থেকে এনেছি তাকে বলেই এসেছিলাম যে পছন্দ না হলে ফেরত দেব।"

"না, থাক!"

"থাক কেন। যে শাড়িগুলো এনে দিয়েছি তার সবগুলোই কি আপনার পছন্দ হয়েছে?"

"একটাও হয়নি।"

"একটাও হয়নি! বলেন কি! তা হলে সবগুলোই নীচে পাঠিয়ে দিন, বদলে আনছি।"

"না, থাক, আবার কেন মিছে কষ্ট করবেন।"

"কিছু কষ্ট হবে না আমার। দিন, পাঠিয়ে দিন।"

"না, থাক।"

"আপত্তি করছেন কেন?"

"অনর্থক বলে। আমার পছন্দ না হলেও শাড়িগুলো ভালই। পরতে অসুবিধা হবে না।"

"তবু আপনার যখন পছন্দ হয়নি—"

"বদলে যা আনবেন তা-ও আমার পছন্দ না হতে পারে। আমার পছন্দ অপছন্দ আপনি ঠিক করবেন কি করে?"

"আপনি যেমন বলে দেবেন তেমনি আনবো। কি রকম রং চাই, কি রকম পাড় চাই, বলুন, এক্ষুনি নিয়ে আসছি।"

"তা-ও কি বলা যায় সব সময়ে চট্ করে। অনেক সময় এমনও হয় যে দোকানে যেটা পছন্দ করে কিনে আনলাম বাড়িতে এসে সেটা পছন্দ হচ্ছে না। দরকার কি হাঙ্গামা করবার। যা এনেছেন থাক। আমার স্যুটকেসটার কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না?"

"না।"

"অত বড় স্যুটকেসটা হারিয়ে গেল না কি। কাপড়-চোপড় আর ওতে আমার অনেক দরকারী চিঠিপত্তর আছে, ঠিকানা আছে। নকুলবাবুর হোটেলে কি আপনি গিয়েছিলেন?"

"গিয়েছিলাম। তিনি বললেন বিধুবাবু পরে এসে আপনার যা কিছু ছিল সব নিয়ে গেছেন ট্যাক্সি করে। হোটেলে আপনার কোনও জিনিস নেই। আপনার পাওনাও বিধুবাবু মিটিয়ে দিয়ে গেছেন।"

"স্যুটকেসটা রাখলেন কোথা তা হলে। রাখলে এই বাড়িতেই তো রাখবেন কোথাও।"

"এখানে কোথাও নেই আমি খুঁজে দেখেছি ভাল করে। তা ছাড়া আমাকে যখন ফোন করে জানিয়েছেন যে আপনার যা যা দরকার—এমন কি শাড়ি, জামাও আমি যেন কিনে দিই, তখন নিশ্চয়ই স্যুটকেসটার গোলমাল করে ফেলেছেন কোথাও।"

"আপনাকে তিনি জামশেদপুর থেকে ফোন করেছিলেন না কি?"

"হ্যাঁ।"

"কবে ফিরবেন সেখান থেকে?"

"তাতো ঠিক বলতে পারি না।"

"তাঁরা ঠিকানাটা জানেন?"

"আজ্ঞে না।"

"ফোন নম্বর?"

"তাও জানি না।"

"মহা মুশকিল হল তো দেখছি! স্যুটকেসটা—"

"কিসের মুশকিল। বলুন, আমার দ্বারা যদি কিছু হয়—"

"কিন্তু আপনি তো তাঁর ঠিকানা, ফোন নম্বর কিছুই জানেন না। আপনি কতদিন আছেন বিধুবাবুর কাছে?"

"এই সবে বাহাল হয়েছি। দিন তিনেক হল।"

"মাত্র?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তা হলে আপনি হয়তো জানেন না—"

"ব্যাপারটা কি?"

"নবেন্দু বিশ্বাস বলে কাউকে চেনেন কি আপনি?"

"নবেন্দু বিশ্বাস? না, নামই শুনিনি কখনও। তাঁর সঙ্গে কি দরকার?"

"বিশেষ দরকার। তাঁর খোঁজেই আমি এসেছি দিল্লী থেকে।"

"ও, কেউ হন বুঝি আপনার।"

"আমার বাবা—"

"ও। তিনি এখানে ছিলেন, আপনি দিল্লীতে ছিলেন, আপনি এখানে তাঁর খোঁজে এসেছেন, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি তাঁর ঠিকানা জানেন না?"

"না। পাঞ্জাবে আমার জন্ম, সেখানেই আমি মানুষ হয়েছি। এদেশের কোনও খবরই আমি রাখি না। বাবা গত রায়টের সময় কোলকাতায় এসেছিলেন, তারপর থেকে তাঁর আর কোন খবর পাইনি। তিনি এসে কোথায় ছিলেন তাও জানি না। মায়ের মৃত্যুসংবাদ তাঁকে আমরা জানাতে চেষ্টা করেছিলাম খবরের কাগজের মারফত। চার সপ্তাহ ধ'রে খবরটা ছাপা হল কিন্তু বাবার কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। তাই চিন্তিত হয়ে আমি তাঁর খোঁজে এসেছি।"

"তিনি কোলকাতায় এসেছিলেন কেন?"

"আমাদের পূর্ববঙ্গে কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল, তারই ব্যবস্থা করবার জন্য তিনি এসেছিলেন। দু'চার দিনের মধ্যেই ফিরে যাবার কথা তাঁর, কিন্তু তিনি ফেরেননি।"

"ও, বুঝেছি। আপনি ওই হোটেলে গেলেন কি করে?"

"ওই হোটেলেই এসে উঠেছিলাম যে। এখানকার পথঘাট তো আমার জানা নেই মোটে, তাই ট্যাক্সিওয়ালাকেই বলেছিলাম একটা ভাল হোটেলে নিয়ে যেতে। সে আমাকে নকুলেশ্বর বাবুর হোটেলে এনে তুললে। নকুলেশ্বরবাবু লোক খারাপ নন। তিনিই আমাকে বিধুবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন একদিন রাস্তায়। বিধুবাবু আশ্বাস দিলেন যে বাবার খোঁজ করে দেবেন তিনি, কিন্তু খুঁজে বার করতে দেরি হবে। বললেন, আমি যদি তাঁর বাসায় গিয়ে থাকি তা হলে খোঁজার সুবিধে হবে। এসে থাকবার জন্যে নিমন্ত্রণই করলেন। বললেন, মিছিমিছি হোটেল খরচ করে থাকবার দরকার নেই, তাঁর বাড়ির ওপরের ফ্ল্যাটটা খালিই রয়েছে, সেখানে আমি যতদিন খুশি থাকতে পারি।"

"ঠিকই করেছেন। বিধুবাবু সত্যিই খুব মহৎ লোক। আমাকে উনি বাঁচিয়েছেন।"

"এ রকম অভাবনীয় যোগাযোগ আমি প্রত্যাশাই করিনি। বিধুবাবু রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সি ডেকে আমাকে তুলে আনলেন এখানে। তারপরই বেরিয়ে গেলেন। বলে গেলেন আমার স্যুটকেস আর বিছানা তিনি নিয়ে আসবেন ফেরবার সময়। কিন্তু তারপর থেকে তিনি আর ফেরেননি। আমাকে শুধু একটা ফোন করেছিলেন যে জরুরী ট্রাঙ্ক 'কল' পেয়ে তাঁকে অবিলম্বে বাইরে যেতে হচ্ছে। আমার সঙ্গে দেখা করে যাবার সময় পেলেন না। আমি যেন কিছু মনে না করি বা কিছু চিন্তা না করি! তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি বরেনবাবু আমার সব ব্যবস্থা করে দেবেন, আমার যা যা দরকার আমি যেন অসঙ্কোচে তাঁকে জানিয়ে দিই। ওপরের ঘরে ফোন আছে, বরেনবাবু নীচের যে অফিসঘরটায় বসেন সেখানেও ফোন আছে, ফোনে জানিয়ে দিলেই বরেনবাবু সব ব্যবস্থা করে দেবেন—"

"আপনি কিন্তু সঙ্কোচ করছেন।"

"সঙ্কোচ আবার কোথায় করলাম।"

"দিন তা হলে শাড়িগুলো বদল করে আনি। কি রকম আপনার পছন্দ তার একটু আভাসও দিন।"

"শাড়ি নিয়ে আমি একটুও মাথা ঘামাচ্ছি না। বাবার খবর না পাওয়া পর্যন্ত কিছু ভাল লাগছে না আমার।"

"তাতো না লাগবারই কথা! আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে তিনি পূর্ববঙ্গেই চলে গেছেন।"

"হতে পারে বই কি। একটা কথা তিনি বলেছিলেন যে পূর্ববঙ্গের কোনও এক মুসলমানের নাকি কোলকাতায় বাড়ি আছে, সেই বাড়ি নিয়ে আমাদের পূর্ববঙ্গের সম্পত্তি তাঁকে দিয়ে দেবেন, কারণ পূর্ববঙ্গে এখন হিন্দুদের সম্পত্তি থাকাও যা, না থাকাও তাই।"

"তা ঠিক। হয়তো সেইজন্যেই পূর্ববঙ্গে চলে গেছেন। আপনাদের সম্পত্তি কোথায় ছিল?"

"ঢাকায়।"

"হয়তো সেখানেই আছেন তিনি।"

"কিন্তু তিন চারখানা ইংরাজি বাংলা কাগজে আমরা বিজ্ঞাপন দিলাম যে মা মারা গেছেন, একটাও কি তাঁর চোখে পড়বে না?"

"পড়া তো উচিত ছিল। যাই হোক ভাববেন না, খবর একটা পাওয়া যাবেই।"

"আমার কেমন যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে—"

"কি অস্বস্তি বলুন, আমার দ্বারা যদি কিছু হয়।"

"আপনি আর কি করবেন, আপনি তো যথাসাধ্য করছেনই, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এ রকম অনিশ্চয়তার মধ্যে কতদিন থাকব—!"

"আপনি যা বললেন তাতে খানিকটা অনিশ্চয়তা তো থাকবেই। তবে আপনি চিন্তিত হবেন না, বিধুবাবু ফিরে এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনি যখন ভার নিয়েছেন তখন ফিরে এসে নিশ্চয়ই কিছু একটা করবেন।"

"আচ্ছা বিধুবাবু করেন কি?"

"বিজনেস করেন শুনেছি।"

"কিসের বিজনেস?"

"তা ঠিক জানি না।"

"সে কি! আপনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি, আপনি জানেন না তিনি কি করেন? আশ্চর্য তো।"

"এখনও আমার জানবার সুযোগ হয়নি। যেদিন আপনি এসেছেন ঠিক তার আগের দিনে বহাল হয়েছি আমি। তারপর তো বিধুবাবু চলেই গেলেন।"

"আপনাকে বাহাল করলেন অথচ কি করতে হবে বলে গেলেন না?"

"আপনাকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে বলে গেছেন।"

"এ ছাড়া আর কোনও কাজ নেই আপনার?"

"আপাতত নেই।"

"এ বাড়িতে আপনি ছাড়া আর কে আছে?"

"আর আছে পুরোনো চাকর মধু। একটা ঠিকে ঝি-ও আছে।"

"তাদের তো দেখেছি। এত বড় বাড়িতে আর কেউ নেই?"

"বিধুবাবুর পরিবার কোথা?"

"আমি কিছুই জানি না। কোলকাতায় আমি আপনারই মতো আগন্তুক।"

"বাড়ি কোথা আপনার?"

"বিহারে। পূর্ণিয়া জেলায়।"

"এখানে চাকরি পেলেন কি করে। বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেছিলেন বুঝি? নিতান্ত ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞেস করছি, মাপ করবেন।"

"না, না, তাতে কি। আমার মতো তুচ্ছ লোকের সম্বন্ধে যে আপনার কৌতূহল জেগেছে তাতে আমি গর্বই অনুভব করছি। বিধুবাবু আমাকে পুলিশের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন।"

"পুলিশের হাত থেকে! পুলিশের হাতে পড়েছিলেন কি করে?"

"পুলিশ আমাকে ডাকাত বলে সন্দেহ করেছিল।"

"সে কি! আপনার চেহারা দেখে তো ডাকাত বলে সন্দেহ হয় না মোটেই।"

"পুলিশ চেহারা দেখে সন্দেহ করে না। খবর বা প্রমাণের উপর নির্ভর করে তারা।"

"হয়েছিল কি?"

"এক জায়গায় ডাকাতি হয়েছিল। পুলিশের সন্দেহ হল সেটা পলিটিক্যাল ডাকাতি। সেই বাড়িতে তারা আমার নাম ঠিকানা লেখা একটা চিঠি নাকি পেয়েছিল। তাদের ধারণা হয় যে ডাকাতদের পকেট থেকেই পড়ে গেছে চিঠিখানা, কারণ যে বাড়িতে ডাকাতি হয়েছিল সে বাড়ির লোকেরা আমার নামও কখন শোনেনি। সুতরাং পুলিশদের সন্দেহ হল যে ডাকাতরাই ফেলে গেছে চিঠিখানা।"

"বিধুবাবু কি করে উদ্ধার করলেন আপনাকে?"

"যে পুলিশ অফিসারটি আমাকে ধরেছিলেন তাঁর নাম ভূপেশবাবু। সেই ভূপেশবাবু বিধুবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু—"

"ও। বিধুবাবু আপনাকে চিনতেন বুঝি আগে?"

"না। ভূপেশবাবু আমাকে বিধুবাবুর গ্যারেজ থেকে গ্রেপ্তার করেন। সেইখানেই আমি লুকিয়েছিলাম।"

"লুকিয়েছিলেন? কেন?"

"ভয়ে। পুলিশ আমার পিছু নিয়েছিল।"

"আপনি সত্যি তা হলে জড়িত ছিলেন ডাকাতদের সঙ্গে?"

"পরিচয় ছিল।"

"তারপর?"

"ভূপেশবাবুর কাছ থেকে বিধুবাবু আমার পরিচয় পেলেন। পেয়ে বললেন, 'দেখ ভূপেশ, একটা এম. এ. পাশ ছেলে যদি ডাকাতি করেই থাকে তা হলে বাধ্য হয়েই করেছে বুঝতে হবে। তোমরা যদি ওকে জেলে পুরে দাও তা হলে ও পাকা ডাকাত হয়ে যাবে। জেলের অভিজ্ঞতা তো আমার আছে। আর তুমি যদি ওকে ছেড়ে দাও আমি ওকে কাজে লাগাতে পারি। আমি একটি প্রাইভেট সেক্রেটারি রাখব ঠিক করেছি, একেই রাখতে পারি যদি তুমি ছেড়ে দাও বেচারিকে। ভূপেশবাবু কি ভেবে আমাকে ছেড়ে দিলে। তারপর থেকে এখানেই আছি।"

"ও। বিধুবাবু লোকটি কেমন বলুন তো?"

"কেমন দেখতে জিজ্ঞেস করছেন? আপনি তো দেখেইছেন। মোটা, কালো, বেঁটে, ঠোঁটে ধবল আছে।"

"সে কথা জিজ্ঞেস করিনি। লোক কেমন?"

"এখনও তো পরিচয় হয়নি ভাল করে। কি করে বলব বলুন। তবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে পুলিশের কবল থেকে উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে যখন আশ্রয় দিয়েছেন তখন লোক খুব খারাপ বলে মনে হয় না। তবে আর একটা কথাও মনে হচ্ছে—"

"কি—"

"দেখবেন বিধুবাবু ফিরে এলে কথাটা আবার যেন তাঁর কানে তুলে দেবেন না। তা হলে কিন্তু বিপদে পড়ে যাব—"

"না না, পাগল নাকি! আপনি আমাকে স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করতে পারেন।"

"দেখবেন—"

"না না, বলুন না, যা আপনার মনে হচ্ছে। লোকটির স্বরূপ আমারও তো জানা দরকার।"

"তেমন ভয়ঙ্কর কিছু মনে হয়নি আমার। কেবল মনে হয়েছিল যে খুব নিঃস্বার্থভাবে তিনি যে আমার উপকার করেছিলেন তা নয়। স্বার্থ ছিল।"

"কি স্বার্থ?"

"সস্তায় কিস্তিমাৎ যাকে বলে! পেটভাতায় একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি পাওয়া খুব সোজা নয় এ বাজারে। একজন এম. এ. পাশ ছোকরা মাসে শ'দুই টাকার কম মাইনেতে থাকতে রাজি হত কি?"

"আপনাকে উনি পেটভাতায় রেখেছেন? বলেন কি!"

"খাওয়া, পরা এবং থাকা, আপাততঃ এর বেশ কিছু দেবেন না বলেছেন।"

"আপনি রাজি হলেন কেন?"

"পুলিশের ভয়ে।"

"কিছু মাইনে দেবেন নিশ্চয়ই।"

"আশা করি দেবেন।"

"আমার কিন্তু একা একা এমনভাবে বসে থাকতে কেমন যেন লাগছে। অথচ কি যে করি।"

"সিনেমায় যাবেন? লাইটহাউসে খুব ভাল একটা বই হচ্ছে।"

"এখন আর যাবার সময় আছে কি? সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে।"

"ট্যাক্সি করে যেতে আর কত সময় লাগবে?"

"আমার কাছে কিন্তু টাকা নেই।"

"টাকার জন্য ভাবছেন কেন।"

"বেশ, চলুন তবে।"

॥ ছয় ॥

"হ্যালো—কে বীরেনবাবু, আমি জমিরুদ্দিন। করাচি থেকে কথা বলছি।

"কেন, কি ব্যাপার?"

"আমার সেই বাড়ি তিনখানার দলিল তৈরি হয়ে গেছে কি?"

"একটু বাকি আছে। আমার টাইপিস্ট অসুখে পড়েছে। সে এলেই হয়ে যাবে। ড্রাফট্‌টা তো করাই আছে। আপনি ফিরছেন কবে?"

"দু'এক দিনের মধ্যে ফিরব। স্ট্যাম্প-কাগজ কিনে ফেলেছেন কি?"

"না এখনও কিনিনি। সে আর কিনতে কতক্ষণ লাগবে?"

"এখন কিনবেন না। বিধুকে বাড়ি বেচব কিনা এখনও ঠিক করিনি। গিয়ে যা হয় করব—হ্যালো—হ্যালো—"

"কি বলুন।"

"বিধু যদি আসে তার কাছে কিছু ভাঙবেন না এখন।"

"কিন্তু এলে কিছু একটা বলতে হবে তো। কি বলব বলুন।"

"বলবেন—মানে, যা হয় একটা গোল কথা বলে দেবেন।"

"তা হলে বলব যে আপনি না ফেরা পর্যন্ত কিছুই হবে না। কি বলেন—।"

"বেশ।"

"যদি জিজ্ঞেস করেন যে আপনি কবে আন্দাজ ফিরবেন।"

"আন্দাজ দেবেন একটা। কেবল আসল কথাটা ফাঁস করবেন না এখন। হ্যালো—"

"বুঝেছি। অন্য কোথাও বেশি অফার পাচ্ছেন না কি?"

"অফার ঠিক পাইনি। অন্য একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে। দেখা হলে সব বলব।"

"আপনি প্লেনেই আসছেন তো?"

"তা-ও এখনও ঠিক করিনি। সুযোগ পেলে প্লেনেই যাব। সব সময় সীট পাওয়া যায় না, দেখি যত শীগগির পারি গিয়ে পৌঁছাচ্ছি।"

"আচ্ছা—"

।। সাত ।।

"হ্যালো, কে, ও আপনি, মণিকা দেবী? ভাগ্যিস বাড়িতে আছেন।"

"বরেনবাবু না কি। আপনার খোঁজেই তো রোজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই আমরা। কোথা থেকে কথা বলছেন আপনি?"

"লাইটহাউস থেকে। ফোনে আরও কয়েকবার আপনাদের ধরবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। আপনাদের ঠিকানাতে ইচ্ছা করেই যাইনি, কারণ গেলে আপনারাও পুলিশের খপ্পরে পড়ে যেতেন! আমি ছাড়া পেয়েছি বটে, কিন্তু মনে হচ্ছে একটা লোক, সম্ভবতঃ পুলিশের লোকই, আমার গতিবিধি লক্ষ্য করছে সর্বদা। খুব সম্ভবতঃ এখানেও সে এসেছে আমার সঙ্গে।"

"আমি কি যাব লাইটহাউসে?"

"এলে দেখা হয়। গোপীনাথ কোথায়?"

"আপনাকে খুঁজছে। তবে এক্ষুনি আসবে সে। পাঞ্জাব থেকে তার এক বন্ধুর আসবার কথা আছে।"

"ভার্গব সিং নয় তো?"

"হ্যাঁ। সরদার ভার্গব সিং নামই তো বলেছিল গোপীনাথ, আপনি চেনেন?"

"বন্ধুত্ব ছিল এককালে। গোপীনাথ আর ভার্গব যদি এসে পড়ে তা হলে ওদের সঙ্গে নিয়ে আসবেন। আর আমার সাদা কোটটাও আনবেন।"

"আপনার সাদা কোট? ও, হ্যাঁ, বুঝেছি। আচ্ছা আনব।"

"খোকা সঙ্গে আছে নাকি।"

"আছে।"

"সেটাকেও আনবেন!"

"খোকাকে নিয়ে যেতে বলছেন কেন?"

"সঙ্গে থাকা তো ভাল। নিশ্চিন্ত থাকা যায়। আমরা? আমরা বক্সে আছি। ঢুকেই দেখতে পাবেন। আমাদের বক্সে কেউ নেই।"

"বহুবচন ব্যবহার করছেন কেন? আর কেউ আছেন না কি?"

"হ্যাঁ। একজন মহিলা আছেন।"

"মহিলা?"

"হ্যাঁ, মহিলা। যেখানে চাকরি করছি তাঁদের বাড়ির লোক। ওঁকে সিনেমা দেখাবার জন্যেই এখানে আসতে হয়েছে আমাকে। হ্যাঁ, অনুচররূপে বই কি। নিশ্চয়। আসছেন তা হলে?"

"আসছি। যিনি আপনার পিছু নিয়েছেন, তাঁর চেহারা কি রকম একটু আন্দাজ দিন না।"

"লম্বা, রোগা। চমৎকার গোঁফ, এত চমৎকার যে নকল বলে সন্দেহ হয়। পরনে সাদা ধুতি, পাঞ্জাবি, অন্ততঃ বিকেল পর্যন্ত তাই ছিল। হাতে একটি মলক্কা কেন্ রুপো দিয়ে বাঁধানো।"

"পায়ে নিশ্চয় পাম-শু!"

"বিকেলে কাবুলী চপ্পল ছিল।"

"মোটামুটি ধারণা হল। গোপীনাথ এলেই বেরিয়ে পড়ব। সময়মতো যদি না গিয়ে পড়ি, অপেক্ষা করতে পারবেন?"

"অপেক্ষা করার অসুবিধা আছে। মহিলা রয়েছেন যে সঙ্গে—"

"ও বুঝেছি। তা হলে যত শীগগির সম্ভব যাচ্ছি। গোপীনাথ যদি এসে পড়ে সঙ্গে থাকবে আর যদি না আসে আমি একাই যাব।"

"বেশ। আপনাদের নাগাল পাবার জন্যে আমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, দেখুন কেমন অদ্ভুত যোগাযোগ হয়ে গেল। যাই বলুন আপনারা, ভগবান আছেন এবং তিনি দয়াময়।"

"দেখুন ভগবান নিয়ে রসিকতা করবেন না।"

"রসিকতা করতেও আপত্তি আপনার!"

"কোন কিছু নিয়ে রসিকতা করা মানেই তার অস্তিত্বে কিছু-না-কিছু বিশ্বাস করা। ও ধরনের বিশ্বাস যদি একবার মনে শিকড় গাড়ে সব ভেস্তে যাবে!"

"তথাস্তু। আসুন তা হলে।"

"আপনি চাকরি করছেন বললেন?"

"হ্যাঁ।"

"কি চাকরি?"

"তা ঠিক জানি না।"

"তার মানে?"

"অর্থাৎ আমাকে ঠিক কি কি করতে হবে তা এখনও জানি না।"

"আপনার মনিব কে?"

"বিধুবাবু বলে একজন ভদ্রলোক।"

"আপনাকে কি করতে হবে তা তিনি বলে দেননি, হেঁয়ালির মতো শোনাচ্ছে।"

"তা শোনাচ্ছে। তিনি আমাকে বাহাল করেই কোলকাতার বাইরে চলে গেছেন। ফিরে এলে বুঝতে পারব।"

"আপাততঃ কি করছেন আপনি?"

"একটি মহিলার তত্ত্বাবধান করছি।"

"মহিলাটি কে?"

"ঠিক জানি না। বিধুবাবু তাঁকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন এইটুকু শুধু জানি। আর— হ্যালো। কেটে দিলেন নাকি। ও হ্যাঁ, গোপীনাথ এল না কি। ভার্গবও এসেছে? আসুন তাদের নিয়ে। আমি ভিতরে চললুম। আচ্ছা—

॥ আট ॥

"হ্যালো। কে ভূপেশবাবু, আদাব সার, আমি মজিদ।"

"কি বলছ?"

"আপনি যে সেই বরেন বলে ছোকরাকে সেদিন নির্দোষ বলে ছেড়ে দিলেন এখন প্রমাণ পেয়েছি সে মোটেই নির্দোষ নয়। প্লেন-ড্রেসে আমাদের যে লোকটি তাকে ওয়াচ করছিল সে যে-সব রিপোর্ট দিয়েছে তার থেকে মনে হচ্ছে ওকে ছেড়ে রাখা ঠিক হবে না।"

"কি রকম? কি রিপোর্ট দিয়েছে?"

"বিধুবাবু তো কোলকাতার বাইরে গেছেন। বরেন প্রায় অধিকাংশ সময়েই রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছে। তার চালচলন দেখলে মনে হয় যেন সে রাস্তার ভিড়ের মধ্যে কাউকে খুঁজছে। দোকানে ঢুকে ঢুকে ফোনও করছে তিন চার বার।"

"ফোন নম্বরটা পেয়েছে!"

"পেয়েছে। গ্র্যান্ড হোটেলের ফোন।"

"ফোনে কোনও নামটাম করেছিল?"

"করেছিল নিশ্চয়। সেটা কিন্তু জানতে পারিনি আমরা। গ্র্যান্ড হোটেলের ফোনেও একজন লোক পাঠান হয়েছে এবার।"

"সে কোনও রিপোর্ট করেনি?"

"না, এখনও পর্যন্ত তো করেনি। সাহেব খুব চটেছেন সার।"

"তাই না কি?"

"মনে হচ্ছে। শালাটাকে এখানে আনবার একটা 'মওকা'ও পেয়ে গেলেন।"

"কি করা যায় বল তো?"

"কাগজপত্র ঠিক করে রাখুন। আপনার সেই বন্ধুর কাছে গিয়ে লিখিয়ে নিন একটা।"

"সে তো এখানে নেই, দিল্লী গেছে।"

"আপনিও যান না, আপনি প্রস্টেট দেখাবার জন্যে দু-সপ্তাহের ছুটি চেয়েছিলেন না? আজ আপিসে দেখলাম ছুটি মঞ্জুর হয়েছে আপনার। ইচ্ছে করলে আপনি আজই দিল্লী রওনা হতে পারেন। বিধুবাবুর কাছ থেকে লিখিয়ে নেওয়া দরকার যে তিনি ওই ছোকরার জন্য জামিন আছেন।"

"তা বিধুবাবু লিখে দেবে।"

"সেটা লিখিয়ে নিন অবিলম্বে। কারণ দত্তগুপ্তের ভাবভঙ্গি ভাল নয়। তিনি, আচ্ছা সেটা গিয়েই বলব আপনাকে। যাচ্ছি আমি। আজই আপনাকে ক্যালকাটা লিভ করতে হবে।"

"আসুন।"

॥ নয় ॥

"হ্যালো, অ্যম্বুলেন্স, হ্যালো অ্যাম্বুলেন্স—"

"কি—"

"শীগগির লাইটহাউসের সামনে চলে আসুন। খুন হয়ে গেছে একটা—"

"খুন?"

"হ্যাঁ। রিভলভারের গুলিতে ঘায়েল হয়েছে একজন।"

"এক্ষুনি যাচ্ছি।"

"আপনার নামটা জানতে পারি কি?"

"সনৎ সেন। না, আমি ডাক্তার নই।"

"সিনেমা দেখতে এসেছিলাম। সবাই লোকটাকে ঘিরে ভিড় করছে, আমার মনে হল আপনাদের খবরটা দিই।"

"ঠিক করেছেন, এক্ষুনি যাচ্ছি।"

॥ দশ ॥

"হ্যালো, লালবাজার?"

"কি বলুন।"

"লাইটহাউসের সামনে একটা খুন হয়ে গেছে খবর পেয়েছেন?"

"পেয়েছি। আপনি কি চান?"

"খুনিকে আপনারা ধরতে পেরেছেন কিনা জানি না, কিন্তু খুন হবার ঠিক পরেই আমি দু'জন গুণ্ডাগোছের লোককে ট্যাক্সি চড়ে বালীগঞ্জের দিকে যেতে দেখলাম। একজনের হাতে রিভলভার ছিল।"

"কি রকম দেখতে বলুন তো লোকগুলো?"

"ঝাঁকড়া চুল, জুলফি, গগলস পরা। পরনে হাফপ্যান্ট, হাফশার্ট—"

"ও! আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন?"

"লাইটহাউস থেকে। আমি সিনেমা দেখতে এসেছিলাম। আমার নাম জানতে চাইছেন? সনৎ সেন। তা কাল না হয় যাব আপনাদের কাছে। এখন আর দাঁড়াতে পারব না, কাজ আছে একটু। দুটো গুণ্ডাগোছের লোককে ট্যাক্সি চড়ে পালাতে দেখলাম, তাই ভাবলাম আপনাদের খবর দিয়ে দিই একটা। আমার ঠিকানা ২৫এ মেছুয়াবাজার, হ্যাঁ, সকালেই যেতে চেষ্টা করব। নমস্কার—

"নমস্কার।'

পরিচয় পর্ব

।। এক ।।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভূপেশ মজুমদারকে অবশেষে কলিকাতা ত্যাগই করিতে হইল। লাইটহাউসের সামনে দুর্ঘটনাটা ঘটিবার পূর্বেই তিনি ট্রেনে চড়িয়া বসিলেন। সিগারেটটি ধরাইবার পরই চিন্তাধারা অব্যাহত প্রবাহে শুরু করিল।

বাল্যবন্ধু বিধুভূষণের অনুরোধে এই ডাকাত ছোঁড়াটাকে ছাড়িয়া দিয়া যে ভুল তিনি করিয়াছিলেন তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সত্যই বেশ একটি সমস্যা ব্যূহ সৃষ্টি হইয়াছে। ভূপেশ ইহাও অনুভব করিলেন যে মজিদের পরামর্শটি যুক্তিযুক্ত, কারণ উক্ত ব্যূহ ভেদ করিতে হইলে দিল্লী যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। বরেন নামক ছোকরাটি যে দোষী সে বিষয়ে তিনি এখন নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাঁহার উপর-ওলা মিস্টার দত্তগুপ্ত সমস্ত শুনিয়া যে সন্দেহটি পোষণ করিতেছেন তাহা তো সাংঘাতিক। তিনি নাকি মজিদকে বলিয়াছেন যে, এত কাণ্ডের পর যে লোকটিকে একটা গ্যারেজ হইতে টানিয়া বাহির করা হইল তাহাকে বিনা জামিনে এমনভাবে ছাড়িয়া দিবার দুইটি অর্থ-ই তাঁহার সহজ বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইতেছে। হয় ভূপেশ মজুমদার মোটা রকম ঘুষ খাইয়াছেন, অথবা তিনি নিজেই গোপনে গোপনে উক্ত ডাকাতের দলের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। অকাট্য-প্রমাণ ব্যতীত তিনি আর তৃতীয় কোনও সম্ভাবনাকে মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে দিতে প্রস্তুত নহেন। মজিদ নিম্নকণ্ঠে একথাও তাঁহাকে জানাইয়াছে যে তাঁহাকে (মানে ভূপেশ মজুমদারকে) "ওয়াচ" করিবার জন্য দত্তগুপ্ত নাকি একজন গুপ্তচরও নিযুক্ত করিয়াছেন। ভূপেশ মজুমদার কামরার চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। কোণের দিকে ওই যে ছোকরা সিনেমা-মাসিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া বসিয়া আছে উহার চালচলন একটু সন্দেহজনক। ছোকরা হাওড়া স্টেশনে পায়চারি করিতেছিল, ট্রেনটি ছাড়িবার ঠিক পরে চলন্ত ট্রেনে আসিয়া ওই কামরাটাতেই উঠিয়া পড়িল। ভূপেশ মজুমদারের মানসপটে দত্তগুপ্তের মুখটা ফুটিয়া উঠিল। তিনি নিজে অবশ্য ভূপেশকে এ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। দেখা হইলে অফিসারী গম্ভীর মুচকি হাসিয়া পূর্বেও যেমন মাথা নাড়িতেন আজও তেমনি নাড়িলেন। কিন্তু মজিদের কথা শোনার পর আজ আপিসে তিনি দত্তগুপ্তের দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা ঝলক মাঝে মাঝে লক্ষ্য করিলেন যাহা শঙ্কাজনক। দত্তগুপ্ত স্বল্পভাষী রাশভারী লোক। ভিতরে ভিতরে তিনি যে কি করিতেছেন তাহা ভগবানই জানেন। তাঁহার একটি শ্যালক দারোগা হইয়াছে এবং এখন মফঃস্বলের থানায় আছে। মজিদের সন্দেহ কোন ওজুহাতে ভূপেশবাবুকে সরাইয়া তাহাকে কলিকাতায় আনাই না কি দত্তগুপ্তের আন্তরিক অভিপ্রায়। তাঁহার অভিপ্রায় যাহাই হউক ভূপেশবাবু নিজেই নিজের কাছে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বসিয়া বসিয়া আত্মবিশ্লেষণ করিতেছিলেন। বরেনকে সেদিন তিনি ছাড়িয়া দিলেন কেন? বিধুর যুক্তিপূর্ণ অনুরোধই কি একমাত্র কারণ? বিধুভূষণ

তাঁহার প্রাক্তন বন্ধু—ছাত্রজীবনে একসঙ্গে অনেকদিন কাটাইয়াছেন, এক মেসে ছাত্রজীবনে তাঁহার দুর্দিনে বিধুভূষণ তাঁহাকে অর্থসাহায্যও করিতেন, বিধুর অনুরোধও যুক্তিপূর্ণ—কিন্তু এই সব কারণে কি তিনি একজন অপরাধীকে ছাড়িয়া দিতে পারেন? বরেন যে অপরাধী তাহা অবশ্য প্রমাণিত হয় নাই, কিন্তু সে যে নিরপরাধ তাহাও তো প্রমাণিত হয় নাই। তা ছাড়া এ সব লইয়া মাথা ঘামাইবার কথাও তো তাঁহার নয়। সন্দেহজনক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারালয়ে প্রেরণ করাই তাঁহার কর্তব্য। সে দোষী কি নির্দোষ তাহা আদালত ঠিক করিবে। তিনি আপন কর্তব্য হইতে চ্যুত হইতে গেলেন কেন? অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে প্রাক্তন বন্ধু বিধুভূষণকে খুশি করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কি করিয়া তাঁহাকে খুশি করিবেন তাহা কয়েকদিন পূর্ব হইতেই তিনি ভাবিতেছিলেন। দৈবাৎ তাঁহার গ্যারাজ হইতে ডাকাতটা ধরা পড়াতে তাঁহার সুবিধা হইয়া গেল। কিন্তু বিধুভূষণকেই বা তিনি খুশি করিতে চাহিয়াছিলেন কেন? অনাদিনাথও কি তাঁহার বাল্যবন্ধু নহে? তাহার পুরাতন পুস্তকগুলির সাহায্যে তিনি কি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন নাই? তাহার একটা অত্যন্ত ন্যায্য অনুরোধও তিনি সেদিন রক্ষা করিলেন না। গুম্ফপ্রান্ত পাকাইতে পাকাইতে ভূপেশ পরবর্তী স্তরে উপনীত হইলেন। বিধুভূষণকে খুশি করিবার উদ্দেশ্য পুঁটির (তাঁহার মাসতুতো শালীর) মেয়ে সুলোচনা। ওই বয়স্থা মেয়েটাকে বিপত্নীক বিধুভূষণ বিবাহ করিতে পারে এই সম্ভাবনায় যুগপৎ আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াই তিনি দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভূপেশবাবু নির্মমভাবে আত্মবিশ্লেষণ করিতেছিলেন, সুতরাং আর একটা জটিলতাও তাঁহাকে সরল করিতে হইল। পুঁটির মেয়ে সুলোচনার জন্যই বা তাঁহার অত দরদ কেন? ঘোঁতনার ছেলে কানুর জন্য তো প্রাণ কাঁদে নাই! ঘোঁতনা তাঁহার আপন মামাতো ভাই এবং কানু তাহার একমাত্র পুত্র। ঘোঁতনা কাহাকেও কোন নোটিশ না দিয়া কিছুদিন পূর্বে পট করিয়া পটল তুলিয়া ফেলিয়াছে। কানু লিখিয়াছিল অর্থাভাবে তাহার পড়াশুনা হইতেছে না। তিনি (মানে, ভূপেশ মজুমদার) যদি প্রতি মাসে কিছু করিয়া সাহায্য করেন তাহা হইলে সে অন্তত ম্যাট্রিকটা পাশ করিতে পারে। ভূপেশ মজুমদার কি করিয়াছিলেন? ইনাইয়া বিনাইয়া মিথ্যা সহানুভূতি এবং সত্য-মিথ্যা পূর্ণ বহুবিধ ওজর দেখাইয়া একখানা পোস্টকার্ড (তাহাও পাশের বাড়ি হইতে ধার করিয়া) লিখিয়াছিলেন। একটি কপর্দক সাহায্য তো করেন নাই, করিবেন বলিয়া আশাও দেন নাই। সুলোচনার জন্যই বা তাঁহার এত মাথাব্যথা হইতে গেল কেন? ভূপেশ কোণে উপবিষ্ট সিনেমা পত্রিকায়-দৃষ্টিলগ্ন যুবকের দিকে চকিতে এক নজর চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর নিজের চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া গুম হইয়া গেলেন। অনেকক্ষণ গুম হইয়াই রহিলেন। ত্রিশ বৎসরের ব্যবধান ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে বিষবৃক্ষের বীজ ত্রিশ বৎসর পূর্বেই উপ্ত হইয়াছিল। ষোড়শী পুঁটির মুখখানা তাঁহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। মুখ নয়, মুখের স্মৃতি। মুখখানা তো পরে দুমড়াইয়া তুবড়াইয়া কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। কিন্তু ওই স্মৃতিটা—ওই বিশেষ একটা ছবি—হাসিভরা দু'টি চোখ, কানের দুল দু'টি, গালের উপর ছোট্ট একটি তিল—এই ছবিটা এখনও অমর হইয়া আছে এবং তাঁহার সর্বনাশ করিতেছে। ভূপেশ মজুমদার নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন, সিগারেট ধরাইলেন, কোণের ছোকরার দিকে আর একবার চাহিয়া দেখিলেন, চোখ দুইটি খুব জোরে বুঁজিয়া আবার খুলিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না। হাসি-ভরা মুখখানি মনের উপর স্থিরভাবে ফুটিয়া রহিল।

বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জীবনটাই তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। কি দুঃখেই ছেলেবেলাটা তাঁহার কাটিয়াছিল। অধিকাংশ দিন দুইবেলা ভাত জুটিত না। বাবা কলিকাতা শহরে সামান্য বেতনে কেরানিগিরি করিতেন। কলিকাতায় বাড়িভাড়া করিয়া পরিবার রাখিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। নিজে একটি সস্তা মেসে থাকিয়া কোনও মাসে পঁচিশ, কোনও মাসে ত্রিশ টাকা তাঁহাদের গ্রামের বাড়িতে পাঠাইতেন। কোনরকমে গ্রাসাচ্ছাদন জুটিত। টাইফয়েডে তাঁহার এক ভাই, এক বোন বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়াছিল। চিকিৎসা করিবার পয়সা ছিল না। সুবিধার মধ্যে গ্রামে একই হাই-স্কুল ছিল এবং ভূপেশ সেই স্কুলে বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। ভূপেশ মজুমদারের ফুটবল খেলার দক্ষতা ছিল। এই দক্ষতার জন্য তিনি একটি মিশনারি সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বিনা-বেতনে কলিকাতায় একটি কলেজে পড়িবারও সুবিধা পান। তাহার পর উক্ত সাহেবেরই অনুগ্রহে তিনি পুলিশ-বিভাগেও প্রবেশ করেন। দারোগা হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। সেই বিবাহবাসরেই পুঁটির সঙ্গে তাঁহার প্রথম দেখা। বাসরঘরের এক কোণে বসিয়া পুঁটি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছিল।

"একটা গান করুন।"

"গান আমি জানি না।"

"যা জানেন তাই করুন।"

"যিনি এমন জোর হুকুম করতে পারেন জানতে পারি কি তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা কি?"

"সম্পর্ক খুব মধুর। পুঁটি তোমার শালী হয়—" কে একজন হাসিয়া বলিয়াছিল।

ভূপেশ মজুমদারের সঙ্গীতে তেমন দখল ছিল না। কিন্তু পুঁটির অনুরোধে কয়েকটি গানই তিনি গাহিয়াছিলেন। তাহার পর যখনই শ্বশুরবাড়ি গিয়াছেন পুঁটির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। পুঁটি অনাথা ছিল, ভূপেশ মজুমদারের শাশুড়ীই নিজের বোনঝিকে মানুষ করিয়াছিলেন। সুতরাং ভূপেশ যখনই যাইতেন পুঁটির সহিত দেখা হইত। পুঁটিকে দেখিতে পাইবেন এই আশাতেই যে ভূপেশ অনেকবার অযাচিতভাবে শ্বশুরালয়ে গিয়াছেন এ কথাও মিথ্যা নয়। অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে পুঁটির সম্বন্ধে তাঁহার একটু দুর্বলতা ছিল। মেয়েটার ভাবভঙ্গিতে কি যেন একটা ছিল যাহা, মানে, —ভূপেশ মজুমদার অবশ্য এমন কিছুই কোনদিন করেন নাই যাহা সমাজের চক্ষে হেয়—কিন্তু এ কথা তাঁহাকে মানিতেই হইবে যে পুঁটিকে ঘিরিয়া তাঁহার কল্পনা একদা বেশ রঙীন হইয়া উঠিয়াছিল। যে রঙের নেশা তাঁহার মনে লাগিয়াছিল তাহার বাহ্যিক প্রমাণ অবশ্য কিছুই ছিল না। পুঁটিকে তিনি কোন উপহার পর্যন্ত কখনও দেন নাই। শাড়ি, গহনা দিবার সামর্থ্যই তাঁহার ছিল না। সাবান, এসেন্সজাতীয় কিছু দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাও দেন নাই। তাঁহার মনে হইত এই ধরনের কিছু দিলে জিনিসটা খেলো হইয়া যাইবে। কেবল একটা আশ্বাস তাহাকে দিয়াছিলেন—"যদি তোমার কখনও কোন বিপদ হয়, খবর দিও, প্রাণপণে সাহায্য করব।" পুঁটি যতদিন বাঁচিয়াছিল কোনও সাহায্য চায় নাই। দুর্গম এক পল্লীগ্রামে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। এক শতছিদ্র খোলার ঘরে এক তাড়িখোর চরিত্রহীন স্বামীকে লইয়া সে দিন কাটাইত। তবু ভূপেশের নিকট সে কোনও সাহায্য চায় নাই। একটা চিঠি পর্যন্ত লেখে নাই। যখন বিধবা হইল তখনও কিছু জানায় নাই। মৃত্যুকালে যখন তাহার শ্বাস উঠিয়াছে তখন সে তাহার কন্যা সুলোচনাকে

অতি কষ্টে তাহার ঠিকানাটি দিয়া বলিয়া গিয়াছে, বিপদে পড়িলে সে যেন ভূপেশের সাহায্য প্রার্থনা করে। ভূপেশ নিজমুখে বড় গলা করিয়া এ আশ্বাস তাহাকে দিয়াছিল। পুঁটির মুখখানা—ষোড়শী পুঁটির মুখখানা—তাহার মানসপটে আবার ফুটিয়া উঠিল। আবেশময় চক্ষু দুইটি নির্নিমেষে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে।

সর্বনাশের মূল কারণ আবিষ্কার করিয়া ভূপেশ মজুমদার অসহায়ভাবে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সমস্ত ব্যাপারটা বেশ জট পাকাইয়া গিয়াছে। দিল্লী গিয়া যদি জটটা ছাড়ানো যায়। প্রথমতঃ বিধুকে দিয়া লিখাইয়া লইতে হইবে যে সে উক্ত বরেনের জন্য জামিন ছিল, এবং তাহাকে সচ্চরিত্র যুবক বলিয়া চিনিত! দ্বিতীয়তঃ যাইতে হইবে গুহ মহারাজের কাছে। শ্রীশ্রীবাসুকীনাথ গুহ দত্তগুপ্তের জননী শীতালাক্ষী দেবীর গুরুদেব! ভূপেশকে তিনি খুবই স্নেহ করেন। তিনি স্নেহপরবেশ হইয়া দত্তগুপ্তকে একটু ইঙ্গিত যদি করেন অচিরাৎ সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে। গুহ মহারাজও এখন দিল্লীতে। গুজব, শাসন-পরিষদের কয়েকজন হোমরাচোমরা সভ্য নাকি গুহ মহারাজের আধ্যাত্মিক কৃপাকণা লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র। তা ছাড়া হোম মিনিস্টারের যিনি আসল দক্ষিণ হস্ত (কাগজেকলমে বা নথিপত্রে নহে, অথচ যিনি প্রকৃতই তাঁহার দক্ষিশ হস্ত) সেই ছিনে মিত্তিরও একজিবিশন দেখিতে দিল্লী গিয়াছেন। ছিনে মিত্তির যদি আশ্বাস দেন যে ভয় নাই, তাহা হইলে সত্যই তিনি নির্ভয় হইতে পারিবেন। দিগ্বিজয়ী সেন্টার ফরোয়ার্ড ভূপেশ মজুমদারকে ছিনে মিত্তির এককালে খুবই শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। গুম্ফপ্রান্ত পাকাইতে পাকাইতে তিনি আশা করিতে লাগিলেন যে ছিনে মিত্তিরের সে শ্রদ্ধা ভক্তি এখনও অচলা আছে। তাহার পর হাওড়ায় আসিবার অব্যবহিত পূর্বে যে ঘটনাটা ঘটিয়াছিল তাহা তাঁহার মনে পড়িল। মনে পড়িবামাত্র আর একবার তিনি মরমে মরিয়া গেলেন। ছি, ছি, কি কাণ্ড!

গৃহিণীর নিকট দিল্লী গমনের একটা মিথ্যা ওজুহাত তিনি দেখাইয়াছিলেন। সত্য কথা গোপন রাখিয়া বলিয়াছিলেন, আফিসের একটা জরুরী দরকারে তাঁহাকে দিল্লী যাইতে হইতেছে।

"আপিসের আবার কি দরকার পড়ল এখন?"

"দরকারটা আমারই বেশি। একটু তদ্বির করলে হয়তো পট করে উন্নতি হয়ে যেতে পারে। গুহ মহারাজ এখন দিল্লীতে যে।"

"ও—"

সৌভাগ্যক্রমে গৃহিণী আর বাধা সৃষ্টির প্রয়াস পান নাই। তিনি যদি অসম্মতি প্রকাশ করিতেন, ভূপেশ মজুমদার তাহা হইলে দিল্লী যাইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। ইদানীং তিনি প্রতিটি কার্য গৃহিণীর পরামর্শ অনুযায়ী করিয়া থাকেন। কারণ সুদীর্ঘ দাম্পত্যজীবন ভোগ করিয়া তিনি একটি সার সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন—গৃহিণী-রূপ ঘোড়াকে ডিঙ্গাইয়া কোনরূপ ঘাস খাইবার চেষ্টা করা উচিত নয়, করিলেই ঘাসের বদলে চাঁট খাইতে হয়।

যাত্রা করিবার প্রাক্কালে ভূপেশ মজুমদার জিনিসপত্র গুছাইতে ব্যস্ত ছিলেন। নীচে ট্যাক্সি অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময় গৃহিণীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"ওগো শুনছ, কোথায় তুমি?"

আবার কি হইল? কণ্ঠস্বরে বেশ একটু ঝাঁজের আভাস পাইয়া ভূপেশ মজুমদার মনে মনে

ঈষৎ তটস্থ হইলেও বাহিরের প্রফুল্লভাব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাও রাখা গেল না। কারণ শ্রীমতী নীলতারা (ভূপেশ-গৃহিণীর নামকরণ করিয়াছিলেন তাঁহার ঠাকুরমা স্বর্গীয়া লাল-পরি দেবী) ঘরে ঢুকিয়া যে নিদারুণ বার্তাটি নিক্ষেপ করিলেন তাহা সত্যই ভয়ঙ্কর!

"কি বলছ, এই যে আমি এ ঘরে বাক্স গোছাচ্ছি।"

"তোমার সুলোচনাকে দূর কর এক্ষুনি। ওকে আর একদণ্ড বাড়িতে রাখা চলবে না।"

"কেন, কি হল?"

"চেহারা দেখে প্রথমেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, এখন আর সন্দেহ নেই। ও পোয়াতি। পাপ বিদেয় কর এখনি—"

"বল কি!"

নীলতারা সহসা অপ্রত্যাশিত একটা খোঁচা দিয়া বলিলেন, "বলব আবার কি! যেমন গাই তেমনি তো বকনা হবে। ওর মা পুঁটি যে কি রকম ছিল তা তো তোমার ভাল করেই জানা আছে—।"

এই সঙ্কটময় মুহূর্তে ভূপেশ মজুমদার নীরব থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। হেঁটমুণ্ডে তাড়াতাড়ি বাক্স-গোছানো শেষ করিয়া তিনি পাশের ঘরে গিয়া স্যুট পরিতে লাগিলেন। পরিতে পরিতে শুনিলেন নীলতারা নীচে তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন— "দূর হয়ে যা, দূর হয়ে যা এখ্‌খুনি—"

সহধর্মিণীর সহিত আর বাক্যালাপ করা সমীচীন নহে মনে করিয়া ভূপেশ মজুমদার সোজা নীচে নামিয়া ট্যাক্সিতে চড়িলেন। ট্যাক্সিতে চড়িয়া দেখেন সুলোচনা বসিয়া আছে।

"কে সুলি—?"

"হ্যাঁ—"

সুলোচনা আর কিছু বলিতে পারিল না। আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। ভূপেশ মজুমদার হাতঘড়িটার দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। ট্রেন ছাড়িবারও বেশি বিলম্ব ছিল না। সোজা হাওড়া স্টেশনে না গেলে ট্রেন পাওয়া যাইত না। মজিদের স্টেশনে আসিবার কথা, ঠিক করিলেন সে যদি আসে তাহার কাছেই আপাততঃ সুলোচনাকে রাখিয়া যাইবেন, যদি না আসে সঙ্গেই লইয়া যাইতে হইবে। উপায় কি। এই সব ভাবিয়া (বেশি ভাবিবারও সময় ছিল না) ভূপেশ ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন "সোজা হাওড়া চল।"

পথে সুলোচনার সহিত একটিও বাক্য-বিনিময় হয় নাই। স্টেশনে মজিদ ছিল। তাহার কাছেই সে সুলোচনাকে রাখিয়া আসিয়াছে। বলিয়া আসিয়াছে যে এই অনাথা মেয়েটির একটা ব্যবস্থা সে ফিরিয়া আসিয়া করিবে। তাহার পত্নী ইহাকে বাড়িতে স্থান দিতে চান না। ভূপেশ মজুমদার কলিকাতায় থাকিতে পাইলে একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করিতে পারিত, কিন্তু তাহাকে দিল্লী যাইতে হইতেছে, সুতরাং—। মজিদ বহুকালের পুরাতন বন্ধু, সে আশ্বাস দিয়াছে যে ভূপেশ ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত সে মেয়েটির রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

দিল্লী এক্‌স্‌প্রেস দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। ইন্‌টার ক্লাস কামরার এক কোণে বসিয়া ভূপেশ মজুমদার আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছেন। হঠাৎ একটা কথা তাঁহার মনে হইল।

মজিদ মুসলমান। সুলোচনাকে যদি সে নিজের বাড়িতে লইয়া যায়, তাহা হইলে সুলোচনা তাহাদের ছোঁয়া খাইবে কি? যদি না খায়...! আবার সমস্ত জট পাকাইয়া গেল।

॥ দুই ॥

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মল্লিকের ইতিহাসটা একটু জটিল। কলিকাতায় যাঁহারা তাঁহার পরিচিত তাঁহাদেরও কেহ সে ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে জানেন না। জানেন না, কারণ কলিকাতা শহরে জানিবার প্রয়োজন হয় না। কলিকাতা শহর পৃথিবীর একটি বড় হাট, সে হাটে ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা-বাণিজ্যই মুখ্য কথা, পরস্পরের সম্পূর্ণ পরিচয় জানাটা গৌণ। মোটামুটি একটা ভদ্র আবরণ, আচরণ ও উপার্জন-দক্ষতা থাকিলে কলিকাতা শহরে কাজ চলিয়া যায় এবং কাজ চলিয়া গেলে, অর্থাৎ অর্থোপার্জন করিতে পারিলে আর কিছুই আটকাইয়া থাকে না। বিধুভূষণ অর্থোপার্জনে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানিবার জন্য কেহ ব্যগ্র হন নাই, তাঁহার আর্থিক পরিচয়েই তিনি বাজারে বেশ চালু ছিলেন। কিন্তু কলিকাতার বাজারে চালু হইলেই গল্পের বাজারে চালু হওয়া যায় না। রসিক পাঠক-পাঠিকার নিকট বিধুভূষণের চিত্রটি সার্থক করিতে হইলে তাঁহার আসল পরিচয়টি দিতে হয়।

বিধুভূষণ একটু অন্তরঙ্গমহলে নিজের যে পরিচয় জাহির করিয়া প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন এবং প্রধানতঃ যে পরিচয়ের জোরে তিনি ব্যবসাক্ষেত্রে সুবিধালাভও করিয়াছিলেন সে পরিচয়টি সম্পূর্ণ মিথ্যা। চিটাগাং বা চিটাগং অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সহিত তাঁহার কোনও সম্পর্ক ছিল না। চট্টগ্রামের পর্বতে পলায়িত বীরগণকে তিনি প্রাণ তুচ্ছ করিয়া খাদ্য সরবরাহ করিতেন এ কথার কোনই ভিত্তি নাই। কিন্তু এই ভিত্তিহীন সংবাদই রাখহরি বিশ্বাস, গোপেন পাল, গগন দাঁ, জিৎরাম চুড়িওয়ালাকে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং তাঁহারা সকলেই এই প্রাণতুচ্ছকারী স্বদেশসেবককে নানাবিধ ব্যবসায়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। সাহায্য করিয়া ঠকেন নাই, কারণ ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বিধুভূষণ সত্যই একজন উঁচুদরের খেলোয়াড় ছিলেন, ইংরেজি ভাষায় যাহাকে বলে স্পোর্টস্‌ম্যান। ব্যবসায়ে কোনরূপ ছুঁচোমি বা ছিঁচকেমিকে তিনি প্রশ্রয় দেন নাই, কখনও কাহাকেও লেংগি মারেন নাই। ইংরেজি ভাষায় যাহাকে "বিলো দি বেল্ট হিট" করা বলে তাহা তিনি কখনও করেন নাই। যাঁহারা তাঁহাকে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সাহায্য করিয়াছিলেন। বিনিময়ে তাঁহারা বিধুভূষণের নিকটও সাহায্য পাইয়াছেন যথেষ্ট। বিধুভূষণ পারতপক্ষে তাঁহাদের প্রতিযোগী হইবার চেষ্টা করেন নাই, সহযোগী হইবারই চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন অর্থোপার্জন করিতে হইলে সহধর্মী যত অধিক লোকের আনুকূল্য লাভ করা যায় ততই সুবিধা। এতদ্ব্যতীত আর একটি সারসত্যও তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন সমাজের নানা স্তর হইতে আহরণ করিয়া নিজের স্বপক্ষে যদি একদল লোককে আনিতে পারা যায় তাহা হইলে জীবনের পথে চলা-ফেরা করা সহজ হইয়া ওঠে, দুর্গম পন্থাও সুগম হইয়া যায়। বিধুভূষণের এই মাত্রা-বোধ অন্তরনিহিত যে প্রবল বাসনা হইতে উদ্ভূত সে বাসনা পৃথিবীর অধিকাংশ লোককেই জীবন-যাত্রায় উদ্বুদ্ধ করে সত্য, কিন্তু তাহা বিধুভূষণের সমস্ত সত্তাকে যতটা একাগ্র করিয়া তুলিয়াছিল সকলকে ততটা করে না। কারণ ছিল। সমাজে

আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বিধুভূষণ এত ব্যাকুল ছিলেন তাহার প্রধান কারণ, জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে যে ভূমির উপর ভবিষ্যৎ আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ সকলে লাভ করেন সে ভূমিটুকুই বিধুভূষণ পান নাই। জীবনের জন্মমুহূর্তে তাঁহাকে শুইতে হইয়াছিল অপরিচয়ের গ্লানি বহন করিয়া পথের ধূলায়, তাঁহার শৈশব ছিল স্নেহমমতাহীন বিভীষিকা।

তাঁহার নিদারুণ জন্মকাহিনী নিজেও তিনি জানিতেন না। কাহারও পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে নিজের জন্মকাহিনী জানা সম্ভব নয়, অপরের মাধ্যমেই পিতৃপরিচয় বংশ-পরিচয় সকলকে জানিতে হয়। বিধুভূষণ জানিয়াছিলেন তাঁহার বিজলী মাসীর কাছে। বিজলী নাম্নী যে প্রৌঢ়া মহিলাটি জমিদার রজতবাবুর বাড়িতে দাসীবৃত্তি করিত, সেই তাঁহার বিজলী মাসী। তাহার মুখেই একদিন তিনি নিজের রোমাঞ্চকর অবিশ্বাস্য জন্মকাহিনী শোনেন। ওই বিজলীর অবিবাহিতা ভগ্নী দামিনীই নাকি তাহার জননী ছিল। দুই ভগ্নীই রজতবাবুর বাড়িতে কাজ করিত। তাহাদের আদি নিবাস কোথায় ছিল, কি করিয়া তাহারা রজতবাবুর বাড়িতে আসিয়া দাসীত্বে বাহাল হইল এ সব ইতিহাস বিধুভূষণকে বিজলী মাসী বলে নাই। বিজলী মাসী বলিয়াছিল যে কাজ করিতে করিতে দামিনী হঠাৎ নাকি একদিন অন্তর্ধান করে। দুই চারদিন এদিকে ওদিকে খবর করিয়া বিজলী যখন তার সন্ধান পাইল না, তখন তাহার মনে হইল যে কাহারও সহিত সে কোথাও চলিয়া গিয়াছে বোধ হয়। ছয় সাত মাস কাটিয়া গেল, কোনও খবর পাওয়া গেল না। তাহার পর একদিন গভীর রাত্রে যাহা ঘটিল তাহা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি অবিশ্বাস্য। একদিন গভীর রাত্রে বিজলী মাসীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তাহার মনে হইল বারান্দার উপর একটি শিশু ক্রন্দন করিতেছে। খুব জোরে কাঁদিতেছে, এত জোরে যে মনে হইতেছে কেউ যেন শিশুটাকে নির্যাতন করিতেছে! বিজলী ধড়মড় করিয়া কপাট খুলিল, দেখিল বারান্দার উপর ন্যাকড়ায় জড়ানো একটি কচি শিশু তারস্বরে চিৎকার করিতেছে। আশেপাশে কেহ নাই। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সে বিস্ফারিত-নেত্রে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর বাবুদের জাগাইল। বাবুরাও কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তাহার পর বড়বাবু, অর্থাৎ রজতবাবু বলিলেন, "আপাততঃ, তুই ওকে ঘরে নিয়ে যা তো, পরে যেমন হয় দেখা যাবে—।" পরদিন সকালে রহস্য ঘনতর হইল। জমিদারবাবুদের পুকুরে দামিনীর মৃতদেহটা ভাসিয়া উঠিল। জমিদারবাবু পুলিশে খবর দিলেন। পুলিশ-তদন্তেব ফলে জানা গেল যে দামিনীর শরীরে সদ্যপ্রসবের লক্ষণসমূহ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত রহিয়াছে। আইনতঃ ইহাও নির্ধারিত হইল যে সে পুকুরে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

এই শিশুই বিধুভূষণ। তাঁহার শৈশবটা বিজলী মাসীর কাছেই অতিবাহিত হইয়াছিল। একটা দুঃস্বপ্নের মতো এই শৈশবের স্মৃতি মাঝে মাঝে তাঁহার এখনও মনে পড়ে। এই শৈশবই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। এই শৈশবে যে দুইটি ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হয় তাহাদের প্রভাব কখনও তিনি অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হওয়ামাত্রই প্রথম যে অনুভূতিটি তাঁহার মর্মকে ক্ষতবিক্ষত করিল তাহা এই যে, তিনি অস্পৃশ্য। সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করে। "দূর দূর", "মর মর", "যমের অরুচি"—নিজের সম্বন্ধে এই সব উক্তি ছাড়া তিনি আর কিছু শোনেন নাই। রজতবাবুর স্ত্রী তাঁহার নামকরণ করিয়াছিলেন পাঁঠা।" তাঁহাকে দেখিলে তাঁহার চোখে মুখে নিষ্ঠুর ঘৃণার যে অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিত তাহা বীভৎস। মনে হইত আইনের বাধা না

থাকিলে তাঁহাকে তিনি ছারপোকার মতো পিষিয়া মারিয়া ফেলিতেন। বলিতেন, "আমার সামনে আসিস না। পাপ, পাপ। মানুষ তো নয়, যেন ছাগলছানা। ছাগলীর পেটে পাঁঠা জন্মেছে।"

আর একটু বড় হইবার পর দ্বিতীয় ধারণাটি তাঁহার মনে শিকড় গাড়িল। তিনি উপলব্ধি করিলেন টাকা থাকিলে পৃথিবীতে কিছুই আটকায় না। রজতবাবু মদ্যপ চরিত্রহীন কিন্তু সকলেই তাঁহাকে প্রণাম করে, সেলাম করে, নানাভাবে খোসামোদ করে, কারণ তাঁহার টাকা আছে। রজতবাবুর একমাত্র ছেলে কনক জন্মান্ধ, তাহার মুখ দিয়া সর্বদা লালা ঝরে, হাঁউমাউ করিয়া কি যে কথা বলে বোঝা যায় না, পা দুইটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত, উঠিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবার সামর্থ্যটুকু নাই, কিন্তু এই পঙ্গু জড়পিণ্ডটাকে ঘিরিয়াই অহোরাত্র একটা সমারোহ চলিয়াছে। তাহার জন্যে দুইটা চাকর, দুইটা চাকরানি, দুইজন নার্স, একজন ডাক্তার; তাহার জন্য রংবেরঙের কত জামাকাপড়, কত এসেন্স পাউডার, স্নো, ক্রীম, কত অদ্ভুত ধরনের খেলনা, কত হরেক রকমের খাবার। তাহাকে বাগানে হাওয়া খাওয়াইবার জন্য কি চমৎকার গাড়ি। সবই সম্ভব হইয়াছে, কারণ রজতবাবুর টাকা আছে। রজতবাবুর ছোট ভাই হিরণবাবু ক্রোধোন্মত্ত হইয়া একটা চাকরকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিলেন কিন্তু পুলিশ তাঁহার কেশাগ্র পর্যন্ত স্পর্শ করিল না, কারণ তাঁহার টাকা আছে। বাল্যকাল হইতেই বিধুভূষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে টাকা থাকিলে পৃথিবীতে অসাধ্যসাধন করা যায়।

বিধুভূষণের পরবর্তী জীবন এই দুইটি ধারণার ফল। তিনি যে জারজ এই সত্যটা সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত করিবার জন্য তিনি না করিয়াছেন কি? বিজলী মাসীর মুখে যেদিন তিনি নিজের জন্মকাহিনী শোনেন সেইদিনই তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। কথাটা শুনিবামাত্র তাঁহার পায়ের তলা হইতে যেন মাটি সরিয়া গেল। পা দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তিনি বসিয়া পড়িলেন। বিজলী মাসী খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া মন্তব্য করিল, "ছোঁড়ার রকম দেখ। ঠিক মায়ের মতই ঢণ্ডী হয়েছেন।" বিজলী মাসী কাজে চলিয়া যাইবার পর বিধুভূষণ অনেকক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিলেন। তাহার পর অনিশ্চিতভাবে পথে বাহির হইয়া পড়িলেন, দুইচক্ষু যেদিকে তাঁহাকে লইয়া চলিল সেইদিকে চলিতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া দেখিলেন পথে মাল-বোঝাই একটা মোটর-লরী দাঁড়াইয়া আছে! পিছন দিকে লুকাইয়া বসিবার মতো একটু স্থান ছিল, ড্রাইভারের দৃষ্টি এড়াইযা তাহাতেই তিনি উঠিয়া বসিলেন। ঘণ্টা বারো তেরো পরে, অর্থাৎ প্রায় তিনশত মাইল পার হইয়া ড্রাইভার বুঝিতে পারিল যে একটা ছোঁড়া পাটের বস্তার ফাঁকে লুকাইয়া বসিয়া আছে, কান মলিয়া গোটা দুই থাপ্পড় লাগাইয়া সে তাহাকে নামাইয়া দিল। যে স্থানে নামাইয়া দিল সে স্থানটা একটা গঞ্জের মতো। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক অনিশ্চিতভাবে ঘুরিয়া বিধুভূষণ অবশেষে একটি চায়ের দোকানের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। চায়ের দোকানের মালিক জয়ন্তীবাবুর কিছুই নজর এড়ায় না। একটা ছোঁড়া যে তাঁহার দোকানের বারান্দায় বসিয়া উসখুস করিতেছে ইহা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

"কি রে ছোঁড়া, কি চাস তুই?"

"একটা চাকরি খুঁজছি বাবু।"

"চায়ের দোকানে কাজ করতে পারবি? ফাইফরমাশ খাটতে হবে।"

"পারব।"

"কি নাম তোর?"

"ভূতো।"

রজতবাবুর বাড়িতে সকলে তাহাকে পাঁঠা বলিয়া ডাকিত। এইখানে পাঁঠার মৃত্যু হইল।

নবজাতক ভৃত্যের প্রায় সমস্ত কৈশোর এবং যৌবনের কিছুটা কাটিয়া গেল এই চায়ের দোকানেই। বিধুভূষণ জীবনের সত্য পরিচয়ও লাভ করিলেন। কত রকমের লোকই যে চা খাইতে আসে। কতরকম বেশভূষা, কতরকম কথাবার্তা, কতরকম চরিত্র। সচ্চরিত্র, দুশ্চরিত্র, মেকী-ধনী, মেকী-দরিদ্র, আসলবাবু, ফোতোবাবু, মজুর, কেরানি, ব্যবসায়ী, বহুরকম লোকের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়া বিধুভূষণ মানবচরিত্র সম্বন্ধে প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেন। তাঁহার এই অভিজ্ঞতা যে উত্তরকালে তাঁহার সাফল্যসৌধ নির্মাণের ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। জয়ন্তীবাবু লোকটিও বেশ চালাক-চতুর করিতকর্মা লোক। ভূতো যে কর্মী হিসাবে নিখুঁত, ইহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। ভূতোর সহায়তায় যে তিনি তাহার আসল ব্যবসায়টি আরও ফলাও করিতে পারিবেন এ আশাও তাঁহার হইয়াছিল। ভূতো পাছে বেহাত হইয়া যায় এই আশঙ্কায় তিনি আটঘাট বাঁধিয়াই চলিতেছিলেন। ভূতোর সহিত সুমিষ্ট ব্যবহার তো করিতেনই, বেতনও বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। খাওয়া-পরা, জলখাবার, প্রত্যহ চার আনা করিয়া হাত-খরচ ছাড়া মাসিক পঁচিশ টাকা বেতন এবং ভবিষ্যতে বেতনবৃদ্ধির আশা দিয়া ভূতোকে তিনি বেশ তোয়াজেই রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভয় ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী ঝক্‌সু মিঞা হয়তো ভূতোকে নানাপ্রকার "ভুজুং" দিয়া নিজের দলে টানিয়া লইবে। ঝক্‌সুর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। দাসু নামক যে ছোকরাটিকে জয়ন্তীবাবু কিছুকাল পূর্বে তালিম দিয়া চৌকস করিয়া তুলিয়াছিলেন, সে সহসা একদিন অন্তর্ধান করিল। তাহার পর জয়ন্তীবাবু বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাইলেন ছোকরা নাকি যোগানন্দ নাম ধারণ করিয়া ঝক্‌সু মিঞার কলিকাতার ব্রাঞ্চের ম্যানেজার হইয়াছে। লম্বা চুল রাখিয়া কপালের মাঝখানে তান্ত্রিকদের মতো সিন্দুরের টিপ পরিতেছে। সুতরাং ভূতোকে তিনি সর্বতোভাবে সাবধানে আগলাইয়া বেড়াইতেছিলেন। এই অতি-সাবধানতার ফলেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। ঝক্‌সু মিঞা হয়তো ভূতোর প্রতি তেমন মনোযোগ দিতেন না, কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে জয়ন্তীবাবু ভূতোকে তাহার দলের লোকের সহিত বাক্যালাপ করিতেও নিষেধ করিয়াছেন, তখন ভূতোর প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। জয়ন্তীবাবুর সাবধানতার বেড়ার ফাঁকে ভূতোর সহিত তিনি কেবল আলাপই করিলেন না, তাহাকে প্রলুব্ধও করিতে লাগিলেন। ভূতো কিন্তু প্রলোভন সত্ত্বেও রাজী হয় নাই। ঝক্‌সু মিঞা তাহাকে এ কথাও বলিয়াছিলেন যে, দিল্লী শহরে তিনি ব্যবসায়ের যে শাখাটি আরম্ভ করিতেছেন ভূতোকেই তাহার ম্যানেজার করিয়া দিবেন। বিধুভূষণ কিন্তু এ লোভ সংবরণ করিয়াছিলেন। যে জয়ন্তী মিশ্র তাঁহাকে বিপদের সময় আশ্রয় দিয়াছিলেন, যাঁহার কৃপায় পোস্টাফিসে হাজার টাকা জমিয়াছে, তাহার সহিত এরূপ দুর্ব্যবহার করিতে তাহার মন সরে নাই। এই গুণটি বিধুভূষণ-চরিত্রের একটি প্রধান গুণ। তিনি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই। এই গুণের জন্যই কিন্তু তিনি বিপদে পড়িলেন, কুটিল ঝক্‌সু মিঞার রোষদৃষ্টি তাঁহার জীবনের ধারা বদলাইয়া দিল।

জয়ন্তী মিশ্রের আসল ব্যবসায়ের সঠিক খবর বিধুভূষণ জানিতেন না তবে তাঁহার সন্দেহ

হইত যে চায়ের ব্যবসা ছাড়াও তাঁহার অর্থাগমের আর একটা উপায় আছে। কারণ চায়ের দোকান বন্ধ হইয়া যাইবার পর দোকানের পিছনদিকের ঘরগুলিতে তাস, দাবা, পাশা প্রভৃতি খেলার আসর বসিত। অনেক লোক আসিত, অনেক রাত্রি পর্যন্ত খেলা চলিত। জয়ন্তীবাবুর অন্তঃপুর হইতে বাটা ভরিয়া পান আসিত, প্রত্যেক খেলোয়াড় পান চিবাইতে চিবাইতে খেলিতেন। বিধুভূষণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন প্রত্যেক খেলোয়াড় খেলা শেষ হইয়া গেলে জয়ন্তীবাবুকে পয়সা দিয়া যাইত। কেন পয়সা দিত, কেনই বা তাহারা প্রত্যহ আসিত, বিধুভূষণ বুঝিতে পারিতেন না। জয়ন্তীবাবু তাঁহার আসল ব্যবসায়টির কথা বিধুভূষণকে বলেন নাই। ইচ্ছা ছিল ধীরে-সুস্থে ক্রমশঃ ব্যাপারটা তাহার নিকট প্রকাশ করিবেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। বিধুভূষণকে মাসে দুইবার (কখনও তিনবার) নিকটস্থ শহরে চা আনিবার জন্য যাইতে হইত। একটি বিশেষ দোকানের সহিত জয়ন্তীবাবুর বন্দোবস্ত ছিল, তাহারা জয়ন্তীবাবুর সমস্ত চা সরবরাহ করিত। চায়ের প্যাকেটগুলি তাহারা ভাল করিয়া বাঁধিয়া, একটি কাঠের বাক্সে পুরিয়া রাখিত, বিধুভূষণ মাঝে মাঝে গিয়া সেই বাক্সটি মাথায় করিয়া লইয়া আসিতেন। ইহার মধ্যে যে কোন প্রকার বিপদ থাকিতে পারে ইহা বিধুভূষণের কল্পনাতীত ছিল। বিপদ কিন্তু ঘটিয়া গেল। একদিন চায়ের বাক্সটি মাথায় করিয়া তিনি আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে সহসা একদল পুলিশ তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া গেল। থানায় কাঠের বাক্স খুলিয়া পুলিশ চায়ের প্যাকেটগুলি বাহির করিতে লাগিল। তাহার পর চায়ের প্যাকেটগুলিও খুলিল। বিধুভূষণ সবিস্ময়ে দেখিলেন, প্রত্যেক প্যাকেটের ভিতর ছোট ছোট শিশিতে সাদা সাদা কি যেন রহিয়াছে। পরে তিনি জানিয়াছিলেন উহা কোকেন। বিধুভূষণের জেল হইয়া গেল। ঝক্সু মিঞারই এক চর নাকি পুলিশে খবর দিয়াছিল!

জেলে গিয়া বিধুভূষণ আর একটি নূতন জগৎ আবিষ্কার করিলেন। তিনি দেখিলেন, জেলে কেবল চোর বা খুনীরাই আসে না, সাধু মহাপুরুষরাও আসে। যাঁহারা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ করেন তাঁহারাও জেলবাসী। ঠিক কিছুদিন পূর্বেই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হইয়াছিল। জেলের কয়েদীদের মধ্যেও সাড়া জাগিয়াছিল একটা। এই বাঙালী বীর যুবকবৃন্দকে কেন্দ্র করিয়া যে উত্তেজনা, যে সম্ভ্রম, যে উদ্দীপনা সকলের হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছিল তাহা বিধুভূষণকেও কম অভিভূত করে নাই। বিধুভূষণ অজ্ঞাতকুলশীল, বিধুভূষণ নিরক্ষর, কিন্তু এই ঘটনাটি তাহার কল্পনাকেও নানারঙে রাঙাইয়া দিয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহার মনে হইত, আহা, আমি যদি উহাদের একজন হইতাম! সুযোগ পাইলে নিশ্চয় হইতে পারিতাম, প্রাণ তুচ্ছ করিতে একটুও ইতস্ততঃ করিতাম না। যে কুৎসিত কলঙ্ক জয়ন্তী মিশ্র আমার চরিত্রে মাখাইয়া দিয়াছে, তাহার জন্য আমি তো দায়ী নই। কোকেন যে কী বস্তু তাহাই আমি জানিতাম না, এখনও আমি জানি না। তবু আমি আইনের চক্ষে কোকেনের চোরা ব্যবসায়ী বলিয়া দণ্ডিত। আমার অজ্ঞতাকে পুলিশ এবং বিচারক ন্যাকামি আখ্যা দিয়াছে। এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে মাঝে মাঝে নিজের জন্মরহস্যের কথাও তাহার মনে জাগিত। তাহার মা দেখিতে কেমন ছিল? বিজলী মাসীর মুখের অনুরূপ একটা মুখচ্ছবি তাহার মানসপটে অস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিত, আবার মিলাইয়া যাইত। তাহার মনে হইত তিনি যদি সুযোগ পান লেখাপড়া শিখিবেন, অনেক অর্থ উপার্জন করিবেন, অর্থের জোরে নিজের কলঙ্ককালিমা মুছিয়া ফেলিবেন। একটা নিষ্ফল আক্রোশ তাঁহার মনের মধ্যে অহরহ গুমরাইয়া মরিত। অদম্য উৎসাহ, অবাধ কল্পনা, ভবিষ্যতের আশা একদিকে যেমন তাঁহাকে উদ্দীপ্ত করিত, জেলের প্রাচীর, ওয়ার্ডারদের অকথ্য গালাগালি, জীবনের অনিশ্চয়তা,

জন্মের কলঙ্কিত কাহিনী আবার তেমনি তাঁহাকে অবসন্নও করিত। উপমার সাহায্য লইলে বলিতে হইবে একটা বেলুনকে কে যেন বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, বাঁধন একটু আলগা হইলে উড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু বাঁধন বড় কঠিন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কাহিনীটা যখন তাঁহার চিত্তকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে তখন আর একটি ঘটনা ঘটিল। বকু নামে একটি নূতন কয়েদী আসিয়া হাজির হইল।

বকু বিধুভূষণের সমবয়সী। তাহার সহিত বিধুভূষণের ভাব হইতে বিলম্ব হইল না। একদিন গোপনে বকুর কাহিনী শুনিয়া বিধুভূষণ যুগপৎ রোমাঞ্চিত ও বিস্মিত হইয়া গেলেন। বকু না কি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সহিত জড়িত ছিল! পুলিশ তাহার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পায় নাই। কিন্তু সন্দিগ্ধ পুলিশ তাহার সঙ্গও ছাড়ে নাই। ছায়ার মতো সর্বত্র তাহার অনুসরণ করিয়াছে এবং অবশেষে একটিমিথ্যা চুরির অজুহাতে তাহাকে জেলে পুরিয়াছে। বিধুভূষণ রুদ্ধশ্বাসে বকুর মুখে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সমস্ত বিবরণ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। শুধু একবার শুনিলেন না, বহুবার শুনিলেন। বকুর সহিত গোপনে দেখা হইলে এই গল্প ছাড়া অন্য গল্প হইত না। সূর্য সেন হইতে শুরু করিয়া প্রতিটি বিদ্রোহীর নাম তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গেল। লুণ্ঠনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি এমনভাবে বারবার তাঁহার হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া গেল যেন নিজেই তিনি অকুস্থলে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন এবং স্বচক্ষে সমস্ত ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সুযোগ পাইলেই বকুকে তিনি ওই বিষয়েই নানা প্রশ্ন করিতেন। এমন একজন উৎসাহী জিজ্ঞাসুকে বকুও নিরাশ করিতে চাহিত না, অকপটে সমস্ত কথাই বলিত। বকু নিজে লুণ্ঠন করে নাই, সে লুণ্ঠনকারীদের ফাইফরমাশ খাটিত। কখন কিভাবে সে কাহাকে চিঠি দিয়া আসিয়াছে, কিভাবে খাদ্য সরবরাহ করিয়াছে, দূর হইতে পুলিশ দেখিয়া কি উপায়ে সকলকে সাবধান করিয়াছে এই সকল কাহিনী সে নানাবর্ণে রঞ্জিত করিয়া বিধুভূষণকে শুনাইত। বিধুভূষণ তন্ময় হইয়া শুনিতেন। এইভাবে দিন কাটিতেছিল, এমন সময় জেলে হঠাৎ একটি লোমহর্ষণ কাণ্ড হইয়া গেল। জেলের কতকগুলি কয়েদী জেল-কর্তৃপক্ষদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া জেলারকে হত্যা করিয়া ফেলিল। ভিতরে ভিতরে যে একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছিল তাহা বিধুভূষণ আভাসে টের পাইয়াছিলেন, কিন্তু সহসা তাহা যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগমের মতো এমন ভীষণ আকার ধারণ করিবে তাহা তিনি আন্দাজ করিতে পারেন নাই। এ অবস্থায় যাহা হয় তাহাই হইল। পাগলা ঘণ্টা বাজিল, মিলিটারি আসিল, গুলি চলিল। একশত ছয়জন কয়েদী গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। বকুও মারা গেল সেই সঙ্গে। মিলিটারির সাড়া পাইয়া বিধুভূষণ প্রকাণ্ড একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন, তাই প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন। ইহার পরও তাঁহাকে কয়েকদিন আতঙ্কের মধ্যে কাটাইতে হইল। কারণ কাহারা কাহারা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তাহার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। অনুসন্ধানের জালে আবার অনেকে ধরা পড়িল, বিধুভূষণ কিন্তু বাঁচিয়া গেলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাহাকে অন্য জেলে চলিয়া যাইতে হইল। কর্তৃপক্ষ এই জেলের কয়েদীগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন জেলে পাঠাইয়া দিলেন। হয়তো তাহাদের আশঙ্কা হইয়াছিল যে একসঙ্গে থাকিলে আবার ইহারা ষড়যন্ত্র পাকাইবে।

আলিপুর জেলে আসিয়া তিনি তৃতীয় জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। এইখানেই তিনি প্রথম প্রচার করিলেন যে, তাঁহার আসল নাম বিধুভূষণ। বকুর মুখে তিনি শুনিয়াছিলেন যে বিদ্রোহীদের যে সব ছোকরারা লুকাইয়া সাহায্য করিত তাহাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল বিধুভূষণ। আলিপুর জেলে আসিয়া তাঁহার এক অদ্ভুত সাধ হইল। আলিপুর জেলের অধিবাসীদের নিকট তিনি নিজেকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের একজন সহকারীরূপে পরিচিত করিলেন। বকু যেভাবে ধীরে

ধীরে লুকাইয়া তাঁহাকে সব কথা বলিয়াছিল তিনিও সেইভাবে অপরকে সব কথা বলিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি যেন ক্রমশঃ বকুতে রূপান্তরিত হইয়া গেলেন। তিনি যে মিথ্যাচারণ করিতেছেন ইহা তাঁহার বিবেককে মোটেই পীড়িত করিল না। অশ্বত্থামা যেমন নকল দুগ্ধ পান করিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনিও তেমনি নকল বীরত্বের অভিনয় করিয়া কেমন যেন একটা উন্মাদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামা ভণ্ডামি করেন নাই, বিধুভূষণ করিতেছিলেন। কিন্তু বিবেককে স্তোক দিবার জন্য তিনি একটা অভিনব যুক্তিও খাড়া করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন যে, এতদ্বারা তির্যকপথে তিনি মৃত বকুর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনই করিতেছেন। তাঁহার কাহিনী শুনিয়া কয়েদীদের মধ্যে কেহ বিস্ময়ে, কেহ শ্রদ্ধায়, কেহ প্রশংসায় বিহ্বল হইয়া যখন তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিত তখন তিনি কল্পনা করিতেন যে, যে সম্মান বকুর প্রাপ্য ছিল অথচ সে পায় নাই, তাহাই আহরণ করিয়া তিনি যেন তাহার স্মৃতি-তর্পণ করিতেছেন। কিছুদিন পরে ধীরে ধীরে এ ভাবটা কাটিয়া গেল। এই জেলেই রাখহরি বিশ্বাস, গোপেন পাল, গগন দাঁ, জিৎরাম চুড়িওয়ালার সহিত যখন তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইল তখন তিনি আর বকুর সম্বন্ধে ততটা সচেতন রহিলেন না। মাঝে মাঝে যখন সচেতন হইতেন তখন তাঁহার মন বিরক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত, বিবেক-দংশনে বিক্ষত হইয়া পড়িতেন। বকুর স্মৃতিটা মন হইতে সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হইয়া যাইতেছে না কেন এই ধরনের একটা আজগুবি ক্ষোভও মনের মধ্যে প্রবল হইয়া তাঁহাকে পীড়া দিত। কিন্তু কালই সকল পীড়ার অবসান ঘটায়। কালক্রমে তিনি এ পীড়া হইতেও মুক্ত হইলেন। কালের প্রভাবের সহিত তাহার ইচ্ছাশক্তির যোগাযোগ ঘটাতে ব্যাপারটা আরও সহজ হইয়া গেল। তাঁহার হৃদয়ে বকুর ছবি ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া আসিল। পুরাতন বিবেককে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নূতন বিবেক তাহাতে আরোহণ করিল। জেল হইতে তিনি যখন মুক্ত হইলেন তখন তিনি একজন পুরাদস্তুর স্বদেশসেবী হইয়া পড়িয়াছেন। চাঁদনীতে রাখহরি বিশ্বাস, শ্যামবাজারে গোপেন পাল, বহুবাজারে গগন দাঁ এবং বড়বাজারে জিৎরাম চুড়িওয়ালাও কখনও নিম্নকণ্ঠে, কখনও সাড়ম্বরে পরিচিত মহলে যখন সেকথা প্রচার করিতে লাগিলেন তখন এই অলীক ইতিহাসের বনিয়াদ ক্রমশঃ বেশ পাকা হইতে লাগিল এবং অবশেষে সত্য হইয়া উঠিল। এই ভদ্রলোক-চতুষ্টয়ও স্বদেশীর হিড়িকে জেলে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা এমন একজন বীরের সন্ধান পাইয়া নিজেদের ধন্য মনে করিতে লাগিলেন। কোনও প্রমাণের অপেক্ষা তাঁহারা রাখিলেন না, বিধুভূষণকে শ্রদ্ধার সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার স্তুতিগান করাটাই তাঁহাদের লক্ষ্য হইয়া পড়িল। বিধুবাবু যে একজন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনকারী বীর এ কথা সকলেই সশ্রদ্ধচিত্তে মানিয়া লইলেন। বিধুভূষণের ভবিষ্যৎ জীবনের ভূমিকা কারাপ্রাচীরের অন্তরালেই রচিত হইয়া গেল।

জেল হইতে বাহির হইয়া বিধুভূষণ একটি মেসে আশ্রয় লইয়াছিলেন। উপার্জনের জন্য তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। কারণ গগন দাঁ তাঁহাকে প্রথমে নিজের বিড়ি ফ্যাক্টারিতে ম্যানেজার, পরে অংশীদার করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। এই মেসেই ভূপেশ মজুমদারের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। ভূপেশ তখনও ছাত্রজীবন অতিক্রম করে নাই। প্রাইভেট ট্যুশনি করিয়া অতিকষ্টে তাঁহাকে কলেজের খরচ চালাইতে হইত। অনেক সময় জলখাবারের পয়সা পর্যন্ত জুটাইতে পারিতেন না। সেই দুর্দিনে বিধুভূষণের মহত্ত্ব তাঁহাকে

রক্ষা করিয়াছিল। বিধুভূষণ অকাতরে তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতেন। ভূপেশ প্রথম প্রথম তাহা ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরিশোধের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিধুভূষণের অমায়িকতার জন্য তাঁহার এ চেষ্টা সফল হয় নাই। বিধুভূষণ একমুখ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "ভাই ভূপেশ, আমি ব্যবসায়ী লোক। তুমি ভেবো না যে টাকাটা আমি তোমাকে বিনা স্বার্থে দিচ্ছি।"

"কি স্বার্থ?"

বিস্মিত ভূপেশ প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

"আমাকে কিছু লেখাপড়া শিখিয়ে দাও তুমি, ভাই। দেশের কাজে মেতে ছেলেবেলাটা তো ছারখার হয়ে গেছে। ভেবেছিলাম ফাঁসিকাঠেই ঝুলতে হবে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু ফাঁসিকাঠ এড়িয়ে গেল আমাকে। এখন দেখছি আর পাঁচজনের মতো রোজগার করে খেতে হবে। এ বাজারে ভদ্রভাবে রোজগার করতে হলে লেখাপড়া একটু জানা চাই। বিড়ি ফ্যাক্টারিতেও লেখাপড়া না জানলে চলে না—"

"বেশ, তা দেব।"

ভূপেশ মজুমদারের নিকটই বিধুভূষণ কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন।

এই কাহিনীর সহিত সংশ্লিষ্ট বিষ্ণুচরণের সহিত বিধুভূষণের পরিচয় ঘটে ব্যবসায় সম্পর্কে। বিধুভূষণ অধ্যবসায়, পরিশ্রম এবং অন্যান্য বহুবিধ চারিত্রিক গুণের জন্য অল্পকালমধ্যেই ব্যবসায়ক্ষেত্রে এমন সুনাম ও দক্ষতা অর্জন করিলেন যে তাঁহার কর্মক্ষেত্র আর কলিকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল না। পাটনা, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, ঢাকা এমন কি রেঙ্গুন পর্যন্ত তাহা বিস্তৃত হইয়া পড়িল। শুধু বিড়ি নয়, পাট, ধান, কয়লা, ইষ্টকের ব্যবসায় প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া ব্যবসায়-জগতে তিনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ধন, মান, প্রতিপত্তির সঙ্গে বয়সও বাড়িতে লাগিল। বিষ্ণুচরণের সহিত যখন তাঁহার আলাপ হইল তখন তিনি যৌবন-সীমান্তে পদার্পণ করিয়াছেন। বিষ্ণুচরণ তাঁহার পাটের ব্যাপারী। তিনি বিধুভূষণের জন্য পূর্ববঙ্গে পাট খরিদ করিতেন। যে সম্পর্কের সূত্রপাত ব্যবসায় হইতে, কালক্রমে তাহা এত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল যে, বিষ্ণুচরণ অবশেষে বিধুভূষণের বন্ধু হইয়া পড়িলেন। বিধুভূষণের চরিত্রের ইহাই একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি অতি সহজেই মানুষকে বন্ধুত্ব-বন্ধনে বাঁধিতে পারিতেন। যাহার সহিত যখনই তাঁহার কোন সম্পর্ক ঘটিয়াছে নানা উপায়ে সে সম্পর্কটিকে মধুর না করা পর্যন্ত তিনি যেন তৃপ্তি পান নাই। ব্যবসায় উপলক্ষে যখনই তাঁহাকে ঢাকায় যাইতে হইত, বিষ্ণুচরণের জন্য কিছু-না-কিছু তিনি লইয়া যাইতেন। হয় মুগের ডাল, না হয় কিছু ভাল সন্দেশ, শীতকালে গলদা চিংড়ি, কখনও দুই একখানা শান্তিপুরী শাড়ি কিংবা বিষ্ণুচরণের শিশুপুত্রের জন্য কিছু খেলনা—এই ধরনের ছোটখাটো কিছু না লইয়া গেলে তাঁহার যেন তৃপ্তিই হইত না বিষ্ণুচরণ প্রথম প্রথম মৃদু আপত্তি জানাইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়াতে শেষে আর কিছু বলিতেন না। শুধু বিষ্ণুচরণ নয়, বিষ্ণুচরণের স্ত্রীও বিধুভূষণের অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিষ্ণুচরণের পত্নী শিবানীকে তিনি 'বোনটি' বলিয়া ডাকিতেন এবং সত্যই তাহাকে ছোট ভগ্নীর মতো স্নেহ করিতেন। তাহাকে কাপড় কিনিয়া দিতেন, গহনা গড়াইয়া দিতেন। প্রতি বৎসর ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সময় বিবিধ প্রকার সওগাত-সহ ভাইফোঁটা লইবার জন্য তিনি কলিকাতা হইতে ঢাকা যাইতেন। বিষ্ণুচবণ ঢাকা জেলার লোক

হইলেও বিবাহ করিয়াছিলেন পশ্চিমবঙ্গে। তাহার শ্বশুরবাড়ি ছিল বর্ধমান জেলায়। শিবানীর পিতা সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন না। কোনও এক মহাজনের বাড়িতে খাতালেখার কাজ করিয়া অতিকষ্টে তিনি সংসার চালাইতেন। বিষ্ণুচরণের এক শিক্ষকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। সেই ভদ্রলোক চেষ্টা করিয়া বিষ্ণুচরণের সঙ্গে শিবানীর বিবাহ দেন।

এই শিবানী একদিন তাহার এক দূরসম্পর্কের ভগ্নীর সহিত বিধুভূষণের বিবাহের সম্বন্ধ করিয়া বসিল। বলিল, "দাদা, এবার একটি বৌদি না হলে আর ভাল দেখাচ্ছে না। ভাল একটি মেয়ে আছে, বলেন তো সম্বন্ধ করি।"

বিধুভূষণ আকাশ হইতে পড়িলেন।

"আমাকে মেয়ে দেবে কে! না আছে চাল, না আছে চুলা। একটা আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত নেই।"

"বিয়ের ব্যবস্থা আমি করব, আপনি শুধু মত করুন।"

"বউ এনে রাখব কোথা?"

"বাড়ি ভাড়া করুন। টাকার তো অভাব নেই আপনার, কিনুন না একটা বাড়ি—"

"কোথায় টাকা, ব্যবসাতে সব আটকে আছে—"

কথাটা এইভাবে শুরু হইয়াছিল। বিধুভূষণ প্রথমে গা করেন নাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিবানীর জিদই বজায় রহিল। তাহার পিসতুতো ভগ্নী স্বর্ণলতার সহিত বিধুভূষণের বিবাহ হইয়া গেল। স্বর্ণলতার পিতা প্রমথবাবু দশটি কন্যার পিতা। তিনি বাংলা উপন্যাসাদি পাঠ করিতে ভালবাসিতেন। তারকবাবুর "স্বর্ণলতা" পুস্তক যখন পড়িতেছিলেন তখনই তাঁহার এই কন্যাটির জন্ম হয় বলিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন স্বর্ণলতা। তাহার স্বামীর নামও যে বিধুভূষণ হইবে, ইহা আশা করিতে পারেন নাই। পাত্রের নাম বিধুভূষণ শুনিয়া তিনি পুলকিত হইলেন, আরও পুলকিত হইলেন পণ লাগিবে না শুনিয়া। বস্তুত বিধুভূষণের মতো পাত্র পাইয়া তিনি যেন বর্তাইয়া গেলেন। বিবাহের পূর্বে পাত্রের সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সব খোঁজ করা উচিত, দশটি কন্যার জনক প্রমথ রায় তাহা করা প্রয়োজনই মনে করিলেন না। তাঁহার মনে হইল শিবানী যখন বিধুভূষণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তখন আর কথা কি। বিধুভূষণ বানাইয়া বানাইয়া নিজের কুল ও গোত্রের যে পরিচয় দিলেন তাহা বিশ্বাস করিতে কাহারও বাধিল না, কেন তাহা যাচাইয়া লওয়াও প্রয়োজন মনে করিলেন না। স্বর্ণলতার সহিত বিধুভূষণের একদিন বিবাহ হইয়া গেল।

এ বিবাহ যে বিধুভূষণের জীবনে বিপর্যয় ঘটাইবে তাহা তিনি ভাবেন নাই। কল্পনা করাই অসম্ভব ছিল। একদিন বিধুভূষণ বাড়িতে ফিরিয়া দেখিলেন স্বর্ণলতা নিবিষ্টচিত্তে একটি পত্র পড়িতেছে।

"কার চিঠি—"

"রজত মেসো লিখেছেন—"

বিধুভূষণের বুকের ভিতরটা ধক্ করিয়া উঠিল।

স্বর্ণলতা হাসিয়া বলিল, "আমাদের যেতে লিখেছেন। খবর পেয়েছেন বোধ হয় যে তুমি বড়লোক তাই এখন নিমন্ত্রণ করেছেন। বিয়ের সময় বাবা নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছিলেন উত্তর পর্যন্ত আসেনি—।"

বিধুভূষণ নির্বাক হইয়া গিয়াছিলেন। সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "কোথায় থাকেন এঁরা—"

"বল্লভগঞ্জে। বেশ বড় জমিদার। কিন্তু কি মাতাল আর কি বদমাশ! একটা ছেলে আছে, দেখলে ঘেন্না করে, মানুষ নয় যেন জন্তু—।"

বিধুভূষণের আর সন্দেহ রহিল না।

"তোমার আপন মেসো—?"

"না, দূরসম্পর্কের! রজতবাবু আমার মায়ের এক দূরসম্পর্কের বোনকে বিয়ে করেছিলেন।"

"ও।"

"যদি যাও তো বল, অনেক করে লিখেছেন, দেখ না—"

বিধুভূষণ পোস্টকার্ডখানা হাতে করিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলেন, তাহার পর জোর করিয়া একটু মেকি হাসি হাসিয়া বলিলেন, "পাগল না কি, আমার এখন মরবার ফুরসত নেই—"

আবার একবার জোর করিয়া হাসিলেন, তাহার পর পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। কি সর্বনাশ! যে গ্লানিকর অতীতের সহিত তিনি সমস্ত সম্পর্ক নিশ্চিহ্নরূপে মুছিয়া ফেলিতে চান, যে অতীতকে সম্পূর্ণরূপে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখিবার জন্য তিনি মিথ্যার পর্বত রচনা করিয়াছেন, সেই অতীতের জীবন্ত সাক্ষী এই স্বর্ণলতা। যে ভিত্তির উপর তাঁহার মানসম্ভ্রম, ব্যবসায়-বাণিজ্য, বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব দাঁড়াইয়া আছে এই মেয়েটা তো যে কোন মুহূর্তে সে ভিত্তিকে শিথিল করিয়া দিতে পারে। এ তো সহধর্মিণী নয়, এ যে শত্রু। অতর্কিতভাবে সুড়ঙ্গ পথে আসিয়া হানা দিয়াছে! শিবানীও নিশ্চয় রজতবাবুদের খবর জানে। আত্মীয় যখন, নিশ্চয় জানে! সেই মুহূর্তে তিনি স্থির করিয়া ফেলিলেন আর ঢাকায় যাইবেন না।

"রজত মেসোকে তা হলে লিখে দি আমাদের এখন যাওয়া হবে না, কি বল? তোমার একখানা ফটো চেয়েছেন, আমাদের পেয়ার ফটো তো তোলাব তোলাব করে আর হলই না, চল না তোলাই একদিন—"

বিধুভূষণ পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাহার কথায় জবাব না দিয়া বলিলেন, "একটা জরুরী কাজে আমাকে বাহিরে যেতে হচ্ছে, বুঝলে, ফিরতে হয়তো দেরি হবে—"

বলিয়াই বাহির হইয়া গেলেন। স্বর্ণলতার সান্নিধ্যও তাঁহার পক্ষে অসহ্য বোধ হইতেছিল। ঘর হইতে বাহির হইয়া ফুটপাথ ধরিয়া তিনি হাঁটিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন কলিকাতার পথে পথে হাঁটিয়া অবশেষে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন সম্মুখেই যে হোটেলটা দেখিতে পাইলেন তাহাতে ঢুকিয়া পড়িলেন। রাত্রেও যখন বিধুভূষণ ফিরিলেন না, তখন স্বর্ণলতা ভাবিল জরুরি কাজের জন্য তিনি কলিকাতার বাহিরেই বোধ হয় চলিয়া গিয়াছেন।

ইহাতে স্বর্ণলতা বিশেষ চিন্তিত হইল না। বিধুভূষণ মাঝে মাঝে দীর্ঘকালের জন্য বাহিরে চলিয়া যাইতেন। সে পুরাতন ভৃত্য মধুর তত্ত্বাবধানেই দিন কাটাইতে লাগিল। বিধুভূষণ কিন্তু কলিকাতা ত্যাগ করেন নাই, সেই হোটেলেই তিনি আত্মগোপন করিয়াছিলেন। একাকী হোটেলের একটা ঘরে বসিয়া তিনি চিন্তা করিতেছিলেন কি করা উচিত। ইহা লইয়া হৈ-চৈ করিলে যে সব পণ্ড হইয়া যাইবে তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। ব্যাপারটাকে নিঃশব্দে অঙ্কুরেই

বিনাশ করিতে হইবে। কিন্তু কিরূপে তাহা সম্ভব? এ সম্বন্ধে অন্য কাহারও সহিত পরামর্শ করাও যায় না। বিধুভূষণ হোটেলের ঘরে একা বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল এ সমস্যার যদি তিনি সমাধান করিতে না পারেন তাহা হইলে এতদিন এত কষ্ট করিয়া যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন সব রসাতলে যাইবে। মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হইতেছিল স্বর্ণলতাকে সমস্ত কথা অকপটে খুলিয়া বলিলে কেমন হয়? তাহারও ভবিষ্যৎ তো ইহার সহিত জড়িত। কিন্তু তখনই মনে হইতেছিল—মেয়েমানুষ, অল্প বয়স, এই ভয়ঙ্কর সত্যের সম্মুখীন হইয়া সে মাথা ঠিক রাখিতে পারিবে কি? না, পারা সম্ভব নয়। পণ্ডিত চাণক্যেব সতর্কবাণী মনে পড়িল। স্ত্রী-জাতিকে বিশ্বাস নাই। মনে পড়িল কত লোকের কাছে তিনি সাড়ম্বরে চট্টগ্রাম-সংক্রান্ত বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, মনে পড়িল ইহার জোরে কত বড়লোকের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া তিনি ফটো তুলাইয়াছেন। স্বর্ণলতা যদি সত্যটা পবিপাক করিতে না পারে, সব মাটি হইয়া যাইবে। যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন ততই স্বর্ণলতাকে একটা ভয়ঙ্কর শত্রু বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বিবাহ করিয়া এ কি ভীষণ প্যাঁচে তিনি পড়িয়া গেলেন? কিন্তু যেমন করিয়াই হোক প্যাঁচ তাঁহাকে খুলিতেই হইবে। স্বর্ণলতার মুখটা কোন উপায়ে বন্ধ করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। রজতবাবুরা তাহাকে লইয়া মাথা ঘামাইবেন না, তাহার কথা হয়তো তাঁহারা এতদিনে ভুলিয়াও গিয়াছেন। বিজলী মাসী নিশ্চয় এতদিন বাঁচিয়া নাই। জয়ন্তীবাবু এবং ঝক্‌সু মিঞা উভয়েরই জেল হইয়া গিয়াছে। জয়ন্তীবাবু নাকি মারাও গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কেহ যদি কোনদিন তাঁহাকে চিনিয়াও ফেলে তাহাকে ধাপ্পা দেওয়া অসম্ভব হইবে না। তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, সে ভুল করিয়াছে। কারণ, প্রথমতঃ একজনের সহিত আর একজনের চেহারার সাদৃশ্য থাকা অসম্ভব নহে, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার নাম বিধুভূষণ, ভূতো নয়। কিন্তু নিজের স্ত্রীর সহিত এ সব চালাকি কতদিন চলিবে? বজতবাবুদের সহিত যখন উহার আত্মীয়তা আছে, তখন কোন-না-কোন সূত্রে সমস্ত কথা একদিন প্রকাশ হইয়া পড়িবেই। বিধুভূষণ যে একদিন 'পাঁঠা' নামে অভিহিত হইতেন এ সত্যকে কিছুতেই চাপা দেওয়া যাইবে না। না, ইহার একটা প্রতিকার করিতেই হইবে।

...কয়েকদিন চিন্তা করিয়া অবশেষে বিধুভূষণ বাড়ি ফিরিলেন। ফিরিয়া দেখিলেন স্বর্ণলতা জ্বরে শয্যাগত হইয়া রহিয়াছেন। তাহার একটু আশা হইল। ভাবিলেন ভগবান হয়তো দয়া করিবেন। যদি অসুখেই মারা যায় তাহাকে আর বিশেষ কিছু হাঙ্গামা করিতে হইবে না। কিন্তু এ আশা শেষ পর্যন্ত সফল হইল না। স্বর্ণলতা মরিল না, ভুগিতে লাগিল। পুরা এক বৎসর ধরিয়া ভুগিল। স্ত্রী অসুখে পড়িলে একেবারে বিনা চিকিৎসায় রাখা যায় না। বিধুভূষণ পাড়ার একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে ডাকিলেন। তাহার ঔষধগুণেই হউক বা স্বাভাবিক নিয়মবশতই হউক স্বর্ণলতা কিছুদিন ভাল থাকিত, তারপর জ্বরে পড়িত। এইভাবে ছয় মাস কাটিল। সংবাদ পাইয়া স্বর্ণলতার পিতা একদিন আসিলেন। বলিলেন, "একজন ভালো কাউকে ডাক না—"

বিধুভূষণ উত্তর দিলেন, "অ্যালোপ্যাথির উপর তেমন বিশ্বাস নেই আমার। যদি বলেন, কবিরাজ ডাকতে পারি।"

"তাই ডাক।"

কবিরাজ আসিলেন। কিন্তু তিনিও বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারিলেন না। কয়েকদিন থাকিয়া স্বর্ণলতার পিতা দেশে ফিরিয়া গেলেন। সেখান হইতে একটা ঠিকানা দিয়া পত্র

লিখিলেন—"এই ঠিকানায় একজন ভাল অবধূত আছেন শুনেছি, তিনি অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি ভাল করেছেন। তাঁকে একবার দেখিও—"

তিনি আসিলেন এবং দেখিলেন। জ্বরের কিন্তু উপশম হইল না। চিকিৎসা চলিতে লাগিল। বাড়ির মালিক বিধুভূষণ কিন্তু পারতপক্ষে বাড়িতে থাকিতেন না। তাঁহার ভয় হইত হঠাৎ যদি রজতবাবুদের বাড়ির কেহ আসিয়া পড়ে! ঝি এবং চাকরই স্বর্ণলতার তত্ত্বাবধান করিত। বিধুভূষণ রাত্রে তাহার কাছে পর্যন্ত শুইতেন না। গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া তিনি মধুকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কেউ এসেছিল?" যদি আশঙ্কাজনক কোন উত্তর পাইতেন তাহা হইলে বাড়িতে শুইতেনও না। কোনও কাজের ছুতায় তৎক্ষণাৎ বাহিরে চলিয়া যাইতেন। ভয়ের কিছু না থাকিলে নীচের ঘরটিতে শুইয়া পড়িতেন। এইভাবেই চলিতেছিল। স্বর্ণলতার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাইতে লাগিল। স্বর্ণলতার পিতা পুনরায় আসিলেন এবং তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে একজন অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারকে ডাকিতে হইল। তিনি কিছুদিন ঘটা করিয়া চিকিৎসা করিলেন। বিধুভূষণের ভয় হইয়া গেল। শেষ পর্যন্ত ভাল করিয়া না তোলে! যে রকম রেটে ইনজেক্‌শন দিতেছে তাহাতে মরা মানুষের উঠিয়া বসিবার কথা। ডাক্তারবাবু কিন্তু শেষে জবাব দিলেন।

বলিলেন, "কোলকাতায় এ অসুখ সারবে না, আপনি ওঁকে নিয়ে চেঞ্জে যান। পাহাড়ই ভাল হবে ওর পক্ষে। দার্জিলিং গিয়ে থেকে আসুন না কিছুদিন—"

বিধুভূষণ দার্জিলিং গেলেন। উঠিলেন একটা হোটেলে। একটা সঙ্কল্প করিয়াই তিনি গিয়াছিলেন। সুতরাং হোটেলে নিজেকে যোগজীবন নামে পরিচিত করিলেন। সঙ্কল্পকে কার্যে পরিণত করিতে হয়তো দুই একদিন বিলম্ব হইত। কিন্তু একটি ঘটনা ঘটাতে তাঁহার আর তর সহিল না। বিধুভূষণ বাজার হইতে ফিরিয়া একদিন দেখিলেন স্বর্ণলতা চিঠি লিখিতেছে।

"কাকে চিঠি লিখছ?"

"রজত মেসোকে।"

বিধুভূষণের চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত হইয়া গেল। "রজত মেসোকে? হঠাৎ!"

"কনকদার একবার এইরকম জ্বর হয়েছিল। কিছুতেই সারছিল না, শেষকালে ইউনান সাহেবের ওষুধে ফল হল। আজ কথাটা মনে পড়ল হঠাৎ। কোলকাতায় মনে পড়লে হয়তো সেরেই যেতাম এতদিন। রজত মেসোকে তাই লিখছি যদি ওষুধের নামটা লিখে পাঠান, কিংবা ইউনান সাহেবের ঠিকানা দেন। এই হোটেলের ঠিকানাটা কি বল তো—"

"তুমি লেখা শেষ কর। একটু জায়গা রেখ, ঠিকানা আমি লিখে দেব।"

স্বর্ণলতার লেখা শেষ হইতেই বিধুভূষণ চিঠি হস্তগত করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

হোটেলে আর একটি ঘটনাও ঘটিয়াছিল। ঘটনাটির গুরুত্ব বিধুভূষণ তখন উপলব্ধি করেন নাই, পরে করিয়াছিলেন। ঘটনাটি এই। বিধুভূষণের হোটেলে আর একটি অদ্ভুত প্রকৃতির লোকও আসিয়া উঠিয়াছিলেন। লোকটির চাল-চলন, কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ বড়লোকের মতো। চোখে রঙীন চশমা, মুখে হাভানা সিগার, অনামিকায় হীরার আংটি, অঙ্গে দামী স্যুট। ইনি বিধুভূষণের অন্তরে প্রথম প্রথম বেশ সম্ভ্রমও সঞ্চার করিয়াছিলেন। ভদ্রলোক কাহারও সহিত বড় মিশিতেন না, একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার অদ্ভুত মুদ্রাদোষও ছিল একটা। আপনমনেই হাসিতেন, আপনমনেই মাথা নাড়িতেন। কেহ কাছাকাছি আসিলেই গম্ভীর হইয়া যাইতেন সঙ্গে সঙ্গে। এমনভাবে তাঁহার দিকে চাহিতেন, যাহার অর্থ—তুমি এখানে কি করছ,

সরে যাও। লোকটিকে দেখিলেই বিধুভূষণের একটা অস্বস্তি হত। সুতরাং একদিনও তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার চেষ্টা করেন নাই। লোকটিও আলাপী ছিলেন না, হোটেলে কমই থাকিতেন। সমস্তক্ষণ বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন তিনি। বাহিরেই মাঝে মাঝে বিধুভূষণের সহিত হঠাৎ তাঁহার দেখা হইয়া যাইত। বিধুভূষণ কখনও দেখিতে পাইতেন চলাচলের পথ হইতে একটু দূরে তিনি একটি উচ্চ প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া সঞ্চরমাণ মেঘের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন এবং মাঝে মাঝে তুড়ি দিতেছেন। মুখ গম্ভীর। মনে হইত মুখ নয়, যেন মুখোশ। দুই একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে ঝোপের অন্তরালে তাঁহাকে আবিষ্কার করিয়া বিধুভূষণ বিস্মিত হইয়া গিয়াছেন। ভদ্রলোকের চাল-চলন, ধরনধারণ, মতিগতি, উদ্দেশ্য কিছুই বোঝা যাইত না। মাঝে মাঝে বিধুভূষণের এ সন্দেহও হইত যে, ভদ্রলোক হয়তো তাঁহারই গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছেন। কারণ যখনই তিনি স্বর্ণলতাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন কোথাও-না-কোথাও ইহার সহিত দেখা হইয়া যাইত। মনে হইত লোকটা যেন ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল। বিধুভূষণ শঙ্কিত হইয়া পড়িতেন, কারণ তাঁহার বিবেকে গলদ ছিল। মাঝে মাঝে অযৌক্তিকভাবে এ কথাও তাঁহার মনে হইত—বকুর কোন আত্মীয় নয় তো! যথাসাধ্য তিনি ভদ্রলোককে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন।

স্বর্ণলতা তাহার রজত মেসোকে যে চিঠিখানি লিখিয়াছিল সেটি ডাকে ফেলিয়া দিবার ছুতায় বিধুভূষণ যখন বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, তখন কেহ তাঁহার মানসিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে দেখিত যে তাঁহার সমস্ত সত্তাকে ঘিরিয়া উনপঞ্চাশ পবন তাণ্ডবনৃত্য করিতেছে। সেই তাণ্ডবনর্তনে তাঁহার বিবেক বিপর্যস্ত, পাপপুণ্যবোধ অন্তর্হিত। যে ভয়ঙ্কর সঙ্কল্প তাঁহার মনে বাসা বাঁধিয়াছিল তাহাই যেন এ বিপদে তাঁহাকে কেবল আশ্বাস দিতেছে।

খানিকক্ষণ পরে ফিরিয়া স্বর্ণলতাকে তিনি বলিলেন, "আজ অতি চমৎকার জিনিস দেখে এলাম একটা"—

"কি—"

স্বর্ণলতা সোৎসুকে প্রশ্ন করিল।

"পাহাড়ী স্থলপদ্ম।"

"কোথায়?"

"ওই যে-দিক দিয়ে আমরা বেড়াতে যাই, রাস্তার বাঁকে সেই যে প্রকাণ্ড গর্তটা আছে, সেই গর্তের তলায় ফুটেছে ফুলগুলো। চমৎকার ফুল—"

"গর্তের তলায় ফুটেছে? সে তো অনেক নিচুতে, আমি কি পারব?"

"নামা যাবে না, উঁকি মেরে দেখতে হবে।"

"অত নিচু গর্তের ভিতর ফুল তুমি দেখতে পেলে কি করে? আমার চোখে তো একদিনও পড়েনি। রোজই তো যাচ্ছি।"

বিধুভূষণ মনে মনে ক্ষণকালের জন্য বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সামলাইয়া লইতেও তাঁহার বিলম্ব হইল না।

"আমি দেখতে পাইনি। একজন পাহাড়ী আমাকে দেখিয়ে দিলে। আজ দেখাব তোমাকে। চল না একটু পরেই বেরোন যাক।"

"বেশ।"

একটু পরেই স্বর্ণলতাকে লইয়া বিধুভূষণ বেড়াইতে বাহির হইলেন। ফিরিলেন একা। দ্রুতপদে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিলেন। এ রকমটা যে ঘটিতে পারে তাহা তো তিনি কল্পনাও করেন নাই, কি সর্বনাশ! লোকটা দেখিয়াছে কি? নিশ্চয়ই দেখিয়াছে তাহা না হইলে ও কথা বলিয়া উঠিল কেন? স্বর্ণলতাকে যখন তিনি সেই অতলস্পর্শ গহ্বরটায় ঠেলিয়া দিতেছিলেন তখন কে যেন বলিয়া উঠিল—"আরে!" বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ বিধুভূষণ ঘাড় ফিরাইয়াছিলেন। যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাতে ক্ষণিকের জন্য তাঁহার চক্ষুস্থির হইয়া গিয়াছিল। দেখিয়াছিলেন দূরের একটা ঝোপের ভিতর হইতে সেই রঙীন চশমা-পরা ভদ্রলোক মুণ্ডু বাড়াইয়া রহিয়াছেন। বিধুভূষণ ওরফে যোগজীবন আর ফিরিয়া চাহেন নাই।

দ্রুতগতিতে ফিরিয়া নিজের জিনিসপত্র গুছাইয়া হোটেলের হিসাব চুকাইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি দার্জিলিং ত্যাগ করিলেন।

দার্জিলিং ত্যাগ করিয়া বিধুভূষণ কলিকাতা যান নাই। এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডের পর পরিচিত পরিবেশে ফিরিয়া যাইবার সাহস ছিল না তাঁহার। তিনি নেপালের দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন। শোনা যায় এই সময়ে তিনি কস্তুরী ও চামরের ব্যবসায়ে নিজেকে লিপ্ত করিয়াছিলেন। নেপালী ব্যবসায়ীদের সহিত ভাব করিয়া তিনি নাকি কস্তুরী ও চামর খরিদ-বিক্রি করিতেন। সে যাই হোক, অবশেষে তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিতেই হইল, কারণ কলিকাতাই তাঁহার প্রধান কর্মকেন্দ্র। ফিরিলেন মাসতিনেক পরে। ফিরিয়া সকলের কাছে প্রচার করিলেন যে বহু চেষ্টা করিয়াও প্রিয়তমা পত্নী স্বর্ণলতাকে তিনি বাঁচাইতে পারেন নাই। তাঁহার জন্য নেপালে গিয়া তিনি বাবা পশুপতিনাথের নিকট ধর্না পর্যন্ত দিয়াছিলেন কিন্তু বাবা দয়া করেন নাই। এ বার্তায় কেহ বিস্ময়বোধ করিলেন না। স্বর্ণলতা যে অনেক দিন হইতেই অসুস্থ এ সংবাদ অনেকেই জানিতেন। বিষ্ণুচরণের পত্নী শিবানী প্রশ্ন করিয়া হয়তো বিধুভূষণকে বিব্রত করিতে পারিতেন কিন্তু সে সুযোগই মিলিল না। কারণ ঠিক সেই সময় রাজনৈতিক দাবাখেলার চালে বাঙালীরা মাৎ হইয়া গেলেন। বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হইল, মুসলমান গুণ্ডাদের হস্তে শিবানী নিহত হইলেন। শিবানী বাঁচিয়া থাকিলেও স্বর্ণলতার মৃত্যুর প্রকৃত খবরটা জানিতে পারিতেন না, কারণ বিধুভূষণ তাঁহাকে সে সুযোগ দিতেন কিনা সন্দেহ।

শিবানীর মৃত্যুসংবাদ বিধুভূষণ অনেকদিন পান নাই। কারণ কলিকাতায় ডাইরেক্ট অ্যাকশন শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় তাঁহাকে কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। স্বর্ণলতার মৃত্যু লইয়া তাঁহার বিবেক তাঁহাকে হয়তো কিছুকাল বিরক্ত করিত; কিন্তু ডাইরেক্ট অ্যাকশনের বীভৎসতায় বিবেক হতভম্ব হইয়া গেল। প্রতিদিন নৃশংস মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া শুনিয়া তাঁহার স্বকৃত নৃশংসতাটা তাঁহার কাছে সামান্য একটা ছেলে-খেলা বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

কলিকাতা ত্যাগ করিয়া তিনি মজঃফরপুরে জগৎরাম ভেড়িওয়ালার নিকট চলিয়া গেলেন। জগৎরাম তাঁহার প্রাক্তন বন্ধু জিৎরামের আত্মীয়। সেই সূত্রেও বটে, ব্যবসার সূত্রেও বটে, জগৎরামের সহিত বিধুভূষণের বেশ একটা হৃদ্যতা ছিল। দার্জিলিং যাইবার কিছু পূর্বে তিনি তাঁহার সহিত মজঃফরপুরে এবং কলিকাতায় উভয় স্থানেই গোলদারি ব্যবসাও আরম্ভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার আকাশে মেঘ, বজ্র, বিদ্যুৎ দেখিয়া তিনি কংগ্রেস-শাসিত হিন্দুপ্রধান মজঃফরপুরে চলিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। তিনি শুধু সেখানে গেলেন না, বেশ কিছুদিন বসবাসও করিলেন। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে তখন পাশবিকতার যে ঝঞ্ঝা বহিতেছিল,

বিহারেও যে তাহার ঝাপটা লাগে নাই তাহা নয়, কিন্তু হিন্দু বিধুভূষণের পক্ষে ভয়ের কিছু ছিল না। আর একটা কাণ্ড করিয়া তিনি নিজের নিরাপত্তা দৃঢ়ভূত করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার পূর্বপরিচিতদের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন তাঁহাদের মনে হইয়াছিল যে পত্নীর অকালমৃত্যুতে হয়তো বিধুভূষণের অন্তরে বৈরাগ্য সঞ্চারিত হইয়াছে, মাথায় কদমছাঁট চুল, গলায় তুলসীর মালা, পরিধানে খদ্দরের গেরুয়া ফতুয়া, খদ্দরের গেরুয়া কাপড়, চোখেমুখে একটা বিনীত আত্মসমাহিত ভাব—এ মূর্তি দেখিলে উক্ত ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। পত্নীর কথা উল্লেখ করিলে তাহার নয়নপল্লব আর্দ্র হইয়া উঠিত, পারতপক্ষে সেইজন্য কেহ তাহা উল্লেখ করিতেন না। মোট কথা, সেই সময় বিধুভূষণ পরিচিতমহলে সকলের মনে বেশ একটা সম্ভ্রম উদ্রিক্ত করিয়াছিলেন। মুসলমানদলনের জন্য গোপনে গোপনে উৎসাহী হিন্দু যুবকদের অর্থসাহায্য করাতে সে সম্ভ্রম অচিরে শ্রদ্ধায় পরিণত হইয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিল—"বিদ্দুবাবু তো মোহন্তজী হ্যায়। স্বয়ং রামদাস হ্যায়।" প্রত্যুত্তরে বিধুভূষণ কেবল বিনীত হাসি হাসিতেন। এই দুই তিন বৎসরে (মানে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে) তিনি কেবল শ্রদ্ধাই নয়, অর্থোপার্জনও করিয়াছিলেন। বিপুল অর্থ। চাল, ডাল, নুন, তেলের কারবারে জগৎরামজির সহায়তায় সাদাবাজারে এবং কালোবাজারে এই সময়ে যে পরিমাণ অর্থ তিনি উপার্জন করিয়াছিলেন তাহার অঙ্ক না কি লক্ষের কোঠায়।

জনশ্রুতি যে এই সময়েই নাকি তিনি কলিকাতার বৃহৎ বাড়িখানি কিনিয়াছিলেন। এই সময় দিল্লীর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিতও তাঁহার পরিচয় ঘটে। কালোবাজারে ফলাও ব্যবসায় করিতে গেলে অনেক পদস্থ অফিসারের মনোরঞ্জন করিতে হয়, না করিলে ব্যবসায় অচল হইয়া পড়ে। ব্যবসায় চালু রাখিবার দক্ষতা বিধুভূষণের ছিল।

খুন, জখম, লুঠতরাজের ডামাডোল কমিবার পর বিধুভূষণ পুনরায় সাবেক স্বাভাবিকবেশে কলিকাতায় ফিরিলেন। যে বাড়িটি কিনিয়াছিলেন তাহা আসবাবপত্র কিনিয়া সাজাইলেন, টেলিফোন লইলেন, রেডিও কিনিলেন। অর্থাৎ বেশ গুছাইয়া বসিলেন।

মজঃফরপুরে থাকিতেই তিনি খবর পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রাক্তন ব্যবসায়ী বন্ধুদের মধ্যে জিৎরাম চুড়িওয়ালার ব্যবসাটাই চালু আছে। বাঙালী তিনজনের ব্যবসা উঠিয়া গিয়াছে। দেখিলেন রাখহরি বিশ্বাসের চাঁদনীর দোকানটি জনৈক কচ্ছির কবলে। ঋণে জর্জরিত রাখহরি বর্ধমান জিলাস্থ পৈতৃক ভিটায় পালাইয়া আত্মগোপন করিয়া আছেন। ডাইরেক্ট অ্যাকশানে গোপেন পাল মারা গিয়াছেন। তাঁহার ব্যবসাও উঠিয়া গিয়াছে। তাঁহার নাবালক পুত্র এবং বিধবা তাঁহাদের প্রাক্তন গৃহশিক্ষক পরেশ মল্লিকের রক্ষণাবেক্ষণে কোনক্রমে দিনপাত করিতেছে। অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়াছে গগন দাঁর! তিনি তাঁহার সাবেক ব্যবসায় উঠাইয়া দিয়া রিফিউজি-সমস্যা সমাধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। মন্ত্রীদের সহিত দেখা করিতেছেন, কাগজে কাগজে প্রবন্ধ লিখাইতেছেন, মাঝে মাঝে বিক্ষোভপ্রদর্শনকারী শোভাযাত্রা পরিচালনা করিতেছেন, পার্কে পার্কে বক্তৃতা দিতেছেন, দুই তিনটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদককে প্রায় হস্তামলকবৎ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার আপ্যায়নে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা বড় বড় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ-রচনায় ব্যাপৃত হইয়াছেন। স্বদেশী ব্যাপারে মাতিয়া গগন দাঁ একবার জেল খাটিয়াছিলেন এই ঘটনাটিকে মূলধন করিয়া তিনি চতুর্দিকে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছেন যে বাস্তুহারাদের জন্য প্রয়োজন হইলে পুনরায় তিনি জেলে যাইতে প্রস্তুত আছেন। গভর্নমেন্ট যতক্ষণ না

বাস্তুহারাদের জন্য সুব্যবস্থা করিতেছেন ততক্ষণ তিনি আন্দোলন চালাইতে থাকিবেন। বিধুভূষণ তাঁহার রকম-সকম দেখিয়া একটু ঘাবড়াইয়া গেলেন। এ জাতীয় ব্যাপারে তিনি পারদর্শী ছিলেন না। গগন দাঁর সহিত যুক্ত হইয়া যে বিড়ি ব্যবসায়টিতে তিনি লিপ্ত ছিলেন তাহা লুপ্ত হওয়াতে তিনি একটু ম্রিয়মাণই হইয়া পড়িলেন, কারণ ব্যবসায়টি সত্যই বেশ লাভজনক ছিল। অবোধ লোকেরা যে পয়সাগুলি বিড়ি ফুঁকিয়া উড়াইয়া দিত তাহারা গিয়া নীড় বাঁধিত দাঁ মল্লিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের খাতায়! গগন দাঁ হঠাৎ এ কি কাণ্ড করিয়া বসিল!

বিধুভূষণ গগন দাঁর সহিত একদিন গিয়া সাক্ষাৎ করিলেন রাত্রি দশটার পর। দিনের বেলায় গগনের নাগাল পাওয়া কঠিন। নাগাল যদি পাওয়া যায়, আলাপ করিবার সুযোগ ঘটে না। বিধুভূষণ একদিন গিয়া দেখিলেন কয়েকজন ফটোগ্রাফার লইয়া গগন রেফিউজিদের ফটো তুলাইতেছে। এত ব্যস্ত যে ভিড়ের মধ্যে বিধুভূষণকে দেখিতে পর্যন্ত পাইল না। দ্বিতীয় দিন আর এক কাণ্ড! একদল যুবক-যুবতী গগনকে ঘিরিয়া রহিয়াছে এবং রেফিউজিদের সম্বন্ধে সংগৃহীত কাহিনী শুনাইতেছে। নিকটে একজন বসিয়া শর্টহ্যাণ্ডে সেগুলি টুকিয়া লইতেছে। দ্বিতীয় দিন অবশ্য গগন বিধুভূষণকে দেখিতে পাইল এবং উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

"আরে, আপনি কবে ফিরলেন! আপনার মতো লোকেরই যে দরকার এখন। আপনাকেই খুঁজছি আমি। ঠিকানাটাও রেখে যাননি যে একটা চিঠি লিখি। বসুন, বসুন—। কবে ফিরলেন?"

উপবেশন করিয়া বিধুভূষণ বলিলেন, "ফিরেছি কিছুদিন হল।"

"এইবার লেগে পড়ুন আবার আমার সঙ্গে। বাঙালী জাতটা যে মরে গেল মশাই।"

বিধুভূষণ এতদুত্তরে কি বলা উচিত ভাবিয়া না পাইয়া একটা গোল উত্তর দিলেন।

"তাতো দেখতেই পাচ্ছি।"

"ভিড়ে যান আমার সঙ্গে। সরে থাকলে চলবে না।"

মুখে একটা গদগদ অথচ সলজ্জ হাসি ফুটাইয়া বিধু ঘাড় চুলকাইতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আপনার সঙ্গে তো বরাবর ভিড়েই আছি। যা বলবেন করব। কখন আসব বলুন।"

গগন দাঁ পট করিয়া পকেট হইতে একটি ডায়েরি বাহির করিয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল। একটি পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল, কিছুক্ষণ সে পাতাটি ভ্রূকুঞ্চনসহকারে নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর বলিল, "পরশু রাত দশটায় আসুন। রাত্রে আপনার নিমন্ত্রণ রইল। খাবেন আমার বাড়িতে। সেই সময়েই আলোচনা হবে।"

খবরটি ডায়েরিতে লিখিয়া লইল। বিধুভূষণ লক্ষ্য করিলেন গগনের চালচলন আগে ঢিলা-ঢালা ছিল, এখন বেশ আঁটসাট হইয়াছে। একটু বিস্মিত হইলেন, মজাও লাগিল।

নির্দিষ্ট তারিখে রাত্রি দশটার পর বিধুভূষণ হাজির হইলেন। খাইতে বসিয়া লক্ষ্য কবিলেন যে আহারের ব্যাপারেও গগন যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। পূর্বেও তিনি গগনের বাড়ি নিমন্ত্রণ খাইয়াছেন। কিন্তু বড়ি, পোস্ত, কলাইয়ের ডাল, মৌরলা মাছের ঝাল বা অম্বল, দুই একটা ভাজাভুজি, একটু দই বা রাবড়ি—এই ধরনের খাদ্য ছাড়া অন্য কিছু খাইয়াছেন বলিয়া মনে পড়িল না। পোলাও, পাকা মাছের কালিয়া, মটন, ভেটকি মাছের ফ্রাই, উৎকৃষ্ট সামি কাবাব, ফ্রেঞ্চ কাটলেট, পুডিং, ফ্রুটস, তা ছাড়া শ্রদ্ধেয় ভীম নাগ, দ্বারিক, সেন মহাশয় প্রভৃতি মিষ্টান্ন-মনীষিগণের সমাবেশ—বিধুভূষণ রীতিমত ঘাবড়াইয়া গেলেন। সহসা কোন থার্মোমিটারকে

গরম জলে ডুবাইয়া দিলে তাহার পারাটা যেমন দ্রুতগতিতে উপরের দিকে উঠিতে থাকে, বিধুভূষণের অন্তরে গগন দাঁর প্রতি সম্ভ্রমও তেমনি দ্রুতগতিতে বাড়িয়া গেল। আহারাদির পর সুগন্ধি তাম্বুল চর্বণ করিতে করিতে গগন আসল প্রসঙ্গটির অবতারণা করিল।

"দেখুন বিধুবাবু, দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে, যে স্বাধীনতার জন্য আপনি আমি প্রাণ তুচ্ছ করেছিলাম সেই স্বাধীনতা এখন আমরা পেয়েছি। এখন আমাদের কি বিড়ির ব্যবসা করা সাজে? এখন এমন একটা কিছু করতে হবে যা দেশহিতকর—"

চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনকারী বিধুভূষণকে বলিতেই হইল, "সে তো নিশ্চয়ই। বিড়িটা স্বদেশী বলেই—"

গগন দাঁ বিধুভূষণের বাক্য সম্পূর্ণ হইতে দিল না। বলিল, "অনিষ্টকর স্বদেশী জিনিসের সংস্রবও ত্যাগ করতে হবে আমাদের। বিড়িতে ফুসফুস নষ্ট করে। দেশের ফুসফুস জখম করা কি আমাদের সাজে? আদর্শ স্থাপন করবার দায়িত্ব যে আমাদের।"

বড় বড় সাধকেরা যেমন অন্যমনস্ককারী পরিস্থিতির মধ্যেও ধ্রুব সত্যটাকে বিস্মৃত হন না, বিধুভূষণও তেমনি সত্যটি বিস্মৃত হইলেন না। সেইদিকেই গগন দাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ঈষৎ কাশিয়া মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু রোজগারও তো করতে হবে—"

"নিশ্চয়। কিন্তু ভাল কাজ করেও ভাল রোজগার করা যায়। আসুন, আপনাকে সব খুলে বুঝিয়ে দিচ্ছি। তলিয়ে বুঝুন ব্যাপারটা—"

ইহার পর গগন দাঁ হঠাৎ নিম্নকণ্ঠ হইয়া গেল এবং তাকিয়াটা কোলের উপব টানিয়া লইয়া বিধুভূষণের কর্ণকুহরে চুপি চুপি তাহাই বলিল যাহা বিধুভূষণ বুঝিতে চাহিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে ব্যাপারটা তাঁহার নিকট কাঁচের মতো স্বচ্ছ হইয়া গেল। গগন দাঁর সম্বন্ধে সম্ভ্রম আরও বাড়িল। বস্তুত তিনি মুগ্ধই হইয়া গেলেন। দেশহিতের সহিত অর্থাগমের যে এমন একটা রাজযোটক সম্বন্ধ হইতে পারে তাহা তাঁহার ধারণাই ছিল না।

একটু হাসিয়া বলিলেন, "ভিতরে ভিতরে যে এত ব্যাপার আছে তা বুঝিনি।"

গগন দাঁ উদ্দীপ্তকণ্ঠে বলিল, "আপনি সরল মানুষ, তাই বোঝেননি। এটা তো সোজা কথা যে এতগুলি রিফিউজিকে এদেশে ভদ্রভাবে বসবাস করাতে গেলে গভর্নমেন্টকে অনেক রুধিরপাত করতে হবে। তাদের জমি দিতে হবে, বাড়ি দিতে হবে, রোজগারের সুযোগ দিতে হবে, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে হবে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হবে এতে। গভর্নমেন্ট যাদের উপর এ সবের ভার দেবেন তাদের হাত দিয়েই খরচ হবে টাকাগুলো। হবে কিনা বলুন—"

বিধুভূষণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু দুটিও হাসিতেছিল। তিনি ঘাড় কাৎ করিয়া স্বীকার করিলেন, "হবে।"

"আমরাই চেষ্টা-চরিত্র করে সে ভার নিই, আসুন না। একটা সৎকাজ করাও হবে, রোজগারও হবে। এ রোজগারের তুলনায় বিড়ির ব্যবসা একটা ছেলেখেলা মাত্র। আপনি নামুন এতে—"

"আমাকে কি করতে হবে বলুন! এ সবের ঘাঁতঘোঁৎ তো আমার একেবারেই জানা নেই।"

"আপনার জানবার দরকারও তো নেই, আমি যখন আছি। আপনি নেপথ্যে থাকুন, যা করবার আমিই করব। বক্তৃতা করে হোক, কাগজে লিখে হোক, ঘুষ দিয়ে হোক, ধমক দিয়ে

হোক, খোশামোদ করে হোক, যেমন করে হোক, আমি আপনাকে কনট্রাক্ট পাইয়ে দেব, আপনি কাজ করে যাবেন। আপনার সঙ্গে আমার আধাআধি বখরা থাকবে শুধু—"

"এ কাজে তো অনেক টাকা চাই।"

"খুব বেশি নয়। হাজার পঁচিশেক নিয়ে আরম্ভ করুন, তারপর মাছের তেলেই মাছ ভাজবেন। আপনি পাকা লোক, আপনাকে আর বেশি কি বলব—"

গগন মুচকি হাসিয়া ভ্রূযুগল ঈষৎ নাচাইল। বিধুভূষণ ঘাড় হেঁট করিয়া ঘাড়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ব্যাপারটি ভাল করিয়া অনুধাবন করিলেন এবং অবশেষে ইহার সুদূর-প্রসারী সম্ভাবনা উপলব্ধিও করিলেন।

বলিলেন, "বেশ, তা হলে তাই হোক। দাঁ-মল্লিকের অ্যাকাউন্টে আমার অংশে যে টাকাটা জমেছে এতেই খাটুক তা হলে সেটা—"

পুলকিত গগন দাঁ সোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, "বেশ বেশ।"

ইহার পর গগন পারিবারিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল।

"আপনি সেই যে দার্জিলিং চলে গেলেন, তারপর থেকে আপনার সঙ্গে আর দেখাই হয়নি। বৌদির শরীরটা বেশ সেরেছে তো?"

"সে মারা গেছে।"

"বলেন কি! দার্জিলিংয়েই?"

গগন দাঁও আর এ শোকাবহ ঘটনা লইয়া অধিক আলোচনা করা সমীচীন মনে করিল না। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর বিধুভূষণ বলিলেন, "ওই কথা রইল তা হলে। উঠি এবার, রাত অনেক হল।..."

গগন দাঁর সহিত নিজেকে পুনরায় যুক্ত করিয়াই বিধুভূষণ নিরস্ত হইলেন না, রাখহরি বিশ্বাস এবং গোপেন পালের নাবালক পুত্রের অভিভাবক পরেশ মল্লিকের সহিতও তিনি যোগস্থাপন করিলেন। রাখহরি বিশ্বাসের সমস্ত ঋণ শোধ করিয়া রাখহরিকে চাঁদনীর দোকানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতঃ তাহাকে বলিলেন, "নিজের দোকানটিতে আবার আগের মতো বস তুমি। আমার সঙ্গে তোমার আধাআধি বখরা থাক। টাকা যা লাগে আমার, মেহনত তোমার। তুমি আগের মতো হালটি ধরে বসে থাক খালি। শরীরটাও সারিয়ে নাও, ম্যালেরিয়াতে একেবারে জরাজীর্ণ করে দিয়েছে তোমাকে।" বিধুভূষণ নিজেই একদিন একজন ডাক্তার ডাকাইয়া আনিয়া রাখহরির চিকিৎসার ব্যবস্থাও করিয়া দিলেন।

গোপেন পালের ছিল বাসনের ব্যবসায়। দোকান উঠিয়া যাওয়াতে সে ঘরটি বেদখল হইয়া গিয়াছিল। বিধুভূষণের প্রথম কাজ হইল ঐ ঘরটি পুনরায় দখল করা। বাড়িওয়ালাকে বেশি ভাড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়া, পাড়ার লোকদের উস্কাইয়া দিয়া, নূতন ভাড়াটের নামে দুইটি মিথ্যা মোকদ্দমা সৃষ্টি করিয়া, বিধুভূষণ এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করিলেন যে নূতন ভাড়াটেকে বাড়ি ছাড়িয়া দিতে হইল। অর্থাৎ কেবলমাত্র টাকার জোরে যুগপৎ ছল, বল এবং কৌশল প্রয়োগ করিয়া বিধুভূষণ স্বর্গীয় গোপেন পালের পুরাতন দোকানঘরটি পুনরধিকার করিলেন। ইহার জন্য যে পরিমাণ অর্থ তাঁহাকে ব্যয় করিতে হইল তাহাতে অন্য পাড়ায় ইহার অপেক্ষা ভাল ঘর পাওয়া অসম্ভব হইত না। কিন্তু পুরাতনের প্রতি বিধুভূষণের অদ্ভুত একটা মমতা ছিল। বিশেষতঃ যাহা পয়মন্ত বলিয়া একবার তাঁহার ধারণা হইত—তাহা মানুষই হোক, বা বাড়িই

হোক— তাহা নিজের আয়ত্তাধীনে রাখিবার জন্য অর্থব্যয় করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। কারাগারের বন্ধু জিৎরাম, গগন, রাখহরি এবং গোপেন তাঁহাকে সমাজে এবং ব্যবসায়ক্ষেত্রে একদা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এ কথা তিনি ভোলেন নাই। জীবনের দুইটি কাম্য স্বপ্ন—ধনী হওয়া এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ করা—যে বন্ধু-চতুষ্টয়ের সংস্রবে আসিয়া সফল হইয়াছিল তাহাদের এবং তাহাদের সংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছুকে আঁকড়াইয়া থাকিলে তাঁহার মঙ্গল হইবে এই ধরনের একটা ধারণা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। একটা অনির্দিষ্ট অমঙ্গল আশঙ্কায় সর্বদাই যেন তাঁহার গা ছমছম করিত। স্বর্ণলতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যখন দেশব্যাপী দাঙ্গা বাধিয়া গেল, তাঁহার পুরাতন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি যখন ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল, তখন তাঁহার মানসিক জগতেও একটা প্রলয় চলিতেছিল। তাঁহার মনে হইতেছিল পাপের প্রায়শ্চিত্ত এইবার বুঝি আরম্ভ হইয়া গেল। এইবার কোনও মুসলমান গুণ্ডার হস্তে তাঁহার প্রাণান্ত ঘটিবে। ঊর্ধ্বশ্বাসে তিনি হিন্দুপ্রধান বিহারে পলায়ন করিলেন এবং সেখানেও গিয়া আশ্রয় পাইলেন তাঁহার প্রাক্তন বন্ধু জিৎরামের আত্মীয় জগৎরামের কাছে। শুধু তাহাই নয়, সেই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও পুনরায় তাঁহার ভাগ্যোদয় হইল। পুরাতন বন্ধুদের সংস্রবে থাকিলে তিনি নিরাপদে থাকিবেন এই ধারণাটা তাঁহার মনে আরও বদ্ধমূল হইয়া গেল। সুতরাং প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া গোপেন পালের পুত্রকে তাহাদের পুরাতন দোকানটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি শুধু যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন তাহা নয়, একটু নিরাপদও বোধ করিলেন। তাঁহার মনে হইল প্রাক্তন বন্ধুগণের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলে স্বর্ণলতার ব্যাপারটা ভগবানের দপ্তরেও সম্ভবতঃ চাপা পড়িয়া যাইবে। বিবেকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে বিভীষিকাটা অহরহ তাঁহাকে শঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল এই সব সৎকার্য-প্রাচীর তুলিয়া সেটাকে তিনি মনশ্চক্ষুর আড়াল করিবার প্রয়াস পাইলেন এবং সত্যসত্যই অনেকটা নির্ভয় হইলেন।

কিছুদিন পরেই কিন্তু তাঁহাকে আর একটি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। যে মুহূর্তে তিনি শুনিয়াছিলেন যে স্বর্ণলতা ও শিবানীর সহিত রজতবাবুর সম্পর্ক আছে সেই মুহূর্তেই তিনি স্থির করিয়াছিলেন ইহাদের বর্জন করিতে হইবে। নিরাপত্তার জন্য নিজের দেহের অবাঞ্ছিত অংশ যেমন কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হয়, ইহাদেরও তেমনি অপসারণ করিতে হইবে। স্বর্ণলতা অপসারিত হইয়াছে, ভয় ছিল শিবানীর সম্বন্ধে। কিন্তু মজঃফরপুর হইতে ফিরিয়া তাঁহার পাটের দালালদের মুখে যখন খবর পাইলেন যে উন্মত্ত পাকিস্তানীরা বিষ্ণুচরণকে সপরিবারে নিঃশেষ করিয়াছে, তখন তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। একদিন গিয়া ঠনঠনিয়ার জাগ্রত কালীমাতাকেও প্রণামও করিয়া আসিলেন, মায়ের পূজা দিবারও ব্যবস্থা করিলেন। তথাপি কিন্তু শেষরক্ষা হইল না। গগন দাঁ একদিন আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল, "পাকিস্তান থেকে বিষ্ণুচরণ বলে এক ভদ্রলোক আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আপনি যে নতুন বাড়ি কিনেছেন তার ঠিকানা তিনি জানেন না। আপনার পুরানো বাসায় গিয়ে আপনার খোঁজ পাননি। শেষকালে একজন রেফিউজির সঙ্গে আমার কাছে এসে হাজির হয়েছিলেন আজ সকালে। আমি এই বাড়ির নতুন ঠিকানাটা তাঁকে বলে দিয়েছি, তিনি আজ সন্ধ্যা আটটায় আপনার কাছে আসবেন সম্ভবতঃ।"

বিধুভূষণ ক্ষণিকের জন্য হতভম্ব হইয়া গেলেন।

"বিষ্ণুচরণ! সে তো রায়টে মারা গেছে শুনেছি।"

"না মরেনি। তার মুখেই শুনবেন সব খবর। আমি এখন উঠি। পুনর্বাসন-মন্ত্রীর সঙ্গে একটা এনগেজমেন্ট আছে—"

রিস্টওয়াচটার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া গগন দাঁ চলিয়া গেল! বিধুভূষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিলেন। সংবাদটি পাইয়া তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। একবার মনে হইল পুনরায় কিছুদিনের জন্য অন্তর্ধান করিলে কেমন হয়। ব্যবসার সম্পর্কে মজঃফরপুর যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল এমনভাবে পলাইয়া গেলে বিষ্ণুচরণ এবং গগন দাঁ উভয়ের মনে সন্দেহ জাগিবে। তা ছাড়া এমনভাবে পলাইয়া কতদিন তিনি আত্মরক্ষা করিবেন! সত্যের সম্মুখীন একদিন হইতেই হইবে। এমন হইলেই বা ক্ষতি কি। শোনাই যাক না বিষ্ণুচরণ কি বলে।

কাঁটায় কাঁটায় ঠিক আটটার সময় একটি চামড়ার ব্যাগ হস্তে বিষ্ণুচরণ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার বেশভূষায় যদিও বিধুভূষণ কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারিলেন না কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টি এবং মুখের হাসি দেখিয়া তাঁহার কেমন যেন অশ্বস্তি হইতে লাগিল। মনে হইল তাঁহার মুখে যেন একটা মুচকি হাসি চিরকালের মতো স্থির হইয়া গিয়াছে। যেন জীবন্ত হাসি নয়, মুখোশের হাসি। সেই মুখোশের চোখ দুইটি কিন্তু স্থির নয়, বরং যেন একটু বেশি চঞ্চল। বিধুভূষণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। বিষ্ণুচরণ কথা কহিল কিন্তু ধীরভাবেই।

"তারপর দাদা, ভাল আছ তো? অনেকদিন পরে দেখা হল—"

বিধুভূষণ হঠাৎ হু হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। শিবানীর মুখটা সহসা তাঁহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। যদিও শিবানীকে তিনি শত্রুপক্ষ বিবেচনা করিয়া তাহার প্রতি একটা বিরূপতা পোষণ করিয়াছিলেন, বিষ্ণুচরণকে সম্মুখে দেখিয়া কিন্তু সব গোলমাল হইয়া গেল। তিনি অঝোরঝরে কাঁদিতে লাগিলেন। বিষ্ণুচরণই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিল।

"কাঁদছ কেন দাদা, পুরুষমানুষের কান্না শোভা পায় না। যা হবার তা হয়ে গেছে। তা নিয়ে হা-হুতাশ করে লাভ কি। যতক্ষণ বেঁচে আছি, পুরুষমানুষের মতো যুঝতে হবে।"

কোঁচায় চক্ষু মুছিতে মুছিতে বিধুভূষণ বলিলেন, "তোমাকে যে দেখতে পাব এ আশাই আমি করিনি ভাই। কি করে রক্ষে পেলে তুমি?"

"আমি মুসলমান হয়েছি।"

"বল কি!"

"অন্য উপায় ছিল না। শিবানী যদি হত তা হলে সেও বাঁচত, ছেলেটাও বাঁচত। কিন্তু সে রাজি হল না! প্রাণের চেয়ে ধর্মই বড় হল তার কাছে—"

বিধুভূষণ বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে নির্বাক হইয়া বিষ্ণুচরণের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বাক্যস্ফুরিত হইলে দুইটি কথা মাত্র বলিলেন, "মুসলমান হয়েছ?"

বিষ্ণুচরণ ইহা প্রত্যাশাই করিয়াছিলেন। তিনি যাহা বলিবেন তাহাও ঠিক করিয়া আসিয়াছিলেন।

"হাঁ। মৃত্যু আর ইসলামধর্ম ছাড়া আর তৃতীয় পথ ছিল না। আমি ইসলামকেই বেছে নিয়েছি। এতে আশ্চর্য হচ্ছ কেন দাদা। আমরা তো প্রাণের দায়ে এ রকম অনেক কিছুই করে থাকি। গ্রীষ্মকালে আদ্দির পাঞ্জাবি পরে আরাম পাই, কিন্তু শীত পড়লে প্রাণের দায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি ত্যাগ করে গরম জামা পরতে আমাদের দ্বিধা বা দেরি হয় না। আমাদের মতো সাধারণ

লোকের কাছে ধর্মটাও বাইরের পোশাক ছাড়া আর কি বল। প্রাণে বেঁচে থাকাটাই হল আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় কথা—"

বিধুভূষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। বিষ্ণুচরণের উক্তিটা তাঁহার মর্মস্পর্শ করিয়াছিল। আত্মরক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, চাচা আপন বাঁচা প্রভৃতি প্রবচনগুলি যে জ্ঞানগর্ভ একথা ঠিক, বিষ্ণুচরণের যুক্তিও অকাট্য, তথাপি তাঁহার মন তাহার কথায় ঠিক সায় দিতে পারিল না। আত্মরক্ষা করিবার জন্য নিজে যদিও পাশবিকতার অতি নিম্নস্তরে নামিয়াছিলেন, কিন্তু এজন্য মুসলমান হওয়াটা তাঁহার নিকট কেমন যেন ঘৃণা বলিয়া মনে হইল। কেন হইল সে আত্মবিশ্লেষণে তিনি প্রবৃত্ত হইলেন না, বিষ্ণুচরণের যুক্তিকে খণ্ডন করিবার মতো যুক্তিও তাঁহার মাথায় আসিল না, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

বিষ্ণুচরণ স্মিতমুখে ক্ষণকাল বিধুভূষণের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে আসল কথাটি ব্যক্ত করিলেন।

"আমি একটা কথা বলবার জন্যে তোমার কাছে এসেছি দাদা--"

"কি কথা?"

"তোমার সঙ্গে আমার যে ব্যবসায় সম্পর্ক ছিল তা আমি বজায় রাখতে চাই। আমার পূর্বজীবনের সমস্ত স্মৃতি এই সম্পর্কটুকুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে—"

বিধুভূষণের মনে হইল ভাবাধিক্যবশতঃ বিষ্ণুচরণ বোধ হয় থামিয়া গেল। তাহার মুখমণ্ডলে অবশ্য কোন ভাবান্তর তিনি দেখিতে পাইলেন না, বরং তাঁহার মনে হইল চঞ্চল চক্ষু দুইটিতে একটা ধূর্তভাব প্রকটিত হইয়াছে।

"কি করে সম্পর্ক বজায় রাখবে বল—"

"বলছি। সেই কথা বলতেই এসেছি। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে পাকিস্তান থেকে পাটের ব্যবসা বজায় রাখা আর সম্ভবপর নয়। এই কোলকাতাতেই বেনামে আমি অন্য একটা ব্যবসা করবার চেষ্টা করছি। কিন্তু এখানে তো আমি সব সময় থাকতে পারব না, তুমি যদি ভার নাও নিশ্চিন্ত হই।"

"কিসের ব্যবসায়?"

বিষ্ণুচরণ কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল।

তাহার পর বলিল, "ওদেশে অনেক ধর্ষিতা মেয়ে বেওয়ারিশ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদেব আত্মীয়-স্বজন হয় মরে গেছে, না হয় পালিয়ে গেছে। যারা তাদের ধর্ষণ করেছিল তারাও আর এখন তাদের আমল দিচ্ছে না বিশেষ। মুশকিলে পড়েছে বেচারারা। তাদের যদি এখানে এনে কোন কাজে লাগানো যায় তা হলে তারা স্বাধীনভাবে রোজগার করতে পারে, আমাদেরও দু'পয়সা হয়—"

"আমাদের দু'পয়সা হবে কি করে? রোজগার করবে তারা আর আমরা পয়সা কেমন করে পাব—"

"কমিশন হিসাবে। সে ব্যবস্থা আমি করব।"

"ব্যাপারটাই শুনি না আগে। অতগুলো মেয়ে এনে করবে কি?"

"করবার অনেক কিছু আছে। আপাততঃ 'মাসাজ বাথ' খোলা যেতে পারে। ওটাই ফ্যাশন দেখছি আজকাল—"

ব্যাপারটা বিধুভূষণের ঠিক বোধগম্য হইল না। ভূপেশ মজুমদারের নিকট তিনি কিছু কিছু ইংরেজী শিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 'মাসাজ বাথ' কথাটার মর্মগ্রহণ করিবার মতো বিদ্যা তাঁহার হয় নাই। গগন দাঁর কথাটা মনে পড়িল। কিছুদিন হইতে সে তাঁহাকে একজন ভালো প্রাইভেট সেক্রেটারি রাখিতে অনুরোধ করিতেছে। বলিতেছে, ভালো ইংরেজি-জানা চালাকচতুর, সুদর্শন কোনও ছোকরাকে না রাখিলে আজকাল ব্যবসায় চালানো কঠিন। উদাহরণস্বরূপ গগন দাঁ দুই একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়াছিল। বলিয়াছিল প্রাইভেট সেক্রেটারির বিদ্যার জোরেই তাঁহারা নাকি বাজার মাৎ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের পেটে কোন বিদ্যা নাই। গগন দাঁ প্রাইভেট সেক্রেটারি রাখিয়াছে। তাহার সব প্রবন্ধ, বক্তৃতা নাকি প্রাইভেট সেক্রেটারিই লিখিয়া দেয়। বিধুভূষণ একটি এম-এ পাস ছোকরার সহিত কথাও বলিয়াছেন, সে তাহার বাড়িতে আসিয়া থাকিতেও রাজি হইয়াছিল। কিন্তু ছোকরার খাঁই দেখিয়া বিধুভূষণ চমকাইয়া গিয়াছেন, খোরাক, পোশাক ছাড়া মাসিক আড়াইশত টাকা বেতন চায়, প্রতি বৎসর বেতনবৃদ্ধি করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি চায়! ইহার উপর প্রভিডেন্ট ফান্ড অথবা ন্যূনপক্ষে পাঁচ হাজার টাকাব লাইফ ইনসিওরেন্সেরও দাবি আছে। এ কি সাধারণ লোকে দিতে পারে?

"গোটা দুই 'মাসাজ বাথ' যদি খোলা যায়, মাসে অন্ততঃ হাজারখানেক টাকা লাভ থাকবে।"

বিধুভূষণ প্রাইভেট সেক্রেটারির চিন্তায় একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। পুনরায় বিষ্ণুচরণের দিকে মন দিলেন। বিষ্ণুচরণের কাছে মাসাজ বাথ সম্বন্ধে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করিতে কিন্তু তাহার বাধিল। ব্যাপারটা কলিকাতায় তখনও তেমন প্রচলিত হয় নাই। এ কি এক উদ্ভট ব্যাপার বিষ্ণুচরণ আমদানি করিল! এ অবস্থায় কথার সাহায্যেই কথা বাহির করিয়া লওয়া ছাড়া উপায় নাই। তাহাই করিবার প্রয়াস পাইলেন।

বলিলেন, "তাতো থাকবে বুঝলাম। কিন্তু ব্যবসাতে নামবার আগে অগ্রপশ্চাৎ ভেবে দেখা দরকার।"

"সে কি আর আমি ভাবিনি?"

"মেয়েমানুষের ব্যাপার—"

"মেয়েমানুষের ব্যাপার বলেই এতে লাভ প্রচুর।"

"তাই না কি?"

"বিধুভূষণের ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটি ক্ষণকালের জন্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

"অনেক লাভ?"

"অথৈ।"

"আমাকে কি করতে হবে?"

"কিছুই করতে হবে না। টাকা দাও, আমি সব ব্যবস্থা করব। এতে দেশের কাজও হবে, উপার্জনও হবে।"

গগন দাঁও ঠিক এই কথাই বলিয়াছিল।

"কত টাকা?"

"অন্তত হাজার দশেক তো এখুনি চাই।"

"ও বাবা! অত টাকা!"

বিধুভূষণ দ্বিধাগ্রস্ত হইলেই নির্নিমেষ হইয়া যাইতেন। বিষ্ণুচরণের মুখের উপর তিনি নির্নিমেষদৃষ্টি স্থাপন করিলেন। বিষ্ণুচরণের চোখের পাতা ঘন ঘন উঠিতে পড়িতে লাগিল। বিধুভূষণ ভাবিতেছিলেন লোকটা সধর্ম ত্যাগ করিয়া পাকিস্তানে আড্ডা গাড়িয়াছে, টাকাটি হস্তগত করিয়া একবার ঢাকা মেলে চড়িলে আর তাহার নাগাল পাওয়া যাইবে কি? বিষ্ণুচরণও ঠিক ওই একই কথা ভাবিতেছিল। তাহারও মনে হইতেছিল অনুরূপ পরিস্থিতিতে আমিও কি বিধুকে দশ হাজার টাকা দিতাম? সুতরাং জটিলতাকে সরল করিয়া সে বলিল, "দশ হাজার টাকা আমার অবিলম্বে দরকার। তুমি এমনিতে যদি না দাও কোলকাতায় আমার যে তিনখানা বাড়ি আছে তার বদলে দাও। কোলকাতায় বাড়ি রেখে আমার লাভই বা কি?"

বিধুর নির্নিমেষচক্ষু একটু বিস্ফারিত হইল। দুই একবার পলক পড়িল। কলিকাতায় যে বিষ্ণুচরণ সস্তায় তিনখানি বাড়ি খরিদ করিয়াছিল তাহা বিধুভূষণ জানিতেন। যখন তাহার সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল তখন বিষ্ণুচরণ বিধুভূষণকেও এই তিনখানি বাড়ির মধ্যে একটি কিনতে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু বিধুর টাকা তখন অন্যত্র আটকাইয়াছিল বলিয়া এ প্রস্তাবে তিনি রাজি হইতে পারেন নাই। এজন্য মনে মনে তিনি ক্ষুব্ধও ছিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে সহসা সেই পলাতক মৎস্য পুনরায় বঁড়শির নিকট ঘুরঘুর করিতেছে দেখিয়া শিকারী বিধুভূষণ লোলুপ হইয়া উঠিলেন। আজ তাঁহার টাকার অভাব নাই।

বিধুভূষণ প্রশ্ন করিলেন, "তোমার বাড়িগুলো তো বেলেঘাটায়?"

"হ্যাঁ। তুমি তো দেখেছ।"

"বাড়িগুলো কি বিক্রি করতে চাও?"

"এখানে বাড়ি রেখে তো আমার লাভ নেই। ওসব বাড়ি মাসাজ বাথের কাজেও লাগবে না। তার জন্যে বড় রাস্তায় বাড়ি চাই। সুতরাং ওসব বাড়ি আমার আর কোন্ কাজে লাগবে বল। হয়তো কোনদিন রেফিউজিরা এসে দখল করে বসবে, তখন বিপদে পড়ে যাব।"

যদিও প্রশ্নটা নিজের কাছেই হাস্যকর ঠেকিতেছিল তবু তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "দশ হাজার টাকার বদলে তিনখানা বাড়িই দেবে নাকি?"

"তোমার সঙ্গে দরদস্তুর আমি করব না। তুমি যা ন্যায্য মনে কর তাই দিও।"

"তুমি কিনেছিলে কততে?"

"তা আমার প্রায় হাজার পঁয়ত্রিশ পড়েছিল।"

বিধুভূষণ খবরটা জানিতেন। বুঝিলেন বিষ্ণুচরণ সত্যকথাই বলিতেছে। মস্তকে দুই একবার হাত বুলাইয়া কয়েকমুহূর্ত ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন। তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বাড়ির আমার এখন দরকার নেই। তবে তুমি বন্ধুলোক, বিপদে পড়েছ, যদি কিছু কমসম করে দাও তো নিয়েনি।"

"বলেছি তো তোমার কাছে লাভ করব না। পঁয়ত্রিশ হাজারই তুমি দিও।"

"অত টাকা নেই আমার কাছে এখন। সব ঝেড়েঝুড়ে হাজার পঁচিশেক দিতে পারি।"

"বাকী দশ হাজার পরে দিও না হয়। মাসখানেক পরে এসে না হয় নিয়ে যাব।"

"মাসখানেক পরে পারব না। মাসতিনেক পরে পারব। তবে দশ হাজার নয়, পাঁচ হাজার দেব।"

বিষ্ণুচরণ ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল। তাহার মুখের মুচকি হাসিটা যেন আরও স্থির হইয়া

গেল। তাহার চঞ্চল চোখের দৃষ্টিতে ক্ষণিকের জন্য সেই জাতীয় একটা ঝলক খেলিয়া গেল যাহা শাণিত ছোরার উপর মাঝে মাঝে খেলিয়া যায়।

বলিল, "আমি তো আগেই বলেছি, তোমার সঙ্গে দরদস্তুর করব না। বেশ, পাঁচ হাজারই দিও। তা হলে আমি এখন কাঁচা রসিদ লিখে দিচ্ছি। বাড়িগুলোর চাবিও দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। আমার উকিল বীরেনবাবুকে বলে যাচ্ছি দলিলপত্র তৈরি করতে। তৈরি হয়ে গেলে আমি এসে রীতিমত রেজেস্ট্রী করে দেব তোমাকে—"

"তুমি এখন যাবে কোথা?"

"এখানেই থাকব। নানা জায়গায় ঘুরতে হবে এখন। মাসাজ বাথের চারটে বাড়ি ঠিক করেছি। চারটে বাড়ির জন্য সেলামীই দিতে হবে দশ হাজার। তারপর আসবাবপত্র দিয়ে সাজাতে হবে, তাতেও বিস্তর খরচ। ভালভাবে করতে গেলে কৃপণতা করলে তো চলবে না, টাকা ঢালতে হবে। তুমি যদি আমার সঙ্গে থাক, আমি খুশিও হই, নিশ্চিন্তও হই।"

"আচ্ছা তুমি আগে আরম্ভ কর তো, তারপর দেখা যাবে।"

"দেখা না, আসতেই হবে তোমাকে। হিন্দুস্থানে পাকিস্তানে তো খিটিমিটি চলছেই, কখন কি হুজ্জৎ বেধে যায় ঠিক কি, হয়তো আমাকে গা ঢাকা দিতে হবে, কিংবা সরে পড়তে হবে পাকিস্তানে। তখন তুমি যদি ব্যবসাটার হাল ধরে থাক ভরাডুবি অন্তত হবে না। দাও চেকটা দাও, আমি উঠি এবার। বেয়ারার চেক দিও। কারণ এখানকার ব্যাঙ্ক থেকে আমি অ্যাকাউন্ট তুলে নিয়েছি। ব্যাঙ্কের লোকেরা আমাকে চেনে অবশ্য, বেয়ারার চেক দিলে টাকাটা পেয়ে যাব। আর যদি গোলমাল করে, তুমি তো আছই। কাঁচা রসিদটা লিখে দিয়ে যাচ্ছি তোমাকে—"

"এখনই চেকটা নেবে?"

"এখনই। বাড়িগুলো তা না হলে বেহাত হয়ে যাবে—"

ব্যাগ হইতে কাগজ, কলম বাহির করিয়া বিষ্ণুচরণ কাঁচা রসিদ লিখিতে লাগিল। তাহার মুখের স্থির মুচকি হাসিটার দিকে বিধুভূষণ নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন কেবল। তাঁহার বিষয়বুদ্ধি যাহা বলিতে তাঁহাকে প্ররোচিত করিতেছিল তাহা তিনি বলিতে পারিলেন না। চক্ষুলজ্জা তাঁহাকে রুদ্ধবাক করিয়া রাখিল। একদিন যাহার সহিত হাজার হাজার টাকা লেন-দেন করিয়াছেন, যাহার মুখের কথার উপর নির্ভর করিয়া হাজার হাজার টাকা উপার্জন করিয়াছেন, শুধু ব্যবসাক্ষেত্রে নহে, হৃদয়ের ক্ষেত্রেও যাহার সহিত একদিন নিবিড় পরিচয় ঘটিয়াছিল, যাহার বাড়িতে তিনি বহুবার অন্নগ্রহণ করিয়াছেন, যাহার স্ত্রীর হস্তে ভাইফোঁটার তিলক পরিয়াছেন, আজ দৈবদুর্বিপাকে সে ধর্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে বলিয়া তাহাকে কি বলা যায় তোমাকে অবিশ্বাস করি? শিবানীর মুখখানাও মনের উপর ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। সুতরাং যদিও ব্যবসায়ী বিধুভূষণের বুদ্ধি তাহাকে বলিতেছিল—আগে পাকাপাকি দলিলটা হইয়া যাক, তাহার পর টাকাটা দিও—কিন্তু বন্ধু-বৎসল মানুষ বিধুভূষণ তাহা পারিলেন না। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল—বিষ্ণুচরণ কি কখনও আমাকে ঠকাতে পারে? কখনও না।

কাঁচা রসিদ লইয়াই তিনি বিষ্ণুচরণকে চেকটা লিখিয়া দিলেন।

ব্যবসায়ী বিধুভূষণ যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। টাকাটি হস্তগত করিবার পর

তাঁহার সহিত আর বিষ্ণুচরণের দেখা হইল না। নবেন্দু বিশ্বাসের সহিত যে উক্ত বাড়ি তিনটির সম্পর্ক আছে তাহা তিনি জানিতে পারিলেন বেলেঘাটার কয়েকটি লোকের মুখে। তবে তিনি একাধিক লোকের মুখে একথা শুনিলেন যে, পূর্ববঙ্গের এক মুসলমানের সহিত সম্পত্তি বিনিময় করিয়া পাঞ্জাব-প্রবাসী যে বাঙালী ভদ্রলোকটি এই বাড়ি তিনটি খরিদ করিয়াছিলেন তিনি নাকি দ্বিতীয় রায়টে মারা গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে দুই একজন ভদ্রলোকের নামটাও বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ঠিকভাবে বলিতে পারিল না। একজন বলিল, 'নবকুমার দাস' আর একজন বলিল, 'নবকিশোর বিশ্বাস'। বিধুভূষণ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বাড়ি ফিরিয়া গিয়া বিষ্ণুচরণের প্রাক্তন ঠিকানায় একটি পত্র লিখিলেন। দশ দিন কাটিয়া গেল, কোন উত্তর আসিল না। টেলিগ্রাম করিলেন, উত্তর আসিল না। বিষ্ণুচরণ যে জমিরুদ্দিন হইয়াছেন এ খবর তিনি জ্ঞাত ছিলেন না। এ খবরটিও পাইলেন অপ্রত্যাশিতভাবে। নেপথ্যবর্তী বিধুভূষণের টাকার উপর নির্ভর করিয়া গগন দাঁ যে কলোনি নির্মাণ করিতেছিল, সেই কলোনিতে আশ্রয়প্রার্থী হইয়া একদিন ঢাকা হইতে একটি ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যবসার সূত্রে বহুবার তিনি ঢাকায় গিয়াছেন, ভদ্রলোকটিকে তিনি চিনিতেন।

"রমণীবাবু না কি, কি খবর—"

বিষ্ণুচরণই একদিন রমণীরঞ্জন গুহকে বিধুভূষণের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল। রমণীবাবুর মুখেই বিধুভূষণ খাঁটি খবরটি আদ্যোপান্ত শুনিলেন। শুনিলেন, বিষ্ণুচরণ এখন নাকি জমিরুদ্দিন আলি নামে পরিচিত হইয়া পাঞ্জাব-প্রবাসী জনৈক নবেন্দু বিশ্বাসের বিশাল বিষয় এবং প্রকাণ্ড বাড়ি ভোগ করিতেছে। বিনিময়ে উক্ত নবেন্দুকে সে কলিকাতার বাড়ি তিনখানি নাকি লিখিয়া দিয়াছে। এ খবরটা সত্য কি মিথ্যা তাহা রমণীবাবু বলিতে পারিলেন না। তবে ইহাই গুজব। রমণীরঞ্জন আরও বলিলেন যে, বিষ্ণুচরণ একজন মুসলমানীকে বিবাহ করিয়াছে, করাচীতে ঘনঘন যাওয়া-আসা করিতেছে। তিনি অনুমান করিলেন যে, পাকিস্তান সরকারের নিকট সে বড় একটা কিছু বাগাইবার তালে আছে। পাকিস্তান সরকার তাহাকে হয়তো ভাল একটা কিছু দিবেও, কারণ যে মুসলমানীকে বিষ্ণুচরণ বিবাহ করিয়াছে যে সম্রান্ত-বংশীয়া। বিধুভূষণ নির্বাক হইয়া গলার সম্মুখদিকের চামড়াটা অকারণে টানিতে লাগিলেন।

"বিষ্ণুচরণের ঠিকানাটা কি বলতে পারেন?"

"পারি বই কি। ঠিকানা, ফোন নম্বর সব টোকা আছে আমার। টুকে রেখেছি, কখন কি দরকার লাগে বলা যায় না তো।"

রমণীরঞ্জনের নিকট বিধুভূষণ জমিরুদ্দিন আলির ঠিকানা, ফোন নম্বর প্রভৃতি সংগ্রহ করিলেন। অনেক চেষ্টা করিয়া অনেকবার ব্যর্থমনোরথ হইয়া টেলিফোনযোগে তিনি বিষ্ণুচরণের নাগাল পাইলেন বটে, কিন্তু টাকাটার বা বাড়িগুলির কোনও সুব্যবস্থাই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বিষ্ণুচরণ কেবলই বলেন, বাড়ি তুমি ভোগ কর।

গগন দাঁ পরামর্শ দিল পাকিস্তানের হাই কমিশনারের সহায়তা ভিন্ন এ ব্যাপারের সুরাহা হওয়া শক্ত।

বিধুভূষণ চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, "আমি মুখ্যু মানুষ, আমি কি অত কাণ্ড করতে পারি?"

গগন দাঁ হাসিয়া উত্তর দিল, "আমি তো আগেই বলেছি, ভাল দেখে একটা 'প্রাইভেট'

রাখুন। সে সব সামলে দেবে। আজকালকার দিনে 'প্রাইভেট' না রাখলে চলে না।" গগন দাঁ প্রাইভেট সেক্রেটারি কথাটাকে মাঝে মাঝে সংক্ষেপ করিয়া 'প্রাইভেট' বলিত। বিধুভূষণ কেন যে 'প্রাইভেট' রাখিতেছিলেন না তাহা আর গগন দাঁকে খুলিয়া বলিলেন না। মাথায় একবার হাত বুলাইয়া কেবল বলিলেন, "দেখি—", মনে মনে কিন্তু অনুভব করিতে লাগিলেন যে টাকার মায়া করিলে আর চলিবে না, একটা লোক রাখিতেই হইবে।

ঠিক এই সময়েই যোগাযোগটা ঘটিয়া গেল। কয়েকদিন পরে ভূপেশ মজুমদার তাঁহারই গারাজ হইতে বরেনকে টানিয়া বাহির করিলেন। বিধুভূষণের গৃহসংলগ্ন গারাজটি খালিই পড়িয়াছিল। হাতে আরও কিছু টাকা হইলে মোটর কিনিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন বলিয়া গারাজটা তিনি ভাড়া দেন নাই। সেই শূন্য গারাজই তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিল। খুবই সস্তায় একটা প্রাইভেট সেক্রেটারি জুটিয়া গেল। ভূপেশ তাঁহার অনুরোধটি রক্ষা করাতে তিনি মনে মনে খুবই হৃষ্ট হইলেন। ঠিক এই সময়েই ভূপেশ যদি তাঁহার নিকট পূর্বোক্ত বিবাহের প্রস্তাবটি করিত তাহা হইলে কি হইত বলা যায় না। কিন্তু বিশাখা দেবীর আকস্মিক আবির্ভাবে সব গোলমাল হইয়া গেল। কিন্তু নবলব্ধ প্রাইভেট সেক্রেটারির যোগ্যতা-অযোগ্যতা নির্ণয় করিবার সময়ও তিনি পাইলেন না। পরিস্থিতি এমন জটিল হইয়া উঠিল যে তাঁহাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দিল্লী ছুটিতে হইল। এক আধ পয়সা নয়, পঁচিশ হাজার টাকা! বিশাখা সত্যই নবেন্দু বিশ্বাসের কন্যা কিনা, সত্যই নবেন্দু বিশ্বাস নামে কোনও রেফিউজি জমিরুদ্দিনের সহিত সম্পত্তি-বিনিময় করিয়াছিল কিনা এ সব সত্য নির্ণয় করিতে হইলে দিল্লী যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। বিশাখার স্যুটকেস হইতে তিনি কয়েকটা ঠিকানাও সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রাইভেট সেক্রেটারির সাহায্যে হাই কমিশনারের দ্বারস্থ হওয়ার পূর্বে ব্যাপারটার স্বরূপ জানিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। শুধু যে টাকাটা উদ্ধার করিবার জন্য অথবা বাড়ি তিনটি পাকাপাকিভাবে দখল করিবার জন্যই তিনি ব্যগ্র হইলেন তাহা নয়, একটা মনস্তাত্ত্বিক কৌতূহলও তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। বিষ্ণুচরণ যে সত্যই এত বড় জুয়াচোর একথা কিছুতেই তাঁহার বিশ্বাস হইতেছিল না। সত্যটা যাচাই করিয়া লইবার জন্যই আরও বিশেষ করিয়া তিনি দিল্লী ছুটিয়াছিলেন। দিল্লীতে গিয়া খোঁজখবর করিয়া তিনি অবশেষে সেই সত্যের সম্মুখীন হইলেন যে সত্যের সাক্ষাৎ দার্শনিক বা কবিরাই মাঝে মাঝে পান। তিনি নিঃসংশয়ে হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, একই মানুষের মধ্যে বহু রূপ প্রচ্ছন্ন থাকা সম্ভব। একই লোকের পক্ষে কখনও দেবতা, কখনও পিশাচ, কখনও সৎ, কখনও অসৎ, কখনও কোমল, কখনও কঠিন হওয়া কিছুমাত্র বিস্ময়কর নয়। নিজের কথা চিন্তা করিয়া এই বিষয়ে তিনি আরও নিঃসন্দিগ্ধ হইলেন। কিছুদিন পূর্বে বিষ্ণুচরণ যে উপমাটা ব্যবহার করিয়াছিল সেইটাই তাঁহার পুনরায় মনে পড়িল। মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার দাস, শীত পড়িলে সে কি খালি গায়ে থাকিতে পারে? তাহাকে জামা পরিতেই হইবে। জামার ছিটটা বা কাপড়টা তাহার নিজের পছন্দমতো বা সামর্থ্য অনুযায়ী সে কিনিতে পারে, কিন্তু জামা তাহাকে পরিতেই হইবে। এই উপমাটা নানাভাবে প্রণিধান করিবার পর বিষ্ণুচরণ সম্বন্ধে তাঁহার মনে যে গ্লানি জমিয়াছিল তাহা কতকটা কাটিয়া গেল। কিন্তু জীবন-সমরাঙ্গনে বিষ্ণুচরণ যে তাঁহার ধূর্ত প্রতিদ্বন্দ্বী, এই সত্যটা ভালভাবে অনুভব করিয়া তিনি ধীরভাবে কর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। "ব্যাপারটা তো বোঝা গেল। এইবার টাকাটা কি করে উদ্ধার করা যায়..."

অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, কিন্তু কোন সদুপায় তাঁহার মাথায় আসিল না। পরিচিত মহলে পাকিস্তান গভর্নমেন্টের সম্বন্ধে যাহা তিনি শুনিলেন তাহাতে তাঁহার মনে হইল যে হাই কমিশনারের দ্বারস্থ হইলেও বিশেষ কিছু সুবিধা হইবে না।

সহসা একটা কথা তাঁহার মনে হইল। কলিকাতায় থাকিতে থাকিতেই এ কথাটা আবছাভাবে তাঁহার মনে হইয়াছিল। টেলিফোন করিয়া ভূপেশ ব্যাপারটাকে স্পষ্টতর করিয়া দিয়াছে। তাঁহার মনে হইল ইহাই একমাত্র উপায়। ওই মেয়েটাকে বিবাহ করিয়া ফেলিলেই তো সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও তাঁহার ব্যবসায়ী বিবেক তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে, মনে মনে অনেক সমস্যাই সমাধান করা সহজ, কার্যক্ষেত্রে অনেক বিঘ্ন আসিয়া জোটে। প্রথমত—বিশাখা তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি হইবে কি? অমন সুন্দরী লেখাপড়া-জানা মেয়ে, সে কি—? কিন্তু তাঁহার নিজের মনই সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও জোগাইল। কেন হইবে না? কত সুন্দরী লেখাপড়া-জানা মেয়ে আজকাল পথে পথে ফ্যা ফ্যা করিয়া ঘুরিতেছে, সিনেমায় নামিবার জন্য, রেডিওতে গান গাহিবার জন্য, আফিসে চাকরি করিবার জন্য, বড়লোকের টাইপিস্ট হইবার জন্য—কিনা করিতেছে তাহারা। তাঁহার মতো একজন নির্ভরযোগ্য পাত্র কি এ বাজারে অবহেলা করিবার মতো? তাঁহার টাকা আছে, বাড়ি আছে, প্রতিষ্ঠাও কিছু আছে, একাধিকবার কাগজে তাঁহার ফটো ছাপা হইয়াছে, কিছুদিন পরে তিনি মোটর কিনিবেন। পাত্র হিসাবে কি তিনি নিন্দনীয়? তিন আইনের জোরে জাতি, কুলের বাধাও ডিঙ্গাইয়া যাওয়া সম্ভব আজকাল। বিশাখার নিজেরই বা আছে কি! বাপ নাই, মা নাই, সহায়সম্বল কিছুই নাই। থাকিবার মধ্যে আছে রূপ এবং একটা ডিগ্রী হয়তো। সে আমাকে বিবাহ করিবে না কেন? তাহার যদি এতটুকু সাধারণ বুদ্ধি থাকে আমার প্রস্তাবে সে সানন্দে রাজি হইবে। এসব কথা নানাভাবে চিন্তা করিবার পরও কিন্তু জটিলতাটা সরল হইল না। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা পরাইলে হয়তো মুষিককুলের সুবিধা হয়, কিন্তু ঘণ্টাটি পরাইবে কে? বিশাখাকে এ প্রস্তাবটা করাই যে শক্ত। তাঁহার পক্ষে সামনাসামনি এ প্রস্তাব করা অত্যন্ত অশোভন। তাঁহার পক্ষে অসম্ভবও। কারণ তিনি অত্যন্ত মুখচোরা লোক, কোনও অপ্রিয় বা অশোভন কার্য সামনাসামনি তিনি করিতে পারেন না। পারিলে হয়তো স্বর্ণলতাকে পিছনদিক হইতে অমনভাবে ঠেলিয়া দিতেন না। কাহাকে দিয়া এই প্রস্তাবটা করানো যায়? এই চিন্তাই তাঁহাকে পাইয়া বসিল। যতই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন ততই এই ধারণা তাঁহার মনে দৃঢ় হইতে লাগিল প্রস্তাবটি করিয়া ফেলিতে পারিলে বিশাখা সানন্দে রাজি হইয়া যাইবে। মেয়েটিকে বুদ্ধিমতী বলিয়াই মনে হয়। ভূপেশের মারফত প্রস্তাবটা করানো চলিত। কিন্তু ভূপেশ তাহার শালীর মেয়েকে গছাইবার জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, সুতরাং ভূপেশের নিকট হইতে ব্যাপারটা গোপনই রাখিতে হইবে। গগন দাঁকে ব্যাপারটা খুলিয়া বলিলে সে হয়তো রাজি হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতেও একটা "কিন্তু" আছে। গগন দাঁ, জিৎরাম, জগৎরাম, রাখহরি ইহারা সকলেই তাহাকে জিতেন্দ্রিয় সাধু-পুরুষ বলিয়া মনে করেন এবং সেইজন্য যথেষ্ট খাতিরও করেন। স্বর্ণলতাকে বিবাহ করিবার সময় তিনি প্রচার করিয়াছিলেন যে একজন কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোককে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইতেছে। ম্যালেরিয়া হইলে লোকে যেমন কুইনাইন খায়, অনেকটা সেইরকম। স্বর্ণলতার মৃত্যুর পর তিনি অনেকবার অনেককে বলিয়াছেন যে ভগবান তাঁহাকে দয়া করিয়া মুক্তি দিয়াছেন। এখন আবার কোন্

যুক্তি অনুসারে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবেন? যে শ্রদ্ধার উপর উপরোক্ত বন্ধুবর্গের সহিত তাঁহার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত সেই শ্রদ্ধার ভিত্তি কি ইহাতে টলিয়া যাইবে না? বিধুভূষণ বড়ই ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন। ভাবিতে ভাবিতে একটা কথা তাঁহার মনে হইল। প্রস্তাবটা সামনাসামনি করিবার পূর্বে বিশাখাকে একটু ভাবিবার সময় দেওয়া উচিত। আচমকা কথাটা শুনিলে সে হয়তো ঘাবড়াইয়া যাইবে। এখান হইতে একটা চিঠি লিখলে কেমন হয়! গুছাইয়া লিখিতে পারিলে খুব অশোভন হয়তো হইবে না। চিঠি লিখিতে বসিয়া কিন্তু তিনি আবার থামিয়া গেলেন, চিঠিটা লইয়া মেয়েটা যদি হৈ-চৈ করিয়া বসে, যদি পুলিশের দ্বারস্থ হয়, যদি বলে যে আমাকে ঘরে আটকাইয়া রাখিয়া জোর করিয়া বিবাহ করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা হইলে তিনি আর একটা ফ্যাসাদে পড়িয়া যাইবেন। বসিয়া বসিয়া মাথায় অনেকক্ষণ হাত বুলাইলেন, তাহার পর ভাবিয়াচিন্তিয়া অবশেষে ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছ এই পত্রটি লিখিলেন।

নমস্কারান্তে নিবেদন,

আমি আপনার বিষয়ে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি। সংবাদ যে শুভ নয় তাহা আপনিও নিশ্চয় আশঙ্কা করিতেছেন। সব কথা চিঠিতে লেখা সম্ভব নয়। একটি কথা শুধু আপনাকে সসঙ্কোচে জানাইতেছি। আপনি যে জটিল প্যাঁচে পড়িয়াছেন তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার একটিমাত্র উপায় আছে। আমি যদি আপনাকে বিবাহ করি তাহা হইলেই আপনাকে রক্ষা করিতে পারি। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় পথ নাই। আপনি এ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন কিনা জানি না, যদি না হন আপনি নিজের ইচ্ছামত যাহা খুশি করিতে পারেন। আমার দিক হইতে বলিতে পারি, এ বিবাহে আমার আপত্তি হইবে না। কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন। সমস্ত কথা শুনিলে আশা করি আপনার আপত্তি হইবে না। আমি দুই একদিনের মধ্যেই পৌঁছিতে চেষ্টা কবিব। আশা করি কুশলেই আছেন। ইতি—

বিধুভূষণ

চিঠির উপরে কোনও নাম না লিখিয়া চিঠিটি একটি সাদা খামে পুরিলেন। খামের উপরেও কোন নাম বা ঠিকানা লিখিলেন না। ভিন্ন একটি কাগজের টুকরায় লিখিলেন—

প্রিয় বরেন,

জরুরি দরকারে সেই মেয়েটিকে এই পত্র লিখিতেছি। নামটা ঠিক স্মরণে আসিতেছে না বলিয়া খামে ঠিকানা লিখিতে পারিলাম না। তুমি চিঠিটা তাহাকে হাতে হাতে দিয়া দিও। তুমি নিজে যেন চিঠি খুলিও না। দুই একদিনের মধ্যেই যাইতেছি। ইতি—

বিধুভূষণ

সাদা খামটি এবং বরেনের নামে লিখিত চিঠিখানা আর একটি খামে পুরিয়া সেটি বরেনের নামে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার মনে হইল পত্রে কাহারও কোন নামোল্লেখ না থাকাতে আইনের কবল হইতে উদ্ধার পাওয়া সহজ হইবে। স্থির করিলেন পত্রটি কলিকাতায় পৌঁছিবার তিন চারদিন পরে তিনি কলিকাতায় পৌঁছিবেন। ইতিমধ্যে বিশাখা দেবী নিশ্চয় মনস্থির করিয়া ফেলিতে পারিবেন।

ভবিষ্যতের চিন্তায় ও স্বপ্নে মশগুল হইয়া বিধুভূষণ দিল্লীর রাজপথে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন বিশাখার জন্য কোনও উপহার লইয়া যাওয়া কি ঠিক হইবে? কিছু জুয়েলারি গহনা, দুই একটা শাড়ি লইয়া গেলে কেমন হয়? কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে হইল, খুবই অশোভন হয়। দর করিয়া দেখিলেন এখানে জিনিসপত্রের দামও খুব চড়া। অনর্থক এতগুলো টাকা ব্যয় করার কি দরকার এখন? সত্যই যদি বিবাহটা হইয়া যায় তখন উপহার দেওয়ার অনেক সময় পাওয়া যাইবে। বিশাখারা দিল্লীতে আসিয়া যে বাসায় ছিল সেই বাসার নিকটে নীহারবাবু নামক যে লোকটি থাকিতেন তিনিই বিশাখার সম্বন্ধে অনেক সংবাদ বিধুভূষণকে সরবরাহ করিয়াছিলেন। বিধুভূষণের মনে হইল, তাঁহার নিকট গিয়া বিশাখার সম্বন্ধে আরও কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিলে মন্দ হয় না। যাহাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিতে হইবে তাহার সম্বন্ধে যতটা খবর সংগ্রহ করা যায় ততই ভাল। স্বর্ণলতার ব্যাপারে তিনি যে ঘা খাইয়াছেন তাহা তাঁহাকে খাইতে হইত না যদি তিনি বিবাহের পূর্বে তাহার সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর করিতেন। বিশাখার সম্বন্ধে খোঁজখবর করিবার উদ্দেশ্যে তাই তিনি নীহারবাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখেন নীহারবাবু নাই, সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি লোক বসিয়া রহিয়াছে। লোকটির পরিধানে বুশশার্ট এবং পায়জামা, পায়ে কাবুলী চপ্পল, চোখে কালো চশমা, নাকের নীচে বাটারফ্লাই গোঁফ। হাতে একটি বাংলা দৈনিক কাগজ। বিধুভূষণ নিকটে আসিতেই লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং নমস্কারান্তে বলিল, "আপনিই কি নীহারবাবু?"

"না—।"

"নীহারবাবু বাড়িতে নেই না কি?"

"না। তাঁর অপেক্ষায় অনেকক্ষণ থেকে বসে আছি। আপনি নীহারবাবুকে চেনেন মনে হচ্ছে, হয়তো আপনিও আমাকে খবরটা দিতে পারবেন।"

"কি খবর—"

ভদ্রলোক তখন বাংলা সংবাদপত্রটি খুলিয়া একটি বিজ্ঞাপনের প্রতি বিধুভূষণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বিধুভূষণ দেখিলেন বিজ্ঞাপনটির চতুর্দিকে লাল পেন্সিল দিয়া দাগ দেওয়া আছে। বিজ্ঞাপনটি পড়িয়া বিধুভূষণের পায়ের তলা হইতে সহসা মাটি সরিয়া গেল যেন। বিশাখা তাহার নিরুদ্দিষ্ট পিতার সন্ধানের জন্য যে বিজ্ঞাপন দিয়াছিল এটি সেই বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনটি বিধুভূষণের চোখে পড়ে নাই, কারণ তিনি দিল্লী চলিয়া আসিয়াছিলেন। দেখিলেন বিজ্ঞাপনে বিশাখার দিল্লীর ঠিকানা এবং কলিকাতার হোটেলের ঠিকানা দেওয়া আছে। ভদ্রলোকটি বলিল—"এখানে এসে দেখছি বিশাখা দেবী নেই। বলতে পারেন তিনি কোথায় গেছেন?"

"শুনছি কোলকাতায় গেছেন।"

"কিন্তু কোলকাতায় হোটেলের যে ঠিকানা তিনি দিয়েছেন সে ঠিকানায় তিনি নেই। এখানেও নেই দেখছি। গেলেন কোথায় তিনি। বিজ্ঞাপন যখন দিয়েছেন তখন এর কোন একটা ঠিকানায় তাঁর থাকা উচিত ছিল না?"

"তাতো ছিল—"

"ব্যাপারটা বেশ যেন ঘোরাল মনে হচ্ছে—"

বিধুভূষণ আড়চোখে একবার লোকটির দিকে চাহিলেন। দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ লোকটির চোখ-মুখের হাব-ভাবও বিশেষ কমনীয় নয়। বিধুভূষণ প্রশ্ন করিলেন।

"আপনি কি বিশাখার কোনও আত্মীয়?"

"না।"

"তবে? তার বাবার কোনও খবর পেয়েছেন না কি?"

"পেয়েছি। তিনি মারা গেছেন।"

"এই খবরটা দিতে এসেছেন?"

"না। আমি এসেছি তাঁকে সাহায্য করতে। কারণ কোলকাতায় সেই হোটেলে গিয়ে খবর পেলাম যে বিধুভূষণ বলে একজন লোক মেয়েটিকে হোটেল থেকে তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। হোটেল থেকে সেই বাড়ির ঠিকানায় গিয়ে খোঁজ করলাম, দেখি সে বাড়িতে কেউ নেই।"

"কেউ নেই?"

"কারও সাড়াশব্দ অন্তত পেলাম না। একটা চাকর শুধু বেরিয়ে এল। সে বললে বাড়িতে কেউ নেই।"

বিধুভূষণ নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"আপনি তাকে সাহায্য করতে চান কেন হঠাৎ?"

"বিপন্ন রিফিউজি মেয়েদের সাহায্য করবার জন্য আমরা একটি সমিতি করেছি। আমি সেই সমিতির লোক—"

"ও। কিন্তু আমি তো এর বেশি কোনও খবর দিতে পারব না। আমি জানি বিশাখা কোলকাতায় গেছেন—"

"নীহারবাবুর জন্যে অপেক্ষা করি একটু তা হলে। তিনি হয়তো আরও বেশি কিছু জানতে পারেন।"

"বেশ, বসুন তা হলে।"

বিধুভূষণ আর সেখানে অপেক্ষা করা নিরাপদ মনে করিলেন না। তাঁহার মনে হইল ভাগ্যে তিনি নীহারবাবুকে নিজের নাম, ঠিকানাটা দেন নাই!

নীহারবাবুর বাসা হইতে রীতিমত ভীত হইয়া বিধুভূষণ ফিরিয়া আসিলেন। অস্পষ্টভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন একটা অদৃশ্য জাল যেন তাঁহাকে ধীরে ধীরে ঘিরিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু জালে পড়িয়া মৎস্য যেমন ছটফট করে ঠিক সে অবস্থাটা তাঁহার হইল না। জালটা অদৃশ্য ছিল বলিয়াই ভয়টাও অনিশ্চিত ছিল, অন্যবিধ চিন্তা ও কল্পনার অবকাশ ছিল। সেই সব চিন্তা ও কল্পনায় মগ্ন হইয়া তিনি দিল্লীর রাজপথে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিশাখার জন্য কোনও উপহার লইয়া যাওয়া উচিত হইবে কিনা এই চিন্তাটা তাঁহার চিত্তকে বেশ খানিকক্ষণ অধিকার করিয়া রাখিল। একবার মনে হইল বিবাহ করিয়া আবার ফাঁদে পড়িয়া যাইবেন না তো, বিবেক উপদেশ দিল ওসব পাকিস্তানী ব্যাপার হইতে দূরে সরিয়া থাকাই সুবুদ্ধির কাজ হইবে! কিন্তু যে অর্থ তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র সেই অর্থই বিবেকের মুখ চাপিয়া ধরিল। এক আধ টাকা নয়, পঁচিশ হাজার টাকা। বিশাখাকে যেমন করিয়া হোক বিবাহ করিতে হইবে। বিবাহ হইয়া গেলে বিষ্ণুচরণের নিকট হইতে বাড়িগুলো পাকাপাকি দখল করিবার জন্য বরেনকে দিয়া চেষ্টা করিতে হইবে। ছোকরাকে বেশ চালাকচতুর বলিয়াই তো মনে হয়। এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার পূর্বজীবনের কাহিনীও মনে পড়িল। বকুর কথা, স্বর্ণলতার

কথা, শিবানীর কথা...। দিল্লী রাজপথের বিচিত্র ভিড়ের মতোই নানা চিন্তাও তাঁহার মনের মধ্যে ভিড় করিতে লাগিল। কখনও সংলগ্ন, কখনও অসংলগ্ন। এমন সময় হঠাৎ যেন সেই অদৃশ্য জালটা অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িল। কে যেন বলিয়া উঠিল—"আরে!"—বিধুভূষণ ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন দার্জিলিং হোটেলের সেই চশমা-পরা অদ্ভুত লোকটা দাঁড়াইয়া আছে। চোখাচোখি হইবামাত্র সে হনহন করিয়া আগাইয়া আসিল এবং তাঁহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—"এতদিনে ধরেছি।"

"ধরেছেন মানে?"

"মানে ধরেছি। কট ইউ।"

"কি বলছেন বুঝতে পারছি না।"

"খুনীরা ধরা পড়লে ন্যাকা সাজবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাকে ঠকাতে পারবেন না। আমি স্বচক্ষে দেখেছি দার্জিলিঙে আপনি আপনার স্ত্রীকে ধাক্কা মেরে গভীর খাদে ফেলে দিয়েছিলেন। তখন থেকে আপনার সন্ধানে ঘুরছি আমি, আজ ধরেছি। আমাকে এড়িয়ে যাওয়া সহজ নয়—"

বিধুভূষণ ভীত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হন নাই। বিপদে পড়িলে তিনি বিচলিত হইতেন না। তিনি একটু ধমকের সুরেই প্রশ্ন করিলেন, "কে আপনি—"

"আমি বিখ্যাত ডিটেকটিভ ও. সি. কুণ্ডু।"

বিধুভূষণ বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"আমার নাম নিশ্চয় শুনেছেন?"

ও. সি. কুণ্ডুর নাম বিধুভূষণ শোনেন নাই! কিন্তু সে কথা বলিলেন না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"কথা বলছেন না কেন? আপনি যোগজীবন দাস নন?"

বিধুভূষণ আশার আলো দেখিতে পাইলেন। মনে পড়িল দার্জিলিং হোটেলে তিনি নিজেকে যোগজীবন নামে পরিচিত করিয়াছিলেন। কথাটা মনে পড়িবামাত্র তাঁহার হৃদয়ে বলসঞ্চার হইল।

"হাত ছাড়ুন—"

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়াইয়া লইলেন।

ও. সি. কুণ্ডু কালো চশমার ভিতর দিয়া বিধুভূষণের মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "হাতটা ছেড়ে দিলাম, কিন্তু সঙ্গ ছাড়ছি না।"

"কেন—"

"আপনি যে যোগজীবন নন এর প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। আপনি হোটেল ছেড়ে চলে যাওয়ার ঠিক পরেই আমি ছুটে এসেছিলাম, কিন্তু আপনাকে ধরতে পারলাম না। আপনাকে পেলাম না বটে, কিন্তু খুব দামী জিনিস পেলাম একটা। যে কাপটিতে আপনি চা খেয়েছিলেন দেখলাম সেটি তখনও ধোয়া হয়নি। তৎক্ষণাৎ কিনে নিলাম কাপটা। তাতে আপনার ঠোঁটের দাগ ছিল। চলুন, আপনার ঠোঁটের ইম্‌প্রেশন নেব—"

'ইম্‌প্রেশন' কথাটা ঠিক তাঁহার বোধগম্য হইল না বটে, কিন্তু ব্যাপারটা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

বলিলেন, "যদি না দিই—"

হঠাৎ ও. সি. কুণ্ডু তাঁহার রঙীন চশমাটা খুলিয়া ফেলিতেই বিধুভূষণ শিহরিয়া উঠিলেন। ও. সি. কুণ্ডুর চোখের দৃষ্টি ভয়ঙ্কর, যেন মানুষের চোখ নয়, বাঘের চোখ। জ্বলজ্বল করিতেছে। ও. সি. কুণ্ডু কিন্তু চোখ দেখাইবার জন্য চশমা খোলেন নাই, খুলিয়াছিলেন কপালের ঘাম মুছিবার জন্য। বিধুভূষণের অন্তরাত্মা কিন্তু শিহরিয়া উঠিল। ও. সি. কুণ্ডু ঘাম মুছিয়া চশমাটি পুনরায় পরিধান করিলেন এবং গম্ভীরভাবে বলিলেন—"দেখুন, বেশি চালাকি করবেন না আমার সঙ্গে। আমি ও. সি. কুণ্ডু—পকেট থেকে হুইস্‌ল্‌টি বার করে যদি একটিবার ফুঁ দি অলি-গলি থেকে আর্মড পুলিশ ছুটে আসবে পিল পিল করে—তখন মহা মুশকিলে পড়ে যাবেন বলে দিচ্ছি।"

পকেট হইতে সত্যই একটা হুইস্‌ল্‌ বাহির করিয়া তিনি সেটা বিধুভূষণের নাকের সামনে নাড়িতে লাগিলেন। বিধুভূষণ সত্যই এবারে বেশ ঘাবড়াইয়া গেলেন। কিন্তু সপ্রতিভতার ভান করা ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। একটু হাসিয়া বলিলেন, "বিশ্বাস করুন, আমি যোগজীবন নই, বিধুভূষণ।"

"প্রমাণ চাই।"

"চলুন তা হলে আপনাকে আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের কাছে নিয়ে যাই—"

"আগে নাম বলুন তাদের—"

"শেঠ রূপচাঁদ, ভুতু পালিত, নীরেনবাবু—"

"ওসব চলবে না। দুটি লোককে বিশ্বাস করতে পারি। প্রাইম মিনিস্টার নেহরু আর হোম মিনিস্টার। এরা কেউ চেনেন আপনাকে?"

"না।"

"তবে?"

একটা কথা বিদ্যুৎপ্রবাহবৎ বিধুভূষণের মাথায় খেলিয়া গেল।

"আমি যদি দেখিয়ে দিতে পারি যে আমার স্ত্রী বেঁচে আছেন? আমার স্ত্রীকে দেখলে আপনি চিনতে পারবেন কি?"

"দূর থেকে দেখেছি, তবু মনে হয় পারব। কোথায় আছেন তিনি?"

"কোলকাতায়।"

ও সি. কুণ্ডু কয়েক মুহূর্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন।

"বেশ, যাব আপনার সঙ্গে কোলকাতায়। ও. সি. কুণ্ডু নিরীহ লোককে কখনও পীড়ন করে না। কবে যাবেন আপনি কোলকাতায়—"

"কাল।"

"বেশ আমিও যাব আপনার সঙ্গে।"

বিধুভূষণ বিব্রতবোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি সত্যই দোষী, তাঁহার বিবেক নিখুঁত নয়, তিনি বেশি আপত্তি করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন লোকটাকে যদি কিছুতেই এড়াইতে না পারেন, সত্যই যদি ও শেষ পর্যন্ত কলিকাতায় গিয়া হাজির হয়, বিশাখাকেই স্ত্রী বলিয়া চালাইয়া দিবেন। বিশাখা এতদিনে হয়তো তাঁহার চিঠি পাইয়াছে। সে যদি তাঁহাকে বিবাহ করিতে না-ও চায়, তাঁহাকে পুলিশের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করিতে সে হয়তো আপত্তি করিবে না। যদি করে তাহার পায়ে ধরিবেন তিনি।

ও. সি. কুণ্ডু বিধুভূষণের সঙ্গ ছাড়িলেন না।

তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বিধুভূষণ পরদিন কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইবেন ঠিক করিলেন।

॥ তিন ॥

বিষ্ণুচরণ ওরফে জমিরুদ্দিনকে নির্জলা পিশাচ বলিয়া মনে না করিলেও যাঁহাদের তৃপ্তির ব্যাঘাত ঘটিবে তাঁহারা তাহাকে পিশাচ বলিয়াই মনে করুন। কেবল তাহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনুকম্পা যদি তাঁহারা পোষণ করেন তাহা হইলে ব্যাপারটা একটু ভদ্র হয়। কারণ নিক্তির ওজনে বিচার করিলে পক্ষপাতহীন বিচারকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, যে সকল দোষ বিষ্ণুচরণকে পিশাচ করিয়াছে তাহা আমাদেরও অনেকের চরিত্রে অল্পবিস্তর বর্তমান। ঘটনাচক্রে পড়িলে আমরাও অনেকে ঠিক ওইরূপ পিশাচ হইয়া পড়িতাম। শান্ত অনুকূল পরিবেশে থাকিয়া আমরা প্রায়ই এই সত্যটা বিস্মৃত হই। সুখসুবিধাপূর্ণ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত থাকিয়া আমরা ভুলিয়া যাই যে আমরা ভিতরে ভিতরে পশু, বিপদে পড়িলে আমাদেরও পশুত্ব প্রকট হইয়া পড়ে। শুধু তাই নয়, এই আত্মবিস্মৃতির সময় আমরা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এমন কতকগুলি গুণও প্রত্যাশা করি যাহা স্বাভাবিকভাবে তাহার চরিত্রে বর্তমান্ নাই, যাহা আমাদের কল্পনারই সৃষ্টি। সুখের দিনে অধিকাংশ মানুষই ছদ্ম আচরণ দ্বারা আমাদের এই কল্পনাকে হৃষ্ট করে। দুঃখের সংঘাতে সেই ছদ্মবেশটা যখন খুলিয়া যায়, আসল পশুটা যখন নখদন্ত বিস্তার করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে, তখন আমরা শিহরিয়া মন্তব্য করি— উঃ, লোকটা কি ভয়ানক পিশাচ! পিশাচ আমরা অল্পবিস্তর সকলেই। কিন্তু মজা এই যে, যখনই কাহারও পিশাচত্ব প্রকট হইয়া পড়ে, অমনি আমরা সাধু বিচারক সাজিয়া তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হই। তখন আমাদের মনে থাকে না যে বিচারক সাজিবার প্রচেষ্টার মধ্যেই খানিকটা পশুত্ব লুক্কায়িত আছে।

বিষ্ণুচরণের পরিচয় মোটেই অসাধারণ নয়। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান সে। তাহার পিতা ভবনাথের ছোট মিষ্টান্নের দোকান ছিল একটি। সামান্য কিছু জমিও ছিল। আর ছিল বংশপ্রদীপের একমাত্র সলিতাটি—মাতৃহীন পুত্র বিষ্ণুচরণ। প্রথমত তিনি বিষ্ণুচরণকে স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভরতি করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা তিনি কোনও দিন আশা করেন নাই, যে তাঁহার পুত্র জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া তাঁহার দুঃখ-মোচন করিবে। আমড়াগাছে আমড়াই ফলিবে ইহাই তিনি জানিতেন, আম বা আঙুরের প্রত্যাশা তাঁহার ছিল না। সেইজন্য বাল্যকাল হইতেই তিনি বিষ্ণুচরণকে দোকানেও বসাইতেন, জমিতেও পাঠাইতেন। তিনি জানিতেন যে, অ্যালজ্যাব্রার অঙ্ক ঠিকমতো কষিতে না পারিল তেমন কিছু ক্ষতি হইবে না, হনলুলু কোথায় অথবা পানিপথের যুদ্ধ কোন্ তারিখে হইয়াছিল এসব তথ্য সঠিক না জানিলেও তাঁহার দোকানও চলিবে, জমিতে ফসলও ফলিবে, যদি দোকানে এবং জমিতে যথোচিত মনোনিবেশ করা যায়। তাই বাল্যকাল হইতেই তিনি বিষ্ণুচরণকে এই দুইটি বিষয়ে অবহিত হইতে উৎসাহ দিয়াছিলেন। বিষ্ণুচরণের দিক হইতেও উৎসাহের অভাব হয় নাই। সে নামেমাত্র স্কুলে যাইত, প্রায়ই ক্লাস-প্রমোশন পাইত না। কিন্তু এ যুগে (যে যুগকে পণ্ডিতগণ কলিযুগ আখ্যা দিয়াছেন) ন্যায়ের বিধান অনুসারে কয়টা লোকই বা চলে? ঘড়ির

মতো সূক্ষ্ম যন্ত্রও স্লো-ফার্স্ট হয়, নিক্তির কাঁটাও মাঝে মাঝে ভুল ওজন দেখায়। ভবনাথও লেখাপড়ায় অমনোযোগী পুত্রটির ক্লাস-প্রমোশনের একটা অবৈধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সুবিধাও হইয়াছিল। স্কুলের হেডমাস্টারমহাশয় নানা-কারণে ভবনাথের উপর প্রীত ছিলেন। ভবনাথ যে একজন উঁচুদরের মিষ্টান্নশিল্পী এ ধারণা তো তাঁহার ছিলই, ব্যক্তিহিসাবেও তাঁহাকে তিনি খাতির করিতেন। প্রায়ই বলিতেন, ভবনাথ লোকটি ভারী অমায়িক, ভারী সরল। তাহার বিনীত ভব্য আচরণ হেডমাস্টারকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বিষ্ণুচরণ সম্পর্কে যে সকল কথা তিনি ভবনাথের মুখে শুনিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়াও মনে হইয়াছিল। ভবনাথ হাতজোড় করিয়া একদিন বলিয়াছিলেন—"দেখুন হেডমাস্টারবাবু, বিষ্টুকে স্কুলে দিয়েছি বিয়ের সুবিধে হবে বলে। এটা আমি জানি চাষবাস করে আর দোকান চালিয়েই ওকে খেতে হবে। ডাক্তার, উকিল, হাকিম এসব হবার যোগ্যতা ওর নেই। তবে কি জানেন, ভদ্রলোকের ছেলে একেবারে গোমূর্খ হলে দেখতে শুনতেও খারাপ দেখায়, ভদ্রঘরে বিয়ে দেওয়াও শক্ত হয়। কারণ সব মেয়েরই বাপের আকাঙ্ক্ষা জামাইটা একটু লেখাপড়া জানা হোক। তাই আমার প্রার্থনা প্রমোশনটা ওকে দিয়ে দেবেন মাঝে মাঝে। আপনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান লোক, আপনাকে অকপটেই সব নিবেদন করলাম। ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস পর্যন্ত ঠেলেঠুলে তুলে দিন ওকে। তারপর বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত ওই ক্লাসেই থাক। বিয়ের সম্বন্ধ এলে বলতে পারব ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ছে। বুঝলেন না—"

হেডমাস্টারমহাশয় বুঝিলেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তিনি জানিতেন যে শিক্ষাপ্রসারের হুজুকটা আধুনিক যুগের একটা বাতিকমাত্র। তাঁহার দৃঢ়ধারণা ছিল যে শত চেষ্টা করিয়াও সকলকে শিক্ষিত করা যায় না। আবার চেষ্টা না করিলেও, এমন কি বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাভূত করিয়াও, কতকগুলি লোক শিক্ষিত হয়। তাঁহার এই ধারণার স্বপক্ষে উদাহরণও তিনি দেখাইতেন। বলিতেন যে সব জ্ঞান-তপস্বীর সাধনা যুগে যুগে মানবসভ্যতাকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে তাঁহাদের অধিকাংশই দরিদ্রের অথবা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের লেখাপড়া করিবার সুযোগসুবিধা ছিল না। অনেকে দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পর্যন্ত পাইতেন না, তবু তাঁহারা প্রকৃত শিক্ষালাভ করিয়াছেন। আর ধনীর ঘরের আদুরে নন্দদুলালেরা, যাহাদের সুখসুবিধার অন্ত নাই, তাহারা কিছুই করিতে পারিতেছে না। তাহারা নানারকম পোশাক ও বুলির নকল পেখম আস্ফালন করিয়া প্রকৃত ময়ূরদের বিব্রত করিতেছে মাত্র। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি মনে করিতেন যে যাহার সত্যিই বিদ্যালাভ হইবে তাহার আগ্রহকে কোন কিছুই বাধা দিতে পারে না, আর যাহার সে আগ্রহ নাই তাহাকে বিদ্যা গিলাইয়াও বিদ্বান করা যাইবে না, বড় জোর সে একটা বুলি-কপচানো তোতাপাখি হইতে পারে। বহু বাধা সত্ত্বেও পাখি আকাশে ডানা মেলিবে, শত শিক্ষা দিলেও কেঁচো তাহা পারিবে না। কিন্তু বর্তমান যুগে ইহাই যখন নিয়ম যে সাপ, ব্যাং, কেঁচো, শামুক সকলকে এক গোয়ালে পুরিয়া একই শিক্ষা দিয়া পাখি করিবার চেষ্টা করা হোক এবং সে নিয়ম পরিবর্তন করিবার সাধ্যও যখন তাঁহার নাই তখন চুপ করিয়া দশটা পাঁচটা চাকরি করিয়া যাওয়া ছাড়া আর তিনি কি করিতে পারেন? ভবনাথের অতি সঙ্গত অনুরোধটি পালন না করারই বা কি হেতু থাকিতে পারে?

সুতরাং তিনি বিষ্ণুচরণকে "পুশ" করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিষ্ণুচরণের যোগ্যতা এমনই

অসাধারণ ছিল যে, প্রায় কোন বিষয়েই সে পাস নম্বর সংগ্রহ করিতে পারিত না। হেডমাস্টারমহাশয়ের অনুরোধে পরীক্ষকরা তাহাকে "গ্রেস"ও দিতেন, তবু সব সময় কুলাইত না! তাই কোনও কোনও ক্লাসে তাহাকে একাধিক বৎসর আটকাইয়া পড়িতে হইয়াছিল। ইহাতে বিষ্ণুচরণের ভ্রূক্ষেপ ছিল না, কিন্তু ভবনাথ চিন্তিত হইয়া পড়িতেন। আশেপাশের গ্রাম হইতে দুই চারটি বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছিল, কিন্তু বিষ্ণুচরণের বিদ্যার বহর দেখিয়া তাহারা পিছাইয়া গেল। এই সব দেখিয়া ভবনাথ মাঝে মাঝে দমিয়া যাইতেন। ভাবিতেন ছেলেটার কি তাহা হইলে বিবাহ হইবে না? যার তার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া যায় না। একমাত্র ছেলে, ভদ্রবংশের কন্যা চাই। কিন্তু ভদ্রবংশীয় কন্যার পিতারা মূর্খ জামাই চান না। শিক্ষিত জামাই লাভ করিবার জন্য তাঁহারা ঋণগ্রস্ত হইতে প্রস্তুত কিন্তু বিনা পণেও মূর্খ জামাই তাঁহারা পছন্দ করেন না। ভবনাথ সেইজন্য মাঝে মাঝে ক্ষেপিয়া গিয়া পুত্রকে তাড়না করিতেন, হেডমাস্টারের বাড়ি নানাবিধ উপঢৌকন পাঠাইতেন। বিষ্ণুচরণও দুই চারিদিন বই খাতা লইয়া সাড়ম্বরে পাড়া মাতাইয়া পড়াশোনা করিত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশানুরূপ ফল ফলিত না।

এই সব করিতে করিতে বিষ্ণুচরণের গোঁফ উঠিয়া গেল। আর একটা কাণ্ডও ঘটিল। বিষ্ণুচরণদের চাষের চাকর জামালুদ্দিন ইসলাম বিধান অনুসারে একসঙ্গে একাধিক বিবাহ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। অনেকগুলি পুত্র-কন্যা ছিল তাহার। তাহারাও বিষ্ণুচরণদের জমিতে মজুর খাটিত। জামালুদ্দিনের চতুর্থা কন্যা ফতিমার বয়স যখন মাত্র দশ বৎসর তখন হইতেই সে বাপের সঙ্গে মাঠে যাইত। ভবনাথের নির্দেশে বিষ্ণুকেও প্রত্যহ চাষের তদারক করিতে যাইতে হইত। নিয়তির অমোঘ চক্রান্তে এই ফতিমাকে বিষ্ণুচরণের একদিন ভাল লাগিয়া গেল। মেয়েটার চোখেমুখে কি যে মায়া মাখানো ছিল, তাহার হাসিতে, চাহনিতে, হাব-ভাবে, চলন-বলনে কি যে মাধুরী উচ্ছলিত হইত তাহার বিশদ বর্ণনা বিষ্ণুচরণই করিতে পারিত যদি সে কবি হইত। কিন্তু কাব্যরচনা করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না, সে কেবল মুগ্ধ হইয়া গেল। একটা জিনিস ভাবিয়া সে বিস্মিত হইয়া যাইত। ফতিমাকে সে ছেলেবেলা হইতেই চেনে, কিন্তু একটি বিশেষ দিনে, বিশেষ মুহূর্তে, বিশেষ পটভূমিকায় হঠাৎ যেন সে অনুভব করিল ফতিমা তাহার অত্যন্ত আপন। পটভূমিকাটাও নূতন নয়, দিগন্তবিস্তৃত মাঠে এরকম দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়। যতদূর দৃষ্টি চলে সবুজের পর সবুজ, কচি কচি ধানের চারার উপর পদ্মার হাওয়া ঢেউ তুলিতেছে, কয়েকটা গাংচিল চক্রাকারে উড়িতেছে, একটা বাঁশের ডগায় নীলকণ্ঠ বসিয়া আছে, সমুজ্জ্বল সূর্যকিরণে চতুর্দিক উদ্ভাসিত, সহসা ছায়া ঘনাইয়া আসিল। বিষ্ণুচরণ ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল একটা কালো মেঘ আসিয়া সূর্যকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। একটা কোমল স্নিগ্ধতায় চারিদিক ঢাকিয়া গেল, সবুজ ধানক্ষেতের রূপ বদলাইয়া যাইতেছে...আলের উপর দাঁড়াইয়া আছে ফতিমা, পরনে লাল ডুরে শাড়ি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল হাওয়ায় উড়িতেছে, সুন্দর মুখখানি ফুলের মতো কোমল, বিষ্ণুচরণের মনে হইল—কি যে মনে হইল তাহা বিষ্ণুচরণও বলিতে পারিবে না—কিন্তু ফতিমা যে মুসলমানী একথা তাহার মনে একবারও জাগিল না। সে মুগ্ধনেত্রে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধমকাইয়া উঠিল।

"এই ফতি, কাজে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে, আমি বুঝি দেখতে পাচ্ছি না কিছু—"

ফতিমা একছুটে চলিয়া গেল।

সেইদিনই মাঠ হইতে ফিরিবার সময়, বিষ্ণু ফতিমাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল, "আজ সন্ধের পর দোকানে আসিস—"

"কেন?"

"আসিস না, এলে বলব।"

ফতিমার কালো চোখদুটি হাসিতে নাচিয়া উঠিল। সে যেন সব বুঝিতে পারিয়াছিল। সেদিন সন্ধ্যার সময় বিষ্ণুচরণ ফতিমাকে প্রথম যে প্রণয় উপহার দিল তাহা ফুল নয়, আতর নয়, কবিতা নয়, চুম্বনও নয়, দিল দুইটি রসগোল্লা, তাহাও দোকান হইতে চুরি করিয়া!

এইভাবেই শুরু হইল। সামাজিক বাধা না থাকিলে হয়তো সমাপ্তিটাও সুন্দর হইত। সামাজিক বাধা কিন্তু চিরকাল আছে, চিরকাল থাকিবে। সকলের সুখসুবিধার জন্য সমাজ। ব্যক্তিগত সুখদুঃখে বিচলিত হইয়া সমাজ আইন পরিবর্তন করে না। আইন-ভঙ্গকারীকে শাস্তি দিবার জন্য সমাজপতিরা সততই সশস্ত্র হইয়া থাকেন। অনেক সময় তাঁহারা উৎকোচের দ্বারা বশীভূতও হন। দেখা যায় যাঁহারা দরিদ্র অথবা প্রতিপত্তিহীন তাঁহারা গোপনতার আশ্রয় লইয়া থাকেন। ইহাই চিরাচরিত প্রথা। দরিদ্র বিষ্ণুচরণ সেই চিরাচরিত প্রথাই অনুসরণ করিতে লাগিল।

নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনীর কথা, প্রতাপ-শৈবলিনীর কাহিনী, পার্বতী-দেবদাসের গল্প আমাদের চিত্তকে বহুদিন হইতে বিগলিত করিতেছে, কিন্তু বিষ্ণুচরণ-ফতিমার ব্যাপারে যে আমাদের অন্তরে ক্রোধ ছাড়া আর কিছু উদ্রিক্ত হইবে না তাহা আমি জানি। কিন্তু তথাপি সত্যের অনুরোধে ঘটনাটা বলিতেই হইবে। কারণ বিষবৃক্ষের মূলই ওইখানে।

গোপনে গোপনে বিষ্ণুচরণের সহিত ফতিমার ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল। ঘনিষ্ঠতা বাড়িলেও সামাজিক ক্রিয়াকর্ম বাধা পাইল না। ফতিমার বাবা যথাকালে ফতিমার বিবাহ দিল, যথাকালে ফতিমা বিধবা হইল, যথাকালে সে আবার আর একজনের ঘরণী হইয়া চলিয়া গেল। ফতিমার দ্বিতীয় ভর্তা হামিদুল্লা মিঞা একটু বেশিরকম পুরুষ-প্রকৃতির লোক ছিলেন। ফতিমা ছাড়া আরও তিনটি নারীর পাণিপীড়ন তিনি করিয়াছিলেন। তাঁহার পৌরুষ এমনই উগ্র ছিল যে তাঁহাদের দাম্পত্যজীবনে থানা-পুলিশ, উকিল-আদালত প্রভৃতির অভ্যাগম মাঝে মাঝে নাকি অনিবার্য হইয়া উঠিত। ফতিমাকে প্রায়ই ক্ষতবিক্ষতদেহে পিতৃগৃহে পালিয়া আসিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইত। শোনা যায় পত্নীদের শাসন করিবার জন্য হামিদুল্লা বিশেষ ফরমাশ দিয়া একটি হান্টার প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। চামড়া এবং লোহার তারের সম্মিলনে প্রস্তুত হান্টারটি একবার অঙ্গ-স্পর্শ করিলে খানিকটা মাংস না লইয়া উঠিত না। উক্ত অস্ত্র দ্বারা কিন্তু হামিদুল্লা তাঁহার তৃতীয়া পত্নী হাসিনাকে সম্যকরূপে শাসন করিতে পারেন নাই। ক্রোধান্ধ হইয়া একদিন তাহাকে রামদা দিয়া কাটিয়াই ফেলিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার ফাঁসি হইয়া গেল। হামিদুল্লার যেদিন ফাঁসি হয় বিষ্ণুচরণ সেদিন নাকি গোপনে স্থানীয় পীরের নিকট পাঁচ পয়সার সিন্নি দিয়া আসিয়াছিল। কারণ এত সত্ত্বেও ফতিমার প্রতি তাহার প্রেম এতটুকু মলিন হয় নাই। ফতিমা যখন দ্বিতীয়বার বিধবা হইয়া ফিরিয়া আসিল তখন তাহার বয়স কুড়ি বছর। বিষ্ণুচরণের পঁচিশ। এই সময়েই পার্শ্ববর্তী হিন্দু জমিদারটির সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণরূপে সচেতন হইয়া উঠিল। একটু রাগ আগে হইতেই ছিল। কারণ উক্ত জমিদার-

কন্যা চন্দ্রলেখার সহিত ভবনাথ তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। মূর্খ বিষ্ণুচরণের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে জমিদারবাবু রাজি তো হননই নাই, উপরন্তু তিনি (এবং তাঁহার কন্যাও) বিষ্ণুকে চন্দ্রলোলুপ উদ্বাহু বামন বলিয়া পরিহাস করিয়াছিলেন। এই অপমানজনিত ক্রোধটা তাহার অন্তরে তুষাগ্নির মতো ধোঁয়াইতেছিল, ফতিমার মুখে সব কথা শুনিয়া তাহা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। উক্ত জমিদারবাবুই নাকি হাসিনার মৃত্যুর আসল কারণ, গহনার লোভ দেখাইয়া সত্যই নাকি লোকটা হাসিনাকে সৎপথ-ভ্রষ্টা করিয়াছিল! ফতিমাকেও সে প্রলুব্ধ করিতে ছাড়ে নাই। সমস্ত শুনিয়া বিষ্ণুচরণ গুম হইয়া রহিল। শপথ করিল যেমন করিয়া হোক সে একদিন প্রতিশোধ লইবেই।

ফতিমাকে তৃতীয়বার ঘরণী করিলেন মুন্সীগঞ্জের নিয়ামত আলী।। বৃদ্ধ নিয়ামত সজ্জন ছিলেন। সঙ্গতিসম্পন্নও ছিলেন। একটিমাত্র বিবাহ করিয়াছিলেন। উপযুক্ত দুইটি পুত্রও তাঁহার ছিল। সুখেই দিন কাটিতেছিল, কিন্তু সহসা জীবন-সন্ধ্যায় জীবন-সঙ্গিনীকে হারাইয়া তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এই বিব্রত ভাবটা কাটাইয়া উঠিবার জন্যই ফতিমাকে তিনি খুঁজিয়া বাহির করিলেন। পুত্ররা বাধা দিল না। জ্যেষ্ঠপুত্র রহমনের বাধা দিবার সুযোগই ছিল না, কারণ সে ছিল জেলে। কনিষ্ঠ পুত্র রমজান আপত্তি করিল না, কারণ তাহার বিবি পত্নীহীন নিয়ামতকে একা সামলাইতে পারিতেছিল না। তাঁহার বদনা, পিকদানী আগাইয়া দেওয়া, লুঙ্গী, গামছা ঠিক রাখা, পাঁচ ওক্ত নমাজের জন্য সতরঞ্চি বিছাইয়া দেওয়া, তাঁহার জন্য ঘন ঘন তামাক সাজা, তাঁহার শয়ন-ভোজনের সর্ববিধ তদারক-তদ্বির করা অর্থাৎ যে সকল কর্তব্য নিয়ামত-গৃহিণী করিতেন তাহার সবটাই স্ত্রী জেবউন্নিসার ঘাড়ে পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার অল্প বয়স, ষোল বৎসরও পুরা হয় নাই, তবু বেচারি যথাসাধ্য সব কাজই হাসিমুখে করিত, কিন্তু নিয়ামত আলীকে কিছুতেই সন্তুষ্ট করিতে পারিত না। নিয়ামত সর্বদাই হা-হুতাশ করিয়া বলিতেন, আহা, রহমনের যদি জেল না হইত তাহা হইলে আসগর মিঞার ভগ্নীর সহিত তাহার বিবাহ দিতেন, মেয়েটি রূপে, গুণে অসামান্যা, সে পুত্রবধূ হইয়া আসিলে এত কষ্ট পাইতে হইত না। জেবউন্নিসার অপটুতাকে কেন্দ্র করিয়া বাড়িতে অহোরাত্র একটা অশান্তির ঝড় বহিত। সুতরাং পিতা পুনরায় বিবাহ করিবেন মনস্থ করিয়াছেন জানিয়া রমজান স্বস্তির নিঃশ্বাসই ফেলিল। ফতিমার সহিত নিয়ামতের বিবাহ হইয়া গেলে কিছুদিন পরে সে আলাদা ঘরও বাঁধিল।

বিষ্ণুচরণের জীবনধারাও এই সময় গতিপরিবর্তন করিল। স্কুলের হেডমাস্টারমহাশয় নিজের কথা রাখিয়াছিলেন। বিষ্ণুচরণকে ম্যাট্রিকুলেশনের দ্বার পর্যন্ত তিনি পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। বিষ্ণুচরণ বার দুই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার সুযোগ পাইয়াছিল। আরও কয়েকবার হইতে পাইত কিন্তু হেডমাস্টারমহাশয় হঠাৎ একদিন অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িলেন। তাঁহার স্থানে বর্ধমান হইতে বেঁটেগোছের যে ভদ্রলোকটি নিযুক্ত হইলেন, তিনি অন্য ভাবের ভাবুক। স্বল্পভাষী, কড়াপ্রকৃতি। তিনি একদিন ভবনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, "আপনার ছেলেকে আর মিছিমিছি স্কুলে রেখেছেন কেন? ও আর ম্যাট্রিক পাস করতে পারবে না।"

ভবনাথ হাত কচলাইতে কচলাইতে সবিনয়ে বলিলেন,

"তাতো বুঝতেই পারছি, কিন্তু কি করি বলুন।"

"পুরোপুরি ব্যবসাতেই ওকে লাগিয়ে দিন।"

"তাই দেব, বিয়েটা যতদিন না হয় ততদিন স্কুলের খাতায় নামটা থাক, আমি চেষ্টা করছি খুব। বিয়েটা হয়ে গেলেই ওকে ছাড়িয়ে নেব। ছেলে পড়ছে জানলে বিয়ের সুবিধা হবে এইটুকু দয়া আপনি করুন।"

স্বল্পভাষী হেডমাস্টার তখন আর বিশেষ কিছু বলিলেন না। কিন্তু তাঁহার মুখভাব দেখিয়া ভবনাথ বুঝিলেন সুবিধা হইবে না। সেইদিনই সন্ধ্যার সময় প্রচুর মিষ্টান্ন উপঢৌকন লইয়া পুনরায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কড়াপ্রকৃতির সুশীল নাগ এবার ধমকাইয়া উঠিলেন।

"আমি কি দারোগা, না রেলের বাবু যে আপনি ঘুষ দিয়ে কাজ উদ্ধার করতে এসেছেন?"

ভবনাথ মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন কিছুক্ষণ। তাহার পর সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "আগের হেডমাস্টারবাবু আমার হাতের তৈরি মিষ্টি পছন্দ করতেন কিনা, তাই—"

"না, আমি ওসব পছন্দ করি না। আপনার ছেলেকেও আমি আর স্কুলে রাখতে পারব না। শুনছি স্কুলের প্রতিটি ছাত্রকে ও সিগারেট খাওয়াতে শিখিয়েছে—" ভবনাথ সবই জানিতেন। করজোড়ে বলিলেন, "ওকে আমি স্কুলে যেতে দেব না, খাতায় নামটা কেবল রাখুন। আদেশ করেন তো একবছরের মাইনে আমি অগ্রিম জমা করে দিচ্ছি। ওর বিয়েটা কোনরকমে দিয়ে দিতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।"

ইহা শুনিয়া সুশীল নাগের হঠাৎ প্রমথ ঘোষের কথা মনে পড়িয়া গেল। তাঁহার বাল্যবন্ধু প্রমথ ঘোষ অনেকগুলি কন্যা লইয়া বিব্রত। তাহার একটা মেয়ের সহিত বিষ্ণুর সম্বন্ধ করিলে কেমন হয়! পাত্র হিসাবে ছোকরা নিতান্ত নিন্দনীয় নয়। ঘরে খাইবার, পরিবার সঙ্গতি আছে, স্বাস্থ্যও ভাল। লেখাপড়ায় ভাল নয় অবশ্য, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি। উপার্জন করিবার জন্যই তো লেখাপড়া। প্রমথকে পত্র লিখলে হয়তো সে রাজি হইয়া যাইবে। ভবনাথ করজোড়ে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার দিকে চাহিয়া সুশীল নাগের হাসি পাইল, একটু দুঃখও হইল। শ্রদ্ধাও হইল একটু। পুত্র ভাল নয়, কিন্তু পিতাটি কর্তব্যপরায়ণ।

"পশ্চিমবঙ্গে যদি বিয়ে দেন, আপনার ছেলের সম্বন্ধ করি একটা। আমারই এক বন্ধুর মেয়ে আছে অনেকগুলি, আপনাদের পালটি ঘরও।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোনও আপত্তি নেই আমার। সদ্বংশের মেয়ে হলেই হল। আর আপনার বন্ধু যখন—তখন আর কথা কি। নিশ্চয়ই ভাল লোক হবেন। দূরের মেয়েই আনতে হবে। কারণ এখানে সবাই ভাংচি দিচ্ছে—"

"বেশ তা হলে চেষ্টা করি?"

"করুন।"

ভবনাথ নমস্কার করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। সুশীল নাগ ডাকিয়া বলিলেন, "মিষ্টিগুলো নিয়ে যান। বিয়েটা যদি লাগাতে পারি তখন মিষ্টি খাওয়া যাবে—"

সুশীল নাগের চোখের দিকে চাহিয়া ভবনাথ আর আপত্তি করিতে পারিলেন না।

বলিলেন, "বেশ, আপনার আদেশই শিরোধার্য করছি। বিয়ের কথাটা কিন্তু গোপন রাখবেন।"

"রাখব।"

পরদিনই নাগমহাশয় বন্ধু প্রমথ ঘোষকে পত্র দিলেন।

এদিকে বিষ্ণুচরণ আর এক কাণ্ড করিয়াছিল। সে মুন্সীগঞ্জে গিয়া নিয়ামত আলীর সহিত ভাব জমাইয়া আসিয়াছিল। অজুহাতের অভাব হয় নাই। বলিয়াছিল তাহাদের গ্রামের মেয়ে ফতিমা যখন নিয়ামত আলীর ঘরণী, তখন নিয়ামত আলী তো আপন লোক। প্রয়োজন হইলে সে নিয়ামত আলীকে পাটের কারবারে সাহায্য করিবে, কারণ অনেক পাট-চাষীর সহিত তাহার আলাপ আছে, নিজেরও জমিতে কিছু কিছু পাট হয়। সস্তায় পাট কিনিয়া দিবার ব্যবস্থা সে অনায়াসেই করিয়া দিতে পারে। বলা বাহুল্য, নিয়ামত আলীকে পাটের ব্যবসায়ে সাহায্য করিবার জন্য সে যায় নাই, গিয়াছিল কোন ছুতায় ফতিমাকে দেখিবে বলিয়া। বৃদ্ধ নিয়ামত কিন্তু পাটের ব্যবসাটার উপরই জোর দিলেন বেশি এবং বিষ্ণুচরণের এই সহৃদয় মনোবৃত্তিকে খোদার একটা বিশেষ করুণা বলিয়া গণ্য করিলেন। কারণ কনিষ্ঠপুত্র রমজান পৃথক হইয়া যাওয়াতে তিনি বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বার্ধক্যনিবন্ধন ব্যবসাব জন্য দৌড়ঝাঁপ করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না, রমজানই সব কিছু করিত। কিন্তু সে পৃথক হইয়া অন্য ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিয়াছিল। একটি মনোহারী দোকান খুলিয়া তাহাতেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতেছিল। পত্নীর প্ররোচনাতেই যে সে এভাবে নাচিয়া বেড়াইতেছে বৃদ্ধ নিয়ামত তাহা বুঝিতেছিলেন। কিছুদিন পরেই যে তাহার চৈতন্য হইবে তাহাও তিনি জানিতেন, কিন্তু ব্যাপারটার আকস্মিকতায় তিনি একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিষ্ণুচরণের আত্মীয়সুলভ মনোভাবে তাই তিনি প্রীত হইলেন এবং বলিলেন, "বেশ, তুমি পাট যোগাড় কর, আমি টাকা দেব। তোমার যাতে দু'পয়সা থাকে তা-ও দেখব। ঘরের ছেলের মতো তুমি যখন খুশি এস—"

বিষ্ণুচরণ ইহাই চাহিয়াছিলেন। নিয়ামত আলীর সহিত সে পাটের ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া পড়িল। ভবনাথও পুত্রের উপার্জন প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়া সুযুক্তি মনে করিলেন না। তিনি ইহা নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলেন যে ছেলেকে আর স্কুলে রাখা যাইবে না। হেডমাস্টার যেরূপ কড়া লোক, নামটাও হয়তো তিনি কাটিয়া দিবেন। পাটের ব্যবসা করিয়া সে যদি কিছু রোজগার করিতে পারে ভালই।

এইভাবেই মাস দুই কাটিয়া গেল। ফতিমার সান্নিধ্যে আসিয়া বিষ্ণুচরণের স্বপ্ন যখন রঙিন হইতে রঙিনতর হইয়া উঠিতেছিল, তখন হঠাৎ ভবনাথের একরঙা স্বপ্নটা সফল হইয়া গেল। নাগমহাশয়ের বন্ধু প্রমথবাবু একদিন সশরীরে আসিয়া হাজির হইয়া গেলেন। বিষ্ণুচরণকে দেখিয়া এবং ভবনাথের সহিত আলাপ করিয়া তিনি আনন্দলাভও করিলেন। ভবনাথকে সানুনয়ে অনুরোধ করিতে লাগিলেন তাঁহার কন্যা শিবানীকে দেখিয়া আসিবার জন্য। অর্থাৎ বিবাহ-ব্যাপারে যাহা যাহা ঘটা উচিত তাহা তাহা ঘটিয়া অবশেষে বিষ্ণুর সহিত শিবানীর একদিন বিবাহ হইয়া গেল। রোমান্টিক উপন্যাসের নায়করা সাধারণতঃ যাহা করিয়া থাকে, বিষ্ণুচরণ তাহার কিছুই করিল না। পিতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া হৃদয়-বিদারক বক্তৃতাও দিল না, আত্মহত্যা করিবারও চেষ্টা করিল না। ভালো ছেলের মতো টোপরটা মাথায় দিয়া বিবাহ করিয়া আসিল।

বিষ্ণুচরণের জীবনের আদর্শটা বাল্যকাল হইতেই বাস্তবধর্মী। যাহা অনিবার্য, তাহার

বিরুদ্ধে অনর্থক বিদ্রোহ করিয়া সে শক্তি বা কাল-ক্ষয় করিত না। ফতিমা যে কিছুতেই তাহার পত্নীর স্থান গ্রহণ করিতে পারে না এ সহজবুদ্ধি তাহার ছিল। পিতার পছন্দ অনুসারে আর একটি বালিকার পাণিপীড়ন করিয়া তাহাকে আর পাঁচজনের মতো সংসার করিতে হইবে ইহাও সে জানিত। সুতরাং অসম্ভবকে আয়ত্তাধীন করিবার হাস্যকর প্রয়াস না করিয়া সে নির্ব্বিবাদে বিবাহটি করিয়া আসিল। শিবানীকে তাহার মন্দও লাগিল না। ডাগরডোগর লাজুক কিশোরীটিকে ভালই লাগিল তাহার। ফতিমা অবশ্য গোপনে মাঝে মাঝে তাহাকে পরিহাস করিত, তাহার দুই একটা শ্লেষোক্তির মধ্যে ঈষৎ খোঁচাও যে না থাকিত তাহা নয়, কিন্তু মোটের উপর সে-ও অসন্তুষ্ট হয় নাই। সেও একদিন ঘটা করিয়া আসিয়া শিবানীকে শাড়ী, সিন্দুর উপহার দিয়া গেল। সবদিক দিয়াই ব্যাপারটা বেশ সুসম্পন্ন হইল। কোথাও কোন বেসুর বাজিল না। সর্বাপেক্ষা খুশি হইয়াছিলেন ভবনাথ। পুত্রের বিবাহ দিয়া তিনি যেন চরিতার্থ হইয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে যাহা ঘটিল তাহাতে মনে হয় এই সাংসারিক কর্তব্যটুকু অসম্পূর্ণ ছিল বলিয়া ভবনাথ সংসারত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না। বিবাহের কিছুদিন পরে বিষ্ণুচরণকে বিষয়ের সমস্ত খুঁটিনাটি বুঝাইয়া দিয়া, শিবানীর হস্তে ভাণ্ডারের চাবিটি সমর্পণ করিয়া তিনি তীর্থে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে লইলেন মাত্র একশ'টি টাকা। কিছুকাল পরে কাশী হইতে তাঁহার একটি পত্র আসিয়াছিল, তিনি আরও পঞ্চাশটি টাকা পাঠাইতে লিখিয়াছিলেন। মাস ছয়েক পরে বৃন্দাবন হইতে আর একটি পত্র আসে, তাহাতে টাকা পাঠাইবার কথা ছিল না। শিবানীর অনুরোধে বিষ্ণুচরণ তবু একশত টাকা পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু মনিঅর্ডার ফিরিয়া আসিল। চিন্তিত বিষ্ণুচরণ চিঠি লিখিল, টেলিগ্রাফ করিল, কিন্তু কোন জবাব আর আসিল না।

বিষ্ণুচরণ কুপুত্র হইতে পারে কিন্তু পিতার অন্তর্ধানে সে অবিচলিত থাকিতে পারিল না। কর্তব্যনির্ধারণ করিবার জন্য সে হেডমাস্টারমহাশয়ের নিকটে গেল। নাগমহাশয় পরামর্শ দিলেন চিঠিপত্র লিখিয়া যখন কোন ফল হইতেছে না তখন নিজে গিয়া খোঁজখবর করা উচিত। বিষ্ণুচরণ অবিলম্বে বাহির হইয়া পড়িল। কাশী গেল, বৃন্দাবনেও গেল। বৃন্দাবনে যে ঠিকানায় সে পিতাকে শেষবার টাকা পাঠাইয়াছিল এবং যে যে টাকা তিনি লইয়াছিলেন সেই ঠিকানায় গিয়া সে শুনিল যে ভবনাথ নাকি একদল তীর্থযাত্রীদের সহিত কেদারবদরির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন। ইহার বেশি কোনও খবর কেহ বলিতে পারিল না। দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতির দ্রষ্টব্য দৃশ্য বা হর্ম্যগুলি দেখিয়া বিষ্ণুচরণ কিছুদিন পরে ফিরিয়া আসিল। নাগমহাশয় পুনরায় পরামর্শ দিলেন, "খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দাও, পুলিশেও একটা খবর জানিয়ে রাখ।" বিষ্ণুচরণ তাহাই করিল। দেখিতে দেখিতে দুইটি বৎসর কাটিয়া গেল। কিন্তু নিরুদ্দিষ্ট ভাবনাথ আর কাহারও নাগালের মধ্যে ধরা দিলেন না। তখন স্বভাবতঃই সকলে অনুমান করিতে লাগিলেন, ভবনাথ সম্ভবতঃ ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। হিতৈষীর দল প্রথামতো তাহাকে উপদেশ দিলেন যে, দশ বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তবে যেন সে শ্রাদ্ধাদি করে। বিষ্ণুচরণ হয়তো হিতৈষীদের উপদেশ অমান্য করিত না। কিন্তু দশ বৎসরের মধ্যে রাজনৈতিক রথচক্র এত দ্রুতবেগে আবর্তিত হইয়া এমন অতর্কিতভাবে বিষ্ণুচরণের ঘাড়ে আসিয়া পড়িল যে, শ্রাদ্ধ করিবার অবকাশই সে পাইল না। যখন পাইল তখন ব্যাপারটা বেশ জটিল হইয়া গিয়াছে। মুসলমান পুত্র কি হিন্দুমতে হিন্দু পিতার শ্রাদ্ধ করিতে

পারে? মুসলমানী মতে করিলে হিন্দু পিতার আত্মা কি তৃপ্ত হইবে? জমিরুদ্দিনে রূপান্তরিত বিষ্ণুচরণ কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া অবশেষে চিন্তাই ছাড়িয়া দিল। নাগমহাশয় বাঁচিয়া থাকিলে হয়তো একটা সৎপরামর্শ দিতেন। কিন্তু তিনি বাঁচিয়া ছিলেন না, রায়টে মারা গিয়েছিলেন।

বিষ্ণুচরণের জমিরুদ্দিনে রূপান্তরিত হইবার কাহিনী আরও একটু বিশদ করিয়া বলিতে হইবে। না বলিলে শুধু যে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে তাহা নহে, গল্পটাই ভাল কবিয়া বলা হইবে না।

শিবানীকে বিবাহ করিয়া বিষ্ণুচরণ অসুখী হয় নাই। ফতিমার স্মৃতি যে তাহার দাম্পত্য-জীবনকে ম্লান করিয়াছিল এ কথাও সত্য নহে। তবে এ কথাও সত্য যে শিবানীকে পাইয়া সে ফতিমাকে ভোলে নাই। মোটেই না। নিয়ামত আলীর সহিত হৃদ্যতা এবং ব্যবসায় সম্পর্কে উত্তরোত্তর বর্ধিতই হইতেছিল। ফতিমাকে সে প্রায়ই দেখিতে পাইত। ফতিমাকে দেখিলে তাহার সমস্ত হৃদয় এমন একটা মধুর রসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত যাহা অবর্ণনীয়। একটু ক্ষোভও হইত। মনে হইত যে জীবনটা ব্যর্থই হইয়া গিয়েছে, আনন্দলোকের দ্বার আর খুলিবে না। শিবানীকে লইয়া সে যে সংসার পাতিয়াছে তাহাতে কোন অশান্তি নাই, পাঁচজনের দৃষ্টিতে তাহা সুখের সংসার, কিন্তু তাহাতে কিসের যেন একটু অভাব আছে। সেটা ঠিক যে কি তাহাও বিষ্ণুচরণ বুঝিতে পারিত না। তাহার কেবল মাঝে মাঝে মনে হইত শিবানীকে কেন্দ্র করিয়া তাহার গৃহস্থালী হয়তো আরও শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিবে, মিষ্টান্নের দোকান হয়তো আরও উন্নতি করিবে, পাটের ব্যবসায় আরও ফলাও হইবে কিন্তু প্রথম যৌবনে ফতিমাকে দেখিয়া যে রং তাহার কল্পনাকে রঞ্জিত করিয়াছিল, সে রং আর তাহার জীবনে লাগিবে না। আকাশের রামধনুর মতো আকাশে ফুটিয়া তাহা আকাশেই মিলাইয়া গিয়াছে। দূর হইতে যে অমৃতলোকের আভাস সে পাইয়াছিল—সমাজ প্রতিকূল না হইলে যেখানে সে অনায়াসে পৌঁছিতে পারিত—সে অমৃতলোক চিরকালের মতো অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন প্রত্যহ দোকানে বসা, চাষের ব্যবস্থা করা, পাট কিনিতে যাওয়া, হাটবাজাবে ঘোরা, শিবানীকে লইয়া সংসারধর্ম করা—এই বৈচিত্র্যহীন একরঙা জীবনের চক্রাকার আবর্তনই আমরণ চলিতে থাকিবে। অনাস্বাদিতপূর্ব মাধুর্য অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া কল্পনাকে আর আবিষ্ট করিবে না। ফতিমাকে যখনই দেখিত, এই সব কথা অস্পষ্টভাবে তাহার মনে হইত, জাতিভেদের বিরুদ্ধে নানা যুক্তিও তাহার মনে জাগিত, কিন্তু তাহাও অস্পষ্টভাবে। স্পষ্টভাবে জাগিবার মতো শিক্ষা তাহার ছিল না।

ঠিক এই সময়ে একটা অপ্রত্যাশিত আলোর ঝলক তাহার একঘেয়ে জীবনকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল কয়েকদিনের জন্য। পার্শ্ববর্তী গ্রামের চন্দ্রলেখা নাম্নী ধনী জমিদার-কন্যাটি কলিকাতায় হোস্টেলে থাকিয়া পড়াশোনা করিত। সে সহসা একদিন গ্রামে হাজির হইল। তাহার টাইট-করিয়া পরা জামা-কাপড়, তাহার লীলায়িত গতিভঙ্গি, তাহার চঞ্চল নয়নের চটুল চাহনি, তাহার নিটোল যৌবন, সমস্ত গ্রামের আবহাওয়াকে মদির করিয়া তুলিল। অনেক যুবকই মুগ্ধ হইল, বিষ্ণুচরণও হইল। তাহার মোহের সহিত একটু ক্ষোভও মিশিল। মনে পড়িল এই চন্দ্রলেখার সহিতই ভবনাথ তাহার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। উত্তরে চন্দ্রলেখার পিতা —

ওই দাম্ভিক জমিদারটা—পারিষদদের নিকট যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও বিষ্ণুচরণের মনে পড়িল। তিনি বলিয়াছিলেন, বামন উদ্বাহু হইয়া চাঁদ ধরিবার চেষ্টা করে এটা কবিদের অলীক কল্পনা বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কিন্তু ভবনাথের প্রস্তাব শুনিয়া তাঁহার সে ভ্রম ভাঙিয়া গিয়াছে। এই উক্তি বিষ্ণুচরণের মর্মে যে ক্ষত সৃজন করিয়াছিল তাহা যেন সহসা আবার জ্বালা করিয়া উঠিল। চন্দ্রলেখাকে দেখিতে পাইলেই সে তাহার দিকে প্রলুব্ধনয়নে চাহিয়া থাকিত। কিন্তু ওই পর্যন্ত। আর বেশিদূর অগ্রসর হইবার সাহস তাহার ছিল না, সে কল্পনাও সে করে নাই। কিন্তু এ কথাও ঠিক, এই সময়ে নবোদ্ভিন্নযৌবনা চন্দ্রলেখা যদি তাহার নয়ন-পথ-বর্তিনী না হইত তাহা হইলে বিষ্ণুচরণ জমিরুদ্দিনে রূপান্তরিত হইত কিনা সন্দেহ।

ইহার কিছুদিন পরে আর একটি ঘটনাও ঘটিল। নিয়ামত আলীর জ্যেষ্ঠপুত্র রহমন জেল হইতে ছাড়া পাইয়া ফিরিয়া আসিল। সে ছিল আলিপুর জেলে। এই আলিপুর জেলে বিধুভূষণের সহিত তাহার আলাপ হয়। শুধু মৌখিক আলাপ নয়, অন্তরের যোগাযোগও ঘটিয়াছিল। পুলিশের খাতায় রহমনকে গুণ্ডা বলিয়া অভিহিত করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে সে ছিল একজন বীর। সে অন্যায় সহ্য করিতে পারিত না, ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই একাধিকবার সে আইনের গণ্ডী লঙ্ঘন করিয়াছিল। সুতরাং চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনকারী একজন বীরকে স্বচক্ষে দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল এবং তাহার সান্নিধ্য-লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিল। বিধুভূষণ যেদিন জেল হইতে ছাড়া পাইয়া চলিয়া আসেন সেদিন রহমান অশ্রু-বিসর্জন পর্যন্ত করিয়াছিল। জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া রহমন পিতার পাটের ব্যবসায়ে যোগদান করিল। নিয়ামত আলী বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, পুত্রের হস্তে ব্যবসায় সমর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। এই সূত্রে বিষ্ণুচরণের সহিতও তাহার ঘনিষ্ঠতা হইল। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হইয়া এই সময় রমজানও মারা গেল হঠাৎ। বৃদ্ধ নিয়ামত আলী পুত্রশোক সহ্য করিতে পারিলেন না, একদিন সন্ন্যাসরোগাক্রান্ত হইয়া তিনিও মর্ত্যলোক ত্যাগ করিলেন। রহমান রমজানের বিধবাপত্নী জেবউন্নিসাকে বিবাহ করিয়া ফেলিল। এই সব নানা ঝঞ্ঝাটে বিধুভূষণের কথাটা তাহার মনে তত স্পষ্টভাবে জাগরূক থাকিতে পাইল না। কিন্তু বিধুভূষণকে সে যে ভুলিয়া যায় নাই তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন ঢাকার পথে সহসা তাহাকে একদিন সে দেখিতে পাইল। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল সে। বিধুভূষণ পাটের ব্যবসা উপলক্ষেই ঢাকায় আসিয়াছিলেন। তিনি জানিতেনও না যে রহমন একজন পাটের কারবারী। আকস্মিকভাবে যোগাযোগ ঘটিল এবং ক্রমশঃ তাহা মণিকাঞ্চন-জাতীয় হইয়া উঠিল। এই রহমনই বিধুভূষণের সহিত বিষ্ণুচরণের পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল। এই পরিচয় কালক্রমে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাতে পরিণতিলাভ করিল। পাটের ব্যবসায় জমিয়া উঠিতে দেরি হইল না। বিধুভূষণ এই সময়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিলেন। বিষ্ণুচরণও করিল।

ঠিক সেই সময়েই বিষ্ণুচরণ-চরিত্রে আর একটি জিনিসও মাথা চাড়া দিতেছিল ক্রমশঃ। লোভ। অর্থলোভ। অগ্নি যখন ভস্মাচ্ছাদিত থাকিয়া ম্রিয়মাণ থাকেন তখন তাঁহার জ্যোতির্ময় রূপটা লোকের চোখে পড়ে না। কিন্তু একবার যদি তাঁহাকে জাগাইয়া দিয়া ঘৃতাহুতি দেওয়া যায়, অমনি তাঁহার শিখা লেলিহান হইয়া ওঠে, সাধারণ লোকের চোখ ধাঁধিয়া যায়। অনেকের জীবনেই এ ঘটনা ঘটিয়াছে। বিষ্ণুচরণের জীবনেও ঘটিল। অগ্নির জ্যোতির্ময় রূপে মুগ্ধ হইয়া সে ক্রমাগত ঘৃতসংগ্রহে মন দিল। সে যখন সাধারণ গৃহস্থঘরের ছেলে ছিল, যখন

সামান্য একটা ছিটের জামা বা নূতন জুতা তাহার মনে স্বর্গসুখ আনয়ন করিত, তখন লোভের প্রচণ্ড প্রভাব তাহার চিত্তকে আচ্ছন্ন করে নাই। অর্থের প্রয়োজন সে অনুভব করিত, অর্থাভাবে কষ্ট পাইত, অর্থলাভ করিতে পারিলে আনন্দিতও হইত, কিন্তু অর্থের লোভে ক্লিষ্ট হইয়া সে কখনও বিনিদ্র রজনী যাপন করে নাই, অপরের বিপুল বিভব দেখিয়া তাহার চিত্ত কখনও পীড়িত হয় নাই। এ সব হইতে শুরু করিল যখন প্রয়োজনের অধিক অর্থ তাহার হাতে আসিয়া জমিতে লাগিল। চন্দ্রলেখার বাবার প্রচুর অর্থই যে তাহাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে, এই অর্থের জোরেই যে তিনি অতবড় একটা ব্যঙ্গোক্তি করিতে সাহস করিয়াছেন, এই ধারণা তাহার মনে দৃঢ় হওয়াতে সে আরও অর্থ উপার্জনের জন্য বদ্ধপরিকর হইল। সে যে বামন নয়, চন্দ্রলেখাকে পত্নীত্বে বরণ করিবার যোগ্যতা যে তাহার থাকিতে পারে এ কথাটা প্রমাণ করিবার জন্য সে যেন উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। তাহার জীবনের মূলমন্ত্র হইল—যেমন করিয়া হোক ধনী হইতে হইবে।

নূর মহম্মদের মৃত ভ্রাতা আলিজানের জমিটা বাকী খাজনার দায়ে নীলামে উঠিয়াছিল, নূর মহম্মদের সহিত পাল্লা দিয়া বিষ্ণুচরণ টাকার জোরে সে জমিটা ডাকিয়া লইল। বহু জেলেকে চড়া সুদে টাকা ধার দিয়া বিষ্ণুচরণ সুদের টাকায় শুধু যে বিনামূল্যে মাছ খাইতে লাগিল তাহা নয়, অনেকগুলি ধীবর পরিবারকে দাসানুদাস করিয়া ফেলিল। অনেক মজুরকেও অসময়ে সে টাকা ধার দিত, কিন্তু তাহা তাহাদের উপকারার্থে নয়, তাহাদের ঋণজালে আবদ্ধ করিয়া মুঠার মধ্যে রাখিবার জন্য। মজুরেরা বিনা মজুরিতে কিংবা কম মজুরিতে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস খাটিয়া চক্রবৃদ্ধি-হারে-বর্ধিত-ঋণ শোধ করিতে পারিত না। পাটের ব্যবসাতেও টাকার জোরে সে অনেক ছোটখাটো ব্যবসায়ীর মুখের গ্রাস ছিনাইয়া লইতে লাগিল। তবু তাহার শান্তি ছিল না, রাত্রে নিদ্রাও হইত না। কারণ সে সর্বদাই অনুভব করিত চন্দ্রলেখার পিতার মতো ঐশ্বর্য তাহার হয় নাই। শুধু চন্দ্রলেখার পিতা কেন, অনেকেই তাহার অপেক্ষা অনেক বেশি ধনী, বেশি মানী। অনেকেরই কলিকাতায় বাড়ি আছে, রাঁচিতে বাড়ি আছে, কাশীতে বাড়ি আছে, অনেকে রায়বাহাদুর খেতাব পাইয়াছে, বিলাতের বড় বড় ব্যবসায়ীর সহিত লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার করিয়া অনেকেই হু হু করিয়া কোটিপতি, অর্বুদপতি হইয়া যাইতেছে, কিন্তু সে কিছুই করিতে পারিতেছে না। তাহার একটা মোটরগাড়ি পর্যন্ত নাই, এখানেই এখনও পর্যন্ত একটা পাকা ইমারত সে বানাইতে পারিল না। চন্দ্রলেখার বাবা সব দিক দিয়াই লক্ষ্মীমন্ত। যেমন বাড়ি, তেমন গাড়ি, তেমনি ছেলেমেয়েগুলি, তেমনি বউ, বিষ্ণুচরণের বুক ফাটিয়া যাইত।

এই অবস্থায় বিধুভূষণের সহিত তাহার আলাপ হইল। কিছুদিন আলাপের পরই বুঝিল যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিয়া বিধুভূষণ যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু বিধুভূষণের বৈষয়িক কৃতিত্ব আরও প্রশংসনীয়। ফতুয়া-গায়ে আধময়লা-কাপড় পরা লোকটি বহু লক্ষ টাকার মালিক। বিষ্ণুচরণ শ্রদ্ধায় বিগলিত হইল। সবিনয়ে তাঁহাকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিল এবং ক্রমশঃ "দাদা" বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল। ইহাতে ফলও হইল। বিধুভূষণের অর্থানুকুল্যে ক্রমশঃ বিষ্ণুচরণ পাটের ব্যবসায়ে যেরকম লাভ করিতে লাগিল তাহা সত্যই আশাতীত। কলিকাতায় বাড়ি কিনিল। একটা মোটরগাড়িও

হয়ত কিনিয়া ফেলিত কিন্তু বিধুভূষণ বাধা দিলেন। বলিলেন, "দেখ ভাই, বেশি বাহ্যাড়ম্বর ভাল নয়! ওতে লোকের চোখ টাটায়, ব্যবসার সুবিধা হয় না। পাঁচজনকে তুষ্ট রাখলে পরেই লক্ষ্মী ঘরে আসেন। তাও আসেন চুপি চুপি, হৈ-হল্লা ভালবাসেন না তিনি। মোটর কিনে কি হবে এখন? কোলকাতায় আরও খানকয়েক বাড়ি কেন, তারপর ও সব কথা ভেব। এখন নয়। মোটর কিনলে মাসে দু'শ টাকা খরচ। ও সব বাবুয়ানি করবার সময় এখন নয়।"

বিধুভূষণকে চটাইবার সাহস বিষ্ণুচরণের ছিল না। মোটর কেনা হইল না।

ডাইরেক্ট অ্যাকশনের পৈশাচিক লীলা শুরু হইয়া গেল ঠিক ইহার কিছুদিন পরেই। কিছু যে একটা ঘটিবে তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে 'কিছু'টার চেহারা যে এমন ভয়ঙ্কর হইবে তাহা বিষ্ণুচরণ অনুমান করিতে পারে নাই। কেহই পারে নাই। ঝটিকার মতো দ্রুতবেগে এবং ব্যাপকভাবে ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল। সহসা বিষ্ণুচরণকে আবিষ্কার করিতে হইল যে সে হিন্দু বলিয়াই সকলের শত্রু হইয়া পড়িয়াছে। আশপাশের গ্রামে মৌলভীরা মীটিং করিয়া 'জিগির' দিতে লাগিল যে ইসলামকে রক্ষা করিতে হইলে কাফেরকে বধ করিতে হইবে। কয়েকজন পরিচিত হিন্দুর বাড়িতে আগুন লাগিয়া গেল, প্রকাশ্যে গো-বধ হইতে লাগিল, শোনা গেল কয়েকটি হিন্দু পরিবার সম্পূর্ণরূপে নিহত হইয়াছে। বিষ্ণুচরণের পরিচিত যে সব মুসলমান ছোকরা পূর্বে তাহার সামনে মুখ তুলিয়া কথা বলিতে পারিত না, দেখা গেল তাহারাই নেতৃস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে। তাহারাই একদিন সদলবলে আসিয়া বিষ্ণুচরণের বাড়িতে হাজির হইল। বিষ্ণুচরণকে প্রথমে আশ্বাস দিল তাহারা। বলিল বিষ্ণুচরণকে বা কোন ভাল লোককে বিব্রত করা তাহাদের উদ্দেশ্য নয়। তাহারা কেবল অত্যাচারী হিন্দুদের দমন করিতে চায়! পাশের গাঁয়ের জমিদারটি অতিশয় দর্পী এবং অত্যাচারী। এই লোকটিকে শিক্ষা দিবে বলিয়া তাহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছে। শিক্ষা দেওয়াব অর্থ তাহাকে সবংশে নিধন করা এবং তাহার সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া আত্মসাৎ করা। এই মহৎ কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য তাহারা বিষ্ণুচরণের সাহায্য প্রার্থনা করিল।

"কোন জমিদার?"

"চন্দ্রলেখার বাবা।"

বিষ্ণুচরণ নির্বাক হইয়া রহিল। তাহার অন্তরের পুরাতন ক্ষতটা সহসা রক্তাক্ত হইয়া উঠিল।

"চন্দ্রলেখাকেও মেরে ফেলবে?"

"ওকে ধরে বিয়ে করব, মারব কেন?"

"কে বিয়ে করবে?"

"যদি চাও তুমিই করতে পার। তুমি না চাও আর কেউ করবে। ওকে মারব না।"

বিষ্ণুচরণ আবার নির্বাক হইয়া গেল। লোকটার ঐশ্বর্য-আস্ফালন অনেকদিন হইতেই তাহার চিত্তকে তিক্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার দ্রুত ধাবমান মোটরগাড়িটা বহুদিন তাহার গায়ে কাদার ছিটা দিয়া গিয়াছে। বামন-চাঁদের উপমাটাও মনে পড়িল। লোকটার উদ্ধত মাথাটাকে পায়ের তলায় গুঁড়াইয়া দিবার সুযোগ যখন মিলিয়াছে তখন সেটা ছাড়া উচিত কি? তা ছাড়া আর একটা কথা। সে যদি ইহাদের সহায়তা করিতে অসম্মত হয় তাহা হইলে

সে নিজেই যে বিপন্ন হইয়া পড়িবে। ইহাদের ভাবভঙ্গি ভাল নয়। কিছুক্ষণ ভাবিয়া সে অবশেষে প্রতিশ্রুতি দিল যথাসাধ্য সাহায্য করিবে। দুষ্টের দমন তো করাই উচিত।

"আমাকে কি করতে হবে বল—"

"লোকটার বন্দুক আছে, তাই আমরা ভয় পাচ্ছি। তুমি এক কাজ কর। তুমি ভয়ের ভান করে তার বাড়িতে গিয়ে সপরিবারে আশ্রয় নাও। এমন একটা ভান কর যেন আমাদের ভয়ে পালিয়ে গিয়ে তুমি তার আশ্রয় চাইছ। তুমি ওখানে গিয়ে আড্ডা গাড়বার পর আমরা একদিন গিয়ে হাজির হব। পারো তো বন্দুকটা সরিয়ে ফেলো। আর তা যদি না পার বাড়ির গেটটা তো খুলে দিতে পারবে। আমরা যদি পিল পিল করে একসঙ্গে ঢুকে পড়তে পারি তখন একটা বন্দুক দিয়ে ও আর কি করবে—"

শিবানী কিন্তু বাঁকিয়া বসিল। বিষ্ণুচরণ শিবানীকে সব কথা খুলিয়াও বলে নাই, তবু সে যাইতে আপত্তি করিল।

বলিল, "নিজেদের বাড়ি ছেড়ে তাদের বাড়িতে যাব কেন? ওদের সঙ্গে তোমার মনের মিল নেই, আমি ওদের বাড়ির কাউকে চিনি না, ওখানে কি যাওয়া যায়? যদি পালাতেই চাও কোলকাতায় চল—"

"সেখানে ভীষণ কাণ্ড চলছে।"

"তা হলে আমাদের বাড়ি বর্ধমানে চল।"

বিষ্ণুচরণ চটিয়া উঠিল।

"যাবে কোন্ দিক দিয়ে? যাওয়ার সব পথ যে বন্ধ। সব ঘাঁটি আগলে বসে আছে ওরা। একটি হিন্দুকে বেরুতে দেবে না।"

"তা হলে নিজের ভিটে আঁকড়েই মরব। কোথাও যাব না।"

শিবানীর আপত্তি কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকিল না। ইহার কারণ বিষ্ণুচরণ স্বামী এবং শিবানী তাহার সতী স্ত্রী। শিবানী যখন বুঝিল যে বিষ্ণুচরণকে কিছুতেই নিরস্ত করা যাইবে না, তখন সে হিন্দু স্ত্রীর চিরন্তন আদর্শ অনুসারে স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করাই শ্রেয় মনে করিল। গত্যন্তর ছিল না।

...গভীর রাত্রে গরুর গাড়িতে নিজেদের জিনিসপত্র বোঝাই করিয়া তাহারা জমিদারবাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি। চতুর্দিকে জনমানবের কোন সাড়া নেই, ঝিল্লী পর্যন্ত ডাকিতেছে না। শিশুপুত্রটিকে কোলে লইয়া শিবানী পাষাণ-প্রতিমার মতো বসিয়াছিল। কোথায় চলিয়াছে সে! এটা গ্রামের পথ, না শ্মশান!

কিছুক্ষণ পরে তাহারা জমিদারবাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়িটা যেন দৈত্যের মতো নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। জনপ্রাণীর সাড়া নাই। গেটটা ভিতর হইতে বন্ধ, কিন্তু তালা বন্ধ নয়। গাড়োয়ান পাঁচিলে চড়িয়া ভিতরে লাফাইয়া পড়িল এবং অনায়াসেই গেটটা খুলিয়া দিল। কেন কোনও প্রতিবাদ করিল না, একটা সাড়াশব্দ পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

গাড়োয়ান হাসিয়া বলিল, "সবাই অঘোরে ঘুমুচ্ছে। আপনারা বারান্দায় উঠে বসুন। কাল সকালে দেখা হবে—"

শিবানী সভয়ে বলিল, "ওদের শুনছিলাম বড় বড় বিলিতি কুকুর আছে। একটাও তো দেখছি না—"।

গাড়োয়ান আর একটু হাসিয়া জবাব দিল—"বড়লোকের কুকুরও বড়লোক মা-ঠান। তারা কি পাহারা দেয়! তারাও রাত্তিরে গদিতে শুয়ে ঘুমোয়।"

গাড়োয়ানের নির্দেশ-অনুসারে বিষ্ণুচরণকে অবশেষে সপরিবারে বারান্দাতেই আশ্রয় লইতে হইল। জমিদারবাড়ির কাহাকেও জাগাইতে তাহাদের সাহস হইল না, নিজেবাই সারারাত জাগিয়া রহিল। কল্পনাতীত বলিয়া একটা জিনিস তাহারা লক্ষ্য করিতে পারে নাই। গাড়োয়ান জাফর যাইবার সময় গেটটি বাহির হইতে তালা বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল! এই জাফরকে বিষ্ণুচরণ অল্প সুদে টাকা দিয়া-অনেক সাহায্য করিয়াছিল একদিন। সে যে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করিবে এ আশঙ্কা তাহার মনে একবারও জাগে নাই। প্রভাতে উঠিয়া তাহার চক্ষুস্থির হইয়া গেল। খবর পাইল জমিদারবাবু নিজের সমস্ত জিনিসপত্র লইয়া সপরিবারে অনেক আগেই পলায়ন করিয়াছেন। বাড়িতে একটি লোকও নাই। কাকাতুয়াটা পর্যন্ত লইয়া গিয়াছেন তাঁহারা। তাঁহারই এক মুসলমান চাকর আসিয়া সংবাদটি দিল। অনেকদিন আগেই তিনি দাঙ্গার আভাস পাইয়াছিলেন এবং ধীরে ধীরে মালপত্র সরাইয়া ফেলিতেছিলেন। তাঁহার অনুগত মুসলমান প্রজারাই তাঁহাকে এ বিষয়ে নাকি সাহায্য করিয়াছিল। দাঙ্গার অব্যবহিত পূর্বে তিনি মোটরযোগে সরিয়া পড়িয়াছেন।

কিছুক্ষণ পরেই বিষ্ণুচরণের স্থির-চক্ষু কপালে উঠিল যখন ক্ষিপ্ত মুসলমান জনতা আসিয়া বাড়ি ঘেরাও করিয়া ফেলিল। তাহাদের কাহারও হাতে লাঠি, কাহারও হাতে রামদাও, কাহারও হাতে ছোরা। জনতার নেতা গেটের সামনে আসিয়া পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় যাহা বলিলেন তাহাব সারমর্ম এই যে, তাহাদের ধারণা হইয়াছে বিষ্ণুচরণই বিশ্বাসঘাতক। সে-ই নিশ্চয় গোপনে গোপনে সংবাদ দিয়াছিল তাই হিন্দু জমিদারবাবু পলাইয়া আত্মবক্ষা করিতে পারিয়াছেন, নতুবা ইহা সম্ভব হইত না। সুতরাং বিষ্ণুচরণের উপরই তাহারা প্রতিশোধ লইবে। গেট খুলিয়া দলে দলে লোক ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। বিযুঃচরণ লক্ষ্য করিল—অধিকাংশই তাহার খাতক।

সে কিছুক্ষণ গুম হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "ভগবান সাক্ষী, আমি বিশ্বাসঘাতক নই। আমি তোমাদেরই দলের লোক।"

"বিশ্বাস করি না সে কথা।"

"জবাই কর হালাকে" জনতার ভিতর হইতে একজন চিৎকার করিয়া উঠিল। লোকটা একজন মৎসব্যবসায়ী, কিছুদিন পূর্বেই সে বিষ্ণুর নিকট টাকা ধার লইয়াছিল। এখনও একটি পয়সা শোধ দেয় নাই।

"তোমরা কি আমাকে প্রাণে মারতে চাও?"

প্রশ্ন শুনিয়া জনতা স্তব্ধ হইয়া গেল সহসা। যে লোকটা আপদে বিপদে টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছে তাহাকে হত্যা করা হইবে কিনা এই প্রশ্নটা তাহাদেরও যেন ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ করিয়া দিল। দলের নেতাটি ক্ষণকাল পরে আগাইয়া আসিয়া বলিল, "তোমাকে প্রাণে মারার ইচ্ছে নেই দাদা। কিন্তু তুমি যে আমাদের আপন লোক সেটাই তোমাকে প্রমাণ করতে হবে কেবল।"

"কি করতে হবে বল?"

"মুসলমান হতে হবে। যদি মুসলমান হও, তোমাকেই দলপতি করব আমরা। আর তা যদি না হও তা হলে—"

শিবানী অপ্রত্যাশিতভাবে চিৎকার করিয়া উঠিল সহসা।

"আমি কিছুতেই মুসলমান হব না।"

জনতা অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। অশ্লীল ইঙ্গিতও করিল কে একজন। শিবানী কানে আঙুল দিল।

বিষ্ণুচরণ নীরব হইয়া গিয়াছিল। ভাবিতেছিল কি করা উচিত। সহসা ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে সহসা-প্রক্ষিপ্ত একটা আলোকরেখা তাহাকে যেন পথনির্দেশ করিতেছিল। যে শত্রুকে উচ্ছেদ করিতে আসিয়াছিল সে শত্রু ফাঁকি দিয়া নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। সহসা মনে হইল ওই লোকটাকে জব্দ করিবার জন্যই তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। তা ছাড়া বাঁচিয়া থাকাটাই কি সর্বাপেক্ষা বড় কথা নয়? আগে জীবন, তাহার পর ধর্ম। তা ছাড়া এই যে লোকগুলো আজ তাহাকে হত্যা করিতে আসিয়াছে ইহাদের প্রত্যেকেই কি তাহার কাছে উপকৃত নয়? ইহাদের স্বরূপ তো চেনা গেল। ইহাদের শাস্তিবিধান করিবার জন্যও বাঁচিতে হইবে। মরিয়া গেলে তো সব ফুরাইয়া গেল, তাহাতে লাভটা কি?

বিষ্ণুচরণ নিজের মনকে শক্ত করিবার জন্য বারম্বার নিজেকে বুঝাইতে লাগিল এই জীবন-মরণ-সমস্যায় দুর্বল হইলে চলিবে না। বাঁচাটাই সবচেয়ে বড় কথা।

শিবানীকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গেল, তাহার যুক্তিটা তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু অবুঝ শিবানী কোনও যুক্তিই শুনিল না। একটি কথাই সে বারম্বার বলিতে লাগিল, "প্রাণের চেয়ে মান বড়, ধর্ম বড়। এ কথা তুমি উচ্চারণও কোরো না—।"

শিবানীর কথায় বিষ্ণুচরণের মন টলিয়া গেল একটু। দ্বিধায় পড়িয়া গেল সে। শিবানীর সহায়তা পাইয়া তাহার বিবেকও তাহাকে বলিতে লাগিল, "ছি, ছি, পিতৃপুরুষের ধর্মটা বিসর্জন দিবে? উহাদের একটু বুঝাইয়া বলিলে হয়তো শুনিবে।"

দোলায়মানচিত্তে পুনরায় সে জনতার সম্মুখীন হইল।

"কি ঠিক করলে—"

দলপতি আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল।

"এখনও ঠিক করতে পারিনি কিছু। আমার বউ রাজি হচ্ছে না।"

"তাকে জবরদস্তি রাজি করতে হবে। গোবিন্দ পুরুতের বউও প্রথমে রাজি হয়নি। এখন দিব্যি গোস্ত, রুটি খাচ্ছে। তোমার বউও খাবে।"

"আরো একটু সময় দাও আমাকে।"

"সময় দিতে পারব না। অনেক জায়গায় যেতে হবে আমাদের।"

বিষ্ণুচরণ সত্যই কয়েকমুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। নির্বাক হইয়া নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল সে। তাহার নীচের ঠোঁটটা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। উপরের ঠোঁট দিয়া নিচের ঠোঁটটাকে চাপিয়া ধরিয়া রহিল। অনেকক্ষণ চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। কিন্তু যখন চাহিল নজরে পড়িল গেটের বাহিরে নিয়ামত আলীর বিধবা ফতিমা দাঁড়াইয়া আছে। মনে হইল তাহার চোখের দৃষ্টিতে যেন কাতর মিনতিপূর্ণ একটা মৌন প্রত্যাশা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে দৃষ্টি যেন বলিতেছে—যে সব দুস্তর বাধাবিঘ্ন আমাদের সুখের পথে এতকাল অন্তরায় হইয়াছিল তাহা তো এইবার অপসারিত হইতে চলিয়াছে, তবে তুমি ইতস্তত করিতেছ কেন?

বিষ্ণুচরণ কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। আর তাহার কোন দ্বিধা রহিল না।

বলিল, "আমি মুসলমান হব। তোমরা সব ব্যবস্থা করে ফেল—"

শিবানী একটু দূরে শিশুপুত্রটিকে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কথাটা তাহার কানে গেল।

"অ্যাঁ, বল কি, মুসলমান হবে তুমি—"

আর্তকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল সে এবং পরমুহূর্তে ছুটিয়া গিয়া যে কাণ্ড করিল তাহা অপ্রত্যাশিত। নিকটে একটা প্রকাণ্ড ইঁদারা ছিল, ছুটিয়া গিয়া তাহার ভিতর লাফ দিয়া পড়িল সে।

একটু পরে যখন তাহাকে তোলা হইল তখন বোঝা গেল জোর করিয়া তাহাকে কিম্বা তাহার শিশুপুত্রটিকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করা যাইবে না। দুইজনেই মারা গিয়াছে। বিষ্ণুচরণ নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখের একটি পেশীও বিচলিত হইতেছিল না। সমস্ত মুখটা যেন পাষাণ হইয়া গিয়াছিল। নির্নিমেষে সে শিবানীর মৃত-দেহটার দিকে চাহিয়াছিল। মরিবার সময়ও নিজের সন্তানকে সে ছাড়ে নাই, প্রাণপণে বুকের কাছে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে।

কয়েকদিন পরেই বিষ্ণুচরণ জমিরুদ্দিনে রূপান্তরিত হইল।

জমিরুদ্দিনে রূপান্তরিত হইয়া বিষ্ণুচরণ কিন্তু শান্তি পাইল না। অনেক লোকের স্বাভাবিক রূপ থাকে— প্রসাধনের প্রয়োজন হয় না, অনেকের গান গাহিবার স্বাভাবিক গলা থাকে— সাধিবার প্রয়োজন হয় না, তেমনি অনেকের যে-কোন অবস্থায় শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকে, শান্তির সন্ধানে তাহাদের ছটফট করিয়া বেড়াইতে হয় না। বিষ্ণুচরণের এরূপ স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল না। সে শান্তির সন্ধানে ধর্মত্যাগ করিল, কিন্তু শান্তি পাইল না। ঐহিক সুখ-সুবিধা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা সে পাইল বটে, তাহার বসতবাটি, বিষয়-সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইল না, তাহার দোকান অটুট রহিল, পবিত্র ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মৌলভীগণ তাহাকে অভিনন্দিত করিলেন, কিন্তু শান্তি সে পাইল না। ফতিমাকেও পাইল না। জনৈক খাঁটি মুসলমান ভদ্রলোকই নিয়ামত আলির রূপসী বিধবাটিকেও নিকা করিলেন। এ বিষয়ে ফতিমার বা জমিরুদ্দিনের অভিমতকে বিচার করিয়া দেখিবার সুযোগ কেহ দিল না। কারণ ফতিমা অথবা জমিরুদ্দিন কেহই নিজের দুর্বলতা কাহারও কাছে প্রকাশ করিয়া বলিতেই পারিল না। বলিতে পারিলেই যে সুফল ফলিত তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, কারণ একটা জিনিস বিষ্ণুচরণ অনুভব করিতেছিল, মুসলমান হইয়াও সে মুসলমান সমাজের অন্তরলোকে স্থান পায় নাই। সে যে প্রাণের ভয়ে বিষয়সম্পত্তি বাঁচাইবার জন্য ইসলামধর্ম বরণ করিয়াছে, এই সত্যটার আলোক তাহাকে যে মূর্তিতে সকলের নিকট প্রকটিত করিয়া দিল তাহা সম্মানার্হ নহে, শান্তিজনক তো নহেই। পরিচিত মুসলমানেরা তাহাকে দেখিলে মুখ ফিরাইয়া হাসিত। ফতিমার এক ভাই তাহাকে একদিন বলিল, "দাদাঠাকুর, আপনি নূর রাখুন, তা নাহলে ঠিক মানাচ্ছে না।"—বলিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসিল। বিষ্ণুচরণের কিছু করিবার উপায় ছিল না! একটু শুধু মুচকি হাসিত। তাহার মুচকি হাসিটা মুখোশের হাসির মতো অবশেষে তাহার মুখের উপর কায়েমী আসন পাতিয়া বসিয়া গেল।

বিষ্ণুচরণ রাত্রে নানারূপ বিকট স্বপ্নও দেখিতে লাগিল প্রায় প্রত্যহ। একদিন দেখিল

প্রকাণ্ড একটা রক্তের সমুদ্রে পিতা ভবনাথ হাবুডুবু খাইতেছেন, আশেপাশে অসংখ্য শব ভাসিতেছে। শিবানী এবং তাহার শিশুপুত্রটিও তাহার মধ্যে রহিয়াছে। শিবানীর চোখদুইটা যেন আতঙ্কে, বিস্ময়ে ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। আর একটা ব্যাপারও ক্রমশঃ তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, গভীর রাত্রে তাহার বাড়ির উঠানে কে যেন কাঁদে, ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদে, সে কতদিন রাত্রে উঠিয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া এদিক ওদিক খুঁজিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পায় নাই। ঘরের ভিতর ঢুকিলেই কিন্তু কান্নাটা আবার স্পষ্ট হইয়া ওঠে। লণ্ঠনের আলো উঠানে পড়িলেই কান্নাটা থামিয়া যায়, ঘরে ঢুকিলেই শোনা যায়। কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে, আবার শুরু হয়। বিষ্ণুচরণ অতিষ্ঠ হইয়া পড়িল। ইহা ছাড়া আর একটা ঘটনা ঘটিল যাহা তাঁহাকে গ্রাম ত্যাগ করিতে বাধ্য করিল।

গভীর রাত্রে প্রায়ই সে উৎকর্ণ হইয়া জাগিয়া থাকিত। বোধ হয় কান্নাটা শুনিবার জন্যই। একদিন রাত্রে খিড়কির দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ শুনিয়া সে বিছানায় উঠিয়া বসিল। তাহার মনে হইল দ্বারে কে যেন করাঘাতও করিতেছে। তাড়াতাড়ি লণ্ঠন জ্বালিয়া উঠানে বাহির হইল। বাহির হইয়া উঠানেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল সে খানিকক্ষণ। পুনরায় কড়ানাড়ার শব্দ হইল। তাহার অন্তরাত্মা ভয়ে শিহরিয়া উঠিল, মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হইয়া গেল। এতরাত্রে কড়া নাড়িতেছে কে? পুনরায় শব্দ হইল। আর সে স্থির থাকিতে পারিল না। আগাইয়া গিয়া কপাট খুলিয়া দিল। দেখিল আপাদমস্তক বোরখাঢাকা এক মূর্তি দাঁড়াইয়া আছে। বোরখার মুখের ঢাকনাটা খুলিয়া গেল। বিষ্ণুচরণ সবিস্ময়ে দেখিল—ফতিমা!

ফতিমা এদিক ওদিক চাহিয়া চুপিচুপি বলিল, "বিষ্ণুদা, তুমি পালাও এখান থেকে। তোমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলছে। অনেকে বলছে তুমি বিশ্বাসঘাতক, মুসলমানদের বিপদে ফেলবার জন্যেই মুসলমান হয়েছ। অনেকগুলো গুণ্ডাও আছে সে দলে। খবরটা তাই লুকিয়ে তোমাকে বলে গেলাম। ওরা কখন যে কি করবে তা বলা যায় না। তুমি গ্রাম ছেড়ে কোথাও চলে যাও।"

"কি হয়েছে? কে ষড়যন্ত্র করছে—"

"অতকথা বলবার সময় নেই। মোটকথা, তুমি এখন এখানে থেক না, চলে যাও।"

"যাব কোথা?"

"ঢাকায় যাও। সেখানে রহমান আছে। কোলকাতায় যাও না, সেখানে তুমি তিনখানা বাড়ি কিনেছিলে, সেগুলো আছে তো।"

"আছে। সেখানে বিষ্ণুচরণ গিয়ে বাস করতে পারত, কিন্তু জমিরুদ্দিন পারবে না। কোলকাতায় যে কাণ্ড হচ্ছে শুনেছি—"

"তা হলে ঢাকায় যাও। রহমনের কাছে আশ্রয় নাও গিয়ে, সে ঠিক তোমাকে সাহায্য করবে। আমি লুকিয়ে এসেছি, আর দাঁড়াব না, যাই—"

ফতিমা চলিয়া গেল। বিষ্ণুচরণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল খানিকক্ষণ। লণ্ঠনটায় তেল ছিল না, সেটাও নিবিয়া গেল। সেই অন্ধকারে একা দাঁড়াইয়া বিষ্ণুচরণ সহসা অনুভব করিল সে সর্বস্বান্ত হইয়াছে। তাহার পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব কেহ নাই, ধর্ম গিয়াছে, বিষয় সম্পত্তিও নিরাপদে নহে। ফতিমাও তাহার হইল না, চিরকালের মতো সে নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। আর হয়তো তাহার সহিত দেখাও হইবে না!

রহমান সত্যই বিষ্ণুচরণের সহিত সদ্ব্যবহার করিল। তাহাকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিল, নানারূপ সৎপরামর্শও দিল। তাহাকে পাকাপাকিভাবে মুসলমান সমাজভুক্ত করিয়া ফেলিবার জন্য তার বিবাহের বন্দোবস্ত সে-ই করিল। একদিন আসিয়া বলিল, পশ্চিম হইতে কতকগুলি অনাথা মুসলমান মেয়ে ঢাকায় পলাইয়া আসিয়াছে। তাহারা সকলে গভর্নমেন্টের খরচায় রেফিউজি ক্যাম্পে রহিয়াছে, গভর্নমেন্ট তাহাদের লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। বিষ্ণুচরণ যদি ইহাদের মধ্যে কাহাকেও ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইবেন এবং একটু তদ্বির করিলে বিষ্ণুচরণ ওরফে জমিরুদ্দিন পাকিস্তান সরকারে একটি ভাল চাকুরিও হয়তো পাইয়া যাইবে। রহমন নিম্নকণ্ঠে একথাও তাহাকে জানাইল সে খবর লইয়াছে, জুবেদা নাম্নী মেয়েটি ভদ্রবংশীয়া। মেয়েটি যে সুন্দরী তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই, কারণ এ বিষয়ে সে প্রত্যক্ষদর্শী। মাত্র এক লহমার জন্য সে জুবেদাকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিল; তাহার ধারণা জুবেদা সত্যই জমিরুদ্দিনের অর্ধাঙ্গিনী হইবার যোগ্যা। রহমনকে অসন্তুষ্ট করবার সাহস বিষ্ণুচরণ সংগ্রহ করিতে পারিল না—রাজি হইল। রহমনও উৎসাহিত হইয়া জুবেদার সম্বন্ধে আরও খবর সংগ্রহ করিতে লাগিল এবং বিবাহের প্রস্তাবটা যথাস্থানে পেশ করিয়া দিল।

রহমনই একদিন নবেন্দু বিশ্বাসকেও আনিয়া হাজির কবিল। বলিল, এ ভদ্রলোকের এখানে বাড়ি আছে, জমিদারি আছে। ইনি সেগুলো এক্স্চেঞ্জ কবতে চান। আপনাব কোলকাতায় তিনখানা বাড়ি আছে তো। বদলা-বদলি করে ফেলুন এর সঙ্গে। ইনিও ক্যালকাটা প্রপার্টি খুঁজছেন। আপনি যদি রাজি থাকেন আমি সব ব্যবস্থা কবে দিতে পারি। দু'জনেরই সুবিধা হবে এতে—"

বিষ্ণুচরণের গত্যন্তর ছিল না। তাহাকে বিবাহও করিতে হইল, সম্পত্তিও বদল করিতে হইল। রহমন সত্যসত্যই তাহার সুবিধাও করিয়া দিল অনেক। সে খবর সংগ্রহ করিল যে জুবেদা অনাথিনী বটে, কিন্তু বিধবা নয়, কুমারী। দাঙ্গায় সে পিতৃহীনা হইয়াছে। তাহার পিতা মেহের আলি আধুনিকরুচিসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার একমাত্র কন্যাটিকে বাল্যকালেই হারেমে পুরিবার ব্যবস্থা করেন নাই। তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতেছিলেন। মেয়েটি কলেজে পড়িতেছিল। কিন্তু সর্বনাশা দাঙ্গার ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া মেহের আলি প্রাণ হারাইয়াছিলেন। জুবেদাকে পলায়ন করিয়া প্রাণ ও মানরক্ষা করিতে হইল। তাহার পলায়নের ইতিহাস মর্মান্তিক।

জুবেদা মেয়েটি সত্যই খুব ভাল। স্বভাব অতি শান্ত, অতি মৃদু, অতি মিষ্ট। আকস্মিক এই পরিস্থিতিতে বেচারী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। গভর্নমেন্টও তাহাকে লইয়া বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, কারণ তাহার আত্মীয়স্বজনের কোন খবর তাঁহারা পাইতেছিলেন না। তাহার নিকট-আত্মীয় কেহ ছিলও না। আবদুল গফ্ফর খাঁর একজন ভক্ত ও দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় হোসেন খাঁর সহিত তাহার আলাপ ছিল, মেহের আলির ইচ্ছা ছিল হোসেন খাঁর সহিত জুবেদার বিবাহও দিবেন—কিন্তু দাঙ্গার জন্য সব গোলমাল হইয়া গেল। হোসেন খাঁ হয়তো বাঁচিয়া আছে, হয়তো নাই। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে জুবেদা হোসেন খাঁর নাম বলিল না; তাহার লজ্জা হইল।

জমিরুদ্দিনের সহিত বিবাহের প্রস্তাবটা জুবেদার নিকট আসিবার পূর্বে আরও গোটাতিনেক বিবাহের প্রস্তাব তাহার নিকট উপস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু জুবেদা সেগুলি

গ্রাহ্য করে নাই। কারণ তিনজনেরই একাধিক পত্নী বর্তমান ছিল, তিনজনেই প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন, তা ছাড়া আধুনিক যুগের কলেজী শিক্ষা কাহারও ছিল না। কর্তৃপক্ষও জুবেদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। জমিরুদ্দিনের সহিত বিবাহের প্রস্তাবটি যখন আসিল তখনও জুবেদা একটু বিব্রতবোধ করিতে লাগিল। জমিরুদ্দিনকেও তাহার পছন্দ হয় নাই, কিন্তু তাহার মনে হইল, এভাবে গভর্নমেন্টের স্কন্ধারূঢ় হইয়া থাকা অপেক্ষা বিবাহ করা ভাল। জমিরুদ্দিনের প্রতি তাহার অনুকম্পাও হইল। সে অনুভব করিল— ও বেচারাও আমারই মতো বিপন্ন। দাঙ্গায় যথাসর্বস্ব গিয়াছে, প্রাণটি বাঁচাইবার জন্য বিবাহ করিতে চাহিতেছে। বিবাহ করিলে গভর্নমেন্টের সাহায্য পাইবে, গভর্নমেন্ট সে প্রতিশ্রুতিও নাকি তাহাকে দিয়াছে। অনেক ভাবিয়াচিন্তিয়া জুবেদা শেষে রাজি হইয়া গেল। গভর্নমেন্টকে একটি অনুরোধ সে কেবল করিল। বিবাহের পর গভর্নমেন্ট জমিরুদ্দিনকে যদি পশ্চিম পাকিস্তানে কোন চাকুরিতে নিযুক্ত করেন তাহা হইলে জুবেদার সুবিধা হয়। কারণ বাল্যকাল হইতে পশ্চিম ভারতেই সে মানুষ হইয়াছে। মেহের আলি করাচী, লাহোর প্রভৃতি স্থানে ব্যবসায় করিতেন। শেষ বয়সে দিল্লীতে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। গভর্নমেন্ট এ অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। একদিন জুবেদা খাতুনের সহিত জমিরুদ্দিনের বিবাহ হইয়া গেল।

কর্তৃপক্ষ জমিরুদ্দিনের উপর সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার অনেক সুবিধাও করিয়া দিলেন। চাকুরি তো দিলেনই, নবেন্দু বিশ্বাসের ব্যাপারেও এমন ব্যবস্থা করিয়া দিলেন যাহাতে জমিরুদ্দিনেরই ষোল আনা সুবিধা হইল। তাঁহারা নবেন্দু বিশ্বাসকে বলিলেন যে তাহার বাড়ি বিষয়সম্পত্তি জুবেদা খাতুনকে বিক্রয় করিতে হইবে, তাহার নামেই দলিলপত্রাদি রচিত হইবে। মূল্যস্বরূপ তিনি বিষ্ণুচরণের কলিকাতার যে বাড়ি তিনখানি পাইবেন তাহার জন্য বিষ্ণুচরণ কলিকাতায় গিয়া পৃথক একটি বিক্রয়-দলিল লিখিয়া দিবেন। নবেন্দু বিশ্বাসের ইহাতে আপত্তি হইল না। বস্তুত, আপত্তি করিবার উপায়ও ছিল না। আপত্তি করিলে তাঁহার বিষয় বেদখল হইয়া যাইত। সুতরাং তিনি তাঁহার বাড়ি ও সম্পত্তি জুবেদা খাতুনকে নগদ মূল্য পাইয়া বিক্রয় করিতেছেন এই মর্মে দলিল লিখিয়া দিলেন। বিষ্ণুচরণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রহিল যে সেও কলিকাতায় গিয়া উক্ত মূল্যে বাড়ি তিনখানি নবেন্দু বিশ্বাসকে বিক্রয় করিতেছে এই মর্মে দলিলপত্র রেজেস্টারী করিয়া দিবে।

বিষ্ণুচরণের মৌখিক আশ্বাসটুকুমাত্র সম্বল করিয়া নবেন্দু বিশ্বাস কলিকাতায় ফিরিলেন এবং অবিলম্বে নিহত হইলেন।

চাকরির জন্য বিষ্ণুচরণ কখনও কলিকাতা, কখনও বোম্বাই, কখনও করাচী, কখনও দিল্লী যাতায়াত করিতে লাগিল। নবেন্দু বিশ্বাসের মৃত্যু-সংবাদটা যথাসময়ে তাহার কর্ণগোচর হইল। শোনা যায় সংবাদটা পাইয়া সে না কি বলিয়া উঠিয়াছিল—"খোদা মেহেরবান!"

কিন্তু এই নূতন জীবনের সহিত সে নিজেকে ঠিক খাপ খাওয়াইতে পারিল না। পারিলে হয়তো সে শান্তি পাইত। কিন্তু পারিল না। অতীতকে মানুষ সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারে না। অতীতের স্মৃতি, অতীতের সংস্কার, অতীতের বিবিধ বিচিত্র অনুভূতি মানুষের বর্তমানকে অমোঘভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। বিষ্ণুচরণ এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিল না। অতীতের

স্মৃতি কিন্তু মধুর বা করুণরসে তাহার চিত্তকে নিষিক্ত করিল না। অতীতের, যে সকল অনুভূতি তাহার চিত্তকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা মধুর নহে, তিক্ত; তাহা বঞ্চিত, অপমানিত, বিধ্বস্ত মনুষ্যত্বের অসহায়, ভাষাহীন ক্ষোভের হলাহলে বিষাক্ত। মহত্ত্ব, প্রেম বা অনুকম্পার লেশমাত্র ছিল না তাহাতে। হিন্দু বা মুসলমান জাতির উপরও তাহার রাগ হয় নাই, রাগ হইয়াছিল নারীজাতির উপর।

সে ভাবিয়া দেখিল নারীরাই তাহাকে দাগা দিয়াছে। যে ফতিমাকে সে বাল্যকাল হইতে ভালবাসিয়াছিল, তাহাকে শেষ পর্যন্ত সে পাইল না কেন? যখন হিন্দু ছিল তখন সে আরও দূরে সরিয়া গেল। ফতিমা যদি ঠিক সেই মুহূর্তটিতে গেটের সামনে আসিয়া না দাঁড়াইত, তাহার চোখে-মুখে তখন সে যদি একটা আকুল উৎকণ্ঠা লক্ষ্য না করিত, তাহা হইলে বিষ্ণুচরণ হয়তো মুসলমানই হইত না। তাহারই জন্য সে নিজের সমস্ত অতীতকে রসাতলে পাঠাইতে ইতস্তত করে নাই, অথচ সে আসিল না। সে ইচ্ছা করিলে কি তাহাকে স্বামীত্বে বরণ করিতে পারিত না? বিষ্ণুচরণের বিশ্বাস, নিশ্চয় পারিত। সে বরণ করে নাই, সে বরণ করিবার সামান্য ইচ্ছাটুকুও প্রকাশ করে নাই, তাহার কারণ যে ব্যক্তিকে সে বিবাহ কবিযাছে সে ধনে, মানে, মর্যাদায় বিষ্ণুচরণ অপেক্ষা অনেক বড়। স্ত্রীলোকমাত্রেই স্বার্থপর। তাহার পর ওই চন্দ্রলেখা। ও মেয়েটাও কি কম নাকি? তাহার সহিত যখন বিবাহের কথা হইয়াছিল তখন সে-ও নাকি বলিয়াছিল, "আমার তেল আর সাবানের খরচ সংগ্রহ করিতেই হিমসিম খেয়ে যাবেন, উনি চাইছেন আমাকে বিয়ে করতে!" বিশেষ করিয়া ওইকথা শোনার পর হইতেই তাহার সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়াছিল। তাহাদের এই সদম্ভ উক্তির জন্যই তো সে তাহাদের ষড়যন্ত্র করিয়া মুসলমান জনতার কবলে ফেলিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। সব পাজি, সব পাজি! শিবানীও কি কম স্বার্থপর? সেও তাহার দিকে তাকায় নাই। ধর্মটাই বড় হইল তাহার কাছে। স্বামীর চেয়ে কি ধর্ম বড়? হিন্দুশাস্ত্রে অন্তত এ কথা লেখে না।

কাহারও নিকট অর্থ বড়, কাহারও নিকট মর্যাদা বড়, কাহারও নিকট ধর্ম বড়। তাহার কোনই মূল্য নাই। জুবেদা-নাম্নী যে নারীটিকে সে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছে সে-ও অবশেষে আর এক ধরনের পেজোমির পরিচয় দিল। বেশ একটা জটিলতার সৃষ্টি করিল সে। যদিও বাঙালিনী (মেহের আলি নাকি বাংলাদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়ছিলেন, বাংলাদেশে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন) কিন্তু উত্তরপ্রদেশে মানুষ হওয়াতে তাহার চালচলন, কথাবার্তা, একটু স্বতন্ত্র ধরনের। উর্দু চমৎকার বলিতে পারে। বাংলাও বলে, কিন্তু মনে হয় যেন কেতাবী বুলি বলিতেছে। পূর্ববঙ্গের ভাষা বুঝিতেও পারে না, বলিতেও পাবে না। অত্যন্ত আদব-কায়দা-দুরস্ত, অতিশয় ভদ্র, অতিশয় মৃদু-স্বভাব, তাহার উপর রূপসী এবং শিক্ষিতা। বিষ্ণুচরণ ইহাকে লইয়া যে কি করিয়া ঘর করিবে প্রথম প্রথম তাহা ভাবিয়া পায় নাই। তাহার সহধর্মিণীরূপে সে যে বেমানান, ইহা উপলব্ধি করিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। ইহা সে নিঃসংশয়ে অনুভব করিয়াছিল যে বেগম-সদৃশা এই নিরুপমা নারীটিকে ঘরোয়া আটপৌরে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করিবার ক্ষমতা তাহার অন্তত নাই। সুতরাং তাহাকে ঘিরিয়া প্রথম প্রথম যে মনোভাব তাহার অজ্ঞাতসারেই গড়িয়া উঠিল তাহা সম্ভ্রমাত্মক। জুবেদা যেন একজন মাননীয়া অতিথি, অথবা কোন মূল্যবান আসবাব, এই ধরনের ভাবভঙ্গি তাহার আচরণে প্রকাশ পাইতে লাগিল। যে সমাজে বিষ্ণুচরণ (অথবা জমিরুদ্দিন) স্বাভাবিক, সে সমাজও জুবেদাকে

ঠিকমতো গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহার অতিমার্জিত আবির্ভাব কাহারও ব্যঙ্গের, কাহারও বা ঈর্ষার খোরাক জোগাইতে লাগিল। কেহ কেহ প্রলুব্ধ হইল, কেহ কেহ ইশারায়, ইঙ্গিতে প্রকাশ করিতে লাগিল যে বানরের গলায় মুক্তার মালা পরাইয়া দিয়া কর্তৃপক্ষ তো রসবোধের পরিচয় দেনই নাই, সুবুদ্ধিরও পরিচয় দেন নাই। বিষ্ণুচরণ কি এ 'চিড়িয়া'কে পুষিতে পারিবে? উহার জন্যই না আবার তাহার প্রাণ-সংশয় হয়! মোট কথা বিষ্ণুচরণ বেশ একটু বিপদে পড়িয়া গেল। কিন্তু ফতিমা, চন্দ্রলেখা, শিবানীর মতো জুবেদাও যে "পাজি" একথাটা প্রথমে সে ভাবিতেই পারে নাই। সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন তাহাকে আবিষ্কার করিতে হইল যে জুবেদাও শুধু পাজি নয়, খুব উঁচু-দরের পাজি। জুবেদা একদিনও তাহার সহিত একশয্যায় শয়ন করে নাই। বিষ্ণুচরণ মনে করিয়াছিল স্বাভাবিক লজ্জাই বোধ হয় ইহার কারণ। কালক্রমে উহা কাটিয়া যাইবে। কিন্তু একদিন জুবেদা তাহাকে বলিল, "দেখুন, আমরা দুজনেই বিপদে পড়ে বাধ্য হয়ে পরস্পরকে বিয়ে করেছি। আপনি ধর্মত্যাগ করেছেন বাধ্য হয়ে, আমি দেশত্যাগ করেছি বাধ্য হয়ে। একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার মধ্যে পড়ে সমস্ত দেশটাই উলটে পালটে গেছে। কিন্তু এখন অবস্থা ক্রমশঃ স্বাভাবিক হচ্ছে। এখন ইচ্ছে করলে আমরা এই অবাঞ্ছিত বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি। আপনি অনায়াসে আমাকে তালাক দিয়ে মনোমত বিয়ে করতে পারেন, আমিও নিজের দেশে ফিরে যেতে পারি।"

"দেশে গিয়ে তুমি থাকবে কোথা?"

"তার ব্যবস্থা একটা করেছি। এই দেখুন।"

জুবেদা যে বি. এ. পাস বিষ্ণুচরণ তাহা জানিত না। জুবেদা যাহা দেখাইল তাহা একটি নিয়োগ-পত্র। তাহাতে লেখা রহিয়াছে যে করাচীর কাছাকাছি একটি বালিকা-বিদ্যালয়ে জুবেদা খাতুন বি. এ. মাসিক দুইশত টাকা বেতনে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। নিয়োগপত্রটির দিকে চাহিয়া বিষ্ণুচরণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

"কবে তুমি এ দরখাস্ত করেছিলে?"

"মাসখানেক আগে।"

"সত্যিই তুমি চাকরি করতে চাও?"

"স্বাধীনভাবে উপার্জন করাই তো ভাল। আপনি যে কাজ পেয়েছেন তাতে করাচীতে মাঝে মাঝে আপনাকে যেতেই হবে, আমিও যদি ওই অঞ্চলে চাকরি করি, আপনার সঙ্গে দেখা-শোনা হবে। এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল। এখানে কারও সঙ্গে খাপ খাবে না আমাদের। আপনার তো খাবেই না।"

বিষ্ণুচরণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার অধরপ্রান্ত ক্ষণিকের জন্য একবার কাঁপিয়া উঠিল মাত্র।

"তুমি আমার স্ত্রী হয়ে থাকতে চাও না?"

"আমাকে যদি ছেড়ে দেন, আমি খুশি হব। যদি না দেন আমার কিছু বলবার নেই অবশ্য, কারণ আমি ইচ্ছে করেই আপনাকে বিয়ে করেছি। কেন সে ইচ্ছা করেছিলাম তাও আপনাকে জানিয়েছি। গভর্নমেন্টের অনুগৃহীত হয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল আমার পক্ষে। আমি ভেবেছিলাম বিয়ে করলে আমরা দু'জনেই মুক্তি পাব। মুক্তি পেয়েওছি। এখন আর বিয়েটাকে আঁকড়ে থাকার কোন অর্থ হয় না।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জুবেদা বলিল, "এই চাকরি আমি যদি আগে পেতাম তা হলে বিয়ে করতাম না।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বিষ্ণুচরণ বলিল, "কিন্তু তোমাকে আমি ছেড়ে দিতে চাই না"— কথাগুলি বলিয়াই সে ভ্রূকুঞ্চিত করিল। কেন করিল তাহা সে নিজেও হয়ত বলিতে পারিত না। তাহার কুঞ্চিত ভ্রূর দিকে চাহিয়া জুবেদা মৃদুহাস্য করিল।

বলিল, "আপনার মুখ দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে কথাগুলো আপনি আনন্দের সঙ্গে বলছেন না!"

বিষ্ণুচরণের মুখে যে মুচকি হাসিটা স্থির হইয়া গিয়াছিল সেইটাকেই আর একটু প্রসারিত করিয়া সে বলিল, "আনন্দের সঙ্গে বলছি না, ভেবেচিন্তে বলছি। তোমাকে ছাড়া আমার পক্ষে নিরাপদ নয় এখন। অন্য কোন পথ নেই। হিন্দু-সমাজে আর আমি ফিরতে পারব না, সে পথ চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গেছে—"

"কেন, শুদ্ধি করে শুনেছি—"

"শুদ্ধি করে আইনত হয়তো আমি হিন্দু হতে পারি কিন্তু সমাজের যে জায়গাটি ছেড়ে এসেছি, কোনও আইনই সেখানে আমাকে আর পৌঁছে দিতে পারবে না। মুসলমান হয়েও দেখছি আমার পরিচিত মুসলমান বন্ধুরা আমাকে ঠিক আপন করে নিতে পারেনি। আমি যে প্রাণের ভয়ে মুসলমান হয়েছি, আমি যে খাঁটি মুসলমান নই, একথাটা তারা ভুলতে পারছে না। তাদের কথাবার্তায়, তাদের চোখের দৃষ্টিতে একটা অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠেছে। তুমি যা বলেছ তা ঠিকই। নূতন দেশে গিয়েই নূতন জীবন আরম্ভ করা ঠিক। কিন্তু তোমাকে যদি আমি ছেড়ে দিই তা হলে আমার করাচীর চাকরিও হয়তো থাকবে না। কারণ তোমার জন্যেই চাকরি। তাই তোমাকে এখন ছাড়তে পারব না।"

বলিয়া পুনরায় সে ভ্রূকুঞ্চিত করিল।

জুবেদা বলিল, "বেশ, তা হলে একটা শর্ত থাকুক। আপনি যতদিন না স্বাধীনভাবে কোথাও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছেন, ততদিন আইনত আমি আপনার স্ত্রী থাকব। আপনার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই আপনি আমাকে ছেড়ে দেবেন—"

"বেশ, সে তখন দেখা যাবে।"

একসপ্তাহ পরে বিষ্ণুচরণ জুবেদাকে লইয়া করাচী চলিয়া গেল। জুবেদার কর্মস্থলে গিয়া দেখিল বন্দোবস্ত ভালই। জুবেদার জন্য কর্তৃপক্ষ যে কোয়ার্টার্স দিয়াছেন তাহা মনোরম। পরিবেশও নূতন জীবন আরম্ভ করিবার উপযোগী। কিন্তু ইহা সে বুঝিয়াছিল যে এই পরিবেশে তাহার স্থান হইবে না। তাই জুবেদাকে সেখানে রাখিয়া ভাগ্য-অন্বেষণ-মানসে সে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। নবেন্দু বিশ্বাসের মৃত্যুর খবরটা সে পাইয়াছিল, পাইয়া উল্লসিতও হইয়াছিল, কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া সে কেমন যেন বিমর্ষ হইয়া পড়িল। মনে হইল এত বড় একটা মিথ্যা আচরণের পাপ কি তাহার সহিবে? নবেন্দু বিশ্বাস সত্যই মরিয়াছে কিনা তাহা নিঃসংশয়ে জানিবার জন্য সে সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিল। নিঃসংশয় হইতে বিলম্বও হইল না। যে ভদ্রলোক ছুরিকাহত নবেন্দু বিশ্বাসকে হাসপাতালে লইয়া গিয়াছিলেন তাঁহার সহিতই বিষ্ণুচরণের দেখা হইয়া গেল। হাসপাতাল হইতেও সে সংবাদটার যথার্থ্য যাচাই করিয়া লইল। হাসপাতাল হইতে ফিরিবার সময় ট্রামে বসিয়া এ

চিন্তাও তাহার মনে উদিত হইল যে নবেন্দু বিশ্বাসের যদি কোনও উত্তরাধিকারী থাকে খোঁজ করিয়া তাঁহাকেই সে বাড়িগুলি লিখিয়া দিবে। ইহার জন্য পরদিন কাগজে বিজ্ঞাপন দিবে ইহাও সে মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল কিন্তু হঠাৎ সব গোলমাল হইয়া গেল। ট্রামের পিছনদিকের কোণে সে বসিয়াছিল, সামনের দিকে নজর করে নাই। হঠাৎ সামনের একটা সিটে তাহার দৃষ্টি আটকাইয়া গেল। চন্দ্রলেখা না? সেই পলাতক জমিদারবাবুর জোয়ান মেয়েটা! হ্যাঁ, সেই তো! আরও দুই তিনটি মেয়ের সহিত হাসিয়া হাসিয়া গল্প করিতেছে! ধর্মতলা স্ট্রীটে সকলে নামিয়া পড়িল। বিষ্ণুচরণও নামিল। বিষ্ণুচরণের একটা সুবিধা ছিল, চন্দ্রলেখা তাহাকে চিনিত না। তাহার নাম শুনিয়াছিল কিন্তু তাহাকে চাক্ষুষ করিবার সুযোগ কখনও পায় নাই।

কিছুদূর অনুসরণ করিয়া বিষ্ণুচরণ দেখিল, গলির মধ্যে একটি প্রকাণ্ড বাড়িতে মেয়েগুলি ঢুকিয়া পড়িল। বাড়ির সামনে একটা সাইনবোর্ড ঝুলিতেছে—"মাসাজ অ্যান্ড বাথ।" ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল সে অবাক হইয়া গেল। তাহার পর বাড়িটার আশেপাশে ঘুরিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ব্যাপারটা কি।

পাশের দোকানে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। দেখিলেই মনে হয় লোকটি রসিক। পাকা গোঁফগুলি তামাকের ধোঁয়ায় লালচে, গালদুটিও লালচে। বিষ্ণুচরণকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার দৃষ্টি কৌতূহলান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিষ্ণুচরণের সহিত চোখাচোখি হইতেই মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন।

"কোন্ নম্বরটা খুঁজছেন?"

"ওই বাড়িটা কার, কি হয় ওখানে?"

ইহা শুনিয়া ভদ্রলোকের চক্ষু হইতে খানিকটা কৌতুক যেন উপচাইয়া পড়িল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি কোলকাতার বাইরে থাকেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"তাই জানেন না, কোথা থাকা হয়?"

বিষ্ণুচরণ মিথ্যাকথা বলিল।

"বিহারে।"

"বিহারে। ও বাড়িও বিহারেরই একটা আধুনিক আড্ডা। ঢুকে দেখে আসুন না—"

রসিকতাটা বিষ্ণুচরণ প্রথমে বুঝিতে পারে নাই।

"বিহারের আড্ডা? তার মানে বিহারীরা ওখানে থাকে—"

"কেউ থাকে না। যাতায়াত করে। বিহারী, বাঙালী, পাঞ্জাবী, মারাঠী সবাই।"

"ও।"

"বসুন, বসুন। আপনি একেবারে আনকোরা দেখছি।"

বিষ্ণুচরণ উপবেশন করিল। তাহার চোখে পড়িল দোকানে নানা মাপের, নানা রঙের গামছা এবং তোয়ালে টাঙানো রহিয়াছে।

"এ সব গামছা কি বিক্রির?"

"হ্যাঁ।"

একটা গামছা দেখাইয়া বিষ্ণুচরণ বলিল, "এটার দাম কত?"

"আমি জানি না, আমি পাহারাদারমাত্র, দোকানদার একটু পরে আসবেন।"

"আপনি এখানে পাহারা দেন বুঝি?"

"শখের চাকরি। মাইনে পাই না। মনিবটি অতি পাজি" বলিয়াই তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "নাতির দোকান। তিনি আমাকে দোকানে বসিয়ে সেলুনে চুল ছাঁটতে গেছেন। বসুন, ভাল করে বসুন—"

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিই বিষ্ণুচরণকে 'ম্যাসাজ বাথ' সম্বন্ধে জ্ঞানদান করিলেন। কিছুটা কথায়, কিছুটা আকার, ইঙ্গিতে। পরিশেষে বলিলেন, পাকিস্তান থেকে যে-সব বেওয়ারিশ মাল এসে জমেছে, তাদের একটা গতি হওয়া চাই তো! সবরকম অগতির গতি এই কোলকাতা শহর। গতি এখানে প্রগতি হয়। আমরা হু হু করে সভ্য হচ্ছি, বুঝলেন না। এখানকার অনেক ভদ্রলোকও মোটা টাকার লোভে ওখানে মেয়ে পাঠাচ্ছে এ খবরও শুনেছি।"

সংবাদটা বিষ্ণুচরণের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিল। সহসা তাহারও মতিগতি বদলাইয়া গেল। তাহার মনে এতদিন যে ঘৃণা, ঈর্ষা, যে ক্ষোভ নারীজাতিকে কেন্দ্র করিয়া একটা পঙ্কিল আবর্তে আবর্তিত হইতেছিল সহসা তাহা যেন পথ দেখিতে পাইল। প্রতিশোধের পথ। 'মাসাজ এন্ড বাথ'—! সাইনবোর্ডটার দিকে সে নির্নিমেষে তাকাইয়া রহিল। মনে হইল এক ঢিলেই তো দুই পক্ষী নিহত হইবে।

প্রায় ঘণ্টা দুই সে ওই অঞ্চলে নানা ছুতায় ঘুরিয়া বেড়াইল। দুইঘণ্টা পরে চন্দ্রলেখা একাই বাহিব হইয়া আসিল সেই গলির ভিতর হইতে। বাহির হইয়া ট্রামে চড়িল। বিষ্ণুচরণও চড়িল। চন্দ্রলেখার ঠিকানা সংগ্রহ করিতে বেশি বিলম্ব হইল না তাহার। সে সানন্দে লক্ষ্য করিল চন্দ্রলেখারা একটা নোংরা পল্লীতে খোলার ঘরে থাকে। তাহার পুলক আরও বর্ধিত হইল যখন সে শুনিল যে চন্দ্রলেখার বাবা প্রাণ ও মানমাত্র লইয়া পলাইয়া আসিতে পারিয়াছেন, টাকাকড়ি বিশেষ কিছু আনিতে পারেন নাই। অনেক ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাকে খবরগুলি সংগ্রহ করিতে হইল। লোকটার বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই পাকিস্তানে আটকাইয়া পড়িয়াছে, তিনি এখন পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্টের দাক্ষিণ্যের দ্বারে ভিখারী, চন্দ্রলেখাই নাকি 'ম্যাসাজ এন্ড বাথ' চাকুরি করিয়া কোনক্রমে সংসার চালাইতেছে —এই সব সংবাদ বিষ্ণুচরণের কর্ণে মধুবর্ষণ করিল। একটা দোকানে ঢুকিয়া দুইটি কাটলেট ও দুই পেয়ালা চা-সহযোগে সে সংবাদগুলিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া রোমন্থন করিল। চাকা তাহা হইলে ঘুরিয়াছে! মনে পড়িল, এই মেয়েটাকে কেন্দ্র করিয়াই মুসলমান গুণ্ডাদের পাশবিক কামনা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারও কি উঠে নাই? উঠিয়াছিল বই কি! কিন্তু তাহার সাহস ছিল না। তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইবার সাহস পর্যন্ত ছিল না। এই সাহসের অভাবই তাহাকে এই গুণ্ডাদের দলে ঠেলিয়া দিয়াছিল এ কথা কি সত্য নয়? ওই গুণ্ডাদের দলে যোগ দিয়াছিল বলিয়াই কি তাহাকে মুসলমান হইতে হয় নাই? আর পাঁচজনের মতো সে-ও অনায়াসে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিত না কি? নিশ্চয় পারিত। পারে নাই, কারণ ওই মেয়েটা তাহাকে চুম্বকের মতো টানিয়া রাখিয়াছিল। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়া বিষ্ণুচরণ শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে তাহার ইসলাম-ধর্মগ্রহণের মূল কারণ নেপথ্যবর্তিনী ওই চন্দ্রলেখা। ফতিমার মুখটা একবার তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল, কিন্তু তাহাকে সে আমল দিল না। ওই চার-হাত-ফেরতা মেয়েটার উপর তাহার কোনওদিনই আস্থা ছিল না,

এই ধরনের একটা স্তোকবাক্যে সে বিবেকের মৃদু-প্রতিবাদকে থামাইয়া দিল।...সহসা সে ঠিক করিয়া ফেলিল কলিকাতার বাড়ি তিনখানা যখন ভাগ্যবলে তাহারই থাকিয়া গিয়াছে, তখন সেগুলিকে সে আর হস্তান্তর করিবে না। কল্পনা করিল ওই তিনখানি বাড়ির সহায়তায় 'ম্যাসাজ এন্ড বাথ'-এর ব্যবসায় ফাঁদিয়া চন্দ্রলেখাকে সেই ব্যবসায়ের ফাঁদে আবদ্ধ করিবে। তাহাকে আয়ত্তের মধ্যে পাইয়া বিবাহের প্রস্তাবও করিবে। বিবাহ হইয়া গেলে তাহার পর আত্মপরিচয় দিবে সে। তাহার বাবাকে ডাকিয়া বলিবে,—দেখ হে, আমিই সেই উদ্বাহু বামন, তোমার চন্দ্রলেখাকে বুকে জাপটাইয়া ধরিয়াছি। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ। উত্তেজনাভরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। দামটা চুকাইয়া দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। খানিকক্ষণ উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া ফুটপাথে ফুটপাথে ঘুরিয়া বেড়াইল। কিছুক্ষণ পূর্বে তাহার মনে হইয়াছিল নবেন্দু বিশ্বাসের উত্তরাধিকারী যদি কেহ থাকে তাহার সন্ধান করিয়া বাড়িগুলি তাহাকেই সে লিখিয়া দিবে। এই সদিচ্ছাটা তাহার মনে সন্তর্পণে আর একবার উঁকি দিল। দিয়াই কিন্তু অন্তর্ধান করিল। লগুড়হস্তে সম্প্রতি যে যুক্তিটা তাহার মনের সদরে নিজেকে স্থাপিত করিয়াছিল সে তারস্বরে ধমকাইয়া উঠিল,— আমার প্রতি কেহই যখন সুবিচার করে নাই, আমিই বা করিব কেন। মুসলমান হইয়া যাহাকে বিবাহ করিলাম সেই জুবেদা পর্যন্ত আমাকে ছাড়িয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। আমাকে বাঁচিতে হইবে তো?

বিষ্ণুচরণ সাত আটদিন ধরিয়া কলিকাতার নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইল। 'মাসাজ এন্ড বাথ' সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করিয়া বড় রাস্তার উপর প্রকাণ্ড একটি বাড়িও সে দেখিয়া রাখিল। তাহার পর দেখা করিল বিধুভূষণের সঙ্গে। কিন্তু দেখা করিবার পূর্বে আর একটি কার্যও সে করিয়াছিল যাহা বিধুভূষণকে সে জানায় নাই। একটা সেকেন্ডহ্যান্ড মোটরকার সে সস্তায় কিনিয়া ফেলিয়াছিল। স্থির করিয়াছিল ভবিষ্যতে যখন সে চন্দ্রলেখার বাবার সহিত দেখা করিতে যাইবে, তখন মোটর চড়িয়াই যাইবে আর তাহার পাশে বসিয়া থাকিবে চন্দ্রলেখা। মোটরটা কিনিয়া একটা গ্যারাজ ভাড়া করিয়া তাহাতেই সেটাকে সে আপাতত বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। কলিকাতায় পাকাপাকি একটা আস্তানা ঠিক হইলে তখন বাহির করা যাইবে, তখন হয়তো বিধুবাবুও আর আপত্তি করিবেন না। বিষ্ণুচরণকে চটাইবার সাহস তাহার ছিল না। কারণ ইহা সে বুঝিয়াছিল যে এখন প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে এ ব্যাপারের সহিত যুক্ত করা উচিত হইবে না। বিধুভূষণকেই সদরে খাড়া করিয়া রাখিতে হইবে। সে থাকিবে নেপথ্যে। নূতন রকম একটা পুতুল-নাচের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ব্যাপারটা যতই সে চিন্তা করিতে লাগিল ততই তাহার কল্পনা রঙিন হইয়া উঠিল।

বিধুভূষণের নিকট হইতে টাকা সহজেই পাওয়া গেল। এত সহজে পাওয়া যাইবে তাহা সে কল্পনাও করে নাই। আর কালবিলম্ব না করিয়া বড় রাস্তার উপর যে বাড়িটা সে নির্বাচন করিয়াছিল মাসিক পাঁচশত টাকা ভাড়ায় সেটা সে ঠিক করিয়া ফেলিল। কিছু ফার্নিচারও ভাড়া করিল। তাহার পর চলিয়া গেল করাচী। ব্যবসায়টা চালু করিতে হইলে কিছুদিন ছুটি লইতে হইবে। জুবেদাকে বলিতে হইবে জুবেদার অভিপ্রায় অনুসারেই সে কলিকাতা শহরে নিজের নূতন ভবিষ্যৎ গঠনের চেষ্টা করিতেছে, তাই ফিরিতে দেরি হইল। জুবেদার সাহায্যেই তাহাকে ছুটিও যোগাড় করিতে হইবে। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ জুবেদাকে যে খাতির করিয়া চলেন তাহা সে লক্ষ্য করিয়াছিল। চাকরিটা এখন সে ছাড়িবে না। এখন ছুটিই লইতে হইবে।

নূতনভাবে নূতন জীবন আরম্ভ করিবার জন্য সে যেন ছটফট করিতেছিল। কারণ তাহার জীবনটা রক্ষা পাইয়াছিল বটে, কিন্তু জীবনের স্বাদ চলিয়া গিয়াছিল। তাহার পর হইতে এতদিন সে যাহা করিয়াছে—জুবেদাকে বিবাহ, চাকরি, কয়েকবার করাচীতে যাতায়াত—সবই যেন যন্ত্রচলিতবৎ করিয়াছে। না করিয়া উপায় ছিল না বলিয়া করিয়াছে। এইবার নিজের মনের মতো একটা কাজ পাইয়া তাহার কল্পনা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, কর্মশক্তি সজীব হইল। বহুকাল পরে নিজের অন্তরের ভিতর হইতে সে একটা কর্মপ্রেরণা অনুভব করিতে লাগিল। কল্পনায় সে ব্যবসাটাকে বাড়াইয়া একটা প্রতিষ্ঠানেই পরিণত করিয়া তুলিল। বিধুভূষণের অর্থবলের উপর তাহার আস্থা ছিল, ব্যবসায়ী হিসাবেও তাহাকে সে শ্রদ্ধা করিত। সুতরাং তাহাকে হালে বসাইয়া দিলে নব-কল্পিত ব্যবসায়-তরণীটি যে কালক্রমে ঈপ্সিত বন্দরে পৌঁছিয়া যাইবে এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না। কল্পনা সুতরাং উদ্দাম হইয়া উঠিতেছিল। বিধুভূষণ যদি টাকার গন্ধ পায়, আরও টাকা ছাড়িতে আপত্তি করিবে না। বাড়ি তিনটির জন্য আরও কিছু টাকা তাহার নিকট হইতে আদায় করিতেই হইবে। আরও অন্তত দশহাজার টাকা না দিলে সে পাকা দলিল লিখিয়াই দিবে না। বিধুভূষণ দিবেও, লোক সে খারাপ নয়। ব্যবসায়ে বিধুভূষণকে যদি অর্ধেক লাভও দেওয়া যায় (আধাআধি বখরা না দিলে লোকটা ভিজিবে না) তাহা হইলেও ফেলিয়া ছড়াইয়া মাসে হাজারখানেক টাকা যে তাহার অংশে থাকিয়া যাইবে তাহাতে তাহার সংশয় ছিল না। এই ব্যবসায়ে যাহারা নামিয়াছে তাহাদের সহিত এ বিষয়ে আলাপ করিয়া বিষ্ণুচরণ যে অঙ্কের আভাস পাইয়াছে তাহা লক্ষের কোঠায়। তেমন তেমন ধনী খরিদ্দার যদি জোটে এবং কোনও ভাল মেয়ে যদি তাহার নজরে পড়িয়া যায় তাহা হইলে একটা মেয়েই তাহাকে "লাল" করিয়া দিবে। লাভ যদি কমই থাকে তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি। তাহার এ ব্যবসায়ের লক্ষ্য তো ঠিক অর্থ নয়, আসল লক্ষ্য চন্দ্রলেখা এবং চন্দ্রলেখার বাবা। তাহারা আসিয়া যদি তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়ে, তাহাদের উন্নাসিক স্পর্ধাকে সে যদি দুই পায়ে পিষিয়া দিতে পারে তাহা হইলেই সে শ্রম সার্থকজ্ঞান করিবে। ইহার বেশি আর সে কিছু চায়ও না। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা আপাতত পাকিস্তান গভর্নমেন্ট তো করিয়াই দিয়াছেন। ব্যবসায়ের লাভের উপর সুতরাং সে ততটা জোর এখন দিবে না। যে বহ্নিতে তাহার সমস্ত বুকটা পুড়িয়া যাইতেছে সেই বহ্নিটাকে নির্বাপিত করিবার ব্যবস্থা তাহাকে আগে করিতে হইবে। অবশ্য বহ্নিটা যে কিসের, তাহার উৎস যে কোথায়, তাহা সে বিশ্লেষণ করিয়া ঠিক করিতে পারে নাই। ফতিমাকে সে যদি পাইত, শিবানী যদি তাহাকে ছাড়িয়া মৃত্যুবরণ না করিত, বাধ্য হইয়া তাহাকে যদি মুসলমান না হইতে হইত, চন্দ্রলেখার পিতা যদি তাহাকে অমন ব্যঙ্গোক্তি করিয়া অপমান না করিতেন, জুবেদা যদি তাহাকে ছাড়িয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ না করিত, তাহা হইলে—তাহা হইলে...ইহার পর বিষ্ণুচরণ আর ভাবিতে পারে নাই। একটা তীব্র গ্লানির পঙ্কে সে ধীরে ধীরে ডুবিতেছিল, অনির্বাণ তুষানল তাহার সমস্ত বুকটা পুড়াইয়া ছারখার করিয়া দিতেছিল, এমন সময় চন্দ্রলেখাকে সে দেখিতে পাইল। নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন খড় দেখিলে সেটাকেই চাপিয়া ধরিয়া বাঁচিতে চায়, বিষ্ণুচরণও তেমনি ভাবিল চন্দ্রলেখাকে আয়ত্তাধীন করিতে পারিলেই বুঝি শান্তি ফিরিয়া পাইবে। অহোরাত্র যে তুষানল তাহার সারা বুক জুড়িয়া জ্বলিতেছে হয়তো তাহা নিবিয়া যাইবে।

করাচীতে পৌঁছিয়া কিন্তু আবার সব গোলমাল হইয়া গেল। জুবেদা তাহার প্রত্যাগমনের আশায় যেন ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল। তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র সে প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, ঢাকার বাড়ি, বিষয়সম্পত্তি যে ভদ্রলোক আমার নামে লিখে দিয়েছিলেন, তাঁর নাম কি নবেন্দু বিশ্বাস?"

প্রশ্নটা শুনিয়া বিষ্ণুচরণ থতমত খাইয়া গেল। প্রথমেই তাহার মনে হইল আইনত ঢাকার বাড়ি এবং বিষয়-সম্পত্তি তাহার নয়, জুবেদার। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "হ্যাঁ, কেন—"

"তাঁকে আপনি কোলকাতার যে বাড়ি তিনখানা দেবেন বলেছিলেন তা দেওয়া হয়েছে কি?"

"না, এখনও হয়নি, কোলকাতায় ভদ্রলোককে খুঁজেই পেলাম না। শুনলাম সেকেন্ড রায়টে তিনি মারা গেছেন। তাই বাড়ি তিনখানা বেচে দেব ভাবছি।"

"বেচবেন কেন? তাঁর মেয়ে আছে—"

"মেয়ে আছে! তুমি জানলে কি করে—"

"বিশাখা আমার সঙ্গে লাহোরে পড়ত যে। সে আমাকে চিঠি লিখেছে! লিখেছে অনেকদিন আগে। ঘুরতে ঘুরতে চিঠিখানা এসে এতদিনে পৌঁছেছে। ভাগ্যে মারা যায়নি। এই দেখুন—"

চিঠিখানা সে ড্রয়ার হইতে বাহির করিয়া দিল। বিষ্ণুচরণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পড়িল—

ভাই জুবেদা,

তুমি এখন কোথায়, জানি না। তুমি আমার চিঠি পাবে কিনা তা-ও অনিশ্চিত। তবু তোমাকে লিখছি। আমরা ভাই, মহাবিপদে পড়েছি। বাবা কোলকাতায় গিয়েছিলেন তাঁর ঢাকার বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করতে; কিন্তু এখনও তিনি ফেরেননি, চিঠি লিখে তাঁব কোন জবাব পাচ্ছি না। কোলকাতায় আবার নাকি ভীষণ রায়ট হয়ে গেছে শুনছি! আমার ভাই, বড় ভাবনা হয়েছে। আমি মিসেস দাসের কাছে শুনলাম, তুমি নাকি ঢাকায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছ। তাঁর কাছ থেকেই আমি তোমার ঢাকার ঠিকানাটা পেলাম। যদি তাঁর কোন খোঁজ পাও আমাকে দয়া করে একটু জানিও ভাই। আমার বাবার নাম নবেন্দু বিশ্বাস। এ নামের কোনও লোকের যদি খোঁজ পাও আমাকে দয়া করে নীচের ঠিকানায় জানিও। মা-ও অসুস্থ, শয্যাশায়ী। কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না, মাকে ছেড়ে নড়বারও উপায় নেই। পারো তো আমার এই উপকারটি কোরো ভাই। তোমাকে আর বেশি কি লিখব। আশা করি ভাল আছ। নীচে আমার দিল্লীর ঠিকানাটা দিলাম। আমার ভালবাসা নাও। ইতি —

বিশাখা

বিষ্ণুচরণ পত্রপাঠ শেষ করিয়াও পত্রখানার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আমি তো এ খবর জানতাম না। চিঠির কোনও উত্তর দিয়েছ নাকি—"

"দিয়েছি। লিখেছি যে এক নবেন্দু বিশ্বাসের বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি আমি কিনেছি, কিন্তু তিনি তোমার বাবা কিনা জানি না—"

বিষ্ণুচরণের পায়ের তলা হইতে যেন মাটি সরিয়া গেল। তথাপি সে স্থিরকণ্ঠেই বলিল, "খোঁজ না নিয়ে কিছুই বলা যায় না। অনেক নবেন্দু বিশ্বাস এখন গজাবে—"

"বিশাখা খুব ভাল মেয়ে, সে প্রতারণা করবে না।"

"খোঁজ করে দেখি—"

জুবেদার সহিত বিষ্ণুচরণ এ বিষয়ে আর আলোচনা করা নিরাপদ মনে করিল না। তাড়াতাড়ি আপিসে চলিয়া গেল।

আপিসে যাইবার নাম করিয়া সে বাহির হইয়া আসিল বটে, কিন্তু আপিস তখন খোলেই নাই। জুবেদার সান্নিধ্য ত্যাগ করিবার নিমিত্তই সে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। জুবেদার নিকট বিষ্ণুচরণ থাকিতেই পারিত না। জুবেদা রূপসী, শিক্ষিতা; তাহার গাম্ভীর্য, আদব-কায়দা এমন একটা মার্জিতরুচির পরিচয় বহন করে যে বিষ্ণুচরণ কিছুতেই তাহার নিকট স্বস্তি পায় না, কেমন যেন ভয়ভয় করে। মনে হয় উপন্যাসের কোনও নবাবজাদীর শয়নকক্ষে সে না বলিয়া অনধিকারপ্রবেশ করিয়াছে।

আপিস খুলিতেই সে আপিসে গিয়া হাজির হইল। একটু পরেই একজন কেরানি আসিয়া তাহাকে খবর দিল যে দিল্লী হইতে বিধুভূষণ নামে কে একজন তাহাকে ফোনে ডাকিতেছে। ফোনে কি কি কথা হইয়াছিল পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে। বিষ্ণুচরণ হঠাৎ চিন্তিত হইল। মেয়েটা তাহা হইলে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। বিধুভূষণও দিল্লীতে আসিয়া তাহার সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতেছে। সহসা সে অনুভব করিল, অবিলম্বে অকুস্থলে উপস্থিত না হইলে সমস্তই বানচাল হইয়া যাইবে। খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিল। তাহার পর কলিকাতায় তাহার এটর্নিকে 'ফোন' করিল।

মনিব জমিরুদ্দিনের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন সুতরাং একমাসের ছুটি পাইতে তাহার বিলম্ব হইল না। আপিস হইতে বাহির হইয়া তাহার মনে হইল, এবার কি করা যায়! জুবেদার কাছে যাওয়া যাইবে না। রাস্তায় খানিকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল। একটা এলোমেলো হাওয়া বহিতেছিল। বিষ্ণুচরণেব পূর্বকল্পিত কর্মসূচীও কেমন যেন এলোমেলো হইয়া গেল। সমস্ত বুদ্ধি-বিবেচনা বিকল হইয়া পড়িল। কি করিবে সে? কিছুই ঠিক করিতে পারিল না খানিকক্ষণ। দোদুল্যমান-মানসপটে ফতিমা, শিবানী, চন্দ্রলেখা এবং জুবেদার ছবি বারম্বার নানারূপে ফুটিয়া উঠিল ও মুছিয়া গেল। বিধুভূষণের সহিত তাহার সম্পর্কের কথা মনে পড়িল। বিধুভূষণ তাহাকে বিশ্বাস করিয়া অতগুলো টাকা যে সম্পর্কের জোরে দিয়াছিল, সে সম্পর্কের সম্মানরক্ষা করিবার সামর্থ্য কি তাহার আছে? মনে হইল জুবেদা আজ যদি তাহার সহিত বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে, সে নিঃস্ব হইয়া যাইবে। ঢাকার সমস্ত সম্পত্তি তাহার নামে। নবেন্দু বিশ্বাস তাহাকেই সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছিল। ন্যায়ত বিষ্ণুচরণের তাহাতে কোনও অধিকার নাই। কলিকাতার বাড়ি তিনখানাও যদি হাতছাড়া হইয়া যায়—ন্যায়ত ধর্মত হইবারই কথা—তাহা হইলে তাহার থাকিবে কি! সে তো পথের ভিখারী হইয়া যাইবে। তাহার নিজস্ব যে জমিজমা ছিল তাহা নাকি মুসলমানেরা ভোগদখল করিতেছে। যে বাড়িখানায় আগে মিষ্টান্নের দোকান ছিল সেটা নাকি ভস্মীভূত হইয়াছে। তাহার পৈতৃক ভিটায় গোহত্যা হইতেছে, রমজানের এক শালা নাকি সেখানে ব্যবসাও করিতেছে। বিষ্ণুচরণ জমিরুদ্দিনে রূপান্তরিত হইয়া জুবেদা নাম্নী রূপসী ধনীকন্যাকে বিবাহ করিতে অনেক সম্পত্তির মালিক হইয়াছে, নবেন্দু বিশ্বাসের বিশাল বাড়ি ও বিস্তর ভূসম্পত্তি পাইয়াছে, তাহার তো কোনও অভাব নেই, সে আবার পৈতৃক বিষয় লইয়া কি করিবে? এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তাহার গ্রামের মুসলমান বন্ধুগণ তাহার সম্পত্তি দখল করিয়া ভোগ করিতেছে। তাহাদের উৎখাত করা প্রায় অসম্ভব।

অনেক ভাবিয়া বিষ্ণুচরণ শেষে ঠিক করিয়া ফেলিল কলিকাতার বাড়ি তিনটি বাঁচাইতেই হইবে। বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া জুবেদাকে বলিল জরুরি কার্যব্যপদেশে তাহাকে কলিকাতা ফিরিতে হইতেছে। নবেন্দু বিশ্বাসের দিল্লীর ঠিকানাটাও সে জুবেদার নিকট হইতে টুকিয়া লইল। বলিল, কলিকাতার পথে সে দিল্লীতে নামিয়া বিশাখার সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করিবে।

সেইদিনই দিল্লীগামী একটা প্লেনে সে দৈবাৎ "সিট" পাইয়া গেল এবং তাহাতে চড়িয়া বসিল। দিল্লীতে পৌঁছিয়া প্রথমেই সে গেল নবেন্দু বিশ্বাসের ঠিকানায়। কাহারও দেখা পাইল না। সে আশা করিয়াছিল বিশাখার কোন আত্মীয়কে অন্তত সে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে এবং যে মতলবটা মনে মনে ভাঁজিয়া রাখিয়াছিল তাহা তাহারই মারফত বিশাখার নিকট ব্যক্ত করিবে। কিন্তু তাহাকে হতাশ হইতে হইল। এমন কি নীহারবাবুর দেখাও সে পাইল না। বিধুভূষণ দিল্লীতে আছেন কি নাই ইহা খোঁজ করার সে প্রয়োজন মনে করিল না। বিধুভূষণকে এখন কিছুদিন এড়াইয়া চলাটাই বুদ্ধিমানের কার্য ইহাই তাহার মনে হইল।

অনেক চিন্তার পর বিধুভূষণের মতো সে-ও স্থির করিয়াছিল যে বিশাখাকে বিবাহ করিতে হইবে। হিন্দু বা মুসলমান কোনও ধর্মেই একাধিক বিবাহ বে-আইনী নয়। হিন্দুরূপে হউক, মুসলমানরূপে হউক, ছলে, বলে, কৌশলে যেমন করিয়া হউক, বিশাখাকে বিবাহ করিতে হইবে। তাহা না করিতে পারিলে তাহার বাঁচিবার উপায় নাই। সারাজীবন ওই জুবেদার অনুগ্রহপ্রার্থী ক্রীতদাস হইয়া তাহাকে থাকিতে হইবে। তাহা অসম্ভব।

সে জানিত বিশাখা কলিকাতায় বিধুভূষণের আশ্রয়ে আছে। তাহার নিকট সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়া বিবাহের প্রস্তাবটা পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। পৌঁছাইয়া দিবার মতো লোক নিশ্চয়ই সে যোগাড় করিতে পারিবে।

প্রথম শ্রেণীর একটি বার্থে চক্ষু বুঁজিয়া বিষ্ণুচরণ আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছিল। ফতিমা, শিবানী, চন্দ্রলেখা, জুবেদা—বিশাখা। বিশাখা মেয়েটা কেমন, কে জানে! গাড়িতে আর দ্বিতীয় লোক কেহ ছিল না। অবাধে সে চিন্তা করিতেছিল। পরের স্টেশনে কিন্তু একটি যাত্রী উঠিলেন। লোকটির পরিধানে বুশশার্ট এবং পায়জামা, পায়ে কাবলী চপ্‌পল, চোখে কালো চশমা, নাকের নীচে বাটারফ্লাই গোঁফ। লোকটি বিষ্ণুচরণের দিকে একনজর চাহিয়া পাশের বেঞ্চে নিজের বিছানা পাতিয়া আপাদমস্তক ঢাকিয়া শুইয়া পড়িলেন। বিষ্ণুচরণের পুনরায় মনে হইল, বিশাখা মেয়েটি কেমন, কে জানে।

।। চার ।।

বরেনের কিছু পরিচয় আপনারা পাইয়াছেন। বাকীটা গোপীনাথ, মনিকা, শিবাজী (ওরফে সনৎ, ওরফে অনেক কিছু) এবং ভার্গবের পরিপ্রেক্ষিতে দিলে মানাইবে ভাল। গোপীনাথ, মণিকা এবং ভার্গবেরও আসল নাম অন্য। এগুলি তাহাদের ছদ্মনাম। গোপীনাথের আসল নাম মলয়কুমার এবং মণিকার আসল নাম আন্নাকালী একথা হয়তো আপনাদের হাস্যোদ্রেক করিবে, কিন্তু ইহা সত্য। ভার্গব একজন পাঞ্জাবী মুসলমান। বিস্ময়কর মনে হইবে, কিন্তু ইহাও সত্য।

আর একটা কথা বলাও প্রয়োজন। ইহারা আপনাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়, ইহাদের সকলকেই আপনারা অল্প-বিস্তর চেনেন। অবশ্য ভিন্ন নামে, ভিন্ন পরিচয়ে। খবরের কাগজের

পৃষ্ঠায়, নেতাদের বক্তৃতায়, প্রতিবেশীদের বৈঠকখানায়, উপন্যাসের চরিত্রে, সিনেমার ছবিতে, নাটকের দৃশ্যে—ইহাদের নানা রূপ আপনারা দেখিয়াছেন, ইহাদেরই নানা সমালোচনা আপনারা করিয়াছেন। ইহাদের আপনারা ভয় করেন, ভক্তি করেন। ইহাদের নিন্দাও করেন, প্রশংসাও করেন, বিশ্বাসও করেন, অবিশ্বাসও করেন।

আলাদা আলাদা ইহাদের প্রত্যেকের পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা একটা সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হওয়াই সুবিধাজনক; আমরা মণিকার সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হইতেছি।

শ্রীমতী মণিকা সদাগরী আপিসের নিম্নশ্রেণীর জনৈক কেরানি জিতেন্দ্রনাথ গুড়গুড়ি মহাশয়ের সপ্তমা কন্যা। জিতুবাবু যে বেতন পাইতেন তাহাতে এ বাজারে ভদ্রভাবে সংসার চালানো শক্ত। বিশেষ করিয়া মা-ষষ্ঠী যখন তাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন। ভগবান কিন্তু তাঁহার প্রতি সদয় ছিলেন। নানা উৎস হইতে জলধারা আনিয়া তিনি তাঁহার সংসারমরুকে সরস করিয়া রাখিতেন। তাঁহার মেয়েদের হালফ্যাশানের শাড়ি, গহনার অভাব হইত না, নূতনতম স্নো-ক্রীম-পাউডারের অনটন ছিল না, ঘন ঘন সিনেমা দেখার পয়সাও জুটিত। নৃত্য-শিক্ষক এবং সঙ্গীত-শিক্ষকেরা আসিয়া তাহাদের বাড়িতে কোন পারিশ্রমিক না লইয়া নৃত্য-গীতের আসর পাতিতেন। জিতেন্দ্র গুড়গুড়ি কন্যাভাগ্যে ভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন।

মণিকার বয়স যখন মাত্র বারো বৎসর তখনই সে এমন নৃত্য-গীত-পটীয়সী হইয়া উঠিয়াছিল যে, অধিকাংশ দিনই সন্ধ্যার সময় বাড়িতে থাকিতে পাইত না। কোন-না-কোন জলসায় আহূত হইয়া তাহাকে হয় নাচিয়া, না হয় গাহিয়া সমাগত সজ্জনবৃন্দের মনোরঞ্জন করিতে হইত; সাহিত্য-সভা, বিবাহ-সভা, মহাপুরুষদের জন্মোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আনন্দ-সভা, মৃত্যুতিথি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শোক-সভা, ঝঞ্ঝা-বন্যা-ভূমিকম্প বিধ্বস্ত মানবতাকে রক্ষা করিবার জন্য সাহায্য-সভা—বস্তুত যে কোনও কারণে অনুষ্ঠিত যে-কোন সভা বা 'চ্যারিটি শো' মণিকা-হীন হইবার জো ছিল না। এ সবের পরিবর্তে মণিকা প্রকাশ্যে প্রচুর প্রশংসা ও হাততালি পাইত, গোপনে অন্য কিছু পাইত কিনা তাহা আমাদের জানা নাই।

এই গানের আসরের মাধ্যমেই মণিকার সহিত মলয়কুমারের প্রথম পরিচয় ঘটিয়াছিল। যথানিয়মে সেই পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠও হইয়াছিল। মণিকার বয়স তখন ষোল, মলয়কুমারের সাতাশ।

এই ঘনিষ্ঠতার মর্মোদ্ভেদ করিতে হইলে আর একটু ইতিহাস জানা প্রয়োজন।

টোপিরাম নামক জনৈক ধনী মাড়োয়ারি বণিক যখন কলিকাতা হইতে তাঁহার মূল্যবান মোটরকারটি খরিদ করিয়া আনেন, তখন সেইসঙ্গে শ্রীমান মলয়কুমারকেও সপরিবারে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। মলয়কুমারের পরিবার অবশ্য বৃহৎ ছিল না। বিধবা মা এবং অবিবাহিতা ভগ্নী শেফালী—এই দুইটি প্রাণী লইয়াই তাহার পরিবার। মলয়কুমারের বসবাসের জন্য টোপিরাম নিজের একটি বাড়ি তাহাকে দিয়াছিলেন। অন্যান্য নানা সুবিধাও করিয়া দিয়াছিলেন। এবম্বিধ সহৃদয়তার কারণ নিশ্চয় একটা ছিল। শোনা যায় মলয়কুমারের স্বর্গীয় পিতাঠাকুর নাকি টোপিরামের কলিকাতার গদিতে একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার জীবনব্যাপী বিশ্বস্ততার জন্যই নাকি টোপিরাম তাঁহার পরিবারের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাও শোনা যায় টোপিরামের খরচেই নাকি মলয়কুমার নামজাদা এক বিলাতী মোটরব্যবসায়ীর তত্ত্বাবধানে থাকিয়া মোটরচালক ও মোটর-মেকানিক হইতে পারিয়াছিল। আরও শোনা যায় স্বর্গীয় বিশ্বস্ত

কর্মচারীর পুত্রকে কর্মে নিযুক্ত করিবার জন্যই নাকি টোপিরাম মূল্যবান মোটরকারটি ক্রয় করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত জনশ্রুতিটির কিছু ভিত্তিও ছিল। কারণ, প্রায়ই দেখা যাইত, মোটর থাকা সত্ত্বেও টোপিরাম নিজের পুরাতন ল্যাণ্ডোটিতেই চড়িয়া বেড়াইতেছেন। বস্তুত মোটরে তিনি ক্বচিৎ চড়িতেন। মোটরটি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইত আর পাঁচজনের কর্মে। গভর্নমেন্ট অফিসাররা তো বটেই, শহরের অন্যান্য গণ্যমান্য ভদ্রলোকেরাও একরকম অবাধেই টোপিরামের মোটরটি ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইতেন। কোনও হোমরা-চোমরা বা পদস্থ ব্যক্তির বিরাগভাজন হওয়া টোপিরামের নীতিবিরুদ্ধ ছিল। কাহারও মনে তিনি আঘাত দিতে চাহিতেন না। কে কখন, কিভাবে প্রত্যাঘাত করিয়া বসে ঠিক কি! মোটরটি আসাতে আর একটি সমস্যারও সমাধান হইয়া গিয়াছিল। পূর্বে নানা-ব্যপদেশে-অনুষ্ঠিত সভায় বা জলসায় তরুণী আর্টিস্টদের লইয়া যাওয়া এবং সেখান হইতে রাত্রে তাহাদের বাড়ি পৌঁছাইয়া দেওয়া ব্যয়সাধ্য তো ছিলই, অতিশয় ঝঞ্ঝাটজনক ব্যাপারও ছিল। টোপিরামের মোটরটি আসার পর হইতে সে ঝামেলা মিটিয়া গিয়াছিল। তরুণীদের বহন করিতে টোপিরাম, টোপিরামের মোটর বা মোটরচালক কোনদিনই আপত্তি করে নাই।

এই মোটরেই মলয়কুমারের সহিত আন্নাকালীর একদিন পরিচয় ঘটিল এবং মোটরকারের মতোই দ্রুতগতিতে সে ঘনিষ্ঠতা সুবিদিত 'অজানা'র উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হইতে লাগিল। কতকাল প্রধাবিত হইত বলা যায় না—হয়ত অনন্তকাল—কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে বোম্বাইমার্কা একটা আলোর ঝলক আসিয়া পড়াতে আন্নাকালীকে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল।

শহর হইতে চার পাঁচ মাইল দূরে জনৈক জমিদারের বাগান-বাড়িতে একদা বোম্বাই শহরের এক বিখ্যাত গায়ক আহূত হইয়া আসিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য স্থানীয় সঙ্গীত-শিল্পীদের লইয়া একটি জলসার আয়োজন হওয়াতে স্বভাবতই আনুকে (সংক্ষিপ্ত আন্নাকালী) তাহাতে একটি বিশেষ অংশগ্রহণ করিতে হইল। নৃত্য এবং গীত উভয়প্রকার কলার দ্বারা আন্নাকালী বোম্বাই শিল্পীকে সংবর্ধিত করিল। গায়কমহাশয় মুগ্ধ হইয়া গেলেন। শেষপর্যন্ত এত মুগ্ধ হইলেন যে আনুকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, "খুব ভাল লাগল আপনার নাচ, গান। অতি চমৎকার। আপনার জায়গা ছোট শহর নয়, কোলকাতা কিংবা বোম্বাই আপনার উপযুক্ত স্থান। অনেক বড় বড় সিনেমা কোম্পানির সঙ্গে পরিচয় আছে আমার। আপনি যদি সিনেমায় আসেন তো খুব ভাল হয়। আমাকে একটু খবর দিলেই আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব। আমার ঠিকানাটা আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি। আপনার ঠিকানাটাও আমাকে দেবেন। আপনি সিনেমায় এলে সিনেমা-শিল্প উন্নত হবে।"

এই কথা শুনিয়া আনু সহসা যে কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। তাহার বুকের ভিতরটা কেবল টিপ টিপ করিতে লাগিল।

"কি বলেন, নামবেন সিনেমায়? আপনার যদি মত থাকে এখান থেকেই আমি একটা চিঠি লিখে দিতে পারি—"

আনতচক্ষে আনু উত্তর দিল বটে,—"বাবাকে জিজ্ঞেস করে আপনাকে জানাব"—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জিতেন্দ্রনাথ গুড়গুড়ির মতামতের সহিত শ্রীমতী আন্নাকালী বা তাহার ভগ্নীদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। তাহারা যথেচ্ছ ঘুরিয়া বেড়াইত, যাহা খুশি করিত। পিতার মতামতের বেড়ি তাহাদের সবুজ স্বপ্নকে বাধাগ্রস্ত করিতে পারে নাই। যে পিতা অসমর্থ। যে পিতা

ভালভাবে ভরণপোষণ করিতেও অপারগ, কেবলমাত্র কর্তব্যের দাবিতে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইতে হইলে যে সুশিক্ষার দরকার, তাহাও জিতুবাবু বা তাঁহার পত্নী পুত্রকন্যাদের দিতে পারেন নাই। তাহারা বাল্যকাল হইতেই জানিয়াছিল 'বাবা' নামক ব্যক্তিটি কোনও কর্মের নয়। মানুষই না, রাস্তার 'ডাস্টবিন' যেন। সকলের অশ্রদ্ধা, সকলের কটূক্তি, সর্বপ্রকার গঞ্জনা, লাঞ্ছনা নীরবে মাথায় পাতিয়া লইয়া অন্তরে সঞ্চয় করাই যেন তাঁহার একমাত্র কর্তব্য। যা তাঁহাকে সকালে, সন্ধ্যায় (ছুটির দিন, দুপুরেও) সকলের সম্মুখে যে ভাষায় অপমান করেন এবং তিনি নীরবে, বিনা প্রতিবাদে তাহা যেভাবে হজম করেন, তাহাতে তাঁহাকে অপদার্থ, জড়ভরত ভিন্ন অন্য কিছু মনে করা শক্ত। পাওনাদাররাও বাড়ি চড়াও হইয়া প্রায়ই অকথ্যভাষায় গালাগালি দিয়া যাইত। গুড়গুড়ি মহাশয় টুঁ শব্দটি করিতেন না। এহেন লোকের মতামতের উপর কেহ আস্থা স্থাপন করে না, তাহার পুত্রকন্যারাও করিত না। আন্নাকালী পিতার দোহাই দিল জিনিসটা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার জন্য।

সিনেমার প্রস্তাব আনুর ভালই লাগিয়াছিল, কিন্তু সে সময় লইল আর একটা কারণে। কিছুদিন হইতে মলয়কুমারের আচরণে সে একটু রোমান্সের গন্ধ পাইতেছিল। তাহাকে দেখিলেই মলয়কুমারের আচরণ কেমন যেন একটু বেসামালগোছের হইয়া যাইত। অকাবণে মুচকি হাসিত, অকারণে গলা-খাঁকারি দিত, কাছাকাছি হইলে সন্ত্রস্ত-শশব্যস্ত হইয়া পড়িত, চোখে মুখে সম্ভ্রম, মিনতি ও আকুলতার একটা মিশ্রভাব ফুটিয়া উঠিত, মনে হইত প্রচুর সান্নিধ্যলাভ করিয়া প্রভুভক্ত কোনও কুকুর যেন কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে। কোনও বাক্য আরম্ভ করিয়া সে শেষ করিতে পাবিত না, কয়েকবার 'মানে', 'মানে' বলিয়া বক্তব্যটাকে আরও জটিল করিয়া শেষ পর্যন্ত থামিয়া যাইত। অভিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন লক্ষণ দেখিয়া রোগ নির্ণয় করে, অভিজ্ঞ আন্নাকালীও তেমনি ব্যাপারটা ঠিক ধরিয়াছিল। বলিষ্ঠ, প্রিয়দর্শন মলয়কুমারকে তাহার ভালও লাগিয়াছিল। কিছুদিন ঘনিষ্ঠতার পর তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ক্ষুদ্র একটি আশার অঙ্কুরও তাহার উষর মানসক্ষেত্রে উদগত হইয়াছিল। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, স্বাচ্ছল্যময়, ক্ষুদ্র একটি সংসারের স্বপ্ন অন্ধকারের উষালোকের মতো তাহার দুঃখময় জীবনে ধীরে ধীরে যে মোহিনীমায়া বিস্তার করিতেছিল তাহা সত্যই মনোরম!

গুড়গুড়ি মহাশয় যে কন্যার বিবাহ দিবেন, এমন আশা ছিল না। তিনি বড়মেয়ে কালীর বিবাহ দিয়াছিলেন একটি তেজবরে পাত্রের সঙ্গে একমাস পরে কালী উলঙ্গিনী হইয়া শ্বশুরবাড়ি হইতে ফিরিল। সহসা কেন যে সে বদ্ধ উন্মাদ হইয়া গেল তাহা নির্ণয় করিতে হইলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পাঁক ঘাঁটিতে হয়। তাহা করিবার সামর্থ্য গুড়গুড়ি মহাশয়ের ছিল না, তিনি স্থানীয় সিভিল সার্জনের শরণাপন্ন হইয়া কালীকে একটা পাগলা-গারদে পাঠাইয়া দিলেন। বস্তুতঃ, পাগলা-গারদ ছাড়া আর কোথাও তাহার স্থান হওয়া সম্ভব ছিল না। ইহার পর গুড়গুড়ি মহাশয় কন্যাদের বিবাহপ্রসঙ্গে আর মাথা ঘামান নাই। তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা তারা প্রতিবেশী এক ধনীর সুনজরে পড়িয়াছিল। ধনীর পক্ষাঘাতগ্রস্তা পত্নীর সেবা করিবার ছুতায় সে প্রত্যহ সেখানে যাইত এবং দিনরাত সেখানেই পড়িয়া থাকিত। তৃতীয়া কন্যা মহাবিদ্যা পাড়ায় এক সিনেমা-রসিক স্বর্ণকার-পুত্রের সহিত মাখামাখি করিয়াছিল, তাহার পর আত্মহত্যা করিয়াছে। চতুর্থ ষোড়শী, ধর্মপরায়ণা। জনৈক শৌখীন সুদর্শন, ধনী সন্ন্যাসী তাহাকে দীক্ষা

দিয়াছেন। সন্ন্যাসী শহরে আসিলে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া প্রতিদিনই যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, সেই উৎসবে ষোড়শী সুললিতকণ্ঠে কীর্তনগান করিয়া সন্ন্যাসীর (এবং সম্ভবতঃ ভগবানেরও) মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। বিনিময়ে সন্ন্যাসী-প্রবর শিষ্যাকে আশীর্বাদ তো করেনই, খাইতে পরিতে দেন, শোনা যায় গহনা, এসেন্সও নাকি সরবরাহ করেন। জিতুবাবুর পঞ্চমা কন্যা ভুবনেশ্বরী ট্যারা এবং একটু খোঁড়া, জন্মাবধিই এইরূপ। সে নাচিতেও পারে না, গাহিতেও পারে না। কোনও ধনী যুবক বা সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিয়া আকৃষ্ট হয় নাই। সে বেচারী রান্না করিত, কাপড় কাচিত, ঘুঁটে দিত আর মায়ের গঞ্জনা সহ্য করিত। তাহার দুর্দশায় অবশেষে সে সদাশয় ব্যক্তিটির মনে সহানুভূতি জাগিয়াছিল—তিনি ভাদুড়ি-কাকা। বলভদ্র ভাদুড়ি গুড়গুড়ি-মহাশয়ের সহকর্মী ও সমবয়সী। গাঁট্টাগোঁট্টা, আঁটসাঁট চেহারা। মাথার চুল, গোঁফের চুল, বুকের চুল—অর্থাৎ দৃশ্যমান অঙ্গের সর্বপ্রকার চুল, পাকা। বাঁধানো দাঁতগুলিও ধপধপে সাদা, চোখেই কেবল রঙীন চশমা। তিনি আদর করিয়া ভুবনেশ্বরীকে 'লেংড়ি' বলিয়া ডাকেন। তিনি মাঝে মাঝে তাহার জন্য কিছু কিনিয়া আনেন। কখনও একখানা রঙীন শাড়ি, কখনও বা টফি, কখনও চুল বাঁধিবার রঙীন ফিতা, কখনও বা 'ক্লিপ'। সকলের সম্মুখেই তিনি ডাক দেন—ওলো লেংড়ি, কোথায় তুই, দেখ তোর জন্যে কি এনেছি। বিগলিতা লেংড়ি ছুটিয়া আসে, লেংড়ির মা-ও আসেন। ভাদুড়িমহাশয় সকলের সন্মুখেই তাহাকে উপহারটি দিয়া কখনও থুতনি নাড়িয়া, কখনও বা গাল টিপিয়া তাহাকে আদর করেন। পিতৃবন্ধুর এবম্বিধ স্নেহপ্রবণতায় কেহই অশোভন কিছু দেখিতে পায় না। ষষ্ঠকন্যা বগলাসুন্দরী সর্পদষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। পাড়ার কয়েকটি বখাটে ছোঁড়ার সহিত প্রায়ই সে শহরের বাহিরে যাইত একটা পোড়ো বাগানে আম-জাম-কাঁঠাল-কুল-বৈচি প্রভৃতি সংগ্রহ করিত, সেইখানেই এক বৈশাখের রুদ্র দ্বিপ্রহরে এক গোক্ষুর তাহাকে দংশন করে।

সপ্তম কন্যা আন্নাকালীর পক্ষে সুতরাং আশা করা সম্ভব ছিল না যে অন্যান্য পিতার মতো গুড়গুড়িমহাশয়ও তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করিবেন। সে বুঝিয়াছিল নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করিতে হইবে, নিজের মতে, নিজের পথে চলা ছাড়া গত্যন্তর নাই! সম্বল রূপ-যৌবন, সম্বল নাচ-গান। নৃত্যবিশারদ স্বর্গীয় ন্যাপা বোসের শাগরেদ হেমন্ত আইচ (বর্তমান রিটায়ার্ড টিকিট কালেক্টার, কাঁচাপাকা গোঁফের বাটারফ্লাই, একটু হাঁপানি আছে) তাহাকে যত্ন করিয়া নাচগান শিখাইয়াছিলেন। আন্নাকালী তাহাকে ভক্তিও করিত। হেমন্তবাবুর বয়স ষাট না হইয়া যদি চল্লিশও হইত, আন্নাকালী তাহাকেই হয়তো বিবাহ করিতে চাহিত। কিন্তু হেমন্তবাবুকে বিবাহ করা যায় না। বিবাহ করিয়া ছোট একটি সুখের সংসার পাতিবে ইহাই আন্নাকালীর স্বপ্ন। সভায় সভায় নাচিয়া বেড়াইতে তাহার ভাল লাগে না। পোস্টমাস্টারবাবুর স্ত্রী ঊষাকে তাহার হিংসা হয়। কি সুন্দর তাহার খোকাটি!

মলয়কুমারকে সত্যই তাহার পছন্দ হইয়াছিল। সিনেমাবিষয়ে পাকাপাকি কিছু একটা ঠিক করিবার পূর্বে মলয়কুমারের মতটা জানিবার তাহার ইচ্ছা হইল। এইজন্যই সে সময় চাহিয়াছিল।

গভীর রাত্রি। অনেকক্ষণ পূর্বেই দশটা বাজিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণচন্দ্র চোরের মতো পূর্বাকাশে উঁকি দিতেছে। টোপিরামের নূতন মোটরখানা ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। ড্রাইভ করিতেছি মলয়কুমার, পাশে বসিয়া আছে আন্নাকালী।

"মলয়দা, কি বল তুমি, সিনেমায় নামব?"

মলয়কুমার কোনও উত্তর দিল না। ধীরে ধীরে গাড়ির গতিবেগ কমিতে লাগিল এবং অবশেষে তাহা একটা মাঠের ধারে থামিয়া গেল।

"মোটর থামালে কেন?"

"এ আলোচনা মোটর চালাতে চালাতে করা যায় না। অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে—"

আন্নাকালীর অধরে মুচকি হাসি ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে হাসি মলয়কুমার দেখিতে পাইল না।

"রাত হয়ে গেছে, কি বলবে তাড়াতাড়ি বল—"

"সংক্ষেপেই বলছি তা হলে। আমাকে ফেলে কোথাও তুমি যেতে পাবে না, কারণ তোমাকে ছেড়ে আমি একদণ্ড থাকতে পারব না।"

ভ্রূলতা উৎক্ষিপ্ত করিয়া আন্নকালী বলিল, "তার মানে?—"

"মানে আবার কি। তুমি এখান থেকে চলে যাবে এ কথা আমি ভাবতেই পারি না। তোমাকে যেতে দেব না—"

আন্নাকালী মনে মনে খুশি হইল।

মুখে কিন্তু বলল, "ওসব মৌখিক কবিত্ব অনেক শুনেছি। সিনেমায় ঢুকলে আরও অনেক শুনব। আমাকে যেতে দেবে না মানে? আমাকে নিয়ে করবে কি তুমি!"

"সিনেমাই করব—"

"সিনেমা?"

"হ্যাঁ, সিনেমা। আমি তোমাকে নিয়ে একটা নাটক লিখেছি জান?"

"আমাকে নিয়ে?—"

"হ্যাঁ, তোমাকে নিয়ে, তুমিই তার হেরোইন। বইটা কোলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ সব জায়গায় পাঠিয়েছি, কিন্তু কোনও ব্যাটা উত্তর পর্যন্ত দেয়নি। হয়তো আমার গল্পটাই মেরে অন্য নামে বের করবে শালারা। তাই ঠিক করেছি নিজেই প্রডিউস করব, আর আমার ধারণা বইটা শিওর 'হিট' করবে।"

"তুমি প্রডিউস করবে! টাকা পাবে কোথা?"

"টোপিরাম দেবে।"

"তোমার মনিব টোপিরাম? দেবে সে অত টাকা!"

"আলবাৎ দেবে। মনিব টোপিরাম হয়তো দিত না, কিন্তু ভগ্নীপতি টোপিরাম দেবে। বাপ বাপ করে দেবে—"

"ভগ্নীপতি টোপিরাম মানে? শেফালীদিদিকে উনি বিয়ে করেছেন নাকি?"

"করেছেন। তবে আন্‌অফিসিয়ালি—"

"তার মানে কি?"

"নেপথ্যে।"

আন্নাকালী ক্ষণকাল চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া রহিল, তাহার পর ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

"হেসো না অনু, যখনই ও কথা ভাবি, আমার শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে। আমাকে ভোলাবার জন্যই এতবড় মোটরখানা ও আমাকে কিনে দিয়েছে। কিন্তু আমি ভোলবার

ছেলে নই। ছারপোকার মতো ওকে পিষে মারব আমি একদিন, কিন্তু তার আগে আমাদের যতটা রক্ত ও শোষণ করেছে তার সবটা 'পাম্প' করে বের করে নেব। টাকা দিয়েই যদি সম্মানের দাম দিতে হয়, অনেক টাকা দিতে হবে ওকে। সিনেমার টাকার কথা কাল শেফুকে দিয়ে বলিয়েছিলাম, শালা রাজি হয়েছে। দু'এক দিনের মধ্যেই হাজার দশেক দেবে বলেছে। বলেছে কোলকাতায় একটি হাউসও খুলে দেবে শেফুর নামে, আর আমি হব সে হাউসের হর্তাকর্তা। তখন প্রডিউস করব আমার নাটকটা, আর তুমি হবে তার হিরোইন। প্রডিউস করবই। আর আমার বিশ্বাস নাটকটা জমবেও খুব—"

নাটক কিন্তু পরমুহূর্তে জমিয়া গেল অন্যভাবে।

"হ্যান্ডস আপ—"

মলয়কুমার আন্নাকালী দুইজনেই চমকাইয়া উঠিল। দেখিল, মোটরের দুইদিকে দুইজন পিস্তল উঠাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দৈত্যের মতো দুইটি মূর্তি। আন্নাকালী চিৎকার করিয়া উঠিতেই একজন আগাইয়া আসিয়া তাহার মুখটা চাপিয়া ধরিল।

"যদি প্রাণে বাঁচতে চাও টুঁ শব্দটি কোরো না। পিছনের সিটে গিয়ে চুপটি করে বস।"

তাহার পর মলয়কুমারকে বলিল, "স্টিয়ারিং হুইলটা আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে তুমিও গিয়ে বস। মোটরটা আমাদের চাই। চেঁচামেচি, চিৎকার করলে বাধ্য হয়ে 'সুট' করতে হবে। চুপ করে থাকলে কিছু বলব না—"

মলয় এবং আন্নাকালী বিনা বাক্যব্যয়ে পিছনের সিটে গিয়া বসিল। বসিবার সঙ্গে সঙ্গে একজন আসিয়া তাহাদের হাত, পা, মুখ বাঁধিয়া দিয়া বলিল, "চুপ করে থাক। কিছু পরেই তোদের ছেড়ে দেবো—"

মিলিটারী পোশাক, চোখে গগল্‌স, হাতে রিভলভার—কোনরূপ প্রতিবাদ করিবার সাহস তাহাদের হইল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ি ঘুরিয়া ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে কোন্‌দিকে যে প্রধাবিত হইতে লাগিল তাহা মলয়কুমার বুঝিতে পারিল না।

স্টিয়ারিং ধরিয়াছিল বরেন আর তাহার পাশে বসিয়াছিল শিবাজী ওরফে সনৎ সেন। বরেন এবং শিবাজী ভবানী পাঠক, রবিনহুডের আদর্শে অনুপ্রাণিত। উভয়েই স্বকীয় বুদ্ধিবলে এবং বাহুবলে অন্যায়ের প্রতিকার করিতে চান। তাঁহাদের বিশ্বাস অন্য কোন উপায় আশুফলপ্রদ নয়। আইনসঙ্গত পদ্ধতিতে নাকে কাঁদিয়া আবেদন, নিবেদন করিলে সময় ও শক্তির অপচয় হয় মাত্র, কোন ফল হয় না। বুদ্ধিমান পাপীরা আইনের সাহায্য লইয়াই প্রকাশ্য দিবালোকে পাপাচরণ করে। যখন অধিকাংশ লোকই ধর্ম-বুদ্ধি-বিবর্জিত হয় তখন আইনের কোন মূল্য থাকে না। অর্থলোভে বুদ্ধিমান আইন-ব্যবসায়ীরা অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করেন, ঘুষ খাইয়া পুলিশ কর্মচারীরা অপরাধীকে ছাড়িয়া দেন, বিচারক পর্যন্ত সুবিচার করেন না। দেশের যাঁহারা শিরোমণি তাঁহারা যখন পাপাসক্ত হন, তখন অধর্মই মুখোশ পরিয়া বক্তৃতামঞ্চে বক্তৃতা করে, রাজপথে শোভাযাত্রা করিয়া অভিনন্দিত হয়, সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় বিজয়পতাকা উড়াইয়া দিতে সাহস করে। ধার্মিক, দরিদ্র জনসাধারণ তখন নিষ্পিষ্ট হয়, অধার্মিক, ধনী-সম্প্রদায় রক্ষা পায়। জুতাইয়া যাহাদের পিঠের চামড়া তুলিয়া ফেলা উচিত, আইন গণ্ডার-চর্ম-নির্মিত ঢালরূপে অথবা লৌহনির্মিত বর্মরূপে তাহাদের রক্ষা করে। দেশের এরূপ অবস্থায় দেশের সুস্থ যৌবন যদি নিজের পৌরুষে দুষ্টের দমন করিয়া প্রকৃত শিষ্টের পালন করিতে

সক্ষম হন, তাহা হইলে দেশ রক্ষা পায়, দুর্দিনের মেঘ কাটিয়া গিয়া সুদিনের আলো দেখা দেয়। ইহা করিতে গিয়া যদি দুই একটা খুনজখম করিতে হয়, করিতে হইবে। যদি ফাঁসিকাঠে ঝুলিতে হয়, ঝুলিতে হইবে।

এই মনোভাবদ্বারা চালিত হইয়া বরেন এবং শিবাজী কলেজ জীবন ত্যাগ করিবার পর হইতে যে-সব কাণ্ড করিয়াছিল, তাহা রোমাঞ্চকর।

বর্তমানে তাঁহারা কালোবাজারীদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া দুঃস্থ বাস্তুহারাদের জন্য অর্থসংগ্রহে ব্যাপৃত আছেন। তাঁহারা যে বাঙালী তাহা তাঁহাদের পোশাক দেখিয়া বা কথাবার্তা শুনিয়া বুঝিবার উপায় নাই। চার, পাঁচটা ভাষা অনর্গল বলিতে পারেন, পরিধানে মিলিটারি পোশাক। তাঁহারা বাঙালী না বিহারী, মারহাট্টি না গুজরাটি, চেহারা দেখিয়া বোঝা শক্ত। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, আমরা ভারতবাসী, ইহার বেশি আমাদের আর কোন পরিচয় দিবার আপাতত প্রয়োজন নাই।

বরেনের নাম বরেনই, কারণ এই নামে সে স্বাভাবিক, সামাজিক জীবনও যাপন করে। শিবাজী এবং দলের অন্যান্য সকলের কিন্তু বহু নাম। পুলিশের খাতায় ইহারা জনসন, মুরাঠা, হাবসি, ছট্টু, রামদেও, ছক্কন, যোশী, জাগুয়ার, কারেলাল, ঘেট্টা, কাংড়া প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হইয়া আছে। পুলিশকে বিভ্রান্ত করিবার জন্যই ইহারা নিজেদের উদ্ভট নামকরণ করিয়া তাহা পুলিশের কর্ণগোচর করিয়া দেয়। শিবাজীর আসল নাম অমৃত চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু এ নামে তাহাকে কেহ আর ডাকে না, দলের মধ্যে সে শিবাজী বলিয়া পরিচিত।

প্রায় ঘণ্টা দুই চলিবার পর মোটরটি যেস্থানে আসিয়া থামিল সেস্থান জনমানবহীন। চাঁদ উঠিয়াছিল, ক্ষীণ চন্দ্রালোকে মলয়কুমার দেখিতে পাইল রাস্তা হইতে বেশ কিছু দূরে একটা বিরাট অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপের মতো রহিয়াছে। ধ্বংসস্তূপের পিছনদিকেও খানিকটা ফাঁকা জায়গা দেখা যাইতেছে। শিবাজী সেইদিকেই মোটরটা লইয়া যাইতে নির্দেশ দিল।

আরও এক ঘণ্টা পরে।

চাঁদ একটা বিরাট বৃক্ষের অন্তরালে ঢাকা পড়িয়াছিল। সেই ফাঁকা জায়গায় মোটরের আড়ালে যেস্থানে তাহারা বসিয়াছিল তাহা আলো-আঁধারির কারুকার্যে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহাদের মনে কোন কোমলতা সঞ্চার করিতে পারে নাই। শিবাজী পিস্তল উঁচাইয়া বসিয়াছিল। মলয়কুমার নিজের এবং আন্নাকালীর জীবন-কাহিনী অকপটে বর্ণনা করিতেছিল। বর্ণনা শেষ হইলে শিবাজী প্রশ্ন করিল।

"যা বললে সমস্ত সত্যি?"

"সমস্ত।"

"আমরা খোঁজ করে দেখব। যদি সত্যি হয় তোমাদের কিছু বলব না, কিন্তু যদি মিথ্যে হয় তা হলে তোমাদের কেটে কুচিয়ে কাবাব করে খেয়ে ফেলব।"

বলিয়া সে কোমর হইতে প্রকাণ্ড একটা ছোরা বাহির করিয়া মলয়কুমারের হাতে দিল।

"ধারটা পরীক্ষা করে দেখতে পার।"

মলয়কুমার নীরবে পরীক্ষা করিয়া সেটা ফিরাইয়া দিতেছিল।

শিবাজী বলিল, "ওঁকেও দাও। উনিও পরীক্ষা করে দেখুন।"

আন্নাকালীও পরীক্ষা করিয়া দেখিল।

"আমরা এখন চললুম। তোমরা এখানেই থাক। কাল রাত্রে এসে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা করব।"

মলয়কুমার ও আন্নাকালীকে সঙ্গে লইয়া শিবাজী সেই ধ্বংসস্তূপের দিকে অগ্রসর হইল। বাহির হইতে ধ্বংসস্তূপ কিন্তু ভিতরে ঘর ছিল। একটা ঘরে প্রবেশ করিয়া শিবাজী টর্চ জ্বালিয়ে তাহাদের আহ্বান করিল। মলয়কুমার একটি কথাও বলে নাই। আন্নাকালীর ভয় করিতেছিল। শিবাজীর মুখের দিকে চাহিয়া সে কাতরকণ্ঠে বলিল, "আমার বড় ভয় করছে। আপনার পায়ে পড়ি, দয়া করে ছেড়ে দিন আমাদের।"

"বেশি বকবক করলে মুখ চিরকালের মতো বন্ধ করে দেব। আমার দয়ামায়া নেই, তোমার নাকি-কান্না শোনবার সময়ও নেই। এস—"

গত্যন্তর ছিল না।

বরেন পূর্বেই আসিয়াছিল। ঘরের মেঝেতে স্তূপীকৃত ইঁট পাটকেল সরাইতেছিল সে। একটা ছোট্ট লণ্ঠনও যোগাড় করিয়াছিল।

"কতদূর?" শিবাজী প্রশ্ন করিল।

"প্রায় হয়ে এসেছে। তোমরাও হাত লাগাও না—"

শিবাজী মেঝেতে টর্চ ফেলিয়া হঠাৎ পিছাইয়া আসিল।

"এ কি—"

"গোখরো সাপ একটা। আর একটু হলে কামড়াত আমাকে—"

"এখনও মরেনি দেখছি।"

শিবাজী ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিল। সাপের ল্যাজটা কুণ্ডলীকৃত হইতেছিল।

"না মরুক, খুলিটা উড়ে গেছে।"

"গুলি করেছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"একটা গুলি বাজে খরচ হয়ে গেল। টোটা যোগাড় করাই মুশকিল। অনেকদিন এখানে আসা হয়নি কিনা, তাই সাপ ঢুকেছে। কিছু কার্বলিক অ্যাসিড আনতে হবে আবার।"

মলয়কুমার ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের কি এই ঘরে থাকতে হবে?"

"না। চটপট মেঝেটা পরিষ্কার করলেই সেটা বুঝতে পারবে। নাও, হাত লাগাও।"

সকলে মিলিয়া মেঝেটা পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। দেখা গেল, মেঝেতে একটি লৌহকপাট রহিয়াছে, কপাটে বিরাট একটা তালা লাগানো!

শিবাজী তালা খুলিয়া কপাটটা টানিয়া তুলিল। নীচে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না।

"মই দাও—"

বরেন তাহার কাঁধে-ঝোলানো চামড়ার ব্যাগ হইতে দড়ির মইটি বাহির করিয়া দিল। মলয়কুমার সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, মেঝেতে দুইটি লোহার হুকও শক্ত করিয়া পোঁতা আছে। মইটি অনায়াসেই ঝুলাইয়া দেওয়া গেল। বরেন নামিল সর্বাগ্রে। তাহার পর শিবাজী লণ্ঠনটি দড়ি বাঁধিয়া নামাইয়া দিল।

"এইবার তোমরা নাব একে একে।"

"ওই গর্তের ভিতর থাকতে হবে আমাদের।"

আন্নাকালীর চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল।

শিবাজী স্থির দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "গর্ত নয়, ঘর আছে নীচে। নাবলেই দেখতে পাবে।"

আন্নাকালী করুণদৃষ্টিতে একবার মলয়কুমারের মুখের দিকে চাহিল, তারপর ঝুলিয়া পড়িল।

মলয়কুমারকেও অনুসরণ করিতে হইল। সকলের শেষে নামিল শিবাজী।

নীচে সত্যই ঘর ছিল। মলয়কুমার ভয় পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার কৌতূহলও উদ্রিক্ত হইয়াছিল। তাহার বলিষ্ঠ যৌবন এই লোক দুইটির দুঃসাহসিক কার্যকলাপ সবিস্ময়ে পর্যবেক্ষণ করিতেছিল।

সে জিজ্ঞাসা করিল, "মাটির নিচে ঘর আপনারাই বানিয়েছেন?"

শিবাজী উত্তর দিল।

"বানিয়েছিলেন আমার এক পূর্ব-পুরুষ জমিদার। তিনিও ডাকাত ছিলেন শুনেছি। লুটকরা ধনরত্ন এইখানে রাখতেন। এখন আমার কাজে লাগছে!"

"এত নীচে ঘর বানিয়েছিলেন, আশ্চর্য তো!"

"এত নীচে ছিল না। ভূমিকম্প হওয়াতে আরও নীচে নেমে গেছে। পাশে আরও দুখানা ঘর আছে। তোমরা দু'জনে দুটো ঘরে আলাদা থাকবে। সমস্ত বন্দোবস্ত আছে, এমন কি আলাদা বাথরুম পর্যন্ত। কোনও কষ্ট হবে না। দিন দুইয়ের মতো খাবারও আছে। অবশ্য ভাতটাত পাবে না, ছাতু আছে এক হাঁড়ি। দু'জায়গায় ভাগ করে নাও সেটা। কাল যদি পাই, পাঁউরুটি আনব। ওসব প্রেম-ট্রেম, সিনেমা-টিনেমা এখন চলবে না, বুঝলে? দেশের এখন অত্যন্ত দুরবস্থা, দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন এই এখন আমাদের প্রধান কাজ, দেশকে গড়ে তুলতে হবে। সুতরাং কোনরকম ন্যাকামি ছিঁচকেমি চলবে না এখন। আমাদের সঙ্গে যদি আসতে চাও ওসব ত্যাগ করে আসতে হবে। এ পথে পুরস্কার কিছুই নেই, একটু অসাবধান হলেই মৃত্যু। কংসরাজার চরেরা চারিদিকে ঘুরছে। তোমাদের সব কথা বলেছি, চব্বিশ ঘন্টা সময়ও দিচ্ছি, নির্জনে ভাল করে ভেবে দেখ কি করবে। তোমরা যদি আমাদের দলে যোগ দাও খুশি হব। দেশের যত যুবক-যুবতী আমাদের দলে আসে ততই মঙ্গল। পঙ্কোদ্ধার করতে অনেক লোক চাই।"

শিবাজীর এই সব কথা শুনিয়া, বিশেষতঃ এখনকার কথাবার্তার ধরনধারণে একটা কোমলতার আভাস পাইয়া আন্নাকালীর মনে একটু সাহস সঞ্চারিত হইয়াছিল।

সে ঘাড় বাঁকাইয়া মুচকি হাসিয়া বলিল, "আমাদের তো আপনারা চেনেন না, আমরা যদি আপনাদের দলে ঢুকে বিশ্বাসঘাতকতা করি।"

"করে দেখই না একবার।"

সহসা শিবাজীর কণ্ঠস্বর কঠিন হইয়া গেল।

"বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের হাত থেকে আজ পর্যন্ত নিস্তার পায়নি কেউ। অনেক বিশ্বাসঘাতককে কেটে কুচিয়ে কাবাব করে খেয়েছি। তোমরা যদি বিশ্বাসঘাতকতা কর তোমাদেরও খাব। বরেন—"

বরেন পাশের ঘরে ঢুকিয়াছিল। সে একটা টিন হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

"ওটা কি—"

"এতে দেখছি কিছু লাড্ডু আছে।"

"ভাগ করে দিয়ে যাও এদের। আর সেই 'জারটা' নিয়ে এস তো—"

বরেন চলিয়া গেল এবং একটা কাঁচের 'জার' লইয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার উপর টর্চের আলো নিক্ষেপ করিয়া শিবাজী বলিল, "ভাল করে দেখে নাও—"

আন্নকালী দেখিল, জারের ভিতর জলের মতো কি যেন রহিয়াছে এবং তাহাতে ছোট ছোট কি সব ডোবানো আছে। দেখিতে অনেকটা আমসির মতো।

"কি ওগুলো?"

"বিশ্বাসঘাতকদের জিব। কেটে নিয়ে ফর্মালিনে ডুবিয়ে রেখেছি—"

"ফর্মালিন কি?"

"একরকম ওষুধ।"

বরেন 'জার'টি পুনরায় পাশের ঘরে রাখিয়া আসিল। হাতঘড়ি দেখিয়া বলিল, "এবার আমাদের যাবার সময় হয়েছে—"

"এদের সব ব্যবস্থা করে দাও আগে।"

"দিয়েছি। একটা ঘরে বালতিটা দিলাম, আর একটা ঘরে কুঁজো, গেলাসও দিয়েছি—"

"এস।"

একটা ঘরে প্রবেশ করিয়া শিবাজী মলয়কুমারকে বলিল, "তুমি এই ঘরে থাক—। তোমার নাম কি?"

"মলয়কুমার।"

"মলয়কুমার টলয়কুমার চলবে না। চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি, নাম বদলাও।"

আন্নাকালীর দিকে ফিরিয়া শিবাজী প্রশ্ন করিল, "তোমার নাম ?"

"আন্নাকালী।"

"এ নামও চলবে না।"

মলয়কুমার লজ্জিতকণ্ঠে বলিল, "আমি ঠিক করেছিলাম ওকে মণিকা বলে ডাকব।"

"ঠিক করবার সময় দ্রৌপদী, গান্ধারী, বিদুলা, লক্ষ্মীবাই, দুর্গাবতী এসব নাম মনে আসেনি? এই সুঁটকো কালো মেয়ের মণিকা নাম মানাবে?"

মলয়কুমার চুপ করিয়া রহিল। আন্নাকালী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"আর দেরি করা ঠিক হচ্ছে না।"

বরেন মৃদুকণ্ঠে পুনরায় বলিল।

"হ্যাঁ, চল—"

দুইজনকেই দুই ঘরে তালা বন্ধ করিয়া বরেন ও শিবাজী চলিয়া গেল।

ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পরে শিবাজী একা ফিরিল। তাহার অদ্ভুত পোশাক দেখিয়া মলয়কুমার চমৎকৃত হইয়া গেল, আন্নাকালী হাসিয়া ফেলিল। শিবাজী কাবুলীওলার পোশাক পরিয়া আসিয়াছিল। চব্বিশ ঘণ্টা একা থাকিয়া মলয়কুমার এবং আন্নাকালীর চরিত্রেরও অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। তাহারা দুইজনেই মর্মে মর্মে যাহা অনুভব করিতেছিল ভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়া বলা কঠিন।

কাবুলীর চাপদাড়িটা খুলিয়া ফেলিয়া শিবাজী বলিল, "বেশিক্ষণ বসবার সময় নেই আজ। তোমরা কে কি ঠিক করলে বল—"

মলয়কুমার বলিল, "আমি কি আর ঠিক করব। আপনি যা বলবেন তাই করব।"

আন্নাকালীর উত্তর শুনিয়া শিবাজী একটু বিস্মিত হইল। এ উত্তর সে প্রত্যাশা করে নাই।

আন্নাকালী বলিল, "এমনভাবে বন্দী করে রাখলে কি কিছু ঠিক করা যায়? প্রাণের ভয়ে আপনি যা বলবেন তাতেই সায় দিতে হবে। আমাদের স্বাধীন মতামত জানতে হলে আমাদের স্বাধীন করে দিতে হবে।"

শিবাজী কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিল।

"বেশ তাই হবে। তোমাদের দুজনকেই ছেড়ে দিচ্ছি। তোমরা যদি আমাদের দলে যোগ দিতে চাও, তা হলে যে মাঠে তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেই মাঠে সাতদিন পরে রাত একটার সময় এস। আমি থাকব সেখানে। সাতদিনে আশা করি যা হয় একটা ঠিক করে ফেলতে পারবে। যদি আমাদের দলে যোগ দেওয়াই ঠিক কর, তা হলে টোপিরাম যে দশ হাজার টাকা দেবে বলেছিল সেটাও হাতিয়ে নিয়ে এস। রেফিউজিদের জন্যে অনেক টাকা লাগছে। আর আমাদের দলে যোগ না দিতে চাও, দিও না, কিন্তু আমাদের কথা কাউকে বোলো না। যদি বল তা হলে তোমাদের জিবও ওই জারে গিয়ে হাজির হবে। ওঠ তা হলে, তোমাদের রেখে আসি—"

মোটর পুনরায় সেই মাঠের ধারে আসিয়া থামিল।

"মোটরটা দেবেন না?"

"না।"

"বোলো বর্ধমানে আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম, মোটরটা সেখানে খারাপ হয়ে যাওয়াতে একটা ওয়ার্কশপে রেখে এসেছি। কিম্বা যা খুশি বানিয়ে বোলো। আসল খবরটা কেবল বোলো না। আমি চললাম তা হলে—"

শিবাজী চলিয়া গেল।

সপ্তম দিন রাত্রি সাড়ে এগারোটা হইতে মলয়কুমার এবং আন্নাকালী সেই মাঠে শিবাজীর প্রতীক্ষায় একটি গাছের তলায় বসিয়াছিল। রাত্রি বারোটা পর্যন্ত কাহারও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। সাড়ে বারোটার সময় আন্নাকালী বলিল, "একটা মোটরের শব্দ হচ্ছে—"

মলয়কুমারও শব্দটা শুনিয়াছিল।

বলিল, "মোটরকার নয়, মোটরবাইক।"

বাইকটা মাঠের ধারেই থামিল। বাইক হইতে নামিলেন একজন দীর্ঘকায় পুরুষ। টর্চ ফেলিতে ফেলিতে তিনি মাঠের দিকে আগাইয়া আসিলেন এবং মাঠের ভিতর দাঁড়াইয়া চারিদিকে টর্চের আলো ফেলিতে লাগিলেন। বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান মলয়কুমার এবং আন্নাকালীর গায়েও টর্চের আলো পড়িল। দীর্ঘকায় পুরুষটি তাহাদের দেখিতে পাইয়া তাহাদের লক্ষ্য করিয়াই অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

আন্নাকালী চুপি চুপি বলিল, "এ তো অন্যলোক দেখছি। শিবাজীও নয়, বরেনও নয়। পোশাক দেখে পুলিশের লোক মনে হচ্ছে।"

"দেখা যাক শেষ পর্যন্ত।"

দীর্ঘকায় পুরুষটি তাহাদের নিকটে আসিয়া থামিয়া গেলেন।

"আপনারা কে।এত রাত্রে এখানে কি করছেন?"

"মাঠে বেড়াতে এসেছি।"

"এত রাত্রে বেড়াতে আসাটা অস্বাভাবিক নয় কি?"

"আমরা একটু বেশি রাত করেই বেড়াই। সন্ধ্যাবেলা সুবিধা হয় না।"

মলয়কুমার আড়চোখে আন্নাকালীর দিকে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিল। আন্নাকালীও মুখটা অন্যদিকে ফিরাইয়া মস্তক নত করিল।

"বুঝেছি। আপনাদের বাড়ি কি এখানেই?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার পরিচয়টি জানতে পারি কি?"

"আমি পুলিস ইনস্‌পেকটর। শিবাজী নামে একটা ডাকাতের আজ এখানে আসবার কথা, তারই সন্ধানে এসেছি।"

"ও বাবা! তা হলে আমাদের এখানে থাকা উচিত নয়, কি বলেন?"

"না, নিরাপদ নয়। অবস্থা বুঝে আমি না হয় আপনাদের ছেড়ে দিলাম, কিন্তু অন্য অফিসার এত রাত্রে আপনাদের এখানে দেখলে ছেড়ে নাও দিতে পারেন।"

"অন্য অফিসারও আছে না কি?"

"সমস্ত মাঠটাকে ঘিরে আছি আমরা।"

"কি সর্বনাশ!"

"আপনারা বাড়ি যান।"

টর্চ ফেলিতে ফেলিতে পুলিশ-ইনস্‌পেকটর চলিয়া গেলেন। একটু পরেই একটা হুইসল বাজিয়া উঠিল। মাঠের অন্ধকার বিদীর্ণ হইয়া গেল যেন। তাহার পর মোটর-বাইকটা গর্জন করিয়া উঠিল এবং গর্জন করিতে করিতে চলিয়া গেল। নিস্তব্ধতা ঘনাইয়া আসিল খানিকক্ষণের জন্য।

আন্নাকালী ছোট্ট একটি হাই তুলিয়া বলিল, "আর কি আমাদের অপেক্ষা করা উচিত?"

মলয়কুমারের পকেটে ছোট একটি টর্চ ছিল। তাহারই সাহায্যে সে হাতঘড়িটা দেখিল।

"ঠিক একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আর পাঁচ মিনিট বাকী আছে।"

"পুলিশে ধরে যদি।"

"ধরুক। শিবাজী যদি না আসেন তা হলে বাড়িতেও পুলিশ গিয়ে হাজির হবে শীগ্‌গির। অতবড় মোটরকারটা হজম করা শক্ত হবে। টোপিরাম আজই বলছিল, তুমি বর্ধমান থেকে গাড়িটা নিয়ে এস।"

"আমার মাও জিজ্ঞেস করছিল মলয়ের সঙ্গে বর্ধমানে গিয়ে কোথায় ছিলি, হোটেলে নাকি?"

"আমার ভয় ছিল রাগারাগি করবেন হয় তো—"

"রাগারাগি করবেন! খুশিই হয়েছেন বরং। ছেলের চাকরি হলে যেমন খুশি হতেন তেমনি—"

আন্নাকালীর কথার উষ্মায় মলয়কুমার অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। চারিদিকের অন্ধকার যেন থমথম করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে আন্নাকালী পুনরায় বলিল, "এ নরক থেকে উদ্ধার যে কবে পাব জানি না। নমিতাদি কি সাধে আত্মহত্যা করেছেন—"

"নমিতাদি কে—"

"সেজদির একজন বন্ধু। তার বাপ নিজে লোক জুটিয়ে আনত! এতদিন ছিল একটা বুড়ো এস.ডি.ও. তারপর এসে জুটেছিল নিমাই ডাক্তার, তারপর—"

আন্নাকালীর কথা শেষ হইল না। শিবাজীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"এই যে তোমরা এসেছ দেখছি—"

আন্নাকালী তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল, "আপনাকে ধরবার জন্যে একজন পুলিশ অফিসার ঘুরে বেড়াচ্ছে, এখানে এসেছিল একটু আগে—"

শিবাজী এ সংবাদে বিশেষ বিচলিত হইল না।

প্রশ্ন করিল, "তোমরা কি ঠিক করলে?"

"আপনার সঙ্গে যোগ দেব।"

"দুজনেই?"

"দুজনেই।"

মলয়কুমার বলিল, "টাকাটাও এনেছি—"

"বাঃ। নগদ তো!"

"নগদ। টোপিরাম নিজে উইথড্র করে দিয়েছে।"

"বেশ, চল তা হলে। নাম বদলেছ?"

"বদলেছি। আমি আজ থেকে গোপীনাথ। শহীদ গোপীনাথের পরিবারের সঙ্গে আমাদের আলাপ ছিল এককালে—"

"বেশ। আর তুমি?"

আন্নাকালী বলিল, "বাপমায়ের দেওয়া নাম বদলাবার আমার ইচ্ছে নাই। নাম বদলে কি হবে। যদি বদলাতেই হয় মণিকাই হোক। মলয়দা যখন অত পছন্দ করে রেখেছেন—"

"বেশ মণিকাই থাক। আমি কিন্তু তোমাকে লক্ষ্মীবাই বলে ডাকব। ঝান্সীর রানি লক্ষ্মীবাই যেমন বলেছিল—মেরী ঝান্সী নেহি দেউঙ্গী, তোমাকেও তেমনি বলতে হবে মেরা ইমান নেহি দেউঙ্গী, মেরী ইজ্জত নেহি দেউঙ্গী—"

"বেশ। এখানে কিন্তু থাকা নিরাপদ নয়। পুলিশ ইনস্‌পেকটরটা হয়তো আবার এসে পড়বে—"

শিবাজী হাসিয়া বলিল, "ভয় নেই, আমিই ওকে পাঠিয়েছিলাম দেখতে যে, তোমরা যদি এসে থাক। তোমাদের ভাবগতিক কি রকম। তোমরাও তো পুলিশ সঙ্গে নিয়ে আসতে পারতে।"

"পুলিশ ইনস্‌পেকটরের সঙ্গে ভাব আছে নাকি আপনার—"

"আছে বই কি দু'একজনের সঙ্গে। কিন্তু এখন যে পুলিশ ইনস্‌পেকটর এসেছিল সে নকল পুলিশ ইনস্‌পেকটর।"

"তাই না কি!"

আন্নাকালী সত্যই বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল।

"চমৎকার 'মেক্ আপ' করেছিল তো।"

"আমাদের দলের লোক। আলাপ হবে ক্রমশঃ—"

তাহারা মাঠ ছাড়াইয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িল। গাছের অন্ধকারে যে একটা মোটর দাঁড়াইয়া আছে তাহা প্রথমে মলয়কুমারের নজরে পড়ে নাই।

"চল, ওঠ—"

"সে মোটরটা কোথায় গেল?"

"সেইটেই। রংটা কালো করে দিয়েছি—"

"কোথা করলেন? স্প্রে পেন্টিং করিয়েছেন তো?"

"হ্যাঁ। কোলকাতায় আমাদের নিজেদেরই ওয়ার্কশপ আছে; সেখানেই করিয়েছি।"

"ও।"

"চল এবার। দু'দিন ঘুম হয়নি। একটু ঘুমুতে হবে—। তোমাদের কি এখনও আলাদা আলাদা ঘরে বন্ধ করে রাখতে হবে নাকি?"

মণিকা উত্তর দিল—"আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন—"

"তোমাকে?"

শিবাজী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গোপীনাথের দিকে চাহিল।

ঈষৎ ইতস্তত করিয়া গোপীনাথও বলিল, "আমাকেও?"

"বেশ, চল।"

সাতদিনের মধ্যেই নবজাতক গোপীনাথ ও মণিকা শিবাজীর দলের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গেল। তাহারা লক্ষ্য করিল, বরেন দলের সঙ্গে থাকে না! মাঝে মাঝে আসে, আবার যায়।

"বরেনবাবু থাকেন কোথা—"

মণিকাই একদিন প্রশ্ন করিল। গোপীনাথের মনেও এ প্রশ্ন আসিয়াছিল কিন্তু সে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করে নাই। শিবাজীকে অত্যন্ত ভয় করিত বলিয়া তাহার সহিত তাহার আচরণ স্বচ্ছন্দ হয় নাই। মণিকার কিন্তু হইয়াছিল।

শিবাজী উত্তর দিতে আপত্তি করিল না।

"বরেন নিজের বাড়িতে থাকে। শিকারের খবর নিয়ে মাঝে মাঝে আসে কেবল। তোমাদের খবর ওই এনেছিল।"

"ও! কি করেন উনি?"

"লাইফ ইনসিওরেন্সের দালালী। মাঝে মাঝে টিউশনিও করে। এম-এ পাশ, মুখ্যু নয়—"

"আপনাদের দলে আর কে কে আছে?"

"অনেকে আছে। প্রত্যেক প্রদেশেই লোক আছে আমাদের। বিহারে গণপৎ পাণ্ডে, পাঞ্জাবে ভার্গব, উত্তরপ্রদেশে কুকি, মহারাষ্ট্রে শঙ্কর শাস্ত্রী, গুজরাটে কানহাইয়া—আরও অনেক আছে, যদি টিকে থাকতে পার সকলের সঙ্গেই পরিচয় হবে ক্রমশঃ। এখন তোমাদের কাজ বলে দি শোন। তোমরা ছদ্মবেশে শহরে শহরে ঘুরে বেড়াবে, আর কালোবাজারীদের সন্ধান রাখবে, আর ঘুষখোর অফিসারদের নাম সংগ্রহ করবে। আপাতত এই তোমাদের কাজ—"

গোপীনাথ হাসিয়া বলিল, "আজকাল শুনছি সব অফিসারই ঘুষখোর—"

"অকাট্য প্রমাণ পেলে সব কটাকেই শেষ করতে হবে তা হলে। স্লেট মুছে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।"

মণিকা প্রশ্ন করিল—"আমাকে কি ছদ্মবেশে মানাবে বলুন তো—"

"তোমাকে ব্যাটাছেলে সেজে থাকতে হবে। আজই চুল ছেঁটে ফেল। কাবুলী, ইরানী বা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বেশে মানাবে তোমাকে, আর একটা কথা, দুজনে কখনো একসঙ্গে থেকো না।"

গোপীনাথ মনের কথাটি চাপিয়া রাখিয়াছিল। এইবার ব্যক্ত করিল।

"আমি মনে মনে শপথ করেছি টোপীরামকে হত্যা করব।"

"ওকে বাঁচিয়ে রাখাই ভাল। মাঝে মাঝে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা যাবে। টাকার খুব দরকার যে। ওকে মেরে ফেলতে চাইছ কেন?"

গোপীনাথ ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল, "ও আমার মা আর বোন দুজনকেই নষ্ট করেছে।"

"তা যদি হয় তা হলে তোমার মা আর বোনকেও শেষ করতে হয়। তারাও পাপীয়সী।"

"দারিদ্র্যের জন্য বাধ্য হয়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে।"

"গলায় দড়ি দিতেও পারত। পুড়ে মরতে পারত। খুব দরিদ্র অথচ খুব ভাল মেয়ের অভাব নেই এদেশে। পাকিস্তানের গুণ্ডারা সত্যিকারের ভালো মেয়েদের নষ্ট করতে পারেনি। তারা সবাই আত্মসম্মান বাঁচিয়েছে। এদেশেই জহরব্রত করেছিল একদিন মেয়েরা—"

শিবাজীর চক্ষু দুইটি জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ডের মতো লাল হইয়া উঠিল। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইল, হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ হইয়া গেল, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া শিবাজী বলিল, "দারিদ্র্য! দারিদ্র্যের পঙ্কেই সতীত্বের কমল ফুটতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। টোপিরামকে মারতে হলে ওদের রেহাই দেওয়া চলবে না।"

গোপীনাথ নির্বাক হইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ গোপীনাথের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিয়া শিবাজী অবশেষে বলিল, "সে ব্যবস্থা যথাকালে করব আমি। তোমাকে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আজই ওদের নাম লিস্টে চড়িয়ে নেব আমি। তোমরা আগে লক্ষ্যভেদ করতে শেখ, টারগেট প্র্যাকটিস কর, তারপর ওসব কথা ভেব।..."

এইভাবেই চলিতে লাগিল।

গোপীনাথ এবং মণিকা ভূগর্ভস্থ সেই ঘরে বসিয়া মোমবাতি জ্বালাইয়া লক্ষ্যভেদের সাধনা করিতে করিতে ক্রমশঃ যে যোগ্যতা অর্জন করিল তাহা সুলভ নহে। শিবাজী সমস্ত দিন থাকিত না। রাত্রে আসিত। নানা যানে, নানা বেশে। কখনও পদব্রজে, কখনও অশ্বপৃষ্ঠে, কখনও মোটরযোগে, কখনও বাঙালীবাবুর পোশাকে, কখনও মিলিটারি বেশে, কখনও মাড়োয়ারীর পাগড়ি মাথায় দিয়া। কখনও চোখে চশমা, কখনও সূচ্যগ্র ফরাসী-দাড়ি, কখনও জমকালো জুলফি। গোঁফ কখনও পতঙ্গী হিটলারি, কখনও শৃঙ্গী কাইজারি, কখনও বাবরি চুল, কখনও আবক্ষ দাড়ি—নানা ছদ্মবেশে সে যে কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইত, গোপীনাথ বা মণিকার জানিবার উপায় ছিল না। তাহারা শুধু জানিত শিবাজী রাত্রে আসিবে, সঙ্গে করিয়া আনিবে কিছু খাবার এবং টাকা। প্রত্যহই সে টাকা লইয়া আসিত এবং ওই ভগ্নস্তূপের মধ্যেই কোথাও লুকাইয়া রাখিত। কিন্তু কোথায় রাখিত তাহা গোপীনাথ বা মণিকা জানিতে পারে নাই,

জানিবার চেষ্টাও তাহারা করিত না। আর একটা ব্যাপারও তাহাদের অজ্ঞাত ছিল। শিবাজী যে গোপনে তাহাদের দুইজনের আচরণ লক্ষ্য করিতেছে, এ খবরও তাহারা জানিত না। একদিনের ঘটনায় তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল।

শিবাজীর সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীমতী মণিকার চরিত্রে যে পরিবর্তন দেখা দিল তাহা বিস্ময়কর। সে যেন শিখার মতো জ্বলিতে লাগিল। একখণ্ড মূল্যবান হীরকখণ্ড অনাদরে ধূলায় মলিন হইয়া যেন পড়িয়াছিল, পরিষ্কৃত হইবামাত্র তাহার স্বাভাবিক দ্যুতি ফিরিয়া আসিল। লক্ষ্যভেদের ব্যাপারেও অল্পসময়ের মধ্যে যে দক্ষতা সে অর্জন করিল তাহা অসাধারণ। গোপীনাথের মধ্যে কিন্তু কিঞ্চিৎ গলদ থাকিয়া গিয়াছিল। লক্ষ্যভেদ ব্যাপারে সে-ও অবশ্য কম কৃতিত্বলাভ করে নাই, শাখায় দোদুল্যমান আমকে সে এক গুলিতেই ভূশায়ী করিতে পারিত, কিন্তু দেখা গেল চরিত্রে তাহার রন্ধ্র আছে। সহসা একদিন অবেগকম্পিত-কণ্ঠে সে বলিয়া বসিল, "মণিকা, আমার স্বপ্ন কি কখনও সফল হবে না—"

"কি স্বপ্ন?"

"তোমাকে পাবার স্বপ্ন।"

বলিয়া তাহার হাত ধরিল।

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া মণিকা সঙ্গে সঙ্গে তর্জন করিয়া উঠিল, তাহার নয়নদ্বয় হইতে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ ছুটিয়া বাহির হইল। হঠাৎ কোমরে-গোঁজা রিভলভারটা তুলিয়া বলিল, "খবরদার, ওকথা দ্বিতীয়বার যদি উচ্চারণ করেছ, মাথার খুলি উড়িয়ে দেব তোমার।"

গোপীনাথ ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল। কথাটা বলিবার পূর্বে তাহার নিজের মানসিক ভারসাম্যটাও বিচলিত ছিল, মণিকার ধমক খাইয়া সে একেবারে হাঁটু গাড়িয়া তাহার পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল, করজোড়ে বলিল, "আমাকে মাপ কর, আর কখনও বলব না—"

"আমার পা ছুঁয়ে বল, মা আমাকে মাপ কর। তা হলে কবব।"

গোপীনাথ অপ্রস্তুতমুখে তাহাই বলিল।

ঠিক ইহার পরই যাহা ঘটিল তাহা আরও অপ্রত্যাশিত। কপাট ঠেলিয়া শিবাজী প্রবেশ করিল এবং মণিকার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল। "বাঃ খুশি হলাম। বকশিশ দেব তোমাকে—"

গোপীনাথের দিকে শিবাজী যখন তাকাইল তখন কিন্তু তাহার দৃষ্টি অগ্নিগর্ভ।

"তোমার যা ব্যাপার দেখছি তাতে তোমাকে কেটে কুচিয়ে কাবাবই করে ফেলতে হবে—"

তাহার পর বজ্রকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল—"হ্যান্ডস্ আপ—" ক্ষিপ্রহস্তে পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া বলিল, "ভগবানের নাম করতে চাও তো কর—"

মণিকা হাসিমুখে দাঁড়াইয়াছিল।

বলিল, "আমাকে বকশিশ দেবেন বললেন, ওর প্রাণটাই আমাকে দিন।"

"কি করবে তুমি ছাগলটাকে নিয়ে? বোকা পাঁঠা একটা—"

"না, ও মানুষ। মানুষ বলেই একটু-আধটু দুর্বলতা আছে। সব শুধরে যাবে। একটু সময় দিন ওকে। আমাকে ও মা বলেছে, আমি ওকে মাপ করেছি।"

"এখানে কিন্তু ওকে আর রাখব না।"

"তা যেখানে খুশি রাখুন প্রাণে মারবেন না।"

"বেশ।"

সেইদিনই শিবাজী গোপীনাথকে লইয়া চলিয়া গেল। গোপীনাথ কোনও প্রতিবাদ করিল না। শিবাজী তাহাকে লইয়া গিয়া সমর্পণ করিল ভার্গবের হস্তে। ভার্গবের সহিত তাহাদের দেখা হইল গঙ্গা-তীরের একটা পোড়ো নীল-কুঠির ধারে। শিবাজী ভার্গবকে বলিল, "একে এবং একটি মেয়েকে নূতন ভর্তি করেছি। একে তুমি তোমার হেফাজতে রাখ। এক নম্বর ক্যাম্পে রেখেছিলাম, একটু বদচাল লক্ষ্য করেছি, তাই তোমার কাছে দিয়ে যাচ্ছি। তেমন যদি কিছু লক্ষ্য কর, দয়া-মায়া করবার দরকার নাই।"

"বেশ।"

ভার্গবকে দেখিয়া গোপীনাথ আশ্চর্য হইয়া গেল। ভার্গব নামটা মনে যে ধরনের জমকালো ছবি আঁকে, ভার্গব মোটেই সেরকম নয়। ছিপছিপে, পাতলা, লম্বা লোক। শরীরের উপরার্ধ সামনের দিকে সর্বদা ঝুঁকিয়া আছে। যখন দাঁড়াইয়া থাকে মনে হয় যেন একটা বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্ন মূর্ত হইয়াছে, কিম্বা যেন একটা প্রকাণ্ড কাস্তে হাতলের উপর দাঁড়াইয়া আছে। দাঁড়াইবার এই বিশেষ ভঙ্গি যে লোকের চোখে ধূলা দিবার একটা কায়দামাত্র তাহা গোপীনাথ অনেকদিন বুঝিতে পারে নাই। আর একটা জিনিসও সে লক্ষ্য করিল, ভার্গব অত্যন্ত স্বল্পভাষী। যে মোটরবাইকে চড়িয়া সে আসিয়াছিল, তাহার সহিত সংযুক্ত একটি সাইড-কার ছিল। গোপীনাথ তাহাতেই চড়িয়া ভার্গবের সহিত চলিয়া গেল।

পরদিন বরেন আসিয়া মণিকাকেও লইয়া গেল। বরেন তাহাকে লইয়া গিয়া রাখিল নিজের বাড়িতে, পরিচয় দিল তাহার এক পাকিস্তানী বন্ধুর ভগ্নী বলিয়া। পাকিস্তান হইতে বহু অপরিচিতা নারী এদেশে আসিতেছে, সুতরাং কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিল না। বরেনের বাড়িতে পরিজন বেশি ছিল না। বরেনের দাদা, বৌদিদি এবং দুইটি শিশু সন্তান। বরেনের দাদা হরেনবাবু অতিশয় নিরীহ প্রকৃতির লোক। সমস্ত সকাল পূজাপাঠ লইয়া থাকিতেন, দশটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত আপিস করিতেন, সন্ধ্যার আহারাদি করিয়া ভাগবতপাঠ শুনিতে যাইতেন, রাত্রে আসিয়া কয়েকবার হরিনাম উচ্চারণ করিয়া শুইয়া পড়িতেন। বাজার পর্যন্ত করিতেন না। বরেন যখন বাড়িতে থাকিত বরেনকেই সে কাজ করিতে হইত। যখন থাকিত না তখন বাড়ির ছোঁড়া চাকরটা করিত। মণিকার আগমনে নিরীহপ্রকৃতির হরেনবাবু প্রথম প্রথম একটু বিব্রতবোধ করিতেছিলেন। দুর্দাশাগ্রস্ত পূর্ববঙ্গবাসীদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি যথেষ্ট ছিল, প্রত্যহ তিনি তাহাদের মঙ্গলের জন্য ভগবচ্চরণে প্রার্থনাও জানাইতেন, কিন্তু একটি যুবতী মেয়ে তাঁহার পরিবারে আসিয়া বাস করিবে, এই জটিল পরিস্থিতির জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না, এই দুর্মূল্যের বাজারে ইহার ভরণপোষণ করিবার মতো আর্থিক সঙ্গতিও তাঁহার ছিল না। বরেন তাঁহাকে আশ্বস্ত করিল। বলিল, মেয়েটি একেবারে নিঃস্ব নহে, পলাইয়া আসিবার সময় কিছু টাকা সে সঙ্গে আনিয়াছে, নিজের ব্যয়ভার সে নিজেই বহন করিবে, এমন কি তাহাদের সংসারেও কিছু অর্থসাহায্য করিতে ইচ্ছুক। মাসিক একশত করিয়া টাকা সে দিবে। তাহার আত্মীয়স্বজনকে গুণ্ডারা মারিয়া ফেলিয়াছে, এখন সে কিছুদিনের জন্য অন্তত কোনও ভদ্রপরিবারে আশ্রয় চায়। ইহার পর অবস্থা অনুসারে সে নিজের ব্যবস্থা করিয়া লইবে। কয়েকদিন পরে বরেন সত্যিই নগদ একশত টাকা হরেনবাবুর হাতে দিয়া বলিল, "মণিকা এই টাকাটা দিয়েছে। ওর ইচ্ছে পাঁচজনের কাছে আমরা যেন ওকে নিজের লোক বলে পরিচয় দিই—"

হরেনবাবু নোটগুলির দিকে কয়েকমুহূর্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তাহার পর বলিলেন, "নিজের লোক! কি জাত তার ঠিক নেই।"

"আমাদেরই স্বজাতি।"

হরেনবাবুর স্ত্রী কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি বরেনের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "পালটি ঘর নাকি—"

"হ্যাঁ—"

"তা হলে আর ভাবনা কি—"

মুচকি হাসিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। হরেনবাবু নোটগুলির দিকে চাহিয়াছিলেন, হঠাৎ মনস্থির করিয়া ফেলিলেন। নোটগুলি ফতুয়ার পকেটে পুরিয়া বলিলেন, "বেশ, তাই হবে—"

পরকে আপন করিয়া লইবার দক্ষতা মণিকার ছিল, সুতরাং দেখিতে দেখিতে সে ইহাদের ঘরের লোকই হইয়া গেল।

মাসখানেক বেশ নির্বিঘ্নে কাটিল। তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনাও ঘটিল না। একটি খবর কেবল মণিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কিছুক্ষণের জন্য তাহাকে বিচলিত করিয়া দিল। খবরটি সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছিল। খবরটি এই—

"টোপিরাম নামক জনৈক মাড়োয়ারী দুইটি স্ত্রীলোকসহ প্রথম শ্রেণীর কামরায় দিল্লী এক্‌স্‌প্রেসে কলিকাতা যাইতেছিলেন। তাঁহাদের তিনজনেরই রক্তাক্ত মৃতদেহ গাড়ির কামরায় পাওয়া গিয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় টোপিরামের যে ভৃত্যটি ছিল সে বলিতেছে যে, তাহার মালিকের সহিত প্রচুর অলঙ্কার ও বেশ কিছু নগদ টাকাও ছিল। অলঙ্কার এবং টাকাগুলিও অপহৃত হইয়াছে। পুলিশ ভৃত্যটিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে, জোর তদন্ত চলিতেছে..."

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটিল মাসখানেক পরে। স্কুল ছুটি হইয়াছিল, বরেন সাতদিনের জন্য কলিকাতা বেড়াইতে গিয়াছিল, কিন্তু তিন সপ্তাহ কাটিয়া যাইবার পরও যখন সে ফিরিল না তখন সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। উদ্বেগের মাত্রা আরও বাড়িল যখন দারোগাসাহেব আসিয়া হরেনবাবুকে একটি পোস্টকার্ড দেখাইয়া জানিতে চাহিলেন যে, বরেনের নামে এই পত্রটি যে ব্যক্তি লিখিয়াছিল তাহার ঠিকানা তিনি বলিতে পারেন কিনা। নিরীহ হরেনবাবু কিছুই বলিতে পারিলেন না। পত্রে কলিকাতার একটি ঠিকানা ছিল, পুলিশ সেইখানেই অনুসন্ধান করিতে লাগিল। জানা গেল একটি কালোবাজারী ধনীর বাড়িতে সম্প্রতি যে ভয়ঙ্কর সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে তাহারই তদন্ত করিতে গিয়া পুলিশ উক্ত পোস্টকার্ডটি তাহাদের বাড়িতে কুড়াইয়া পাইয়াছে। তাহাদের ঘোর সন্দেহ, বরেন উক্ত দলে ছিল।

বরেন আর ফিরিল না। মণিকা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া মনে মনে ছটফট করিতে লাগিল। তাহার বিশ্বাস ছিল শিবাজী নিশ্চয়ই কিছু একটা বন্দোবস্ত করিবে, তাহাকে এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলিয়া রাখিবে না। হইলও তাহাই। তাহার নামে একদিন একটি পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। পত্রে লেখা ছিল—"তোমার পূর্ববঙ্গের একজন আত্মীয় তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন। আগামীকল্য বৈকালের ট্রেনে তিনি পৌঁছিবেন। তুমি তাঁহাকে লইবার জন্য স্টেশনে আসিও। কারণ তিনি তোমাদের শহরের পথঘাট চেনেন না, তোমাদের বাড়ি চিনিয়া বাহির করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইবে। তাছাড়া তিনি বৃদ্ধ, চোখে ভাল দেখিতে পান না। তুমি নিশ্চয় আসিবে।" নীচে নাম লেখা ছিল বংশীবদন দাস।

স্টেশনে শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। অঙ্গে নিখুঁত সাহেবী পরিচ্ছদ, মুখে পাইপ। স্টেশনের বাহিরে একটা 'জিপ্' দাঁড়াইয়াছিল।

"চল—"

উভয়ে জিপে চড়িয়া বসিল।

কিছুদূর গিয়া শিবাজী বলিল, "বরেনকে উদ্ধার করতে হবে, পুলিশ তার পিছন নিয়েছে।"

"তিনি কোথায় এখন—"

"খবর পেলাম কোলকাতার দিকে গেছে।"

"আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

"কোলকাতায়। কোলকাতায় তোমাকে নাবিয়ে দিয়ে আমাকে খুব জরুরি দরকারে দিল্লী যেতে হবে।"

"মোটরেই যাবেন?"

"প্লেন পেলে প্লেনেই যাব—"

"কোলকাতায় আমি কি কবব?"

"বরেনকে খুঁজবে।"

"কোথায় খুঁজব আমি?"

"রাস্তায় রাস্তায়—"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া শিবাজী বলিল, "গোপীনাথও আসবে—"

"আবার তাকে আমার কাছে আনছেন কেন—"

"অনেকক্ষণ উনুনে চড়ানো আছে, সিদ্ধ হল কিনা দেখা যাক—"

"উনুন মানে?"

"ভার্গব।"

মণিকা কোন উত্তর দিল না।

ঝড়ের বেগে 'জিপ' ছুটিয়া চলিয়াছে। আকাশে নক্ষত্রমালা জ্বলিতেছে। পথপার্শ্বের তরুশ্রেণী দ্রুতবেগে অন্তর্ধান করিতেছে।

সহসা শিবাজী প্রশ্ন করিল—"অশ্বিনী দত্তের 'অভিযোগ' পড়েছ?"

"না।"

"নাম শুনেছ?"

"না।"

"বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ?"

"না।"

"তোমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলা উচিত।"

মণিকা অপ্রতিভমুখে বসিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। হাওয়ায় তাহার চুলগুলো উড়িয়া উড়িয়া চোখের উপর পড়িতেছিল, তাহাই সে কেবল হাত দিয়া সরাইতে লাগিল।

"কোলকাতায় পৌঁছেই বই দু'খানা কিনে পড়ে ফেলবে। পড়তে জানো তো?"

"জানি। কোলকাতায় কোথায় থাকব?"

"গ্র্যান্ড হোটেলে। ওইখানেই আমরা উঠি। বরেন এ কথা জানে। গোপীনাথেরও ওইখানে আসবার কথা আছে।"

"গোপীনাথের সঙ্গে ভার্গবও আসবেন নাকি?"

"ভার্গব পরে আসবে। আমি তাড়াতাড়ি এখন পৌঁছতে পারলে বাঁচি—"

জিপের গতি দ্রুততর হইল।

বরেন কলিকাতা আসিয়াছিলেন বিশেষ একটি উদ্দেশ্য লইয়া। যে মুহূর্তে সে বুঝিতে পারিল যে তাহার পকেট হইতে একটি ঠিকানা-লেখা চিঠি পড়িয়া গিয়াছে, সেই মুহূর্তেই তাহার আশঙ্কা হইল যে যিনি তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন পুলিশ নিশ্চয়ই সেখানে গিয়া হানা দিবে এবং ভদ্রলোককে বিব্রত করিয়া তুলিবে। এই ভদ্রলোকটিকে সাবধান করিবার উদ্দেশ্যেই সে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছিল। কলিকাতায় পৌঁছিয়া সোজাসুজি সে ভদ্রলোকের বাসায় যায় নাই, ভয় ছিল গেলে হয়তো একেবারে পুলিশের কবলে পড়িয়া যাইবে। দূর হইতে খবর লইয়া তাহার পর তাহাদের সহিত দেখা করিবে এই মতলবে দূর হইতে সে বাড়িটির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছিল। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় বাড়িটির কাছাকাছি গলিতে গিয়া সে নজর রাখিত বাড়িটি হইতে পরিচিত কেহ বাহির হয় কিনা। প্রায়ই দেখিত দরজা-জানালা বন্ধ, সম্মুখের দ্বারে প্রকাণ্ড একটা তালা ঝুলিতেছে। কলিকাতায় আসিয়া অর্থাভাবের জন্য প্রথমে সে একটা সস্তা হোটেলে উঠিয়াছিল। গ্র্যান্ড হোটেলে উঠিতে পারে নাই। দৈবক্রমে বিশাখাও ঠিক সেই হোটেলেই আসিয়া উঠিয়াছিল তাহার পিতার খোঁজে। বরেন ত্রিতলে থাকিত, বিশাখা দ্বিতলে। বরেন হোটেলে বেশিক্ষণ থাকিত না, সুতরাং বিশাখাকে সে একদিনও দেখে নাই। বিশাখাও হোটেলে বেশিদিন থাকিতে পায় নাই। একটা খবর কিন্তু বরেনের কানে আসিয়াছিল। সে শুনিয়াছিল একটি রেফিউজি মেয়ে নাকি এখানে আসিয়া তাহার পিতাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে এবং বিধুভূষণ নামে হোটেলওলার এক সহৃদয় বন্ধু নাকি মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়া সর্বপ্রকার সাহায্য করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। যে ব্যক্তি খবরটি দিয়াছিলেন তিনি একদিন বিধুভূষণকে দূর হইতে দেখাইয়াও দিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে বরেন তাঁহাকে রাস্তাতেও দেখিতে পাইল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিধুভূষণের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল সে। "রেফিউজি মেয়ে" কথাটি শুনিয়াই সে কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিল। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ওই ভদ্রলোক একটি যুবতী রেফিউজি মেয়েকে আশ্রয় দিয়াছেন? আসলে লোকটি কেমন লোক? সহৃদয়তার অন্তরালে অন্য কোনও মতলব নাই তো! কিছুক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিলেই বোঝা যাইবে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বরেন দূর হইতে বিধুভূষণকে অনুসরণ করিতে লাগিল। আজকাল রেফিউজি মেয়েদের লইয়া অনেক মহাপুরুষ অনেক কাণ্ড করিতেছেন! তাহাদের শাস্তিবিধান করাই বরেনদের দলের একটা প্রধান কাজ। সুতরাং কর্তব্যবোধেই সে বিধুভূষণের পিছু লইল। কিছুক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সে দেখিল বিধুভূষণ প্রকাণ্ড একটি বাড়িতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বাড়ির গেটে পিত্তলফলকে বি. মল্লিক এই নাম খোদিত রহিয়াছে। বরেন ঠিকই অনুমান করিল, বাড়িটি ভদ্রলোকের নিজেরই। দেখিল পাশে একটি খালি গারাজও রহিয়াছে। বাড়িটির আনাচেকানাচে খানিকক্ষণ ঘোরাফেরা করিবার পর বরেনের মস্তিষ্কে একটি নূতন বুদ্ধি সঞ্চারিত হইল। সে ভাবিল, একটা সস্তা হোটেলে বহু লোকের দৃষ্টিপথবর্তী হইয়া থাকা নিরাপদ নয়। গ্র্যান্ড হোটেলে থাকিবার পয়সা নাই। বিধুভূষণের গারাজটির পিছনদিকে বেশ

বড় একটা ফাঁক আছে। নাতি-উচ্চ দেওয়ালও একটি রহিয়াছে ঠিক নীচেই। অনায়াসেই গারাজের ভিতর প্রবেশ করা সম্ভব। যত্রতত্র ভোজন করিয়া গারাজেই রাত্রিবাস করিলে মন্দ কি! লোকের দৃষ্টিও এড়ানো যাইবে, পয়সাও বাঁচিবে। তাছাড়া বিধুভূষণ ব্যক্তিটিকেও পর্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা হইবে। বরেন সেইদিনই হোটেল ত্যাগ করিল। প্রথমে গেল তাহার সেই পরিচিত লোকটির উদ্দেশ্যে যাহাকে সে সাবধান করিতে আসিয়াছিল। গিয়া দেখিল সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি লোক তালা খুলিয়া ঘরে ঢুকিতেছে। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া বরেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। তাহার মনে হইল ভদ্রলোক সম্ভবতঃ বাসা বদলাইয়াছেন, নূতন ভাড়াটে আসিয়াছে। সঠিক সংবাদটি জানিবার জন্য সে আগাইয়া গেল এবং তালা উন্মোচনকারী ভদ্রলোককে প্রশ্ন করিল, "অবনীবাবু কোথা বলতে পারেন?"

"তিনি বাসা বদলেছেন।"

"আপনারা নতুন ভাড়াটে এসেছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ—"

"তাঁর ঠিকানাটা জানেন?"

"ঠিকানা ঠিক জানি না। তবে আজ রাত্রে তাঁর আসবার কথা আছে। আপনার নাম ঠিকানা যদি দিয়ে যান তাঁকে বলব।"

"আচ্ছা, আমি রাত্রে আসব একবার।"

"আপনার নামটি কি?"

"মহীতোষ।"

অকম্পিতকণ্ঠে মিথ্যা কথাটি বলিয়া বরেন চলিয়া আসিল। কাহারও নিকট নিজের প্রকৃত নাম ব্যক্ত করা তাহাদের দলের নিয়ম নয়। হোটেলে সে নিজেকে রামরূপ কানুনগো নামে পরিচিত করিয়াছিল।

যিনি বাড়ির তালা খুলিয়াছিলেন তিনি অপসৃয়মাণ বরেনের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শ্যেনদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তিনি অন্য কেহ নন—স্বয়ং মজিদ। অবনীবাবুকে কয়েকদিন পূর্বে গ্রেপ্তার করিয়া তিনি সদলবলে তাঁহার বাসাটি দখল করিয়াছিলেন এবং বরেন নামক ফেরারি আসামীর জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাঁহাকে সাবধান করিতে বরেন আসিবেই। ঘরের ভিতর হইতে একটি ছোকরা বাহির হইয়া আসিল।

"মজিদ-দা, লোকটা কে—"

"ঠিক বুঝতে পারলাম না। যাই হোক, তুমি প্লেন ড্রেসে ওকে 'ফলো' কর।"

পরদিনই বরেন বিধুর গারাজে ধরা পড়িল। সে যে মহীতোষ নয়, তাহাও প্রমাণিত হইতে বিলম্ব হইল না। বাল্যকালে ফ্যাশানের বশবর্তী হইয়া নিজের দক্ষিণ বাহুতে সে নিজের নামটি উল্‌কি দিয়া লিখাইয়াছিল। তাহাই তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল।

বিধুভূষণ তাহাকে উদ্ধার করিলেন এবং রহস্যময়ভাবে অন্তর্ধানও করিলেন। বিশাখা নাম্নী রেফিউজি মেয়েটির ভার তাহার উপরই পড়িয়া গেল। তাহার পরিচর্যার জন্য বিধুভূষণ তাহাকে যথেষ্ট অর্থও দিয়া গেলেন। অন্য কোন অবস্থায় বরেনও হয়তো সরিয়া পড়িত। কিন্তু ব্যাপারটা রেফিউজি সংশ্লিষ্ট হওয়াতে সে গেল না; বরং প্রকৃত ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহাও সে অনুভব করিল, সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে। বিশাখার সহিত ফোনে যে

আলাপ সে করিতে লাগিল তাহা অতি সন্তর্পণে। মণিকার জন্য তাহার মনের নেপথ্যে একটা দুশ্চিন্তা ছিল বটে কিন্তু খুব বেশি উদ্বিগ্ন সে হয় নাই। তাহার বিশ্বাস ছিল শিবাজী যখন খবর পাইয়াছে তখন মণিকার একটা সুব্যবস্থা হইবে। গ্র্যান্ড হোটেলেই তাহাদের আড্ডা। শিবাজী যদি মণিকাকে কলিকাতায় পাঠানোই ঠিক করিয়া থাকে তাহা হইলে মণিকা নিশ্চয়ই আসিয়া গ্র্যান্ড হোটেলেই উঠিবে। তাই বরেন একটু ফাঁক পাইলেই রাস্তায় বাহির হইয়া গ্র্যান্ড হোটেলে ফোন করিত মিস্ মণিকা নামে কেহ হোটেলে আসিয়াছে কিনা। হঠাৎ একদিন নজরে পড়িল দূরে একটা লোক তাহাকে অনুসরণ করিতেছে। তখনই ঠিক করিয়া ফেলিল বিধুভূষণের বাড়িতে বেশিদিন সে থাকিবে না। অনুসরণকারী লোকটা যে পুলিশের লোক তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পক্ষে যে-কোনও মুহূর্তে সরিয়া পড়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু রেফিউজি বিশাখাকে এমন অসহায়ভাবে ফেলিয়া যাইতে তাহার মন সরিতেছিল না। বিধুভূষণের চালচলন সন্দেহজনক, ভদ্রলোকের কি যে মতলব তাহাও ঠিক সে বুঝিতে পারিতেছিল না। কেন যে তিনি মেয়েটিকে আনিয়া এমনভাবে আটকাইয়া রাখিয়াছেন কে জানে। যদিও সে অনুভব করিতেছিল এখানে থাকিলে অচিরেই তাহাকে পুলিশের কবলে পড়িতে হইবে, তবু সে ভাবিতেছিল মেয়েটিকে এমনভাবে ফেলিয়া যাওয়া কি উচিত? ইহাদের রক্ষা করাই তো তাহাদের সমিতির উদ্দেশ্য।

কি করিবে চিন্তা করিতেছিল এমন সময় হঠাৎ সিনেমা দেখার বুদ্ধিটা তাহার মাথায় খেলিয়া গেল। বিশাখাও আপত্তি করিল না। সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল সিনেমা শেষ হইয়া গেলে সে বিশাখাকে বিধুভূষণের চাতুরীপূর্ণ মিথ্যাচরণের কথা খুলিয়া বলিবে। বিধুভূষণের নিশ্চয়ই একটা নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে, তাহা না হইলে তিনি তাঁহার দিল্লী গমন গোপন করিতেছেন কেন। সব শুনিবার পর বিশাখা যদি বিধুভূষণের কাছেই ফিরিয়া যাইতে চায় তাহা হইলে তাহাকে সে তাঁহার বাসায় রাখিয়া আসিবে। যদি ফিরিয়া না যাইতে চায় তাহা হইলে সে তাহাকে দিল্লীতে তাহার নিজের ঠিকানাতেও পৌঁছাইয়া দিতে পারে। কিম্বা দিল্লী না গিয়া সে যদি তাহাদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহাকে নিরুদ্দিষ্ট পিতার সন্ধান করিয়া দিতে বলে তাহাতেও তাহার আপত্তি নাই। শিবাজীরও হইবে না।

সে কিন্তু নিশ্চিন্তমনে সিনেমা দেখিতেছিল না। যে লোকটি তাহাকে অনুসরণ করিতেছিল তাহার কথাই বারবার মনে হইতেছিল। এখানেও লোকটি আসিয়াছে কি? সে উঠিয়া বাহিরে গেল, দেখিল আসিয়াছে। মনে হইল এখনই যদি পালাইতে হয় কোথায় যাইবে সে? গ্র্যান্ড হোটেলে আর একবার খবর লওয়া যাক। ফোনে মণিকাকে পাইয়া সে উল্লসিত হইয়া উঠিল। সে উল্লাস বাড়িল যখন সিনেমা শেষ হইবার পর সে দেখিল যে শুধু মণিকা নয়, গোপীনাথ, শিবাজী এবং ভার্গব তাহার অপেক্ষায় বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে।

মণিকার দিকেই সে আগাইয়া গেল।

"আমার সাদা কোট এনেছ?"

"এই যে—"

মণিকা একটি ছোট কার্ড-বোর্ডের বাক্স তাহার হাতে দিল। তাহাতে ছিল পরচুলা, সাদা গোঁফ, সাদা দাড়ি এবং সাদা চুল। এই বাক্সটিরই নাম সাদা কোট।

"খোকা কই?"

"এই যে—"

এদিক ওদিক চাহিয়া মণিকা আঁচলের তলা হইতে চামড়ার কেসটি বাহির করিয়া দিল। রিভলভার। শিবাজী একটা মোটরের স্টিয়ারিং ধরিয়া বসিয়াছিল। সে নামিয়া আসিয়া বরেনকে একটু দূরে লইয়া গিয়া নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"ও মেয়েটি কে—"

"রেফিউজি। বিপদে পড়েছে।"

"আমাদের কথা বলেছ ওকে?"

"কিছুই বলিনি। তবে বলতে চাই।"

"তা হলে সোজা আমাদের ছ'নম্বর আড্ডায় চলে যেও। আমি একটু পরেই আসছি।"

"বেশ।"

শিবাজী রাস্তা পার হইয়া অপরদিকের ফুটপাতে যাইতে না যাইতেই কিন্তু একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। প্লেন ড্রেসে যে পুলিশ অফিসারটি বরেনকে লক্ষ্য করিতেছিলেন তাঁহার মনে হইল অবিলম্বে গ্রেপ্তার না করিলে পক্ষী উড়িয়া যাইবে। তিনি আগাইয়া আসিয়া বরেনকে বলিলেন, "দাঁড়ান আপনি একটু।"

"কেন?"

"আপনাকে আমি অ্যারেস্ট করলাম।"

"অ্যারেস্ট? কেন?—"

ভার্গব মোটরের ব্যাকসিটে ঈষৎ ঝুঁকিয়া বসিয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন একটা গুলিখোর ঝিমাইতেছে। উপরোক্ত কথাগুলো কানে যাইতেই সে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল এবং ধীরে ধীরে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকাইল।

"কেন তা থানায় গিয়ে জানতে পারবেন।"

"আপনি কি পুলিশ অফিসার?"

"হ্যাঁ। প্রমাণ চান?"

প্রমাণ দেখাইবার অবসর কিন্তু তিনি পাইলেন না। ভার্গবের হস্তে রিভলভার গর্জন করিয়া উঠিল। বিদীর্ণমস্তকে তৎক্ষণাৎ তিনি ভূলুণ্ঠিত হইলেন।

নিমেষের মধ্যে মণিকা, গোপীনাথ ও বরেন মোটরে চড়িয়া বসিল। বিশাখা চিৎকার করিয়া উঠিল।

"চিৎকার করবেন না, চলে আসুন, চলে আসুন, দেরি করবেন না। ছি, ছি, কি করছেন। আপনার কোন ভয় নেই—"

প্রায় টানিয়া বরেন তাহাকে মোটরে তুলিয়া লইল। শিবাজী রিভলভারের শব্দ শুনিয়া অপরদিকের ফুটপাথে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। দ্রুতবেগে বরেনের মোটরটা যখন নির্বিঘ্নে বাহির হইয়া গেল, তখন হঠাৎ সে গোঁফটা টানিয়া খুলিয়া ফেলিল। একটু শিস দিল। তাহাব পর ধীরেসুস্থে আগাইয়া গিয়া দুইটি ফোন করিল। একটা অ্যাম্বুলেন্সের জন্য আর একটি লালবাজারে, নিজের নাম বলিল সনৎ সেন।

গোপীনাথ ড্রাইভ করিতেছিল। গাড়ি খুব দ্রুতবেগে চলিতেছিল না। গাড়ির বেগ অস্বাভাবিকরকম দ্রুত করিয়া দিলে যে পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে এ জ্ঞান তাহার ছিল।

বরেন বিশাখার দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি ভয় পাবেন না। আমরা সত্যই আপনার হিতৈষী।"

"কেমন করে জানব সেটা। আপনাদের ব্যবহার তো মোটেই ভদ্র মনে হচ্ছে না। এমনভাবে আমাকে নিয়ে এলেন কেন?"

"স্বচক্ষেই তো দেখলেন গত্যন্তর ছিল না। না পালালে পুলিসের হাতে পড়তে হত।"

"আমাকে যেখানে থেকে এনেছিলেন সেখানে রেখে আসুন।"

"বিধুবাবুর বাড়িতে?"

"হ্যাঁ—"

"বেশ।"

বরেন কার্ড-বোর্ডের বাক্স হইতে সাদা গোঁফ, দাড়ি, ভ্রূ প্রভৃতি বাহির করিয়া নির্বিকারভাবে পরিয়া ফেলিল। বিশাখা সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়াছিল। তাহার মনে পড়িল অনেকদিন পূর্বে সে কোথায় যেন ওমর খৈয়ামের একটা ছবি দেখিয়াছিল। রূপান্তরিত বরেনকে অনেকটা সেইরকম দেখাইতে লাগিল।

"মণিকা, তোমার ব্যাগে বোরখা আছে?"

"আছে—"

"এঁকে দাও। গোপী, গাড়িটা একটু নিরিবিলি জায়গায় দাঁড় করাও। আপনি বোরখাটা পরে নিন, আমি একটি ট্যাক্সি করে আপনাকে বিধুবাবুর বাসার রেখে আসছি।"

গাড়ি মাঠের ধারে থামিল।

"বোরখা পরব কেন?"

"নিরাপদ বলে। পুলিশ হয়তো আপনাকেও দেখেছে। পট করে যদি ধরে ফেলে বিপদে পড়ে যাবেন।"

কথাটা সমীচীন মনে হইল। আপত্তি না করিয়া বোরখাটা পরিয়া ফেলিল সে।

"গোপী, এইবার কোন একটা ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডের কাছাকাছি আমাদের নাবিয়ে দাও। আমি একে পৌঁছে দিয়ে এখুনি ফিরছি।"

কিছুদূর গিয়া গাড়ি আবার থামিল।

বরেন বিশাখাকে লইয়া অদূরে অবস্থিত ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছুদূর গিয়া বরেন বলিল, "আমি যতক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ছিলাম অর্থাৎ যতক্ষণ বিধুবাবুর আস্তানা আঁকড়ে থাকা ছাড়া অন্য পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবার সাহস হয়নি আমার। বিবেকেও বাধছিল, তিনি নিজে যেরকম লোকই হোন, আমাকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন এ কথা আমাকে মানতেই হবে। এখন কিন্তু মনে হচ্ছে তাঁর সম্বন্ধে যা আমার মনে হয় তা আপনাকে অন্তত অকপটে জানানো উচিত।"

"বলুন।"

"আমার মনে হয় আপনাকে কেন্দ্র করে বিধুবাবু কোনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। তাঁর চালচলন কেমন যেন একটু গোলমেলেগোছের মনে হয়েছে আমার।"

"গোলমেলে মানে?"

"উনি জামশেদপুর যাননি, গেছেন দিল্লী। অথচ সে কথাটা আপনার কাছে প্রকাশ করতে মানা করে গেছেন—"

"দিল্লী গেছেন কেন?"

"তা জানি না। কিন্তু আপনাকে লুকিয়ে দিল্লী যাওয়া, আপনাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখবার জন্য আমাকে আদেশ দেওয়া, আপনার স্যুটকেসটাকে রহস্যজনকভাবে সরিয়ে ফেলা, নির্বিচারে আপনার ফরমাশ অনুযায়ী আপনাকে জিনিসপত্র কিনে দেওয়ার জন্য আমাকে টাকা দিয়ে যাওয়া,—এই সব ঘটনা থেকে মনে হয় ভদ্রলোকের ভিতরে ভিতরে কি যেন একটা দুরভিসন্ধি আছে। ভাল কথা, তিনি যে টাকা আমাকে দিয়েছিলেন তার সবটা খরচ হয়নি, কিছু বেঁচেছে। এটা আপনিই রেখে দিন—"

বরেন পকেট হইতে একটা লম্বা খাম বাহির করিয়া বিশাখার হাতে দিল।

"ওর ভিতর হিসেবও আছে।"

"আচ্ছা, আমাকে কেন্দ্র করে ষড়যন্ত্র করছেন উনি, ঠিক এ কথা কেন মনে হচ্ছে আপনার?"

"হয়তো আমার অনুমান ভুল। যা মনে হয়েছে তাই বললাম। হয়তো উনি আপনার ভালোর জন্যেই এ সব করছেন, তাও হতে পারে। তাঁর এই লুকোচুরি ব্যাপারটা ভাল লাগেনি আমার, তাই বললুম আপনাকে।"

নীরবে কিছুক্ষণ পথ অতিবাহন করিয়া অবশেষে বরেনই পুনরায় কথা বলিল।

"ছাড়াছাড়ি হবার আগে একটা কথা বলতে চাই আপনাকে, আমাদের সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা যাতে আপনার না হয়। সাধারণতঃ খুনী বা ডাকাত বলতে যা বোঝায় আমরা তা নই। আমরা প্রত্যেকেই শিক্ষিত, প্রত্যেকেই আদর্শবাদী। যে ভণ্ডামী, যে জুয়াচুরি আজ দেশকে অধঃপাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, আইন ও শৃঙ্খলার নামে যে বেপরোয়া জবরদস্তি ন্যায় ও ধর্মের মুখোশ পরে দেশে রাজত্ব করছে আজ, আমরা জনকয়েক মিলে তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি। হয়তো এর জন্যে আমাদের কারাবাস, নির্যাতন এমন কি ফাঁসি পর্যন্ত হবে, তবু আমরা থামব না। আমরা নতুন কিছু করছি না। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শ। সেই আদর্শ-ই অনুসরণ করছি আমরা, বাক্যে নয়, কাজে। অনেক নিপীড়িত রেফিউজিদের আমরা সাহায্য করেছি। অনেক কালোবাজারীকে আমরা শায়েস্তা করেছি, অনেক অসাধু, চরিত্রহীন গভর্নমেন্ট অফিসারকে আমরা শাস্তি দিয়েছি। আপনি যদি চান আপনাকেও যথাসাধ্য সাহায্য করব। সমস্ত প্রদেশেই আমাদের লোক আছে। হিন্দু, মুসলমান, বাঙালী, বেহারী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, সিন্ধী, গুজরাটী সবরকম লোকই আছে আমাদের দলে। এই ট্যাক্সি—"

একটা ট্যাক্সি আগাইয়া আসিল।

ট্যাক্সিওয়ালাকে ঠিকানাটা বলিয়া দিয়া তাহারা দুইজনে পাশাপাশি নীরবে বসিয়া রহিল। ট্যাক্সি যখন বিধুবাবুর বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া পড়িল তখন বরেন কথা কহিল।

"ওই আপনাদের বাড়ি দেখা যাচ্ছে। আমি আর ওখান পর্যন্ত যাব না। এটুকু আশা করি আপনি হেঁটে যেতে পারবেন। বিধুবাবু এলে সব কথা খুলে বলবেন তাঁকে। ওহে, এইখানেই থাম একটু—"

ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া পড়িল। বিশাখার কিন্তু নামিবার লক্ষণ দেখা গেল না।

"ধরুন, যদি আমি আপনাদের সাহায্য চাই, কি করে আবার নাগাল পাব আপনার?"

"তা বলা শক্ত। আমাদের গতিবিধি বড় অনিশ্চিত। আমাদের সাহায্য যদি চান এখনি তা হলে চলুন না। আমাদের সাহচর্য যদি ভাল না লাগে আবার ফিরে আসবেন।"

"বেশ, চলুন—"

"ড্রাইভার, তা হলে সোজা তুমি হাওড়া চল। ময়দানে আমাদের নামিয়ে দিও।"

বিশাখা এবং বরেন পৌঁছিবার পূর্বেই শিবাজী তাহার ছয় নম্বর আড্ডায় পৌঁছিয়া গিয়াছিল। একটু পরে ভার্গব, গোপীনাথ এবং মণিকাও আসিয়া হাজির হইল। শিবাজী প্রশ্ন করিল, "ভার্গব, কি হল সে ব্যাপারে?"

"প্লেনে তিনটে সিট বুক করেছি। ভোরে প্লেন ছাড়বে। আমি আটটা নাগাদ পৌঁছে যাব।"

"লোকটাকে চেন তুমি—"

"ফটো দেখেছি।"

"ফটো কোথায় পেলে?"

"ননকু দিল্লী থেকে পাঠিয়েছিল। ননকুও তার সঙ্গে থাকবে টেলিগ্রাম করেছে।"

"বেশ। কোলকাতার ব্যবস্থাটা করে আমিও সোজা পাটনায় আমাদের তিন নম্বর আড্ডায় হাজির হব। মোটরে যাব।"

ভার্গব হাত ঘড়িটা দেখিয়া বলিল, "আমি চললাম তা হলে। গোপীনাথ আর মণিকাকেও আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। একজন আসল স্ত্রীলোক থাকলে সুবিধা হবে।"

"সেই প্ল্যানটা কাজে লাগাবে ঠিক করেছ বুঝি?"

শিবাজীর চোখের দৃষ্টি হাসিয়া উঠিল।

"হ্যাঁ—"

"বেশ, নিয়ে যাও ওদের।"

ভার্গব, গোপীনাথ ও মণিকা চলিয়া যাইবার একটু পরেই বিশাখাকে লইয়া বরেন প্রবেশ করিল।

শিবাজী প্রশ্ন করিল, "ইনি আবার কে?"

"বিশাখা। পাঞ্জাবের রেফিউজি একজন। এখানে এসে বিপদে পড়েছেন। আমি একদিন একজন বিধুভূষণ মল্লিকের প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়েছিলাম। সেই বিধুবাবু আশ্রয় দিয়েছিলেন এঁকে। কিন্তু তাঁর মতলব ভাল মনে হচ্ছে না। তাই এঁকে নিয়ে এসেছি।"

"ব্যাপারটা কি শুনি। ভার্গব পাঞ্জাবের এক রেফিউজি বাঙালী পরিবারের সম্বন্ধে খোঁজ নেবার জন্যে লাগিয়েছে একজনকে। আপনার ব্যাপারটা কি?"

বিশাখা সংক্ষেপে নিজের কাহিনী বিবৃত করিল। সমস্ত শুনিয়া শিবাজী বলিল, "আপনাকেই বোধ হয় খুঁজছি আমরা। আপনার বাবার নাম নবেন্দু বিশ্বাস?"

"হ্যাঁ।"

শিবাজী পকেট হইতে একটি নোটবুক বাহির করিয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল।

"দিল্লীর মোহিত মৈত্রকে চেনেন আপনি?"

"না। দিল্লীর বিশেষ কাউকেই চিনি না।"

"ও। আচ্ছা, থাকুন আপনি। একটা কথা কিন্তু শুনে রাখুন। আমাদের সঙ্গে যদি থাকেন প্রথমত ভদ্রভাবে থাকতে হবে, দ্বিতীয়ত আমরা আপনার ভালর জন্য যা বলব নির্বিচারে তা করতে হবে। আমরা অনেক সময় বে-আইনী কাজ করি, বাধ্য হয়েই করতে হয়। আশা করি আপনি পুলিশে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না। আপনার ব্যবহারে যদি বিশ্বাসঘাতকতার আভাসমাত্র পাই তা হলে আপনাকে কেটে কুচিয়ে কাবাব করে খেয়ে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না আমাদের। আশা করি এ অপ্রীতিকর কাজ করতে আপনি আমাদের বাধ্য করবেন না। আপনার উপর সত্যিই যদি কোন অন্যায় হয়ে থাকে আর আপনি আমাদের উপর সত্যিই যদি বিশ্বাস করেন, আপনার জন্যে প্রাণপাত করব আমরা। আমি এখন চললুম। বরেনের কাছে থাকুন আপনি। আপনার কোনও কষ্ট হবে না। দরকার হলে আপনাকে স্থানান্তরিত করবার ব্যবস্থা করব আমরা। আচ্ছা চলি নমস্কার—"

শিবাজী বাহির হইয়া গেল।

বিশাখা বলিল, "রাত্রে খাবার, শোবার কি হবে?"

"সব হবে। কাছেই পাঞ্জাবী হোটেল আছে, সেখান থেকে খাবার আনব। কি কি খাবেন বলুন। আর দুটো ঘর আছে, যেটা খুশি আপনি বেছে নিন। খেয়েদেয়ে খিল দিয়ে শুয়ে পড়ুন—"

"আর আপনি?"

"আমি ঘুমোব না, পাহারা দেব। কখন কি হয় বলা যায় না। হয়তো আজ রাত্রেই অন্যত্র সরে পড়তে হবে। এক ডাকে আপনার ঘুম ভাঙবে তো?"

"হ্যাঁ। আমার ঘুম খুব পাতলা। আমার কিন্তু একটু একটু ভয় করছে বরেনবাবু, টু বি ফ্র্যাংক—"

"কিচ্ছু ভয় নেই।"

বরেনের হাস্যোজ্জ্বল চোখের দিকে চাহিয়া বিশাখা সত্যই একটু সাহস পাইল।

গমনাগমন পর্ব

কোনও যক্ষ্মারোগীর যদি ফোড়া হয় তাহা হইলে কয়েকদিনের জন্য মূল রোগ অপেক্ষা ফোড়াটা যেমন অধিক যন্ত্রণাদায়ক হইয়া ওঠে এবং সম্পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করে, ট্রেনের কোণে উপবিষ্ট ছোকরাটির সান্নিধ্য ভূপেশ মজুমদারের নিকট তেমনি যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিল। তাঁহার গুরুতর বিপদের কথা তিনি খানিকক্ষণের জন্য বিস্মৃত হইলেন। সিনেমা-মাসিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়াই ছোকরা বসিয়াছিল না, মাঝে মাঝে আড়চোখে তাঁহার দিকে চাহিতেছিল। ছোকরা যে স্পাই, ভূপেশের এ সন্দেহ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। সত্য নির্ণয় করিবার উপায় নাই, অথচ নির্ণয় করিতে না পারিলে...মুশকিল! বহুকাল পূর্বে এক জ্যোতিষীর পরামর্শে ভূপেশ মজুমদার একটি নীলা সমন্বিত আংটি ধাবণ করিয়াছিলেন। নিরুপায় হইয়া সেইটিই তিনি ঘর্মাক্ত কপালে ঘষিতে লাগিলেন।

ফল হইল।

একটা স্টেশনে ট্রেনের সব যাত্রীগুলি নামিয়া গেল। নামিল না কেবল সেই ছোকরা। ভূপেশ আগাইয়া গিয়া তাহার সামনা-সামনি বসিলেন এবং মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কতদূর যাবেন?"

"আমি? আমি দিল্লী যাব। আপনি?"

"আমিও। ভালই হল, সঙ্গী পাওয়া গেল একজন।"

ছোকরা কিন্তু তেমন আমল দিল না। ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একটি সিগারেট ধরাইল সে। ব্যাপারটা যদিও ভদ্রতা-বিরুদ্ধ, তবু ভূপেশ মজুমদার আরও কয়েকটি প্রশ্ন করা সমীচীন মনে করিলেন। জেরার মুখে অপ্রত্যাশিতভাবে অনেক সত্য যে আত্মপ্রকাশ করে ইহা তাঁহার অবিদিত ছিল না।

"দিল্লীতে কোথায় উঠবেন আপনি?"

"এক বন্ধুর বাড়িতে। আপনি?"

"আমি হোটেলে উঠব। দিল্লীতে কি জন্যে যাওয়া হচ্ছে—"

"বিশেষ একটা দরকারে যেতে হচ্ছে। আপনি যাচ্ছেন কেন?"

ভূপেশ মজুমদার দেখিলেন ছোকরা প্রতিবার পাল্টা প্রশ্ন করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু জানিয়া লইতেছে, অথচ তিনি বিশেষ কিছুই জানিতে পারিতেছেন না।

"আমিও যাচ্ছি বিশেষ দরকারে—"

সহসা ভূপেশের মনে হইল লুকোচুরি করিয়া লাভ কি। ছোকরাকে গল্প-ছলে সব কথা অকপটে খুলিয়া বলিলে কোন ক্ষতি নাই। ও সত্যই যদি স্পাই হয় উহার কিছু অজ্ঞাত নাই। আর স্পাই যদি না হয় তাহা হইলেও জানাইতে কোন আপত্তি নাই। তিনি এমন কিছুই করেন নাই যাহা লজ্জাকর। বন্ধুর অনুরোধে একটা লোককে ছাড়িয়া দিয়াছেন—এই তো? ইহাতে

লজ্জার কিছুই নাই, বরং বাহাদুরি দেখাইবার সুযোগ আছে। হয়তো তিনি ছোকরার মনে সহানুভূতি (কিম্বা শ্রদ্ধাও, কিছুই বলা যায় না) উদ্রিক্ত করিতে পারেন।

সুতরাং তিনি হাসিয়া বলিলেন, "দরকার ছাড়া আজকাল কে আর দিল্লী যায় বলুন এই গরমে। সমস্ত ব্যাপারের কলকাঠি তো ওখানেই। আপনিও নিশ্চয় আপিসের দরকারে যাচ্ছেন—"

"না আমি যাচ্ছি একটি মেয়ের খোঁজে।"

"মেয়ের খোঁজে? দিল্লী লাড্ডুর জন্য প্রসিদ্ধ শুনেছি।"

রসিকতায় একটু ফল ফলিল। ছোকরার গম্ভীর বদনে একটু হাসির রেখা দেখা দিল।

"আমার বাবার এক বন্ধুর মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে। তারই সন্ধানে বেরিয়েছি—"

"ও, তা হলে আমি তো আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারব। আমি পুলিশে চাকরি করি। আপত্তি যদি না থাকে মেয়েটির পরিচয় আমাকে বলতে পারেন। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনাকে হেল্প করতে। আই. বি. ডিপার্টমেন্টের বহুলোকের সঙ্গে আলাপ আছে আমার—"

"ও, তা হলে তো সুবিধাই হল। মেয়েটির নাম বিশাখা। তার বাবার নাম নবেন্দু বিশ্বাস। লাহোরে থাকতেন তাঁরা। রায়টের সময় পালিয়ে আসেন দিল্লীতে। তারপব নবেন্দুবাবু কোলকাতায় যান। সেখান থেকে যান ঢাকায়। ঢাকায় তাঁর কিছু সম্পত্তি ছিল। এক মুসলমানের সঙ্গে সেই সম্পত্তি বিনিময় করে কোলকাতায় তিনি বাড়িও কিনেছিলেন। যখন দ্বিতীয়বার রায়ট বাধল কোলকাতায়, তারপর থেকে তাঁর আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় রায়টের সময় তিনি কোলকাতাতেই ছিলেন। কোন খবর না পেয়ে বিশাখা তাই তাঁকে খুঁজতে কোলকাতায় আসে। তারপর থেকে বিশাখাকেও পাওয়া যাচ্ছে না। কোলকাতায় চেনা-শুনা কোন জায়গায় সে নেই। দিল্লীতে সে ফিরেছে কিনা এই খবর নিতেই আমি দিল্লী যাচ্ছি—"

ভূপেশ মজুমদার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ব্যাপারটা খানিকক্ষণ প্রণিধান করিলেন। তারপর জেরা শুরু করিলেন।

"নবেন্দুবাবুদের সঙ্গে আপনাদের কতদিনের আলাপ?"

"আমি তাঁকে দেখিনি। তিনি আমার বাবার বাল্যবন্ধু ছিলেন। বাবার সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ চলত।"

"আপনারা থাকেন কোথায়?"

"কোলকাতায়।"

"ও। আপনি নবেন্দুবাবুদের চেনেন না বলেছেন অথচ তাঁর মেয়ের খোঁজে দিল্লী যাচ্ছেন, ব্যাপারটা বুঝলাম না ঠিক। আপনার বাবাই আপনাকে পাঠিয়েছেন নাকি?"

"বাবা ছমাস আগে মারা গেছেন। আমি এদের কথা জানতাম না বিশেষ। মৃত্যুর কিছুদিন আগে বাবা আমাকে তাঁর চিঠিগুলি দেন। দিয়ে বলেন যে বিশাখার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব নবেন্দুকে এ প্রতিশ্রুতি অনেকদিন আগেই আমি দিয়েছি। তুমি পড়াশুনা করছিলে বলে তোমাকে কিছু বলিনি। এইবার তুমি পাস করেছ, আমার ইচ্ছা, এইবার বিয়েটা হয়ে যাক।"

"আপনি কি পাস করেছেন?"

"এম. এ.। ল'টাও পাস করেছি।"

"ও। বিশাখাকে দেখেছেন আপনি?"

"দেখেছি। দূর থেকে—"

"দূর থেকে মানে?"

"বাবার অনুরোধে তাকে দেখতেই আমি দিল্লীতে গিয়েছিলুম একবার। কিন্তু সামনা-সামনি দেখা করতে পারিনি। কেমন যেন লজ্জা হল। তার ওপর শুনলাম বিশাখার মা নাকি অসুস্থ। তাই ওদের বাড়িতে আর আমি যাইনি। আমার এক বন্ধুর বাড়িতে আমি উঠেছিলাম, সে ওদের খবর রাখত, সে-ই আমাকে দূর থেকে একদিন দেখিয়ে দিয়েছিল বিশাখাকে—"

"তারপর?"

"তারপর বাবা মারা গেলেন? ও ব্যাপার চাপাই পড়ে গেল। দিনকয়েক আগে হঠাৎ মোহিতের এক চিঠি পেলাম। সে লিখেছে, বিশাখা কোলকাতায় গেছে। আমার মনে হল ঠাট্টা করে লিখেছে বোধ হয়। তবু টেলিগ্রাফ করলাম একটা। মোহিত উত্তর দিলে বিশাখা দিল্লীতে নেই, কোলকাতাতেই আছে—"

"মোহিত কে?"

"আমার সেই বন্ধুটি। তার টেলিগ্রাফ পেয়ে আমি একটু অবাক হলাম। কৌতূহলও হল একটু। কোলকাতায় যে-সব ঠিকানায় বিশাখার যাওয়া সম্ভব সব জায়গায় খুঁজলাম, কিন্তু কোথাও তাকে পেলাম না। তাই দিল্লী যাচ্ছি ভাল করে ব্যাপারটা জানবার জন্যে—"

"বিশাখা যে আপনার বাগদত্তা, এ কথা সে জানে?"

"জানে। নবেন্দুবাবু তাকে বলেছিলেন—"

"ওদের কথা আপনি জেনেছিলেন আপনার বাবার চিঠি থেকে—"

"হ্যাঁ।"

"ওদের বাড়ির কাউকেই চিনতেন না?"

"না। বিশাখার মাও মারা গেছেন শুনেছি! প্র্যাকটিকালি মেয়েটি এখন অসহায় হয়ে পড়েছে। সেইজন্যে আমি আরও তার খবর নিতে যাচ্ছি—"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভূপেশ মজুমদার পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "মেয়েটি লেখাপড়া জানে?"

"বি. এ. পাস করেছে শুনেছি।"

"কোলকাতায় আমার এক বন্ধুর বাড়িতে একটি রেফিউজি মেয়ে আশ্রয় নিয়েছে। শুনেছি সেও দিল্লী থেকে এসেছে, সে লেখাপড়াও নাকি জানে—"

"তাই নাকি—!"

ভদ্রলোকের চক্ষু দুইটি আগ্রহে জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল।

"হ্যাঁ। এ যদি সেই মেয়ে হয় তা হলে আপনাকে বেশি খুঁজতে হবে না। আমার সেই বন্ধুটিও এখন দিল্লীতে আছেন। যদি দেখা হয়ে যায়, হবারই বেশি সম্ভাবনা, তা হলে আপনি পুরো ডিটেলস পেতে পারবেন; আর এ যদি সে মেয়ে না হয় তা হলেও আই-বি-র থ্রু দিয়ে আপনাকে কিছু সাহায্য আমি অবশ্যই করতে পারব।"

"দিল্লীতে আপনি ক'দিন থাকবেন?"

"ঠিক বলতে পাচ্ছি না। চাকরির ব্যাপারে এসেছি, এখন ক'দিন লাগবে কে জানে—"

ছোকরার সহিত আলাপ করিয়া ভূপেশ আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল ছোকরা স্পাই নয়। বিছানাটি পাতিয়া শুইবার আগে ভূপেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নামটি কি?"

"কৈলাসপতি রায়। আপনার?"

"ভূপেশ মজুমদার। এইবার শুয়ে পড়া যাক, কি বলেন। আপনি নীচে থাকতে চান, না ওপরে উঠবেন?"

"আমি পরে যেখানে হোক শোব। আপনি শুয়ে পড়ুন। নীচের বেঞ্চটাই নিন আপনি। ওপরে উঠতে আপনার কষ্ট হবে।"

ভূপেশ প্রীত হইলেন। হোল্‌ড-অল্‌টি খুলিতে ভূপেশের অসুবিধা হইতেছিল। কৈলাসপতি আগাইয়া আসিয়া হোল্‌ড-অল্ খুলিয়া বিছানাটি পাতিয়া দিল। ভূপেশ আরও প্রীত হইলেন।

ভোরে উঠিয়া একটা স্টেশনে উভয়ে চা পান করিলেন; কৈলাসই দামটা চুকাইয়া দিল। ভূপেশ লক্ষ্য করিলেন তাহার আচরণে, কথাবার্তায় বেশ একটা সমীহের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভূপেশ অসঙ্কোচে তাহাকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন।

ট্রেন যথাসময়ে দিল্লী পৌঁছিল। ভূপেশ ট্যাক্সি করিয়া প্রথমেই গেলেন বিধুভূষণের ঠিকানায়। কৈলাসও সঙ্গে রহিল। হোটেলে গিয়া শোনা গেল বিধুভূষণ কিছুক্ষণ পূর্বে হিসাবপত্র চুকাইয়া দিয়া হোটেল ত্যাগ করিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন তাহা হোটেলওলা বলিতে পারিল না।

কৈলাস বলিল, "আপনি আমার বন্ধুর বাসায় উঠবেন চলুন! কোনও অসুবিধা হবে না।"

ভূপেশ মজুমদার বিশাখার সন্ধান দিতে পারেন এই সংবাদ পাওয়ার পর হইতেই কৈলাস ভূপেশের অত্যন্ত অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না।

"বেশ তাই চল। জিনিসপত্রগুলো হোটেলেই থাক। তোমার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করে আসি। আমাকে নানা জায়গায় ঘুরতে হবে, খাবার, শোওয়ার ঠিক থাকবে না হয়তো, তোমার বন্ধুকে বিব্রত করতে চাই না। ছিনে মিত্তিরকে পাকড়াতে হবে, বাসুকী মহারাজকে ধরতে হবে—"

"মোহিত সব ব্যবস্থা করে দেবে। সে অনেক খবর রাখে। চলুন তো—"

"বেশ চল—"

দেখা গেল মোহিত মৈত্র নামক হাস্যমুখ যুবকটি বেশ চালাক চতুর অথচ ভদ্র। একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় সে সহকারী সম্পাদকের কাজ করে এবং হেন খবর নাই যাহা সে না রাখে। রেসে যে সব ঘোড়া প্রথম হইয়াছে তাহাদের বংশপরিচয় কি, সিনেমা অভিনেত্রীরা বয়স ভাঁড়াইবার জন্য কি কি প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন, কোন্ মিনিস্টারের কি দুর্বলতা, কোন্ কোন্ খেলোয়াড়ের কি কি দোষ না থাকিলে তাহারা ওয়ার্লড চাম্পিয়ান হইতে পারিত, স্টালিনের পাইপের বিশেষত্ব কি ছিল, সোভিয়েটের আসল মতলব কি, বিখ্যাত ভারতবাসীরা ইংরেজী লিখিতে গিয়া কি রকম শোচনীয় ভুল করেন, কোন্ কোন্ লেখকেরা ক্রমশঃ অন্তঃসারশূন্য হইয়া কেবল নামের জোরে টিকিয়া আছেন—এই ধরনের নানা খবর মোহিত মৈত্রের নখদর্পণে। কৈলাসপতির সহিত সে শুধু কলেজেই নয়, স্কুলেও একসঙ্গে পড়িয়াছিল। সত্যই সে তাহার বন্ধু।

পিতার নিকট কৈলাস যেদিন জানিতে পারিল যে তিনি তাহার ভাবী পত্নীকে বহুদিন পূর্বেই মনোনীত করিয়া রাখিয়াছেন এবং পত্নীটি বর্তমানে দিল্লীবাসিনী, তখন স্বভাবতই খবরটি সে বন্ধু মোহিতকে পত্রযোগে জানাইতে বিলম্ব করে নাই। মোহিতও বিলম্ব না করিয়া বিশাখা সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহাকে উত্তর দিয়াছিল। যে পত্রটি সে কৈলাসকে লিখিয়াছিল তাহার শেষাংশ এইরূপ—

"মেয়েটি চমৎকার টু দি পাওয়ার এন্। এনের ভ্যালু কত তা তুমি এসে নিজের চোখে দেখে ঠিক কর। মেয়েটির সামনাসামনি না হয়েও যাতে তাকে দুচক্ষে, বিস্ফারিতচক্ষে, কুঞ্চিত-চক্ষে, নিরীক্ষণ করতে পারো সে ব্যবস্থা আমি করে দেব। একটু দূর থেকে দেখাই ভাল। আসবার আগে শুধু 'কামিং' এই ইংরাজী শব্দটি তারযোগে প্রেরণ কোরো। বাকী সব আমি করব।"

নিমন্ত্রণটি লোভনীয় হলেও কৈলাসপতি যাইতে পারে নাই, কারণ পিতা হিমাদ্রিনাথ কড়া লোক ছিলেন। হঠাৎ দিল্লী চলিয়া গেলে তিনি সবই বুঝিতে পারিবেন এবং বুঝিতে পারিলে কি যে করিবেন তাহা আন্দাজ করা শক্ত ছিল তাহার পক্ষে। তিনি যে তাহার জন্য একটি বধূ এতদিন ধরিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাই কি সে আন্দাজ করিয়াছিল। হিমাদ্রিনাথ ছিলেন হাই-ব্লাডপ্রেসারের রোগী। তাঁহাকে অযথা উত্তেজিত করিবার সাহস কৈলাসের ছিল না, সুতরাং লোভটি সে সংবরণ করিয়াছিল। কিন্তু স্বয়ং হিমাদ্রিনাথই তাহাকে একদিন বলিলেন, "তুমি নিজেই গিয়ে বিশাখাকে দেখে এস একবার। নবেন্দু তো নেই বিশাখার মাকেই আমি চিঠি লিখেছিলাম একটা, তিনি তোমাকে যেতে বলেছেন, তুমি মোহিতের বাসায় উঠতে পার, দুজনে একসঙ্গে দেখে এস—"

বিশাখাকে গিয়া সে দেখিয়া আসিল। মোহিতের পরামর্শ অনুযায়ী দূর হইতেই সে তাহাকে দেখিল। ফিরিয়া আসিয়া মনে মনে সে স্বপ্নের জালও বুনিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ হিমাদ্রিনাথ মারা গেলেন। আসন্ন মিলনটা অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছাইয়া গেল। অন্তত এক-বৎসরের জন্য তো বটেই। তাহার পর খবর পাওয়া গেল, বিশাখার মা-ও মারা গিয়াছেন। মোহিতই খবরটি সরবরাহ করিল। ঠিক সেই সময় কৈলাস আই-এ-এস পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিল। এ ক্ষেত্রে তাহার কি কর্তব্য তাহা সে ভাবিয়া দেখিবারই সময় পাইল না। আরও মাস দুই কাটিল। কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময় মোহিতের আর একটি পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। পত্রটি এই—

ভাই কৈ,

সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে যিনি একজন অথবা শ্রীরাধার অষ্টসখীর মধ্যে যিনি অন্যতমা তাঁহাকে গত কয়েকদিন হইতে দিল্লী শহরে দেখিতেছি না। তাঁহার প্রতিবেশী ভদ্রলোকের নিকট খবর লইয়া জানিলাম তিনি কলিকাতা গিয়াছেন। কাহার তর সহিতেছে না সে গবেষণা করিবার সময় আমার নাই। তাঁহার এক বান্ধবীর মুখে শুনিলাম তিনি তোমার সমস্ত খবর পাইয়াছেন, এমন কি তোমার পিতৃ-প্রেরিত ফটোখানিও নিরীক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার মাতা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার নিকট সকল কথাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষেও অধৈর্য হওয়া অসম্ভব নয়। তুমি যে অধীর হইয়াছ তাহা তো জানিই। একটি

কথা শুধু মনে করাইয়া দিতেছি। পিতা বা মাতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে হিন্দুর ঘরে কোনও শুভকার্য হয় না। আর প্রাক্-বিবাহ 'হনিমুন' ভদ্র খৃস্টানসমাজেও অচল। ব্যাপারটা কি জানাও। ইতি—

মুগ্ধ মোহিত

ইহার পর পত্র ও টেলিগ্রাম আদান-প্রদানের পর কৈলাসপতিকে দিল্লী ছুটিতে হইল।

মোহিত একটি ছোট ফ্ল্যাটে থাকে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট ফ্ল্যাটটি তাহার মার্জিতরুচির নানাচিহ্ন বহন করিতেছে। ঘরে ঢুকিলেই মনটা খুশি হইয়া ওঠে, ছোট টিপয়ে রক্ষিত সুদৃশ্য ফুলদানিতে চমৎকার ফুলের তোড়াটি যে কাগজের তাহা বুঝিতে দেরি লাগে এবং বুঝিবার পর মনটা আরও খুশি হয়।

সমস্ত শুনিয়া সে ভূপেশ মজুমদারকে বলিল, "ছিনে মিত্তির আজকাল অন্ধ এবং কালা হয়ে গেছে। কাউকে দেখতেও পায় না, কারও কথা শুনতেও পায় না।"

"তা হলে উপায়?"

"উপায় আছে—"

"খুব চেঁচিয়ে কথা বলতে হবে নাকি?"

"না। গলা ফাটিয়ে ফেললেও সে শুনতে পাবে না। ভুতির কাছে যেতে হবে।"

"ভুতি কে?"

"ভুতিবালা নাম্নী একটি সাধ্বী রমণীর কাছেই ছিনে মিত্তির থাকেন আজকাল। ভুতিবালা তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে যা বলেন তাই শোনেন তিনি। আর অন্য কোনও উপায়ে তাঁকে কিছু শোনানো যায় না।"

"আমার সঙ্গে এককালে খুবই বন্ধুত্ব ছিল। আমাকে চিনতে পারবেন না?"

"পারবেন যদি ভুতিবালা তাঁর কানের কাছে ফিসফিস করে আপনার পরিচয় দেন। এ সব করবার জন্য প্রণামী দিতে হয় তাঁকে শুনেছি একশ টাকা। বেশিও দেন কেউ কেউ।"

"ও বাবা! আমি গরীব মানুষ কোথা পাব অত টাকা! ছিনে মিত্তিরের আশা ছাড়তে হল তা হলে—"

"কিছু ছাড়তে হবে না। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি দেখুন না।"

"কি করে ঠিক করবে তুমি? অত টাকা পাব কোথা?"

"টাকার দরকার নেই।"

"তবে—"

ভুরু নাচাইয়া মোহিত বলিল—"গুহা—"

"গুহা? মানে, কেভ?"

"না ডাক্তার, অন্তরঙ্গমহলে ভি. ডি. গুহা নামে পরিচিত। কেউ কেউ এস. জি. গুহাও বলে। সিফিলিস, গণোরিয়ায় ধন্বন্তরী। ভুতিবালাকে তিনি বিনা পয়সায় ইনজেকশন দেন। আমার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব।"

ভূপেশ আবেগভরে মোহিতকে জড়াইয়া ধরিলেন।

"আমাকে বাঁচাও ভাই।"

"কিছু ঘাবড়াবেন না। বাসুকী মহারাজের সঙ্গেও আপনার দেখা করিয়ে দেব। তবে এটা একটু শক্ত হবে। কারণ মিনিস্টাররা হরদম গাড়ি পাঠাচ্ছে কিনা। দেখি—করতেই হবে একটা উপায়। আমি দেরি করব না, বেরিয়ে পড়ি তা হলে। আপনি চানটান করুন। কৈলাস রইল—"

একটি ঝকঝকে বাইকে আরোহণ করিয়া সজোরে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে মোহিত মৈত্র বাহির হইয়া গেল।

বাহিরের ঘরের একটা চৌকিতে কৈলাশ বিছানা পাতিতেছিল। ভূপেশবাবুর দিকে চাহিয়া অনেকটা জবাবদিহির সুরে সে বলিল, "একটু ঘুমিয়ে নেব ভাবছি। সমস্ত রাত ঘুম হয়নি কাল। ঠায় জেগে বসেছিলাম।"

"কেন, জায়গা তো ছিল প্রচুর।"

"ঘুম আসছিল না—"

বলিয়াই কৈলাসপতি লজ্জিত হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল ঘুম না আসার প্রকৃত কারণটা ভূপেশবাবু বোধ হয় অনুমান করিয়া ফেলিলেন। সে মুখ অন্যদিকে ফিরাইয়া বিছানার চাদরটা ঠিক করিতে লাগিল।

"আচ্ছা, তুমি তা হলে ঘুমিয়ে নাও। আমি আপিস থেকে ঘুরে আসি একবার।"

"এখানেই ফিরবেন তো?"

"আমি সেই হোটেলেই ফিরব। বিকেলে দেখা হবে আবার—"

আপিসে গিয়া ভূপেশ প্রথমে কোন হদিসই পাইলেন না। কনফিডেনশাল ক্লার্ক তাঁহার দিকে একনজর তাকাইয়া যে মন্তব্যটি করিল, তাহাতে অস্বস্তি বাড়িল বই কমিল না।

"আপনি এসে গেছেন? ভালই হয়েছে।"

"কেন বলুন তো?"

"জানতেই পারবেন; আই জির সঙ্গে দেখা করুন একবার।"

"দত্তগুপ্ত কোন রিপোর্ট করেছে নাকি?"

"দত্তগুপ্ত? আপনার নামে? জানি না তো।"

বলিয়াই ফিক করিয়া সে হাসিয়া ফেলিল, তাহার পর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কাজে মন দিল। এই ক্লার্কটিকে সকলে আড়ালে 'জিলাপী' বলিয়া থাকে। ভদ্রলোকের ভিতর নাকি অনেক জটিল প্যাঁচ আছে।

"আই-জির সঙ্গে দেখা করব বলছেন?"

"করুন, তিনি জনকয়েক ভাল সিনিয়র অফিসারের নাম চেয়ে পাঠিয়েছেন শুনলাম।"

"আমার নাম লিস্টে গেছে না কি?"

"ঠিক জানি না। লিস্টই এখনও যায়নি বোধ হয়। আপনি যান না, আপনাকে দেখলে হয়তো লিস্টের দরকারই হবে না তাঁর।"

"কি রকম—"

কনফিডেনশাল ক্লার্ক আর উত্তর দিল না। হেঁট হইয়া কি লিখিতে লাগিল। ভূপেশের মনে হইল এই অস্পষ্ট উক্তির নানারকম অর্থ হইতে পারে। দত্তগুপ্ত হয়তো আই-জিকে গোপনে কিছু লিখিয়াছেন। আই-জি হয়তো তাঁহাকে সরাইয়া দিতে চান। সরাইয়া দিলে তাঁহার স্থানে

অন্য লোক পাঠাইবেন। তাই সম্ভব লিস্ট চাহিয়াছেন। ভূপেশ কনফিডেনশাল ক্লার্কটির দিকে আর একবার চাহিয়া দেখিলেন, ঝুঁকিয়া লিখিয়াই চলিয়াছে—মুখখানি যেন মার্জারের মুখ। মনে হইল ইহাকে কচলাইয়া এখন আর সুবিধা হইবে না। স্থির করিলেন আই-জির সহিত দেখা করিয়া যদি সুবিধা না হয় তাহা হইলে কিছু লেবু এবং মেওয়া লইয়া সন্ধ্যার পরে কনফিডেনশাল ক্লার্কের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করিবেন। ইতিমধ্যে মোহিতও হয়তো কিছু সুরাহা করিতে পারে। দেখা যাক! কপাল ঠুকিয়া তিনি আই-জির সহিত দেখা করিলেন। আই-জির ব্যবহার বেশ ভদ্র মনে হইল। মনে হইল ভূপেশকে দেখিয়া যেন তিনি প্রীতই হইয়াছেন।

"ও আপনি এসেছেন—"

"হ্যাঁ সার। ছুটি নিয়ে এসেছি।"

"ভালই হয়েছে। কোথায় উঠেছেন এখানে?"

"হোটেলে।"

"ফোন আছে সেখানে?"

"আছে।"

"ফোন নম্বরটা আমাকে দিয়ে যান।"

ভূপেশ পকেট হইতে ডায়েরি বাহির করিলেন। ডায়েরিতে ফোন নম্বর লেখা ছিল। বিধুভূষণের হোটেলের ফোন নম্বব বরেনের নিকট হইতে তিনি টুকিয়া রাখিয়াছিলেন। একটুকরা কাগজে সেটা তিনি লিখিয়া আই-জিকে দিলেন।

"যদি দরকার হয় আপনাকে ফোন করব। একটা কাজের জন্য একজন পাকা লোক হয়তো দরকার হবে। আপনি ফ্রি আছেন তো?"

"আছি সার।"

প্রস্টেটের কথাটা তিনি চাপিয়া গেলেন।

"কাল কি আপনার সঙ্গে দেখা করব সার?"

"দেখা করবার দরকার নাই দরকার হলে আমি ফোন করব, কিংবা লোক পাঠাব। এখন যান।"

"আচ্ছা সার। নমস্কার।"

"নমস্কার।"

ভূপেশ বিচিত্র সম্ভাবনাদোলায় দুলিতে দুলিতে হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আহারাদি সমাপন করিয়া একটু বিশ্রাম করিবার বাসনা হইল। চাকরকে বিছানাটা পাতিয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু ভৃত্যটি যে ঘরে তাঁহার জন্য বিছানা প্রস্তুত করিল সে ঘরে ঢুকিয়া তিনি অনুভব করিলেন, সেখানে শোওয়া যাইবে না। বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ ছাড়িতেছে।

"বড় বিশ্রী গন্ধ যে হে এখানে।"

"আজ সকাল থেকে দেখছি জানলার নীচে একটা বেড়াল মরে পড়ে আছে। মেথরটা এখনও আসেনি। দুবার লোক পাঠিয়েছি—"

"অন্য ঘর নেই?"

"বিধুবাবু যে ঘরটার ছিলেন সেটা খালি আছে। কিন্তু সেটা পরিষ্কার হয়নি এখনও। তার চার্জও একটু বেশি।"

"সেখানে গন্ধ-টন্ধ নেই?"

"আজ্ঞে না। ঘর চমৎকার। তেতলার উপরে—"

"সেই ঘরে চল—"

ত্রিতলের ঘরটি সত্যই ভাল। ভৃত্য সেইখানেই বিছানা পাতিয়া দিল। ভূপেশ মজুমদার শয়ন করিয়া চক্ষু মুদিলেন। নিদ্রা কিন্তু আসিল না। আসিল চিন্তা। নীল তারা, সুলোচনা, দত্তগুপ্ত, বিধুভূষণ, কনফিডেনশাল ক্লার্ক, আই-জি, কৈলাস, মোহিত, ছিনে মিত্তির সকলেই কিছু-না-কিছু চিন্তার খোরাক লইয়া তাঁহার মুদিত নয়ন-পল্লবের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইতে লাগিল। কাহারও মুখে মৃদু হাসি, কাহারও ভ্রূকুটি, কেহ নির্বিকার, কেহ ভীত, কেহ কৌতুক-প্রবণ, কেহ শ্রদ্ধাবিষ্ট...বিরক্ত হইয়া শেষে উঠিয়া বসিলেন তিনি। উঠিয়া বসিয়াই কিন্তু যাহা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল তাহা সাধারণতঃ কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, কৌতূহলও উদ্রিক্ত করে না। কিন্তু পুলিশের লোক বলিয়াই হোক বা চিন্তার হাত হইতে আপাতত পরিত্রাণ পাইবার জন্যই হোক তিনি ঘরের কোণে দোমড়ানো মোচড়ানো যে নীল কাগজের টুকরাটি পড়িয়াছিল তাহাতেই মনোনিবেশ করিলেন। উদ্দেশ্য ছিল কাগজটি পাকাইয়া লম্বা করিবেন এবং সেটি কর্ণকোহরে প্রবেশ করাইয়া কান চুলকাইতে চুলকাইতে কিছুক্ষণের জন্য আত্মবিস্মৃতিলাভ করিবেন। উঠিয়া কাগজের টুকরাটি কুড়াইয়া আনিলেন। কাগজটি খুলিয়া কিন্তু তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া গেল। একখানা চিটির তলায় বিধুভূষণের নাম। ব্যাপার কি! পড়িয়া আরও বিস্মিত হইলেন। কাহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বিধু এই পত্র লিখিতেছিল। সেই মেয়েটির নিকট নাকি, চিঠিতে অনেক কাটাকুটি রহিয়াছে, এটা বোধ হয় রাফ কপি। বিশাখাকে চিঠি লিখিবার পূর্বে বিধু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া যে মুশাবিদটি করিয়াছিলেন এবং চিঠিটি পরিচ্ছন্ন করিয়া লিখিবার পর যাহা তিনি অবহেলাভরে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা যে ভূপেশ মজুমদারের হাতে পড়িয়া যাইবে তাহা বিধুর সদূরতম কল্পনাতেও আভাসিত হয় নাই। ভূপেশও এ রকম পত্র এভাবে পাইবার প্রত্যাশা করে নাই। অদ্ভুত যোগাযোগটি কিন্তু ঘটিয়া গেল। ভূপেশ খানিকক্ষণ পত্রটির দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার কুঞ্চিত ভ্রূ ক্রমশঃ মসৃণ হইল, অধরে একটি মৃদু হাসির রেখা ফুটিল। চিঠিটি ভাল করিয়া ভাঁজ করিলেন, তাহার পর সযত্নে নিজের পার্সের একটি খোপে সেটি রাখিয়া দিলেন।

"নিচে মোহিতবাবু এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।"

ভৃত্য আসিয়া খবর দিল।

"নিচে বসিয়েছ তাঁকে?"

"মোটরে বসে আছেন তিনি।"

"তাই নাকি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"চল।"

ভূপেশ নামিয়া দেখিল সত্যই একটি বিরাট মোটরে মোহিত মৈত্র বসিয়া আছে। তাঁহাকে দেখিয়া নামিয়া আসিল এবং স্মিতমুখে "আপনার অদৃষ্ট ভাল, মানে খুবই ভাল। বাসুকী মহারাজকে যে চট করে বাগাতে পারব ভাবিনি। খুব শুভ মুহূর্তে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। গিয়ে

দেখি পুজোটি শেষ করে মালপোয়া খাচ্ছেন। আপনার কথা বলতেই চিনতে পারলেন আপনাকে। বললেন, নিয়ে এস। আচ্ছা আপনার ডাকনাম কি গ্যাঁড়া?"

"হ্যাঁ।"

"গ্যাঁড়া নামেই আপনার উল্লেখ করলেন। আচ্ছা, মন্তর নিতে আপত্তি আছে কি আপনার?"

"মন্তর?"

"মানে, দীক্ষা। আপত্তি আছে কি, বলুন তা হলে অন্য একটা প্যাঁচ কসতে হবে।"

"বুঝতে পাচ্ছি না ঠিক। হঠাৎ দীক্ষা নেবার কথা উঠল কি করে—"

"আমিই ওঠালাম। বললাম পুলিশ লাইনের পাঁক ঘেঁটে ঘেঁটে আপনি আপাদমস্তক কর্দমাক্ত হয়ে গেছেন। আপনার ভুরু, চোখ সমস্ত কাদায় ঢেকে গেছে। তাই আপনি ব্যাকুল হয়ে বাসুকী মহারাজের কাছে ছুটে এসেছেন, কিন্তু সাহস করে কাছে আসতে পারছেন না। অভয় পেলে কাছে যাবেন, গিয়ে দীক্ষা নেবেন। কারণ আপনার দৃঢ়-ধারণা হয়েছে অন্য কোনোরকম সাবানেই এ কাদা উঠবে না—"

ভূপেশ বিস্ফারিতচক্ষে মোহিতের কথা শুনিতেছিলেন। কথা শেষ হইলে ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন, "আপনি তো এরকম 'কমিট' করেই এসেছেন, না নিলে আপনার মুখ থাকবে কোথায়—"

"মুখ আমি সামলে নেব। হরবোলা পাখি তো আমরা, নানারকম বোল বলতে পারি। আপনার দীক্ষা নিতে আপত্তি আছে কিনা সেইটেই বিবেচ্য—"

"দীক্ষা নিতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু পরিবারের সঙ্গে একটু পরামর্শ না করে দীক্ষা নেওয়াটা কি ঠিক হবে—"

মোহিত এক নজর তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ফেলিল।

"ওই কথাটাই বলুন তা হলে গিয়ে। বলুন, আপনি যদি অভয় দেন তা হলে সস্ত্রীক আপনার চরণতলে এসে আশ্রয় নিই। খুব খুশি হবেন। ওঁর স্ত্রীলোক শিষ্যই বেশি।"

"তাই নাকি—"

"সেদিন কসে দেখেছিলাম নাইন্টি-ফাইভ পয়েন্ট সেভেন পারসেন্ট—"

"ও—"

"চলুন। ওই কথাই বলবেন তা হলে।"

"ছিনে মিত্তিরের কি হল? দেখা হয়েছে—?"

"হয়েছে। ভূতিবালার মারফত আপনার কথা তাঁর কর্ণগোচর করিয়েছি। এতক্ষণ তিনি বোধ হয় ফোন করেছেন।"

"কোথায়—"

"তা ঠিক জানি না। ভূতিবালা শুধু বললেন সব ঠিক হয়ে যাবে। চলুন আর দেরি করবেন না। আমাকে আপিসে ফিরে গিয়ে দুটো প্রুফ দেখতে হবে, মেসিন না হলে বসে থাকবে—"

"চলুন। এ গাড়ি কার—"

"বাসুকী মহারাজের।"

ভূপেশ মজুমদার আর অধিক বাক্যবায় না করিয়া গাড়িতে চড়িয়া বসিলেন।

বাসুকী মহারাজ যে এতটা সময় ব্যবহার করিবেন তাহা তিনি প্রত্যাশা করেন নাই। ভূপেশ যখন তাঁহার বিপদের কথা বিবৃত করিতেছিলেন তখন হয়তো তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গিয়াছিল। হয়তো নয়নকোণে একবিন্দু অশ্রু আভাসিত হইয়াছিল, কে জানে! কিন্তু বাসুকী মহারাজ যাহা করিলেন তাহা মোহিত মৈত্রের মতে "আন্-থট্-অফ!" সমস্ত শুনিয়া বাসুকী মাভৈঃ-ভঙ্গীতে-প্রসারিত-করতল দক্ষিণ-বাহুটি উত্তোলন করিলেন, তারপর বলিলেন, "ভয় ভগবানকে সমর্পণ কর, তা হলে ব্যবস্থা তিনিই করবেন। বিধুবাবুকে দিয়ে তুমি লিখিয়ে নিতে চাও যে বরেন বলে যে ছোকরাটিকে তুমি ছেড়ে দিয়েছ সে খুব ভাল ছেলে এবং তিনি তাঁর জন্য জামিন রইলেন। এই তো""

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তুমি বিধুবাবুকে এখানে পেলে না?"

"আজ্ঞে না। আমার দুর্ভাগ্য, তিনি চলে গেছেন শুনলাম।"

"তুমি বরেনকে যেদিন ধরেছিলে সেটা কোন্ তারিখ?"

ভূপেশ ডাইরি দেখিয়া তারিখটা জানাইল। বাসুকী মহারাজও একটি ছোট ডায়েরি বাহির করিয়া সেটির পাতা উলটাইতে লাগিলেন। একটি পাতায় কয়েকমুহূর্ত দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন,

"হয়েছে।"

"কি?"

"আমিও ওই তারিখে কোলকাতায় ছিলাম। দত্তগুপ্তের বাড়িতেই ছিলাম। তুমি বিধুবাবুকে দিয়ে যা লিখিয়ে নিতে চাইছ, আমি যদি সেটা লিখে দি, চলবে?"

আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেও ভূপেশ এতটা পুলকিত হইতেন কিনা সন্দেহ।

"আপনি দিলে চলবে না? তা কি হতে পারে কখনও! আপনি কি বরেনকে চেনেন?"

এই প্রশ্নে বাসুকীনাথের চক্ষুদুটি নিমীলিত হইল। ধীরে ধীরে মুখে স্মিতহাস্য ফুটিয়া উঠিল। কয়েক সেকেন্ড এইভাবে থাকিয়া তিনি ধীরে ধীরে প্রায় অস্ফুটকণ্ঠে কহিলেন, "চিনি, সবাইকে চিনি আমি। অচেনার মধ্যে চেনাকে, সকলের মধ্যে এককে দেখেছি, এই তো আমার সাধনা, গ্যাঁড়া।"

এই আধ্যাত্মিক উক্তি ভূপেশ মজুমদারকে এমন গভীরভাবে বিচলিত করিল যে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বাসুকী মহারাজের পদপ্রান্তে উপুড় হইয়া পড়িলেন।

"কোন ভয় নেই গেঁড়ু। সব ঠিক হয়ে যাবে। মালপো খাও দুখানা।"

মোহিত ঘরের এককোণে গালে হাত দিয়া বসিয়াছিল। তাহার মুখের একটি পেশীও বিচলিত হয় নাই। মালপোয়াপ্রসঙ্গ আসিয়া পড়াতে সে বুঝিল ব্যাপারটা আরও কিছুদূর গড়াইবে। সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বলিল, "আপনি তা হলে বসুন এখানে। আমি আপিসে যাই। ফেরবার পথে আপনাকে নিয়ে যাব।"

বাসুকী মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, "কোথায় নিয়ে যাবে?"

"আমার বাসায়।"

"তারজন্য তোমাকে কষ্ট করে আসতে হবে কেন? সুখনলাল তোমার বাসা চেনে তো?"

সুখনলাল বাসুকী মহারাজের ড্রাইভার।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, চেনে বই কি।"

"তা হলে আমার গাড়িই ওকে পৌঁছে দেবে। তুমি আর কষ্ট করে আসবে কেন?"

"তা হলে আমি চলি।"

"এস।"

মোহিত উঠিয়া পড়িল এবং বাসুকী মহারাজের পিছনদিকে গিয়া নিজের কর্ণস্পর্শ করিয়া চক্ষুর একটা রহস্যময় ভঙ্গি করিল। ভূপেশ বুঝিলেন মোহিত দীক্ষার ব্যাপারটা আলোচনা করিতে ইঙ্গিত করিতেছে। মোহিত চলিয়া যাইবার পর ভূপেশ দীক্ষাপ্রসঙ্গেই উপনীত হইলেন।

হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিলেন, "আমার অনেকদিন থেকে একটা বাসনা আছে। কিন্তু মুখ ফুটে সেটা বলবার সাহস পাইনি কোনদিন! যদি অভয় দেন, আজ বলি।"

"বল।"

"জেনে-না-জেনে অনেক পাপ করেছি জীবনে। আপনাদের মতো মহাপুরুষের কৃপাকণা না পেলে আমাদের মতো পাপীর উদ্ধারের আশা নেই। আপনি যদি চরণে আশ্রয় দেন তা হলে—"

ভূপেশ পুনরায় তাঁহার চরণে উপুড় হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু বাসুকী মহারাজ বাধা দিলেন।

"বারবার চরণ নিয়ে টানাটানি কর কেন? চরণটা তো আমি নই। আমার এই দেহটাও আমি নই, সেটা কেন তোমরা বোঝ না।"

ভূপেশ করজোড়ে আনতনয়নে বসিয়া রহিলেন।

"দীক্ষা নিতে চাও?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। যদি আপনি কৃপা করেন—"

"বেশ, দেব।"

বাসুকী মহারাজ কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন। তাহার পর তাঁহার মুখে হাসি ফুটিল। ধীরে ধীরে দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি বলিলেন, "সব বাঙালীকেই এবার দীক্ষা নিতে হবে। এখন এ পথ ছাড়া অন্য পথ নেই তার। একদিন সে ভোগের পথে কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। চাকরির ক্ষেত্রে, পেশার ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, সবক্ষেত্রেই একদিন বিজয়পতাকা উড়িয়েছে সে। ভোগ-শিখরের চূড়াস্তে সে পৌঁছে গেছে। ভগবান এবার তাই দয়া করেছেন তাকে। কর্মীকেই তো তিনি দয়া করেন। কিন্তু তাঁর দয়া দাক্ষিণ্যের রূপ নিয়ে আসেনি, এসেছে নিষ্ঠুরতার রূপ নিয়ে। ভোগের ভোগবতী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন, নির্মমভাবে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। ভোগের সর্বক্ষেত্র থেকে বাঙালী বিতাড়ন চলছে আজ। এইবার বাঙালীকে কবি রবি ঠাকুরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে হবে, "দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল, বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল—"

ভূপেশ জোড়হস্তে এই জ্ঞানগর্ভ বাণী শুনিতেছিলেন। বাসুকীনাথ থামিতেই তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "তাই গাইব—"

"দীক্ষা নিতে হলে কিছু কিছু আয়োজন করতে হবে।"

"করব। আমার ইচ্ছে সস্ত্রীক দীক্ষা নি। যদি অনুমতি দেন নীলুকে নিয়ে আসি গিয়ে—"

"সস্ত্রীক দীক্ষা নেওয়াই উচিত। তবে নীলুকে এখানে আনবার দরকার নেই। আমিই কোলকাতা যাব। দত্তগুপ্তের ওখানেই যাব। শীতলাক্ষী বাতে বড় কষ্ট পাচ্ছে। তার জন্যে একটা স্বস্ত্যয়নের আয়োজন করতে হবে। সেই সময় তোমাদের দীক্ষা দিয়ে দেব। কি বল—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই ভাল।"

বাসুকীনাথ ফতুয়ার পকেট হইতে একটি মূল্যবান ঘড়ি বাহির করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

"এক মিনিস্টারের বাড়ি থেকে গাড়ি আসবে একটু পরে। তুমি উঠেছ কোথা?"

"একটা হোটেলে।"

"মোহিতকে কোথা পেলে? বড় ভাল ছোকরা, ভারী জ্ঞানবান।"

"এবারই আলাপ হল।"

"তার কাছেই যাবে নাকি এখন?"

"তাই কথা আছে। কিন্তু তিনি কি আপিস থেকে ফিরেছেন?"

"তার আপিসেই যাও নাহয়। সুখন আপিসও চেনে।"

বাসুকীনাথ উঠিবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া ভূপেশ অবিলম্বে আসল প্রসঙ্গটির অবতারণা করিয়া ফেলিলেন।

"বরেনের কথাটা এখুনি লিখে দেবেন কি?"

"এক্ষুনি।"

তাহার পর সেকেন্ড দুই চোখ বুজিয়া রহিলেন।

"তোমার নামে একটা চিঠি লিখে দি, কি বল?"

"আপনাকে আমি আর কি বলব। যা ভাল বোঝেন তাই করুন।"

"তাই দি।"

বাসুকীনাথ উঠিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন এবং কয়েক মিনিট পরে একটি তুলোট কাগজে পরিষ্কার বাংলায় লিখিয়া আনিলেন।

নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু,

কল্যাণীয় ভূপেশ, শ্রীমান বরেনকে আমি চিনি। উহাকে তুমি ছাড়িয়া দাও, আমি উহার-জন্য জামিন রহিলাম। প্রয়োজন হইলে দত্তগুপ্তকেও আমি এ কথা বলিব। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ছাড়িয়া দিতে পার। আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্বাদক
বাসুকীনাথ

ভূপেশ পত্রটি পাঠ করিয়া পুনর্বার তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

মোহিতের আপিস পর্যন্ত যাইতে হইল না। পথেই তাহার সহিত দেখা হইয়া গেল। সে নিজেই হাত তুলিয়া গাড়ি থামাইল।

"চলুন সোজা আই-জির আপিসে। সেখান থেকে লোক এসেছিল আপনাকে খুঁজতে। আপনার হোটেলে এসেছিল, সেখানে আপনাকে পায়নি, হোটেলের চাকরটা আমাকে চেনে, সেই পাঠিয়ে দিয়েছিল আমার আপিসে, ছিনে মিত্তিরও কিছু করেছে মনে হচ্ছে।"

"তোমার আপিসের কাজ হয়ে গেল?"

"প্রুফটা আর একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে এলাম। আপনার ব্যাপারটা বেশি দরকারি।"

আই-জির আপিসে গিয়া ভূপেশ যাহা শুনিলেন তাহা এতই অপ্রত্যাশিত যে কিছুক্ষণ তাঁহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

আই-জি বলিলেন, "আমাদের এক মিনিস্টারের নামে গত এক মাস থেকে ক্রমাগত চিঠি আসছে। সবগুলোই হুমকি। কুড়িখানা চিঠি এসেছে। এর তদন্তের ভার আপনাকে নিতে হবে। এখানকার কোন অফিসারের উপব তদন্তের ভার দেবার উপায় নেই। মিনিস্টারের সেটা ইচ্ছে নয়, তাঁর মাথায় কে যেন ঢুকিয়ে দিয়েছে এখানকার পুলিশ অফিসাররাই এর সঙ্গে জড়িত আছেন। রং ইম্‌প্রেশন্ অবশ্য। আমি আপিসে বাংলাদেশের পাকা অফিসারদেব একটা লিস্ট চেয়েছিলাম। এমন সময় কাল আপনি এলেন। মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করেছেন নাকি?"

"আজ্ঞে না! কেন বলুন তো?"

"তিনি একটু আগে ফোন করে বললেন কোলকাতা থেকে মজুমদার এখানে এসেছেন, তাঁকেই এন্‌কোয়ারির ভার দিন।"

"আমার সঙ্গে তো দেখা হয়নি। আমার সঙ্গে পরিচয়ও নেই।"

"তা হলে অন্য কোথাও আপনার সুখ্যাতি শুনে থাকবেন। আপনি ব্যাপারটার ভার নিন তা হলে। কাল এই চিঠিটা এসেছে দেখুন—"

একটা চিঠি ভূপেশকে দিলেন। ভাষা ইংরাজী। টাইপ করিয়া লেখা। বাংলা অনুবাদ করিলে দাঁড়ায়—

মন্ত্রী মহাশয়,

আপনার দুষ্কৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর আমরা রাখিতেছি। আপনার গতিবিধির উপরও আমাদের তীক্ষ্ণ নজর আছে। আপনি এখনও বিরত হউন, ইহাই আমাদের বিনীত অনুরোধ। আপনার শোণিতে মৃত্তিকা সিক্ত করিবার বাসনা আমাদের নাই, হত্যা করা আমাদের পেশাও নয়। কিন্তু ইহা স্থির জানিবেন দেশের কল্যাণের জন্য যদি প্রয়োজন হয় তাহাতেও আমরা পশ্চাৎপদ হইব না। ইতি—

ভবানী পাঠক

"নিন এগুলোও, আপনার কাছেই সব থাক।"

ড্রয়ার টানিয়া একগোছা চিঠি তিনি বাহির করিয়া দিলেন। ভূপেশ সেগুলিও খুলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল। এমন সময় আই-জি বলিলেন, "ওগুলো বাড়িতে পড়বেন। আসল ব্যাপারটা শুনুন এখন। কাল মিনিস্টার শ্বশুরবাড়ি যাবেন, সেখানে প্লেন নামবার

জায়গা নেই, ট্রেনেই যেতে হবে। আজই আপনি বরং লাইনটা দেখে আসুন, আর সেখানে পাহারার ব্যবস্থা করুন। আমি অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি, আপনার যা দরকার সব পেয়ে যাবেন।"

"যে আজ্ঞে।"

নমস্কার করিয়া ভূপেশ আপিস হইতে বাহির হইয়া গেলেন। পরমুহূর্তেই আই-জি মিনিস্টার মহাশয়কে ফোন করিয়া বলিলেন, "মজুমদারকেই লাগালাম। লোকটি সত্যিই ভাল। আপনি কিন্তু পরের প্যাসেঞ্জারটায় যাবেন। সবাই জানুক যে আপনি একসপ্রেসেই যাচ্ছেন, পাহারাও মোতায়েন থাকুক, যদি কেউ তাতে যেতে চায় যাক—কিন্তু আপনি যাবেন পরের ট্রেনে। বুঝলেন না? আমি যাচ্ছি একটু পরে—।"

আপিস হইতে বাহির হইয়া ভূপেশ মজুমদার স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো মোটরে উঠিয়া বসিলেন। সত্যই তাঁহার মন ক্ষণকালের জন্য বৈদান্তিকভাবে আপ্লুত হইয়া গেল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ইহা স্বপ্ন, মায়া, না মতিভ্রম!

"কি হল।"

মোহিতের প্রশ্নে তাহার চমক ভাঙিল।

"ভালই। খুব ভাল—"

সহসা আবেগভরে তিনি মোহিতকে জড়াইয়া ধরিলেন।

"তোমার ঋণ কখনো শোধ করতে পারব না ভাই।"

"ছাড়ুন, ছাড়ুন। অত সহজে ভোলবার ছেলে আমি নই। ঋণ আপনাকে শোধ করতেই হবে। একটি পয়সা ছাড়ব না—।"

"কি করতে হবে বল?"

"কৈলাসের বিয়েটি দিয়ে দিতে হবে। আমি যতদূর বুঝতে পারছি বিশাখা মেয়েটি অথৈ জলে পড়ে আছে। এর থেকে সাঁতরে উঠে আসবার ক্ষমতা তার আছে কিনা জানি না। আপনার সাহায্য পেলে হয়তো পারলেও পারতে পারে। আপনি পুলিশের লোক কিনা, তাই অনুরোধ এ ভারটি আপনাকে নিতে হবে।"

"নিশ্চয় নেব। বিশাখার সম্বন্ধে তুমি যা যা জান আমাকে বল—।"

"আমি সব লিখে দেব। এলোমেলো কাজ আমি করি না। লিখে খামে পুরে আপনাকে দিয়ে দেব। কবে নাগাদ আপনি ফ্রি হবেন?"

"ঠিক বলতে পাচ্ছি না ভাই। এ মিনিস্টারের প্যাঁচ কি না, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, অ্যাট অল্ দাঁড়াবে, না, হু হু করে বইতেই থাকবে, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।"

"কেন, মিনিস্টারের কি হল আবার?"

"কনফিডেনশাল ব্যাপার। বলা যাবে না। কিছু মনে কোরো না।"

"মনে করব কি। আপনার উপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। আপনি কি নাগাদ কোলকাতা ফিরবেন তার একটা আন্দাজ দিন অন্তত।"

"দরকার পড়লে হয়তো কালই যেতে হতে পারে। আমার দেরিও হতে পারে। কিছু বলা যায় না।"

"কৈলাস তা হলে কি করবে এখন। এখানে বসেই ভ্যারাণ্ডা ভাজুক।"

"আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকুক না। ওর বিশেষ কোন কাজ নেই যখন—।"

"কাজ ইচ্ছে করলে আপনি দিতে পারেন। আপনি যদি বিধুবাবুর ঠিকানাটা ওকে দিয়ে দেন ও সেখানে গিয়ে খোঁজ করতে পারে।"

"তা পারে। কিন্তু বিধু কোথায় আছে তার ঠিক নেই, তার অনুপস্থিতিতে সে মেয়েটি ওখানে আছে কিনা তাও অনিশ্চিত। আমি নিজে না গেলে সুবিধে হবে না।"

"তা হলে আপনি যা ভাল বোঝেন করুন। আপনার কুকুরের শখ আছে?"

"ছিল এককালে, এখনও আছে একটু-একটু। কেন?"

"তা হলে সুখ পাবেন। আপনাকে একটা ভাল জিনিস দেখাই চলুন। ড্রাইভার, বাঁ-হাতি গলিটাতে ঢোক তো ভাই একবার।"

"কি দেখাবে?"

"কুকুর। শুদ্ধকুলোদ্ভব ককার্স স্প্যানিয়েল একটি। নাবুন, রাস্তা থেকেই দেখতে পাবেন।"

নাবিতে হইল। মোহিত মৈত্র একটি বাড়ির বারান্দায় উপবিষ্ট একটি কুচকুচে কালো লোমশ কুকুর দেখাইয়া বলিল,

"ওই দেখুন। বিউটি একটি, নয়?"

"হ্যাঁ, চমৎকার।"

ভূপেশের এসব তত ভাল লাগিতেছিল না, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে হাসিয়া এবং ঘাড় নাড়িয়া কুকুরটির তারিফ করিতে হইল।

মোহিত বলিল, "ওই কুকুরটিকে আদর করবার জন্য আমিও বাড়ির একটা ছেলের সঙ্গে ভাব করেছি। অতি বদ ছেলে, খালি ধার চায়, কিন্তু কুকুরটিকে আদর করবার লোভ সামলাতে পারি না। কিন্তু আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, চলুন।"

উভয়ে আবার গাড়িতে আসিয়া বসিলেন, গাড়ি চলিতে লাগিল।

"কৈলাস তাহলে আপনার সঙ্গে যাচ্ছে?"

"চলুক—"

"কৈলাসের পরিচয় পেয়েছেন কি?"

"কিছু কিছু পেয়েছি—"

"আমি আর একটু দি। সংক্ষেপেই বলছি। ও কিরকম লোক জানেন? যেন একটা পাকা ল্যাংড়া আম। সর্বগুণান্বিত। খোলা পাতলা, প্রচুর শাঁস, আঁশ নেই, আঁটিটি ছোট। কিন্তু এইজন্যই ওর বিপদ বেশি। যে পাবে সেই খেয়ে ফেলবে। অথচ জরদগবও নয়, দামী হীরের টুকরো। বুঝেছেন?"

"বুঝেছি—"

"সুতরাং ওকে একটু রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।"

"করব। নিশ্চয় করব।"

"আপনার হাতে ওঁকে সঁপে দিয়ে তা হলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি?"

"নিশ্চয়।"

"সেইদিনই সন্ধ্যায় ভূপেশ মজুমদার স্বাধীন ভারতের জনৈক মন্ত্রীর শ্বশুরবাড়িযাত্রা নির্বিঘ্ন করিবার জন্য পুলিশবাহিনীসহ বাহির হইয়া পড়িলেন।

।। দুই ।।

বিধুভূষণ বেশ শক্ত পাল্লায় পড়িয়াছিলেন। ও. সি. কুণ্ডু তাঁহার সঙ্গ ছাড়েন নাই। ও. সি. কুণ্ডুর সহিত হোটেল ত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিতই তিনি ঘুরিতেছিলেন। যে ট্রেন তাঁহার ধরিবার কথা সে ট্রেন ধরিতে পারেন নাই। ও. সি. কুণ্ডু বাজারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানাবিধ জিনিসপত্র কিনিতে কিনিতে এত দেরি করিয়া ফেলিলেন যে, সময়মতো স্টেশনে পৌঁছানো গেল না। পরবর্তী ট্রেনটাই ধরিতে হইল।

বিধুভূষণ থার্ডক্লাস কিংবা বড়জোর ইন্টারক্লাসে চিরকাল চড়িয়া আসিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে বা প্রথম শ্রেণিতে চড়িয়া পয়সা অপব্যয় করিবার কল্পনা তিনি কখনও করেন না। কিন্তু ও. সি. কুণ্ডুর সন্তোষবিধানার্থে তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কাটিতে হইল। ও. সি. কুণ্ডু বলিলেন তিনি ফার্স্টক্লাস ছাড়া 'ট্র্যাভল'' করেন না। তিনি বিধুভূষণের নিকট হইতে টাকা লইয়া নিজেই গিয়া টিকিট খরিদ করিলেন। অনেকগুলি টাকা লাগিল। বিধুভূষণ আপত্তি করিতে পারিলেন না। এই নামজাদা ডিটেকটিভকে চটাইবার সাহস তাঁহার ছিল না। মনে হইয়াছিল ইহারা কেঁচো খুড়িবার নাম করিয়া সাপ খুঁজিয়া বেড়ায়, কখন কি মতলবে থাকে বোঝা শক্ত, কয়টা টাকার জন্য কি দরকার ইহাকে চটাইয়া! ও. সি. কুণ্ডু আসিয়া বলিলেন, "কে এক মিনিস্টার এই গাড়িতে যাচ্ছে। তাঁর লটবহর, জিনিসপত্র নিয়ে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি একটি গোটা ফার্স্টক্লাস দখল করে বসেছে। আমি অনেক কষ্টে দুটি বার্থ-ওলা একটি কূপে পেয়েছি। এক হিসেবে সুবিধাই হল, তৃতীয় লোক উঠে বিরক্ত করবে না আমাদের।"

বিধুভূষণ মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। সমস্ত পথটা এই লোকটার সহিত মুখোমুখি বসিয়া থাকিতে হইবে। সর্বনাশ।

ও. সি. কুণ্ডু গাড়িতে উঠিয়াই বাথরুমটা খুলিয়া ফেলিলেন এবং ঝুঁকিয়া উপুড় হইয়া সার্শি, খড়খড়ি টানিয়া নানাবিধ পরীক্ষায় ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন।

"কি দেখছেন বাথরুমে?"

"দেখছি পালাবার কোনও রাস্তা আছে কিনা। একবার এই বাথরুমে একটা চোরকে ধরেছিলাম আমি। সেইজন্যে গাড়িতে চড়েই প্রথমে বাথরুমটা দেখে নি।"

"ও।"

ইহার বেশি কোনও কথা আর বিধুভূষণের মুখ হইতে বাহির হইল না। সেই সময় একটা খাবারের ফেরিওয়ালা খাবারের গাড়িটি ঠেলিতে ঠেলিতে আসিয়া তাঁহাদের কামরার সম্মুখে দাঁড়াইল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় বিধুভূষণ তাড়াতাড়ি নামিয়া গেলেন এবং খাবার কিনিতে লাগিলেন। অনেক খাবার কিনিয়া ফেলিলেন। ভাবিলেন, লোকটাকে খাওয়াইয়া যদি একটু নরম করা যায়।

"অত খাবার খাবেন আপনি?"

প্রশ্ন করিলেন ও. সি. কুণ্ডু।

"আপনিও তো আছেন।"

"আমি আপনার হাত থেকে কিছু খাব না, নট এ গ্রেন। আমার খাবার আমার বাস্‌কেটে আছে। সঙ্গেও আছে।"

প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকাইয়া কুণ্ডু মহাশয় একটি চ্যাপটা গোছের বোতল বাহির করিয়া দেখাইলেন। তাহার পর বলিলেন, "যতক্ষণ না অন্যরকম প্রমাণ পাচ্ছি ততক্ষণ আপনাকে শত্রু বলে মনে করব। আপনার হাত থেকে এক গণ্ডুষ জল পর্যন্ত খাব না।" এই বলিয়া তিনি রঙীন চশমাটা খুলিয়া ফেলিতেই বিধুভূষণ পুনরায় তাঁহার রক্তবর্ণ জ্বলন্ত চক্ষুদুইটি দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া খুবই ঘাবড়াইয়া গেলেন তিনি। প্ল্যাটফর্মে অনেক লাল পাগড়ি পুলিশ আসিয়াছিল। সম্ভবতঃ মিনিস্টারের দেহরক্ষী উহারা। বিধুভূষণের একবার মনে হইল, উহাদের একজনকে ডাকিয়া ও. সি. কুণ্ডুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিবেন, কিন্তু তাঁহার বিবেকে গলদ ছিল। ভাবিলেন, দরকার নাই, কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সত্যই যদি সাপটা বাহির হইয়া পড়ে!

খাবারওলা দাম লইয়া চলিয়া গেল। ট্রেনও ছাড়িয়া দিল।

ও. সি. কুণ্ডু বলিলেন, "আপনি ঘুমুতে চান, ঘুমুন। আমি ঘুমুব না। আমি সমস্ত রাত জেগে বসে থাকব।"

"কেন?"

"আপনাকে পাহারা দেব। আপনি যে মাঝরাত্রে উঠে সুট করে নেবে যাবেন সেটি হতে দিচ্ছি না।"

ও. সি. কুণ্ডু সামনের খোলা জানলার দিকে চাহিয়া শিস দিতে লাগিলেন। বিধুভূষণের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না পর্যন্ত। বিধুভূষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার ইচ্ছা করিতেছিল উঠিয়া গিয়া লোকটার গালে ঠাস-ঠাস করিয়া চড় বসাইয়া দিতে। কিন্তু বিবেকে গলদ ছিল, আত্মসংবরণ করিতে হইল। যে খাবার কিনিয়াছিলেন তাহাই কিছু গলাধঃকরণ করিবার চেষ্টা করিলেন। চেষ্টা করিতে গিয়া বুঝিলেন ঘি নয়, দালদা। দালদায় প্রস্তুত এতগুলো খাবার কি তিনি হজম করিতে পারিবেন? তির্যকপথে, আর একটি চিন্তাও আসিয়া এই অবসরে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক করিয়া দিল। জিৎরাম বেশ ফলাও করিয়া দালদার ব্যবসায় ফাঁদিয়াছে। তাঁহাকেও অংশীদার করিতে চাহিয়াছিল, এখনও চায়...আরও গোটা দুই নিমকি চর্বণ করিলেন...তাহার পর আর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়িতে জলের কুঁজোটি ফেলিয়া আসিয়াছেন। বাথরুমে ঢুকিয়া হাতটা, মুখটা ধুইয়া ফেলিলেন। বাথরুমের জল খাইতে প্রবৃত্তি হইল না। বাথরুম হইতে বাহির হইয়া আসিলেন—যাচিয়া তিনি আবার ও. সি. কুণ্ডুর সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন, উদ্দেশ্য, আলাপ করিয়া তাঁহাকে যদি একটু নরম করিতে পারেন—বলিলেন, "ও মশাই, আমি এক কাণ্ড করেছি। জলের কুঁজোটা ফেলে এসেছি। অমন ভাল কুঁজোটা চাকরব্যাটা গ্যাপ করবে নিশ্চয়। পরের স্টেশনে জল নিতে হবে তেষ্টা পেয়েছে খুব!"

"আমার কাছে জল আছে, ইচ্ছে করেন তো খেতে পারেন। তবে প্লেন জল নয়, ব্রাণ্ডিমেশানো। প্লেন জল আমি খাই না—"

"না, থাক। ব্রাণ্ডি খাওয়া আমার অভ্যাস নেই।"

"খেয়ে দেখতে পারেন, খারাপ লাগবে না, ঘুম হবে।"

"না, থাক—"

বিধুভূষণ একটা বার্থে নিজের বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িলেন। ও. সি. কুণ্ডুর দিকে

পিছন ফিরিয়া চোখ বুঁজিলেন। ঘুম কিন্তু আসিল না। নানা জটিল চিন্তা মনের মধ্যে ঘুরপাক খাইয়া জটিলতর হইতে লাগিল। একটা কথা বিশেষভাবে আকুল করিয়া তুলিল। নীহারবাবুর বাড়িতে কাবুলি-চপ্পল-পরা ষণ্ডাগোছের সেই ছোকরা যে খবরটি দিল তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে তো ভয়ানক কথা। কলিকাতায় পৌঁছিয়া যদি দেখেন বিশাখা, বরেন কেহ নাই তাহা হইলেই তো সর্বনাশ। ও. সি. কুণ্ডু তাহা হইলে যে কি কাণ্ড করিবে! সত্যই হুইসল্ বাজাইয়া হয়তো পুলিশ জড়ো করিয়া ফেলিবে! পাড়ার মাঝখানে তাহা হইলে যে কেলেঙ্কারি হইবে তাহা কল্পনা করিয়া তিনি অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। ঘুম আসিল না।

সহসা ও. সি. কুণ্ডু কথা কহিয়া উঠিলেন।

"ঘুমুলেন না কি?"

"না, ঘুম আসছে না।"

"আপনার কোলকাতার ঠিকানা কি?"

"কেন?"

"টুকে রাখতে চাই। ওটা গোড়াতেই জিজ্ঞেস করে টুকে রাখা উচিত ছিল আমার।"

বিধুভূষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

"বলুন।"

বলিতেই হইল। এ তো এক আচ্ছা মোগলের হাতে পড়িয়া গিয়াছেন! কত খানাই যে উহার সহিত খাইতে হইবে কে জানে!

ঠিকানাটা শুনিয়া ও. সি. কুণ্ডু উঠিয়া বসিলেন এবং পকেটবুক বাহির করিয়া তাহাতে সেটা টুকিয়া রাখিলেন। তাহার পর যে পুস্তকটি পাঠ করিতেছিলেন তাহাতেই পুনরায় মনোনিবেশ করিলেন। বিধুভূষণ ঈষৎ ব্যায়ত আননে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া রহিলেন তাহার দিকে। লক্ষ্য করিলেন, ও. সি. কুণ্ডু রঙীন চশমা খুলিয়া একটি মোটা-রিম-ওলা সাদা চশমা পরিধান করিয়াছেন। যে বইটা পড়িতেছেন তাহার মলাটের উপর বড় বড় ইংরেজী অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—আগাথা ক্রিস্টি। সাদা চশমা পরিয়া তাঁহাকে আরও ভয়ানক দেখাইতেছিল। তাঁহার চক্ষু দুইটি যে ঘোর লাল তাহা তিনি ইতিপূর্বেই দেখিয়াছিলেন কিন্তু অক্ষিতারকাযুগল যে ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছে, ইহা তিনি পূর্বে লক্ষ্য করেন নাই। ঠিকানা টুকিয়া লইয়া তিনি পুস্তকে মন দিয়াছিলেন।

হঠাৎ ফিরিয়া বলিলেন, "ঘুমুতে চান তো ব্রান্ডি খান একটু। খুব সুদিং।"

"খাইনি কখনও কিনা।"

"সেইজন্যই বলছি, খেলেই ঘুমিয়ে পড়বেন। প্রথম যারা খায়, তাদের ঘুম পায়। দেব?"

"না, থাক।"

ও. সি. কুণ্ডু ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পুনরায় পাঠে মন দিলেন। মনে হইল তাঁহার চোখের তারা দুইটি আরও খানিকটা যেন বাহির হইয়া পড়িল। চোখ দেখিয়া বিধুভূষণ আরও ঘাবড়াইয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল ইহার অনুরোধ বারংবার উপেক্ষা করাটা কি সুবুদ্ধির কাজ হইতেছে? ইহার কবলে যখন পড়া গিয়াছে তখন ইহাকে চটাইয়া তো কোন লাভ নাই। বরং ভিজাইবার চেষ্টা করা উচিত। ভিজাইবার জন্যই তিনি খাবার কিনিয়াছিলেন, কুঁজো-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ও সবে তো সুবিধা হইল

না। একটু ব্রাণ্ডি পান করিলে কিই বা এমন হইবে? মতির এরূপ গতি হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু বিধুভূষণ খানিকক্ষণ চক্ষু বুঁজিয়া পড়িয়া রহিলেন। ব্রান্ডি প্রত্যাখ্যান করিয়া আমার তাহা চাহিয়া লইতে কেমন যেন সঙ্কোচ হইতে লাগিল। কখনও এপাশ, কখনও ওপাশ করিতে লাগিলেন। দুই ভ্রূর মধ্যবর্তী স্থানে চিত্ত নিবিষ্ট করিবার প্রয়াস পাইলেন। চিত্ত কিন্তু কিছুতেই স্থির হয় না। সহসা লক্ষ্য করিলেন, তিনি বিশাখার কথাই চিন্তা করিতেছেন, যেন তাহার পায়ে ধরিয়া বলিতেছেন, আমাকে তুমি বাঁচাও। বিষ্ণুচরণের কথা একবার মনে হইল। লোকটা অতগুলো টাকা সত্যই গ্যাপ করিবে না কি। ফোনের কথাবার্তার শুরু তো মোটেই তাঁহার ভাল লাগে নাই। ট্রেনটা কি ভীষণবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, মনে হইতেছে যেন অট্টহাস্য করিতেছে। নাঃ, ঘুম কিছুতেই আসিবে না। বিধুভূষণ উঠিয়া বসিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "কুণ্ডু মশাই, দিন, আপনার ব্রান্ডিই দিন একটু। কিছুতেই ঘুম আসছে না।"

ও. সি. কুণ্ডু তড়িৎবেগে উঠিয়া নিজের বেতের বাক্সটি খুলিয়া ফেলিলেন এবং একটা ফ্লাস্ক হইতে পরিষ্কার একটি কাঁচের গ্লাসে খানিকটা বাদামী রঙের পানীয় ঢালিয়া ফেলিলেন।

"সিপ করে করে খান। একেবারে ঢক্ ঢক্ করে খাবেন না।"

"বেশ।"

ও. সি. কুণ্ডু বেশ যেন একটু উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রদীপ্ত দৃষ্টি মেলিয়া তিনি বিধুভূষণের মদ্যপান দেখিতে লাগিলেন, যেন একটা অদ্ভুত কিছু দেখিতেছেন।

"কেমন লাগছে—"

বিধুভূষণ মুখ বিকৃত করিয়া সিপ করিতেছিলেন। মনে হইতেছিল ঔষধ পান করিতেছেন। গলাটা জ্বলিতেছিল। কিন্তু ও. সি. কুণ্ডুর প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহার বদনে হাসি ফুটিল।

"চমৎকার লাগছে—"

"আর একটু দি তা হলে।"

বিধুভূষণ আপত্তি করিতে সাহস করিলেন না। আরও খানিকটা মদ লইয়া 'সিপ' করিতে লাগিলেন।

"কেমন লাগছে?"

"অতি চমৎকার।"

"আর একটু নিন তা হলে।"

"দিন।"

এইভাবে বিধুভূষণ প্রায় পুরা দুই পেগ ব্রান্ডি পান করিয়া ফেলিলেন।

"এইবার শুয়ে পড়ুন।"

বাধ্য বালকের মতো বিধুভূষণ শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার কান দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছিল, মাথার ভিতরটা ঝিম ঝিম করিতেছিল। ক্রমশঃ তাঁহার চৈতন্যও ঘোলাটে হইয়া আসিল। মিনিট দশেকের মধ্যে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। আনন ঈষৎ ব্যায়ত হইল, নাক ডাকিতে লাগিল।

হঠাৎ যখন তাঁহার ঘুম ভাঙিল, তিনি বুঝিতে পারিলেন না, কি ঘটিয়াছে। চতুর্দিকে যেন অন্ধকার সমুদ্র গর্জন করিতেছে। সহসা তিনি আবিষ্কার করিলেন ট্রেন চলিতেছে না।

"কুণ্ডুমশায়—মিস্টার কুণ্ডু—"

কোন সাড়া নাই। সহসা একটা টর্চের আলো অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিল। ট্রেনে কে একজন উঠল যেন। উঠিয়া বলিল, "আপনার লাগেনি তো কোথাও?"

বিধুভূষণ উঠিয়া বসিলেন।

"কে আপনি?"

"আমি পুলিশের লোক। আপনার কোথাও আঘাত লাগেনি তো?"

"না আঘাত লাগবে কেন?"

"তা হলে আপনি নাবুন।"

"কেন, কি হয়েছে?"

"ট্রেন ডিরেল্‌ড হয়েছে?"

"ডিরেল্‌ড?"

"হ্যাঁ, নেবে পড়ুন।"

"নেমে যাব কোথায় এই অন্ধকারে।"

"আপাতত আমাদের কাছেই থাকুন।"

"আপনাদের কাছে, মানে, থানায়?"

"থানা কোথা মশাই এখানে, চতুর্দিকে মাঠ।"

"এখানে আপনি এলেন কি করে?"

"পুলিশফোর্স সমস্ত লাইনটাকে ঘিরে ফেলেছে।"

"কেন—"

"এই গাড়ির পিছন দিকে বোমা পড়েছে একটা।"

"বোমা? সর্বনাশ। কুণ্ডুমশাই গেলেন কোথা।"

"কুণ্ডুমশাই কে?"

"আমার সঙ্গে ছিলেন এক ভদ্রলোক।"

"তিনি নেবে গেছেন বোধ হয়, আপনিও নাবুন।"

"আমার জিনিসপত্র?"

"সব ব্যবস্থা হবে। আপনি নাবুন তো আগে।"

কণ্ঠস্বরে ধমকের আভাস পাইয়া বিধুভূষণ নামিয়া পড়িলেন। বুকে হাত দিয়া একবার দেখিলেন 'ইনার পকেটে' মানিব্যাগটা ঠিক আছে কিনা। দেখিলেন, আছে। দেখিলেন, অসংখ্য লোক চতুর্দিকে কলরব করিতেছে। বহু টর্চের আলো জ্বলিতেছে চতুর্দিকে। অন্ধকার কিন্তু আলোকিত হইতেছে না। অসংখ্য আলোর বল্লম যেন একটা কালো জন্তুর গায়ে বিঁধিয়াছে, কিন্তু জন্তুটা নড়িতেছে না। ও. সি. কুণ্ডু কোথায় গেলেন? কাছেপিঠে তো কোথাও নাই। হঠাৎ একটা কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি আরাম অনুভব করিলেন। মনে পড়িল কোন এক জ্ঞানী ব্যক্তি না কি বলিয়াছিল, ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্য। তাঁহাকে ও. সি. কুণ্ডুর হাত হইতে বাঁচাইবার জন্যই ভগবান হয়তো ট্রেনখানা ডিরেল্‌ড করিয়া দিলেন। কে জানে!

পুলিশের লোকটি বলিলেন, আপনাকে চলুন একটু আলাদা বসিয়ে দিচ্ছি। আপনি ফার্স্টক্লাস প্যাসেঞ্জার, আপনি যাতে একটু আরামে থাকতে পারেন সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ওই গাছতলাটায় চলুন ওখানে ভিড় নেই।"

গাছটা একটু দূরে ছিল। কিছুদূর হাঁটিয়া তাহারই তলায় গিয়া বিধুভূষণ আশ্রয় লইলেন। একটু পরে তাঁহার জিনিসপত্রও আসিয়া পড়িল। বিধুভূষণ লক্ষ্য করিলেন, ও. সি. কুণ্ডুর বেতের বাক্সটিও তাঁহার জিনিসপত্রের সঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছে। বাক্সটির উপর ও. সি. কুণ্ডুর নাম, ঠিকানাও লেখা আছে দেখিলেন।

"ও বাক্সটা আমার নয়, কুণ্ডু মহাশয়ের।"

"থাক ওটা এখানে। তাঁর খোঁজ পেলে তাঁকেও এখানে নিয়ে আসব।"

"না মশাই, দয়া করে ও কাজটি করবেন না। অদ্ভুত লোক, সারারাত আমাকে জ্বালাতে জ্বালাতে এসেছে। ও বাক্স আপনারা নিয়ে যান, তাঁর দেখা পেলে দিয়ে দেবেন। আর দয়া করে বলবেন না আমি এখানে আছি। তা হলেই এসে হাজির হবে আর বকবক করবে।"

পুলিশ অফিসারটি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "বেশ। বাক্সটা নিয়ে যাই তা হলে। আপনি বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়ুন।" আমরা পাহারায় থাকব, কোন ভয় নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুন। সকাল নাগাদ সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের বড়সায়েবও এসে পড়বেন ততক্ষণ।"

বিধুভূষণের তন্দ্রা আসিয়াছিল। কিন্তু ভাঙিয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিলেন।

"বকু—বকু—ও বকু, কোথা গেলে তুমি—"

কে যেন কাহাকে চিৎকার করিয়া ডাকিতেছে। বকু নামটা শুনিয়া কিন্তু বিধুভূষণের সর্বাঙ্গে একটা শিহরন বহিয়া গেল। মনে হইল যেন তাঁহার মেরুদণ্ড বহিয়া তুষারশীতল জলধারা সর্পিলগতিতে নামিতেছে। জেলের সেই দৃশ্যটা চোখের পর ভাসিয়া উঠিল, বুকের গুলি-বিদ্ধ রক্তাক্ত শবদেহটা মুখ গুঁজড়াইয়া পড়িয়া আছে! সঙ্গে সঙ্গে একটা অসম্ভব কথাও তাঁহার মনে হইল। বকু বাঁচিয়া নাই তো! হয়তো জেলের ডাক্তারেরা অপারেশন করিয়া গুলি বাহির করিয়া দিয়াছে, তাহার শরীরে, অপরের রক্ত দিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহাকে বাঁচাইয়া দিয়াছে। আজকালকার দিনে কিছুই অসম্ভব নয়। সেদিন কাগজে এইরকম একটা সংবাদ তিনি পড়িতেছিলেন।

"বকু—বকু—বকু—ও বকু—এদিকে—এদিকে—"

অন্ধকারে অজানাকণ্ঠে কাতর চিৎকারটা ক্রমাগত যেন কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিধুভূষণের আতঙ্ক হইল। তাঁহাকেই খুঁজিতেছে না তো। একবার তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু এই অন্ধকারে কোথায় যাইবেন? পা দুইটা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

"বকু—বকু—বকু।"

বিধুভূষণ অবশেষে দুই কানে আঙুল ঢুকাইয়া বসিয়া পড়িলেন এবং নিস্পন্দ হইয়া বসিয়াই রহিলেন।

প্রথম শ্রেণীর বার্থে অঙ্গ প্রসারিত করিয়া নিমীলিতচক্ষু বিষ্ণুচরণ চিন্তা করিতেছিল বিশাখা মেয়েটি কেমন। তাহার জাগ্রত মানস কল্পনা-বেলুনে চড়িয়া যে-সব দেশে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল তাহা রূপকথার দেশ। সেখানে সে নিজেকে রাজপুত্র এবং বিশাখাকে ঘুমন্ত রাজকন্যা ভাবিয়া সোনার কাঠির সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অতি শৈশবে তাহার ঠাকুরমার মুখে যে আজগুবি রূপকথা সে শুনিয়াছিল তাহাই এখন তাহার নিগূঢ় চৈতন্যলোক হইতে উঠিয়া আসিয়া জাগ্রত মানসলোককে সুরঞ্জিত করিতে লাগিল। ট্রেনের

দোলানিতে জাগ্রত মানস কিন্তু বেশীক্ষণ জাগ্রত থাকিতে পারিল না, ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমের দেশের কল্পনা-বেলুন রূপান্তরিত হইল স্বপ্নে। বিশাখার পরিবর্তে শিবানী আসিয়া দেখা দিল।

শিবানী বলিল, "দেখ, আমি কেমন সুখে আছি। খোকন কত বড় হয়েছে দেখ। তুমিও যদি আমাদের সঙ্গে আসতে পারতে কেমন সুখে থাকতাম সবাই মিলে। অচেনা চেনা-শুনা লোক আছে এখানে।"

কিছুমাত্র বিস্মিত না হইয়া বিষ্ণুচরণ স্বপ্নলোকে অতি স্বাভাবিকভাবে শিবানীর সহিত আলাপ করিতে লাগিল। বলিল, "তা আর আসতে পারলাম কই। আমি ভীতু, তোমার মতো সাহসী নই। এখন কিন্তু কি করি বল তো—"

"জুবেদাকে যখন বিয়ে করেছ, তখন তাকে নিয়েই ঘরকন্না কর।"

"কিন্তু সে যে আমার কাছে থাকতে চায় না।"

"না থাকতে চায়, চলে যাক।"

"আমি তখন কি করব?"

"অপেক্ষা কর।"

"কিসের অপেক্ষা?"

"পারের খেয়ার। আমি যে তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছি।"

"আমি যদি আর একটা বিয়ে করি তাহলেও অপেক্ষা করে থাকবে?"

"নিশ্চয়। তবে আমার যদি পরামর্শ শোন, আর বিয়ে করতে যেও না। ওই চন্দ্রলেখা বা বিশাখাকে বিয়ে করে সুখী করতে পারবে না, শুধু ঝামেলা বাড়বে। তার চেয়ে বরং বাধ্য হয়ে যাকে বিয়ে করেছ, তাকে নিয়েই থাক। মেয়েটি খারাপ নয়। সে যদি বোঝে যে তুমি তাকে ভালবাস তা হলে তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে চাইবে কেন? ভালবাসায় পশুও বশ হয়।"

"সাধারণ পশুরা হয়, কিন্তু মানুষ আজব জানোয়ার। তুমি নিজেই কি করেছ ভেবে দেখ না!"

ট্রেনটা একটা স্টেশনে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল। প্রায় চার পাঁচ ঘণ্টা। লাইন ক্লিয়ার ছিল না। সামনে একটা ট্রেন নাকি লাইনচ্যুত হইয়া পথরোধ করিয়াছে।...শিবানীর স্বপ্ন মিলাইয়া গেল। বিষ্ণুচরণ পাশ ফিরাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। খানিকক্ষণ বেশ সুনিদ্রা হইল।

ট্রেন পুনরায় ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিষ্ণুচরণের সহযাত্রীটি জাগিয়াই ছিলেন। ট্রেন যেই চলিতে আরম্ভ করিল তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া রহিলেন।

ট্রেন যখন পাটনা স্টেশনে প্রবেশ করিল তখন গভীর রাত্রি। বিষ্ণুচরণ পুনরায় স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। জুবেদা যেন আসিয়াছে। বলিতেছে—আপনি বড় তাড়াতাড়ি চলে এলেন, আমারও ইচ্ছে ছিল আপনার সঙ্গে আসি। বিশাখার সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি, সম্ভব হলে এ বিপদে তাকে সাহায্য করতাম।

ঠিক এই মুহূর্তে তাহার সহযাত্রীটি ধাক্কা দিয়া জাগাইয়া দিলেন।

"উঠুন, উঠুন, এক ভদ্রলোক আপনাকে খুঁজছেন।"

"আমাকে?"

ধড়মড় করিয়া বিষ্ণুচরণ উঠিয়া বসিল।

"এটা কোন্ স্টেশন?"

"পাটনা।"

"এখানে কে আমাকে খুঁজছে?"

"এই যে, এই ভদ্রলোক।"

ভার্গব জানালা দিয়া মুখ গলাইয়া প্রশ্ন করিল, "আপনিই কি মিস্টার জমিরুদ্দিন, করাচী থেকে আসছেন?"

"হ্যাঁ।"

"নাবুন তা হলে। আপনার স্ত্রী করাচী থেকে চলে এসেছেন। আপনাকে নামিয়ে নেবার জন্য স্টেশনে এসেছেন তিনি। আপনি নেবে পড়ুন। জিনিসপত্তর কোন্‌গুলো? এই কুলি, ভিতর যাও।"

"আমার স্ত্রী? জুবেদা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কোথায়?"

"ওই যে।"

বিষ্ণুচরণ দেখিল কালো বোরখায় সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া সত্যই একটি নারীমূর্তি প্ল্যাটফর্মের একধারে দাঁড়াইয়া আছে।

"জুবেদা এখানে এলো কি করে—"

"প্লেনে এসেছেন; আপনাকে ধরবার জন্যে প্রত্যেকটি ট্রেনে নিজে এসে খোঁজ করছেন। আপনার কি একটা বিপদের খবর পেয়েই এসেছেন শুনছি। আপনি আর দেরি করবেন না, নেবে পড়ুন—"

গার্ডের হুইস্‌ল শোনা গেল। বিষ্ণুচরণ হুড়মুড় করিয়া নাবিয়া পড়িল। নাবা উচিত কিনা সে বিচার করিবার অবসর ছিল না। তাহার সহযাত্রীটিও নাবিল। বোরখাপরা নারীটি হস্তের ইঙ্গিতে বিষ্ণুচরণকে আহ্বান করিয়া ওভারব্রিজের দিকে অগ্রসর হইলেন। বিষ্ণুচরণ তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল।

বিষ্ণুচরণের সহযাত্রীটিকে আড়ালে ডাকিয়া ভার্গব নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "ঠিক লোক তো?"

"ঠিক লোক।"

"তুমি ফিরে যাচ্ছ দিল্লীতে?"

"হ্যাঁ। দিল্লী থেকে করাচী যাব।"

স্টেশনের বাহিরে একটি বেশ বড় মোটর দাঁড়াইয়াছিল। বোরখা-ধারিণী বিষ্ণুচরণকে লইয়া গিয়া তাহাতেই আরোহণ করিলেন। ভার্গব বসিল ড্রাইভারের পাশে।

"ব্যাপার কি"—নিম্নকণ্ঠে বিষ্ণুচরণ বোরখা-ধারিণীকে প্রশ্ন করিল।

"চলুন। বলছি সব"—অতি মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল বোরখা-ধারিণী। বিষ্ণুচরণের মনে হইল সঙ্গে লোক আছে বলিয়া জুবেদা বোধ হয় জোরে কথা কহিতে পারিতেছে না। ইহাই বোধ হয় মুসলমানী নিয়ম।

মোটর চলিতে আরম্ভ করিল। অচিরেই তাহার গতিবেগ বাড়িয়া চলিল।

উদ্যোগপর্ব

।। এক ।।

মিনিস্টারমহাশয়ের যে ট্রেনে শ্বশুরবাড়ি যাইবার কথা ছিল সত্যই সে ট্রেনে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। মিনিস্টারের জন্য নির্দিষ্ট সেলুনটি পিছনদিকে ছিল, তাহারই কয়েকটা কাঁচ ভাঙিয়া গিয়াছিল মাত্র। ট্রেনটি লাইনচ্যুতও হইয়াছিল। আর কিছু হয় নাই।

ভূপেশ মজুমদার কয়েকজন পুলিশ অফিসারসহ অবস্থান করিতেছিলেন ঠিক আগের জংশন স্টেশনটিতে। ফোনে খবর পাইয়া মোটর-ট্রলিযোগে তিনি যখন ঊর্ধ্বশ্বাসে আসিয়া অকুস্থলে পৌঁছিলেন তখন ভোর হইতেছে। বোমা-নিক্ষেপকারীকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলে বা তাহার সন্ধান-সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিলে কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁহার প্রতিপত্তি শতগুণ বাড়িয়া যাইবে এই দুরাশার বশবর্তী হইয়া তিনি সংবাদটি পাইবামাত্র ফোনে হুকুম দিয়াছিলেন যে, তিনি না পৌঁছানো পর্যন্ত যেন কাহাকেও স্থানত্যাগ করিতে না দেওয়া হয়। এমনিই স্থানত্যাগ করিবার উপায় ছিল না, কারণ লাইনচ্যুত ট্রেনকে লাইনস্থ করিতে বেশ বিলম্ব হইতেছিল।

প্রতি যাত্রীর নাম, ধাম, ঠিকানা ও টিকিট পরীক্ষা করিতে করিতে ভূপেশ মজুমদার অবশেষে বিধুভূষণের সমীপবর্ত হইলেন।

"আরে, একি বিধু—তুমি এখানে—"

"এই ট্রেনে কোলকাতা ফিরছিলাম ভাই। রাস্তার মাঝখানে কি বিপদ দেখ—"

"খুব বেঁচে গেছ। ট্রেনে বোমা পড়েছিল—"

"শুনেছি! এখন কি হচ্ছে?"

"ট্রেন ডিরেল্ড হয়ে গেছে। যে বোমা ফেলেছিল আমরা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—"

"ও।"

বিধুভূষণকে দেখিয়া ভূপেশের যুগপৎ কৈলাসের কথা এবং হোটেলে প্রাপ্ত চিঠিটির কথা মনে হইল। কিন্তু প্রকাশ্যে তিনি কিছুই বলিলেন না। কৈলাস তাঁহার সঙ্গে আসে নাই, কারণ একটি জরুরি টেলিগ্রাম পাইয়া তাহাকে কলিকাতা ফিরিতে হইয়াছিল। বিধুভূষণের পত্রটি কিন্তু তাঁহার মনি-ব্যাগে ছিল। কথাটা মনে হইতেই একটি সূক্ষ্ম স্মিতহাস্য তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। কোন কথা না বলিয়া কয়েক মুহূর্ত তিনি হাসিমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"যে বোমা ফেলেছিল তাকে ধরতে পেরেছ?"

"এখনও খোঁজাই শেষ হয়নি।"

"কতক্ষণ বসে থাকতে হবে এই গাছতলায়?"

"তা থাকতে হবে খানিকক্ষণ। লাইনই ঠিক হয়নি এখনও। তা তোমার এখানে বসবার দরকার কি, তুমি আমার ট্রলিতে গিয়ে বস। কিংবা আমাদের ঘরেও যেতে পার, ট্রেনের তো বিস্তর দেরি এখন। ওহে, শোন—"

একটি ছোকরা দারোগা আগাইয়া আসিল।

"একে আমাদের ঘরটায় নিয়ে গিয়ে বসাও। আমার বন্ধু একজন। চা-টা সব ব্যবস্থা করে দিও। বিধু, যাও তুমি এর সঙ্গে—"

"তোমার কাজ কতক্ষণে শেষ হবে?"

"ঘণ্টাখানেক অন্ততঃ লাগবে। বেশিও লাগতে পারে। তুমি বিছানা পেতে ঘুমোওগে না। আমি আসছি একটু পরেই—"

দারোগাটির সহিত বিধুভূষণ চলিয়া গেলেন। তাঁহার জিনিসপত্রও একজন কনস্টেবল বহন করিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিল। বিধুভূষণ গিয়া দেখিলেন, স্টেশনের খানিকটা অংশ পুলিশরা দখল করিয়া রহিয়াছে। পুলিশের জন্য নির্দিষ্ট ঘরটিতে দারোগাসাহেব বিধুভূষণকে বসাইয়া দিল। পুলিশ কনস্টেবলটি হোল্‌ডঅল্‌ খুলিয়া তাঁহার বিছানা পাতিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরেই চা এবং গরম গরম সিঙাড়া আসিল। দারোগাটি সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করিল—"আর আপনার কিছু দরকার হবে কি? কাগজওলাকে বলেছি একখানা কাগজ এখুনি আপনাকে দিয়ে যাবে।"

"না, আমার আর কিছু লাগবে না—"

"আমি যাব তা হলে? অনেক কাজ—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যান। আমার আর কিছু লাগবে না।"

দারোগা চলিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাগজ-ওলা একখানা বাংলা দৈনিক পত্রিকা লইয়া প্রবেশ করিল। বিধুভূষণ দাম দিতে চাহিলেন। সে বলিল, দারোগাবাবু দাম দিয়াছেন। বিধুভূষণ পূর্বেও অনেকবার অনুভব করিয়াছেন, পুনরায় অনুভব করিলেন পুলিশেরাই সর্বেসর্বা। পুলিশের নেক্‌নজরে থাকিলে আর কোন ভাবনা থাকে না। ভূপেশ মজুমদারের বন্ধু শুনিবামাত্র সকালেই তটস্থ হইয়া পড়িয়াছে। চা-সহযোগে সিঙ্গাড়া চর্বণ করিতে করিতে তাঁহার পূর্বজীবনের কথা মনে পড়িল। ওই ভূপেশের কি দুর্দশাই ছিল আগে। তিনি টাকা না দিলে পড়িতেই পারিত কি? সেই ভূপেশ আজ কি হইয়াছে! কেমন যেন একটু ঈর্ষা হইতে লাগিল। ঈর্ষার অনলে কিছুক্ষণ দগ্ধ হইলেন। তাহার পর খবরের কাগজটা উল্টাইতে লাগিলেন। মনোযোগ সহকারে বাজারদর অংশটি পড়িয়া ফেলিলেন। রাজনৈতিক বা বৈদেশিক সংবাদগুলি বাদ দিয়া 'চিঠিপত্র'গুলি পড়িলেন। হঠাৎ নজরে পড়িল এক পুলিশ গোয়েন্দা এক পলাতক খুনীকে নাকি বহুদিন পরে ধরিয়াছে। লোকটি তাহার ঘুমন্ত স্ত্রীকে হত্যা করিয়া পলাইয়াছিল। ও. সি. কুণ্ডুর কথা বিদ্যুৎঝলকের মতো তাঁহার মানস-গগনকে ঝলসাইয়া দিল। তিনি শঙ্কিতদৃষ্টি মেলিয়া একবার খোলা ঘরটার পানে চাহিলেন, তাহার পর উঠিয়া কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন। মনে হইল লোকটা আবার যদি তাঁহাকে ধরিয়া ফেলে, ভূপেশের কাছে সব কথা যদি প্রকাশ করিয়া দেয়! বন্ধদ্বারের দিকে বিস্ফারিতনেত্রে সভয়ে তিনি চাহিয়া রহিলেন কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর আপাদমস্তক চাদরমুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে যখন ভূপেশ মজুমদার ফিরিলেন তখনও বিধুভূষণ জাগিয়াই ছিলেন। ভূপেশের সাড়া পাইয়াও কিন্তু তিনি মুখের ঢাকা খুলিলেন না, নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া থাকাই নিরাপদ মনে করিলেন। ভূপেশের সঙ্গে আর দুই তিনটি লোক, সম্ভবতঃ দারোগা আসিয়াছিল। তাহাদের নিকট মুখ দেখাইতে বিধুভূষণের ভয় করিতে লাগিল। মনে হইল ইহাদের কাহারও সহিত ও. সি. কুণ্ডুর যদি যোগাযোগ থাকে! কিছুই অসম্ভব নয়। নিদ্রার ভান করাই তিনি সমীচীন মনে করিলেন।

কপালের ঘাম মুছিয়া ভূপেশ বলিলেন, "কটা লোককে অ্যারেস্ট করা হল? লিস্ট করেছ?"

কে একজন উত্তর দিল—"করেছি। সবসুদ্ধ জনদশেক হবে। তবে আমার মনে হচ্ছে এক রজত ছাড়া আর কারও বিরুদ্ধে কেস টিকবে না।"

রজত নামটা শুনিবামাত্র বিধুভূষণের কান খাড়া হইয়া উঠিল। তিনি উৎকর্ণ হইয়া রুদ্ধশ্বাসে ইহাদের কথাবার্তা শুনিতে লাগিলেন।

ভূপেশ বলিলেন, "রজতটা কে—"

"বাংলাদেশের লোক। বহুকালের ফেরারী আসামী। এককালে নাকি জমিদার ছিল। খুন, আর্সন, রেপ, ডাকাতি অনেকরকম চার্জ ওর নামে আছে। লোকটা অনেকদিন থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ভাগ্যে ফেরারী আসামীদের ফটো অ্যালবামটা সঙ্গে ছিল, তাই ওকে ধরতে পারলাম—"

"দেখি কেমন চেহারাটা—"

ভূপেশ অ্যালবামটা দেখিতে লাগিলেন।

"এই লোকটা অনেকদিন থেকে ফেরার। একে ধরেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"দ্যাট্ ইজ সামথিং। এখানে যিনি কনস্টেবলদের ইনচার্জ ছিলেন বিভীষণ পাণ্ডে, তিনি কিন্তু বলেছেন যে লোকটা বোমা ফেলেছে সে কনস্টেবল সেজেই এসেছিল।"

"কি করে বুঝলেন তিনি?"

"কাল সন্ধের সময় যতগুলো কনস্টেবল তাঁর কাছে রিপোর্ট করেছিল সবাইকে তিনি চিনতেন না। চেনা সম্ভব নয়। কারণ বাইরে থেকেও অনেক লোক পাঠিয়েছিলাম। তাদের মধ্যে বিশ্বামিত্র সিং বলে যে লোকটা নিজের পরিচয় দিয়েছিল তাকে আজ সকালবেলা থেকে দেখা যাচ্ছে না। গুনে দেখা যাচ্ছে একজন কম রয়েছে। সুতরাং অসম্ভব নয় যে সে কনস্টেবল সেজেই এসেছিল।"

"হতে পারে কিন্তু সে যখন বোমা ছুঁড়ল তখন অপর কেউ দেখতে পাবে না?"

"নাও পেতে পারে। কাল অমাবস্যা ছিল। তা ছাড়া ওরা পাশাপাশি ছিল না তো, একশ গজ দূরে দূরে ছিল। চল, রজত লোকটাকে দেখে আসি। কোথায় বসিয়েছ ওদের?"

"প্লাটফর্মেই আছে সব।"

"চল।"

সকলে বাহির হইয়া গেলেন। তারপর বিধুভূষণ অতি সন্তর্পণে মুখটা বাহির করিয়া চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলেন একবার। না, কেহ নাই। রজত? কোন্ রজত? জমিদার ছিল? খুন

করা, নারীধর্ষণ করা, লোকের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া এই সব ও করেছে? বিধুভূষণের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। ঠোঁট দুটি নড়িতে লাগিল, তিনি কাতরহৃদয়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, ভগবান রক্ষা কর। প্রার্থনা করিতে করিতে তাঁহার মনে এক বিচিত্র ভাবের উদয় হইল, শুধু তাই নয়, কৌতূহলও। তাহার সহিত ঈষৎ মমতা এবং কিঞ্চিৎ অনুকম্পাও হয়তো ছিল। রজত লোকটার প্রতি তাঁহার এতদিনের সঞ্চিত নিদারুণ বিতৃষ্ণায় সহসা যেন একটু কোমলতার সঞ্চার হইল। যাহা এতদিন জমাট কঠিন ছিল তাহা যেন গলিতে আরম্ভ করিল। অন্তরের অন্তস্তলে, মগ্ন চৈতন্যের নিগূঢ়লোকে যে যুক্তি এতদিন প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল তাহারা অকস্মাৎ যেন আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহাকে বলিল, লোকটা পাপিষ্ঠ সন্দেহ নাই, তোমার প্রতি নিদারুণ অবিচার করিয়াছে তাহাও সত্য, কিন্তু পৃথিবীতে ওই এখন তোমার একমাত্র আপন লোক, হয়তো উহার সহিত তোমার রক্তের সম্পর্কও আছে, হয়তো ও তোমার বাবা। আর একটা কথাও মনে রাখিও, তুমি যুধিষ্ঠির নও, তুমিও নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য নিজের স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছ, নিজের মানসম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য মিথ্যার জটিল জাল সৃষ্টি করিতে ইতস্তত কর নাই। টাকার মোহে একটা অসহায় নারীকে ছলে, বলে, কৌশলে ঘরে আটকাইয়া বিবাহ করিতে চাহিতেছ। তুমি এ কথা বেশ ভাল করিয়াই জান যে তুমি কুৎসিত, তুমি মূর্খ, তুমি জারজ, পাত্র হিসাবে কোন দিক দিয়াই তুমি লোভনীয় নও। কেবল অর্থের জোরে তুমি মেয়েটির ভবিষ্যৎ সুখশান্তি পদদলিত করিতে উদ্যত হইয়াছ। রজতের সঙ্গে তোমার তফাত কি?

বিধুভূষণের চিন্তাধারাকে বিঘ্নিত করিয়া ভূপেশ মজুমদার আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

"এই যে উঠেছ দেখছি। ঘুম কেমন হল?"

বিধুভূষণ মুখে একটা গদগদ ভাব ফুটাইবার চেষ্টা করিলেন।

"ভাগ্যে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ভাই। তা না হলে হাড়ির হাল হত আমার। অতগুলো সিঙ্গাড়া খেলাম কিন্তু এর মধ্যেই খিদে পেয়েছে।"

"মাংসের ঝোল, ভাত প্রায় রেডি হয়ে এসেছে। চান করতে চাও তো সে ব্যবস্থাও হতে পারে। চমৎকার ইঁদারা রয়েছে।"

"না থাক, চান আর করব না।"

"আমিও করব না। কি দবকার কাপড়চোপড় ভিজিয়ে। বাড়ি ফিরে না হয় করা যাবে। তোমার গাড়িও ঘন্টাখানেকের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। তুমি কলকাতা ফিরছ তো—"

"তুমি?"

"আমাকে এখন দিল্লী যেতে হবে। হ্যাঁ, আসল কথাটাই তো তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। তোমার কথায় সেই বরেন ছোকরাকে ছেড়ে দিয়ে মহা মুশকিলে পড়েছিলাম। যতটা খবর পাওয়া গেছে তাতে মনে হচ্ছে ও সত্যিই ডেন্‌জারাস ক্যারেকটার। ও তোমার ওখানে নেই, একটা খুন করে সরেছে। মহাবিপদে পড়েছিলাম আমি, চাকরি নিয়ে টানাটানি হবার যোগাড় হয়েছিল, অনেক কষ্টে টালটা সামলেছি। তোমাকে দিল্লীতে ধরতে না পেরে তো আমার চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল।"

"কেন—"

"আমি তোমার মুখের কথায় ওকে ছেড়ে দিয়েছিলাম তো। তুমি যে ওর জন্যে জামিন

রইলে এ কথা তো তোমার কাছ থেকে লিখিয়ে নিইনি। তারপর ওর যখন স্বরূপ বেরুল, আমার ওপরওলা আমাকে চেপে ধরলে, তুমি ওকে ধরে ছেড়ে দিয়েছ কেন, নিশ্চয় ওর সঙ্গে তোমার ষড় আছে বা নিশ্চয় তুমি ঘুষ খেয়েছ।"

"ও বাবা, খুব প্যাঁচে পড়েছিলে বল।"

"সঙ্গীন। কোনক্রমে বেঁচে গেছি।"

"বরেন তা হলে পালিয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"বিশাখার কোন খবর জান?"

"না।"

তাহার পর ভূপেশ হাসিয়া বলিলেন—"একটা গোপন খবর কিন্তু জানি, মানে জেনে ফেলেছি।"

"কি খবর?"

"পরে বলব এখন।"

ঠিক এইসময় আরদালিগোছের একটি লোক প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল খাবার দেওয়া হইয়াছে।

"চল, খেয়ে নেওয়া যাক—"

বিধুভূষণও ভূপেশ মজুমদারের পিছু-পিছু বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার একটু ভয়-ভয়ও করিতেছিল, যদি প্ল্যাটফর্মে হঠাৎ ও. সি. কুণ্ডুর সহিত দেখা হইয়া যায়! ক্ষুধা তাঁহার মোটেই পায় নাই। ভূপেশ মজুমদারকে অনর্থক কেন যে তিনি মিছা-কথাটা বলিতে গেলেন!

কিছুদূর গিয়া চোখে পড়িল পুলিশ-বেষ্টিত হইয়া একস্থানে কতকগুলি লোক বসিয়া আছে। প্রত্যেকেরই কোমরে দড়িবাঁধা। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি রজত? লক্ষ্য করিতে করিতে হঠাৎ তিনি চিনিতে পারিলেন। যদিও বহুদিন পূর্বে দেখিয়াছিলেন, চেহারাটা খুব স্পষ্ট মনে ছিল না। রজতবাবুর অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়াছে। পোশাক-পরিচ্ছদে দারিদ্র্যের চিহ্ন, গাল দুইটি অস্বাভাবিকরকম লাল, নাকটা ফোলা। ভুরুর চুল নাই। কান দুইটাও কেমন যেন! চক্ষু দুইটি চাহিয়া আছে বটে, কিন্তু মনে হয় দৃষ্টি নাই। বিধুভূষণ 'থ' হইয়া গেলেন। এই সেই প্রবল-প্রতাপান্বিত রজত চৌধুরী যিনি টাকার জোরে দিনকে রাত করিতে পারিতেন, হাতে মাথা কাটিতেন, সত্যকে মিথ্যায় এবং মিথ্যাকে সত্যে রূপান্তরিত করিতে পারিতেন? এই দশা হইয়াছে তাঁহার? বিধুভূষণ সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার এতকালের পুঞ্জীভূত ক্রোধ কোথায় মিলাইয়া গেল। তাঁহার বরং মনে হইল—"আহা, একটা হাতি খাদে পড়ে গেছে!"

"তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে পড়লে কেন—"

"এই যে যাচ্ছি। এরাই বুঝি ধরা পড়েছে।"

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ভূপেশ কণ্ঠস্বর নামাইয়া মন্তব্য করিল, "ধরেছি বটে আমরা, তবে ওদের কারো বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ করা শক্ত হবে। তবে ওই রজতটা অনেকদিনের ফেরারী আসামী, ওই ব্যাটারই সাজা হবে। চোখে ভাল দেখতে পায় না, তাই ধরতে পেরেছে ওকে, ভয়ঙ্কর শয়তান ব্যাটা!"

বিধুভূষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

ভূপেশ মজুমদারের জন্য আহারের বেশ সুবন্দোবস্তই হইয়াছিল। আরও জনকয়েক পদস্থ পুলিশ অফিসারও আহারে ব্যাপৃত ছিলেন। বিধুভূষণকে লইয়া ভূপেশ প্রবেশ করিয়া ইংরেজীতে বলিলেন, "আমার ইনি বিশিষ্ট বন্ধু একজন। এই হাঙ্গামায় এখানে আটকে পড়েছেন, একে টেনে নিয়ে এলাম খাবার জন্যে—"

সকলেই স্মিতমুখে বিধুভূষণকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইলেন।

খাইতে খাইতে ট্রেনের ঘণ্টা পড়িল।

"তোমার ট্রেন ছাড়ছে বোধ হয়। কোলকাতা যাবে নাকি? যদি যাও তো বল, ট্রেনটাকে ডিটেন করি একটু।"

"থাক, পরে যাব এখন। তোমার সঙ্গে দিল্লীই ফিরে যাই। তারপর একসঙ্গে কোলকাতা ফেরা যাবে—"

"বেশ—"

একাধিক কারণে বিধুভূষণ ভূপেশ মজুমদারের সঙ্গত্যাগ করা সমীচীন মনে করিলেন না।

ভূপেশ বলিলেন, "আমার কিন্তু দিল্লী ফিরতেও দেরি হবে একটু। এখানকার কাজ না মিটিয়ে তো ফিরতে পারব না। সমস্ত লাইনটাও ইনস্‌পেকশন করতে হবে। তোমার কাজের কোন ক্ষতি হবে না তো—"

"না।"

"বেশ তবে চল—"

।। দুই ।।

বিশাখাকে লইয়া হাওড়া ক্যাম্পে বেশীক্ষণ থাকা যে নিরাপদ নহে একথা বরেন, শিবাজী দুইজনেই বুঝিয়াছিলেন। পুলিশের লোক যখন খুন হইয়া গিয়াছে, তখন খুনীকে বাহির করিবার জন্য পুলিশ চেষ্টার ত্রুটি করিবে না। চিরুনি দিয়া আঁচড়াইয়া লোকে যেমন মাথার ময়লা বাহির করে, ইহারাও তেমনিভাবে কলিকাতা এবং কলিকাতার পার্শ্ববর্তী স্থানগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া খুনীকে বাহির করিবার চেষ্টা করিবে। সুতরাং হাওড়ায় থাকা নিরাপদ নহে। এই উপদেশটি শিবাজী বরেনকে দিল। বলিল—"এখানে তোমরা বেশীক্ষণ থেকো না। ভোরের আগেই বেরিয়ে পোড়ো। আমি এখনই যাচ্ছি, কারণ আমাকে যেমন করে হোক কাল পাটনায় পৌঁছতেই হবে। নবেন্দু বিশ্বাসের কিছু খবর এখানে পেয়েছি, ভদ্রলোক মারাই গেছেন সম্ভবতঃ, ঠিক খবরটা পাব পাটনায়। কাল বিকেল নাগাদ সেখানে লোক এসে পৌঁছবে। তা ছাড়া আর একটা জরুরি ব্যাপার আছে এদেরই সম্পর্কে। আমাকে কাল আমাদের উকীল জয়সওয়ালের সঙ্গে দেখা করতে হবে একটা ডকুমেন্ট করবার জন্যে। সেজন্য কাল বিকেল নাগাদ আমাকে পাটনা পৌঁছতেই হবে। তোমাদেরও আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু তাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে বলে নিচ্ছি না। পুলিশ তোমাকেও দেখেছে, বিশাখাকেও দেখেছে। তারা নিশ্চয়ই খবরও দিয়েছে চারিদিকে। হঠাৎ কোথাও যদি কেউ তোমাদের চিনে ফেলে আমিসুদ্ধ আটকে পড়ব। তার চেয়ে তোমরা ভোরের দিকে এখান থেকে বেরিয়ে পোড়ো। আলাদা আলাদা যাবে। আমরা পাটনা ক্যাম্পে বেশীক্ষণ থাকব না। কাজ শেষ করেই চম্পট দেবে

সেখানে থেকে। নবেন্দু বিশ্বাসের আরও খবর যদি পাই—আশা করি পাব—তা হলে সে খবরটা রেখে যাব সেখানে। কাংড়া বা ছক্কন তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবে সেখানে। তার কাছেই চিঠি থাকবে। সে তোমাদের জন্যে সাতদিন অপেক্ষা করবে। সাতদিনের মধ্যে তোমরা যদি পাটনা ক্যাম্পে না গিয়ে পৌঁছও তা হলে বুঝব তোমাদের কোন বিপদ ঘটেছে।"

"পাটনা থেকে ফিরবে কোথায় তোমরা—"

"হাওড়ায় কিংবা গ্র্যান্ড হোটেলে! গোপীনাথও সেইখানেই ফিরে যাবে, মণিকাকে নিয়ে আমিও সেইখানেই ফিরব।"

শিবাজীর দূরদৃষ্টিতে বরেন মুগ্ধ হইল।

বলিল, "বেশ—"

শিবাজী মোটরে স্টার্ট দিল।

বরেন ঘরে ফিরিয়া দেখিল বিশাখা তখনও জাগিয়া আছে।

"ঘুমোননি এখনও?"

"ঘুম আসছে না।"

"কেন ভয় করছে?"

"করছে বই কি একটু-একটু।"

বরেনের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

"হাসছেন যে।"

"যুধিষ্ঠিরের সেই কথাটা মনে পড়ছে। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্। মৃত্যুভয়টা মানুষ কিছুতেই জয় করতে পারে না, সকলকে যে একদিন মরতেই হবে এ কথা ভুলে থাকতে চায় সবাই।"

"মরতে আমার ভয় নেই। সম্প্রতি চোখের উপর এত মৃত্যু দেখেছি যে মৃত্যুভয়টা তত নেই। ভয় অসম্মানকে। ভয় হয় কলঙ্কের পাঁক সর্বাঙ্গে মেখে যদি বেঁচে থাকতে হয়। বাঘ, সিংহের মুখে পড়ে প্রাণ দেওয়া সহজ, কিন্তু একটা আরশোলা বা টিকটিকি গায়ে উঠে যদি সড়সড় করে ঘুরে বেড়ায় তা অসহ্য।"

বরেনের মুখে আবার হাসি ফুটিল।

"আমার কাছে যতক্ষণ আছেন, নির্ভয়ে থাকতে পারেন। পুলিশের দু-একটা গুলি হয়তো ছিটকে আপনার লাগলেও লাগতে পারে, কিন্তু টিকটিকি আরশোলাকে আপনার অঙ্গ স্পর্শ করতে দেব না। আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ অন্ততঃ দেব না—"

"আপনারা যে কাণ্ড করে বেড়াচ্ছেন তাতে আপনিই বা কতক্ষণ বাঁচবেন তার ঠিক কি!"

"কিচ্ছু ঠিক নেই। আমার অবর্তমানেও যাতে আপনি আত্মসম্মান রক্ষা করতে পারেন সে ব্যবস্থাও করে দিতে পারি।"

পকেট হইতে একটি রিভলভার বাহির করিয়া বরেন বলিল, "এইটে রেখে দিন আপনার কাছে। টিকটিকি, আরশোলাকে যদি মারতে নাও পারেন, নিজের মুখের ভিতর নলটা ঢুকিয়ে ট্রিগারটা টেনে দেবেন যদি বেগতিক বোঝেন। আত্মসম্মান রক্ষা করবার ইচ্ছে থাকলে কেউ তা কেড়ে নিতে পারে না।"

বিশাখা রিভলভারটি লইয়া সবিস্ময়ে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল।

"ট্রিগার কোন্‌টা—"

"এইটে। লোডেড্ আছে, দেখবেন—"

"আমাকে দিচ্ছেন, আপনার দরকারের সময় কোথায় পাবেন?"

"আমার কাছে আর একটা।"

বিশাখা হাসিয়া বলিল, "তা হলে থাক এটা আমার কাছে। কিন্তু মরবার ইচ্ছে আমার নেই।"

"মরবার ইচ্ছে কারই বা থাকে বলুন। কিন্তু দরকার হলে মরতে হয়।"

"তা হয়।"

বিশাখা স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

বরেন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "দু-একটা ব্যক্তিগত কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি কি? আমাদের ভবিষ্যৎ কর্তব্য ঠিক করবার জন্য কথাগুলো জানা দরকার।"

"কি কথা?"

"আপনার নিজের লোক কে কে আছেন, তাদের ঠিকানাই বা কি। আপনার মা তো মারা গেছেন বললেন, বাবাও নিরুদ্দিষ্ট। আর কে আছেন আপনার—"

"বাবার খোঁজ যদি না পাওয়া যায় তা হলে আমার রক্ত-সম্পর্কের আপন লোক আর কেউ থাকবে না।"

"কোথায় কার আশ্রয়ে তা হলে পৌঁছে দেবো আপনাকে? বিধুবাবুর কাছে ফিরে যাবেন না নিশ্চয়।"

"না।"

"সেখানে ফেরা নিরাপদও নয়। বিধুবাবুর ভাবগতিক সন্দেহজনক, তা ছাড়া সেখানে গেলে পুলিশ ধরবে হয়তো আপনাকে।"

"না, সেখানে যাব না।"

"তবে?"

বিশাখা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

তাহার পর বলিল, "বাবা তাঁর এক বন্ধুর ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক করেছিলেন। বাবা যদি আসেন সেখানেই আমার বিয়ে হবে, আর যদি না ফেরেন তা হলে ভদ্রলোককে চিঠি লিখব, যদি আমাকে বিয়ে করতে চান, বিয়ে করে নতুন সংসার পাতব আবার। আর যদি না করেন, চাকরিবাকরি জুটিয়ে নেব একটা।"

"কোথায় তা হলে পৌঁছে দেব আপনাকে আমরা?"

"দিল্লী স্টেশনে পৌঁছে দিলেই আমি চলে যেতে পারব। বাবার কি কোন খবর পেয়েছেন আপনারা?"

মৃত্যু-সংবাদটা দিতে বরেনের ইচ্ছা হইল না।

"না, ঠিক খবর পাইনি এখনও। তবে লোক লেগে আছে, ঠিক খবর শীগগিরই পাব। আপনার ভালর জন্য যা যা করবার তা আমরা করব, এই আমাদের ব্রত, আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। এখন শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করুন একটু। খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতেই আমরা বেরুব।"

"কোথায় যাব আমরা—"

"দিল্লীর দিকেই। পথে কোথাও ট্রেনে উঠিয়ে দেব আপনাকে। পাটনায় কিংবা গয়ায়।"

"ক'টার সময় বেরুব আমরা—"

"দুটো আড়াইটের সময়। তিনটের আগেই।"

"মোটরে যাবেন?"

"হ্যাঁ। আলাদা আলাদা মোটরে যাব আমরা। আপনি ট্যাক্সিতে যাবেন। আপনাকে যদি কেউ ধরে ফেলে রাস্তায়, আপনি ঘাবড়ে যাবেন না। বলবেন পাটনা যাচ্ছি, সেখান থেকে দিল্লী যাব। ঠিকানা চাইলে আপনার সত্যিকার ঠিকানা দিয়ে দেবেন। আমাদের সঙ্গে যে আপনার কোন সংস্রব আছে তা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করবেন না।"

"না, তা করব না।"

"আপনি তা হলে গড়িয়ে নিন একটু। রিভলভারটা সাবধানে রাখবেন। বালিশের নীচে রাখুন এখন, যাবার সময় পেট-কাপড়ে গুঁজে নেবেন। শুয়ে পড়ুন—"

"ঘুম হবে কি?"

"চেষ্টা করুন।"

বরেন কপাটটি ভেজাইয়া দিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। আর একটি রিভলভার বাহির করিয়া সেটিতে টোটা পুরিল। তাহার পর একটা পরচুলা ও গোঁফ পরিয়া বাহিরে বারান্দায় গিয়া অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

।। তিন ।।

মোটর-বাহিত হইয়া প্রায় একঘণ্টা পরে বিষ্ণুচরণ ওরফে জমিরুদ্দিন যে স্থানে নীত হইল তাহা শহর হইতে অনেক দূরে। মনে হইল যেন একটা পল্লীগ্রাম। চতুর্দিকে বড় বড় গাছ রহিয়াছে। বিষ্ণুচরণ একটু ভীত হইয়া পড়িল।

"নাবুন—"

মোটর থামিতেই বোরখাধারিণী নামিয়া পড়িলেন। সমস্ত পথ তিনি একটিও কথা বলেন নাই। বিষ্ণুচরণ দুই একটা প্রশ্ন করিয়াছিল কিন্তু তিনি কোন উত্তর দেন নাই। ব্যাপারটা তাঁহার কেমন যেন গোলমেলে মনে হইতেছিল। জুবেদা কথা কহিতেছে না কেন!

"নাবুন। আমরা এসে গেছি—"

বিষ্ণুচরণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল চারিদিকে বড় বড় গাছ। শুধু তাই নয়, একটা এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়া বহিতেছে, গাছের শাখা-প্রশাখা সবেগে দুলিতেছে, অদ্ভুত শব্দ হইতেছে একটা। মনে হইতেছে গাছগুলোই যেন অট্টহাস্য করিতে করিতে এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে।

"নাবুন।"

"কোথায় এসেছি আমরা?"

"নাবলেই দেখতে পাবেন।"

নাবিতে হইল।

"চলুন এবার—"

"আমার জিনিসগুলো?"

"সব ঠিক আছে, চলুন আপনি।"

ভার্গবের হাতের টর্চটা জ্বলিয়া উঠিল।

"আসুন।"

যন্ত্রচালিতবৎ বিষ্ণুচরণ তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল।

বোরখাধারিণী ভার্গবের আগে আগে চলিয়াছিলেন। বিষ্ণুচরণ ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল একজন লোক তাঁহার জিনিসপত্রগুলিও বহন করিয়া আনিতেছে।

কিছুদূর যাইবার পর একটি ছোট বাড়ি দেখা গেল। বাড়িটির সামনে একটি ধূলি-ধূসরিত মোটরকার দাঁড়াইয়া আছে, বাড়ির জানলা দিয়া আলো দেখা যাইতেছে।

বাড়ির সমীপবর্তী হইয়া ভার্গব হাঁক দিল, "উকিলসাহেব জেগে আছেন না কি?"

"আছি বই কি। এস!"

দাড়ি-ওলা চশমাপরা এক ব্যক্তি ঢিলা-পাজামার রশি বাঁধিতে বাঁধিতে বাহির হইয়া আসিলেন।

"মক্কেল নিয়ে এলেন না কি?"

"এলাম।"

বোরখাধারিণী সিঁড়ি দিয়া গটগট করিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। বিষ্ণুচরণের দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইলেন না পর্যন্ত!

"ভিতরে আসুন।"

ভার্গবের পরুষ কণ্ঠস্বরে বিষ্ণুচরণ চমকাইয়া উঠিল। দেখিল ভার্গব একটি ঘরের উন্মুক্ত দ্বারের দিকে তর্জনী প্রসারিত করিয়া আছে। বিষ্ণুচরণের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল।

"দাঁড়িয়ে ভাবছেন কি, আসুন—"

বিষ্ণুচরণকে সেই উন্মুক্ত দ্বার দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে হইল, প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভার্গব ভিতর হইতে কপাটের খিল বেশ করিয়া আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

একটা শুষ্ক হাসি হাসিয়া বিষ্ণুচরণ প্রশ্ন করিল, "ব্যাপারটা কি বলুন তো?"

"খুব সঙ্গীন। ওই চেয়ারে বসুন। এখনই জানতে পারবেন।"

বিষ্ণুচরণ তবুও দাঁড়াইয়া রহিল।

"বসুন। দাঁড়িয়ে আছেন কেন?"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"এখুনি পারবেন। বসুন। উকিলসাহেব ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিন ওঁকে। বসুন আপনি—"

ভার্গব তাঁহাকে প্রায় জোর করিয়া চেয়ারটায় বসাইয়া দিল। উকিলসাহেব তখন গলাখাঁকারি দিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আপনার নামই তো আগে বিষ্ণুচরণ ছিল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কোলকাতায় বেলেঘাটা অঞ্চলে কি তিনখানি বাড়ি ছিল আপনার?"

"ছিল।"

"এই বাড়ি তিনখানির বিনিময়ে কি আপনি পূর্ববঙ্গের কোনও নবেন্দু বিশ্বাসের বিষয় কিনেছিলেন?"

"কিনেছিলাম।"

"সে বাড়ি তিনখানি কি নবেন্দু বিশ্বাসকে দেওয়া হয়েছে?"

"না, হয়নি। খবর পেয়েছি নবেন্দু বিশ্বাস মারা গেছেন।"

"ঠিক খবর পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর কোন উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারিণী আছেন কিনা সেটা খোঁজ করেছিলেন?"

বিষ্ণুচরণ গুম হইয়া গেল। ভাবিতে লাগিল সত্যকথাটা বলা উচিত কিনা।

"বলুন, খোঁজ করেছিলেন?"

"করেছিলাম, কিন্তু খবর পেয়েছি কোনও উত্তরাধিকারী নেই।"

পাশের দেওয়ালে একটা কালো পরদা ঝুলিতেছিল। সেই পরদার পিছন হইতে নারীকণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইল।

"মিথ্যা কথা। আমি নিজে তোমাকে বিশাখার কথা বলেছি,—তার চিঠিও দেখেছ তুমি।"

উকিলসাহেব মৃদু হাসিয়া আনতনয়নে দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ কাহারও মুখ দিয়া কোন বাক্য নির্গত হইল না।

তাহার পর উকিলসাহেবই কথা কহিলেন।

বলিলেন, "সেই বিশাখা দেবীর নামেই ওই বাড়ি তিনটে আপনাকে আজ এক্ষুনি লিখে দিতে হবে। আমি সব তৈরি করে রেখেছি। আপনাকে কেবল সইটি করতে হবে।"

উকিলসাহেব একটি দলিল বাহির করিয়া দেখাইলেন। বিষ্ণুচরণ নির্নিমেষদৃষ্টিতে দলিলটির দিকে চাহিয়া রহিল। পড়িয়া দেখিল—একটি 'উইল'। মহম্মদ জমিরুদ্দিন ওরফে বিষ্ণুচরণ দাস পাঞ্জাব রিফিউজি স্বর্গত নবেন্দুমোহন বিশ্বাসের কন্যা শ্রীমতী বিশাখাকে এই বাড়ি তিনটি 'উইল' করিয়া দিয়া যাইতেছে। এ কথাও লেখা আছে যে ইহার পরিবর্তে সে উক্ত নবেন্দুমোহন বিশ্বাসের পূর্ববঙ্গস্থ বিষয়সম্পত্তি পাইয়াছে। বিষ্ণুচরণ স্তম্ভিত হইয়া কাগজখানার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। ক্রমশঃ তাহার মুখে একটা কুটিল ক্রূর হাসি ফুটিয়া উঠিল।

"সই যদি না করি—"

উকিলসাহেব কিছু না বলিয়া মৃদু হাসিলেন শুধু।

ভার্গব এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, একটি মোড়া টানিয়া সে বসিয়া পড়িল। বিষ্ণুচরণ সভয়ে দেখিল তাহার স্তিমিতনয়নের দৃষ্টিতে ধিকিধিকি করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। সেই অগ্নিময় দৃষ্টি বিষ্ণুচরণের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া ভার্গব বলিল, "যতক্ষণ না সই করছেন ততক্ষণ আপনাকে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। শুধু তাই নয়, নানারকমে আপনাকে নির্যাতন করব আমরা।"

বিষ্ণুচরণের অন্তরটা সহসা জমাট হইয়া গেল। কিছুক্ষণ তাহার মুখ দিয়া কোনও কথাই বাহির হইল না। তাহার মুখে মুখোশের যে হাসিটা শত দুঃখেও নিবিত না, সে হাসিটাও যেন নিবিয়া গেল।

।। চার ।।

"সই করুন।"

স্থির কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে ভার্গব পুনরায় আদেশ করিল।

বিষ্ণুচরণ ঢোক গিলিয়া বলিল, "এইজন্যেই আমাকে ভুলিয়ে আপনারা এখানে এনেছেন?"

"হ্যাঁ, এইজন্যেই।"

"আপনারা কে?"

"তা জানবার দরকার নেই আপনার। সই করুন। একটি কথা শুধু বলতে পারি আমরা আপনার নাড়ীনক্ষত্র সব জানি। পাকিস্তানে, কোলকাতায়, করাচীতে আপনি যা যা করেছেন তা আমাদের অজানা নেই। সই যদি না করেন ভয়ঙ্কর কষ্ট পাবেন।"

"জুবেদার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই একবার।"

"যিনি বোরখা পরে আমাদের সঙ্গে এলেন তিনি জুবেদা নন। তিনি আমাদের সহকর্মিণী একজন। আপনাকে ভুলিয়ে আনবার জন্যে স্টেশনে গিয়েছিলেন। জুবেদা বেগম করাচীতেই আছেন। তবে তিনিও আমাদের পক্ষে। তাঁর কাছ থেকেই আমরা আপনার সম্বন্ধে অনেক খবর সংগ্রহ করেছি।"

উকিলসাহেব হাসিমুখে দাড়ি চুমরাইতেছিলেন, ভার্গবের কথা শেষ হইলে আর একটু হাসিয়া বলিলেন, "সই যখন করতেই হবে, দেরি করছেন কেন?"

বিষ্ণুচরণ বলিল, "কিন্তু এমনভাবে জোর করে সই করিয়ে নিলে কি এ দলিলের দাবি আদালতে টিকবে! শুনেছি রেজেস্টারী না করলে।"

সহসা ভার্গব প্যান্টের পকেট হইতে একটি রিভলভার বাহির করিল। রিভলভারটি দক্ষিণ-মুষ্টি বদ্ধ করিয়া বলিল, "দাবি টিকবে কিনা সে চিন্তা করব আমরা। আপনাকে যা বলছি করুন। সই করুন। এই বাড়ি তিনটি নবেন্দু বিশ্বাসকে বা তার ওয়ারিশকে দেবেন এই প্রতিশ্রুতি আপনি পাকিস্তান গভর্নমেন্টকে দিয়েছেন। আপনার স্ত্রী জুবেদা সে কথা জানেন। সুতরাং দাবি যে টিকবে তাতে আমাদের সন্দেহ নেই। সই করুন আপনি—"

"সই করলেই মুক্তি দেবেন আমাকে?"

"দেব।"

"এক্ষুনি?"

"এক্ষুনি।"

বিষ্ণুচরণ দলিলটি পড়িয়া দেখিল।

"এটা কি উইল?"

"হ্যাঁ, উইলই।"

"এ দুটো কার সই—"

"দুজন সাক্ষীর। একজন উকিল, আর একজন ডাক্তার।"

"কিন্তু তাঁদের সামনে আমার সই করা উচিৎ।"

"তারা বিশ্বাস করেছেন যে আমরা ঠিক লোককে দিয়েই সই করিয়ে নেব। আপনি ও সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন বৃথা। যা বলছি তাই করুন।"

বিষ্ণুচরণ তথাপি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

"চুপ করে আছেন কেন। করে ফেলুন সইটা। নিন।"

উকিলসাহেব কলম আগাইয়া দিলেন।

"একটু ভাববার সময় দিন আমাকে।"

"ভাববার তো কিছু নেই এতে। বাড়ি যাঁর ন্যায্য প্রাপ্য তাঁকেই দিচ্ছেন আপনি।"

"তিনি কোথা—"

"আসবেন একটু পরে।"

"বেশ, তিনি এলেই সই করবো।"

উকিলসাহেব হাসিমুখে দাড়ি চুমরাইতে লাগিলেন। তাহার পর ভার্গবের দিকে চাহিলেন। তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে কিসের যেন একটা ইশারা চকমক করিয়া উঠিল। ভার্গব সঙ্গে সঙ্গে পকেটে হাত পুরিয়া রবারের দস্তানা বাহির করিয়া পরিয়া ফেলিল এবং নিমেষের মধ্যে দুই হাত দিয়া বিষ্ণুচরণের গলা টিপিয়া ধরিল। জাঁতি-কলে পড়িয়া ইঁদুর যেমন ছটফট করে বিষ্ণুচরণ তেমনি ছটফট করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল তাহার চক্ষু দুইটি এখনই বুঝি ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া পড়িবে। উকিলসাহেব চক্ষু দিয়া আর একবার ইঙ্গিত করিলেন; ভার্গব বিষ্ণুচরণকে ছাড়িয়া দিল।

"কেন কষ্টভোগ করছেন, সই করে ফেলুন।"

বিষ্ণুচরণ হাঁপাইতে বলিল, "একি অন্যায় অত্যাচার—"

"অন্যায় আপনিই করেছেন, আমরা তার প্রতিকারের চেষ্টা করছি। স্থিরমস্তিষ্কে ভেবে দেখুন কথাটা—"

উকিলসাহেব দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে হাসিমুখে তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। বিষ্ণুচরণ গুম হইয়া বসিয়া রহিল; আড়চোখে চাহিয়া দেখিল ভার্গব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নীরবে রিভলভারে টোটার পর টোটা পুরিতেছে।

উকিলসাহেব পুনরায় হাসিমুখে বলিলেন, "বৃথা সময় নষ্ট করছেন কেন? সই যখন করতেই হবে, করে ফেলুন—"

"আচ্ছা, একটা কথা বলুন আমাকে। জুবেদা কি ষড়যন্ত্র করে আমাকে এই বিপদে ফেলেছে?"

"না। আপনি যে বিপদে পড়বেন তা তিনি কল্পনাও করেননি। তবে আপনার সম্বন্ধে সমস্ত খবর তিনিই আমাদের দিয়েছেন—"

"কি করে তাঁর নাগাল পেলেন আপনারা?"

"হোসেন খাঁর মারফত। আপনিও দেখেছেন তাকে। দিল্লী থেকে একসঙ্গে এক গাড়িতেই তো এলেন আপনারা।"

"তিনি কি জুবেদার কেউ হন নাকি?"

"বাল্যবন্ধু। রায়ট না হলে তাঁর সঙ্গেই জুবেদার বিয়ে হত।"

বিষ্ণুচরণ নির্বাক হইয়া রহিল খানিকক্ষণ।

"নিন, সই করুন। আর দেরি করবেন না।"

"আচ্ছা, আপনারা আমার খবর কি জুবেদার কাছেই পেলেন প্রথমে?"

"না। প্রথমে আমরা দিল্লীতে রিফিউজি নবেন্দু বিশ্বাসের খবর পাই। কাগজে তাঁর মেয়ে বিশাখা যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন সেটাও আমাদের চোখে পড়ে। খোঁজ করতে করতে বেরিয়ে পড়ল যে নবেন্দু বিশ্বাসের সম্পত্তি আপনিই কিনেছেন তার কোলকাতার বাড়ির বিনিময়ে। তারপর জানা গেল আপনি হোসেন খাঁর বাগদত্তাকে বিয়ে করেছেন। হোসেন খাঁ আমাদের দলের লোক। সুতরাং আপনার সম্বন্ধে জানতে আর বাকি রইল না কিছু। আপনার এটর্নি

বীরেনবাবুর সঙ্গেও পরিচয় আছে আমাদের। এমনকি আপনি কোলকাতায় "মাসাজ এন্ড বাথ" খোলবার যে মনোরম পরিকল্পনাটি করেছেন তাও আমাদের অবিদিত নেই। আপনার সম্বন্ধে কোথাও কোন ভুল হয়নি আমাদের। সমস্ত খবর নিয়ে আটঘাট বেঁধে তবে আপনাকে ধরেছি আমরা। এখন আপনার আর পালাবার উপায় নেই, সইটা করে ফেলুন, নিন—"

বিষ্ণুচরণ কলমটা হাতে করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, তাহার পর সই করিয়া দিল।

ভার্গব কথা কহিল এইবার।

"ব্যাস্। মুক্তির জন্য প্রস্তুত হোন এবার। রামনাম বা আল্লার নাম যা করতে চান করুন।"

বিষ্ণুচরণ ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার নীচের ঠোঁটটা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

"রামনাম? আল্লার নাম? কেন?"

"যে উইল এখুনি করলেন সেইটেই যাতে আপনার শেষ উইল হয় সে ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। তা ছাড়া দেশকে পাপমুক্ত করব এ-ও আমাদের ব্রত।"

বিষ্ণুচরণ সহসা লাফাইয়া উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ভার্গবের লক্ষ্য অব্যর্থ। দ্বারের কাছে বিদীর্ণমস্তকে আর্তনাদ করিয়া বিষ্ণুচরণকে ভবলীলা সমাপ্ত করিতে হইল।

উকিলসাহেব সঙ্গে সঙ্গে দাড়ি খুলিয়া শিবাজীতে রূপান্তরিত হইলেন। ভার্গব ত্বরিতহস্তে একটা বোরায় বিষ্ণুচরণের দেহটা পুরিয়া ফেলিল, মণিকা ভিতর হইতে আরও গোটা দুই বোরা লইয়া আসিল, উপর্যুপরি তিনটি বোরায় বিষ্ণুচরণের শবকে আবৃত করিবার পর শিবাজী মণিকাকে বলিল, "তুমি খাকি মিলিটারী পোশাক পরে ক্যাপ্টেনসাহেব হয়ে পড় এইবার। কটা রংয়ের বাটারফ্লাই গোঁফটাও লাগিয়ে নাও। গোপীনাথ আশা করি নৌকা যোগাড় করে রেখেছে এতক্ষণ।"

বলিতে বলিতে জল ঢালিয়া চারিদিক ধুইয়া তিনজনে পুনরায় মোটরে চড়িল। গঙ্গাতীরের সমীপবর্তী হইতেই আরদালিবেশী গোপীনাথকে দেখা গেল। তাহার সঙ্গে নৌকার মাঝিরাও দাঁড়াইয়াছিল। আরদালিবেশী গোপীনাথ সেলাম করিয়া ক্যাপ্টেনবেশী মণিকাকে জানাইল যে নৌকা ঠিক আছে। নৌকার মাঝি দুইটিও সেলাম করিল। ক্যাপ্টেনসাহেবের স্কন্ধে চামড়ার কেসে বন্দুক ঝুলিতেছিল। তিনি আগাইয়া গেলেন। বোরাটি ভার্গব বহন করিয়া লইয়া গেল। মাঝিদের বলা হইল, ক্যাপ্টেনসাহেব শিকারে গিয়াছিলেন, বোরার ভিতর মরা হাঁস আছে। বোরাটি নৌকার গলুইয়ের কাছে রাখা হইল।

...ক্যাপ্টেনসাহেবকে নৌকায় চড়াইয়া দিয়া শিবাজী ভার্গবসহ মোটরযোগে গঙ্গাতীর ত্যাগ করিয়া একটি পথের বাঁকে গাছের তলায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

নৌকা যখন মাঝগঙ্গায় পৌঁছিয়াছে তখন ঝপ্ করিয়া শব্দ হইল একটা।

"কেয়া গিরা—"

আরদালি গোপীনাথ সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "বোরা গির গয়ী হুজুর—"

"ও ড্যাম সোয়াইন!—"

সাহেবী কায়দায় মণিকা চিৎকার করিয়া ধমকাইয়া উঠিল।

নাও ঘুরাও। ফির আজ শিকারমে যানা পড়েগা। কমিশনার সাহেবকো হাঁস দেনেকা ওয়াদা কিয়া হ্যায়। ঘুরাও, ঘুরাও, জলদি নাও ঘুরাও—"

নৌকা পুনরায় আসিয়া তীরে ভিড়িল।

মণিকা ও গোপীনাথ নামিয়া গেল।

পিশাচ বিষ্ণুচরণ অন্তিমে গঙ্গালাভই করিল।

বিশাখাকে লইয়া বরেন বৈকালের দিকে পাটনা ক্যাম্পে আসিয়া পৌঁছিল। পথে কোনরূপ বিপদ হয় নাই। পৌঁছিবামাত্র কাংড়া ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া একটি লম্বা খাম বরেনের হাতে দিল। খাম খুলিয়া বরেন যে চিঠিটা পাইল তাহা এই—

"নবেন্দুবাবু মারা গেছেন। বিশাখাদেবীকে খবরটা দিয়ে দিও। নবেন্দুবাবুর মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে বিষ্ণুচরণবাবু তাঁর বেলেঘাটার বাড়ি তিনখানা গ্রাস করেছিলেন। তিনিও মারা গেছেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর মৃত্যুর সময় আমরা উপস্থিত ছিলাম। মৃত্যুকালে তাঁর মতি-পরিবর্তন হয়, তিনি বিশাখাদেবীকে বাড়ি তিনটি উইল করে দিয়ে গেছেন। বিশাখাদেবীকে উইলটা দিয়ে দিও। এইসঙ্গে রইল সেটা। তাঁকে বলো বাড়ি তিনটি তিনি যেন অবিলম্বে দখল করবার ব্যবস্থা করেন। ইতি—'শিবু'।

বরেন চিঠিখানার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার পর নীরবে সেখানা বিশাখার হাতে দিল।

"কার চিঠি?"

"পড়ে দেখুন।"

বরেন আশঙ্কা করিতেছিল চিঠিখানা পড়িয়া বিশাখা হয়তো ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কিন্তু সে কিছুই করিল না। নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"আপনি দিল্লী ফিরবেন তো?"

"হ্যাঁ।"

"চলুন তা হলে, আপনাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি। একটু পরেই আপনার ট্রেন।"

"চলুন।"

স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় দুইজনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছিল।

বরেন বলিল, "যে ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, তিনি কি এখন কোলকাতায় আছেন—"

"হ্যাঁ—"

"তাঁর ঠিকানাটা যদি আমাকে দেন তাঁকে গিয়ে খবর দিয়ে দিতে পারি একটা। আমি তো কোলকাতায় ফিরছি।"

"বেশ, লিখে নিন।"

বরেন কৈলাসপতির ঠিকানাটা লিখিয়া লইল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীগামী ট্রেনখানাও আসিয়া পড়িল। বিশাখা ট্রেনে উঠিয়া বরেনকে নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনার পুরো পরিচয় পাইনি। তবু যতটুকু পেয়েছি তাতেই মুগ্ধ হয়েছি। আশা করি আবার দেখা হবে।"

"আশা করি।"

বরেন স্টেশন হইতে বাহির হইয়া একটা পোস্টাফিসে গেল। কৈলাসপতির নামে একটা টেলিগ্রাম করিয়া দিল—রিটার্নিং টু ডেলহি। বিশাখা।

।। পাঁচ ।।

মণিকাকে লইয়া শিবাজী কলিকাতা অভিমুখে চলিয়াছিল। তাহাদের দেখিয়া হঠাৎ চিনিবার উপায় ছিল না। শিবাজী মিলিটারী পোশাক পরিয়াছিল, আর মণিকা সাজিয়াছিল মেমসাহেব। মেমসাহেবের পোশাকে মণিকাকে চমৎকার মানাইয়াছিল সোনালী রঙের পরচুলা পরিয়া তাহার চেহারাই বদলাইয়া গিয়াছিল। তাহার চোখে ছিল একটি ফিকে সবুজ রঙের চশমা, শিবাজীর ছিল মিলিটারী গগলস্। শিবাজী দাঁতে একটা পাইপও কামড়াইয়া ধরিয়াছিল।

একটা গ্রাম পার হইয়া একটা প্রকাণ্ড মাঠ দেখা গেল। মাঠের মাঝখানে একটা গাছ ছিল। শিবাজী সেই গাছতলায় গাড়িটা দাঁড় করাইল।

মণিকা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, "এখানে থামছেন কেন?"

"তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।"

"কি কথা?"

শিবাজী ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বলিল, "তুমি জুবেদার ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করেছ। কর্মী হিসাবে তুমি প্রথমশ্রেণীর। তোমার চরিত্র, তোমার বুদ্ধি, তোমার অভিনয়-ক্ষমতা অদ্ভুত। আমাদের সমিতি তোমাকে পেয়ে লাভবান হয়েছে। তবু ঠিক করেছি তোমাকে আমাদের দলে রাখব না।"

"রাখবেন না? কেন?"

"রাখব না, কারণ তুমি স্ত্রীলোক। শুধু তাই নয়, তুমি মোহিনী। তোমাকে কেন্দ্র করে আমাদের দলে অনর্থ সৃষ্টি হতে পারে। যদিও এখনও তেমন কিছু স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, কিন্তু অনুভব করছি বরেন, ভার্গব, গোপীনাথ, কাংড়া, ছক্কন প্রত্যেকেরই মনে তুমি কিছু-না-কিছু প্রভাব বিস্তার করেছ। এরা আমাদের সমিতির মেরুদণ্ড। ভয় হচ্ছে তোমার জন্যে আমাদের সে মেরুদণ্ড না ভেঙে যায়। বরেনের কথায় তোমাদের যখন নিয়েছিলাম তখন ভেবেছিলাম, ধোপে টিকবে না। হয়তো তোমাদের মেরেই ফেলতে হবে। কিন্তু এখন দেখছি তোমরা টিকে গেছ। শুধু তাই নয়, কর্মী হিসাবে লোভনীয় হয়ে উঠেছ, সবাই তোমার সঙ্গে কাজ করতে উৎসুক, ভার্গব তোমাকে পাঞ্জাবে নিয়ে যেতে চাইছিল। তোমার বদলে গোপীনাথকে তার সঙ্গে দেব বলাতে সে মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হয়েছে মনে হল। এই সব দেখে তোমাকে দলে রাখা সঙ্গত মনে হচ্ছে না—"

মণিকা মনে করিয়াছিল শিবাজী মাঝে মাঝে যেমন করে, তেমনি বুঝি বা পরিহাস করিতেছে। তাহার চোখে একটা কৌতুক-দীপ্তি ফুটিফুটি করিতেছিল কিন্তু শিবাজীর মুখের দিকে চাহিয়া সে দীপ্তি নিবিয়া গেল।

"আপনি এ কি বলছেন?"

"আনন্দমঠ পড়েছ?"

"পড়েছি।"

"তা হলে তো যা বলছি তা তোমার বোঝা উচিত। বঙ্কিমবাবু ঋষি ছিলেন, তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন স্ত্রীলোকের জন্যই সর্বনাশ হয়ে গেল।"

মণিকা ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। ক্রমশঃ তাহার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইল, চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল।

"আমাকে যখন দলে নিয়েছিলেন তখনই কি আপনার এ সব কথা ভাবা উচিত ছিল না?"

"ছিল। আমার অপরাধ হয়েছে স্বীকার করছি। তোমাদের নিয়েছিলাম দুটো প্রধান কারণে। তোমাদের মোটরটার লোভে আর টোপিরামের টাকাটার জন্যে। তোমরা যে টিকে থাকতে পারবে এ কল্পনাও করিনি।"

মণিকা চুপ করিয়া রহিল। তারপর স্থিরকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "আমাকে এখন কি করতে বলেন তা হলে?"

"বিয়ে করতে। গোপীনাথকে যদি বিয়ে করতে চাও সে ব্যবস্থা করে দিতে পারি। বিয়ে করে তোমরা যাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পার সে ব্যবস্থাও হতে পারে অনায়াসে। পাঞ্জাবে বা উত্তরপ্রদেশে অনেক চেনাশোনা লোক আছে আমাদের, তারা তোমাদের অনেক সাহায্য করবে। তোমরা গার্হস্থ্যজীবনযাপন করেও আমাদের সমিতির অনেক উপকার করতে পার, বরেন যেমন করেছে। রাজি আছ?"

মণিকার চোখের দৃষ্টি আরও প্রখর হইয়া উঠিল। বলিল, "বিয়ে করলে গোপীনাথকেই করতাম, কিন্তু তা আর হয় না। সে আমাকে মা বলেছে, তাকে বলতে আমি বাধ্য করেছি। ছোট্ট একটি সংসার পাতব—এই স্বপ্নই তো ছিল আমার। কিন্তু আপনার সংস্পর্শে এসে সে স্বপ্ন পুড়ে গেছে। নতুন ধরনের আর একটা মন্ত্রে আপনি দীক্ষা দিলেন। এখন আপনি বলছেন যেহেতু আমি স্ত্রীলোক, এই অপরাধে আমাকে দলত্যাগ করতে হবে। আমাদের কি আপনি নির্জীব খেলনা মনে করেন না কি?"

"না, তা করি না। তুমি অত্যন্ত বেশি সজীব। অপরাধও তোমার কিছু নেই। শিখায় পতঙ্গেরা পুড়ে মরে, শিখার কোনও অপরাধ নেই তাতে। কিন্তু পতঙ্গ নিয়ে যার কারবার, শিখাকে এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ তার পক্ষে।"

মণিকা সহসা উঠিয়া পড়িল।

"বেশ, আমি চললুম তা হলে। এই আপনার পরচুলা আর চশমা রইল।"

পরচুলা ও চশমা সে খুলিয়া ফেলিল।

"কোথায় যাচ্ছ?"

"তা জানি না। কিন্তু যাব। আমি মেয়েদের নিয়ে নতুন দল গড়ে আপনাকে দেখিয়ে দেব যে আমরাও আপনাদের চেয়ে কম নই। আমি শুধু আনন্দমঠই পড়িনি, দেবী চৌধুরাণীও পড়েছি। কিন্তু আমি যে দল গড়ব, তাতে ভবানী পাঠক থাকবে না। থাকবে মণিকা। চললুম—"

শিবাজী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "যা বলছ তা সত্যিই যদি পার, তা হলে বুঝব আমাদের সুদিন আসন্ন। তবে এমন থিয়েটারী কায়দায় এখানে তোমাকে নাবতে দেব না। হঠাৎ অমন ক্রোধান্ধ হলে কি চলে? আমার সঙ্গে কোলকাতা চল, সেখানে যা হয় কোরো। আমিই তোমাকে সাহায্য করব এ বিষয়ে।"

"আমি আপনার সাহায্য চাই না।"

"বেশ, নিও না। এখন এস, উঠে পড়। পরচুলা আর চশমটা পর। এ সব ব্যাপারে হঠকারিতা চলে না। এস—"

মণিকা কয়েকমুহূর্ত ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর মোটরে উঠিয়া বসিল। মোটর আবার দ্রুতবেগে চলিতে শুরু করিল।

।। ছয় ।।

যে দুইটি কারণে বিধুভূষণ ভূপেশ মজুমদারের সঙ্গ ছাড়েন নাই তাহার মধ্যে একটি বিশাখা-সম্পর্কীয়। বিশাখা বিষয়ে ভূপেশ কি খবর সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য তিনি কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিলেন। দিল্লীতে কাবুলী-চপ্পল পরা সেই ষণ্ডাগোছের ছোকরা যে খবর দিয়াছিল তাহা অস্বস্তিকর, বিশাখা, বরেন কাহাকেও সে তাঁহার বাড়িতে পায় নাই, মধু কেবল বাহির হইয়া আসিয়া খবর দিয়াছিল, বাড়িতে কেহ নাই। ইহার অর্থ কি! হইতে পারে, বাহিরের কোনও লোকের কাছে আত্মপ্রকাশ করিতে বরেন রাজি হয় নাই, কিন্তু সে আত্মগোপন করিবে কি করিয়া? তাহার তো নীচের ঘরে সর্বদা বসিয়া থাকিবার কথা। তাহার সহিতই তো ওই ষণ্ডা ছোকরার প্রথমে দেখা হওয়া উচিত ছিল। তবে কি সে উপরে গিয়া বিশাখার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়াছে? আজকালকার ছোকরা, কিছুই বলা যায় না। ভূপেশ বিশাখার সম্বন্ধে কি খবর সংগ্রহ করিয়াছে? তাহা গোপন করিবার চেষ্টাই বা করিতেছে কেন? যেমন করিয়া হোক কথাটা তাহার নিকট হইতে বাহির করিতে হইবে। কিন্তু কথাটা খোলাখুলিভাবে জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগই তিনি অনেকক্ষণ পাইলেন না। ভূপেশ মজুমদার সমস্তদিন একদল পুলিশ আর দারোগা লইয়া কখনও মোটরে, কখনও ট্রলিতে, কখনও বা হাঁটিয়া এমন হৈ-হৈ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে তাঁহাকে ধরিবার অবসরই তাঁহার মিলিল না। একটু সুস্থির না হইয়া বসিলে কি এ সব কথা পাড়া যায়? সন্ধ্যার পর খাওয়াদাওয়া সারিয়া শুইবার পূর্বে সুযোগটি মিলিল।

ভূপেশ মজুমদার বলিলেন, "কালকের আগে আমাদের যাওয়া হবে না। এ অঞ্চলে আরও কয়েকটা দাগী গুণ্ডার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। দু-একজন নাকি সন্ধ্যার সময় স্টেশনের কাছে ঘোরাঘুরিও করেছিল। তাদের পাকড়াতে হবে কাল। আজই হয়তো ধরা পড়বে। লোক পাঠিয়েছি। তোমার অসুবিধে হচ্ছে না কি?"

"না, অসুবিধে আর কি। তোমার কাছে তো রাজ-হালে আছি। কোলকাতার কাজকর্ম মোটামুটি সেরেই এসেছি। কেবল ওই বিশাখার সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আচ্ছা, তখন তুমি বললে, বিশাখার সম্বন্ধে কি একটা খবর নাকি পেয়েছ, কি খবর—"

"খবরটা ঠিক বিশাখা সম্বন্ধে নয়, তোমার সম্বন্ধে। ব্যাপারটা আগেই অনুমান করেছিলাম, এখন আর সন্দেহ নেই।"

"সন্দেহ নেই মানে? কি বিষয়ে সন্দেহ নেই—"

"পরেশ আমাকে যে খবরটা দিয়েছিল সেটা মিছে কথা নয়। ওই বিশাখাকেই তুমি বিয়ে করতে চাও, ফোনে যদিও সেটা অস্বীকার করেছিলে।"

বিধুভূষণ বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলেন, "কি করে জানলে সেটা—"

"তুমি বিশাখাকে যে চিঠিটা দিয়েছ তাই থেকে জানলাম।"

বিধুভূষণ এইবার আকাশ হইতে পড়িলেন।

"বিশাখার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল নাকি?"

"দেখা হয়েছিল কিনা তা পরে শুনো। তাকে তুমি চিঠি লিখেছিলে কিনা সেইটে বল আগে।"

"লিখেছিলাম।"

"সে চিঠিতে বিয়ের প্রস্তাবও করেছিলে?"

"করেছিলাম। তবে তার মধ্যে একটা ইয়ে ছিল। মানে—"

"বুঝেছি—"

ভূপেশ মজুমদার কৈলাস-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু হঠাৎ তিনি থামিয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল কথাটা শুনিলে বিধুভূষণ হয়তো কৈলাসের বিবাহে কোনরূপ বাগড়া লাগাইয়া দিতে পারে। লোকটা টাকার কুমীর এবং এ যুগে টাকার জোরে সবই করা সম্ভব। কৈলাসের কথাটা তিনি চাপিয়া গেলেন।

"বুঝেছি মানে, কি বুঝেছ?"

"কোলকাতায় গিয়ে শুনো সব।"

ভূপেশ বিধুভূষণের আগ্রহ দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন এবং তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে অনর্গল মিথ্যাকথা বলিতে লাগিলেন।

"বিশাখার কাছে আমার চিঠি তুমি দেখলে কি করে?"

"বিশাখাই দেখিয়েছে।"

"তুমি আমার বাড়িতে গিয়েছিলে নাকি?"

"বরেন যখন একটা খুন করে পালাল তখন যেতে হয়েছিল।"

"কবে—"

"ঠিক এখানে আসবার আগে।"

"তারপর?"

"তোমার চাকর বললে বরেনবাবু সরে পড়েছেন। পুলিশ অফিসার হিসাবে তখন বিশাখার সঙ্গে দেখা করাটা আমার কর্তব্য বলে মনে হল। বিশাখা তখন তোমার চিঠিটা দেখালে আমাকে—"

"চিঠিটা পড়েছিলে তুমি সবটা?"

"চোখ বুলিয়ে দেখেছিলাম একবার।"

"বিশাখা চটেছে মনে হল?"

"না, চটবে কেন। তোমার মতো সুপাত্র এ বাজারে পাবে কোথায়। তুমি যে এ প্রস্তাব করবে তা আমি জানতাম। আমার কাছে ব্যাপারটা লুকোতে গেলে কেন শুধু শুধু? এ সব ব্যাপার কি কখনও লুকোনো যায়?"

"তুমি যখন আমাকে ফোন করেছিলে তখন আমি এ কথা ভাবিই নি। তা ছাড়া চিঠিতে ঠিক বিয়ের প্রস্তাবও তো আমি করিনি। আমি কেবল লিখেছিলাম ওঁর ব্যাপার যে রকম জটিল হচ্ছে তাতে আমি যদি ওঁকে বিয়ে করি তা হলেই সুরাহা হতে পারে। অন্য কোনও উপায় নেই।"

"ও। আচ্ছা, কোলকাতায় ফিরে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা যাবে। এখন শুয়ে পড়া যাক। সমস্তদিন যা হয়রানি গেছে, আমার চোখ জড়িয়ে আসছে—"

ভূপেশ বিছানায় শুইয়া পাশবালিশটি জড়াইয়া চক্ষু বুঁজিলেন। বিধুভূষণও শুইয়া পড়িলেন এবং ভূপেশের কথাগুলি প্রণিধান করিতে লাগিলেন। ভূপেশের কথা শুনিয়া তিনি কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। বিধু যে বিশাখাকে বিবাহ করিতে উৎসুক এ কথা বেশীদিন চাপা থাকিত না। ভূপেশ

না হয় দুই চারিদিন আগেই জানিয়াছে। তাহাতে ক্ষতিই বা কি। কিন্তু বিশাখা যে এ প্রস্তাবে রাগ করে নাই, বিশাখা যে এখনও তাঁহার বাড়িতে আছে, এই অলীক সংবাদটি তাঁহার কর্ণে মধুবর্ষণ করিল। ও. সি. কুণ্ডু নামক যে শনিটা তাঁহার স্কন্ধে ভর করিয়াছিল, ট্রেন অ্যাকসিডেন্টের হিড়িকে সেও নামিয়া গিয়াছে। সুতরাং ওদিকের আকাশের ঘোলাটে ভাবটা প্রায় কাটিয়া আসিতেছে। কলিকাতায় গিয়া বিশেষ কোন অসুবিধায় পড়িতে হইবে বলিয়া মনে হয় না। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে বিশাখাকে বিবাহ করিয়া তিনি বেলেঘাটার বাড়ি তিনটি ন্যায়তঃ অধিকার করিতে পারিবেন এবং যে পঁচিশ হাজার টাকা বিষ্ণুচরণ গ্যাপ করিয়াছিল তাহা সুদসুদ্ধ উশুল হইয়া যাইবে। এ বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি আরামবোধ করিলেন। কিন্তু আরামে নিদ্রা তিনি দিতে পারিলেন না। দ্বিতীয়, যে কারণটির জন্য তিনি ভূপেশের সঙ্গ ছাড়েন নাই, সেইটি তাঁহার মনে এইবার প্রভাব বিস্তার করিল। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি বেশ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কর্তব্যনির্ধারণে এত চিন্তিত তিনি আর কখনও হন নাই। চিন্তাটা প্রথমদিকে আত্মবিশ্লেষণের আকার ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু ক্রমশঃ তাহা আত্মতিরস্কারে রূপান্তরিত হইল। নিজেকেই তিনি মনে মনে ভুরু নাচাইয়া প্রশ্ন করিলেন, ওই রজতটার জন্য তুমি অনর্থক মাথা ঘামাইয়া মরিতেছ কেন? লোকটা জীবনে হেন দুষ্কার্য নাই যাহা করে নাই। পাঁকালমাছের মতো এতদিন পাঁকে গা-ঢাকা দিয়া বসিয়াছিল। ভগবানের জালে এইবার ধরা পড়িয়াছে। এই অতিশয় ন্যায়সঙ্গত ব্যাপারে তুমি মাথা গলাইতে যাইতেছ কেন? নানারূপ অদ্ভুত উপমাও তাঁহার মাথায় আসিতে লাগিল। মনে হইল নদী যেমন অনিবার্যপ্রবাহে বহিয়া অবশেষে সমুদ্রে গিয়া মেশে, ওই রজতও তেমনি স্বাভাবিক নিয়মে ফাঁসিকাঠে গিয়া ঝুলিবে। যেমন কর্ম করিয়াছে তেমনি ফল পাইবে। পাওয়াই উচিত। তিনি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার কল্পনা কেন করিতেছেন? তাঁহার তো বরং খুশিই হওয়া উচিত। এ কথা কি সত্য নয় যে ওই লোকটাই তাঁহার সকল কষ্টের মূল? সারাজীবন তিনি এই যে লুকোচুরি খেলিতেছেন তাহার জন্য কি ওই দায়ী নয়? রজতবাবুর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বলিয়াই তো স্বর্ণলতাকে অকালে প্রাণ হারাইতে হইল। অন্য উপায়ই বা ছিল কি! বিধুভূষণ চক্ষু বুঁজিয়া এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিলেন। এ রকম পাষণ্ডকে পুলিশের হাত হইতে উদ্ধার করিবার বাসনা কেন তাঁহার মনে জাগিতেছে, জাগা উচিত কিনা, জাগিলেই বা তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে, এই সব কথাই তাঁহার চিত্তকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। ঘুম আসিল না। চক্ষু বুঁজিয়া পড়িয়া রহিলেন, কখনও বা এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত শব্দ শুনিয়া তিনি চমকাইয়া উঠিলেন। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন ভূপেশের নাক ডাকিতেছে। আবার পাশ ফিরিয়া শুইলেন। ভূপেশের কথাই মনে হইতে লাগিল। লোকটা কি ছিল, কি হইয়াছে। একদিন যাহার মেসের চার্জ মিটাইয়া দিবার সামর্থ্য ছিল না, জলখাবার পয়সা জুটিত না, আজ তাহার কি বাড়বাড়ন্ত। তাহার হুকুমে দশ বারোটা দারোগা ছুটাছুটি করিতেছে, ট্রেনকে যখন যেখানে খুশি দাঁড় করাইয়া ফেলিতেছে। খাবার-ওলা, হোটেল-ওলা খাবার লইয়া সাধাসাধি করিতেছে। আর একবার তিনি ভূপেশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। একপেট মাংস-ভাত খাইয়া স্প্রিংয়ের খাটে শুইয়া আরামে নাক ডাকাইতেছে। সবই অদৃষ্ট। অদৃষ্টের কথা মনে হইতেই তাঁহার চিন্তাধারা ভিন্ন খাতে বহিতে শুরু করিল। তাঁহার অন্তরের নিগূঢ়লোকে যে সত্তাটি রজতের স্বপক্ষে যুক্তি সংগ্রহ করিবার জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল, সে যেন একটু পুলকিত হইয়া উঠিল। বলিয়া উঠিল—"বন্ধু, অদৃষ্টই যদি মানিতে

চাও তবে আর রজতকে দোষী করিতেছ কেন? উহার অদৃষ্টকে দোষী কর। অদৃষ্ট উহাকে কুবুদ্ধি জোগাইয়া মন্দ পথে লইয়া গিয়াছে, চরিত্রহীন পাষণ্ডে পরিণত করিয়াছে। তুমি বিচারক সাজিয়া বসিলে কোন্ অধিকারে? সেদিন তো কথক মহাশয়ের মুখে শুনিলে, ভগবান বলিয়াছেন আপন আপন কর্তব্য করিয়া যাও, কারণ তাহা ছাড়া আর কিছু করিবার ক্ষমতাই তোমার নাই। ফলাফল লইয়া মাথা ঘামানো বৃথা, কারণ তাহার উপর তোমার কোন হাত নাই।" বিধুভূষণ ইহার বিরুদ্ধে কোনও যুক্তিসংগ্রহ করিতে পারিলেন না। মাথায় হাত বুলাইলেন একবার। ঘাড় ফিরাইয়া আর একবার দেখিলেন। ভূপেশ নাক ডাকাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। রজতকে ছাড়িয়া দিবার জন্য ভূপেশকে অনুরোধ করিলে সে কী রাজি হইবে? খুব সম্ভবতঃ হইবে না। বরেনকে ছাড়িয়া দিয়া যেরকম বিপদে পড়িয়াছিল বলিতেছে, তাহাতে ওপথে আর ও পা বাড়াইবে না। তা ছাড়া ব্যাপারটা মিনিস্টারের সঙ্গে জড়িত যে! রজতের বিরুদ্ধে অনেকগুলি ওয়ারেন্টও রহিয়াছে। ভূপেশের ইচ্ছা থাকিলেও ছাড়িয়া দিবার সাহস হইবে না। নাঃ, ভূপেশকে বলিয়া লাভ নাই। বিধুভূষণ অনেকক্ষণ চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া রহিলেন। পায়ের পাতাটা মাঝে মাঝে নাচাইতে লাগিলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। মিনিটপাঁচেক পরেই তিনি ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। মনে হইল বাহিরে কে যেন আর্তনাদ করিতেছে। পুলিশেরা কয়েদীদের ঠ্যাঙ্গাইতেছে না কি? বিধুভূষণ শুনিয়াছিলেন আপরাধ স্বীকার করাইবার জন্য পুলিশেরা কয়েদীদের নির্যাতন করে। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দেহের শিরায় শিরায় অসংখ্য রক্তকণিকা যেন চিৎকার করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল, "তোমার বাবাকে ওরা মেরে ফেলেছে আর তুমি চুপ করে বসে আছ? ওঠ, যেমন করে পার বাঁচাও ওকে"—রজত যে তাঁহার বাবা এ কথা কেহ তাঁহাকে বলে নাই, ইহার কোনও প্রমাণ নাই, অথচ এমন একটা ধারণা কি করিয়া যে তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল যে বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত না হইয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং সন্তর্পণে দ্বার খুলিয়া প্ল্যাটফর্মে বাহির হইলেন। বাহির হইতেই একটি উর্দিপরা কনস্টেবল উঠিয়া দাঁড়াইয়া মিলিটারি কায়দায় সেলাম করিল। লোকটি পাহারায় নিযুক্ত ছিল। বিধুভূষণ দেখিলেন চারিদিকে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। দূরে একটা ইঞ্জিন নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। চারিদিকে ঝিঁঝিঁ ডাকিতেছে। কনস্টেবলটির দিকে চকিতে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া হনহন করিয়া খানিকটা আগাইয়া গেলেন। কয়েদীরা যে স্থানটায় বসিয়াছিল, দেখিলেন সে স্থানটা শূন্য। কাছাকাছি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। একটু দূরে কয়েকটা কুলি শুইয়া ঘুমাইতেছে। ফিরিয়া আসিলেন। কনস্টেবলটার সহিতই আবার দেখা হইল। ভাঙা হিন্দীতে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, 'কয়েদী সব কাঁহা গিয়া—'

কনস্টেবল উত্তর দিল বাংলায়।

"ওদের 'লক-আপ'-এ রাখা হয়েছে।"

"আপনি বাঙালী বুঝি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এখানে গারদ আছে না কি?"

"স্টেশনে নেই, থানায় আছে। থানা বেশি দূর নয়—"

"থানায় আছে কে?"

"দারোগা আছে একজন। অন্য সিপাহীরাও আছে—"

"ও।"

"কেন, কিছু দরকার আছে আপনার।"

"না, এমনি জিজ্ঞেস করছি। দিনের বেলা ওরা ওইখানটায় বসে ছিল কিনা, এখন দেখছি খালি, ভাবলাম কোথা গেল সব—"

আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া তিনি পুনরায় ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, ভূপেশ পাশ ফিরিয়াছে, এবং সেইজন্যই সম্ভবতঃ নাক-ডাকাটা বন্ধ হইয়াছে। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। কর্তব্যচিন্তা করিতে লাগিলেন। এ ধরনের কার্য আগেও তিনি অনেকবার করিয়াছেন। আসল মন্ত্রটি তাঁহার জানা আছে। তবু একটু চিন্তা করিয়া দেখা তিনি প্রয়োজন মনে করিলেন। কয়েকবার মাথায় হাত বুলাইয়া এবং ওষ্ঠের নানারকম ভঙ্গি করিয়া তিনি একটি কথাই কেবল চিন্তা করিতে লাগিলেন, কথাটা কি করিয়া পাড়া যায়। কথা পাড়াটাই সবচেয়ে কঠিন জিনিস। ইহাই তাঁহার অভিজ্ঞতা। কায়দা করিয়া কথাটা একবার পাড়িয়া ফেলিতে পারিলে বাকিটা ঠিক হইয়া যায়। মিনিটখানেকের মধ্যেই তিনি মনস্থির করিয়া ফেলিলেন। মনে মনে বলিলেন, দেখাই তো যাক. কি দাঁড়ায়। সহজে যদি না হয়, আইন-আদালত তো আছেই! সন্তর্পণে আগাইয়া গিয়া নিজের ট্রাঙ্কটির সামনে উবু হইয়া বসিলেন। ভূপেশেব দিকে চাহিয়া দেখিলেন একবার। তাহার পর খুব আস্তে চাবি ঘুরাইয়া ট্রাঙ্ক খুলিয়া ডালাটি তুলিলেন। কাপড়েব তলা হইতে লম্বা খাম বাহির করিলেন একটি। খামের ভিতর নোট ছিল। প্রত্যেকটি একশ টাকাব নোট। গণিয়া গণিয়া খান-কয়েক নোট তিনি বাহির করিয়া লইলেন। তারপর আর একটি খাম বাহির করিলেন। তাহাতে দশ টাকার নোট ছিল। তাহাও খানকয়েক লইলেন। তাহার পর বাক্সটি পুনরায় সন্তর্পণে বন্ধ করিয়া দিয়া তিনি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বাথরুমের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ভূপেশ বা বাহিরের কনস্টেবলটি তাঁহার নির্গমন টের পাইল না।

থানা কোথায় তাহা আবিষ্কার করিতে বেশি বেগ পাইতে হইল না তাঁহাকে। রাস্তায় বাহিব হইয়া একটা 'রিকশ' পাইলেন, সেই তাঁহাকে থানার সামনে নামাইয়া দিল। থানায় প্রবেশ করিতেই একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল এবং বারান্দায় যে কনস্টেবলটি শুইয়াছিল, তাহাকে জাগাইয়া তুলিল। বিধুভূষণ নিশ্চল হইয়া রহিলেন। কনস্টেবলটি আগাইয়া আসিল, বিধুভূষণকে সে-ও চিনিতে পারিল। বিধুভূষণ যে ভূপেশের অন্তরঙ্গ বন্ধু এ কথা প্রায় সকলেই জানিয়াছিল। কনস্টেবলটি আসিয়া বিধুভূষণকে সেলাম করিল।

বিধুভূষণ বলিলেন, "দারোগাসাহেবের সঙ্গে একটু জরুরি দরকার ছিল; দেখা হবে কি?"

"জরুর।"

কনস্টেবল বিধুভূষণকে ভিতরে লইয়া গিয়া একটি চেয়ারে বসাইল। একটু পরেই দারোগাসাহেব আসিলেন।

"নমস্কার। এত রাত্রে হঠাৎ—"

"নমস্কার। বলছি, বসুন। একটু গোপনীয় কথা, কপাটটা ভেজিয়ে দিন।"

"কিছু দরকার নেই; আচ্ছা, বলছেন যখন, ভেজিয়ে দিই।"

উঠিয়া গিয়া তিনি কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন। দারোগাকে বাঙালী দেখিয়া বিধুভূষণ আশান্বিত হইয়াছিলেন।

"ব্যাপার কি বলুন তো—"

বিধুভূষণ হাসিয়া বলিলেন, "ভূপেশের কাছে আপনার খুব প্রশংসা শুনছি, তাই আপনার কাছে আসতে সাহস হল। ভূপেশকে যে অনুরোধ করতে ভরসা পাইনি তা আপনাকে করতে এসেছি। ভূপেশ আমার বাল্যবন্ধু, কিন্তু বড় কড়া অফিসার। তাই তাকে লুকিয়ে আপনার কাছেই এলাম—"

বিধুভূষণ হাসিমাখা দৃষ্টি দারোগাসাহেবের উপর নিবদ্ধ করিলেন।

"ব্যাপার কি—"

"ওই যে রজতকে আপনারা ধরেছেন, ও আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয়। লোকটা পাষণ্ড সন্দেহ নেই, কিন্তু ওর মা বেঁচে আছে। আশা করে আছে একদিন ও ফিরে আসবে। আমি তাঁকে কতদিন এই বলে সান্ত্বনাও দিয়েছি। আর বিধির চক্র দেখুন, ও আমারই চোখের সামনে ধরা পড়ে গেল। কিছুতেই ঘুম হল না আমার। তার মায়ের মুখটা বারবার মনে জাগতে লাগল। তাই চলে এলাম আপনার কাছে, যদি ওর উদ্ধারের কোনও উপায় থাকে—"

দারোগাসাহেব আনতনয়নে চুপ করিয়া রহিলেন।

বিধুভূষণ মরিয়া হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, "ওর মায়ের কথা মনে পড়েই আমার কষ্ট হচ্ছে। আমার নিজের কোন স্বার্থ নেই এতে। তবু ওর মায়ের কথা ভেবে ঠিক করে ফেলেছি যে ওকে বাঁচাবার জন্যে যত টাকা লাগে তা আমি খরচ করব। আপনি যদি দয়া করে ছেড়ে দেন ভালই, আপনি যা আদেশ করবেন তাই আমি দেব, আর আপনি যদি অন্যমত করেন তা হলে টাকাগুলো ব্যারিস্টারের পেটে যাবে।"

দারোগাবাবু এতক্ষণ আনতচক্ষু হইয়াছিলেন এ কথা শুনিয়া টেবিলের উপর যে কাগজের টুকরাটি ছিল সেটি তুলিয়া লইয়া গুলি পাকাইতে লাগিলেন।

তাহার পর বলিলেন, "আপনি যা বলছেন তা করতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এ ব্যাপার তো আমি একা করতে পারি না। জন দুই কনস্টেবল রয়েছে—"

"তাদেরও দলে টেনে নিন। যা টাকা লাগে আমি দেব।"

দারোগাসাহেব পুনরায় আনতচক্ষু হইয়া কাগজের গুলি পাকাইতে লাগিলেন।

আলাপটা এইভাবে আরম্ভ হইল এবং ঘণ্টাখানেক চলিয়া ঈপ্সিত পরিণতিতে পৌঁছিয়া গেল। দারোগাসাহেবকে নগদ এক হাজার টাকা এবং দুইজন কনস্টেবলকে পাঁচশত করিয়া দিতে হইল। বিধুভূষণ টাকা সম্বন্ধে কোনরূপ দরদস্তুর করিলেন না, একটি অনুরোধ কেবল তিনি করিলেন, রজতকে এখনই গারদ হইতে মুক্তি দিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। তাহাই হইল। বিধুভূষণ স্বচক্ষে দেখিলেন একটি কনস্টেবল রজতকে গারদ হতে বাহির করিয়া আনিয়া কিছুদূরে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিল এবং বলিল—"ভাগো, জোর সে ভাগো—"

দারোগাসাহেব তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া চুপিচুপি বলিলেন, "এইবার তাড়াতাড়ি একে এ তল্লাট থেকে সরিয়ে ফেলুন আপনি। ভোরের দিকে আমরা হাল্লা করব যে, কয়েদিটা পায়খানা যাব বলাতে একজন কনস্টেবল বেকুবি করে তার কোমরের দড়ি খুলে দিয়ে তাকে গারদ থেকে বার করে পায়খানার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে তার পেটে লাথি মেরে সরে পড়েছে। আপনি যত শিগ্গির পারেন ওকে পার করে দিন। কাছেই পারঘাটা আছে, নৌকাও পাবেন—"

রজত ছাড়া পাইয়া ছুটিতেছিল। ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ সে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। বিধুভূষণ ছুটিয়া গেলেন এবং তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন।

"লাগল না কি?"

"কে তুমি বাবা—"

বিধুভূষণ কোন উত্তর না দিয়া ধরিয়া তাহাকে তুলিলেন।

"কে তুমি বাবা—"

"আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখলাম আপনি পড়ে গেলেন—"

"ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। আমাকে একটা গাড়ি ডেকে দিতে পার বাবা, চোখে ভাল দেখতে পাই না—"

"আপনি আমার হাত ধরে চলুন; দিচ্ছি আপনাকে গাড়ি ঠিক করে—"

বিধুভূষণের হাত ধরিয়া রজত হাঁটিতে লাগিল। বেশ কিছুদূর হাঁটিবার পরও কিন্তু কোন গাড়ির দেখা পাওয়া গেল না। দুই একটা রিক্‌শাওয়ালার দেখা মিলিল বটে, কিন্তু রিক্‌শাতে চড়াইয়া দেওয়া বিধুভূষণ নিরাপদ মনে করিলেন না। রজতের হাত ধরিয়া হাঁটিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যাশা করিতেছিলেন একটা ট্যাক্সি, অন্তত একটা ঘোড়ার গাড়ি মিলিয়া যাইবে। কিন্তু মিলিল না। শেষ পর্যন্ত একটা রিক্‌শাওয়ালাকেই ডাকিতে হইল।

রিকশাওয়ালাকেই ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখান থেকে নদীর ঘাট কত দূর?"

"প্রায় মাইলখানেক হবে, বাবু।"

"সেখানে খেয়া পারপার হয়?"

"হয়। তবে এখন এত রাত্রে তো খেয়া বন্ধ হয়ে গেছে।"

"তা হলে উপায় কি করা যায় বল্‌তো। বাবুর একটা নৌকা চাই। যোগাড় হবে কি?"

"হতে পারে। তবে ভাড়া বেশি চাইবে।"

"ভাড়া যা চাইবে দেব। তুই যদি ভাল করে চড়িয়ে দিস তোকেও বকসিস দেব। ভাড়া কত নিবি?"

"দুটাকা বাবু। তার কমে পারব না।"

"তোকে দশ টাকা দেব। তুই হেফাজত করে বাবুকে নিয়ে গিয়ে একটা নৌকোভাড়া করে তাতে চড়িয়ে দিস। বাবু চোখে একটু কম দেখেন, বুঝলি।"

রিক্‌শাওলা দশ টাকা পাইবে শুনিয়া পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল। সসম্ভ্রমে উত্তর দিল— "এক মাঝির সঙ্গে আমার দোস্তি আছে। আমি সব বন্দোবস্ত ঠিক করে দেব। তবে সে-ও কিছু বেশি ভাড়া চাইবে বাবু।"

"দেব বেশি ভাড়া। ভাড়ার জন্যে কিছু আটকাবে না।"

"বিধুভূষণ কয়েকখানা দশ টাকার নোট রজতের হাতে দিয়া বলিলেন,—খানকয়েক দশ টাকার নোট রেখে দিন আপনি। রিক্‌শাওলাকে দশ টাকা দিয়ে দেবেন। মাঝিও যা চায় দেবেন তাকে। নৌকো করেই চলে যান আপনি। এটাও রাখুন—এটা একশ' টাকার নোট।"

একখানা একশত টাকার নোটও তিনি বাহির করিয়া রজতের হাতে দিলেন।

রজত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। অন্ধদৃষ্টি তুলিয়া বিহ্বলকণ্ঠে সে পুনরায় প্রশ্ন করিল,— তুমি কে বাবা?

বিধুভূষণের একবার ইচ্ছা হইল বলেন,—আমি দামিনীর ছেলে—কিন্তু আত্মসংবরণ করিলেন।

বলিলেন,—"আমার নাম বংশীবদন মিত্র। আপনাকে চিনি আমি। পরে আপনার সঙ্গে দেখা করব।"

"ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

রজত হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিল। রিক্‌শা চলিয়া গেল।

বিধুভূষণ ফিরিয়া আসিলেন। বাথরুমের পিছনকার দরজা দিয়াই ঘরে ঢুকিলেন। দেখিলেন ভূপেশ পুনরায় চিৎ হইয়া নাক ডাকাইতেছে। বিধুভূষণ সন্তর্পণে আবার বাক্সটি খুলিলেন এবং নোটগুলি পুনরায় গণিয়া সেই খামে পুরিয়া কাপড়ের তলায় রাখিয়া দিলেন। বাক্স বন্ধ করিযা তিনি আব একবার প্ল্যাটফর্মে বাহির হইলেন। কনস্টেবলটি ঢুলিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"ঘুম হচ্ছে না। আমাকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পার, বাবা?"

"পারি।"

কনস্টেবল রিফ্রেশমেন্ট রুমের দিকে চলিয়া গেল।

বিধুভূষণের জল খাইবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তিনি যে বরাবর ঘরের মধ্যেই ছিলেন কনস্টেবলের মনে এই ধারণাটি জন্মাইবার জন্য কপট আচরণটি করিলেন। কনস্টেবল একটি কাঁচের গ্লাসে জল লইয়া আসিল। জলপান করিয়া বিধুভূষণ ঘরে ঢুকিয়া বিছানায় অঙ্গ প্রসারিত করিলেন। একটা অদ্ভুত আত্মপ্রসাদে তাঁহার সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

যখন ঘুম ভাঙিল তখন অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে। দেখিলেন ভূপেশ ঘরে নাই। প্ল্যাটফর্মে বাহির হইয়া দেখিলেন কনস্টেবলরাও কেহ নাই। বিধুভূষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর দেখিতে পাইলেন ভূপেশ আসিতেছে।

"ঘুম ভাঙল তোমার! এদিকে আমি এক মহাফ্যাসাদে পড়ে গেছি—"

"কি—"

"সেই রজত ব্যাটা পুলিশের হাত ছাড়িয়ে পালিয়েছে। একের নম্বর বদমাশ তো—"

"তাই না কি! কখন—"

"সকালে।"

"তা হলে তোমার ফিরতে তো বেশ দেরি দেখছি।"

"আমি আর এখানে থেকে কি করব। এখানকার পুলিশরাই যা হয় করবে। আমি আজই ফিরব।"

"কোথা ফিরবে?"

"দিল্লীতে। সেখানে রিপোর্টটা দাখিল করতে হবে তো!"

"সেখান থেকে কোলকাতায় ফিরছ তো?"

"হ্যাঁ। তুমি কি এখান থেকেই কোলকাতায় ফিরতে চাও—"

"না, চল, তোমার সঙ্গেই যাব। সৎসঙ্গে কাশীবাস।"

বিধুভূষণ হাসিবার চেষ্টা করিলেন।

"চা খেয়েছ?"

"না।"

"আমিও খাইনি। চল, চা খাওয়া যাক।"

মিলনপর্ব

অপ্রত্যাশিতভাবে রজতবাবুর সহিত দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিধুভূষণের সমস্ত সত্তা যে প্রচণ্ড ভাবাবেগে আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার ফলে কেবল যে কতকগুলি পুলিশের লোক অবৈধভাবে কিছু অর্থোপার্জন করিয়া রজতকে ছাড়িয়া দিল তাহা নয়, তাহার ফলে বিধুভূষণের মানসিক জগতের চেহারাটাই বদলাইয়া গেল। দরিদ্র পিতামাতার আদরে লালিত সন্তান অতি শৈশবে যে রূপকথার জগতে বাস করে, সে-জগতে কিছুকালের জন্য সে নিজেকে মনে করে রাজপুত্র। কিন্তু একটু বড় হইয়া সে প্রথমে যখন নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করে যে বাস্তবিক সে রাজপুত্র নয়, সে একটি দরিদ্র নগণ্য ব্যক্তির সন্তান, তখন তাহার মনের অবস্থা যেমন হয় বিধুভূষণের মনের অবস্থা অনেকটা তেমনি হইল। বিধুভূষণ নিঃসংশয়ে হৃদয়ঙ্গম করিলেন ঐশ্বর্যের অথবা মিথ্যার যে আবরণেই তিনি নিজেকে ঢাকিয়া রাখিয়া যেমনভাবেই বাহিরে আত্মপ্রকাশ করুন না কেন তাঁহার আসল পরিচয়—তিনি ওই দুর্বৃত্ত রজতের অবৈধ সন্তান, তাঁহার মা জনৈকা চরিত্রহীনা দাসী। ইহাই তাঁহার সত্য পরিচয়। প্রমাণ কিছুই নাই, তবু অন্তরের অন্তস্তলে এই নিদারুণ সত্যটা তিনি নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিলেন। প্রতি মানুষের অন্তরে যে বোদ্ধা কোনও প্রমাণের অপেক্ষা না রাখিয়া সত্যনির্ণয় করে, সেই সর্বজ্ঞ নিগূঢ় চেতনাই তাঁহাকে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ করিল। সত্যটা তিনি বরাবরই জানিতেন, এই সত্যটাকে চাপা দিবার জন্যই তিনি সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম করিয়া বিপুল বিত্ত অর্জন করিয়াছেন, কিন্তু সহসা সেদিন তিনি উপলব্ধি করিলেন এতদিন বাহিরের লোককে তিনি ভুলাইয়াছেন সত্য, কিন্তু নিজেকে ভুলাইতে পারেন নাই। পারিলে বিপন্ন রজতকে দেখিয়া তিনি অতটা বিচলিত হইতেন না, তাহার উদ্ধারের চেষ্টাও করিতেন না। তাঁহার অন্তরের মুখোশটাও হয়তো কোনও অচিন্তিতপূর্ব আঘাতে হঠাৎ একদিন খসিয়া পড়িবে, ওই রজতের যেমন পড়িয়াছে। প্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদার রজতনারায়ণ সিংহের এ দুর্দশা কে কল্পনা করিয়াছিল! বিধুভূষণের মনোজগতের রূপ সত্যই বদলাইয়া গেল। যে নিষ্ঠুর নিদারুণ ভাগ্যের বিরুদ্ধে তিনি এতদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন, সহসা তাহার নিকট তিনি নতিস্বীকার করিলেন। মনে মনে সবিনয়ে স্বীকার করিলেন, নিয়তির বিরুদ্ধাচরণ করিবার শক্তি মানুষের নাই। একটা সান্ত্বনাও তিনি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিলেন। ভাবিলেন, নিজের জন্মের জন্য তিনি দায়ী নহেন, নিজের কর্মের জন্যই তিনি দায়ী। পূর্বজন্মের কোন পাপের ফলেই এইরকম হইয়াছে। ইহজীবনে সৎকর্ম করিলে আগামী জন্মে সুখে থাকিবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথা ভাবিয়াও তিনি একটু ম্রিয়মাণ হইলেন যে তাঁহার ইহজীবনের কর্মগুলি সব সৎ নয়। অসুস্থ স্বর্ণলতার মুখটা মনে পড়িল। আরও অনেক কিছু মনে পড়িল। একটু দমিয়া গেলেন। আগামী জন্মেও নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না কি!

মনের অবস্থা যখন এইরূপ তখন তিনি হাওড়া স্টেশনে নামিলেন। ভূপেশও সঙ্গে ছিলেন। যদিও ভূপেশ কোন আসামীকে ধরিতে পারেন নাই, তবু মন্ত্রীমহাশয় তাঁহার কর্মতৎপরতায়

খুশি হইয়া তাঁহাকে উচ্চতর পদে উন্নীত করিয়াছিলেন। সংবাদটি নীলতারার কর্ণগোচর করিবার জন্য, সুতরাং ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন তিনি। সুলোচনার সম্বন্ধেও তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। যদিও তাহার কি ব্যবস্থা করিল, কে জানে।

বিধুভূষণের দিকে চাহিয়া হাসিয়া তিনি বলিলেন, "গিন্নীকে সুখবরটা দিতে হবে। আমি এখান থেকে সোজা ট্যাক্সি করে বাড়ি যাচ্ছি। পরে তোমার সঙ্গে দেখা করব। বিশাখা দেবী কি ঠিক করলেন তা জানবার কৌতূহল আমারও কম নয় তোমার চেয়ে। আমি তোমার বাড়িতে আসছি একটু পরে—"

ভূপেশ একটা ট্যাক্সিতে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

বিধুভূষণ কি করিবেন চট্ করিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। প্ল্যাটফর্মের ঘড়িটার দিকে চাহিলেন, মাথায় দুই একবার হাত বুলাইলেন। বাসে যাইবেন, না ট্যাক্সি করিবেন স্থির করিতে তাঁহার একটু সময় লাগিল। ট্যাক্সি করিয়া অতগুলা পয়সা খরচ করিতে তাঁহার মন সরিতেছিল না।

"বাসে খুব ভিড় হবে?"

কুলিটাকে প্রশ্ন করিলেন।

"বাসে ভিড় হবে বইকি। মালপত্র নিয়ে অসুবিধাও হবে।"

"তবে চল, একটা ট্যাক্সিতেই চল—"

মনে একটা যুক্তিও জাগিল। তাড়াতাড়ি যাওয়াই উচিত, বরেন ছোকরা কি কাণ্ড যে করিয়া গিয়াছে কে জানে। কিন্তু বাড়িতে গিয়া যাহা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইল তাহার পূর্বাভাস পাইলে ট্যাক্সি চড়িয়া তিনি আসিতেন না। মোটেই আসিতেন কিনা সন্দেহ। গিয়া দেখিলেন ও. সি. কুণ্ডু বারান্দায় বসিয়া অধীরভাবে পা দোলাইতেছেন।

"গুড মর্নিং যোগজীবনবাবু। শো মি ইওর ওয়াইফ্।"

বিধুভূষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"আপনি কোথা ছিলেন এতক্ষণ। ট্রেন থেকে কোথা গেলেন—"

"ট্রেনটা থেমে যেতেই আমি নেবে পড়লাম। শুনলাম ট্রেনে বোমা পড়েছে। সিরিয়াস ব্যাপার! কে বোমা ফেলেছে তারই সন্ধানে ছুটোছুটি করলাম খানিকক্ষণ। তারপর মনে হল ছুটোছুটি করে লাভ নেই। সঙ্গে ক্যামেরা ছিল। ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে চট্ করে ফটো তুলে ফেললাম গাড়িটার। ওই ফটো থেকেই 'ক্লু' বার করব আমি। আপনার ব্যাপারটা মিটিয়ে দিল্লী ছুটতে হবে আজই আমাকে। দেরি করবেন না, শো মি ইওর ওয়াইফ্। ভাগ্যে আপনার ঠিকানাটা টুকে রেখেছিলাম তা না হলে এবারও আপনি ঠিক ফসকে যেতেন। নিন, আর দেরি করবেন না—"

ও. সি. কুণ্ডু তাঁহার রিস্টওয়াচে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

ভৃত্য মধু বাহির হইয়া আসিয়া দণ্ডবৎ করিল। মধুকে দেখিয়া বিধুভূষণ একটু যেন সাহস পাইলেন।

"মধু, এর জন্যে একটা চা-জলখাবারের ব্যবস্থা কর। আপনি বসুন, আমি কাপড়-চোপড়গুলো ছেড়ে আসি।"

মধু চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ও. সি. কুণ্ডু বলিলেন, "আপনার এখানে এক গণ্ডূষ জল পর্যন্ত খাব না। নট্ এ ড্রপ্—"

"বসুন তা হলে। আসছি আমি ভেতর থেকে।"

"আমিও আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাব।"

"কেন?"

"আপনি যদি সরে পড়েন! আই অ্যাম নট এ ফুল। হয় আপনার স্ত্রীকে এখানে ডেকে পাঠান, কিংবা আমাকে ভিতরে নিয়ে চলুন। আপনাকে আমি চোখের আড়াল করব না।"

"যদি আমি জোর করে চলে যাই, কি করবেন?"

ও. সি. কুণ্ডু পকেট হইতে প্রকাণ্ড হুইসল্‌টি বাহির করিয়া বলিলেন, "এইটি বাজাব। বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিস এসে ঘিরে ফেলবে আপনার বাড়ি।"

বিধুভূষণ বিস্ফারিতচক্ষে হুইসল্‌টির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর মস্তকে একবার হাত বুলাইয়া বলিলেন, "বেশ, আসুন তা হলে আমার সঙ্গে ওপরে।"

"চলুন।"

উপরে উঠিয়াই ঝিয়ের সহিত দেখা হইল।

বিধুভূষণ বেশ সপ্রতিভভাবেই প্রশ্ন করিলেন, "উনি কোথা—"

"চান করছেন।"

"খবর দাও, বল একজন ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বসুন আপনি—"

ঝি চলিয়া গেল।

ও. সি. কুণ্ডু বলিলেন, "আপনিও বসুন।"

উভয়ে মুখোমুখি খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। বিধুভূষণের বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল। প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা হইতেছিল বিশাখা আসিয়া হয়তো সব ভণ্ডুল করিয়া দিবে। বিশাখার সহিত কথাবার্তা কহিবারও সুযোগ দিল না লোকটা।

"আমি একবার ভিতরে গিয়ে দেখি।"

"আপত্তি নাই, কিন্তু আমিও যাব।"

"এমন সময় দ্বার ঠেলিয়া একটি তরুণী প্রবেশ করিল। বিধুভূষণ বিস্মিত হইয়া গেলেন! এ কে! এ তো বিশাখা নয়।

"ইনিই আপনার স্ত্রী?"

"হ্যাঁ—"

ইহা বলা ছাড়া বিধুভূষণের গত্যন্তর ছিল না।

"আপনিই এর স্ত্রী?"

তরুণীটি ঘাড় হেঁট করিয়া একটু মুচকি হাসিল, তাহার পর ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

"বিধু, ও বিধু —ওপরে আছ নাকি?" নীচে হইতে ভূপেশের গলা শোনা গেল। মধুও প্রবেশ করিয়া খবরটি দিল, "নীচে ভূপেশবাবু এসেছেন—"

বিধুভূষণ মধুকে প্রশ্ন করিলেন, "মধু, আর একটি মেয়েকে এখানে রেখে গিয়েছিলাম, তিনি কোথায়?"

"তিনি বরেনবাবুর সঙ্গে চলে গেছেন, আর ফেরেননি।"

"তুমি ভূপেশবাবুকে ওপরেই পাঠিয়ে দাও।"

মধু নীচে নামিয়া গেল।

ও. সি. কুণ্ডু বলিলেন, "আপনার স্ত্রীকে আর একবার ডাকুন, দুচারটে কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।"

"আবার কি জিজ্ঞেস করবেন?"

"ডাকুনই না।"

"ও ঝি, ওঁকে আর একবার বাইরে আসতে বল—"

বিধুভূষণ মহাফাঁপরে পড়িয়া গেলেন। মেয়েটি কে, কোথা হইতে আসিল, কেনই বা আসিয়াছে, কিছুই তাঁহার জানা নাই। জেরার মুখে কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিবে তাহাও অনিশ্চিত। ভূপেশও আবার ঠিক এই সময়ে আসিয়া জুটিয়া গেল।

তরুণীটি দ্বার ঠেলিয়া পুনরায় প্রবেশ করিল। ও. সি. কুণ্ডু জেরা শুরু করিলেন।

"আপনার নাম কি?"

"সুলোচনা।"

"কতদিন আগে বিয়ে হয়েছে আপনার?"

সুলোচনা কোন উত্তর না দিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভূপেশ মজুমদার প্রবেশ করিলেন।

"এই যে সুলি, যাক বাঁচা গেল"—সুলোচনা আগাইয়া আসিয়া ভূপেশকে প্রণাম করিল এবং প্রণাম করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। ও. সি. কুণ্ডুর দিকে চাহিয়া ভূপেশ প্রশ্ন করিলেন — "ইনি কে—"

ও. সি. কুণ্ডু নিজেই আত্মপরিচয় দিলেন।

"আমি ও. সি. কুণ্ডু, ডিটেকটিভ।"

ভূপেশের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল।

"এখানে কি করছেন?"

"এর স্ত্রীর সম্বন্ধে একটু এনকোয়ারি করতে এসেছি।"

"বিধুর স্ত্রী সম্বন্ধে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আমার সন্দেহ ওর নাম বিধু নয়, যোগজীবন।"

"যে মেয়েটি এখানে দাঁড়িয়েছিল আপনার ধারণা তিনি বিধুর স্ত্রী?"

"উনি স্ত্রী বলেই তো পরিচয় দিলেন।"

ভূপেশ সবিস্ময়ে শুনিলেন বিধুভূষণ একটা অপ্রতিভ হাস্যে হাসিয়া বলিতেছেন—"হ্যাঁ, আমার স্ত্রী বই কি। তুমি যে আকাশ থেকে পড়লে।"

ভূপেশের ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হইল। মধু কয়েক পেয়ালা চা হইয়া প্রবেশ করিয়াছিল। ভূপেশ তাহাকে বলিলেন, "মধু, নীচে গাড়ি থেকে আমার বড় ব্যাগটা নিয়ে এস তো—"

ব্যাগ আসিলে ভূপেশ তাহার ভিতর হইতে একটি ফটো অ্যালবাম বাহির করিয়া খাতা উলটাইতে লাগিলেন। উলটাইতে উলটাইতে একটা পাতায় আসিয়া থামিয়া গেলেন তিনি। আর একবার ও. সি. কুণ্ডুর মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আপনাকে অনেকদিন থেকে খুঁজছি আমরা। আপনি পাগলা-গারদ থেকে পালিয়ে এসেছেন না?"

ও. সি. কুণ্ডু হঠাৎ উঠিয়া দ্বারের দিকে ধাবমান হইলেন। কিন্তু ভূপেশের ক্ষিপ্রতার কাছে তাঁহাকে হার মানিতে হইল। ভূপেশ তাঁহাকে ধরিয়া টানিতে টানিতে নীচে লইয়া গেলেন এবং যে পুলিশ কনস্টেবলটি তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহার হাতে তাহাকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "লোকটা পাগলা গারদ থেকে পালিয়েছে, একে এখন নিয়ে গিয়ে একটা লক-আপে রেখে দাও। পরে গিয়ে আমি ব্যবস্থা করছি। একটা মোটরে করেই নিয়ে যাও।"

বিধুভূষণও ভূপেশের সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিয়াছিলেন। দেখিলেন ও. সি. কুণ্ডু পকেট হইতে হুইসল্‌টি বাহির করিয়া খুব জোরে জোরে বাজাইতেছেন আর বলিতেছেন, "মজা দেখাচ্ছি দাঁড়ান আপনাদের। আলিগলি থেকে পিলপিল করে আর্মড ফোর্স এসে পড়বে এখুনি—"

পুলিশ কনস্টেবল একটি ধাবমান ট্যাক্সিকে থামাইল।

ও. সি. কুণ্ডু ট্যাক্সিতে চড়িতে আপত্তি করিলেন না, হুইস্‌ল বাজাইতে বাজাইতে ট্যাক্সি চড়িয়া চলিয়া গেলেন।

"লোকটা পাগল?"—বিধুভূষণ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন।

"হ্যাঁ। তুমি এর পাল্লায় পড়লে কি করে!"

"সব বলছি, চল।"

"তুমি হঠাৎ সুলোচনাকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে গেলে কেন?"

"ও মেয়েটিকে তুমি চেন না কি?"

"আরে, ওই তো আমার সেই শালীর মেয়ে যার সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলাম—"

"ও এখানে এল কি করে?"

"মজিদ রেখে গেছে।"

"তার মানে?"

"ওপরে চল, সব খুলে বলছি।"

উপরের একটি ঘরে ঢুকিয়া বিধুভূষণ বলিলেন, "কপাটটা ভেজিয়ে দাও, খিলই দিয়ে দাও। তোমাকে আজ আমার জীবনের এমন অনেক কথা বলব যা আর কাউকে বলিনি কখনও। তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি তো?"

"নিশ্চয়।"

"তবে শোন।"

বিধুভূষণ অকপটে নিজের জীবনের সমস্ত কাহিনী খুলিয়া বলিলেন। কিছুই গোপন করিলেন না। কাহিনী শেষ হইলে বলিলেন, "এইবার আমি ভদ্রভাবে থাকতে চাই, ভাই। তুমি একটু সাহায্য কর আমাকে। তোমার শালীর মেয়েকেই আমি বিয়ে করব, অবশ্য সব কথা শোনার পর তোমার যদি বিয়ে দিতে আপত্তি না থাকে।"

ভূপেশ নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। বিধুর এই কথায় তাঁহার চমক ভাঙিল। বলিলেন, "না আমার আপত্তি নেই। কিন্তু কথাটা পাকাপাকি হবার আগে তোমারও একটা কথা জানা দরকার।"

"কি বল।"

"সুলোচনা অন্তঃসত্ত্বা।"

বিধুভূষণ ক্ষণকাল নির্বাক হইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তা হোক। আমার মা-ও কুমারী অবস্থায় অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল। কুন্তীও হয়েছিল। আমি ছেলেবেলায় বড় কষ্ট পেয়েছি ভাই। আমাকে কেউ ছুঁতো না, পাঁঠা বলে ডাকত সবাই। সুলোচনার সন্তান দুঃখ পাবে না আমার কাছে। ছেলেবেলায় ভালবাসা না পাওয়ার যে কি দুঃখ তা মর্মে মর্মে আমি জানি। সুলোচনার ছেলেকে বুকে করে মানুষ করব আমি—আমাকে তুমি বিশ্বাস কর—"

ভূপেশ হাসিয়া বলিলেন—"বেশ।"



জলতরঙ্গ

প্রথম পর্ব

গল্পের কথক শ্রীসাত্যকি রায়ের নিবেদন

এই কাহিনীটির সম্বন্ধে প্রথমেই একটি কথা আপনাদের বলতে চাই। এ কাহিনী কোনোদিনই আমি লিখতাম না, এ লেখার যে বিশেষ কোনো সার্থকতা আছে তাও আমি মনে করি না, অবশ্য সার্থকতা কথাটা আমি নিতান্ত স্থূল আধিভৌতিক অর্থেই ব্যবহার করছি, আমরা ধারণা এ গল্প বাজারে বিক্রি হবে না। ধনী মাত্রেই পাষণ্ড এবং সুন্দরী যুবতী মাত্রেই বিপথে যাবার জন্যে উৎসুক এই যেখানে অধিকাংশ জনপ্রিয় গল্পের মূল সুর, সেখানে এ গল্প চালু করা শক্ত। তাছাড়া এটা গল্প নয়, সত্য ঘটনা। সত্য ঘটনার গায়ে রং না দিলে তা শিল্প হয়ে ওঠে না। কিন্তু শ্রীমতী বর্ণনা, যার জেদে আমি এই গল্প লিখতে বাধ্য হয়েছি, নিছক সত্যের বাইরে এক পা-ও যাবার অধিকার দেয়নি আমাকে।

এই কাহিনীর পাত্র-পাত্রীরা অনেকে এখনও জীবিত। বিশেষ করে ভূষণ চক্রবর্তী বেশ প্রবলভাবেই জীবিত আছেন শুনেছি, এখনও ডাম্বেল মুগুর ভাঁজেন নিয়মিত রূপে। এই গল্পের মধ্যে তিনি তাঁর স্বরূপ আবিষ্কার করে যদি ক্ষেপে ওঠেন তাহলে আমার জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। সত্যের খাতিরে দু'চারজন তথাকথিত আর্ট-ক্রিটিক, একজন জ্যোতিষী, একজন কামার্ত ধনীর সত্য চরিত্রও এ কাহিনীতে আঁকতে হয়েছে। এঁরাও ইচ্ছে করলে আইনের সাহায্য নিয়ে আমাকে নাস্তানাবুদ করতে পারেন, কারণ টাকার জোর থাকলে এ যুগে একটা ছারপোকাও একটা হাতিকে ওরিএন্টাল নাচ নাচাতে পারে;—এ সবই শ্রীমতী বর্ণনাকে বলেছিলাম, কিন্তু তবু সে আমাকে সত্য ঘটনার গায়ে অসত্য কল্পনার রং লাগাবার অনুমতি দেয়নি। সে আমাকে প্রথমে যা করতে বলেছিল তা আরও বিপজ্জনক। সে আমাকে তার বাবার একটা প্রামাণিক জীবন-চরিতই লিখে দিতে অনুরোধ করেছিল। তার জন্যেই সমস্ত মাল-মসলা যোগাড় করে এনেছিল সে, 'সুখপুর-পত্রিকা'র ফাইল তার কাছ থেকেই আমি পেয়েছি, কিন্তু সব দেখে-শুনে আমি পিছিয়ে গেলাম। বললাম স্বর্গীয় ব্রজেন বাঁড়ুজ্যে বেঁচে থাকলে যা করতে পারতেন সাত্যকি রায় তা পারবে না। আমি এই সব মাল-মসলার সাহায্যে বড়জোর একটা উপন্যাস-জাতীয় কিছু লিখে দিতে পারি, কিন্তু ইতিহাসসম্মত জীবন-চরিত লেখা আমার কর্ম নয়। আর জীবন-চরিত লিখে হবেই বা কি। চৈতন্য-চরিতামৃত বা বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিতই এ দেশের লোক পড়ে না। তোমার বাবা যদি নামজাদা সিনেমাস্টার হতেন তাহলে হয়তো কেউ কেউ পড়ত। একথা বলে আমি যেমন একদিকে জীবন-চরিত লেখার দায় থেকে অব্যাহতি পেলাম, অন্যদিকে তেমনি পা দিলাম আর এক ফাঁদে। নিজের মুখেই স্বীকার করে বসলাম এই মাল-মসলার সাহায্যে উপন্যাস জাতীয় কিছু একটা লিখে দিতে পারব। বর্ণনা শান্তকণ্ঠে বললে, "তবে তাই লেখ। কিন্তু মিথ্যে রং চড়িয়ে একটা আজগুবি কাণ্ড করে বস না যেন। কল্পনার রাশ আলগা করলে তোমার

তো আর জ্ঞান থাকে না।" কোনও যুবতী স্ত্রীলোককে যুক্তি দিয়ে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম মাত্র, তার উপর সে যদি রূপসী এবং জেদি হয়, ঘাড় নেড়ে, অলক দুলিয়ে, মুচকি হেসে, ভ্রূভঙ্গি করে নানা কৌশলে নিজের গোঁ বজায় রাখবার প্রয়াস পায়, তাহলে তাকে বোঝাবার চেষ্টা-রূপ নদী যে বিফলতার মরু-পথে হারিয়ে যাবেই তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। তবু আমি চেষ্টা করেছিলাম। বলেছিলাম, "তোমার বাবা আর জ্যাঠামশায়ের চরিত্র যদি হুবহু আঁকি তাহলে সেটাই অবিশ্বাস্য রকম আজগুবি হবে। কোলকাতার কাছেই এক পাড়াগাঁয়ে একজোড়া রোমশ ম্যামথ বাস করত, এ কথা বরং কেউ কেউ বিশ্বাস করতেও পারে, কিন্তু এ যুগেও তোমার বাবা আর জ্যাঠামশায়ের মতো লোক যে থাকতে পারেন এ কথা বিশ্বাসই করবে না কেউ। ভাববে আমি রূপকথা লিখেছি। বল তো কল্পনার সাহায্যে ও দুটো চরিত্রকে একটু স্বাভাবিক কববার চেষ্টা করি।"

বর্ণনা বলল, "না, তা করতে হবে না তোমাকে। আমি চাই ওঁদের ঠিক স্বরূপটি আঁকা হোক। সেই জন্যেই জীবন-চরিত লিখতে বসেছিলাম। কিন্তু তোমার স্বভাবই হচ্ছে, আমি যে রাস্তায় যেতে বলব, ঠিক তার উল্টো রাস্তায় যাবে তুমি। আমি চাই লোকে জানুক, আমার বাবা জ্যাঠা কি রকম মানুষ ছিলেন। আমি যেমন তাঁদের ফোটো রেখেছি তেমনি তাঁদের চরিত্রের নিখুঁত বর্ণনাও রেখে যেতে চাই। অতি দূর ভবিষ্যতে আমার বংশধরেরা জানবে, কেমন ছিলেন তাঁদের পূর্বপুরুষরা। আমার বিশ্বাস জেনে তারা গর্ব অনুভব করবে।"

স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে এল বর্ণনার চোখের দৃষ্টি। বুঝলাম, ঠিক এই মুহূর্তে এর বিরুদ্ধে আব কিছু বলা সমীচীন নয়।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলাম, "এ বই কি তুমি ছাপাবে?"

"নিশ্চয়।"

"আমার কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে একটা। এ বই কোনো প্রকাশক ছাপাতে রাজি হবে কি না সন্দেহ।"

"আমার বাবা জ্যাঠার কাহিনী জানবার পর তুমি ভাবলে কি করে যে আমি কোনও প্রকাশকেব দ্বারস্থ হব? আমি তো তাঁদেরই মেয়ে। আমি এটা ছাপাব নিজের খরচে এবং বিতরণ করব বিনামূল্যে"— তারপর হঠাৎ একটু হেসে বলল—"অবশ্য তুমি যদি লিখে দিতে না চাও তাহলে আমি জোর করতে চাই না। অন্য লেখকের শরণাপন্ন হতে হবে আমাকে, আর আমার ভুলটাও ভেঙে যাবে তাহলে।"

"কি ভুল?"

"যে তোমার উপর আমার জোর করবার অধিকার আছে। একটা ভুল বিশ্বাসের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছি হয়তো—"

বর্ণনার পাতলা ঠোঁট দুটি ঘিরে যদিও হাসি চিকমিক করছিল, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি সহসা বিদ্যুৎ-বর্ষী হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম যুক্তি-টুক্তি বিসর্জন দিয়ে রাজি হতে হবে আমাকে।

"আমি লিখে দেব না, একথা তো একবারও বলিনি। তোমার জন্যে যা যা করেছি তা তুমি জানো। এ বই বেরুলে বড় জোর আমার না হয় জেল হবে মাস কয়েক, তাতেও আমি পিছপা নই, সেটা খুব বড় একটা ট্র্যাজিডিও হবে না, কিন্তু মর্মান্তক ট্র্যাজিডি হবে বইখানার প্রচার যদি আইনের জোরে বন্ধ হয়ে যায়—"

"তা হবার সম্ভাবনা আছে না কি?"

"খুব আছে। খারাপ লোককেও প্রকাশ্যভাবে খারাপ বললে সে তোমাকে মানহানির দায়ে ফেলতে পারে। আইন তার স্বপক্ষে—"

এ কথা শুনে বর্ণনা মুষড়ে গেল একটু। বরং এ অবস্থায় সাধারণত সে যা করে তাই করতে লাগল, বাঁ কানের উপরের চুলগুলো তিনটে আঙুল দিয়ে টানতে লাগল আস্তে আস্তে, আর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। নাকের সূক্ষ্ম ডগাটাও যেন কেঁপে উঠল দু'একবাব। কষ্ট হতে লাগল তাকে দেখে।

"একটা কাজ করলে অবশ্য হতে পারে।"

"কি?"

"নামগুলো সব যদি বদলে দেওয়া যায়। আমার বিশ্বাস তাহলে কেউ আর ধরতে পারবে না। দু'একটা অবান্তর ঘটনাও অবশ্য ঢোকাতে হবে ওর মধ্যে, যাতে ওদের মনে হয় যে গল্পটা সত্যিই কল্পনা-প্রসূত—"

মুখ গোঁজ করে বসে রইল বর্ণনা কিছুক্ষণ।

তারপর বলল, "বেশ তাই কর তাহলে—"

সুতরাং এই গল্পের সমস্ত নামগুলিই কাল্পনিক, এমন কি বর্ণনার নামও বর্ণনা নয়, সুখপুরের নামও সুখপুর নয়। বলা বাহুল্য, আমার পরিচয়ও আমি যথাসাধ্য প্রচ্ছন্ন রাখবার প্রয়াস পেয়েছি। আমার নাম থেকেই সেটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়, কারণ মহাভারত-যুগের পর কোনও লোকই সম্ভবত নিজের ছেলের নাম সাত্যকি রাখেননি, আমার বাবা তো একথা ভাবতেই পারতেন না। আর একটা কথাও বলা দরকার, এই বিশেষ কাহিনীর জগতেই যে আমি নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেছি তা নয়, বাইরের বাস্তব-জগতেও নিজেকে আমি প্রচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করেছি বরাবর। ভারী আনন্দ পেয়েছি এতে। অপরিচয়ের বোরখা ঢাকা দিলে জগতের যে রূপ দেখা যায়, স্বরূপে তা দেখা সম্ভব নয় মোটেই। চেনা লোক সর্বদাই আপনার কাছে একটা বিশেষ রূপ নিয়ে আসে, তার বিশেষ রকম হাসি, বিশেষ রকম কথাবার্তা, বিশেষ রকম ব্যবহার ছাড়া তার আর কিছুই আপনি দেখতে পান না! কিন্তু তার কাছে যদি অচেনা হয়ে যান তাহলে তার আর এক রূপ, সম্ভবত তার সত্য রূপই দেখতে পাবেন আপনি, আরব্য উপন্যাসের হারুণ-অল্-রশীদ যেমন পেতেন।

গল্পটি দুই পর্বে ভাগ করে আমি বলছি। প্রথম পর্ব এবং দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কুড়ি বছর। বর্ণনার জন্মের সঙ্গে প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হয়েছে বর্ণনার বয়স যখন কুড়ি বছর।

।। এক ।।

একটা বিরাট বনস্পতিকে কেউ যদি তার আরণ্য পরিবেশ থেকে উপড়ে এনে একটা টবে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করে তাহলে তা যেমন যুগপৎ হাস্যকর এবং করুণ হয়, শ্রীমতী বর্ণনা সুখপুর গ্রামের বনস্পতি মিশ্রকে কোলকাতা শহরের এক ভাড়াটে বাসায় এনে ঠিক তেমনি এক হাস্যকর এবং করুণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বসল। বনস্পতি আসতে চাননি, বর্ণনাও জানত এলে তাঁর কষ্ট হবে খুব, তবু তাঁকে আসতে হয়েছিল, না এসে উপায় ছিল না।

ব্যাপারটা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে হলে পূর্ব ইতিহাস জানতে হয়। বনস্পতির পিতা গৃহপতি মিশ্র সুখপুর গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন একজন। গঙ্গার ধারে ধারে দুশ' বিঘে ধানের জমি ছিল তাঁর। যেবার কম ফলত, সেবারও বিঘে পিছু দশ মণ ধান পেতেন তিনি। সুতরাং লোকে যে তাঁর সংসারকে লক্ষ্মীর সংসার বলত, সেটা অত্যুক্তি নয়। অন্নবস্ত্রের চিন্তা ছিল না বলেই শখও ছিল তাঁর নানারকম। ফুলের বাগান, ফলের বাগান, খাওয়া-খাওয়ানো, গান-বাজনা এই সব নিয়েই জীবন কাটিয়েছিলেন তিনি। চন্দন গাছ, হিং গাছ, কমলালেবুর গাছ, আঙ্গুর লতা ছিল তাঁর বাগানে। শোনা যায় লবঙ্গ-লতা, এলা-লতা আর সোম-লতা চাষ করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে অনেক অর্থ ব্যয় করেছিলেন তিনি, কিন্তু সফলকাম হননি। বিলিতি ব্যাঞ্জো বাজনাটা শেখবার চেষ্টা করেছিলেন, বাজনাটা নতুন আমদানি হয়েছিল তখন এদেশে, কিন্তু গুরুর অভাবে সেটাকেও আয়ত্তে আনতে পারেননি ভাল করে। লেখাপড়ার শখও ছিল তাঁর। সেকালে যত রকম বাংলা বই বেরুত, সব কিনতেন তিনি। উর্দু বই, সংস্কৃত বইয়েরও ভাল সংগ্রহ ছিল তাঁর। তাঁর বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল সংস্কৃত উদ্ভট-শ্লোকের প্রতি। অনেক শ্লোক কণ্ঠস্থও ছিল, প্রায়ই আওড়াতেন। আর একটা বিশেষত্বও তাঁর দেখা গিয়েছিল পরে। স্ত্রী-বিয়োগের পর মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতেন। নানারকম গুজব উঠত এ নিয়ে প্রথম প্রথম। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল তিনি বেশি দূরে যান না। তাঁর বাড়ির কাছেই 'বুড়ির জঙ্গল' বলে যে বনকরটা তিনি কিনেছিলেন সেইখানে নির্জন-বাস করেন গিয়ে। কিছুদিন পরে আবিষ্কৃত হল সেখানে একটি ছোট কুঁড়েঘর আছে, কুয়াও আছে একটি। বুড়ির জঙ্গলের এই কুঁড়ে ঘরে স্বপাক আহার করে একা একা বানপ্রস্থের মহড়া দিতেন তিনি সম্ভবত।

মোট কথা, খুব খামখেয়ালি এবং শৌখিন লোক ছিলেন তিনি। ধনী তো ছিলেনই। আর একটি গুণ ছিল তাঁর (অনেকে এটাকে দোষ বলেও গণ্য করত) সে যুগে যা অধিকাংশ লোকেরই ছিল না। চরিত্রবান লোক ছিলেন তিনি। একটি মাত্র বিবাহ করেছিলেন। প্রথম যৌবনেই স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছিল তবু আর বিবাহ করেননি। দাম্পত্য-জীবনের বাইরে আর কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে সম্পর্কও রাখেননি। যে যুগে একাধিক বিবাহ এবং একাধিক রক্ষিতা-পালনই আভিজাত্যের বৈশিষ্ট্য ছিল সে যুগে গৃহপতির এই একনিষ্ঠ আচরণ বিস্ময় উৎপাদন করেছিল অনেকের মনে। অনেকে তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখত। অনেকে বিদ্রূপও করত। সম্ভবত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁর 'পাগলা গিরি' নাম দিয়েছিল এই জন্যেই। গৃহপতি নামটাকেই সংক্ষিপ্ত করে 'গিরি' করে নিয়েছিল তারা। পাগলামির আরও নানারকম পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি জীবনে। বাড়ির হাতায় কোনও গরু বা ছাগল ঢুকলে তাদের তিনি খোঁয়াড়ে

তো দিতেনই না, তাড়িয়েও দিতেন না। বরং ভাল করে খাওয়াতেন তাদের। বলতেন, ওরা অতিথি, মানুষ নয় বলেই কি ওদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা উচিত? একবার গ্রামের এক গরীবলোকের বাড়িতে ভূতের উপদ্রব শুরু হলো, গভীর রাত্রে তার বাড়ির চারিধারে পাঁঃ, পাঁঃ, পাঁঃ শব্দ শোনা যেতে লাগল। অনেক সন্ধান করেও কোনও মানুষ, পাখি বা জন্তু-জানোয়ার আবিষ্কার করা গেল না। তখন বাড়ির কর্তা খেতু গৃহপতির কাছে কেঁদে পড়ল এসে। গৃহপতির উপর কিছু দাবিও ছিল তার, কারণ গৃহপতির সহপাঠী ছিল সে পাঠশালায়। গৃহপতি গিয়ে খেতুর বাড়িতে রাত্রিবাস করলেন। পাঁঃ, পাঁঃ শব্দটা শুনলেন স্বকর্ণে। তারপর সকালে খেতুকে বললেন, "তোর ঠাকুরদার প্রেতাত্মা পায়েস খেতে চাইছেন। মনে নেই নিমন্ত্রণ খেতে খেতেই মৃত্যু হয়েছিল ওঁর? পুরো খাওয়াটা শেষ করতে পারেননি, পায়েসটা বাকি ছিল। সেই আকাঙ্ক্ষাটা আছে এখনও। ভাল করে পায়েস খাওয়া ওঁকে, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।" তার পরদিন নিজেই তিনি দু'মণ দুধের পায়েস তৈরি করিয়ে খাওয়ালেন সকলকে। খেতুর বাড়ির চারিদিকে ছোট ছোট খুরিতে করে একশ' খুরি পায়েস রেখে দেওয়া হল। তার পরদিন সকালে দেখা গেল একটি খুরিতেও পায়েস নেই, সব যেন কেউ চেটেপুটে খেয়েছে। এর পর থেকে শব্দটাও থেমে গেল।

গৃহপতির সম্বন্ধে এই ধরনের নানারকম কাহিনী প্রচলিত আছে।

গৃহপতির পত্নী রঞ্জাবতীও অসাধারণ মহিলা ছিলেন। গরীবের ঘরে জন্ম হয়েছিল তাঁর, গৃহপতির পিতা সুরপতি তাঁকে আবিষ্কার করেছিলেন এক গরীব যজমানের গৃহে। সুরপতি যজন-যাজন করতেন। যজন-যাজন করেই প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন তিনি সে যুগে। যে দু'শ বিঘে জমি গৃহপতির সংসারে পরে স্বাচ্ছন্দ্য এনেছিল তার অধিকাংশই সুরপতি পেয়েছিলেন ব্রহ্মত্র স্বরূপ। বড় বড় জমিদার এবং ধনীরা সুরপতির যজমান ছিলেন। সুলক্ষণা রঞ্জাবতীকে সুরপতি যখন আবিষ্কার করেছিলেন তখন তার বয়স ন'বছর। গৃহপতির বয়স তখন ষোল। গৃহপতি সুরপতির একমাত্র সন্তান ছিলেন। শৈশবে মাতৃহীনও হয়েছিলেন তিনি। তাই সুরপতি আর কালবিলম্ব না করে রঞ্জাবতীকে পুত্রবধূ করে এনেছিলেন। ভেবেছিলেন তাঁর গৃহে লক্ষ্মীর শূন্য আসন রঞ্জাবতীই সার্থকভাবে পূর্ণ করতে পারবে। তা তিনি পেরেছিলেন, সুরপতির আশা সফল হয়েছিল। খুব 'পয়' ছিল রঞ্জাবতীর। যে বছর তাঁর বিয়ে হয় সেই বছরই জমিতে এত ফসল ফলেছিল যে তা বিক্রি করে আরও পঞ্চাশ বিঘে জমি কিনতে পেরেছিলেন সুরপতি। গঙ্গার ধারের এই পঞ্চাশ বিঘে জমির নামই ছিল 'সোনা-ফলানি'। রঞ্জাবতী আসবার পর সুরপতির সংসারে ঐশ্বর্য যেন উথলে পড়েছিল। শেষ-জীবনে সুরপতি যজন-যাজন ছেড়ে দিয়েছিলেন। গৃহপতিকেও ও কাজে তিনি আর উৎসাহিত করেননি। বলতেন, খাঁটি ব্রাহ্মণ না হলে ওসব কাজ ঠিক মতো করা যায় না, আর যা ঠিক মতো করা যায় না তা করাও উচিত নয়। শেষ জীবনে চাষ-বাস নিয়েই থাকতেন তিনি।

গৃহপতিকে গৃহস্থাশ্রমে স্থাপন করে দুটি পৌত্রমুখ দেখে সুরপতি গঙ্গাতীরে সজ্ঞানে হরিনাম করতে করতে যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তখন গৃহপতির বয়স পঁয়ত্রিশ বছর, রঞ্জাবতী তখনও যৌবন-সীমা অতিক্রম করেননি। গৃহপতির বড় ছেলে বকু তখন বারো বছরের, ছোট ছেলে বনু দশ বছরের। এদের নামকরণ সুরপতিই করেছিলেন। বক্ বক্ করত বলে তিনি বড় নাতির নাম দিয়েছিলেন বকু আর ভাল নাম বাচস্পতি। ছোট নাতিটি ছিল একটু বন্য

স্বভাবের, তাই তার ডাক নাম দিয়েছিলেন বনু (মাঝে মাঝে বুনো বলেও ডাকতেন তাকে) আর ভাল নাম বনস্পতি। বনু যখন খুব ছেলেমানুষ তখনই এটা সবাই লক্ষ্য করেছিল যে সে বনে-জঙ্গলে ঘাটে মাঠে ঘুরে বেড়ানোটাই পছন্দ করে বেশি। গঙ্গার চরে চরে, গ্রামেব বাগানে বাগানে, ঝোপে জঙ্গলে সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়াত সে। 'বুড়ির জঙ্গল' বনকরটা যখন কেনা হল তখন প্রায়ই সেখানে চলে যেত। নদীর ধারে আকাশের মেঘের দিকে চেয়ে তন্ময় হয়ে বসে থাকতে অনেকে দেখেছে তাকে। বকুর স্বভাব ছিল উল্টো। সে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াত আর প্রত্যেক বাড়ির খবর সংগ্রহ করে এনে সবিস্তারে বর্ণনা করত বাড়িতে। উত্তর জীবনে এরা যা হবে তা তাদের বাল্যকালেই আভাসিত হয়েছিল।

গ্রামের স্কুলে লেখাপড়া শিখেছিল দুজনে। গ্রামে মাইনর স্কুল ছিল একটি। সে স্কুল থেকে যখন তারা বেরুল তখন উচ্চশিক্ষা লাভ করবার জন্যে তাদের শহরে আর গৃহপতি পাঠালেন না। বললেন, ওরা চাকরি তো করবে না, ডাক্তার উকিলও হবে না। শুধু শুধু মেস-বোর্ডিংয়ের কদন্ন খেয়ে শরীর খারাপ করার দরকার কি তাহলে। তার চেয়ে বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করুক। হিরণ্ময় শিরোমণির কাছে সংস্কৃত পড়ুক বরং কিছুদিন, তারপর বড় হয়ে নিজেদের বিষয়-আশয় দেখুক। রঞ্জাবতীও সায় দিলেন এতে, ছেলে দুটিকে ঘিরেই তাঁর সংসার। তারা চোখের আড়ালে চলে যাবে, কোথায় থাকবে, কি খাবে—এ অনিশ্চয়তার মধ্যে ছেলেদের পাঠাতে রাজি হলেন না তিনি। তাঁব মনে হল ছেলেরাই যদি বাইরে থাকে তাহলে সংসারে তিনি থাকবেন কি নিয়ে? এত দুধ, এত ঘি, তরিতরকারি এসব খাবে কে? বারো মাসে তেরো পার্বণের উৎসব কাদের নিয়ে করবেন?

সুতরাং বাচস্পতি এবং বনস্পতির বিলাতী উচ্চশিক্ষা লাভ করা হল না। তারা হিরণ্ময় শিরোমণির কাছে উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কৌমুদী, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ পড়তে লাগল।

বছর দুই কাটল এইভাবে। বছর দুই পরে শিরোমণি মশায় তাঁর শিষ্যদের বললেন, তোমবা কিছু সংস্কৃত রচনা করে আমাকে দেখাও। রচনার বিষয় তোমরাই নির্বাচন কর।

বাচস্পতি লিখল—'ফাল্গুন মাসি পূর্ণিমা তিথৌ ভট্টাচার্যস্য ধুম্‌সি নাম্নী গাভী এক বিচিত্রবর্ণং বৎসং প্রসবয়ামাস।'...বনস্পতি কিছুই লিখল না দু'একদিন। বলল, কি লিখব ভাবছি। শিরোমণি মশায় তাগাদা দিলেন আবার। তখন সপ্তাহখানেক পরে যা লিখল সে তা কেউ প্রত্যাশা করেনি। লিখল—'বিবিধরাগরঞ্জিতা সন্ধ্যা-গগন-পটশোভা-জাহ্নবী-তরঙ্গ-শীর্ষে অবর্ণনীয় আলেখ্যং বিস্তারয়ামাস।' কালি দিয়ে লিখল না, হলুদ, চুন আর সিঁদুর দিয়ে লিখল, মনে হতে লাগল যেন সন্ধ্যার মেঘই অক্ষরের রূপ ধরেছে।

শিরোমণি মশায় প্রকৃত শিক্ষক ছিলেন। তিনি গৃহপতিকে বললেন, "তোমার দুটি ছেলেই ভাল, কিন্তু একরকম নয়। তোমার বড় ছেলেটির ঝোঁক দেখছি সংবাদ-সংগ্রহের দিকে। গ্রামের যাবতীয় সংবাদ ওর কাছে পাবে। আমার মনে হয় ইতিহাস আর প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে ওকে উৎসাহিত করা উচিত। এই সব গ্রন্থই ওকে পড়াতে হবে। আর তোমার ছোট ছেলেটির প্রবণতা শিল্পের দিকে। উৎসাহ দিলে চিত্রকর হতে পারবে। বকুর মতো ওরও সংবাদ-সংগ্রহ করার ঝোঁক আছে, কিন্তু সে সব সংবাদ সাধারণ মানুষের সংবাদ নয়, আলো বাতাস আকাশ অরণ্য এদের সংবাদ, সে সংবাদ ভাষায় ব্যক্ত হয় না, হয় বর্ণের ব্যঞ্জনায়। ওর বন্ধু কে জান? শীতল কুমোর আর হরি পোটো। ওর প্রতিভা স্ফুরিত হবে চিত্রকলায়—"

গৃহপতি যে এসব দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন তা মনে হয় না। তবে বাধাও দেননি। ছেলে দুটি আপন আপন খেয়াল-খুশির স্রোতে নিজেদের নৌকা ভাসিয়ে বড় হচ্ছিল। রঞ্জাবতী এই ভেবে খুশি ছিলেন যে এ সব খেয়াল বদ খেয়াল নয়। উৎসাহ দিতেন তিনি তাদের। বাচস্পতি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে নানারকম সংবাদ সংগ্রহ করে এনে একটি খাতায় লিখত। তারপর মা-কে পড়ে শোনাত সেগুলি। শুনে অবাক হয়ে যেতেন রঞ্জাবতী। গ্রামের মন্দির, গ্রামের পোড়ো ভিটে, সজনেপাড়ার রতনদীঘির পিছনে যে এত সব ইতিহাস ছিল তা কে জানত। অনেক পুরনো লোকের গল্পও যোগাড় করে আনত বাচস্পতি। যে সব গল্প লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায় কখনও কিংবদন্তী রূপে, কখনও রূপকথার আকারে, সেই গল্পগুলিকে সংগ্রহ করে এনে সে লিপিবদ্ধ করত তার 'সুখপুর-পত্রিকায়'। তার খাতাখানার নাম সে দিয়েছিল 'সুখপুর-পত্রিকা'। অতি সাধারণ সর্বজনবিদিত খবরও থাকত তাতে। হারু গাঙ্গুলীর বিধবা কন্যার আত্মহত্যা, চৌধুরী মশায়ের ছেলের উপনয়ন, নাপিতপাড়ায় গোখরো সাপের উৎপাত—এ ধরনের খবরও সুখপুর-পত্রিকায় লিখত সে অসঙ্কোচে। খবর যোগাড় করে আনা এবং সেটা পরিচ্ছন্ন করে খাতায় লেখা একটা নেশার মতো হয়ে গিয়েছিল তার। আর মা-ই ছিল তার একমাত্র শ্রোতা। শিরোমণি মশায়ও শুনতেন মাঝে মাঝে এবং সেগুলি সংস্কৃতে অনুবাদ করতে বলতেন। তা-ও করত বাচস্পতি আলাদা একটি খাতায়।

বনস্পতির প্রধান আড্ডা ছিল হরি পোটোর বাড়িতে। শীতল কুমোরের ওখানেও সে প্রায় যেত। তারা যে পদ্ধতিতে যে সব রং দিয়ে বরাবর পট বা মূর্তি করেছে তা শিখে নিতে বেশি সময় লাগেনি বনস্পতির। একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি কিন্তু ভাল লাগত না তার। সে চাইত নতুন কিছু করতে। নিজে করবার চেষ্টাও করত। একবার একটা তক্তার উপর আঠা মাখিয়ে, সেই আঠার উপর বালি আর মাটির গুঁড়ো ছড়িয়ে এমন সুন্দর উই-ঢিবি এঁকেছিল সে, যে তাক লেগে গিয়েছিল হরি পোটোর। খড়ির গুঁড়োর সঙ্গে নীল, তিসির তেল আর তার্পিন দিয়ে কেষ্ট ঠাকুরও গড়েছিল সে চমৎকার। মায়ের একটা ছবিও এঁকেছিল অদ্ভুত ধরনের। কাছ থেকে দেখলে মনে হত খাবছা খাবছা কতকগুলো রং লাগানো রয়েছে বুঝি কেবল। সব রকম রংই ছিল ছবিটাতে, এমন কি কালো রং পর্যন্ত।

রঞ্জাবতী ছবিটা দেখে বললেন, "ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া রং লাগিয়ে এ কি করেছিস তুই—"

"দূর থেকে দেখ। বারান্দার ওই দিকে চলে যাও একেবারে—" দূর থেকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন রঞ্জাবতী। চমৎকার রামধনু রঙের শাড়ি পরে পান সাজছেন তিনি নিজেই। মাথাটি হেঁট করে হাসছেনও মুচকি মুচকি। ঠোঁট দুটি টুকটুক করছে, কুচকুচ করছে মাথার চুল, আর ঝলমল করছে শাড়িখানা। হাতের সবুজ পানটা মনে হচ্ছে যেন পান্না। দেখে গৃহপতিও খুশি হলেন খুব। কিছুদিন পরে আর এক কাণ্ড করলে বনু। শিরোমণি মশায়ের একখানা ছবি এঁকে ফেললে কাঠের উপর, আর সেটা বাটালি দিয়ে কেটে এমন করলে যে দেখলে ঠিক মনে হয় জীবন্ত শিরোমণি মশায় বুঝি বসে আছেন। মাথার সামনে টাক, শুক-চঞ্চু নাসা, মুখে মৃদু হাসি, কানে খড়কে গোঁজা, অবিকল শিরোমণি মশায়।

বনস্পতি কালে যে একজন উঁচুদরের শিল্পী হবে সকলেরই মনে এ ধারণা দৃঢ় হল। তা দৃঢ়তর হল যখন সে গৃহপতি আর রঞ্জাবতীর দুটি বড় বড় মূর্তি তৈরি করে ফেললে সিমেন্ট

দিয়ে। গঙ্গার ধারে তাদের যে বাগানটা ছিল সেই বাগানে দুটি প্রকাণ্ড ছত্রের তলায় মূর্তি দুটি যখন স্থাপিত হল তখন মুগ্ধ হয়ে গেল সবাই। এই খবরটা লিপিবদ্ধও হয়েছিল বকুর 'সুখপুর-পত্রিকা'য়। সংবাদটি সে লিখেছিল যে ভাষায় তা-ও রীতিমতো পত্রিকার ভাষাই।

"নবীন শিল্পী শ্রীমান বনস্পতি মিশ্র কর্তৃক নির্মিত তাহার পিতা-মাতার সিমেন্ট-মূর্তি সুখপুর গ্রামস্থ সৈকত কাননে মহাসমারোহে স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমান বনস্পতির পিতৃদেব শ্রীযুক্ত গৃহপতি মিশ্র এবং জননী শ্রীযুক্ত রঞ্জাবতী দেবী উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীমানকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে একটি বিরাট ভোজেরও আয়োজন হইয়াছিল। সুখপুর গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ভূরি-ভোজনে তৃপ্তিলাভ করায় শ্রীমানের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা রঞ্জাবতী দেবী স্বহস্তে পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া এবং স্বহস্তে তাহা সকলকে পরিবেশন করিয়া মাতৃস্নেহের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা সুখপুরের অধিবাসীবৃন্দ সহজে বিস্মৃত হইবে বলিয়া মনে হয় না।"

'সৈকত-কানন' গৃহপতিরই গঙ্গার ধারের বাগানটার নাম। এইখানেই নানারকম শৌখীন গাছ পুঁতেছিলেন তিনি। একটা বেশ বড় বাড়িও ছিল সৈকত-কাননে।

এরপর গৃহপতির গৃহে যে সব ঘটনা ঘটেছে তা অসাধারণ কিছু নয়। বকু আর বনু যথানিয়মে বড় হয়েছে, তাদের বিবাহও দিয়েছেন গৃহপতি খুব ধুমধাম করে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে তীর্থ পর্যটন করে এসেছেন, গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছেন, দান-ধ্যান করেছেন, তারপর যথানিয়মে গঙ্গাতীরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন একে একে। রঞ্জাবতী আগে, গৃহপতি তার বছরখানেক পরে।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে গৃহপতি আর একটা কাজ করেছিলেন, সেটাকেও অসাধারণ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, অন্তত তাঁর পক্ষে এটা অসাধারণ। তিনি ছেলে দুটিকে ডেকে উপদেশ দিয়েছিলেন কিছু, যা তিনি ইতিপূর্বে আর কখনও দেননি তাদের।

বলেছিলেন, "দেখ, আমার এবার যাওয়ার সময় হল। তাই আজ তোমাদের ডেকেছি কিছু উপদেশ দেওয়ার জন্য। আমি জানি উপদেশ দিলে কেউ শোনে না, তাই এর আগে কখনও তোমাদের উপদেশ দিইনি। কিন্তু আজ হঠাৎ মনে হল সংসার থেকে বিদায় নেবার সময় আমার ঐহিক সম্পত্তি যা কিছু আছে তা যেমন তোমাদের দিয়ে যাব, আমার ঐহিক অভিজ্ঞতাটাও তেমনি দিয়ে যাওয়া উচিত। অভিজ্ঞতায় অভিনবত্ব কিছু নেই, আমাদের দেশের প্রাচীন কথাই আবার বলছি। কোনও কারণে স্বধর্ম ত্যাগ কোরো না। করলে কষ্ট পাবে। আর আত্মসম্মানকে রক্ষা করবে যখের ধনের মতো। ওটা যদি কোনও কারণে বিকিয়ে দাও তাহলে নিজের চোখেই নিজেকে হীন বলে মনে হবে। তার চেয়ে বড় কষ্ট আর নেই। সাধারণত অর্থাভাবে পড়ে লোকে এসব করে। ভগবানের কৃপায় যা রেখে যাচ্ছি তাতে সেরকম অভাব তোমাদের হওয়ার কথা নয়। এর বেশি আর বলবার কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, আর একটা কথাও মনে হচ্ছে সেটাও বলে যাই। তোমাদের ছেলে-মেয়ে দেখে যাবার সৌভাগ্য আমার হল না, তারা যখন আসবে তাদের আর সাবেক চালে মানুষ কোরো না—তোমাদের যেমন করেছি। কালের গতি বদলেছে, সমাজের চেহারাও বদলে যাচ্ছে, পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখতে হলে নিজেদেরও বদলাতে হবে। তাদের কোলকাতায় রেখে আধুনিক শিক্ষা দিও। সে শিক্ষা না পেলে তারা ঠিক মানিয়ে চলতে পারবে না সকলের সঙ্গে।"

।। দুই ।।

বাচস্পতির বিয়ে হয়েছিল এক গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে। রঞ্জাবতীই পছন্দ করেছিলেন মেয়েটিকে, মেয়ের নামটাও বদলে দিয়েছিলেন তিনি। মেয়ের ভাল নাম ছিল অসীমাসুন্দরী, আর ডাক নাম ছিল সিমু, তিনি ভাল নামটাকে সীমন্তিনী করে দিয়েছিলেন। সীমন্তিনীর রূপ গুণ দুই-ই ছিল। যেদিন সে বুঝল যে গৃহপতির গৃহের বড় বধূ হতে হবে তাকে, সেদিন থেকেই এর জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করেছিল সে। প্রস্তুতির অধিকাংশটাই অবশ্য হয়েছিল নেপথ্য মানসলোকে। বাইরে একটা জিনিস দেখা গিয়াছিল শুধু, খুব মন দিয়ে সে হাতের লেখা মক্‌শ করতে আরম্ভ করেছে। সে শুনেছিল বাচস্পতি লেখা-পড়া ভালবাসে, রোজ নিজে সুখপুর-পত্রিকা নামে একখানা বই লেখে। তখনই সে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল সে-ও বিয়ে হবার পর স্বামীকে সাহায্য করবে এ বিষয়ে। পাঠশালার পণ্ডিত হরু ঠাকুরের কাছে বসে রোজ মন দিয়ে হাতের লেখা লিখত। মুক্তোর মতো হাতের লেখা হয়েছিল তার। পরবর্তী জীবনে সিমুর নাম আবার বদলে দিয়েছিল বাচস্পতি। 'ছাপাখানা' বলে ডাকত তাকে। এই 'ছাপাখানা' না থাকলে 'সুখপুর-পত্রিকা' অচল হয়ে যেত। আর তাহলে বাচস্পতিও তার জীবনের অবলম্বন হারিয়ে ফেলত। সীমন্তিনীর কোনও ছেলেপিলে হয়নি, 'সুখপুর-পত্রিকা' তারও জীবনে অপত্যের স্থান অধিকার করেছিল। তাকেই সে সারাজীবন লালন করেছে মাতৃস্নেহে। বাড়িতে অবশ্য পরে সন্তান-সন্ততির অভাব হয়নি। সিমুর দাদা হিমুর সমস্ত পরিবারই এসে আশ্রয় নিয়েছিল বাচস্পতির সংসারে। প্রথম প্রথম সিমুকেই সব ভাব পোয়াতে হয়েছিল তাদের। হিমুর স্ত্রী সত্যবতী পৌরাণিক যুগের সত্যবতীর মতোই স্থির-যৌবনা ছিলেন। তাঁকে দেখলে মনে হত না যে তিনি পাঁচটি সন্তানের জননী, বরং মনে হত তাঁর বয়স কুড়ির নীচেই।

বনস্পতির বিয়ে হয় কোলকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। বনস্পতির স্ত্রী সরস্বতী রূপের জোরেই এসেছিলেন এ সংসারে। যে ঘটক বিয়ের সম্বন্ধ এনেছিলেন তিনি জোর গলায় বলেছিলেন—আপনার ছেলে শিল্পী, মানে সৃষ্টিকর্তা, তার জন্যে সত্যিই সরস্বতীর খোঁজ এনেছি আমি। এ তল্লাটে ওরকম মেয়ে আর দ্বিতীয় নেই, দেখে আসুন, সত্যিই কুন্দেন্দুবরণা। গৃহপতি দেখতে গিয়েছিলেন এবং দেখে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে একেবারে আশীর্বাদ করে বাড়ি ফিরেছিলেন তিনি। আশীর্বাদ করবার মাসখানেক পরই বিয়ের শাঁখ বেজে উঠেছিল বাড়িতে।

বিয়ের পর বনস্পতি মেতে উঠেছিল বউকে নিয়ে। অবশ্য উন্মাদনাটা সীমাবদ্ধ ছিল তার মানসলোকেই, কারণ সে যুগে বউ নিয়ে বাইরে বাড়াবাড়ি করবার উপায় ছিল না। আর একটা কথাও সঙ্গে সঙ্গেই বলে দেওয়া উচিত, তা না হলে আধুনিক যুগের পাঠক-পাঠিকারা হয়তো 'বাড়াবাড়ি' কথাটার ভুল অর্থ করতে পারেন। বিয়ের সময় সরস্বতীর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। বনস্পতির শিল্পী মনই মেতে উঠেছিল এই কুমারী কিশোরীকে নিয়ে। তার যে মন আকাশের অনন্ত রূপে অভিভূত হত, অরণ্যের নিত্য নব শোভাকে বর্ণের বন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা করত, গঙ্গার তীরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেও যা ক্লান্ত হত না কখনও, তার সেই শিল্পী-

মানস-শতদলেই এসে সমারূঢ়া হল রূপসী সরস্বতী। সে সরস্বতীর হাতে যে অদৃশ্য বর্ণের বীণায় অসংখ্য ছবির সুর বাজত তা সাধারণ লোকের শ্রুতিগোচর বা নয়নগোচর হত না। তা বনস্পতিকেই সম্মোহিত করত কেবল অনাস্বাদিত-পূর্ব রসে। ছবির পর ছবি এঁকে যেতে লাগল সে। নানারকমের ছবি, নানারকমের রং। নিজেই সে তৈরি করত নানারকমের রং। হলুদ, শিউলি ফুলের বোঁটা, লোহা, সুরকি-গুঁড়ো, তুঁত, হিরাকস, ফটকিরি প্রভৃতি নানা জিনিস মিলিয়ে মিশিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত রং সৃষ্টি করত সে, আর তাই নিয়ে মেতে থাকত দিনরাত। রঙের এই রাসায়নিক ক্রীড়ায় সব সময় যে সফল হত তা নয়, প্রায়ই বিফল হত, কিন্তু দমত না কখনও, বরং দ্বিগুণ উৎসাহে মেতে উঠত আবার। বাজারের প্রচলিত রং, রঙের বাক্স, তুলি এ সবই ছিল তার প্রচুর, কিন্তু সে আনন্দ পেত নিজের তৈরি রঙে ছবি এঁকে।

সরস্বতীর অনেক ছবি এঁকেছিল সে। কিন্তু একটি সরস্বতীও প্রচলিত সরস্বতীর মতো হয়নি। কুচকুচে কালো পটভূমিকায় দুলছে একটি ধবধবে সাদা পপি ফুল লম্বা সবুজ বৃন্তের উপর—নীচে নাম লেখা সরস্বতী। একদল শ্বেতহংস খেলা করছে পদ্মবনে, হাঁসগুলো মনে হচ্ছে পদ্মের মতন আর পদ্মগুলোই যেন হাঁস, একটি আধ-ফোটা পদ্ম চেয়ে আছে আকাশের দিকে—নীচে নাম লেখা সরস্বতী। কৃষ্ণমেঘের স্তর ভেদ করে চাঁদ উঠেছে পূর্ণিমায়—নীচে নাম লেখা সরস্বতী। এক ঝাঁক অপরাজিতা ফুল ফুটে আছে সবুজ লতাটিকে আচ্ছন্ন করে—নীচে নাম লেখা নীল সরস্বতী। বিরাট বাঘের থাবার নীচে পড়ে আছে রক্তাক্ত হরিণ ঘাড় মটকে— নীচে নাম লেখা রক্ত সরস্বতী। কত রকমের সরস্বতী যে এঁকেছিল সে তার আর ইয়ত্তা নেই। সৈকত-কাননে বড় হল-ঘর ছিল একটা, সেইখানেই খিল বন্ধ করে অধিকাংশ সময় থাকত সে, নিজেকে নিয়েই থাকত। রঞ্জাবতী যতদিন বেঁচেছিলেন জোর করে ধরে আনতেন তাকে নাওয়া-খাওয়ার জন্য। না ডাকলে আসত না। একবার ডাকলেও আসত না, অনেকবার ডাকতে হত।

আর একটা জিনিসও হয়েছিল' বাংলা সাহিত্যের সঙ্গেও পরিচয় ঘটেছিল দুই ভায়েরই। আগেই বলেছি গৃহপতি সবরকম বাংলা বই কিনতেন। দৈনিক সাপ্তাহিক পাক্ষিক মাসিক সব রকম সাময়িক পত্রিকারও গ্রাহক ছিলেন তিনি। সুতরাং দুজনেরই বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল ঘনিষ্ঠভাবে। এর ফলে দুজনের মনেই যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা-ও স্বাভাবিক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা ঘটল তা একটু অদ্ভুত। লেখক এবং চিত্রকরদের বাইরের জগতে আত্মপ্রকাশ করবার যে স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে তা বাচস্পতি বনস্পতি দুজনেরই ছিল। দুজনেই তাদের রচনা গোপনে গোপনে পাঠিয়েছিল বাংলা সাহিত্যের হাটে, সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকদের দপ্তরে, কিন্তু পাত্তা পায়নি সেখানে। অনেকদিন কোনও উত্তরই আসেনি। সঙ্গে টিকিট দেওয়া ছিল, ঠিকানা-লেখা খাম দেওয়া ছিল, তবু আসেনি। অনেকবার তাগাদা দেবার পর অমনোনীত হয়ে ফেরত এসেছিল বনস্পতির আঁকা ছবি একখানা। কিন্তু যে অবস্থায় এসেছিল তা দেখলে যে কোন শিল্পীরই বুক ফেটে যাবে। মোড়া, দোমড়ানো, ময়লা—শুদ্ধ ভাষায় ধর্ষিত এবং মর্ষিত হয়ে ফিরেছিল ছবিখানা। কোথাও কোথাও রংও উঠে গিয়েছিল। ছবিখানার দিকে চেয়ে চোখে জল এসে পড়েছিল বনস্পতির। এর কিছুদিন পরে সে হঠাৎ একদিন চমকে গেল তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে। সেখানে তার চোখে পড়ল মেঝেতে

একটা খাম আছে, তারই নাম-ঠিকানা লেখা খাম, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, তার নাম-ঠিকানা কেটে লাল কালিতে অপরের ঠিকানা লেখা রয়েছে তাতে। খামটা কুড়িয়ে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখলে সে। তারপর তার আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করল, এ খাম এখানে এল কি করে? তিনিও বলতে পারলেন না কিছু, তারপর একটু ভেবে বললেন, কাল হোর্‌মিলার কোম্পানির একটি ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনিই ফেলে গেছেন সম্ভবত। খামের ভিতর কোনো চিঠি ছিল না।

এই ঘটনার পর বনস্পতি তার ছবি আর কোথাও পাঠায়নি।

বাচস্পতির অভিজ্ঞতা আরও তিক্ত। সাতটি সাময়িক পত্রিকায় সে সুখপুর গ্রামের নানা বিবরণ পাঠিয়েছিল, কিন্তু কোথাও তা প্রকাশিত হয়নি। সাতটি পত্রিকার সম্পাদকদের মধ্যে সকলেই যে অভদ্র ছিলেন তা নয়, তিনজন চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করা যাবে না। ভারী দমে গিয়েছিল বাচস্পতি। বিমর্ষ বাচস্পতিকে সিমুই সান্ত্বনা দিয়েছিল।

বলেছিল, "ওরা তোমার লেখার মানেই বুঝতে পারেনি সম্ভবত। শুনেছি বড়লোকের আকাট মুখ্যু ছেলেরা নাকি ওই সব কাগজ চালায়। ওরা তোমার লেখার মর্ম বুঝতে পারে কখনও? শুধু শুধু পয়সা খরচ করে ওই বেনাবনে আর মুক্তো ছড়াতে যেও না তুমি।"

সাময়িক পত্রিকায় সম্পাদকেরা যে সবাই আকাট মুখ্যু বড়লোকের ছেলে এ অত্যুক্তি অবশ্য বাচস্পতি হজম করতে পারেনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিমু যে যুক্তিটা দিলে তা তার মনে লাগল।

সিমু বললে, "তাছাড়া আমাদের গ্রামের খবর, আমাদের পাড়ার লোকের খবর আমাদের যত ভালো লাগবে বাইরের লোকের তত লাগবে কেন। বাইরের লোকের কাছে এসব ছড়াবার দরকারই বা কি। এতদিন যেমন ঘরের লোকেদের জন্যে লিখছিলে তেমনি লেখ না। খাতায় না লিখে খবরের কাগজের মতো বড় বড় কাগজেই লেখ। ঠাকুরপো সুন্দর করে বর্ডার দেবে রং দিয়ে, আর আমি খুব ভালো করে টুকে দেব। শুনেছি আজকাল একরকম যন্ত্রও বেরিয়েছে তা দিয়ে অনেকগুলো কপি করা যায়। একবারের বেশি লিখতে হয় না। আমাদের গাঁয়ের ইস্কুলের মাস্টারমশাইরা ওই যন্ত্রে কোশ্চেন ছাপতেন দেখেছি। খোঁজ কর না কত দাম ওই যন্ত্রের। তাতে ছেপে ছেপে 'সুখপুর-পত্রিকা' তাহলে আত্মীয়-স্বজনদেরও পাঠানো যাবে।"

সিমুর এ কথাগুলো বেশ লেগেছিল বাচস্পতির।

কিন্তু যতদিন গৃহপতি এবং রঞ্জাবতী বেঁচেছিলেন ততদিন দু'ভায়ের খেয়াল মাত্রা ছাড়িয়ে যায়নি। সব একান্নবর্তী পরিবারে যেমন হয়, নগদ টাকা থাকে কর্তার দখলে। তিনি সকলেব ভরণ-পোষণ করেন, অনেক সময় ছেলেদের কিছু হাত-খরচও দেন, বনস্পতির ছবি-আঁকাব সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম গৃহপতি কিনে দিয়েছিলেন, কিন্তু খেয়াল-খুশিমতো টাকা খরচ করবার সুযোগ সে পায়নি। বাচস্পতি সাইক্লোস্টাইলও কিনেছিল গৃহপতির মৃত্যুর পরে।

গৃহপতির মৃত্যুর পরে আর একটা ঘটনাও ঘটেছিল যাতে ওদের পারিবারিক আবহাওয়ার সুরটা বদলে গিয়েছিল কিছুদিনের জন্য। সর্বস্বান্ত হয়ে বাচস্পতির শ্যালক হেমন্তকুমার ওরফে হিমু এসে সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছিল ওদের বাড়িতে। হেমন্তকুমারের পরিবারটাই পরবর্তী কালে সমস্যার সৃষ্টি করেছিল এদের জীবনে। তাই এ লোকটির পরিচয় একটু বিস্তৃত করে বলা দরকার।

॥ তিন ॥

শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় খুব গুণী লোক ছিলেন। তাঁকে বিবিধ জ্ঞানের আকর বললেও অত্যুক্তি হবে না। এঁর পিতা বসন্তকুমার রায় হেডপণ্ডিত ছিলেন গ্রামের স্কুলে, যদিও তিনি বাংলা ভাষায় বেশ বিদ্বান ছিলেন, সংস্কৃত জানতেন, ইতিহাস-ভূগোল-অঙ্কশাস্ত্রেও বেশ দখল ছিল তার, কিন্তু তবু তাঁর মনে ক্ষোভ ছিল তিনি বিলিতি উচ্চশিক্ষা পাননি। সেই আক্ষেপটা তিনি মেটাতে চেয়েছিলেন তাঁর একমাত্র পুত্র হেমন্তকুমারকে কোলকাতার স্কুলে পাঠিয়ে। ছেলে বোর্ডিংয়ে থাকত, তিনি মাসে মাসে টাকা পাঠাতেন। ছেলে লিখত, 'স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বাইরের বই না পড়লে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। 'স্কুলের লাইব্রেরিতে অনেক ভাল বই নেই, আপনি যদি কিছু বেশি টাকা পাঠান—।' বসন্তকুমার পাঠাতেন। ছেলে লিখল, 'কোলকাতার নানা জায়গায় ভাল ভাল বক্তৃতা হয়, আমি সেগুলি প্রায়ই শুনতে যাই, শুনে অনেক নূতন নূতন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি। কিন্তু ট্রামে যাতায়াত করতে বড় বেশি সময় নষ্ট হয়ে যায়, একটা যদি সাইকেল থাকত সুবিধা হত। আমি সাইকেল চড়তে শিখেছি। মাত্র একশ' টাকায় সাইকেল পাওয়া যাচ্ছে আজকাল—।' বসন্তকুমার ধার করে ছেলেকে একশ' টাকা পাঠালেন। শোনা যায় দুহিতারাই নাকি দোহন করে, কিন্তু পুত্র হেমন্তকুমার দোহন ব্যাপারে কান কেটে দিয়েছিল তাদের। পুত্রের বিষয়ে অন্ধ ছিলেন বসন্তকুমার। তার কোনো আবদার অগ্রাহ্য করতে পারতেন না। এমন কি সে যখন উপর্যুপরি দু'বার ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করল, তখনও তাঁর অন্ধত্ব ঘুচল না। তিনি ছেলেকে এক স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আর এক স্কুলে দিতে লাগলেন। আত্মীয়-স্বজনদের কাছে আলোচনা করতে লাগলেন, 'আজকালকার মাস্টাররা মোটেই ভাল করে পড়ায় না। হিমুর মতো ছেলেকেও যখন তারা পাশ করাতে পারছে না তখন তারা কি দরের মাস্টার বোঝ!' বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নানা জাতের স্কুলে আর বোর্ডিংয়ে ঘুরে ঘুরে বছর কয়েক কাটল হেমন্তকুমারের। সে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করতে পারলে না যদিও, কিন্তু শিখল নানা বিদ্যা। এক যোগাশ্রমে গিয়ে সে জানল প্রাণায়াম আর কুম্ভকের রহস্য, নানারকম আসনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে শিখল কি করে কাপড় কাচতে হয়, বাসন মাজতে হয়, রান্না করতে হয়, কি সুরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করলে মন্ত্র সফল হয়। টিকি রেখে গেরুয়াও পরেছিল দিনকতক, কারণ ওটাই সে আশ্রমের 'ইউনিফর্ম' ছিল। কিন্তু বেশিদিন মন টিকল না সেখানে। এর পর সে চলে এল শান্তিনিকেতনে। বেশ কিছুদিন ছিল সেখানে। নাচ, গান, অভিনয় আর চিত্রকলার জ্ঞানরসে যখন তার চিত্ত অভিষিক্ত হয়ে গেল তখন আর সেখানে থাকা প্রয়োজন মনে করল না সে। ছুটল গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রমের দিকে। সেখানে যদিও তেমন কল্কে পায়নি কিন্তু হালও ছাড়েনি সে। কোন এক গুজরাটী পরিবারের সঙ্গে ভাব করে সবরমতীর আশেপাশে কাটিয়েছিল কিছুদিন। গান্ধীতত্ত্বের নির্যাসটুকু হৃদয়ঙ্গম করে তবে ফিরেছিল। তারপর যে স্কুলে গিয়ে জুটল সেখানকার কর্তৃপক্ষদের ধারণা লাঠি-খেলা, ছোরা-খেলা, বক্সিং, কুস্তি, জুজুৎসু এইসব না শিখলে দেশোদ্ধার হবে না। সেখানে গিয়ে এই সবও শিখল সে কিছুদিন। কিন্তু ওসব বিষয়ে তাদৃশ পটুতা ছিল না তার, ভালও লাগত না খুব। এই সময়েই উদীয়মান একজন সাহিত্যিকের সঙ্গলাভ ঘটেছিল তার কপালে কিছুদিন। দু'একজন রাজনৈতিক নেতার তল্পিবাহক হবার সুযোগও পেয়েছিল সে। ম্যাট্রিকুলেশন সে পাশ করতে পারেনি তা ঠিক, কিন্তু কৃষ্টি-লাভ করেছিল সে এবং ওরই জোরে হয়তো সে শেষ পর্যন্ত একটা

কিছু হয়েও পড়ত। আজকাল সুযোগও তো হয়েছে নানারকম। কোনও সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠানের নেতা, কিংবা কোনও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রচার-সচিব, কিংবা কোনও বড় লোকের প্রাইভেট সেক্রেটারি, নিদেনপক্ষে কোনও উঠতি কাগজের সম্পাদক হওয়ার মতো যোগ্যতা তার ছিল। কিন্তু থাকলে কি হবে, শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারল না, বিধি বাম হলেন। হঠাৎ মারা গেলেন বসন্তকুমার। মণি-অর্ডার যোগে টাকা আসা বন্ধ হয়ে গেল। কপর্দকহীন হয়ে বিদেশে থাকা চলে না। বিদেশে থেকে চাকরির চেষ্টা করতে গেলেও টাকা চাই, আর হেমন্তকুমার যে সব চাকরির যোগ্য, তা দরখাস্ত করলে মেলে না, তার জন্যে চাই ভড়ং, বিনা পয়সায় ভড়ং হয় না। জনৈক ঘুন-ধরা রাজকুমারের প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়তো হতে পারত সে। "এদেশের পারিষদ আর বিদেশের বাট্‌লার এই দুই জীবের সমন্বয়ে হয়েছে আধুনিক প্রাইভেট সেক্রেটারি"—একথা হেমন্তকুমারই বলেছিল—"ও কাজ যদি পাই চুটিয়ে করতে পারব।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা পেলই না বেচারা। ভড়ং জাহির করে রাজকুমারের প্রাইভেট পছন্দ-কামরায় ঢোকবার মতো অর্থই জোটাতে পারল না সে।

পিতার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে সে যখন বাড়ি এল তখন তাকে দেখে ভড়কে গেল সবাই। পায়ে ছেঁড়া চটি, গায়ে জাপানী কিমোনো। যাঁরা কিমোনো দেখেননি তাঁদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে কিমোনো একটা আলখাল্লার মতো জিনিস, গলা থেকে পায়ের গোছ পর্যন্ত ঢাকা থাকে, হাত দুটো অত্যন্ত ঢিলে, আমাদের ঢিলে-হাতা পাঞ্জাবির হাতের পিতামহ, তার ভিতর আবার পকেটও থাকে। বাবার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে এমন অদ্ভুত পোশাক পরে সে কেন এল তা অনেকে জানতে চাইল। হেমন্তকুমার কিছু না বলে কিমোনোটি খুলে একবার দেখিয়ে দিল শুধু। সকলে সবিস্ময়ে দেখল, তার গায়ে গেঞ্জি পর্যন্ত নেই, পরনে শুধু একটি কৌপীন। হেমন্ত গম্ভীর ভাবে বলল—"বাবা টাকা পাঠাবেন এই আশায় ধার করেছিলাম। আমার যা কিছু ছিল, বই-বাক্স, কাপড়-জামা এমন কি গেঞ্জি পর্যন্ত বিক্রি করে সেই ধার শোধ করতে হল। আমার এক আর্টিস্ট বন্ধু এই কিমোনোটা না দিলে উলঙ্গ হয়ে আসতে হত।"

বসন্তকুমারও ধার করেছিলেন অনেক। হেমন্তকুমারকে উচ্চশিক্ষা দেবার জন্যেই ধার করতে হয়েছিল তাঁকে। কিছু পৈত্রিক জমি ছিল তাঁর। সেই জমি বাঁধা দিয়েই অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন তিনি। আশা ছিল হেমন্তকুমার উচ্চশিক্ষা পেয়ে উঁচুদরের চাকরি পাবে, তখন সেই ধার শোধ করবে।

শ্রাদ্ধাদি চুকে যাবার পর দেখা গেল মাত্র দু'বিঘে ধানের জমি অবশিষ্ট আছে, আর নেপথ্যে অপেক্ষা করে আছে স্থিরযৌবনা সত্যবতী, তার মায়ের সইয়ের মেয়ে। সই বেঁচে নেই, তাঁর মৃত্যুশয্যায় হেমন্তর মা তাঁকে কথা দিয়েছিলেন যে সত্যবতীকে তিনি পুত্রবধূ করে ঘরে আনবেন।

কালাশৌচ চুকে যাবার পর সত্যবতীর পাণিপীড়ন করে হেমন্তকুমারকে মাতৃসত্য পালন করতে হল। যে ব্যাপারটা সাধারণত সে যুগে ঘটত না, তা-ও ঘটল। বিয়ের একবছর পরেই সত্যবতী প্রথম পুত্র প্রসব করলেন। এর কারণ ছিল। বাগদত্তা সত্যবতীকে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল হেমন্তকুমারের জন্য। বিয়ের সময়ই তিনি চতুর্দশী ছিলেন।

হেমন্তকুমার কিন্তু ঘাবড়াল না, দু'বিঘে জমি ছাড়াও তার ভদ্রাসনের পাশে জমি ছিল কয়েক কাঠা। তাতে সে মহা উৎসাহে তরিতরকারি লাগাতে লাগল, ছোটখাটো বাগানই করে ফেললে

একটা। সে যখন এক মিশনারি স্কুলে ছিল তখন সেই স্কুলের এক সাহেব মিশনারির কাছে 'কিচেন-গার্ডেন' সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখেছিল। এই বিদ্যেটা সে কাজে লাগিয়ে ফেললে। সাহেবের কাছ থেকে আহরিত আর একটি বিদ্যেও সে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু খুব বেশি সুবিধা হয়নি তাতে। সাহেব বলেছিলেন, "তোমাদের এমন ফসল ফলাবার চেষ্টা করা উচিত যার বাজার দর বেশি। একমণ ধান বা আলু না ফলিয়ে যদি একমণ কালো জিরে বা মেথি বা ঐরকম কোন দামী মশলা ফলাতে পারো তাহলে অনেক বেশি লাভ করতে পারবে।" হেমন্ত তার দু'বিঘে জমিতে মেথি ফলাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আশানুরূপ মেথি হয়নি। এর একটি ফল হয়েছিল শুধু, ও অঞ্চলে 'মেথি-হেমন্ত' বলে প্রসিদ্ধি হয়েছিল তার। বেশি জমি থাকলে হয়তো অর্থাগমও হত কিন্তু তা হল না। ওই দু'বিঘে জমি ভাগ বিলি করে দিয়ে সে মণ চারেক চালের ব্যবস্থা করে ফেলল। উপার্জনের আর একটা পথও পেয়ে গেল সে। যদিও সে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করতে পারেনি, তবু স্কুলের কর্তৃপক্ষ বসন্তপণ্ডিতের ছেলেকে স্কুলেই কাজ দিয়ে দিলেন একটা। ড্রিল-মাস্টার করে বাহাল করে নিলেন তাকে। একটা স্কুলে থাকতে বয়েজ স্কাউটে ভরতি হয়েছিল সে, সুতরাং ড্রিলের ব্যাপারটা জানত কিছু কিছু। এর থেকে গোটা তিরিশেক টাকা পেত। সব মিলিয়ে সংসারটা তার চলে যাচ্ছিল কোনক্রমে। বছর দুই পরে হঠাৎ ভাগ্য-দেবতা প্রসন্ন হলেন তার উপর। গৃহপতির গৃহিণী রঞ্জাবতীর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল ঘটনাচক্রে।

হেমন্তদের বাড়ির কাছেই যে গঙ্গা ঘাটটি, তার নাম উমা-ঘাট। জনশ্রুতি, বহু পূর্বে, কলিকালের গোড়ার দিকে স্বয়ং উমা নাকি এই ঘাটে এসে স্নান করেছিলেন। ঘাটের কাছেই যে বহুপ্রাচীন শিবমন্দিরটি আছে স্নানান্তে উমা নাকি সেই মন্দিরে প্রবেশ করে শিবার্চনাও করেছিলেন। কাছাকাছি যতগুলি ঘাট ছিল তার মধ্যে এই ঘাটটির মাহাত্ম্য ছিল সবচেয়ে বেশি। অনেক দূর থেকে এই ঘাটে স্নান করতে আসত, বিশেষ করে শিবরাত্রির সময়।

রঞ্জাবতী সেবার খুব ভোরে গিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল শিবের শেষ প্রহরের পুজোটা তিনি ওই প্রাচীন শিব-মন্দিরেই করবেন। পালকি যখন শিবমন্দিরের কাছে থামল তখনও বেশ অন্ধকার রয়েছে। ঘাটে লোকজন কেউ নেই, মন্দিরে কিন্তু আলো জ্বলছে দেখলেন, কপাটটি ভেজানো আছে। রঞ্জাবতী পালকি থেকে নেবে মন্দিরের দ্বারে এসে দাঁড়ালেন; কপাটটি একটু খুলে দেখলেন ভিতরে কে আছে। দেখেই চমকে উঠলেন তিনি। তাঁর মনে হল স্বয়ং উমাই বসে শিব-পূজা করছে। ফুটফুটে সুন্দরী একটি কিশোরী, হাত জোড় করে চোখ বুজে বসে আছে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে। সিমুকে সেই প্রথম দেখলেন তিনি, আর দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তখনই অবশ্য তাকে পুত্রবধূরূপে কল্পনা করেননি তিনি। কিন্তু তারপর পরিচয় হল, জানলেন যে ওরা পালটি ঘর, ভাল বংশ, খুব গরীব বলেই বিয়ে হয়নি এতদিন। কিছুদিন পরে ঘটকী পাঠালেন তিনি ওদের বাড়িতে। যথা-বিধি সব হল। বিয়ে হল কিন্তু বছরখানেক পরে। নানা কারণে দেরি হয়ে গেল। সামনে মলমাস ছিল, তারপর পড়ল গৃহপতির পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ, রঞ্জাবতীর এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয় মারা গেলেন, তাইতে গেল কিছুদিন, তারপর পড়ল জ্যৈষ্ঠ মাস, বড় ছেলের বিয়ে ও-মাসে হয় না। কিন্তু কথা যখন পাকা হয়ে গেছে, বিশেষ করে রঞ্জাবতীর যখন পছন্দ হয়েছে মেয়েটিকে, তখন আটকাল না কিছু, বিয়ে হয়ে গেল। রঞ্জাবতীর পছন্দ হয়েছিল সিমুকে, কিন্তু গৃহপতির পছন্দ হল হিমুকে। মেথি-হেমন্তর কথা তিনি আগেই শুনেছিলেন, ছোকরার

নতুন-কিছু করবার ঝোঁকটা ভাল লেগেছিল তাঁর। নিজেও তো তিনি একদিন লবঙ্গ-লতা সোমলতা চাষ করবার জন্যে অনেক অর্থব্যয় করেছিলেন, তাঁর ইচ্ছে ছিল মেথি-হেমন্তর সাথে আলাপ করবেন একদিন গিয়ে। বিবাহের সূত্রে আলাপ হল এবং আলাপ করে মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। লোককে মুগ্ধ করবার শক্তি হেমন্তকুমারের ছিল।

প্রথমেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি তার বড় ছেলের নাম শুনে। ওই একটি মাত্রই ছেলে হয়েছিল তখন তার। ছেলের সে নাম রেখেছিল 'লাঠি'। ছেলের এমন অদ্ভুত নাম কেন রাখা হল গৃহপতি হেসে জানতে চেয়েছিলেন।

"দেখুন",—উত্তরে বলেছিল হেমন্তকুমার— "জীবনযুদ্ধের জন্যে অস্ত্রশস্ত্র থাকা চাই তো। বড় লোকেদের অস্ত্র টাকা, আর আমাদের অস্ত্র আমাদের ছেলেমেয়েরা। ওরাই নিজেদের শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করবে, ঠেকিয়ে রাখবে দারিদ্র্য।"

গৃহপতি তর্ক করেননি, মুগ্ধ হয়েছিলেন।

হেমন্তকুমারও তার মত পরিবর্তন করেনি। লাঠি, সোঁটা, বল্লম, কিরিচ, বন্দুক এই সব নাম রেখেছিল ছেলেমেয়েদের। এমন কি দরকার হলে শেষের দিকে ইঁট, পাটকেল, ঝাড়ু, চড়, ঘুঁষি এসব নাম ব্যবহার করতেও আপত্তি ছিল না তার। বম্, এটম্ বম্ প্রভৃতি আধুনিক মারণাস্ত্রের প্রতি তার তেমন শ্রদ্ধা ছিল না। সে বলত, ওসব বড়লোকদের অস্ত্র, গরীবের নয়। শেষের দিকে কিন্তু নাম সংগ্রহ করতে বেগ পেতে হয়েছিল তাকে, কারণ প্রতি বছরই তার হয় একটি ছেলে না হয় একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করত। তার ছেলেমেয়েদের বয়সের ক্রম-অনুসারে সাজিয়ে একসারে দাঁড় করিয়ে দিলে একটি সমকোণী ত্রিভুজের আকার ধারণ করত, আর ত্রিভুজটি ছিল ক্রম-বর্ধমান।

গৃহপতিদের সঙ্গে হেমন্তকুমারের যখন আত্মীয়তা হল তখন তার যে ক'টি ছেলেমেয়ে ছিল তারা খুব প্রিয় হয়ে উঠল বনস্পতির। এদের নিয়ে মেতে উঠল তার শিল্পী মন। তাদের নানা ভঙ্গিতে বসিয়ে ছবি আঁকতে লাগল সে। শিল্পী মাত্রেরই ফাইফরমাশ করবার মতো লোক হাতের কাছে থাকলে সুবিধা হয়। বিবাহের পূর্বে শীতল কুমোর আর হরি পোটোর বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এ কাজ করত। বিয়ের কিছুকাল পরে সরস্বতীও করেছিল। কিন্তু হিমু পাকাপাকিভাবে এদের পরিবারভুক্ত হবার আগেই লাঠি-সোঁটা-বল্লম-বন্দুকরা বনস্পতির পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। ছেলেগুলি যেমন ফুটফুটে, তেমনি চটপটে আর তেমনি বাধ্য। দু'তিনজন সর্বদাই বনস্পতির কাছে থাকত।

সুতরাং তিনদিক দিয়ে হেমন্তকুমারের পরিবারবর্গ অধিকার বিস্তার করল গৃহপতির পরিবারে। হেমন্ত অধিকার করল গৃহপতির হৃদয়, সিমু রঞ্জাবতীর আর ছেলেমেয়েরা বনস্পতির।

হেমন্তকুমার কোলকাতায় যে চাকরিটা পায়নি, সুখপুরে এসে বস্তুত সেই চাকরিটাই পেয়ে গেল। কার্যত গৃহপতির প্রাইভেট সেক্রেটারিই হয়ে উঠল সে। বাড়ির মালিকের প্রাইভেট সেক্রেটারি হলে যে ধরনের সবিনয় সবজান্তা-ভাব আচারে ব্যবহারে কথাবার্তায় প্রকট রাখা উচিত, আসল মনোভাবটি চেপে রেখে অথচ সোজাসুজি মিথ্যাভাষণ না করে গেলে কথার সহায়তায় যেভাবে বিপজ্জনক পরিস্থিতিগুলো এড়িয়ে যেতে হয় তার শিল্পায়িত কৌশল ভালভাবেই আয়ত্ত ছিল হেমন্তকুমারের। উদারহৃদয় খামখেয়ালী গৃহপতির মনের নৌকাটির হালে

এতদিন বসেছিলেন অন্তঃপুরচারিণী রঞ্জাবতী। তাঁর পাশে কখন যে হেমন্তকুমার এসে বসল তা কেউ টেরও পেল না। নাই পেয়ে হেমন্তকুমারের অন্তর্নিহিত রূপটি কিন্তু প্রকাশ পেতে লাগল ক্রমশ। যদিও সাংসারিক ব্যাপারে বা পারিবারিক আলোচনায় সে যখন ফোড়ন দিত তখন তা তত অসঙ্গত মনে হত না কারও, কারণ সে সিমুর দাদা, আর সে ফোড়নটাও এমনভাবে দিত যে উগ্র ঝাঁজ লাগত না কারো নাকে। এই ফোড়ন-দেওয়ার মধ্যেই যে পরশ্রীকাতরতার ছোঁয়াচ-লাগা একটা মুরুব্বিয়ানা প্রচ্ছন্ন থাকত তা অত লক্ষ্যও করেনি কেউ। বরং সে যে প্রত্যেক ব্যাপারের আর একটা দিক দেখতে পায় এজন্য প্রশংসাই করতেন তাকে গৃহপতি। ক্রমশ ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে হিমুকেই সংসারতরণীর কর্ণধার বলে স্বীকার করে নিল সবাই। একটু গোল বেধেছিল অবশ্য বাচস্পতিকে নিয়ে। গৃহপতি তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেননি কখনও, কিন্তু হেমন্তর মনে হল এটা অন্যায় হচ্ছে। এমন অবাধ স্বাধীনতা অনিষ্টকর। তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করেছিল সে। বলা বাহুল্য, হিতৈষীর মতোই—(ছদ্মবেশে কথাটা বড্ড বেশি রূঢ় হবে বসে সেটা আর ব্যবহার করলাম না) হিতৈষীর মতোই এ চেষ্টা করেছিল।

গৃহপতিকে কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলেছিল, "বকু বনু দুজনেই জিনিয়াস, কিন্তু এই ঘোর পাড়াগাঁয়ে থাকলে ওরা মাটি হয়ে যাবে। ভাল গাছের পক্ষে যেমন উপযুক্ত পরিবেশ আর সার দরকার, জিনিয়াসের পক্ষেও তেমনি। বিলেতে কিংবা কন্টিনেন্টে যদি ওদের পাঠাতে পারতেন দেখতেন কি কাণ্ড করত ওরা।"

গৃহপতি শুনে হাসিমুখে চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ।

তারপর বললেন, "দেখ, লোক দেখিয়ে পাঁচজনকে তাক লাগিয়ে কিছু একটা কাণ্ড করা, আর গ্রামে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকা দুটো আলাদা জিনিস। ওরা সুখে স্বচ্ছন্দে থাক এইটেই আমরা চেয়েছি। ওদের মা তো ওদের ছেড়ে থাকতে পারে না, তাই ওদের কোলকাতাতেও পাঠাইনি—"

এর একটা জুতসই জবাব সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছিল হেমন্তকুমার।

"গুরুদেবের সেই বিখ্যাত কবিতাটা নিশ্চয় পড়েছেন আপনি। যার শেষ দু'লাইন হচ্ছে—

সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করনি।"

"পড়েছি। কিন্তু কবিতা কবিতাই, যখন পড়া যায় বেশ লাগে। কিন্তু পরের লেখা কবিতা অনুসারে নিজের জীবনকে গড়তে গেলে অনেক সময় মুশকিলে পড়তে হয়। আর কবিরা তো এক কথা বলেন না সব সময়। ওই রবীন্দ্রনাথই তাঁর অনেক লেখায় আবার অন্য কথাও বলেছেন। লোলুপ হয়ে বিদেশের ঐশ্বর্যের দ্বারে মাথা লুটিয়ে দিতে আত্মসম্মানে বেধেছে তাঁর।

দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তোমার মন্ত্র অগ্নি-বচন
তাই আমাদের দিয়ো
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব
তোমার উত্তরীয়।"

হেমন্ত তর্ক করতে পারত, কিন্তু সে অবাক হয়ে গেল গৃহপতি রবীন্দ্রনাথের খানিকটা

কবিতা আবৃত্তি করে গেল শুনে। এটা সে প্রত্যাশা করেনি। তার ধারণা ছিল সুখপুর গ্রামে অন্তত রবীন্দ্রকাব্যেরা সে-ই অদ্বিতীয় সমঝদার। হঠাৎ সে কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "হার মানছি আপনার কাছে। আপনি যে এত পড়েছেন, এত ভেবেছেন এসব বিষয়ে, তা আমার ধারণা ছিল না।" শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে পড়বার ভান করল হেমন্ত। এতে গৃহপতির মনের দরবারে তার আসন আরও পাকা হয়ে গেল।

এখানে আর একটি কথাও কিন্তু বলা দরকার। গৃহপতির কাছে যদিও সে বাচস্পতি বনস্পতিকে 'জিনিয়াস' বলে উল্লেখ করত, কিন্তু আসলে মনে মনে তার ধারণা ছিল, দুটি ছেলেই গবেট, বাপের পয়সার শ্রাদ্ধ করছে ঘরে বসে। বাইরের দুনিয়ার কোনও খবর রাখে না, লেখাপড়ারও ধার ধারে না বিশেষ, কেবল বড়লোকের ছেলে বলে এই নিস্তরু-পাদপ দেশে এরণ্ড দুটি দ্রুম বলে চালিয়ে যাচ্ছে নিজেদের। তার অনুকম্পা হত, মনে হত বেচারারা অন্ধ, কি যে করে যাচ্ছে তা তারা জানে না। একজন সুরকি-গুঁড়ো আর হলুদ-গুঁড়ো দিয়ে ছবি আঁকছে, আর একজন সেই খবরটা ঘটা করে হাতের লেখা 'সুখপুর-পত্রিকা'য় লেখাচ্ছে নিজের বউকে দিয়ে। আর তাই নিয়ে বাহবা বাহবা করছে সবাই।

বাচস্পতি-বনস্পতিকেও সে এর হাস্যকর দিকটার সম্বন্ধে সচেতন করবাব চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সফল হয়নি।

"দেখ হিমুদা"—বাচস্পতি বলেছিল— "উপনিষদে ব্রহ্মের বর্ণনা প্রসঙ্গে এক ঋষি বলেছেন, 'অণোরনীয়ান মহতো মহীয়ান'। যে ব্রহ্ম বিরাটের মধ্যে মহীয়ান, তিনি অণুর মধ্যেও সমান সার্থক। ব্রহ্ম যদি অণুর মধ্যে সার্থকরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন তাহলে আমরা এই এত বড় গাঁয়ের মধ্যে নিজেদের সার্থক করতে পারব না? কি বলছ তুমি! আর এই বা তোমার কেমন কথা যে ছাপা না হলে লেখার কোন দাম নেই। আমাদের দেশের বড় বড় বই যখন লেখা হয়েছিল তখন দেশে ছাপাখানা ছিল না। কালিদাস তাঁর 'মেঘদূত' ছাপা মাসিকপত্রে বার করেননি বলে কি কোনও ক্ষতি হয়েছে?"

"কেন ক্ষতি হয়নি জানো? ছাপাখানা তখন ছিল না বটে, কিন্তু বিক্রমাদিত্য ছিল যে। বিক্রমাদিত্যের সভা না থাকলে কালিদাসকে চিনত কে?"

'না চিনলেও ক্ষতি ছিল না। কালিদাস তাঁর মেঘদূতের রসিক সমঝদার পেয়ে যেতেনই।"

"আর একটা কথা ভেবে দেখেছ? ছাপাখানা না থাকাতে কত কালিদাস হারিয়ে গেছে—"

"তাতেই বা ক্ষতি কি। হারিয়ে যাওয়াটাই তো পৃথিবীর নিয়ম। এখন তো ছাপাখানাব অভাব নেই, কিন্তু সব কালিদাসরাই কি জায়গা পাচ্ছে? আর যারা পাচ্ছে তারা সবাই কি কালিদাস? সত্যিকার প্রতিভার কদর যে রসিক সমাজে সেখানে আসল কালিদাসরা জায়গা পাবেই, তা তাদের লেখা ছাপা হোক বা নাই হোক। বৃহত্তর বেরসিক সমাজে হয়তো তারা পাত্তা পাবে না"—তারপর একটু থেমে বলেছিল—"কে জানে হয়তো তাও পাবে শেষ পর্যন্ত। আমি এ বেশ আছি।"

"এই পাড়াগাঁয়ে তোমার ও হাতের লেখা পত্রিকার মর্যাদা কে দেবে বল। আমার মতে জার্নালিজম যদি করতে চাও, কোলকাতায় যাও। সেখানে অনেকের সঙ্গে আমার আলাপ আছে, নিখিলদা আছেন, নরেশদা আছেন, তাঁরা তোমায় সাহায্য করবেন। এখানে এই গরুর পালের মধ্যে—"

কথাটা হেমন্ত শেষ করল হাত দুটো উলটে এবং মুরুব্বিয়ানাসূচক হাসি হেসে।

বাচস্পতির কান দুটো লাল হয়ে উঠল এ কথা শুনে। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে। তারপর বলল, "নিজের গ্রামবাসীদের সম্বন্ধে অতটা হীন ধারণা আমার নেই। আমার 'সুখপুর-পত্রিকা' পড়ে তারা যদি খুশি হয় তাহলেই আমি ধন্য হয়ে যাব। তাছাড়া, আর একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন, সুখপুর-পত্রিকার প্রধান পাঠিকা আমার মা। তাঁকে খুশি করবার জন্যেই ছেলেবেলায় ওটা আরম্ভ করেছিলাম। যা তাঁর ভাল লেগেছে তা কোলকাতার কোন সবজান্তা সহকারী সম্পাদকের বা আধুনিক ময়ূরপুচ্ছধারী বায়সদের ভাল লাগল কিনা এ জানবার আমার উৎসাহ নেই—"

হেমন্তকুমার অনুভব করল বাচস্পতি যে রকম উঁচু পরদায় সুর বেঁধেছে তার চেয়ে বেশি চড়াতে গেলে তার ছিঁড়ে যাবে, অর্থাৎ মনোমালিন্য হবে। সেটা করা সমীচীন মনে হল না তার। সুতরাং চেপে গেল।

দিনকয়েক পরে বনস্পতির কাছে আবার এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিল সে। শুনে বনস্পতি চটে গেল, যা বললে তা অপমানসূচকই, কিন্তু হেমন্ত সেটা গায়ে মাখেনি।

বনস্পতি বলল, "আপনি তো আমাদের কোলকাতা পাঠাতে চাইছেন। কিন্তু নিজে তো এতদিন কোলকাতাতেই ছিলেন, কি কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে এসেছেন বলুন।"

সাধারণ লোক হলে এ কথায় চটে উঠত, কিন্তু হেমন্তকুমার চটল না। তার মনে ববং অনুকম্পা জাগল এই কূপমণ্ডুকের সংকীর্ণ দৃষ্টি-পরিধি দেখে। কিন্তু মুখেব কথায় বা চোখেব দৃষ্টিতে তার মনোভাব প্রতিফলিত হল না।

সে হেসে বললে, "আমার সঙ্গে কি তোমাদের তুলনা হয়। তোমবা হলে 'জিনিয়াস', যাকে বাংলা ভাষায় বলে 'প্রতিভা'। সোনা বা হীরে যদি ওস্তাদ স্যাকরাব হাতে পড়ে তবেই তা বহুমূল্য অলঙ্কারে পরিণত হতে পারে, লোহার ভাগ্যে তা কি সম্ভব? আমি লোহা, বড় জোর পিতল—"

বনস্পতি আর কোন উত্তর দেয়নি। সে নূতন একটা সরস্বতী আঁকতে ব্যস্ত ছিল। কেবল দু'খানি পায়ের পাতা আর সেই পাতা দুটি ঘিরে অপরূপ একটি শাড়ির পাড়, মনে হচ্ছিল নক্ষত্র-খচিত এক টুকবো আকাশ যেন ওই পায়েব পাতা দু'টি ঘিবে ধন্য হয়েছে।

হেমন্তকুমার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, তারপর মুচকি হেসে চলে গেল। শেয পর্যন্ত তাকে উপলব্ধি করতেই হল এই আধ-পাগলা ছেলে দুটিকে সে যা ভেবেছিল তা তারা নয়। বোলচাল দিয়ে ওদের বিচলিত করা যাবে না, পুকুরে চুনোপুঁটি ছাড়া মাছ নেই এ কথা শতবার বললেও ওরা এই এঁদো পুকুর-পাড় ছেড়ে উঠবে না, দামী ছিপ ফেলে ঠায় বসে থাকবে ফাৎনার দিকে চেয়ে। থাক্—। সে যতক্ষণ আছে যতটা পারে ওদের উপকারের চেষ্টাই করে যাবে। হাজার হোক, আত্মীয় তো।

।। চার ।।

গৃহপতি আর রঞ্জাবতীর মৃত্যুর পর যখন বাচস্পতি আর বনস্পতি বিষয়ের মালিক হল তখন একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠল সকলের কাছে, যে আইনত ওরা মালিক বটে, কিন্তু

কার্যত মালিক সাবু মিত্তির (ভাল নাম সর্বেশ্বর মিত্র) আর ভূষণ চক্রবর্তী। সাবু মিত্তির গৃহপতির প্রাক্তন কর্মচারী ধনেশ্বর মিত্তিরের একমাত্র ছেলে। ধনেশ্বরের মৃত্যুর পর বাচস্পতি তাকে বহাল করেছিল বিষয়-সম্পত্তি দেখা-শোনা করবার জন্য। বিষয়ের সমস্ত 'ঝক্কি'টা সাবুকেই পোয়াতে হত। বাচস্পতি ব্যস্ত থাকত 'সুখপুর-পত্রিকা' নিয়ে। সীমন্তিনীরও অন্য দিকে মন দেবার অবসর ছিল না। তাকে সকালে বিকালে, কখনও-কখনও রাত্রেও 'সুখপুর-পত্রিকা' লিখতে হত। শ্রুতি-লিখনের মতো হত ব্যাপারটা। বাচস্পতি বলে যেত, সীমন্তিনী লিখত। সুখপুর-পত্রিকায় থাকত প্রধানত সুখপুরের এবং আশেপাশের গ্রামের খবর। আর থাকত একটি প্রবন্ধ, কখনও কখনও কবিতা। খবর সংগ্রহের জন্য নিজস্ব সংবাদদাতা ছিল একদল। গ্রামেরই কিশোর ছিল কয়েকটি, ভিন্ন গ্রামেরও ছিল। খবর পিছু এক আনা করে পেত তারা। খবর এনে প্রথমে দিতে হত সাবু মিত্তিরকে। সেই প্রথমে খবর বাছাই করত। সে বাছাই করে যে খবরগুলি বাচস্পতিকে দিত, সেগুলি বাচস্পতি আবার যাচাই করে দেখত অকুস্থলে গিয়ে। এজন্য ছোট্ট একটি টাট্টু ঘোড়া রেখেছিল সে। খবর সত্য হলে সেটি প্রকাশিত হত সুখপুর-পত্রিকায়। সুখপুর-পত্রিকার দু'কপি সীমন্তিনী খুব ভাল করে নিজের হাতে লিখত, আর খান পঞ্চাশেক ছাপা হত সাইক্লোস্টাইলে। ছাপা হবার পর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিতরিত হত সেগুলি। হাতে হাতে কিছু কিছু পাঠিয়ে দেওয়া হত, কিছু বা ডাকযোগে। সাবু মিত্তির হিসাব করে বলেছিল এর জন্য মাসে প্রায় পঁচিশ টাকা খরচ হয়। কম খরচেও হতে পারত, কিন্তু বাচস্পতি দামী কাগজ ব্যবহার করত বলে তা আর হত না। সাবু এ বিষয়ে বাচস্পতির দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে ধমক খেয়েছিল।

"দেখ, যদি তামাক-বিড়ি খেতাম, তাহলেও এ খরচটা হত। তখন কি তুই বলতে আসতিস অম্বুরী তামাক না খেয়ে দা-কাটা তামাক খান তাহলে খরচ কম হবে? এটা একটা দরকারী জিনিস, এর জন্যে ন্যায্য খরচ করতে হবে বইকি। ওতে কুণ্ঠিত হলে কি চলে?"

গৃহপতি-রঞ্জাবতী যে বাড়িতে বাস করতেন সেই বাড়িটাই বাচস্পতি নিয়েছিল। বনস্পতি থাকত সৈকত-কাননে, সেখানে যে বাড়িখানা ছিল তাতেই কুলিয়ে গিয়েছিল তার। হেমন্তকুমার যখন সপরিবারে এসে এদের আশ্রয়-প্রার্থী হল তখন একটু সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল, কোথায় ওদের থাকতে দেওয়া যায় এই নিয়ে। স্থানাভাবের প্রশ্ন নয়, কারণ গৃহপতির বাড়ি প্রকাণ্ড বাড়ি, তাতে স্থানাভাব হত না, কিন্তু সীমন্তিনীই রাজি হলেন না।

বললেন, "এখানে পত্রিকার কাজকর্ম নিয়ে তুমি সর্বদাই ব্যস্ত থাক। ছেলেমেয়ের হট্টগোল হয়তো ভাল লাগবে না তোমার, মনে মনে বিরক্ত হবে, অথচ মুখে কিছু বলতে পারবে না। আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গোলমাল করবেই। তাছাড়া আমাকেও থাকতে হবে তোমাকে নিয়ে, ওদের দেখাশোনাও করতে পারব না। বৌদি হয়তো এতে কিছু মনে করতে পারেন। তার চেয়ে ওদের আলাদা একটা বাড়িতেই ব্যবস্থা করে দাও না। 'জাহ্নবী-নিবাসে'র দোতালাটা তো খালি পড়ে আছে। নীচের তলার একটি মাত্র ঘরে সাবু-ঠাকুরপোর আপিস। ওই বাড়িতেই ওরা স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে। রান্নাঘরও আছে, সামনেই গঙ্গা—"

বাচস্পতি চিন্তা করছিল বিভিন্ন আলোকে।

বলল, "সেটা কি ভাল দেখাবে। আত্মীয় স্থল, নিন্দে করবে না তো লোকে। বাবা মা বেঁচে

থাকলে এই বাড়িতে থাকতে দিতেন ওদের, এক হাঁড়িতেই খাওয়া-দাওয়া হত। সৈকত-কাননে বনু যে বাড়িটাতে আছে সেখানে তো প্রচুর জায়গা, চারিদিকে বাগান, ছেলেগুলো খেলা করে বাঁচবে। ঘরও অনেকগুলো আছে বাড়িটাতে—"

"কিন্তু ঠাকুরপো যে একাই একশ'। কখন যে কোন্ খেয়ালে থাকে ঠিক নেই। ছেলেপিলের 'ঝক্কি' ওর ওপর দেওয়া চলবে কি। তাছাড়া, সরু ছেলেমানুষ এখনও—"

জাহ্নবী-নিবাসেই শেষ পর্যন্ত গেল হেমন্তকুমার। বাচস্পতির জমি থেকে তার সমস্ত পরিবারের জন্য চাল ডাল তেল নুন আটা ঘি তরিতরকারি সবই সরবরাহ হতে লাগল। এমন কি মশলা পর্যন্ত। জাহ্নবী নিবাসের পাশে জমি ছিল এক টুকরো, সেইটেতে হেমন্তকুমার লাগিয়ে ফেলল নানাবিধ তরিতরকারি। কিন্তু অবসর বিনোদনই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। সারের বিবিধ বৈচিত্র্য করে কুলি-বেগুনকে মুক্তোকেশী বেগুন করা সম্ভব কিনা, বড় বড় টমাটোকে ছোট ছোট আঙুরের মতো করা যায় কিনা, হেমন্তকুমার এই সব গবেষণা নিয়ে সময় কাটাত।

আগেই বলেছি, বাচস্পতি থাকত 'সুখপুর-পত্রিকা' নিয়ে। তার জীবন-ধারা অনেকটা এই বকম ছিল। সকালবেলা উঠে স্নানান্তে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পুজো করত খানিকক্ষণ। তারপর জলখাবার খেয়ে বাচস্পতি সীমুকে ডাকত—"কই এস এবার, বসা যাক—"

"হ্যাঁ, এই যে যাচ্ছি—"

গুছিয়ে বসতে একটু দেরি হত সীমুর। পানের বাটাটি নিয়ে, ভাল শাড়িখানি পড়ে, মাথার চুলটি বাগিয়ে, খয়ের টিপটি কপালের ঠিক মাঝখানটিতে নিপুণভাবে এঁকে তবে সে আসত। তার ছেলে হয়নি, হবার আশাও নেই। জ্যোতিষী, ডাক্তার কেউ আশা দেয়নি। তার সমস্ত নারী-সত্তা বিকশিত হয়ে উঠেছিল ওই 'সুখপুর-পত্রিকা'কে কেন্দ্র করেই। পুজোর ঘরে ঢোকবার আগে সে যেমন স্নান করে গরদ পরে মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিজেকে শুদ্ধ করে নিত, লেখবার ঘরে ঢোকবার আগেও তেমনি নিজেকে একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে না নিলে তৃপ্তি হত না তার। তাকে দেখলে মনে হত সে যেন প্রিয়-সম্ভাষণে যাচ্ছে। প্রশস্ত চৌকির উপর একটি গালিচা পাতা, তার উপর সুদৃশ্য একটি কাঠের ডেস্ক। সেই ডেস্কের সামনে এসে বসত সীমন্তিনী কাগজ-পেন্সিল নিয়ে। বালির কাগজের উপর পেন্সিল দিয়েই প্রথমে সে শ্রুতি-লিখন লিখে নিত। বাচস্পতি সংবাদগুলি লিখে রাখত আগের রাত্রে। সামনে একটি ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে সেইগুলি সে পড়ে যেত, আর সীমন্তিনী শুনে শুনে টুকত সেগুলি। টোকা শেষ হলে বাচস্পতি সেগুলির বানান ভুল সংশোধন করত। বাচস্পতির ভাষা একটু সংস্কৃত-ঘেঁষা ছিল বলে বানান ভুল অনেক হত। বাচস্পতির সংশোধনের পর আবার সেগুলি পরিষ্কার করে টুকতে হত সীমন্তিনীকে। সুখপুর-পত্রিকার একটি সংখ্যা থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি।

প্রথমেই বড় অক্ষরে হেডলাইন ঃ—ধর্ম-ষাঁড়ের বিপুল আক্রমণে মোগলপুরের হানিফ মিঞার সংজ্ঞা-লোপ। এর নীচে ছোট ছোট অক্ষরে সংবাদটি দেওয়া হয়েছে।

"বাঘনা গ্রামের হরিহর মণ্ডল পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে বৃষটি উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা এখন একটি বিশালবপু ষণ্ডে পরিণত হইয়াছে। তাহার বিরাট আকার, সু-উচ্চ ককুৎ এবং সুবৃহৎ শৃঙ্গদ্বয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের মনে ভীতির সঞ্চার করিতেছে। হানিফ মিঞার ঘন কুঞ্চিত দীর্ঘ শ্মশ্রু আছে, গুম্ফ নাই, তদুপরি তিনি একটি ঘোর রক্তবর্ণ জোব্বা পরিয়া ঈষৎ

কুব্জ হইয়া হাঁটেন। তাঁহার আকৃতি এবং পোশাকই সম্ভবত উক্ত ষণ্ডটির ক্রোধ উদ্রিক্ত করিয়াছিল। হানিফের পুত্র ইসমাইল থানায় খবর দেয়। থানার দারোগা মৃত্যুঞ্জয় বসাক মহাশয় কয়েকটি কনেস্টবল লইয়া দুষ্ট ষণ্ডটিকে গ্রেপ্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই। দুইটি কনেস্টবলকে জখম করিয়া ষণ্ডটি লাফাইতে লাফাইতে গিয়া যখন 'বুড়ির জঙ্গলে' আত্মগোপন করিল তখন বসাক মহাশয় হাল ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, হিন্দু হইয়া তিনি ধর্মের ষাঁড়ের উপর গুলি চালাইতে পারেন না। মানুষ হইলে পারিতেন, কিন্তু গরুকে গুলি করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। মনে হয় তিনি শুধু পরলোকের ভয়েই ভীত নহেন, ইহলোকের ভয়ও তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে। তাঁহার আশঙ্কা হইতেছে গরুকে গুলি করিয়া মারিলে স্থানীয় হিন্দুরা বিদ্রোহ করিবে, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাও হইয়া যাইতে পারে। হয়তো শেষ পর্যন্ত তাঁহার চাকুরি লইয়া টানাটানি পড়িবে। তিনি সদরে খবর পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।"

কল্পনা করছি শ্রীমতী সীমন্তিনী ঠোঁট ফুলিয়ে বলছে—"বড্ড শক্ত শক্ত কথা দিয়ে লিখেছ এটা। ককুৎ মানে কি?"

"ষাঁড়ের পিঠের উপর যে উঁচু টিবিটা থাকে তাকে ককুৎ বলে।"

"আজ বোধহয় অনেক বানান ভুল হয়ে গেল। এত সব শক্ত শক্ত কথা আমি লিখতে পারি কি!"

"তুমি লিখে যাও না, আমি তো সব দেখে দেব আবার।"

এ সংবাদটির শেষের অংশটি আরও কৌতুকপ্রদ।

"ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কি নির্দেশ দিয়াছেন তাহা এখনও পর্যন্ত জানা যায় নাই, কিন্তু একটি অদ্ভুত উপায়ে সমস্যাটির সমাধান হইয়া গিয়াছে। ষাঁড়টি হরি মণ্ডলের দৌহিত্রী খুকুমণিব অত্যন্ত প্রিয় ছিল। আশ্চর্যের বিষয় সে এই দুর্দান্ত ষাঁড়ের নামকরণ করিয়াছিল 'লক্ষ্মীসোনা'। পুলিশের দল যখন চলিয়া গেল তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে খুকুমণি 'বুড়ির জঙ্গলের' ধারে গিয়ে আস্তে আস্তে কয়েকবার ডাক দিল—লক্ষ্মীসোনা, আয় আয়। একটু পরেই অরণ্য ভেদ করিয়া বিরাটকায় পুঙ্গবটি বাহির হইয়া আসিল। খুকুমণি তাহার জন্য কিছু খাবার আনিয়াছিল, বাধ্য বালকের মতো সেটি সে আহার করিল। খুকুমণি বলিল, "বড় দুষ্টু হয়েছিস তুই। আয় আমার সঙ্গে—" একটি সামান্য দড়ি তাহার গলায় বাঁধিয়া খুকুমণি তাহাকে টানিয়া টানিয়া নিজেদের বাড়িতে লইয়া গিয়া গোহালে বন্দী করিয়াছে। প্রেমই যে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ইহা আর একবার প্রমাণিত হইল।"

ইহার পর অন্য একটি সংবাদ।

"ধীবর বিশু দাস তাহার পুষ্করিণীগুলিতে এবার নূতন 'পোনা' ছাড়িয়েছে। গত বৎসর কোনও অজ্ঞাত কারণে তাহার পুষ্করিণীগুলিতে সমস্ত মাছ মরিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছিল। অনেকে মনে করেন গ্রীষ্মাধিক্যই তাহার কারণ ছিল। কিন্তু তাহাই যদি হইত অন্য পুষ্করিণীর মাছগুলি অব্যাহতি পাইল কিরূপে? আমাদের মতে তাহার পুষ্করিণীগুলির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখাও প্রয়োজন, কারণ মন্দ লোকের অভাব নাই।"

আর একটি খবর।

"মহাত্মা নৃপতি পাইনের স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ভূপতি পাইনের জলসত্র

স্থাপন। মহাত্মা নৃপতি পাইন এ অঞ্চলের একজন আদর্শচরিত্র সাধু ব্যক্তি ছিলেন। দম, শম, শৌচ, ক্ষমা, ধৃতি প্রভৃতি গুণাবলী তাঁহার চরিত্রকে সমুজ্জ্বল করিয়াছিল। চাল, ডাল, লবণ, তৈল, সাধারণ মসলা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া তিনি সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। তাঁহার সামান্য একটি দোকান ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই পরনিন্দাপ্রবণ পল্লীগ্রামেও তাঁহার বিরুদ্ধে একটিও নিন্দাবাক্য কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ভূপতি পাইন লেখাপড়া শিখিয়া দারোগা হইয়াছেন। বিদেশে চাকরি কবেন। তিনি ইউনিয়ন বোর্ডকে পাঁচশত টাকা পাঠাইয়া দিয়া অনুরোধ করিয়াছেন তাঁহার জন্মভূমি রায়না গ্রামে গ্রীষ্মকালে যেন একটি জলসত্র স্থাপিত হয়। জলসত্র শীতল জল, কিছু ভিজানো-ছোলা এবং গুড় যে কোনও পিপাসিত ব্যক্তিকে দান করা হইবে। তাঁহাদের বাস্তুভিটার উপরই সত্রটি স্থাপিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত ভূপতি পাইন প্রকাণ্ড টিনের উপর 'নৃপতি পাইন জলসত্র' এই কথা কয়টি বড় বড় করিয়া লিখাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। দুইটি বংশদণ্ডের উপর সেটি যথাবিধি টাঙানোও হইয়াছে। আমাদের মতে আর একটু উঁচু করিয়া টাঙাইলে সাইন বোর্ডটি দূরবর্তী পিপাসিত পথিকগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিত। জনসাধাবণের পক্ষ হইতে আমরা শ্রীযুক্ত ভূপতি পাইনের দীর্ঘজীবন কামনা করি।"

আর একটি খবর।

"কাজল দীঘির ঘাটে বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কার। এ অঞ্চলে কাজল দীঘির নাম সকলের নিকট সুপরিচিত। এই দীঘিটাব পূর্বঘাটে একটি প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর বহুকালাবধি পড়িয়া ছিল তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। প্রস্তরটির উপর কাপড় কাচা হইত, বালক-বালিকাদেব তাহার উপর দাঁড় করাইয়া জননীবা অনেক সময় তাহাদের স্নান কবাইতেন। মেয়েবা অনেক সময় তাহার উপর পা ঘষিযা পা পরিষ্কার করিতেন। এ যাবৎ সকলে উহাকে সামান্য প্রস্তরখণ্ড রূপেই গণ্য করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পূর্বে হালদার বাড়ির কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীমান কনককান্তি সকলের এই ধারণাটিকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়েছেন। শ্রীমান ইতিহাসের ছাত্র, উত্তর-প্রদেশের কোনো এক কলেজে প্রাচীন মূর্তি লইয়া গবেষণা কবিতেছেন। তিনি শ্বশুরবাড়ি আসিয়া উক্ত কাজল দীঘিতে স্নান করিতে যান। প্রস্তরটিকে দেখিয়াই তাঁহার সন্দেহ হয় যে ইহা সামান্য প্রস্তরখণ্ড নহে। তাঁহার নির্দেশক্রমে এবং কাজল দীঘির বর্তমান স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ভূপেন দাঁ মহাশয়ের সম্মতি অনুসারে লোকজন ডাকিয়া পাথরটিকে উল্টাইয়া ফেলা হয়। প্রস্তরটি যে এত গুরুভার তাহা প্রথমে কেহ অনুমান করিতে পারে নাই। পঁচিশটি সমর্থ যুবকের সম্মিলিত চেষ্টায় তবে সেটিকে উল্টানো সম্ভব হইয়াছে। শক্ত মোটা নারিকেল দড়ি বাঁধিয়া উক্ত পঁচিশজন বলিষ্ঠ যুবক সম্মিলিতভাবে শক্তি প্রয়োগ করিয়া তবে পাথরটির বিপরীত দিক সকলের দৃষ্টিগোচর করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দৃষ্টিগোচর হইবার পরও প্রথমে কিছু বোঝা যায় নাই। শৈবাল, পঙ্ক, গুগলি, শামুক প্রভৃতি জলমগ্ন অংশটিকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। পরিষ্কার করিবার পর দেখা গেল তাহা চমৎকার একটি বিষ্ণুমূর্তি। শ্রীবিষ্ণুর মুখের স্মিত হাস্যটি সত্যই সুন্দর। কৃষ্ণপ্রস্তরের উপর বিবিধ কারুকার্যও অপূর্ব। অধ্যাপক কনককান্তি মূর্তিটি নিজের গবেষণাগারে লইয়া গিয়াছেন। গ্রামের মহিলামহলে কিন্তু একটু অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। যে সব মহিলা প্রায় প্রত্যহই বিষ্ণু-মূর্তির পৃষ্ঠের উপর পদাঘাত করিতেন তাঁহারা অমঙ্গল আশঙ্কায় বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। বিনু

তৈলকারের পুত্রটি সহসা জ্বরাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে আশঙ্কা আরও বাড়িয়াছে। উক্ত বালক নাকি নিয়মিতভাবে বিষ্ণু-মূর্তিটির পৃষ্ঠের উপর মল-মূত্র ত্যাগ করিত। আমাদের মতে ইহাতে আশঙ্কার কোন সঙ্গত কারণ নাই। অজ্ঞাতসারে পাপ করিলে ভগবান শাস্তি দেন না। পাপকে পাপ জানিয়া তাহাতে যদি কেহ লিপ্ত হয় তবেই তাহা শাস্তিযোগ্য।''

এই নমুনা ক'টি থেকেই আপনারা বুঝতে পারবেন 'সুখপুর-পত্রিকা' কি ধরনের পত্রিকা ছিল। এ পত্রিকার আর যে দোষই থাক এর প্রধান গুণ ছিল যে সংবাদগুলি একটিও মিথ্যা নয়। প্রতিমাসে দু'টি করে সংখ্যা বেরুত। পূর্ণিমা সংখ্যা আর অমাবস্যা সংখ্যা। ঠিক নির্দিষ্ট দিনে বেরুত। আর এই নিষ্ঠার জন্য খাটতে হত দুজনকেই। সুতরাং বিষয়-সম্পত্তির তদারক করা বাচস্পতির পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সাবু মিত্তির যা করত তাই হত।

সাবু মিত্তির রোগা পাতলা লোক, একটু মিনমিনে গোছের, গলার স্বরও সরু, চোখে বেমানান গোছের বড় চশমা। কিন্তু হিসাবপত্রের ব্যাপারে একেবারে নিখুঁত। এই জন্যই বাচস্পতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে পেরেছিল তার উপর। তার প্রধান কাজ ছিল বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করা, কত আয় কত ব্যয় তার হিসাব রাখা এবং নিট্ আয়ের অর্ধাংশ বনস্পতির তত্ত্বাবধায়ক ভূষণ চক্রবর্তীর কাছে জমা করে দেওয়া। বাচস্পতি আর বনস্পতি নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার সাবু মিত্তিরের উপরেই দিয়েছিল, সে যা করত তাই হত। কিন্তু ভূষণ চক্রবর্তীর উপর ভার ছিল বনস্পতির আয়ের অংশটুকু বুঝে নেওয়া। অর্থাৎ ইংরেজি ভাষায় যাকে 'এক্জিকিউটিভ' বলে সাবু মিত্তির ছিল তাই আর ভূষণ চক্রবর্তী ছিল 'অডিট্'। ভূষণ চক্রবর্তীকে লোকে আড়ালে 'ভীষণ চক্রবর্তী' বলে ডাকত। রেগে গেলে তার মুখে কিছু আটকাত না। লোকের গায়ে হাত তুলতেও কসুর করত না সে। গায়ে শক্তি ছিল অসুরের মতো। মুগুর ভাঁজত রোজ। এহেন লোকের কাছে হিসাব দাখিল করা ক্ষীণ-প্রাণ সাবু মিত্তিরের পক্ষে সহজ ছিল না। দু'একবারের অভিজ্ঞতার পর সাবু আর তার সামনাসামনি বসে হিসাব বুঝিয়ে দিতে সাহস করত না। ভূষণ চক্রবর্তীর কঠোর নিষ্পলক দৃষ্টির সামনে বসতেই ভয় করত তার। ভূষণ চক্রবর্তীর চোখ দুটো বড় বড় আর সর্বদাই মনে হত সে দুটো বুঝি এখনই ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। দু'দিকের রগে কুটিল স্ফীত শিরা ছিল, সাবুর মনে হত সেগুলোও যেন মাঝে মাঝে নড়া-চড়া করে, হয়তো হঠাৎ বেরিয়ে পড়বে চামড়া ফুঁড়ে। কণ্ঠস্বরও কমনীয় ছিল না। ঝাপসা, ধরা-ধরা কর্কশ কণ্ঠে সে যখন কাউকে গালাগালি দিত মনে হত র‍্যাঁদা চালাচ্ছে কেউ খরখরে কাঠের উপর। সাবু মিত্তির পারতপক্ষে তাই এ লোকটির সম্মুখীন হতে চাইত না। সে আয়-ব্যয়ের সম্পূর্ণ একটি হিসাব কাগজে লিখে পাঠিয়ে দিত চক্রবর্তী মশায়ের কাছে। আর পাওনা টাকাকড়ি পাঠিয়ে দিত স্থানীয় পোস্টাফিসে। বনস্পতির নামে আলাদা সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল সেখানে। ভূষণ চক্রবর্তী প্রায়ই হিসাবের কাগজে লাল কালিতে দাগ দিয়ে দিয়ে জবাবদিহি তলব করত হিসাবের খুঁটিনাটি নিয়ে। সাবু মিত্তির লিখেই জবাব দিত তার।

এই ব্যক্তিটি কি করে বনস্পতির কাছে এসে জুটল তার আসল রহস্য অনেকেই জানে না। লোকটি এম-এ পাশ, কৃষ্ণনগরের কাছাকাছি কোথাও বাড়ি, কিছু জমিজমাও আছে নাকি

সেখানে, জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছে। যদিও জমিজমা এবং বাস্তুভিটের সেই একমাত্র উত্তরাধিকারী, কিন্তু তার থেকে অন্নবস্ত্রের কোনও সংস্থান সে করতে পারেনি। কোলকাতা শহরে এসেছিল ভাগ্যান্বেষণে, কিন্তু হতাশা ছাড়া আর কিছু জোটেনি। প্রেমে পড়েছিল একটি মেয়ের, কিন্তু পায়নি তাকে। চাকরির চেষ্টা করেছিল অনেক জায়গায়, ভেবেছিল তার যোগ্যতার মর্যাদা সে পাবে। কিন্তু এদেশে যোগ্যতার মর্যাদা আর ক'টা লোকে পায়? সে-ও আবিষ্কার করেছিল চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতার তত দরকার নেই, যত দরকার খোশামোদের। সে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে প্রভুর পায়ে তেল দিতে পারে তারই উন্নতি হয়, সে প্রথম শ্রেণীর এম.এ., না তৃতীয় শ্রেণীর, তার খোঁজ নেওয়ার দরকার মনে করে না কেউ। সাহিত্য এবং শিল্পকলার দিকে ঝোঁক ছিল। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা নিয়ে কিছুদিন ঘোরাঘুরি করেছিল সাহিত্যের বাজারে, কোথাও আমল পায়নি। নূতন লেখকদের কোনও সম্পাদক, কোনও প্রকাশক প্রশ্রয় দেয় না, অনেক সময় তার লেখাটা পড়েও দেখেন না পর্যন্ত, দেখলেও বুঝতে পারেন না অনেক সময়, কারণ ভাল লেখা পড়ে বোঝবার ক্ষমতা অনেকেরই নেই। তাঁরা মোহিত হয়ে যান বিখ্যাত নাম দেখে।

বনস্পতির ছবিটা যে সম্পাদকের দপ্তরে এসেছিল সেখানকার একজন সহকারী সম্পাদকের সঙ্গে তার আলাপ ছিল। সেখানেই সে বনস্পতির আঁকা ছবিটা দেখেছিল প্রথমে, সেখান থেকেই সে বনস্পতির ঠিকানাটাও প্রথমে জানতে পারে। ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল ভূষণ চক্রবর্তী। কল্পনার অভিনবত্বই বিশেষ করে মুগ্ধ করেছিল তাকে। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে চেয়েছিল সে ছবিটার দিকে, এককথায় ছবিটা দেখে তাক্ লেগে গিয়েছিল তার। জ্যোৎস্নালোকিত একটা পথ দূর দিগন্তে মিলিয়ে গেছে, আর সেই পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে একক একটি গাছ, গাছের কালোছায়া পড়েছে পথের উপর, মনে হচ্ছে গাছটাই যেন পা বাড়িয়ে দিয়েছে জ্যোৎস্নালোকিত পথটার দিকে, মনে হচ্ছে যেন দুটো হাত তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেউ, আরও দুটো শাখা বেরিয়ে আছে দু'পাশ দিয়ে, সে দুটোকেও হাত বলে মনে হচ্ছে। ছবির নিচে নাম লেখা 'মহাকালী'।

এরপর নিম্নলিখিত রূপ কথাবার্তা হয়েছিল তার সহকারী সম্পাদকের সঙ্গে।

উচ্ছ্বসিত ভূষণ বলেছিল—"চমৎকার ছবি। কোন্ সংখ্যায় যাচ্ছে এটা?"

"চমৎকার লাগল? তোমার আত্মীয় হন নাকি ভদ্রলোক?"

"আত্মীয়ই মনে হচ্ছে, কিন্তু দেখিনি কখনও এঁকে। ছবি দেখে লোভ হচ্ছে আলাপ করে আসি। কোথায় থাকেন ভদ্রলোক?"

"সুখপুরে।"

সেই সময় ঠিকানাটা দেখেছিল ভূষণ। টুকে নিয়েছিল।

"কোন সংখ্যায় যাচ্ছে ছবিটা?"

"ও ছবি ছাপা হবে না, বুলু সেন বলেছে অতি বাজে ছবি। নামজাদা আর্টিস্টদের ছবি পড়ে আছে একগাদা, দেখবে?"

নামজাদা আর্টিস্টদের অনেক ছবি দেখিয়েছিল তাকে। ছবিগুলো ভালই, কিন্তু অধিকাংশই মেয়ের ছবি। ভূষণের মনে হয়েছিল ছবিগুলোতে স্তন এবং নিতম্বের প্রাধান্য একটু বাড়াবাড়ি

রকমের বেশি, যেন ওইগুলো দেখিয়েই ইতরজনকে মুগ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন শিল্পীরা, মাংস দিয়ে কুকুর ভোলাবার চেষ্টা করে যেমন কুকুর-চোরেরা।

ভূষণ তবু বলেছিল, "এঁরা সবাই নামজাদা লোক, এঁদের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলা শোভা পায় না। কিন্তু এ কথা আমি বলব বনস্পতি মিশ্রের 'মহাকালী' ছবিখানা এ ছবিগুলোর চেয়ে অনেক ভালো—"

"বুলু সেনের তা মত নয়।"

"বুলু সেন কে?"

"আমাদের মালিকের দ্বিতীয় পক্ষের শালী।"

"তিনিই ছবি নির্বাচন করেন? তাঁর সে যোগ্যতা আছে নাকি?"

"তাঁর তো যোগ্যতার দরকার নেই। তিনি মালিকের দ্বিতীয় পক্ষের সুন্দরী শালী, এই তো তাঁর সবচেয়ে বড় যোগ্যতা। তার উপর তিনি ইয়োরোপ বেড়িয়েছেন, প্যারিসে গেছেন, রোমে গেছেন, স্পেনে গেছেন। লন্ডনে গিয়েছিলেন, আরও সব কোথায় কোথায় যেন গিয়েছিলেন, সুতরাং ছবির ভালমন্দ সম্বন্ধে তাঁর মতই অকাট্য, অন্তত এই পত্রিকার আপিসে—"

চুপ করে রইল ভূষণ চক্রবর্তী খানিকক্ষণ।

"আমার কবিতাটা ছাপা হবে তো?"

"সত্যি কথা বলব? হবে না। কাগজে 'স্পেস্' কই। সিনেমা, খেলাধুলো, রান্না, সবরকম খবরই তো দিতে হয়। জানই তো নিছক সাহিত্য-পত্রিকা বাজারে চলে না আজকাল। 'সবুজপত্র', 'সাধনা' কদিন চলেছিল? যে কদিন চলেছিল তা লোকসান দিয়ে। তাছাড়া তোমার ও কবিতা অচল আজকালকার যুগে। কবিশেখর কালিদাস রায়ের কবিতাও ফেরত দিতে হয় আমাদের। ওসব কবিতা সেকেলে, জিনুবাবুর অন্তত তাই মত।"

"জিনুবাবু কে?"

"জনমেজয় বসু। নাম শোননি? উদীয়মান কবি একজন। আমাদের মালিকের ভাগনে।"

"তিনি বলেছেন আমার কবিতা অচল?"

"তিনি কি বলেছেন জানি না, কিন্তু অমনোনীত লেখাগুলো সাধারণত তিনি যে ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে ফেলে দেন সেইখানে তোমার লেখাটাও ছিল।"

"তিনিই কি কবিতা নির্বাচন করেন নাকি? আমার ধারণা ছিল, সম্পাদকমশাই কিম্বা তুমি কর।"

ম্লান হেসে তিনি জবাব দিলেন, "আমাদের কাজ কি জান? প্রুফ দেখা।"

তারপর নিম্নকণ্ঠে বললেন, "সত্যি কথা শুনবে একটা? আজকাল অধিকাংশ পত্র-পত্রিকাই বড়লোকের বাগানবাড়ি। তাঁরা নিজের নিজের শখ অনুসারে সেগুলো সাজান। কোথাও খেমটা নাচ হয়, কোথাও বা কীর্তন। কেউ কেউ ঝুমকো লতা পছন্দ করেন, কেউ আইভি লতা, কেউ ক্রোটন, কেউ বা ক্যাক্‌টাস। আমরা সেই সব বাগানবাড়ির ভৃত্য মাত্র। যে টব যখন যেখানে রাখতে বলেন সেই রকম রাখি। কথাগুলো তোমাকে কন্‌ফিডেন্‌শ্যালি বললাম, বোলো না যেন কাউকে, অন্তত আমাদের মালিকদের কানে যেন না যায়, গেলে চাকরি থাকবে না। আমি তোমার কবিতাটি ঢুকিয়ে দিতে খুব চেষ্টা করব। কোনো গল্প বা প্রবন্ধের নীচে যদি 'স্পেস' পাই ঢুকিয়ে দেব। সে ক্ষমতাটা আছে আমাদের হাতে।"

উক্ত আলাপের পর কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসেছিল ভূষণ চক্রবর্তী। হঠাৎ তার চেঙ্গিস্ খাঁর কথা মনে পড়েছিল। কৈশোরে পিতৃহীন হয়ে বিবিধ শত্রুপরিবৃত সেই মোঙ্গল বীর বাহুবলে, বুদ্ধিবলে সবেগে তরোয়াল এবং ঘোড়া চালিয়ে যেমন কৃতিত্বের শীর্ষদেশে উপনীত হতে পেরেছিল, সেও কি তেমনি পারে না? সে অর্ধেক পৃথিবীর রাজত্ব চায় না, সে চায় অন্তত একটা ভাল কাগজেও তার লেখা সগৌরবে ছাপা হোক। এইটুকু সে পারবে না?...

কিন্তু পারেনি। অন্নবস্ত্রের সংস্থানের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়েছিল তাকে ভিক্ষুকের মতো। তবু তা ভদ্রভাবে যোগাড় করতে পারেনি সে। বহু ব্যর্থতার পর হঠাৎ একদিন বনস্পতি মিশ্রের কথা মনে পড়ল তার। অসংখ্য ক্ষতের জ্বালায় সে যখন ছটফট করছিল, অপমানের তীব্র হলাহলে তার সমস্ত অন্তঃকরণ যখন আর্তনাদ করছে, সামান্য একটু আশার বাণী বা স্নেহের স্পর্শ পাবার জন্য যখন তার সমস্ত চিত্ত আকুল, তখন হঠাৎ একদিন বনস্পতি মিশ্রের কথা মনে পড়ল তার। মনে হল এই পৃথিবীতে বোধহয় ওই একটিমাত্র লোকই আছে যে তার অন্তর্দাহের মর্ম বুঝতে পারবে, যার মনের সুরের সঙ্গে হয়তো বা তারও মনের সুর মিলবে। কারণ এটা সে লক্ষ্য করেছিল যে তথাকথিত সুধী বা গুণী-সমাজে বনস্পতি মিশ্রের নাম পর্যন্ত কেউ শোনেনি। তার একটি ছবিও ছাপা হয়নি কাগজে। তার মতো সেও বোধহয় অপমানিত অবহেলিত। ঠিকানা জানাই ছিল। অনেক ইতস্ততঃ করে প্রথমে সে চিঠি লিখলে একখানা।

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনাকে আমি চিনি না। কিন্তু শুনে হয়তো বিস্মিত হবেন আপনিই আমার সবচেয়ে আপনার লোক। বহুদিন আগে এক মাসিক পত্রিকার আপিসে আপনার 'মহাকালী' ছবিটি দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ছবিটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝেছিলাম আপনি কত বড় শিল্পী। উক্ত মাসিক পত্রিকায় আপনার ছবি ছাপা হয়নি, সে পত্রিকাও এখন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু আমার মনে মুদ্রিত হয়ে গেছে আপনার ছবিখানা চিরকালের জন্য। এতদিন সাহস পাইনি আপনাকে চিঠি লিখতে, শিল্পীর তপস্যা ভঙ্গ করতে সঙ্কোচ হয়েছিল, আপনি যে এখনও শিল্পসাধনা করছেন এ সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়। আমার কোনো বিশেষ পরিচয় নেই, আমি জীবনে সব দিক দিয়েই ব্যর্থ। আমার এই ব্যর্থ অপমানিত পদদলিত জীবনের অন্তিম মুহূর্তে সহসা আজ মনে হল, আপনার সঙ্গে একবার অন্তত দেখা না হলে আমার মরেও সুখ হবে না। অবশ্য আপনি যদি অনুমতি দেন, তবেই যাব। আপনার উত্তরের আশায় রইলাম। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন।"

চারদিনের মধ্যেই উত্তর এসেছিল ছবির ভাষায়। জোড়-করা দু'টি হাত, নীচে রং দিয়ে লেখা, 'এলে অনুগৃহীত হব, বনস্পতি'। প্রতিটি অক্ষর যেন অবনত হয়ে আছে স-সম্ভ্রমে।

ভূষণ চক্রবর্তী সেই যে এলেন আর ফিরে গেলেন না। লোহা যেন চুম্বকে আটকে গেল।

ভূষণ চক্রবর্তীর আগমন-সংবাদটি সুখপুর-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেইটিই উদ্ধৃত করছি।

"সুখপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত ভূষণ চক্রবর্তীর আগমন। শিল্পী শ্রীমান বনস্পতি মিশ্রের জনৈক গুণগ্রাহী শ্রীযুক্ত ভূষণ চক্রবর্তী এম. এ. মহাশয় গত সপ্তাহে এখানে আসিয়া শিল্পীর সহিত সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। প্রথম সাক্ষাৎ বড়ই অদ্ভুত ধরনের হইয়াছিল। বনস্পতির সম্মুখীন

হইয়া চক্রবর্তী মহাশয় কোনও কথা বলেন নাই, নমস্কার পর্যন্ত করেন নাই, নির্বাক বিস্ময়ে বনস্পতির দিকে চাহিয়াছিলেন। বনস্পতি শিষ্টাচারসঙ্গত নমস্কারান্তে যখন আলাপ করিতে উদ্যত হইল, তখন চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিলেন তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে। তিনি এইবার যাইতে চান, অনর্থক বাগবিস্তার করতঃ শিল্পীর অমূল্য সময় নষ্ট করিবার বাসনা তাঁহার নাই। বনস্পতি ইহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া সবিনয় তাঁহাকে অন্তত দুই এক দিনের জন্য তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ জানায়। সে অনুরোধ চক্রবর্তী মহাশয় রক্ষা করিয়াছেন।"

সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল অমাবস্যা-সংখ্যায়। পূর্ণিমা-সংখ্যায় প্রকাশিত আর একটি সংবাদ থেকে জানা যাচ্ছে যে চক্রবর্তী মশায় শেষ পর্যন্ত বনস্পতি মিশ্রের কাছে পাকাপাকিভাবেই থেকে গেলেন। সংবাদটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি।

"শিল্পী শ্রীমান বনস্পতি মিশ্রের অভিনব প্রহরী। শ্রীমান বনস্পতি মিশ্রের গুণগ্রাহী শ্রীযুক্ত ভূষণ চক্রবর্তীর সুখপুরে আগমন-বার্তা বিগত অমাবস্যা-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি প্রথমে মাত্র দুই দিনের জন্য বনস্পতির আতিথ্য গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু দুইদিন আলাপের পর তাঁহার মত বদলাইয়াছে। বনস্পতির শিল্প-কর্মের চমৎকারিত্বে তিনি এতদূর অভিভূত হইয়াছেন যে আজীবন তিনি বনস্পতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু একটি মাত্র শর্তে, এজন্য তিনি কোনো বেতন লইবেন না। তিনি বলিয়াছেন, যে প্রেরণা বশে বৈরাগিনী মীরা একদা গাহিয়াছিল 'ম্যয়নে চাকর রাখো জী' সেই প্রেরণাই তাঁহাকেও শিল্পী বনস্পতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। সৈকত-কাননের বাড়িতে সামান্য আহার এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেই তিনি সানন্দে তাঁহার অবশিষ্ট জীবনটা শিল্পীর সেবায় কাটাইয়া দিতে পারিবেন এই কথা বলিয়াছেন। কিভাবে তাঁহার সমস্ত দিন কাটিবে, অর্থাৎ তাঁহার দৈনিক কার্যক্রম কি হইবে তাহা আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা শ্রীমান ভূপেন দাস জানিতে চাহিয়াছিল। উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, শিল্পী বনস্পতিকে প্রহরা দেওয়াই তাঁহার প্রধান কার্য হইবে। তাঁহার মতে ভাল দামী গাছের চারাকে গরু ছাগলের মুখ হইতে রক্ষা করিতে হইলে যেমন কাঁটার বেড়া দেওয়ার প্রয়োজন, শিল্পী এবং সাহিত্যিকদের রক্ষা করিতে হইলেও সেইরূপ সমর্থ এবং কড়া প্রহরী চাই। তিনি আরও বলিয়াছেন সভ্য মনুষ্যসমাজেও গরু ছাগল জাতীয় প্রাণীর অভাব নাই, তাহাদেরও একমাত্র কাজ উদীয়মান শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মাথাটি মুড়াইয়া খাওয়া। তাঁহার বিবেচনায় ইহা খুবই সুখের এবং সৌভাগ্যের বিষয় যে শ্রীবনস্পতিকে শহরের অর্ধশিক্ষিত স্বার্থপর পরশ্রীকাতর এবং তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত ফড়িয়াদের কবলস্থ হইয়া শিল্পী-জীবন যাপন করিতে হয় নাই। তিনি নির্জনে নিজগৃহে স্বীয় প্রতিভাকে বিকশিত করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী শ্রীমান ভূপেন্দ্রনাথের নিকট আর একটি আশঙ্কার কথাও ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি মনে করেন অদূর ভবিষ্যতে বনস্পতি মিশ্রের তপোভঙ্গ করিবার জন্য শহর হইতে বহুবিধ ফড়িয়ার সমাগম হইবে। ছেঁড়া কাঁথা, ভাঙা কলসীর কানা, পুরাতন পট অথবা হাতে লেখা পুঁথির খোঁজে যাঁহারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ান তাঁহারা কালক্রমে বনস্পতির সন্ধান পাইবেনই এবং তখন তাঁহাকে রক্ষা করিবার মতো কোনো সমর্থ লোক যদি না থাকে তাহা হইলে যে কি হইবে তাহা কল্পনা করিলেও তাঁহার হৃৎকম্প হয়। তিনি স্থির করিয়াছেন যে অনুমতি পাইলে তিনিই

প্রহরীর কাজ করিবেন। চক্রবর্তী মহাশয় বেশ বলিষ্ঠ গঠন ব্যক্তি, প্রত্যহ মুদ্গর চালনা করেন। তিনি স্বল্পাহারী, স্বল্পবাক এবং কৃতবিদ্য। তিনি এই স্বেচ্ছাবৃত প্রহরীর কার্য যে অনায়াসে করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের অনুরোধ তিনিও তাঁহার প্রতিভাকে বিকশিত করিয়া তুলুন। তিনি কৃতবিদ্য ব্যক্তি, ইচ্ছা করিলে তিনি আমাদের প্রভূত জ্ঞান দান করিতে পারেন। সুখের বিষয় তিনি 'সুখপুর-পত্রিকা'য় মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি লিখিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।"

ভূষণ চক্রবর্তী যে কিরকম কড়া প্রহরী তার প্রথম আভাস পেল হেমন্তকুমার। হেমন্তকুমার প্রায়ই যেত সৈকত-কাননে, উদ্দেশ্য আনাড়ি বনস্পতিকে আর্ট সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান দান করা। ভাবত—'এদের খাচ্ছি, পরছি, যতটা পারি এদের উপকার করি। যতটা পারি কূপমণ্ডুকটাকে বলে আসি যে তার কূয়োর বাইরে কত বড় বড় আর কি অপরূপ সব সাগর মহাসাগর আছে, শুনেও যদি ওর কিছুটা উন্নতি হয়। এত করে বললাম তবু গ্রাম ছেড়ে তো গেল না কোথাও।' বনস্পতি যখন ছবি আঁকত তখন তার কাছে বসে সে প্রায়ই গিয়ে সমুদ্রের কথা শোনাত। র‍্যাফল, বটিচেলি, এল্ গ্রেকো, ভ্যান গঘ, রুবেন্‌স্, গগ্যাঁ, পিকাসো, মিকালেঞ্জেলো, গয়া, দা ভিঞ্চি কত রকম নামই যে করত তার ঠিক নেই। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করতে পারেনি, কিন্তু সর্ববিদ্যাবিশারদ ছিল সে। অনর্গল বলে যেত এদের কথা। তাছাড়া অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ যে কোথায় কোথায় ভুল করেছেন, কি কি করলে তাঁরা সত্যি বিশ্ববিখ্যাত হতে পারতেন, যামিনী রায় কেন প্রগ্রেসিভ নন, দেবীপ্রসাদের দুর্বলতা কোথায় এসব নিয়েও বেশ বিজ্ঞের মতো বক্তৃতা দিত সে নস্যির টিপটি হাতে ধরে। বনস্পতি তার কথাগুলো মন দিয়ে শুনছে কি না, মহামূল্য এসব তথ্যে তার চিত্তলোক উদ্দীপ্ত হচ্ছে কিনা তা কিন্তু সব সময়ে বুঝতে পারত না হিমু। কারণ বনস্পতি আপন মনে ছবিই এঁকে যেত, 'হ্যাঁ', 'না' কোনও উত্তরই দিত না, মাথা নাড়ত না, ভুরু কোঁচকাত না, হাসত না, বক্তৃতার মাঝখানে উঠেও যেত মাঝে মাঝে। কিন্তু এসবে দমত না হেমন্তকুমার। সে নস্যির টিপটা টেনে নিয়ে হাসিমুখে বসে থাকত চুপ করে। বনস্পতি ফিরে এলে শুরু করত আবার। আর একটা বিশেষত্বও ছিল হেমন্তকুমারের। বনস্পতির ছবির সম্বন্ধে কোনো মন্তব্যই করেনি কখনও সে, যেন সেগুলো তার নজরেই পড়েনি, যদিও যে ঘরে বসে সে বনস্পতির সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকে প্রসারিত করবার চেষ্টা করত সে ঘরের চারটে দেওয়ালই ভরতি ছিল বনস্পতির আঁকা ছবিতে। তারই ছেলেমেয়ের নানা ছবি সে এঁকেছিল নানা ভঙ্গিতে, কিন্তু সেগুলোর সম্বন্ধেও কোনো প্রশংসা-বাক্য উচ্চারণ করা দূরে থাক, কোনও মন্তব্য পর্যন্ত করেনি হেমন্তকুমার, যেন ওসব ছেলেমানুষী কাণ্ডগুলোকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনাটা অশোভন তার মতো বিজ্ঞের পক্ষে। বনস্পতি হেমন্তকুমারের ছেলেমেয়ের ছবিগুলো সত্যিই অদ্ভুত করে এঁকেছিল। যার নাম বন্দুক তার হাতে একটা বন্দুক দিয়ে মেয়েটার ভাব-ভঙ্গিতে ফুটিয়েছিল একটা বন্দুক-ভাব—নির্বিকার, আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ, কিন্তু চোখের দৃষ্টি অগ্নি-গর্ভ। বর্শার মুখখানা এঁকেছিল একটা চকচকে বর্শা-ফলকের উপর। সত্যবতী দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন এই অভিনবত্বে, কিন্তু হেমন্তকুমারের মনে এসব যে কোন রেখাপাত করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সে মুখে একটা সবজান্তা-মার্কা হাসি ফুটিয়ে হয় চুপ করে বসে থাকত, কিম্বা বনস্পতির আত্মিক উন্নতির জন্য বক্তৃতা করত।

ভূষণ চক্রবর্তী মাসখানেক ধরে লক্ষ্য করলেন এসব। হেমন্তকুমারের স্বরূপ আবিষ্কার করতে বিলম্ব হয়নি তাঁর, কিন্তু বাচস্পতির শ্যালক বলে প্রথম প্রথম তাকে কিছু বলতে পারেননি। কিন্তু একদিন তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল যখন তিনি আড়াল থেকে শুনতে পেলেন হেমন্তকুমার বলছে—"ও ছবি আঁকবার আগে তোমার লিওনার্দো দা ভিঞ্চির জীবন-চরিতটা পড়ে নেওয়া উচিত ছিল, তাহলে বুঝতে পারতে কত বড় প্রতিভা থাকলে তবে ও ছবি আঁকা সম্ভব। তুমি ছবির নাম দিয়েছ 'বিশ্ববিদ্যালয়', কিন্তু বিশ্বের সম্বন্ধে কতটুকু ধারণা আছে তোমার? সারাজীবন পড়ে আছো তো এই অজ পাড়াগাঁয়ে, দা ভিঞ্চি আঠারো উনিশ বছর ঘুরে ঘুরেই বেড়িয়েছিলেন শুধু, দুনিয়ার কত কিছু দেখেছিলেন, তবু তিনি ও নাম দিয়ে ছবি আঁকতে সাহস করেননি। বিখ্যাত আর্টিস্টদের জীবনীগুলো অন্তত তোমার পড়া উচিত, কিন্তু মুশকিল হয়েছে তুমি ইংরেজি যে একেবারে জান না, পড়ে বসে আছ এক 'ডেড্ ল্যাঙ্গুএজ'—"

ভূষণ চক্রবর্তীর আপাদমস্তক জ্বলে উঠল এ-কথা শুনে। কিছুদিন আগে 'বিশ্ববিদ্যালয়' নাম দিয়ে বনস্পতি প্রকাণ্ড যে ছবিটা আঁকতে শুরু করেছিল তার পরিকল্পনা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় কোনো বড় অট্টালিকা নয়। প্রাচীন এক বট-বৃক্ষ অসংখ্য ঝুরি নাবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট গাম্ভীর্যে, তার গাঁটে গাঁটে সবুজ পাতা আর লাল ফলের সমারোহ, কত রকমের পাখি যে আশ্রয় নিয়েছে তাতে, কত রকমের পতঙ্গ যে ঘুরে বেড়াচ্ছে পাতায় পাতায়, কত রকমের লতা উঠেছে তার গা বেয়ে তার আর ইয়ত্তা নেই। একধারে এক বুড়ি ডাল নুইয়ে পাতা পাড়ছে, পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি উন্মুখ বাছুর। আর একধারে দোলনায় দুলছে এক মেয়ে, উড়ছে তার আলুলায়িত চুল, চোখে মুখে উপছে পড়ছে হাসি, মাথার উপর অনন্ত আকাশ, চারিপাশে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। আকাশে উড়ে চলেছে বকের সারি। বটবৃক্ষের পাদমূলে নানারকম পাথরের মূর্তি, প্রত্যেকটিতে সিন্দুর-চন্দন, একটি মেয়ে প্রণতা হয়ে আছে তাদের সামনে, বর্তমান যেন প্রণাম করছে অতীতকে। এছাড়া আরও অনেক বৈচিত্র্য অলঙ্কৃত করছে ছবিখানিকে। কোথাও পাখি নীড় বেঁধেছে, কোথাও আবার পিঁপড়েরা, মাকড়শারা সূক্ষ্ম উর্ণার জাল টাঙিয়ে দখল করে আছে খানিকটা জায়গা, ভাঙা শুকনো শাখার পাশ থেকে উঁকি দিচ্ছে নবীন কিশলয়ের দল। গাছের আর একধারে বুড়িটার পাশে কয়েকটি মেয়ে শুকনো পাতা আর ডাল কুড়িয়ে বোঝা বাঁধছে। একদল শাখা-মৃগও বসে আছে একধারে গাছের উপর। সবাই আনন্দিত, সবাই প্রাণরসে ভরপুর। ভূষণ চক্রবর্তীর মতে এইটি নিঃসন্দেহে বনস্পতির শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম। তিনি দূর থেকে দাঁড়িয়ে রোজ দেখে যেতেন কতদূর আঁকা হল, নীরবে দেখে যেতেন শুধু, কোন কথা বলতেন না।

এই ছবির সম্বন্ধে হেমন্তকুমারের অভিমত শুনে ক্ষেপে গেলেন ভূষণ চক্রবর্তী। কিন্তু তখনই তখনই এর প্রতিকার করা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে, হেমন্তকুমার বাড়ির একজন নিকট আত্মীয়।

হেমন্তকুমার চলে যাবার পর ভূষণ চক্রবর্তী গেলেন বনস্পতির কাছে। বনস্পতি তখন আঁকছেন গাছের মাথার উপরে আটকে গেছে রঙীন একখানা ঘুড়ি।

"একটা কথা বলতে এসেছি আপনাকে।"

বনস্পতি তখনও রং লাগাচ্ছেন ঘুড়িতে। ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, "ও, আপনি। কি বলবেন বলুন, কেমন লাগছে ছবিখানা?"

"অপূর্ব। আমি আর একটা কথা বলতে এসেছি। আমি নিজেকে আপনার সেবায় নিযুক্ত করেছি, কিন্তু যা করব বলে এসেছিলাম তা তো করতে পাচ্ছি না। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি হেমন্তবাবু রোজ আপনাকে এসে বিরক্ত করে যাচ্ছেন, আমার মনে হচ্ছে ওঁকে বাধা দেওয়া উচিত—"

উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে বনস্পতি বললেন, "আমারও মনে হচ্ছে। কিন্তু উপায় কি?"

"উপায় আছে। আপনি যদি আমাকে লিখিত একটি আদেশ দেন তাহলে আমি কোনো বাজে লোককে ঢুকতে দেব না।"

"তাহলে তো বাঁচি। কি লিখতে হবে?"

"লিখতে হবে ভূষণ চক্রবর্তীর বিনা অনুমতিতে কেউ আমার ছবি-আঁকার ঘরে ঢুকতে পাবে না। আমার সঙ্গে দেখা করতে হলেও ভূষণ চক্রবর্তীর সঙ্গে আগে দেখা করে সেটা ঠিক করে নিতে হবে। ভূষণ চক্রবর্তীই আমার প্রহরী, কোনও কারণেই তাঁর অমতে আমার কাছে আসা চলবে না।"

"এরকম লিখলে কেউ কিছু মনে করবে না তো!"

"করবে বইকি, নিশ্চয় করবে। কিন্তু ওর ঝুঁকিটা আমি নিজের ঘাড়েই নেব, বদনাম আমারই হবে, আর নিতান্ত প্রয়োজন না হলে আপনার লেখাটা আমি দেখাব না কাউকে।"

শেষ পর্যন্ত তাই হল। বনস্পতি একটা খাতায় লিখে দিলেন ওই কথাগুলো, লিখে নাম সই করে দিলেন নীচে।

বনস্পতিকে রক্ষা করবার একটা সুবিধা ছিল। বনস্পতির অন্দরমহলে প্রবেশ করবার দ্বার একটি মাত্র। সেই দ্বারেব সামনে প্রকাণ্ড একটা বারান্দা। বারান্দার অপর প্রান্তে দুটি ঘর নিয়ে বাস করতেন ভূষণ চক্রবর্তী। সুতরাং তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে বাইরের কোনো লোকেরই অন্দর মহলে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না। চাকর-চাকরানি আর হেমন্তকুমার ছাড়া অন্দর-মহলে তখন যেতও না কেউ বিশেষ। কোলকাতা থেকে জনসমাগম পরে আরম্ভ হয়েছিল।

একদিন সকালে হেমন্তকুমার এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভ্রূকুঞ্চিত করে মুখ তুলে দেখল সদর দরজার উপর বড় বড় অক্ষরে নোটিশ ঝুলছে—"ভূষণ চক্রবর্তীর বিনা অনুমতিতে ভিতরে প্রবেশ নিষেধ।" হেমন্তকুমার নস্যির টিপটি ডান হাতে ধরে আরও ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ নোটিশটার দিকে। মনে ঈষৎ কৌতুক সঞ্চার হল তার। তারপর নস্যির টিপটা সজোরে টেনে নিয়ে ভিতরের দিকে যথারীতি অগ্রসর হল সে।

"শুনছেন? ভিতরে যাবেন না।"

ভূষণ চক্রবর্তীর বজ্রকণ্ঠ শুনে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল হেমন্তকুমারকে। চক্রবর্তী মশায় নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে অন্দরমহলের দ্বার রোধ কবে এসে দাঁড়ালেন।

"এর মানে?"—প্রশ্ন করলেন হেমন্তকুমার।

"নোটিশটা দেখুন।"

"দেখেছি। কিন্তু ও নোটিশ আমার উপরও খাটবে? আমি ওর আত্মীয়—"

"আপনি ওঁর আত্মীয় নন, বরং আমার মনে হয় আপনি ওঁর শত্রু। আপনি ওঁর কানের কাছে বকবক করে ওঁর কাজে বাধা দিচ্ছেন। আত্মীয় হলে এটা করতেন না।"

"ওর ভালর জন্যেই বকবক করি। আর্ট সম্বন্ধে যতটুকু জানি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করি—"

"আপনি যা বলেন তা আমি শুনেছি। আর্ট সম্বন্ধে আপনার কোনো জ্ঞান নেই, আজকাল কতকগুলো শস্তা বিলিতি বইয়ের দৌলতে অধিকাংশ লোক যা হয়েছে আপনি তাই।"

"কি—"

"একটি 'ফড়ে'। তাই আমার ইচ্ছে নয় যে আপনি ওঁর কাছে যান।"

"আপনার ইচ্ছে অনুসারে আমাকে চলতে হবে না কি?"

"বনস্পতি মিশ্রের বাড়িতে চলতে হবে। তিনি এ বিষয়ে লিখিত অনুমতি দিয়েছেন আমাকে—"

মুখে স্মিত হাসি ফুটিয়ে হেমন্তকুমার চেয়ে রইল চক্রবর্তীর দিকে। এইটি তার একটি বিশেষত্ব। প্রাণের ভিতর যাই হোক মুখে তা প্রকাশ পায় না কখনও। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে অবশেষে বলল, "আমি যদি জোর করে ঢুকি?"

"আমার দিকে চেয়ে দেখুন, আমার সঙ্গে জোরে পারবেন কি?"

হেমন্তকুমার তাঁর পেশী-সমৃদ্ধ বাহুখানির উপর একবার চোখ বুলিয়ে আর একটু হেসে এমন ভাবে চলে গেল যেন সে একটা ষাঁড়কে দেখে পাশ কাটাচ্ছে।

আশ্চর্যের বিষয়, এ নিয়ে হেমন্তকুমার কোনও হৈ চৈ তো করেইনি, দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির কাছে কথাটা প্রকাশ পর্যন্ত করেনি। এটাও তার একটা বৈশিষ্ট্য। কিলটি খেয়ে সেটি নিঃশব্দে হজম করবার অদ্ভুত নৈপুণ্য আছে তার। কোথাও অপমানিত হলে কাক-পক্ষীটি পর্যন্ত সে খবর জানতে পারত না। কোন বয়স্ক ব্যক্তি কোথাও পা পিছলে পড়ে গেলে যেমন প্রথমেই চারিদিকে চেয়ে দেখে তার এই অধঃপতন কেউ দেখতে পেয়েছে কি না, অপমানিত হলে হেমন্তকুমারও তেমনি শঙ্কিত হয়ে পড়ত, খবরটা কেউ জানতে পারেনি তো। ছাত্রজীবনে বহু ঘাটের জল খেয়ে এই সত্যটা সে উপলব্ধি করেছিল যে গায়ে একবার কাদা লেগে গেলে তার আর চারা নেই, বুক চাপড়ে লোক জড়ো করলে সে কাদার মলিনতা তো একটুকু কমবেই না, বরং সেটা অনেক লোকের হাসির খোরাক জোগাবে। তার চেয়ে চুপি চুপি আড়ালে গিয়ে কাদাটা তাড়াতাড়ি ধুয়ে ফেলবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আর ভবিষ্যতে কাদাটা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করাই উচিত।

হেমন্ত এ ক্ষেত্রেও তাই করল।

কাদার সংস্রব এড়িয়ে গিয়ে বসতে লাগল তালুকদার মশায়ের চণ্ডীমণ্ডপে। বেশ একটি সম্মানের আসনও পেল সে সেখানে। তালুকদার মশায়ের তৃতীয় পক্ষের কনিষ্ঠ পুত্র সহদেবের শ্রদ্ধা সে আগেই আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিল। সহদেব ফোর্থ-ক্লাস থেকে প্রমোশন পায়নি। তিনবার চেষ্টা করেছিল, পারেনি। এই জন্যেই সম্ভবত সহদেবের সম্বন্ধে একটা মমত্ব-বোধ ছিল হিমুর। সহদেবের বাবা শিবু তালুকদার স্বর্গারোহণ করেছিলেন বছর দুই পূর্বে। তাঁর বিষয়-সম্পত্তি ছিল কিছু, ভাগ করলে প্রতি ভাগে চটকস্য মাংসের চেয়েও কম পড়ত, কারণ ত্রয়োদশ পুত্রের পিতা ছিলেন তিনি। এক সহদেব ছাড়া অন্য ভাইগুলির বিবাহ এবং সন্তান-সন্ততিও হয়েছিল। সবাই একান্নবর্তী ছিল বলেই মোটা-ভাত মোটা-কাপড় কোনোক্রমে জুটছিল সকলের। অন্য ভাইগুলি এদিকে-ওদিকে কিছু রোজগারও করতেন। সহদেবই ছিলেন বেকার। সে সংসারের ফাই-ফরমাশ খাটত, আর সন্ধের পর নিজেদের চণ্ডীমণ্ডপে বসে তাস খেলত বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে।

প্রথমে সে এর নামকরণ করেছিল 'সুখপুর ক্লাব'। কিন্তু হেমন্তকুমার সংশোধন করে দিয়েছিল নামটা। বলেছিল, "কানা পুতের নাম পদ্মলোচন রেখো না। ক্লাব অনেক বড় জিনিস হে, 'বার্' না থাকলে ক্লাব হয় না। কার্ড ক্লাব রাখতে পার বরং।" লাউ কুমড়োর ডালনা, পুঁই শাকের চচ্চড়ি আর কলাইয়ের ডাল দিয়ে লাল চালের ভাত ছাড়া শারীরিক পুষ্টি বিধানের জন্য অন্য উপকরণ যদিও সে জোটাতে পারত না, বিদেশি আহার সংগ্রহ করা অসম্ভবই ছিল তার পক্ষে, বিদেশি বিদ্যাও সে আহরণ করতে পারেনি। কিন্তু বিদেশি সভ্যতা সম্বন্ধে মোহের অন্ত ছিল না সহদেবের। এরই প্রকাশ হয়েছিল তার 'ওপন্ ব্রেস্ট' কোটে আর ওই সুখপুর কার্ড ক্লাবে।

হেমন্তকুমার এইখানে এসেই আশ্রয় পেল।

সহদেব একটু কৌতূহলী প্রকৃতির লোক। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, "আপনি আর বনুদার ওখানে যান না, আগে তো রোজ যেতেন?"

"না ভাই, আর যাই না। ওখানে যাওয়া ছেড়েছি। আমাদের এক মাস্টার মশাইয়ের বাড়ি যাওয়া যেমন ছেড়েছিলাম—"

"কি রকম?"

কৌতূহলী সহদেব আরও কৌতূহলী হয়ে উঠল।

"কোলকাতায় শেষবার যে স্কুলটাতে ট্রায়াল দিয়েছিলাম সেখানে এক মাস্টার ছিলেন ভানু মিত্তির। লোকটি এমনিতে ভাল, বেশ ভাল, আমাকে স্নেহ করতেন খুব। একদিন বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেলেন, তাঁর স্ত্রীটিও দেখলাম খুব ভাল। আমাকে স্নেহ করতেন খুব। আমাকে সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়ালেন। মাঝে মাঝে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করলেন। আমি যেতামও মাঝে মাঝে, কিন্তু তার এক ল্যালা পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছেলের জন্য যাওয়া ছাড়তে হল শেষটা—"

"কেন, কি করত সে?"

"ডাক্তারের পরামর্শে তাকে ভাল ভাল খাবার খেতে দিত ওরা। সন্দেশ, রসগোল্লা, সর, মাখন, ডিম—কত কি, কিন্তু ছেলেটা খেত না কিছু, বাঁ হাত দিয়ে চটকাত খালি, আর মুখ দিয়ে নাল গড়িয়ে পড়ত। সে এক বীভৎস দৃশ্য। রোজ রোজ ওই দৃশ্য দেখা পোষাল না আমার, যাওয়া ছেড়ে দিলাম।

বনুর ওখানে যাওয়াও ছেড়েছি ওই জন্যে। ভাল ভাল কাগজ রং আর তুলি নিয়ে যে সব কাণ্ড ও করছে তা আর বসে দেখা যায় না—"

"কি ছবি আঁকছেন আজকাল বনুদা?"

"ও ছবি আঁকবে কি! মোগল পাঠান হদ্দ হল ফারসী পড়ে তাঁতি, ওর হয়েছে সেই অবস্থা, আস্বা আছে খুব। কিন্তু সামর্থ্যে কুলোয় না। একটা ছবির গাল-ভরা নাম দিয়েছে 'বিশ্ববিদ্যালয়'; কিন্তু আঁকছে একটা বটগাছ—"

"তাই না কি! বটগাছের নাম বিশ্ববিদ্যালয় দেবার মানে?"

"বোঝ—"

এরপর হেমন্তকুমার গাল-ভরা কতকগুলো নাম উচ্চারণ করে সহদেবকে বিস্মিত করে দিলে। র্যাফেল, মিকালেঞ্জেলো, দা ভিঞ্চি, গয়া, রুবেন্স প্রভৃতির নামও কখনও শোনেনি বেচারা। হাঁ করে শুনতে লাগল। সহদেবকে বিস্মিত করে দেবার মতো বিদ্যে ছিল হেমন্তকুমারের।

এর দিনকতক পরে 'সুখপুর-পত্রিকা'র এক সংখ্যায় ভূষণ চক্রবর্তীর এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। প্রবন্ধের নাম 'মানুষের সঙ্গ'।

চক্রবর্তী মশায় তাতে লিখলেন—"প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোনও সমর্থ পুরুষ দ্বিতীয় সমর্থ পুরুষের সান্নিধ্য সহ্য করিতে পারিত না। নারী এবং শিশু পরিবৃত হইয়াই সে বন্য জীবন যাপন করিত। শিশু-পুত্র যৌবনে উত্তীর্ণ হইলেই পিতার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গণ্য হইয়া অবশেষে বিতাড়িত হইত। বহু শতাব্দী ধরিয়া এই নিয়মই মানব-সমাজকে চালিত করিয়াছে। ইহার পর মানুষ সভ্য হইল, সমাজ স্থাপন করিল, সমাজের পুরুষেরা আর তখন অন্য পুরুষের সঙ্গ বর্জন করিতে পারিল না, বর্জন করিতে চাহিলও না। কারণ তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিল নিজেদের স্বার্থের জন্যই একতা, সহৃদয়তা, বন্ধুত্ব, সামাজিকতা প্রভৃতির প্রয়োজন আছে। কিন্তু বহু শতাব্দী ধরিয়া পরস্পরের প্রতি যে বিরুদ্ধ ভাব তাহারা পোষণ করিয়া আসিয়াছে তাহা সহজে অবলুপ্ত হইল না। ইংরেজিতে একটি প্রবচন আছে—চিতাবাঘ নিজ চর্মের কৃষ্ণ-বৃত্তগুলি কিছুতেই মুছিয়া ফেলিতে পারে না। সংস্কৃত কবিও বলিয়াছেন, অঙ্গারকে শতবার ধৌত করিলেও তাহা মলিনতা-মুক্ত হয় না। বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণও বলিতেছেন, আমাদের পাশব প্রবৃত্তিগুলিও লুপ্ত হয় না, অবদমিত হয় মাত্র, মনের গহনে অবচেতন লোকে তাহারা আত্মগোপন করিয়া থাকে এবং কালক্রমে ভিন্ন রূপে রূপান্তরিত হইয়া মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে।

একটি উদাহরণ দিতেছি—মনে করুন, আপাতদৃষ্টিতে 'ক' 'খ'-য়ের বন্ধু। যতদিন তাহাদের অবস্থা সমান থাকে ততদিন তাহাদের বন্ধুত্বে হয়তো ফাটল ধরে না। কিন্তু যে-ই একজনের সৌভাগ্য দেখা দেয়, ধনে-মানে পুত্রে-কলত্রে সামাজিক প্রতিষ্ঠায় যেই একজন আর একজনকে ছাড়াইয়া যায়, তখনই নিম্নস্থ বন্ধুটির মনে ঈর্ষা জাগে। কিন্তু এ ঈর্ষা সে প্রকাশ করে আইনসঙ্গত সভ্য উপায়ে। জঙ্গলের আইন প্রচলিত থাকিলে সে সোজাসুজি তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নখদন্ত আয়ুধ প্রহারে তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিত। কিন্তু সভ্যসমাজে তাহা করিবার উপায় নাই। তাই তাহারা বাধ্য হইয়া যে সব অস্ত্রের আশ্রয় লয় আপাতদৃষ্টিতে সেগুলিকে অস্ত্র বলিয়া চেনাই যায় না। বর্তমান সভ্যসমাজে তাহারা নানা নামে প্রচলিত আছে। একটি এইরূপ অস্ত্রের নাম করিতেছি। সেটির নাম 'সমালোচনা'। 'সমালোচনার ভাল দিক যে নাই তাহা বলিতেছি না, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সমালোচনা পরশ্রীকাতরতারই প্রকাশ। যিনি আপনার বন্ধু, তিনিই আপনার বড় সমালোচক, প্রকাশ্য সমালোচক নয়, গোপন সমালোচক। তিনি আপনার নিকটে আসিয়া আপনাকে উপদেশ দিবার ছলে আপনার সমালোচনা করেন, আপনার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া আপনাকে অভিনন্দন করিবার সময় আসিয়াও আপনার সমালোচনা করেন, তাঁহার অন্তর্নিহিত ঈর্ষানল তাঁহার বাক্যে, ব্যবহারে, হাসিতে বিকীর্ণ হয়। আপনি বিপন্ন হইলে তিনি মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু মনে মনে আনন্দিত হন।

ইহার প্রতিক্রিয়াও হইয়াছে। সম্ভবত, ইহারই ফলে সমাজে আজকাল দুই শ্রেণীর লোক উদ্ভূত হইয়াছেন। প্রথম শ্রেণীতে আছেন সাধু সন্ন্যাসী এবং প্রকৃত মহাত্মাগণ। ইঁহারা সংসার ও সমাজ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর অরণ্যে, পর্বতে বা মরুভূমিতে একক জীবন যাপন করাই

নিরাপদ মনে করেন। যাঁহারা তাঁহাদের নাগাল পান না তাঁহারা এই সাধু-সন্ন্যাসীদের 'এস্‌কেপিস্ট' অর্থাৎ 'পলাতক' আখ্যা দিয়া কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। ঈশপের গল্পে শৃগালও দ্রাক্ষাগুচ্ছকে তিক্ত বলিয়াছিল। একথা কিন্তু অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে ইহারা সকলেই গুণী, জ্ঞানী এবং তপস্বী। তথাকথিত সভ্য মানবসমাজের পাশবিকতা এড়াইবার জন্যই মনুষ্যসঙ্গ পরিহার করা তাঁহারা শ্রেয় মনে করিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাঁহারা আছেন তাঁহারা সমাজ পরিত্যাগ করেন নাই বটে, কিন্তু সমাজের ভিতর থাকিয়াই তাঁহারা কূর্মের মতো হাত-পা গুটাইয়া বাস করেন। ইঁহারাও ঐশ্বর্যবান। কিন্তু ইঁহারা নিজেদের ঐশ্বর্যের কথা কাহাকেও জানিতে দেন না। টাকা-কড়ি থাকিলে তাহা মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখেন। আহারে, বিহারে, পোশাকে-পরিচ্ছদে সে ধনের অস্তিত্ব বিন্দুমাত্র আভাসিত হয় না। সমাজের নিকট তাঁহারা দরিদ্র রূপেই পরিচিত হইতে চান। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান তাঁহারাও অতি-বিনয়-বশত মূর্খতার ভান করিতে ভালবাসেন, নিজেদের বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করিয়া অপরের ঈর্ষাভাজন হইবার বাসনা তাঁহাদের নাই। তাঁহারা মূর্খতারই ভান করেন। অর্থাৎ এই দ্বিতীয় স্তরের লোকেরাও যে জ্ঞানী গুণী এবং ধনী হইয়াও সমাজে অতিশয় সসঙ্কোচে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন, আমার বিশ্বাস, তাহা তথাকথিত বন্ধুদের ভয়ে। যে মনোবৃত্তি বশে আমরা বর্ষাকালে পোকার ভয়ে আলো জ্বালি না, ইহা অনেকটা সেইরূপ মনোবৃত্তি। মানুষের সঙ্গ ইঁহাদের নিকট বিরক্তিকর, অনেক সময় ভয়াবহ এবং বিপদসঙ্কুল।

তৃতীয় আর একটি শ্রেণীর উল্লেখ করিব। ইঁহারা মানুষের অনুরাগী, মনুষ্য সমাজেই বাস করেন, মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মানুষের পরিবেশ, বস্তুত মানুষই ইঁহাদের জীবনের প্রেরণা, ইঁহাদের সৃষ্টির উপাদান এবং উপকরণ। ইঁহারা কবি ও শিল্পী। মানুষের সঙ্গ ইঁহাদেরই সর্বাপেক্ষা বেশি বিপন্ন করিয়াছে। নিন্দা, প্রশংসা, তিরস্কার, পুরস্কার, ছদ্মবেশী শত্রু, মতলববাজ চাটুকার, ঈর্ষা-ক্লিষ্ট আত্মীয়-বন্ধু, বেরসিক পৃষ্ঠপোষক, অখ্যাতির হতাশা, অতি-খ্যাতির বিড়ম্বনা প্রভৃতি অনিবার্যভাবে আসিয়া ইঁহাদের অনাবিল মানসলোককে আবিল করিয়া তুলিতেছে। ইঁহারা আত্মভোলা লোক, কিন্তু সন্ন্যাসীদের মতো সাত্ত্বিক প্রকৃতির নহেন, রাজসিকতার ইন্দ্রলোকে সমাসীন হইয়া শান্তিতে সৃষ্টির স্বপ্নে বিভোর থাকিতে পারিলেই ইঁহারা সর্বোত্তম সৃষ্টি করিতে পারেন, কিন্তু আমার মনে হয়, মানুষের সঙ্গই এ পথে তাঁহাদের প্রধান অন্তরায়। তাঁহারা প্রকৃত রসিকের খোঁজে মানুষদের সহিত মিশিতে বাধ্য হন, কারণ মানুষই তাঁহাদের সৃষ্টির একমাত্র মূল্যদাতা। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবাঞ্ছিত মানুষেরা তাঁহাদের চারিদিকে যে পরিবেশ সৃষ্টি করে তাহা পীড়াদায়ক। ইহাদের চাপে অনেক সময় প্রতিভার মৃত্যু হয়। আমার মতে ইঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা কর্তব্য। কিন্তু আমরা সে কর্তব্য পালন তো করিই না, উপরন্তু উপাধি, পুরস্কার, খোশামোদ, নিন্দা প্রভৃতির লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া ইহাদের বিরক্ত করি, কখনও জ্ঞাতসারে, কখনও অজ্ঞাতসারে।

সাধারণ মানুষের পক্ষে অন্য মানুষের সঙ্গ হয়তো কাম্য, অনেক সময় তাহা হিতকরও। কিন্তু যাঁহারা অসাধারণ ব্যক্তি, অবাঞ্ছিত মনুষ্যসঙ্গ তাঁহাদের পক্ষে বিষবৎ। তাহা সুধাবৎ হইত যদি তাঁহারা প্রকৃত রসিক এবং হিতৈষী লোকের সঙ্গ পাইতেন। কিন্তু সেরূপ লোক সর্বযুগেই বিরল, এ যুগে আরও বিরল।"

এ প্রবন্ধটি বাচস্পতির খুব ভাল লেগেছিল। সম্ভবত এ-ও তিনি আন্দাজ করেছিলেন যে

প্রবন্ধটির লক্ষ্য হেমন্তকুমার। হেমন্তকুমার যে বনস্পতির ওখানে না গিয়ে সহদেবদের চণ্ডীমণ্ডপে তাস খেলছে এবং সহদেবের সাঙ্গোপাঙ্গদের নতুন নতুন রকম তাস খেলা শেখাচ্ছে এ খবরও তিনি শুনেছিলেন সীমন্তিনীর মুখে। সীমন্তিনী শুনেছিল লাঠির কাছে। লাঠি ছিল একটু গোয়েন্দা-প্রকৃতির। তার বাবা কি করছে, কোথায় যাচ্ছে এসব খবর সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রাখত আর তার পিসীমার কাছে এসে বলত চুপি চুপি। হেমন্ত যে আর বনস্পতির ওখানে যাচ্ছে না এতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল সীমন্তিনী। তার দাদা যে সপরিবারে এখানে এসে আছে এতেও মনে মনে একটা কুণ্ঠা ছিল তার। অথচ সে মুখে কিছু বলতে পারত না। তার দাদাকেও না, স্বামীকেও না। বাচস্পতি ও সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্যই করতেন না। বহুকাল পূর্বে হেমন্তকুমারের সঙ্গে তাঁর যে আলোচনা হয়েছিল, তারপর থেকে হেমন্তকুমার তাঁকে এড়িয়ে চলত। তিনিও আর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার সঙ্গে আলাপ করবার উৎসাহ পাননি। সুখপুর-পত্রিকা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতে হত তাঁকে যে সময়ও পেতেন না। প্রায়ই টাট্টু ঘোড়াটিতে চড়ে তিনি বেরিয়ে যেতেন বাড়ি থেকে সংবাদের যাথার্থ্য যাচাই করবার জন্যে। ফিরে এসেই আবার বসতেন সে সংবাদটি লিখতে। সুতরাং হেমন্তকুমারকে নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ই পেতেন না তিনি। ভূষণ চক্রবর্তীর প্রবন্ধটি পড়ে তিনি বুঝলেন হেমন্তকুমারের সঙ্গে তাঁর একটা সংঘর্ষ হয়ে গেছে সম্ভবত। খুশি হলেন মনে মনে, হেমন্তকুমার সৈকত-কাননে আর যাচ্ছে না শুনে আরও খুশি হলেন।

হেমন্তকুমার সৈকত-কাননে না গেলেও তার ছেলেমেয়েরা সেখানে যেত। বনস্পতি তাদের সঙ্গ পছন্দ করত, তাদের মডেল করে ছবি আঁকত, তাদের নানারকম ফাই-ফরমাশ করত। ভূষণ চক্রবর্তীকে সে বলে দিয়েছিল ওদের আসা-যাওয়া যেন অবারিত থাকে।

এইভাবেই চলছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত ভূষণ চক্রবর্তী যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই ঘটল। কোলকাতা শহর থেকে সমঝদার জুটতে লাগল। এরা আকৃষ্ট হল অবশ্য ছবির টানে নয়, টাকার গন্ধে। তারা ভেবেছিল বনস্পতি মিশ্র নামক যে অর্ধশিক্ষিত ধনী সন্তানটি ছবির খেয়ালে মেতে আছে তাকে একটু চোমরালে, একটু তাতালে, 'শিল্প জগতে আগামী যুগের অগ্রদূত' বা 'জুলিয়াস সীজার' বা 'নাদির শাহ্' বা ওইরকম কিছু বলে বর্ণনা করলে তার মাথা ঘুরে যাবেই, আর মাথা ঘোরাতে পারলেই পয়সা টানা যাবে। তারা জানে অনেক বড়লোকের ছেলে বদ-মেয়েমানুষ আর ঘোড়ায় পয়সা ওড়ায়, আবার কেউ কেউ এই-সব খেয়ালেও ওড়ায়। এই সব উড্ডীয়মান পয়সা যে শেষ পর্যন্ত চতুর ব্যক্তিদের ব্যাংকে গিয়ে নীড় বাঁধে এ কথা তো সুবিদিত। চতুর ব্যক্তিগুলি এই আশা নিয়েই এসেছিলেন। কিন্তু তাঁরা ভূষণ চক্রবর্তীর খবর পাননি।

বনস্পতি যে একজন খেয়ালী শিল্পী এবং ধনী লোক এ খবরটা কোলকাতায় প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল বনস্পতির শ্বশুরবাড়িতে। জামাইষষ্ঠীর একটি নিমন্ত্রণেও যায়নি সে। সরস্বতী লিখে জানিয়েছিল, "উনি ছবি-আঁকা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে ওঁকে সময়ে খাওয়ানো-নাওয়ানো যায় না। ছবি নিয়েই দিনরাত মেতে আছেন। ওঁকে আর তোমরা যাবার জন্য পীড়াপীড়ি কোরো না। আর ওঁর মতো লোককে নিয়ে গিয়ে শুধু শুধু কষ্ট দেওয়াই হবে। উনি এখানে একাই চার-পাঁচটা বড় বড় ঘর নিয়ে থাকেন। কোলকাতায় গলির মধ্যে ছোট্ট ভাড়াটে বাড়ির খুপরি ঘরে গিয়ে থাকা খুবই কষ্টকর হবে ওঁর পক্ষে।..."

সরস্বতীর বাপের বাড়ি থেকে এই খবর পল্লবিত হল। এ কান সে কান হয়ে শেষকালে তা গিয়ে পৌঁছল রৈবতক গাঙুলীর কানে।

হবুচন্দ্র রাজা যখন প্রথম শূকর দেখেছিলেন তখন সবিস্ময়ে তাঁর মন্ত্রী গবুচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন, "এ আবার কি রকম জানোয়ার। আগে তো দেখিনি কখনও।" গবুচন্দ্রও দেখেননি, কিন্তু নিজের অজ্ঞতা মহারাজের কাছে প্রকাশ না করে তিনি কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "মহারাজ, এ নতুন কোন জানোয়ার নয়। এর আবির্ভাবের দুটি কারণ আমি অনুমান করছি—হয় গজ-ক্ষয়, না হয় মূষিক-বৃদ্ধি।" শ্রীরৈবতক গাঙুলীর পরিচয় দিতে গিয়ে আমার গবুচন্দ্রের কথা মনে পড়ছে এবং তাঁর উক্তির অনুকরণে বলতে ইচ্ছে করছে—রৈবতক গাঙুলী হয় এন্‌সাইক্লোপিডিয়া-ব্রিটানিকা-ক্ষয় অথবা হেমন্তকুমার-বৃদ্ধি। রৈবতক গাঙুলীর সামাজিক পরিচয়টাও তুচ্ছ করবার মতো নয়। চাঁছা-ছোলা বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার তিনি বিনা-বেতনে অধ্যাপনাও করেন একটা বেসরকারি কলেজে। কথাবার্তা শুনলে মনে হয় সূর্যচন্দ্র-গ্রহতারা নিয়ে লোফালুফি করাটাই তাঁর অভ্যাস, অবসর-বিনোদন করেন 'প্রতিভা' আবিষ্কার করে। এই শেষোক্ত ব্যাপারটা তিনি বিলেত থেকে শিখে এসেছেন। বিলেতে অনেক সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ছেলে-মেয়ের 'হবি' নাকি অবহেলিত, অবজ্ঞাত প্রতিভাবানদের আবিষ্কার করে 'পুশ' করা। রৈবতক গাঙুলী বিলেতে গিয়ে এই 'হবি'টির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ছেলেবেলায় স্ট্যাম্প সংগ্রহ করতেন, এখন 'প্রতিভা'-সংগ্রহে মন দিয়েছেন। ইনি যখন সরস্বতীর পিসতুতো ভাইয়ের কলেজ-সঙ্গিনী চখীর মুখে বনস্পতি মিশ্রের কথা শোনেন তখন টুকে রেখেছিলেন সেটা নোট-বুকে। তখন আসতে পারেননি, কারণ তখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন তাঁর বাড়িওয়ালার ভাইপো সুগ্রীবকে নিয়ে। সে একজন উদীয়মান কবি। কোনও তরুণী নাকি তার গ্রীবার প্রশংসা করেছিল, তাই সাহিত্য জগতে সে নিজেকে 'সুগ্রীব' নামে পরিচিত করেছে। সে 'ছাতারে কাব্য' বলে যে কবিতার বইটি লিখেছে রৈবতক গাঙুলী সেটিকে রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্য বলে মনে করেন। এই সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তিনি বক্তৃতা করে প্রবন্ধ লিখে দেখিয়েছেন এ কাব্য কোথায় কোথায় রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-পরিধিকে অতিক্রম করেছে, নামজাদা সব লোকদের মুখ দিয়ে কলম দিয়ে এই অভিমত ব্যক্ত তিনি করিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মনোমতো ফল হয়নি, সুগ্রীবের বই বিক্রি হয়নি মোটে। তিনি তাকে আশ্বাস দিচ্ছিলেন যে আগামীবারে নোবেল পুরস্কার তাকে পাইয়ে দেবেন, কারণ যাঁদের হাতে বিচারের ভার তাঁরা সবাই নাকি তাঁর বন্ধুলোক। কিন্তু বন্ধু ছোকরার খুড়ো, মানে তাঁর বাড়িওয়ালা, বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড করে বসলেন একটা, বাকি ভাড়ার জন্যে নালিশ করে দিলেন তাঁর নামে। এরপর আর সুগ্রীবের কাব্যের ব্যাপারে মাথা ঘামাবার উৎসাহ রইল না তাঁর। নিজের প্রেস্টিজ বজায় রাখবার জন্যে বড় রাস্তার উপর বড় একটা বাড়ি নিতে হয়েছিলে তাঁকে। সাধ এবং সাধ্যের সামঞ্জস্য করে চলতে যাঁরা উপদেশ দেন এবং যাঁরা সে উপদেশ শুনে গদগদ হয়ে পড়েন রৈবতক গাঙুলী এদের কোনও দলেরই নন। তিনি বলেন, তোমার সাধ অনুসারেই তুমি চলতে চেষ্টা কর, পাথেয় জুটেই যাবে কোনো-না-কোনো উপায়ে। তিনি সুগ্রীবের কাকার বাড়িভাড়া মিটিয়ে দিতেনই, হয়তো দু'দিন দেরি হত, কিন্তু ভদ্রলোকের তর সইল না, একেবারে কোর্টে ছুটলেন।

সুতরাং আবার তাঁকে নোটবুক খুলে সন্ধান করতে হল, এরপর কোন্ অবহেলিত

'প্রতিভা'র প্রতি তিনি মনোযোগ দিতে পারেন। দেখলেন তিনটি নাম রয়েছে। প্রথম, জটাধারী দাস, উইদিন ব্র্যাকেট, কমরেড-বৈষ্ণব। ইনি প্রাচীন বৈষ্ণব বংশের সন্তান, বড় কীর্তনীয়া, কিন্তু এঁর বিশেষত্ব ইনি কীর্তনের সঙ্গে বোম্বাই টপ্পার সুর মিশিয়ে নূতন ধরনের এক সুর সৃষ্টি করেছেন। আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। ঠিকানা লেখা আছে। বাড়ি স্টেশন থেকে কুড়ি মাইল দূরে। কাঁচা রাস্তায় যেতে হয়, গরুর গাড়ি ভিন্ন অন্য যান অচল সে পথে। রৈবতক সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করলেন জটাধারীকে। দ্বিতীয় নামটি জর্জেট মাসী, আসল নাম, করুণাময়ী বর্মা। ইনি সূচী-শিল্পী। এঁর বিশেষত্ব ইনি পুরোনো জর্জেট কাপড় দিয়ে কাঁথা, দোলাই, সুজ্‌নী প্রভৃতি প্রস্তুত করেন। এককালে এঁর স্বামী অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। এখনও এঁর যাঁরা বান্ধবী তাঁরা সবাই ধনী, তাঁরাই এঁকে পুরোনো জর্জেট সরবরাহ করেন। কিন্তু নিজের অবস্থা এঁর শোচনীয়। স্বামী অনেকদিন আগে মারা গেছেন, পূর্ববঙ্গের জমিদারি পাকিস্তানের কবলে। একটি মাত্র ছেলে বগেন লম্বা চুল রেখে বাঁশি বাজিয়ে বেড়ায়, যা রোজগার করে তাতে নিজেরই চলে না তার, জর্জেট মাসীর যা কিছু সঞ্চিত অর্থ গয়না-গাঁটি ছিল তা ওই ছেলের পিছনেই গেছে। জর্জেট মাসী এখন কোলকাতারই এক অভিজাত-পল্লীতে বাস করেন তাঁর এক খুড়তুতো বিপত্নীক দেওরের বাড়িতে। রৈবতক গাঙুলী তাঁকে 'বঙ্গ-সংস্কৃতি'র আসরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেখানকার কয়েকটি খদ্দরধারী চাঁইয়ের জন্য পারেননি। তাঁরা বলে বসলেন—জর্জেট বাংলার নয়, মসলিন হলে বিবেচনা করে দেখতাম। শিল্পের ক্ষেত্রে এরকম সঙ্কীর্ণ মনোভাব প্রত্যাশা করেননি রৈবতক গাঙুলী। তিনি জর্জেট মাসীর নামটার দিকে খানিকক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখলেন, তারপর স্থির করলেন এঁকে নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তাঁর যে দূরসম্পর্কের দেওরটির কাছে থাকেন, তিনি এ বিষয়ে মোটেই উৎসাহী নন। এঁর সঙ্গে ফোনে এ বিষয়ে একবার আলাপ করেছিলেন তিনি, যদি চৌরঙ্গী অঞ্চলে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে একটা প্রদর্শনী খোলবার জন্যে কিছু অর্থসাহায্য করতে রাজি হতেন তিনি, তাহলে পাবলিসিটির ব্যবস্থা করা অসম্ভব হত না তাঁর পক্ষে। কিন্তু তিনি রাজি হননি। অবশেষে বনস্পতি মিশ্রকেই পল্লীগ্রামের জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা সাব্যস্ত করলেন তিনি।

সুখপুরে এসে সৈকত-কাননে পৌঁছতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি তাঁকে। সুখপুরে রেল স্টেশন নেই। পাঁচ মাইল দূরের জংশন স্টেশন থেকে গো-যানে কিম্বা পদব্রজে আসতে হয়। স্টেশনে নামবামাত্রই তিনি উপলব্ধি করলেন যে বনস্পতি মিশ্র এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। গাড়ির গাড়োয়ান কুলি সবাই চেনে তাঁকে। প্রথমে অবশ্য একটু মুশকিলে পড়লেন নেবেই। নিখুঁত সাহেবী স্যুট পরে এসেছিলেন, গরুব গাড়িতে চড়লে 'ক্রীজ'গুলো নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এছাড়া তো অন্য যানও নেই। গাড়িতে আলতোভাবে বসে তিনি নিজে হয়তো যেতে পারবেন, কিন্তু ক্যামেরাটা? বেশ বড় ক্যামেরা তাঁর। ওটাকে গরুর গাড়ির উপর চাপিয়ে নিয়ে যেতে ভয় করছিল, গাড়ির ঝাঁকানিতে ভিতরকার কোনও স্ক্রু আলগা হয়ে যায় যদি?

গাড়ির গাড়োয়ান কিন্তু সমস্যাটার সমাধান করে দিলে। বললে, "আমার ভাই ওটা মাথায় করে নিয়ে যাবে।"

"কত দিতে হবে তোমার ভাইকে এজন্য?"

"কিছু দিতে হবে না সায়েব। আপনি ভদ্দর নোক, বনুবাবুর বাড়িতে যাবেন, এর জন্যে আর আলাদা করে কিছু দিতে হবে না আপনাকে। গাড়ির ভাড়া তো দিচ্ছেনই। ভাইটা গাড়িতে

করে আমার সঙ্গে এসেছিল। হেঁটে তো ওকে ফিরতেই হবে সুখপুরে, আপনার সঙ্গে বসে তো আর যেতে পারে না, আপনার জিনিসটা নিয়ে চলুক—"

এই অপ্রত্যাশিত সহৃদয়তায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন রৈবতক। মনে পড়ল বিলেতের এক কান্ট্রিসাইডে বেড়াতে গিয়ে সেখানকার এক অপরিচিত লোকের কাছে কি সাহায্যই পেয়েছিলেন! সে তাঁকে পোস্টাফিসের রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছিল, কোন্ হোটেলে গেলে ভাল খানা পাওয়া যাবে তাও বলে দিয়েছিল, তার সঙ্গে তুলনীয় লোক যে এদেশের পাড়াগাঁয়েও আছে এ ভেবে বেশ পুলকিত হলেন তিনি। বিস্মিতও হলেন। তাঁর বিস্ময় কিন্তু চরমে পৌঁছল যখন সৈকত-কাননে গিয়ে পৌঁছলেন তিনি।

সৈকত-কাননের বাড়িটি দেখে ভাল লাগল তাঁর। বনস্পতি যে শাঁসালো ব্যক্তি বাড়িটি দেখেই তা অনুভব করলেন। বারান্দার উপরে উঠতেই দেখা হল বল্লমের সঙ্গে।

"আপনি কে?"

রৈবতক তাঁর কার্ডটি দিলেন তাকে। কার্ডটি উলটে পালটে দেখে বল্লম সেটি ফেরত দিলে।

"আমি ইংরেজি পড়তে জানি না। আপনি কোথা থেকে এসেছেন?"

"কোলকাতা থেকে। শিল্পী বনস্পতি মিশ্রের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"ও। তাহলে আপনি ভূষণ কাকার কাছে যান। ওই ঘরে থাকেন তিনি।"

ভূষণ চক্রবর্তীর ঘরের বন্ধ দ্বারের দিকে দু'এক সেকেন্ড চেয়ে রইলেন রৈবতক। তারপব জিজ্ঞাসা করলেন, "বনস্পতিবাবু কোন্ ঘরটায় থাকেন?"

"ভিতরে থাকেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হলে আগে ভূষণ কাকার সঙ্গে দেখা করতে হবে। আসুন আমার সঙ্গে।"

বল্লম তাঁকে সঙ্গে করে ভূষণ চক্রবর্তীর ঘরের দ্বার পর্যন্ত নিয়ে গেল। তারপর কপাটটা একটু ফাঁক করে ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে বলল, "কোলকাতা থেকে একজন ভদ্রলোক এসেছেন"—বলেই এক ছুটে চলে গেল সে ভিতরে। বেরিয়ে এলেন ভূষণ চক্রবর্তী।

"কি চান?"

"শিল্পী বনস্পতি মিশ্রের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"তিনি যে শিল্পী সে কথা আপনি জানলেন কি করে? তাঁর ছবি তো কোথাও ছাপা হয়নি!"

অপরূপ একটা হাস্যস্নিগ্ধ ভাব ফুটে উঠল রৈবতক গাঙুলীর মুখে। দুটি প্রচলিত উপমা তিনি ব্যবহার করলেন পর পর।

"আগুন কি কখনও চাপা থাকে? ফুলের গন্ধ কি লুকিয়ে রাখা যায়?"

ভূষণ চক্রবর্তীর ভ্রূ কুঞ্চিত হল একটু।

প্রশ্ন করলেন, "আপনার পরিচয় জানতে পারি কি?"

"এই যে—"

কার্ডটি দিলেন। কার্ডে-ছাপা নামটি দেখে তার ভ্রূযুগল আরও কুঞ্চিত হয়ে গেল। এ নাম তো তিনি কাগজে দেখেছেন, তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল। মনে মনে বললেন, "ও, এই তাহলে সেই রাস্কেলটা—"

মুখে বললেন, "দেখা হবে না।"

"হবে না! বলেন কি! অতদূর থেকে এসেছি, ক্যামেরা বয়ে এনেছি একটা ছবি তুলব বলে, আর আপনি বলছেন, দেখা হবে না!"

দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন ভূষণ চক্রবর্তী—"হবে না।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন রৈবতক।

"আপনি কি ওঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি?"

"না, আমি ওঁর দারোয়ান।"

"ও।"

রৈবতকের চোখে এক ঝলক সকৌতুক বিস্ময় ফুটে মিলিয়ে গেল।

"দারোয়ান? কিন্তু আমি তো দারোয়ানের সঙ্গে আলাপ করতে আসিনি। আমি এসেছি শিল্পীর কাছে। তিনি যদি দেখা না করতে চান, সেটা মানব, কিন্তু দারোয়ানের কথায় ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই। আপনি বরং আমার কার্ডটা তাঁকে দিয়ে আসুন, আর আমি কেন এসেছি তাও জানিয়ে দিন তাঁকে। আমি তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখব বলে মাল-মসলা সংগ্রহ করতে এসেছি। তাঁর আর্টের বিষয়ে তাঁর সঙ্গেই আলোচনা করা দরকার। তাছাড়া তাঁর ছবি তুলব, তাঁর ছবির ছবি তুলব—"

ভূষণ চক্রবর্তীর খোচা খোচা ঘন গোঁফ ছিল। গোঁফের চুলগুলো নড়তে লাগল। নাকের নীচেটাও কেঁপে উঠল, ঠিকরে বেরিয়ে এল চোখ দুটো। মনে হল এখনই বুঝি তিনি রৈবতকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দেবেন তাঁকে। কিন্তু তা না করে একটু উচ্চকণ্ঠে তিনি বললেন, "ওসব কিছু হবে না, আপনি ফিরে যান।"

রৈবতক এবার চটেছিলেন। কিন্তু বিলেত-ফেরত মার্জিত-রুচির লোক তিনি, মনের ভাব চেপে রাখবার অসীম ক্ষমতা তাঁর। তাই একটু মোলায়েম মুচকি হেসে তিনি বললেন, "আপনার ব্যবহারে সত্যিই আমি আশ্চর্য বোধ করছি। আপনার এই বিরুদ্ধ মনোভাবের হেতুটা জানতে পারি কি?"

"ঘেয়ো নেড়ী কুকুরকে মন্দিরে ঢুকতে দেওয়ার রেওয়াজ নেই এখানে। বৈঠকখানাতে তাকে ঢুকতে দিই না, হাতাতেও না, সে যদি বিলিতি স্যুট পরে আসে তাহলেও না।"

রৈবতক এদিক-ওদিক চাইলেন একবার। তাঁর সন্দেহ হল লোকটা পাগল নয় তো! যে ছেলেটি তাঁকে এর কাছে দিয়ে গেল, তারই সন্ধানে তাঁর চোখের দৃষ্টিটা একবার ঘুরে এল চারিদিকে, কিন্তু তাকে দেখতে পেলেন না। পকেট থেকে মুসলমানী-লুঙ্গির টুকরোর মতো একটা রুমাল বার করে কপালটা আর মুখটা মুছে ফেললেন। তারপর ভূষণ চক্রবর্তীর দিকে চেয়ে বললেন, "আমাদের দেশের ঐতিহ্য পাড়াগাঁয়ে বেঁচে আছে আমরা শহুরে মানুষেরা এই কথাই শুনে এসেছি বরাবর। স্টেশনে নেবে তার একটু পরিচয়ও পেয়েছিলাম গাড়োয়ানটার কাছে, আশা ছিল তার পরিপূর্ণ রূপটি দেখতে পাব আপনাদের সান্নিধ্যে, যে আতিথেয়তা আমাদের দেশের প্রত্যেক অতিথির ন্যায্য পাওনা সেটুকু থেকে আমাকে অন্তত বঞ্চিত করবেন না। কিন্তু আপনার ব্যবহারে—"

ভূষণ চক্রবর্তী তাঁকে কথা শেষ করতে দিলেন না।

"অচেনা একটা লোককে অন্দরমহলে নিয়ে বাড়ির কর্তার কানের কাছে ভ্যাজর ভ্যাজর

করতে কেউ দেয় না কখনও। ভুল ধারণা আছে আপনার। ক্যামেরা নিয়ে ফোটো তুলতেও দেয় না। আর আপনি তো অচেনা অতিথি নন, আপনাকে খুব ভাল করে চিনি আমি। আপনার মতো মতলববাজের সঙ্গে কথা কয়ে আমি যে সময় নষ্ট করেছি এইটেই কি যথেষ্ট নয়?"

মতলববাজ কথাটা চাবুকের মতো আঘাত করল রৈবতক গাঙুলীকে। কিন্তু তবু তিনি নিজেকে সামলে নিলেন।

"আপনি আমাকে চেনেন? আমার তো মনে পড়ছে না এর আগে কখনও আপনাকে দেখেছি।"

"না, দেখেননি, আমিও আপনাকে দেখিনি।"

"তবে আমাকে মতলববাজ বলে চিনলেন কি করে?"

"চেহারা দেখে মতলববাজকে চেনা যায় না, চেনা যায় তার চালচলন থেকে। আপনার চালচলনের খবর পেয়েছিলাম খবরের কাগজের কৃপায়। আপনিই তো সেই রৈবতক গাঙুলী যিনি হনুমান, না সুগ্রীব কার ল্যাজে তেল দিয়েছিলেন হাবাতে কাব্য, না ছাতারে কাব্য, না ন্যাকড়া কাব্য নিয়ে? নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন বাংলার সব কবিদের ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে আর ছাপিয়েছিলেন আপনার সেই অমূল্য ভাষণ সম্পাদকের খোশামোদ করে? সেই লোকই তো আপনি। সেই হনুমানটার কাছ থেকে কত টাকা মেরেছিলেন?"

এবার রৈবতক একটু অপ্রতিভ হলেন সত্যি সত্যি। আশ্চর্য, মুখের মার্জিত হাসিটি কিন্তু মলিন হল না। বরং সেটিকে আর একটু মার্জিত করে বললেন, "আপনার মতো রূঢ় অভদ্র ভাষা ব্যবহার করবার শিক্ষা আমার নেই। 'ছাতারে কাব্য' এবং বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যে মত আমি ব্যক্ত করেছি সেটা আমার নিজস্ব মত, সে মত ব্যক্ত করবাব অধিকাব আমার নিশ্চয়ই আছে।"

"আপনার ওই নিজস্ব মতের জন্য আপনাকে আমার এলাকা থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দূর করে দেবার অধিকারও আমার নিশ্চয়ই আছে। আপনি চলে যান, আপনাকে নিয়ে আর সময় নষ্ট করতে চাইনে।"

"শিল্পীর সঙ্গে তাহলে দেখা হবে না কিছুতেই।"

"কিছুতেই না।'

পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

"এখানে কোনও হোটেল আছে?"

"না।"

"তাহলে কোথায় যাই বলুন, খাওয়া দাওয়াই বা করব কোথায়?"

"ওই বেঞ্চিটায় বসুন। আমার কাছে যা খাবার আছে দিচ্ছি। খেয়ে আপনি স্টেশনেই ফিরে যান, একটু পরেই ট্রেন পেয়ে যাবেন।"

ভূষণ চক্রবর্তী ভিতরে ঢুকে গেলেন এবং একটু পরে একটি মাটির খুরিতে করে কিছু ছোলা-ভিজে আর গুড় নিয়ে এসে ঠক্ করে নামিয়ে দিলেন সেটা তাঁর পাশে। তারপর ঢুকে গেলেন ঘরে। পর মুহূর্তেই তার ঘরের কপাটটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। ভিতর থেকে চিৎকার করে কি যেন বললেন কাকে। একটু পরে একটা চাকর চকচকে কাঁসার ঘটিতে করে এক ঘটি জল দিয়ে গেল।

রৈবতক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর উঠে পড়লেন।

...ঘণ্টা দুই পরে তাঁকে দেখা গেল জাহ্নবী-নিবাসে সাবু মিত্তিরের দপ্তরে। সাবু মিত্তির তাঁর সঙ্গে খুবই ভদ্র ব্যবহার করলেন, তাঁর স্নানাহারের ব্যবস্থা করে দিলেন, ভূষণ চক্রবর্তীর হাতে তাঁর লাঞ্ছনার কথা শুনে আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে একথা বলতেই হল যে বনস্পতির সঙ্গে দেখা করতে হলে ওই অভদ্র ভূষণ চক্রবর্তীরই মত নিতে হবে। তাঁর অমতে দেখা হবে না।

"শিল্পী বনস্পতি কোনও ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি হয়ে থাকবেন একথা তো ভাবাই যায় না।"

"বনুদা নিজেই ওঁকে সে অধিকার দিয়েছেন, লিখে দিয়েছেন।"

"বলেন কি!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

রৈবতক কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, "এতদূর থেকে খরচপত্তর করে এসেছি, একবার দেখা না করে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। আপনি গিয়ে ভূষণবাবুকে একটু অনুরোধ করতে পারেন না?"

"না, ওইটি পারব না। আমি তাঁর কাছে পারতপক্ষে যাই না। তবে হিমুদা সৈকত-কাননে যান। তিনি যদি কিছু পারেন দেখি, আপনিও আসুন না।"

হেমন্তকুমারের সঙ্গে ভূষণ চক্রবর্তীর সংঘর্ষের খবরটা সাবু পায়নি। আগেই বলেছি খবরটা হেমন্তকুমার কারো কাছে প্রকাশ করেনি। রৈবতক গাঙুলীকে নিয়ে সাবু যখন গেল তার কাছে তখনও খবরটা ভাঙল না সে। রৈবতককে খুব আদর-যত্ন করে বসাল, নিজের হাতে তৈরি করে 'কফি' খাওয়াল (সুখপুর গ্রামে একমাত্র হেমন্তকুমারই কফি খেত), তারপর একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললে, "আমি জানতুম মরুভূমিতেই লোকে মরীচিকা দেখে, শস্যশ্যামল বাংলা দেশের সমতলেও যে ও-জিনিস দেখা যায় তা জানা ছিল না।"

হেমন্তকুমারের বাক্-ভঙ্গিতে খুশি হলেন রৈবতক। তাঁর আহত-আত্মসম্মানের নিদারুণ ক্ষতে একটু যেন স্নিগ্ধ প্রলেপ পড়ল এতে।

মৃদু হেসে তিনি বললেন, "চিরকালই মরীচিকার পিছনেই দৌড়াচ্ছি মশাই। মরীচিকার পিছনে দৌড়তে দৌড়তে লন্ডন প্যারিসেও গিয়েছিলাম, আবার সুখপুরেও এসেছি। কিন্তু এখানে যে রকম ঘা খেলাম, এমনটা আর কোথাও খাইনি।"

"ও, ভূষণের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বুঝি। ভূষণ একটু কড়া লোক, কিন্তু লোক ভাল—"

"দেখুন না যদি শিল্পীর সঙ্গে দেখাটা করিয়ে দিতে পারেন।"

"শিল্পী? দামী কাগজে ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া করে রং লাগালেই শিল্পী হয় না কি! যাই হোক চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে নেওয়াই ভাল—"

"কিন্তু আপনি সাহায্য না করলে সেটা তো হবে না।"

"দেখি।"

হেমন্তকুমার সেই যে বেরিয়ে গেল আর ফিরল না।

তার ছেলে সড়কি একটু পরে এসে খবর দিলে—"বাবা একটা জরুরি দরকারে শিয়ালমারিতে চলে গেছে, ফিরতে দেরি হবে।"

সমস্ত দিন অপেক্ষা করে রৈবতক গাঙুলীকে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হল অবশেষে।

রৈবতক গাঙুলী ফিরে গেলেন বটে, কিন্তু নিরস্ত হলেন না।

পত্রযোগে হানা দিলেন বনস্পতির কাছে। তাঁর আশা ছিল এইবার তিনি ভূষণ চক্রবর্তী-রূপ ঘোড়া ডিঙিয়ে বনস্পতি-রূপ ঘাসটি খেতে পারবেন। কিন্তু এবারও হতাশ হতে হলো তাঁকে। কারণ বনস্পতি তাঁর চিঠিটি ভূষণ চক্রবর্তীর কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছিল উত্তর দেবার জন্য। ভূষণ চক্রবর্তী সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে দিলেন—"সবিনয় নিবেদন, আপনি শ্রীবনস্পতি মিশ্রকে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহার উত্তরে জানাইতেছি যে তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না। এ সম্পর্কে আর পত্রালাপ করিতেও তিনি ইচ্ছুক নহেন। ইতি—"

রৈবতক গাঙুলী একটি মাত্র নমুনা। বাইরে থেকে আরও অনেক লোক এসেছিল, কিন্তু তার কেউ ভূষণ চক্রবর্তীকে কায়দা করতে পারেনি। দশ বছর ধরে মূর্তিমান নিষেধের মতো তিনি দাঁড়িয়েছিলেন বনস্পতির দরজার সামনে। অবশ্য সবাইকে তিনি সম্পূর্ণরূপে ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি, বনস্পতির শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কিত কিছু কিছু সমঝদার ঢুকে পড়েছিল অন্দরমহলে কিন্তু তারা খুব বেশি ক্ষতি করতে পারেনি। কারণ একটু বেগতিক দেখলেই বনস্পতি স্বয়ং ডেকে পাঠাতেন ভূষণ চক্রবর্তীকে, আর বলতেন, "ভূষণ, ইনি তোমার বৌদির পিসতুতো ভাই, খুব রসিক লোক, শিবু ময়রার দোকান থেকে কিছু ভাল রসগোল্লা আনাও দিকি"—এটি ছিল তার ইঙ্গিত। ভূষণ চক্রবর্তী রসগোল্লা আনাতেন এবং আড়ালে সরস্বতীকে বলে আসতেন, "বৌদি, দেখবেন আপনার ভাইটি মত্ত মাতঙ্গের মতো শিল্পীর কমল বনে যেন ঢুকে না পড়েন। সরস্বতীও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন খুব। তাঁর বাপের বাড়ির লোকেরা যাতে বনস্পতিকে বিরক্ত না করে সে বিষয়ে কড়া নজর ছিল তার। আর তারা আসতও ক্বচিৎ।

।। পাঁচ ।।

...এই ভাবেই চলছিল।

কিছুদিন পরে এদের পারিবারিক জীবনে প্রধান ঘটনা ঘটল একটি। বনস্পতির একটি কন্যাসন্তান হল। বাচস্পতির কোনো ছেলে-মেয়ে হয়নি, তিনি খুব মেতে উঠলেন এতে। ধুমধাম করে খাওয়া-দাওয়া তো হলই, 'সুখপুর-পত্রিকা'র একটি বিশেষ সংখ্যাই বের করে ফেললেন তিনি। তার থেকে সংবাদটি উদ্ধৃত করছি।

"গত বৈশাখী পূর্ণিমার শুভলগ্নে সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় শ্রীমান বনস্পতির একটি সুলক্ষণা কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে মিশ্র পরিবারের সকলে যে অবিমিশ্র আনন্দলাভ করিয়াছেন তাহা অবর্ণনীয়। শ্রদ্ধেয় শিরোমণি মহাশয় কন্যাটির ঠিকুজি দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে কন্যার তুঙ্গী সূর্য, তুলা লগ্ন এবং তুলা রাশি হওয়াতে কন্যার সৌভাগ্য সূচিত হইতেছে। বৈশাখী পূর্ণিমা ভগবান বুদ্ধদেবেরও জন্মদিন। ইহাও অনেকে বলিতেছেন যে আমাদের

স্বর্গগতা জননীর মুখাবয়বের সহিত শিশুকন্যার মুখাবয়বের নাকি সাদৃশ্য আছে। ইহাও অনেকের অনুমান তিনিই নাকি বনস্পতির কন্যারূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার সত্যাসত্য নির্ধারণ করা কঠিন। কন্যার নামকরণ লইয়া একটু মতদ্বৈধ হইয়াছে। বনস্পতির ইচ্ছা কন্যার নাম 'বর্ণ' হউক। শ্রীমান শিল্পী, সুতরাং বর্ণই তাহার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। সেদিক দিয়া নামকরণ ঠিকই হইয়াছিল, কিন্তু শ্রদ্ধেয় শিরোমণি মহাশয় ইহাতে ব্যাকরণের অসঙ্গতি দেখিয়া আপত্তি করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন সংস্কৃত ভাষায় 'বর্ণ' শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ। বাংলা ভাষার ব্যবহারিক প্রয়োগে কোন কোনস্থলে তাহা পুংলিঙ্গ রূপেও ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু কোন ভাষাতেই 'বর্ণ' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ রূপে প্রযুক্ত হয় নাই। সুতরাং কন্যার নাম 'বর্ণ' দিলে তাহা ব্যাকরণ-শুদ্ধ হইবে না। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে 'বর্ণ' শব্দটির প্রতি বনস্পতির যদি পক্ষপাতিত্ব থাকে তাহা হইলে নামটিকে আর একটু দীর্ঘ করিয়া 'বর্ণ-বতী' করা যাইতে পারে। তাহা হইলে উভয় দিকই রক্ষিত হইবে। শ্রীমান বনস্পতি কিন্তু অত দীর্ঘ নাম পছন্দ করিতেছে না। আমরা প্রস্তাব করিতেছি ভগবান বুদ্ধদেবের উপদেশ অনুসারে মধ্যপথ অবলম্বন করিলে কেমন হয়। তিন অক্ষরের 'বর্ণনা' নামটি রাখিলে ক্ষতি কি? শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ এবং ইহার আভিধানিক অর্থ দীপন, রঞ্জন প্রভৃতি। রঞ্জাবতীর পৌত্রীর পক্ষে এ নাম বেমানান হইবে বলিয়া মনে হয় না।"

এর পর সুখপুরের মিশ্র-পরিবারে যে সব ঘটনা ঘটেছে তাতে অসাধারণত্ব কিছু নেই। তা সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনাপুঞ্জের আবর্তন এবং পুনরাবর্তন মাত্র। এই কাহিনীর পক্ষে উল্লেখযোগ্য যে ঘটনাগুলি ঘটেছে 'সুখপুর-পত্রিকা'র প্রায় কুড়ি বছরের ফাইল ঘেঁটে তা আমি নিম্নে উদ্ধৃত করছি, প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করবার জন্য।

"শ্রীমতী বর্ণনার কলিকাতা যাত্রা। শিল্পী শ্রীমান বনস্পতি মিশ্রের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী বর্ণনা উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার জন্য গতকল্য কলিকাতা গিয়াছে। শ্রীমতীর বয়স মাত্র দশ বৎসর। এতদিন গৃহেই সে শিরোমণি মহাশয়ের নিকট প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিতেছিল, কিন্তু শিরোমণি মহাশয় অতি-বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি শ্রবণশক্তি এমন কি চলচ্ছক্তিও ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। শারীরিক অসামর্থ্য সত্ত্বেও তিনি উৎসাহের সহিত শ্রীমতীর অধ্যাপনা করিতেছিলেন। কিন্তু বনস্পতির মতে এ বয়সে তাঁহার উপর আর চাপ দেওয়া উচিত নহে। তাছাড়া আমাদের স্বর্গীয় পিতৃদেবের নির্দেশ ছিল যে আমরা যেন আমাদের বংশধরদের কলিকাতায় পাঠাইয়া আধুনিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করি। পিতৃদেবের অন্তিমকালীন এ উপদেশ অমান্য করা অনুচিত মনে হওয়াতে আমরা শ্রীমতীর শিক্ষার ব্যবস্থা কলিকাতাতেই করিয়াছি। সে কলিকতায় 'কন্‌ভেন্ট' নামক বিদ্যালয়ে ভরতি হইবে এবং সেই বিদ্যালয়েরই ছাত্রীনিবাসে থাকিবে। শ্রীমতীর মাতুলালয়ও কলিকাতায়। সেখানে থাকিয়াও সে পড়িতে পারিত, কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না। তাহার মাতামহ মাতামহী উভয়েই কিছুকাল পূর্বে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাহার একমাত্র মাতুল একটি ধনী কন্যার পাণিপীড়ন করিয়া ইংলণ্ডে সস্ত্রীক প্রবাস-জীবন যাপন করিতেছে। জনশ্রুতি সেইখানেই সে নাকি উপার্জনের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে, এদেশে আর ফিরিবে না। কলিকাতায় তাহাদের বাসাও আর নাই, কারণ তাহারা ভাড়াটিয়া বাসাতে বাস করিত। সুতরাং ছাত্রী-নিবাসেই শ্রীমতীর থাকিবার ব্যবস্থা করিতে

হইয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা লাভ ও নাগরিক জীবন যাপন করিয়া শ্রীমতী যেন ভারতীয় নারীত্বের মর্যাদাকে নূতন অলঙ্কারে ভূষিত করিতে সমর্থ হয়।''

দ্বিতীয় খবরটি সাত বছর পরের।

''কলিকাতার বিদ্যালয়ে শ্রীমতী বর্ণনার কৃতিত্ব। শ্রীমতী বর্ণনা এবার প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংরেজি, বাংলা এবং সংস্কৃতে সম্মানসূচক অক্ষর (লেটার) লাভ করিয়াছে। স্কুলের কর্তৃপক্ষ আশা করেন শ্রীমতী হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিলাভও করিবে। এ সংবাদ আমাদের সকলের পক্ষেই নিঃসন্দেহে আনন্দজনক, কিন্তু সম্প্রতি একটি দুর্ঘটনা ঘটাতে সে আনন্দ কিঞ্চিৎ ম্লান হইয়া গিয়াছে। গত বৎসর হইতেই গঙ্গার ধারা সুখপুর গ্রামের কোল ঘেঁষিয়া বহিতেছিল, এবার বর্ষায় তাহা উদ্দাম হইয়া আমাদের গঙ্গাতীরস্থ 'জাহ্নবী-নিবাস' নামক অট্টালিকাটিকে গ্রাস করিয়াছে। এ পারের অনেক স্থানেই ভাঙন ধরিয়াছে, অনেকের জমি কাটিয়া গিয়াছে। আমাদের জমিও রক্ষা পায় নাই। গঙ্গার এ-কূলবাসী অনেকের মনেই ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে, হইবারই কথা, কারণ সর্বনাশ আসন্ন। মা গঙ্গার গতি যদি এইরূপই থাকে এবং জননী যদি তাঁহার সংহারিণী প্রবৃত্তি সংবরণ না করেন, তাহা হইলে এ অঞ্চলের বহু পরিবার উৎসন্ন হইবে। 'জাহ্নবী-নিবাস' গঙ্গা-গর্ভে নিমজ্জিত হওয়াতে সর্বাপেক্ষা বেশি বিব্রত হইয়াছেন হেমন্তকুমার। তিনি তাঁহার একাদশটি পুত্রকন্যা লইয়া জাহ্নবী-নিবাসে বাস করিতেন। জাহ্নবী-নিবাসেব চারিপাশে তিনি একটি সুন্দর সব্জিবাগও করিয়াছিলেন। তাঁহার বাগানের ইটালীদেশীয় বাঁধা-কপির অপরূপ বর্ণ-বৈশিষ্ট্য ও সুস্বাদু এ গ্রামের অনেকেরই হৃদয় হরণ করিয়াছিল। কিন্তু হায়, মা গঙ্গা সবই গ্রাস করিলেন। ভগবানের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নাই। গ্রামে অষ্টপ্রহরব্যাপী হরিসংকীর্তন এবং দৈনিক গঙ্গা-পূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।''

তৃতীয় খবর আরও তিন বছর পরের।

''মিশ্র পরিবারের কলিকাতা যাত্রা। বিগত কয়েক সংখ্যায় মিশ্র-পরিবারের বৈষয়িক সর্বনাশের কয়েকটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। গঙ্গার তীরে তীরে আমাদের যত ধানের জমি ছিল মা-গঙ্গা সবই একে একে গ্রাস করিয়াছেন। সৈকত-কাননও রক্ষা পায় নাই। শিল্পী বনস্পতি তাহার পিতামাতার যে সিমেন্ট মূর্তিগুলি নির্মাণ করিয়াছিল সে দুইটিও গঙ্গা-গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। আমাদের স্বর্গীয় পিতৃদেব যে সকল দুর্লভ বৃক্ষলতাদি সৈকত-কাননে রোপণ করিয়াছিলেন সেগুলিও আর নাই। গত সপ্তাহে গঙ্গার ধারা সৈকত-কাননের মনোরম সৌধটির অতি সন্নিকটে আসিয়া পড়াতে বনস্পতি মিশ্র সপরিবারে তাহার অঙ্কিত দুই শতাধিক চিত্রসহ তাহার পুরাতন বসতবাটীতে সরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। হেমন্তকুমার পূর্ব হইতেই সেখানে আসিয়াছিল। তাহার অনেকগুলি পুত্রকন্যা, কয়েকটি বেশ বড় হইয়াছে। সুতরাং পুরাতন বসতবাটীতেও স্থানাভাব ঘটিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে অন্নাভাব ঘটিবারও সম্ভাবনা। কারণ যে জমি আমাদের অন্ন সরবরাহ করিত তাহা আর নাই। পোস্টাফিসে যৎসামান্য যাহা সঞ্চিত আছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা কোনক্রমে কালাতিপাত করিতেছিলাম, কিন্তু গত পরশ্ব হইতে গঙ্গার আবর্তসংকুল ভয়ঙ্করী ধারা আমাদের পুরাতন

বসতবাটীর দিকেও অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং সুখপুর হইতে এবার আমাদের বাস উঠিল। শ্রীমতী বর্ণনা কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়াছে, সেইখানেই আমাদের চলিয়া যাইতে হইবে। শ্রীমতী বর্ণনা বলিল পরিবারের লোকসংখ্যা অল্প হইলে একটি ছোট পাকা বাড়িতেই সংকুলান হইয়া যাইত। মাসিক ষাট টাকা ভাড়ায় সে একটি বাড়ি যোগাড়ও করিয়াছিল, কিন্তু হেমন্তকুমারের পরিবারবর্গকে লইয়া সেখানে কুলাইবে না । এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে নবীনগঞ্জে হেমন্তকুমারের মাতুলালয়। সে সেখানে গিয়া আশ্রয় লইতে পারিত। কিন্তু শ্রীমান বনস্পতির তাহা ইচ্ছা নয়। বনস্পতি বলিয়াছে আমরা যেখানেই থাকি একসঙ্গে থাকিব। দুঃখে পড়িয়াছি বলিয়া নিজেদের হস্তপদাদি আমরা যেমন বিসর্জন দিই না, যাহাদের সহিত এতকাল একসঙ্গে বাস করিয়াছি সেই আত্মীয়-স্বজনদেরও তেমনি বিসর্জন দিব না। হেমন্তকুমারের ছেলে-মেয়েগুলি বনস্পতির খুব প্রিয়। সুতরাং শিল্পীর ইচ্ছা অনুসারে বর্ণনা এক বস্তিতে চারিটি বড় বড় খোলার ঘর ভাড়া করিয়াছে। আগামীকল্য আমরা সেইখানেই যাইব। পিতৃ পিতামহের ভিটা ছাড়িয়া যাইতে খুবই কষ্ট হইতেছে কিন্তু ইহা ছাড়া গত্যন্তরও তো নাই। সবই যে গঙ্গাগর্ভে চলিয়া গেল। থাকিবার মধ্যে রহিল কেবল আমাদের 'বুড়ির জঙ্গল' বনকরটা, সেটা গঙ্গার তীর হইতে কিছু দূরে। পুরাতন সুখপুরের অস্তিত্ব লোপ পাইল, দেখা যাক নূতন কোন সুখপুরের সন্ধান পাওয়া যায় কি না।"

দ্বিতীয় পর্ব

।। এক ।।

সেদিন খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল নবনী রায়ের। নবনী রায় কোনও ভাঙা জিনিসকেই জোড়া লাগাবার চেষ্টা করে না, ভাঙা ঘুমও নয়। সে বিছানায় উঠে বসল, মাথার দিকের জানলাটা ভাল করে খুলে দিলে, তারপর সিগারেটটি ধরিয়ে চিৎকার করে উঠল— "প্রহ্লাদ—"। সকালে উঠেই এইটি তার প্রথম কাজ, ঠাকুর-দেবতার নাম করা নয়। খোলা জানলাটির সামনে বিছানায় বসে সামনের রাস্তাটির দিকে চেয়ে সে ধীরে ধীরে সিগারেটটিতে টান দিতে থাকে যতক্ষণ না প্রহ্লাদ চা দিয়ে যায়। সিগারেটটি নিঃশেষ হওয়ার পরও যদি চা না এসে পৌঁছয় তাহলে দ্বিতীয় আর একটি সিগারেট ধরিয়ে দ্বিতীয় আর একটি ডাক দেয় সে। তৃতীয় সিগারেট ধরাবার বা তৃতীয় ডাক দেবার দরকার প্রায়ই হয় না, চায়ের পেয়ালা নিয়ে প্রহ্লাদ এসে পড়ে।

প্রহ্লাদ ব্যক্তিটি দুর্বোধ্য। তাকে দেখে বোঝবার উপায় নেই যে নবনী যখন বাসায় থাকে না তখন সে লুকিয়ে ডাক্তার সুকুমার সামন্তের জন্ম-নিরোধ-ক্লিনিকে প্রৌঢ়া নার্স সুবাসিনীর কাজ-কর্ম করে দিয়ে আসে, বোঝবার উপায় নেই যে তার বয়স ষাটের কাছাকাছি, বোঝবার উপায় নেই যে সে বিহারী। প্রহ্লাদের একটি চুলও পাকেনি, একটি দাঁতও পড়েনি, চমৎকার বাংলা বলে। জন্ম-নিরোধ-ক্লিনিকে সে যে কখন যায় তা নবনী জানতেও পারে না, কারণ বাসায় ফিরে সে প্রহ্লাদকে অনুপস্থিত দেখেনি কখনও। এটা অবশ্য সম্ভব হয়েছিল বিশেষ কোনও গুণের জন্য নয়, ডাক্তাব সামন্তর ক্লিনিকটি নবনীর বাসার খুব কাছে বলে নবনী বাসায় ঢুকলেই প্রহ্লাদ ক্লিনিকের জানলা থেকে স্পষ্ট দেখতে পেত সেটা।

...সেদিন সকালে জানলা খুলেই নবনী দেখতে পেল যে কুয়াশা হয়েছে, পাতলা মসলিনে যেন চারদিক ঢাকা। নবনী কবিতা লেখে না, কিন্তু কবি-প্রকৃতির। তাই তার মনে হল আকাশলোক থেকে কোনও অশরীরিণী অভিসারিকা নিশীথ রাত্রে হয়তো এসেছিল এখানে এখনও ফিরে যেতে পারেনি, অপ্রত্যাশিতভাবে ভোর হয়ে গেছে, নিজের ওড়নার আড়ালে হয়তো এখনও সে লুকিয়ে আছে, কিম্বা নেই, হয়তো আলোর পথেই সে ফিরে গেছে আকাশে...হঠাৎ সে দেখতে পেলে তার বাসার ঠিক সামনেই রাস্তার ওধারে কালো স্তূপের মতো কি একটা যেন রয়েছে। সিগারেটে ধীরে ধীরে টান দিতে দিতে অসম্ভব রকম একটা কল্পনা করে বসল সে। ওটা ওই আকাশচারিণী অভিসারিকার বিরহবেদনার স্তূপ নয় তো? হয়তো সে আর বইতে পারছিল না বিরহ-বেদনার গুরুভার, তাই সেটা নামিয়ে দিয়েছে পথের ধুলোর উপরই, অতিশয় সসঙ্কোচে কিন্তু নিরুপায় হয়ে। খুব আস্তে আস্তে সিগারেটে টান দিতে

দিতে সে কল্পনায় আরও রং চড়াতে যাচ্ছিল এমন সময় কুয়াশাটা কেটে গেল, দেখা গেল, ওটা স্তূপীকৃত বিরহ-বেদনা নয়, তিরপল ঢাকা প্রকাণ্ড একখানা 'মোটর লরি'।

ঠিক এই সময় প্রহ্লাদ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল।

নবনী তার দিকে ফিরে বলল, "প্রহ্লাদ, তুই যদি আমার চোখের সামনে দেখতে দেখতে এখুনি ইঁদুর কিংবা ব্যাং হয়ে যাস তাহলে কি রকম হয় সেটা?"

প্রহ্লাদ তার মনিবটিকে চেনে তাই মাত্র মুচকি হাসিটুকু হেসে চলে গেল, কোন মন্তব্য করা নিরাপদ মনে করল না। তার চক্ষে নবীন রহস্যময় ইলেক্‌ট্রিক্ যন্ত্রের মতো, ঠিকভাবে নাড়াচাড়া করলে চমৎকার, কিন্তু একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই 'শক্' খাবার ভয় আছে।

নবনী চায়ের কাপে একটা লম্বা গোছের চুমুক দিয়ে তিরপল-ঢাকা লরিটার দিকেই চেয়েছিল, ফলে, পরের চুমুকটা দিতে একটু দেরি হল তার। তিরপল-ঢাকা লরির ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল বর্ণনা। বেরিয়ে এসে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চাইতে লাগল সে, তারপর হাত তুলে থামাল একটা চলন্ত রিক্‌শাকে রিক্‌শাওলাটার সঙ্গে কি কথা হল তাব, তারপব সেই রিক্‌শাওলাটাই আরও খানকয়েক রিক্‌শা ডেকে নিয়ে এল। এরপর দুজন ময়লা হাফপ্যান্ট হাফশার্ট পরা লোক আবির্ভূত হল কোথা থেকে। লরিরই ড্রাইভার এবং ক্লিনার সম্ভবত। তারা তিরপল খুলতে লাগল। তারপর এল লাঠি আর বল্লম। নবনী রায় এদের কাউকেই চিনত না, কিন্তু সেটা তার কাছে খুব বড় বাধা বলে মনে হল না। কারণ সে জানে পৃথিবীতে কেউ কাউকে চেনে না, সবাই সবাইকে চেনার ভান করে এবং তার মধ্যে থেকেই কিছু আনন্দ, কিছু রোমান্স, কিছু দঃখ, কিছু হতাশা ভোগ করে যে যার নিজের পথে চলে যায়, কিন্তু যেটা তার কাছে অসুবিধাজনক বাধা বলে মনে হচ্ছিল সেটা হচ্ছে এই যে সে আলাপের কোনও যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছিল না। সে ঠিকই করে ফেলেছিল এদের সঙ্গে আলাপ করে এদের নিয়েই আজ দিনটা শুরু করবে। যে ব্যাপার নিয়ে সে এতদিন নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিল তা শেষ হয়ে গেছে কয়েকদিন আগে। কন্যাদায়গ্রস্ত নীলাম্বরবাবুর কন্যাটির শুভ-বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেছে। যে মাদ্রাজী বন্ধুটির ফটোগ্রাফের দোকান-ঘর ঠিক করে দেবে বলেছিল তাও হয়ে গেছে, তার জন্যে বড় রাস্তার উপর ভাল ঘরই পেয়েছে সে একটা। এখন তার হাতে আর কাজ নেই, একটা যোগাড় করবার জন্য সে চা খেয়ে বেরুবে ঠিক করছিল, এমন সময় ঠিক তার বাসার সামনেই এই কাণ্ড। প্রথমেই কুয়াশার ওড়না গায়ে আকাশচারিণী অভিসারিকার আবির্ভাব ও তিরোভাব, তারপরই এই লরি, লবির পাশে রূপসী একটি মেয়ে, খানকয়েক রিক্‌শা, দুটি ছোকরা, মেয়েটির মুখে একটু বিষণ্ণ বিব্রত ভাব—হঠাৎ নবনী রায়ের কল্পনাকে সজীব করে তুলল। কি সূত্রে ওদের মধ্যে গিয়ে পড়বে হঠাৎ সেইটেই ঠিক করতে পারছিল না সে। একটা রিক্‌শাওলাকে দেখে সেটাও ঠিক হয়ে গেল। এক নিশ্বাসে চা-টা শেষ করে নেবে গেল সে। রিক্‌শাওলা ঝকসু তার চেনা লোক, এই পাড়াতেই থাকে, অনেকবার সে তার রিক্‌শায় চড়েছে, বন্ধুত্ব আছে ওর সঙ্গে।

তাকে ডেকে বললে—"চল, গড়পারে পৌঁছে দে আমাকে।"

"আমি তো বাবু ভাড়া গছে নিয়েছি।"

নবনী তখন বর্ণনাকে নমস্কার করে বললে, "ও, আপনি ভাড়া করেছেন বুঝি এটা? সবগুলোই ভাড়া করেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"আপনারা তো মাত্র তিনজন দেখছি। কিন্তু রিক্‌শা তো দেখছি আটটা—"

"ওতেও কুলুবে না। রিক্‌শাতে আমরা কেউ যাব না, ছবি যাবে। এক লরি সব ছবি।"

"বলেন কি ! নীলামের ব্যাপার নাকি কোনও?"

"না। আমার বাবার আঁকা ছবি। তিনি দেশে থাকতেন, সম্প্রতি এখানে এসেছেন—"

"ও, আপনার বাবার আঁকা!"

সম্ভ্রম ফুটে উঠল নবনী রায়ের চোখে মুখে।

"কোথায় এসে উঠেছেন তিনি?"

একটু ইতস্তত করে বর্ণনা বললে, "বাসা এখনও ঠিক হয়নি, এক আত্মীয়ের বাড়িতে আছি আমরা।"

এই মিথ্যাভাষণটুকু করে বর্ণনা ছবি নামাতে আরম্ভ করল লাঠি আর বল্লমের সহায়তায়। নবনী রায় দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মিনিট, অবাক হয়ে গেল দু'একটা ছবি দেখে। সে ছবির খুব সমঝদার নয়, কিন্তু ছবিগুলি যে সাধারণ পর্যায়ের নয়, তা বুঝতে দেরি হল না তার। এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা যে অশোভন হচ্ছে তা সে বুঝতে পারছিল, কিন্তু তবু সে সরতে পারছিল না সেখানে থেকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরতেই হল, কারণ আর একটা রিক্‌শা এসে পড়ল এবং তাতে চড়তেই হল তাকে। না চড়লে বর্ণনার সন্দেহ হত। রিকশা চড়ে সোজা চলে গেল কিছুদূর, একটা চায়ের দোকানে নেমে আর একবার চা খেলে, তারপর বাড়িতেই ফিরে এল আবার। এসে দেখলে তখনও লরি থেকে ছবি নামানো চলছে। সে সোজা উঠে চলে গেল তার তেতলার ঘরটিতে। আর একটি সিগারেট ধরিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল মেয়েটির কার্যকলাপ।

নবনী রায়ের উক্ত আচরণ থেকে যদি আপনাদের মনে এই ধারণা হয় যে লোকটি আধুনিক যুগের সেই শ্রেণীর লোক যারা যুবতী তরুণী দেখলেই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে হয় কবিতা লেখে, না হয় পিছু নেয়, না হয় প্রেমে পড়ে বিয়ে করবার জন্যে উদ্বাহু হয়ে নাচতে থাকে—তাহলে আপনাদের সে ধারণাটা বদলাতে হবে। নবনী রায় বর্ণনাকে দেখে আকৃষ্ট হয়েছিল সত্য, কিন্তু এর আগে সে আকৃষ্ট হয়েছিল ন্যুব্জদেহ নীলাম্বরবাবুকে দেখে যার পঞ্চম কন্যার পাত্র জোটাবার জন্যে সে সমস্ত কোলকাতা শহর চযে ফেলেছিল। তার আগে সে আকৃষ্ট হয়েছিল এক দরিদ্র কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত পরিবারের প্রতি, তার আগে এক চানাচুর ফেরিওয়ালাকে নিয়ে কাটিয়েছিল কিছুদিন। এরকম আরও অনেক উদাহরণ আছে। নবনীর জীবন-চরিত যদি কেউ কখনও লেখে বা অনুধাবন করে তাহলে এই কথাটাই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে যদিও সে অবিবাহিত, যদিও তার কল্পনাশক্তি এবং ভাব-প্রবণতার অভাব নেই, তবু মেয়েমানুষ সংক্রান্ত ব্যাপার থেকে সে যথাসাধ্য নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছ এ যাবৎ। "নারী নরকের দ্বার" অথবা "অপ্সরী না হলে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করব না"—এ ধরনের কোনও আজগুবি খেয়ালের বশে সে যে একাজ করছে তা ঠিক নয়। করেছে কারণ সে প্রকৃত স্বাধীনতাকামী। ইংরেজীতে যাকে 'এস্‌কেপিস্ট' বলে তাও ঠিক নয় সে, কারণ দুনিয়ার ঝামেলা থেকে গা বাঁচিয়ে সে সরে পড়েনি কখনও, বরং অপরের ঝামেলা স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন বরাবর। এই 'স্বেচ্ছা' কথাটার মধ্যেই নিহিত আছে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সে জানে নারী-

নিগড়ে বাঁধা পড়লে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে এমন অনেক কাজ করত হয় যা কোনও ভদ্রলোকের করা উচিত নয়। সে সন্ন্যাসী হতে পারত, কিন্তু সন্ন্যাসী হতে হলে যে-সব গুণ থাকা দরকার তাও তার ছিল না। ষড়রিপুর মধ্যে প্রথম চারটি রিপুর কবলমুক্ত হতে পারেনি সে, হবার তেমন আগ্রহও ছিল না, যদিও ওই রিপুগুলির প্রকোপে পড়ে পাঁকেও লুটিয়ে পড়েনি সে কখনও। সুতরাং সংসারী না হয়েও সংসারে থাকবার কৌশল আবিষ্কার করতে হয়েছিল তাকে। বাবা-মা অথবা ভাই-বোন থাকলে বিয়ে না করেও হয়তো সংসারী হয়ে থাকতে হত তাকে কিছুদিন। কিন্তু সে সব তার কিছুই ছিল না। বাবা-মা মারা গিয়েছিলেন তার ভাল করে জ্ঞান হবার পূর্বেই, ভাই-বোনও হয়নি। তাকে মানুষ করেছিলেন তার বাবার এক অবাঙালী বন্ধু, টাকার বিনিময়ে। মিলিটারি কন্ট্রাক্টার ছিলেন তার বাবা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রচুর টাকা উপার্জন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুকালে আবিষ্কৃত হল দশ লক্ষ টাকা ব্যাংকে জমা করে গেছেন তিনি। নবনীর জন্মের বছরখানেক পরেই তার মায়ের মৃত্যু হয়। মায়ের মৃত্যুর পর তার বাবা 'পেইংগেস্ট' হয়ে তাঁর অবাঙালী বন্ধুটির বাড়িতেই থাকতেন। তাঁর মৃত্যু সেই বাড়িতেই হয় আরও বছর দুই পরে। মৃত্যুর পর দেখা গেল তিনি একটি উইল করে গেছেন। উইলে তিনি তাঁর অবাঙালী বন্ধুটিকে তাঁর নাবালক পুত্রের অভিভাবক নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। ছেলেকে ভালভাবে মানুষ করার জন্য তিনি প্রতি মাসে তিনশ' টাকা পাবেন উইলে এ নির্দেশও ছিল। একথাও উল্লিখিত ছিল তাঁর বন্ধু যদি অভিভাবক হতে রাজি না হন তাহলে তাঁর উকিল গভর্নমেন্টের হাতে সে ভার দেবেন। তার দরকার অবশ্য হয়নি, অবাঙালী বন্ধুটিই নাবালক নবনীর ভার নিয়েছিলেন। অর্থাৎ সে একটু বড় হতেই তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ভাল একটি বোর্ডিং হাউসে। বস্তুত বোর্ডিংয়ে বোর্ডিংয়েই কেটেছে তার নাবালক জীবনটা। ঠিক বাইশ বছর বয়সে সে এম-এ পাশ করল সসম্মানে। এরপর সে নাকি বছর দুই তিন বিলেতেও ছিল। সেখানকার কোনো এক নামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দামী একটা ডিগ্রীও অর্জন করেছিল নাকি। এ বিষয়ে বর্ণনার ধারণাটা অবশ্য ধোঁয়াটে। কারণ নবনী নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেনি বর্ণনাকে। আর আমি যা লিখছি তার উৎস বর্ণনাই। নবনী যে এম-এ পাশ এ খবরও জানতে পারত না, হঠাৎ জেনে ফেলেছিল তারই কলেজের এক প্রফেসারের কাছ থেকে।

নবনী যেদিন বর্ণনাকে প্রথম দেখেছিল সেইদিনই তার সঙ্গে আলাপ হয়নি। সেদিন সে তার তেতলার ঘর থেকে বর্ণনাকে লক্ষ্যই করছিল কেবল, অনেকক্ষণ ধরে দেখছিল, নিরপেক্ষভাবে দেখবার চেষ্টা করছিল, আলাপ করেনি, আলাপ করবার কথা মনেও হয়নি অনেকক্ষণ, তার ছবি নামানোও চলছিল অনেকক্ষণ ধরে, তাই দেখেই সে আলাপের সুখটা অনুভব করছিল মনে মনে, তারপর শেষ রিক্‌শাটি যখন ছবি-বোঝাই হয়ে চলতে শুরু করল, তখন তার মনে হল যে আর একটু দেরি করলেই ওরা হয়তো হারিয়ে যাবে এই কোলকাতা শহরের ঘূর্ণাবর্তে, যে ঘূর্ণাবর্তে সকলেই সকলের সঙ্গে সম্পৃক্ত অথচ কেউ কাউকে চেনে না, যে ঘূর্ণাবর্তে একই সময়ে একই বাড়ির এক ফ্ল্যাট থেকে মড়া বেরোয়, আর এক ফ্ল্যাট থেকে বর, যেখানে মানুষের ঠিকানা নম্বর দিয়ে নির্ণীত হয়, যেখানে আসক্তি-অনাসক্তির মায়া-বৈরাগ্যের আপাত-মিলন হয়েছে স্বার্থের তাড়নায়, যেখানে—

আর কালবিলম্ব না করে নেবে পড়েছিল নবনী। কারণ এটা সে বুঝেছিল, (কি করে বুঝেছিল তা সে-ই জানে, এ বিষয়ে সম্ভবত সহজাত একটা দূরদৃষ্টি ছিল তার পশুদের মতো) —যে ওই মেয়েটি আর ওই এক লরি ছবির সমন্বয় এই কোলকাতা শহরে এমন অদ্ভুত যে ওদের কেন্দ্র করেই তাকে কাটাতে হবে এখন কিছুদিন। সে সহজাত প্রকৃতি মধুপকে নিয়ে যায় ফুলের কাছে, তৃষিত পশুপক্ষীকে চালিত করে লুক্কায়িত ঝরনাধারার দিকে, সেই সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় সেও নেবে পড়ল। কারণ একটা মনোমত-কিছু নিয়ে ব্যাপৃত থাকা মস্ত বড় অপরিহার্য প্রয়োজন তার জীবনে। ওই তার ধর্ম এবং কর্ম, একঘেয়ে দৈনন্দিন জীবনে নূতন সুর, নূতন বর্ণ-বৈচিত্র্য, নিত্য নব আস্বাদ সৃজন করবার একমাত্র উপায়। সাধারণত শিক্ষিত যুবকেরা যে কর্মে লিপ্ত থাকে,—যেমন চাকরি অথবা ব্যবসা তা করবার দরকারই ছিল না তার, ব্যাংক থেকে প্রতি মাসে যা সুদ পেত তাতেই তার স্বচ্ছন্দে চলে যেত। অনর্থক আরও টাকা রোজগার করবার লালসায় নিজেকে অবনত করবার ইচ্ছাই তার হয়নি কোনোদিন। কারণ, এই ধারণাটা তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে মনুষ্যত্ব বজায় রেখে এদেশে অন্তত চাকরি বা ব্যবসা কিছুই করা সম্ভব নয়। রাজনীতিকে সে ঘৃণা করত, ধর্মেও মতি ছিল না, গান-বাজনা, ছবি-আঁকা, সাহিত্য-চর্চা এসবেরও বাতিক ছিল না কোনও। সে বই পড়ত কিনে এবং পড়া হয়ে গেলেই সেটা বিক্রি করে কিনত আর একখানা বই। লাইব্রেবি করবার শখও ছিল না তার, থাকলে তাই নিয়ে খানিকটা সময় কাটত। এককালে খবরের কাগজের নানারকম বিজ্ঞাপন এবং সংবাদ সংগ্রহের দিকে ঝোঁক ছিল, অনেক সংগৃহীত বিজ্ঞাপন আর 'কাটিং' পড়ে আছে স্তূপীকৃত হয়ে একটা বাক্সে। এখন আর ওসবে রুচি নেই। এখন কোনও সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের ধার দিয়েও সে যায় না। সংসারের বন্ধনটা যথাসম্ভব আলগা করে রাখবার দিকেই যেন তার ঝোঁক হয়েছে ইদানীং। এমন কি যে ফ্ল্যাটটা সে ভাড়া নিয়েছিল সেখানে রান্নার ব্যবস্থাও করেনি। হোটেলে খেত নগদ পয়সা দিয়ে। চা জলখাবার আসত পাশের একটা দোকান থেকে। নিজের বাসার সঙ্গেও কোনো বন্ধনের সম্পর্ক সে রাখেনি। সকালবেলা স্নান করে বেরিয়ে যেত, ফিরত রাত্রে একেবারে খাওয়া-দাওয়া সেরে। প্রহ্লাদের কাজ ছিল ফাই-ফরমাশ খাটা, বাড়ি পাহারা দেওয়া আর বাড়ি পরিচ্ছন্ন করে রাখা, যে ঘরটি নবনী ব্যবহার করত সেইটি সে পরিষ্কার করত রোজ। বাকি তিনটে ঘর তালা-দেওয়াই থাকত। মাঝে মাঝে নবনীর দু'একজন বিদেশি বন্ধু এসে আশ্রয় নিত সেখানে দু'একদিনের জন্য। কখনও কোনো সাহেব, কখনও পাঞ্জাবী, কখনও মাদ্রাজী, ক্বচিৎ দু'একজন বাঙালী। দু'একদিনই থাকত তারা। কোলকাতায় বিশেষ কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করেনি সে, পাছে বন্ধুদের দায়ে ঝামেলা পোহাতে হয়। সে ভালবাসত অচেনা জগতে অচেনা পথ চিনে চিনে ঘুরে বেড়াতে, অচেনা জগত চেনা হয়ে গেলেই সে সরে পড়বার চেষ্টা করত সেখান থেকে। বিশাল কোলকাতা শহরে অসম্ভব হত না সেটা। তার যদিও একটা বাসা ছিল কিন্তু সে বাসাটাকে সরাইখানার মতো ব্যবহার করেই বেশি আনন্দ পেত সে। সুতরাং প্রহ্লাদের প্রচুর অবসর ছিল, জন্ম-নিরোধ-ক্লিনিকের সুবাসিনীর কর্ম-ভার লাঘব করেই এ অবসর বিনোদন করত সে, একথা আগেই বলেছি।

নবনী প্রায়ই বাড়িতে থাকত না, নিজের কাজে বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়াত। এই কাজ সংগ্রহ করাই ছিল তার জীবনের প্রধান প্রেরণা এবং সমস্যা। একটা কাজ শেষ হয়ে গেলেই আর একটা কাজের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতে হত তাকে। পথে পথে ঘুরতে ঘুরতেই কাজ

পেয়ে যেত সে। নীলাম্বর সেনকে সে আবিষ্কার করেছিল পথেই। পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তাঁকে। নবনী যখন খোঁজ নিয়ে জানল যে কন্যাদায়ের জন্যই ভদ্রলোক ঋণজালে জড়িত হয়ে শেষকালে পুলিশের কবলে পড়েছেন, তখনই সে অনুভব করল তার কাজ জুটে গেছে। একটু অনুসন্ধান করতেই জানা গেল যে মাত্র পাঁচ হাজার টাকার জন্যে নীলাম্বরের উত্তমর্ণ একজন আত্মীয় আক্রোশ-বশে তাঁকে সিভিল জেলে পাঠাবার আয়োজন করেছেন। আর একটু অনুসন্ধানের পর প্রকাশ হয়ে পড়ল আক্রোশটা টাকার জন্য নয়, নীলাম্বরের পঞ্চম কন্যা চুণীর জন্য। চুণীর সঙ্গে তিনি তাঁর এক মাতাল শালার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, নীলাম্বর সেন রাজি হননি। জেদ চড়ে গেল নবনীর। এক একজন গণিতজ্ঞের স্বভাব অঙ্ক যত কঠিন হয় ততই তিনি মেতে ওঠেন তা নিয়ে। নবনীর স্বভাবও অনেকটা সেই রকম। পঞ্চকন্যার পিতা নীলাম্বর সেনের কঠিন জীবন-সমস্যা মাতিয়ে রেখেছিল তাকে বেশ কিছুদিন, সমস্যার সমাধানও করেছিল সে শেষ পর্যন্ত। একথা শুনে নবনীকে অনেকে হয়তো ভুল বুঝবেন। রূপকথায় যে সব ছদ্মবেশী দেবদূতের কথা শোনা যায় নবনী রায়কে সে-রকম কেউ যদি মনে করেন তাহলে সেটা ঠিক হবে না। সে যে পরোপকার করব বলে এসব করে বেড়াত তা নয়, করে বেড়াত নিজের প্রয়োজনে, সময় কাটাবার জন্য। আরও দু'একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। কিছুদিন সে কাটিয়েছিল একটা খাতায় ভিখারী-ভিখারিনীদের সত্য জীবনকাহিনী সংগ্রহ করে। পার্কে পার্কে রাস্তায় রাস্তায় অনেকদিন সে ঘুরে বেড়িয়েছে এজন্য। এই সময়ই তার আলাপ হয় চানাচুরওলা মহেন্দ্রের সঙ্গে। কুচকুচে কালো কষ্টিপাথরে-কোঁদা মহেন্দ্রকে দেখে তার মনে হয়েছিল অজন্তার কোন নারীমূর্তিই বোধহয় পুরুষের রূপ ধরে নেমে এসেছে কোলকাতা শহরে আর ম্যাডক্স স্কোয়ারের কোণে দাঁড়িয়ে চানাচুর বিক্রি করছে। মহেন্দ্রের পাকা গোঁফ এবং কাঁচাপাকা কোঁকড়ানো চুল থাকা সত্ত্বেও একথা মনে হয়েছিল তার। প্রায়ই গিয়ে চানাচুর কিনত তার কাছে। চমৎকার চানাচুর তৈরি করত মহেন্দ্র। নিরামিষ চানাচুর, ছোলা, চিনাবাদাম, মুগ মটর দিয়ে সাধারণত যা তৈরি হয় তাই। প্রথম দিন দেখেই নবনীর মনে হয়েছিল লোকটা শিল্পী।

একদিন তাকে জিগ্যেস করল—"মাংসের ঘুগনি করতে পার?"

"রোজই করি, কিন্তু বিক্রি করি না।"

"নিজে খাও?"

"আজ্ঞে না। আমার ওস্তাদের জন্য করি।"

"ওস্তাদ? কিসের ওস্তাদ?"

"সারেঙ্গীর।"

"তুমি সারেঙ্গী বাজাও নাকি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

কুণ্ঠিতভাবে উত্তর দিয়েছিল চানাচুরওলা।

এরপর থেকে নবনী তার সমস্ত চানাচুর কিনে নিত এবং তারপর তার বাড়ি গিয়ে সারেঙ্গী শুনত তার কাছ থেকে। অপূর্ব বাজাত লোকটা। তার ওস্তাদের বাড়িতেও গিয়েছিল সে। গরীব লোক, খোলার ঘরে থাকে, কিন্তু থাকে যেন বাদশার মতো। নবনীও তার জন্যে ভাল ভাল হোটেল থেকে মাংসের নানারকম খাবার কিনে নিয়ে গিয়ে খাওয়াত তাকে, আর বাজনা

শুনত। অর্থাৎ এই নিয়েই সে কাটিয়ে দিয়েছিল কিছুদিন। এর মধ্যে পরোপকারের কোন প্রশ্ন ছিল না।

যে মাদ্রাজী বন্ধুটির জন্যে ফোটোগ্রাফের দোকান-ঘর ঠিক করে দিয়েছিল তার সঙ্গে বরং এই ধরনের একটা সম্পর্ক ছিল। শ্রীনাথনের বাবা তার দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন, তাঁর চিঠি পেয়ে এ কাজ করতে হয়েছিল তাকে। কাজটা খুব মনোরম মনে হয়নি, কিন্তু পিতৃতুল্য অধ্যাপকের অনুরোধ অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না।

সময় কাটাবার জন্য এই ধরনের নানা কাজ নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে হয় তাকে। তবে সে চেষ্টা করত কাজটা যাতে মনোমত হয়।

সেদিন সে তাড়াতাড়ি উপর থেকে নেমেই যদি একটা ট্যাক্সি না পেত, তাহলে বর্ণনার নাগালই আর সে পেত না সম্ভবত। বর্ণনা অনেক দূর চলে গিয়েছিল, রিক্‌শাটা যখন একটা গলির মধ্যে ঢুকল তখন ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সে-ও ঢুকল। ঢুকেই দেখা হয়ে গেল তার সেই চেনা রিক্‌শাওলাটার সঙ্গে। তার কাছেই জানতে পারল অত ছবি কোন্ ঠিকানায় রেখে এল তারা। অবাক হয়ে গেল শুনে। অত ছবি নাকি রাখা হয়েছে একটা খোলার ঘরে। রিক্‌শাওলা চলে যাবার পর একটি সিগারেট ধরিয়ে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে দেখে এল ঘরগুলো। সারি সারি চারটে খোলার ঘর। রাস্তার পাশেই, বাড়িগুলোর সামনা-সামনি একটা কল, কলে নানাজাতের ছেলে-মেয়ের ভিড়, চিৎকার, গালাগালি, কলহ। সেই ভিড়েরই একপাশে বালতি-হাতে বাচস্পতি দাঁড়িয়ে ছিলেন, নবনী রায় তখন তাঁকে চিনত না। আশেপাশে দু'একটা পাকা বাড়ি আছে, কিন্তু তাদের চেহারাও শ্রীহীন। অনতিদূরে একটা আটা-পেষাই কল, তার পাশে একটা বেকারি। খোলার ঘরের চাল ভেদ করে উঠেছে একটা কুৎসিত টিনের চোঙা, তার থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। চারপাশে ময়লা আর জঞ্জাল, একটা মরচে-ধরা ফাটা ডাস্টবিন থেকে উপচে পড়েছে আরও ময়লা আর জঞ্জাল। তার উপর চড়ে কলরব করছে কতকগুলো মুরগী। আর একটু দূরে একটা দাঁড়কাক একটা মরা ইঁদুরকে দুপায়ে চেপে ধরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আর একটু দূরে কলরব করছে কতকগুলো ছোঁড়া একটা ঘুড়ি নিয়ে। কাছেই একটা খোলার ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে দুটি নারীর কাংস্য-কণ্ঠ, ঝগড়া করছে তারা। পাশেই খানিকটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে। তাতে বাঁধা রয়েছে তিনটে মোষ, তাদের ঘিরে কাদা গোবর আর চোনার নরককুণ্ড। গলির দুধারের কাঁচা ড্রেনগুলোও নরককুণ্ড, এত দুর্গন্ধ যে কাছে দাঁড়ানো মুশকিল বেশিক্ষণ।...নবনী চমকে উঠল। সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে এসে আঙুলে ছ্যাঁকা দিয়েছিল। সেটা ফেলে দিয়ে সে চলে যাচ্ছিল। এমন সময় দেখতে পেলে বর্ণনা বেরুল একটা খোলার ঘর থেকে, বগলে বই-খাতা। পাঁক থেকে পদ্ম ফুটল এ-কথা তার মনে হল না, মনে হল একটা জীর্ণ মলিন খাপ থেকে যেন বেরিয়ে এল একটা চকচকে তলোয়ার। একটা বাড়ির পিছনে একটু গা-ঢাকা দিয়ে আত্মগোপন করে রইল নবনী। একটু আগেই যার সঙ্গে দেখা হয়েছে তার সামনে এখনই পড়াটা অশোভন হবে মনে হল তার। বর্ণনা গলিটা পার হয়ে যখন চলে গেল, তখন আর একটি সিগারেট ধরিয়ে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে।

এদের ঘিরে যে একটা রহস্যলোক আছে তার আভাস সে পাচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে সে রহস্যলোকের চাবি কি করে পাওয়া যায় তাই সে ঠিক করতে পারছিল

না। সে জানত তাড়া-হুড়ো করে যেমন ফুল ফোটানো যায় না, তেমনি ভাব করাও যায় না। সবুর করতে না জানলে আনন্দের মেওয়া পাওয়া অসম্ভব...

আবার তার চিন্তাধারা বিঘ্নিত হল। সে দেখতে পেল গেরুয়ার আলখাল্লা-পরা, রুদ্রাক্ষধারী, কাঁচাপাকা গোঁফ-দাড়িওলা, কালো চশমা চোখে একটি লোক বেরিয়ে এল ওই চারটি খোলার ঘরের একটি থেকে। হেমন্তকুমার। ভেক বদলেছিল সে। নবনী রায়ের দিকে এক নজর চেয়ে সে প্রশ্ন করল, "আপনি খুঁজছেন কাউকে?"

একটা প্রেরণা-প্রবাহ বয়ে গেল নবনী রায়ের মস্তিষ্কের ভিতর।

"শুনেছি এ পাড়ায় একজন ভাল তান্ত্রিক সাধু এসেছেন বাইরে থেকে। তাঁর নাম ঠিক জানি না—"

"আসুন আমার সঙ্গে।"

হেমন্তকুমারকে অনুসরণ করে নবনী রায় বেরিয়ে গেল গলি থেকে।

।। দুই ।।

কোলকাতায় এসে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল সকলেরই।

বাচস্পতি আর বনস্পতি যে এমন নির্বিকারভাবে নূতন পারিপার্শ্বিকের কদর্যতাটা মেনে নিতে পারবে বর্ণনা তা আশা করেনি। তারা দুজনেই বাইরে এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা যে কষ্ট পাচ্ছে তা বর্ণনা বুঝতে পারত। খাওয়ারই কষ্ট হত। প্রধান সমস্যা হয়েছিল অর্থের। পোস্টাফিসে তাদের সঞ্চিত অর্থ ছিল মাত্র পাঁচ হাজার। বাড়ির আসবাবপত্র বিক্রি করে আরও হাজার দুই টাকা পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়া সীমন্তিনী, সরস্বতী আর বর্ণনার গহনাও ছিল কিছু, কিন্তু সেগুলো বর্ণনা ব্যাংকে রেখে দিয়েছিল, বিক্রি করেনি।

বর্ণনাই এদের সকলের ভার নিয়েছিল, সে-ই বাচস্পতি-বনস্পতিকে আশ্বাস দিয়েছিল যে চিন্তার কোনও কারণ নেই। বলেছিল, "আপনারা সুখপুরে যেমন সুখপুর-পত্রিকা আর ছবি-আঁকা নিয়ে ছিলেন এখানেও তেমনি থাকুন, সংসারের ভার আমি নিলুম।"

মুখে সে আশ্বাস দিয়েছিল বটে কিন্তু চিন্তিত হয়ে পড়েছিল মনে মনে। বাড়িতে খাওয়ার লোক আঠারো জন, কিন্তু উপার্জনক্ষম একজনও নয়, ডাল ভাত আর নিরামিষ একটা তরকারি খেয়ে থাকলেও দৈনিক অন্তত পাঁচ টাকার দরকার। তাছাড়া চারটে খোলার ঘরের ভাড়া মাসে ষাট টাকা, কাপড়-চোপড় আছে, সুখপুর-পত্রিকার জন্য, ছবি আঁকার জন্য কিছু কিছু খরচ আছে, সাবান মাজন তেল প্রভৃতির জন্যও টুকিটাকি খরচ আছে রোজই। বাচস্পতি-বনস্পতির জন্য কিছু দুধের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল, তার খরচও কম নয়, প্রায় বাড়িভাড়ার সমান। সাবু মিত্তির অবশ্য মাঝে মাঝে এসে চাল-ডাল দিয়ে যেত পুরোনো প্রজাদের কাছ থেকে. যোগাড় করে। সাশ্রয় হত তাতে কিছু। তবু বর্ণনা হিসেব করে দেখেছিল মাসে অন্ততপক্ষে সাড়ে তিনশ টাকা আয় না হলে ওই নরককুণ্ডে থেকেও সংসার চালানো অসম্ভব। ভাগ্যক্রমে একটা চাকরি জুটে গিয়েছিল তার। ভাল চাকরি, মাইনে দু'শ টাকা, কাজও কম। একজন বড়-লোকের স্ত্রীকে গান-বাজনা শেখাতে হবে রোজ সন্ধ্যায় দু'ঘণ্টা করে। চাকরি

হিসাবে খুবই ভাল, কলেজও কামাই হবে না, অথচ ভাল রোজগার হবে যেদিন সে 'লরি' করে তার বাবার ছবিগুলো নিয়ে এল ঠিক তার দিন সাতেক আগে চাকরিটা পেয়েছিল সে। বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেছিল, এমনি একটা দরখাস্ত করে দিয়েছিল, আশা করেনি যে হয়ে যাবে। ইন্টারভিউ করবার জন্যে যখন চিঠি এল তখন অবাক হয়ে গেল। কোলকাতা শহরে তার চেয়ে ভাল সঙ্গীতজ্ঞ নিশ্চয়ই আছে এই তার ধারণা ছিল। ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে আরও অবাক হল সে। স্থূলকায় প্রৌঢ়া একটি মহিলাকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত এবং সেতার শেখাতে হবে। এতদিন কি করছিলেন ভদ্রমহিলা? তাঁর স্বামী সুখময়বাবুরই আগ্রহ বেশি মনে হল। খানিকক্ষণ আলাপের পর তিনি বললেন, "আপনাকে দেখেই মনে হচ্ছে আপনি ঠিক পারবেন। গান-বাজনা শেখবার ওর দরকার নেই তত, আসল দরকার সহচরীর। আমরা এতদিন পাঞ্জাব-প্রবাসী ছিলাম, ব্যবসা উপলক্ষে কিছুদিন আগে এখানে এসেছি, এখানে থাকতেও হবে এখন বেশ কিছুদিন। এখানে আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেউ নেই। ছেলেপিলেও হয়নি, বাইরের কাজ নিয়ে আমার সময়টা কেটে যায়, কিন্তু মুশকিল হয়েছে অঞ্জনার। আপনি এখন ওর ভার নিন। ছেলেবেলায় ওর গান-বাজনার শখ ছিল, অনেকদিন চর্চা নেই, দেখুন আবার যদি ওকে শেখাতে পারেন।" সুখময়বাবু যতক্ষণ কথা বলছিলেন ততক্ষণ অঞ্জনা দেবী হাসছিলেন মুখে কাপড় দিয়ে ফিকফিক করে। যদিও বয়স হয়েছে তবু বর্ণনার মনে হচ্ছিল ভদ্রমহিলা যেন একটু খুকী প্রকৃতির। যাই হোক, চাকরিটা পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল সে।

অপ্রত্যাশিত রকম পরিবর্তন হয়েছিল বাচস্পতি-বনস্পতির।

বর্ণনার আশঙ্কা হয়েছিল দুজনেই মুষড়ে পড়বে। কিন্তু ঠিক উল্টো হল। তারা দুজনেই যেন একটু বেশি রকম উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বিধাতার এই পরিহাসটাকে পরিহাসরূপে গ্রহণ করে তা উপভোগ করবার জন্যে যেন তৈরি হয়ে পড়ল তারা। তাদের মুখে বিষাদের ছায়াপাত হওয়া দূরে থাক, এমন একটা সজীবতার ভাব দেখা গেল যা খুব নতুন ঠেকল বর্ণনার চোখে। ভাবটা—জীবন-যুদ্ধের সৈনিক হিসাবে তাদের যে এইবার ডাক পড়েছে এতে তারা ভীত বা ম্রিয়মাণ তো নয়ই বরং যেন কৃতার্থ, তারা যে কোনও কাজ করতে রাজি, যে-কোন কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য প্রস্তুত।

বাচস্পতি নিজের ঘর নিজেই ঝাড়ু দিতে শুরু করে দিল, নিজের কাপড় নিজেই কাচতে লাগল। সীমন্তিনী বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল, পারেনি।

"তুমি তোমার নিজের কাপড়-জামাগুলি কাচ তাহলেই যথেষ্ট হবে। তা করে সময় পাও তো তোমার বউদিকে সাহায্য কর গিয়ে রান্নাঘরে।"

সত্যবতী রান্নার ভার নিয়েছিল, বাচস্পতি নিজেই থলি হাতে বাজার করে আনত রোজ। বর্ণনাকে পাই-পয়সা হিসেব বুঝিয়ে দিত।

বর্ণনা বলল, "লেখাপড়া ছেড়ে তুমি এসব কি আরম্ভ করেছ?"

"বেশ লাগছে। তুই আমার জন্যে একটা টিউশনি যোগাড় করে দিতে পারিস? সংস্কৃতটা পড়িয়ে দিতে পারব। বি-এ ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীকেও পারব।"

"আচ্ছা।"

বনস্পতিও স্বাবলম্বী হয়ে উঠল। যে লোক কোনোদিন কুটোটি নাড়েনি, সে-ও নিজের

কাজ নিজে করতে লাগল। সত্যবতীকে গিয়ে বললে, "দিদি, তুমি যদি আপত্তি না কর আমি তোমাকেও সাহায্য করতে পারি। এমন ছবির মতো তরকারি কুটে দেব যে, আলু, পটল কুমড়োর টুকরোকে ফুল বলে মনে হবে।"

সত্যবতী কেমন যেন গম্ভীর বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল।

ম্লান হেসে বললে, "না থাক—"

বর্ণনাকে একদিন আড়ালে ডেকে বললে, "তোর টাকার যদি টানাটানি হয় আমার ছবিগুলা বিক্রি করে দে না হয়। যদিও তোর মা রাজি হবে কিনা সন্দেহ। বেচতে আমারও কষ্ট হবে, কিন্তু কি করা যাবে, উপায় কি? দেখিস চেষ্টা করে, তোর তো অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে—"

"আচ্ছা।"

বর্ণনা দুজনকেই 'আচ্ছা' বললে বটে, কিন্তু সে জানত কোনোটাই সহজ-সাধ্য কাজ নয়। সংস্কৃত শেখবার জন্যে কেউ সংস্কৃত পড়ে না আজকাল, পড়ে পরীক্ষা পাশ করবার জন্যে। আর বই কিনে পড়ার অভ্যাসই যে দেশে নেই, সে দেশে ছবি কিনবে কে? তবু সে চেষ্টা করবে, কিছু আয় বাড়াতেই হবে। অনেক বড়লোকের ছেলে-মেয়ে পড়ে তার সঙ্গে, তাদের বলবে, যদি কেউ কেনে।

খুব বড় রকম পরিবর্তন হল হেমন্তকুমারের।

সে প্রথমেই এসে পরিস্থিতিটা যাকে বলে 'পর্যবেক্ষণ' তাই করলে। সব চেয়ে যে ঘরটা বড় সেইটেই দেওয়া হয়েছিল তাকে, কিন্তু তবু তার পছন্দ হল না। পছন্দ না হওয়ার কারণটা সে বাচস্পতি, বনস্পতি বা বর্ণনা কারও কাছে ভাঙলে না, ভাঙলে সোজা গিয়ে বাড়িওলার কাছে।

বললে, "মশাই একটু দয়া করতে হবে।"

"কি বলুন।"

"আমার ঘরটায় একটা পার্টিশন করিয়ে দিতে হবে। দরমার পার্টিশন হলেও চলবে।"

"পার্টিশন করতে চাইছেন কেন?"

"ছেলে-মেয়েরা বড় হয়েছে, তাদের সামনে কি বউ-এর সঙ্গে শোয়া যায়? অথচ অনেক দিনের অভ্যাস বউ-এর কাছে না শুলে ঘুম আসে না। আপনি ছোট-খাটো একটা পার্টিশন করে দিন দয়া করে। একপাশে একটা বিছানা করবার মতো জায়গা হলেই হবে আমার।"

বাড়িওলা একটু রসিক-প্রকৃতির লোক। প্রশ্ন করলেন, "কটি ছেলে-মেয়ে আপনার?"

"তা বলতে নেই, মা ষষ্ঠীর কৃপা আছে। ডজন পুরব পুরব হয়েছে। তার মধ্যে পাঁচ ছ'জন বেশ বড় বড়, বাকীগুলো ছোট।"

"ওদের ঘরে কি কুলুবে সকলের?"

"কুলিয়ে নিতেই হবে, উপায় কি। আপনি একটা পার্টিশনের ব্যবস্থা করিয়ে দিন শুধু।"

"আচ্ছা।"

বাড়িওলার লোক যখন পার্টিশন তৈরি করতে এল তখনই সর্বনাশের স্বরূপটা যেন সহসা উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল সকলের কাছে। গঙ্গা কূল ভাঙতে ভাঙতে একদিন যেমন বাড়ির বারান্দার নীচে হাজির হয়েছিল, অনেকটা তেমনি। অবস্থা যখন সচ্ছল ছিল তখন এ প্রশ্ন

কারো মনে ওঠেনি, কিন্তু এখন সহসা সকলে যেন উপলব্ধি করল যে হেমন্তকুমারের বংশবৃদ্ধি রোধ করতে না পারলে দ্বিতীয়বার ভরা-ডুবি হবে। কিন্তু এ বিষয়ে হেমন্তকুমারকে সামনাসামনি কোন কিছু বলা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। সম্পর্কে সে বাড়ির বড় বউয়ের দাদা, সুতরাং অগ্রগণ্য গুরুজন।

তবু বাচস্পতি সসঙ্কোচে তাকে আড়ালে ডেকে বললে, "তোমার বয়স কত হল হিমুদা?"

"একান্ন চলছে। হঠাৎ বয়স জানতে চাইছ কেন?"

"আমি বলছি পার্টিশন না করে আর একটা কাজ করলে হয় না।"

"কি?"

"সংযম।"

কথাটা শুনে হেমন্তকুমারের ভ্রূযুগল উত্তোলিত হল এবং সেই অবস্থাতেই রইল কয়েক মুহূর্ত।

"এ রকম আজগুবি কথা তোমার মনে হল কেন।"

"আজগুবি নয়, সমীচীন। আমাদের আয়ের পথ যখন বন্ধ হয়ে গেছে তখন ব্যয়সঙ্কোচ না করলে চলবে কেন?"

"ব্যয়সঙ্কোচ কর কিন্তু স্বাভাবিক ক্ষুধা-তৃষ্ণার দাবিকে তো একেবারে অগ্রাহ্য করা যাবে না। আয়ের পুরোনো পথ বন্ধ হয়েছে, নতুন পথ আবিষ্কার কবতে হবে। সে চেষ্টায় আছি আমি।"

তারপর আর একটু থেমে একটু মুচকি হেসে বললে, "আমার পরিবারের খরচ আমি রোজগার করে ফেলব কোনোরকমে। সেজন্য তোমাদের ভাবতে হবে না।"

হেমন্তকুমার আর সেখানে দাঁড়াল না, বাইরে চলে গেল।

অপ্রতিভ হয়ে পড়ল বাচস্পতি।

এর দিন দুই পরেই দেখা গেল হেমন্তকুমার তার কাপড়-জামা এমন কি কেড্‌স জুতো জোড়াকে পর্যন্ত গেরুয়া রঙে রাঙিয়ে ফেলেছে। হেমন্তকুমারের একাদশটি পুত্রকন্যার মধ্যে ছ'জন বেশ বড় হয়েছিল। ছ'টির মধ্যে অবশ্য চারটি কন্যা, বন্দুক, কিরিচ, কাটারি আর ছোরা। বয়স যথাক্রমে বাইশ, কুড়ি, সতেরো আর তেরো। দুটি ছেলে লাঠি আর সোঁটা, বয়স যথাক্রমে আটাশ আর পঁচিশ। এর পরের ছেলে বল্লমের বয়স এগারো। বয়সের দিক থেকে নাবালক হলেও বুদ্ধির দিক দিয়ে সে কম পরিপক্ক ছিল না।

নিজের কাপড়-চোপড় গেরুয়া রঙে রাঙিয়ে হেমন্তকুমার তার সাতটি পুত্রকন্যাকে ডেকে নিয়ে গেল একদিন হাওড়া স্টেশনে। কোনও পার্কে যেতে পারত কিন্তু সে ভেবে দেখলে পার্কে তার এতগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে সমবেত হলে ভিড় জমে যাবে। হাওড়া স্টেশনের প্রকাণ্ড চত্বরের এক কোণে জটলা করলে সে সম্ভাবনা নেই। সকলেই মনে করবে ওরা যাত্রী। একদিন দুপুরে ট্রাম-যোগে সকলেই হাজির হল সেখানে। হেমন্তকুমার সকলকেই এক কাপ করে চা আর একটা করে 'কেক্' খাওয়ালে। তারপর বললে, "চল এইবার ওদিকের কোণটায় গিয়ে বসা যাক, ফাঁকা আছে জায়গাটা।"

সকলে সমবেত হলে হেমন্তকুমার নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিল একটা, যার সারমর্ম হচ্ছে —

"দেখ, আজ একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার আলোচনা করবার জন্যে তোমাদের ডেকেছি। জীবন-মরণ সমস্যা। আমাদের প্রত্যেককে এখন রোজগার করতে হবে। তোমাদের পিসেমশাইরা এতদিন আমাদের খাইয়েছে পরিয়েছে, এইবার আমরা তাদের খাওয়াব পরাব। তা যদি নাও পারি আমাদের নিজেদের খরচটা রোজগার করতেই হবে। তোমারা সবাই বড় হয়েছ উপযুক্ত হয়েছ, তোমরা সবাই মিলে যদি লেগে পড় তাহলে আর ভাবনা কি?"

লাঠি বলল, "কিন্তু আমরা যে লেখাপড়া শিখিনি—"

"সেইটেই তো তোমাদের সুবিধে, তোমরা মুটে মজুর হতে পার আবার অনেক উঁচুতেও উঠতে পার। যারা লেখাপড়া শিখেছে তারা সব রকম কাজ করতে পারে না, কিন্তু তোমরা পারবে। কাল থেকেই লেগে পড় তোমরা। কোলকাতার মতো শহরে কাজের অভাব নেই। আমি নিজে ঠিক করেছি জ্যোতিষীর ব্যবসা করব, কিছু কিছু কবচও বেচব। হস্তরেখা বিচারের বই পড়েছি দু'চারখানা, পাঁজিটাও পড়ি ভাল করে, কিছু রোজগার হবেই ওসব থেকে। ঠিক করেছি ফুটপাথে কিংবা পার্কে বসব। আমি একটা খাবারওলার সঙ্গে কথা বলেছি, সে বলেছে কিছু টাকা জমা দিলে ফেরি করবার জন্যে খাবার সে দেবে। ওই কাজটাতে কাল থেকেই লেগে পড়তে পার কেউ—"

"দোকানটা কোথা?" লাঠি জিজ্ঞেস করল।

"বড়বাজারে। তুমি যদি কর তার সঙ্গে কথা বলতে পারি। গোটা পঞ্চাশেক টাকা জমা দিতে হবে সে খাবার আর বাসন-পত্তর তুমি নিয়ে যাবে তারই জামিন স্বরূপ লাগবে টাকাটা, তা আমি দিতে পারব। কিছু টাকা আমার আছে।"

"বেশ, করব।"

"ইংরেজদের একটা ফ্যাকটারি আছে আমাদের বাড়ির কাছেই। সেখানেও একটা চাকরি জুটতে পারে কারও, সোঁটা বা বল্লম সেখানে খোঁজ করতে পার, ওরা মাইনে ভাল দেয় শুনেছি।"

"আর আমরা কি করব?"—মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলে কিরিচ।

"কি করবে তা তোমরাই ঠিক কর। আমিও চেষ্টায় থাকব। মোট কথা, টাকা রোজগার করতে হবে, যেমন করে হোক করতে হবে। আর কিছু না পার বাড়িতে যা করছ বাইরে তা করলেও দু' পয়সা ঘরে আসবে।"

"বাড়িতে কি আর করছি!"

"কাপড় কাচছ, বাসন বাজছ, মশলা পিষছ, ঘর ঝাঁট দিচ্ছ, রান্না করছ, সবই তো করছ।"

"তার মানে বাইরে দাসীবৃত্তি করতে বলছেন?"

ভ্রূ-কুঞ্চিত হয়ে উঠল বন্দুকের।

"দাসীবৃত্তি কথাটা শুনতে খারাপ, কিন্তু কাজটা খারাপ নয়। যারা বড় বড় চাকরে তারাও তো দাস-দাসী। দাস-দাসীরাই তো দুনিয়া চালাচ্ছে। তুই ভুরু কোঁচকাচ্ছিস কেন?"

"কিন্তু লোকে যদি খারাপ বলে?"

"কিচ্ছু এসে যায় না তাতে! দারিদ্র্যের চেয়ে খারাপ আর কিছু নেই। আর এই কোলকাতা শহরে কে কাকে চেনে? এরা চেনে শুধু টাকা। কাল তুমি টাকা রোজগার করে মোটর হাঁকিয়ে বেড়াও সবাই তোমাকে সেলাম করবে, কি করে সে টাকা রোজগার করেছ তার হিসেবও নেবে না কেউ। যেন-তেন প্রকারেণ টাকা রোজগার করতে হবে এ শহরে।"

বল্লম হঠাৎ বলল, "এক ঠ্যালাওলার সঙ্গে ভাব হয়েছে আমার। তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরব?"

"সে কিছু দেবে কি?"

"তা জানি না, জিগ্যেস করব কাল।"

"কোরো। মোট কথা সবাইকে কিছু কিছু রোজগার করতে হবে রোজ।"

এই ধরনের আলাপ আলোচনায় আরও কিছুক্ষণ কাটিয়ে উঠে পড়ল তারা।

"একটা সিনেমা দেখাও না বাবা আজকে।"

"বেশ, চল।"

ছ'আনার সীটে গাদাগাদি করে বসতে হল, কারণ তার বেশি খরচ করার সামর্থ্য ছিল না হেমন্তকুমারের।

পরদিন থেকেই কাজের চেষ্টায় হেমন্তকুমারের ছেলে-মেয়েরা ঘুরতে লাগল।

সুখপুরে মিশ্র-পরিবারের আর একজন পরিজন ছিলেন ভূষণ চক্রবর্তী। এঁর খবর বনস্পতি সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। যখন এদের সুখপুর ছেড়ে কোলকাতায় আসা অনিবার্য হয়ে উঠল তখনই বিদায় নিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, কোলকাতায় আবার দেখা করবেন। কিন্তু প্রায় দু'মাস কেটে যাওয়ার পরও তাঁর কোনও খবর পাওয়া গেল না।

।। তিন ।।

সেদিন কিছুক্ষণ নীরবতার পর হেমন্তকুমার অনুসরণকারী নবনী রায়কে অবশেষে জিজ্ঞাসা করল, "তান্ত্রিক সাধুর কাছে কি দরকার আপনার? মারণ, উচাটন, বশীকরণ, জাতীয় কিছু না কি? না অন্য কিছু?"

"হাতে কোনও কাজ নেই। বেকার বসে আছি। কাজকর্ম কিছু জুটবে কি না, কি রকম জুটবে—এই সব জানতে চাই আর কি।"

"সে তো যে-কোনও জ্যোতিষী আপনাকে বলে দিতে পারত। এর জন্যে তান্ত্রিক সাধু খুঁজছেন কেন?"

"তান্ত্রিক সাধুরা এর প্রতিকারও করে দিতে পারেন শুনেছি।"

"তা পারেন। মন্ত্রসহ মহাকালী কবচ, মহানবগ্রহ কবচ—এসব ধারণ করলে ফল পাবেন। আরও নানারকম কবচ আছে। বাজারেও কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে ভাল ফল হয় না। আপনার জন্মকালীন গ্রহ সংস্থান অনুসারে তৈরি করলে সুফল ফলবে। আপনাকে কে খবর দিলে যে এই গলিতে তান্ত্রিক সাধু আছে?"

"ট্রামে যেতে যেতে কানে এল দুজনে বলাবলি করছিল—তিনি যে গ্রাম থেকে এসেছেন সে গ্রামের নামটিও বলছিল, নামটি ঠিক মনে পড়ছে না আমার।"

নবনী রায় ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে যেতে চাইল না।

"সুখপুর কি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ সুখপুরই।"

"তাহলে আমার কথাই বলছিল সম্ভবতঃ। ও গলিতে গেরুয়াধারী তো এক আমিই আছি।"

"আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, ভালই হল। আমার একটা ব্যবস্থা করে দিন তাহলে। আপনি কোথায় বসেন?"

"আপাতত ফুটপাথে কিংবা পার্কে বসছি। ঘর-টর কোথাও পাইনি, খোলার ঘরে এসে মাথা গুঁজেছি দিনকতক আগে।"

"সুখপুর থেকে চলে এলেন কেন?"

"মা গঙ্গা থাকতে দিলেন না। বাড়ি-ঘর জমি-জমা সবই কেড়ে নিলেন। এ রকম ভাঙন বহুদিন হয়নি।"

"ও। তাহলে তো মহা মুশকিলে পড়েছেন।"

"মুশকিল বইকি। তবে সবই মায়ের ইচ্ছা। তিনি যা করবেন তাই হবে।"

"আপনি কোনও কবচ ধারণ করেননি?" মুচকি হেসে জিগ্যেস করলে নবনী।

"করেছি বইকি। ডান-হাতে, গলায়, কোথাও বাকি রাখিনি। একটু যেন ফল হয়েছে মনে হচ্ছে। দেখা যাক।"

দেশবন্ধু পার্কের কাছাকাছি এসে পড়েছিল তারা।

"চলুন পার্কটায় ঢোকা যাক। আপনার হাতটা আগে দেখি। কুষ্ঠি আছে আপনার?"

"আজ্ঞে না।"

"জন্ম সময়?"

"তাও নেই।"

"হাত থেকেও খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। চলুন দেখি—"

পার্কের একটা বেঞ্চে বসে নবনীর দুটি হাতই ভাল করে দেখলে সে। হাত-দেখার দু-একখানা বই পড়া ছিল, সেই বিদ্যের জোরে সে বলল, "কোন চাকরি বা ব্যবসার চিহ্ন তো দেখছি না আপনার হাতে। তবে দারিদ্র্যের কষ্ট ভোগ করতে হবে না আপনাকে। আপনার ভাগ্য রেখা খুব জোরালো।"

"কবচ নিলে কাজ জুটবে?"

"জোটা তো উচিত।"

"কি রকম খরচ পড়বে?"

"যেমন খরচ করবেন। কবচ দু'চার টাকাতেও হয়, আবার ভাল কবে করলে শ-খানেক টাকাও লাগে।"

"ভাল করেই করুন আপনি। কিছু অগ্রিম দিতে হবে কি!"

"দিলে ভাল হয়। বুঝতেই পারছেন, বাস্তুভিটে থেকে উৎখাত হয়ে এসেছি। নিজের সংসার তো আছেই, তাছাড়া আছে এক ভগ্নীপতি আর তার ভাইয়ের সংসার।"

উৎকর্ণ হয়ে উঠল নবনী। এই সব খবরই তো সে শুনতে চাইছিল।

"ও, তাই নাকি। ওঁরা কি করেন?"

"কিছুই করেন না, করবার যোগ্যতাও নেই। দুটোই পাগল। একজন ঘরে বসে হাতে-লেখা পত্রিকা নিয়ে সময় কাটায়, আর একজন আঁকে ছবি। বাপ-ঠাকুর্দার বিষয়-আশয় ছিল তো, খেটে খাবার দরকার হয়নি, ওই সব আজগুবি খেয়াল নিয়ে থাকত। এখন মুশকিলে পড়েছে।"

"প্রত্যেকেরই ছেলেপিলে আছে তো?"

"ওইটি ভগবান রক্ষা করেছেন। বনস্পতির কেবল মেয়ে আছে একটা। সে লেখা-পড়া শিখেছে, চাকরিও করছে একটা। ভাল মেয়েটা, তবে বড্ড বেশি আপ-টু-ডেট্।"

"ও।"

বর্ণনার ছবিটা ভেসে উঠল নবনী রায়ের মনে। তার বুঝতে দেরি হল না 'লরি'র পাশে একেই সে দেখেছিল। ভাবতে লাগল, কি করে ভদ্রভাবে ওই আপ-টু-ডেট্ মেয়েটার নাগাল পেতে পারবে। যদিও শেষ পর্যন্ত উপকারী বন্ধু হিসাবেই তার সঙ্গে পরিচয় করতে হয়েছিল, কিন্তু সে তা চায়নি। কারণ সে জানত হিতৈষী বন্ধু হওয়ার শেষ পরিণাম শত্রুতা। ওই নীলাম্বর সেনই নাকি তার নিন্দে করে বেড়াচ্ছে। বিদ্যাসাগরের মতো লোকও পরোপকার করতে গিয়েই অনেক শত্রু-সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু এটাও সে অনুভব করছিল যে ওর সঙ্গে আলাপ করতে হবেই, কেমন যেন একটা রহস্য ঘিরে আছে ওর চারদিকে, আর সেইটেই সব চেয়ে বড় আকর্ষণ, মেয়েটা তত নয়। কুয়াশা কেটে গেলে স্তূপীকৃত বিরহ-বেদনা হয়তো তিবপল-ঢাকা 'লরি'-রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। 'লরি'টার ভিতর কিন্তু ছবি ছিল অনেক। এর ভিতরও আছে কি?

"কবচটা কি তাহলে করব?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। দেখি আমার কাছে এখন কত আছে।"

পকেট থেকে ব্যাগটা বার করে দেখল কত টাকা আছে। সাধারণত বেশি টাকা নিয়ে ঘোরাফেরা করে না সে।

"গোটা পঁচিশেক টাকা দিলে চলবে?"

"তাই দিন।"

টাকা ক'টি গেরুয়া ঝোলাটার ভিতর পুরে হেমন্তকুমার হাসিমুখে চেয়ে রইল নবনীর দিকে, তারপর বলল, "দিন সাতেক পরে কবচ পাবেন। কোথায় থাকেন আপনি, ঠিকানা কি?"

নবনীর মনে হল ঠিকানাটা দেওয়া ঠিক হবে না।

"আমি কোলকাতার বাইরে থাকি। সাতদিন পরে আমিই না হয় আপনার কাছে যাব। ওই গলির কত নম্বরে আপনি থাকেন?"

"না, ওখানে যাবেন না। আমি যে এসব নিয়ে ব্যবসা করছি সেটা বাড়ির লোকের কাছে গোপন রাখতে চাই। ওরা শুনলে ভয় পেয়ে যাবে। তন্ত্র নিয়ে ব্যবসা করাটা একটু বিপজ্জনক তো। ওরা জানে আমি রোজ বেরিয়ে যাই কালীঘাটে পুজো করব বলে—"

"অ, আচ্ছা বেশ, আমি সাতদিন পরে এইখানেই তাহলে দেখা করব আপনার সঙ্গে। ক'টার সময় আসব বলুন?"

"এগারোটা নাগাদ।"

"বেশ।"

নবনী রায় সেদিন যখন বাড়ি ফিরল তখন একটি দুঃসংবাদ দিলে প্রহ্লাদ। তার প্রকাণ্ড কাঠের সিন্দুকটায় নাকি উই লেগেছে। ভিতরের কাগজপত্রও নষ্ট করেছে কিছু।

"বলিস কি রে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ভাল করে দেখেছি।"

গুম হয়ে রইল নবনী খানিকক্ষণ। অতীতের কথা মনে পড়ল। অনেক ভিখারি-ভিখারিনির জীবন-কাহিনী সংগ্রহ করেছিল সে। অনেক বিজ্ঞাপন, অনেক বিচিত্র, বিস্ময়কর, কৌতুকপ্রদ সংবাদ সংগ্রহ করেছিল দেশি-বিদেশি নানা কাগজ থেকে। তাছাড়া ওই সিন্দুকে আছে চিঠি, অনেক চিঠি। ওই সিন্দুকের তলায় তার অতীত জীবনের অনেকখানি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। সিন্দুকটাও একটা স্মৃতি। ওটা তার মায়ের ছিল, মা বাসন রাখতেন। তাড়াতাড়ি গিয়ে খুলে দেখলে। নিচের তক্তা খানিকটা জখম হয়েছে। কাগজপত্রও খেয়েছে কিছু কিছু। সিন্দুকটা মিস্ত্রীকে দিয়ে ঠিক করিয়ে নেওয়া যাবে, কিন্তু এত কাগজপত্র? সব ফেলে দেবে? এতদিনের কর্মফল বিসর্জন দিতে হবে রাস্তার 'ডাস্টবিনে'? আবার টুকে রাখলে কেমন হয় নতুন খাতায়। কিন্তু কে টুকবে এত? ওদের কেন্দ্র করে অতীত জীবনে যে উৎসাহ জেগেছিল তা আর নেই, কিন্তু ওদের একেবারে বিসর্জন দেবারও ইচ্ছে হল না। হঠাৎ তখুনি ঠিক করতে পারলে না কি করবে।

"ন্যাপথলিনের গুলি আছে বাড়িতে?"

"বেশি নেই, দু'চারটে আছে।"

"আরও কিছু কিনে নিয়ে আয়। আজ ন্যাপথলিন দিয়ে রেখে দে, পরে কিছু একটা ব্যবস্থা করা যাবে।"

তার পরদিন একাধিক খবরের কাগজে এই বিজ্ঞাপনটি দেখা গেল। "কেরানির কাজ করিবার জন্য একজন লোক চাই। ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় জ্ঞান থাকা দরকার। যোগ্যতা অনুসারে বেতন নির্দিষ্ট হইবে। ...নং পোস্টবক্সে আবেদন করুন।"

ভূষণ চক্রবর্তী সেদিন সুখপুর ত্যাগ করে কোলকাতায় এসে হাজির হলেন সেদিন তাঁর চেহারাটা অন্তত ভদ্রলোকের মতো ছিল। কিন্তু মাস দুই কোলকাতার ধর্মশালায় ধর্মশালায় থেকে, স্টেশন প্ল্যাটফর্মে আর পোর্টিকোর তলায় কাটিয়ে অনাহারে-অর্ধাহারে টালিগঞ্জ থেকে বেলগাছিয়া এবং শিয়ালদহ থেকে হাওড়া পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করে তাঁর যা চেহারা হল তা কদর্য, কিম্ভূতকিমাকার, প্রায় অবর্ণনীয়। বড় বড় রুক্ষ চুল, একমুখ গোঁফদাড়ি, ছিন্নমলিন জামা-কাপড়, কপালে মুখে বলি-রেখা, ফোলা-গাল চুপসে গেছে, উঁচু হয়ে উঠেছে দুপাশের হাড় দুটো, অস্থিসার প্রকাণ্ড নাকটা খাঁড়ার মতো আরও উগ্র হয়ে উঠেছে। আরও কণ্টকিত হয়ে উঠেছে শুঁয়োপোকার মতো ভুরু দুটো, চোখের দৃষ্টিতে জ্বলছে হুতাশন।

একটি লক্ষ্য স্থির রেখেই সুখপুর থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি,—যেমন করে হোক কোলকাতার কদর্যতা থেকে রক্ষা করতে হবে শিল্পী বনস্পতি মিশ্রকে। কিন্তু এই 'যেমন করে হোক'টা কেমন করে হবে, আগে থাকতে সে সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোনও পন্থা ঠিক করেননি তিনি, ঠিক করা সম্ভবও ছিল না তাঁর পক্ষে। এ-ও তিনি তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন যে কলিকাতা নামক বিরাট শহরটি পাশ্চাত্য সভ্যতার সেই বিরাট নরক-কুণ্ড, যেখানে সৎপথে থেকে কোনো সচ্চরিত্র লোক সসম্মানে জীবিকা অর্জন করতে পারে না, যেখানে সদ্‌গুণের চেয়ে বদ্‌গুণেরই কদর বেশি, যেখানে গুণ্ডামি দিয়ে রাজনীতি চালাতে হয়, ভণ্ডামি দিয়ে ধর্ম, যেখানে শিক্ষকেরা ছাত্রদের ভয়ে ভীত, যেখানে তাঁরা নোট বেচে সকলের পায়ে তেল দিয়ে সভয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, যেখানে সাহিত্যিকরা পর্যন্ত হয় মতলববাজ ব্যবসাদার না হয় ভিখারি, শুধু অন্নের ভিখারি নয় সম্মানেরও ভিখারি, যেখানে ফুটপাথে লোক শুকিয়ে মারা

যায় তিলে তিলে, কেউ ফিরে দেখে না পর্যন্ত, তারই পাশ দিয়ে মোটরের সারি চলে, সামনেই সিনেমা হয় থিয়েটার হয় আলো জ্বালিয়ে বাজনা বাজিয়ে, যেখানে গণিকারা ভদ্রমহিলা হয়েছে এবং ভদ্রমহিলারা গণিকা হবার চেষ্টা করছে, যেখানে অবিচার আর অন্যায়ের নূতন নামকরণ হয়েছে গণতন্ত্র স্বাধীনতা—এসবই তিনি জানতেন, কিন্তু তবু তিনি এসেছিলেন, কারণ না এসে উপায় ছিল না। শিল্পী বনস্পতি মিশ্রকে যখন বাধ্য হয়ে কোলকাতায় আসতে হয়েছে, তিনি দূরে সরে থাকবেন কি করে। তিনি পণ করে বেরিয়েছেন এই নরককুণ্ডেই তিনি যেমন করে হোক রক্ষা করবেন বনস্পতিকে। বর্ণনার হস্টেলের ঠিকানা তিনি জানতেন, তিনি স্থির করেছিলেন কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই বর্ণনার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবেন। একটা জিনিস নিঃসংশয়ে তিনি বুঝেছিলেন যে বনস্পতিকে আলাদা একটা পাকা বাড়িতে স্থানান্তরিত না করতে পারলে তাঁকে রক্ষা করতে পাবা যাবে না। কিন্তু আলাদা একটা পাকা বাড়ি মানেই টাকা, অনেক টাকা, আর সে টাকা তাঁকেই রোজগার করতে হবে। যেমন করে হোক করতে হবে।

সামান্য কিছু টাকা ছিল তাঁর হাতে, তাই সম্বল করেই তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন। আগেকার তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সম্ভবত ভবভূতির মতো একটা ক্ষীণ আশা ছিল তাঁর মনে—কাল নিরবধি এবং পৃথ্বীও বিপুলা, হয়তো সমান-ধর্মা কোনও লোকের দেখা মিলবে এবং সে হয়তো তাঁর মনের কথা বুঝবে। তিনি প্রথমে এসে উঠলেন এক ধর্মশালায়। সেখানে তিনি রাত্রে শুতেন খালি, তাও বারান্দার এক কোণে। তাঁর আসল কাজ হল ফ্রি রিডিংরুমে গিয়ে খবরের কাগজগুলো থেকে কর্মখালির বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দরখাস্ত কবা আর আপিসে-আপিসে দোকানে-দোকানে কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়ানো। খেতেন চা আর ছাতু, তাতেও পাঁচ-ছ'আনা লেগে যেত। যদিও তিনি বারান্দার এক কোণে শুয়ে থাকতেন, তবু এক ধর্মশালায় বেশি দিন থাকতে দিত না তাঁকে। আর এক ধর্মশালায়, কিম্বা কোনো বড় বাড়ির পোর্টিকোর তলায় তখন আশ্রয় নিতে হত। এত মিতব্যয়িতা সত্ত্বেও কিছুদিন পরে তাঁর সম্বল ফুরিয়ে গেল। তখন ফিরে গেলেন তিনি তাঁর গ্রামে, সেখানে বাস্তুভিটা আর সামান্য জমি যা ছিল তা বিক্রি করে আবার ফিরে এলেন কোলকাতায়, আবার শুরু করলেন কাজ খুঁজতে।

এ যেন নতুন রকম এক অদ্ভুত তপস্যা।

সত্যিকার তপস্যা কখনও নিষ্ফল হয় না। সমান-ধর্মা লোকের নাগাল পেলেন তিনি অবশেষে। নবনী রায়ের দেওয়া বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল তাঁর।

দুদিন বিজ্ঞাপন দেওয়ার ফলে নবনী রায় সবসুদ্ধ দুশ তেষট্টিখানা দরখাস্ত পেয়েছিল। অধিকাংশই ম্যাট্রিকুলেশন পাশ, কিছু আই-এ, আই-এস-সি ছিল, গ্র্যাজুয়েট ছিল কুড়িজন এবং এম-এ পাশ চারজন। নবনী ঠিক করল প্রথমে এম-এ পাশ প্রার্থীদের সঙ্গেই দেখা করবে।

প্রহ্লাদ এসে খবর দিলে, "একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কিন্তু লোকটাকে পাগল বলে মনে হচ্ছে, নিয়ে আসব উপরে?"

"পাগল? কি করে বুঝলি?"

"চেহারাটা দেখে ওই রকমই লাগছে।"

"আচ্ছা, নিয়ে আয়।"

ভূষণ চক্রবর্তীর চেহারা দেখে নবনীরও সন্দেহ হল।

"আপনি কি চান?"

"চাকরি। আপনি আমাকে আজ দেখা করবার জন্যে ডেকেছিলেন, তাই এসেছি।"

নবনী ডায়েরী উল্টে দেখল।

"ও, আপনিই ভূষণ চক্রবর্তী? আসুন, বসুন।"

ভূষণ চক্রবর্তীকে দেখে হঠাৎ ভাল লেগে গেল নবনীর, তাঁর অদ্ভুত খাপছাড়া চেহারার জন্যেই ভাল লেগে গেল। এর আগের দিন সাহেবি পোশাক-পরা ছিমছাম ক্লিন-শেভড্ যে ছোকরাটি এসেছিল তাকে তত ভাল লাগেনি। মানে, তাক্ লাগেনি। মনে হয়েছিল এ যুগের গতানুগতিকতার ঐক্যতানে সুর মিলিয়েছে ছেলেটি, গড্ডালিকা-প্রবাহের বৈশিষ্ট্যহীন মেষ একটি। ভূষণ চক্রবর্তীকে দেখে নবনী চমৎকৃত হয়ে গেল, এ যুগের বিরুদ্ধে মূর্ত একটা প্রতিবাদ যেন, অথচ বাংলা ইংরেজি দুটো বিষয়েই এম-এ ডিগ্রী আছে!

ভূষণ চক্রবর্তী চেয়ারে বসেই জিগ্যেস করলেন, "আপনার আপিস আছে? কেরানির কাজ করতে হবে সেখানে?"

"আপিস নেই, আমার পুরোনো কিছু কাগজপত্তর আছে, সেগুলোতে উই ধরেছে, আমি সেগুলো টুকিয়ে রাখতে চাই নতুন খাতায় পরিষ্কার করে।"

"কত কাগজ আছে আপনার? টুকতে কতদিন আন্দাজ লাগবে?"

"মাস তিন চার লাগা উচিত।"

"তারপর আমার চাকরি শেষ হয়ে যাবে?"

আগের দিন যে ছিমছাম যুবকটি এসেছিল তাকে নবনী বলেছিল 'যাবে', কিন্তু ভূষণ চক্রবর্তীর মুখের দিকে চেয়ে সে কথা আর বলতে পারল না। তার মনে হল একাধিক বজ্রাঘাতে বিধ্বস্ত এই মহীরুহ আর একটা বজ্রাঘাতের জন্য যেন প্রস্তুত হচ্ছে। আর একটা বজ্রাঘাত হয়তো সে সহ্য করতেও পারবে, কিন্তু বজ্রটা হানতে ইচ্ছা হল না নবনীর।

"না, চাকরি শেষ হবে কেন। নানারকম খবর সংগ্রহ করার বাতিকই যে আছে আমার, সেগুলো আপনি যদি সাজিয়ে পরিচ্ছন্ন করে বরাবর টুকে দেন তাহলে বরাবরই কাজ থাকবে আপনার।"

"রোজ কতক্ষণ করে কাজ করতে হবে, মাইনে কত দেবেন?"

"আপনিই সেটা বলুন। কাজ আপনার মরজি মতন করবেন। কারণ তাড়া তো কিছু নেই। কাজটা সুন্দর করে করতে হবে কেবল। কড়াকড়ি নিয়ম বেঁধে যে তা করা যায় না, তা আমি জানি। মাইনে কি রকম চান?"

"মাইনে আমি চাই না, কি চাই সেটা বলছি—।"

বলবার আগে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ভূষণ চক্রবর্তী, যা বলবেন তার হাস্যকর দিকটা তাঁর কাছেও ক্ষণকালের জন্য প্রকট হয়ে উঠল।

"কি বলুন—"

"একটা ভাল বড় বাড়ি আমি ভাড়া করতে চাই। তার যা ভাড়া লাগে সেইটে আপনি দিয়ে দেবেন। আর আমাকে নগদ গোটা তিরিশেক টাকা দিলেই চলবে, পঁচিশ টাকা হলেও চলবে।"

এইবার নবনী রায়েরও মনে হল লোকটি সত্যই বোধহয় পাগল।

"বড় বাড়ি চান? খুব বড় পরিবার বুঝি আপনার?"

"আমার পরিবার নেই, কেউ নেই। আমি বাড়িটা চাই শিল্পী বনস্পতি মিশ্রের জন্য।"

"বনস্পতি মিশ্র?"

একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যেন স্পর্শ করে গেল নবনীকে! বনস্পতি? এই অদ্ভুত নামটা তো সে শুনেছিল সেই জ্যোতিষীর কাছে।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তাঁর বাড়িভাড়া আপনি দেবেন কেন? কে হন তিনি আপনার?"

"রক্তের সম্পর্ক নেই, কিন্তু তিনিই আমার সব। এই সর্বনাশা যুগের করাল কবল থেকে তাঁকে বাঁচাব এই আমার পণ, প্রাণ পণ করেছি এই জন্যে, এ পণ রক্ষা করবার জন্যে আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি দু'মাস থেকে। আমি—"

হঠাৎ রুদ্ধবাক হয়ে গেলেন ভূষণ চক্রবর্তী! টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল তাঁর চোখ থেকে।

নবনী রায়ও রুদ্ধবাক হয়ে গিয়েছিল। ভাবছিল এ কি অদ্ভুত যোগাযোগ! আর একটু ভাল করে জানবার জন্যে সে জিগ্যেস করল, "শিল্পী বনস্পতির নাম তো শুনিনি কখনও"—

গর্জন করে উঠলেন ভূষণ চক্রবর্তী।

"বাজারে নাম জাহির করতে হলে নিজেকে যতটা নিচু করতে হয় বনস্পতি ততটা নিচু হতে পারেন না। সত্যিই বনস্পতি তিনি, আকাশচুম্বী তাঁর শির, সে শির মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেব না আমি। প্রচণ্ড একটা ঝড় এসেছে তা ঠিক, সে ঝড় তাঁর গায়ে আমি লাগতে দেব না। তাই পাগলের মতো একাই আমি তার বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছি। হয়তো আমি পারব না, হয়তো বনস্পতির মৃত্যু হবে, হয়তো সমূলে উৎপাটিত হয়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে সে, সঙ্গে সঙ্গে আমিও পড়ব, আমার প্রাণ থাকতে আমি মাথা নোয়াতে দেব না তাঁকে—"

"কোথা থাকেন তিনি?"

"আগে সুখপুরে থাকতেন, সুখের সংসার ছিল তাঁদের, কিন্তু গঙ্গার ভাঙনে ভেঙে গেল সব, ভেসে গেল। গঙ্গা দেবী নয়, রাক্ষসী। এখন ওঁরা কোলকাতার এক এঁদো গলিতে এসে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করছেন। আমি তাঁকে আর তাঁর মেয়ে বর্ণনাকে সেখান থেকে উদ্ধার করতে চাই।

নিঃসংশয় হল নবনী রায়।

"বেশ, আমি আপনাকে সাহায্য করব। ভাল বাড়ি দেখুন আপনি, যা ভাড়া লাগে আমি দেব। কিন্তু একটা শর্তে।"

"কি শর্তে বলুন।"

"আমি যে বাড়ির ভাড়াটা দিচ্ছি, একথা তৃতীয় ব্যক্তি যেন জানতে না পারে। বাড়ি খুঁজুন আপনি। বনস্পতি মিশ্রের সম্বন্ধে আরও জানতে কৌতূহল হচ্ছে, আপত্তি যদি না থাকে, তাহলে তাঁর ইতিহাসটা বলুন—"

ভূষণ চক্রবর্তী গোড়া থেকে সব বলতে লাগলেন।

উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল নবনী রায়। শুনতে শুনতে আর একটা কথাও তার মনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। শুধু বনস্পতি নয়, বর্ণনার জন্যেও প্রাণ কাঁদছে ভূষণ চক্রবর্তীর।

।। পাঁচ ।।

এইখানে একটা কথা বলে নিতে চাই। এই কাহিনীর ঘটনাগুলো আমি পর-পর যে ভাবে বর্ণনা করে যাচ্ছি তাতে হয়তো মনে হবে যে ওগুলোর মধ্যে বুঝি কোনো সময়ের ব্যবধান ছিল না। সময়ের ব্যবধান যথেষ্ট ছিল, কিন্তু কোন্ ঘটনার কতদিন পরে আর একটা ঘটনা ঘটেছে তা আমার ঠিক মনে নেই। বর্ণনারও নেই। অনেকদিন পরে অনেকদূর থেকে ওগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করে ওদের যে পাশাপাশি-ঘেঁষাঘেঁষি রূপ আমরা দেখেছি সেটা ওদের সত্য রূপ নয়, ওদের মধ্যে অনেক ফাঁক, অনেক সময়ের ব্যবধান আছে। আকাশের নক্ষত্রদেরও আমরা পাশাপাশি দেখি, কিন্তু আসলে একটা নক্ষত্র আর একটা নক্ষত্র থেকে বহু কোটি যোজন দূরে থাকে। এ-ও অনেকটা তেমনি।

হেমন্তকুমার আর তার ছেলে-মেয়েরা রোজগার করতে শুরু করল সবাই। চারটি মেয়েই বাহাল হয়ে গেল ঝি-গিরিতে। এর চেয়ে ভাল কাজ তাদের জুটল না, জোটা সম্ভবও ছিল না। লাঠি খাবার ফেরি করতে লাগল, সোঁটা বাহাল হয়ে গেল এক কবিরাজের দোকানে, সেখানে ওষুধ বাটা, গুঁড়ো করা, বাছা—এই সব কাজ করতে হত তাকে। বল্লম অনিশ্চিতভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরত, কিন্তু রোজই রোজগার করত কিছু কিছু, বলত মুটেগিরি করি। হেমন্তকুমারও গেরুয়া-কাপড় আর বুলির জোরে রোজগার করত মন্দ নয়। সবাই মিলে গড়ে প্রায় সাত আট টাকা রোজগার করত প্রথম-প্রথম। আর্থিক সমস্যা অনেকটা সমাধান হল বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে আর এক সমস্যা দেখা দিল।

হেমন্তকুমার সকালে বেরিয়ে যেত, খাবার জন্য ফিরে আসত দুপুরে। খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম করে চারটে নাগাদ আবার বেরুত, ফিরে আসত রাত নটার পর।

একদিন সে দুপুরে ফিরে এসে দেখল রান্না হয়নি; আসন্ন-প্রসবা সত্যবতী আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে। ঘরের চারদিকে ভাঙা কাপ ডিশ ছড়ানো।

"কি ব্যাপার, অমন করে শুয়ে আছ যে? শরীর খারাপ নাকি?"

সত্যবতী নিরুত্তর।

"ঘুমুচ্ছ নাকি?"

কোনও উত্তর নেই। মড়ার মতো শুয়ে আছে সত্যবতী।

"হল কি তোমার?"

গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা দিলে হেমন্তকুমার বার দুই। তবু উত্তর নেই।

"আরে ব্যাপার কি—?"

ন'বছরের ছেলে সড়কি বাচস্পতির ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, "মায়ের অসুখ করেছে। ডাক্তার এসেছিল ইন্‌জেকশন দিয়ে গেছে।"

"তাই নাকি?"

তারপর সীমন্তিনী এল, তার কাছ থেকে সব বোঝা গেল। সকালে হেমন্তকুমার আর ছেলে-মেয়েরা কাজে বেরিয়ে যাবার পর থেকেই সত্যবতীর এই ভাবান্তর।

"প্রথমে বিড়বিড় করে কি বলছিল। তারপর চেঁচিয়ে উঠে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল,

কাপ ডিশগুলো আছড়াতে লাগল মেঝের উপর। শেষকালে আগুনের একটা নুড়ো জ্বেলে ওই পার্টিশনটায় আগুন ধরিয়ে দিতে গিয়েছিল, ভাগ্যে বর্ণনা দেখে ফেললে, তা নাহলে সর্বনাশ হয়ে যেত। উনি বললেন, এ তো পাগলামির লক্ষণ মনে হচ্ছে, ডাক্তার ডাকতে পাঠাও। বর্ণনা কলেজ যাচ্ছিল, সে বললে আমি এখুনি ডাক্তার পাঠিয়ে দিচ্ছি। বর্ণনা চলে যাবার পর আরও বাড়াবাড়ি হল। নিজের পেটে গুম গুম করে কিল মারতে লাগল বৌদি। খন্তাটার চুলের ঝুটি ধরে মুখ ঘষতে লাগল মেঝেতে, বেচারির কপালের ছাল উঠে গেছে খানিকটা। সে এক কাণ্ড! উনি, ঠাকুরপো, সবাই শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন, সরু ওকে ধরতে গিয়েছিল, এক চড় মেরে সরিয়ে দিলে তাকে। বাড়িতে বড় ছেলে-মেয়ে কেউ নেই, শেষকালে বাড়িওলাকে ডাকতে হল। তিনি আরও দু'তিনজনকে ডেকে এনে ধরে বেঁধে ফেললেন ওকে। সে কী চিৎকার! একটু পরে ডাক্তার এলেন, তিনি এসে ইন্‌জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে গেছেন। তোমাকে বলেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। এই তাঁর ঠিকানা—"

কার্ডখানার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল হেমন্তকুমার।

সীমন্তিনী বলল, "তোমার খাবার আমি করে রেখেছি। খাবে চল, ছেলেমেয়েদেরও খাইয়ে দিয়েছি। বৌদি এখন ঘুমুক। ঘুম ভাঙলে একটু দুধ খাইয়ে দেব। চল—"

হেমন্তকুমাররা সপরিবারে রোজগার আরম্ভ করেই আলাদা রান্নার ব্যবস্থা করেছিল। একটা অজুহাতও ছিল তাদের। তারা পছন্দ করত ঝাল-মসলা-পেঁয়াজ-রসুন দেওয়া গরগরে রান্না। বনস্পতি-বাচস্পতির সহ্য হত না ওসব। তাই বর্ণনা একটা ইক্‌মিক কুকার আর স্টোভ কিনে আলাদা ব্যবস্থা করেছিল নিজেদের।

খাওয়া-দাওয়ার পর হেমন্তকুমার ডাক্তারের কাছে গেলেন।

ডাক্তার চক্রবর্তী বর্ণনাদের হস্টেলের ডাক্তার। তিনি হেমন্তকুমারের গৈরিক বাস দেখে আশ্চর্য হলেন একটু।

"বর্ণনা আমাকে পাঠিয়েছিল কি আপনারই স্ত্রীকে দেখতে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ওর কি হয়েছে বলুন তো?"

"মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।"

"এর কারণটা কি?"

"কারণ আপনি।"

"আমি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। সন্তানের বোঝা আপনার স্ত্রী আর বইতে পারছেন না। কিন্তু সেদিকে আপনার লক্ষ্য নেই, আপনি বোঝা চাপিয়েই যাচ্ছেন—"

"দেহের ক্ষুধা তৃষ্ণা কি করে রোধ করি বলুন।"

মৃদু হেসে ডাক্তার চক্রবর্তী বললেন, "আপনি গেরুয়া পরেছেন, আপনার মুখে ওকথা সাজে না।"

"ওইখানে ভুল করলেন সার। এটা আমার ব্যবসার ইউনিফর্ম, আপিসের পোশাক। পুলিশের, রেল কর্মচারীদের, ট্রাম কন্ডাকটারদের যেমন থাকে, এ-ও তেমনি। আমি ঊর্ধ্ব-রেতা সন্ন্যাসী নই, হতেও চাই না। এ বিষয়ে আমার নিজস্ব মতামত আছে—"

"তা থাক, কিন্তু আপনার ওই এনিমিক স্ত্রীর যদি এইভাবে ছেলেপিলে হতে থাকে তাহলে উনি আর বাঁচবেন না, যদিও বাঁচেন, দেহে মনে পঙ্গু হয়ে থাকবেন।"

"কিন্তু এর উপায়টা কি বলুন। আপনারা সংযম-সংযম করেন, কিন্তু সংযম করলেই কি কিছু হবে? বছরে যদি একদিনও সংযমের বাঁধ ভাঙে, ব্যস, তাহলেই তো হয়ে গেল। তাছাড়া সংযম করবই বা কেন। মনুতে কি আছে তা জানেন?"

"না জানি না। তবে এইটে জানি যে জানোয়ারের মতো এই ভাবে যদি বংশবৃদ্ধি করতে থাকেন, অসীম দুর্গতি ভোগ করতে হবে। আপনার সঙ্গে তর্ক করবার সময় নেই আমার। আপনি বরং ডাক্তার সামন্তের কাছে যান, তার একটা বার্থ-কন্ট্রোল ক্লিনিক আছে। সে আপনার মনু টনু মন দিয়ে শুনবে, আপনার সঙ্গে তর্ক করতেও পারবে, ব্যবস্থাও করে দিতে পারবে। তাকে আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি।"

তিনি প্যাড টেনে চিঠি লিখতে লাগলেন। তারপর চিঠিটা খামে পুরে তার উপর ঠিকানা লিখে দিয়ে দিলেন হেমন্তকুমারকে।

"এখন আমার স্ত্রীর কি চিকিৎসা চলবে?"

"আমি বর্ণনাকে একটা প্রেসকৃপশান লিখে দিয়েছি। ওই ওযুধটাই ছঘণ্টা অন্তর চলুক আপাতত। আজ আর ইন্‌জেকশন দেবার দরকার নেই, দরকার হলে পরে দেখা যাবে।"

"আপনার ফী-টা—"

ডাক্তার চক্রবর্তী হেসে বললেন, "আপনি তো আমাকে কল্‌ দেননি, কল্‌ দিয়েছিল বর্ণনা। ফী-য়ের কথা তার সঙ্গে হয়ে গেছে। আপনি যত শিগ্‌গির পারেন সামন্তর সঙ্গে দেখা করুন, সে আপনার কাছে ফী চাইবে না, লিখে দিয়েছি।"

"কিন্তু আমি বিনা ফী-য়ে কাউকে দিয়ে কিছু করাতে চাই না।"

"বেশ তাহলে দেবেন। আচ্ছা, আসুন এখন, নমস্কার।"

ডাক্তার চক্রবর্তী ঘণ্টা টিপলেন।

আর একটি রোগী এসে হাজির হল দ্বারপ্রান্তে। হেমন্তকুমারকে উঠে পড়তে হল চেয়ার ছেড়ে।

।। ছয় ।।

বর্ণনার আশা হয়েছিল হেমন্তকুমার সপরিবারে উপার্জন করে যখন নিজেদের খরচ চালিয়ে নিতে পারছে তখন এইবার একটু সচ্ছলতার মুখ দেখা যাবে বোধহয়। সুখময়বাবু ঠিক নিয়মিতভাবে মাইনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, বাচস্পতিরও ছাত্রী জুটেছিল একটি। তারই এক বন্ধু, সুদেষ্ণা। সুদেষ্ণা তার চেয়ে বছরখানেকের সিনিয়ার। এম.এ পাশ করে পাণিনি ব্যাকরণ সম্বন্ধে গবেষণা করছে। বাচস্পতি সংস্কৃতে পণ্ডিত শুনে আলাপ করতে এসেছিল। আলাপ করে প্রথম দিনই মুগ্ধ হয়েছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে। তিনি তাকে গবেষণার একটা নূতন পথও নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "দেখ মা, পাণিনি শুধু ব্যাকরণ নয়, পাণিনি আর্য সংস্কৃতির প্রতীক। ভাল করে পাণিনি পড়লে বোঝা যায় আর্য সভ্যতার চেহারা কি রকম ছিল, আদর্শ কি রকম ছিল। তাই পাণিনি আগে বারো বছর ধরে পড়তে হত, শুধু একটা ব্যাকরণ

হলে অতদিন লাগবার কথা নয়। ভট্টি যেমন শুধু কাব্য নয় ব্যাকরণও, পাণিনিও তেমনি শুধু ব্যাকরণ নয়, ওর মধ্যে অনেক কিছু আছে। তুমি তোমার গবেষণাটা যদি এই ধারায় চালাও, তাহলে এ যুগের পক্ষে একটা নতুন জিনিস হবে। আমার যতটুকু বিদ্যে আছে তা দিয়ে তোমাকে সাহায্য করব নিশ্চয়ই।" সুদেষ্ণা সপ্তাহে তিন দিন তাঁর কাছে আসত, মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দিত।

বনস্পতিরই রোজগারের কোনও রাস্তা আবিষ্কৃত হয়নি তখনও পর্যন্ত। যদিও বর্ণনা ভাবছিল তাঁর ছবিগুলো একে একে বিক্রি করে ফেলতে পারলে ঘরটাও খালি হয়ে যায় আর কিছু টাকাও আসে—কিন্তু কথাটা সে পাড়তে পারেনি বনস্পতির কাছে ভালোভাবে। বনস্পতি যদিও তাকে বলেছিল ছবি বিক্রি করতে, কিন্তু সেটা তার মনের কথা যে নয় তা সে বুঝেছিল। এখানে এসে বাবা মা দুজনেরই যেন ছবিগুলোর প্রতি মমতা আরও বেড়ে গেছে তার মনে হচ্ছিল, যদিও নূতন কোনো ছবি আর আঁকা হয়নি, কিন্তু ছবির জগতেই যেন বাস করছে ওরা দুজনে। প্রতিটি ছবিকে রোজ ঝাড়ছে, মুছছে, পূর্বদিকের যে জানলাটা দিয়ে আলো আসে তাব সামনে এক-একদিন এক-একটি ছবি রেখে নূতন করে যেন আলাপ করছে তাদের সঙ্গে। বর্ণনার মাঝে মাঝে মনে হয়, ওই ছবিগুলোই ওদের সন্তান-সন্ততি। ওগুলোর সঙ্গে তার বাবা-মার প্রাণের যোগ যত গভীর তারও সঙ্গে বোধহয় ততটা নয়। ইদানীং ওই পুরোনো ছবিগুলো নাড়া-চাড়া করেই সময় কাটছে তাঁদের। এখানে এসেই বনস্পতি একটা নূতন ছবিতে হাত দিয়েছিল, কিন্তু সেটার কাজ অগ্রসর হল না। ক্যানভাস্‌টার সামনে তুলি নিয়ে চুপ করে বসে-বসেই সময় কেটে গেল অনেকক্ষণ, দিনের পর দিন কাটল, ছবি হল না।

"আচ্ছা, ভূষণের কোনও খবর পাওয়া গেল না? সে এখানকার ঠিকানা জানে তো?"

বনস্পতি মাঝে মাঝে খোঁজ করে। তার বোধহয় মনে হয় ভূষণ কাছাকাছি থাকলে তার ছবি আঁকবার প্রেরণা ফিরে আসবে আবার।

"ভূষণ কাকা এখানকার ঠিকানা জানেন না, আমার হস্টেলের ঠিকানা জানেন, হস্টেলে তো আমি রোজই যাই, তিনি এলে খবর পাব নিশ্চয়।"

"হয়তো তোকে দেখতে না পেয়ে ফিরে গেছে—"

"না দারোয়ানকে বলা আছে আমার খোঁজে কেউ এলে যেন তার নাম ঠিকানা লিখে রাখে, উনি আসেননি এখনও।"

বনস্পতি প্রতিবাদ করে না, কিন্তু কথাটা কেমন যেন বিশ্বাস হয় না তার। ভূষণ এতদিন ছেড়ে থাকবে তাকে?

ভূষণ চক্রবর্তী বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন।

নবনী রায়ের বাড়িতে ঘণ্টা দুই কাজ করে তিনি বাড়ির খোঁজে বেরিয়ে পড়তেন। মনোমত বাড়ি কিছুতেই পাচ্ছিলেন না। কোলকাতা শহরে টাকা ফেললেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি পাওয়া যায় না। নবনী রায়ও বাড়ির চেষ্টায় ছিল। বনস্পতিকে একটা ভাল পরিবেশে স্থাপন করবার আগ্রহ তারও কম ছিল না। কিন্তু কিছুতেই পছন্দমতো বাড়ি পাওয়া যাচ্ছিল না।

এইভাবেই চলছিল।

এমন সময় বর্ণনার একদিন মনে হল ভাগ্যদেবতা সহসা বুঝি প্রসন্ন হলেন। অঞ্জনা দেবীকে

কাফির একটা গৎ শেখাচ্ছিল সে, পাশের ঘরেই সুখময়বাবু ছিলেন, এমন সময় নীচে থেকে চাকর হীরু কাগজে মোড়া একটি বড় প্যাকেট নিয়ে এল।

অঞ্জনা বললেন, "বাবু ওঘরে আছেন, ওখানেই নিয়ে যাও।"

হীরু চলে গেল। বর্ণনা জিজ্ঞেস করলে, "কি ওটা, ছবি, না আয়না?"

"ছবি। ওঁর নানারকম ছবি কেনার বাতিক আছে যে।"

কথাটা বলেই মুখ ফিরিয়ে হাসলেন অঞ্জনা, মুখে আঁচল দিয়ে। বর্ণনা ঠিক বুঝতে পারল না এতে হাসির কি আছে।

"ও, তাতো জানতুম না। জানলে আমার বাবার ছবিগুলো দেখাতাম ওঁকে। কিন্তু কই, আপনাদের ঘরে তো ছবি দেখি না তেমন। ছবি কিনে উনি রাখেন কোথা?"

"আলমারিতে।"

"ছবি তো দেখবার জন্যে। আলমারিতে পুরে রেখে লাভ কি?"

"সবাইকে দেখান না। আপনাকে হয়তো দেখাতে পারেন একদিন।"

এমন সময় সুখময়বাবু ঘরে এসে ঢুকলেন।

"কাফির গৎটা বন্ধ হয়ে গেল কেন? বেশ লাগছিল, চমৎকার হাত আপনার।"

"উনি তোমার ছবিগুলো দেখতে চাইছেন।"

অঞ্জনা দেবী মুচকি হেসে চোখ-মুখের এমন একটা ভঙ্গি করলেন যে অদ্ভুত মনে হল বর্ণনার।

"ছবির সম্বন্ধে আপনার কৌতূহল আছে নাকি?"

"আছে বইকি, আমার বাবা যে একজন আর্টিস্ট।"

"সত্যি? একথা তো আগে বলেননি। আপনার বাবার নাম কি?"

"বনস্পতি মিশ্র। তবে তাঁর নাম আপনারা কেউ শোনেননি। দেশের বাড়িতেই তো বরাবর কাটিয়েছেন, আর ছবি-ছাপানোর দিকে তার ঝোঁক ছিল না কখনও। বিস্তর ছবি জমে আছে বাড়িতে। ভাবছি তেমন খরিদ্দার যদি পাই, বেচে দেব।"

"আমিই কিনতে পারি। ছবিগুলো দেখান আমাকে।"

"বেশ দেখাব। কাল নিয়ে আসব একখানা। কোনও বন্ধুকে দেখাতে যাচ্ছি বলে নিয়ে আসতে হবে। বাবা হয়তো বিক্রি করতে রাজি হবেন না। তবে আপনার যদি পছন্দ হয় তাঁকে রাজি করাতে পারব।"

"বেশ কাল নিয়ে আসবেন। আর আমাকে আপনি বন্ধু বলেই মনে করতে পারেন।"

মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন অঞ্জনা দেবী। বর্ণনার মনে হয় যখন তখন হাসি মেয়েটির রোগ নাকি!

তার পরদিন 'মহাকালী' ছবিখানাই নিয়ে এল সে। বাবা-মার চোখের দৃষ্টি কিন্তু এড়াতে পারেনি।

শঙ্কিত কণ্ঠে বনস্পতি জিজ্ঞেস করল, "কোথা নিয়ে যাচ্ছিস ওটা?"

"আমার এক বন্ধুকে দেখাব।"

"দাঁড়া তাহলে, আমি ঠিক করে বেঁধে দি কাগজ দিয়ে। দেখিস ছবির মাঝখানে যেন ঘষা না লাগে।"

বনস্পতি নিজেব হাতে নিপুণভাবে প্যাক করে দিলেন ছবিখানা।

ছবিখানা দেখে যে সুখময়বাবু এমনভাবে মুগ্ধ হয়ে যাবেন তা বর্ণনা কল্পনা করেনি।...

"বা বা বা বাঃ—এ তো অদ্ভুত ভাল ছবি। ইনি তো একজন জিনিয়াস দেখছি, বিরাট জিনিয়াস!"

ম্লান হেসে বর্ণনা বললে, "অনেকে একথা বলেছে। কিন্তু আত্মপ্রচার আর আত্মবিক্রয় না করলে জিনিয়াসদের কদর হয় না এদেশে। নিজের ঢোল নিজেই পেটাতে হয় বাবা সেটা করতে রাজি নন। তাই খোলার ঘরে বাস করে অতি কষ্টে দিন কাটাতে হচ্ছে তাঁকে—"

"বলেন কি! খোলার ঘরে থাকেন আপনারা?"

"মাত্র দু শ' টাকা আয় যে। জ্যাঠামশাই সম্প্রতি একটা পঞ্চাশ টাকার টিউশনি পেয়েছেন। মাত্র আড়াই শ' টাকা আয়ে ভাল বাড়িতে থাকা যায় না। দেশে আমাদের পাকা বাড়ি জমি সব ছিল। কিন্তু গঙ্গায় সব কেটে গেছে। এখানে খোলার ঘরে আছি। বাবার ছবিগুলোর জন্যেই আলাদা একটা ঘর ভাড়া করতে হয়েছে।"

"সেটাও খোলার ঘর?"

"হ্যাঁ, পাকাঘর ভাড়া করবার পয়সা এখনও রোজগার করতে পারছি কই!"

"আপনার যা গুণ, আপনার পয়সা রোজগারের ভাবনা কি! ছবিগুলোর জন্য অন্তত একটা পাকা ঘর ভাড়া করুন, তা নাহলে ওগুলো নষ্ট হয়ে যাবে।"

"কাছাকাছি তেমন পাকা ঘরও নেই। আর বাবা-মা দুজনেই ছবিঅন্ত প্রাণ। ছবিগুলো চোখের আড়াল করতে চান না। আমি চেষ্টা করছি ওঁদের বুঝিয়ে সুজিয়ে ছবিগুলো আস্তে আস্তে বিক্রি করে দেব। আপনি কি এটা কিনতে চান?"

"নিশ্চয়ই—"

"কি রকম দাম দেবেন?"

স্মিতমুখে চুপ করে রইলেন সুখময়বাবু।

তারপর বললেন, "এসব অমূল্য জিনিস, টাকা দিয়ে এসবের দাম দেওয়া যায় না। আপনি যা বলবেন তাই দেবার চেষ্টা করব, অবশ্য যদি সামর্থ্যে কুলোয়।"

"আমি কিছুই বলব না।"

সুখময়বাবু চেক বই বার করে এক হাজার টাকার চেক লিখে দিলেন একটা। বর্ণনা এতটা প্রত্যাশা করেনি। তার দেহে মনে পুলক শিহরন বয়ে গেল। তবু বললে, "আপনি চেকটা এখন রাখুন। বাবা যদি বিক্রি করতে রাজি হন তাহলে ওটা নিয়ে যাব।"

"না, আপনি চেকটা নিয়ে যান, ছবিটাও নিয়ে যান। আপনার বাবা যদি রাজি হন ছবিটা দিয়ে যাবেন আমাকে।"

একটু ইতস্তত করে বর্ণনা বললে, "আচ্ছা, ছবিটা থাক আপনার কাছে।"

বাড়ি ফিরে এসে বর্ণনা বনস্পতির দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

"একটা কথা বলব, রাগ করবে না তো?"

"কি কথা—"

"আমার বন্ধুর খুব ভাল লেগেছে 'মহাকালী' ছবিটা। সে ওটা রাখতে চাইছে।"

আনন্দে জ্বলজ্বল করে উঠল বনস্পতির চোখ দুটো।

"খুব ভাল লেগেছে? রাখতে চাইছে? তোর মায়ের যদি আপত্তি না থাকে, থাক না হয় ওটা ওর কাছে। তোর খুব বন্ধু বুঝি?"

"হ্যাঁ—। সে কিন্তু অমনি নেবে না, এক হাজার টাকার চেক দিয়েছে একটা।"

"সে কি! বন্ধুর কাছ থেকে দাম নিবি?"

"সে কিন্তু অমনি নেবে না।"

বনস্পতি এ-কথা শুনে একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়ল।

"নেবে না? আমাদের দারিদ্র্যের কথা টের পেয়েছে না কি? আমাদের দুরবস্থার কথা বলেছিস তাকে?"

"বলেছি বইকি। লুকুতে যাব কেন?"

"তাই সে তোর উপহার নিতে চাইছে না। ছবি কেনার ছুতো করে সাহায্য করছে। দাম দেওয়ার ছলে ভিক্ষে দিচ্ছে।"

"বাঃ, তা কেন, ছবি বিক্রি করে সব শিল্পীই দাম নেয়। এটা একটা পেশা তো—"

"তা জানি। কিন্তু আমি তো পেশাদার শিল্পী নই। ছেলেবেলা থেকে নিজের খেয়ালেই ছবি আঁকছি। দাম-টামের কথা তো ভাবিনি কখনও।"

"কিন্তু এবার ভাবতে হবে। এমন কষ্ট করে তুমি আছ, এ আমি দেখতে পারি না।"

হঠাৎ বর্ণনার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল। এ কাঁপার অর্থ কি বনস্পতি জানতেন। শশব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

"আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ, তোর যা খুশি কর।"

বর্ণনাব চোখ দিয়ে সত্যিই টপ টপ করে জল পড়ল। আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকলে সে।

"এই দেখ, দেখ, কি ছেলেমানুষী দেখ। বললুম তো, তোর যা খুশি কর। ছবি বেচে তোর যদি সাশ্রয় হয়, তাই কর।"

এমন সময় সরস্বতী এসে ঘরে ঢুকল। স্নান করতে গিয়েছিল সে।

"কি হয়েছে?"

তারপর সমস্ত শুনে বললে, "ও ছবিখানা কাউকে দেব না। আমি মহাকালী পুজো করব ঠিক করেছি, ওই ছবিখানাই পুজো করব। অন্য ছবি তুমি তোমার বন্ধুকে দিতে পাব।"

পরদিন আর একখানা ছবি নিয়ে গেল বর্ণনা। এটা আরও পছন্দ হল সুখময়বাবুর। শুধু তাই নয়, তিনি বললেন, তাঁর তেতলার ঘরে তিনি খানকতক ছবি এনে রাখতে চান। দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখলে ভালও থাকবে, তাঁর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ক্রেতাও জুটবে।

বললেন, "বেশি ছবি যদি আনেন সেগুলো আলমারিতে রেখে দেবার ব্যবস্থাও করতে পারি। বড় বড় দুটো খালি আলমারিও আছে আমার। আমি আরও দু'একখানা কিনতেও পারি।"

আকাশের চাঁদ হাতে পেলেও বর্ণনা এত খুশি হত না।

কিন্তু এতে বনস্পতি সরস্বতী কেউ রাজি হয়নি প্রথমে। যে ছবিকে তারা কখনও চোখের আড়াল করেনি তা অপরের বাড়িতে নিয়ে যাবে? তারা ঠিক মতো রাখবে কিনা, ঝাড়বে কিনা, এসব নানা কথা মনে হচ্ছিল তাদের। অথচ তারা সোজাসুজি 'না'-ও বলতে পারছিল

না। কারণ এই বেদনাদায়ক সত্যটা ক্রমশ তাদের উপলব্ধি করতে হচ্ছিল যে ছবি বিক্রি না করলে চলবে না। এত টানাটানির মধ্যে বেশি দিন থাকা যাবে না। তবু তারা ইতস্তত করছিল। বর্ণনার জেদাজেদিতে শেষ পর্যন্ত পাঁচখানা ছবি নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া গেল। এ ছবিগুলো দেখেও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন সুখময়বাবু। বললেন, আরও দু'খানা তিনিই নেবেন, বাকি তিনখানার খদ্দেরও যোগাড় করে দেবেন।

এইভাবে কাটল দিন কতক। বর্ণনার কল্পনা স্বপ্নে রঙীন হয়ে উঠল। তার মনে হল সত্যিই যদি বাবার ছবিগুলো বিক্রি হয়ে যায়, তাহলে তো তাদের ছোটোখাটো একটা বাড়িও হয়ে যেতে পারে। তার বান্ধবী আকাশ-পরী এম.এ পাশ করেই নাকি বিলেত যাবে। তারও বিলেত যাওয়ার ইচ্ছে। বাবার এত ছবি, সত্যিই যদি ভাল দামে বিক্রি হয়ে যায়, তাহলে টাকার ভাবনা কি।

কিন্তু স্বপ্নসৌধ-শীর্ষে বজ্রপাত হল একদিন।

বর্ণনার সাহায্যে সেই তেতলার ঘরটিতে ছবি পাঁচখানি টাঙাচ্ছিলেন সুখময়বাবু। টাঙানো হয়ে যাবার পর সুখময়বাবু হঠাৎ বললেন, "বাইরের খদ্দের আসবার আগে আমি আমার ছবি দু'খানা বেছে নিয়ে 'সোল্ড' লিখে দি।"

"বেশ তো নিন। কোন্ দু'খানা নেবেন আপনি?"

সুখময়বাবু ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। দেখবার পর হঠাৎ তিনি বর্ণনার সামনে এসে বললেন, "আমার মতে কোন্ ছবিখানা সবচেয়ে বেশি ভাল জানেন?"

"কোন্‌খানা?"

"এইটে।"—এই বলে মৃদু হেসে তিনি বর্ণনার থুতনিটি নেড়ে দিলেন।

বর্ণনা পেছিয়ে গেল, তারপর আগুন জ্বলে উঠল তার দৃষ্টিতে।

এর মানে!"

খিক্ খিক্ হাসির শব্দ শুনে বর্ণনা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল দালানে দাঁড়িয়ে অঞ্জনা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসছে! হাসছে? নিজের চোখকে বিশ্বাস হল না বর্ণনার। স্বামীর এই ব্যবহার দেখে তার স্ত্রী হাসছে খিক্ খিক্ করে!

নিমেষের মধ্যে ব্যাপারটা বুঝে নিলেন সুখময়বাবু। ঢোঁড়া ভেবে যাকে নিয়ে খেলা করতে গিয়েছিলেন, দেখলেন তা ঢোঁড়া নয়, গোখ্‌রো!

ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "কিছু মনে করবেন না বর্ণনা দেবী, ওটা এমনি রসিকতা করলুম। আমি 'শ্রীরাধা' আর 'রজনী' এই ছবি দুটো নেব। চেকটা এখুনি লিখে দি?"

"না—"

রূঢ় কদর্য সত্যটা সহসা প্রতিভাত হয়ে উঠল তার মনে। সে আর কোনো কথা না বলে নেবে গেল, সোজা নেবে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়াল একেবারে, তারপর হাঁটতে লাগল।

...অনির্দিষ্ট ভাবে হন হন করে খানিকক্ষণ হাঁটবার পর সে একটা পার্কে গিয়ে ঢুকল ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখবার জন্যে। একটা কথা গোড়া থেকেই তার মনে হচ্ছিল, ওখানে আর যাওয়া যাবে না। কিন্তু এই কোলকাতা শহরে তাহলে চলবে কি করে? হঠাৎ

মনে পড়ল সুদেষ্ণা বলেছিল সে বনস্পতিকে ছোটোখাটো আঁকার কাজ যোগাড় করে দিতে পারে। তার এক দাদা বিজ্ঞাপনের এজেন্ট, অনেক আর্টিস্টকে ছবির কাজ দেন। বর্ণনা তখনই উঠে পড়ল।

সুদেষ্ণার দাদা সুবন্ধু সেন বাড়িতেই ছিলেন।

বর্ণনার সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করলেন।

"তিনটে কাজ এখনই দিতে পারি আপনার বাবাকে। একটা ছবি জুতোব কালির বিজ্ঞাপনের জন্য, একটা ছবি দেশলাই বাক্সর জন্য, আর তৃতীয়টা একটা বইয়ের প্রচ্ছদপট। বইটার নাম "মম চিত্তে নিতি নৃত্যে'। ছবি পছন্দ হলে তবে টাকা পাবেন। আমার কাজ ছবি যোগাড় করে আনা, পছন্দ করবেন ব্যবসার মালিকরা।"

"পছন্দ হলে কি রকম টাকা পাওয়া যাবে?"

"ছবি পিছু পঁচিশ টাকা। অনেক আর্টিস্ট ওর চেয়েও কম নেন, কিন্তু আমি আপনাব বাবাকে পঁচিশ টাকাই পাইয়ে দেব। এসব ছবি আঁকতে ওঁর কতক্ষণই বা লাগবে। আসলে আইডিয়াটারই দাম।"

বর্ণনা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। একটু আগেই তার বাবার এক একটা ছবির জন্য হাজার টাকা দিতে চাইছিল একজন, আর ইনি পঁচিশ টাকাও যেন অনুগ্রহ করে দিচ্ছেন। তৎক্ষণাৎ অবশ্য তার মনে হল সুখময়বাবু কি কেবল ছবির জন্যই অত টাকা দিচ্ছিলেন?

"আপনার আপিসটা কোথায়? ছবি-আঁকা হলে কোথায় নিয়ে যাব? এখানেই আনব?"

"এখানে আনতে পারেন, কিন্তু আপিসে যাওয়াই ভাল। আপনার বাবাকেই পাঠিয়ে দেবেন।"

"বাবা এখানকার পথ-ঘাট তেমন চেনেন না। আমিই গিয়ে দিয়ে আসব। আপনার আপিসের ঠিকানাটা দিন।"

ঠিকানাটা নিয়ে চলে এল বর্ণনা, কিন্তু বাড়ি গেল না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। ভাবতে লাগল, বিচার করতে লাগল। একটা কথা বার বার তার মনে হচ্ছিল আর একটা চাকরি পাবার আগে এ চাকরিটা ছাড়বে কিনা। লোকটা যে পাষণ্ড তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে নিজে যদি সংযত থাকে কি করবে ও? জীবন-যুদ্ধে যখন নাবতেই হয়েছে তখন অত স্পর্শকাতর হলে চলবে কেন? এই যে রোজ রাস্তা দিয়ে সে হাঁটে একাধিক পশুর লুব্ধদৃষ্টি কি তার সর্বাঙ্গ লেহন করে না? তাই বলে সে কি রাস্তায় হাঁটা ছেড়ে দেবে, না বোরখা পরে বেরুবে। বাবার ছবিগুলো উদ্ধার করে আনবার জন্যেও তো তার কাছে যাওয়া দরকার। আর সত্যিই যদি সে দু'হাজার টাকা দিয়ে ছবিগুলো কেনে, তাহলে বিক্রিই বা করবে না কেন? ক্রেতার চরিত্র নির্ণয় করে ছবি বেচে না কেউ। যদি চাকরি ছেড়েই দিতে হয় ওই টাকাগুলোই তখন সম্বল হবে...

হঠাৎ তার চিন্তাধারা বিঘ্নিত হল, একটা ট্যাক্সি নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল তার পাশে। আর ট্যাক্সির ভিতর থেকে মিষ্টি সুরে ভেসে এল—"বোর্নিও, বোর্নিও—"

আকাশ-পরীর গলা।

"বোর্নিও, তুই চিত্রাঙ্গদা দেখতে যাসনি?"

"না ভাই যাওয়া হয়নি। কেমন হল?"

"চমৎকার। অনেক লোকের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছি। কোথা যাচ্ছিস?"

"বাড়ি।"

"চল্ তোকে পৌঁছে দি—"

ট্যাক্সিতে উঠল বর্ণনা। তার মনেই ছিল না যে ইউনিভার্সিটির ছেলে-মেয়েরা আজ 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয় করছিল 'এম্পায়ার' থিয়েটারে। আকাশ-পরী 'চিত্রাঙ্গদা' সেজেছিল।

"তুই এত মনমরা হয়ে আছিস কেন বল্ তো?"

ম্লান হেসে বর্ণনা বললো, "এমনি—"

আকাশ-পরী বড়লোকের মেয়ে, কিছুদিন পরে বড়লোকের বউ হবে, হবু স্বামী একজন বড় মিলিটারি অফিসার। যদিও আকাশ-পরী বর্ণনার খুব বন্ধু, তবু নিজের দৈন্যের কথা সে কোনোদিন বলেনি তাকে। বলতে লজ্জা করত। বর্ণনাকে নাবিয়ে দিয়ে আকাশ-পরী চলে গেল। যাবার আগে দু লাইন কবিতা বলে গেল—

"সখি, আবরি রেখ না হিয়া
মরা মনটিরে জিয়াইয়া তোল প্রেমবারি সিঞ্চিয়া—"

কথায় কথায় গান আর কবিতা তৈরি করতে পারত সে।

বর্ণনা বাড়িতে ঢুকে দেখলে বাবা চিন্তিত হয়ে বসে আছে তার অপেক্ষায়।

"এত রাত হল যে তোর?"

মিথ্যে কথা বললে বর্ণনা।

"আজ কলেজে থিয়েটার ছিল। আচ্ছা বাবা, তুমি বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকবে? সামান্য কাজ, অথচ ছবি পিছু পঁচিশ টাকা করে দেবে।"

"কি রকম ছবি?"

"সে কিছুই নয় তোমার পক্ষে। পরে বলব তোমাকে।"

সঙ্গে সঙ্গে বর্ণনা বনস্পতিকে বলতে পারল না যে জুতোর কালি আর দেশলাই বাক্সের জন্য ছবি আঁকতে হবে।

"মা কোথা?"

"হিমুদার ওখানে গেছে। ওদিকে আবার এক কাণ্ড হয়েছে।"

"আবার কি হল?"

"বন্দুক কিরিচ কেউ ফেরোন এখনও। বৌদি আরও ক্ষেপে গেছে। ক্রমাগত চিৎকার করছে আমার মেয়েদের ফিরিয়ে এনে দাও। হিমুদা ফিরে আসতেই হাতা ছুঁড়ে মেরেছে তাকে। লাঠি সোঁটা বল্লম কেউ বাড়িতে নেই। তুইও তো ছিলি না। হিমুদাই গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনলেন, তিনি আবার একটা ইনজেকশান দিয়ে গেছেন।"

সরস্বতী এসে ঘরে ঢুকলেন।

"তুমি চলে এলে যে?"

"কে একজন ভদ্রলোক কুষ্ঠি নিয়ে এসেছেন দাদার কাছে। বর্ণনা তুই একবার যা ওখানে, ওষুধ আনতে হবে।"

ঘর থেকে বেরুতেই দেখা হয়ে গেল সাবু মিত্তিরের সঙ্গে।

বুড়ির জঙ্গল বনকরটা বেঁচে গিয়েছিল। তারই খানিকটা বন্দোবস্ত করে কিছু চাল-ডাল সংগ্রহ করে এনেছিল সে।

"সাবুদা তুমি কি ওষুধ আনতে যাচ্ছ?"

"না, আমি বাসায় ফিরে যাচ্ছি। এখন না গেলে ট্রাম পাব না আর। টালিগঞ্জে যেতে হবে তো।"

"ও আচ্ছা।"

সাবু চলে গেল।

হেমন্তকুমারের ঘরে ঢুকে বর্ণনা দেখল নবনী রায় হেমন্তকুমারের সঙ্গে কথা কইছে। নবনী ইদানীং প্রায় কোনো-না-কোনো ছুতো নিয়ে হেমন্তকুমারের কাছে আসে বর্ণনার দেখা পাবে বলে। আজ তার সে আশা সফল হল। হেমন্তকুমারের মাথায় ব্যান্ডেজ দেখে বর্ণনা জিগ্যেস করলে, "তোমার মাথায় কি হল মামাবাবু?"

"গলিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। অন্ধকার তো গলিটা। তোর মামীমারও আবার অসুখ করেছে।"

আসল ব্যাপারটা বাইরের লোকের কাছে ভাঙল না হেমন্তকুমার।

নবনী রায় উঠে দাঁড়িয়েছিল। নমস্কার করে বর্ণনাকে বললে, "চিনতে পারছেন?"

বর্ণনা চিনতে পারলে না।

"আপনি সেদিন যখন 'লাব' থেকে ছবি নাবাচ্ছিলেন তখন আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, প্রায় মাস তিনেক আগে।"

এইবার মনে পড়ল বর্ণনার।

"এখানে এসেছেন কেন?"

"স্বামীজির কাছে একখানা কুষ্ঠি নিয়ে এসেছিলাম। উনি আমাকে একটা কবচ করে দিয়েছিলেন, খুব ভাল ফল পেয়েছি।"

'স্বামীজি' কথাটা শুনে ভুরু কুঁচকে গেল বর্ণনার।

হেমন্তকুমার বললে, "নবনীবাবু, আজ আর কুষ্ঠি বিচার করতে পারব না। কপালটা কেটে গেছে, তার উপর বাড়িতেও অসুখ। আপনি দিন সাতেক পরে আসবেন।"

"বেশ। টাকাটা দিয়ে যাই।"

দু'খানি দশ টাকার নোট বার করে দিল নবনী রায়।

হেমন্তকুমার তখন বর্ণনার দিকে ফিরে বলল, "তোর মামীমার জন্যে ডাক্তার চক্রবর্তী একটা প্রেসকৃপশান লিখে দিয়ে গেছেন, তুই এনে দিতে পারবি?"

"শ্যামবাজারে যেতে হবে তো। ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। তবে, 'বাস' হয়তো পেতে পারি। দাও, দেখি—"

নবনী রায় বললে, "আমি ট্যাক্সি করে এসেছি। আপনাকে 'লিফ্‌ট' দিয়ে দিতে পারি যদি আপনার আপত্তি না থাকে।"

"বাইরে তো কোন ট্যাক্সি দেখলুম না।"

"বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।"

"চলুন তাহলে—"

গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নবনী রায় বলল, "স্বামীজি যে আপনার মামা তা জানতাম না।"

বর্ণনাও জানত না যে হেমন্তকুমার স্বামীজি সেজে পয়সা রোজগার করছেন। বর্ণনার মজা লাগল একটু। কিন্তু পরমুহূর্তেই লজ্জা হল। একটু আগেই সে সুখময়বাবুর মুখোশের অন্তরালে যে পশুকে দেখেছিল হেমন্তকুমারের মধ্যেও যেন সেই পশুর আর এক রূপ দেখতে পেল সে।

"আপনার বাবার আঁকা ছবিগুলো কি এইখানেই এনে রেখেছেন?"

নবনী রায়ের প্রশ্নে একটু বিস্মিত হল বর্ণনা, এই ছবির কথাই এখনি ভাবছিল সে।

"আর কোথা রাখব বলুন। কিছু বিক্রি করে দিতে চাই, কিন্তু খরিদ্দার পাচ্ছি না। কোথাও এক্‌জিবিট্‌ করতে পারলে হত। কিন্তু জানাশোনা সে রকম জায়গা তো নেই। একজনকে দিয়েছিলাম কয়েকখানা, কিন্তু সেখানে রাখা চলবে না।"

"কেন, কি হল? একটাও বিক্রি হয়নি?"

"তিনি একখানা কিনেছেন আরও কিনতে চান, কিন্তু—"

হঠাৎ থেমে গেল বর্ণনা।

"কিন্তু কি?"

"সেখানে পোষালো না ঠিক।"

এই সময় বড় রাস্তায় এসে পড়ল তারা। আলো পড়লো বর্ণনার মুখে। নবনী রায় দেখতে পেল সে একটু অপ্রতিভ আর লজ্জিত হয়ে পড়েছে।

নবনী তখন বলল, "আমার একটি ফোটোগ্রাফার বন্ধু আছে, তার ভাল 'শো-কেস'ও আছে। লোকটি মাদ্রাজী, খুবই ভদ্রলোক। আপনি যদি চান তার 'শো-কেসে' দু'একটা ছবি রাখিয়ে দিতে পারি। অনেক লোক আসে তার দোকানে, বিক্রি হয়ে যেতে পারে।"

"যদি করে দিতে পারেন, খুব উপকৃত হব।"

উপকারী বন্ধুর ভূমিকায় নাবতে ইচ্ছা ছিল না নবনীর, কিন্তু নাবতে হল। সে মুহূর্তের মধ্যে ভেবে নিল কি করবে, এখন ধরা দিতে হল বটে, কিন্তু আর দেবে না।

"ছবিগুলো কি আপনার বাড়িতে দিয়ে আসব? আপনার ঠিকানা কি?"

"আমি বাইরে থাকি। যাঁর কাছে ছবিগুলি আছে তাঁর কাছে যদি একটা চিঠি লিখে দেন আনিয়ে নিতে পারি। কিম্বা এখানে যদি এনে রাখেন, আমার সেই বন্ধুটি এখান থেকেও নিয়ে যেতে পারেন।"

"বেশ। কাল আপনি আসবেন কি? তাহলে আপনাকে সঙ্গে করে না হয় নিয়ে যাব তাঁর কাছে।"

"আসব। কোথায় দেখা হবে আপনার সঙ্গে? এইখানেই?"

"আপনি যদি আমাদের হস্টেলে যান তাহলে আমার সুবিধা হয়।"

"হস্টেল? কোথায় সেটা?"

"হস্টেল বলতে যা বোঝায় তা ঠিক নয়। আমরা জনাকয়েক পোস্টগ্র্যাজুএট মেয়ে একটা বাড়িভাড়া করে থাকি। কলেজ রো-তে। ঠিকানাটা লিখে দেব আপনাকে?"

"বেশ যাব। পাঁচটা নাগাদ থাকবেন সেখানে?"

"থাকব।"

ওষুধের দোকানে নেবে বর্ণনা হস্টেলের ঠিকানাটা নবনী রায়কে লিখে দিলে।

ওষুধ নিয়ে বর্ণনা যখন ফিরল তখনও বন্দুক কিরিচ ফেরেনি। লাঠি ফিরেছে, কিন্তু মত্ত অবস্থায়। বর্ণনা এসে দেখলে সোঁটা তার মাথায় জল ঢালছে আর বল্লম জোর করে তার মাথাটা হেঁট করে রেখেছে। বাকী ছেলে-মেয়েগুলো ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দেখছে। হেমন্তকুমার নেই।

"মামাবাবু কোথায় গেলেন?"

জবাব দিল কাটারি—"বাবা দিদিদের খুঁজতে বেরিয়েছে।"

ছোরা আপদমস্তক ঢাকা দিয়ে শুয়েছিল, সে মুখটা খুলে বললে, "ওরা খিদিরপুরে সেকেন্ড শোয়ে 'নাগীন' দেখতে গেছে। বাবাকে বললুম কিন্তু বাবা শুনলে না।"

বর্ণনা পার্টিশনের ওপারে উঁকি মেরে দেখলে ইন্‌জেকশনের ঘোরে সত্যবতী মড়ার মতো ঘুমুচ্ছে। তার মাথার শিয়রে বসে হাওয়া করছে বনস্পতি, তার দুটি চক্ষুই বিস্ফারিত।

বর্ণনাকে দেখে বনস্পতি বললে, "ওরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার তো ঘুম হয় না, তাই আমিই বসলুম এসে।"

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বর্ণনা।

।। সাত ।।

হেমন্তকুমার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে ঠিক মেয়েদেব খোঁজবাব জন্যেই বেরোয়নি, সে যেন আর কিছু খুঁজছিল, কিন্তু সেটা যে কি তাও ঠিক করতে পারছিল না। জন্ম-নিরোধ-ক্লিনিকের ডাক্তার সামন্তর সঙ্গে তার যে আলাপ হয়েছিল সেইটেই মনে পড়ছিল বারবার। সেদিন যা ঘটেছিল তা সংক্ষেপে এই।

ডাক্তার সামন্ত খুব ভদ্র এবং বিনয়ী লোক। ডাক্তার চক্রবর্তীর চিঠি পেয়ে তিনি আরও ভদ্র, আরও বিনয়ী হয়ে পড়লেন, বললেন, "আপনার জন্য যথাসাধ্য আমি করব। আপনার ব্যাপারটা কি আগে শুনি।"

সব শুনে বললেন, "আমার মনে হয় আপনার স্ত্রীর পেটে যে সন্তানটি এখন আছে সেটি সম্ভবত নষ্ট হয়ে যাবে। সে যা হবার হোক, কিন্তু এরপর আপনাকে বার্থ-কন্ট্রোল করতে হবে।"

"ওইটেতেই আমার ঘোর আপত্তি। আমি গরীব লোক, বংশবৃদ্ধি করলে নিজেই ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ব তাও বুঝতে পারছি, কিন্তু খোদার উপর খোদকারি করবার সাহস আমার নেই। খোদা বলতে আমি প্রকৃতি মিন করছি। আপনারাই তো বলেন প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা অন্যায়।

"কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা বলি বটে, কিন্তু মানব-সভ্যতার মূল কথাটা ভুলে যাবেন না। উপনিষদ পড়া আছে কি আপনার?"

"কিছু কিছু পড়েছি—"

"বৃহদারণ্যকে আছে বুদ্ধিমান মানুষ শ্রেয়কে আশ্রয় করে থাকেন, যা মঙ্গলজনক তাই তিনি বরণ করেন। কি মঙ্গলজনক এইটেই মানুষের কাছে সব চেয়ে শক্ত প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর

জানবার জন্য বহু শতাব্দী পূর্বে মানুষ জ্ঞানের পথে যাত্রা করেছে, কিন্তু সে উত্তর পুরোপুরি মেলেনি, তার সন্ধানও শেষ হয়নি। একটা কথা কিন্তু ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে যে সভ্য মানুষ প্রকৃতির বিদ্রোহী সন্তান, বিদ্রোহী হয়েই সে সভ্য হয়েছে। যে তপস্বী হিমালয়ের নির্জনতায় নিদারুণ ঠাণ্ডায় তপস্যা করছেন তিনিও প্রকৃতির নিয়ম মানেননি, আবার যিনি গগল্‌স পরে এরোপ্লেনে চড়ে ছ'মাসের পথ ছ'দিনে অতিক্রম করছেন তিনিও প্রকৃতির নিয়ম মানেননি। যে মানুষ কাঁচা মাংস আর শাক-সবজিকে সুখাদ্য ব্যঞ্জনে পরিণত করেছে, উলঙ্গ শরীরকে নানাবকম বেশ-বাসে ঢেকেছে, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, পঞ্চইন্দ্রিয়ের সমস্ত শক্তির সীমানা ক্রমাগত বাড়িয়েছে, ওষুধের পর ওষুধ বার করে যে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে অবিরাম, ভোগ-তৃষ্ণা কমিয়ে বাড়িয়ে নানারকম করে সে ক্রমাগত জানতে চাইছে—আমাদের শ্রেয় কিসে, যে মানুষ একদিন হারেম বানিয়েছিল, বহু বিবাহ করে অজস্র সন্তান সৃষ্টি করেছিল সেই মানুষই আজ নূতন সমস্যার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, পৃথিবীতে আর স্থান নেই, খাদ্য নেই। পৃথিবীর আয়তনের একটা সীমা আছে, উৎপাদন শক্তিরও একটা সীমা আছে, আমরাও যদি সন্তানের সংখ্যা সীমাবদ্ধ না করি তাহলে বিপদ অনিবার্য—"

মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল হেমন্তকুমার।

"বাঃ, আপনার সার ডাক্তার না হয়ে অধ্যাপক হওয়া উচিত ছিল। চমৎকার বলবার ক্ষমতা আপনার। কিন্তু এ বিষয়ে আমারও একটু বক্তব্য আছে, শুনবেন কি?"

"নিশ্চয় শুনব।"

"আপনি সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করছেন। আমি আমাদের মতো সামান্য লোকের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে কথাগুলো বলছি। আমরা গরীব মানুষ, আমাদের দিনমজুরি করে খেটে খেতে হয়। সেজন্য আমাদের মতো লোকের পক্ষে পরিবারে যত লোক বৃদ্ধি হবে ততই সুবিধে নয় কি? প্রত্যেকেই আর্নিং মেম্বার হবে। সেদিন একটা মেথরকে জিগ্যেস করেছিলাম, সে বললে তাদের মাসিক রোজগার মাসে তিনশ টাকা। সে নিজে, তার বউ, তার ছেলে, মেয়ে, পুত্রবধূ সবাই রোজগার করে। এর আর একটা দিকও আছে। আমাদের গণতন্ত্র হয়েছে আজকাল, সুতরাং যারা সংখ্যায় বেশি, শাসন ব্যাপারে তাদেরই আধিপত্য থাকবে। আপনারা যদি জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করে ভদ্রলোকদের সংখ্যা কমিয়ে দেন আর ওই অশিক্ষিত মুচি মেথররা যদি ক্রমাগত সংখ্যায় বেড়ে যায় বাড়বেই, কারণ তারা আপনাদের জন্ম-নিয়ন্ত্রণের উপদেশ শুনবে না, তাহলে শেষ পর্যন্ত ওদেরই রাজত্ব হবে, আমরা জীবন-যুদ্ধে হেরে যাব ওদের কাছে। সেটা কি ঠিক হবে?"

ডাঃ সামন্ত হাসিমুখে কথাগুলি শুনলেন। তারপর বললেন, "দেখুন, যাঁরা সংখ্যায় বেশি তারাই যে সব সময়ে জয়ী হয় তা নয়। আমাদের দেশেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, তিনি বাবার এক ছেলে। সিংহের সন্তান-সংখ্যা খুব কম, কিন্তু সিংহই পশুরাজ। আমাদের কবিও বলে গেছেন, একশ্চন্দ্র তমোহন্তি ন চ তারাগণৈরপি। যারা সংখ্যায় বেশি তারাই সব সময় জয়ী হয় না, তারাও শেষ পর্যন্ত গুণী শক্তিমানদের আধিপত্য মেনে নেয়। গুণী আর শক্তিমান হওয়াটাই আসল কথা। আর আপনি রোজগারের কথা যা বললেন তা আপাতদৃষ্টিতে চমৎকার মনে হতে পারে কিন্তু একটু তলিয়ে যদি দেখেন এর গলদ ধরা পড়বে। আপনার এতে খুব লাভ হবে না শেষ পর্যন্ত। পশু-পক্ষীদের সন্তান-সন্ততিরা একটু

বড় হয়েই নিজেরা চরে খায়। কিন্তু তারা তাদের বাপ-মায়ের ভাই-বোনের কথা কি ভাবে কখনও? তারা যেই সমর্থ হয় অমনি পর হয়ে যায়। যে সব মুচি মেথরদের কথা আপনি বললেন তাদের পারিবারিক জীবনের খবর নিয়েছেন কখনও? যদি নেন, আপনার মত বদলে যাবে। ওদের ছেলেমেয়েরা কেউ বাপ-মাকে মানে না, বুড়ো বাপ-মাকে বসিয়ে খেতে দেয় না কেউ, তারা যখন অসমর্থ হয় তখন ভিক্ষাবৃত্তিই তাদের একমাত্র গতি, ছেলে-মেয়ে কেউ ফিরেও চেয়ে দেখে না তাদের দিকে। আপনি কি এই রকম ছেলে-মেয়ে চান? ছেলে-মেয়েকে শিক্ষিত, কর্তব্যপরায়ণ, শ্রদ্ধাশীল করে গড়ে তুলতে না পারলে তারা আপনার কোনো কাজেই আসবে না। সাধারণত অশিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা যেই টাকা রোজগার করতে আরম্ভ করে অমনি সে স্বাধীন হয়ে পড়ে, নিজের খুশিমতো স্বোপার্জিত টাকা খরচ করতে চায়। ছোট ভাই-বোনদেরও দায়িত্ব নিতে চায় না। আমি একজন তথাকথিত শিক্ষিত ছোকরাকে বলতে শুনেছি, ভাই-বোনদের দায়িত্ব নিতে আমি বাধ্য নই, বাবা তাদের জন্ম দিয়েছেন। বাবা তাদের মানুষ করবেন। ছোকরা স্কুলে কলেজে পড়েছে বটে, কবিতা-টবিতাও লেখে, কিন্তু শিক্ষিত হয়নি। ছেলে-মেয়েরা যদি পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়, তাহলে তারা রোজগার করলেও বাবা-মার আর্থিক সুবিধা হয় না। তাদের শ্রদ্ধাশীল, কর্তব্যপরায়ণ করতে হলে প্রকৃত শিক্ষা দিতে হবে, তাদের দেহের স্বাস্থ্য, মনের স্বাস্থ্য দুইই ভালো করতে হবে, তাহলেই তারা সুপুত্র সুকন্যা হবে। একপাল ছেলে-মেয়েকে এভাবে মানুষ করা সম্ভব কি? ভেবে দেখুন কথাটা।"

হেমন্তকুমার চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "জন্মনিরোধ করতে হলে কি করতে হবে?"

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন ডাক্তার সামন্ত।

"এই যে, আসুন না, সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। পাশের ঘরটায় চলুন।"

ডাক্তার সামন্ত বই বার করে, ছবি এঁকে, নানারকম ছবি দেখিয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন।

হেমন্ত মন দিয়ে শুনল সব, তারপর হেসে বলল, "দেখুন ডাক্তারবাবু, অনেকদিন আগে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে আমাকে বলেছিল মেরুদণ্ড সোজা করে, পদ্মাসনে বসে, চোখ বুঁজে, দুই ভ্রূর মাঝখানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যদি প্রাণায়াম করতে পারি, তাহলে কপালের মাঝখানে আলো দেখতে পাব। আসন ছেড়ে শূন্যে উঠতে পারব, ফলে যে আনন্দ পাব, তাই স্বর্গ-সুখ। আমি মেরুদণ্ডটা কোনোক্রমে সোজা করেছিলাম, কিন্তু পদ্মাসনে বসতে পারলুম না, একটা পায়ের উপর আর একটা পা ওঠাতেই পারলুম না। অনেক কষ্টে একবার উঠিয়েছিলাম, কিন্তু ছিটকে বেরিয়ে গেল। তাই স্বর্গ-সুখ ভোগ করা আর হল না। জন্মনিরোধের যে সব বখেড়া দেখছি ওসব আমার দ্বারা হবে না। আচ্ছা, এখন উঠি, দরকার হলে আবার আসব। কত দক্ষিণা দিতে হবে আপনাকে?"

"আমাকে কিছু দিতে হবে না।"

"না, সে হয় না, এতক্ষণ সময় নষ্ট করলুম আপনার, সামান্য কিছু নিতে হবে।"

গোটা পাঁচেক টাকা ডাক্তার সামন্তের হাতে গুঁজে দিয়ে চলে এসেছিল সেদিন হেমন্তকুমার।

মাথায় ব্যান্ডেজ-বাঁধা, উদ্‌ভ্রান্ত-দৃষ্টি হেমন্তকুমার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মাতাল লাঠির কথাগুলো তখনও তার কানে বাজছিল, "শ্লা, গেরুয়া মারিয়েছে—!"

ডাক্তার সামন্তর কথাগুলো তার মনে পড়ল, "আপনি কি এইরকম ছেলে-মেয়ে চান?"

।। আট ।।

'সুখপুর-পত্রিকা' বন্ধ হয়নি।

বাচস্পতি-সীমন্তিনী যেন আরও বেশি নিষ্ঠাভরে সেটাকে আঁকড়ে ধরেছিল। সুদেষ্ণাকে গবেষণায় সাহায্য করবার জন্যে বাচস্পতিকে রোজ খানিকক্ষণ পড়াশোনা করতে হত। বর্ণনা দরকার মতো তাকে বই এনে দিত ইউনিভার্সিটি থেকে, সীমন্তিনীও কাঁথা সেলাই করে কিছু রোজগার করতে আরম্ভ করেছিল—কিন্তু এসবের জন্যে 'সুখপুর-পত্রিকা'র কাজ বন্ধ হয়নি, তা নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। খবর সংগ্রহের জন্য বাচস্পতিকে আর টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে বাইরে যেতে হত না। ওই গলিতে তার চোখের সামনেই যে সব ঘটনা ঘটত তাই লিপিবদ্ধ করে আনন্দ পেত সে। আর একটা জিনিসও হয়েছিল, কোলকাতায় এসে খবরের কাগজের সম্বন্ধে তার নিজস্ব মতামতও গড়ে উঠেছিল। কোলকাতায় প্রকাশিত 'সুখপুর-পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকেই সেটা বেশ বোঝা যায়। উদ্ধৃত করছি।

"সুখপুর-পত্রিকার আদর্শ। আমরা সুখপুর ত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি বটে, কিন্তু সুখপুরের আদর্শ, সুখপুরের স্মৃতি আমাদের মনে অক্ষুণ্ণ আছে। আশা করি বরাবর থাকিবে। মহৎ মানবতার আদর্শ এবং স্মৃতিই সুখপুর-পত্রিকা সম্পাদনায় আমাদিগকে চালিত করিবে। ইতিপূর্বে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির সহিত আমাদের তেমন পরিচয় ছিল না। এখানে আসিয়া পরিচয় হইয়াছে। কিন্তু সে পরিচয় লাভ করিয়া সুখী হই নাই, আতঙ্কিত হইয়াছি। এই পত্রিকাগুলির প্রথম পৃষ্ঠাতেই যে ভয়ঙ্কর খবরগুলি বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয় তাহা পড়িয়া মনে হয় না যে আমরা সভ্য মানব-জাতির সংবাদ পাঠ করিতেছি। বরং এই কথাই মনে হয়, আমরা সভ্য নহি, আমরা বর্বর, আমরা পশু। কিন্তু ইহা সত্য নহে, উচ্চ প্রেরণামূলক গৌরবজনক খবর অনেক আছে, কিন্তু সেগুলি ছাপা হয় না। এই অতি ঘৃণ্য দুঃসংবাদগুলি একত্রিত করিয়া প্রথম পৃষ্ঠায় ফলাও করিয়া প্রদর্শন করায় তাৎপর্য কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সংবাদগুলি সত্য হইলেও গৌরবজনক নহে, সেগুলি যদি ছাপিতেই হয় পিছনের দিকে ছোট অক্ষরে সসঙ্কোচে ছাপা উচিত। ন্যক্কারজনক ডাস্টবিনকে কেহ বৈঠকখানার টেবিলের উপর স্থাপন করেন না। কিন্তু এই সংবাদপত্রগুলি প্রতিদিন তাহাই করিতেছেন। মহাত্মা গান্ধী মিস্ মেয়োর 'মাদার ইন্ডিয়া' পুস্তক সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহাই মনে পড়ে। এ সকল সংবাদ পাঠ করিয়া কেহ যে বিশেষ উপকৃত হন তাহা মনে হয় না। কেহ উত্তেজিত হন, কেহ কেহ বা হয়তো একটা পাশবিক আনন্দ তির্যকভাবে উপভোগ করেন। কতকগুলি বেকার যুবক-যুবতী এসব খবর লইয়া চায়ের দোকানে বসিয়া গুলতানি করেন শুনিয়াছি। মনে হয় এসব খবর এমন বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করার পিছনে কোনও রাজনৈতিক চক্রান্ত আছে। কোনও একটা বিশেষ রাজনৈতিক দল বিপক্ষ দলকে অপ্রস্তুত বা নিষ্প্রভ করিবার জন্য এগুলি হয়তো ছাপে। এক দলের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করাই নাকি ইহাদের উদ্দেশ্য। হায়রে জনমত, কতটুকু তাহার পরমায়ু!

মানব-সভ্যতার গৌরবজনক খবরগুলি এসব পত্রিকায় কচিৎ ছাপা হয়, হইলেও সেগুলিকে মোটেই প্রাধান্য দেওয়া হয় না, যদি না সেগুলির রাজনৈতিক গুরুত্ব থাকে। সাধারণত দেখি বীরত্ব, মহত্ত্ব, প্রতিভা, পৌরুষের খবরগুলিতে পাশবিক খবরগুলির অনুবর্তী বা পদপ্রান্তলীন

করিয়া ছাপা হয়। মানবজাতির অগ্রগতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা এ-কথা বলিতে বাধ্য হইলাম, এ মনোভাব অত্যন্ত হীন অবাঞ্ছনীয় পশুর মনোভাব। 'সুখপুর-পত্রিকা' যদিও ক্ষুদ্র তবু মানবতার আদর্শকেই সে প্রাধান্য দিবে। অদ্যকার খবরের কাগজগুলিতে বহু ভয়াবহ পাশবিক খবর ছাপা হইয়াছে, কিন্তু আমরা নিম্নলিখিত খবরটিকেই প্রাধান্য দিলাম। নাশের, ক্রুশ্চেভ, চু-এন্-লাইয়ের খবর, আমাদের বিবেচনায়, ইহার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর।

আমাদের ঠিক পাশের বাড়িতেই একটি দরিদ্র পরিবার বাস করে। তাহাদের একমাত্র কন্যা মিন্টুর কালাজ্বর হইয়াছে। মিন্টুর বাবা বলিতেছিলেন অর্থাভাবে মেয়েটির চিকিৎসা হইতেছে না। দাতব্য চিকিৎসাগুলিতেও পয়সা খরচ না করিলে সুচিকিৎসা হয় না। মেয়ের রোগের আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি কথায় কথায় বলিলেন যে মিন্টুর খাদ্যদ্রব্যে নাকি খুব লোভ, উহা নাকি কালাজ্বর ব্যাধির একটি লক্ষণ। কিন্তু সকালে জলখাবার হিসাবে মাত্র দুইখানি বিস্কুটের বেশি তিনি তাহাকে দিতে পারেন না, দিতে ভয়ও হয়, পয়সা নাই। গতকল্য কিন্তু একটি অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইলাম। আমাদের গলিতে মিন্টুদের বাড়ির সম্মুখে একটি ছিন্নবসনা ভিখারিনি তারস্বরে চিৎকার করিতেছিল, আমাকে দয়া করিয়া কিছু খাইতে দাও, ক্ষুধার জ্বালা আর সহ্য করিতে পারি না। কেহই তাহার ক্রন্দনে কর্ণপাত করিতেছিল না। সহসা দেখিলাম কঙ্কালসার লোভী মিন্টু তাহার রোগশয্যা হইতে উঠিয়া আসিল এবং তাহার বরাদ্দ দুইখানি বিস্কুটের একখানি ওই ক্ষুধার্ত ভিখারিনিটিকে দান করিল। আমাদের বিবেচনায় এই খবরটি অদ্য আমাদের সংবাদপত্রগুলিতে সর্বাগ্রে বড় বড় অক্ষরে লিখিত হইবার যোগ্য। চিত্রতারকাদের ছবির পরিবর্তে মিন্টুর ছবিই সর্বাগ্রে বড় করিয়া ছাপা উচিত। কারণ ওই মিন্টুরাই মানব-সভ্যতার ধারক এবং বাহক। উহার আচরণ দেখিয়া বহুকাল পরে প্রাতঃস্মরণীয় রাজা শিবিকে মনে পড়িল। কৃতার্থ হইয়া গেলাম।"

এই ধরনের খবরই 'সুখপুর পত্রিকা'য় প্রকাশিত হত। রিক্‌শাওলার কর্তব্যবোধ, দুগ্ধ ব্যবসায়ী গোয়ালাদের অসাধুতা, গাভীর প্রতি অকথ্য নিষ্ঠুরতা এবং তার কারণ, শহরের কলতলা ও পল্লীর পুকুর-ঘাটের তুলনামূলক আলোচনা, রাস্তায় ঘাটে বাঙালীদের তুলনায় অবাঙালীদের ভিড়, অবাঙালীদের পোশাক-পরিচ্ছদ নকল করার দিকে বাঙালী ছেলে-মেয়েদের প্রবণতা, ধারের ভারে পাড়ার মুদিটির ব্যবসার নৌকাটি কেন ডুবু-ডুবু, পথের ধারে যে মুচিটি বসে জুতো সেলাই করে আধুনিক জুতো সম্বন্ধে তার অভিমত, জনৈক গরীব বাঙালী গৃহস্থের বাড়িতে অভিজাতবংশীয় একটি অ্যালশেসিয়ান কুকুর ছানার দুর্দশা,—সুখপুর-পত্রিকার ফাইল ঘাঁটলে এরকম অনেক কৌতুকজনক সংবাদ এবং সে সম্বন্ধে বাচস্পতির সরস মন্তব্য পাওয়া যাবে।

পারিবারিক খবরও থাকত কিছু কিছু। এই কাহিনীর যোগসূত্র হিসাবে নিম্নলিখিত সংবাদটি উদ্ধৃত করছি।

"শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমারের বর্তমান জীবন-দর্শন। আমাদের নিকট আত্মীয় শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমারের জীবনে উল্লেখযোগ্য বিপর্যয় ঘটিয়াছে। এই বিপর্যয়ের হেতু নির্ণয় করা সহজ নহে, কিন্তু যদি কেহ ইহাকে কেবলমাত্র অর্থ-সঙ্কটের সহিতই যুক্ত করেন, আমাদের মতে হেতুর স্বরূপটি তাহা হইলে সম্পূর্ণরূপে উদঘাটিত হইবে না। অর্থ-সঙ্কটকে আপাত-কারণ বলা যাইতে পারে, কিন্তু আমাদের মতে প্রকৃত কারণ নিহিত আছে স্বভাবে, সংস্কারে এবং জীবন-দর্শনে। উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যাউক, গোমাংস ভক্ষণ ব্যতীত ক্ষুন্নিবৃত্তির অন্য উপায় নাই, এমত অবস্থায় পতিত হইলে সকলেই কি গোমাংস ভক্ষণ করিবে? আমাদের মনে হয় সকলে করিবে না, যুক্তিযুক্ত হইলেও করিবে না,

অনেকে গোমাংস-ভক্ষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যু-বরণই শ্রেয় মনে করিবে। মানুষের স্বভাব, সংস্কার এবং জীবন-দর্শনই তাহার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাহার আচরণের অনুকূল যুক্তিও সে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় এবং তজ্জন্য যে কোনও কৃচ্ছ্রসাধন করিতেও সে প্রস্তুত থাকে। জীবনরক্ষার জন্য গোমাংস-ভক্ষণ করাও অনুচিত নহে ইহাই যদি কাহারও জীবন নীতি হয় তাহা হইলে গোমাংস ভক্ষণ জনিত সামাজিক ও দৈহিক অসুবিধাগুলিও সহ্য করিবার জন্য তাহার প্রস্তুত থাকা উচিত। হেমন্তকুমার যতদিন স্বচ্ছলতার মধ্যে ছিলেন ততদিন তাঁর স্বভাবের বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সহিত জীবন-নীতির কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু অর্থোপার্জন করিতে হইবে—এই নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি গৈরিক বেশ পরিধান করতঃ জ্যোতিষাচার্যের ভূমিকায় অবতরণ করিয়াছিলেন, ছেলেমেয়েদেরও ইতরজনোচিত কর্মে নিযোগ করিতে ইতস্তত করেন নাই। যাঁহারা মনে করেন কর্মজগতে জাতিভেদ নাই, যে কোনও কর্মই ভাল কর্ম, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত নহি। কর্মের প্রভাব চরিত্রেব উপর পড়িবেই, যদি না সে চরিত্র পদ্মপত্রবৎ নির্বিকার হয়। হেমন্তকুমারের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেহই এরূপ চরিত্রবান বা চরিত্রবতী নহে। ফলে কুসঙ্গে মিশিয়া তাহাবা বিপথে গিয়াছে। বড় মেয়ে বন্দুক এবং বড় ছেলে লাঠি এখন আয়ত্তের বাহিরে। দ্বিতীয় পুত্র সোঁটা, তিনটি কন্যা কিরিচ, ছোবা, কাটাবি এবং সপ্তম পুত্র বল্লমও যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা যথেচ্ছ রোজগার, যথেচ্ছ খরচও করে। হেমন্তকুমারের স্ত্রী সত্যবতী উন্মাদিনী হইয়া গিয়াছে। সে আসন্নপ্রসবা ছিল, কয়েকদিন পূর্বে একটি মৃত সন্তান প্রসব করিয়া তাহার অবস্থা যাহা হইয়াছিল তাহা প্রায় অবর্ণনীয়। মহামতি ডাক্তার হরিভূষণ সামন্ত মহাশয়ের চিকিৎসা-নৈপুণ্যে সে প্রাণ ফিরিয়া পাইযাছে বটে, কিন্তু তাহার পাগলামি বাড়িয়াছে। সে ক্রমাগত চিৎকার করিতেছে আমার ছেলে-মেয়েদের ফিরাইয়া দাও। চিকিৎসায় পাগলামির কোনো উপশম হইতেছে না। হেমন্তকুমার নিজেই এবার চিকিৎসার ভার লইয়াছেন। তিনি পুনরায় পার্টিশন করাইয়াছেন। তাঁহার মতে স্ত্রীর সহিত পূর্ববৎ একত্রে শয়ন করিলে তাহার মানসিক স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে। ডাক্তার সামন্ত তাহা মনে করেন না। তিনি বলিতেছেন একত্রে শয়ন করিবার পূর্বে জন্ম-নিরোধের ব্যবস্থা করা উচিত। ডাক্তার চক্রবর্তী পরামর্শ দিয়াছেন শ্রীমতী সত্যবতীকে আপাতত কোনও পাগলা-গারদে স্থানান্তরিত করা হউক। বর্ণনা এ বিষয়ে খোঁজ করিয়াছে, কিন্তু পাগলা-গারদেও স্থানাভাব। হেমন্তকুমারের বাকী সন্তান কয়টি — কোদাল, কুড়ুল, সড়কি আর খন্তা আমাদের নিকট আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। আমবা তাহাদের যথাসাধ্য যত্ন করিতেছি, কিন্তু মনে হয় তাহাদের সুখী করিতে পারি নাই। তাহারা হাসে না, কথা বলে না অকারণে কোনো একটা ছুতা করিয়া কান্নাকাটি করে। মনে হয় হেমন্তকুমারও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাব জীবন-দর্শনের সহিত তাঁহার আচরণের মিল হয় নাই। তিনি যে পথে চলিতে চাহিয়াছিলেন সে পথের বিপদের কথা তাঁহার জানা ছিল না, সেজন্য তিনি প্রস্তুতও ছিলেন না। তাঁহার সমস্ত অন্তঃকরণ আর্তনাদ করিতেছে, কিন্তু তিনি জেদী লোক, বাহিরে নিজের জেদ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা অতিশয় মর্মন্তুদ ব্যাপার। গত রাত্রে তাঁহার স্ত্রীর চিৎকার শুনিয়া বুঝিলাম সকলের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া হঠকারীর মতো আচরণ করিবার শৌর্যও তাঁহার আছে। তাঁহার স্ত্রী চিৎকার করিতেছিল, আমাকে ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও, তুমি দূর হইয়া যাও, দূর হইয়া যাও।

হেমন্তকুমারের মতো আমরাও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি।"

॥ নয় ॥

বর্ণনাই সবচেয়ে বেশি বিব্রত হয়েছিল হেমন্তকুমারের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে। কারণ তা ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছিল এবং বর্ণনাকেই চেষ্টা করতে হচ্ছিল সে জট ছাড়াবার। বন্দুক বাড়িতে আসা বন্ধ করেছিল। কিরিচের মুখে শোনা গেল সে এক বড়লোকের বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টার জন্যেই বাহাল হয়েছে। ভাল মাইনে দিচ্ছে তারা। মাসে পঁচিশ টাকা, তাছাড়া, খাওয়া পরা। কিরিচের হাতে সে কিছু টাকা পাঠিয়েছিল হেমন্তকুমারকে। কিরিচও প্রায়ই বাড়িতে থাকত না। সে যেখানে কাজ করত তারাও খাওয়া পরা দিত, কিন্তু সেখান থেকে ফিরতে অনেক রাত হত তার। সে বাড়ির কর্তা নাকি আপিস থেকে ফিরে খেয়ে-দেয়ে গিন্নীকে নিয়ে রোজ সেকেণ্ড শো'তে সিনেমা যান। কিরিচ তাদের ছেলে-মেয়েদের পাহারা দেয়। ছোরা আর কাটারিও ঠিকে-ঝি-গিরিতেই বাহাল হয়েছিল, তারাই সত্যবতীকে কিছু সেবা করত বটে, কিন্তু আর্থিক সাহায্য তেমন করত না, বিলাসী হয়ে পড়েছিল। লাঠি মিষ্টান্ন ফেরি করা ছেড়ে দিয়ে বাহাল হয়েছিল একটা মোটরের ওয়ার্কশপে। বাতদুপুরে কালি-ঝুলি মেখে বাড়ি ফিরত ঈষৎ মত্ত অবস্থায়। পয়সা-কড়ি যা রোজগার করত তা মদেই যেত। হেমন্তকুমার পারতপক্ষে তার সম্মুখীন হবার চেষ্টা করতেন না। সোঁটাও কবিরাজি দোকানের চাকরি ছেড়ে ঢুকেছিল একটা সাইকেল তৈরির কারখানায়। সেখানে ভাল মাইনেই পাচ্ছিল। কিন্তু ক্রমশ তার ধারণা হল তার মাইনে আরও ভাল হওয়া উচিত। মালিকেরা বেশি মুনাফাখোর বলে মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছে না। চাপ দিলে দিতে বাধ্য হবে। তারই নেতৃত্বে স্ট্রাইক হল একদিন। তারপর ক্রমশ মারামারি, পুলিশ, কাঁদুনে গ্যাস এবং জেল। সোঁটা জেলে আছে। বর্ণনা অনেক চেষ্টা করেও তাকে জামিনে খালাস করতে পারেনি। সত্যবতীর পাগলামি উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। এর ঝক্কিও বর্ণনাকেই পোয়াতে হচ্ছিল। ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা, পাগলা গারদে সীটের জন্য ঘোরাঘুরি করা সব সে-ই করছিল। হেমন্তকুমার রোজগারের চেষ্টায় সমস্ত দিন পার্কে পার্কে ফুটপাথে ঘুরে বেড়াত। নবনী রায়ের মতো শাঁসালো মক্কেল তার আর জোটেনি। সমস্ত দিন ঘুরে হাত দেখে আর মাদুলী বেচে কোনোদিন এক টাকা, কোনোদিন দেড় টাকা, কোনোদিন দু'টাকার বেশি সে পেত না প্রায়। যা পেত তা বর্ণনার হাতেই এনে দিত। বাচস্পতিকে দিতে গিয়েছিল, সে নিতে চায়নি। বনস্পতিও চায়নি।

বনস্পতি আর সরস্বতী দুজনে ছবির জগতেই বাস করছিল। বর্ণনা বনস্পতিকে বিজ্ঞাপনের যে ছবি আঁকবার ফরমাশ দিয়েছিল, তাই নিয়ে ব্যস্ত ছিল তারা। তিনটে ছবিই আঁকা হয়েছিল এবং তিনটে ছবিই সরস্বতীর এত ভাল লেগেছিল যে তাইতেই চরিতার্থ হয়ে গিয়েছিল বনস্পতি। সে ছবির দাম পাওয়া যাবে কি যাবে না সেদিকে খেয়াল ছিল না। জুতোর কালির বিজ্ঞাপনটি সত্যিই চমৎকার হয়েছিল। কয়েকরকম জুতো, জুতোর কালির কৌটো, শিশি আর বুরুশ এমনভাবে সাজিয়ে ছবিখানি এঁকেছিল বনস্পতি যে হঠাৎ দেখলে মনে হয় একসাজি ফুল বুঝি কেউ রেখে গেছে একজোড়া পায়ের কাছে। দেশলাই বাক্সের ছবিটা আরও পছন্দ হয়েছিল বর্ণনার। জ্বলন্ত দেশলাই কাঠির শিখার ভিতর আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে একটি সহাস্য মানুষের মুখ। সে অস্তগামী সূর্যের দিকে চেয়ে আছে, যেন বলছে, তুমি চলে যাচ্ছ বটে, কিন্তু আমি অন্ধকারকে আলোকিত করব। 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে' ছবিটিই সবচেয়ে ভাল লেগেছিল সরস্বতীর। আকাশে ঘন মেঘ, কদম্ব বনে শিহরন জেগেছে কদমের ফুলে ফুলে, কদম্বের ডালে দোলনায় দুলছে একটি মেয়ে, সামনে ময়ূর নাচছে। বর্ণনার মনে হচ্ছিল বাবা যদি এইভাবে আঁকতে পারেন তাহলে সত্যিই

তাদের আর অর্থ কষ্ট থাকবে না। মাসে তিন চার শ'টাকা অনায়াসেই রোজগার করতে পারবেন।...হঠাৎ তার মনে পড়ল মামার কাছে যে ভদ্রলোকটি এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে সে দেখা করবে বলেছিল হস্টেলে। তিনদিন সে হেমন্তকুমারের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে কোথাও যেতে পারেনি, কলেজেও না, হস্টেলেও না, সুখময়বাবুর বাড়িতেও না। কথাটি মনে হওয়ামাত্র সে বেরিয়ে পড়ল। তার মনে হল হস্টেল যাবার আগে সুখময়বাবুর বাড়িতে গিয়ে ছবিগুলো নেবার ব্যবস্থা করা আগে দরকার। অন্তত এ কথাটা তাঁকে জানানো দরকার যে সে অন্যত্র ছবি-বিক্রির ব্যবস্থা করেছে। হয় সে নিজে এসে ছবিগুলো নিয়ে যাবে, না হয় তার চিঠি নিয়ে কোনো লোক আসবে নিতে। আর সঙ্গে সঙ্গে ছবিগুলো যদি পেয়ে যায় তাহলে তো কথাই নেই। চাকরিতে ইস্তফা দেবে কিনা তা সে তখনও ঠিক করতে পারেনি। সে ভেবে রেখেছিল সুখময়বাবু যদি তাঁর কাষ্ঠ-রসিকতাটির জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চান, আর ভবিষ্যতে কখনও এরকম অশোভন ব্যবহার করবেন না প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলে সে হট্ করে চাকরিটা ছাড়বে না। এ সিদ্ধান্তে সে উপনীত হয়েছিল অনেক ভেবেচিন্তে, এর জন্যে মনে মনে তার কুণ্ঠারও অন্ত ছিল না, এমন কি আত্মধিক্কারও হচ্ছিল মাঝে মাঝে। কিন্তু কি করবে। নিদারুণ কোলকাতা শহরে টাকা ছাড়া এক পা চলবার উপায় নেই। সুখময়বাবু যে হাজার টাকার চেকটা দিয়েছিলেন সেটা ভাঙাতে হয়েছে সোঁটাকে জেল থেকে বাঁচানোর জন্য। সোঁটা বাঁচল না, কিন্তু টাকাটা প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। মামীমার ছোট ছেলেমেয়েগুলোরও ভার নিতে হয়েছে, মামীমার চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারের ফী লাগছে না বটে, কিন্তু ওষুধ কিনতেই জিভ বেরিয়ে পড়ছে। হেমন্তকুমার, লাঠি, সোঁটা, মাঝে মাঝে কিছু কিছু দেয়, কিন্তু তাতে কুলোয় না। ছোরা আর কাটারি যা রোজগার করে তার সবটাই প্রায় খরচ করে নিজেদের স্নো-পাউডার সাবান শাড়ি ব্লাউজ কিনে, বলে নোংরা হয়ে থাকাটা তাদের মনিবরা পছন্দ করে না। কাটারি ধার করে শাড়ি কিনেছে সেদিন। বাবার ছবিগুলো বিক্রি হয়ে গেলে কিছু টাকা পাওয়ার আশা আছে। ওই ভদ্রলোক যদি বিক্রি করে দিতে পারেন খুব ভাল হয়। কিন্তু তিনি যদি না পারেন? সুখময়বাবু দু'খানা ছবি কিনতে চেয়েছিলেন সে দু'খানা তাঁকে দিলে ক্ষতি কি। এই সব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ভূষণ কাকার কথা মনে পড়ল তার। তিনি থাকলে কি ছবি বিক্রি করতে দিতেন?

সুখময়বাবুর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। সেদিন সুখময়বাবুর চোখের দৃষ্টিতে সে যা প্রত্যক্ষ করেছিল তার দ্বিতীয় কোনও অর্থ তো হয় না। একা ও-বাড়িতে ঢোকাটা কি সমীচীন? কিন্তু ঢুকতেই হবে। উপায় কি।

কড়া নাড়তেই সুখন চাকর এসে কপাট খুলে দিলে।

"বাবু বাড়ি নেই।"

নিশ্চিন্ত হল বর্ণনা।

"মাইজি?"

"মাইজি আছেন।"

"তাঁর সঙ্গে দেখা করব একটু খবর দাও।"

একটু পরেই সুখন এসে নিয়ে গেল তাকে। উপরে উঠে বর্ণনা দেখলে একটি রূপসী মেয়ের সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করছেন অঞ্জনা দেবী।

"ও, আপনি এসেছেন? আসুন, আসুন।"

বর্ণনা আসাতে দ্বিতীয় মেয়েটি উঠে দাঁড়াল।

"আমি তাহলে এখন উঠি। কাল থেকে আসব তো?"

"আমি খবর পাঠাব।"

নমস্কার করে এবং বর্ণনার দিকে অপাঙ্গে একটি দৃষ্টি হেনে বেরিয়ে গেল মেয়েটি।

"একেবারে ডুব মেরেছিলেন কেন বলুন তো? কোনও খবরও তো দেননি। উনি শেষে এই মেয়েটিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এ-ও বেশ ভাল শেখায়, ওঁর আপিসের স্টেনো—"

বর্ণনা নিস্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল নির্নিমেষে।

মুচকি হেসে অঞ্জনা দেবী বললেন, "কিন্তু আপনাকেই ওঁর বেশি পছন্দ।"

হঠাৎ বর্ণনার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, "আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। সব খুলে বলবেন দয়া করে?"

"কি বলব বলুন।"

"সত্যিই কি আপনাকে গান-বাজনা শেখাতে হবে, না এটা একটা ফাঁদ।"

মুখে কাপড় ঢেকে হাসতে লাগলেন অঞ্জনা দেবী মাথাটা ঘুরিয়ে। তাঁর দোলানো বেণীটা দেখে পুরাতন উপমাটা মনে পড়ে গেল বর্ণনার, ঠিক যেন সাপ!

বর্ণনা আবার বললে, "সত্যি কথাটা বলুন আমাকে খুলে।"

মুখে কাপড় ঢেকে অঞ্জনা বললেন, "বুঝতেই পারছেন তো!"

আবার ঘাড় হেঁট করে হাসতে লাগলেন। তাঁর স্থূল মেদবহুল দেহটা হাসির বেগে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

"সত্যিই আমি বুঝতে পারছি না, আপনি স্ত্রী হয়ে কি করে এসব সহ্য করছেন।"

"আমি ওঁর স্ত্রী নই, রক্ষিতা"—মৃদুকণ্ঠে বলে ঘাড় হেঁট করে রইলেন অঞ্জনা।

বর্ণনা এর পর কি যে বলবে তা ভেবে পেল না।

অঞ্জনা দেবীই আবার কথা কইলেন।

"আমার বয়স হয়েছে তো, আমি এবার রিটায়ার করব। চাকরি করলেই রিটায়ার করতে হয়। আমার জায়গায় তাই নতুন লোক খোঁজা হচ্ছে।"

বজ্রাহতবৎ বসে রইল বর্ণনা। অঞ্জনা দেবীও তার দিকে পিছু ফিরে ঘাড় হেঁট করে বসে রইলেন।

"রিটায়ার করে কোথা যাবেন আপনি?"

মিনিটখানেক পরে জিজ্ঞাসা করল বর্ণনা। সহসা কৌতূহলী হয়ে উঠল সে।

"বাবা বিশ্বনাথের চরণে। আমাদের মতো অভাগিনীর তিনিই তো একমাত্র আশ্রয়।"

"সেখানে থাকবেন কোথা?"

"সেখানে আমাকে বাড়ি করে দিয়েছেন। যথেষ্ট টাকাও দিয়েছেন, সেদিক দিয়ে কোনও অসুবিধা হবে না।"

অঞ্জনা দেবী ঘাড় ফিরিয়েই কথা বলছিলেন, ক্রমশ তাঁর ঘাড়টা যেন আরও নিচু হয়ে গেল। বর্ণনার মনে হল কাঁদছে!

হঠাৎ তার মনে পড়ল বান্ধবী আকাশ-পরীকে। যেমন সুন্দরী, তেমনি ডানপিটে, গানে বাজনায় অভিনয়ে কবিতা লেখায় চৌকোশ একেবারে। তার মতো মেয়ের পাল্লায় পড়লে জব্দ হয়ে যেত শয়তানটা। নিতান্ত ভাল মানুষ অঞ্জনার জন্য কষ্ট হতে লাগল তার।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বর্ণনা বলল, "আমি চললুম। আর আসব না। ওঁর কাছে যে পাঁচখানা ছবি দিয়েছিলাম, সেগুলো কোথা?"

"ওপরের ঘরে আছে।"

"ওগুলো আমি নিয়ে যেতে চাই।"

"আর একদিন এসে নিয়ে যাবেন। উনি তো এখন নেই—"

"না, আমি আর আসব না। এখুনি নিয়ে যাচ্ছি, ওঁকেবলে দেবেন।" তরতর করে উপরের ঘরে উঠে গেল সে। গিয়ে দেখল দেওয়ালে একখানি ছবিও নেই। বড় বড় আলমারি রয়েছে কয়েকটা। একটা আলমারির কপাট টানতেই খুলে গেল। ভিতরে দেখল ছবি রয়েছে অনেকগুলো, কিন্তু সেগুলো দেখেই আপাদমস্তক শিউরে উঠল তার, তার বাবার ছবি নয়, কতকগুলো অশ্লীল বীভৎস ছবি। দড়াম করে আলমারির কপাটটা বন্ধ করে আবার নেমে এলো সে।

"আমি লোক পাঠিয়ে দেব, তার হাতে দিয়ে দেবেন ছবিগুলো"

দ্রুতপদে নেমে গেল সে।

হস্টেলে পৌঁছেই তার দেখা হয়ে গেল আকাশ-পরীর সঙ্গে। আকাশ-পরীর নামটিও যেমন অপরূপ, চেহারাটিও তেমনি। চোখের কালো তারায় আছে একটু নীলের আমেজ, কালো চুলে সোনার, গায়ের বাদামী রঙও দুধে-আলতার। ওর ভারতীয় রূপের অন্তবালে লুকিয়ে আছে ইউরোপীয় শ্রী। চোখ দুটি খুশির আলোয় ঝলমল। মথার চুল বব্ করা, নাইলনের নীল শাড়ি লুটিয়ে পড়েছে স্যান্ডালের লাল-মখমলের উপর। স্যান্ডালের স্ট্র্যাপের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে কিউটেক্স-রঞ্জিত পায়ের নখগুলি। হাতের নখেও কিউটেক্স। বর্ণনা উপর্যুপরি তিনদিন না আসাতে উদ্বিগ্ন হয়েছিল সে। বর্ণনাকে দেখতে পেয়েই টেনে নিয়ে গেল সে আড়ালে, নিজের ঘরে। গিয়েই ঘরে খিল বন্ধ করে বর্ণনার থুতনিতে হাত দিয়ে গান ধরে দিলে মুচকি হেসে—

"কহ কহ লো বারতা কি
তিনটি দিবস ব'য়ে যে গেল
দেখাবে না উদারতা কি
বঁধুয়ার জুতো ক্ষয়ে যে গেল।"

মুখে মুখে কবিতা তৈরি করবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল আকাশ-পরীর।

"ছাড়।"

"তুই মাদ্রাজীর প্রেমে পড়লি শেষকালে!"

"মাদ্রাজী? মানে!"

"মানে তুমিই জানো। কুচকুচে কালো লম্বা সাহেবি-স্যুট পরা একটি মাদ্রাজী রোজ বিকেলে এসে ধন্না দিচ্ছে তোমার জন্যে। তিনদিন এসেছে, আজও আসবে হয়তো।"

"মাদ্রাজী?"

"হ্যাঁ গো, মিস্টার শ্রীনাথন।"

"ও বুঝেছি। ফোটোগ্রাফার। আমি আশা করেছিলাম বাঙালী ভদ্রলোকটিই আসবেন বোধহয়।"

"হয়তো মাদ্রাজীর ছদ্মবেশে তিনিই আসছেন, কিচ্ছু বলা যায় না"—বলেই আবার গান ধরলে সে—

"প্রেমের কতই লীলা কত কারসাজি গো
বাঙালী বঁধুয়া এল সাজি' মাদরাজি গো।"

"চুপ কর। আমি এদিকে মহা মুশকিলে পড়েছি। তুই যদি আমাকে উদ্ধার করতে পারিস।"

"করিব করিব সখি নিশ্চয় করিব
শাহারায় তোর লাগি মদ্‌গুর ধরিব।"

"সব শোন আগে। বস ভাল করে।"

সুখময়ের সমস্ত কাহিনীটি আদ্যোপান্ত বললে তাকে।

"এখন ওর কাছ থেকে ছবিগুলি উদ্ধার করি কি করে বল্ তো?"

"অনায়াসে পারি। কিন্তু আমি যা করতে চাচ্ছি তা করবার আগে হবু প্রাণনাথটির সঙ্গে যড় করতে হবে। সে যদি রাজি হয় তাহলে অনায়াসে কেল্লা ফতে হয়ে যাবে।"

"তিনি তো মীরাটে—"

"এখানে এসেছে পরশু। তোর সঙ্গে আলাপ করবে বলে এসেছিল কাল। কিন্তু তুই এলি না, খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গেল।"

"কোথা আছেন।"

"গ্র্যান্ডে।"

"ফোন কর। যদি থাকে, এক্ষুনি গিয়ে আলাপ করে আসি। তিনি তো একাই একশ'।"

"শুধু একশ'? একশ' ইনটু একশ' ইনটু একশ' ইনটু এক শ' যতক্ষণ দম থাকে ততক্ষণ ইনটু একশ' প্লাস এক্‌স্। এক্‌সের যত ইচ্ছে ভ্যালু বসাতে পার।"

দুয়ারে টোকা পড়ল।

কপাট খুলে দেখা গেল হোস্টেলের বালক ভৃত্যটি একটি কার্ড এনেছে।

"সেই ভদ্রলোক আজও এসেছেন। বর্ণনা দিদির সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।"

আকাশ-পরী মুচকি হেসে বললে, "সেই তিনি, যাও দেখা করে এসে। আমি ততক্ষণ ফোন করি।"

বর্ণনা কমনরুমে ঢুকতেই দাঁড়িয়ে উঠলেন শ্রীনাথন।

"মিস বর্ণনা মিশ্র?"

"হ্যাঁ।"

"মিস্টার রায় আপনাকে এই চিঠিটা দিয়েছেন।"

একটি বড় চৌকো সাদা খামের ভিতর থেকে ছোট্ট চিঠি বেরুল একটি।

সুচরিতাসু,

নিজে যেতে পারলাম না বলে দুঃখিত। বন্ধু শ্রীনাথন নিজেই যাচ্ছে। ছবির বিষয় তাঁর সঙ্গে কথা কইবেন। সে সব ব্যবস্থা করে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আপনি ওকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন। দরকার হলে ওর দোকানেই আমাকে খবর দেবেন, তখন দেখা করব। আশা করি ওই সব করে দিতে পারবে। নমস্কার। ইতি—

ভবদীয়
নবনী রায়

শ্রীনাথনের সঙ্গে ইংরেজিতেই কথাবার্তা হচ্ছিল।

শ্রীনাথন বললেন, "আমি তিন দিন ঘুরে গেছি। মিস্টার রায় বলে দিয়েছিলেন, যতদিন না আপনার সঙ্গে দেখা হয় ততদিন যেন রোজ আসি। আমি তাঁর আদেশ পালন করেছি। আপনার বাবার আঁকা ছবি আমি আমার শো-কেসে ভালভাবে ডিসপ্লে করব। ছবিগুলির দাম কি রকম হবে তা কি ছবির সঙ্গে লেখা থাকবে?"

"একটা ছবি হাজার টাকায় বিক্রি করেছিলাম। সব ছবি হয়তো অত টাকায় বিক্রি হবে না। দাম আপনি যেমন ভাল বুঝবেন তেমনি রাখবেন।"

"ছবিগুলো কি এখানে আছে?"

"না। সে আমি আপনার দোকানে পৌঁছে দিয়ে আসব। আপনাকে এত কষ্ট দিলাম, সে জন্য দুঃখিত।"

"না না না, ও কিছু নয়। আমার কোনো কষ্ট হয়নি। আপনার সেবায় লাগতে পেরেছি বলে আমি সো গ্ল্যাড।"

ইত্যাকার বিনয় বাচন করে শ্রীনাথন চলে গেলেন।

বর্ণনা আকাশ-পরীর ঘরে চলে গেল। একটু পরেই আকাশ-পরী ফিরে এসে গান ধরে দিলে।

"ফ্যান-সমীরে ত্রিতল-কুটীরে গ্র্যান্ডে বসতি বনমালী
সুট্-বুট্-মণ্ডিত সে প্রণয়-মণ্ডিত সমর্থ ভুজ যুগ শালী।
ঝন-ঝন-ফোন-যোগে ভেজিল নিমন্ত্রণ—আও লো সখীরে লয়ে আও
চৈনিক তৈজসে অধর পরশ করি চাহা-পানি পান করি যা-ও।"

তারপর সুর বদলে—

"শোন গো মিনতি শোন
আমার নিধিটি আঁচলে বাঁধিয়া
চলিয়া এস না যেন।
সখি, আমারও দিকটা দেখিও খানিক,
ওই যে আমার সব সম্বল
সাতসাগরের একটি মানিক।"

বর্ণন তাকে ছোট্ট একটি চাপড় মেরে বললে, "কি পাগলামি করছিস। চল্ বেরিয়ে পড়ি।"

...একটু পরে দুজনে বেরিয়ে পড়ল হোটেলের উদ্দেশে।

গ্র্যান্ড হোটেলে মেজর মুখার্জী উচ্ছ্বসিত সম্বর্ধনা জানালেন বর্ণনাকে।

"আকাশের কাছে আপনার কথা এত শুনেছি যে আপনাকে দেখবার জন্য আপনাদের হস্টেলে গিয়েছিলাম। কিন্তু ভাগ্য খারাপ, দেখা হয়নি। আপনি যে দয়া করে এসেছেন এতে কি যে আনন্দ পেলাম তা আর কি বলব। আকাশ সাধারণত সব কথাই বাড়িয়ে বলে, কিন্তু আপনার বেলায় দেখছি কমিয়েই বলেছে।"

আকাশ-পরী বর্ণনার দিকে চোখ বড় বড় করে চেয়ে বললে, "শুনলি তো। তোকে বলিনি? দেখা হলেই খোশামোদ আরম্ভ করবে। কী যে হ্যাংলা লোকটা—"

মেজর মুখার্জী দরাজ গলায় হেসে বললেন। "খোশামোদ করাই তো আমাদের পেশা।

এক বুল-ডগমুখো সাহেবের খোশামোদ করছি, এমন সুন্দর মুখের করব না? আর সম্বন্ধটা কত মধুর, ভাবী পত্নীর প্রিয়তমা বান্ধবী—"

"কিন্তু উনি আর মধুর রসের চর্চা করতে ভরসা পাবেন কিনা সন্দেহ। একটি ষাঁড় ক্ষেপেছে, তুমি মাথা ঠিক রাখ। পারো তো ষাঁড়টাকে শিক্ষা দিয়ে দাও। সঙ্গীন ব্যাপার। তুই গুছিয়ে বলতে পারবি, না আমিই বলব।"

"তুই বল্—"

চা এসে হাজির হল। চা খেতে খেতে সুখময়ের কাহিনী শুনতে লাগলেন তিনি আকাশ-পরীর কাছ থেকে। সব শুনে বর্ণনাকে বললেন, "ছবি আপনি কালই পেয়ে যাবেন। আপনি শুধু সুখময়বাবুর নামে একটা চিঠি লিখে দিন আমাকে যে আমার পাঁচটি ছবি এই পত্রবাহককে দিয়ে দেবেন। আর কিছু করতে হবে না, আমি লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নেব। কিন্তু আমার কৌতূহল হচ্ছে নবনী রায় নামটা শুনে। যখন লন্ডনে ছিলাম তখন অক্সফোর্ডের এক নবনী রায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, অদ্ভুত খেয়ালী ছেলে, আমাদের সকলের কানের মাপ নিয়ে কি একটা চার্ট না গ্রাফ করেছিল। এ কি সে-ই লোক?"

"আমি ঠিক জানি না। মাত্র একদিনের আলাপ, তা-ও হঠাৎ—"

মেজর মুখার্জী হেসে বললেন, "একদিনের আলাপেই ভদ্রলোক আপনার সম্বন্ধে এতটা ইন্‌টারেস্ট নিচ্ছেন! অবশ্য সেই নবনী যদি হয় তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, এই ধরনেরই খেয়ালী লোক সেও।"

আকাশ-পরী কবিতায় বললে—

"রূপের আগুনে পুড়িল লঙ্কা, জীবন্ত হল মৃত
ধ্বংস হইল ট্রয়
রূপের আগুনে নবনী গলিয়া হয়েছে গব্য ঘৃত
এতে কিবা বিস্ময়।"

"ব্রেভো"—ছাদ কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন মেজর মুখার্জী।

"আপনি আমাকে চিঠিটা তাহলে লিখে দিন। আমি লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নিচ্ছি—"

॥ দশ ॥

হেমন্তকুমার ক্রমশ দমে যাচ্ছিল, বিশেষ করে রোজগার করতে পারছিল না সে। এক পার্ক থেকে আর এক পার্কে গিয়ে, ফুটপাথের পর ফুটপাথ বদলে কোনোই ফল হচ্ছিল না। রোদে ঠায় বসে থাকাও কষ্টকর হয়ে উঠছিল ক্রমশ। বাধ্য হয়ে বড় দেখে ছাতা কিনেছিল একটা, আর সেটা যাতে পিছন দিকে আপনা-আপনি খাড়া থাকে, তার ব্যবস্থাও করেছিল। গেরুয়া-কাপড় দিয়ে মুড়েও ছিল সেটাকে, বেশ একটা দৃশ্য হয়েছিল, কিন্তু ফল হচ্ছিল না। তার সবচেয়ে বিপদ হয়েছিল সময় নিয়ে। চুপচাপ বসে বসে সময় যেন কাটতেই চায় না। সামনে দিয়ে অবিরাম জনস্রোত বয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে কেউ তার সামনে থামলে উৎসুক দৃষ্টি তুলে চেয়ে দেখে তার দিকে, কিন্তু সে আবার চলে যায়। দু'একজন কটু মন্তব্যও করে, ব্যঙ্গও করে কেউ কেউ। "গায়ের চামড়া আর গোঁফ দাড়িও গেরুয়া করে ফেল চাঁদ"—কে একজন বলেছিল। এসব সত্ত্বেও মুখ

বুঁজে বসে থাকতে হয়। সামনের ফুটপাথে পুরাতন-পুস্তকের একটি দোকান ছিল। সেই দোকানী একদিন এসে হাত দেখিয়ে মাদুলী নিয়ে আট আনা পয়সা দিতে গিয়েছিল, হেমন্ত নেয়নি। বলেছিল, তুমি বরং মাঝে মাঝে আমাকে বই পড়তে দিও। বই পড়ে সময় কাটত কিছুটা। নানারকম ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস আর প্রেমের গল্প। মন্দ লাগত না নেহাত। হঠাৎ একদিন একটা নতুন ধরনের বই হাতে এসে গেল তার। বইওলাই দিলে তাকে।

"ঠাকুরমশাই, এই বইটা পড়ুন, হয়তো আপনার কাজে লাগবে। ওটা আপনি রাখতেও পারেন। সের দরে কিনেছিলাম।"

হেমন্ত উল্টে দেখলে বইয়ের নাম 'তন্ত্রসার'। সামনে পিছনে পাতা নেই। দশমহাবিদ্যার ছবি রয়েছে। পড়তে শুরু করে দিলে। ক্রমশ তন্ত্রসার উর্বর করে তুলল তার মস্তিষ্ককে। কয়েকদিন পরে দেখা গেল, তার ছাতার উপরে, ঠিক মাঝখানে একটি চৌকোনা পিস্‌বোর্ড আটকানো রয়েছে আর তাতে বড় বড় লাল অক্ষরে লেখা রয়েছে —বশীকরণ, উচাটন। এর পর থেকে সামনে দিয়ে যে জনস্রোত রোজ বইত তার গতি যেন একটু মন্থর হলো, মাঝে মাঝে দু'একজন দাঁড়াতেও লাগল। অবশেষে এক বাবরিওলা ছোকরা একদিন বসে পড়ল তার সামনে।

"আচ্ছা ঠাকুরমশাই, বশীকরণ, উচাটন এসব কি সত্যি হয়?"

তার বিকশিত হলদে দাঁতগুলোর দিকে চেয়ে খুব চটে গেল হেমন্তকুমার মনে মনে। উপর্যুপরি কয়েকদিন কোনো রোজগার না হওয়াতে তিরিক্ষে হয়ে পড়েছিল সে।

"হয় বইকি। তবে গোড়াতেই একটা কথা শুনে রাখ বাপু। এসব বিষয়ে পরামর্শ নিতে গেলে গোড়াতেই দুটি টাকা প্রণামী দিতে হয়। অনর্থক বকবক করতে পারব না।"

ছোকরা একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। তারপর বলল, "বেশ, নিন।" দুটি টাকা বার করে দিলে, প্রণামও করলে। হেমন্তকুমার এবার পুলকিত হল। ভক্তিমান মক্কেল!

"এইবার বল কি দরকার তোমার? কিচ্ছু গোপন কোর না, খোলসা করে খুলে বল সব। যদি খরচ করতে পার তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তুমি কি জাত?"

"মুচি। জুতোর দোকান আছে আমার। এসব করতে কত খরচ পড়বে?"

"আগে শুনি কি করতে হবে।"

একটু ইতস্তত করে বার দুই গলা-খাঁকারি দিয়ে অবশেষে ছোকরা অকপটে মনের বোঝা নামিয়ে ফেললে হেমন্তকুমারের কাছে। পাড়ার একটি মেয়েকে সে ভালবেসেছে। কিন্তু মেয়েটি তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। না তাকাবার কারণ আর একটি বড়লোকের ছেলে মেয়েটিকে টাকার লোভ (সে বললে, ললকানি) দেখাচ্ছে, টাকার লোভে অন্ধ হয়ে মেয়েটি তার পবিত্র প্রেমের মহিমা দেখতে পাচ্ছে না। তাই সে স্থির করেছে দৈব করবে কিছু। এক্ষেত্রে কি করা উচিত?

হেমন্ত বলল, "তিন রকমই করতে হবে—"

"তিন রকম? মানে?"

"বিদ্বেষকরণ, উচাটন, বশীকরণ।"

"বুঝতে পারছি না ঠিক।"

"বিদ্বেষকরণ করলে ওই বড়লোকের ছোকরা আর ওই মেয়েটির মধ্যে ঝগড়া হয়ে শেষ পর্যন্ত মনান্তর হয়ে যাবে। তারপর করতে হবে উচাটন। এর ফলে মেয়েটির তোমার সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা হবে, আগ্রহ হবে। তারপর তাকে আকর্ষণ করে বশীকরণ করতে হবে। খরচ পড়বে পঁচাত্তর টাকা।"

"পাঁচাত্তর টাকা!"

"তাতো লাগবেই। খুব কম করে বলেছি আমি। জিনিসপত্তর সংগ্রহ করতে হবে কত। সব যোগাড় করতে মাস তিনেক সময়ই লেগে যাবে আমার, ঘুরতে ঘুরতে পায়ের বাঁধন আলগা হয়ে যাবে—"

"খুব দামী দামী জিনিস লাগে বুঝি?"

"দামী খুব নয়, বিদঘুটে। ষাঁড়ে-ষাঁড়ে যেখানে লড়াই করছে সেখানকার মাটি, শ্মশানের আগুন, পলাশ ফুল, পাটল ফুল, গোরোচনা, কাকের পালক, কাকের বাসা, কাকের বিষ্ঠা, মহিষের গোবর, ঘোড়ার লাদি, তা ছাড়া ধূপ ধুনো কুঙ্কুম চন্দন এসব তো আছেই। চট করে এসব সংগ্রহ করাও মুশকিল। ঘুরতে হবে, তক্কে তক্কে থাকতে হবে। মাস তিনেক মেহনত করলে তবে জোটাতে পারব। মজুরি না পোষালে অত হাঙ্গামা করবে কে—"

"চট করে অত টাকা যোগাড় করা শক্ত আমার পক্ষে। বাবা দোকানে বসেন কি না।"

খেঁকিয়ে উঠল হেমন্তকুমার।

"শিরদাঁড়ার জোর নেই ডন ফেলবার শখ কেন তাহলে?"

ছোকরা তবু বসে রইল খানিকক্ষণ।

"ওই তিন রকম করলে সোনামণি আমার বশে আসবে?"

"নির্ঘাত।"

"দুবারে টাকাটা দিলে হবে না?"

"হবে না কেন, দেরি হবে। পুরো টাকাটা হাতে না পেলে কাজ আরম্ভ করা যায় না তো।"

"কাল অর্ধেক টাকা দিয়ে যাব—"

"কাল? কালই এস। কাল সোমবার, মেয়েটির নামও সোনামণি, দুটোই দন্ত্য 'স'। কালই এস। তোমার নামটি কি?"

"আজ্ঞে, শশাঙ্ক দাস।"

"শশাঙ্ক কি বানান লেখ?"

"তালব্য 'শ' তালব্য শয়ে আকার আর ঙ-য়ে ক-য়ে।"

"এবার থেকে দন্ত্য 'স' লিখবে। দাস দন্ত্য 'স' আছেই, শশাঙ্কতে ডব্‌ল দন্ত্য 'স' হলে তিনগুণ জোর হবে।"

"যে আজ্ঞে।"

"কাল সোমবার হয়ে আর একটা সুবিধেও হয়েছে। সোমবার হচ্ছে চাঁদের বার। আর চাঁদ হচ্ছেন মনের কারক। আর এসব তান্ত্রিক ক্রিয়া মনের উপরই তো কাজ করবে।"

"যে আজ্ঞে, কাল আমি নিশ্চয় আসব।"

পুনরায় প্রণাম করে ছোকরা চলে গেল।

হেমন্তকুমার নিশ্চিন্ত হল খানিকটা। বর্ণনা চাকরিটা ছাড়ার পর খুবই অর্থকষ্ট চলছে। ধার জমে গেছে চারদিকে।

বাড়ি ফিরে আরও খুশি হল সে। অনেকদিন পরে বন্দুক এসেছে মাকে দেখতে। ফল-টল এনেছে, কাপড় চোপড়ও এনেছে। যাবার সময় পঁচিশটা টাকাও দিয়ে গেল। হঠাৎ তার দুই ছেলের কথা মনে পড়ল। লাঠি অনেক দিন আসেনি, সোঁটা জেলে। তারপর মনে হল বল্লমটা আজ এখনও ফিরছে না

কেন। এ সময় তো রোজই ফিরে আসে। রোজই রোজগার করে আনে কিছু। বয়স যদিও কম, কিন্তু খুব করিতকর্মা হয়েছে ছেলেটা।...একটু পরেই ছোরা গলির মোড় থেকে ছুটতে ছুটতে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "বাবা গো, শিগগির চলো, মেজদাকে মেরে ফেললে—"

"কে?"

"রাস্তার লোকে। শিগ্‌গির এস। খুব মারছে—"

হেমন্তকুমারও ছুটে গেলেন। গিয়ে দেখলেন বড় রাস্তার উপর ভিড় জমে গেছে। বাঁ চোখটা ফুলে উঠেছে, দরদর করে রক্ত পড়ছে নাক দিয়ে। তবু মারছে!

"কি হল, কি হল, মারছ কেন ওকে?"

"মারব না? শালা পকেটমার! এই দেখুন কাঁচি দিয়ে আমার পকেট কাটছিল, হাতে-নাতে ধরে ফেলেছি শালাকে। খুন করে ফেলব—"

আবার মার চলতে লাগল। কিল চড় লাথি ঘুঁষি জুতো ছাতা। হেমন্তকুমার লাফিয়ে পড়ল ভিড়ের মধ্যে, ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করল বল্লমকে ওদের হাত থেকে, কিন্তু পাবল না। শেষে নাটকীয় ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠল সে—"আমাকেই মার তোমরা, আমাকেই মার, ওকে ছেড়ে দাও, ওকে আর মেরো না, দোহাই তোমাদের, আমাকে মাব, আমি ওর বাবা, আমিই ওর জন্য দায়ী, ওকে ছেড়ে আমাকে মার।"

ছোরা দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিল, তার ভয় হল বাবাও পাগল হযে গেল নাকি।

।। এগারো ।।

মেজর মুখার্জীর চেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু সুখময়বাবুর কবল থেকে ছবিগুলি উদ্ধার করা গেল না। তিনি তাঁর আরদালিকে কয়েকবারই পাঠিয়েছিলেন কিন্তু সে যখনই গেছে সুখময়বাবুর দেখা পায়নি। উপর থেকে খবর এসেছে তিনি বাড়ি নেই, কখন ফিরবেন তারও ঠিক নেই। এই করতে করতে মেজর সাহেবের ছুটি ক্রমশ ফুরিয়ে এল। হঠাৎ একটা জরুরি টেলিগ্রামও এসে গেল, অবিলম্বে চলে এস।

যেদিন মেজর মুখার্জী চলে যাবেন সেদিন তাঁকে স্টেশনে তুলে দেবে বলে আকাশ-পরী গ্র্যান্ড হোটেলে গিয়েছিল।

সে বললে, "বর্ণনার বাবার ছবিগুলোর তো কিছুই হল না—"

"আমি ওখান থেকে সান্ডেলকে চিঠি লিখে দেব। সে এইখানেই পুলিশে বড় চাকরি করে। সে ব্যবস্থা করে দেবে ঠিক।"

আকাশ-পরী মুচকি-মুচকি হাসতে লাগল।

"হাসছ যে?"

"একটা কবিতা মনে হচ্ছে। বলব?"

"বল।"

"বাঘের ভয়েতে কাঁপে বাইসন হাতি,
নেংটি ইঁদুর গ্রাহ্য করে না তাকে

চুপটি করিয়া গর্তে লুকায়ে থাকে;
বল যদি ফাঁদ পাতি।"

"কি রকম ফাঁদ?"

"ঠিক কি রকম তা ভাবিনি এখনও। তবে সরল ভাষায় তার কাছে গিয়ে তার মুণ্ডুটি ঘুরিয়ে দিয়ে ছবিগুলি নিয়ে চলে আসব। তুমি বরং তোমার বন্ধু সান্ডেলকে বলতে পার আমাকে যেন একটু সাহায্য করেন।"

"অতটা বাড়াবাড়ি করবে?"

"পশুদের সঙ্গে একটু বাড়াবাড়ি করতে হয়। ওদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে বেশ লাগে। তবে তোমার যদি আপত্তি থাকে তাহলে—"

চুপ করে গেল আকাশ-পরী। তারপর অপাঙ্গে চেয়ে মুচকি হেসে বললে, "তোমার কি ভয় হচ্ছে আমি লোকটার প্রেমে পড়ে যাব, না, সে আমাকে গপ্ করে গিলে ফেলবে।"

"এসব ব্যাপারে একটু 'রিস্ক্' আছে বইকি।"

"থাকলেই বা। নো রিস্ক্ নো গেন্। এই যে তুমি রোজ প্লেনে প্লেনে ঘুরে বেড়াচ্ছ সেটা কি রিস্কি নয়? আমি তো তোমাকে রিস্ক্ নিতে দিয়েছি। বেশ, তোমার যখন আপত্তি তখন থাক। যতই তোমরা লেখাপড়া শেখ তোমাদের প্রাগৈতিহাসিক চেহারা এখনও বদলায়নি।"

মুচকি-মুচকি হাসতে লাগলেন মেজর মুখার্জী।

তারপর হঠাৎ বললেন, "আচ্ছা, অনুমতি দিলুম। কিন্তু দেখো কেলেঙ্কারিটা যেন খুব বেশি দূর না গড়ায়।"

আকাশ-পরী লাফিয়ে উঠল চেয়ার থেকে। তারপর দু'হাত তুলে ঘুরে ঘুরে নাচ শুরু করে দিলে গান গাইতে গাইতে।

মনে পিয়ানো বাজে
টিরি টিং, টুং টাং, টিং টিং
ডার্লিং, ডার্লিং, ডার্লিং
ও ডার্লিং ডার্লিং ডার্লিং।

অদ্ভুত মেয়ে আকাশ-পরী।

।। বারো ।।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল বর্ণনা। প্রায় কপর্দকহীন হয়ে পড়েছিল সে। চারদিকে ধার অথচ হাতে একটি পয়সা নেই। হেমন্ত বশীকরণের জন্য শশাঙ্ক দাসের কাছ থেকে যে টাকাটা পেয়েছিল সেটা খরচ হয়ে যাচ্ছিল আদালতে, বল্লমকে জেলের কবল থেকে বাঁচাবার জন্যে। পুলিশ বেশ ঘোরালো করে কেস সাজিয়েছিল তার বিরুদ্ধে। সোঁটা জেল থেকে খবর পাঠিয়েছিল, ওকে জেল থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছ কেন। জেলই ভাল। আমি রাজসুখে আছি। তোমরা সব্বাই জেলে চলে এস।' হেমন্তকুমার তবু বাঁচাবার চেষ্টা করছিল ওকে। বর্ণনাকে কিচ্ছু দিতে পারেনি সে ইদানীং।

সুখময়বাবুর কাছ থেকে ছবিগুলো আনতেও যায়নি বর্ণনা, সে নির্ভর করছিল আকাশ-পরীর উপর। ইতিমধ্যে সে আর এক কাজ করেছিল। বনস্পতির আঁকা বিজ্ঞাপনের ছবি তিনখানা দিয়ে

এসেছিল সুবন্ধু সেনের আপিসে। তাঁরা খবর পাঠাবেন বলেছিলেন, কিন্তু কোনও খবর আসেনি। সে একবার গিয়েছিল তবু খবর পায়নি। সুদেষ্ণা বাচস্পতিকে যে টাকাটা দিচ্ছিল সেটাও পাওয়া যায়নি এমাসে। সুদেষ্ণা আজকাল আসছে না। গুজব রটেছে তার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে, পাণিনির গবেষণা পাণিপীড়নে পর্যবসিত হবে নাকি শেষ পর্যন্ত। আর্থিক অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে নগদ তরকারিও কেনা যাচ্ছে না। ছোরা কাটারি কিছু রোজগার করে কিন্তু তাদের কাছে হাত পাততে প্রবৃত্তি হয় না বর্ণনার। তাছাড়া তারা তাদের মায়ের জন্য খরচও তো করছে। ফল-মূল, ওষুধ-বিষুধ নানারকম লেগেই আছে রোজ। বন্দুক কিরিচ আসেই না। সত্যবতীর অবস্থা একটু ভাল হয়েছিল, কিন্তু আবার খারাপের দিকে যাচ্ছে। ডাক্তার চক্রবর্তী বলেছেন এমনি করে আস্তে আস্তে ভাল হয়ে যাবে। জ্যাঠামশাই জ্যাঠাইমা ছোট ছেলেমেয়েগুলোর ভার নিয়েছেন, নিজেদের দুধ ওদেরই খাওয়াচ্ছেন। বর্ণনাকে বাধ্য হয়ে দুধের বরাদ্দ বাড়াতে হয়েছে। কিন্তু মাসের শেষে সে টাকা দেবে কোথা থেকে? জ্যাঠামশাই জ্যাঠাইমা দুজনেই অদ্ভুত রকমের শান্ত আছেন। সব কাজকর্ম সেরে অনেক রাত্রে শোন। আবার ওঠেন খুব ভোরে। উঠেই 'সুখপুর-পত্রিকা' লিখতে শুরু করেন। ওই যেন ওঁদের পুজো করা। জ্যাঠাইমা তাঁর সর্বদা-পরার ভারী হারটা তাকে দিয়েছেন বিক্রি করে টাকা যোগাড় করবার জন্যে। খুব নির্বিকার ভাবে বললেন, "ভাবছিস কেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। এইটে বেচে কিছু টাকা যোগাড় করে ফেল আপাতত।" বর্ণনা এখনও হারটা বিক্রি করেনি। ভাবছে বাবার বিজ্ঞাপনের ছবিগুলি যদি চলে তাহলে বিক্রি করবার দরকার হবে না হয়তো। বনস্পতি একেবারে নীরব হয়ে গেছে। বর্ণনা বুঝতে পারে বাবা মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। ছবি আঁকবার জন্যে রোজই ক্যানভাসটার কাছে গিয়ে বসে, কিন্তু ছবি এগোয় না, বসে থাকে কেবল।

একদিন জিগ্যেস করেছিল, "আমার সেই ছবি পাঁচখানার কি হল? কেউ বোধহয় শেষ পর্যন্ত কিনলে না, নয়? বিক্রির জন্যে তো ওসব আঁকিনি। কেউ না কেনে ফিরিয়ে নিয়ে আয়। একটা ছবি তো হাজার টাকা নিয়ে দিয়েছিলি তোর বন্ধুকে। চেকটা ভাঙিয়েছিস?"

"ভাঙিয়েছি তো। সোঁটার মকদ্দমায় খরচ হল, দুধের টাকা, বাড়িভাড়ার টাকা, সব ওই থেকেই তো দিলাম। সে টাকা ফুরিয়ে গেছে।"

"ও, তাই বুঝি। তা বেশ হয়েছে! বিজ্ঞাপনের ছবিগুলো কি হল?"

"এখনও খবর পাইনি। খবর পাব শিগ্‌গির।"

"আচ্ছা, সে হবে এখন, ব্যস্ত কি।"

বর্ণনা কিন্তু বুঝতে পারছিল, বাবা ব্যস্তই হয়েছেন। কিন্তু কি করবে, উপায় তো নেই কিছু।

সেদিন হস্টেলে যেতেই আকাশ-পরী বললে, "সব মাটি হয়ে গেল।"

"কি মাটি হল?"

"আমার প্ল্যানটা। আমি দরখাস্ত করেছিলাম যে সঙ্গীতানুরাগিণী অঞ্জনা দেবীকে আমি সব রকম গান-বাজনা শিখিয়ে দেব। সুখময়বাবু আমাকে পরশু দিন ডেকেওছেন, কি শাড়ি পরে কি এসেন্স মেখে তাঁর কাছে যাব তাও ঠিক করে রেখেছি, এমন সময় পুলিশ অফিসার সান্ডেল এসে আমার মনের বেলুনটিতে আলপিন ফুটিয়ে চলে গেলেন।"

"তার মানে!"

"তিনি নিজে গিয়ে ছবিগুলি নিয়ে এসেছেন। আমার আর কিছু করবার রইল না। কি কাণ্ড বল দিকি, আমি কত কি ভেবে রেখেছিলাম।"

"ভালই হয়েছে।"

'ভালই হয়েছে। এমন একটা স্পোর্ট মাটি হয়ে গেল। আচ্ছা, পুরুষগুলো আমাদের কি মনে করে বল দেখি, আমরা এতই ঠুনকো যে ক্রমাগত সামলে সামলে বেড়াতে হবে।"

হাসিমুখে ক্ষণকাল চেয়ে রইল বর্ণনার মুখের দিকে। তারপর গান ধরে দিলে

চতুর পুরুষগুলো—
করিয়া নানান্‌, ছলনা ফন্দী
আঙুরের মতো করেছে বন্দী
উপরে নীচেতে তুলো।

"ছবিগুলো কোথা?"

"ওপরে আছে।"

"আমাকে গোটা দশেক টাকা দিতে পারিস? ছবিগুলো তাহলে পৌঁছে দিয়ে আসি ফোটোগ্রাফারের দোকানে।"

"বেশ, চল, দুজনেই যাই, একটা ট্যাক্সি ডাকতে পাঠা।"

ছবি পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে বর্ণনা দেখল বনস্পতি বাড়িতে নেই। সরস্বতী চিন্তিত হয়ে ঘর-বার করছে।

"উনি বাইরে বেরিয়ে গেছেন, এখনও ফেরেননি।"

"কোথা গেছেন?"

"কিছু তো বলে যাননি। খাওয়া-দাওয়ার পর কখন বেরিয়ে গেছেন টেরও পাইনি। আমি দিদির ঘরে ছিলাম।"

"কেউ সঙ্গে গেছে?"

"কে আর যাবে?"

চিন্তিত হয়ে পড়ল বর্ণনা।

"মহা মুশকিল তো। বাবা তো কখনও বেরোয়নি এর আগে, পথঘাট জানা নেই। জ্যাঠামশাই শুনেছেন?"

"না। সড়কি আর খন্তা দুজনেরই খুব কেঁপে জ্বর এসেছে। ওদের নিয়েই ব্যস্ত আছেন। এ খবর শুনলে আরও ব্যস্ত হবেন, তাই আর বলিনি। তুই একেবার দেখ না হয়।"

বর্ণনা বেরিয়ে গেল।

॥ তেরো ॥

বনস্পতি কোলকাতার রাস্তায় কখনও একা বেরোয়নি। একা একা বেরোবার একটা গোপন লোভ অনেকদিন থেকেই তার মনে ছিল, যে বন্য স্বভাব তাকে সুখপুরের বনে জঙ্গলে গঙ্গার ধারে ধারে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াত সেই স্বভাব তাকে এখানেও প্রলুব্ধ করেছিল অনেকদিন থেকে। এসে থেকে একটা মনের মতো ছবি আঁকতে পারেনি, গলির ভিতর ওই ঘুপচি ঘরে কোনও প্রেরণাই সে পাচ্ছিল না। তার মনে হচ্ছিল রাস্তায় বেরুলে সত্যিকার কোলকাতার রূপ ধরা দেবে তার চোখে। ওই

খোলার ঘরের অন্ধকূপে দেবে না। তাছাড়া হেমন্তকুমারের ছেলে-মেয়েদের নিত্য নতুন ঝামেলা, উন্মাদিনী সত্যবতীর আর্তনাদ, আর্থিক অনটন, বর্ণনার শুকনো মুখ, সরস্বতীর সপ্রতিভ থাকবার ব্যর্থ চেষ্টা, দাদা-বৌদির কৃচ্ছ্রসাধন—এ সবই যেন নিষ্প্রভ করে দিচ্ছিল তার মনের আলোকে। তার আশঙ্কা হচ্ছিল আমি কি নিভে যাচ্ছি? কিন্তু তার অন্তরতম শিল্পী একথা মানতে চাইছিল না, তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই টালটা সামলে গেলেই গুমোটটা কেটে যাবে, অন্ধকার থাকবে না, হাওয়া বইবে, চাঁদ উঠবে, ফুল ফুটবে, ছবি আসবে। তার এ-ও মনে হচ্ছিল কোলকাতা শহরের রাস্তায় রাস্তায় সে যদি একা ঘুরে বেড়াতে পারে তাহলেও ছবি আসবে মনে। কোলকাতার রূপ সে দেখতে পাচ্ছে না। এই খাঁচা থেকে না বেরুতে পারলে পাবে না। একা একা বাইরে বেরিয়ে পড়বার আকাঙ্ক্ষাটা অনেক দিন থেকেই জাগছিল তার মনে। সেদিন একটা উপলক্ষ জুটে গেল। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া ঢুকল ঘরে, বর্ণনার টেবিলের কাগজ-পত্র ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

ঘরে আর কেউ ছিল না, বনস্পতি নিজেই কাগজগুলো গুছিয়ে রাখতে লাগল, গুছিয়ে রাখতে গিয়ে একটা ঠিকানা চোখে পড়ল তাব, ঠিকানাটার নীচে লেখা রয়েছে, বাবার বিজ্ঞাপনের ছবি তিনটে এই ঠিকানায় দেওয়া হল। পড়েই পাখা মেলে উড়ল বনস্পতির কল্পনা। খাওয়া-দাওযার পর চুপিচুপি বেরিয়ে পড়ল সে।

দেখাই যাক না...।

রাস্তায় খানিকক্ষণ হাঁটবার পর মনে পড়ল সঙ্গে একটি পয়সা নেই, রিক্‌শা নেওয়া যাবে না। রাস্তার পথিকদের জিগ্যেস করে করে হাঁটতেই লাগল সে। হাঁটতে খারাপ লাগছিল না। মাঝে মাঝে থেমে চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, বাঃ, চমৎকার তো। কোলকাতার বড় বড় রাস্তাগুলোর যে বিশেষ একটা রূপ আছে তা অভিভূত করে দিল তার শিল্পী মনকে। সে মনে মনে ছবি আঁকতে আঁকতে চলেছিল। ভাবছিল...অনেক কিছুই ভাবছিল সে।

অনেক ঘুরে, অনেকবার পথ ভুল করে অবশেষে সে যখন সুবন্ধু সেনের আপিসে এসে পৌঁছল, তখন সে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বাড়ির দারোয়ান বললে, তিনতলার একটি ঘরে আপিস। অনেক সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হবে। খাড়া সিঁড়িগুলোর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। তারপর কপালের ঘামটা মুছে ওপরে উঠতে লাগল।

"সুবন্ধুবাবুর সঙ্গে দেখা হবে কি?"

"হবে। আসুন ভিতরে। কি দরকার আপনার?"

বনস্পতির দিকে না চেয়েই বুশ-শার্ট-পরা সুবন্ধু সেন রিভলভিং চেয়ারে বসে আপিসের কাজ করে যেতে লাগলেন।

"আমি আমার ছবি তিনটের খবর নিতে এসেছি।"

এইবার সুবন্ধু চাইলেন তার দিকে।

"আপনার ছবি? কবে ছবি দিয়েছিলেন আপনি?"

"আমার মেয়ে বর্ণনা দিয়ে গিয়েছিল।"

এই শুনে সুবন্ধু সেনের দৃষ্টির ভাষা বদলে গেল। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। নমস্কারও করলেন।—"ও, আপনি বর্ণনা দেবীর বাবা? বসুন বসুন।"

সামনের চেয়ারটায় বসল বনস্পতি।

সুবন্ধু সেন আবার তাঁর কাজে মন দিলেন। বোধহয় চিঠি লিখছিলেন। সেটা শেষ করে ব্লট করে খামে পুরে, ঠিকানা লিখে আবার ব্লট করে চাইলেন তিনি বনস্পতির দিকে। ক্ষণকাল চেয়ে রইলেন কিছু না বলে। তারপর মন-স্থির করে ফেললেন। বাঁ দিকের ড্রয়ারটা টেনে বড় খাম বার করলেন একটা।

"এই নিন—"

"কি ওটা?"

"আপনার ছবি তিনখানা? প্রোপাইটারদের পছন্দ হয়নি।"

খামটা হাতে নিয়ে নির্বাক হয়ে বসে রইল বনস্পতি। তারপর বলল, "কোন্ ছবিগুলো ওঁদের পছন্দ হয়েছে তা দেখতে পারি কি?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়। এই যে দেখাচ্ছি—"

তিনখানা ছবিই বার করে দিলেন। জুতোর কালির বিজ্ঞাপনের ছবিতে জনৈক পীনোন্নত-পয়োধরা যুবতী কবলার্স স্ট্যান্ডের উপর পা তুলে দিয়ে জুতো বুরুশ কবাচ্ছে, তার দু'হাত কোমরে, চোখে মুখে একটা দৃপ্ত হাসি যেন কি মহৎ কাজ করাচ্ছে। মুচিটাও হাসছে। দেশলাই বাক্সর ছবিতেও এক জোড়া তরুণ-তরুণীর মুখ, তরুণটির মুখে জ্বলন্ত সিগারেট, সে একটি দেশলাই কাঠি জ্বেলে তরুণীর মুখের সিগারেটটি ধরিয়ে দিচ্ছে। দুজনেরই চোখে মুখে হাসি। 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে' বইটির প্রচ্ছদপটেও একটি মেয়ের ছবি, তার এক পা মাটিতে আর এক পা আকাশে। সম্ভবত নাচছে। মুখে হাসি।

বনস্পতি গম্ভীরভাবে ছবি তিনখানি ফেরত দিয়ে বললেন, "আচ্ছা, আমি চললুম নমস্কার।"

"নমস্কার। পার্সোনালি কিন্তু আপনার ছবি তিনটি আমার খুব ভাল লেগেছিল, কিন্তু কি করব বলুন। আচ্ছা, মিস্টার গাঙুলীর সঙ্গে কি আপনার আলাপ আছে?"

"কারো সঙ্গেই আমার আলাপ নেই।"

"চলুন না, পাশের ঘরেই আছেন তিনি। মস্ত বড় একজন আর্ট ক্রিটিক, তিনি যদি আপনাকে ব্যাক করতে রাজি হন, হু হু করে আপনার ছবি বাজারে চলবে। এই তিনটি ছবিই তরুণ শিল্পীদের আঁকা। উনিই রেকমেন্ড করেছিলেন, বাজারে ওঁর রেকমেন্ডেশনের খুব দাম। গভর্নমেন্ট পর্যন্ত খাতির করেন। অনেক জায়গায় উনি জজ্ হন। ওঁর সঙ্গে আলাপ করুন। আমি এই শ্লিপটা লিখে দিচ্ছি, বেয়ারার হাত দিয়ে এইটে ভিতরে পাঠিয়ে দিলেই দেখা করবেন আপনার সঙ্গে। এদিকে খুব পলিস্‌ড্ লোক।—"

বনস্পতির কৌতূহল হল, দেখেই আসি কি রকম লোকটা। তবু কিন্তু ইতস্তত করতে লাগল।

"আচ্ছা, চলুন, আমিই আপনাকে ইনট্রোডিউস করে দিচ্ছি।"

সুবন্ধু সেন নিয়ে গেলেন তাকে পাশের ঘরে।

"মিস্টার গাঙুলী, ইনি শ্রীবনস্পতি মিশ্র, আমাদের জন্যে গোটা তিনেক বিজ্ঞাপনের ছবি এঁকেছিলেন, কিন্তু সেগুলো মালিকদের পছন্দ হয়নি। আপনি যে ছবিগুলো রেকমেন্ড করেছিলেন সেইগুলোই নিয়েছেন ওঁরা। সুদেষ্ণার বান্ধবীর বাবা ইনি। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন।"

তারপর বনস্পতিকে নিম্নকণ্ঠে বললেন, "আলাপ করুন।"

বনস্পতি রৈবতক গাঙুলীকে দেখেনি। দেখলেও চিনতে পারত কিনা সন্দেহ, কারণ তাঁর

চেহারা খুব বদলে গিয়েছিল। শুধু চেহারা নয়, বেশবাসও। আগে সাহেবী স্যুট পরতেন, এখন খদ্দর পরেন, খুব দামী মিহি খদ্দর। বৃদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর ক্ষৌরীকৃত মুখমণ্ডলে, চোখের কোণে, চিবুকের নীচে, গলার কাছে জরার ছাপ পড়েছিল, যদিও তাঁর নীলাভ রিম্‌লেস চশমাটা প্রতিবাদ জানাচ্ছিল এই বার্ধক্যের বিরুদ্ধে। বনস্পতি নামটা শুনেই উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন তিনি। বহুকাল আগেকার ক্ষতটা তখনও শুকোয়নি।

"বনস্পতি মিশ্র? সুখপুরে বাড়ি কি আপনার?"

বনস্পতি শুধু মাথা নাড়ল।

"বহুকাল আগে আমি আপনার বাড়ি থেকে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছিলাম। আপনার দারোয়ান ভূষণ চক্রবর্তী আমাকে কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিয়েছিল। সে কথা মনে আছে আপনার?"

"ভূষণ অনেককেই তাড়িয়েছিল। কাকে তাড়াত আমি জানতেও পারতাম না। আপনার কথা আমার মনে পড়ছে না।"

রৈবতক গাঙুলীর ভুরু দুটো কুঁচকে গেল, তারপর ঠোঁট দুটো এবং থুতনিটাও। খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন বনস্পতির দিকে।

তারপর বললেন, "তা বলে আপনার উপর আমার রাগ নেই। আপনি যদি আমার পরিচয় পেতেন, তাহলে বুঝতে পারতেন—"

"আপনার পরিচয় আমি পেয়েছি।"

"পেয়েছেন? কে বললে, সুবন্ধু?"

"না। আপনি যে ছবি তিনটি রেকমেন্ড করেছেন তা দেখেছি। তারাই আপনার পরিচয় দিয়েছে। আপনাকে দেখবার কৌতূহল হল তাই এসেছিলাম। আচ্ছা, চলি নমস্কার।"

উঠে পড়ল বনস্পতি।

"শুনুন বনস্পতিবাবু, আপনার তিনটি ছবিও আমার ভাল লেগেছে। আপনি যে গুণী লোক তাতে আমার সন্দেহ নেই, আপনার অন্য ছবিগুলো যদি আনেন একদিন—"

স্মিত হাস্য করে বনস্পতি বললে, "না, দ্বিতীয়বার ভুল আমি আর করব না—"

রৈবতক গাঙুলীকে অবাক করে দিয়ে বনস্পতি বেরিয়ে চলে গেল।

অনেকক্ষণ পরে অনেক রাত্রে বর্ণনা বাড়ি ফিরে এসে দেখলে বনস্পতি সরস্বতী দুজনেই গুম হয়ে বসে আছে। বনস্পতি অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর।

বাবা, কোথায় গিয়েছিলে তুমি?"

বনস্পতি কোনো জবাব দিল না। তারপর হঠাৎ বলল, "আমার সেই ছবি পাঁচখানা নিয়ে এস। আমি ছবি বিক্রি করব না।"

এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না বর্ণনা। বাবা-মার অনুমতি নিয়েই সে ছবি বিক্রি করতে দিয়েছে।

"সেগুলো একটা ছবির দোকানে দিয়েছি।"

"কালই গিয়ে নিয়ে এস, ছবি বিক্রি করতে হবে না।"

বনস্পতির এরকম রুক্ষ কণ্ঠ বর্ণনা আগে কখনও শোনেনি। নিজের পক্ষ সমর্থন করে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, সরস্বতী চোখের ইশারায় বারণ করাতে থেমে গেল।

।। চোদ্দ ।।

নবনী রায়ের অনেকক্ষণ খবর পাওয়া যায়নি।

নেপথ্য-বিলাসী নবনী রায় নেপথ্যেই ছিল বরাবর, নেপথ্যে থেকেই যা করবার করে যাচ্ছিল, যারা কাঠ-পুতলীর নাচ দেখায় অনেকটা তাদেরই মতো। শেষ পর্যন্ত নেপথ্য থেকেই হয়তো বর্ণনাদের সমস্যাটার সমাধান করে নেপথ্যেই বিলীন হয়ে যেত সে, কিন্তু তা হল না। পাদ-প্রদীপের সামনে এসে তাকে দাঁড়াতে হল অবশেষে।

বর্ণনার সম্পর্কে নবনীর মনোভাবটা মনস্তত্ত্ববিদ্গণের প্রণিধানযোগ্য। নবনী যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল বর্ণনার সান্নিধ্য এড়িয়ে চলতে, আপাত-দৃষ্টিতে সে এড়িয়ে চলছিলও। জ্ঞাতসারে সে কখনও বর্ণনাকে প্রিয়-রূপে কল্পনা তো করেইনি, পাছে বর্ণনা সন্দেহ করে যে সে কবছে তাই সে বর্ণনার ছায়া পর্যন্ত মাড়াবার চেষ্টা করেনি কোনোদিন। কিন্তু গোপনে গোপনে বর্ণনার জন্য সে যা করেছিল তা নির্বিকার নিঃস্বার্থভাবে কেউ যে করতে পাবে একথা কোনও বিজ্ঞানী মনস্তত্ত্ববিদের পক্ষে মানা শক্ত। তাঁরা সন্দেহ করবেন প্রেমই অবদমিত হয়ে ওকে ওইরকম ভাবে ঘোরাচ্ছে। কিন্তু আগেই আমি বলেছি ওইরকম ভাবে ঘোরাটাই ওর স্বভাব। নীলমণি সেন, মহেন্দ্র, নগেন হাজরা, ঝক্মু বা কমলাক্ষের জন্যেও সে ওইরকম ভাবে ঘুরেছে। যাই হোক বর্ণনার জন্যে সে যা যা করেছে তা সংক্ষেপে বলছি। এর থেকে আপনারা যে যা অনুমান কবতে চান করুন।

বর্ণনার সঙ্গে যেদিন তার প্রথম পরিচয় হল সেদিন থেকে বর্ণনার গতিবিধির সমস্ত খবর রাখছিল সে। বর্ণনা কখন বাড়ি থেকে বেরোয়, কোথা কোথা যায়, কবে সে সুখময়বাবুর চাকরি ছাড়ল, কেন ছাড়ল—কোনো খবর তার অবিদিত ছিল না। রিক্শা বা ট্যাক্সি চড়ে নিজেই সে অনুসরণ করেছে বর্ণনাকে অনেকদিন, ইংরেজি ভাষায় যাকে 'ফলো' করা বলে। কিন্তু কখনও তার সামনে পড়বার চেষ্টা করেনি। সুখময়বাবুর খবর জানবার জন্যে সে এক মেয়ে গোয়েন্দাই বহাল করে ফেলেছিল। এই সূত্রে তার পুরাতন ভৃত্য প্রহ্লাদের চরিত্রেরও একটা বিশেষ দিক প্রকাশিত হয়ে পড়ল তার কাছে। প্রহ্লাদ যে তার নাকের সামনে এই কাণ্ড করেছে তা ঘুণাক্ষরে সে জানত না। প্রহ্লাদকে সে একদিন সুখময়বাবুর বাড়িটা দেখিয়ে বলল, "দেখ, তুই এই বাড়ির চাকরদের সঙ্গে ভাব করে খবর নে তো ও-বাড়িতে কি সব কাণ্ড - কারখানা হচ্ছে। "প্রহ্লাদ মনে মনে একটু অবাক হল, কিন্তু বাইরে সে ভাব প্রকাশ করল না। তারপর বর্ণনাকে ও বাড়ি থেকে ঢুকতে-বেরুতে দেখে সে নিজস্ব একটা থিয়োরি খাড়া করে প্রভুর আদেশ পালন করতে লাগল। দিন কতক পরে এসে সে খবর দিলে, "ও-বাড়ির ভিতর অনেক খবর আছে বাবু। কিন্তু আমি ঠিক ধরতে পারছি না। অন্দরমহলে তো ঢুকতে পারি না। কাল শুনলাম ওদের বাড়িতে একটা ঝি দরকার। যদি বলেন সুবাসিনীকে ওইখানে লাগিয়ে দি। ওর আজকাল চাকরি নেই।"

"সুবাসিনী কে?"

কথাটা এতদিন গোপনই রেখেছিল প্রহ্লাদ, এইবার মরিয়া হয়ে বলেই ফেললে।

"আমার পরিবার হুজুর।"

"তোর পরিবার! তোর যে পরিবার আছে তা তো জানতাম না। কোথা থাকে সে?"

"আগে সামন্ত ডাক্তারের ওখানে নার্সের কাজ করত। উনি এখন পাশ-করা নার্স বহাল করেছেন, ওর চাকরি নেই। যদি বলেন তো ওকে ঢুকিয়ে দি সুখময়বাবুর বাড়িতে।"

"দে। কিন্তু তুই এই বয়সে বিয়ে করে ভরাডুবি হবি যে—"

মাথা চুলকে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে প্রহ্লাদ বললে, "যাতে না হই ডাক্তার সামন্ত সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।"

সুবাসিনী এসে বর্ণনার সম্বন্ধে যে খবর দিলে তা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল নবনী। বর্ণনার যতই পরিচয় পেতে লাগল, ততই সে মুগ্ধ হতে লাগল উত্তরোত্তর। এর আর একটা কারণও ছিল। স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে এদেশের সনাতনপন্থীদের সঙ্গে সে ঠিক একমত ছিল না। শিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা রোজগার করতে নাবলে বিপথে যাবেই—সনাতনপন্থীদের এই মনোভাবের সঙ্গে সে সায় দিতে পারেনি কোনোদিন। কিন্তু নিজের মতটাকে সে যেন আর টিকিয়ে রাখতে পারছিল না। পথে-ঘাটে, আপিসে-হাসপাতালে, সিনেমায়-থিয়েটারে, এমন কি স্কুল-কলেজেও রোজগেরে মেয়েদের যে চেহারা সে রোজ দেখতে পাচ্ছিল তাতে সত্যিই দমে যাচ্ছিল সে। তার মনে হচ্ছিল সনাতনপন্থীদের কথাই ঠিক তাহলে নাকি। বেলেল্লাগিরিতে পুরুষদেরও উপর টেক্কা দিতে পারে এরকম মেয়ে রোজই যে চোখে পড়ছে তার। যে শাস্ত্রকে ওরা উপহাস করে সেই শাস্ত্রবাক্যেব যাথার্থ্যই সে প্রমাণ করছে এই সব ঘৃতকুম্ভের দল আগুনের সংস্পর্শে আসামাত্রই গলগল করে গলে গড়িয়ে পড়ছে একেবারে! তার বাইরের মনটা দমে যাচ্ছিল সত্যি, কিন্তু তার অন্তরের নিভৃতলোকে যে আদর্শবাদী কল্পনাবিলাসীটি বাস করত সে দমেনি। সে জানত, যাদের দেখছি তারা এ যুগের প্রতীক নয়। তারা আধুনিক বেশ-বাসে নিজেদের সজ্জিত করে, আধুনিক ফ্যাশান আর মুদ্রাদোষগুলো আস্ফালন করে রাস্তায় ঘাটে ট্রামে-বাসে হৈ-হুল্লোড় করছে বটে, কিন্তু তারা আধুনিক-আধুনিকা নয়, তারা প্রাগৈতিহাসিক যুগের বন্য বর্বরের দল। ভোলটা শুধু বদলেছে। কিন্তু এও সে জানত ওই বর্বরদের ভিড়ের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সত্যিকার আধুনিক-সত্তা, সংখ্যায় কম বলে তাদের দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তারা আছেই, চানাচুরওলা মহেন্দ্রের মধ্যে যেমন প্রচ্ছন্ন ছিল সঙ্গীত-রসিক, কন্যাদায়গ্রস্ত নীলমণি সেনের মধ্যে যেমন ছিল তেজস্বী পিতা, কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত নগেন্দ্র হাজরার মধ্যে যেমন সে বিবেকী নাগরিককে দেখতে পেয়েছিল, গরীব বিক্‌শাওলা ঝক্‌মুর মধ্যে আবিষ্কার করেছিল নির্লোভ সচ্চরিত্র ভারতীয় কর্মীকে, গরীবের ছেলে কমলাক্ষের মধ্যে পেয়েছিল আত্মত্যাগী বীরকে, তেমনি সত্যিকারের আধুনিকাকেও সে একদিন আবিষ্কার করবে এই হ্যাংলা ভিড়ের মধ্যে এ আশা তার ছিল। যে শুধু আধুনিকা নয়, সুচরিতা, সুশোভনা, সুশিক্ষিতা, অপ্রগলভা, যে আত্মসম্মানী, যে সত্যি স্বাধীন। বর্ণনাকে প্রথম দিনই সেই লরির পাশে দেখে তার মনে হয়েছিল এ মেয়েটি অসামান্যা, একে ঘিরে যে গম্ভীর কমনীয় প্রভাময় পরিবেশ দ্যুতিমান হয়ে আছে, তা সচরাচর দেখা যায় না। এ রহস্যময়, সুদূর এবং সুন্দর। এই রহস্যের যবনিকা তুলতে গিয়ে সে সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেল, পুলকিত হয়ে উঠল তার অন্তরনিবাসী কল্পনাবিলাসী কবি, বলে উঠল,—এই তো, এই তো সে। আধুনিকতার মুখোশ পরা বর্বরদের ভিড়ের একপাশে এই তো সে দাঁড়িয়ে আছে। সসঙ্কোচে নয়, সসম্মানে। এই তো সেই মহিমাময়ী আধুনিকা যে বিপন্ন পরিবারের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে সমর্থ ছেলের মতো, তুলে নিয়েছে কর্তব্য-বোধে, শোভন শালীনতা সহকারে যে নিদারুণ দারিদ্র্য সত্ত্বেও অনায়াসে উপেক্ষা করতে পেরেছে লম্পট সুখময়ের লালসা-ক্লিন্ন প্রস্তাব, যে অপরের সহানুভূতির জন্যে দ্বারে দ্বারে

ঘোরেনি, আত্মবিক্রয় করেনি, হতাশায় ভেঙে পড়েনি, কামনায় বেঁকে যায়নি। মেয়েটি যে কত বড় বংশের, কত বড় মর্যাদার, কত বড় মহিমার উত্তরাধিকারিণী এ খবরও সে পেয়েছিল ভূষণ চক্রবর্তীর কাছে। সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সে, ঠিক করে ফেলেছিল একে সে সাহায্য করবেই। ব্যাংকে তার যে টাকা জমছিল তার কিছুটা না হয় খরচ হয়ে যাবে এই মহৎ কর্মের জন্য। তা যাক। টাকার সম্বন্ধে তার মোহ নেই। কিন্তু এও সে ঠিক করেছিল, যা করবে খুব গোপনে নেপথ্যে থেকেই করবে। বর্ণনা যেন বুঝতে না পারে তার টাকাতেই এসব অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে। ঘর-পোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলেও মনে করবে আবার বুঝি আগুন লাগল। বন্ধু শ্রীনাথনের কাছেও কিচ্ছু ভাঙেনি সে, পাছে তার মনে হয় মেয়েটির প্রেমে পড়েই মিস্টার রায় এসব করছেন।

মিস্টার নাথন পাঁচখানা ছবিই একসঙ্গে সাজিয়ে রেখেছিল তার 'শো-কেসে' পাশাপাশি। ছবিগুলো তার নিজেরও খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু ছ'মাসের আগে যে বিক্রি হয়ে যাবে এ আশা সে করেনি। প্রত্যেক ছবির দাম হাজার টাকা করেই রেখেছিল সে, ভেবেছিল খরিদ্দার এসে একটু দর-দস্তুর করবেই, তখন না হয় কিছু কমানো যাবে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেল যখন সাতদিনের মধ্যেই বিক্রি হয়ে গেল সব ছবিগুলো। পাঁচজন অচেনা খরিদ্দার এসে এক হাজার টাকা করে দাম দিয়েই কিনে নিয়ে গেল সেগুলো একে একে। চানাচুরওলা মহেন্দ্র, কন্যাদায়গ্রস্ত নীলমণি সেন, কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত নগেন হাজরা, রিক্শাওলা ঝক্‌মু, প্রফেসার কমলাক্ষ সিংহ এদের কাউকেই চিনত না শ্রীনাথন। শিল্পীর জাত বলে বাঙালীদের সম্বন্ধে শ্রীনাথনের আগে থাকতেই শ্রদ্ধা ছিল, সে শ্রদ্ধা আরও বাড়ল। ঝক্‌মু আর কমলাক্ষকে আপনারাও চেনেন না। ঝক্‌মুকে নবীন একদিন অন্ধকারে ভুল করে এক টাকার বদলে দু'টাকার নোট দিয়েছিল ভাড়া হিসাবে। ঝক্‌মু তার পরদিন টাকাটা ফেরত দিয়ে যায়। সেই থেকে ঝক্‌মু নবনী রায়ের বন্ধু। কমলাক্ষের সঙ্গে নবনী আলাপ করেছিল স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে খবরের কাগজ পড়ে আর খবরের কাগজে তার ছবি দেখে। কমলাক্ষ তখন স্কুলে পড়ত। এক অন্ধ বুড়ীকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে চাপা পড়েছিল এক মোটরের তলায়। সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিল। খবরটা কাগজে পড়েই নবনী খোঁজ নিয়েছিল গিয়ে হাসপাতালে। রোগা পাতলা ছেলে একটা, কণ্ঠার বুকের হাড় বেরিয়ে আছে। খোঁজ নিয়ে খবর পেল, গরীব মায়ের একমাত্র ছেলে। দুবেলা ভাল করে খেতেও পায় না। তারপর থেকে নবনী আর তাকে ছাড়েনি। নবনীর অর্থানুকুল্যেই বরাবর পড়াশোনা করে এখন সে প্রফেসার হয়েছে।

ছবিগুলো শ্রীনাথনের দোকানে পৌঁছে গেছে এ খবর পেয়েই নবনী এদের প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করে ছবি কিনতে পাঠিয়েছিল। নিজে কেন গিয়ে কিনছে না তার একটা মনগড়া কাহিনীও বলেছিল প্রত্যেককে। আর বলেছিল, খবরদার কথাটা যেন প্রকাশ না পায়।

ছবিগুলি সংগ্রহ করে নিজের বাড়ির একটা ঘরেই তালাবন্ধ করে রেখে দিয়েছিল সে ভূষণ চক্রবর্তীর অজ্ঞাতসারে। এর জন্যে বেশি বেগ পেতে হয়নি তাকে। ভূষণ চক্রবর্তী সমস্ত দিনই বাড়ির খোঁজে বাইরে বাইরে থাকতেন। তাঁকে একটা ঘর দিয়েছিল নবনী। সেই ঘরে তিনি কাজও করতেন, থাকতেনও।

এই ভূষণ চক্রবর্তীই শেষকালে বিপদে ফেলে দিলেন তাকে। অসুখে পড়ে গেলেন তিনি। অসুখে যে পড়বেন তা নবনী আশঙ্কাই করেছিল। নিজের খাওয়া খরচের জন্য নগদ পঁচিশ টাকার বেশি নিতেন না তিনি। নবনী রায়ের অনুরোধ সত্ত্বেও নেননি। ওই পঁচিশ টাকাতে

একটা সস্তা হোটেলে জঘন্য খাবার খেয়ে বাড়ির খোঁজে সমস্ত দিন রোদে রোদে টো-টো করে ঘুরে বেড়াতেন। কিছুতেই ভাল বাড়ি পাচ্ছিলেন না। শেষে নবনী রায়ই তাঁকে দমদমের দিকে ভাল একটা কম্পাউন্ড-ওলা বাড়ির খবর দেন। বাড়িটা দেখে খুব ভাল লাগে তাঁর। অনেকখানি কম্পাউন্ড, বড় একটা গেট, গেট বন্ধ করে দিলে কেউ আর ঢুকতে পারবে না। বাড়িতে মালিকের একটি কর্মচারী ছিলেন, তাঁর সঙ্গেই পাকা কথা ক'য়ে ঠিক করে ফেললেন সব। মাসে পাঁচশ' টাকা করে ভাড়া। আনন্দে উত্তেজনায় শন শন করে ফিরে আসছিলেন তিনি নবনী রায়কে খবরটা দেবার জন্যে। হেঁটেই ফিরছিলেন। কিন্তু এত উত্তেজনা সহ্য হল না তাঁর। বাড়িতে ফিরে সিঁড়িতে উঠতে উঠতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন তিনি অজ্ঞান হয়ে। নবনী তখন বাড়িতে ছিল না। প্রহ্লাদ গিয়ে ডেকে নিয়ে এল ডাক্তার সামন্তকে। তিনি এসে যা করবার করলেন। চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হয়নি, কিন্তু অসুখের কোনো উপশম দেখা গেল না, জ্বর উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। রক্ত পরীক্ষা করিয়ে ডাক্তার সামন্ত বললেন টাইফয়েড হয়েছে। এর নূতন যে ওষুধ বেরিয়েছে তা দিয়ে জ্বরটা কমল বটে, কিন্তু ভূষণ চক্রবর্তী সুস্থ হলেন না। আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকতেন আর প্রলাপ বকতেন।

প্রলাপে বলতেন—"কে, কে যাচ্ছেন ঘরের মধ্যে, যাবেন না। না, আমি যেতে দেব না। খবরদার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তপস্যাই, আপনি ওখানে ঘুজঘুজ করছেন কেন, বাইরে যান। কি বললেন, মাসিক পত্রের সম্পাদক, ওঁকে চুমরে বিনা পয়সায় ছবি নিতে এসেছেন? হবে না, বেরিয়ে যান।"

আবার খানিকক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। তারপর আবার—"বর্ণনা কোথা। বর্ণনার বিয়ের পাত্র আমি নিজে খুঁজব। রূপকথার রাজপুত্র চাই, শিল্পী বনস্পতির উপযুক্ত জামাই চাই। একটা স্বর্ণগর্দভ হলে চলবে না।"

তারপর আবার—"কে হে? ছবি কিনবে? এটা ছবির দোকান নয়। অন্যত্র যাও।" আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর—"বর্ণনা, বর্ণনা কোথা? এদিকে আয়। অমন শুকনো মুখ কেন মা তোর। তোর তো ফুলের মতো ফুটে থাকা উচিত। কত বড় শিল্পীর মেয়ে তুই। তোদের জন্যে খুব ভাল একটা বাড়ি খুঁজে বার করেছি, জানিস? আমার একটা কর্তব্য শেষ হয়েছে"—আবার খানিকক্ষণ পরে—"আর একটা কর্তব্য বাকি আছে। তোর জন্যে একটা ভাল বর খুঁজে বার করতে হবে। বার করবোই।"

আবার চুপচাপ কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ—"বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও এখান থেকে, এটা বেশ্যা বাড়ি নয় যে মজলিশ করবে। না, না, উনি কারও সঙ্গে দেখা করবেন না। এই দারোয়ান—" আবার চুপচাপ।

তারপর—"বর্ণনা, বর্ণনা কোথা গেলি। ও বর্ণনা, সরে আয় না এদিকে। তোর মুখটা ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না।"

শেষে প্রলাপের ঘোরে ভূষণ চক্রবর্তী ক্রমাগত বর্ণনাকে খুঁজতে লাগলেন, এত অস্থির হয়ে পড়লেন যে বিছানায় উঠে উঠে বসতে লাগলেন।

"বর্ণনা আসছে না কেন, কি হয়েছে ওর, নিশ্চয় রাগ হয়েছে।, খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেলছে ওকে সবাই, ও কি অত খাটতে পারে, কচি মেয়ে, রাজার দুলালী। বর্ণনা, বর্ণনা— চিৎকার শুরু করলেন ভূষণ চক্রবর্তী।

নবনী তাড়াতাড়ি গিয়ে ডাক্তার সামন্তকে ডেকে নিয়ে এল। নবনী, প্রহ্লাদ আর সুবাসিনী এরা তিনজনই পালা করে সেবা করছিল, রাত জাগছিল।

ডাক্তার সামন্ত বললেন, "বর্ণনা দেবীকে বরং খবর দিন। তাঁকে দেখলে হয়তো একটু শান্ত হবেন।"

শান্ত হবার একটা ওষুধ দিয়ে চলে গেলেন। ওষুধে কিন্তু ফল হল না! বর্ণনার জন্যে ক্ষেপে গেলেন তিনি যেন। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, "আমি বর্ণনার কাছে যাব, তার হস্টেলে যাব, সে অভিমান করেছে—"

নবনী রায়কে আবার যেতে হল ডাক্তার সামন্তর কাছে। ওয়েটিংরুমে ঢুকেই বুঝতে পারল, ভিতরে লোক রয়েছে। ডাক্তার সামন্ত কাকে যেন বলছেন, "আজ্ঞে না, আপনাদের এখন জন্ম-নিরোধ করবার দরকার নেই। দু'একটা ছেলে-মেয়ে হোক না, তখন আসবেন।"

নবীন রায় শুনতে পেল মৃদুকণ্ঠে একটি মেয়ে বলছে, "না, ছেলে-মেয়ের বড় ঝঞ্ঝাট। ও আমরা চাই না!"

"দেখুন, জন্ম-নিরোধ করে আপনাদের যথেচ্ছাচার করবার সুবিধে করে দেব তেমন লোক আমি নই। আয় এবং স্বাস্থ্য অনুসারে সন্তান সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করাই আমার কাজ। যখন দরকার হবে আমি নিজেই সে কথা বলব আপনাদের। এখন থেকেই ও-কথা ভাবছেন কেন? অন্তত একটা ছেলে হোক, তখন আসবেন—"

একটি বরসা-ধরা পুরুষ কণ্ঠ বলল, "যদি একটু বিবেচনা করে দেখতেন। শ'খানেক টাকা দিতে রাজি আছি আমি।"

"সব জায়গায় ঘুষ চলে না। আচ্ছা, আসুন এখন।"

বাহারে শাড়ি-পরা আধ ঘোমটা দেওয়া একটি মেয়ে এবং একটি ছোকরা বেরিয়ে গেল।

নবনীর মুখে সব শুনে ডাক্তার সামন্ত বললেন, "বর্ণনা দেবীকেই আনিয়ে নিন। ঠিকানাটা জানেন তো?"

"জানি!"

"একটা খবর দিয়ে দিন তাহলে।"

নবনী রায়কে পাদ-প্রদীপের সামনে এসে দাঁড়াতে হল এইবার।

।। পনেরো ।।

বর্ণনাদের বাড়িতে এদিকে তুমুল তাণ্ডব চলছিল। পুলিশের এবং মৃত্যুর। উপর্যুপরি কয়েকদিন সে কলেজে যেতে পারেনি। হস্টেলেও যায়নি, ছবির খবরও নিতে পারেনি। প্রচণ্ড দুর্যোগের সম্মুখীন হয়ে বনস্পতিও আর তোলেনি ছবির কথা।

বিপদ কখনও একা আসে না, বিধাতার রোষ যার উপর পড়ে তাকে একেবারে ছারখার করে দেয়—এই সব প্রবাদ বাক্য হেমন্তকুমারকে দেখেই যেন রচিত হয়েছিল। যে কটি রঙীন বুদ্বুদ সে কোলকাতার রাস্তায় উড়িয়েছিল তার সব কটিই ফেটে গেল।

ছোরা আত্মহত্যা করেছিল। একটা কাগজে লিখে গিয়েছিল, "স্বেচ্ছায় গলায় দড়ি দিলুম। কেন দিলুম তা জেলে গিয়ে সেজদাকে জিগ্যেস করো। আমি তা লিখতে পারব না।" কাটারি পালিয়ে

গিয়েছিল কিরিচের কাছে। তার ভয় করত। সে নাকি ছোরাকে দুদিন দেখতে পেয়েছিল দরজার পাশে, তার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। এর উপর আর এক বিপদ। যে চারটি ছেলেমেয়ে বাচস্পতির কাছে ছিল তাদের প্রত্যেকেরই বসন্ত হয়েছে। আসল বসন্ত। কারো টিকে দেওয়া ছিল না।

একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল কিন্তু। সত্যবতী হঠাৎ সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। যে ভোরে আড়কাটা থেকে দোদুল্যমান ছোরাকে দেখে চিৎকার করে উঠেছিলেন তিনি, সেই ভোর থেকেই তাঁর পাগলামি সেরে গিয়েছিল। একটা দমকা হাওয়ায় কুয়াশাটা যেন উড়ে গেল। সবাই ঘুমিয়ে পড়বার পর ছোরা গভীর রাত্রে গলায় দড়ি দিয়েছিল। ভোরবেলা সত্যবতীই তাকে প্রথম দেখতে পান। তাঁর যে গগন-বিদারী আর্ত হাহাকার পাড়ার সবাইকে জাগিয়ে তুলেছিল সেই হাহাকারই নাকি জাগিয়ে তুলেছিল তাঁর আচ্ছন্ন সত্তাকে, তীব্র বেদনার তাড়নায় পাগলামি সেরে গিয়েছিল। ডাক্তার চক্রবর্তীর এই মত।

সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনি। তাঁর চোখে মুখে একটা অপ্রতিভ কুণ্ঠিত ভাবও ফুটে উঠেছে, এতদিন কর্তব্য-কর্মে মন দিতে পারেননি বলে তিনি লজ্জিত। লাঠি সোঁটা বল্লম বন্দুক কিরিচ ছোরা এদের কথা উল্লেখ পর্যন্ত করেননি, এদের জন্য এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলেননি। অত্যন্ত শান্ত ভাবে নিজের কাজ করে যাচ্ছেন। বর্ণনার মনে হচ্ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিক হাসপাতাল থেকে ভাল হয়ে আবার যেন 'ডিউটি'তে ফিরে এসেছে অনেকদিন পরে।

একদিন শুধু কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "উনি তো নিজে সংসারের জন্যেই দিনরাত মেহনত করছেন সংসারের উপকার হবে বলে ছেলে-মেয়েদেরও কাজে লাগিয়েছিলেন। এমনটা যে হবে কে জানত। আমিই মাথা ঠিক রাখতে পারলুম না বলে এসব হল। আমি ঠিক থাকলে এমন হত না। হালে মাঝি না থাকলে নৌকো তো বানচাল হবেই।"

এই বলে হেসেছিলেন একটু। করুণ বিষণ্ণ হাসি।

এই নিদারুণ দুঃখের পটভূমিকায় বাচস্পতি-সীমন্তিনীরও নূতন রূপ ফুটে উঠেছিল। বাচস্পতি যে বাড়ির বড় ছেলে এবং সীমন্তিনী যে বাড়ির বড় বউ সেটা এইবার যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠল। এই বিপদেও দুজনেই অবিচলিত, দুজনেই হাসিমুখ, যেন কিছুই হয়নি। সীমন্তিনী সত্যবতীকে রোজ বলেন, "উনি বলছিলেন আমরা যতক্ষণ আছি তোমাদের কোনো ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। ভগবানকে ডাক, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

বাচস্পতি বর্ণনাকে বললেন, "তোমার বড়মার গয়নাগুলো ব্যাংক থেকে বার করে বিক্রী করে দাও। তোমার আর তোমার মায়ের গহনা এখন থাক। তোমার বড়মার গয়না বিক্রি করলে অন্তত হাজার পাঁচ ছয় টাকা হবে, ও টাকাটা শেষ হয়ে যাবার পর যদি দরকার হয় তখন তোমাদের গয়নায় হাত দেব।"

জ্যাঠামশায়ের আদেশ অমান্য করা সম্ভব ছিল না বর্ণনার পক্ষে। বড়মার গয়না বিক্রি করে সাড়ে ছ'হাজার টাকা পাওয়া গেল। সেটা ব্যাংকে জমা করে পাশ বুকটা বাচস্পতিকে এনে দিলে সে।

"ওটা তোর কাছেই রাখ। তোকেই তো বার করতে হবে ব্যাংকে গিয়ে। এখন কিছুদিনের জন্যে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তুমি হস্টেলে গিয়ে পড়াশোনায় মন দাও এবার। ভাল করে এম এ.-টা পাশ করা চাই। হ্যাঁ, আর তোর বন্ধু সুদেষ্ণার বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র এসেছে দেখেছিস? তাকে ভাল একখানা বেনারসী শাড়ি কিনে পাঠিয়ে দে। খেলো জিনিস দিসনি। দেড়শ' দু শ' টাকায় ভাল শাড়ি হবে না? তাই দিস। আর তোর বাবাকে বল্ সে ছবি আঁকতে আরম্ভ করুক এবার। মন-স্থির করে বসলেই পারবে। আর আমি যখন রয়েছি ওর অত ভাবনা কি—"

বাচস্পতির মনোভাবটা আরও স্পষ্ট হয়েছে 'সুখপুর-পত্রিকা'র একটি সংবাদে। উদ্ধৃত করছি।

''ঘরের খবর। আমাদের আত্মীয় হেমন্তকুমারকে ভগবান শাস্তি দিতেছেন। এ শাস্তি তাহার প্রাপ্য কিনা, শাস্তি অত্যন্ত বেশি কঠোর কিনা তাহা বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই। এইটুকু শুধু বলিতে পারি এক্ষেত্রে আমরা ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করিব। যতক্ষণ আমাদের দেহে ও মনে শক্তি থাকিবে ততক্ষণ আমরা হেমন্তকুমার ও তাহার পরিবারবর্গকে ভগবানের শাস্তি হইতে বাঁচাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিব। ফল কি হইবে তাহা জানি না। সে সম্বন্ধে চিন্তাও করিব না। কারণ স্বয়ং ভগবানই গীতায় বলিয়াছেন, কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নহে, সুতরাং ফল লইয়া মাথা ঘামাইও না।

উপর্যুপরি বিপৎপাতে শ্রীমান বনস্পতিও বেশ বিচলিত হইয়াছে। কলিকাতায় আসিয়া অবধি সে জল-চ্যুত মীনের মতো ম্রিয়মাণ হইয়া ছিল, একটিও ছবি আঁকিতে পারে নাই, সর্বদাই কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া থাকিত। সম্প্রতি সে আরও যেন দমিয়া গিয়াছে। নিজেকে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য ঘরের কাজে মন দিয়াছে। রাস্তার কল হইতে জল আনে, ঘর ঝাঁট দেয়, এমন কি কাপড় কাচে। শ্রীমতী সরস্বতী রান্নার যাবতীয় ভার বহন করিতেছে। যাহারা স্বপ্নের জগতে বাস করিয়া বিবিধ বর্ণের বেলুনে উড়িয়া বেড়াইত, ভগবান তাহাদের রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন করিয়া সম্ভবত মজা দেখিতেছেন। ভগবান তাঁহার লীলা-বিলাসে মত্ত থাকুন, আমরা আমাদের কর্তব্য হইতে বিমুখ হইব না। আমি অদ্য বনস্পতিকে শাসন করিয়া দিয়াছি। বলিয়াছি, 'দেখ, শাণিত ক্ষুর দিয়া কেহ কখনও বৃক্ষশাখা ছেদন করে না। তুমি শিল্পী, তুমি ছবি আঁক, জল-আনা, কাপড়-কাচার জন্য আমি একটি দাসী নিযুক্ত করিয়া দিতেছি। সংসারের তুচ্ছ খুঁটিনাটি লইয়া তোমাকে চিন্তা করিতে হইবে না। সেজন্য আমি আছি। বধূমাতারও রান্নাঘরে সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। একটি পাচিকা বা পাচক ঠিক করিয়া দিতেছি। বধূমাতা তোমাকে যেমন ছবি আঁকায় সাহায্য করিত তেমনি করুক। এখনও তো আমরা একেবারে নিঃস্ব হই নাই, তোমার ভাবনা কি। তুমি ছবি আঁক।' আমার কথায় সে ছবি আঁকিতে বসিয়াছিল কিন্তু কিছুই আঁকিতে পারে নাই। সম্ভবত এ পরিবেশই তাহার ছবি আঁকার অনুকূল নহে। তাহাকে দেখিয়া মনে হইল, সে-ই বোধহয় সর্বাপেক্ষা বেশি বিপন্ন। কিন্তু রাত্রে আমার এ ভুল ভাঙিল, বুঝিলাম হেমন্তকুমারই সবচেয়ে বেশি দুঃখী। গত রাত্রে রাস্তায় ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া বাহিরে গেলাম। দেখিলাম পথের উপর নর্দমার পাশে বসিয়া হেমন্তকুমার দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে। হেমন্তকুমারকে ইতিপূর্বে কখনও কাঁদিতে দেখি নাই। সে সর্বদাই সপ্রতিভ। তাহাকে রোরুদ্যমান দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তাহার পাশে বসিয়া তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে অনেক সান্ত্বনা দিলাম।

বলিলাম, 'ভাই, ভাঙিয়া পড়িও না। বিপদে ধৈর্যই বল। কর্মফল সকলকেই ভোগ করিতে হয়। তুমি উদ্যমশীল কর্মী লোক। একটি দিনও অলসভাবে বসিয়া থাক না। কিন্তু যদি রাগ না কর একটি কথা তোমাকে বলিব। তুমি গৈরিক বাস পরিত্যাগ কর। গৈরিক ধারণ করিবার যোগ্যতা আমাদের কাহারও নাই। খুব কম লোকেরই সে যোগ্যতা থাকে। জ্যোতিষীর ব্যবসাও আমার মতে ভাল ব্যবসা নহে, সাধারণত উহা ভণ্ডামি এবং মিথ্যাচারের নামান্তর মাত্র। আমার মতে এইটিও তুমি পরিত্যাগ কর। সুবিধা মতো অন্য কোন কাজ যোগাড় করিয়া লও। যদি যোগাড় করিতে না পার, ঘরেই বসিয়া থাক। আমি যতক্ষণ বাঁচিয়া আছি, তোমার কোন চিন্তা নাই।'

হেমন্তকুমার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—'চিরকাল আমরা তোমাদেরই খাইয়া পরিয়া মানুষ হইয়াছি। কিন্তু দুর্দিনে আর তোমাদের ভার বাড়াইতে চাহি না। যেমন করিয়া পারি যতটুকু পারি,

তোমাদের সাহায্য করিব। জ্যোতিষী ব্যবসায় যে জুয়াচুরির নামান্তর তাহা আমি জানি, কিন্তু যে সমাজে, যে শাসন ব্যবস্থায় সর্বত্রই অন্যায় অবিচার ও জুয়াচুরি সেখানে আমি সৎ থাকিব কেমন করিয়া? আমি ইচ্ছা করিয়াই জুয়াচুরি করিতেছি, সমাজের উপর প্রতিশোধ লইতেছি, বোকা অথচ পাজি লোকগুলার কান মলিয়া টাকা আদায় করিতেছি। আমাকে তুমি বাধা দিও না। অন্য কোন্ কাজ করিব বল? আমার কোন যোগ্যতাই যে নাই।'

আমি কি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না।"

॥ ষোলো ॥

হেমন্তকুমার বাচস্পতির অনুরোধ শোনেনি। গেরুয়া পরেই রোজ বেরিয়ে যাচ্ছিল সে। সমস্ত দিন বাইরে বাইরেই থাকত। রোজগারের চেষ্টায় হন্যে কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে। এক রাস্তা থেকে আর এক রাস্তায়। দিনের বেলা বাইরেই খেয়ে নিত কিছু, কিম্বা কিছুই খেত না। বাড়ি ফিরত রাত এগারোটা বারোটার পর।

একদিন তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সহদেবের। সেই সহদেব, যে 'সুখপুর কার্ড ক্লাব' স্থাপন করেছিল। সে গৈরিকধারী হেমন্তকে দেখে অবাক হয়ে গেল। "হিমুদা, এ কি কাণ্ড?"

হেমন্ত কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল তার দিকে গম্ভীর ভাবে।

তারপর সংক্ষেপে বলল—"পেটকা ওয়াস্তে। তুই কি করছিস?"

"আমি এক গুজরাটি বিড়ির দোকানে চাকরি করি।"

"যাক চাকরি একটা পেয়েছিস তাহলে--"

"অতি কষ্টে। বাঙালীকে আজকাল কেউ চাকরি দিতেই চায় না হিমুদা। বলে তোমরা ফ্যাক্টারিতে ঢুকলেই স্ট্রাইক করাবে। তোমাদের চাকরি দেব না। এই গুজরাটির হাতে-পায়ে ধরে অনেক কষ্টে চাকরিটি পেয়েছি। বকুদা বনুদা কেমন আছেন?"

"টিকে আছেন কোন রকমে।"

"তোমার এ ব্যবসা কেমন চলছে?"

"এক রকম। তবে তুই যদি একটু সাহায্য করিস আরও ভাল ভাবে চলবে। তোকে কিছু কমিশনও দেব।"

"বল কি করতে হবে। নিশ্চয় করব সম্ভব হলে—"

"একটু অভিনয় করতে হবে। তুই রোজ আমার কাছে হাতজোড় করে এসে বসবি, আর যেই কেউ কাছাকাছি আসবে অমনি গদগদকণ্ঠে একটু জোরে জোরে বলবি, ঠাকুর মশাই ধন্য আপনার গণনা। আপনার কথা অনুসারে চলে রেসে বিস্তর টাকা পেয়েছি। কোনদিন বা বলবি, ধন্য আপনার মাদুলি, হাঁপানি একদম সেরে গেছে। কোনদিন বলবি, ধন্য আপনার কবচ, চাকরি পেয়ে গেছি। কোনদিন বলবি, কি বশীকরণই করেছিলেন, অদ্ভুত ফল হয়েছে। এখন মেয়েটা আমার পায়ে লুটোপুটি খাচ্ছে। ধন্য আপনার গণনা, ধন্য আপনার তান্ত্রিক ক্রিয়া, আপনি মহাপুরুষ, আপনি দেবতা—"

চিৎকার করতে লাগল হেমন্ত। সহদেব ভয় পেয়ে গেল। প্রলাপ বকছে নাকি হিমুদা। চোখ দুটো কেমন যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। রগের শিরগুলো ফুলে উঠেছে।

"এই উপকারটা করতে পারবি?"

"তা পারব না কেন—"

"ওই একটা লোক আসছে। বল তাহলে জোরে জোরে—"

বিস্মিত সহদেব হাতজোড় করে বলতে লাগল—"ঠাকুর মশাই, ধন্য আপনার মাদুলী, হাঁপানি একদম সেরে গেছে—ধন্য আপনার গণনা—"

লোকটা এল, চলে গেল, দাঁড়াল না।

এইভাবে চলল কিছুদিন। সে কবে কোন্ পার্কে বা কোন্ রাস্তায় বসবে তা আগে থাকতে সহদেবকে বলে দিত। সহদেব ঠিক আসত। এতে তার রোজগার বেড়েছিল কিছু। সহদেবকে টেন্ পারসেন্ট দিয়েও কিছু বাঁচত তার।

হঠাৎ একদিন আর এক কান্ড হল। সেই বাবরি-চুলওলা শশাঙ্ক দাস তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"আরে, ঠাকুর মশাই, আপনি এখানে বসছেন নাকি আজকাল! এদিকে আমি আপনার খোঁজে সারা কোলকাতা শহর চষে বেড়াচ্ছি। আপনার বশীকরণে কি অদ্ভুত ফলই যে ফলেছে তা কি আর বলব। সোনামণি এক্কেবারে আমার হাতের মুঠোয় এখন। অবশ্য এক ছড়া ভারী বিছে হার গড়িয়ে দিতে হয়েছিল, কিন্তু আপনার ক্রিয়ায় কাজ যে হয়েছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। খুব কাজ হয়েছে। তিন আইনের জোরে বিয়েও করে ফেলেছি তাকে। ন্যাটা চুকিয়ে দিয়েছি। আপনি চলুন, আশীর্বাদ করে আসবেন।" শশাঙ্ক দাস প্রণাম করে নগদ পঁচিশটি টাকা দিলে।

"আপনার জন্যে এক জোড়া কাপড় আর একটি মখমলেব চাদরও গেরুয়া ছুপিয়ে রেখে দিয়েছি। বাড়িতে পায়ের ধুলো পড়লে সেখানেই দেব। যাবেন এখন? রিক্‌শা ডাকব?"

"ডাক।"

রিক্‌শায় যেতে যেতে শশাঙ্ক দাস বললে, "আর একটি কাজও করে দিতে হবে ঠাকুর মশাই। যাতে ছেলেপিলে না হয় তার একটা ব্যবস্থা করে দিন। ছেলেপিলে হতে আরম্ভ করলেই শরীরের বাঁধুনিটা চলে যায়, বুঝলেন না। ছেলেপিলে চাই না। একজনের কথায় ডাক্তার সামন্তর জন্ম-নিরোধ ক্লিনিকে গেসলাম কিন্তু লোকটা একটু ইয়ে গোছের, এক শ' টাকাতেও রাজি হল না। হয়তো দু শ' পাঁচ শ' দিলে হত, কিন্তু অত টাকা হাতে নেই। বাবা দোকানে বসে কিনা। আপনি তন্ত্র মন্ত্র কিছু একটা করে দিন। তন্ত্রে মন্ত্রে হবে কিছু?"

"হবে। ওই এক শ' টাকাতেই হবে।"

"বেশ, ব্যবস্থা করে ফেলুন তাহলে।"

তারপর হেমন্তকুমারকে একটা কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বললে, "আর একটা বিয়েও পাকছে। সোনামণির একটা বোন আছে, আমার এক মাসতুতো ভাই তাকে দেখে ক্ষেপেছে। ক্ষেপবার কথাই, ডব্‌কা ছুঁড়ি যাকে বলে। এর বিয়েটা চটপট দিয়ে দিতে হবে। মেয়েটা রাজি হয়েছে"—তারপর চুপি চুপি—"সাধে হয়েছে; পোয়াতি হয়ে গেছে ছুঁড়ি, এই রোকো, রোকো—" রিক্‌শা একটা খোলার বাড়ির সামনে থামল।

"কই সোনামণি, কপাট খোল, কপাট খোল। ঠাকুর মশাইকে পাকড়াও করে এনেছি।"

এইবার ভগবান আর একটি বজ্র হানলেন হেমন্তর মাথায়। কপাট খুলে বেরিয়ে এল বন্দুক, আর তার পিছনে কিরিচ আর কাটারি।

হেমন্তকুমার হঠাৎ ঘুরে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল গলি থেকে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শশাঙ্ক দাস।

।। সতেরো ।।

পর পর তিনদিন গিয়েও বর্ণনার দেখা পেল না নবনী। হেমন্তকুমার হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়াতে আবার তাকে ঘুরতে হচ্ছিল থানায় থানায়, হাসপাতালে হাসপাতালে। তাছাড়া আর এক বিপদ হয়েছিল, কোদাল কুড়ুল খন্তা তিনজনই মারা গিয়েছিল। সড়কি শুষছিল। বর্ণনা বাড়িতে বসতে পারছিল না এক মুহূর্ত; সব ব্যবস্থা তাকেই করতে হচ্ছিল, সব ভার তার উপর।

কয়েকদিন পরে হেমন্তকুমারের এক ঠিকানাহীন চিঠি আসতে পারিবারিক আবহাওয়া কিছু যেন শান্ত হল। হেমন্তকুমার লিখেছে—আমি ভাল আছি। আমার জন্যে তোমরা চিন্তা কোরো না। যথাসময়ে গিয়ে হাজির হব। নতুন কাজ শিখছি একটা। কয়েকদিন দেরি হতে পারে।

ভূষণ চক্রবর্তী অনেকটা সামলেছিলেন। জ্বর ছিল না, কিন্তু বর্ণনাকে দেখবার জেদ কমেনি। তাঁর আগ্রহাতিশয্যে নবনীকে আর একবার বর্ণনার খোঁজে বেরুতে হল। যাবার আগে সে ভেবে নিয়েছিল কি করবে। একটা কথা সে বুঝতে পেরেছিল যে বর্ণনার সঙ্গে যে ছলনা সে এতদিন করেছে তা আর চালানো যাবে না। সে বর্ণনাকে বলেছিল সে কোলকাতার বাইরে থাকে, হেমন্তকুমারকেও বলেছিল সে কথা। কিন্তু ভূষণ চক্রবর্তীর সঙ্গে বর্ণনার দেখা হলেই তো সব ফাঁস হয়ে যাবে। আরও কতকগুলো মিথ্যা কাহিনী রচনা করে এ ব্যাপারটাকেও অন্য রঙে রাঙিয়ে দেবার মতো কল্পনা-শক্তি তার যে ছিল না তা নয়, কিন্তু তা করতে তার আর প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। কারণ সে জানত সত্য একদিন না একদিন আত্মপ্রকাশ করবেই। আর যখন করবে তখন বর্ণনার কাছে অত্যন্ত খেলো হয়ে যেতে হবে তাকে। বর্ণনা নিঃসন্দেহে তাকে মিথ্যাচারী ভণ্ড বলে মনে করবে। হয়তো এ-ও ভাববে যে এ সবের পিছনে নিশ্চয় তার একটা নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে, হয়তো তাকে সুখময়বাবুরই নূতন সংস্করণ মনে করবে। বর্ণনার মনে এ ধরনের সন্দেহ যাতে না হয় সেই জন্যই তো সে গোপনতার আশ্রয় নিয়েছিল। বর্ণনাকে টাকা দিয়ে প্রলুব্ধ করে নিজের দিকে আকর্ষণ করবার আকাঙ্ক্ষা তার সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না, এখনও নেই। বর্ণনার মতো মেয়ে, বনস্পতির মতো শিল্পী, ভূষণ চক্রবর্তীর মতো আদর্শবাদী এই বর্বর সভ্যতার স্টিম-রোলারের তলায় চাপা পড়ে আর একটু হলে মারা যাচ্ছিল, সে তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। কর্তব্যবোধেই করেছে। এই জন্যে সে কোন বাহবাও প্রত্যাশা করে না, এর পিছনে তার কোনো উদ্দেশ্যই নেই। সে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিল কি করবে।

বর্ণনার সঙ্গে বাড়িতে দেখা হল না। তার হস্টেলে যেতে হল। বাচস্পতি বর্ণনাকে জোর করে আবার হস্টেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কমন-রুমে বসে একটা স্লিপে নিজের নাম লিখে পাঠিয়ে দিতেই বর্ণনা সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, "আপনি এসেছেন? আপনাকেই খুঁজছিলাম আমি মনে মনে।"

"কেন?"

"কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য। আপনি কি উপকার যে করেছেন আমার। বাবার পাঁচখানা

ছবিই বিক্রি করে দিয়েছেন আপনার বন্ধু। আর প্রত্যেকটা এক হাজার টাকা করে। এটা সত্যি প্রত্যাশা করিনি। আমি ওঁকে কিছু কমিশন দিতে চাইলাম, কিন্তু উনি নিতে চাইলেন না। আপনি একটু বলবেন তো ওঁকে—"

"ও আমার কাছ থেকে কমিশন নেবে না।"

"কিন্তু আপনার কাজ তো করেননি, করেছেন আমার কাজ।"

"আমার অনুরোধেই করেছে। টাকাটা পেয়ে গেছেন তো?"

"হ্যাঁ—"

"এইবার আরও খানকয়েক ছবি দিন ওকে। সে পরে দেবেন এখন। আপাতত একটি দুঃসংবাদ শোনবার জন্য প্রস্তুত হোন—"

"কি দুঃসংবাদ?"

"ভূষণ চক্রবর্তী বলে আপনার বাবার একজন ভক্ত তাঁর জন্যে একটা ভাল বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আমার বাসায়। আপনাকে দেখতে চাইছেন। আপনি চলুন একবার।"

"আপনার বাসায়? আপনি তো কোলকাতার বাইরে থাকেন বললেন সেদিন। কোথা যেতে হবে আমাকে?"

"এখানেও আমার একটা ছোট বাসা আছে। সেইখানেই আছেন তিনি।"

"সেখানে এলেন তিনি কি করে?"

"সব বলব। চলুন।"

"এখনই যেতে হবে?"

"এখনই যাওয়াই তো ভাল। বড্ড অস্থির হয়েছেন আপনার জন্যে।"

"একটু অপেক্ষা করুন তাহলে। কাপড়টা বদলে আসি।"

ভিতরে ঢুকেই আকাশ-পরীর সঙ্গে দেখা হল বর্ণনার।

"আকাশ, আমি একটু বেরুচ্ছি।"

"আগেই জানতাম।"

"কি করে জানলি?"

"ভদ্রলোক এসেছেন দেখে আড়ি পাতছিলাম। আজ মাদ্রাজীর ছদ্মবেশ ছেড়ে এসেছেন দেখছি। চমৎকার দেখতে ভদ্রলোক। তোরা দুজনে যখন পাশাপাশি কথা বলছিলি এমন সুন্দর লাগছিল।"

বলেই সে কবিতা আওড়াতে লাগল।

"সোনার সঙ্গে সোহাগা যেন রে
মালার সঙ্গে গলা
কমল-নয়নে কাজলের রেখা
ফলারেতে পাকা কলা।
(আহা) মানিয়েছে ভাল, মানিয়েছে খাসা
পান্নার পাশে চুনি

তপোবন মাঝে অপ্সরা হেরি
বিব্রত যেন মুনি।"

"ফাজিল কোথাকার! ওই এক চিন্তা খালি—"

বর্ণনা কাপড় বদলাইবার জন্যে ঘরে ঢুকল। আকাশ-পরীও ঢুকল তার পিছু পিছু কীর্তনের সুরে গাইতে গাইতে—

"কহিছে শ্রীরাধা কোথা শ্রীকৃষ্ণ
কোথা তুমি বনমালী
কোথা শ্রীবৎস কোথা শ্রীবৎস
কহিছে চিন্তা খালি।
সখি, কেন কর মুখে এ কপটতা—
গাহিবার মতো এই তো রাগিণী
কহিবার মতো এই তো কথা।"

বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল একটু পরেই।

নবনী রায় বললে, "এইবার আমি চললাম।"

"কোথা যাবেন?"

"আমি এবার বিদায় নিতে চাই। আর আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে না"— তারপর ব্যাগ থেকে একটি কাগজ বের করে দিয়ে বললেন, "এটা ভূষণবাবুকে দিয়ে দেবেন। দমদমের বাড়িভাড়ার রসিদ। এক বছরের বাড়িভাড়া দেওয়া আছে।"

"কোথা যাচ্ছেন এখন?"

"হিমালয়ের দিকে যাব"—তারপর হেসে বললে—"আবার ভেসে ভেসে বেড়াব আর কি, যেখানে গিয়ে ঠেকি—"

বর্ণনা তার মুখের দিকে চকিতে চেয়ে দেখল একবার।

"ভূষণ কাকার সঙ্গে দেখা করবেন না?"

"না। তাঁকে এত বেশি শ্রদ্ধা করি যে তিনি যদি যেতে মানা করেন আমাকে থেকে যেতে হবে। কিন্তু আমার আর থাকবার ইচ্ছে নেই। উনি অনেকটা সেরে উঠেছেন, এবার আপনি ওঁর ভার নিন। আমাকে ছুটি দিন।"

"কিন্তু কোনও কারণে আপনাকে যদি আমার দরকার হয়। কি করে খবর দেব আপনাকে?"

"চান যদি আমার ঠিকানাটা দিতে পারি। আপাতত সিমলা যাচ্ছি, সেখানে একটা হোটেলে উঠব, সেই ঠিকানাটাই রাখুন।"

একটা কার্ডের পিছনে ঠিকানাটা লিখে দিয়ে, ট্যাক্সিভাড়া চুকিয়ে হাসিমুখে নমস্কার করে চলে গেল নবনী রায়।

বর্ণনা তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। নবনী রায় দেখতে দেখতে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার দিকে ফিরেও চাইলে না।

বর্ণনাকে দেখেই বিছানায় উঠে বসলেন ভূষণ চক্রবর্তী।

"বর্ণনা এসেছিস? আয়, এইখানটায় বোস। তোকে দেখবার জন্যে মনটা ছটফট করছিল। কেমন আছিস, তোর বাবা কেমন আছে?"

ভূষণ কাকার জরাজীর্ণ চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল বর্ণনা। তাঁর শরীরটা ভেঙে পড়েছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। এ অবস্থায় তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা তাঁকে বলবার সাহস হল না তার।

বললে, "ভালই আছি আমরা।"

"তোর বাবা নতুন কোন ছবি এঁকেছে আর?"

"না। অত ভিড়ে গোলমালে কি ছবি আঁকা হয়!"

"হয় কি? হবে না জানতাম। কিন্তু এবার হবে। খুব ভাল বাড়ি ঠিক করেছি তোদের জন্য একটা। সেখানে গেলে দেখবি ছবির পর ছবি হবে। কি বড় বড় ঘর, প্রকাণ্ড হাতা, চমৎকার বাগান, কোলকাতাতেও যে দোয়েল থাকতে পারে তা ওইখানেই প্রথম দেখলুম। চমৎকার বাড়ি—"

"নবনীবাবুর কাছে শুনলাম। তিনি এই রসিদটা তোমাকে দিয়ে গেলেন। বাড়িটার এক বছরের অগ্রিম ভাড়া দেওয়া হয়েছে। টাকাটা কি নবনীবাবু দিলেন?"

"হ্যাঁ, সেই তো কথা ছিল। নবনীবাবু কোথা?"

"তিনি তো চলে গেলেন।"

"চলে গেলেন। কোথা চলে গেলেন?"

"বললেন হিমালয়ে যাচ্ছি।"

"হিমালয়ে!" নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন ভূষণ চক্রবর্তী।

কয়েক মুহূর্ত পরে বললেন, "হিমালয়ে চলে গেলেন! সে যে অনেক দূর। আমি যে এদিকে মনে মনে—" আবার স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি।

"কি?"

"হিমালয়ে কোথায় গেছে জানিস?"

"একটা ঠিকানা দিয়ে গেছেন।"

ভূষণ চক্রবর্তীর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। "ও, ঠিকানা দিয়ে গেছেন? এখুনি চিঠি লেখ, লেখ, আপনি চিঠি পেয়েই চলে আসুন।"

"আসতে বলছেন কেন?"

"না বললে আর আসবে না। নির্বিকার মহাপুরুষ লোক। এ রকম লোক আমি আর দেখিনি। স্বয়ং শিব। লেখ লেখ, এখুনি লেখ—ফিরে আসুন, আপনি ফিরে আসুন। ওই টেবিলে কাগজ, কলম, খাম সব আছে। এখুনি লেখ, আমার সামনে বসে লেখ।"

ভূষণ কাকার আগ্রহাতিশয্যে লিখতে হল চিঠিটা। তারও যে খুব একটা অনিচ্ছা ছিল তা নয়, তারও খুব ভাল লেগেছিল লোকটিকে।

কিন্তু চিঠি লিখতে লজ্জা করছিল তার।

যতদূর সম্ভব সংযত ভাষায় সে লিখলে—

প্রিয় নবনীবাবু,

আপনি হঠাৎ চলে যাওয়াতে ভূষণ কাকা ভারী অস্থির হয়ে পড়েছেন। তাঁর খুব ইচ্ছা আপনি আবার ফিরে আসুন। কিছুদিন পরে না হয় আবার যাবেন। তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছাও যুক্ত করলাম। আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

ইতি—বর্ণনা

চিঠিটা হস্তগত করে ভূষণ চক্রবর্তী হাঁক দিলেন—"প্রহ্লাদ।"

প্রহ্লাদ পাশেই ছিল, এসে হাজির হল।

"এই চিঠিটা এক্ষুনি ডাকে দিয়ে এস। তোমার বাবু হঠাৎ হিমালয়ে চলে গেলেন কেন?"

"উনি মাঝে মাঝে ওই রকম চলে যান। আবার ফিরে আসবেন দিন কতক পরে।"

"উনি না থাকলে এখানকার খরচ-পত্র চলে কি করে?"

"সে ব্যাঙ্কে সব বলা আছে। আমি গেলেই টাকা পাই। আর বাড়িভাড়া প্রতি মাসে বাড়িওলার কাছে চলে যায়। সেজন্যে কিছু আটকায় না।"

চিঠি নিয়ে চলে গেল প্রহ্লাদ। নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন ভূষণ চক্রবর্তী। তারপর ধীরে ধীরে আবৃত্তি করতে লাগলেন—

"মহার্ঘ শয্যাপরিবর্তন-চ্যুতৈঃ স্বকেশ পুষ্পৈরপি যা স্ম দূয়তে
অশেত তা বাহুলতোপধায়িনী নিষেদুষী স্থণ্ডিল এব কেবল।

দামী বিছানায় পাশ ফিরবার সময় চুল থেকে যে ফুল খসে পড়ত তার স্পর্শেও যিনি কাতর হতেন সেই উমা এখন হাতে মাথা রেখে মাটিতে শুয়ে থাকেন, মাটিতেই বসে থাকেন।"

"কি বলছ ভূষণ কাকা ওসব!"

"কালিদাসের কুমার-সম্ভবে উমার তপস্যার যে বর্ণনা আছে তা এখন মনে পড়ল হঠাৎ। উমা অনেক তপস্যা করেছিল তাই মহাদেবকে পেয়েছিল। তোকেও করতে হবে। তোরা সবাই তো উমা—"

বর্ণনার কান এবং গালের খানিকটা লাল হয়ে উঠল। কথার মোড়টা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য বলল, "আমরা নতুন বাড়িতে কবে যাব?"

"আমি আর একটু জোর পাই। বাড়িটা পরিষ্কার করাই, সাজাই, তখন যাস। তোর বাবাকে এখন কিছু বলিস না যেন। তাকে একটা 'সারপ্রাইজ' দেব আমরা।

"হ্যাঁ, সেই বেশ হবে।"

একটু পরেই প্রহ্লাদ এসে জিজ্ঞাসা করল, "উনি ছবিগুলোর কথা কিছু বলে গেছেন কি?"

"কোন ছবিগুলো?"

"উনি পাঁচখানা ছবি কিনে রেখে গেছেন পাশের ঘরে। সেগুলো কি ওখানেই থাকবে?"

"দেখি কি ছবি।"

পাশের ঘরে গিয়ে বর্ণনা ছবিগুলো দেখে অবাক হয়ে গেল।

তারপর সে ভূষণ কাকার কাছে শুনল দমদমের বাড়িভাড়া করার কাহিনী। তারও মনে হল এরকম লোক কি সম্ভব এ যুগে?

এ যে কল্পনাতীত!

।। আঠারো ।।

আরও দিন দশেক ভুগে সড়কিও মারা গেল।

কান্নার রোল পড়ে গেল বাড়িতে। বাচস্পতি বালকের মতো লুটিয়ে কাঁদতে লাগল। সীমন্তিনী মূর্ছা গেল। সরস্বতীর চোখ দিয়ে ঝরে পড়তে লাগল নীরব অশ্রুধারা। সে সাধারণত নীরব প্রকৃতির, শোকেও নীরব রইল। স্থির প্রস্তরমূর্তিবৎ বসে রইলেন সত্যবতী, তাঁর চোখে এক ফোঁটা জল নেই, মুখে একটি কথা নেই। বনস্পতিরও না। কাঁদতে পারলে সে খানিকটা হালকা হত। কিন্তু সে কিছুতেই কাঁদতে পারল না, একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা তার সারা বুকটাকে মুচড়ে দিতে লাগল কিন্তু সে কাঁদতে পারল না। মাথা হেঁট করে গলির এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে লাগল শুধু।

বর্ণনা হতবাক হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর হস্টেলে চলে গেল।

আর দিন কয়েক পরে, শোকের তীব্রতাটা যখন কিছু কমেছে, তখন হেমন্তকুমার এসে হাজির হল হঠাৎ একটা রিক্‌শা টানতে টানতে। পরনে ছেঁড়া ময়লা হাফপ্যান্ট, হাফশার্ট, মাথায় একটা পাগড়ি। গৈরিক নয়, ময়লা খাকি।

বাচস্পতির দিকে চেয়ে বলল, "তোমার উপদেশ শুনেছি বকু। গেরুয়া জ্যোতিষ সব ছেড়ে দিয়েছি। একটা খাটালে রিক্‌শা টানা শিখছিলাম। এখন থেকে আমি রিক্‌শাই টানব।"

বাচস্পতির চোখে দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে। তার বাকি চারটি সন্তানও আর বেঁচে নেই একথা শুনে খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইল হেমন্ত। তারপর বলল, "মরে বেঁচেছে। বেঁচে থাকলে হয় বেশ্যা হত, না হয় জেলে যেত।"

সত্যবতী নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে বসেছিলেন, সত্যিই যেন তিনি পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। স্বামীর এই পরিবর্তনে তিনি কিছুমাত্র আশ্চর্য হলেন না। সমস্ত অনুভূতির অতীত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি যেন। তাঁর মুখে একটি ভাবই কেবল ফুটে ছিল, তিনি লজ্জিত, কুণ্ঠিত, অপ্রতিভ। তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল হেমন্ত।

তারপর বলল, "সব তো ফুরিয়ে গেল। এস আমার সঙ্গে—"

"কোথা যাব?"

"এস না।"

সত্যবতী যন্ত্রচালিতবৎ গিয়ে রিক্‌শাতে উঠে বসলেন।

খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল সে হাজির হয়েছে ডাক্তার সামন্তর জন্ম-নিরোধ-ক্লিনিকের সামনে।

ডাক্তার সামন্ত তখন ক্লিনিকে ছিলেন।

সব শুনে বললেন, "খুবই দুঃখিত হলাম সত্যি। মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরে এই জিনিসই নানা আকারে রোজই দেখছি। সেই জন্যেই তো আমরা চেষ্টা করছি একটা প্ল্যান করে ছেলে-মেয়ে হোক—এদেশে আইডিয়াটা নতুন, কিন্তু ও ছাড়া বাঁচবার পথ নেই।"

হেমন্ত বলল, "আমরাও নতুন করে জীবন আরম্ভ করছি আবার। আপনি ব্যবস্থা করে দিন যাতে আর ছেলে-মেয়ে না হয়।"

"তা কেন। আপনার নতুন জীবনে নতুন মানুষ আসুক না আবার দু'একটা, এখন তো

একটাও সন্তান নেই বলছেন। আবার নতুন সন্তান হোক। সে সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করে তুলুন এবার।"

"না, না, না। আর সন্তান চাই না। আমার মতো দরিদ্রের পিতা হবার যোগ্যতা নেই, এ লক্ষ্মীছাড়া সমাজে কোনও সন্তান মানুষ হবে না, মরুভূমিতে গাছ বাঁচে না। আপনি দয়া করে ব্যবস্থা করে দিন একটা, আমি নির্বংশই থাকব, আমার বংশে বাতি দিতে হবে না কাউকে। আপনি দয়া করে ব্যবস্থা করে দিন।"

হঠাৎ ডাক্তার সামন্তের পা দুটো জড়িয়ে কাঁদতে লাগল সে।

।। উনিশ ।।

দিন পনেরো পরে একদিন বিকেলে ভূষণ চক্রবর্তী বনস্পতিকে দমদমের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে এলেন। বর্ণনা পরীক্ষা দিচ্ছিল, সে আসতে পারেনি। একটা ভাল বাড়ি পাওয়া গেছে শুনে বাচস্পতি আনন্দ প্রকাশ করলেন। কিন্তু বললেন, "বনু আর বউমা খুব ভোরে উঠে কোথা যে চলে গেছে, বুঝতে পারছি না। বর্ণনা তো কদিন থেকে আসেনি, হেস্টেলেই আছে। ওরা যে কোথা গেল বুঝতে পারছি না। কোলকাতায় নেই। কোলকাতায় থাকলে এতক্ষণ ফিরে আসত—"

ভূষণ চক্রবর্তী নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তিনি বাড়িখানি সাজিয়ে গুছিয়ে অনেক আশা করে এসেছিলেন, কিন্তু এ কি হল!

বনস্পতি আর সরস্বতী দুজনেই হাঁটছিল। সুখপুরে ফিরে যাচ্ছিল তারা। কোলকাতায় আর তারা একদণ্ড থাকতে পারছিল না। কয়েকদিন আগে সাবু এসেছিল। সে খবর দিয়েছিল বুড়ির জঙ্গলে অনায়াসে বাস করা যেতে পারে। গৃহপতি যে ঘরটা করেছিলেন সেটা এখনও আছে। সেইখানে ফিরে যাচ্ছিল তারা, হেঁটে যাচ্ছিল কারণ তাদের কাছে একটিও পয়সা ছিল না। পয়সা চাইলেই অবশ্য পেত, কিন্তু চায়নি। তাদের আশঙ্কা ছিল শুনলে বাচস্পতি হয়তো যেতে দেবেন না।

খবর পেয়েই ভূষণ চক্রবর্তী গিয়ে হাজির হল সেখানে।

বুড়ির জঙ্গলে সে আগে কখনও যায়নি। গিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। বিরাট অরণ্য' তার মাঝখানে বনস্পতি মহানন্দে ছবি এঁকে চলেছে।

"আমি আবার ফিরে এলাম—"

"আরে, ভূষণ না কি! আমি রোজই তোমার কথা ভাবি। যাক এসে গেছ বাঁচলাম—" দুজনে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হল।

বনস্পতি বললে, "আর তোমাকে কোথাও যেতে দেব না ভূষণ।"

ভূষণ চক্রবর্তী ছবিটার দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে ছিলেন।

বনস্পতি বললে, "ওটার নাম দিয়েছি 'শিল্পী ও দারিদ্র্য রাক্ষসী'।"

একটা বিরাট কুৎসিত তাড়কার মতো রাক্ষসী। শিল্পী তার গায়ে মুখে পেটে বুকে নানারকম রং লাগাচ্ছে তুলি দিয়ে, আর রাক্ষসীটা খিল খিল করে হাসছে, বোধহয় তার কাতুকুতু লাগছে।

সরস্বতী এক বাটি ক্ষীর আর মুড়ি নিয়ে এল।

"সাবু একটা গাই ঠিক করে দিয়েছে। খুব মিষ্টি দুধ। তোমার চেহারাটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে, তুমি কিছুদিন খাওয়া-দাওয়া কর, ভাল করে খাও। আমি ততক্ষণ এটাতে রং দি—"

আবার তন্ময় হয়ে গেল সে ছবিতে।

সুখপুর-পত্রিকার একটি খবর।

"বনস্পতি সরস্বতী বুড়ির জঙ্গলে গিয়া বাস করিতেছে। সাবু বলিল সেখানে ভূষণ চক্রবর্তীও গিয়াছেন। বনস্পতি আজকাল রোজই নাকি ছবি আঁকিতেছে। আমিও সেখানে ফিরিয়া যাইতাম, কিন্তু হেমন্তকুমারকে এখানে একা ফেলিয়া যাইতে পারি না। তাহাকে বারবার বলিতেছি, তুমি আমার সঙ্গে চল। গঙ্গার গতি পরিবর্তন হইয়াছে। আমাদের জমি আবার হয়তো উঠিবে। আবার হয়তো আমরা সুখের মুখ দেখিতে পাইব। কিন্তু সে বলে—'আমি এ মুখ আর সুখপুরে দেখাইতে পারিব না।' সে না গেলে আমি কি করিয়া ফিরিয়া যাই। মহা সমস্যায় পড়িয়াছি।"

।। কুড়ি ।।

নবনী রায় আর ফেরেনি।

প্রায় মাস তিনেক পরে তার চিঠি এল একটা। বর্ণনাকে লিখেছে।

সুচরিতাসু,

আমি আর ফিরতে পারলাম না। পৃথিবী গোল, আবার কোনদিন কোথাও দেখা হবে হয়তো, একটা সুযোগ ঘটেছে, আপনি যদি রাজি হন তাহলে হয়তো দেখা হবে। দিল্লীতে আপনার বান্ধবী আকাশ-পরী আর তাঁর স্বামী মেজর মুখার্জীর সঙ্গে আলাপ হল। দুজনেই চমৎকার লোক। তাঁদের খুব ইচ্ছে আপনার বাবার ছবিগুলোর একটা প্রদর্শনী করা। এজন্য তাঁরা দিল্লীতে একটা হলও ভাড়া করেছেন। আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে ছবিগুলো নিয়ে চলে আসুন। শ্রীমতী আকাশ-পরীও হয়তো আপনাকে চিঠি লিখবেন। তাঁরই অনুরোধে এ চিঠি আপনাকে লিখছি। ভূষণবাবু এবং আপনাদের বাড়ির সকলে আশা করি ভাল আছেন। চিঠির উপরে যে ঠিকানা রয়েছে সেখানে আমি একমাস থাকব। প্রীতি ও নমস্কার নিন। ইতি—

ভবদীয়—নবনী রায়

আকাশ-পরীর চিঠি এল ছোট একটি কবিতায়।

রোহিত মৎস্য থাকে গভীর জলে
তাহারে ধরিতে হয় নানান ছলে।
ফেলেছি অনেক চার
দেরি করিও না আর
লইয়া ছবির জাল
এস গো চলে।

বর্ণনার ভয় ছিল ভূষণ কাকা তাকে ছবি নিয়ে যেতে দেবেন কিনা। কিন্তু নবনী রায়ের চিঠি দেখে তিনি আপত্তি করলেন না। বরং বললেন, "ভালই হয়েছে। তুমি চলে যাও তার কাছে।"

ছবিগুলো দমদমের বাড়িতে বন্ধ ছিল। ছবিগুলো নিয়ে বর্ণনা একদিন দিল্লী অভিমুখে রওনা হয়ে গেল।

গ্রন্থকারের নিবেদন

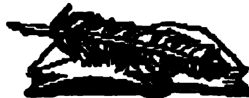
শ্রীযুক্ত সাত্যকি রায়ের জবানীতে যে কাহিনীটি আপনাদের শোনালাম সেটির পাণ্ডুলিপিটি আমি পেয়েছিলাম মিস্টার রায়ের কাছ থেকে। তিনি পাণ্ডুলিপিটি আমাকে দেখে দিতে বলেছিলেন। এ-ও বলেছিলেন, যদি আমার ভাল লাগে আমি ওটা ব্যবহার করতে পারি। মিস্টার রায়ের আসল নাম কি আমি জানি না। একদিন ট্রেনে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হয়েছিলাম। গল্পটি ব্যবহার করতে গিয়ে দু'এক জায়গায় একটু আধটু ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করলাম। একথা তাঁকে লেখাতে তিনি আমাকে নীলগিরি থেকে একটি চিঠি লেখেন। সে চিঠিটি এই—

"আমার কোলকাতার বাসায় আমার পুরোনো ডায়েরিগুলো আছে। তার থেকে আপনি আপনার প্রয়োজনীয় খবরগুলি পাবেন। আমার ঠিক মনে নেই। আপনাকে খাটতে হবে একটু। এলোমেলো নানারকম খবরের মধ্যে ছড়ানো আছে ওগুলো। যে কোনও খবর আপনি ব্যবহার করতে পারেন। শুধু একটি অনুরোধ, আমার আসল নামটি কোথাও প্রকাশ করবেন না। মিস্টার রায় নামেই আমি চেনা-মহলে পরিচিত। আপনি মিস্টার রায় নামেই আমাকে চিঠি লিখেছিলেন, সে চিঠি ঠিক পৌঁচেছে। আমার চাকর প্রহ্লাদ সস্ত্রীক কোলকাতার বাসায় থাকে। তাকেও চিঠি লিখে দিলাম। আপনি গেলে সে আপনাকে আমার পুরোনো ডায়েরিগুলো দেবে। আমার শেষ ডায়েরিটাও ওইখানে আছে। দরকার হলে ও বাড়িতে আপনি থাকতেও পারেন দু'চারদিন। কোন অসুবিধা হবে না। নমস্কার নিন। ইতি—

ভবদীয়—মিস্টার রায়

তাঁর ডায়েরিগুলো খুলে সবিস্ময়ে দেখলাম তাঁর পদবী রায় নয়, মুখোপাধ্যায়।

ডায়েরি ঘেঁটে অনেক নূতন খবর পেয়েছি এবং এই কাহিনীতে তা ব্যবহার করেছি। একটি খবর ব্যবহার করিনি সেটা এখন জানাচ্ছি আপনাদের। তাঁর শেষ ডায়েরিটিতে এক জায়গায় আছে—'একজনের অনুরোধে আজ থেকে একটা অব্যাপারে লিপ্ত হলাম। অনুরোধ এড়াবার উপায় ছিল না, কারণ, অনুরোধকারিণী আমার সদ্য বিবাহিতা পত্নী। তার পারিবারিক কাহিনী অবলম্বন করে একটা উপন্যাস ফেঁদে বসেছি। কাহিনীতে তার নাম দিয়েছি যদিও বর্ণনা, কিন্তু তার আসল নাম অন্য এবং তা বর্ণনার ঠিক উল্‌টো। অর্থাৎ সে অবর্ণনীয়া। আমার একটা ভয় হচ্ছে কিন্তু। ছেলেবেলায় একটা সংস্কৃত গল্পে পড়েছিলাম এক বানর চেরা কাঠের গুঁড়ির ভিতরকার কীলক নিয়ে খেলা করতে গিয়ে মহা বিপদে পড়েছিল। আমারও সে কীলোৎপাটীর বানরের দশা না হয়!"



স্থাবর

।। এক ।।

সুদূর অতীতের নিবিড় অন্ধকার হইতে আমি তোমাদের সম্বোধন করিতেছি। আমি অমর আত্মা, প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আকাশে-বাতাসে, সমুদ্রে-নদীতে, অরণ্যে-পর্বতে, মরুভূমির ঊষরতায়, শস্যক্ষেত্রের শ্যাম-শোভায় অহরহ সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছি। আমি মরি নাই। তোমাদের ধর্মে-কর্মে সংস্কৃতিতে, কাব্যে শাস্ত্রে পুরাণে, চিন্তা-ধারায় বৈচিত্র্যে, রক্ত-ধারার অণু-পরমাণুতে আজও আমি স্পন্দিত হইতেছি। কবরভূমি খনন করিয়া আমাকে অনুসন্ধান করিও না, আত্মানুসন্ধান কর, তোমার মধ্যেই আমাকে পাইবে। তোমার মধ্যেই আজও আমি ওতপ্রোত হইয়া আছি। তাহাই আমার বৈশিষ্ট্য এবং সেইখানেই আমাব জয়। আমি মবিয়াও মরি নাই। আমার আদিমতম রূপ কি ছিল তাহা আমি জানি না। আমি ছিলাম, আছি এবং থাকিব—এইটুকুই শুধু নিঃসংশয়ে জানি। কিন্তু কাহিনী বলিতে হইলে একটা আরম্ভ থাকা চাই। সুতরাং একস্থান হইতে আরম্ভ করি।...

প্রভাত হইয়াছে। অদূরে পর্বতশিখরে, নবোদিত সূর্যের কিরণজালে, অসংখ্য বন্য-কুসুমে, সদ্যজাগ্রত বিহঙ্গকুলের কাকলিতে যে অপরূপ মহিমার আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাহা আমার চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। সেদিন আমি অতিশয় বিষণ্ণচিত্তে সু-উচ্চ একটি তিন্তিড়ী বৃক্ষের শাখায় বসিয়া আছি। দলপতি তাড়াইয়া দিয়াছে; পলায়ন করিয়া প্রাণে বাঁচিয়াছি। ধরিতে পারিলে মারিয়া ফেলিত। লোকটার গায়ে অসুরের শক্তি। বসিয়া বসিয়া তাহার মূর্তিটাই ভাবিতেছিলাম। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, ঝাঁকড়া ভ্রূ, ছোট ছোট চক্ষু দুইটি যেন জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড, হিংস্রতায় জ্বলিতেছে। মুখ বুক কালো কর্কশ লোমে পরিপূর্ণ। আজানুলম্বিত দীর্ঘ বাহু। চলিবার সময় সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া চলে। আমিও নদীর জলে ঝুঁকিয়া একদিন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, আমার চেহারাও ঠিক উহার মতো। নীচের চোয়ালটা ঠিক তেমনি সম্মুখের দিকে আগাইয়া আসিয়াছে, বিরাট থ্যাবড়া নাকটায় ঠিক তেমনি দুইটা বিরাট গর্ত। বেশ মনে পড়িতেছে ক্ষুব্ধ হই নাই, মুগ্ধও হই নাই, বিস্মিত হইয়াছিলাম। প্রথমে মনে হইয়াছিল জলের তলায় একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বুঝি বসিয়া আছে। মনে হইবামাত্র রাগ হইয়াছিল, মুখ ভ্যাংচাইয়াছিলাম। সে-ও ঠিক তেমনিভাবে মুখ ভ্যাংচাইল। ক্রোধে অন্ধ হইয়া জলে লাফাইয়া পড়িলাম... প্রতিচ্ছবি কোথায় মিলাইয়া গেল। ভুল ভাঙিল আমার সঙ্গিনীর সহায়তায়। যে সঙ্গিনীর জন্য আমার এত লাঞ্ছনা, সেই সঙ্গিনীকে লইয়া একদিন নদীতীরে গিয়াছিলাম। সহসা তাহার প্রতিচ্ছবি নদীতরঙ্গে প্রতিফলিত দেখিলাম। উভয়ে নানারূপ মুখভঙ্গি করিয়া সেদিন উপলব্ধি করিয়াছিলাম আমাদেরই কায়ার ছায়া নদীর জলে পড়িয়াছে। সবিস্ময়ে সেদিন দুজনে অনেকক্ষণ পাশাপাশি বসিয়াছিলাম। তখন আমরা কিশোর-কিশোরী।

...ওই সঙ্গিনীই শেষে আমার কাল হইল। আমাদের উভয়েরই বয়স ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। শরীরের শিরা-উপশিরায় যৌবনের উন্মাদনা জাগিল। আজও তোমরা যে লুব্ধ-দৃষ্টিতে

যুবতী নারীর প্রস্ফুটিত যৌবনের দিকে চাহিয়া থাক, সেই লুব্ধ-দৃষ্টিতে আমিও তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতাম। তখন দেহের বা মনের কোনো আবরণ ছিল না। নগ্ন দেহের প্রতি রোমকূপে নগ্ন কামনা উদগ্র হইয়া থাকিত। সহসা সকলের সমক্ষেই একদিন তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীক্ষ্ণ প্রস্তরফলক আসিয়া পৃষ্ঠে বিঁধিল এবং পরমুহূর্তেই দলপতি আসিয়া আমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। আঁচড়াইয়া খামচাইয়া কামড়াইয়া হয়তো আমাকে মারিয়াই ফেলিত, যদি না আমি রণে ভঙ্গ দিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিতাম। রণে ভঙ্গ দিয়াও নিরাপদ হই নাই, অজস্র পাথর ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে বহু দূর পর্যন্ত সে আমাব পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল। প্রাণপণে ছুটিয়া তাহার এলাকা পার হইয়া এই গভীর অরণ্যে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছি। তিন্তিড়ী বৃক্ষের উচ্চ ডালে আরোহণ করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছি। সমস্ত বাত্রি ঘুম হয় নাই। একপাল হায়েনা কাছে দূরে ক্রমাগত চিৎকার করিয়াছে। একটা অস্ফুট আর্তনাদও যেন সমস্ত বনে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিয়াছে। সর্বাঙ্গে নিদারুণ বেদনা। পৃষ্ঠের ক্ষতটা টন-টন করিতেছে। প্রভাতের মহিমায মুগ্ধ হইতে পারিতেছি না। যে পরিবেশের মধ্যে এতকাল ছিলাম, সেখানে আর ফিরিবার উপায় নাই। ওই দলপতিই আমার পিতা কি না, তাহা জানি না। যে রমণীটিকে মা বলিয়া জানিতাম, বাল্যকালেই তাঁহাকে চোখের সম্মুখে নিহত হইতে দেখিয়াছি একটা দুর্দান্ত বন্যববাহের তীক্ষ্ণ দন্তাঘাতে। নিমেষের মধ্যে পেটটা চিরিয়া দিয়া চলিয়া গেল। নাড়িভুঁড়িগুলা বাহির হইয়া পড়িল। সে বীভৎস দৃশ্য অনেকদিন আমার রাত্রির নিদ্রা হরণ করিয়াছে। বস্তুত সেই আমার জীবনে প্রথম বিভীষিকা। সেদিন হইতে বন্যবরাহকে সামান্য জন্তু বলিয়া ভাবিতে পারি না, মনে হয় স্বয়ং মৃত্যু। সামান্য পশুর কি এত শক্তি থাকিতে পারে? আর একটা ছবিও মনে আঁকা আছে।... অন্ধকার বাত্রি, আগুনের চারিধাবে আমরা সকলে বসিয়া আছি। আগুনটা নিবিয়া আসিয়াছে। ঘুম ধরিতেছিল, চোখ বুজিয়া বসিয়াছিলাম। একটা প্রচণ্ড গর্জনে হঠাৎ চমকাইয়া উঠিলাম .. যে যেখানে পাবিল পলাইল, আমিও ছুটিয়া একটা ঝোপের ভিতর লুকাইয়া পড়িলাম। অনেকক্ষণ সেখানে লুকাইয়া রহিলাম। তাহার পর একটা হাওয়া উঠিল, খুব জোর হাওয়া, নির্বাপিতপ্রায অগ্নিকুণ্ডটা জ্বলিয়া উঠিল। তাহারই আলোকে দেখিতে পাইলাম, শূন্যে যেন দুইটি গোল অঙ্গাবখণ্ড ধক-ধক করিয়া জ্বলিতেছে। প্রকাণ্ড একটা কালো মুণ্ডে ভয়ঙ্কর দুইটা চোখ! জ্বলন্ত অগ্নিশিখাটাব দিকে ঘাড় ফিরাইয়া তাকাইয়া আছে। পরমুহূর্তেই আবার ঘাড় ফিরাইয়া লইল, হাড়-ভাঙার কড়মড় শব্দ শোনা গেল। সামনের দুই থাবায় চাপিয়া কি যেন খাইতেছে। মুখটা আর একবার তুলিয়া হিংস্র দৃষ্টিতে আগুনের শিখাটার দিকে চাহিয়া সমস্ত দন্তগুলি বাহির করিল...কান দুইটা পিছনের দিকে চলিয়া গেল...খ্যা খ্যা জাতীয় একটা চাপা রুষ্ট গর্জন করিয়া আবার আহারে মন দিল। বাঘ একটা। তাহার জ্বলন্ত চক্ষু, লেলিহান জিহ্বা, রক্তাক্ত দংষ্ট্রা সেই স্বল্পালোকে মুহূর্তের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর চিত্র আমার অন্তরতম চেতনায় আঁকিয়া দিল, তাহার মূল রূপটি আজও অপরিবর্তিত। সে চিত্র বাঘের নয়। তাহা হিংস্র দেবতার নিষ্ঠুর পিশাচের নিরপরাধ নিরীহ জীবকে যে অতর্কিতে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে, তাহার। যুগে যুগে সে রূপ বদলাইয়াছে সত্য, কিন্তু লুপ্ত হয় নাই। তাহার নবতম মূর্তি তোমাদের অ্যাটম বম। পরদিন দেখা গেল, আমাদের দলের একজন নাই। তাহার জন্য কেহ শোক কবিল না। শুধু তাই নয়, তাহার কয়েকদিন পরে আমাদের দলপতি আর একটি ছেলেকে দলছাড়া করিল। তাহার কোনো অপরাধ ছিল না।

একমাত্র অপরাধ সে প্রাপ্তবয়স্ক, দলপতির সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী। ইহাই তখন নিয়ম ছিল। প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পর নিজে চরিয়া খাইতে হইবে, নিজের শক্তিতে নিজের বিচরণভূমি আবিষ্কার করিয়া তাহা রক্ষা করিতে হইবে, নিজের সঙ্গিনী সন্ধান করিয়া নিজের সংসার পাতিতে হইবে।

...অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া বসিয়া আছি, প্রভাতের মহিমায় মুগ্ধ হইতে পারিতেছি না। কিন্তু বেশিক্ষণ বসিয়া থাকা যায় না। ক্ষুধার উদ্রেক হইতেছে। লাল পিঁপড়েরাও জ্বালাতন করিতেছিল। গাছটায় অসংখ্য লাল পিঁপড়ে। কয়েকটা খাইয়া দেখিলাম—টক টক মন্দ নয়। কিন্তু ইহাতে পেট ভরিবে না, ইহাদের নিঃশেষও করা যাইবে না। সুতরাং গাছ হইতে নামিয়া পড়িলাম। ঝোপের আড়ালে আড়ালে সাবধানে উঁকি-ঝুঁকি দিতে দিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সে যুগে মানুষ নির্ভয়ে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারিত না। অনেক শত্রু ছিল। বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, বন্যমহিষ, বন্যবরাহ কখন কে কোন্ দিক হইতে অতর্কিতে আসিয়া পড়িবে, সেই ভয়ে সর্বদা সাবধানে থাকিতে হইত। মানুষ তখনও নিজের সাম্রাজ্যের বনিয়াদ পাকা করিতে পারে নাই, তখনও তাহাকে লুকাইয়া লুকাইয়া কোনোক্রমে আত্মরক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। বাঘ সিংহ গণ্ডারেরাই তখন রাজত্ব করিতেছিল। অনেক সময় তাহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াই দিন কাটাইতে হইত। একবার মনে আছে, ভীষণ একটা গর্জন শুনিয়া সকলে নিকটবর্তী গাছে চড়িয়া পড়িলাম। তখন গাছেই আমাদের আশ্রয় ছিল। দলপতি গাছের ডাল ফাঁক করিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল, আমরাও তাহাই করিতে লাগিলাম। গর্জনটা কিসের এবং আমরা নিরাপদ কি না, তাহা না জানা পর্যন্ত কাহারও স্বস্তি নাই। সহসা দলপতি হর্ষসূচক একটা শব্দ করিল, যদিও কিছুই দেখিতে পাই নাই, তবু, বুঝিলাম আনন্দজনক কিছু একটা ঘটিতেছে। আমরাও অনুরূপ শব্দ করিয়া দলপতিকে সমর্থন করিলাম। পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে শুধু গর্জন নয়, তুমুল একটা আলোড়নও চলিতেছিল। কিছুক্ষণ চলিয়া হঠাৎ সেটা থামিয়া গেল। দলপতি সচকিতে একবার চাহিল। যে মেয়েটি তাহাব মাথার উকুন বাছিতেছিল, সেও সচকিত হইল—কিংবা হইবার ভান করিল—দলের মধ্যে সে-ই তখন দলপতির প্রিয়তমা। দলপতি সন্তর্পণে গাছ হইতে নামিল। আমরাও নামিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু দলপতি দাঁত খিঁচাইয়া তাড়া করিয়া আসিতে আমরা নিরস্ত হইলাম। সে একাই নামিয়া গেল। একটু পরে যখন ফিরিয়া আসিয়া বসিল, তখন তাহার মুখ গম্ভীর। চতুর্দিকে অন্ধকার...পরিস্থিতি অনিশ্চিত...আমরা আর টুঁ শব্দটি করিলাম না। সমস্ত রাত্রি দলপতি কেমন যেন উসখুস করিতে লাগিল। রাত্রিতে কিন্তু সে আর গাছ হইতে নামিবার সাহস করিল না। পরদিন সকালে উঠিয়াই নামিয়া গেল এবং বনের ভিতর হইতে অর্ধভুক্ত মহিষ টানিয়া বাহির করিয়া আনিল। সম্ভবত কোনো বাঘ কিংবা সিংহ মহিষটাকে বধ করিয়াছিল, সবটা খাইয়া শেষ করিতে পারে নাই। দলপতি সেটাকে টানিয়া টানিয়া বহুদূরে লইয়া গেল, আমরাও তাহার অনুসরণ করিলাম। একটা নিরাপদ স্থানে গিয়া যতটা পারা গেল, তখনই সকলে মিলিয়া খাওয়া গেল। অবশিষ্ট যেটুকু রহিল সেটুকু দলপতি একটি খাদের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়া আসিল। মহিষের পচা মাংস খাইয়া আমাদের বেশ কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছিল মনে পড়িতেছে।

...এদিক ওদিক ঘুরিয়া একটু পরেই বুঝিতে পারিলাম, যেখানে আসিয়া পড়িয়াছি, তাহা

জুজুমের এলাকা। জুজুমকে বহুদিন পূর্বে বহুদূর হইতে দেখিয়াছিলাম। ভীষণ-দর্শন। সে যুগে কেহই মহাত্মা ছিল না, সুতরাং প্রকৃতিও যে তাহার হিংস্র, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার হেতু নাই। একবার যদি নাগালের মধ্যে পায় আস্ত রাখিবে না। তখন সদ্ভাব দূরে থাক প্রতিবেশী বলিয়াই কিছু ছিল না। একজন দলপতির সহিত আর একজনের ক্বচিৎ দেখা হইত। প্রত্যেকে নিজের নিজের এলাকায় নিজের ক্ষুদ্র গোষ্ঠী লইয়া বিচরণ করিত এবং সেখানে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিত না। এদিক ওদিক চাহিয়া আর একটি বৃক্ষে আরোহণ করিলাম। অবিলম্বে সহজলভ্য কিছু খাদ্যের সন্ধান করিতে হইবে। মাটি খুঁড়িয়া কেঁচো কিংবা কন্দ সংগ্রহ করিবার উৎসাহ ছিল না। বিনা পরিশ্রমে কিংবা অল্প পরিশ্রমে যদি খানিকটা মাংস বা ফল পাওয়া যায় বড় ভাল হয়।

গাছে উঠিয়া কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিবার পর দেখিতে পাইলাম, অদূরে একটা গাছের ডালে প্রকাণ্ড একটা মৌচাক রহিয়াছে। কিছুদূরে একটা নদীও বহিয়া গিয়াছে। তাহার নীরে অথবা তীরে কিছু খাদ্য পাওয়া অসম্ভব নয়। ডান দিকে প্রকাণ্ড একটা জলাভূমিও দেখা যাইতেছে, সেখানে আর কিছু না থাক, শামুক গুগলি নিশ্চয় আছে। সম্মুখেপ্রকাণ্ড একটা ঝোপ থাকাতে সবটা দেখা যাইতেছে না, হয়তো আবও কিছু আছে। মৌচাক হইতে মধু সংগ্রহ করিতে হইলে আগুন দরকার। ধোঁয়া না দিলে মৌমাছিগুলা পলাইবে না। চকমকি পাথর খুঁজিয়া শুষ্ক ডাল-পাতা সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালাইতে বেশ কিছু সময় লাগিবে। নদীর তীরেই আপাতত কিছু খোঁজ করা যাক।

গাছ হইতে নামিলাম। ঝোপের আড়ালে আড়ালে অগ্রসর হইতেছি, দেখি একটা হরিণ তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। কাছেই একটা বেশ বড় পাথর পড়িয়াছিল, ত্বরিতহস্তে সেটা তুলিয়া লইলাম। যদি কপালের মাঝখানে কিংবা পায়ে মারিতে পারি, নির্ঘাত পড়িয়া যাইবে এবং তাহা হইলে কয়েকদিনের জন্য নিশ্চিন্ত। পাথরটা তুলিয়া মারিতে গিয়া কিন্তু মারা হইল না, ত্রস্ত হইয়া ঝোপের ভিতর আত্মগোপন করিতে হইল। স্বয়ং জুজুম হরিণটার পিছু পিছু ছুটিয়া আসিতেছে! ক্ষণপরেই হরিণটা আমার পাশ দিয়া সবেগে চলিয়া গেল, দেখিলাম তাহার পিঠে একটা পাথরের তীর গাঁথা। আমার মাথার উপর দিয়া কয়েকটা প্রস্তরফলক সাঁ সাঁ করিয়া ছুটিয়া গেল। তাহার পরমুহূর্তেই দ্রুত পদক্ষেপে কেবল জুজুম নয় আরও দুইজন গেল বুঝিতে পারিলাম। আমি একটা ঘন ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া ছিলাম। সন্তর্পণে ডালপালা ফাঁক করিয়া দেখিলাম—যাহা দেখিলাম, তাহা আজও ভুলি নাই।

...হরিণটা মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। জুজুম তাহার পেটের উপর বসিয়া তীক্ষ্ণ প্রস্তর ছুরিকা দিয়া তাহার হৃৎপিণ্ডটা বিদীর্ণ করিয়া দিতেছে। তাহার ঠিক পিছনে দাঁড়াইয়া আছে দুইটি স্ত্রীলোক, একজন প্রৌঢ়া আর একজন যুবতী। সম্ভবত মা আর মেয়ে। জুজুম হরিণের বুক হইতে ছুরিটা খুলিয়া লইতেই ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিল। সঙ্গে সঙ্গে যুবতীটি হরিণটার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার ক্ষতস্থান হইতে চুষিয়া রক্ত পান করিতে লাগিল। জুজুম অবশ্য তাহাকে বেশিক্ষণ এ সুযোগ দিল না; এক ঝটকায় সরাইয়া দিয়া নিজেই পান করিতে লাগিল। মেয়েটা ভ্রূভঙ্গি সহকারে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া সমস্ত দন্তপাতি বিকশিত করিয়া মায়ের দিকে একবার চাহিল। তাহার সে মূর্তি আজও ভুলি নাই। প্রভাতের স্বর্ণকিরণে শ্যামল প্রকৃতি উদ্ভাসিত, অদূরে শৈলশিখরে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘমালা, এই পটভূমিকায় সেদিন নগ্না কৃষ্ণাঙ্গী ইকাকে

দেখিয়াছিলাম—পীনোন্নত-পয়োধরা, নিবিড় নিতম্বিনী, বিস্রস্ত কুন্তলা— তীক্ষ্ণ দন্তে পুষ্ট অধরে উষ্ণ মৃগরক্ত লাগিয়া আছে।

...একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন। তখন কাহারও কোন নাম ছিল না। তোমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য তোমাদের কল্পনা অনুযায়ী নামকরণ করিতেছি। তখন আমরা সকলেই ছিলাম নাম-গোত্রহীন। নামের বা গোত্রের প্রয়োজন ছিল না। ইকাকে দেখিয়া যে ক্ষুধা অনুভব করিয়াছিলাম, তাহাই তখন জীবনের প্রধান প্রেরণা ছিল, তাহারই তাড়নায় যাহা করিতাম, তাহাই ছিল তখনকার দিনে প্রধান প্রয়োজন, অন্য কিছু চিন্তা করারও প্রয়োজন অনুভব করিতাম না। আমি তাকে দেখিয়া চিনিয়াছিলাম, সে-ও আমাকে দেখিলে চিনিবে। ডাকিবার প্রয়োজন ছিল না। ডাকিলে তো আসিবে না, সবলে অধিকার করিতে হইবে। যে ভাষায় এ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছি, তাহাও তোমাদের ভাষা। কারণ এ ভাষায় না বলিলে তোমরা বুঝিবে না। সেকালে আমাদের যে ভাষা ছিল, তাহা ইঙ্গিতের চাহনির ভঙ্গির—তাহা লিপিবদ্ধ করা যায় না।

...অনেকক্ষণ ইকার দিকে চাহিয়া রহিলাম। যাহাকে বাহুপাশে বাঁধিতে গিয়া কিছুক্ষণ পূর্বে বিতাড়িত হইয়াছিলাম, তাহার স্মৃতি আমার উন্মুখ বাসনাকে ম্লান করিল না। তাহার মধ্যে যাহার অনবদ্য প্রকাশ আমাকে আকুল করিয়াছিল, ইকার মধ্যেও তাহাই দেখিতেছিলাম। মানুষ নয়, দেহ নয়, যৌবন।

জুজুম হরিণটাকে টানিতে টানিতে লইয়া চলিল। ইকা এবং সেই প্রৌঢ়াও তাহার পিছু পিছু চলিল। আমিও তাহাদের অনুসরণ করিলাম, কখনও বুকে হাঁটিয়া, কখনও হামাগুড়ি দিয়া কখনও ঝোপের আড়ালে। একটু আগেই খাদ্যের অভাব অনুভব করিতেছিলাম। উগ্রতর ক্ষুধার তাড়নায় সে কথা ভুলিয়া গেলাম। ইকা কোথায় থাকে, তাহা আবিষ্কার করাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কর্ম বলিয়া মনে হইল। কণ্টকে কঙ্করে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সরীসৃপের মতো ইকার অনুসরণ করিতেছিলাম। একটু পরেই কলরব শোনা গেল। হর্ষধ্বনি। জুজুমের পরিবারবর্গ—নানা বয়সের কতকগুলি নারী এবং শিশু ছুটিয়া আসিয়া জুজুমকে সংবর্ধনা করিল। ঝোপের আড়াল হইতে সন্তর্পণে ঘাড়টা তুলিয়া জুজুমের আস্তানা দেখিলাম। তখন আমরা কুঁড়েঘরও প্রস্তুত করিতে শিখি নাই। ডালপালা দিয়া ঘিরিয়া একটা স্থান চিহ্নিত করা থাকিত, কাছেই থাকিত একটা বড় গাছ, তাহাতেই বিপদের সময় আশ্রয় লইতে হইত। মানুষের গৃহের কোনো প্রয়োজনও ছিল না তখন। তাহার নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু প্রায় প্রত্যহই আহরণ করিতে হইত। সঞ্চয় করিবার মতো উদ্বৃত্ত প্রায়ই থাকিত না। একটি জিনিস কেবল সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইত—পাথরের নুড়ি। পাথরের নুড়ি একস্থানে স্তূপীকৃত থাকিলেই বোঝা যাইত যে কাছেপিঠে মানুষ আছে। গৃহের আর একটা প্রয়োজন অন্তরাল সৃষ্টি করা। তখন সে প্রয়োজনও মানুষের ছিল না। তখন আমরা উলঙ্গ ছিলাম। যাহা করিবার তাহা প্রকাশ্য দিবালোকে উন্মুক্ত আকাশের নীচেই করিতাম। লজ্জা বলিয়া কিছু ছিল না, শ্লীলতার জটিলতা কল্পনাই করিতে পারিতাম না। প্রত্যেক দলে একটি মাত্র সমর্থ পুরুষ থাকিত। বালক যৌবনে পদার্পণ করিলেই নিহত কিংবা বিতাড়িত হইত। আমি যেমন হইয়াছিলাম।

...জুজুম শিকার লইয়া বেড়ার অন্তরালে অদৃশ্য হইল। আমি উৎসুক নয়নে চাহিয়া

রহিলাম। ইকাকে আর দেখা গেল না। আহারের সন্ধানে ধীরে ধীরে জলাটার দিকেই অবশেষে অগ্রসর হইলাম। জঠরের তাড়নায় বেশিক্ষণ উদাসীন থাকা আর সম্ভব ছিল না। সদ্য-নিহত হরিণের রক্তাক্ত স্মৃতিটা রসনাকে লালায়িত করিতেছিল, কিন্তু নিরুপায় হইয়া লোভ সংবরণ করিতে হইল।

জলাশয়ের ধারে কিছু খাদ্য জুটিল। প্রচুর ব্যাং ছিল। শামুকও ছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে একটা মাছও পাইয়া গেলাম। মাছটা আকাশ হইতে পড়িল। উপরে চাহিয়া দেখিলাম, প্রকাণ্ড একটা মাছরাঙা পাখি এবং উৎক্রোশ দ্বন্দ্বে ব্যাপৃত। সম্ভবত মাছরাঙাটার মুখ হইতেই মাছটা খসিয়া পড়িয়াছে। তীরবর্তী গাছের ডালে ডালে নানা জাতীয় মৎস্যভুক পাখির সমাবেশ দেখিয়া অনুমান করিলাম, জলাশয়ে প্রচুর মাছ আছে। বড় আনন্দ হইল, আহারের বেশ সংস্থান আছে। পরক্ষণেই কিন্তু মন খারাপ হইয়া গেল। ইহা যে জুজুমের এলাকা। যে কয়দিন এখানে থাকিতে হইবে, চুরি করিয়া লুকাইয়া থাকিতে হইবে। ধরা পড়িলে জীবনসংশয়। কিন্তু উপায় নাই, থাকিতেই হইবে। সুতরাং যথাসম্ভব সাবধানে চারিদিক পর্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিছু শুষ্ক ডালপালা এবং কয়েকটা ভাল পাথর সংগ্রহ করিতে হইবে। যে মৌচাকটা দেখিয়াছি, তাহার নিচে আগুন জ্বালাইয়া মধু ও মৌমাছির বাচ্চাগুলি অবিলম্বে সংগ্রহ করা দরকার। ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাথর সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। সে যুগে পাথরই ছিল আমাদের অস্ত্র। শুধু অস্ত্র নয়, জীবনধারণের প্রধান সহায়। পাথর ছুঁড়িয়া শিকার করিতাম, পাথরের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতাম, পাথরের মধ্যেই আমরা অগ্নিকে আবিষ্কার করিয়াছিলাম। নানা শত্রুপরিবেষ্টিত সেই যুগে অসহায় মানুষের পাথরই ছিল পবম সহায়। পরবর্তী যুগে পাথবই তাই আমাদেব দেবতা হইয়াছিল। সমস্ত দিন ঘুরিয়া অনেক পাথর সংগ্রহ করিলাম। ছোট বড় মাঝারি, গোল লম্বা নানা আকারের। সেই সময়ই লক্ষ্য কবিলাম কোথায় কোন্ কন্দ আছে, কোন্ কোন্ গাছের ডালে, পাতায় বা ফাটলে গুটিপোকা পাওযা যায়, কোন্ গর্তটি মূষিকের, কোন্‌টি শশকের, কোন্‌টি শজারুর। একটা গাছে দেখিলাম, অজস্র কুল ধবিয়া আছে। কতদিন এখানে থাকিতে হইবে ঠিক নাই, খাদ্যের যত সন্ধান জানা থাকে, ততই ভাল। অস্ত্র কিছু সংগ্রহ হইয়াছে, খাদ্যের সন্ধান কিছু পাওয়া গেল, এইবার একটা আশ্রয় চাই। অর্থাৎ একটা বৃক্ষ নির্বাচন করিতে হইবে। সে যুগে গাছই আমাদের গৃহ ছিল, দুর্গ ছিল। গাছ আমাদের ফল দিত, ছায়া দিত। পাথরের মতো ইহারও মধ্যে তাই আমরা দেবতার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম।

গাছের অভাব ছিল না। প্রকাণ্ড একটি গাছ বাছিয়া ঠিক করিলাম। উঠিয়া দেখিলাম বেশ মনোমত—শাখাপত্রবহুল। উপরের দিকে কাণ্ডের ভিতর একটা গর্তও ছিল। পাথরের নুড়িগুলি তুলিয়া তুলিয়া সেখানে রাখিলাম। পাশাপাশি দু-তিনটা ডাল বাহির হইয়াছে, আরও কয়েকটি ডাল ভাঙিয়া সেখানে সাজাইয়া দিলাম, বেশ একটা মাচার মতো হইল। গাছের মূল কাণ্ডে ঠেস দিয়া বেশ ঘুমানো যাইবে। আহার এবং নিদ্রার ব্যবস্থা হইল, এইবার একটি সঙ্গিনী চাই। সঙ্গিনী পাইলেই মনোমত একটা স্থান বাছিয়া নিজের গৃহস্থালি স্থাপন করিতে পারিব। ওই দূরে পাহাড়ের ওপারে নিশ্চয়ই অনেক অনধিকৃত স্থান পড়িয়া আছে। দূর পর্বতশ্রেণীর দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। ইকার মূর্তিটা মনশ্চক্ষে বারংবার মূর্ত হইয়া উঠিতেছিল। ইকাকে কি উপায়ে পাওয়া যায় আকুল অন্তঃকরণে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। যে

অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম তাহাতে এটুকু নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছিলাম যে, নিছক বলপ্রয়োগ করিয়া কাজ হইবে না। জুজুম স্বেচ্ছায় আমাকে কন্যা সম্প্রদান করিবে না। শুধু জুজুম কেন, কেহই করিবে না। সে যুগে এ জাতীয় কল্পনাও কেহ করিত না। আমার কল্পনাতেও তাহা আসে নাই। আমি কেবল ইকাকে সমস্ত অন্তর দিয়া কামনা করিতেছিলাম, ভাবিতেছিলাম কি উপায়ে তাহাকে পাওয়া যায়। পাইতেই হইবে। পাইবই...একটা অনিশ্চিত অনির্দিষ্ট আত্মবিশ্বাস যেন অলক্ষিতে আমাকে আশ্বাস দিতেছিল। বলে আমি পারিব না, ছল অথবা কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু কোন্ ছল এবং কি কৌশল? কখন কিরূপে কার্যকরী হইবে? কল্পনা করিতে না পারিলেও মনের অন্ধ প্রেরণা আমাকে উপদেশ দিল—কোনো না কোনো উপায় হইবেই একটা। আপাতত আত্মগোপন করিয়া ইকার গতিবিধি লক্ষ্য করাই প্রথম কর্তব্য, তাহাই ভাল করিয়া কর।

সূর্য অস্ত গিয়াছে, অন্ধকার নামিতে লাগিল। অন্ধকার কিন্তু গাঢ় হইল না। পূর্ব-দিগন্তে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিল, চারিদিকে জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গেল। নিবিড় অরণ্যের জ্যোৎস্নাময়ী নিস্তব্ধতা নিশাচর পতঙ্গদের গুঞ্জনে মুখরিত হইয়া উঠিল। আমি বৃক্ষে আরোহণ করিয়া মাচার উপর উপবেশন করিলাম। ঠেস দিয়া বসিয়া আরামে চক্ষু মুদিলাম। মুদিত নয়নের সম্মুখে ইকার মূর্তি ফুটিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত উপত্যকা অদ্ভুত নিবিড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। চতুর্দিকে অশ্রান্ত ঝিল্লীরব। অরণ্যের পুঞ্জীভূত অন্ধকারে অসংখ্য জোনাকি। মধ্যে মধ্যে শুষ্ক পত্র-পল্লবের খড়-খড় শব্দ। সরীসৃপ শ্বাপদের দল বাহির হইয়াছে। মট্ করিয়া একটা শব্দ হইল, শুষ্ক ডাল ভাঙার শব্দ। শব্দ শুনিয়া মনে হইল ডালটা নেহাত পাতলা নয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইল যে জন্তুর পদভরে ইহা ভাঙিল সে জন্তুটিও নিশ্চয় হালকা নয়। উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ কোন শব্দ নাই। নিশ্চয় নিঃশব্দ সঞ্চরণে অগ্রসর হইতেছে। পরমুহূর্তেই গন্ধ পাইলাম এবং তার পরই সেই ভয়ানক পরিচিত ঘরর ঘরর শব্দ। মুদিতনেত্রে রুদ্ধশ্বাসে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলাম। আর একটু দূরে মট্ করিয়া আবার শব্দ হইল। বাঘটা দূরে চলিয়া গেল।

...কতক্ষণ চোখ বুজিয়া ছিলাম মনে নাই, হঠাৎ কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যেন ইকা আমার হইয়াছে, যেন পিছন দিক হইতে আমার কাঁধের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া সাগ্রহে আমার মাথার উকুন বাছিতেছে। একটা বাহু যেন আমার গলায় জড়ানো। নিটোল বাহুর নিবিড় বন্ধন...মনে হইল তাহা ক্রমশ নিবিড়তর হইতেছে...জোরে, জোরে, আরও জোরে চাপিয়া ধরিতেছে...শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল—ইকা এ কি করিতেছে। ঘুম ভাঙিয়া গেল। মুহূর্ত-মধ্যে শিহরিয়া উপলব্ধি করিলাম ইকার বাহু নয়, একটা ময়াল সাপ আমার গলায় পাক লাগাইতেছে। প্রবল শক্তিতে পাকটা একটু আলগা করিয়া সাপের দেহের সেই অংশটুকু মুখের কাছে আনিয়া প্রাণপণে কামড়াইয়া ধরিলাম। আমার শাণিত শ্বাদন্ত কর্ কর্ করিয়া তাহার মাংসে বসিয়া গেল। খানিকটা মাংস ছিঁড়িয়া তুলিয়া লইলাম। আবার কামড়াইলাম। এইবার অনুভব করিলাম গলার ফাঁস কিছুটা আলগা হইয়াছে, মাংসপেশী ক্রমশ শিথিল হইতেছে। চকিতে ফাঁসটা গলা হইতে খুলিয়া অন্য ডালে সরিয়া গেলাম। তাহার পর একটা বড় পাথর বৃক্ষকোটর হইতে বাহির করিয়া সাপের মাথাটা খুঁজিতে লাগিলাম। সাপটা বুঝিয়াছিল যে, আততায়ী নিতান্ত নিরীহ প্রাণী নয়, মানুষ। পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, মাথাটা

নিচে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। আমি কিন্তু ছাড়িলাম না। সবলে তাহাকে টানিয়া তুলিয়া বহুবার ব্যর্থ-মনোরথ হইবার পর অবশেষে গাছের কাণ্ডের উপর মাথাটা রাখিয়া প্রস্তরাঘাতে তাহা বিচূর্ণিত করিলাম। তাহার পর দূরের একটা মোটা ডালে সেটাকে জড়াইয়া রাখিয়া দিলাম সকালে কাজে লাগিবে। আবার অপ্রত্যাশিতভাবে খানিকটা মাংস জুটিয়া গেল। সে যুগে এরূপ অপ্রত্যাশিত আহার প্রায় জুটিত। তখনই হয়তো আহারটা শেষ করিতাম কিন্তু ক্ষুধা ছিল না। আবার নিজের মাচাটির উপর গিয়া কাণ্ডে ঠেস দিয়া বসিলাম। বিঘ্নিত নিদ্রাটি যেন পাশের ডালেই অপেক্ষা করিতেছিল, চক্ষু বুজিবামাত্র চোখের পাতা ভারি হইয়া আসিল।

...কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম বলিতে পারি না, হঠাৎ একটা চিৎকারে ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম প্রভাত হইয়াছে, চতুর্দিকে আলো। আবার চিৎকার হইল—তীক্ষ্ণ তীব্র চিৎকার—মনে হইল বায়ুস্তর যেন চিরিয়া গেল। দেখি সাপটা ডালে নাই। ঝুঁকিয়া দেখিলাম একদল ময়ূর সেটাকে দূরে টানিয়া লইয়া গিয়া ছেঁড়াছেঁড়ি করিয়া খাইতেছে। সাপটা সম্পূর্ণ মরে নাই, তখনও তাহার দেহের পেশিতে পেশিতে কুঞ্চন-প্রসারণের তরঙ্গ উঠিতেছে। একদল ময়ূর তীক্ষ্ণ নখচঞ্চুঘাতে তাহার সারা দেহ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে, তবু মরে নাই। শুধু ময়ূর নয়, একদল কাকও ঝাঁক বাঁধিয়া অদূরে বসিয়াছিল, কিন্তু ময়ূরের প্রতাপে কাছে ঘেঁষিতে পারিতেছিল না। অগ্রসর হইবার সামান্য চেষ্টা করিলেই তীক্ষ্ণ কেকাকণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইতেছিল। সেই প্রভাত-আলোকে সেই আরণ্য পটভূমিকায় সেই বিচিত্রপক্ষ হিংস্র ময়ূরগণের তেজোদৃপ্ত গ্রীবাভঙ্গি দেখিয়া একবারও মনে হইতেছিল না যে আর সকলের মতো বুভুক্ষার তাড়নায় ইহারা আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে—কি যে, মনে হইতেছিল তাহাও বর্ণনা করিতে পারিব না। এইটুকু শুধু মনে আছে স্তম্ভিত হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়াছিলাম। সহসা চোখে পড়িল পাশের একটা ঝোপে একটা শৃগালও মুখ বাড়াইয়া ধৈর্যভরে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে—সে-ও কাছে আসিতে সাহস করিতেছে না। মুহূর্তমধ্যে কর্তব্যবুদ্ধি জাগরিত হইল, নিজের সম্পত্তি রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলাম। বৃক্ষকোটরে প্রস্তর সংগ্রহ করাই ছিল, শাখার অন্তরাল হইতে তাহাই ক্রমাগত ছুঁড়িতে লাগিলাম। ময়ূর, কাক, শৃগাল সকলকেই অবশেষে রণে ভঙ্গ দিতে হইল। বৃক্ষ হইতে নামিয়া ভুক্তাবশিষ্ট সাপটাকে টানিয়া জঙ্গলের ভিতরে লইয়া গেলাম এবং আব কালবিলম্ব না করিয়া খাইতে শুরু করিয়া দিলাম। সাপটা খুব বড় ছিল না, দেখিতে দেখিতে শেষ হইয়া গেল। ময়ূরের দল অনেকটা মাংস খাইয়া ফেলিয়াছিল, আমার জন্য খুব বেশি অবশিষ্ট ছিল না। ক্ষুধা মিটিল না বরং আরও উগ্র হইয়া উঠিল। মনে পড়িল আগের দিন একটা মৌচাক দেখিয়াছিলাম, সেটাকে আত্মসাৎ করিলে মন্দ হয় না। প্রকাণ্ড একটা গাছের উঁচু ডালে মৌচাকটা আছে। ভাবিলাম প্রথমে দেখিয়া আসা যাক, তাহার পর শুষ্ক ডালপালা সংগ্রহ করিয়া পাথরে পাথর ঠুকিয়া আগুন জ্বালাইব, ধোঁয়া না দিলে মৌমাছিরা পালায় না। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হইল ধোঁয়া করিলে তো জুজুম জানিতে পারিবে। কথাটা মনে হইবামাত্র আপাদ-মস্তক একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল। জুজুম জানিতে পারিলে আর রক্ষা নাই, আমাকে তাড়াইয়া তবে সে ছাড়িবে। ইকার মূর্তিটা আবার মনের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। হঠাৎ সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল, শরীরের সমস্ত পেশী শক্ত হইয়া উঠিল, শিরা-উপশিরায় উন্মাদ রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র দিয়া যাহা বহিতে লাগিল তাহা নিশ্বাস নয়, আগুনের হলকা। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া মুষ্টিবদ্ধ বাহুযুগল আকাশের

দিকে তুলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যাইব না, যেমন করিয়া পারি ইকাকে অধিকার করিব। সেই নির্জন বনে উত্তোলিত-বাহু অবস্থায় কতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলাম বলিতে পারি না, একটা বন্য-পাখির তীব্র চিৎকারে চমক ভাঙিল। আত্মস্থ হইলাম। ধীরে ধীরে আবার সেই মৌচাকটার ছবি মানসপটে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। জিহ্বা লালায়িত হইল। বিপদ আছে জানিয়াও আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না। বনের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। একটা দুর্নিবার ক্ষুধা যেন আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। একটু পরে সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলাম। লোলুপ দৃষ্টি ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করিলাম। যাহা দেখিলাম তাহা কিন্তু হতাশাজনক। মানবদস্যুকে ফাঁকি দিয়া মৌমাছিরা মধু খাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। পড়িয়া আছে শুধু শূন্য চাকটা।... ক্ষুব্ধচিত্তে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, সহসা এক ঝাঁক মৌমাছির ভনভন শব্দ শুনিতে পাইলাম, ছুটিয়া একটা ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া পড়িলাম। বাল্যকালে একবার মৌমাছির কামড় খাইয়াছিলাম সে নিদারুণ যন্ত্রণার কথা আজও ভুলি নাই। ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করিলাম বটে, কিন্তু স্থির থাকিতে পারিলাম না। মৌমাছিদের এই অতর্কিত আবির্ভাবের কারণ নির্ণয় না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাইতেছিলাম না। প্রতিটি জিনিসের কারণ নির্ণয় করিবার প্রবৃত্তি বোধ হয় বন্য-মানবকে সভ্য করিয়াছে। প্রতিটি জিনিসের কারণ নির্ণয় না করা পর্যন্ত আজও তাহার শান্তি নাই। ঐ মৌচাকটার মৌমাছিগুলাই কি মধুপান করিয়া আনন্দে মাতিয়া বেড়াইতেছে, না এ আর একটা দল? এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে কারণটা হঠাৎ চোখে পড়িল। কাছেই একটা বিশাল অশ্বত্থ গাছ, তাহার উচ্চডালে উঠিয়া একটা প্রকাণ্ড ভালুক আর একটা মৌচাক আক্রমণ করিয়াছে, তাহার সর্বাঙ্গে সহস্র মৌমাছি ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু লোমশ ভালুকের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। নির্বিকারচিত্তে দস্যুটা লুণ্ঠন করিতেছে। ...স্থানটা নিরাপদ মনে হইল না। হামাগুড়ি দিয়া ঝোপ হইতে বাহির হইয়া গেলাম। সেই জলাটার দিকেই গেলাম, কিছু খাদ্য সেখানে পাইবই। জলাশয়ের তীরবর্তী হইতে বেশ একটু সময় লাগিল, পথঘাট তখনও অপরিচিত। তাছাড়া ঝোপের ভিতর গা-ঢাকা দিয়া চলিতে হইতেছিল, ফাঁকা জায়গায় বাহির হইবার সাহস ছিল না। জুজুম যদি দেখিয়া ফেলে। অসংখ্য বন্য-শত্রুরও অভাব নাই। অনাবৃত স্থানে আত্মপ্রকাশ করা নিরাপদ ছিল না সেকালে। মাঝে মাঝে হাঁসের ডাক শুনিতে পাইতেছিলাম, তাহাই অনুসরণ করিয়া অবশেষে জলার ধারে গিয়া পৌঁছিলাম । ঝোপের ভিতর হইতে সন্তর্পণে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম কাছে-পিঠে কোনো বিপদের সম্ভাবনা আছে কি না। সে রকম কিছু চোখে পড়িল না, দেখিলাম অজস্র পদ্ম ফুটিয়া আছে, অসংখ্য হাঁস ভাসিয়া বেড়াইতেছে। আর কালবিলম্ব না করিয়া কয়েকটা শামুক সংগ্রহ করিয়া হাতের কাছে যে পদ্মগুলি ছিল তুলিয়া ফেলিলাম। পদ্মের ভিতরের চাকগুলি অতিশয় সুখাদ্য। মোটামুটি ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল। জলাটার ধারে ধারেই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিছু কাছিমের ডিমও পাইয়া গেলাম একস্থানে। এক জায়গায় কিছু কন্দও চোখে পড়িল। কিন্তু তখন আর খাইবার প্রবৃত্তি ছিল না, স্থানটা চিহ্নিত করিয়া রাখিলাম ভবিষ্যতের জন্য। তাহার পর পাথর সংগ্রহে মন দিলাম। নানা আকৃতির কয়েকটি পাথর কুড়াইবার পর মনে হইল শুধু পাথর সংগ্রহ করিলেই তো চলিবে না, ওগুলিকে তীক্ষ্ণ অস্ত্রে পরিণত করিতে হইবে, অর্থাৎ পাথর ঘষিবার একটা স্থানও চাই। কয়েকটা তীক্ষ্ণ তীর যদি করিতে পারি তাহা হইলে আর ভাবনা কি? সম্মুখ-যুদ্ধে জুজুমকে আহ্বান করিবার সাহস যদি

নাও হয়, গাছের আড়াল হইতে তার শির লক্ষ্য করিয়া একটা তীর নিশ্চয়ই ছুঁড়িতে পারিব এবং তীরটা যদি ঠিক লক্ষ্যভেদ করে, জুজুমকে আর উঠিতে হইবে না। একবার পড়িয়া গেলে ছুটিয়া গিয়া তাহার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িব, টুঁটি কামড়াইয়া ধরিব। উত্তেজনায় শরীরের সমস্ত পেশী শক্ত হইয়া উঠিল। সংগৃহীত পাথরগুলিকে একটি ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া রাখিয়া চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলাম...পাথর ঘষিবার স্থান একটা আবিষ্কার করিতেই হইবে। স্থানটা নিরাপদ এবং নির্জন হওয়া চাই, জুজুম যেন না জানিতে পারে। দূরে আকাশের গায়ে পর্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছিল, সহসা মনে হইল ওইখানেই আছে। ওখানে গেলে নিশ্চয়ই পাইব। অবিলম্বে পর্বতশীর্ষ লক্ষ্য করিয়া গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। কখনও হাঁটিয়া কখনও হামাগুড়ি দিয়া, কখনও গাছে চড়িয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কতক্ষণ কাটিয়াছিল বলিতে পারি না, বিকট একটা তীক্ষ্ণ চিৎকারে সচকিত হইয়া উঠিলাম। শুধু চিৎকার নয়, সমস্ত বন যেন আলোড়িত হইয়া উঠিল। আমি মাটিতে ছিলাম, তাড়াতাড়ি একটা গাছে উঠিয়া পড়িলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে শরীরের রক্তস্রোত ক্ষণিকের জন্য থামিয়া গেল। একদল হাতি; পর্বতাকার একটা দাঁতাল হাতি মদমত্ত হইয়া জনৈকা হস্তিনীকে প্রণয় নিবেদন করিতেছে। তাই এই আলোড়ন। গাছের উচ্চডালে আরোহণ করিয়া দেখিলাম বৃহৎ, নাতি-বৃহৎ ক্ষুদ্র অনেকগুলি হাতি রহিয়াছে। অধিকাংশই হস্তিনী। কাছাকাছি থাকা আর নিরাপদ মনে হইল না। গাছ হইতে নামিয়া পড়িলাম, হাতির দলকে দক্ষিণে রাখিয়া অন্য পথে পুনবায় অগ্রসব হইলাম। যত শীঘ্র সম্ভব এ অঞ্চল ত্যাগ করিতে হইবে। মত্তমাতঙ্গ বড় ভয়ানক জিনিস। হাতির দলের সহিত দূরত্ব রক্ষা করিতে গিয়া কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে একটা সুবিধা হইয়া গেল। বনের যে অংশে আসিয়া পড়িলাম তাহা কম জটিল, একটা পথের আভাসও পাওয়া গেল। কেন জানি না, হস্তিযূথের প্রতি মনটা প্রসন্ন হইয়া উঠিল। উহাদের দর্শনেব ফলেই যেন অরণ্যের জটিলতা কমিয়া গেল এই ধরনের একটা ধারণা অজ্ঞাতসারে, মনের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করিল। দ্রুতপদে হাঁটিতে লাগিলাম। অরণ্য শেষ হইয়া গেল, একটা প্রান্তরে আসিয়া পৌঁছিলাম। দেখিলাম প্রান্তরের ঠিক ওপারেই পাহাড়ের শ্রেণী। বন হইতে বাহির হইয়াই প্রথমে অবশ্য যাহা দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা প্রান্তরও নয়, পাহাড়ও নয়, একদল শকুনি। আর একটু আগাইয়া দেখিলাম একটা মৃত জন্তুকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। দেখিয়া খুশি হইলাম। কাছাকাছি তাহা হইলে কোনো মানুষ নাই, থাকিলে ওই মৃত-জন্তুটা শকুনিদের ভোগে লাগিত না, মানুষই সেটাকে টানিয়া খাইত। আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হইলাম, চারিদিকে অনেক পাথর পড়িয়া আছে। অবিলম্বে কয়েকটা পাথর তুলিয়া শকুনিদের তাড়া করিলাম। তাহারা একেবারে উড়িয়া গেল না, লাফাইয়া লাফাইয়া একটু দূরে সরিয়া বসিল-মাত্র। কাছে গিয়া দেখিলাম একটা মৃত শৃগাল। শৃগালটাকে টানিয়া লইয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইলাম। শকুনির দলও লাফাইয়া লাফাইয়া কিছুদূর পর্যন্ত আমাকে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিল, আমিও পাথর ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া তাহাদের নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। শেষ পর্যন্ত তাহারা পারিল না, রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। আমি শৃগালটাকে টানিয়া লইয়া অবশেষে পর্বতের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। হস্তী-দর্শনের ফল সত্যই শুভ হইয়াছিল। কাছেই একটা ঝরনা দেখিতে পাইলাম। পাহাড় হইতে স্বচ্ছ জলের ধারা নামিয়া একটি ছোট নদী সৃষ্টি করিয়াছে। দুই তীরে অসংখ্য পাথরের নুড়ি। ইতস্তত নিরীক্ষণ করিবার

পর পাহাড়ের গায়ে একটি গুহা দেখিতে পাইলাম। ভয় হইল। গুহামাত্রেই তখন ভীতিপ্রদ ছিল। গুহার অন্তরালে সে যুগে স্বয়ং মৃত্যু লুকাইয়া থাকিত। সিংহ ব্যাঘ্র হায়েনা আরও কত কি। এই মৃত শৃগালটা হয়তো কোনো বাঘেরই মুখের গ্রাস। গুহাটাকে পশ্চাতে রাখিয়া নদীর ধারে ধারে যতদূর পারিলাম চলিয়া গেলাম। কিছুদূর যাইবার পর পাহাড়েব গায়ে তাকের মতো একটা স্থান হঠাৎ চোখে পড়িল। মাটি হইতে বেশ একটু উঁচুতে। উঠিয়া বসিতে পারিলে বেশ নিরাপদ স্থান। যখন পাহাড়ের গায়ে রহিয়াছে তখন নিশ্চয়ই প্রস্তরময়। পাথর ঘষিবারও সুবিধা হইবে। কি করিয়া ওঠা যায়! সহসা কোনো বুদ্ধি মাথায় আসিল না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া শেষে আহারে মন দিলাম, নদীতীরে বসিয়া শৃগালমাংস ছিঁড়িয়া খাইতে লাগিলাম। স্থান বেশ নির্জন বলিয়া মনে হইল। অন্য কোনো মানুষের এলাকাভুক্ত হয় নাই সম্ভবত। অন্তত তাহার কোনো চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না; ইকাকে যদি পাই এইখানেই আসিয়া থাকিব। ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনের একটা ছবি অস্পষ্টরূপে মানসপটে প্রতিভাত হইতে লাগিল। সে ছবিতে কোনো নূতনত্ব নাই, তাহা আমার পুরাতন জীবনেবই পুনরাবৃত্তি। যে দলপতি আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল, যে জুজুমের কবল হইতে ইকাকে অপহরণ করিতে চাই ভবিষ্যৎ জীবনে নিজেকে তাহাদেরই অনুরূপ কল্পনা করিয়া শৃগালের হাড় চুষিতে চুষিতে কথঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার প্রয়াস পাইলাম।

কোথায় বাসা বাঁধিব? পাহাড়ের উপর? তাহার পূর্বে পাহাড়ের উপরটা ঘুরিয়া দেখিতে হইবে নিরাপদ কি না। দূরে ওই গাছটা আছে...সহসা তড়িৎ-স্পৃষ্টবৎ উঠিযা দাঁড়াইলাম। একটা প্রেবণার বিদ্যুৎ মস্তিষ্ককে স্পর্শ করিযা চলিয়া গেল। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, চেষ্টা করিয়া দেখিব বই কি। এক লম্ফে নির্ঝরিণী পার হইয়া সেই গাছটার কাছে গিয়া হাজির হইলাম। মোটা একটা ডাল ভাঙা শক্ত কাজ, কিন্তু শক্ত বলিয়া নিবস্ত হইলে চলিবে না। একটা ডাল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলাম, খুব জোরে ঝাঁকানি দিলাম, বিশেষ কিছু হইল না। তখন গাছের উপর উঠিয়া পড়িলাম, একটা উঁচু ডাল দুই হাতে ধবিযা পায়ে করিয়া সজোরে নীচের ডালে চাপ দিতে শুরু করিলাম। মড় মড় করিয়া ডালটা ভাঙিয়া পড়িল। ডালটা খুব বেশি মোটা নয়, কিন্তু আমাব কাজের পক্ষে যথেষ্ট। ডালটা টানিয়া আনিয়া পাহাড়ের গায়ে লাগাইলাম— বাঃ, ঠিক তাক পর্যন্ত পৌঁছাইয়া গিয়াছে। ডাল বাহিয়া তাকে উঠিয়া বসিলাম। চমৎকার প্রশস্ত জায়গা, নিচে হইতে বুঝিতে পারি নাই যে, এত প্রশস্ত হইবে। ডালের পত্রপল্লব দিয়া বেশ একটু আড়ালও হইয়াছিল। নিচে নামিয়া গিয়া কয়েকটা পাথর কুড়াইয়া আনিয়া ঘষিতে শুরু করিয়া দিলাম। ভাল ভাল তীর কয়েকটা করিতেই হইবে। যেমন করিয়া হউক ইকাকে চাই।

দিন কাটিতে লাগিল। ঠিক কয়দিন কাটিল তাহার হিসাব রাখিবার তখন প্রয়োজনও ছিল না, সামর্থ্যও ছিল না। কয়েকটি প্রভাত আসিল ও চলিয়া গেল। আহার সংগ্রহ করিতে প্রতিদিন খানিকটা সময় যাইত, তাহার পর পাথর ঘষিতাম। নিবিষ্টচিত্তে যে পাথর ঘষিতাম তাহাও নয়, পাথর ঘষিতে ঘষিতে মাঝে মাঝে উঠিয়া পড়িতাম, অস্থির চিত্তে অথচ সাবধানে। চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতাম যদি হঠাৎ কোথাও একা ইকার সন্ধান পাইয়া যাই।

...একদিন দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইলাম। একা ছিল না। জুজুম ছাড়া আর সকলেই তাহার আশে পাশে ছিল। বনের ধারে সকলে মিলিয়া শুষ্ক ডালপালা সংগ্রহ করিতেছিল। আমাকে তাহারা দেখিতে পাইল না, আমি লুকাইয়া ইকাকে দেখিতে লাগিলাম। একটা অদ্ভুত

জিনিস লক্ষ্য করিলাম, ইকা মাথায় একটা লাল ফুল গুঁজিয়াছে। তাহার অবিন্যস্ত রুক্ষ কেশপাশে সেই টকটকে লাল ফুলটা যেন নীরব ভাষায় আমাকে আশ্বাস দিল। অস্পষ্টভাবে যেন অনুভব করিলাম কঠিন প্রস্তর খণ্ডকে ধৈর্য ভরে ঘষিয়া তীক্ষ্ণমুখ তীরে পরিণত করাই যে ইকাকে লাভ করিবার একমাত্র উপায় তাহা নয়, ইকার মাথার ওই লাল ফুলটা নীরবে আর একটা পথের ইঙ্গিত দিতেছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া অতৃপ্ত নয়নে দেখিতেছিলাম—হঠাৎ একটা গর্জন শোনা গেল—জুজুমের গর্জন—সকলে নিমেষমধ্যে বনান্তরালে অন্তর্ধান করিল।

...আর একদিন ইকার দেখা পাইলাম। সেদিন সে কুল পাড়িতেছিল। সেদিনও একা ছিল না, কাছেই জুজুম পরিবারের সকলেই কুল কুড়াইতে ব্যস্ত ছিল। ইকা লাঠি দিয়া গাছের ডালে ঝাঁকানি দিতেছিল, বাকি সকলে কুল কুড়াইতেছিল। আমি ঝোপের আড়াল হইতে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম। সহসা একটা কাণ্ড হইয়া গেল। আমার কণ্ঠ দিয়া আমার অজ্ঞাতসারে একটা শব্দ নিঃসৃত হইল। নিরুদ্ধ আকুলতা সহসা শব্দায়িত হইয়া পড়িল যেন। ইকা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, আমিও আমার মুণ্ডটা ঝোপের ভিতর টানিয়া লইতে ভুলিয়া গেলাম। ইকা আমাকে দেখিল, ক্ষণকালের জন্য ঘাড় ফিরাইয়া রহিল, তাহার পর আবার কুল-পাড়ায় মন দিল, যেন কিছুই হয় নাই। চিৎকার করিল না, পলাইয়াও গেল না। তাহার এই আচরণ আমার মনে যে অর্থ বহন করিয়া আনিল তাহাতে বিস্ময়ে আনন্দে আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই হয়তো আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া অসমসাহসিক কিছু একটা করিয়া ফেলিতাম, কিন্তু একটা তীক্ষ্ণ চিৎকারে সচকিত হইয়া পাশের গাছটার উপর উঠিয়া পড়িলাম। চিৎকারটা আহত জন্তুর। গাছের উপর হইতে দেখিলাম একটু দূরে ফাঁকা মাঠে জুজুম একটা শূকর শাবককে পাথরে আছড়াইয়া মারিতেছে। আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করিলাম—যা এতদিন করি নাই, কাছে একটা ফাঁদ পাতা রহিয়াছে। মাটিতে প্রকাণ্ড একটা গর্ত, সেই গর্তের ওপর ডাল-পালা সাজানো। শূকর শাবকটা ওই গর্তের মধ্যে ধরা পড়িয়াছিল। শব্দ অনুসরণ করিয়া সকলে জুজুমের নিকট ছুটিয়া গেল। ইকাও। রক্তাক্ত শূকর শিশুটাকে ঘিরিয়া তাহাদের আনন্দ-কলরব জমিয়া উঠিল। আমি লুব্ধচিত্তে ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণে বসিয়া বসিয়া তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, সেদিন আর সেই গাছ হইতে নামিলাম না। ভয়ের জন্য নয়, একটা দুর্নিবার আকর্ষণ যেন আমাকে টানিয়া রাখিল, কিছুতেই নামিতে দিল না। সন্ধ্যার অন্ধকারটা অজুহাত স্বরূপ হইয়া আমাকে সেই নানা অসুবিধাপূর্ণ গাছটার উপরে বসাইয়া রাখিল। ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, কিন্তু সেই জলাশয়ে গিয়া আর শামুক সন্ধান করিবার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। একস্থানে খানিকটা কন্দ দেখিয়াছিলাম, তাহার সন্ধানে যাইতেও ইচ্ছা করিল না। সেই গাছের ডালেই আমি নানা অসুবিধা সহ্য করিয়া বসিয়া রহিলাম। একটা মৃদু শব্দ হইল। পক্ষ বিধূননের শব্দ; ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম ঠিক পাশের ডালেই একটা কোটর রহিয়াছে। কোটরে হাত ঢুকাইয়া দিতেই আঙুলে কি একটা কামড়াইয়া ধরিল। অসহ্য যন্ত্রণায় হাতটা বাহির করিয়া লইলাম। সঙ্গে সঙ্গে গোটা দুই পাখি উড়িয়া গেল। জনক-জননী উড়িয়া গেল, নিশ্চয়ই ডিম কিংবা ছানা আছে। পুনরায় হাত ঢুকাইলাম। গোটা দুই ছানা ছিল। সেই দুটিকে গলাধঃকরণ করিয়া কোনোক্রমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। সমস্ত রাত ভাল ঘুম হইল না। ভোরের দিকে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। চোখ খুলিয়া দেখিলাম ভোর হইতেছে। পর মুহূর্তেই আনন্দে উত্তেজনায় সমস্ত দেহটা কাঁপিয়া উঠিল। ভোরের আলো দেখিয়া নয়, নিজের অজ্ঞাতসারে যাহা আশা করিয়াছিলাম, তাহাই যেন মূর্তিমতী হইয়া দেখা দিয়াছে। ইকা

আসিতেছে — একা! আমি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না, গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িলাম। সচকিত ইকা ছুটিয়া বনমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। অন্তর্হিত হইবার পূর্বে কিন্তু একবার ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া গেল। মনে হইল তাহার চকিত চোখের দৃষ্টিতে, বিকশিত দন্তরুচিতে, কম্পমান স্তনযুগলে সে যাহা প্রকাশ করিয়া গেল, তাহা প্রত্যাখ্যান নয়, নিমন্ত্রণ। উর্ধ্বশ্বাসে অনুসরণ করিলাম, কিন্তু ধরিতে পারিলাম না। সে নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া ফাঁদটা পর্যবেক্ষণ করিলাম—ফাঁদে কিছু পড়ে নাই। মনে হইল ফাঁদটা দেখিবার জন্য ইকা বোধহয় আসিয়াছিল এবং রোজই সম্ভবত আসে। কিন্তু আজ যাহা ঘটিল তাহার পরও আসিবে কি? অনেকক্ষণ ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইলাম। ইকা জুজুমকে ডাকিয়া আনিতে পারে, জুজুম নিজেই হয়তো আসিয়া পড়িতে পারে—এসব সম্ভাবনার কথা যে মনে হইতেছিল না তাহা নয়, কিন্তু কিছুতেই ওই স্থানটা ত্যাগ করিতে পারিতেছিলাম না। মনে হইতেছিল জুজুম যদি আসে আসুক, প্রাণ তুচ্ছ করিয়া তাহাব সহিত সম্মুখ সময়ে অগ্রসর হইব, কিন্তু এ স্থান ত্যাগ করিব না। একটা অদৃশ্য রজ্জু যেন দুশ্ছেদ্য বন্ধনে আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। একবার মনে হইল, ফিরিয়া যাই। পাহাড়ে একটা পাথর ঘষিয়া ঘষিয়া অনেকটা সূচালো করিয়া ফেলিয়াছি, আজ সমস্ত দিন ঘষিলে তাহা একটা উৎকৃষ্ট অস্ত্রে পবিণত করিতে পারিব। কিন্তু কিছুতেই ওই স্থানটি ত্যাগ করিতে পারিলাম না। উহারই আশে-পাশে আনাচে-কানাচে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিলাম। সেই কন্দটা খুঁড়িয়া খাইয়া ফেলিলাম, একটা শজারুব গর্ত হইতে একটা শজারুকে টানিয়া বাহিব করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। একটা ঝোপে গোটা দুই পাখির ডিম পাওয়া গেল, জলাশয়ের ধারে গিয়া কয়েকটি শামুকও পাইলাম। ইকার কুলগাছটায় অনেক কুল ছিল। কুল পাড়িতে গিয়া হঠাৎ চোখে পড়িল বনের মধ্যে একটা গাছ অসংখ্য লাল ফুলে ভরিয়া রহিয়াছে। ওই ফুলই তো ইকা মাথায় পরিয়াছিল; চকিতের মধ্যে একটা মতলব মাথায় খেলিয়া গেল। ডাঁসা ডাঁসা বড় বড় কুলসুদ্ধ একটা ছোট কুলের ডাল ভাঙিয়া লইলাম, তাহার পর সেই গাছটা হইতে ডাল-সুদ্ধ এক গোছা ফুলও পাড়িলাম। সন্ধ্যায় গাছে উঠিবার আগে সেই ডাল দুইটাকে একত্র বাঁধিয়া ইকার পথে রাখিয়া দিলাম। ইকা ওই পথ দিয়া আজ আসিয়াছে, কালও আসিবে। দেখিতে আসিবে ফাঁদে শিকার পড়িয়াছে কি না। সে যখন জুজুমকে ডাকিয়া আনে নাই তখন নিশ্চয় আসিবে।

...সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র নয়নে বসিয়া রহিলাম। কিছুতেই ঘুম আসিল না। রাত্রির অন্ধকারের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। অরণ্যের বিচিত্র শব্দে অন্ধকার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শ্বাপদ গর্জন করিল, ঝিল্লী ঝনৎকার তুলিল। সরীসৃপ সঞ্চরণের সর-সর, পক্ষীর পক্ষ-বিধূনন অন্ধকারে শিহরন জাগাইল। আকাশে তারা উঠিল, চাঁদ হাসিল। আমি নিস্পন্দ হইয়া একাগ্র দৃষ্টিতে পথপানে চাহিয়া রহিলাম। কতক্ষণ ছিলাম বলিতে পারি না। সহসা দেখিলাম অন্ধকার স্বচ্ছ হইতেছে। ঈষৎ আলোর রূপালি পটভূমিকায় নিকষ কৃষ্ণাঙ্গিনী, যৌবন-কঠিন ইকার মূর্তি অনিবার্য নিয়তির মতো যেন ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল।

.... আমি জানিতাম, ইকা আসিবে। ইকার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল ইকাও যেন জানে আমি প্রতীক্ষা করিতেছি। অকম্পিত চরণে ধীরে ধীরে সে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছু দূর আসিয়া পথের উপর কুল ও ফুলের গোছা দেখিতে পাইল। দেখিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, এ-দিক ও-দিক চাহিল একবার, তাহার পর হাসিয়া উঠিল। সভ্য তরুণীর মুচকি হাসি নয়। মনে

হইল একটা ক্ষুধিত হায়েনা যেন ডাকিতেছে। পরমুহূর্তেই সে মাটিতে বসিয়া পড়িল। মাথায় ফুল গুঁজিয়া কুলে মনোনিবেশ করিল। সে যখন তন্ময় হইয়া কুল খাইতেছিল, তখন আমি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে গাছ হইতে নামিয়া পড়িলাম এবং ঝোপের আড়ালে গুঁড়ি মারিয়া ধীরে ধীরে তাহার নিকটবর্তী হইলাম। তাহার পর অতর্কিতে বিপরীত দিক হইতে আক্রমণ করিলাম, যাহাতে সে জুজুমের আস্তানার দিকে না যাইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠিয়া ছুট দিল, আমিও পশ্চাদ্ধাবন করিলাম। কণ্টকে কঙ্করে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, বন জঙ্গল ভেদ করিয়া উন্মত্তের মতো ছুটিতে লাগিলাম। জঙ্গল পার হইয়া সেই জলাশয়ের তীরে আসিয়া পড়িলাম। ইকা ছুটিয়া গিয়া জলাশয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল, আমিও পড়িলাম। হাঁসের দল সচকিত হইয়া উড়িতে লাগিল, তাহাদের ডাকে আকাশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি প্রাণপণে সাঁতার কাটিয়া কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি, এমন সময় এক কাণ্ড ঘটিল। নিদারুণ আর্তনাদ করিয়া ইকা হঠাৎ ডুবিয়া গেল। বুঝিলাম কুমির। সঙ্গে সঙ্গে আমিও ডুব দিলাম এবং তীরবেগে ডুব সাঁতার কাটিয়া গিয়া কুমিরের পিঠের উপর চড়িয়া বসিলাম। কুমিরকে কি করিয়া জব্দ করিতে হয় জানা ছিল। সজোরে তাহার দুই চোখে আমার তীক্ষ্ণ-নখসমন্বিত আঙুল দুইটা ঢুকাইয়া দিলাম। কুমির তৎক্ষণাৎ ইকাকে ছাড়িয়া আমাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ধরিতে পারিল না। আমি সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিকে সরিয়া গিয়াছিলাম। কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া দেখি, ইকা তীরে উঠিয়াছে। দ্রুতবেগে সাঁতার কাটিয়া আমিও তীরে উঠিয়া পড়িলাম। আমাকে দেখিয়া ইকা আবার ছুটিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কুমির তাহার ডান পাটা চিবাইয়া দিয়াছিল। আমি ছুটিয়া গিয়া তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। তাহার রক্তাক্ত চরণের যন্ত্রণার কথা ভাবিয়া নিরস্ত হইলাম না, উন্মত্ত আগ্রহে নিষ্ঠুর আলিঙ্গনে তাহাকে নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলাম। ইকা আমার বাহুমূলে কামড়াইয়া ধরিল, তীক্ষ্ণ নখরে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারিল না।

ইকা চলিতে পারিতেছিল না। তাহাকে কাঁধের উপর তুলিয়া লইয়াছিলাম। তাহার পদনিঃসৃত রক্তধারায় আমার সর্বাঙ্গ রঞ্জিত, তাহার দন্ত ও নখরাঘাতে আমার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। কাঁধের উপর বসিয়াও রাক্ষসীটা প্রাণপণে আমার মাথার চুল ধরিয়া টানিতেছিল। আমি দুই হাত দিয়া তাহার মাংসল উরুযুগলকে প্রাণপণে কাঁধের উপর চাপিয়া ধরিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতেছিলাম। সেই পাহাড়ের উদ্দেশ্যে!

পাহাড়ে পৌঁছিয়া এক ঝটকায় কাঁধ হইতে তাহাকে ভূপাতিত করিলাম। উঃ, মাথার চুলগুলা বোধ হয় উপড়াইয়া ফেলিয়াছে। মাথায় আগুন জ্বলিতেছিল। কাছেই একটা গাছ ছিল, তাহার একটা ডাল ভাঙিলাম। আপাদমস্তক না চাবকাইলে পোষ মানিবে না। ডাল হাতে করিয়া ফিরিয়া দেখি ইকা হাসিতেছে। অপরূপ মোহিনী মূর্তি। ডালটা ফেলিয়া দিয়া তাহাকে আবার জড়াইয়া ধরিলাম। আমার গৃহস্থালি স্থাপিত হইল।

॥ দুই ॥

তাহার পর কত কাল কাটিয়া গিয়াছে। আমি কিন্তু মরি নাই। কত ইকা আসিল এবং চলিয়া গেল, কত সন্তান জন্মিল মরিল, কত বন্য-জন্তু, আরণ্য বৃক্ষলতা, পর্বত-নির্ঝরিণী

জীবনের পটভূমিকায় কখনও আনন্দ, কখনও বিস্ময়, কখনও আশঙ্কার ছবি আঁকিয়া বিলীন হইয়া গেল। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব, পাশবিক উল্লাস, দৈহিক ক্ষুধার তাড়নায় ফুল-ফল ল -পাতা কন্দ-কাণ্ড-মূল কীট-সরীসৃপ-পশু-পক্ষীর নিরবচ্ছিন্ন সন্ধান, নারীমাংসকে কেন্দ্র করিয়া সদাজাগ্রত হিংস্র আকাঙ্ক্ষা—এই সমস্তর উপর দিয়া কালের প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে। স্তরের উপর স্তর পড়িয়াছে, ধীরে ধীরে পরিবর্তনের বীজ উপ্ত হইয়াছে, যুগের পর যুগান্তর আসিয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী।

প্রথমটা তত গ্রাহ্য করি নাই, কিন্তু শেষে একদিন করিতেই হইল। সহসা একদিন উপলব্ধি করিলাম খুব বেশি শীত করিতেছে। নিদারুণ শীত। বর্ষাকালে নদীর জল ক্রমশ যেমন বাড়ে শীতটাও উত্তরোত্তর তেমনি যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে। পশুচর্মে আর যেন শীত ভাঙে না, পূর্বে একটা পশুচর্ম হইলেই যথেষ্ট হইত। পশুচর্মও বেশি না। কিছুদিন হইতে বনে বৃহদাকার পশুরও অভাব ঘটিয়াছে। বহুকাল বড় পশু শিকার করি নাই। হায়েনার ডাকও আজকাল তেমন শোনা যায় না। বন্য মহিষও দেখিতে পাই না। সুতরাং পশুচর্ম বেশি নাই। যে কয়খানা ছিল সেগুলি আমি আর আমার সঙ্গিনীরা দখল করিয়াছি। শিশুগুলা শীতে কাঁপিতেছে। কয়েকটা শিশু তাহাদের মায়ের কোল ঘেঁষিয়া বসিয়াছে, তবু কাঁপিতেছে। নিদারুণ শীত। আগুন জ্বালাইয়াছি, আগুনের চতুর্দিকেই সকলে বসিয়া আছি। তবু কিন্তু শরীর গবম হইতেছে না। তাহা ছাড়া আর একটা জিনিসও ক্ষীণভাবে উপলব্ধি করিয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িতেছি। আগুনের ইন্ধন ফুরাইয়াছে। নিকটেই যে কাঠের বোঝা ছিল তাহা নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। গত কয়েক দিন আগুনের নিকট হইতে কেহ ওঠে নাই, উঠিতে পারে নাই। অরণ্যের একধারে গাছের ডালপালা দিয়া ঘিরিয়া নিজেদের যে আশ্রয়টুকু রচনা করিয়াছিলাম নিদারুণ শীতে যদিও তাহা অকিঞ্চিৎকর তবু তাহা ত্যাগ করিয়া কেহ কোথাও যাইতে চাহিতেছি না। অগ্নিকুণ্ডটাকে ঘিরিয়া সকলে নিঝুম হইয়া বসিয়া আছি। শীতে মাঝে মাঝে সর্বাঙ্গে শিহরন জাগিতেছে, যে অরণ্যের আড়ালে আশ্রয় লইয়া এতকাল কাটাইয়াছি, সে অরণ্যের ভিতর শীত-তীক্ষ্ণ বায়ু গর্জন করিয়া ফিরিতেছে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া শুনিতেছি। কি করিব ভাবিয়া পাইতেছি না। তখনও মাটির নিচে বা গুহার অন্তরালে বাস করিবার কল্পনাও আমাদের মনে জাগে নাই। গাছের ডালপালা লতা দিয়া বড় বড় দুই তিনটা আগড়ের মতো বানাইয়া তাহারই সাহায্যে কুটির প্রস্তুত করিয়া বাস করিতাম। ঝড়ে বৃষ্টিতে কখনও কখনও তাহা ভাঙিয়া পড়িত, আবার প্রস্তুত করিয়া লইতাম। এমন শীতের অভিজ্ঞতা পূর্বে আর কখনও হয় নাই।

সমস্ত কাঠ একদিন নিঃশেষ হইয়া গেল। বনের ভিতর শীতের তীক্ষ্ণ হাওয়া তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে, দূর প্রান্তরে শুষ্ক পাতার রাশি বায়ুবেগে উড়িয়া চলিয়াছে। মনে হইতেছে শীতের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য উহারা যেন পলায়ন করিতেছে। ওই পলাতক পাতাগুলাকে কুড়াইয়া আনিয়া অগ্নিকুণ্ডে সমর্পণ করিলে খানিকক্ষণ আরাম পাইতাম। শুষ্ক পাতা কুড়াইয়া আনিয়াই এতকাল আগুন জ্বালাইয়াছি, পাতার রাশি গাছের তলায় স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া থাকিত, এখন সব ছুটিয়া চলিয়াছে। ছুটিয়া উহাদের ধরিতে পারিব কি? কয়েক দিন ভাল করিয়া খাওয়া হয় নাই, খাদ্য সংগ্রহের জন্য বাহিরেই যাইতে পারি নাই। দুর্বল বোধ করিতেছিলাম, শীতে কাঁপিতেছিলাম, তবু উঠিয়া পড়িতে হইল। যেমন করিয়া হউক কিছু কাঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতেই হইবে।

বাহিরে আসিয়া আশে পাশে চাহিয়া দেখিলাম অরণ্যও ভয়াকুল। সমস্ত পাতা ঝরিয়া গিয়াছে, শুষ্ক শীর্ণ শাখা-প্রশাখা শীতের প্রখর বাতাসে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। আমিও কাঁপিতে লাগিলাম। বায়ুবেগে হঠাৎ আমার গাত্রাবরণ শুষ্ক চর্মখানা উড়িয়া গেল। ছুটিয়া গিয়া সেটাকে কুড়াইয়া আনিয়া নগ্নদেহকে আবৃত করিলাম। ওই শুষ্ক চর্মই তখন আমাদের একমাত্র দেহাবরণ ছিল। ছুটিয়া শরীরে উত্তাপ সঞ্চারিত হইয়াছিল। শুষ্ক চর্মটাকে এক হাতে বুকের উপর চাপিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহে মন দিলাম। আগুনের ইন্ধন সংগ্রহ করিতে না পারিলে মৃত্যু অনিবার্য। একটু আগাইয়া বুঝিলাম শুষ্ক ডালপালার অভাব নাই, সমস্ত বনই শুকাইয়া আসিতেছে, শীতে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া আনাই কষ্টসাধ্য। কিছু দূর গিয়াই দেখিলাম একটা ছোট গাছ মরিয়া গিয়াছে। তাহার ডালপালাগুলি তাড়াতাড়ি ভাঙিয়া যতটা পারিলাম বহিয়া আনিলাম। আমার সঙ্গিনীরাও বাহির হইয়া গিয়াছিল, তাহারাও দেখিলাম কিছু কিছু কাঠ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। একজন একটা মৃত জন্তুর কঙ্কাল টানিয়া আনিয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। পশু কঙ্কাল অতি চমৎকার ইন্ধন। হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম দুইটা শিশু মরিয়া গিয়াছে। কুঁকড়াইয়া একধারে পড়িয়া আছে, নিঃশ্বাস পড়িতেছে না। অগ্নিকুণ্ডও নির্বাপিত প্রায়। শীত আরও যেন তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। তাড়াতাড়ি সকলে মিলিয়া ফুঁ দিয়া আগুন জ্বালাইয়া ফেলিলাম, তাড়াতাড়ি সকলে মিলিয়া অগ্নিস্তূপের নিকট ঘেঁষিয়া বসিলাম। মৃত শিশু দুইটাকেও আগুনের মধ্যে গুঁজিয়া দেওয়া হইল। তখন আমরা কোনো কিছুই নষ্ট হইতে দিতাম না। শোক? নিজের সুবিধার জন্য মাথার চুল কিংবা হাতের নখ কাটিয়া ফেলিয়া তোমরা কি শোক কর? আজও যেমন সঙ্কীর্ণ স্বার্থের মাপকাঠি দিয়াই শোকেব বিচার হয় তখনও তাহাই হইত। একটা ক্ষুদ্র শিশু অপেক্ষা একটা পাথরের অস্ত্র আমাদের নিকট বেশি প্রিয় ছিল। একটা পাথরের অস্ত্র হারাইয়া গেলে আমরা শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িতাম। তা ছাড়া, শিশু তখন আনন্দজনক ছিল না, খাদ্যের এবং রমণীর অংশীদাররূপে বিরক্তিই উৎপাদন করিত।

...শীত উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। অরণ্যের পত্র-পল্লব শুকাইয়া আসিল। ইন্ধনের অভাব হইল না, হু হু করিয়া আগুন জ্বালাইয়া তাহার মধ্যে আমরা বসিয়া রহিলাম। কিন্তু পেটেও অগ্নি জ্বলিতেছিল। সে অগ্নির ইন্ধন সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া উঠিতেছিল ক্রমশ। যে অরণ্য আমাদের খাদ্য সরবরাহ করিত তাহা মরিয়া যাইতেছিল। একটা প্রাণহীন অরণ্য-কারাগারে আমরা ধীরে ধীরে যেন বন্দী হইয়া পড়িতেছিলাম। বনের পশুপক্ষীরও আর সাড়া পাওয়া যায় না। তীক্ষ্ণ তীব্র শীতের বাতাস একটা হিংস্র পশুর মতো মৃতপ্রায় অরণ্যভূমিতে গর্জন করিয়া ফিরিতেছে শুধু, আর কিছু নাই। পাখির ডাক নাই, পতঙ্গের গুঞ্জন নাই, শ্বাপদের সঞ্চরণ শব্দ নাই। ভয়ঙ্কর মৃত্যুর হিমশীতল কবলে সমস্ত চরাচর যেন নির্জীব হইয়া আসিতেছিল '

...একে একে সমস্ত শিশুগুলি গেল। কয়েকটি আপনিই মরিল, কয়েকটিকে মারিয়া ফেলিতে হইল। পলায়নক্ষম কিশোর-কিশোরীরা বিপদ আসন্ন বুঝিয়া একে একে অন্তর্ধান করিল।

...আহারের চেষ্টায় একদিন বাহির হইয়া দেখি নদী, জলাশয় সমস্ত সাদা। সব জমিয়া গিয়াছে। তাহার পূর্বে তুষার কখনও দেখি নাই, আতঙ্কিত বিস্ময়ে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর হঠাৎ বিপরীত দিকে ফিরিয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ ছুটিবার পর ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হইল। একস্থানে বসিয়া পড়িলাম। বসিয়া লক্ষ্য করিলাম আশেপাশে পেঁজা তুলোর মতো কি যেন ছড়ানো রহিয়াছে। সাহস সঞ্চয় করিয়া হাত দিলাম। হাত দিয়াই

চমকাইয়া উঠিতে হইল, মনে হইল হাতে যেন কামড়াইয়া দিল। মনে হইল জিনিসটা যেন জীবন্ত। জীবন্ত অথচ শীতল, চতুর্দিকে ছড়ানো রহিয়াছে। হঠাৎ নজরে পড়িল আকাশ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে। একটা অজানা আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া আমরা উঠিয়া ছুটিতে শুরু করিলাম। খানিকক্ষণ ছুটিয়া আবার বসিয়া পড়িতে হইল। পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। উপর্যুপরি দুই দিন কিছু খাই নাই। ক্ষুধায় পেটের নাড়ি জ্বলিয়া যাইতেছে। খাদ্যের কোনো আশা নাই। অরণ্যের শ্যামশোভা অবলুপ্ত হইয়াছে, জীবনের কোনো লক্ষণ কোথাও নাই। একটা শ্বেত বিভীষিকা প্রেতের মতো সমস্ত গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। ছুটিয়া শরীরে খানিকটা উত্তাপ সঞ্চারিত হইয়াছিল, কিছুক্ষণ বসিবার পর শীত করিতে লাগিল। আবার উঠিলাম। সহসা মনে হইল আগুনটা যদি নিবিয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে শীতেই মরিতে হইবে। দ্রুতপদে আস্তানাব দিকে ফিরিতে লাগিলাম। প্রখর বাতাসটা হঠাৎ থামিয়া গেল। পেঁজা তুলোর মতো তুষার চতুর্দিকে ঝরিয়া পড়িতেছে, বিরাম নাই। চারিদিক কেমন যেন আবছা হইয়া আসিয়াছে। কিছুদূর আসিয়া চোখে পড়িল একটা গাছের মোটা ডাল ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সেটাকে টানিয়া লইয়া চলিলাম। আগুন জ্বালাইতে হইবে। আস্তানায় ফিরিয়া দেখিলাম একজন ছাড়া আর সকলেই পলাইয়াছে। তিনটি নারী শেষ পর্যন্ত ছিল এখন ফিরিয়া দেখিলাম দুইজন চলিয়া গিয়াছে, একজন আছে। যে আছে সে যে আমার প্রতি মায়াবশত আছে তাহা নয়। তাহার যাইবার সামর্থ্য নাই। চোখে দেখিতে পায় না। একটা বন-বিড়াল একবার উহার মুখের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, তাহারই নখরাঘাতে চক্ষু দুইটি গিয়াছে। মুখময় কুৎসিত ক্ষতচিহ্ন।

...আগুনটা প্রায় নিবিয়া আসিয়াছিল, অনেক কষ্টে পুনরায় তাহা জ্বালাইয়া তুলিলাম। পত্রপল্লববহুল মোটা ডালটা অবশেষে ধরিয়া উঠিল। শীত কমিল, কিন্তু ক্ষুধা বাড়িল। চতুর্দিকে অনুসন্ধান করিয়া আসিলাম, খাদ্যের কোনো সম্ভাবনা কোথাও নাই। এ অরণ্য মরিয়া গিয়াছে, এখানে থাকিলে আমারও মৃত্যু অনিবার্য—এই চিন্তা আমাকে উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিল। ফাঁদে পতিত মৃত্যু-ভীত পশুর ন্যায় আমি সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দিকে অস্থিরভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। মনে হইল এখন কেবল একটিমাত্র উপায় আছে। অন্ধ সঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম। থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে। এতদিন উহার দেহটা নানাভাবে ভোগ করিয়াছি, এইবার পরিপূর্ণভাবে ভোগ করিব। পাথরের মুগুরটা তুলিয়া সজোরে মাথার উপর মারিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। আক্ষিপ্ত দেহের অসহায় বিক্ষোভ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলাম। একটু পরে সব শান্ত হইয়া গেল। তাহার পর সেই রক্তাক্ত মৃতদেহটা জ্বলন্ত শাখার উপর রাখিয়া সেটা টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম। যেমন করিয়া হউক আমাকে বাঁচিতেই হইবে।

...দ্রুতপদে চলিতেছিলাম। একটা হিম-শীতল কুয়াশায় চতুর্দিক আচ্ছন্ন হইয়া দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ করিয়াছিল। কতক্ষণ চলিয়াছিলাম মনে নাই, পথও দেখিতে পাইতেছিলাম না। একটা ঝড়ের মতো বহিতেছিল। সেই ঝড়ে অসংখ্য তুষারকণা ছুটিয়া আসিয়া সুচের মতো সর্বাঙ্গে বিঁধিতেছিল। আমি চোখ বুজিয়া অন্ধের মতো ছুটিতেছিলাম, কোন্ দিকে যাইতেছিলাম জ্ঞান ছিল না, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছিলাম কেবল। জ্বলন্ত শাখাটা কিন্তু ছাড়ি নাই। দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলাম সেটাকে। উহাতে অগ্নি আছে, ওটা ছাড়িলে যে চলিবে না এ জ্ঞানটুকু ছিল। ছুটিতে ছুটিতে যে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম খেয়াল ছিল না, হঠাৎ পায়ের

তলা হইতে মাটি সরিয়া গেল, হুড়মুড় করিয়া একটা বিরাট গর্তের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। গর্তের মধ্যে পড়িয়া একটু যেন আরাম অনুভব করিলাম, আর যাই হোক তীক্ষ্ণ বাতাসের দংশন হইতে বাঁচিয়াছি। ভিতরে বাহিরের মতো অত ঠাণ্ডাও নয়। চোখ খুলিয়া দেখিলাম বেশ প্রশস্ত বড় গর্ত। গাছের পাতলা ডাল দিয়া গর্তটা ঢাকা ছিল। তাড়াতাড়ি জ্বলন্ত গাছের ডাল এবং আমার সঙ্গিনীর মৃতদেহটা গর্তের মধ্যে টানিয়া লইলাম। আগুন প্রায় নিবিয়া আসিয়াছিল, প্রাণপণে ফুঁ দিয়া তাহা আবার জ্বালাইয়া তুলিলাম। হঠাৎ খড়খড় করিয়া একটা শব্দ হইল, ঘাড় ফিরাইয়া দেখি গর্তের এক প্রান্তে কি একটা যেন জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে। আগাইয়া গিয়া দেখিলাম একটা হরিণ শাবক। বুঝিলাম এটা তাহা হইলে ফাঁদ একটা। আরও খানিকটা খাদ্য হাতের কাছে পাইয়া আনন্দিত হইলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, যে লোকটা ফাঁদ পাতিয়াছে সে কাছে পিঠে কোথাও নাই তো! একটু পরে আসিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিবে না তো। মনে হইল আমার পাথরের অস্ত্রগুলা তো আনি নাই। আত্মরক্ষা করিব কি করিয়া? অস্ত্রগুলা আনিতে হইবে। হরিণটাকে এখন মারিব না, ওটা থাক, পরে কাজে লাগিবে। নিমেষের মধ্যে এই সব চিন্তা মাথার মধ্যে খেলিয়া গেল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রবলভাবে যাহা অনুভব করিতেছিলাম, তাহা ক্ষুধা। ভীষণ ক্ষুধা। আগুনে ঝলসাইয়া সঙ্গিনীর মৃতদেহের খানিকটা খাইয়া ফেলিলাম। ভারি তৃপ্তি হইল। শ্রান্ত দেহে যেন খানিকটা শক্তি ফিরিয়া পাইলাম; প্রাণে আশাও সঞ্চারিত হইল। আগুনে গর্তটা বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছিল। শীতের প্রকোপ হইতে বাঁচিবার মতো একটা আশ্রয় যখন জুটিয়াছে, তখন বোধহয় বাঁচিয়া গেলাম। এইবার আমার অস্ত্রশস্ত্রগুলি এবং গায়ে দিবার চামড়া কয়খানা আনা দরকার।

আবার গর্ত হইতে বাহির হইলাম। আবার সেই হিমশীতল বাতাসের সম্মুখীন হইতে হইল। আর একটা মুশকিলেও পড়িলাম। কোন্ দিকে যাইব? দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছি, আমার পুরাতন আস্তানা যে কোন্ দিকে তাহা কি করিয়া ঠিক করিব? চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলাম। কেবল সাদা আর সাদা। বেশিক্ষণ দাঁড়াইয়া নিরীক্ষণ করিবারও উপায় ছিল না। শীতে সমস্ত শরীর জমিয়া আসিতেছিল। অসহায়ভাবে ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। হঠাৎ একটা কালো জিনিস চোখে পড়িল, ছুটিয়া সেই দিকে গেলাম। দেখিলাম যে পোড়া ডালটা টানিয়া টানিয়া আনিয়াছিলাম, তাহারই একটা অংশ। আবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, ওই যে দূরে আর একটা কালো—কিছুদূরে আর একটা। বুঝিলাম, অজ্ঞাতসারে নিজেই পথ চিহ্নিত করিয়া আসিয়াছি। চিহ্ন অনুসরণ করিয়া ছুটিতে লাগিলাম, অনেকক্ষণ ছুটিবার পর পুরাতন আস্তানায় গিয়া পৌঁছিলাম। দেখিলাম সব ঠিক আছে। কোথাও জন-প্রাণী কেহ নাই। আমার আশে পাশে বিশেষ কেহ ছিলও না। তখনও গ্রাম বা সমাজ গড়িয়া ওঠে নাই। বিচ্ছিন্ন এক একটি পরিবার দূরে দূরেই থাকিত। সেই নির্জন অরণ্যে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া রহিলাম। সমস্ত বন যেন হাহাকার করিতেছে। কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল। ডালপালা সমেত একটা ছোট গাছ কাটিয়া তাড়াতাড়ি চামড়া কয়খানা তাহার উপর সাজাইয়া দিলাম। চামড়ার উপর পাথরের অস্ত্রগুলি রাখিয়া ডালটাকে টানিয়া টানিয়া আবার গর্তের উদ্দেশ্যে চলিতে লাগিলাম। গতি কিন্তু ক্রমশ মন্থর হইয়া পড়িল। যদিও আমার গায়ে একখানা চামড়া জড়ানো ছিল তবু শীতে কাবু হইয়া পড়িতে লাগিলাম। কিছুদূর গিয়া মনে হইল আর চলিতে পারিতেছি না, পা দুইটা অসাড় হইয়া জমিয়া যাইতেছে। তখন সেই চামড়া আর পাথরগুলাকে ফেলিয়া রাখিয়া,

কিছুদূর ছুটিয়া আসিলাম, তাহাতে শরীর যেন একটু গরম হইল। আবার ফিরিয়া আসিয়া সেগুলাকে টানিয়া লইয়া চলিলাম। চোখ বুজিয়া চলিতেছিলাম, চোখ খুলিয়া রাখিবার উপায় ছিল না। চলিতে চলিতে যেই মনে হইতেছিল শরীর জমিয়া আসিতেছে, অমনি খানিকটা ছুটিয়া আসিতেছিলাম। এইভাবে টানিতে টানিতে কতক্ষণ যে চলিয়াছিলাম, বলিতে পারি না। হঠাৎ এক জায়গায় হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাইবার মতো হইলাম। চোখ খুলিয়া দেখিলাম একটা মেয়েমানুষ চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে। অসাড় নিস্পন্দ বলিয়া মনে হইল। পরিপুষ্ট পীবর স্তনযুগল তুষারাচ্ছাদিত, মুখে চুলে আঁখিপল্লবে তুষারকণা জমিয়া আছে। চোখে পড়িল পাশে একটা সদ্যোজাত শিশুও রহিয়াছে। দুই জনকেই টানিয়া চামড়ার উপর তুলিলাম। মাংসের সংস্থান যত থাকে ততই ভাল। কাচিন তখন যদি আমার মনের কথা টের পাইত, তাহা হইলে তাহার অসাড় শরীরেও সাড়া জাগিত বোধ হয়। চলচ্ছক্তিহীন দেহটাকে কোনোক্রমে টানিয়া তুলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পাথরের স্তূপের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল। হিমতীক্ষ্ণ বাতাসের বেগ প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছিল, চতুর্দিক বরফে ঢাকা, চোখ খুলিলেই চোখে তুষারকণা ঢুকিয়া পড়িবার সম্ভাবনা, তবু আমি বিস্ফারিত নয়নে ক্ষণকাল কাচিনের পরিপুষ্ট যৌবনশ্রীর দিকে চাহিয়া রহিলাম, তুষারচর্চিত হইয়া তাহা যেন আরও সুন্দর দেখাইতেছিল, পরমুহূর্তেই চোখ বন্ধ করিয়া ফেলিতে হইল, বাতাসের বেগটা সহসা বাড়িয়া উঠিল, চোখ বুজিয়া আবার টানিতে শুরু করিলাম। বোঝা বেশ ভারি হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু যত ভারিই হউক, গর্তে গিয়া পৌঁছিবই। যেমন করিয়া হউক বাঁচিতেই হইবে। আমি মরিয়া যাইব?

ইহা যে কল্পনা করিতে পারি না। দন্তে দন্তে চাপিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বাতাসও যেন সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ডতর হইয়া উঠিল, তুষারের একটা ঘূর্ণাবর্ত আমাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া উদ্দাম নৃত্য শুরু করিল, কিছুক্ষণ পরে মনে হইল আর পারিতেছি না, এইবার শুইয়া পড়ি, আমারও তুষার-সমাধি হইয়া যাক। কিন্তু তখনই অন্তরের ভিতব হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—না, তাহা অসম্ভব, তোমাকে বাঁচিতেই হইবে। চল, আর বেশি দূর নাই। চলিতে লাগিলাম। বাতাসের বেগটা আরও বাড়িল, মনে হইল ঝড় উঠিয়াছে, বালির মতো তুষারকণা উড়িতেছে...আমি চলিয়াছি। সমস্ত শরীর অসাড়, পা বরফে পুঁতিয়া যাইতেছে, পিছনের বোঝাটা ক্রমশ বেশি ভারি হইয়া উঠিয়াছে.. তবু চলিয়াছি। মাঝে মাঝে কেবল চাহিয়া দেখিতেছি পথের চিহ্নগুলো ঠিক আছে কি না। যদিও কিছু কিছু বরফে ঢাকিয়া গিয়াছিল তবু একেবারে অবলুপ্ত হয় নাই, অর্ধদগ্ধ কালো শাখার টুকরাগুলা বরফে পুঁতিয়া গিয়া সুবিধাই হইয়াছিল, তাহা না হইলে বোধ হয় বাতাসে উড়িয়া যাইত। কালো অঙ্গুলি তুলিয়া তাহারা আমাকে পথনির্দেশ করিতেছিল। কৃষ্ণবর্ণকে এতকাল ভয় করিয়া আসিয়াছি। যে মেঘ বজ্র হানে তাহা কালো, যে রাত্রি ভয়ঙ্কর শ্বাপদ সরীসৃপকে লুকাইয়া রাখে তাহা কালো, বক্রদন্ত যে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এতকাল জীবন ধারণ করিয়াছি তাহার দেহেও কালো রং, সেদিন কিন্তু শ্বেত বিভীষিকার মধ্যে ওই কালোকেই একমাত্র বন্ধু বলিয়া মনে হইতেছিল। তাহারই নির্দেশে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশে চলিতেছিলাম। অনেকক্ষণ পরে, কতক্ষণ ঠিক জানি না, চোখ খুলিয়া দেখি কালো চিহ্ন আর দেখা যাইতেছে না, চারিদিকে কেবল সাদা আর সাদা। সব ঢাকিয়া গেল নাকি! বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। পথ হারাইয়া গেলে মৃত্যু অনিবার্য। আর একবার

চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে গেলাম, চাহিতে পারিলাম না, অসংখ্য তুষারকণা আসিয়া দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিয়া দিল। সোজা মাথা তুলিয়া চাহিবার উপায় নাই। তখন জানু পাতিয়া বসিয়া মাথা হেঁট করিয়া চোখ চাহিবার চেষ্টা করিলাম। দেখিলাম চাওয়া যায়, কিন্তু বেশি দূর দেখা যায় না। তখন হামাগুড়ি দিয়া খুঁজিতে লাগিলাম কয়লার টুকরা কোথাও ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে কিনা। কোথাও কিছু দেখিতে পাইলাম না। হামাগুড়ি দিয়া ব্যাকুলভাবে চতুর্দিকে হাতড়াইতে লাগিলাম, হামাগুড়ি দিয়াই অগ্রসর হইলাম কিছুদূর। মনে হইতেছিল আর উপায় নাই, এইবার সব শেষ। কিন্তু মনে হইবামাত্র অমন অসহায় অবস্থাতেও অন্তরের ভিতর হইতে কে যেন সাহস দিতেছিল, কে যেন ক্রমাগত বলিতেছিল—না, না, শেষ নয়, শেষ হইতে পারে না, দেখ, খোঁজ, চেষ্টা কর, উপায় একটা মিলিবেই। পরমুহূর্তেই চোখে পড়িল কাছেই একটা ফাটল হইতে সরু রেখায় ধোঁয়া বাহির হইতেছে। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া সেখানে গেলাম। এই তো সেই গর্তের মুখ, বরফে ঢাকিয়া গিয়াছে। ফাটলের নিকটবর্তী হইবার পূর্বেই পাতলা বরফের আচ্ছাদন আমার দেহের ভারে ভাঙিয়া গেল, আমি আবার সেই গর্তের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। গর্তে পড়িয়াই আবার আরাম অনুভব করিলাম। ভিতরে আগুন জ্বলিতেছিল। আর বাহির হইতে ইচ্ছা হইতেছিল না, কিন্তু বাহিরে যাহা রাখিয়া আসিয়াছিলাম তাহার প্রত্যেকটিই প্রয়োজনীয়। নিতান্তই প্রয়োজনীয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাই আবার বাহির হইতে হইল। ছুটিয়া গিয়া সব গর্তের মুখের নিকট টানিয়া আনিলাম। কাচিন তখনও অজ্ঞান অচৈতন্য। তাহাকেই প্রথমে গর্তের ভিতর নামাইয়া দিলাম, তাহার পর আমার পাথরের অস্ত্রশস্ত্র এবং চামড়া কয়খানা। হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম সেই সদ্যোজাত শিশুটা নাই, কোথায় পড়িয়া গিয়াছে হয়তো। এই দুর্দিনে অতখানি ভাল মাংস হাতছাড়া হইয়া যাওয়াতে ক্ষুব্ধ হইলাম। সামর্থ্য থাকিলে তখনই হয়তো তাহার সন্ধানে আবার বাহির হইয়া পড়িতাম, কিন্তু আর সামর্থ্য ছিল না। সর্বাঙ্গ অসাড় হইয়া আসিয়াছিল। চোখ দিয়া ক্রমাগত জল পড়িতেছিল। কান দুইটা জ্বালা করিতেছিল, মনে হইতেছিল যেন পুড়িয়া যাইতেছে। তাড়াতাড়ি আসিয়া আগুনের কাছে বসিলাম, আমার অন্ধ সঙ্গিনীর ভুক্তাবশিষ্ট দেহের খানিকটা একেবারে পুড়িয়া গিয়াছিল, বাকি অংশটুকু টানিয়া লইয়া আবার আহার শুরু করিয়া দিলাম। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম গর্তেব এক কোণে দেওয়ালেব দিক ঘেঁষিয়া হরিণ শাবকটা চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া আছে। আমি তাহার দিকে চাহিতেই সে চোখ খুলিয়া চাহিল, যেন নীরব ভাষায় তাহার কানে কানে কেহ কি বলিয়া দিল, চোখের দৃষ্টিতে শঙ্কা ঘনাইয়া আসিল। সেদিক হইতে চোখ ফিরাইয়া কাচিনের দিকে চাহিলাম, তখনও অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। বাহিরের বাতাসের বেগটা বাড়িল বলিয়া মনে হইল। মনে হইল যেন একটা অশান্ত অদৃশ্য দানব তীক্ষ্ণকণ্ঠে তর্জন করিতেছে। গর্তের ভিতর দিয়া খানিকটা শীতল বাতাস এবং বরফ ভিতরে ঢুকিল। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, ইতিপূর্বে আরও ঢুকিয়াছে। গর্তের ঠিক নিচের অংশটা আর্দ্র। হয়তো তুষারাচ্ছন্নই ছিল, আগুনের তাপে বরফ গলিয়া গিয়াছে। ভয় হইল। গর্তের ভিতরটাও যদি ক্রমশ বরফে ভরিয়া যায়! তাড়াতাড়ি উঠিয়া একটা চামড়া দিয়া গর্তের মুখটা ঢাকিয়া দিলাম। বেশ ভালভাবে ঢাকিয়া দিলাম। বাহিরের আলো যেটুকু আসিতেছিল তাহার পথ বন্ধ হইল বটে, কিন্তু অন্ধকার হইল না। আগুন ছিল, আগুন যে কেবল উত্তাপ দেয় না আলোও দেয়, এ সত্য যদিও বহুকাল পূর্বেই আবিষ্কার করিয়াছিলাম তবু তাহা পুনরায় প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দিত হইলাম। জ্বলন্ত

অঙ্গারস্তূপের রক্তিম আলোকে অন্ধকার গহ্বরটা অপরূপ হইয়া উঠিল। আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইল। প্রদীপ্ত অঙ্গারস্তূপের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলাম। অনুভব করিলাম, ঠিক কি যে অনুভব করিলাম তাহা ভাষায় বলিতে পারিব না। আতঙ্ক বিস্ময় কৃতজ্ঞতা ভক্তি এবং এসব ছাড়াও অবর্ণনীয় আর একটা কি যেন সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ করিয়া দিল, যন্ত্রচালিতবৎ জানু পাতিয়া প্রত্যক্ষ অগ্নি-দেবতাকে প্রণাম করিলাম। কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু ধোঁয়ায় সমস্ত গর্তটা ভরিয়া উঠিল, শ্বাসকষ্ট হইতে লাগিল, দেখিলাম অগ্নির দীপ্তিও ক্রমশ ম্লান হইয়া আসিতেছে, তাড়াতাড়ি গর্তের মুখ হইতে চামড়াটা সরাইয়া দিলাম। ধোঁয়া বাহির হইয়া গেল, গর্তের বাতাস অনেকটা স্বচ্ছ হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করিয়া উঠিল বাহিরের দানবটা। এক ঝলক হিম-শীতল বাতাস আবার গর্তের মুখ দিয়া প্রবেশ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা বরফ। অদ্ভুতভাবে যেন অনুভব করিতে লাগিলাম, বাহিরের ওই শ্বেত দানবটা অসীম শক্তিশালী শত্রু, কোথা হইতে আসিয়া সমস্ত দেশ গ্রাস করিয়াছে, আমাকেও গ্রাস করিয়া ফেলিবে। ইহাই তাহার লক্ষ্য। উহার নির্মম কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারিলে মৃত্যু অনিবার্য। ভাবিতে লাগিলাম, গর্তের মুখটা কি করিয়া বন্ধ করা যায়! আগুনের ধোঁয়া বাহির হইয়া যাইবে অথচ বাহিরের বাতাস ভিতরে প্রবেশ করিবে না—কি উপায়ে তাহা করা সম্ভব! আজ যেমন তোমরা নানাবিধ রাজনৈতিক আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে সমস্ত বুদ্ধি নিয়োগ করিয়াও দিশাহারা হইয়া পড়িতেছ আমিও সেদিন তেমনি ওই সামান্য ছিদ্রটুকু বন্ধ করিবার সমস্যায় সমস্ত বুদ্ধি নিয়োগ করিয়াও দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেদিন উহাই আমার জীবন-মরণ সমস্যা ছিল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া শেষে ঠিক করিলাম, গর্তের মুখটা সম্পূর্ণ বন্ধ না করিয়া অংশত বন্ধ করা যাইতে পারে। তাহাই করিলাম। তাহাতে বেশ খানিকটা ফলও হইল। আনন্দিত হইয়া পাথরগুলা গুছাইয়া রাখিতে আরম্ভ করিয়াছি হঠাৎ বাহিরের বাতাসটা হুঙ্কার দিয়া উঠিল, শুষ্ক চামড়াটা উড়িয়া চলিয়া গেল, আবরণহীন গর্তের মুখে শ্বেত দানবটা উঁকি দিয়া যেন হা-হা রবে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। একটা বাঘ কিংবা ভালুক গর্তের মুখে উঁকি দিলে যাহা করিতাম তাহাই করিলাম, কয়েকটা বড় বড় প্রস্তরফলক সজোরে সেদিকে ছুঁড়িয়া দিলাম। আশ্চর্য কাণ্ড, ঝড়টা হঠাৎ যেন থামিয়া গেল। গর্তের মুখ দিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িলাম, চামড়াটা এবং পাথরগুলা কুড়াইয়া আনিতে হইবে। বাহির হইয়া দেখি চামড়াটা বেশ কিছু দূরে উড়িয়া গিয়াছে, নির্মেঘ আকাশে সূর্য উঠিয়াছে। শুভ্র তুষারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন, তাহার উপর সূর্যকিরণ পড়িয়াছে, বরফের উপর যেন আগুন লাগিয়াছে। মনে হইল, একটা নীরব দীপ্তির নিষ্ঠুর ঔজ্জ্বল্য ক্রমশ প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়া উঠিতেছে, একটা নিঃশব্দ ভয়ঙ্কর হাসি যেন। তাড়াতাড়ি গর্তের মধ্যে ঢুকিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরেই আবার চোখ খুলিতে হইল। ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, সূর্য মেঘে ঢাকিয়াছে। রৌদ্রের প্রখরতা আর নাই। আবার বাহির হইলাম। ছুটিয়া গিয়া চামড়াখানা এবং পাথরগুলা কুড়াইয়া লইলাম। কুড়াইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ফিরিতেছি, হঠাৎ একটা পাথরে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলাম। গর্তের আশে পাশে কয়েকটা বড় বড় পাথর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল আগেই তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, এখন সেইগুলাই বরফে ঢাকা পড়িয়া আত্মগোপন করিয়াছে। তাহারই একটাতে হোঁচট খাইলাম। তীব্র আঘাত দিয়া পাথরটা আমাকে যেন একটা সত্যের সম্মুখীন করিয়া দিল। বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে হইল বড় পাথর ওড়ে না। একটা বড় পাথর

দিয়া যদি এই চামড়াখানাকে গর্তের মুখে চাপা দিতে পারি তাহা হইলে হাওয়াতে চামড়াটা উড়িয়া যাইবে না। তৎক্ষণাৎ প্রস্তরফলক দিয়া বরফ খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। চিত্তে যেন নবীন প্রেরণা নবীন উৎসাহ সঞ্চারিত হইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বরফ খুঁড়িয়া পাথরটাকে বাহির করিয়া ফেলিলাম, তাহার পর ঠেলিয়া ঠেলিয়া সেটাকে গর্তের মুখে লইয়া আসিলাম, তাহার পর গর্তের মুখে চামড়াটা বসাইয়া তাহার এক ধারে পাথরটাকে চাপা দিলাম। ধোঁয়া বাহির হইবার জন্য ফাঁক রাখিতে গিয়া বুঝিলাম যে, শুধু ধোঁয়ার জন্য নয়, আমার নিজের ঢুকিবার এবং বাহির হইবার জন্যও ফাঁক রাখা প্রয়োজন। আবার মেঘ ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছিল, আবার সেই হাসিটা ফুটিয়া উঠিতেছে, ফাঁক দিয়া গর্তের ভিতর লাফাইয়া পড়িলাম। লাফাইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত চিৎকার শুনিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম। কাচিন উঠিয়া বসিয়াছে এবং নিজের স্তনযুগলকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া তারস্বরে চিৎকার করিতেছে। তাহার চোখে আতঙ্ক। স্ফীত পয়োধর হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছে। বরফেব ভিতর হইতে তাহার অসাড় দেহটাকে যখন কুড়াইয়া আনিয়াছিলাম তখন ভাবি নাই যে সে বাঁচিয়া উঠিতে পারে। দুর্দিনের খাদ্য হিসাবে তাহাকে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম, করুণাবশত নহে। তখনকার জীবনে করুণার কোন স্থান ছিল না। যাহা করিতাম প্রয়োজনের তাগিদেই করিতাম। কাচিনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম, মনে হইতে লাগিল দেহটা প্রাণহীন হইলে এখনই আমার কাজে লাগিত। আমার অন্ধ সঙ্গিনীর দেহের খানিকটা যদিও এখনও আবশিষ্ট আছে—ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম—নাই! কয়েকখানা হাড় পড়িয়া আছে মাত্র, আর কিছুই নাই। কাচিনের দিকে ফিরিয়া চাহিলাম—হ্যাঁ, ওই যে মুখে রক্তের দাগ লাগিয়া আছে, ওই-ই তাহা হইলে বাকিটা খাইয়াছে। রাক্ষসী! হঠাৎ ভয়ঙ্কর রাগ হইল, তাহাকে তাড়া করিলাম।

কাচিনও বোধহয় ইহাই আশঙ্কা করিতেছিল, সে এক লম্ফে গর্ত হইতে বাহির হইয়া ছুট দিল; আমিও পশ্চাদ্ধাবন করিলাম। একটু আগে নিদারুণ বরফের মধ্যে যে কষ্ট পাইয়াছিলাম তাহা আর মনে রহিল না, একটা হিংস্র প্রবৃত্তি আমাকে আবার সেই বরফের মধ্যে ছুটাইয়া লইয়া চলিল।...

কাচিন হরিণীর মতো ছুটিতেছিল। আমিও ছুটিতে লাগিলাম। দূরে প্রকাণ্ড একটা আকাশচুম্বী গাছ দাঁড়াইয়াছিল। গাছ নয়, গাছের কঙ্কাল। একটি পাতা নাই, শুষ্ক শীর্ণ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া একটা মূর্ত বিভীষিকা যেন। কাচিন আমার দিকে একবার ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া উর্ধ্বশ্বাসে সেই গাছটার দিকে ছুটিতে লাগিল। কাছে-পিঠে লুকাইবার মতো কোনো আবরণ ছিল না। চতুর্দিকে কেবল শাদা আর শাদা, কাচিন ছুটিয়া গিয়া সেই গাছটাতে উঠিতে লাগিল। একটু পরে আমিও সেই বৃক্ষতলে উপনীত হইলাম, কাচিন তখন অনেক দূর উঠিয়া গিয়াছে, আমিও উঠিতে লাগিলাম। গাছের কাণ্ড বরফে পিছল হইয়া গিয়াছিল, বারবার পিছলাইয়া যাইতেছিলাম, তবু কিন্তু নিরস্ত হইলাম না, সেই কনকনে ঠাণ্ডা পিছল কাণ্ডটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া প্রাণপণ শক্তিতে উপরের দিকে উঠিতে লাগিলাম। একটা হিংস্র প্রতিহিংসা যেন চুলের মুঠি ধরিয়া আমাকে উপরে টানিয়া তুলিতেছিল। বিশাল গাছ, উঠিতে অনেকক্ষণ লাগিল। উঠিয়া দেখি কাচিন বন্য বিড়ালীর মতো শাখা হইতে শাখান্তরে লাফাইয়া বেড়াইতেছে। একটু আগে এই ব্যক্তিই যে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল তাহা কে বলিবে! জীবন যখন বিপন্ন হয় তখন আত্মরক্ষাকল্পে জীবনীশক্তি যে বহুগুণ বাড়িয়া যায় ইহা বহুবার প্রত্যক্ষ

করিয়াছি। আহত হরিণ ক্রোশের পর ক্রোশ ছুটিয়া যায়, চূর্ণিতমস্তক সর্প মরিয়াও যেন মরে না। কাচিনও যখন জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছে সহজে ধরা দিবে না। আমাকে দেখিয়া কাচিন উপরের একটা ডালে উঠিয়া বসিল। দেখিলাম তাহার চোখের দৃষ্টি নিষ্ঠুর নয়, হিংস্র নয়, তাহাতে ভয়ও নাই। সকৌতুক মিনতির সহিত সগর্ব স্পর্ধা মিশিয়া সে দৃষ্টি যেন অদ্ভুত একটা ভাব প্রকাশ করিতেছিল। উঁচু ডালে বসিয়া সে আমার গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। আমি তাড়া করিয়া যাইতে লঘুগতিতে আরও একটু উপরে উঠিয়া গেল। আমি অনুসরণ করিতে লাগিলাম। কিছুদূর উঠিয়া গিয়াছি, হঠাৎ সে আর একটা ডাল ধরিয়া নামিয়া পড়িল! আমি ঘুরিয়া দ্রুতগতিতে সবেগে যেই তাহাকে ধরিতে গেলাম আমার পায়ের নীচের ডালটা সহসা ভাঙিয়া গেল। বহু ঊর্ধ্ব হইতে, একেবারে নীচে পড়িয়া গেলাম। তাহার অব্যবহিত পরে কি ঘটিয়াছে আমার মনে নাই।

যখন চোখ খুলিলাম তখন দেখি অন্ধকার। শীত করিতেছে না, চারিদিকে বেশ গরম। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর বুঝিতে পারিলাম একটা আরক্তিম আভা অন্ধকারকে একটু স্বচ্ছ করিয়াছে, কাছে কোথাও আগুন আছে। তালু শুষ্ক, পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল। উঠিতে যাইব সহসা অনুভব করিলাম মুখের উপর টপ টপ করিয়া জলের মতো কি যেন পড়িল, জিব দিয়া চাটিয়া দেখিলাম মিষ্ট। মাথার ঠিক পাশেই যে অন্ধকার স্তূপটা ছিল তাহা যেন একটু নড়িয়া উঠিল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম—কাচিন। দুই হাত দিয়া তাহার স্ফীত স্তন হইতে দুধ নিঙড়াইয়া ফেলিতেছে, আমি যে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছি তাহা সে প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই, আমি যে বাঁচিয়া আছি তাহাই বোধ হয় তাহার ধারণার অতীত ছিল। সে আমাকে বোধ হয় টানিয়া আনিয়াছিল আহার করিবে বলিয়া, আমি তাহাকে যেমন আনিয়াছিলাম। দুগ্ধ-ভারে স্ফীত স্তনযুগল তাহার পক্ষে বোধ হয় পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সে দুধটা নিঙড়াইয়া ফেলিয়া দিতেছিল। তাহা যে উৎসধারায় আমার মুখে আসিয়া পড়িতেছে ইহা সে বুঝিতে পারে নাই। কি অপরূপ মিষ্ট! সহসা আমার দেহে যেন অসুরের বল সঞ্চারিত হইল। নিমেষের মধ্যে উঠিয়া তাহার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার স্তন্যপান করিতে লাগিলাম।

কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে। তুষারপাতের জন্য জীবনে যে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহার দুঃসহতাও যেন আর নাই। নূতন পারিপার্শ্বিকে নূতন অবস্থার মধ্যে যে ভীতি যে অনিশ্চয়তা মনকে প্রতিমুহূর্তে আকুল করিয়া তুলিতেছিল তাহা অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে। গর্তের বাহিরে যে শ্বেত-দানবটা কখনও নিঃশব্দে কখনও সগর্জনে চরাচরকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিতেছিল গর্তের ভিতর যে তাহার প্রতাপ ততটা নাই এই ধারণা মনে বদ্ধমূল হওয়াতে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছি। গর্তের মুখটার চতুর্দিকে বড় বড় পাথর বসাইয়া নাতি উচ্চ একটি দেওয়াল প্রস্তুত করিয়াছি, পাথরের মাঝে মাঝে ছোট ছোট ফাঁক আপনিই থাকিয়া গিয়াছে, সেই পাথরের দেওয়ালের উপর মহিষের চামড়া বসাইয়া পাথর দিয়া চাপা দিয়াছি। ঝড়ে তাহা আর উড়িয়া যাইতেছে না। গর্তের ভিতর হইতে ধূম নির্গমনেরও আর বাধা নাই। ইহাতে প্রথমে একটা সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল, ধূম নির্গমনের নিরাপদ উপায় আবিষ্কার করিয়া নিজেদের গমনাগমনের পথ অনেকটা রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। পাথরের দেওয়ালে একটা বাতায়নের মতো রাখিতে হইয়াছিল। বেশি ঝড় বহিলে সেটাকে দ্বিতীয় একটা চামড়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইত। তখন বাঁধিবার কৌশল শিখি নাই, আমি আর কাচিন চামড়ার দুই প্রান্ত

ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম। কাচিনকে আর হত্যা করিবার চেষ্টা করি নাই, খাদ্যের জন্য তাহাকে হত্যা করিবার প্রয়োজনও আর ছিল না, তাহার বুকেই প্রচুর খাদ্য ছিল। তাহা দিতে তাহার আপত্তিও ছিল না। দুধের ভারে ফুলিয়া তাহা টনটন করিত, আমি পান করিলে সে আরামই অনুভব করিত যেন। শিশুর জন্য যে খাদ্য এতকাল মাতৃবক্ষে সতত উৎসারিত হইতে দেখিয়াছি তাহা যে বয়স্ক ব্যক্তিরও কাজে লাগিতে পারে তাহা ইতিপূর্বে ধারণার অতীত ছিল। এই নূতন আবিষ্কারটা আমার ভবিষ্যৎ জীবনে কত অধ্যায়ই না রচনা করিয়াছে! এই আবিষ্কারের ফলে ভবিষ্যতে কত যে শিশু হত্যা করিয়াছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কত জননী যে দলে দলে শিশু লইয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহার ইতিহাসও বহুবিস্তৃত। রমণীকে কাছে রাখিবার জন্যই অবশেষে শিশু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব লইয়া পিতার পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলাম। এই সমস্তর মূলে ছিল সেদিনের সেই আকস্মিক আবিষ্কার।

না, কাচিনকে হত্যা করিবার চেষ্টা করি নাই। কাচিনের হিংস্র ভাবটাও অনেক কমিয়া গিয়াছিল। আমাকে হত্যা করিয়া আমার মাংস খাইবার প্রবৃত্তি তাহারও আর ছিল না। তাহাকে প্রথমে একটা হিংস্র বন্য বিড়ালীরূপেই কল্পনা করিয়াছিলাম, এই রূপই তখন সকলের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু পরে দেখিলাম কাচিন একটু অস্বাভাবিক; আমার প্রতি তাহার একটা বাৎসল্যভাব জাগিয়াছে। শুধু সে যে আমাকে স্তন্যপান করাইত তাহা নয়, আমার জন্য অন্য খাদ্যও সংগ্রহ করিয়া আনিত। আমরা উভয়েই অস্পষ্টভাবে যেন বুঝিয়াছিলাম যে, নিদারুণ এই দুর্যোগে আমরা পরস্পরের সহায়। ওই শ্বেত দানবটা আমাদের উভয়েরই শত্রু, উহার বিরুদ্ধে সমবেতভাবেই দাঁড়াইতে হইবে। ঠিক স্পষ্টভাবে এমন করিয়া হয়তো সেদিন বিশ্লেষণ করি নাই কিন্তু অস্পষ্টভাবে বুঝিয়াছিলাম যে, দেওয়ালের ওই ফাঁকে চামড়াটা ঠিকমতো ধরিয়া যদি বাহিরের ওই ঝড়ের হিম-তীক্ষ্ণ দংশন হইতে আত্মরক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে চামড়াটা দুইজনে মিলিয়া ধরিয়া রাখিতে হইবে। একজনের দ্বারা হইবে না। কতদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা যে এইভাবে দাঁড়াইয়া কাটিয়া গিয়াছে।

হঠাৎ কাচিনই একদিন অন্য আর একটা পন্থা আবিষ্কার করিল। মৃগশাবকটাকে হত্যা করিয়া কয়েকদিন বেশ কাটিয়াছিল। কিন্তু কয়েকদিন পরেই আবার খাদ্যসমস্যা দেখা দিল। দুইজনকেই আবার গর্ত হইতে বাহির হইয়া খাদ্য সন্ধানে লিপ্ত হইতে হইল। চারিদিকে অনিশ্চিতভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। বায়ুর বেগ কমিলেই বাহির হইয়া পড়িতাম। খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল। মৃত অরণ্যের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইতাম। যে সব গাছের ফল আমাদের খাদ্য ছিল সেই সব গাছের তলায় গিয়া খুঁড়িয়া দেখিতাম, বরফের তলায় ফল পাওয়া যায় কিনা। কখনও মিলিত, কখনও মিলিত না। খুঁড়িতে খুঁড়িতে অপ্রত্যাশিতভাবে দুই একটা মৃত পশু পক্ষীও পাওয়া যাইত। কাচিনের এ বিষয়ে স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল একটা। সে গন্ধ পাইত, না, অন্য উপায়ে আবিষ্কার করিত, জানি না ঠিক, কিন্তু কাছেপিঠে কোথাও কোনো মৃত পশু বা পক্ষী থাকিলে সে ঠিক গিয়া খুঁড়িয়া বাহির করিত। দিগন্তবিস্তৃত তুষার প্রান্তরের মধ্যে সমস্তই নিশ্চিহ্ন, জলাশয় পর্যন্ত তুষারাচ্ছন্ন, তাহার মধ্যে কাচিন কিন্তু ঠিক বুঝিতে পারিত, কোথায় মৃত জন্তু ঢাকা আছে। যখন কোনো কিছুই মিলিত না গাছের শিকড় খুঁড়িয়া আনিতাম। কন্দও মাঝে মাঝে পাওয়া যাইত। এ সব ছাড়াও আর একটা প্রধান কাজ ছিল কাঠ সংগ্রহ করা। খাদ্যের অপেক্ষাও অগ্নি ছিল তখন বেশি প্রয়োজনীয়। দুই-এক-দিন অনাহারে কাটানো বরং

সম্ভব ছিল, কিন্তু অগ্নির অভাবে একদিনও চলিত না। পরবর্তী যুগের সাগ্নিক ব্রাহ্মণের মতো অতিশয় সযত্নে আমরা অগ্নি রক্ষা করিতাম। গর্তে ফিরিয়া প্রথমেই দেখিতাম অগ্নিকুণ্ডে প্রদীপ্ত অঙ্গার আছে কি না। না থাকিলে অতিশয় ভীত হইয়া পড়িতাম। পাথরে পাথর ঠুকিয়া অগ্নি না জ্বালানো পর্যন্ত স্বস্তি থাকিত না। পাথরে পাথর ঠুকিয়া অগ্নি জ্বালানো খুব সহজসাধ্য ছিল না সেকালে। অরণ্য মরিয়া গিয়াছিল, সুতরাং কাঠের অভাব ছিল না। কিন্তু শুকনো কাঠ পাওয়া যাইত না। সমস্তই বরফের জলে আর্দ্র। গর্তের মধ্যে আগুনের তাপে কিছু কাঠ সেইজন্য সর্বদা শুকাইয়া রাখিতে হইত। মৃত জন্তুর হাড়, বিশেষ করিয়া পাখির পালকও ইন্ধনরূপে ব্যবহার করিতাম। কয়েক দিন হইতে ক্রমাগত বরফ পড়িতেছিল। উপর্যুপরি তিন দিন গর্ত হইতে বাহির হইতে পারি নাই। কাচিন যে মৃত শূকরটা খুঁড়িয়া আনিয়াছিল তাহা নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। কাচিনের বুকে আর দুধ নাই, শুকাইয়া গিয়াছে। অবিলম্বে কিছু খাদ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কাচিন গর্তের মধ্যে উসখুস করিতেছিল, আমার দিকে মাঝে মাঝে আড়চোখে চাহিয়া দূরে সরিয়া সরিয়া বসিতেছিল। তাহার চোখে শঙ্কার ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছিল ক্রমশ। সে যেন বুঝিতে পারিতেছিল যে তুষারপাত যদি বন্ধ না হয় তাহা হইলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য। হঠাৎ সে আগাইয়া আসিয়া দুই হাতে আমার গলা জড়াইয়া ধরিল, স্তনটা মুখে তুলিয়া দিল। আমার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না, তাহাকে ঠেলিয়া দিলাম। বিমর্ষ হইয়া সে আবার সরিয়া বসিল। বাহিরে অবিরাম তুষার পড়িতেছে, হাওয়া নাই, সূর্যালোক নাই। হঠাৎ গর্তের একধারে খুট করিয়া শব্দ হইতেই কাচিন সেইদিকে ছুটিয়া গেল। উপুড় হইয়া কি দেখিল, ফোঁস ফোঁস করিয়া মাটি শুঁকিতে লাগিল, তাহার পর একটা প্রস্তর-ফলক লইয়া সেই জায়গাটা খুঁড়িতে শুরু করিয়া দিল। আমিও ঔৎসুক্যভরে আগাইয়া গেলাম। কাচিন আমার দিকে ফিরিয়া চাহিল, তাহার চোখের দৃষ্টি উদ্ভাসিত। পরমুহূর্তেই সে গর্ত হইতে একটা ইঁদুর টানিয়া বাহির করিল, নিমেষের মধ্যে আমিও সক্রিয় হইয়া উঠিলাম এবং কাচিনকে সরাইয়া নিজেই খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। অনেক ইঁদুর পাওয়া গেল, গোটা কয়েক বড় বড় এবং অনেকগুলি বাচ্চা। শুধু যে খাদ্যসমস্যারই সমাধান হইয়া গেল তাহা নয়, আর একটা জিনিসও আবিষ্কার করিলাম। ইঁদুরেরা গর্ত খুঁড়িতে খুঁড়িতে আমাদের গর্তের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল, আসিবামাত্র তাহারা কাচিনের মনোযোগ আকর্ষণ করে। আরও ইঁদুর পাইবার আশায় আমরা তাহাদের গর্তটা অনুসরণ করিয়া খুঁড়িয়া চলিলাম। খুঁড়িতে খুঁড়িতে মাটির নীচে নীচে অনেক দূর চলিয়া গেলাম। আঁকাবাঁকা প্রকাণ্ড একটা গর্ত বাহির হইয়া পড়িল। আরও কিছু দূর গিয়া বাহিরের আলো দেখিতে পাওয়া গেল। গর্তের বহির্মুখটা। সেই মুখটা খুঁড়িয়া বড় করিয়া বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম আমাদের গর্তের মুখ হইতে সেটা অনেক দূরে। আমাদের গর্ত-প্রবেশের দুইটা মুখ হইল। বাহিরে ঝড় উঠিলে এতদিন আমাদের গর্তের দেওয়ালে আমাদের যাতায়াত করিবার জন্য যে ফাঁক ছিল তাহাতে চামড়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। সে প্রয়োজন আর রহিল না। পাথর দিয়া সে ফাঁকটাকে বন্ধ করিয়া দিলাম। মূষিক-বিবরটাকেই দুইজনে মিলিয়া খুঁড়িয়া বিস্তৃততর করিয়া লইলাম, ইহাই আমাদের বাহিরে যাইবার পথ হইল।

এইভাবে অনেকদিন কাটিয়া গেল। যাহাকে আকস্মিক উৎপাত বলিয়া মনে হইয়াছিল তাহাই ক্রমশ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মাটির তলায় কাচিনকে লইয়া নূতন সংসার

পাতিলাম। কত সংসারই যে পাতিয়াছি। সকলের সব কথা মনে নাই। আমার এই কাহিনীতে হয়তো পৌর্বাপর্যও রাখিতে পারিব না। অতীতকে কিন্তু কখনও ভুলিতে পারি নাই। কাচিনকে লইয়া নূতন সংসার পাতিলাম, কিন্তু অতীত অবলুপ্ত হইল না। বিচিত্র পশুপক্ষীপূর্ণ সেই জটিল অরণ্যটা স্বপ্নে মাঝে মাঝে দেখা দিত। জাগিয়া উঠিয়া ভাবিতাম বাঘ-ভালুক-শজারু-শূকর-সমন্বিত বহুবিধ পতঙ্গ-পক্ষী কলরব মুখরিত লতা-পুষ্প-অলঙ্কৃত সেই বিরাট প্রতিষ্ঠানটি কোথায় গেল! মাঝে মাঝে মনে পড়িত আমার পূর্ব পরিবারকে, ক্ষুধার জ্বালায় যাহাদের একে একে হত্যা করিয়াছিলাম কিংবা আমার ভয়ে যাহারা পলাইয়া গিয়াছিল তাহাদের। মনে পড়িত, কিন্তু অনুতাপ হইত না। অন্যায় করিয়াছি ইহা অনুভব করিবার মতো মনোবৃত্তি তখনও হয় নাই। ন্যায়-অন্যায় বলিয়া কোনো বোধ তখন ছিল না। যাহা করিতাম প্রয়োজনের তাড়নায় অনিবার্য বলিয়া করিতাম। অতীতকে কিন্তু মনে পড়িত। সে যে আছে তাহা বিশ্বাস করিতাম। অন্ধকার মাটির তলায় শীত-তীক্ষ্ণ তুষার পরিবেষ্টনীর মধ্যে আলোকোজ্জ্বল ঈষদুষ্ণ শ্যামল দিনগুলির স্বপ্নে সুন্দর অতীত সুন্দরতর হইয়া উঠিত। তাহাকে অস্বীকার করিবার সাধ্য ছিল না। কিন্তু যে বর্তমান সেই অতীতকে নিধন করিয়াছে তাহাকেও যে খারাপ লাগিত তাহা নয়। তাহাকেও ভালবাসিতে শিখিয়াছিলাম। জ্যোৎস্নালোকে, সন্ধ্যাকিরণে, উষাকালে, মেঘাচ্ছন্ন দ্বিপ্রহরে, এমন কি ঝটিকামত্ত দুর্যোগেও তুষারের যে নব নব রূপ দেখিতে শিখিয়াছিলাম তাহা ভয়ঙ্কর নয়, মনোহর। কাচিনেরও নূতন একটা রূপের আভাস অতি ক্ষীণভাবে মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে যে কেবল আমার দৈহিক প্রয়োজন মিটাইবার যন্ত্রমাত্র, আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনুগ্রহ-নিগ্রহের উপরই তাহার অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে, এ বোধও ক্রমশ অপসারিত হইতেছিল। সেই বর্বর-জীবনে আকস্মিক বিপদের সম্মুখীন হইয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে কাচিন না থাকিলে আমি বাঁচিতে পারি না। প্রাচুর্যের মধ্যে স্বকীয় বলিষ্ঠতাকে সম্বল করিয়া হয়তো একা বাঁচিয়া থাকা সম্ভব, কিন্তু বিপদেব সময় দুঃখের দিনে সঙ্গী না থাকিলে চলে না। আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন খুব বেশি ছিল না, কিন্তু যতটুকু ছিল তাহাও একা মিটাইবার সাধ্য আমার ছিল না। খাদ্যের সন্ধানে বাহির হইলে সমস্ত দিন কাটিয়া যাইত, দুইজনে বহুদূর ভ্রমণ করিয়া বহু স্থান খনন করিয়া তবে হয়তো কিছু সংগ্রহ করিতে পারিতাম। একা থাকিলে হয়তো অনাহারেই মৃত্যু হইত। সব দিন বাহির হইতেও পারিতাম না। ঝড় উঠিলে গর্তে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। অনেক সময় দিনের পব দিন ঝড় চলিত। এ অবস্থায় কাচিন আমার পক্ষে অপরিহার্য ছিল। ঝড় থামিলে দুইজনে বাহির হইতাম। দিগন্ত-বিস্তৃত তুষার প্রান্তরের মধ্যে দিশাহারা হইয়া পড়িতাম। ইহার মধ্যে খাদ্য কোথায়। কাচিনের একটা অদ্ভুত শক্তি ছিল, সে ইহারই মধ্যে খাদ্যের ঠিক সন্ধান পাইত। সে হরিণীর মতো দ্রুতপদে এদিকে ওদিকে ছুটিয়া বেড়াইত, এখানে ওখানে শুঁকিত, তাহার পর একটা জায়গা খুঁড়িতে আরম্ভ করিত। খুঁড়িয়া একটা মৃত জন্তু বাহির করিয়া ফেলিত। সমাধিস্থ মৃত জন্তু অনেক ছিল কিন্তু তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করাই ছিল সমস্যা। কাচিন এ বিষয়ে পটু ছিল। ইহা ছাড়া কাচিনের আর একটা রূপও আমাকে আকৃষ্ট করিতেছিল। সে মাঝে মাঝে অকারণে আবেগে কেন যে আমাব গলা জড়াইয়া ধরিত, কেন যে বিহ্বল নয়নে আমার দিকে চাহিয়া থাকিত বুঝিতে পারিতাম না। বুঝিতে পারিতাম না, কিন্তু মুগ্ধ হইতাম।

...দিনের পর দিন এইভাবে অনেক দিনই কাটিয়া গেল। ক্রমে কাচিন আমার সন্তানের জননী হইল। একটি, আর একটি, আরও একটি...পরিবার বাড়িতে লাগিল।

দিনের পর দিন কাটিতেছিল। হঠাৎ একদিন একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিল। গভীর রাত্রে একদিন গর্তের ছাতটা আমাদের মাথার উপর ভাঙিয়া পড়িল। আমরা ঘুমাইতেছিলাম, আতঙ্কে চিৎকার করিয়া উঠিলাম। অন্ধকারে প্রথমটা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, আমি লাফাইয়া গর্তের এক কোণে সরিয়া গেলাম এবং আতঙ্কে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বসিয়া বইলাম। এ কি হইল! ক্ষণপরেই ভাঙা ছাতের ভিতর দিয়া এক ঝলক চাঁদের আলো গর্তের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন বুঝিতে পারিলাম হাতির মতো বিরাট একটা জন্তু গর্তের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে এবং প্রাণপণে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার পা চারিটা গর্তের মধ্যে, মুখটা বাহিরে, গলার ভিতর হইতে বিকট একটা শব্দ বাহির হইতেছে। চিৎকার, ঘড়ঘড় এবং ফোঁসফোঁসের এক ভয়াবহ সমন্বয়। যদিও আমার প্রাণসংশয় তবু বহুকাল পরে পুরাতন বন্ধু হাতিকে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। গুঁড়ি মারিয়া ধীরে ধীরে তাহার একটা পায়ের কাছে আগাইয়া আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিলাম। স্পর্শ করিয়াই কিন্তু শিহরিয়া উঠিতে হইল। বড় বড় লোম ! এ কি! পেটের তলার দিকে হাত বাড়াইয়া দেখিলাম সেখান হইতেও বড় বড় লোম ঝুলিতেছে! লোমশ হাতি তো কখন দেখি নাই! এ কি অদ্ভুত জন্তু! হাতি তো নয়! ইহা লইয়া বেশিক্ষণ মাথা ঘামাইবার অবসর কিন্তু মিলিল না, পরক্ষণেই বাহিরে একটা কলরব উঠিল। বহুলোকের কলরব, মানুষের কণ্ঠস্বর, ক্রমশ নিকটবর্তী হইতেছে। হঠাৎ জন্তুটা আবার নিদারুণ আর্তনাদ করিয়া উঠিল। মনে হইল একটা বিশাল গাছ যেন মড়মড় করিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। সিংহের গর্জন শুনিয়াছি, ব্যাঘ্রের হুঙ্কার শুনিয়াছি, কিন্তু এমন চিৎকার কখনও শুনি নাই। ভয়ে সমস্ত শরীর হিম হইয়া গেল। বাহিরে কলরব বাড়িতে লাগিল, ভিতবে জন্তুটা আছাড়ি-পিছাড়ি করিতেছে, মাঝে মাঝে ঘৎঘৎ জাতীয় শব্দ শুনিয়া মনে হইতে লাগিল জানোয়ারটা আরও অস্থির হইয়া উঠিতেছে, আরও চিৎকার করিতেছে। গর্তের ভিতর একটা তাণ্ডব চলিতে লাগিল। গর্তের ভিতর হইতেও সহসা আর্ত চিৎকার উঠিল। কাচিন এবং তাহার সন্তানবর্গের চিৎকার। আমি সহসা জানোয়ারটার পায়ে কামড়াইয়া ধরিলাম। লোমে সমস্ত মুখ ভরিয়া গেল, কিন্তু তবু আমার দাঁত তাহার চামড়া পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিল না। তখন দুই হাত দিয়া তাহার লোম ছিঁড়িতে লাগিলাম। যদিও ছেঁড়া কঠিন তবু খানিকক্ষণ চেষ্টা করিয়া পায়ের খানিকটা অংশ দংশনযোগ্য করিয়া লইয়া আবার দাঁত বসাইলাম। দাঁত খানিকটা বসিল, কিন্তু ভাল করিয়া বসিল না। আবার কামড়াইলাম, আবার, আবার...। ইহা ছাড়া তখন আর কিছু করিবার ছিল না। যেমন করিয়া হউক এই আততায়ীর কবল হইতে উদ্ধার পাইতে হইবে। উন্মাদের মতো কেবল কামড়াইতে লাগিলাম। জানোয়ারটা মরিয়া হইয়া অবশেষে হুড়মুড় করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। বাহিরের কলরব নিকটবর্তী হইতেছিল। গর্তের ভিতর কিন্তু আর কোনো শব্দ ছিল না। চাঁদের আলোয় গর্ত ভরিয়া গিয়াছিল, সেই আলোয় দেখিলাম, মৃত্যু—নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর মৃত্যু—সকলকে নীরব করিয়া দিয়াছে। হিংস্র হিমানীর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া মাটির তলায় যে সংসার পাতিয়াছিলাম নিমেষের মধ্যে তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। কেহ নাই...। আমিই কেবল বাঁচিয়া আছি। কাচিনের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। তাহার মাথাটা থেঁতলাইয়া চোখ দুইটা ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তবু মনে হইল চোখ দুইটা যেন আমার দিকেই চাহিয়া আছে। এক লম্ফে গর্ত হইতে বাহির হইয়া গেলাম। পলাইয়া গিয়াও কিন্তু নিস্তার পাই নাই। কাচিনের সেই চক্ষুর দৃষ্টি বহুদিন আমার রাত্রির নিদ্রা হরণ

করিয়াছে। স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিয়াছি। আকাশের নক্ষত্রে, হরিণের চাহনিতে, বহু বিচিত্র ইঙ্গিতে কাচিনের সে দৃষ্টি বহুকাল আমাকে অনুসরণ করিয়াছে।

...বাইরে আসিয়া দেখিলাম বহু লোক। একটা জনতা। এত লোকের একত্র সমাবেশ আর কখনও দেখি নাই। অভূতপর্ব অদ্ভুত ব্যাপার। খানিকক্ষণ বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলাম। জ্যোৎস্নালোকিত শুভ্র তুষার, যত দূর দৃষ্টি যায় উদ্ভাসিত রজত-কান্তি চতুর্দিকে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু দাঁড়াইয়া উপভোগ করিবার উপায় নাই, নিদারুণ ঠাণ্ডা। তবু খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। বিস্ময়েই বোধ হয় চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম। মানুষ তাহা হইলে নিঃশেষ হয় নাই! শ্বেত দানবটার সমস্ত প্রতাপকে তুচ্ছ করিয়া সে এখনও বাঁচিয়া আছে। শুধু তাহাই নয়, শত্রু নিপাত করিতেছে। যে হিংস্র জন্তুটা এখনই আমার সমস্ত সংসারটাকে পদদলিত করিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল সকলে মিলিয়া সেই লোমশ পর্বতাকার জন্তুটাকে ঘিরিয়াই বড় বড় বল্লম ছুঁড়িতেছে। সহসা যেন উপলব্ধি করিলাম একক মানুষের দিন ফুরাইয়াছে। বাঁচিতে হইলে মানুষকে দল বাঁধিয়া বাঁচিতে হইবে। দৃশ্য-অদৃশ্য বিবিধ শত্রু চতুর্দিকে। একা সে বাঁচিতে পারে না। কে ইহারা? কবে ইহারা দল বাঁধিল? মনে হইল ইহারা যে-ই হউক, যে ভাবেই ইহারা দল বাঁধিবার প্রেরণা পাইয়া থাকুক, ইহারাই সঙ্কটত্রাতা। যদিও শীতে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছিলাম তবু কেমন যেন অননুভূতপূর্ব একটা শক্তি অন্তরে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। মনে হইল এখন আমি আর একা নই, যে কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে এখন দাঁড়াইতে পারিব। সম্মুখে একটা বল্লম পড়িয়াছিল সেটা তুলিয়া লইয়া ছুটিয়া গিয়া জনতার মধ্যে মিশিয়া গেলাম। আবার নূতন জীবন আরম্ভ হইল।

সত্যই নূতন জীবন। একেবারে অভিনব। এতকাল যে জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছি তাহাতে দলের প্রভুত্ব ছিল না। আমিই আমার সংসারের রাজা ছিলাম। পারতপক্ষে দ্বিতীয় কোনো সমর্থ পুরুষের কর্তৃত্ব, এমন কি, সান্নিধ্য পর্যন্ত আমি সহ্য করি নাই। বাহিরের কোনো লোককে কাছেই ঘেঁষিতে দিতাম না, নিজের পরিবারের মধ্যেও বালক সাবালক হইলে তাহাকে দূর করিয়া দিতাম। ইহাই নিয়ম ছিল। কেহ কাহারও সান্নিধ্য পছন্দও করিত না। অরণ্যে পর্বতে ব্যাঘ্র, সিংহ, সর্প, গণ্ডারের সহিত যুদ্ধ করিয়া শীতাতপ সহ্য করিয়া একাই এতদিন আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছি কিন্তু সমস্ত পৃথিবী যখন বরফে ঢাকিয়া গেল, পুরাতন অরণ্য পুরাতন পশুপক্ষী পুরাতন পারিপার্শ্বিক সহসা যখন পরিবর্তিত হইয়া গেল তখন একার শক্তিতে আর কুলাইল না। যাহার বাঁচিয়া রহিল তাহাদের উপলব্ধি করিতেই হইল যে এই ভয়ানক শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইলে মিলিত হইতে হইবে। দল বাঁধিতে হইবে। সমর্থ মানুষ মাত্রকেই আর শত্রু মনে করিলে চলিবে না। তাহাব সাহায্য লইতে হইবে। সমাজের পত্তন হইল। আমি সহসা সেই সমাজভুক্ত হইয়া গেলাম।

...সেদিন রাত্রেই সেই বিরাট ম্যামথটাকে সকলে মিলিয়া হত্যা করিলাম। সেই দিনই লক্ষ্য করিলাম মানুষ পাথর দিয়া কি সুন্দর অস্ত্র প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে। আমি একটা পাথরের বল্লম কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। পরে দেখিলাম শুধু বল্লম নয়, পাথরের কুঠারও অনেকের হাতে আছে। ম্যামথটা বল্লমবিদ্ধ হইয়া যখন পড়িয়া গেল তখন কয়েকজন তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া তাহার পায়ের উপর কুঠার চালাইতে লাগিল, তোমরা এখন যেমন বৃক্ষকাণ্ডে কুঠার চালাইয়া

থাক অনেকটা সেই রকম। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার দেহ হইতে পদচতুষ্টয় বিচ্ছিন্ন হইল, তাহার পর প্রত্যেকটি পা টুকরা টুকরা করিয়া কাটা হইল এবং আমরা প্রায় প্রত্যেকেই একটা করিয়া টুকরা পাইলাম। পাইবামাত্র সকলে খাইতে শুরু করিয়া দিলাম। ম্যামথের মাংস পূর্বে কখনও খাই নাই। বড় ভাল লাগিল। কয়েকজনে মিলিয়া শুঁড়টা কাটিয়া লইল এবং টুকরা টুকরা করিয়া খাইয়া ফেলিল। এইরূপে ম্যামথের বিরাট দেহটা ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া যে যতটা পারিলাম আহার করিতে লাগিলাম।

...প্রভাত হইল। দেখিলাম মাংসল অংশগুলি প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, অস্থি, চর্ম এবং প্রকাণ্ড বক্র দাঁত দুইটা ছাড়া আর বিশেষ কিছু বাকি নাই। দিনের আলোকে দলটাকে আরও স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইলাম। শুধু পুরুষ নয়, স্ত্রীলোকও অনেক আছে। প্রত্যেকেই সশস্ত্র। আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করিলাম। প্রত্যেকেরই গায়ে একটা আবরণ রহিয়াছে। লোমশ চামড়ার আবরণ। ম্যামথের চামড়া। ভুক্তাবশিষ্ট ম্যামথটাকে সকলে মিলিয়া টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। আমিও তাহার এক প্রান্ত ধরিয়া তাহাদের অনুসরণ করিলাম। কেহ আপত্তি করিল না। কাল রাত্রে যখন বল্লম কুড়াইয়া লইয়া ইহাদের দলে যোগ দিয়াছিলাম তখনও কেহ আপত্তি করে নাই। ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত ঠেকিতে লাগিল। একজন সমর্থ পুরুষ আব একজনকে এত নিকটে পাইয়াও কিছু বলিতেছে না, ইহা প্রথমটা বিশ্বাস করিতেই বাধিতেছিল, নিজেরই হিংস্র প্রবৃত্তি মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছিল। সুযোগ ও সুবিধা থাকিলে আমিই হয়তো আমার পার্শ্ববর্তী লোকটার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতাম। কিন্তু পারিলাম না, সাহস হইল না। যদিও সম্পূর্ণরূপে নিঃসংশয় হইতে পারিতেছিলাম না তবু অস্পষ্টভাবে বুঝিতেছিলাম ইহারা শত্রু নয়, বন্ধু। ম্যামথের দেহটা টানিয়া সকলের সঙ্গে চলিতেছিলাম কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর পারিলাম না, সামর্থ্যে কুলাইল না। শীতে সর্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিয়াছিল। হঠাৎ বরফের উপর মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেলাম। তাহার পর কি ঘটিয়াছিল জানি না।

অনেকক্ষণ পরে যখন জ্ঞান হইল তখন ঠিক বুঝিতে পারিলাম না আমি কোথায় আছি। একটা অন্ধকার ক্লেদাক্ত পিচ্ছিল গহ্বর ছাড়া আর কিছুই ঠাহর হইল না। চতুর্দিকে সাপের মতো কুণ্ডলীকৃত কি যেন আমাকে জড়াইয়া আছে। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম একটা ফাঁক দিয়া আলো আসিতেছে। চাঁদের আলো। হামাগুড়ি দিয়া সেই ফাঁকটার কাছে আসিলাম, হাত দিয়া ঠেলিতেই সেটা আরও ফাঁক হইয়া গেল, আমি বাহির হইয়া আসিলাম। বাহিরে আসিয়া বুঝিতে পারিলাম এতক্ষণ আমি ওই মৃত ম্যামথটার উদরগহ্বরে ছিলাম। যাহারা ম্যামথটাকে টানিয়া আনিয়াছে তাহারা বোধহয় হত-চেতন আমাকেও উহার পেটের মধ্যে পুরিয়া দিয়াছিল। কিন্তু কোথায় গেল তাহারা। চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলাম কেহ কোথাও নাই। চতুর্দিকে বরফ। অদূরে একটা পাহাড়ের মতো দেখা যাইতেছে। একটু আগাইয়া দেখিলাম পাহাড়ের শ্রেণী। জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটিতেছে। হঠাৎ ভয় হইল। পুবাতন সংস্কারটা যেন সাবধান করিয়া দিল—উহারা তোমাকে আহার করিবার জন্যই বহন করিয়া আনিয়াছে, তুমি যেমন কাচিনকে বহন করিয়া আনিয়াছিলে। বাঁচিতে চাও তো পালাও। ছুটিতে শুরু করিলাম। সেই পাহাড়টার দিকেই ছুটিতে লাগিলাম, আবার বরফে পা অবশ হইয়া যাইতে লাগিল। তবু কিন্তু থামিলাম না। অল্পক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ের নীচে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আসিয়াই নজরে পড়িল কাছেই কয়েকটা বড় বড় গাছ রহিয়াছে। ঠিক গাছ নয়, গাছের কঙ্কাল। একটা পাতা নাই, অসংখ্য ডালপালা বিস্তার করিয়া তবু দাঁড়াইয়া আছে। এদিকে ওদিকে

চাহিতে চাহিতে দেখিতে পাইলাম পাহাড়ের পাদমূলে একটা গুহাও রহিয়াছে। শীতে সর্বাঙ্গ জমিয়া যাইবার মতো হইয়াছিল, আশ্রয়ের আশায় তাড়াতাড়ি গুহার দিকে ছুটিলাম। গুহায় ঢুকিতে গিয়া কিন্তু বাধা পাইলাম। অতিশয় তীব্র একটা দুর্গন্ধ আমাকে যেন থামাইয়া দিল। কিন্তু বাহিরে এত শীত যে দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিতেছিল। সাহসে ভর করিয়া অবশেষে গুহাতে ঢুকিলাম। বেশ বড় গুহা, কিছুদুর প্রবেশ করিবার পরই কিন্তু একটা চাপা তর্জন শুনিতে পাইলাম। গর র্ র্র্...। পর-মুহূর্তেই ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিতে হইল এবং আমার পিছু পিছু ছুটিয়া আসিল বিরাট একটা শ্বেত-ভল্লুক। প্রাণের দায়ে মানুষ অসাধ্য সাধন করে। যে আমি শীতে প্রায় চলচ্ছক্তি-রহিত হইয়া পড়িয়াছিলাম সেই আমি শুধু যে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিতে পারিলাম তাহা নয় একটা বৃক্ষেও আরোহণ করিতে পারিলাম। একটি পত্রহীন বৃক্ষের সু-উচ্চ ডালে উঠিয়া আমি তারস্বরে চিৎকার করিতে লাগিলাম। চারিদিকে সাদা বরফ, অদূরে বিরাট একটা পাহাড়, রজতকান্তি জ্যোৎস্না প্রেতিনীর মতো নীরবে দাঁড়াইয়া আছে, গাছের তলায় উর্ধ্ব মুখে দাঁড়াইয়া আছে শ্বেত-ভল্লুকটা। এই অদ্ভুত পরিবেষ্টনী আমার চিৎকারে যেন শিহরিয়া উঠিল। চিৎকার করিতে করিতে সভয়ে লক্ষ্য করিলাম ভল্লুকটা গাছে উঠিবার উপক্রম করিতেছে। সত্যই যদি উপরে উঠিয়া আসে গাছ হইতে লাফাইয়া পড়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু কিছুদূব উঠিয়াই ভল্লুকটা লাফাইয়া নামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বহুকণ্ঠের চিৎকারও শুনিতে পাইলাম। দেখি সেই নূতন মানুষের দল বড় বড় বর্শা হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। ভল্লুকটা ছুটিতে ছুটিতে শ্বেত-প্রান্তরের মধ্যে যেন মরীচিকার মতো মিলাইয়া গেল। কয়েকজন তবু তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে ছাড়িল না। যাহারা আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল তাহারা বৃক্ষতলে আসিয়া সমবেত হইল এবং আমাকে লক্ষ্য করিয়া নানারূপ অঙ্গভঙ্গি ও চিৎকার করিতে লাগিল। তাহাদের ভাষা বুঝিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু ভাবে বোধ হইতেছিল তাহারা আমাকে নামিয়া আসিতে বলিতেছে। আমারও আর গত্যন্তর ছিল না, অতিশয় ভয়ে ভয়ে নামিয়া পড়িলাম। উহাদের ভাবগতিক যদি মন্দ বুঝি তখন আবার ছুটিতে আরম্ভ করিব। ভাবগতিক কিন্তু মন্দ মনে হইল না। নামিবামাত্র তাহাদের একজন ইঙ্গিতে আমাকে অনুসরণ করিতে বলিল। আমি নীরবে অনুসরণ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ অনুসরণ করিবার পর দেখিলাম পুনরায় সেই নিহত ম্যামথটার সমীপবর্তী হইয়াছি। পূর্বাকাশ উষার রক্তিম স্বর্ণাভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। অনেকেই দেখিলাম ম্যামথটাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। আমিও বসিলাম। যাহারা আমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল তাহারাও বসিয়া গেল এবং এক-একটি প্রস্তরনির্মিত অস্ত্র বাহির করিয়া ম্যামথের চামড়া ছাড়াইতে শুরু করিল। আমার কোনো অস্ত্র ছিল না, আমি নখ দিয়া, দাঁত দিয়া এবং হাত দিয়া টানাটানি করিতে লাগিলাম। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম দলে দলে আরও অনেকে আসিতেছে। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা...দলে দলে...পিপীলিকার সারির মতো...। দানবটার মৃত্যু-সংবাদ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহার দেহের যে যতটুকু পারে লইয়া যাইবে। সকলে কিন্তু ম্যামথটার উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল না। যাহাদের হাতে অস্ত্র আছে তাহারাই কেবল আসিয়া চামড়া ছাড়াইতে লাগিল। বাকি সকলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে তুমুল চিৎকারে আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া তুলিল। শত্রু-নিধন-পুলকিত সম্মিলিত মানবের জয়ধ্বনিতে বারংবার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিলাম। এ জাতীয় অনুভূতি আমার জীবনে এই প্রথম।

...কলকণ্ঠের হাস্যধ্বনিতে সচকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইলাম। দেখিলাম অদ্ভুতভাবে

সজ্জিতা ও রঞ্জিতা একটি যুবতী আমাকে দেখাইয়া তাহার সঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। জুমনি। তাহার গলায় ঝিনুকের মালা, মুখে কপালে লাল ও হলুদ রঙ মাখানো, পরিধানে চামড়ার ঘাগরা। তাহার সঙ্গিনীদের কেহ কেহ রঙ মাখিয়াছে দেখিলাম। একজনের নাকের মধ্যে অদ্ভুত একটা অলংকারও রহিয়াছে। পরবর্তী যুগে যে স্থানে তোমাদের স্ত্রীলোকেরা নোলক দুলাইবে সেই স্থানে আঙুলের মতো মোটা একটা হাড় গোঁজা আছে। ইহারা সকলেই একটা অদ্ভুত ভাষায় পরস্পরের সহিত কথা বলিতেছিল, আমি কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আভাসে শুধু এইটুকু বুঝিতেছিলাম যে কিসের যেন একটা আয়োজন চলিতেছে। ম্যামথের দাঁত দুইটা কাটিয়া আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছে, খানিকটা মাংসও পৃথকভাবে রাখা আছে দেখিলাম। তাহার পর সহসা জুমনি উচ্চকণ্ঠে কি একটা আদেশ দিল। সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। আমিও দাঁড়াইলাম। ম্যামথের দাঁত দুইটা ও আলাদা করিয়া রাখা সেই মাংস লইয়া তিনজন আগাইয়া গেল। জুমনি, তাহার সঙ্গিনীগণ এবং বাকি সকলে তাহাদের অনুসরণ করিল। আমিও করিলাম। কিছুদূর গিয়া দেখিলাম, বিরাট একটা গর্ত খোঁড়া রহিয়াছে। একটু দূরেই সেই পাহাড়টা এবং পাহাড়ের গায়ে কয়েকটা গুহা দেখা যাইতেছে। আমরা গর্তটার কাছে সমবেত হইবামাত্র গুহার ভিতর হইতে কয়েকজন একটা মৃতদেহকে বহন করিয়া আনিল। সবিস্ময়ে দেখিলাম, শবের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। মাথাটা নিষ্পিষ্ট, চোখ, মুখ, নাক, কান কিছুই বোঝা যায় না, একটা রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড কেবল। সেই মৃতদেহটিকে ধরাধরি করিয়া সকলে গর্তের ভিতর নামাইয়া দিল। দেখিলাম, গর্তের ভিতর তাহার জন্য একটি প্রস্তর-শয্যাও প্রস্তুত করা আছে। তাহার মাথাটা একটা পাথরের বালিশের উপর রাখা হইল। তাহার পর সেই গর্তের ভিতর সেই ম্যামথের দাঁত, ম্যামথের মাংস, কিছু কন্দ এবং কয়েকটা অস্ত্রশস্ত্র সাজাইয়া দেওয়া হইল। জুমনি নিজের হাতেই সেগুলি সাজাইয়া দিল। সাজাইয়া দিবার পর সকলে মিলিয়া সেই সমাধি-গহ্বরকে ঘিরিয়া শুরু করিল নৃত্য। শুধু নৃত্য নয়, সশব্দ নৃত্য। আকাশের দিকে মুখ ও হাত তুলিয়া নাচিতে নাচিতে তাহারা বিকট একটা শব্দ করিতে লাগিল। তাহা গান নয়, ক্রন্দন নয়, আর্তনাদও নয়। তাহা যেন আক্রোশের আস্ফালন, অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশ্যে তাহা যেন তর্জন। নাচিতে নাচিতে তাহারা প্রত্যেকেই খানিকটা করিয়া মাটি ফেলিয়া দিতে লাগিল। গর্ত ক্রমশ ভরিয়া গেল। যদিও আমি উহাদের প্রতিটি কার্যকলাপ অনুসরণ করিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু আমার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করিতে আর কখনও দেখি নাই। আমি মৃত ব্যক্তিকে আহার করিয়াছি। তাহাকে এভাবে মাটির নীচে পুঁতিয়া ফেলার কোনো অর্থ আমার বুদ্ধিতে আসিতেছিল না। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল যে, ভবিষ্যতের জন্য বোধ হয় ওটাকে রাখিয়া দেওয়া হইল। অন্য কোনো জন্তু যাহাতে না খাইয়া যায়, তাই বোধ হয় মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখিতেছে। একটু পরে লক্ষ্য করিলাম, নাচিতে নাচিতে সকলে আবার ফিরিয়া যাইতেছে। আমিও তাহাদের অনুসরণ করিলাম। ম্যামথটার কাছাকাছি আসিয়া দেখিলাম, বৃহদাকার কয়েকটা শকুনি জাতীয় পাখি ম্যামথটাকে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছিল, আমাদের দেখিতে পাইয়া উড়িয়া গেল।

আবার সকলে আসিয়া ম্যামথটাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিলাম। জুমনি ও তাহার সঙ্গিনীরা পাহাড়ের দিকে চলিয়া গিয়াছিল। আমরা বসিয়া ম্যামথের চামড়া ছাড়াইবার চেষ্টা

করিতেছিলাম। আমি নখ ও দাঁতের সাহায্যেই করিতেছিলাম। ইহাদের ভাষা আমার বোধগম্য না হইলেও একটা জিনিস ক্রমশ আমার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। যাহারা চামড়া ছাড়াইতেছে, তাহারা ভৃত্য জাতীয় এবং যাহারা পর্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা মনিব সম্প্রদায়। পরে আবিষ্কার করিয়াছিলাম এই নূতন মানবসমাজকে সবলরা দুর্বলদের মারিয়া ফেলে না, তাড়াইয়াও দেয় না, কাজে লাগায়। এক-একজন সবল লোকের আশ্রয়ে বহু দুর্বল লোক বাস করে এবং পরিবর্তে তাহারা কাজ করিয়া দেয়। কাজ করিতে পারিলে আশ্রয়ের অভাব হয় না।

বেলা বাড়িতে লাগিল। রৌদ্র উঠিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, এ অঞ্চলটা বরফে ঢাকা বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ ঢাকা নয়। আশেপাশে শ্যামলতার আভাস একটু-আধটু আছে। একরকম বেঁটে বেঁটে ছোট ঝাউয়ের মতো গাছও মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছে। দূরে দূরে পাহাড়। আরও দূরে একটা নদীর মতো কি যেন রহিয়াছে, শীতে জমিয়া গিয়াছে। দূর হইতে বিরাট একটা শ্বেত সর্পের মতো দেখাইতেছে। দাঁত ও নখ দিয়া টানাটানি করিয়া আমি কেবল পরিশ্রান্তই হইয়া পড়িতেছিলাম, ম্যামথের চামড়া বিশেষ ছাড়াইতে পারি নাই। ভীষণ কর্কশ চামড়া, তাহার উপর লোমে পরিপূর্ণ। আশেপাশে চাহিয়া দেখিলাম, সকলেই অখণ্ড মনোযোগ সহকারে স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত। আমার দিকে দুই-একজন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছে বটে, কিন্তু কেহই আমাকে তাড়া করিয়া আসিতেছে না, এই অভিনব অনুভূতিটাই সবিস্ময়ে বারংবার উপভোগ করিতেছিলাম। যাহারা আমাকে গাছ হইতে নামাইয়া আনিয়াছিল, তাহারা কোথায় গেল? তাহারা কে? ইহারাই কি তাহারা? নানা প্রশ্ন মনে জাগিতেছিল। কিন্তু প্রশ্নের সমাধান করিব কি প্রকারে? অসহায়ভাবে বসিয়া মৃত ম্যামথটার ছিন্ন চর্মপ্রান্ত লইয়া টানাটানি করিতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ গোটা দুই পাথরের অস্ত্র আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। একটা চামড়া ছাড়াইবার ছুরি এবং আর একটা পাথরের কুঠার। পিছনে তাকাইয়া দেখিলাম, কোমরে দুই হাত দিয়া গ্রীবাভঙ্গি সহকারে জুমনি দাঁড়াইয়া আছে। মনে হইল চটিয়াছে, স্কন্ধবিলম্বিত চর্মাবরণ খুলিয়া পড়িয়াছে, দ্রুত নিশ্বাসে পীবর স্তনযুগল আন্দোলিত হইতেছে। আদেশের ভঙ্গিতে ম্যামথটার বক্ষোদেশ দেখাইয়া সে কি যে বলিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তখন ঝুঁকিয়া ম্যামথটার বক্ষোদেশ দেখাইয়া সে অঙ্গুলি দিয়া যাহা নির্দেশ করিল, তাহাতে বুঝিলাম সে বলিতেছে—এমনি করিয়া এখানটা কাট। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, অনেকেই সেখানে ছোরা বসাইতে চেষ্টা করিয়াছে, আঁচড়ের দাগ অনেক রহিয়াছে, কিন্তু কেহই সেখানকার চর্ম বিদীর্ণ করিতে পারে নাই। আমিও পারিলাম না। ছোরাটা দিয়া অনেক চেষ্টা করিলাম, দাগ পর্যন্ত বসিল না। তখন কুঠারটা তুলিয়া সজোরে আঘাত করিলাম, মনে হইল প্রস্তরখণ্ডে আহত হইয়া তাহা যেন ফিরিয়া আসিল। আর একবার আরও জোরে আঘাত করিলাম। তাহাতেও কিছু হইল না। ম্যামথের বক্ষ বিদীর্ণ করা সহজ নয়। সহজ নয় বলিয়াই বোধ হয় ওই জায়গাটায় কেহ ভিড়ে নাই। আমার কেমন যেন রোখ চড়িয়া গেল। উন্মাদের মতো আঘাতের পর আঘাত করিয়া যাইতে লাগিলাম। অনুভব করিতে লাগিলাম জুমনি আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার কণ্ঠনিঃসৃত নানারূপ শব্দে আকৃষ্ট হইয়া মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতেছিলাম আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে সে চাহিয়া আছে আমার দিকে নয়, ওই ম্যামথটার বুকের দিকে। অনেকক্ষণ কুঠার চালাইবার পর ম্যামথের বক্ষঃস্থল অবশেষে ফাটিয়া

গেল। তখন জুমনি আঙুল দিয়া ইঙ্গিতে আমাকে জানাইল—উহার হৃৎপিণ্ডটা টানিয়া বাহির কর। কুঠার এবং ছুরির সাহায্যে অনেক কষ্টে হৃৎপিণ্ডটা বাহির করিলাম। বাহির করিবার সঙ্গে সঙ্গে জুমনি তাহা আমার হাত হইতে ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইল এবং সেখানে দাঁড়াইয়া ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতে লাগিল। সমবেত জনতা আবার চিৎকার করিয়া উঠিল। তখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারি নাই। পরে পারিয়াছি। নিজেও পরে ম্যামথের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া খাইয়াছি। সেইদিনই ভোরে ভাসিতে ভাসিতে যেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম, যেখানে আমার ভাষাভাষী লোকেরা সমবেত হইয়া গ্রাম বাঁধিয়াছিল, সেইখানে জুমনির কাহিনীটা শুনিয়াছিলাম। যে ম্যামথটাকে শিকার করিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমরা ছিন্নভিন্ন করিতেছিলাম, সেই ম্যামথটা দুই দিন পূর্বে জুমনির স্বামীকে হত্যা করিয়াছিল, সেই স্বামীর মৃতদেহই আমরা একটু আগে কবরস্থ করিলাম। এই সমস্ত দলটারই অধিপতি ছিল জুমনির স্বামী।

রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডটা চুষিতে চুষিতে জুমনি দ্রুত পদক্ষেপে ভিড়ের মধ্যে অন্তর্ধান করিল। সমস্ত দিন তাহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। সমস্ত দিন ধরিয়া সেই মৃত ম্যামথটাকে লইয়া সকলে মিলিয়া ছেঁড়াছিঁড়ি করিলাম। যে যতটা পারিল সেইখানে বসিয়া বসিয়া খাইল, বহিয়াও লইয়া গেল অনেকে। মাংস, হাড়, চামড়া, চর্বি যে যতটা পারিল লইয়া গেল। হাতে অস্ত্র পাইয়া আমিও কম সংগ্রহ করি নাই। পেটে আর স্থান ছিল না। উদ্বৃত্তটা কোথায় রাখিব, তাহাও চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল ক্রমশ। দেখিতে দেখিতে দিন শেষ হইয়া গেল। রাত্রির জন্য একটা আশ্রয় চাই। সমস্ত দিন ম্যামথের কাছে বসিয়া কাটিয়াছে, জায়গাটা ঘুরিয়া দেখা হয় নাই যে আশ্রয় পাওয়া যাইবে কি না। চিন্তিতভাবে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম কি করা যায়। সেই শ্বেত ভল্লুকটার কথা মনে পড়িল। ভিড় ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে। সকলেই দেখিলাম পাহাড়টার দিকে চলিয়াছে। ওখানেই বোধ হয় আশ্রয় আছে। অনেকগুলি গুহা দেখিয়াছিলাম।

হঠাৎ চোখে পড়িল জুমনি আসিতেছে। আমার দিকেই আসিতেছে। তাহার হাতে দুইটা চর্মাবরণ। আমার কাছে আসিয়া চর্মাবরণ দুইটা সে আমাকেই দিল এবং উদ্ভাসিত চক্ষে অঙ্গ-ভঙ্গি সহকারে কি যে বলিতে লাগিল বুঝিতে পারিলাম না। এইটুকু শুধু আভাসে হৃদয়ঙ্গম করিলাম যে, আমার কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপই বোধ হয় এই চর্মাবরণ দুইখানা সে আমাকে দিতেছে। তাহার চোখমুখের ভঙ্গি দেখিয়া তাহাই মনে হইল। এতদিন যে জীবনযাপন করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে এসব ছিল না। তাই অপ্রত্যাশিতভাবে চামড়া দুইখানা লাভ করিয়া হৃদয়ে যে ভাবের সঞ্চার হইল তাহাও অভূতপূর্ব। ইতিপূর্বে কৃতজ্ঞতা নামক সুকুমার মহৎ ভাব হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় নাই। সেদিন হইল। সমস্ত অন্তর যেন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, কণ্ঠের কাছে কেমন যেন ঈষৎ বেদনার মতো অনুভব করিতে লাগিলাম। একটু ভয়ও যে না হইল তাহা নয়। মনে হইতে লাগিল ইহা নূতন ধরনের ফাঁদ নয় তো! চামড়া দুইখানা দিয়া জুমনি নাচের ভঙ্গিতে দুই হাত তুলিয়া কি যেন বলিল, একটু হাসিল, তাহার পর চলিয়া গেল। সে চলিয়া যাইবামাত্র আমার চমক ভাঙিল, পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হইলাম। তাড়াতাড়ি চামড়ার উপর মাংসের টুকরা ও পাথরের অস্ত্রশস্ত্রগুলি চাপাইয়া দিয়া তাহা টানিতে টানিতে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, জুমনিও পাহাড়ের দিকেই চলিয়াছে। সহসা সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল আমি তাহার অনুসরণ করিতেছি, দেখিতে পাইবামাত্র সে ছুটিতে লাগিল।

আমিও যথাসম্ভব গতিবেগ বাড়াইয়া দিলাম। দেখিতে পাইলাম, ছুটিতে ছুটিতে সে একটা পাহাড়ের গুহামুখে অদৃশ্য হইয়া গেল। খানিকক্ষণ পরে আমি যখন সেখানে পৌঁছিলাম, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছে। আশেপাশে আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। একটা ভয়াবহ নীরবতা চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন। যে বিরাট জনতা এতক্ষণ ভিড় করিয়াছিল, তাহা কোথায় গেল? আকাশচুম্বী পাহাড়টা যেন একটা ভয়ঙ্কর দৈত্যের মতো! নিষ্ঠুর এবং কঠিন, নীরবে ওৎ পাতিয়া আছে। যে গুহামুখে জুমনিকে অদৃশ্য হইতে দেখিয়াছিলাম, আশা হইল হয়তো উহার ভিতরই আশ্রয় মিলিবে। ধীরে ধীরে সেই গুহাটার সম্মুখীন হইলাম। গুহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রথমটা কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু যে-ই ঢুকিবার চেষ্টা করিয়াছি, অমনি একটা শব্দ শুনিতে পাইলাম। হিংস্র জন্তুর তর্জনের মতো একটা শব্দ—গ্র গ্র গ্র—গররররর—গ্র গ্র গ্র—গররর—গরর। তাহার পর দেখিতে পাইলাম শ্মশ্রু-গুম্ফ কেশসমাচ্ছন্ন প্রকাণ্ড একটা মুখ, মহিষের চোখের মতো একজোড়া লাল চোখ, প্রকাণ্ড থ্যাবড়া নাক, কালো পুরু ঠোঁট। আমি সম্মুখের অংশটাই কেবল দেখিতে পাইতেছিলাম—রোমশ হাত দুইটা সম্মুখের দিকে প্রসারিত। ঠিক যেন একটা শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত মহিষের মূর্তি। আমাকে দেখিতে পাইবামাত্র কিন্তু যে চিৎকারটা সে করিয়া উঠিল, তাহা সিংহ-গর্জনের অনুরূপ। আমি ভয়ে পিছাইয়া গেলাম। এ কে! জুমনি কোথায় গেল? পরক্ষণেই একটা খিলখিল হাসি শুনিতে পাইলাম। দেখিলাম, জুমনি ওই মনুষ্যরূপী মহিষটার বক্ষের তলা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। পরে শুনিয়াছি, ওই মনুষ্যরূপী মহিষটার নাম দাহু। জুমনির স্বামীর মৃত্যুর পর ওই নাকি স্বামীর পদে বাহাল হইয়াছে। একটু পরেই দাহুর যে পরিচয় পাইয়াছিলাম, সে পরিচয় তখন জানা থাকিলে ততটা ভয় পাইতাম না। জুমনি বাহির হইয়া কিন্তু আমাকে দেখিতে পাইল না। আমি একটা বড় পাথরেব আড়ালে আত্মগোপন কবিযা দাঁড়াইয়াছিলাম। চামড়া দুইখানা এবং স্তূপীকৃত ম্যামথের মাংস সামনেই পড়িয়াছিল। জুমনি সেগুলির দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার পর আবার চারিদিকে চাহিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে সে হয়তো আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিত, কিন্তু তাহার অবসর সে পাইল না। আর একটা গর্জন করিয়া দৈত্যাকৃতি দাহু বাহির হইয়া আসিল এবং জুমনিকে শিশুর মতো দুই বাহুতে উত্তোলন করিয়া গুহার অন্ধকারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু এভাবে বেশিক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা যায় না, কোথাও একটা আশ্রয় জোগাড় করিতে হইবে। চামড়া দুইখানা টানিতে টানিতে আমি পাহাড়ের সানুদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ সন্ধানের পর অবশেষে একটা আশ্রয় মিলিল। ঠিক গুহা নয়, তবে মাথার উপর একটা আবরণ পাওয়া গেল। একস্থানে পাহাড়ের খানিকটা অংশ বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহারই তলায় আশ্রয় লইলাম। কিন্তু ঘুমাইতে পারিলাম না। শীত তো ছিলই, নিরাপদও মনে হইতেছিল না। শ্বেত ভল্লুকটার কথা মনে হইতেছিল। দাহুর মুখটাও মনে পড়িতেছিল। একটু পরে একটা হাওয়া উঠিল। চামড়া দুইটা টানিয়া গায়ে দিলাম। বিশেষ কোনো ফল হইল না। আগুন না হইলে এ শীত ভাঙিবে না। কিন্তু আগুন কোথায় পাইব? চামড়া দুইটাই ভাল করিয়া জড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিলাম।

বোধহয় একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। হুড়মুড় করিয়া একটা পাথর পাহাড়ের উপর হইতে গড়াইয়া পড়িতেছে মনে

হইল। পরক্ষণেই দ্রুত পদক্ষেপের শব্দ শোনা গেল, মনে হইল কে যেন ছুটিয়া আসিতেছে, আমারই দিকে আসিতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম। চতুর্দিক জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গিয়াছিল। জ্যোৎস্নালোকে দেখিতে পাইলাম বৃহদাকৃতি কি যেন একটা ছুটিয়া আসিতেছে, তাহার পিছনে আর একজন। যে পিছনে ছিল সে চিৎকার করিয়া উঠিল, মনে হইল একটা শব্দের শূল যেন আকাশকে বিদীর্ণ করিয়া দিল। বৃহদাকৃতি লোকটার গতিবেগ আরও বাড়িয়া গেল। উপর্যুপরি কয়েকটা প্রস্তরখণ্ড আমার নিকটে আসিয়া পড়িল। যে পিছনে আসিতেছিল, দেখিতে পাইলাম সে-ই পাথর ছুঁড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহারা নিকটে আসিয়া পড়িল। চিনিতে পারিলাম। দাহু ও জুমনি। দৈত্যাকার দাহুকে জুমনি তাড়া করিয়াছে, ভীত দাহু উর্ধ্বশ্বাসে পলাইতেছে। উভয়েই সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আরও কাছে আসিতে দেখিতে পাইলাম, দাহুর নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে, নাকের সম্মুখের অংশটা নাই বলিয়া মনে হইল। দাহু আর্তনাদ করিতেছে। জুমনির মুখও রক্তাক্ত। হঠাৎ জুমনিও চিৎকার করিয়া উঠিল। ইয়া—ইয়া—ইয়াও—ইয়াও—হো হো-হু-উ-উ-উ। জুমনির এই চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে এই চিৎকারেব প্রতিধ্বনি উঠিল। বহু লোক যেন সাড়া দিল। চতুর্দিক হইতে পিল পিল করিয়া বহু লোক বাহির হইতে লাগিল। চাহিযা দেখিলাম পাহাড়েব গা বাহিয়া যেন পিপীলিকার সারি নামিতেছে। দৈত্যাকার দাহু আকাশের দিকে দুই হাত তুলিযা আবার অসহায়ভাবে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। কিন্তু কেহ তাহাতে কর্ণপাত কবিল না। একটা পাথর সজোরে আসিয়া তাহার মাথায় লাগিল, সে মুখ থুবড়াইয়া পড়িযা গেল, দেখিতে দেখিতে সকলে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। ইয়া—ইয়া—ইয়া—ইয়াও—ইয়াও—হো—হো—হু—উ—ও—সকলের মুখেই এই চিৎকার। এই চিৎকারে দাহুর আর্তনাদ ডুবিয়া গেল। সকলে তাহাকে টানিতে টানিতে পাহাড়ের উপর লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। জ্যোৎস্না শিহরিয়া উঠিল, আমিও শিহরিয়া উঠিলাম। হঠাৎ নজরে পড়িল দূরে সেই শ্বেত ভল্লুকটা একটা হিমানীস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া আছে। সে-ও যেন অবাক হইয়া গিয়াছে।

আমি হঠাৎ বাহির হইয়া বিপরীত দিকে ছুটিতে লাগিলাম। জুমনির দেওয়া চামড়া, ম্যামথের মাংস সমস্ত পড়িয়া রহিল। আমি যে দিকে দু'চক্ষু যায় প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, দাহুকে শেষ করিয়া জুমনি এবার আমাকে ধরিবে। ছুটিতে লাগিলাম। ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে বাধ্য হইয়া গতিবেগ কমাইয়া দিতে হইল। তবু কিন্তু থামিতে পারিলাম না, হাঁটিতে লাগিলাম। একটা অজ্ঞাত ভয় যেন আমাকে পিছনে তাড়া করিয়া আসিতেছিল। সহসা কেমন যেন ধারণা হইয়া গিয়াছিল জুমনি রাক্ষসী, নরমাংস ভক্ষণ করাই উহার স্বভাব, নানা ছলে বিদেশি পুরুষকে ভুলাইয়া নিজের আয়ত্তের মধ্যে লইয়া যায়, তাহার পর খাইয়া ফেলে। নিজের অনাবৃত যৌবন আমার চোখের সামনে ধরিয়া আমাকে চামড়া উপহার দিয়া আমাকেও আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। দাহুকে শেষ করিয়া আমাকে ধরিবে। এইরূপ নিশাচরী বাক্ষসীর কল্পনা কি করিয়া মাথায় আসিয়াছিল তাহা জানি না। কিন্তু আসিয়াছিল এবং আসিবামাত্র উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিয়াছিলাম, বিচার বিতর্ক করি নাই। বিচাব করিবার মতো বুদ্ধি আমাদের তখন ছিল না। হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে কাহার যেন ইঙ্গিত পাইতাম এবং তাহাই অনুসরণ করিতাম। এই ইঙ্গিত অনুসারে চলিয়া চিরকালই লাভবান হইয়াছি। এই

ইঙ্গিতই অসহায়ের সহায়, বিপদের প্রাক্কালে নিগূঢ়ভাবে মানুষকে সতর্ক করিয়া দেয়। যুক্তির কোলাহলে ইহার মৃদু বাণী অনেক সময় শোনা যায় না, কিন্তু ভাল করিয়া শুনিও ইহা এখনও তোমাদের অন্তরে আছে, এখনও বিপদের পূর্বে তোমাদের সতর্ক করে।

...হাঁটিতেছিলাম। চাঁদের আলো ছিল, কিন্তু চাঁদের আলোয় আত্মপ্রকাশ করিবার সাহস ছিল না। আড়ালে আড়ালে হাঁটিতেছিলাম। যেখানে যতটুকু আড়াল বা অন্ধকার পাইতেছিলাম ততটুকুই ব্যবহার করিতেছিলাম। বড় বড় পাথরের আড়ালে ছিল, দুই-একটা বড় বড় গাছের আড়ালও ছিল, কিন্তু বেশির ভাগ ছিল চন্দ্রালোকিত বড় বড় প্রান্তর। সেগুলি ছুটিয়া পার হইতেছিলাম। ছুটিবার আর একটা কারণও ছিল, বরফ পড়িতেছিল।

কিছুক্ষণ এইভাবে চলিবার পর সম্মুখে খুব বড় একটা প্রান্তর পাইলাম। কিছুতেই সেটা আর শেষ হয় না। হঠাৎ দেখিলাম প্রান্তরের মাঝখানে একটা পাহাড় রহিয়াছে। আর চলিতে পারিতেছিলাম না, ইচ্ছা হইল ওই পাহাড়টার নীচে খুঁজিয়া দেখি রাত্রির মতো যদি একটা আশ্রয় পাওয়া যায়। প্রায় ছুটিয়া পাহাড়টার নিকটবর্তী হইলাম। নিকটবর্তী হইয়াই কিন্তু আরও দ্রুতবেগে পালাইতে হইল। পাহাড় নয়, ম্যামথ একটা। আর একটু কাছাকাছি গেলেই ওই রোমশ জন্তুটার কবলে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হইত। আমাকে দেখিয়াই ম্যামথটা বিকট গর্জন করিয়া উঠিল। ছুটিতে ছুটিতে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, আমারই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। বিরাটকায় বলিয়া আমার মতো দ্রুতগতি নয়, তবু কিন্তু আসিতেছে।

...কতক্ষণ ছুটিয়াছিলাম মনে নাই, হঠাৎ মেঘে চাঁদটা ঢাকিয়া গেল। চতুর্দিকে অন্ধকার। কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, তবু ছুটিতেছি। না ছুটিয়া যে উপায় নাই! সহসা একটা ববফের স্তূপের উপর মুখ থুবড়াইযা পড়িয়া গেলাম। শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, আর উঠিবার সামর্থ্য ছিল না। যদিও প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করিতেছিলাম এইবার ম্যামথটা আসিয়া পড়িবে, তাহার দন্তাঘাতে ছিন্নভিন্ন বা পদতলে নিষ্পিষ্ট হইয়া যাইব, তবু কিন্তু একবারও ভাবিতে পারি নাই এইবার মৃত্যু আসন্ন, এইবার সব শেষ হইয়া যাইবে বরং ইহাই মনে হইতেছিল বিপদে পড়িয়া গিয়াছি বটে, তবু আমি বাঁচিয়া যাইব, নিশ্চয়ই বাঁচিব, আমি কি মরিতে পারি?

...হঠাৎ একটা শব্দ হইল। কি যেন একটা ফাটিয়া গেল। ম্যামথটার চিৎকার শুনিতে পাইলাম। আমি মুখ তুলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। চতুর্দিকে অন্ধকার। বসিয়াই রহিলাম, কারণ উঠিবার শক্তি আর ছিল না। কিছুক্ষণ পরে মেঘটা সরিয়া গেল। দেখিলাম আমি একটা বরফের প্রান্তরে বসিয়া আছি, আর ম্যামথটা সেই প্রান্তরের এক প্রান্তে একটা গর্তের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। ঠিক কি হইয়াছে তখনও ভাল বুঝিতে পারি নাই। একটু পরেই কিন্তু মনে হইল আমি ধীরে ধীরে ম্যামথটার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছি। আবার চাঁদ মেঘে ঢাকিয়া গেল। মনে হইল একটা জন্তু যেন আমার দিকে ছুটিয়া আসিল, আবার ছুটিয়া চলিয়া গেল। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

...কিছুক্ষণ পরে প্রভাত হইল। তখন দেখিলাম যে বিরাট বরফের প্রান্তরে আমি বসিয়াছিলাম তাহা খর-বেগে ভাসিয়া চলিয়াছে। বুঝিলাম একটা প্রকাণ্ড নদীর উপরের কিছু অংশ জমিয়া গিয়াছিল, এই নদীটাকেই আমি দিনের আলোকে দূর হইতে দেখিয়াছিলাম,

ম্যামথের পদভারে তাহার খানিকটা ভাঙিয়া গিয়াছে এবং সমস্তটা অবশেষে ফাটিয়া গিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। অন্ধকারে যে জন্তুটা আমার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল দিনের আলোকে সেটা আবার দেখিতে পাইলাম। একটা হরিণ। আমার খাদ্য। বহুদিন হরিণ দেখি নাই। বরফপাত শুরু হওয়ার পর ইহারা কোথায় যেন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। এখন কোথা হইতে আসিল।

সহসা মনে হইল আমাকে এভাবে রক্ষা করিতেছে কে? বিমূঢ়ের মতো বসিয়া রহিলাম। এই রহস্যের আভাসে সমস্ত মন আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। অজানার উদ্দেশ্যে ভাসিয়া যাইতে যাইতে নিজের অজ্ঞাতসারেই এই বিশ্বাস মনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল যে অদৃশ্যলোকে কে যেন একজন আছেন যিনি আমার রক্ষক।

কয়েকদিন ভাসিবার পর যে স্থানে আসিয়া ঠেকিলাম সেখানেও দেখিলাম মানুষ আছে—যাহারা আমার ভাষা বোঝে—যাহারা এই বরফকে মানিয়া লইয়াই নূতন ধরনের সমাজ পত্তন করিয়াছে।

।। তিন ।।

সত্যই নূতন ধরনের সমাজ। বরফ বা খাদ্য সংগ্রহ এ সমাজের সমস্যা নহে, মানুষের প্রতি মানুষের বিভিন্ন আচরণই ইহাদের জীবনের প্রধান প্রেরণা। পুঠা, লুং, রুঠা, হুংজুরা বরফের ভয়ে ভীত নহে, খাদ্যাভাবে কাতর নহে, তাহাদের সমস্যা অন্য জাতীয়।

ইহাদের মধ্যে আসিয়া নূতন বেশ পরিধান করিয়াছি। নূতন বেশ পরিয়া নূতন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছি।

...চর্মাবরণে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া কাষ্ঠপাদুকা পরিয়া নির্নিমেষে দিগন্তের দিকে চাহিয়াছিলাম। পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল পুঠা। প্রৌঢ়া পুঠা। পুঠাই আমার আশ্রয়দাত্রী। আশ্রয় দিবার হেতু আমার কপালের কালো জড়ুলটা। পুঠার শেষ যে পুত্রটি কিছুদিন পূর্বে অর্ধগলিত বরফের তলায় তলাইয়া গিয়াছিল তাহারও কপালে নাকি এইরূপ একটি জড়ুল ছিল। আমার কপালের ওই কালো চিহ্নটি আমার আগন্তুকত্ব-দোষ নষ্ট করিয়া ওই নবসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিল। পুঠা যদিও দুর্ভাগিনী, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার কাহারও সাহস ছিল না। সে যখন আমাকে আশ্রয় দিয়াছিল তখন আমার চিন্তার কারণ ছিল না।

পুঠা সত্যই দুর্ভাগিনী। অনেকগুলি পুত্র-কন্যার জননী হইয়াও সে নিঃসন্তান। ম্যামথের কবলে, রোমশ গণ্ডারের খড়্গাঘাতে, নিদারুণ শীতে, পারিবারিক যুদ্ধ-বিগ্রহে তাহার সমস্ত সন্তান পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিল। একটিও বাঁচিয়া ছিল না। কোনো পুরুষও নাকি আর পুঠার সংস্রবে আসিতে চাহিত না। সকলে তাহাকে ভয় করিত। তাহার বলিষ্ঠ গঠন, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, স্বল্প-ভাষণ সকলের নিকট হইতে তাহাকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার নিশীথ অভিযান, গভীর রাত্রিতে তাহার একক চিৎকার সত্যই তাহাকে ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছিল। কেহ নাকি তাহাকে কাঁদিতে বা হাসিতে দেখে নাই। রাত্রে সে একা একা যক্ষিণীর মতো ঘুরিয়া বেড়াইত। নিস্তব্ধ তুষার-প্রান্তর কখনও তাহার আর্তনাদে কখনও তাহার অট্টহাস্যে প্রকম্পিত হইত। চন্দ্রালোকিত এক রাত্রেই পুঠার সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। নূতন স্থানে সমস্ত

দিন আত্মপ্রকাশ করিতে পারি নাই, গভীর রাত্রে ভয়ে ভয়ে বাহির হইয়াছিলাম। সহসা দূরে দেখি পুঠা দাঁড়াইয়া দুই হাত উপরে তুলিয়া চিৎকার করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া ভয়ে আমি বসিয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু তাহার দৃষ্টি এড়াইতে পারি নাই। সে আমার কাছে ছুটিয়া আসিল এবং হেঁট হইয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। আমিও তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলাম। পুঠার নয়ন সহসা বিস্ফারিত হইয়া গেল। সে ঝুঁকিয়া আমার জড়ুলটার উপর হাত বুলাইয়া দেখিল, তাহার পর অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। ইহার পর সে আমাকে টানিতে টানিতে তাহার বরফগুহার ভিতর লইয়া গিয়াছিল।

...পুঠাকে অনুসরণ করিয়াই গভীর নিশীথে বাহির হইয়াছিলাম। তাহারই অঙ্গুলি সঙ্কেতে দূর দিগন্তের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলাম, বল্গা-হরিণের সারি চলিয়াছে একটা দুইটা নয়, শত শত। পুঠা আমার হাতে বর্শা তুলিয়া দিয়া সঙ্কেত করিল। শিকারিরা কুকুর লেলাইয়া দিবার সময় যেমন শব্দ করে তেমনি শব্দও করিল একটা। আমি বর্শা হাতে ছুটিয়া গেলাম। পুঠা প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

...ছুটিতে ছুটিতে আমি যখন বল্গা-হরিণ-শ্রেণীর নিকটবর্তী হইলাম তখন সমস্ত দলটা অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে। তবু আমি দলের শেষাংশ লক্ষ্য করিয়া বর্শাটা ছুঁড়িলাম। একটা হরিণ পড়িল। পুঠা আমাকে প্রস্তরনির্মিত একটা ছোরাও দিয়াছিল। ছুটিয়া গিয়া ছোরাটা হরিণের বুকে বসাইয়া দিলাম। প্রকাণ্ড হরিণ। তাহার বক্ষের ক্ষতস্থানে মুখ লাগাইয়া খানিকটা উষ্ণ রক্ত তখনই পান করিয়া ফেলিলাম। সমস্ত শরীরে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইল। মুখটা মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং চতুর্দিকে চাহিয়া চাহিয়া নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিলাম হরিণের দল কোন্ দিকে যাইতেছে। দেখিলাম দূরে, অনেক দূরে, সুবিস্তৃত তুষার প্রান্তরের পরপারে ঘননিবদ্ধ অরণ্যের মতো কি যেন একটা রহিয়াছে। ঘন-কৃষ্ণ ভ্রূর মতো দেখাইতেছে। চন্দ্রালোকে বরফের পটভূমিকায় তাহা যেন রহস্যময় ও ভয়াবহ। একদিকে একটা জলের ধারাও দেখা গেল। হরিণের দল সেইদিকেই চলিয়াছে।

...হরিণটাকে টানিতে টানিতে লইয়া যখন পুঠার কাছে গেলাম তখন দেখি সে প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া আছে। নিহত হরিণটা দেখিয়া তাহার প্রস্তরবৎ মুখে ক্ষীণ আনন্দাভাস ছড়াইয়া পড়িল। পরমুহূর্তে কিন্তু সে আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আমার নাকে নাক ঘষিয়া আদর করিল। আমি অভিভূত হইযা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পুঠা ইঙ্গিতে অনুসরণ করিতে বলিল। অনেকক্ষণ হাঁটিবার পর আমরা একটা প্রকাণ্ড গর্তের সমীপবর্তী হইলাম।

পুঠা বলিল, 'এই গর্তটার ভিতর হরিণটাকে বরফ চাপা দিয়া এখন লুকাইয়া রাখ। কাল যথাসময়ে ইহাকে বাহির করিতে হইবে। কাল রূঠার জীবনের শুভতম দিন আসিবে, কাল সে নবজীবন লাভ করিবে, তখন ইহা কাজে লাগিবে। হরিণের সন্ধানে রূঠার সন্তানেরাও প্রত্যহ বাহির হয়, কিন্তু পায় না। আজ তাহারা হরিণ পাইয়াছে কি না কে জানে! তাহারা না পাক আমরা তো পাইয়াছি। এটা এখন এইখানে লুকানো থাকুক।'

রূঠাকে দেখিয়াছি। পলিতকেশা বৃদ্ধা। পুঠারই জ্যেষ্ঠা ভগিনী। রূঠার সন্তান-সন্ততি লইয়াই এই সমাজ। সেকালে জননীই ছিল সন্তানের পরিচয়। পিতার খবর কেহ রাখিত না। পুত্রের পরিচয় জননীর নামে হইত। পৌত্র বলিয়া তখন কিছু ছিল না। দৌহিত্র ছিল। রূঠার

শুধু পুত্র কন্যা দৌহিত্র নয়, দৌহিত্রের দৌহিত্রও আছে। পুঠা যদিও সন্তানহীনা কিন্তু রূঠার সন্তান-সন্ততি প্রায় শতাধিক। লুংয়ের মুখে পরে শুনিয়াছি রূঠার সন্তান-সন্ততিদের বিবাহ লইয়া দূর কোনো পল্লীর টিট্টিভ সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের বিবাদ। তাহারা নাকি রূঠার কয়েকটি পুত্র দৌহিত্রকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া তাহাদের দলভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের মেয়েরা নাকি মায়াবিনী। গভীর নিশীথে টিট্টিভ পক্ষীর ডাক ডাকিয়া তাহারা নাকি পুরুষদের ভুলাইয়া লইয়া যায়। তাহারা নাকি একপ্রকার লোমশ বন্য কুক্কুর পুষিয়া তাহাদের দিয়া কাষ্ঠনির্মিত গাড়ি টানায়। লুংয়ের মুখে এরূপ অনেক অদ্ভুত কথাই শুনিয়াছিলাম এবং যদিও এ ধরনের সংবাদ আমার অভিজ্ঞতার অতীত ছিল তবু তাহা কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু এখন পুঠার কাছে যাহা শুনিলাম তাহা বুঝিতেই পারিলাম না।

'নবজীবন-লাভ ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।'

পুঠা আমার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, 'তুমি যে দেশ হইতে আসিয়াছ সেখানে বুঝি এসব নাই?'

'না। কি করিয়া নবজীবন লাভ ঘটে?'

'দেখিলেই বুঝিবে। রূঠা কাল জল-ভল্লুক হইয়া যাইবে।'

'জল-ভল্লুক কি?'

'জল-ভল্লুক দেখ নাই?'

'না।'

'আচ্ছা, আজই দেখাইয়া দিব।'

শিশুর অজ্ঞতায় জননী যেমন হৃষ্ট হয়, আমার অজ্ঞতায় পুঠাও তেমনি হৃষ্ট হইতেছিল।

...প্রকাণ্ড হরিণটাকে বরফসমাধি দিতে বেশ খানিকটা সময় গেল। বরফ দিয়া গর্তের মুখটা যখন ভালভাবে ঢাকিয়া দিলাম তখন পুঠা বলিল, 'ওই পাথরটা আনিয়া উহার মুখে চাপা দাও, তাহা হইলে আর কেহ উহার উপর দাবি করিবে না।'

পাথর আনিয়া চাপা দিলাম।

'এইবার চল তোমাকে জল-ভল্লুক দেখাই। এখনই দেখিতে পাওয়া যাইবে কি না ঠিক নাই, তবু চল চেষ্টা করা যাক।'

পুঠার অনুসরণ করিতেছিলাম। একটি কথাই বারবার মনে হইতেছিল ভাগ্যে ইহাদের ভাষার সহিত আমার ভাষার কোনো অমিল নাই। থাকিলে কি পুঠা আমাকে আশ্রয় দিত? কি করিয়া যে ইহাদের ভাষার সহিত আমার ভাষার মিল হইল তাহাই চিন্তা করিতে করিতে চলিয়াছিলাম। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল, হয়তো কোনো কালে ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক ছিল। হয়তো আমার পূর্বপুরুষ এবং ইহাদের পূর্বপুরুষ একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিল, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিপর্যয়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কোথায় ছিলাম আমরা? অতীতের দিকে চাহিতে গিয়া কিন্তু সব গোলমাল হইয়া গেল, একটা কুয়াশার মধ্যে যেন দিশাহারা হইয়া পড়িলাম। ঘুরিয়া ফিরিয়া একটা কথাই কেবল মনে হইতে লাগিল, ইহারা আমার ভাষা বোঝে, ইহারা আমার আত্মীয় এবং ইহারা জয়ী হইয়াছে। এই করাল বরফকে ইহারা জয় করিয়াছে। বরফেরই গৃহ প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিতেছে। এইসব চিন্তা করিতে করিতেই নীরবে পুঠার অনুসরণ করিতেছিলাম। পুঠা একটি কথাও বলে নাই। পুঠা

স্বল্পভাষিণী। সহসা সে একটা ভয়ার্ত শব্দ করিয়া মাটির উপর শুইয়া পড়িল। আমিও পড়িলাম। যন্ত্রচালিতবৎ শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু ক্ষণকাল শুইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলাম ব্যাপারটা কি, পুঠা এমন করিল কেন! দেখিলাম পুঠা বরফ দিয়া তাড়াতাড়ি নিজের সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া ফেলিতেছে। ফিসফিস করিয়া আমাকেও সে তাহাই করিতে বলিল। আমিও তাহাই করিতে লাগিলাম। আপাদমস্তক চর্মাবরণে ঢাকা ছিল, পায়ে ছিল চামড়া দিয়া বাঁধা কাঠের জুতা, সুতরাং বরফ চাপা দিয়া খুব যে বেশি কষ্ট হইতে লাগিল তাহা নয়। কেবল নাকটি বাহির করিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিলাম। বেশিক্ষণ অবশ্য থাকিতে হইল না, একটু পরেই পুঠা ডাকিল।

'এইবার ওঠ।'

ডাক শুনিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

পুঠা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলল, 'ওই দেখ—'

দেখিলাম দূরে দীর্ঘাকৃতি কালো মানুষের মতো কি একটা যেন চলিয়া যাইতেছে। তাহার মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। হাত দুইটা আজানুলম্বিত তো বটেই, বোধ হয় আরও লম্বা। মাথাটাও প্রকাণ্ড। পিছনের দিকটাই বেশি বড় বলিয়া মনে হইল। মনে হইল পিছনের দিকেই বুঝি নাক চোখও আছে। কিন্তু তাহা যে নাই তাহা তাহার গতি দেখিলেই বোঝা যায়। দূর হইতে ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলাম না কিন্তু মনে হইতেছিল সর্বাঙ্গে বড় বড় লোমও বোধহয় আছে। কেমন যেন একটা ভল্লুক-ভল্লুক ভাব।

'কি ও?'—পুঠাকে প্রশ্ন করিলাম।

পুঠা বলিল—'হুংজু। রাক্ষস। ওই দূর বনে থাকে। আমার টিন্‌টাকে ওই খাইয়াছে।'

টিন্‌টা বোধ হয় পুঠার কোনো মৃত পুত্র বা কন্যা হইবে।

'রাক্ষস?'

'হ্যাঁ। আমাদের মাথা মড়মড় করিয়া চিবাইয়া খাইতে পারে। গায়ে ভয়ানক শক্তি। ওই বনে অনেক হুংজু ছিল। রূঠার ছেলেরা কয়েকটাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। এইটাই এখনও বাঁচিয়া আছে, আরও দুই-একটা আছে হয়তো—'

আমি তাড়াতাড়ি বসিয়া পড়িলাম। আমার ভয় হইল যদি ঘাড় ফিরাইয়া আমাদের দেখিতে পায়। পুঠাকেও সেকথা বলিলাম।

পুঠা বলিল, 'সে ভয় থাকিলে আমি উঠিয়া দাঁড়াইতাম না। হুংজু ঘাড় ফিরাইতে পারে না, তাহার সে শক্তি নাই। যেদিকে চলে সেইদিকেই চলিতে থাকে, সহজে ফেরে না, হাওয়া এখন উল্টা দিকে বহিতেছে। আমাদের গন্ধ পাইবে না, কথাও শুনতে পাইবে না। চল আমরা আস্তে আস্তে উহার পিছু পিছু যাই। হুংজু নিশ্চয় জল-ভল্লুকের খোঁজেই বাহির হইয়াছে। জল-ভল্লুকের মাংস উহার বড় প্রিয় এবং সেই জন্যেই রূঠার ছেলেদের ও পরম শত্রু।'

আমি সবিস্ময়ে হুংজুর দিকে চাহিয়া রহিলাম। ওই হুংজুই যে আমাদের পূর্বপুরুষ, বহু শতাব্দী পূর্বে আমিও যে উহারই মতো ছিলাম এ কথা একবারও মনে হইল না। উহাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জীব মনে করিয়া সভয় বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

'চল—'

পুঠার আহ্বানে চমক ভাঙিল। সন্তর্পণে দূরে দূরে হুংজুর অনুসরণ করিতে লাগিলাম।

কখনও থামিতেছি, কখনও গুঁড়ি মারিয়া চলিতেছি, কখনও বরফ স্তূপের আড়ালে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছি.. এইভাবে অনেক দূর গেলাম। সহসা একটা করুণ শব্দ শোনা গেল, অনেকটা যেন গানের মতো, কান্নার মতো।

পুঠা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, 'জল-ভল্লুক! ছুটিয়া চল, ওই বরফের ঢিপিটার আড়ালে যাই। হুংজু নিশ্চয়ই একটাকে ধরিয়াছে।'

ছুটিয়া গেলাম, গিয়া দেখিলাম পুঠার অনুমানই সত্য। হুংজু মাছের মতো কি যেন একটা বগলের নিচে চাপিয়া ধরিয়া তাহার গলার কাছে কামড়াইয়া ধরিয়াছে। হুংজুর কবলে সেটা ছটফট করিতেছে। তাহার পরই নজরে পড়িল আরও কয়েকটা ছুটিয়া পলাইতেছে। তখন বুঝিলাম উহারা মাছ নয়, যদিও প্রথমে ঠিক মাছের মতোই মনে হইয়াছিল। এখন লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম উহাদের গায়ে লোম আছে, উহাদের পা আছে, ভালুকের কানের মতো দুইটা কানও আছে। মুখটাও অনেকটা ভালুকেরই মুখের মতো। তোমরা আজকাল যাহাকে সিল' বল পুঠা তাহাকেই জল-ভল্লুক বলিতেছিল। যেটা সর্বাপেক্ষা বড়, সেটা প্রকাণ্ড। সেটা হুড়মুড় করিয়া জলে নামিয়া পড়িল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটাও জলে নামিল। হুংজু দেখিলাম ছুটিতেছে, ছুটিয়া গিয়া সে একটিকে পা দিয়া চাপিয়া ধরিল। ঠিক এই সময় একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। আমি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না, আমার হাতে যে বর্শাটা ছিল হুংজুকে লক্ষ্য করিয়া আমি হঠাৎ সেটাকে ছুঁড়িয়া দিলাম। চকিতের মধ্যে ঘটনাটা ঘটিয়া গেল, এবং আমি যে কি বিপজ্জনক কাজ করিয়া ফেলিয়াছি তাহাও চকিতে উপলব্ধি করিয়া পরমুহূর্তে শুইয়া পড়িলাম। হুংজু যদি এখনই ছুটিয়া আসে। পুঠাও সঙ্গে সঙ্গে শুইয়া পড়িয়াছিল। সে-ও নিশ্চয়ই একই বিপদের আশঙ্কা করিতেছিল—হুংজু এইবার তাড়া করিয়া আসিবে এবং আমাদের ধরিযা মাথাটা মড়মড় করিয়া চিবাইবে। হুংজু কিন্তু আসিল না। কোনো শব্দ পর্যন্ত হইল না। কবলিত জল-ভল্লুক দুইটির ক্রন্দনও ক্রমশ থামিয়া গেল। আমি ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া দেখিলাম কোথাও কেহ নাই, বর্শাটা শুধু গাঁথা রহিয়াছে। তাহার পর আর একটু উঠিয়া দেখিলাম জল-ভল্লুকের শাবক দুইটি বগলদাবা করিয়া হুংজু দূরে পলাইতেছে। তাহার পলায়মান চেহারাটার দিকে চাহিয়া আমার ভীত ভাবটাই শুধু যে অপনোদিত হইল তাহা নয়, সাহসও পাইলাম। ছুটিয়া গিয়া বর্শাটা তুলিয়া তাহাকে অনুসরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, পুঠা আমাকে বাধা না দিলে হয়তো অনুসরণও করিতাম।

পুঠার দিকে এতক্ষণ চাহিয়া দেখি নাই। এখন দেখিলাম। আমার অবিমৃষ্যকারিতায় সে বিরক্ত হয় নাই, আনন্দে উৎসাহে গর্বে তাহার ভাবলেশহীন চক্ষুযুগল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল, 'এখন থাক, পরে হইবে। এখন বাড়ি চল। ভোর হইয়া আসিতেছে। আজ রূঠার নব-জীবন হইবে। অনেক কাজ আছে। দেখি উহারা হরিণ আনিতে পারিয়াছে কি না—'

আমরা বাড়ির দিকে ফিরিলাম। চলিতে চলিতে আমি প্রশ্ন করিলাম—'নব-জীবন লাভ ব্যাপারটা কি বুঝাইয়া বল তো।'

'সত্যই তুমি জান না?'

'না।'

পুঠা তখন চুপি চুপি আমাকে বলিল, 'একথা যেন কাহাকেও বলিও না। তোমাকে যদি

কেহ জিজ্ঞাসা করে তুমি কি—তুমি বলিও তুমিও একজন জল-ভল্লুক। বিশেষত রূঠার মেয়েগুলা যেন কিছুতেই না জানিতে পারে যে, তোমার কুলের কোনো চিহ্ন নাই।'

আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টি দেখিয়া পুঠা বলিল, 'তবে শোন, সব কথা খুলিয়া বলি। বহুদিন পূর্বে রূঠা, ডিংঘা আর আমি তিনজনে এখানে তিনটি বংশ স্থাপন করিয়াছিলাম। আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম রোমশ গণ্ডারকে, রূঠা স্বপ্ন দেখিয়াছিল জল-ভল্লুকের এবং ডিংঘা স্বপ্ন দেখিয়াছিল টিট্টিভ পাখিকে। আমার মা ঠিক করিলেন ওই তিনটি জন্তু দিয়াই আমাদের বংশ চিহ্নিত করিতে হইবে। উহারাই হইবে আমাদের কুলদেবতা। আমরা যখন সন্তানধারণক্ষম হইলাম তখন আমাদের প্রত্যেককে আমাদের স্বপ্নদৃষ্ট সেই জন্তুগুলি আহার করিতে হইল। আমি রোমশ গণ্ডারের মাংস আহার করিলাম, রূঠা জল-ভল্লুকের এবং ডিংঘা টিট্টিভের মাংস আহার করিল। আমাদের প্রত্যেককেই সমস্ত জন্তুটাই আহার করিতে হইল। সাত দিন ধরিয়া আমি এক রোমশ গণ্ডারকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিলাম। তাহার কিছুই ফেলিয়া দিবার উপায় ছিল না, নখ, দাঁত, লোম পর্যন্ত আমাকে গ্রাস করিতে হইয়াছিল। রূঠা এবং ডিংঘাও এইভাবে জল-ভল্লুক এবং টিট্টিভকে আত্মসাৎ করিয়াছিল। এইরূপে আমি হইলাম রোমশ গণ্ডার, রূঠা হইল জল-ভল্লুক এবং ডিংঘা হইল টিট্টিভ। আমার পুত্রকন্যারা হইল রোমশ গণ্ডার, রূঠার পুত্রকন্যারা জল-ভল্লুক এবং ডিংঘার পুত্রকন্যারা টিট্টিভ। আমার পুত্রকন্যারা কেহ বাঁচিয়া নাই। রূঠার পুত্রকন্যা দৌহিত্র দৌহিত্রীরা আছে। ডিংঘা আমাদের ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে।

'কোথায়?'

'একদিন একটা অদ্ভুত দুর্ধর্ষ লোক কুকুরের গাড়ি হাঁকাইয়া আসিল এবং ডিংঘাকে পিঠের উপর চড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল। ডিংঘা আর ফিরিয়া আসে নাই। বহু দূরে গিয়া সে টিট্টিভ বংশ স্থাপন করিয়াছে। উহাদের সহিত আমাদের কলহ। মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। আমরা উহাদের অনেককে মারিয়াছি, আমার এবং রূঠার পুত্রকন্যাদের উহারাও মারিয়াছে। অনেকে বলে হুংজু নাকি উহাদের সপক্ষে। সেই জন্য হুংজু আমাদেব কাহাকেও নাগালের মধ্যে পাইলে ছাড়ে না, মারিয়া ফেলে । তা ছাড়া উহাদের কুকুরের গাড়ি আছে, আমরা উহাদের সহিত পারিয়া উঠি না—'

চলিতে চলিতে আমরা কথা বলিতেছিলাম। পুঠা কেমন যেন একটানা একঘেয়ে স্বরে মন্ত্রপাঠ করার মতো বলিয়া চলিয়াছিল।

'কুকুরের গাড়ি কি জিনিস?'—আমি প্রশ্ন করিলাম।

পুঠা বলিল, 'গাছের ডাল পাশাপাশি বাঁধিয়া উহারা একটা আগড়ের মতো জিনিস তৈয়ারি করে। তাহার একধারে চামড়ার দড়ি দিয়া উহারা একদল ক্ষুধার্ত কুকুর বাঁধিয়া দেয়, তাহার পর আগড়ের উপর মাংসের টুকরা ছুঁড়িতে থাকে, আর কুকুরগুলা সেই মাংসের লোভে আগড়টাকে টানিতে টানিতে উর্ধ্বশ্বাসে ছোটে। আগড়ের উপর কুকুরের গলার দড়ি ধরিয়া যে দাঁড়াইয়া থাকে সে-ও দ্রুতগতিতে অনেকটা পথ পার হইয়া যায়।'

'কুকুর কামড়ায় না?'

'না, কুকুরকে উহারা পোষ মানাইয়াছে।'

কল্পনায় চিত্রটা দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিলাম। এতগুলা কথা একসঙ্গে বলিয়া পুঠাও

নীরব হইয়া গেল। সে-ও বোধ হয় কল্পনানেত্রে কিছু দেখিতেছিল। সে কিন্তু কুকুরের গাড়ি দেখিতেছিল না। কারণ কিছুক্ষণ পরে সে যাহা বলিল তাহা অন্য প্রসঙ্গ। সহসা অস্ফুটকণ্ঠে সে বলিল, 'রূঠা আজ নব-দেহ পাইবে। আজ বল্‌গা-হরিণের দল আসিয়াছে'—মনে হইল যেন সে স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া পথ চলিতেছে, যেন স্বপ্নলোক হইতে কথাগুলি বলিল।

'নব-দেহ? রূঠা কি নূতন দেহ পাইবে? তাহা কি রূপে হইবে!'

আমার বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছিল। পুঠা আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর আবার চলিতে শুরু করিল। চলিতে চলিতে বলিল, 'সে নব-দেহই পাইবে। কিন্তু সে দেহ আমরা দেখিতে পাইব না। রূঠার আর সন্তান প্রসব করিবার ক্ষমতা নাই, এইবার তাহার দেহ তাহার সন্তানদের দেহের সহিত মিশিয়া যাইবে। কেমন করিয়া যাইবে তাহা স্বচক্ষেই দেখিতে পাইবে! প্রথম যে দিন সে জল-ভল্লুক হইয়াছিল সেদিনও বল্‌গা-হরিণের দল আসিয়াছিল। আজ আবার সেই বল্‌গা-হরিণের দল আসিয়াছে। রূঠাকে ডাকিতে আসিয়াছে, রূঠা আজ চলিয়া যাইবে—'

আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আমার কাছে সমস্তটাই একটা দুর্বোধ্য হেঁয়ালির মতো মনে হইতেছিল। একটা কথা সহসা মনে হইল। রূঠার যখন নব-জীবন লাভ হইতেছে, পুঠারও নিশ্চয় হইবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম।

'তোমার নব-দেহ কবে হইবে?'

পুঠা কথাটা শুনিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া এমনভাবে চাহিল যেন কথাটা সে শুনিতে পায় নাই। আবার প্রশ্ন করিলাম। তখন সে আমার দিকে ফিরিয়া চাহিল, দেখিলাম তাহার সমস্ত চোখে মুখে একটা আর্ত বেদনা স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। একটা গভীর দুঃখ সে যেন চাপিতে চেষ্টা করিতেছে। কিছুক্ষণ নীরবতার পর সে উত্তর দিল।

'আমার নব-দেহ হইবে না। কারণ, আমার গর্ভের একটি সন্তানও বাঁচিয়া নাই। কাহার মধ্যে আমি নিজেকে নবীন কবিব? যদি কোনো দিন রোমশ-গণ্ডার দেখিতে পাই, তাহার মুখেই আত্মসমর্পণ করিব। কিন্তু সে ভাগ্যও বোধ হয় আমার হইবে না, কারণ রোমশ-গণ্ডারও আজকাল দেখিতে পাই না। আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও চলিয়া গিয়াছে। বহুকাল রোমশ-গণ্ডার দেখি নাই। আমাকে বোধ হয় পশুব মতো মবিতে হইবে। রূঠার ছেলেরা আমাকে মাটির নিচে পুঁতিয়া দিবে।'

তাহার এই নিদারুণ দুর্ভাগ্যের কথাটা অতি সহজভাবেই পুঠা সেদিন বলিয়াছিল। তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার মনের বেদনা মুখে ফুটিয়াছিল বটে, কিন্তু কোনো হতাশাব্যঞ্জক কথা সে বলে নাই। অবশ্য যে ভাষাতে আমি পুঠার কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিতেছি সে ভাষা পুঠার ভাষা নয়, তোমাদের বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া এইভাবে লিখিতেছি। সেযুগে আমাদের ভাষার অন্যপ্রকার রূপ ছিল। শুধু রসনা দিয়া নয়, সর্বাঙ্গ দিয়া আমরা কথা বলিতাম। পুঠার চোখের দিকে চাহিয়া তাহার নিদারুণ বেদনাটা টের পাইলাম। কিন্তু কেন যে এ বেদনা, তাহার সম্যক তাৎপর্যটা তখনও আমার কাছে পরিস্ফুট হইল না। কি অপমানে লজ্জায় তাহার ভিতরটা যে পুড়িয়া যাইতেছে যাহা কথায় প্রকাশ করিয়া বলিতেও তাহার আত্মসম্ভ্রম আহত হইতেছে—তাহা আমি তখন ঠিক বুঝিতে পারি নাই। নীরবে অনেকক্ষণ দুইজনে পাশাপাশি হাঁটিলাম।

...সহসা মাথার উপর শব্দ হইল—কাঁক, কাঁক, কাঁক—! পুঠার অন্তরের বেদনা যেন আকাশে বাঙ্ময় হইয়া উঠিল। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম এক ঝাঁক হাঁস উড়িয়া যাইতেছে। পুঠারও সহসা রূপান্তর ঘটিল। তাহার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইল, চক্ষু দিয়া সহসা যেন বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। বক্ষের উপর মুষ্টিবদ্ধ দুই হস্ত চাপিয়া উদ্ভাসিত নয়নে সে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু মুখে অনেকক্ষণ কিছু বলিল না।

আমিই পুনরায় প্রশ্ন করিলাম, 'ওই হাঁসের দল কোথা হইতে আসিল? উহারা কোথায় থাকে?' আমার কথায় পুঠার যেন চমক ভাঙিল। আমার দিকে ক্ষণকাল নীরবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'তা জানি না। শুধু জানি আমি যেদিন রোমশ-গণ্ডার হইয়াছিলাম, সেইদিন এই হাঁসের দল এমনিভাবে ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া আসিয়াছিল। কোথা হইতে আসিয়াছিল জানি না। তবে কি রোমশ-গণ্ডারও আজ আসিবে...'

পুঠা এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। আমিও চাহিতে লাগিলাম। দিগন্তবিস্তৃত বরফ ছাড়া আমি আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। পুঠা চক্রবাল রেখার দিকে দৃষ্টি-নিবদ্ধ করিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, 'আসিবে, নিশ্চয় আসিবে। হাঁসের দল আসিয়াছে, সে-ও আসিবে। আবার সব হইবে। তুমি আসিয়াছ—'

সহসা সে আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমি কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম, পুঠা জড়াইয়া ধরিতে চমকাইয়া উঠিলাম। পুঠার আলিঙ্গনপাশ হইতে নিজেকে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দেখিলাম তাহা অসম্ভব। বলিষ্ঠ পুঠার দৃঢ় বাহুদ্বয় অজগরের মতো আমাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল। আমার চোখে মুখে সঞ্চরণ কবিয়া ফিরিতেছিল অদৃশ্য অগ্নিশিখার মতো তাহার তপ্ত নিঃশ্বাস। একটা সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তাহার চোখের দৃষ্টিতে ধকধক করিয়া জ্বলিতেছিল।

'চল, চল'—আমার কানের কাছে মুখ রাখিয়া সে বলিল। অনুনয় এবং আদেশের এমন সমন্বয় আর কখনও শুনি নাই।

সে আমাকে টানিতে টানিতে লইয়া চলিল। আমিও আর বাধা দিলাম না, তাহার নিকট নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিলাম। মনে হইল একটা উত্তাল তরঙ্গময়ী খরস্রোতা নদীর স্রোতে যেন ভাসিয়া চলিয়াছি। কতক্ষণ চলিয়াছিলাম, কোন্ দিকে চলিয়াছিলাম তাহা আমার খেয়াল ছিল না। সহসা লক্ষ্য করিলাম যে গর্তটায় কিছু আগে মৃত বলগা-হরিণটাকে রাখিয়া গিয়াছিলাম সেই গর্তটার সমীপবর্তী হইয়াছি।

পুঠা আমাকে ছাড়িয়া দিল। তাহার পর ছুটিয়া গিয়া গর্তের মুখে আমি যে বরফ চাপা দিয়া গিয়াছিলাম হস্তপদসহযোগে তাড়াতাড়ি সে তাহা সরাইয়া ফেলিতে লাগিল। মনে পড়িল বহুকাল পূর্বে একটা বন্য-ভল্লুককে ওইভাবে মাটি খুঁড়িতে দেখিয়াছিলাম। পুঠাকেও মানুষ বলিয়া মনে হইতেছিল না, মনে হইতেছিল একটা ভল্লুকী বুঝি আদিম ক্ষুধার তাড়নায় তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। আমি খানিকক্ষণ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া দেখিলাম। তাহার পর আমিও আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, আমিও তাহার সহিত যোগ দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই গর্তের মুখটা বেশ পরিষ্কার হইয়া গেল। পুঠা ভিতরে ঢুকিল। আমিও মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহার অনুসরণ করিলাম। প্রকাণ্ড মৃত হরিণটা গর্তের একধারে পড়িয়াছিল। সম্ভবত তাহার শরীরের তাপেই গর্তের ভিতরটা একটু গরম হইয়াছিল।

...কিছুক্ষণ পরে মৃত হরিণটাকে টানিতে টানিতে যখন গুহা হইতে আমরা দুইজনে বাহির হইলাম তখন চারিদিক উষালোকে-রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। অদ্ভুত সে দৃশ্য। এক ভয়াবহ রক্তবর্ণ দ্যুতি চতুর্দিকের বরফকে যেন রক্তাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। চক্রবালসংলগ্ন পর্বতমালা মনে হইতেছে যেন মাংসের স্তূপ। দূর হইতে জল-ভল্লুকের করুণ কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছে। মনে হইতেছে যেন একটা বিরাট হত্যাকাণ্ডের পর কে যেন বুকফাটা কান্না কাঁদিতেছে!

আমি অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। পুঠা আমার দিকে চাহিয়া বলিল, 'উহারা রূঠাকে ডাকিতেছে। রোজই ডাকে। এতদিন বল্‌গা-হরিণ পাওয়া যায় নাই বলিয়া রূঠা অপেক্ষা করিয়াছে। আজ তুমি বল্‌গা-হরিণ শিকার করিয়াছ, আজ রূঠার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। চল্ তাড়াতাড়ি আমরা যাই।'

আমিই হরিণ পাইয়াছিলাম, রূঠার পুত্রেরা হরিণ জোগাড় করিতে পারে নাই। হরিণটাকে ঘিরিয়া সকলে মহা-উৎসব শুরু করিয়া দিল। সকলে মিলিয়া আনন্দে উদ্বাহু হইয়া নাচিতে লাগিল। স্থবিরা রূঠাও। মনে হইল তাহার আনন্দই সর্বাধিক। ন্যুব্জ দেহটাকে মহা উৎসাহে টানিয়া তুলিয়া সে তাহার সন্তান-সন্ততির সহিত নাচিতে লাগিল—নাচিতে নাচিতে বারবার সে সুর করিয়া বলিতে লাগিল, 'বল্‌গা-হরিণ, বল্‌গা-হরিণ, চল আমরা দুইজনে এবার একসঙ্গে থাকিব। আমার পুত্র-কন্যা দৌহিত্র-দৌহিত্রীর দেহ-অরণ্যে এইবার আমরা পাশাপাশি বাস করিব। জল-ভল্লুক এবং বল্‌গা-হরিণ এবার পাশাপাশি থাকিবে। আর তাহাদের ছাড়াছাড়ি হইবে না। অনেক দিন ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল আর হইবে না। আর আমাকে রোগে ভুগিয়া মরিতে হইবে না। মাটির কৃমিকীটেরা আর আমার দেহ ছিঁড়িয়া খাইবে না। আমার ছেলেমেয়েদের দেহে, আমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের নবীন অঙ্গে অঙ্গে আমি এবার চিরকাল বাঁচিয়া থাকিব। ওরে পুঠা, তুই বড় ভাল, তোর মানুষ আজ বল্‌গা-হরিণকে ডাকিয়া আনিয়াছে। তুই বড় ভাল, তোর হাঁসও এইবার আসিবে, গণ্ডারও আসিবে। আমি তোর গণ্ডারকে পাঠাইয়া দিব। আব দেবি নয়, আমাকে তোরা এইবার মুক্তি দে, আমি চলিয়া যাই, আমি তোদের নবীন জীবনে চলিয়া যাই, বল্‌গা-হরিণের সঙ্গে চলিয়া যাই—'

এইসব বলিতে বলিতে বৃদ্ধা রূঠা হাত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ক্রমাগত নাচিতে লাগিল। মাঝে মাঝে এক একটি অল্পবয়স্কা কুমারী রূঠাকে আসিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল, 'যাইবার আগে বলিয়া যাও, আমি কি হইব। আমি তো স্বপ্নে কাহাকেও দেখি নাই।'

রূঠা কাহাকেও মাছ, কাহাকেও শ্বেত-ভল্লুক, কাহাকেও হংস, কাহাকেও আর কোনো জন্তু হইতে বলিল। যাহারা স্বপ্নে বিশেষ কোনো জন্তুকে দেখিতে পাইয়াছিল তাহারাও সে কথা আসিয়া রূঠার কানে কানে বলিল।

রূঠা আনন্দে আত্মহারা হইয়া নাচিতে নাচিতে প্রত্যেকের কাছে গিয়া প্রশ্নও করিতে লাগিল, 'আমি তোমার ভিতর গিয়া এবার বাস করিব। আমি আর ওই বল্‌গা-হরিণ। আমাদের ভালভাবে থাকিতে দিবে তো? যত্ন করিবে তো?'

প্রত্যেকেই মাথা নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দিব।' যতবার রূঠা এই সমর্থন পাইল ততবার যেন তাহার উত্তেজনা বাড়িতে লাগিল। তাহার নৃত্য ক্রমশ উদ্দাম হইতে উদ্দামতর হইয়া উঠিল। সে ক্রমাগত বলিতে লাগিল, 'আমাকে মুক্তি দাও, আমাকে মুক্তি দাও।' ক্রমশ

তাহার চিৎকারে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমরাও নাচিতেছিলাম। রূঠার চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে রূঠার পুত্রকন্যারাও অট্টনাদ করিতেছিল।

মধ্যে পড়িয়াছিল বল্লমবিদ্ধ বিরাট বল্‌গা-হরিণটা। তাহার শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত বিশাল শৃঙ্গ, তাহার বক্ষের রক্তাক্ত-ক্ষত, তাহার আকাশ-মুখী নিষ্পলক দৃষ্টি, রৌদ্রালোকিত তুষার প্রান্তরে নৃত্যপরা অসভ্য মানব-মানবী পরিবৃত তাহার সেই সৌম্য শবদেহ সেদিন যে দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল তাহা আজ তোমরা বোধহয় কল্পনাও করিতে পারিবে না। ছবিটা হয়তো কল্পনা করিতে পারিবে, কিন্তু সেই উন্মাদনাটা অসভ্য মানবের পরলোক-প্রবণতার সেই আদিম উৎসবটার পরিপূর্ণ রূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে না। আমিও নাচিতেছিলাম, রূঠাও নাচিতেছিল। নাচ কতক্ষণ চলিয়াছিল তাহা মনে নাই, হঠাৎ রূঠা মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া যাইতেই নাচটা থামিয়া গেল। পড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে রূঠার জ্যেষ্ঠ পুত্র দিক্ষু একটা মুগুর লইয়া ছুটিয়া আসিল এবং সজোরে রূঠাব মাথায় আঘাত করিল। রূঠা মরিয়া গেল, মরিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সকলে তাহাব উপর উপুড় হইয়া পড়িল এবং তাহার গায়ের মাংস ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতে লাগিল। সকলকে সরাইয়া দিক্ষু অবশেষে রূঠার দেহটা বাহিরে টানিয়া আনিল এবং পাথরের একটা বড় ছোরা দিয়া সেটাকে টুকরা কবিতে লাগিল। বল্‌গা-হরিণটাকেও কুচি কুচি করা হইল। রূঠার মাংস ও বল্‌গা-হরিণের মাংস একসঙ্গে মিশাইযা সেই মিশ্রিত মাংস একটু একটু করিয়া প্রত্যেকে খাইল। অবশ্য পুঠা ছাড়া। দিক্ষু আসিয়া আমাকে প্রশ্ন করিল, 'তুমি লইবে কি? তুমি কি?'

পুঠাব দিকে চাহিয়া আমি বলিলাম, 'লইব বই কি, আমিও যে জল-ভল্লুক।'

সকলে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। করিল না কেবল লুং, রূঠার এক দৌহিত্রী। সে-ই কেবল চোখ বড় বড় করিয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রথম যেদিন ইহাদের সহিত পরিচয় হইয়াছিল সেই দিনই লুংয়েব চোখে এই দৃষ্টি দেখিয়াছিলাম। সে আশা করিয়াছিল যে, আমি বোধহয় জল-ভল্লুক নই। আমাকে লইয়া সে হয়তো নূতন সংসার পাতিতে পারিবে। সে আমার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তাহাব পর পুঠার দিকে চাহিল। পুঠা সাড়ম্বরে দিক্ষুর নিকট বর্ণনা করিতেছিল আমি কিরূপ দক্ষতার সহিত বল্‌গা-হরিণটা শিকার করিয়াছিলাম। বল্‌গা-হরিণ না পাইলে সেদিন এ উৎসব হইত না, কারণ রূঠার ছেলেরা বল্‌গা-হরিণ পায় নাই। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আমিই সেদিনকার উৎসবের নায়ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। সকলেই সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিতেছিল। কেবল লুংয়ের দৃষ্টিতে যাহা ফুটিয়া উঠিতেছিল তাহা প্রশংসা নয়—ঈর্ষা। লোভ ও ঈর্ষার একটা হিংস্র সমন্বয়। ইহাতে কিন্তু আমি অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম না, গোপনে গোপনে আনন্দই অনুভব করিতেছিলাম। তন্বী লুংয়ের নবোদ্ভিন্ন যৌবনের দিকে চাহিয়া আমিও প্রলুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলাম। লোভ মানুষকে চিরকাল বিপথে লইয়া গিয়াছে। এই লোভ আমারও সর্বনাশ করিল।

পুঠার সহিতই বাস করিতে লাগিলাম। বাঘিনী যেমন তাহার শাবককে আগলায়, পুঠাও আমাকে তেমনি আগলাইয়া বেড়াইত, একদণ্ড চোখের আড়াল করিত না। উপর্যুপরি নিয়মিতভাবে পুষ্টিকর আহার পাইয়া আমার শবীরে আবার অসুরের শক্তি ফিরিয়া আসিয়াছিল। আমি বিভিন্ন পরিবেশে মানুয হইয়াছিলাম বলিয়াই হউক অথবা অন্য যে

কোনো কারণেই হউক আমার শরীর আয়তনে ইহাদের শরীর অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ইহাদের কেহই আমার সমকক্ষ ছিল না।

...কিছু দিন পরে আমি আবার একটা বল্‌গা-হরিণ শিকার করিলাম। তুষার প্রান্তরের শেষ সীমায় দিগন্তবিস্তৃত যে প্রকাণ্ড জলরাশি ছিল, সেখান হইতে প্রায়ই আমি নানা রকম মৎস্যও শিকার করিয়া আনিতাম। আমার হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ ছিল। নিজের কর্মনিপুণতায় আমি ক্রমশ ইহাদের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করিতে লাগিলাম এবং একদিন ইহাদের দলপতি হইয়া পড়িলাম। দিক্ষুই এতদিন দলপতি ছিল। কিন্তু যেদিন দিক্ষু শ্বেত-ভল্লুকের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিল না, যেদিন আমি নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া ভল্লুকটাকে মারিয়া তাহাকে বাঁচাইলাম, সেদিন হইতেই সকলে আমাকে দলপতিরূপে স্বীকার করিয়া লইল। এমন কি, দিক্ষু নিজেও। সে যুগেও শক্তিই ছিল প্রভুত্বের নিয়ামক। দিক্ষু অনুভব করিয়াছিল, আমার নিকট নতি স্বীকার না করিলে আমি যে কোনো মুহূর্তে তাহাকে তাড়াইয়া দিতে পারি। সমস্ত দলটাই আমার স্বপক্ষে। নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া আমি যে দিক্ষুকে বাঁচাইয়াছিলাম, তাহা মহত্ত্বের প্রেরণায় নহে, সমস্ত দলের চক্ষে নিজেকে মহৎ প্রতিপন্ন করিবার জন্য। সেই অসভ্য যুগেও মহত্ত্বের সম্মান ছিল, তাই মহৎ না হইয়াও আমি মহৎ সাজিতে চাহিয়াছিলাম। দিক্ষুকে বাঁচাইবার পর হইতে আমাকে সকলে বিশেষ একটা সম্ভ্রমের চোখে দেখিতে লাগিল। আমি যে তাহাদের মধ্যে আসিয়াছি, ইহাতে তাহারা গর্ব অনুভব করিত। বিশেষ করিয়া পুঠার গর্বের অন্ত ছিল না। যে আমি তাহাব আবিষ্কার, যে আমি বিশেষ করিয়া তাহারই সম্পত্তি, সেই আমি যে নিত্য নূতন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া শৌর্যের পরিচয় দিতেছিলাম, ইহা সে যেন নিজেরই গৌরব বলিয়া মনে করিতেছিল। কিছুদিন পূর্বে আমি একটি প্রকাণ্ড জলচর জীবকে লক্ষ্য করিয়া বর্শা ছুঁড়িয়াছিলাম। বর্শাটা লইয়া জানোয়ারটা জলের তলায় অন্তর্ধান করিয়াছিল। তাহারই সন্ধানে আমবা সকলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, এমন সময় শ্বেত-ভল্লুকটা আসিয়া দিক্ষুকে অতর্কিতে আক্রমণ কবে।

সকলেই ভয় পাইয়া চিৎকার করিতে করিতে পলাইয়া গেল, আমিও গিয়াছিলাম, কিন্তু পুঠার ইঙ্গিতে আমাকে থামিয়া যাইতে হইল। লুংও ঘাড় ফিরাইয়া আমাকে দেখিতেছিল আমি কেমন যেন আত্মহারা হইয়া গেলাম, হিতাহিতজ্ঞান লোপ পাইল। প্রস্তর-ছুবিকাটা দৃঢ় হস্তে চাপিয়া ভল্লুকটার দিকে ছুটিয়া গেলাম এবং তাহার পিঠের উপর লাফাইয়া পড়িলাম। ভল্লুকটা দিক্ষুর উপর চাপিয়া বসিয়াছিল, আর একটু দেরি হইলে তাহাকে শেষ করিয়া দিত, কিন্তু আমি তাহার পিঠের উপর ছুরি বসাইয়া দিতে সে ঘুরিয়া আমাকে তাড়া করিল। আমার দিকে ফিরিতেই আমি ত্বরিৎ হস্তে তাহার বুকে ছুরি বসাইয়া দিলাম। তবু সে নিরস্ত হয় নাই। তাহার সহিত রীতিমতো মল্লযুদ্ধ করিয়া তবে তাহাকে পরাস্ত করিতে হইয়াছিল।

তাহার দন্ত ও নখরাঘাতে আমার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, পরে কয়েকদিন শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু রণে ক্ষান্ত দিই নাই। তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া তাহার বুকের উপর চড়িয়া তাহার টুঁটি কামড়াইয়া ধরিয়াছিলাম। রক্তাক্ত দেহে সেদিন যখন মৃত ভল্লুকটাকে টানিতে টানিতে লইয়া সকলের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম, সেই দিনই সকলের বিস্মিত দৃষ্টি আমার ললাটে অদৃশ্য তিলক পরাইয়া দিল। সেইদিন হইতেই আমি দলপতি হইয়া গেলাম।

...এইভাবেই দিন কাটিয়া যাইতেছিল। আরও হয়তো কিছুকাল কাটিত, কিন্তু পুঠার প্ররোচনায় প্রথমেই যে মিথ্যাচার করিয়াছিলাম, তাহাই আমার কাল হইল। পুঠার কথায় নিজেকে জল-ভল্লুক রূপে পরিচিত করিয়া যে গোষ্ঠীতে আমি প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহা রূঠার গোষ্ঠী, সে গোষ্ঠীতে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই জল-ভল্লুক। সে গোষ্ঠীর আইন অনুসারে কোনো স্ত্রী জল-ভল্লুক কোনো পুরুষ জল-ভাল্লুকের সহিত দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে না। যদি কেহ করে, প্রাণদণ্ড তাহার শাস্তি। ধরা পড়িলে দলের অন্য সকলে মিলিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিবে। রূঠা, পুঠা এবং ডিংঘার মা নাকি কাহার নিকট শুনিয়াছিলেন যে, হুংজুরা হুংজু হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ তাহাদের সহোদর ভ্রাতা-ভগ্নীদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক হয়। তাহার পর একদিন হঠাৎ তিনি কেমন যেন ভাবগ্রস্ত হইয়া পড়েন। প্রথমে অজ্ঞান হইয়া খানিকক্ষণ পড়িয়াছিলেন। তাহার পর যখন জ্ঞান হইল, তখন তিনি উঠিয়া বসিলেন। চোখ বড় বড় করিয়া মাথার চুল টানিতে টানিতে চিৎকার করিয়া বলিলেন, 'আমার ছেলেরা আমার মেয়েদের নিকট হইতে তফাতে থাক'—ক্রমাগত এই একই কথা বলিতে বলিতে আবার তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। অজ্ঞান অবস্থাতেও এই একই কথা বলিতে লাগিলেন এবং অবশেষে এই কথা বলিতে বলিতেই তাঁহাব মৃত্যু হইল। রূঠা, পুঠা, ডিংঘার অনেকগুলি ভাই ছিল। তাহাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল দিঘড়া। মাতৃবাক্য অবহেলা করিয়া এই দিঘড়া নাকি জোর করিয়া ডিংঘার সহিত দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল। ফলে দুই দিনের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় সকলে এত ভয় পাইল যে, বাকি ভাইগুলি রূঠা-পুঠা-ডিংঘার সংস্রব ত্যাগ করিয়া যে যেখানে পারিল পলাইয়া গেল। রূঠা-পুঠা-ডিংঘাও তখন তাহাদেব আদিম বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া সোজা পূর্বমুখে চলিতে শুরু করিল। তাহাদের মা নাকি বলিয়াছিলেন যে যেদিক হইতে সূর্য উঠিয়া আমাদের সমস্ত অন্ধকার দূর করে, বিপদে পড়িলে সেইদিকেই যাইতে হয়। রূঠা-পুঠা-ডিংঘা তিন দিন তিন রাত্রি পূর্বমুখে চলিয়া অবশেষে জিম্ভন পরিবারের সাক্ষাৎ পায়। এই পরিবারের স্থাপয়িত্রী জিম্ভনের নাম অনুসারেই যদিও এই বংশের নামকরণ হইয়াছিল, কিন্তু আসলে উহারা ছিল মৎস্য। জিম্ভন মৎস্যের স্বপ্ন দেখিয়াছিল। এক যাদুকর তখন তাহাকে মৎস্য বংশ স্থাপন করিতে নির্দেশ দেয়। রূঠা-পুঠা-ডিংঘাও এই পরিবারে আশ্রয় লইয়া জিম্ভনের আদর্শ অনুসরণ করিয়া নিজ নিজ বংশ স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু বেশিদিন তাহারা জিম্ভন পরিবারে থাকিতে পায় নাই। জিম্ভন পরিবারের লাফুর সহিত রূঠার ঘনিষ্ঠতা যখন বেশি রকম প্রকট হইয়া পড়িল, জিম্ভনের পুত্র শিকাং যখন সর্বসমক্ষেই একদিন পুঠাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল, ডিংঘার জন্য যখন জিম্ভন যুবকদের মধ্যে প্রায়ই কলহ আরম্ভ হইল, তখন জিম্ভন রূঠা-পুঠা-ডিংঘাকে আর নিজ পরিবারে আশ্রয় দিতে পারিল না। লাফু ও শিকাংকে লইয়া রূঠা-পুঠা-ডিংঘা একদিন সরিয়া পড়িল। ডিংঘাকে লইয়াও পরে রূঠা-পুঠার মুশকিল হইয়াছিল, কারণ ডিংঘার স্বভাব নাকি খুব উগ্র ছিল, সে প্রকাশ্যভাবেই রূঠা-পুঠার নিকট হইতে লাফু-শিকাংকে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিত, তাহার পর লালহংস দলের সহিত ইহাদের পরিচয় ঘটিল একদিন শিকার করিতে গিয়া। পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইল। হংস গোষ্ঠীর লোকেরা রূঠা-পুঠা ও ডিংঘার সহিত মিলিবার জন্য প্রায়ই আসিত। কিন্তু সহসা একদিন ডিংঘাকে লইয়া হংস দলের একটি যুবক পলায়ন করিল। তাহার পর এই হংস

দলের সহায়তায় ডিংঘা টিট্রিভ বংশ স্থাপন করিয়াছে। এখন এই টিট্রিভ গোষ্ঠীর সহিত জল-ভল্লুক এবং রোমশ-গণ্ডারদের নিত্য কলহ। রূঠা-পুঠার অনেক সন্তান টিট্রিভদের কবলে পড়িয়া নিহত হইয়াছে। রূঠার দলের অনেক পুরুষকে টিট্রিভ যুবতীরা ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে। আমি এই ইতিহাস শুনিয়াছিলাম লুংয়ের মুখে। শুনিবার ইতিহাসটিও অদ্ভুত। একটা গোটা মাছ তাড়াতাড়ি গিলিতে গিয়া পুঠার গলায় মাছের কাঁটা বিঁধিয়াছিল। সেদিন তাই সে নিশীথ-অভিযানে বাহির হইতে পারে নাই। আমি একাই বাহির হইয়াছিলাম। অতিশয় সন্তর্পণে পা টিপিয়া ঘুমন্ত পুঠাকে ফেলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিলাম লোভের বশবর্তী হইয়া। সকলের অগোচরে একদিন একটি জল-ভল্লুককে খাইয়াছিলাম। সে মাংস আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু যেহেতু আমি নিজেকে জল-ভল্লুক বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলাম, সেই হেতু আমার প্রকাশ্যে জল-ভল্লুকের মাংস খাইবার উপায় ছিল না, পুঠাও আমাকে প্রকাশ্যে খাইতে বারংবার মানা করিয়াছিল। পুঠার সহিত নিশীথ অভিযানে যখন বাহির হইতাম, তখন একদিন পুঠার সম্মতি লইয়াই একটি জল-ভল্লুকের শাবককে গলাধঃকরণ করি। পুঠা সম্মতি দিয়াছিল, তাহার কারণ, সে জানিত যে আমি সত্য সত্যই জল-ভাল্লুক নহি, ভান করিয়াছি মাত্র। যাহারা প্রকৃত জল-ভল্লুক তাহারাই জল-ভল্লুকের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বাধ্য। পুঠা রোমশ-গণ্ডার, তাহারও জল-ভল্লুকের মাংস খাইতে বারণ নাই, কিন্তু সে-ও কখনও প্রকাশ্যে জল-ভল্লুকের মাংস আহার করিত না। আমাকেও আহার করিতে দিত না। যে বন্য উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা এতদিন ভোগ করিয়া আসিয়াছি, এই বিধি-নিষেধবদ্ধ সমাজে আশ্রয় পাইয়া তাহা পদে পদে ক্ষুণ্ণ হইতেছিল সত্য, কিন্তু সমাজকে না মানিয়া উপায় ছিল না। অতীতের উদ্দাম বন্ধনহীন জীবনের জন্য মাঝে মাঝে আকুলতা জাগিলেও একথা স্বীকার করিতেছি যে, বিধি-নিষেধ মানিতেও নিতান্ত মন্দ লাগিতেছিল না। গোপনে এই বিধিনিষেধ অমান্য করার মধ্যেও একটা নূতন ধরনের আনন্দ ছিল, তাহাও ক্রমশ আবিষ্কার করিতেছিলাম। ঘুমন্ত পুঠাকে ফেলিয়া যখন বাহির হইয়া আসিলাম, একটা নূতন ধরনের উন্মাদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষামিশ্রিত নূতন একটা অনুভূতি সমস্ত সত্তাকে যেন উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছিল। অন্ধকার রাত্রি। চাঁদ তখনও ওঠে নাই, আকাশে অগণ্য নক্ষত্র জ্বলিতেছে। মনে আছে, আকাশ-ভরা নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া সেই দিনই বোধহয় প্রথম বিস্ময় বোধ করিয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল, অসংখ্য-চক্ষু ওই বিরাট দৈত্যটা হুমড়ি খাইয়া কি দেখিতেছে। আকাশকে একটা দৈত্যরূপেই কল্পনা করিয়াছিলাম। কিন্তু ইহাও তৎক্ষণাৎ মনে হইয়াছিল যে, দৈত্য হইলেও শত্রু নয়, বন্ধু। শত্রু হইলে আমাদের এতদিন অনায়াসে নিঃশেষ করিয়া দিতে পারিত। মাঝে মাঝে যখন চটিয়া যায়, তখন বজ্র নিক্ষেপ করে বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই প্রসন্ন থাকে। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। কেহ কোথাও নাই। চন্দ্রোদয় আসন্ন। তুষার প্রান্তরের শুভ্রতা অন্ধকার ভেদ করিয়া আবছাভাবে দেখা যাইতেছে। নক্ষত্রলোক অপূর্ব রহস্যালোক সৃজন করিয়াছে। সহসা মৃদু ক্রন্দন-ধ্বনি ভাসিয়া আসিল, সেই পরিচিত ধ্বনি, জল-ভাল্লুকের শাবকের আহ্বান...। শব্দ লক্ষ করিয়া চলিতে লাগিলাম। বেশি দূর যাইতে হইল না। অল্প দূর গিয়া দেখিতে পাইলাম, একটি বৃহৎ জল-ভল্লুক (যাহাকে তোমরা আজকাল সীল বল) কয়েকটি শাবক লইয়া বসিয়া আছে। আমার পদশব্দ পাইয়া হুড়মুড় করিয়া সব কয়টিই জলে নামিয়া গেল। নিতান্ত শিশুটি পারিল না, তাহাকে আমি ধরিয়া

ফেলিলাম এবং অবিলম্বে আহারে প্রবৃত্ত হইলাম। সে যুগে রহিয়া-সহিয়া কিছু করিবার উপায় ছিল না। বিলম্ব করিলেই বিপদ ঘটিত।

...তবু বিপদ ঘটিয়া গেল। তখনও আমার খাওয়া শেষ হয় নাই, মুণ্ডটা তখনও অভক্ষিত রহিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ আমার পিছন দিক হইতে কে যেন আমাকে জাপটাইয়া ধরিল। চিৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিলাম, কিন্তু নিজেকে মুক্ত করিতে পারিলাম না, সে আমার গলা ধরিয়া আমার পিঠের দিকে ঝুলিয়াই রহিল এবং পরমুহূর্তে খিল খিল করিয়া হাসিয়া আমার ঘাড়ে কামড়াইয়া ধরিল। আবার লাফাইয়া উঠিলাম এবং এক ঝটকায় তাহাকে ভূপাতিত করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কাণ্ডও ঘটিল। এক ঝলক জ্যোৎস্না আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িল। পূর্ব দিগন্তে চাঁদ উঠিতেছিল। জ্বলন্ত-নয়না লুংকে চিনিতে পারিলাম। দেখিলাম লুংয়ের প্রজ্বলিত দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ কৌতুকও আভাসিত হইয়াছে। সে নিষ্পলক নেত্রে খানিকক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, 'তুমি না জল-ভল্লুক? তবে জল-ভল্লুক খাইতেছ যে?' আমি কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। 'আমি যদি এখন গিয়া সকলকে বলিয়া দি'—লুংয়ের চোখের দৃষ্টি কৌতুকে নাচিতে লাগিল। সেই মুহূর্তে আমার মনে যে বাসনা জাগিয়া উঠিল, তাহা ভয়ানক। ইচ্ছা হইল, লুংকে হত্যা করিয়া জলে ফেলিযা দিই। সহসা তাহার গলাটা চাপিয়া ধরিতে গেলাম, কিন্তু ফসকাইয়া গেল। কলহাস্যে তুষারপ্রান্তকে সচকিত করিয়া লুং ছুটিতে লাগিল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করিলাম। শুধু অনুসরণ নয়, অনুনয়ও করিতে লাগিলাম।

'লুং, শুনিয়া যাও। তোমাকে সত্য কথা খুলিয়া বলিব। কোনো ভয় নাই, ফিরিয়া এস। সমস্ত কথা খুলিয়া বলিতেছি, চলিয়া যাইও না, ফিরিয়া এস।'

লুং কিন্তু ফিরিল না। ঘাড় ফিরাইয়া দুই-একবার সে আমার দিকে চাহিল বটে, কিন্তু ফিরিল না । দেখিতে দেখিতে সে একটা প্রকাণ্ড তুষার-স্তূপের আড়ালে অন্তর্হিত হইয়া গেল। আর তাহার অনুসরণ করা বৃথা ভাবিয়া আমি নিরস্ত হইলাম। আর একটা বরফ-স্তূপের উপর গিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, এখন কি করা উচিত। লুং যদি গিয়া সব কথা প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহা হইলে আমার প্রাণসংশয়। ইহাদের নিয়ম অনুসারে আমি যাহা করিয়াছি, তাহা গুরুতর পাপ এবং সে পাপের শাস্তি প্রাণদণ্ড। দিক্ষু যদিও ভয়ে ভয়ে আমার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে, কিন্তু মনে মনে সে আমার উপর প্রসন্ন নয়। দলের সকলে আমাকে মানিতেছে বলিয়া সে আমাকে মানিতেছে। কিন্তু আমি জল-ভল্লুক হইয়া লুকাইয়া জল-ভল্লুক হত্যা করিয়া আহার করিয়াছি—এই নিদারুণ সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িলে কেহই আমাকে মানিবে না। সকলেই আমার শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। তখন পুঠাও আমাকে আর বাঁচাইতে পারিবে না। এখন একটিমাত্র পথ খোলা আছে—পলায়ন। কিন্তু কোথায় পলাইব? এই তুষার-প্রান্তরের তিন দিকে বিস্তীর্ণ জলরাশি। আর একদিকে বহু দূরে একটা অরণ্য আছে শুনিয়াছি, যে-অরণ্যে হুংজু থাকে, যে অরণ্যের অভিমুখে সেদিন বল্‌গা-হরিণের দলকে যাইতে দেখিয়াছি। জলরাশি অতিক্রম করিয়া যাওয়া অসম্ভব। ওই অরণ্যের দিকেই যাইতে হইবে। হুংজুর ঝুঁকিয়া-পড়া বিকট চেহারাটা মানসপটে ফুটিয়া উঠিল, বল্‌গা-হরিণদের ছবিটাও ফুটিয়া উঠিল, পুঠা বলিয়াছিল, হুংজু যদি ধরিতে পারে, মাথাটা কড়মড় করিয়া চিবাইয়া খাইয়া ফেলিবে। কিন্তু তাহাকে ধরা দিব কেন? তাহার নাগালের

মধ্যে আসিব কেন? দূর হইতে বর্শা ছুঁড়িয়া আমিই তাহাকে হত্যা করিব, আমিই তাহার মাথাটা চিবাইয়া খাইব। বর্শা দেখিয়া সেদিন হুংজু ভয় পাইয়াছিল—তাহার পলায়মান মূর্তিটা চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল—মনে হইল সে যত বলবানই হোক না কেন, তাহাকে আমি পরাজিত করিবই। বল্‌গা-হরিণের দলও আমাকে প্রলুব্ধ করিতেছিল! ঠিক করিলাম, অরণ্যের দিকেই যাইব। পুঠা আমাকে যে বর্শা, ছোরা, বর্মাবরণ এবং কাষ্ঠপাদুকা দিয়াছিল, তাহা তো সঙ্গেই আছে, তবে আর কালবিলম্বে প্রয়োজন কি? দেরি করিলেই বরং বিপদ, লুং এতক্ষণ হয়তো সব কথা সকলকে বলিয়া দিয়াছে। উঠিতে যাইব, এমন সময় বরফস্তূপের অপর পার্শ্বে চাপা হাসি শুনিতে পাইলাম। তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং ছুটিয়া অপর পার্শ্বে গিয়া দেখিলাম, লুং দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। আমাকে দেখিয়া গম্ভীরমুখে প্রশ্ন করিল—

'তুমি আমাকে ডাকিতেছিলে কেন? সত্যই কি সত্য কথা খুলিয়া বলিবে? বল না।'

'বলিতে পারি যদি তুমি কাহাকেও না বল।'

'পুঠাকেও না?'

লুংয়ের চোখের দৃষ্টি পুনরায় কৌতুকে নাচিতে লাগিল। আমার দিকে ভ্রূভঙ্গি করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। চতুর্দিকে তুষারধবল নির্জনতা, জ্যোৎস্না তাহার তন্বী দেহকে ঘিরিয়া যে মোহিনী মায়া সৃজন করিতেছিল, আমি নির্বাক হইযা তাহাই দেখিতেছিলাম। সহসা আমার মুখ দিয়া কোনো কথাই সরিল না। লুংয়ের কণ্ঠস্বরে পুনরায় আত্মস্থ হইলাম।

'পুঠাকেও বলিব না?' —আবার সে প্রশ্ন করিল।

'পুঠাকে বলিবার প্রয়োজন নাই। সে সব কথা জানে।'

'বেশ। কাহাকেও তাহা হইলে বলিব না। কিন্তু ইহার জন্য আমাকে কি দিবে?'

'কি চাও বল।'

'হাঁটু গাড়িয়া এমনি করিয়া বস।'

কেমন করিয়া বসিতে হইবে, তাহা সে দেখাইয়া দিল। তেমনি করিয়াই বসিলাম।

'এইবার হাত জোড় করিয়া প্রতিজ্ঞা কর—আমি শপথ করিতেছি, এখন হইতে লুংয়ের পদানত থাকিব। সে যখন যাহা বলিবে, তাহাই করিব।'

শপথও করিলাম। আমার শপথ শেষ হইতে না হইতে লুং আসিয়া আমার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সেইদিনই লুং আমাকে তাহাদের সব ইতিহাস খুলিয়া বলিল। সেদিন সেই জ্যোৎস্নালোকিত নির্জন তুষার প্রান্তরে নামহীন সমুদ্রতটে বসিয়া সবিস্ময়ে এক অজ্ঞাতপূর্ব সমাজের কাহিনী শুনিয়াছিলাম। সেইদিন হইতেই আমার জীবন দুইটি ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। একটি ধারা লুংকে লইয়া গোপনে, আর একটি ধারা পুঠার সহিত প্রকাশ্যে।

আমাকে লইয়া পুঠার গর্বের অন্ত ছিল না, যদিও সে স্বল্পভাষিণী ছিল, বাক্যের সহায়তায় যদিও সে আমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই প্রকাশ করিত না, কিন্তু তাহার চোখ-মুখের ভঙ্গিতে, বিস্ময়োৎক্ষিপ্ত ভ্রূ-যুগলে, উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে যাহা প্রকাশিত হইত, তাহাই যথেষ্ট ছিল। শৌর্যে বীর্যে পরাক্রমে দলের মধ্যে আমিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, আমি যে পুঠারই বিশেষ সম্পত্তি, পুঠাকে সামান্যতম তাচ্ছিল্য করিলে যে আমি অবিলম্বে তাহার প্রতিশোধ লইব, তাহা পুঠা আকারে-

ইঙ্গিতে সকলকেই সর্বদা বুঝাইয়া দিত। বলা বাহুল্য, ইহাতে কেহ সন্তুষ্ট হইত না। বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষগণ বিশেষ করিয়া এই জন্যই গোপনে গোপনে আমার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল। দিক্ষুই ছিল সেই ষড়যন্ত্রের নেতা। দিক্ষুর রাগের আর একটা কারণ ছিল; কুক্কুরবংশীয়া যে যুবতীটিকে দিক্ষু কিছুকাল পূর্বে হরণ করিয়া আনিয়াছিল, জল-ভল্লুক সম্প্রদায়ের নিয়মানুসারে প্রত্যেক পুরুষ জল-ভল্লুকেরই তাহার উপর দাম্পত্য অধিকার ছিল। নাংরা কিন্তু আমাকে ছাড়া বিশেষ কাহাকেও প্রশয় দিত না। এমন কি, দিক্ষুকেও না। সামাজিকভাবে নাংরার সহিত আমার মেলামেশা করিবার অধিকার থাকিলেও প্রকাশ্যে আমি তাহা করিতে পারিতাম না পুঠার ভয়ে। পুঠা আমাকে আগলাইয়া বেড়াইত। অন্য কোনো রমণীর প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিলে তাহার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া কাঁপিতে থাকিত, চোখের দৃষ্টিতে ক্রুদ্ধা বাঘিনীর উত্তেজনা ফুটিয়া উঠিত, গর্‌র গর্‌র করিয়া একটা চাপা আওয়াজও গলার ভিতর হইতে বাহিব হইত। মুখে কিন্তু সে কিছু বলিত না। কারণ সামাজিকভাবে আমাকে মানা করিবার তাহার কোনো অধিকার ছিল না। লুংয়ের সম্বন্ধে ছিল কিন্তু নাংরার সম্বন্ধে ছিল না। কুক্কুরবংশের প্রতিষ্ঠাত্রী নাংরা সমস্ত জল-ভল্লুক সম্প্রদায়ের সাধারণ সম্পত্তি ছিল। যদিও আমি প্রকাশ্যভাবে নাংরার সাহচর্য করিতে পারিতাম না, কিন্তু নাংরা যে আমার সঙ্গ লাভের জন্য উন্মুখ, একথা দিক্ষুর অবিদিত ছিল না। সে সন্দেহ করিত যে, গভীর রাত্রে আমি বোধহয় নাংরার সহিত সাক্ষাৎ করি। এ সন্দেহ মিথ্যা নয়। পুঠাকে লুকাইয়া আমি প্রায় প্রত্যহই গভীর রাত্রে বাহির হইয়া পড়িতাম, একথা সত্য। লুংয়ের সহিতই অধিকাংশ দিন সাক্ষাৎ হইত! নাংরার সহিতও মাঝে মাঝে হইত। লুং প্রায় প্রত্যহই কোনো না কোনো তুষার স্তূপের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিত। নাংরার সহিত আমার যে মাঝে মাঝে সংস্রব ঘটিয়া থাকে, তাহা লুং জানিত, কিন্তু আপত্তি করিত না। আপত্তি করিবার উপায় ছিল না। নিজের স্বার্থের জন্যই সে নাংরাকে সহ্য করিত।

এইভাবেই দিন কাটিতেছিল। কিন্তু অন্যায় বেশি দিন গোপন থাকে না। পুঠা ক্রমশ আমাকে সন্দেহ করিতে লাগিল। একদিন আমি ও লুং এক তুষার গহ্বরে বসিয়া তাহার দিগন্ত-বিদারী আর্তনাদ শুনিতে পাইলাম। তাহা আর্তনাদ অথবা অট্টহাস্য তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যাইতেছিল না। আর্তনাদই হউক অথবা অট্টহাস্যই হউক, সে চিৎকারে রাত্রির নিস্তব্ধতা যেন ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছিল; দিগন্তবিস্তৃত তুষার প্রান্তর যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। আমরা উভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম। বলিষ্ঠকায়া পুঠাকে সকলেই ভয় করিত। তাহার গায়ে অসুরের শক্তি। টিট্টিভ সম্প্রদায়ের সহিত এক যুদ্ধে সে বর্শা চালনা করিয়া একাই নাকি বহু শত্রু নিপাত করিয়াছিল। লুং আমার কানে কানে বলিল, —'পুঠা যদি আমাকে তোমার সহিত দেখিতে পায়, এখনই আমাকে হত্যা করিবে। তাহার তীক্ষ্ণ দাঁত আমার গলায় বসিয়া গেলে আমি আর বাঁচিব না। শিকাংয়ের জন্য পুঠা ইতিপূর্বে বহু কিশোরীকে, বহু যুবতীকে হত্যা করিয়া তাহাদের রক্ত পান করিয়াছে। পুঠার অত্যাচারেই ডিংঘা পলাইয়া গিয়া টিট্টিভ দল সৃষ্টি করিয়া এখন আমাদের শত্রুতাসাধন করিতেছে। পুঠা যেন আমাকে তোমার সঙ্গে না দেখে, তুমি আস্তে আস্তে বাহির হইয়া যাও।'

আমিও বুঝিতেছিলাম যে, পুঠা আমাকেই খুঁজিতেছে। আমার সহিত দেখা হইলেই সে থামিয়া যাইবে। গুঁড়ি মারিয়া গহ্বর হইতে বাহির হইলাম এবং গিরগিটির মতো বুকে হাঁটিয়া

হাঁটিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পুঠা যে কোন্ দিকে আছে, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আমি কেন পুঠাকে একা ফেলিয়া রোজ রাত্রে বাহির হইয়া যাই, তাহা পুঠা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। উত্তরে আমি তাহাকে একটা মিথ্যা কথা বলিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম—'আমি হুংজুর খোঁজে বাহির হই। হুংজুকে একাকী বধ করিব, ইহাই আমার উচ্চাশা। কাহারও সাহায্য আমি লইতে চাই না, এমন কি, তোমারও না। সেইজন্য আমি একা বাহির হইয়া যাই।'

ইহাতে পুঠা গর্ববোধ করিয়াছিল। পরদিন সে দলের সকলকে ডাকিয়া আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াও দিয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল সকলকে তাক লাগাইয়া দেওয়া। তাহার পর আমাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিয়াছিল। 'সত্যিই যদি তুমি এই হুংজুকে হত্যা করিয়া আনিতে পার, তাহা হইলে তুমি শুধু আমাদের দলের নয়, এই প্রদেশের সমস্ত দলের অধিপতি বলিয়া গণ্য হইবে। টিট্রিভরাও হয়তো তোমার বশ্যতা স্বীকার করিবে। কারণ এই হুংজুটা সকলেরই শত্রু। সকলেই ইহাকে মারিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কেহই পারে নাই। এ যেমন ধূর্ত তেমনি বলশালী। কিন্তু ইহার জন্য রাত্রে তোমার একা বাহির হইবার প্রয়োজন নাই, আমার সাহায্য যদি না লইতে চাও, আমি সাহায্য করিব না, দূরে দাঁড়াইয়া থাকিব। কিন্তু একেবারে একা বাহির হওয়া নিরাপদ নয়।' ...তবু আমি একা বাহির হইয়াছিলাম।

পুঠার আর্তনাদ ক্রমশ নিকটবর্তী হইতেছিল। অট্টহাস্য নয়, আর্তনাদই। মনে হইতেছিল পুঠার আর্ত-হৃদয় যেন একটা শব্দের শূল হইয়া স্তব্ধতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিতেছে। আমি গিরগিটির মতো বুকে ভর দিয়া চলিতে লাগিলাম। সহসা পুঠার আর্তনাদ থামিয়া গেল। সে আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। পুঠা প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিল, আগাইয়া আসিল না। আমিই তাহার নিকট গেলাম।

রুক্ষকণ্ঠে পুঠা প্রশ্ন করিল, 'তুমি আবার একা বাহির হইয়াছ কেন?'

আমি দূরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইলাম। যাহা দেখাইলাম, তাহা যে একটা গাছ মাত্র ইহা আমি জানিতাম। কিন্তু আমি ভান করিলাম যেন ওটাকেই হুংজু মনে করিয়া আমি তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম। পুঠা এত সহজে ভুলিবার পাত্রী নয়।

'ওটা যে একটা গাছ তাহা আমিও জানি তুমিও জান—'

'ওটা নয়, ওই যে আরও দূরে। এখন আর দেখা যাইতেছে না। চলিয়া গেল—'

পুঠার দৃষ্টি এড়াইয়া দূর দিগন্তের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পুঠা বলিল, 'শোন, এভাবে রাত্রে একা বাহির হইয়া অনিশ্চিত ছায়ার পিছনে হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইলে হুংজুকে মারা যাইবে না। এরূপভাবে বাহির হওয়ার অন্য বিপদও আছে। লুং বা নাংরার পাল্লায় যদি পড়িয়া যাও সে রাক্ষসীরা তোমাকে শেষ করিয়া ফেলিবে।'

পুঠার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া গেল। সমস্ত নাকটাই কাঁপিতে লাগিল। আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

'এখন ঘরে ফিরিয়া চল।'

নীরবে তাহার অনুসরণ করিতেছিলাম, হঠাৎ পুঠা ফিরিয়া বলিল, 'শোন, হুংজুকে মারিতে হইবে। তুমি একাই পারিবে। কালই তুমি ওই বনের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়। আমি নিজে তোমার সঙ্গে যাইব।'

আমি কাতর কণ্ঠে বলিলাম, 'কিন্তু আমি একাই হুংজুকে মারিতে চাই। তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও সে গৌরব হইতে আমি বঞ্চিত হইব।'

'বেশ একাই যাইও। আমি কিছুদুর পর্যন্ত তোমাকে আগাইয়া দিব। কিন্তু একা তুমি হুংজুকে কি করিয়া মারিবে তাহা তো বুঝিতে পারিতেছি না।'

'ঠিক করিয়াছি একটা গাছের উপর বর্শা হাতে লুকাইয়া থাকিব। হুংজুকে দেখিতে পাইলেই বর্শা ছুঁড়িব। আমার লক্ষ্য যে কি রকম অব্যর্থ তাহা সকলেই জানে।'

পুঠার চোখের দৃষ্টি গর্বোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিল, 'অরণ্যে বেশ ভাল একটা গাছ আছে। দেখাইয়া দিব।'

পরদিন সকালে জানা গেল নাংরার শিশু-পুত্রটিকে হুংজু লইয়া গিয়াছে। নাংরা পুত্রটিকে লইয়া গতরাত্রে নাকি বাহির হইয়াছিল। মাছের সন্ধানে জলের ধারে ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ সে হুংজুকে দেখিতে পাইয়া ছুটিতে থাকে। শিশুপুত্রটি তাহার পিঠে বাঁধা ছিল। ছুটিতে ছুটিতে পিঠের বাঁধন আলগা হইয়া শিশুটি মাটিতে পড়িয়া যায়। নাংরা তাহাকে আর তুলিয়া লইবার অবকাশ পায় নাই। তুলিতে গেলে সে নিজেই হুংজুর কবলে পড়িত। জাজা নামে আর একটি মেয়েও অন্তর্ধান করিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে হুংজু লইয়া যায় নাই। আমরা জানিতাম সে হ্রদ-সর্প সম্প্রদায়ের একটি যুবকের সহিত কিছুদিন হইতে মাখামাখি করিতেছিল। সম্ভবত তাহার সহিতই সে চলিয়া গিয়াছে। জল-ভল্লুক কন্যারা বড় হইলে হয় এইভাবে চলিয়া যাইত, কিংবা অন্য কোনো সম্প্রদায়ের ছেলেকে ভুলাইয়া আনিত। বয়ঃপ্রাপ্ত কন্যারা অন্তর্ধান করিলে সুতরাং কেহ বেশি বিচলিত হইত না। সকলে বলিত, 'সে মানুষ খুঁজিতে গিয়াছে। খুঁজিয়া পাইলে আবার ফিরিয়া আসিবে।' মনের মানুষ লইয়া স্ব-সমাজে ফিরিয়া আসাটাই গৌরবের ছিল। কেহ না আসিলে সকলে তাহাকে শক্তিহীনা সমাজত্যাগিনী বলিয়া গালাগাল দিত। সুতরাং জাজার অন্তর্ধানে আমরা খুব বেশি চিন্তিত হইলাম না। নাংরার চিৎকার কিন্তু আমাদের বিচলিত করিয়া তুলিল। বুক চাপড়াইয়া, চুল ছিঁড়িয়া, কাঁদিয়া, চিৎকার করিয়া নাংরা সকলের কাছে গিয়া বলিতে লাগিল, 'আমার ছেলে আনিয়া দাও, আমার ছেলে আনিয়া দাও।' আমার কাঁধে মাথা রাখিয়া আমাকে বারবার শোকাবেগে জড়াইয়া ধরিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল—'তুমি শক্তিমান, তুমি দলপতি, তুমি আমাকে ছেলে আনিয়া দাও, আমার প্রথম পুত্র, প্রথম জল-ভল্লুক, হুংজুর কবলে গেল, তুমি ইহার প্রতিকার কর।'

পুঠা ওষ্ঠাধর নিবদ্ধ করিয়া চুপ করিয়া ছিল। সে এইবার কথা বলিল :

'ইহার প্রতিকার হইবে। ও কাল হুংজুকে মারিয়া আনিবে। আমি আজ রাত্রে উহাকে লইয়া গিয়া অরণ্যের প্রান্তে পৌঁছাইয়া দিব। ও একাই যাইবে, তোমরা কেহ উহার সঙ্গে যাইও না। কাল হুংজু মরিবে।'

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া এই অদ্ভুত ঘোষণা শুনিল।

সেদিন গভীর রাত্রে আমি এবং পুঠা অরণ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। পুঠার মুখে একটিও কথা ছিল না, আমিও নীরবে অনুসরণ করিতেছিলাম। আমাদের দুজনেরই সর্বাঙ্গ শ্বেত-ভল্লুকের চর্মে আবৃত, দুইজনেরই হস্তে প্রকাণ্ড প্রস্তর-নির্মিত বর্শা। ইহা ছাড়া আমার কটিদেশে প্রস্তর-কুঠার এবং প্রস্তর-ছুরিকাও বিলম্বিত ছিল। আশা-আকাঙ্ক্ষায় আচ্ছন্ন হইয়া আমি চলিতেছিলাম। কাঁচপোকা আরশুলাকে যেভাবে টানিয়া লইয়া যায়, পুঠার অদৃশ্য শক্তি

ঠিক তেমনিভাবে আমাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল। সেই বিশাল তুষার-প্রান্তরে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির চিহ্ন ছিল না। মেঘাবৃত চন্দ্রালোকে সমস্ত প্রকৃতি থমথম করিতেছিল। আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ চলিতেছিলাম, সহসা সেই নৈশ-নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া শব্দ উঠিল—কাঁক, কাঁক, কাঁক। পুঠা থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সেই শ্বেত হংসদল আবার উড়িয়া চলিয়াছে। আমরা উভয়ে ঊর্ধ্বমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর পুঠা ধীরে ধীরে অঙ্গুলি তুলিয়া আকাশের দিকে নির্দেশ করিল। আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম যে মেঘটা চন্দ্রকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা দেখিতে ঠিক রোমশ গণ্ডারের মতো। নাকের সম্মুখে ঠিক তেমনি খড়্গ, সর্বাঙ্গে তেমনি রোম। পুঠা বর্শাটা ফেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'তুমি একাই যাও, আমি আর যাইব না। অরণ্যে ঢুকিয়া প্রথম যে বড় গাছটা দেখিবে, তাহাতেই উঠিয়া পড়িবে। আমরা শিকার করিতে গেলে উহাতেই প্রথমে উঠি। কিছুদূর উঠিয়া গাছের কাণ্ডে একটা গর্ত পাইবে। সেই গর্তে বসিবার স্থান আছে। যাও, আর বিলম্ব করিও না।'

অরণ্য বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। আমি অগ্রসর হইয়া গেলাম। একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম পুঠা নতজানু হইয়া করজোড়ে আকাশের দিকে চাহিয়া আছে।

অরণ্যে প্রবেশ করিয়াই বড় গাছটি দেখিতে পাইয়াছিলাম। গাছ নয় মহীরুহ। অসংখ্য শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া বিশাল একটি বৃক্ষরূপী দুর্গ যেন ওৎ পাতিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বৃক্ষের নিম্নে সূচিভেদ্য অন্ধকার। সূচিভেদ্য কিন্তু নীরব নয়, ঝিল্লীরবে মুখরিত। আমি অন্ধকারে চুপ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর হাত বাড়াইয়া বাড়াইয়া বৃক্ষের কাণ্ডটা কোথায় খুঁজিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ খুঁজিবার পর পাওয়া গেল। বৃক্ষারোহণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কোনো শব্দ না করিয়া অতিশয় সন্তর্পণে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিলাম। কাণ্ডটি পরিধিতে বেশ বড়, দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরা যায় না। কিন্তু গাছের কাণ্ডে হাত বুলাইতে বুলাইতে কিছুক্ষণ পরে আবিষ্কার করিলাম যে, মাঝে মাঝে খাঁজ কাটা আছে। তখন পুঠার কথা মনে পড়িল। পুঠা বলিয়াছিল, 'আমরা শিকার করিতে গেলে উহাতেই প্রথমে উঠি।' মনে হইল উহারাই তাহা হইলে খাঁজ কাটিয়া রাখিয়াছে।

খাঁজে পা রাখিয়া সেই বিশাল বৃক্ষের স্কন্ধদেশে আরোহণ করিলাম। আরোহণ করিয়াই অভিভূত হইয়া পড়িলাম, কে যেন আমাকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিল। লুং। সে অনেক আগেই আসিয়া গাছে উঠিয়া বসিয়াছিল।

লুং আমার কানে কানে বলিল, 'চিৎকার করিও না। হুংজু বাহির হইয়াছে, আশেপাশে ঘুরিতেছে।' রুদ্ধশ্বাসে পাশাপাশি দুইজনে বসিয়া রহিলাম। কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি মনে নাই। শকুনের চিৎকারে ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ খুলিয়া দেখি প্রভাত হইতেছে। লুং আমার কোলের উপর বসিয়া আমার কাঁধে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই উপরের দিকে চাহিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার হৃদয়স্পন্দন থামিয়া গেল। দিক্ষু তাহার সাঙ্গোপাঙ্গদের লইয়া উপরের ডালে বসিয়া আমাদের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছে। আমার সহিত চোখাচোখি হইবামাত্র তাহার মুখে একটা পৈশাচিক হাসি ফুটিয়া উঠিল। সর্পের মতো তর্জন করিয়া চাপা কণ্ঠে সে বলিল, 'ঘৃণ্য আগন্তুক, এইবার তোকে হাতেনাতে ধরিয়াছি। বিশ্বাসঘাতককে কি করিয়া শিক্ষা দিতে হয় এইবার তোকে দেখাইব।'

সে বর্শা তুলিতেই আমি লাফাইয়া উঠিলাম। সঙ্গে সঙ্গে লুং গাছের নিচে পড়িয়া গেল। আমিও মাটিতে লাফাইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু লুং-এর দিকে ফিরিয়া চাহিবার আমার অবসর ছিল না। আমি দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া প্রাণপণে ছুটিতেছিলাম। কতক্ষণ ছুটিয়াছিলাম মনে নাই। কিন্তু কিছুক্ষণ ছুটিবার পরই দিক পরিবর্তন করিতে হইল। একটা খোলা জায়গায় আসিয়া দেখি একটা রোমশ গণ্ডার দাঁড়াইয়া আছে। সে আমাকে দেখিয়া তাড়া করিল না, সবিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমি বিপরীত দিকে ছুটিতে লাগিলাম। ছুটিতে ছুটিতে একটা ঘন ঝোপের নিচে আশ্রয় লইলাম; সেখানে কিছু আহারও জুটিয়া গেল। বিচিত্রপক্ষ একটি বন্য হংসী একটি প্রকাণ্ড নীড়ে বসিয়া ডিমে তা দিতেছিল। হংসীটিকে ধরিতে পারিলাম না, কিন্তু ডিমগুলি উদরসাৎ করিলাম। কিছুক্ষণ পরেই একটা হই হই চিৎকার উঠিল। দিক্ষুর দল চিৎকার করিতেছে। কেন করিতেছে বুঝিতে পারিলাম না। হয়তো তাহারা রোমশ গণ্ডারটাকে দেখিয়াছে, কিংবা হয়তো আমাকেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। আমি ঝোপের ভিতর দিয়া কখনও গুঁড়ি মারিয়া কখনও গিরগিটির মতো বুকে হাঁটিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যে দিক হইতে চিৎকারটা আসিতেছিল সে দিক হইতে যত দূরে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। কিছুক্ষণ পরে চিৎকারটা আর শুনিতে পাইলাম না। ঝোপের মধ্যেই চুপ করিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। দুই হাতের আঙুলগুলি ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্ত পড়িতেছিল। তাহাই চাটিয়া চাটিয়া খাইতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া থাকিয়াও যখন দিক্ষু দলের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না তখন ঝোপ হইতে সন্তর্পণে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম সম্মুখেই একটা খোলা প্রান্তর রহিয়াছে। তাহার পর আবার অরণ্য। ছুটিয়া প্রান্তরটা পার হইয়া পুনরায় অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কিছু দূর গিয়াই দেখি বিস্তীর্ণ জলরাশি। নামহীন এক সমুদ্রতটে আসিয়া পড়িয়াছি। এই সমুদ্রতটে বসিয়াই কি লুংয়ের মুখে রূঠা-পুঠা-ডিংঘাদের কাহিনী শুনিয়াছিলাম? অন্যমনস্ক হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। পরক্ষণেই মট মট করিয়া একটা শব্দ হইল। ভারী ওজনের কোনো জন্তু নিশ্চয়ই এইদিকেই আসিতেছে। জলের ধারেই একটি ছোট গাছ ছিল। তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার উপর উঠিয়া পড়িলাম। এদিকে ওদিকে চাহিতে চাহিতে সহসা দেখিতে পাইলাম, হুংজু আসিতেছে। তাহার স্কন্ধে লুং-এর মৃতদেহ। হুংজু তাহার একটা পা চিবাইতেছে। আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম এবং প্রাণপণে সাঁতারাইতে লাগিলাম। বরফ-শীতল জলে সর্বাঙ্গ অবশ হইয়া যাইতেছিল, তবু নিরস্ত হইলাম না। অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে দুর্বার দ্রুতগতিতে আগাইয়া চলিতে লাগিলাম।

।। চার ।।

তাহার পর বহু শতাব্দী কাটিয়াছে। আমি কিন্তু মরি নাই। বহু উত্থান-পতনের ভিতর দিয়া মৃত্যুহীন জীবনের অনন্ত প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে আমি বিবর্তিত হইয়াছি, কিন্তু মরি নাই। কোন্ ঘাটে কতক্ষণ ছিলাম তাহার স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। অস্পষ্টতার কুয়াশা ভেদ করিয়া যে ছবিটি মনে জাগিতেছে তাহাই বর্ণনা করিতেছি।

...বরফের বিভীষিকা আর নাই। চারিদিকে আবার শ্যামশোভা দেখা যাইতেছে। বরফ

গলিয়া বহু নদনদীর সৃষ্টি হইয়াছে। নবীন অরণ্য নবীন শ্যামলতায় নবযুগের বল্‌গা-হরিণের দলকে আকৃষ্ট করিতেছে। মাঝে মাঝে এক এক স্থানে বেশি শীত পড়ে, তখন বল্‌গা-হরিণের দল সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। বল্‌গা-হরিণই তখন আমাদের জীবনধারণের প্রধান উপায়। তাহাদের অনুসরণ করিয়া আমরাও চলি।

...সেদিন আমি এক উপল-বহুল বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া একটি কুটির অভিমুখে চলিয়াছিলাম। আমার আকৃতি ও বেশ দুই-ই পরিবর্তিত হইয়াছিল। আকৃতির ঠিক বর্ণনা দিতে পারিব না। তবে নদীর জলে নিজের যে ছায়া প্রতিফলিত দেখিতাম তাহা ঠিক ভীত চকিত বন্য জন্তুর ছবি নহে। আত্মবিশ্বাসের নিগূঢ় শক্তি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছিলাম। আত্মপ্রতিষ্ঠার মর্যাদাবোধ আমার মুখভাবে গতিভঙ্গিতে আসন্ন মনুষ্যত্বের আভাস দিতেছিল। আমি আর হিংস্রজন্তু-তাড়িত প্রকৃতি-বিপর্যস্ত অসহায় পশুমাত্র ছিলাম না। নিজের শক্তিবলে নিজের নিরাপত্তা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম এবং সে বার্তা আমার নিজের অজ্ঞাতসারে আমার সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। আমার দক্ষিণ স্কন্ধে বিলম্বিত ছিল একটি শ্বেত ভল্লুকের চর্ম, বাম স্কন্ধে ধনুক। কটিদেশে ছিল বল্‌গা-হরিণ-চর্মনির্মিত প্রশস্ত কটিবন্ধন। কটিবন্ধনের একধারে ঝুলিতেছিল একটি প্রস্তর-কৃপাণ, আর একধারে কয়েকটা তীর গোঁজা ছিল। মাথার দীর্ঘ কেশ আর অবিন্যস্ত ছিল না, লতা দিয়া ঝুঁটি বাঁধিয়াছিলাম।

...প্রভাতের অরুণাভায় যে মেঘমালা অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল একটা প্রখর বাতাসে সহসা সেগুলি ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। মনে হইল অগ্নিশিখা আকাশ ব্যাপিয়া উড়িতেছে। থানকুর কথা মনে পড়িল, বৃদ্ধা থানকুর কাছে অনেক গল্প শুনিয়াছি। থানকু বলে আদিম পৃথিবীতে মানুষ ছাড়া আর কিছু ছিল না। মানুষের মধ্যে ক্রমশ পাপ প্রবেশ করিল। সেই পাপের ফলেই পাপী মানুষেরা জন্তু-জানোয়ার-প্রস্তর-বৃক্ষে রূপান্তরিত হইয়া গেল। যাহার যেমন স্বভাব সে তাহাই হইয়াছে। হিংসুক বিশ্বাসঘাতক সর্প হইয়াছে, বীর্যশালী পাপীরা বাঘ সিংহ গণ্ডার হইয়াছে। ওই অগ্নিবর্ণ মেঘেরাও কি মানুষ ছিল একদিন? কে জানে। কিছুক্ষণ ছিন্নভিন্ন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রক্তমেঘগুলির দিকে চাহিয়া রহিলাম। প্রখর বাতাসে আমার রুক্ষ শ্মশ্রু উড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া আবার আমি চলিতে লাগিলাম। আমি চলিয়াছিলাম পাত্রীর সন্ধানে। এই স্থানেই ঘর বাঁধা যদি বিধাতার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে নারী চাই। বৃহার কন্যা জোলমাকে দেখিয়াছিলাম। তাহারই উদ্দেশ্যে এই অভিযান। তাহাকে কৌশলে চুরি করিবার জন্য যাইতেছিলাম না, বলপূর্বক হরণ করিবার জন্যও নহে, যাইতেছিলাম তাহার পিতার নিকট প্রার্থীরূপে। বিনিময়ে বৃহাকে যাহা দিব স্থির করিয়াছিলাম, তাহার লোভ বৃহা সম্বরণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হইতেছিল না। এই অপরিচিত অঞ্চলে বৃহার মতো একজন লোককে যদি আত্মীয়রূপে পাইতে পারি, আমার অনেক সুবিধা হইবে।

একদল বল্‌গা-হরিণের পিছু পিছু এই অঞ্চলে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। একা আসি নাই, আমাদের সমস্ত দলটাই আসিয়াছিল। খাদ্যের অনুসরণ করিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ানোই তখন আমাদের কাজ ছিল। বন্য ঘোড়া, বন্য মহিষ, বাইসন, হরিণ, শূকর ইহারাই ছিল আমাদের জীবনের প্রেরণা। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা যেখানে যায়, আমরাও সেখানে যাই। আমাদের দলের কয়েকজন লোক সর্বদা ইহাদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখে।

কয়েকজন শিকার করে। কেহ কেহ ফাঁদ পাতে। ইহাদের কেন্দ্র করিয়াই এইভাবে আমাদের পূর্বপুরুষেরা বল্‌গা-হরিণকে অনুসরণ করিয়া তুষারের দেশ ছাড়িয়া এ দেশে আসিয়াছিলেন। সেই জীবনধারাই অনুসরণ করিতেছি।

...আমি দল হইতে সহসা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। কয়েকদিন পূর্বে একটা ম্যামথের সন্ধান পাইয়া আমাদের দলের সকলে নদীর ওপারে গিয়া গহন বনে প্রবেশ করিয়াছিল। ম্যামথ তখন দুষ্প্রাপ্য, এবং সেই জন্য লোভনীয়। ম্যামথ শিকার করার আর একটা প্রবলতর কারণও ছিল। ম্যামথেরা বল্‌গা-হরিণের দলকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিত। কোনো বনে ম্যামথ আসিলে বল্‌গা-হরিণরা সে-বন ছাড়িয়া চলিয়া যাইত। নিজেদের স্বার্থের জন্যই ম্যামথটাকে শিকার করিয়া বল্‌গা-হরিণের রক্ষণাবেক্ষণও আমাদের পক্ষে প্রয়োজন ছিল। আমাদের যেদিন নদীর ওপারে চলিয়া যাইবার কথা, ঠিক সেইদিন ভোরে আমি একা উঠিয়া ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতেছিলাম। হঠাৎ একটা বল্‌গা-হরিণ দেখিতে পাওয়ায় তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলাম। কিছুদূর গিয়া তাহাকে মারিলাম বটে, কিন্তু একটা গর্তে পড়িয়া গিয়া পায়ে গুরুতর আঘাতও পাইলাম। অনেকক্ষণ উঠিতে পারিলাম না। তাহার পর কোনোক্রমে মৃত হরিণটাকে টানিতে টানিতে নিকটবর্তী একটা বৃক্ষকোটরে গিয়া আশ্রয় লইলাম। আমার সঙ্গীরা ভাবিয়াছিল, আমি বোধ হয় সঙ্গেই আছি। আমাদের দলে শতাধিক লোক ছিল, আমি যে তাহাদের মধ্যে নাই, ইহা সহসা আবিষ্কার করা তাহাদের পক্ষে সহজ ছিল না।

পায়ের ব্যথা সারিতে বেশ বিলম্ব হইয়া গেল। ভাগ্যে বল্‌গা-হরিণটাকে মারিতে পারিয়াছিলাম, তাহা না হইলে অনাহারেই হয়তো কাটাইতে হইত। এই কয়দিন বৃক্ষ-কোটর-বাস কিন্তু নিষ্ফল হয় নাই। এই সময়ই জোলমাকে দেখিয়াছিলাম। দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। জোলমার চোখের তারা নীল। এমন তো আর কখনও দেখি নাই।

ভাবিয়াছিলাম পায়ের ব্যথা কমিলে নদী পার হইয়া দলে গিয়া যোগদান করিব; কিন্তু পায়ের ব্যথা কমিবার পর নদীতীরে গিয়া অবাক হইয়া গেলাম। কয়েকদিন পূর্বে যে-নদী শীর্ণকায়া ছিল, সহসা তাহা দুকূল প্লাবিনী হইয়াছে। এত খরস্রোতা যে হাঁটিয়া পার হওয়া অসম্ভব। সাঁতার দিয়া হয়তো পার হইতে পারিতাম, কিন্তু নদীতরঙ্গে এক অদ্ভুত ভাষা শুনিলাম। একটা তীব্র বায়ু হু-হু করিয়া বহিতেছিল। নদীর তরঙ্গদল নাচিতেছিল, আর বলিতেছিল—না, না, না।

বহু দূরে চক্রবালনিবদ্ধ পর্বতশ্রেণীর দিকে চাহিলাম। এই নদী উহারই বুকের ভাষা, উহারই বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছে। নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে যেন ওই পর্বত-দেবতারই আদেশ শুনিলাম। শান্ত শীর্ণ নদীকে সহসা তটপ্লাবিনী উন্মাদিনী করিয়া দেবতা কিসের ইঙ্গিত করিয়াছেন? পাহাড়টার দিকে সভয়ে বহুক্ষণ নির্নিমেষে চাহিয়াছিলাম। মনে হইল পর্বত-দেবতার অমোঘ বিধান নীরব ভাষায় যেন আমার অন্তরে সঞ্চারিত হইল, 'যে দল তোমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহারা তোমার আত্মীয় নয়। তুমি এই পারেই আত্মীয় পাইবে। নূতন জীবন আরম্ভ কর, পুরাতন জীবনে আর ফিরিয়া যাইও না।'

জোলমার কথা মনে পড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল—আর ফিরিয়া যাইব না? পিকি, বনটু, বোহিলা, ঘুনু, জামাইকিনা, দোস্কি প্রভৃতি বহু রমণীকে লইয়া যে সংসার পাতিয়াছিলাম, সেখানে আর ফিরিব না? সহসা মনে হইল, পিকি, বনটু, বোহিলা, জামাইকিনা, দোস্কিরা আমার

একার নয়। বহু পুরুষের সঙ্গে তাহাদের সংশ্রব। জোলমার সঙ্গে তো কোনো পুরুষকে দেখিলাম না। এ অঞ্চলে পুরুষই বেশি দেখিতেছি না। তবে কি জোলমা আমার একারই হইবে? যদিও এ-চিন্তা সে যুগে কল্পনাতীত ছিল, তবু ক্ষণিকের জন্যও এই সম্ভাবনাটা চিত্তকে পুলকিত করিয়া তুলিল। বিমূঢ় স্তম্ভিত হইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে শুনিতে লাগিলাম—না, না, না, না। দেবতারও কি ইহাই অভিপ্রায়? অন্তরের বিচিত্র বাসনা যেন বাঙ্ময় হইয়া আমার কানে কানে বলিতে লাগিল—নিশ্চয় তাই। তাহা না হইলে আমার অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবনের মধ্যে এই দুরতিক্রম্য বাধা কে সৃজন করিল? কেন সৃজন করিল? মনে পড়িল ইক্‌ঘার স্বপ্ন-বিধান অগ্রাহ্য করিয়া গোপনে মাতৃ-কুলজাত নিন্‌কির প্রণয়াসক্ত হইয়াছিলাম, তাহার গর্ভে একটি সন্তানও হইয়াছিল, কিন্তু ইহার পরিণাম যাহা ঘটিয়াছিল। তাহা অতি ভয়ানক। ঝড়ে গাছ পড়িয়া আমার দশটি সন্তান নিহত হইল, নিন্‌কিকে বাঘে খাইল, আমি নিজেও ভয়াবহ পীড়ায় আক্রান্ত হইলাম। নিদারুণ মারী-গুটিকায় সর্বাঙ্গ ভরিয়া গেল। বহুকাল শয্যাগত থাকিয়া ওই ইক্‌ঘার উদ্দেশ্যে বহু অর্ঘ্য উপহার দিয়া কোনোক্রমে আবার প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছি, ইক্‌ঘার কাছে শপথ করিয়াছি আর কখনও দেবতার বিধান অগ্রাহ্য করিব না। পর্বতের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। মূর্তিমান গাম্ভীর্য। নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে বাজিতেছে— না, না, না, না।

...ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। স্থির করিয়া ফেলিলাম দেবতার বিধান অগ্রাহ্য করিব না, করিবার উপায়ও ছিল না। আবার হঠাৎ জোলমাকে দেখিলাম। বনের মধ্যে একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সে যে অবস্থায় ছিল তাহাতে অনায়াসে তাহার উপর বলাৎকার করিতে পারিতাম। কিন্তু বলাৎকার করিবার সাহস ছিল না। ভয় জোলমাকে কিংবা জোলমার পরিবারবর্গকে নয়, ভয় নিজের মধ্যেই ছিল। জ্ঞান হইয়া অবধি কিংবদন্তী শুনিয়াছি, পুরাকালে প্রবল পরাক্রান্ত দলপতি বিহাড়া শবরী ওকাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া সবংশে নিহত হইয়াছিল। শবরী ওকার মাথার প্রত্যেকটি চুল নাকি নাগিনীতে রূপান্তরিত হইয়া বিহাড়া বংশের প্রত্যেককে দংশন করিয়াছিল। প্রত্যেকটি অশ্রুবিন্দু নাকি অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিণত হইয়া ছারখার করিয়াছিল তাহার রাজ্যকে। সেই অশ্রু-স্ফুলিঙ্গগুলি আজও আকাশের লক্ষ লক্ষ তারায় জাগিয়া আছে। লক্ষ চক্ষু মেলিয়া দেখিতেছে কোথাও কেহ কাহাকেও বলাৎকার করিতেছে কি না। করিলেই আকাশ হইতে তাহার মাথায় বজ্র পড়িবে। নাগিনীরাও লুকাইয়া আছে, পৃথিবীর গর্তে গর্তে তীক্ষ্ণ দন্তাগ্রে মৃত্যুদণ্ড বহন করিযা। ধর্ষণকাবী নিস্তাব পাইবে না। শবরী ওকা সতর্ক দৃষ্টিতে প্রত্যেক নারনারীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে।

না, বলাৎকার করিবার সাহস আর ছিল না। তাহার দ্বারে গিয়া প্রার্থী হইতে হইবে। বৃহার পরিচিত বিতং আমাকে এই পরামর্শ দিয়াছিল। বনে ঘুরিতে ঘুরিতে বিতং নামক অদ্ভুত যুবকটির সহিত দেখা হইয়াছিল। বল্‌গা-হরিণের ডাক শুনিয়া গিয়া দেখি বিতং ডাকিতেছে। তাহার গায়ে হরিণের রঙ, মাথায় হরিণের শিং বাঁধা। সে আমাকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল, 'শেষ হরিণটিকে তুমিই বোধহয় মারিয়া ফেলিয়াছ। এ বনে আর হরিণ নাই। থাকিলে নিশ্চয় আসিত।'

তাহার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। 'আমি হরিণ মারিয়াছি তুমি কি করিয়া জানিলে?'

'আমি দেখিয়াছি যে। শ্যেনপক্ষী সম্প্রদায়ের হইয়া আমিই তো এ বনে বল্‌গা-হরিণদের

গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করি। আমাদের এলাকায় যখন হরিণদের দল ঢোকে আমি বৃহ্যাকে গিয়া খবর দিই।'

'বৃহ্য আমাদের যাদুকর। সে হরিণের ছবি আঁকে, সেই ছবির কানে কানে কি সব বলে। অদ্ভুত লোক সে। বৃহাকে চেন না? তাহার মেয়ে জোলমাকে নিশ্চয়ই দেখিয়াছ, নীল চোখ—'

'দেখিয়াছি।'

'তাহারই বাবা বৃহ্য। বৃহ্য অসাধারণ লোক। সে বীর, সে যাদুকর, সে ছবি আঁকে। জোলমার মা মারা যাইবার পর সে আর দ্বিতীয় কোনো স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসে নাই। জোলমার মা-ও অদ্ভুত লোক ছিল। এদেশের মেয়ে ছিল না সে। বহুকাল পূর্বে একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়িতে চড়িয়া ভাসিতে ভাসিতে সে কোথা হইতে আসিয়াছিল, তাহা কেহ জানে না।'

এই কথা বলিয়া একটু মুচকি হাসিয়া বিতং হাতের ও পায়ের সাহায্যে হরিণের মতো তুড়ুক তুড়ুক করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। আমি তাহাকে ডাকিলাম।

'শোন। বৃহ্য কোথায় থাকে, তাহার সহিত আলাপ করিতে চাই। আমি বিদেশি—'

তুড়ুক করিয়া বিতং ঘুরিয়া বসিল এবং আমার মুখের দিকে মিটমিট করিয়া চাহিতে লাগিল। তাহার পর হাসিয়া বলিল, 'সুবিধা হইবে না, সে বড় শক্ত ঠাঁই—'

'কেন?'

'জোলমাকে বিবাহ করিতে চাও তো? তাহা সহজে হইবার নয়। বীরত্বের এবং শক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে বৃহ্য জোলমাকে দিবে না। আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম, পারি নাই।'

'বৃহ্য তোমাকে কি করিতে বলিয়াছিল?'

'জোলমার মা যে গাছের গুঁড়িতে চড়িয়া ভাসিতে ভাসিতে আসিয়াছিল, বৃহ্য সে গুঁড়িটিকে নিজের গুহার সম্মুখে দুইটি প্রকাণ্ড পাথরের উপর সযত্নে রাখিয়া দিয়াছে। তাহাতে সে নানা রকম রঙ মাখায়। কখনও লাল, কখনও কালো, কখনও হলুদ. কখনও নানা রঙের সমন্বয়। আমাকে সেই গুঁড়িটা পিঠে করিয়া তুলিতে বলিয়াছিল। আমি পারি নাই।'

বিতং হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

'তোমাকে এমনভাবে সাজাইয়াছে কে?'

'বৃহ্য। আমি হরিণ সাজিয়া বনে বনে হরিণের সন্ধানে ভ্রমণ করি। আমার ডাকে হরিণেরা সাড়া দেয়। তখন আমি ডাকিতে ডাকিতে আমাদের এলাকার দিকে চলিতে থাকি, হরিণের দলও আমার পিছু পিছু আসিয়া লাফাইয়া পাহাড়ে চড়ে, তখন আমরা তাহাদের তাড়া দিই।'

'এটা কাহাদের এলাকা?'

'এটা সকলের। তোমাদের এলাকা এবং আমাদের এলাকার মধ্যে এই যে বন এটা সকলের। ইহাতে সকলেই শিকার করিতে পারে।'

'আমরা যদি তোমাদের এলাকায় ঢুকিয়া শিকার করি—'

'তাহা কেন করিতে যাইবে! তোমাদের এলাকাতেই তো যথেষ্ট শিকার আছে।'

বিতংয়ের চোখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'কিন্তু যদি কেউ চুরি করিয়া করে!'

'চোরের শাস্তি মৃত্যু।'

মুচকি হাসিয়া বিতং আর একবার হরিণের ডাক ডাকিয়া বনে অদৃশ্য হইবার উপক্রম করিতেছিল। আমি আবার তাহাকে বাধা দিলাম।

'আমি তোমাদের এলাকায় বাস করিতে চাই, কারণ আমার দলের লোকেরা আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমি তোমাদের সঙ্গে থাকিতে চাই।'

'তাহা হইলে বৃহার সহিত দেখা কর। বৃহার মা গৌ যদি তোমাকে মনোনীত করে, বৃহা আপত্তি করিবে না।'

'বৃহা থাকে কোথায়?'

'অরণ্যের প্রান্তে একটা কুটির দেখিবে, তাহাই বৃহার আস্তানা। বৃহা থাকে একটা গুহার মধ্যে, ওই কুটিরটা গুহা-প্রবেশের পথ মাত্র। সাবধানে যাইও, বৃহার কুকুরটা ভীষণ রাগী।'

'বৃহা কিসে সন্তুষ্ট হয় বল তো?'

'তুমি ছবি আঁকিতে পার?'

'পারি। এই দেখ, আমার এই প্রস্তর-কুঠারের হাতল আমি প্রস্তুত করিয়াছি।'

বিতং তুড়ুক করিয়া লাফাইয়া কাছে আসিল এবং আমার প্রস্তর-কুঠারটা দেখিতে লাগিল।

'হরিণের শিং দিয়া করিয়াছ?'

'হ্যাঁ।'

'ইহার উপর হরিণের মুখটি তুমিই খুদিয়াছ?'

'হ্যাঁ।'

'এইটাই গিয়া বৃহাকে উপহার দিও, সে খুশি হইবে। আর গল্প করিব না, যাই।'

বিতং বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

...উপল-বন্ধুর পথ অতিক্রম করিতে করিতে একটা কথা মনে হওয়াতে একটু সান্ত্বনা পাইলাম। জোলমা এবং আমি ভিন্ন-কুলজাত। ইহারা সকলেই শ্যেনপক্ষী। যদিও জোলমার বাহুমূলে শ্যেন পক্ষীর চিহ্ন দেখিতে পাই নাই, কিন্তু উড্ডীয়মান একটা শ্যেনপক্ষীকে দেখিয়া জোলমা শুইয়া পড়িয়াছিল তাহা দেখিয়াছি। আমি ব্যাঘ্রবংশীয়, আমার অতি-অতি-বৃদ্ধ-মাতামহী ব্যাঘ্রকেই আমাদের কুলদেবতা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং জোলমার সহিত আমার বিবাহের কোনো বাধা নাই। এই সুখদায়ক চিন্তাটি মনে মনে রোমন্থন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

কাছাকাছি আসিয়া মুখ তুলিয়া দেখিলাম বৃহার কুটির হইতে ধূমরেখা আঁকিয়া-বাঁকিয়া নির্গত হইতেছে। মানুষ যে এই অঞ্চলে নিজ নিজ এলাকা চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে, এই খবরটাও ধূমের মতো আমার অন্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আমি এখন যে মাটিতে পদার্পণ করিয়াছি, তাহা যে আমার নয়, অপরের, এই ধারণাটা বড়ই অদ্ভুত মনে হইতেছিল। বৃহার কুটিরোদগত ধূমরেখার দিকে চাহিয়া নিস্পন্দ হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। সহসা আনন্দে আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। সর্পাকৃতি ধূমরেখা দক্ষিণ দিকে চলিয়াছে। থানকু বলে ইহা অতি শুভ লক্ষণ। দক্ষিণগামী সর্প মঙ্গল সূচনা করে। এ বিষয়ে যে গল্প শুনিয়াছি তাহা মনে পড়িল। সোৎসাহে পুনরায় অগ্রসর হইলাম। কিছু দূর গিয়াই কিন্তু আমাকে বর্শা উদ্যত করিতে হইল। বৃহার ভীষণাকৃতি কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করিয়া ছুটিয়া আসিল। কুকুরটা বাঁধা ছিল, বেশি দূর আগাইয়া আসিতে পারিল না। এ রকম কুকুর পূর্বে

কখনও দেখি নাই। কান দুইটা নেকড়ে বাঘের মতো। গায়ে ভালুকের মতো লোম। তাহার বন্ধন-রজ্জুটাও অদ্ভুত ধরনের। প্রকাণ্ড একটা কাঠের এক দিকে চামড়ার একটা ফিতা, সেটি কুকুরটির গলায় বাঁধা আছে, অন্য দিকে বাঁধা আছে প্রকাণ্ড একটা পাথর। কুকুরের ডাক শুনিয়াই বৃহা বাহির হইয়া আসিল। তাহার হস্তেও প্রস্তরের একটি বর্শা। আমি বর্শা উদ্যত করিয়াছিলাম বলিয়া সে-ও বর্শা উদ্যত করিল। আমি বর্শা নামাইয়া লইলাম, সে-ও নামাইয়া লইল। কিন্তু তাহার দৃষ্টি দিয়া যাহা ক্ষরিত হইয়াছিল, তাহা আশ্বাসজনক নহে। সে দৃষ্টি রোষদীপ্ত।

বৃহার হাতে বর্শা ছিল বলিয়া যে আমি দমিয়া গিয়াছিলাম তাহা নয়। সে যুগে বিনা অস্ত্রে ঘর হইতে কেহ বাহির হইত না। আমি মানুষ না হইয়া কোনো হিংস্র জন্তুও হইতে পারিতাম। সে যুগে হিংস্র জন্তুরাও মানুষের মতোই গুহা খুঁজিয়া বেড়াইত আশ্রয় পাইবার আশায়। জন্তুরাই ছিল আদিম গুহাবাসী। মানুষ তাহাদের গুহাচ্যুত করিয়া নিজেরা সেই গুহায় প্রবেশ করিয়াছিল। গুহাহীন জন্তুরা তাহাদের গুহা পুনরায় অধিকার করিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিত। কিন্তু অগ্নি আবিষ্কারক মানুষ, প্রস্তরায়ুধে বলীয়ান মানুষ, তাহাদের ঠেকাইয়া রাখিত নিজের নবার্জিত শক্তিবলে। বৃহা দেখিতেছি পশুকেও নিজের পাহারার কাজে লাগাইয়াছে। শত্রু বন্ধু হইয়াছে। জন্তু-জানোয়ারেরাই সেকালে ছিল আমাদের জীবনের প্রধান প্রেরণা। একদল ছিল শত্রু, একদল মিত্র। উভয় দলই আমাদের জীবনের ধর্মেকর্মে উপাদান জোগাইত। তাহাদের আমরা যে কেবল বধই করিতাম তাহা নয়, পূজাও করিতাম, বংশের প্রতীকও করিতাম, শুধু পশু কেন, গাছ, পাথর কিছুই আমাদের কাছে তুচ্ছ ছিল না। সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিকে কেন্দ্র করিয়াই আমরা সে যুগে সমাজ পত্তন করিয়াছিলাম, ধর্মের পত্তন করিয়াছিলাম, রূপকথা রচনা করিয়াছিলাম। হিংস্র ব্যাঘ্র সিংহ ম্যামথ হিপোপটেমাসরাই আমাদের অস্ত্র নির্মাণে প্রবুদ্ধ করিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমাদের বিজ্ঞানী করিয়া তুলিতেছিল, উহাদের মধ্যেই আমরা অজ্ঞাত প্রবল শক্তির প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া অপ্রত্যক্ষ লোকের আভাস পাইতেছিলাম, উহারাই আমাদের রূপকথায় দৈত্য-দানবে রূপান্তরিত হইতেছিল। প্রাণী মাত্রেই তখন আমাদের কৌতূহলী মনকে নাড়া দিত। প্রাণী সম্বন্ধে সুতরাং আমরা সর্বদাই সচেতন থাকিতাম। প্রতি জন্তুর সঞ্চরণ শব্দ, সঞ্চরণ পথ, কণ্ঠস্বর, গায়ের গন্ধ আমাদের সুবিদিত ছিল। এ বিষয়ে যাহার জ্ঞান যত গভীরে সে-ই তত শ্রদ্ধাস্পদ ছিল সে যুগে। সে-ই হইত দলের নেতা, সে-ই হইত পুরোহিত, সে-ই হইত চিকিৎসক। ইক্‌ঘার অদ্ভুত শক্তি ছিল। সে মেঘের দিকে চাহিয়া বলিয়া দিতে পারিত এইবার হাঁসের দল উড়িয়া আসিবে। বাতাসের গন্ধ শুঁকিয়া বলিতে পারিত বন্য মহিষের দল আসিয়াছে কি না। মানুষও মানুষের কম শত্রু ছিল না সেকালে। যদিও আমরা সমাজের পত্তন করিয়াছিলাম, কিন্তু সমাজের বাহিরের যে কোনো লোককে সন্দেহের চক্ষে দেখিতাম। বন্ধুত্বের অকাট্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাহাকে শত্রু মনে করিতাম। সেকালে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ এত বেশি রকম আত্মকেন্দ্রিক ছিল যে, সে সমাজটাকে এক-দেহ বলিলে একটুও অত্যুক্তি হইবে না। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে রক্তসম্পর্কে সম্পৃক্ত ছিল। এক বা একাধিক নারীর সন্তান-সন্ততিরাই এক একটি সমাজগোষ্ঠী গড়িয়া তুলিত। রক্তের সম্পর্ককেই আমরা আত্মীয়তার একমাত্র বন্ধন বলিয়া স্বীকার করিতাম। বাকি সব ছিল শত্রু।

সুতরাং বৃহা যে বর্শা হাতে করিয়া বাহির হইয়াছিল, তাহাতে আমি বিস্মিত হই নাই। ইহাই প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। সহসা বৃহা পর্বত প্রকম্পিত করিয়া গর্জন করিয়া উঠিল, 'কে তুমি, কি চাও, অবিলম্বে নিজের পরিচয় দাও, তাহা না হইলে—'

আবার সে বর্শা উত্তোলন করিল। তাহার কপালে মুখে বুকে বহু বর্ণের চিত্র অঙ্কিত। আমি সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম। আকাশের পটভূমিকায় তাহার বিশাল দেহ, শ্মশ্রুগুম্ফাচ্ছন্ন প্রকাণ্ড মুখ, জটাসম্বদ্ধ বিরাট মাথা দেখিয়া সত্যই আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তাড়াতাড়ি কটিবন্ধ হইতে প্রস্তর-কুঠারটি খুলিয়া তাহার পাদমূলে ছুঁড়িয়া দিলাম এবং বর্শা সন্নত করিয়া তাহার আনুগত্য-স্বীকার করিলাম। তাহার পর একপায়ে দাঁড়াইয়া দুই হাত আকাশের দিকে তুলিয়া রহিলাম। সেকালে ইহাই আমাদের আত্মসমর্পণের ভঙ্গি ছিল। বৃহা খানিকক্ষণ নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিল, তাহার পর আমার দিকে একটু আগাইয়া আসিল, আমিও খানিকটা আগাইয়া গেলাম। বৃহা বুঝিয়াছিল যে, শত্রুতা সাধন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। সে আমার দিকে আর একটু অগ্রসর হইল, আমিও হইলাম। এইভাবে যখন পরস্পরের নিকটবর্তী হইয়া গেলাম, তখন আমি আমার গাত্রাবরণ ভল্লুকচর্মের অন্তরাল হইতে মৃত একটি শশক বাহির করিয়া তাহার পদপ্রান্ত রাখিলাম। শশকটি পূর্বদিন শিকার করিয়াছিলাম এবং বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম। সহসা চাহিয়া দেখি গুহার ভিতর হইতে এক পলিতকেশা বৃদ্ধা আমার দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছে। আমার সহিত চোখাচোখি হইবামাত্র সে মুণ্ডটা ভিতরে টানিয়া লইল। কুকুরটা ক্রমাগত ডাকিতেছিল। জোলমা বাহিরে আসিয়া তাহাকে গুহার ভিতরে লইয়া চলিয়া গেল। আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিল না। কুকুরটা দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইয়াছিলাম। কুকুরকে ভীষণ বন্য জন্তু হিসাবেই এতকাল দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা যে পোষা যায় এই প্রথম দেখিলাম। একটা কথা মনে পড়াতে একটু ভয়-ভয়ও করিতে লাগিল। মনে হইল, জোলমা কোনো মায়াবিনী নয় তো! থানকুর কাছে গল্প শুনিয়াছিলাম, জিলাং পাহাড়ের তুষারাবৃত অন্ধকার গুহায় পিপি নামে এক মায়াবিনী বাস করে। মন্ত্রবলে মানুষকে জন্তুতে পরিণত করিবার শক্তি তাহার আছে। গভীর জঙ্গলে যে সব নর-ভুক মানুষ বাস করে, পিপি নাকি তাহাদের নেত্রী। মানুষের মাংস যখন ভাল লাগে না তখন সে মানুষকে নিজের অভিরুচি অনুসারে অন্য জন্তুতে পরিবর্তিত করিয়া লয়। তাহার পর তাহাকে মারিয়া খায়। তাহার অনুচরেরা মানুষ ধরিয়া তাহাকে দেয়, সে তাহাকে কখনও শূকর, কখনও হরিণ, কখনও সজারু, কখনও শশক—যখন যে জন্তুতে খুশি রূপান্তরিত করিয়া খায়, একবার নাকি লোভে পড়িয়া একটা মানুষকে ম্যামথে পরিণত করিয়া বিপদে পড়িয়াছিল। ম্যামথটাকে সামলাইতে পারে নাই। জিলাং পর্বতের তুষারাবৃত অঞ্চলে সেই দুর্দান্ত ম্যামথটা নাকি এখনও চতুর্দিক তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে। একজন মানুষকে বিষধর সর্পে রূপান্তরিত করিয়া সে নাকি বিপক্ষ দলের নেত্রী সিংনাকের গুহায় ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছিল। পিপি মায়াবিনীর অনেক গল্প থানকুর কাছে শুনিয়াছি। জোলমা সেই রকম মায়াবিনী নয় তো?

'টাহা, টাহা, টাহা—'

বৃহার কণ্ঠস্বরে আমার চিন্তাধারা ব্যাহত হইল। দেখিলাম গুহা হইতে একটি পুরুষ বাহির হইয়া আসিয়াছে। তাহারও সর্বাঙ্গে লাল ও হলুদ রঙের চিত্রবিচিত্র করা। বৃহা অঙ্গুলি সঙ্কেতে মৃত শশকটা দেখাইয়া দিতেই টাহা সেটা লইয়া গুহার ভিতরে চলিয়া গেল।

বৃহা তখন আমার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, 'তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ, কেনই বা আসিয়াছ?'

নিজের পরিচয় দিলাম এবং কি করিয়া যে দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি, তাহাও বলিলাম।

'আমার কাছে তোমার কি প্রয়োজন?'

'পর্বতের আদেশে আমি আমার পুরাতন সমাজে আর ফিরিতে পারিব না। আমাকে এই অঞ্চলেই থাকিতে হইবে। তাই তোমার কাছে সাহায্যের জন্য আসিয়াছি। আমাকে আশ্রয় দাও—'

'পর্বতের আদেশ তুমি শুনিয়াছ?'

'নদীর জলে যাহা শুনিলাম, তাহা পর্বতের আদেশ বলিয়াই মনে হইল। ইহার অন্য কোনো অর্থ সম্ভব কি না জানি না।'

বৃহা আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মনে হইল আমার মধ্যে সে যেন অসাধাবণ কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছে। তাহার পর গুহার দিকে চাহিয়া ডাকিল, 'গৌ গৌ—'

সেই পলিতকেশা বৃদ্ধা বাহির হইয়া আসিল। বৃহা তখন আমার পরিচয় দিয়া প্রশ্ন করিল, 'এ যাহা বলিতেছে তাহা সত্য কি না?'

গৌ নির্নিমেষে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর কয়েকবার মাথা নাড়িল। তাহার পর ধীরে ধীরে আবার গুহার ভিতরে ঢুকিয়া গেল। কোনো কথা বলিল না।

বৃহা আমাকে প্রশ্ন করিল. 'আমার কি সাহায্য তুমি চাও?'

প্রথমেই জোলমার কথা বলাটা সমীচীন মনে হইল না। বলিলাম, 'বাস করিবার জন্য আমার একটা স্থান চাই। গুহা হইলেই ভাল হয়।'

'অনুসন্ধান করিলে গুহা পাওয়া যাইবে। জিকাটু পাহাড়ে একটা ভাল গুহা আছে শুনিয়াছি। টাহা জানে। গৌ কি বলে আগে শোনা যাক।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গৌ গুহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার হাতে একটি তিত্তির পক্ষী রহিয়াছে দেখিলাম। তাহার পর বাহির হইয়া আসিল টাহা, তাহার হাতে একটা জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড, টাহার পিছনে পিছনে আসিল জোলমা, তাহার হাতে একটা চামড়াব উপর কিছু শুষ্ক পত্র।

জোলমা পত্রগুলি একস্থানে স্তূপীকৃত করিয়া ঢালিয়া দিল। টাহা জ্বলন্ত কাঠের সাহায্যে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল। আগুনের শিখা লেলিহান হইয়া উঠিবামাত্র গৌ তিত্তিরের মুণ্ডটা মুচড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং মুণ্ডটাকে আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া কবন্ধটাকে জোলমার হাতে দিল। জোলমা সেটাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের উপর ধরিয়া রহিল। আমি অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম। জ্বলন্ত শিখার উপর ফিনকি দিয়া রক্ত পড়িতেই অগ্নিকুণ্ড হইতে কৃষ্ণ সর্পিল ধূমরেখা উঠিতে লাগিল। দগ্ধ রক্তের গন্ধে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দেখিলাম পলিতকেশা গৌ ধূমরেখার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে এবং বিড়বিড় করিয়া কি যেন আওড়াইতেছে। যতক্ষণ রক্ত পড়িল ততক্ষণ জোলমা ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গিতে প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। আমি রুদ্ধশ্বাসে জোলমার দিকে চাহিয়া ছিলাম। সমস্ত প্রকৃতিই যেন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিতেছিল। হঠাৎ গৌ সামনের মাটিতে দুই হাত রাখিয়া তিত্তিরের মতো

ডাকিয়া উঠিল। সেই ডাকে চতুর্দিক সচকিত হইয়া উঠিল যেন। জোলমা তিত্তিরের কবন্ধটা ফেলিয়া দিয়া গুহার মধ্যে চলিয়া গেল। বৃহা এবং টাহা চতুর্দিকে ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, মনে হইল কি যেন একটা খুঁজিতেছে, গৌ তারস্বরে তিত্তিরের ডাক ডাকিয়া যাইতে লাগিল। আমি যে কি করিব ভাবিয়া পাইলাম না। মনে হইল আকাশে বাতাসে অস্বস্তিকর কি যেন সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে। এক একবার মনে হইতে লাগিল ছুটিয়া পালাই। কিন্তু আমার পা দুইটি যেন মাটিতে পুঁতিয়া গিয়াছিল, চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম।

সহসা বৃহার চিৎকারে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম মাটির উপর উবু হইয়া বসিয়া বৃহা এবং টাহা কি যেন দেখিতেছে। বৃহার মুখমণ্ডল•গম্ভীর। গৌ তিত্তিবের ডাক থামাইয়া হামাগুড়ি দিয়া বৃহার দিকে আগাইয়া গেল। জোলমাও গুহার ভিতব হইতে বাহির হইয়া আসিল। আমিও গেলাম। গিয়া দেখিলাম, তিত্তিরের ছিন্ন মুণ্ডটি একটি পাথবের ফাঁকে পড়িয়া আছে। গৌ তাহা দেখিয়া হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। মুণ্ডটি কাত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার একটি চোখ আকাশের দিকে। বৃহা উঠিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিল। টাহাও করিল। টাহা বৃহার অনুজ। বৃহার প্রতিটি কর্মের অনুকরণ করাই তাহার কাজ। পলিতকেশা গৌ ইহাদের মা। আমি লক্ষ্য করিলাম গৌ নির্নিমেষে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছে, তাহার দৃষ্টি হইতে প্রসন্নতা ক্ষরিত হইতেছে। বুঝিলাম ইহারা সকলেই আমার উপর প্রসন্ন হইয়াছে। আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। দগ্ধ তিত্তির-রক্তের ধূমরেখার মধ্যে, তিত্তিরমুণ্ডের আকাশমুখী দৃষ্টিতে শুভলক্ষণ সূচিত হইয়াছে। আমাকে বন্ধুরূপে স্বীকার করিয়া লইতে বৃহা পরিবারের আর আপত্তির কারণ নাই। বৃহা আমাকে সাদরে গুহার ভিতরে লইয়া গেল। আমি যে শশক মাংস আনিয়াছিলাম, জোলমা তাহা তাড়াতাড়ি প্রস্তুত করিতে লাগিল। বৃহা বলিল কিছু মৃগমাংস এবং কন্দও যেন আমাকে•দেওয়া হয়। জোলমা মাথা নাড়িয়া সে কথার সমর্থন করিল এবং অতিথি সৎকারে তৎপর হইয়া উঠিল।

... জোলমাকে ভাল করিয়া দেখিলাম। জোলমাও আমার দিকে অপাঙ্গে একবাব চাহিয়া দেখিল। কিন্তু একবার মাত্র, দ্বিতীয়বার আর দেখিল না, আমার সম্বন্ধে কোনো কৌতূহলও তাহার ব্যবহারে আর প্রকাশ পাইল না। কিন্তু আমি অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিলাম আমার মনের নিগূঢ় বার্তা তাহার মনেও পৌঁছিয়াছে। কেমন করিয়া করিলাম, তাহা বলিতে পারিব না, কিন্তু করিলাম এবং জোলমার আচরণে কোনো প্রতিবাদ লক্ষ্য না করিয়া আনন্দিত হইলাম। তাহার আপাত-ঔদাসীন্য আমাকে যেন আমন্ত্রণ জানাইল।

আহার করিতে করিতে বৃহার গুহা এবং গুহার পারিপার্শ্বিক দৃশ্য লক্ষ্য করিতেছিলাম। প্রকাণ্ড লম্বা গুহা। সমস্তটা দেখা যায় না। গুহায় ঢুকিয়াই দেখিলাম প্রশস্ত অগ্নিকুণ্ড, তাহার পাশেই গোলাকৃতি একটি বড় প্রস্তরখণ্ড। তাহার উপরেই খাবার রাখিয়া আমরা সকলে আহার করিতেছিলাম। আরও ভিতরের দিকে ভস্মপূর্ণ কয়েকটি লম্বা লম্বা গর্ত ছিল। গর্তের কাছে চর্মাবরণ দেখিয়া অনুমান করিলাম উহাই সম্ভবত ইহাদের বিছানা। আমরাও আমাদের গুহায় ওইরূপ শয্যাতেই শয়ন করিতাম। গুহার দেওয়ালে দেখিলাম বৃহা এবং টাহার অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত আছে। দেওয়ালের আর এক দিকে প্রকাণ্ড একটা বল্‌গা-হরিণের ছবি। ছোট ছবি নয়, দেওয়াল জোড়া বিরাট ছবি। একটা বল্‌গা-হরিণ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতেছে, তাহার পিঠে

একটা তীর বিঁধিয়া আছে। বৃহার ক্ষমতায় সত্যই আমি চমৎকৃত হইয়া গেলাম। তাহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা স্বতই অন্তরে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। আড়চোখে তাহার দিকে একবার চাহিলাম। দেখিলাম অন্যমনস্ক হইয়া সে শশকের মাংস খাইয়া চলিয়াছে। জোলমা তাহার কানে কানে আসিয়া কি যেন বলিল। বলিতেই তাহার যেন হুঁশ হইল, শশকের সরু সরু হাড়গুলি না চিবাইয়া চুষিয়া চুষিয়া একধারে সরাইয়া রাখিল। আমাকেও সসম্ভ্রমে অনুরোধ করিল আমিও যেন হাড়গুলি না চিবাইয়া ফেলি, জোলমা উহা দিয়া ছুঁচ প্রস্তুত করিবে। আমাকে কথাগুলি বলিয়াই আবার সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, টাহা অগ্রেই সরু সরু হাড়গুলি পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। বৃহা অন্যমনস্ক হইয়াই আহার শেষ করিল এবং হঠাৎ উঠিয়া গেল। গৌ পূর্বেই গর্তের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং টাহা ছাড়া আমার কাছাকাছি আর কেহ রহিল না। কারণ বৃহার সঙ্গে সঙ্গে জোলমাও তাহার অনুসরণ করিয়াছিল।

টাহাকে প্রশ্ন করিলাম, 'বৃহা কোথায় গেল?'

'ছবি আঁকিতে।'

'জোলমা?'

'জোলমা আলো ধরিতে গেল।'

ব্যাপারটা যে আমি মোটেই বুঝিতে পারিতেছি না, তাহা বোধ হয় আমার চোখের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ টাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমাদের অঞ্চলে কি গুহায় কেহ ছবি আঁকে না?'

'না।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া টাহা বলিল, 'আমাদের এদেশেও কেহ আঁকিত না। জোলমার মায়ের নিকট হইতে বৃহা শিখিযাছে। বৃহা যেখানে ছবি আঁকে সেখানে গাঢ় অন্ধকার, সেই জন্য জোলমা সেখানে আলো ধরিয়া থাকে। ইহার জন্য জোলমা একটা গর্ত-করা পাথবের সাহায্যে আলোর ব্যবস্থা করিয়াছে।'

'কি রকম?'

'একটা গর্ত-করা পাথরে সে চর্বি ভরিয়া রাখে এবং সেই চর্বিতে শুষ্ক শ্যাওলা গুঁজিয়া দেয়। শ্যাওলাটা জ্বালাইয়া দিলে অনেকক্ষণ জ্বলে। আলো হয়।'

আমার কৌতূহল হইল।

'চল, গিয়া দেখি।'

'ছবি আঁকিবার সময় বৃহা জোলমা ছাড়া আর কাহাকেও কাছে থাকিতে দেয় না। সম্প্রতি এই বনে বন্য মহিষ এবং বন্য ঘোড়ার দল আসিয়াছে, বৃহা তাহাদেরই ছবি আঁকিতে ব্যস্ত আছে।'

'ছবি আঁকিয়া কি সুবিধা হইবে?'

'যদি ঠিকমতো ছবি আঁকিয়া বৃহা সেই ছবি ঠিকভাবে মন্ত্রপূত করিতে পারে, আমরা সহজে সেগুলি শিকার করিতে পারিব।'

'বল কি?'

'এখানে যখন বসবাস করিবে বলিতেছ স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে'—একটু চুপ করিয়া

থাকিয়া টাহা পুনরায় বলিল, 'তুমি বৃহাকে যে কুঠারটি উপহার দিয়াছ, তাহার হাতলে যে হরিণের মুখটি আঁকা আছে, তাহা কি তুমিই আঁকিয়াছ?'

'হ্যাঁ, আমাদের অঞ্চলে অস্ত্রের হাতলে অনেকেই ছবি আঁকিতে পাবে, দেওয়ালে কেহ আঁকে না।'

'আমাকে শিখাইয়া দিবে?'

'চেষ্টা করিব। খুব ধারাল ছোট পাথরের ছুরি দরকার।'

'আমার আছে একটা। দেখিবে?'

টাহার কণ্ঠস্বরে অকৃত্রিম আগ্রহ ফুটিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া দেওয়াল হইতে একটি প্রস্তর-ছুরিকা আনিয়া আমাকে দেখাইল।

'চমৎকার ছুরি, ইহাতেই হইবে। আমার থাকিবার একটা গুহা ঠিক করিয়া দাও, তাহার পর তোমাকে শিখাইয়া দিব।'

'বেশ, কালই তোমাকে জিকাটু পাহাড়ের দিকে লইয়া যাইব। সেখানে ভাল ভাল গুহা আছে শুনিয়াছি। কিন্তু স্থানটা বড় নির্জন, কেহই ও অঞ্চলে যাইতে চাহে না। এমন কি জন্তু-জানোয়ার পর্যন্ত না। আমিও কোনো দিন যাই নাই, কাল সকালে তোমাকে স্থানটা দেখাইয়া দিব।'

'বেশ, এখন চল, তোমাদের গুহার চারিপাশটা ঘুরিয়া দেখি।'

বৃহার গুহার সম্মুখে যে বিস্তৃত জমি পড়িয়াছিল তাহা খোলা নহে, ডালপালা দিয়া ঘেরা। উপরে ডালপালা দিয়া চালও করা ছিল। দূর হইতে তাই কুটিরের মতো দেখাইতেছিল। গুহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই আমার নজরে পড়িল একটা স্থান একটু বিশেষভাবে ঘেরা রহিয়াছে।

'ওখানে কি আছে?'

'ওহালির গাছ।'

'বুঝিতে পারিতেছি না।'

'জোলমার মা ওহালি একটা গাছের গুঁড়িতে চড়িয়া রুপ্রিং নদীর স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়াছিল। বৃহা গুঁড়িটা সুদ্ধ তাহাকে উদ্ধার করে। ওহালি চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু গুঁড়িটা ঐ ঘরে আছে। বৃহা খেয়ালখুশি মতো উহাতে রং মাখায়। দেখিবে?'

টাহার সহিত আগাইয়া গেলাম। দেখিলাম গাছের গুঁড়িটার উভয়প্রান্তে দুইখণ্ড উচ্চ প্রস্তরের উপরে রাখিয়া সেটাকে মাটির সংস্পর্শ হইতে রক্ষা করা হইয়াছে। গুঁড়িটার সর্বাঙ্গে নানা বর্ণের ছাপ, সহসা মনে হয় ওটা যেন জীবন্ত কোনো প্রাণী। মনে পড়িল বিরাট একটা ময়াল সাপের গায়ে ওই ধরনের বর্ণসমাবেশ দেখিয়াছিলাম। সবিস্ময়ে ঘুরিয়া ফিরিয়া গুঁড়িটাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। নীল-নয়না জোলমার মা ইহার উপর চড়িয়া ভাসিতে ভাসিতে আসিয়াছিল! কোথা হইতে আসিয়াছিল? কোন্ বংশে তাহার জন্ম?

'ওহালি কোথা হইতে আসিয়াছিল?'

টাহা শ্রদ্ধাভরে আকাশের দিকে বাহু উত্তোলন করিয়া বলিল, 'আকাশ হইতে। ওহালি আকাশ-কন্যা, তাহার চোখে আকাশ ছিল। আকাশ যেমন নানা রঙে ছবি আঁকে ওহালিও তেমনি নানা রঙে ছবি আঁকিত। বৃহা তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল বলিয়া বৃহাকেও সে ছবি আঁকার কৌশল শিখাইয়া দিয়াছে।'

'জোলমাও কি ছবি আঁকে?'

'জানি না। জোলমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না। সে হয় বৃহার কাছে থাকে, কিংবা একা একা থাকে।'

'একা কোথায় থাকে?'

'বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়। কাহারও সহিত মেশে না।'

নিমেষের মধ্যে আমি একটা কাণ্ড করিয়া বসিলাম। হঠাৎ হাঁটু গাড়িয়া সেই গুঁড়িটার নিচে বসিয়া কাঁধ দিয়া সেটাকে তুলিয়া আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিলাম। খুবই ভারি বোধ হইল, কিন্তু আমি যে ওটাকে কাঁধে তুলিতে পারিয়াছি এই গর্বে আমার সমস্ত বুকটা ভরিয়া উঠিল। টাহার দিকে চাহিয়া দেখি ঈষৎ ব্যায়ত আননে সে আমার কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতেছে।

'হঠাৎ তুমি ওরকম করিলে কেন?'

'ওহালির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিলাম।'

টাহা সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলিল না। আমারও মুখ দিয়া কোনো কথা সরিতেছিল না, আমি বড়ই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। উভয়ে নীরবে সেই ঘরটা হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমিই টাহাকে আবার প্রশ্ন করিলাম, না করিয়া পারিলাম না। কথাটা অনেকক্ষণ হইতেই আমার মনে হইতেছিল।

'এখানে তো কাছে-পিঠে কাহাকেও দেখিতেছি না। শ্যেনপক্ষী সম্প্রদায়ের লোকেরা কোথায় থাকে?'

'তাহারা ওই যে দূরে পাহাড় দেখিতেছ, ওই পাহাড়ে থাকে। ওই পাহাড়ে অনেক গুহা আছে, প্রত্যেক গুহায় আমাদের দলের লোক থাকে। ওখানে যদি খালি গুহা থাকিত তুমি অনায়াসেই পাইতে পারিতে। কিন্তু ওখানে আমাদেরই স্থানাভাব। জিকাটু পাহাড়ে কয়েকটা গুহা আছে শুনিয়াছি, কিন্তু ওখানে কেহ যাইতে চায় না।'

'কারণ কি?'

'ও অঞ্চলে প্রায়ই মৃত পশু দেখা যায়। একদিন একটা প্রকাণ্ড মৃত বাইসনও দেখা গিয়াছিল।'

ইহার পর কণ্ঠস্বর নামাইয়া টাহা বলিল, 'নাগবংশীয় মানুষেরা পূর্বে এ অঞ্চলে থাকিত। শ্যেনপক্ষীদের সহিত তাহাদের যুদ্ধ হয়। নাগদের সবংশে নিধন করিয়া আমাদের পূর্বপুরুষরা এ অঞ্চল অধিকার করে। গৌ তখন বালিকা মাত্র। গৌ বলে সেই নাগদের দলপতি প্রেত হইয়া ওই জিকাটু পাহাড়ের গুহায় বসিয়া আছে। শ্যেনবংশীয় কেহ গেলেই তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। কোনো পশুকেও সে নিজের কাছে ঘেঁষিতে দেয় না। একাই থাকে—'

টাহার চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। আমিও মনে মনে বেশ অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। যে স্থানটা এত বিপজ্জনক বৃহা আমাকে সেই স্থানে বাস করিবার নির্দেশ দিল কেন? কিন্তু আমি যে ভয় পাইয়াছি তাহা টাহার নিকট প্রকাশ করিলাম না।

'বেশ চল কাল জায়গাটা দেখিয়া আসা যাক।'

'আমি কেবল দূর হইতে স্থানটা তোমাকে দেখাইয়া দিব, ভিতরে যাইতে পারিব না। শ্যেনপক্ষীদের ওখানে যাওয়া নিষেধ।'

'তাহা হইলে বৃহা আমাকে ওখানে যাইতে বলিল কেন?'

টাহা সঙ্গে সঙ্গে কোনো উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পবে বলিল, 'তুমি তো শ্যেনপক্ষী নও, তোমার হয়তো কোনো বিপদ ঘটিবে না। তুমি আমাকে ছবি আঁকা কখন শিখাইবে? আমার কুঠারের হাতলে একটা ছবি আঁক না দেখি—'

আমরা একটা গাছের তলায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম। বলিলাম, 'বেশ, এইখানে বসা যাক তাহা হইলে—'

'বেশ, বেশ—'

আগ্রহভরে টাহা বসিয়া পড়িল। আমিও বসিলাম।

টাহা আমার ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আমি তাহার কুঠারের হাতলে একটি হবিণ-মুণ্ডেব ছবি আঁকিয়া দিয়াছিলাম। একটি সূক্ষ্মাগ্র কয়লার টুকরা দিয়া প্রথমে ছবিটা আঁকিয়া তাহার পর ছুরি দিয়া কয়লার দাগে দাগে কাটিয়া সেটি হরিণের শিংয়ের উপব ফুটাইয়া তুলিলাম। টাহা সবিস্ময়ে বসিয়া বসিয়া সব দেখিল, কিন্তু নিজে কিছুতেই ছবি আঁকিতে পারিল না। যতবারই চেষ্টা করিল ততবারই হরিণের মুখ না হইয়া অন্য রকম কিছু একটা হইয়া গেল। তাহার ধারণা হইল আমি নিশ্চয় কোনো যাদুশক্তির অধিকারী, বৃহার মতো আমারও উপর কোনো দেবতার বিশেষ অনুগ্রহ আছে, তাই আমি ছবি আঁকিতে পারিতেছি। আমার প্রতি তাহার ব্যবহার ক্রমশ সশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহার পর আমি যখন তাহাকে আশ্বাস দিলাম যে আঁকিতে আঁকিতে সেও ক্রমশ ঠিক মতো পারিবে তখন সে আমার ভক্ত হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'বৃহা কিন্তু আমাকে কখনও একথা বলে নাই। সে কি করিয়া ছবি আঁকে তাহা দেখিতেও দেয় নাই। অথচ আমি সর্বদা তাহার কাছে আছি, তাহাব প্রতিটি কার্যের অনুকরণ করিতেছি।'

'তুমি কি বৃহার কাছেই থাক? তোমার কি স্বতন্ত্র গুহা নাই?'

'আছে বই কি। আমি শ্যেনপক্ষীদের দলেই থাকি, পাহাড়ে আমার গুহাও আছে। কিন্তু আমাদের দল হইতে বৃহা নিজের সাহায্যকারী হিসাবে আমাকে নিযুক্ত করিয়াছে। বৃহা ওই অন্ধকার গুহায় ছবি আঁকা লইয়াই ব্যস্ত থাকে। সংসারের কাজকর্ম আমাকেই দেখিতে হয়। দূরের পাহাড় হইতে আমাকে রং খুঁড়িয়াও আনিতে হয়।'

'শিকার করিতে যাও না?'

'লাফাই পাহাড় হইতে যে খাবার আসে তাহাতেই আমাদের কুলাইয়া যায়। আমাদের দলই বৃহার ভরণপোষণ করে। বৃহা অবশ্য মাঝে মাঝে শখ করিয়া শিকার করিতে বাহির হয় এবং যখন হয় তখন প্রচণ্ড বিক্রমের সহিত শিকার করে। একবার বর্শার এক আঘাতে একটা ম্যামথের মাথা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল এত উহার শক্তি। কিন্তু ছবি আঁকাই বৃহার প্রধান কাজ। বৃহা ছবি না আঁকিলে আমাদের দলের শিকারিরা শিকার পায় না।'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া টাহা বলিল, 'বৃহা কিন্তু আমাকে কিছুই শিখায় না।'

'আমি তোমাকে শিখাইয়া দিব। আমার গুহাটা আগে ঠিক করিয়া লই।'

টাহার চোখে কেমন যেন একটা সভয় দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। মনে হইল সে যেন আমাকে কি বলিতে চাহিতেছে কিন্তু পারিতেছে না।

'চল তোমাদের লাফাই পাহাড় দেখিয়া আসি।'

টাহার সঙ্গে লাফাই পাহাড়ের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম।

যাহা দেখিলাম তাহা কল্পনাতীত ছিল। লাফাই পাহাড় যেন বৃহৎ একটা মৌমাছির চাক। কেবল প্রভেদ সেখানে মৌমাছির বদলে মানুষ বাস করিতেছে। পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য গুহা। যে বনে আমি বিতংয়ের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম সেই বন হইতে কোমল তৃণাচ্ছাদিত একটি বিস্তৃত পথ সর্পিল আকারে লাফাই পাহাড়ে আসিয়া উঠিয়াছে। উঠিতে উঠিতে সেই পথ ক্রমশ এমন একটা উচ্চতায় আসিয়া পড়িয়াছে যাহার পর আর পথ নাই—যাহার পর পাহাড় খাড়া নামিয়া গিয়াছে। এখান হইতে পতন হইলে সুনিশ্চিত মরণ। শুনিলাম, বিতং বন হইতে হরিণের দলকে ডাকিতে ডাকিতে এই পথের উপর লইয়া আসে। পথের উপর আসিয়া পড়িলে হরিণের দল আপনিই উপরে উঠিতে থাকে, কারণ পথের উপর এমন চমৎকার ঘাস আছে যে, চরিতে চরিতে তাহারা নিজেরাই উপরের দিকে আগাইয়া যায়। রাস্তাটা যেখানে পাহাড়ের অনেক উপরে উঠিয়া গিয়াছে সেখানে রাস্তার একদিকে তো পাহাড় আছেই, অন্য দিকটাও বড় বড় পাথর দিয়া প্রাচীরের মতো করা আছে। হরিণের সমস্ত দল যখন এই স্থানে আসিয়া পড়ে তখন পিছন হইতে সকলে মিলিয়া তাহাদের তাড়া দেয় এবং পাথরের প্রাচীরের ফাঁকে ফাঁকে আগুন জ্বালাইয়া দেয়। হরিণের দল তখন ছুটিয়া পাহাড়ের উপর ওঠে এবং পাহাড় হইতে লাফাইয়া প্রাণত্যাগ করে। দলে দলে হরিণ একসঙ্গে মরে। এরূপ অদ্ভুত ফাঁদ কখনও কল্পনা করি নাই। আমরা বর্শা দিয়া অথবা তীরধনুক দিয়া হরিণ মারি, কখনও কখনও পাথর ছুঁড়িয়াও মারি। এরূপ ব্যাপকভাবে হরিণ মারিবার আয়োজন দেখিয়া সত্যই বিস্মিত হইলাম। আর একটা বিস্ময়কর ব্যাপারও তাহার মুখে শুনিলাম। হরিণের দল যেই ওই পথের উপর আসিয়া পদার্পণ করে অমনি সেগুলি সমস্ত সম্প্রদায়ের সম্পত্তি হইয়া যায়। এই দল হইতে মধ্যপথে তীর বা অন্য কোনো অস্ত্র দ্বারা হরিণ মারিয়া যদি কেহ অপহরণ করে তাহা হইলে তাহার শাস্তি মৃত্যু। যে অস্ত্র দ্বারা সে হরিণটিকে মারিয়াছে সেই অস্ত্রাঘাতে তাহাকেও সকলে মিলিয়া নিধন করে। ওই পথের বাহিরে অবশ্য যে যত খুশি শিকার করিতে পারে, তাহাতে কেহ আপত্তি করে না, বরং যে যত বেশি সংখ্যক হরিণ মারিতে পারে দলের মধ্যে তাহারই তত প্রতিপত্তি বাড়ে। কিন্তু বিতং যে হরিণের দলকে ডাকিয়া আনিয়া পাহাড়ে চড়ায় তাহার একটিরও উপর কাহারও ব্যক্তিগত অধিকার নাই। আমিও হরিণের অনুসরণ করিয়াই এতকাল জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছি, বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিয়াছি, প্রয়োজন মতো বনের ধারেই সপরিবারে বাসা বাঁধিয়াছি, সংসার করিয়াছি, কিন্তু হরিণকে কেন্দ্র করিয়া এমন আয়োজন কখনও দেখি নাই। আমি যখন লাফাই পাহাড়ে গিয়া উপস্থিত হইলাম তখন দেখিলাম উপত্যকার উপর একটি উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। একটি পুরুষ ও একটি যুবতী হরিণ-হরিণী সাজিয়াছে এবং তাহাদের ঘিরিয়া একদল আবালবৃদ্ধবনিতা নাচিতেছে। গানও করিতেছে। পুরুষের দল সুর করিয়া হরিণকে বলিতেছে—'ও হরিণ, ও হরিণ, তুমি ঘাস খাও, জল খাও, হরিণীর দিকে মন দাও, এবার হরিণীর দিকে মন দাও।' মেয়ের দলও সুর করিয়া সেই কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া হরিণীকে বলিতেছে—'ও হরিণী, ও হরিণী, তুমি ঘাস খাও, জল খাও, হরিণের দিকে মন দাও, এবার হরিণের দিকে মন দাও।'

হরিণ এবং হরিণী তাহাদের অনুরোধক্রমে পরস্পরের দিকে মন দিবার চেষ্টা করিতেছে

এবং তাহা দেখিয়া সকলের আনন্দ কলরব জমিয়া উঠিতেছে। আমিও খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই আনন্দ উপভোগ করিলাম। শুধু উপভোগ করিলাম বলিলে কিছুই হয় না, নূতন ধরনের এই আনন্দ-স্রোতস্বিনীতে অবগাহন করিয়া যেন চরিতার্থ হইযা গেলাম। এতদিন আমার মন আহার-নিদ্রা-মৈথুন-শৃঙ্খলিত হইয়া যে কারাগারে বাস করিতেছিল সহসা যেন সেই কারাগারের প্রাচীরে একটা ফাটল দেখা দিল, সেই ফাটল দিয়া নূতন আলোক প্রবেশ করিল, সর্বাপেক্ষা বিস্মিত হইলাম গৌ-কে দেখিয়া। ওই পলিতকেশা বৃদ্ধাও আসিয়া এই নাচের দলে যোগ দিয়াছে এবং কিশোরীদের সহিত হাত ধরাধরি করিযা নাচিতেছে। আমাকে দেখিয়া গৌ হাসিল এবং নাচ শেষ হইলে আমার কাছে আসিয়া বলিল, 'থাকিবার জায়গা পাইয়াছ?'

'না, এখনও পাই নাই। টাহা কাল আমাকে জিকাটু পাহাড়ের দিকে লইয়া যাইবে বলিয়াছে, সেখানে নাকি গুহা আছে!'

'জিকাটু পাহাড়ের দিকে!'

গৌ সবিস্ময়ে টাহার দিকে চাহিল।

টাহা সঙ্কুচিত হইয়া উত্তর দিল, 'ইহাই বৃহার আদেশ।'

গৌ চুপ করিয়া রহিল, কোনো উত্তর দিল না। তাহাব পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'আজ রাত্রে তুমি কোথায় থাকিবে?'

'এ কয়দিন যেখানে ছিলাম সেইখানেই ফিরিয়া যাইব।'

'এ কয়দিন কোথায় ছিলে?'

'বিতং যে বনে থাকে সেই বনে একটা বৃক্ষকোটরে ছিলাম।'

গৌ কিছু বলিল না, কেবল ধীরে ধীরে কয়েকবার মাথা নাড়িল।

সেদিন টাহার সহিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্যেনপক্ষী সমাজের অনেক কিছুই দেখিলাম। দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। কত রকম নূতন অস্ত্রশস্ত্র তাহারা প্রস্তুত করিয়াছে। শুধু পাথরেব নয়, হাড়েরও। কেবল বল্লম, বর্শা, কুঠার, ছোরাই নয়, বল্লমে দাঁতের মতো খাঁজ কাটিয়া নানা আকারের অস্ত্র তাহারা বানাইয়াছে। হরিণের এতটুকু হাড় বা শিং তাহারা ফেলিয়া দেয না, তাহা নানা রকম কাজে লাগায়। কোথাও দেখিলাম, একদল স্ত্রীলোক হরিণচর্ম চাঁচিয়া পরিষ্কার করিতেছে, কেহ আগুনে মাংস ঝলসাইতেছে, কেহ হরিণের শিং হইতে অস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে। সকলেই সমগ্র সমাজের হিতার্থে ব্যস্ত। হরিণচর্ম পরিষ্কৃত হইয়া স্তূপীকৃত হইতেছে কোনো ব্যক্তি-বিশেষের জন্য নয়, মাংস ঝলসানো হইতেছে একটি লোকের জন্য নয়, অস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে একজনের জন্য নয়—সকলের জন্য। এক একটি বিভাগে এক একজন কর্তা আছে, সে প্রয়োজন মতো সকলকে ভাগ করিয়া দেয়। বিবাদ উপস্থিত হইলে বৃহা তাহার মীমাংসা করে। বৃহা ইহাদের চক্ষে সাক্ষাৎ দেবতা। জোলমা মানবী নয়, দেবকন্যা। এখানে আমাদের সমাজের মতোই স্ত্রীলোক পর্যন্ত কোনো পুরুষের নিজস্ব নয়। সমস্ত স্ত্রীলোকই সকলের সম্পত্তি। ইহাদের এলাকার পরেই শঙ্খচিল সম্প্রদায়ের এলাকা। শঙ্খচিল সম্প্রদায়ের পুরুষেরা শ্যেন সম্প্রদায়ের মেয়েদের বিবাহ করে শঙ্খচিল মেয়েরা বিবাহ করে শ্যেন পুরুষদের। তাহার পরেও নাকি নকুল সম্প্রদায়ের লোকেরা নূতন এলাকা স্থাপন করিয়াছে। তাহাদেরও সহিত ইহাদের আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছে শুনিলাম। বল্গা-হরিণই

সকলের উপজীব্য। মাঝে মাঝে অন্য জন্তু জানোয়ারও ইহারা শিকার করে। কখনও সমবেতভাবে কখনও একা একা। ইহাদের পরিচয় পাইয়া ইহাদের তুলনায় নিজেকে ক্ষুদ্র মনে হইতেছিল। আশঙ্কা হইতেছিল, আমি যদি এখানে বাস করি তাহা হইলে ইহাদের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিব কি? কই, কেহই তো আমার প্রতি ফিরিয়াও চাহিল না। দলে দলে মেয়েরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আমাকে তো কেহ লক্ষ্যও করিল না, সকলেই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। আমি এখানে কোথায় থাকিব, কি করিব...জোলমার কথা মনে পড়িল...অন্যমনস্কভাবে টাহার সহিত সমস্ত দিন ঘুরিয়া বেড়াইলাম।

...সন্ধ্যাবেলা আমি আমার বৃক্ষকোটর অভিমুখে ফিরিতেছিলাম। টাহা সঙ্গে ছিল। সে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল ছবি আঁকার প্রসঙ্গেই বার বার আসিয়া পড়িতেছিল। তাহার ধারণা আমি কোনো বিশেষ মন্ত্র জানি বলিয়াই ছবি আঁকিতে পারি, সেই মন্ত্রটি কোনোরূপে আমার নিকট হইতে সে জানিয়া লইতে চায়। সে বুঝিয়াছে, বৃহা তাহাকে ছবি আঁকা শিখাইবে না। আমি তাহাকে আশ্বাস দিলাম যে, আমি যদি এখানে থাকি তাহা হইলে আমি তাহাকে নিশ্চয়ই শিখাইয়া দিব। অনেকবার এবং কিছুক্ষণ আগেই তাহাকে একথা বলিয়াছি, কিন্তু পুনরায় সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমাকে কখন তুমি ছবি আঁকা শিখাইবে? বৃহার কাছে এতদিন আছি, বৃহা আমাকে তো কিছুই শিখাইল না।'

'বৃহা তোমাকে শিখাইল না কেন? তুমি গৌকে বল না। গৌ তোমারও মা, বৃহারও মা। গৌ অনুরোধ করিলে বৃহা বোধহয় তোমাকে শিখাইয়া দিবে।'

কোনো কথা বলিলে টাহা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কথাটা প্রণিধান করে, তাহার পর উত্তর দেয়। কিছুক্ষণ নীরবে পথ অতিবাহন করিবার পর টাহা বলিল, 'গৌ বৃহাকে অনুরোধ করিবে না—'

'কেন?'

'কারণ বৃহাকে একটি অনুরোধ সে করিয়াছে, বৃহা যতদিন যে অনুরোধ পালন না করিতেছে ততদিন গৌ আর দ্বিতীয় অনুরোধ করিবে না।'

'বৃহাকে গৌ কি অনুরোধ করিয়াছে?'

'আবার বিবাহ করিবার জন্য। বৃহা কিন্তু বিবাহ করিতেছে না। সে জোলমাকে লইয়া বাকি জীবনটা কাটাইয়া দিতে চায়। জোলমা কাহাকেও বিবাহ করুক ইহাও সে চায় না। সে চায় জোলমা সারাজীবন তাহার ছবি আঁকার কাছে প্রদীপ ধরিয়া থাকুক।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

টাহা মিটিমিটি আমার দিকে চাহিতে লাগিল। মনে হইল আমি যে জোলমাকে বিবাহ করিতে চাই ইহা যেন সে বুঝিতে পারিয়াছে এবং এই সংবাদে আমার মুখভাব কিরূপ হয় তাহা অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমার মুখভাবে কি ফুটিয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু ভাষায় আমি বিশেষ কিছু প্রকাশ করিলাম না। কেবল বলিলাম, 'তাই নাকি, আশ্চর্য তো! গৌ কিছু বলে না?'

'খুব বলে। গৌ ছোট ছেলে খুব ভালবাসে। তাহার নিজের গর্ভে সবসুদ্ধ ত্রিশটি সন্তান হইয়াছে। কিন্তু আমি বৃহা এবং তিনটি কন্যা ছাড়া কেহই বাঁচে নাই। আজ গৌ যে

কিশোরীদের সহিত নাচিতেছিল তাহারা সকলেই উহার দৌহিত্রী। শিশু উহার খুব প্রিয়। কাহারও শিশু হইয়াছে শুনিলেই গৌ সেখানে ছুটিয়া যায়। বৃহার ঘরে শিশু নাই, জোলমার কোলে শিশু নাই, ইহাতে গৌ খুবই মর্মাহত হইয়া আছে। সেইজন্যই তো ওই কুকুর-শাবকটাকে আনিয়া লালন করিতেছে। একবার একটা কুকুরের দলকে শিকারিরা মারিয়া ফেলিয়াছিল এবং বন হইতে জীবন্ত ওই বাচ্চাটাকে লইয়া আসিয়াছিল পোড়াইয়া খাইবে বলিয়া। কিন্তু গৌ উহাকে পোড়াইতে দেয় নাই, স্নেহভরে লালন করিয়াছে। বৃহার বা জোলমার শিশু থাকিলে ওই কুকুরছানাটা বোধ হয় বাঁচিত না।'

'গৌ কি কোনো রকম মন্ত্র তন্ত্র জানে?'

'অনেক রকম। মন্ত্রের জোরেই ও তিত্তির বংশদের ধ্বংস করিতেছে।'

'কেন?'

'তিত্তিরবংশীয়দের সহিত একবার আমাদের খুব যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে আমাব অনেকগুলি ভাই মারা যায়। গৌ তাহার পর হইতে ফাঁদ পাতিয়া তিত্তির পাখি ধরে এবং জীবন্ত পোড়াইয়া মারে। আজ সকালে যেমন করিল, কখনও কখনও তাহার মুণ্ডটা মুচড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলে এবং রক্তটা আগুনে পোড়ায়। তিত্তিরের ছিন্ন মুণ্ড হইতে, পোড়া রক্ত হইতে নানারকম লক্ষণ ও দেখিতে পায়। উহার অনেক ক্ষমতা। তিত্তির পাখি পোড়াইয়া পোড়াইয়া গৌ তিত্তির বংশকেই দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। ইহারা বলে, এক একটা উৎকট অসুখে একে একে সব মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু অসুখ নয়, ভূত।'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া টাহা বলিল, 'গৌ কিন্তু বৃহাকে ভয় করে। বৃহারও ক্ষমতা অদ্ভুত। ওহালি বৃহাকে অদ্ভুত শক্তি দিয়া গিয়াছে। তাই গৌ তাহাকে বেশি অনুরোধ করিতে সাহস করে না।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। তাহার পর টাহা আবার সহসা বলিল, 'গৌ কিন্তু তোমাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছে। তিত্তিরের মুণ্ড বাঁ কাতে পড়া অত্যন্ত সুলক্ষণ। পোড়া বক্তের ধোঁয়াও দক্ষিণ দিকে উড়িয়া গেল, ইহাও খুব ভাল লক্ষণ। বৃহা সেই জন্য কোনো আপত্তি করিতে পারিল না। কিছুকাল পূর্বে আর একজন বিদেশি আসিয়াছিল। গৌ তাহাকে সুনজবে দেখে নাই, বৃহাও তাহাকে থাকিতে দেয় নাই!'

আমি নীরবে তাহার অনুসরণ করিতেছিলাম। কি যে বলিব, কি বলিলে যে সুবিধা হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছিলাম না, তাই চুপ করিয়াই ছিলাম। বনের কাছাকাছি আসিয়া টাহা সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল এবং আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, 'ওই দেখ, ওহালি ছবি আঁকিতেছে।'

চাহিয়া দেখিলাম, মেঘের স্তর ভেদ করিয়া চাঁদ উঠিতেছে। নির্নিমেষে আমিও চাহিয়া রহিলাম। ওহালি ছবি আঁকিতেছে এই অভিনব কল্পনায় এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম যে টাহা কখন নিঃশব্দে চলিয়া গিয়াছে বুঝিতে পারি নাই।

* * *

বৃক্ষকোটরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। একটা পাথরের টুকরা গায়ে লাগিতেই উঠিয়া বসিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা লাগিল। তাহার পর আর একটা। মনে হইল, আকাশ হইতে পড়িতেছে। সন্তর্পণে মুখ বাড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলাম। তাহার পরই শুনিতে

পাইলাম—'দূর হ, দূর হ, দূর হ। মরিয়া গিয়াও কি তুই নিস্তার দিবি না! দূর হ! আকাশে বসিয়া ছবি আঁকিতেছেন! রাক্ষসী কোথাকার! আমার বংশ ছারখার করিয়া তোর লাভ কি! তুই তো চলিয়া গিয়াছিস। বৃহাকে ছাড়িয়া দে, জোলমাকে ছাড়িয়া দে, এমন করিয়া তাহাদের বংশ লোপ করিবি তুই ডাইনি! দূর হ—দূর হ!'

দেখিলাম, গৌ আকাশের দিকে চাহিয়া ক্রমাগত বকিয়া চলিয়াছে। চাঁদে এবং মেঘে মিশিয়া আকাশে অদ্ভুত ছবি ফুটিয়াছে একটা। গৌ মাঝে মাঝে সেই ছবিটার দিকে পাথর ছুঁড়িতেছে। আর দুই হাত তুলিয়া তাহাকে অভিশাপ দিতেছে। তাহার পলিত কেশে, তাহার দীপ্ত চক্ষুর্দ্বয়ে, তাহার উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত বাহুতে, তাহার সর্বাঙ্গে—জ্যোৎস্না। মনে হইতেছে আকাশবাসিনী ওহালি জ্যোৎস্নারূপে নামিয়া আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া যেন ব্যঙ্গ করিতেছে। গৌ আবার আকাশের দিকে পাথর ছুঁড়িতে লাগিল। আমি সবিস্ময়ে বৃক্ষকোটর হইতে বসিয়া বসিয়া তাহার কাণ্ড দেখিতে লাগিলাম। গৌ উন্মাদিনী কি না এ সন্দেহ একবারও আমার মনে হইল না। মনে হইল কোনো দৈবীশক্তি উহার উপর ভর করিয়াছে এবং সে শক্তি ওহালির শত্রু। যে ওহালি ছবি আঁকিয়া বৃহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, যে ওহালির স্মৃতি বৃহাকে স্ত্রী জাতি সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া তাহার বংশবৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি কবিয়াছে, তাহাকে গৌ ক্ষমা করিবে না, তাহার চক্রান্তকে সে যেমন করিয়া হউক ব্যর্থ করিয়া দিতে চায়। হঠাৎ গৌ বলিয়া উঠিল, 'বিদেশি বীর আসিয়াছে, এইবার তোর মায়াজাল সে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিবে। তুই যে অভিশপ্ত কাঠের উপর চড়িয়া এদেশে আসিয়াছিলি সেই কাঠকে সে অনায়াসে তুলিয়াছে, শুনিয়াছি, তোর স্মৃতিকেও এইবার সে উপড়াইয়া ফেলিয়া দিবে। বৃহার কবল হইতে জোলমাকে সে ছিনাইয়া লইবে। বৃহা তাহাকে জিকাটু পাহাড়ে পাঠাইয়া হত্যা করিবে ভাবিয়াছে, কিন্তু তাহা আমি হইতে দিব না, আমি তাহাকে যাইতে দিব না—'

আকাশের দিকে দুই হাত তুলিয়া গৌ খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বুঝিলাম গৌ আমার কথাই বলিতেছে। আমি সন্তর্পণে বৃক্ষকোটর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। বাহির হইয়া আসিলাম বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ কবিবার ইচ্ছা হইল না। আমি যে গৌয়ের কথা আড়াল হইতে শুনিতে পাইয়াছি তাহা গৌকে জানানো বুদ্ধিমানের কাজ হইবে বলিয়া বোধ হইল না। গৌ যে আমার হিতৈষিণী এ কথা তো জানাই গেল, এখন এভাবে তাহার কাছে আত্মপ্রকাশ করিয়া কোনো লাভ নাই। বরং এমনভাবে তাহার সম্মুখে আসা যাক যেন আমি তাহাকে দেখিতেই পাই নাই, হঠাৎ দেখা হইয়া গেল। ধীর বৃক্ষান্তরালে সরিয়া গেলাম। বনের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া সহসা তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িব এইরূপই অভিপ্রায় ছিল। বনের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে একটা বুদ্ধি মাথায় আসিয়া গেল। গৌয়ের নিকট যদি ভান করিতে পারি যে, আমিও তাহার মতানুবর্তী, আকাশের ওই জ্যোৎস্নামণ্ডিত মেঘের চিত্র আমারও চক্ষুশূল, তাহা হইলে গৌ একেবারে আমার বাধ্য হইয়া পড়িবে। একটা বুদ্ধিও মাথায় আসিয়া গেল। সঙ্গে তীরধনুক ছিল। অনেকখানি ঘুরিয়া বন হইতে বাহির হইলাম। দেখিলাম গৌ তখনও আকাশের দিকে চাহিয়া বকিয়া চলিয়াছে। আমি কিছু দূর পিছু হটিয়া গৌয়ের কাছাকাছি সরিয়া আসিলাম—যেন আমি তাহাকে দেখিতেই পাই নাই। তাহার পর ধনুতে শরযোজনা করিয়া তাহা মেঘের দিকে ছুঁড়িয়া দিলাম।

গৌ আমাকে দেখিতে পাইয়াছে বুঝিলাম, কারণ সে নীরব হইয়া গেল। আমি যখন ধনুতে

দ্বিতীয় তীর লাগাইতেছি তখন পদশব্দ শুনিয়া বুঝিলাম গৌ আমার দিকেই আসিতেছে। কিন্তু আমি ঘাড় ফিরাইলাম না, এমন ভাব করিলাম যেন আমি তাহার পদশব্দ শুনিতে পাই নাই। নিবিষ্টচিত্তে ধনুতে তীরটি লাগাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া লক্ষ্য স্থির করিয়া মেঘের দিকে পুনরায় একটি শরক্ষেপ করিলাম।

'তুমি এত রাত্রে এখানে কি শিকার করিতেছ?' আমি যেন চমকাইয়া উঠিলাম। তাহার পর এমন ভান করিলাম যেন কোনো অপরাধ ধরা পড়িয়া যাওয়াতে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছি।

'কি করিতেছ এখানে?'

বিস্মিত গৌ পুনরায় প্রশ্ন করিল।

আমি গম্ভীর কণ্ঠে আকাশের দিকে হাত তুলিয়া বলিলাম, 'উহাকে দূর করিবার চেষ্টা করিতেছি।'

'কাহাকে?'

'ওই জ্যোৎস্না-মাখা মেঘকে—'

'কেন?'

'ও আমার শান্তি নষ্ট করিতেছে। ঘুমাইতে দিতেছে না। ওই চাঁদের আলো আমার নিদ্রায় প্রবেশ করিয়া স্বপ্নরূপে আমাকে ভয় দেখাইতেছে। তীর দিয়া উহাকে দূর করা যায় কি না চেষ্টা করিয়া দেখিতেছি।'

উদ্ভাসিত চক্ষু তুলিয়া গৌ নীরবে কিছুক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার পর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া মুচকি হাসিল। তাহার পর বলিল, 'তুমি তোমার অজ্ঞাতসারে ঠিক কাজই করিতেছিলে। ও তোমার শত্রুই। ও কে জান?'

'না।'

'ওহালি। জোলমার মা। উহারই মায়ায় মুগ্ধ হইয়া বৃহা নিজে বিবাহ করে নাই, জোলমাকে বিবাহ করিতে দেয় নাই। মরিয়া গিয়াও ওহালি নিজের অধিকার ছাড়িবে না। ছবির মায়ায় উহাদের মুগ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।'

গৌ নির্নিমেষে ক্ষণকাল আমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া সহসা বলিল, 'কুঠারের হাতলে ওই ছবিটা কি তোমারই আঁকা?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি তাহা হইলে জোলমাকে ভুলাইতে পারিবে। আকাশে তীর ছুঁড়িয়া কিছু হইবে না, জোলমাকে ভোলাও। তুমি এখানে কোথায় আছ?'

'এখন এই বনেই আছি। কাল কিন্তু জিকাটু পাহাড়ে গুহা খুঁজিতে যাইব।'

'যাইও না। সেখানে গেলে আর ফিরিবে না। বৃহা একথা জানে বলিয়াই তোমাকে জিকাটু পাহাড়ে যাইতে বলিয়াছে। সে জোলমার কাছে কাহাকেও ঘেঁষিতে দিতে চায় না। তুমি যাইও না। এই বনেই থাক। এইখানেই জোলমার দেখা পাইবে। সে এখানে কাঠ কুড়াইতে আসে। তাহার সহিত আলাপ কর, তাহাকে মুগ্ধ কর, ওহালির কুহক হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া বিবাহ কর।'

তাহার পর গৌ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া ফিক ফিক করিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার পর বলিল—

'সবচেয়ে সুন্দর জিনিস কি জান? ছবি নয়, শিশু। মায়ের কোলে স্তন্যপানরত শিশু। জোলমাকে তাই দাও।'—আবার গৌ খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর প্রশ্ন করিলাম, 'তুমি এত রাত্রে এখানে কেন আসিয়াছ?'

'তিত্তির ধরিতে। আমি রোজ আসি।'

'ফাঁদ পাতিয়া তিত্তির ধর?'—আমি কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম।

'হ্যাঁ। দেখিবে তো আইস।'

তাহার অনুসরণ করিলাম।

কিছুদূর গিয়া গৌ বলিল, 'তুমি ওই গাছের উপর উঠিয়া বসিয়া থাক। আমি এই ঝোপের ভিতর ঢুকিব।'

আমি গাছের উপর উঠিয়া বসিলাম। গৌ ঝোপের পিছনের দিকে চলিয়া গেল। খানিকক্ষণ পরেই ঝোপের ভিতর হইতে তিত্তিরের ডাক শোনা গেল। অনুমান করিলাম, গৌ ডাকিতেছে। তিত্তিরের ডাকের এমন চমৎকার অনুকরণ যে মানুষ করিতে পারে তাহা ধারণাতীত ছিল। বিতংয়ের কথা মনে পড়িল। সে-ও চমৎকার হরিণেব ডাক ডাকিতে পারে। সহসা মনে হইল অনুকরণ করাই ইহাদের বিশেষত্ব। বৃহাও ছবিতে রং দিয়া জন্তু জানোয়াবের আকৃতির অনুকরণ করিতেছে। সকলেরই উদ্দেশ্য পশুকে নিজের আয়ত্তাধীনে লইয়া আসা। এরূপ বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য লইয়া আমরা কিন্তু ছবি আঁকিতে শিখি নাই। কেন যে আমবা ছবি আঁকিতে শিখিয়াছি তাহা জানি না। আমাদের মধ্যে অনেকেই ছবি আঁকে, তাহাদেব দেখাদেখি আমিও আঁকিতে শিখিয়াছি। থানকুর মুখে শুনিয়াছি, একবার একটা পাথরের গায়ে আমাদের পূর্বপুরুষ নাকি একটা বল্‌গা-হরিণের ছবি আঁকা দেখিয়াছিলেন। বৃষ্টিতে ধূলা জমিয়া আপনিই ছবি আঁকা হইয়া গিয়াছিল। তিনি নাকি পাশেই তাহার অনুকবণে একটা ছবি আঁকেন। এজন্য নিজেদের দলে তাঁহার নাকি খুব খাতির হইয়াছিল। তখন হইতেই আমাদেব সমাজে ছবি আঁকার প্রচলন হইয়াছে।

হঠাৎ বনে আরও কয়েকটা তিত্তিরের ডাক শোনা গেল। আমি উৎকর্ণ হইয়া উঠিলাম। মনে হইল, তিত্তিরগুলি ক্রমশ যেন নিকটতর হইতেছে। তাহাদের কণ্ঠস্বর স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। ঝোপের ভিতর গৌ ক্রমাগত ডাকিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ দেখিলাম তিন-চারটি তিত্তির ঝোপের নিকট আসিয়া ঘোরা-ফেরা করিতেছে। ঝোপের ভিতর গৌয়ের ডাকও পরিবর্তিত হইল। পুরুষ-তিত্তিররা যেভাবে স্ত্রী-তিত্তিরদের সোহাগের সুরে ডাকে গৌ ঝোপের ভিতর হইতে ঠিক সেইভাবেই ডাকিতে লাগিল। যে তিত্তিরগুলি আসিয়াছিল সেগুলি সম্ভবত স্ত্রী-তিত্তিরই। তাহারা একটু পরেই দেখিলাম ঝোপের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছে। কিছুক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

'এইবার নামিয়া পড়।'

হেঁট হইয়া দেখিলাম, গৌ গাছের ঠিক নিচে দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিতেছে। নামিয়া পড়িলাম।

'চল এইবার দেখিবে চল।'

'তিন-চারটি তিত্তিরকে ওই ঝোপের মধ্যে ঢুকিতে দেখিলাম এখনই।'

'ওটা ঝোপের মতো দেখিতে বটে কিন্তু ওটা ঝোপ নয়, ফাঁদ। উহার ভিতর ঢুকিলে তিত্তির পাখি আর বাহিরে আসিতে পারে না।'

'তুমি কি উহারই ভিতর বসিয়া ডাকিতেছিলে?'

'না, উহার পিছনে। এইবার ঢুকিব।'

গৌ টপ করিয়া পাতা সরাইয়া চকিতের মধ্যে ভিতরে ঢুকিয়া গেল। এমন নিমেষের মধ্যে গেল যে আমি অবাক হইয়া গেলাম। মনে হইল, কোথায় যেন মিলাইয়া গেল। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, এটা স্বাভাবিক ঝোপ নয়, ডালপালা পুঁতিয়া এটাকে ঝোপের আকার দেওয়া হইয়াছে। ভিতরে ঝটপট ঝটপট শব্দ শোনা গেল। একটু পরেই গৌ বাহির হইয়া আসিল। তাহার হস্তে চারিটি জীবন্ত তিত্তির পক্ষী। আমার সম্মুখেই সে একটি পাখির মুণ্ড ছিঁড়িয়া তাহার রক্ত পান করিতে লাগিল। তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'তুমি একটা খাও। দাঁড়াও একটু আগুন জ্বালি।'

মহা উৎসাহে গৌ শুষ্কপত্র সংগ্রহ করিতে লাগিল। আগুন জ্বালিবার সরঞ্জাম তাহার সঙ্গেই ছিল। সরঞ্জাম বিশেষ কিছু নয়—দুই টুকরা কাষ্ঠখণ্ড। পরস্পর ঘর্ষণে আগুন হয়। এক টুকরা অপেক্ষাকৃত চওড়া কাষ্ঠে যে গর্তটি আছে তাহার ভিতর গোলাকৃতি আর একটি কাষ্ঠদণ্ড রাখিয়া ঘর্ষণ করিলেই অগ্নি উৎপন্ন হয় এবং কাছাকাছি কোনো দাহ্য বস্তু থাকিলেই তাহাতে আগুন ধরিয়া যায়। বৃদ্ধা গৌয়ের দেহে যেন কিশোরীসুলভ চঞ্চলতা আবির্ভূত হইল। সে তাড়াতাড়ি শুষ্কপত্র স্তূপীকৃত করিয়া ফেলিল এবং তাহার খানিকটা অংশ লইয়া আগুন ধরাইতে বসিয়া গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই শুষ্ক পত্ররাশি জ্বলিয়া উঠিল। সেই নিবিড় অরণ্যে পাশাপাশি বসিয়া আমরা তিত্তির ঝলসাইয়া আহার করিতে লাগিলাম। দুইটি তিত্তিরকে গৌ বন্য লতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। আহার করিতে করিতে গৌ তাহাদের সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, 'তোদেরও খাইব। ঠিক এমনি করিয়া মুণ্ড ছিঁড়িয়া, এমনি করিয়া আগুনে পোড়াইয়া, এমনি করিয়া চিবাইয়া চিবাইয়া খাইব। আমার সন্তানদের মারিয়া সহজে নিস্তার পাইবি না!'

আহার শেষ করিয়া গৌ পা দিয়া আগুন নিবাইয়া দিল। আমাদের ভুক্তাবশিষ্ট যাহা কিছু পড়িয়াছিল—চর্বিত অস্থি, নাড়িভুঁড়ি—একটা পাতায় সেগুলি কুড়াইয়া লইল। আমার চোখে বিস্ময় ফুটিতে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, 'আমার কুকুরকে খাওয়াইব। বরাবর খাওয়াইয়াছি। তিত্তির যে উহার শত্রু, উহার খাদ্য তাহা উহার মর্মে মর্মে গাঁথিয়া দিব। আমি তো কিছুদিন পরে মরিয়া যাইব তখন ও-ই আমার হইয়া প্রতিশোধ লইবে। ও-ই প্রকৃত পুত্রের কাজ করিবে। বৃহা টাহা পুত্রের কাজ করে না। ওহালি উহাদের সর্বনাশ করিয়া গিয়াছে। উহারা তিত্তির বংশ ধ্বংস না করিয়া ছবিতে উন্মত্ত হইয়া আছে। বৃহা কি বলে জান?'

গৌ আবার হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

'কি বলে?'

'হরিণের দল যেদিন মারা পড়িবে সেই দিনই শুনিতে পাইবে। বৃহা পাগল, টাহা নির্বোধ।'

তাহার পর লতায়-বাঁধা তিত্তির দুইটি তুলিয়া লইয়া গৌ বলিল, 'খবরদার, তুমি জিকাটু পাহাড়ে যাইও না। এই বনেই লুকাইয়া থাক। বৃহার কবল হইতে জোলমাকে উদ্ধার কর। নূতন বংশ স্থাপন কর। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জিনিস কি জান? মানুষ, মানুষ, মানুষ। সেই জন্য সবচেয়ে সুন্দর জিনিস কি জান? শিশু, শিশু, শিশু—'

এমন সময় একটু দূরে হরিণের ডাক শোনা গেল। গৌ ক্ষণকাল উৎকর্ণ হইয়া থাকিয়া হাসিয়া বলিল, 'বিতং। বিতংয়ের সহিত তোমার দেখা হইয়াছে?'

'হইয়াছে।'

'বিতং জোলমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। বৃহা দেয় নাই। বৃহা তাহাকেও হয়তো জিকাটু পাহাড়ে পাঠাইত কিন্তু ও চমৎকার হরিণের ডাক ডাকিতে পারে। ও মরিয়া গেলে হরিণ ডাকিয়া আনিবে কে? তাই উহাকে ওই গাছের গুঁড়িটা তুলিতে বলিল। জানে—ও রোগা মানুষ, গাছের গুঁড়ি তুলিতে পারিবে না—'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'আমি কিন্তু তুলিয়াছি।'

'টাহার মুখে সে কথা শুনিয়াছি। তাই তো তোমাকে জিকাটু পাহাড়ে পাঠাইতেছে। সেখানে গিয়া আজ পর্যন্ত কেহ ফেরে নাই। তুমি যাইও না, এই বনেই থাক।'

'কিন্তু বৃহা যদি জানিতে পারে?'

'পারিলেই বা! এ বন তো সকলের সম্পত্তি। যে কেহ এখানে থাকিতে পারে, শিকার করিতে পারে।'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

গৌ বলিল, 'আমি রোজ রাত্রে এখানে তিত্তির ধরিতে আসি। যদি কোনো অসুবিধা হয় আমাকে বলিও, আমি ব্যবস্থা করিয়া দিব।'

তাহার পর নির্নিমেষে ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'তোমাকে আমার চাই। তোমার মতো সমর্থ বলিষ্ঠ পুরুষই জোলমার প্রয়োজন। তোমাকে আমি যাইতে দিব না।'

আবার হরিণের ডাক শোনা গেল।

গৌ বলিল, 'বিতং এইদিকেই বোধহয় আসিতেছে। আমি যাই।'

তাহার পর তিত্তির পক্ষী দুটির দিকে চাহিয়া বলিল, 'চল, এইবার ঝাউঝাউয়ের বুকের রক্ত তোলপাড় করিবে চল।'

'ঝাউঝাউ কে?'

'কুকুরটা। ইহাদের দুইজনকে এখন তাহার নাগালের বাহিরে অথচ দৃষ্টির সম্মুখে টাঙাইয়া রাখিব। ঝাউঝাউ ইহাদের দেখিবে অথচ ধরিতে পারিবে না। দেখিবে অথচ ধরিতে পারিবে না, মর্মে মর্মে চটিয়া থাকিবে। কি মজাই না হইবে!'

খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে গৌ চলিয়া গেল। আমি কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর ধীরে ধীরে আবার বৃক্ষকোটরের দিকে অগ্রসর হইলাম। তখনও প্রভাতের বিলম্ব ছিল। কোটরে ঢুকিয়া আর একবার ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

...ঘুমাইয়া অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম একটা বাঘ আমার মুখের দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছে। যেন বাঘ নয়, মানুষ। মনে হইতেছিল, এখনই বোধহয় মনুষ্যকণ্ঠে আমার সহিত কথাও বলিবে। কিন্তু ঘুমটা ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম প্রভাত হইয়াছে। কেকারবে সমস্ত বন মুখরিত। তীরধনুক সঙ্গেই ছিল, ইচ্ছা হইল একটা ময়ূর শিকার করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করি। গৌ যখন বৃহার নিকট হইতে আত্মগোপন করিয়া এই বনেই থাকিতে বলিয়া

গিয়াছে তখন শিকার করিয়াই নিজের আহার সংগ্রহ করিতে হইবে। কেকাধ্বনি লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলাম। অনেক দূর যাইতে হইল। ক্রমশ নিবিড় অরণ্যে গিয়া পড়িলাম। অরণ্যের ভিতরও বেশ কিছুদূর গিয়া তাহার পর মনে হইল এইবার বোধহয় কেকাধ্বনির নিকটবর্তী হইয়াছি। জঙ্গলটা পার হইলেই বোধহয় ময়ূরের দলকে দেখিতে পাইব। জঙ্গলের শেষ প্রান্তে গিয়া অতি ধীরে ধীরে মুখ বাড়াইলাম। যাহা দেখিলাম, তাহা দেখিব বলিয়া প্রত্যাশা করি নাই। দেখিলাম, একদল ময়ূর একটা খোলা মাঠে পেখম বিস্তার করিয়া নাচিতেছে এবং তাহাদের সহিত নাচিতেছে জোলমা। ময়ূরেরা তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইতেছে না। সে-ও যেন তাহাদেরি একজন। আমি অনেকক্ষণ মুগ্ধ নেত্রে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের নৃত্য দেখিলাম। বস্তুত আমি আত্মহারা হইয়া কিছুক্ষণের জন্য যেন ভিন্ন লোকেই নীত হইলাম। বনের পাখি মানুষের সহিত এমনভাবে কি করিয়া মিশিতেছে তাহাই আমি ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। পুনরায় আমার থানকুর কথাই মনে হইতেছিল, জোলমা বোধহয় মায়াবিনী। মানুষকেই পাখিতে পরিণত করিয়া নাচাইতেছে, পরে আহার করিবে। সহসা জোলমা থামিয়া গেল এবং বক্ষোলগ্ন চর্মাবরণখানা খুলিয়া ফেলিল। দেখিলাম, তাহার গলায় চামড়ার থলির মতো কি যেন একটা বাঁধা রহিয়াছে। জোলমা থলিটাও খুলিয়া ফেলিল এবং থলির ভিতর হাত ঢুকাইয়া কি যেন বাহির করিয়া চতুর্দিকে ছড়াইতে লাগিল। সবিস্ময়ে দেখিলাম, ময়ূরের দল সেগুলি সাগ্রহে খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতেছে। মানুষ নিজে না খাইয়া পশুদের খাবার বিতরণ করিতেছে, এই অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্যও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলাম।

'দাঁড়াইয়া সময় নষ্ট করিতেছ কেন, ওই তো জোলমা, এত কাছে দাঁড়াইয়া আছে, গিয়া আলাপ কর, উহাকে ভুলাও।'

মনে হইল গৌ আমার কানে কানে যেন কথাগুলি বলিতেছে। ঘাড় ফিরাইয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। আমার নিজেরই কামনা যে বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছে তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই তাই ভয় পাইলাম। মনে হইল, যাদুকরী গৌ হয়তো কোনো অচিন্তনীয় উপায়ে আমাকে আদেশ করিতেছে। তাহার আদেশ যদি পালন না করি বিপদ হইবে। আমার নিজের আগ্রহও কম ছিল না। কিন্তু একটা বিস্ময়ান্বিত শঙ্কা যেন আমার গতিরোধ করিয়াছিল, এই ঘটনায় সাহস পাইয়া বন হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

জোলমা প্রথমে আমাকে লক্ষ্য করে নাই; কিন্তু ময়ূরেরা আমার আবির্ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল। কয়েকটা ময়ূর ভয় পাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিতেই বাকিগুলি সচকিত হইয়া উড়িয়া গেল। তখন জোলমা মুখ তুলিয়া চাহিল। আমাকে দেখিয়া সে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর আগাইয়া আসিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, 'বিদেশি, তুমি এখনও এখানে আছ?'

'হ্যাঁ। পর্বতের আদেশে আমাকে থাকিতে হইয়াছে। তোমাদের দেশেই ঘর বাঁধিব।'

'কোনো গুহা কি ঠিক করিয়াছ?'

'না, এখনও করি নাই, কাল জিকাটু পাহাড়ে গুহার সন্ধানে যাইব।'

'ও, জিকাটু পাহাড়ে।'

চুপ করিয়া সে খানিকক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমিও নির্বাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। একটা তীক্ষ্ণ কেকাস্বর সহসা নিস্তব্ধতাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল।

জোলমা বলিল, 'তোমাকে জিকাটু পাহাড়ে কে যাইতে বলিয়াছে?'

'বৃহা।'

'ও।'

জোলমা আবার চুপ করিয়া গেল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। জোলমার আচরণ বড়ই রহস্যময় বলিয়া মনে হইল। আমন্ত্রণ অথবা প্রত্যাখ্যান, আনন্দ অথবা বিষাদ কিছুই তো তাহার আচরণে প্রতিভাত হইল না। সে আমাকে চায় কি চায় না তাহা তো কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। দেবতার যখন আদেশ তখন এই দেশেই আমাকে থাকিতে হইবে, জোলমাকে লইয়া যদি ঘর না বাঁধিতে পারি, জোলমা যদি আমাকে না চায়...। 'জোলমাকে ভোলাও। বৃহার কবল হইতে উহাকে উদ্ধার কর'—অদৃশ্য গৌ আবার যেন আমার কানে কানে কথা বলিল।

আমি বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম, জোলমা যেদিকে গিয়াছে সেই দিকে চলিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইলাম, জোলমাকে কিন্তু দেখা গেল না। কোথায় গেল সে? তাহাকে সব কথা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিতে চাই। আমাকে সে যদি আশ্বাস দেয়—দিবে কি?-- যদি না দেয়..সহসা একটা চিৎকার শুনিতে পাইলাম, জোলমার কণ্ঠস্বর, মনে হইল আকাশ হইতে ভাসিয়া আসিল। নিকটেই প্রকাণ্ড শিমুল গাছ ছিল, তাহার সর্বাঙ্গ ফুলে ফুলে ভরা। চাহিয়া দেখিলাম, তাহারই উঁচু একটা ডালে জোলমা বসিয়া আছে। আমিও পরমুহূর্তে গাছে উঠিতে লাগিলাম। আমাকে গাছে উঠিতে দেখিয়া জোলমার কিন্তু কোনোরূপ ভাবান্তর হইল না। দূর দিগন্তের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে যেমনভাবে বসিয়াছিল তেমনিভাবেই বসিয়া রহিল। আমি যখন তাহার কাছাকাছি হইলাম তখন সে একবার ঘাড় ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিয়া দেখিল বটে, কিন্তু সে দৃষ্টিতে কোনো আগ্রহ, ভয় বা বিতৃষ্ণা লক্ষ্য করিলাম না, সে দৃষ্টি নিতান্তই উদাসীন। আমি তাহার পাশের ডালে আসিয়া উপবেশন করিলাম। কিছুক্ষণ নীরবতার পর বলিলাম, 'তুমি অমন করিয়া চিৎকার করিলে কেন?'

জোলমা কোনো কথা না বলিয়া চক্রবাল রেখার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। দেখিলাম, বনের ধারে যে প্রান্তরটি রহিযাছে তাহাতে একদল বন্য মহিষ চরিতেছে।

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জোলমার দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, বন্য মহিষ সম্বন্ধে আমার মনোভাব আর জোলমার মনোভাব যেন এক নয়। তাহার চোখের রহস্যময় দৃষ্টিতেই তাহা আভাসিত হইতেছিল। বন্য মহিষগুলি দেখিবামাত্র আমার মনে যে লোভ ও হনন-স্পৃহা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, জোলমার মনে ঠিক সেরূপ হয় নাই। সে সবিস্ময়ে যেন একটা আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছিল। আমি জোলমার মুখের দিকে চাহিয়াই রহিলাম, কোনো কথা বলিলাম না। আমার নীরবতাই অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করিল. জোলমা কথা কহিল।

'বৃহার ছবি ওই মহিষের দলকে টানিয়া আনিয়াছে। এইবার উহারা আমাদের জন্য প্রাণ দান করিবে।'

'বৃহার ছবি উহাদের টানিয়া আনিয়াছে? তাহা কি করিয়া সম্ভব?'

'কি করিয়া তাহা জানি না, কিন্তু সম্ভব। বৃহা ছবি আঁকে বলিয়াই হরিণের দল আসে ইহা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি। শুধু আসে না, আসিয়া আত্মদান করে।'

'আত্মদান করে? আমি তো শুনিলাম, বিতং তাহাদের লাফাই পাহাড়ের দিকে লইয়া যায়, তাহার পর তাড়া খাইয়া তাহারা পাহাড় হইতে লাফাইয়া পড়ে।'

'তুমি যাহা বলিতেছ তাহাও ঠিক, এই বন্য মহিষদের শিকার করিবার জন্যও বৃহা স্বয়ং অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আসিবে, কিন্তু বৃহার মতো যে প্রাণীরা স্বেচ্ছায় আত্মদান না করিলে কেহ তাহাদের মারিতে পারে না। ছবির অদৃশ্য টানে মুগ্ধ হইয়া তাহারা আসে এবং আমাদের হিতার্থে স্বেচ্ছায় প্রাণদান করে। উহারা দেবতা, পশুরূপে আসিয়া আমাদের উপকার করে, স্বেচ্ছায় না আসিলে কেহ জোর করিয়া উহাদের আনিতে পারে না। বৃহা ছবি আঁকিয়া উহাদের পূজা করে, তাই উহারা সন্তুষ্ট হইয়া আসে।'

আমি এরূপ কথা পূর্বে কখনও শুনি নাই। সবিস্ময়ে চুপ করিয়া রহিলাম। জোলমাই আমার কথা কহিল। বলিল, 'সন্তুষ্ট হইয়া উহারা আসে বটে, কিন্তু বীরত্ব না দেখিলে আত্মদান করে না। বৃহাকে তাই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া উহাদের সম্মুখীন হইতে হইবে। আমার বড ভয় করিতেছে। বন্য মহিষ বড় ভয়ঙ্কর জন্তু, সহজে আত্মদান করে না।'

জোলমার চোখে মুখে শঙ্কা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম, 'বৃহাকে কি যাইতেই হইবে? বৃহার বদলে যদি আমি যাই?'

জোলমা কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, 'তুমি যাইবে কেন?'

'তোমাকে নির্ভয় করিবার জন্য।'

'তুমি কি বৃহাকে রক্ষা করিবে?'

'বৃহার যাইবার প্রয়োজন কি? আমি একাই গিয়া বন্য মহিষদের সম্মুখীন হইব এবং বেশি না পারি একটাকেও অন্তত বধ করিব।'

জোলমা চকিতে আমার মুখের দিকে একবার চাহিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। মুখ ফিরাইয়া রাখিয়াই বলিল, 'বৃহাকে কিন্তু যাইতেই হইবে, কারণ সে আমাদের দলপতি। টাহা হয়তো তাহার সঙ্গে থাকিবে, তোমার কথাও বৃহাকে বলিব। তুমি কি ইতিপূর্বে বন্য মহিষ শিকার করিয়াছ?'

'করি নাই। কিন্তু তোমার জন্য আমি যে কোনো বিপদ বরণ করিতে প্রস্তুত আছি।'

ইহার উত্তরে কিন্তু জোলমা যাহা করিল তাহাতে আমি অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। সে সহসা মুখ ফিরাইয়া সানুনয়ে বলিল, 'বিদেশি, পালাও। আমাকে তুমি পাইবে না। প্রাণ থাকিতে বৃহা কখনও ওহালি-কন্যাকে অপরের হস্তে সমর্পণ করিবে না। যতদিন বাঁচিব, ততদিন অন্ধকার গুহায় বৃহার পার্শ্বে প্রদীপ লইয়া আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। আমার জীবন সাধারণ মানুষের ভোগে লাগিবে না, আমাকে তুমি কামনা করিও না, পালাও—'

দেখিলাম জোলমার মুখ পাংশুবর্ণ, অধর কম্পমান, চক্ষু জ্বালাময়ী। আমার অপ্রস্তুত ভাবটা মুহূর্তে কাটিয়া গেল, আমার শিরায় উপশিরায় রক্তপ্রবাহ চঞ্চল হইয়া উঠিল, অমি সহসা তাহার দুই হস্ত ধারণ করিয়া বলিলাম, 'আমি সাধারণ মানুষ নই, আমি পর্বতের ভাষা বুঝিতে পারি, বল্‌গা-হরিণকে ছবিতে মূর্ত করিতে পারি, গত রাত্রে ওহালিকে আমি

জ্যোৎস্নামাখা মেঘে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তোমাকে পাইবার জন্য যে-কোনো দুরূহ কার্য করিতে আমি প্রস্তুত আছি। তোমার মা যে কাঠের উপর চড়িয়া ভাসিয়া আসিয়াছিল তাহা আমি অবলীলাক্রমে স্কন্ধে তুলিয়াছি, টাহাকে জিজ্ঞাসা করিও। বৃহা যে জিকাটু পর্বতে আমার জন্য বাসস্থান নির্দেশ করিয়াছে তাহা শুনিয়াছি অতিশয় ভয়ঙ্কর স্থান। যত ভয়ঙ্কর হোক, সেখানে আমি যাইব, নিজের শক্তিতে সে স্থানকে নিরাপদ করিব, আমি প্রমাণ করিয়া দিব যে, আমি সাধারণ লোক নই। তোমাকে কামনা করিবার দাবি আমার আছে—'

জোলমার অধরে মৃদু হাস্য স্ফুরিত হইল। সে বলিল, 'দাবি থাকিলেও আমাকে পাইবে না। কারণ, আমার জীবন উৎসর্গীকৃত। আমাদের সম্প্রদায়কে বাঁচাইতে হইলে বৃহাকে ছবি আঁকিতে হইবে। আমি প্রদীপ না ধরিলে বৃহা ছবি আঁকিতে পারে না। সুতরাং বৃহার পার্শ্বে প্রদীপ ধবিয়া দাঁড়াইয়া থাকা ছাড়া আমার গত্যন্তর নাই। আমার আশা তুমি ছাড়িয়া দাও। আমাদের সম্প্রদায়ে নারীর অভাব নাই, তুমি অপর কাহাকেও বাছিয়া লও— '

এই বলিয়া জোলমা গাছ হইতে নামিতে শুরু করিল। আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম।

গাছ হইতে নামিয়া জোলমা বলিল 'তুমি কি সত্যই মহিষ শিকার করিতে যাইবে? যদি যাও তোমার কথা বৃহাকে বলিব।'

'বৃহা কবে মহিষ শিকারে বাহির হইবে?'

'তাহাকে আজ খবরটা দিব, তাহার পরে সে নিজেই দিন স্থির করিবে।'

'আমি তাহা হইলে আজ জিকাটু পাহাড়টা ঘুরিয়া আসি। কাল সকালে আবার এইখানেই তোমার প্রতীক্ষা করিব।'

'জিকাটু পাহাড়ে তুমি যাইও না, এখানেই থাক।'

'আমি যাইবই। বৃহার আদেশ আমি অমান্য করিব না।'

জোলমা নীরবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে হইল সে যেন কি বলিতে চাহিতেছে কিন্তু বলিতে পারিতেছে না। জিকাটু পাহাড় সম্বন্ধে যে ভয় টাহা এবং গৌয়ের মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছি সেই ভয় জোলমাকেও অভিভূত করিয়াছে মনে হইল। অথচ সত্য কথাটা সে যেন বলিতে পারিতেছে না। জোলমার নীরব চাহনির উত্তরে আমি প্রশ্ন করিলাম, 'জিকাটু পাহাড়ে যাইতে বারণ করিতেছ কেন? কি আছে সেখানে?'

'কি আছে জানি না, এইটুকু শুধু জানি, সেখানে গেলে কেহ ফেরে না—'

'তবে বৃহা আমাকে সেখানে যাইতে বলিল কেন?'

'শ্যেন সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য। বৃহা আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না, আমি চলিয়া গেলে তাহার ছবি আঁকা বন্ধ হইয়া যাইবে। আমি তাহাকে ছাড়িয়া অন্য কাহারও সহিত থাকি ইহা কল্পনা করাও তাহার পক্ষে শক্ত। তাই সে তোমাকে জিকাটু পাহাড়ে যাইতে বলিয়াছে।'

সহসা আমার মাথায় যেন খুন চড়িয়া গেল। আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া জোলমাকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া বলিলাম, 'জিকাটু পাহাড়ে আমি যাইব, কিন্তু তোমাকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। বৃহার কাছে তুমি আর ফিরিয়া যাইবে না।'

'ছাড়, ছাড়, ছাড়িয়া দাও—'

জোলমা চিৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু আমি তাহাকে মুক্তি দিলাম না। আলিঙ্গনপাশ হইতে সে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইলেও আমি বজ্রমুষ্টিতে তাহার একটা হাত ধরিয়া

রহিলাম। জোলমার চোখে এক অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। সে শান্ত অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল, 'আমি আজন্ম কুমারী। আমার পবিত্রতা নষ্ট করিও না। আমার পবিত্রতার প্রভাবেই বৃহা ছবি আঁকে, সমস্ত শ্যেন সম্প্রদায়ের জীবন-মরণ আমার পবিত্রতার উপর নির্ভর করিতেছে, আমাকে কলঙ্কিত করিও না, ছাড়িয়া দাও। আমাকে কলঙ্কিত করিলে শুধু শ্যেন সম্প্রদায়ের নয়, তোমারও সর্বনাশ হইবে। ওহালি তোমাকে ক্ষমা করিবে না—'

বিহাড়া ও শবরী ওকার গল্পটা আমার মনে পড়িয়া গেল। ক্ষণিকের জন্য অভিভূত হইয়া পড়িলাম কিন্তু তবু জোলমার হাত ছাড়িলাম না। ছাড়িতে পারিলাম না।

বলিলাম, 'তোমাকে আমি কলঙ্কিত করিব না। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে অপমান করিব এত বড় কাপুরুষ আমি নই। কিন্তু তোমাকে আমি ছাড়িব না। আমার সহিত তোমাকে এখনই জিকাটু পাহাড়ে যাইতে হইবে। যে ভয় তোমাদের সকলকে অভিভূত কবিয়া রাখিয়াছে আমি তোমাকে দেখাইয়া দিতে চাই যে সে ভয় অতিক্রম করিবার মতো পৌরুষ আমার আছে। তোমাকে আমার সঙ্গে জিকাটু পাহাড়ে যাইতে হইবে।'

'আমি যদি না যাই—'

'জোর করিয়া টানিতে টানিতে লইয়া যাইব।'

জোলমা নির্নিমেষে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহাব পব বলিল, 'জিকাটু পাহাড়ে যাইতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু আমার জীবনের দায়িত্ব তোমাকে লইতে হইবে। আমাদের সমস্ত সম্প্রদায়ের জীবন আমার জীবনের উপর নির্ভর করিতেছে। আমার জীবন হেলায় নষ্ট করিবার অধিকার আমার নিজেরও নাই, জিকাটু পাহাড়ে গেলে আমার জীবন যে বিপন্ন হইবে না তাহার কি জামিন তুমি দিতে পার?'

আমি আমার চর্মনির্মিত কটিপেটিকা হইতে বৃহত্তম প্রস্তর-ছুরিকাটি বাহির করিয়া তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলাম, 'যখনই তুমি নিজেকে বিপন্ন মনে কবিবে এইটি ব্যবহার করিও। প্রয়োজন বোধ করিলে আমার বুকেও বসাইয়া দিতে পার, আপত্তি করিব না।'

জোলমার চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল, 'বেশ, আমার হাত ছাড়িয়া দাও। চল তোমার সঙ্গে যাইতেছি।'

তাহার হাত ছাড়িয়া দিলাম। সে পলাইয়া গেল না, অগ্রবর্তিনী হইয়া আমাকে পথ দেখাইয়া জিকাটু পাহাড়ের দিকে লইয়া চলিল। বন্যপথ তাহার সুপরিচিত। বন্য হরিণীর মতো ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়া দ্রুতগতিতে সে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিছু দূর গিয়া সহসা একটা কথা মনে হওয়াতে আমার একটু খটকা লাগিল।

বলিলাম, 'একটা কথা আমার মনে হইতেছে। তোমার এমন মূল্যবান জীবন রক্ষণাবেক্ষণ করিবার কোনো ব্যবস্থা কি তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা করে নাই? মনে কর, সত্যই যদি কেহ তোমাকে আক্রমণ করে তোমার আত্মরক্ষা করিবার কি উপায় আছে? তোমার কাছে তো একটা অস্ত্রও নাই।'

'উপায় আছে বই কি, দেখিবে?'

জোলমা হাসিমুখে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

'কই দেখি?'

জোলমা সহসা কেকা-ধ্বনি করিয়া উঠিল। অরণ্য নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া সে ধ্বনি যেন

আকাশকেও চিরিয়া দিল। একবার, দুইবার, তিনবার চিৎকার করিল সে। তাহার পর সে চিৎকার মুহূর্ত মধ্যে শত চিৎকারে পরিণত হইল। সমস্ত বন কেকা-ধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল, তীক্ষ্ণ তীব্র শব্দময় একটা বিরাট সমুদ্র যেন অন্তরীক্ষ হইতে নামিয়া আসিতেছে। তাহার পরই পক্ষবিধূননের শব্দ। দেখিলাম, দলে দলে শত শত ময়ূর চতুর্দিক হইতে উড়িয়া আসিতেছে। তাহাদের চোখের দৃষ্টি হিংস্র, নখর উদ্যত, তাহাদের তীক্ষ্ণ চঞ্চুতে জিঘাংসা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। জোলমা হাসিয়া বলিল, 'উহারা যদি দেখে আমি বিপন্ন, প্রাণ দিয়া আমাকে রক্ষা করিবে। এই বনে আমাকে আক্রমণ করিয়া কেহ নিস্তার পাইবে না, উহাবা নিমেষে তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিবে। এই ময়ূরের দলই আমার রক্ষী। বাঘের হাত হইতেও ইহারা আমাকে রক্ষা করিয়াছে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ আমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করিতে পারে না। শ্যেন সম্প্রদায়ের সকলেই এ কথা জানে।'

তাহার পর মুচকি হাসিয়া বলিল, 'বিতংকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও।'

চতুর্দিকের ঝোপ-ঝাড় বৃক্ষশ্রেণী ময়ূরে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আকাশেও দেখিলাম অনেক ময়ূর উড়িতেছে। আমি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। জোলমা হাততালি দিয়া নাচিতে লাগিল। ময়ূরের দল আবার ক্রমে অন্তর্ধান করিল।

জোলমা বলিল, 'এইবার চল, যাই—'

পুনরায় সে অগ্রবর্তিনী হইল। আমি পুনরায় তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম।

'আমি যখন তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে স্পর্শ করিয়াছিলাম তখন তুমি ময়ূরের দলকে ডাক নাই কেন?'

প্রশ্নটা না করিয়া পারিলাম না। আমার অভিভূত চেতনায় ওই প্রশ্নটাই কেবল বারংবার বাঙ্ময় হইবার চেষ্টা করিতেছিল।

জোলমা মুখ না ফিরাইয়া উত্তর দিল, 'তোমার দৌড় কতদূর দেখিতেছিলাম। তুমি শেষ মুহূর্তে নিজেকে সংযত করিতে পারিয়াছ ইহাতে আমি খুশি হইয়াছি এবং সেই জন্যই তোমার সহিত জিকাটু পাহাড়ে যাইতে রাজি হইয়াছি—'

'ইহার পূর্বে জিকাটু পাহাড়ে কখনও গিয়াছ?'

'না। শ্যেন সম্প্রদায়ের সকলেই জিকাটু পাহাড়কে ভয় করে। ওখানে যে যায় সে আব ফিরিয়া আসে না এইরূপ জনশ্রুতি।'

'তবে এখন যাইতেছ কেন?'

'তোমার জন্য। তুমিই তো আমাকে জোর করিয়া লইয়া যাইতেছ।'

'কিন্তু তোমাকে যে জোর করিয়া কোথাও লইয়া যাওয়া যায় না, তাহার প্রমাণ তুমি এখনই দিয়াছ। তবে যাইতেছ কেন বুঝিতে পারিতেছি না।'

ইহার উত্তরে জোলমা আমার দিকে হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি মেলিয়া একবার চাহিল মাত্র, কোনো কথা বলিল না। আমিও সমস্ত পথ কোনো কথা বলিলাম না। একটা অদ্ভুত বিস্ময়ে আমার সমস্ত মন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। জোলমাকে আর মানবী বলিয়া মনে হইতেছিল না, মনে হইতেছিল, শ্যেন সম্প্রদায়ের লোকেদের বিশ্বাসই বোধহয় ঠিক, জোলমা দেবকন্যা। আর একটা কথাও কিন্তু অনিবার্যভাবে মনে হইতেছিল। মনে হইতেছিল জোলমা মানবী বা দেবী যাহাই হউক না কেন, জোলমাকে আমার চাই। তাহাকে যদি না পাই আমার সমস্ত পৌরুষ

ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কিছুকাল পূর্বে বহু নারী লইয়া ঘর করিয়াছি। এখন সহসা মনে অভিনব একটা অনুভূতি জাগরিত হইল। মনে হইল, জীবনে এই বোধহয় প্রথম নারী দেখিলাম। আমার পূর্ব জীবনের পিকি-বনটু-বোহিলা-জামাইকিনা-দোম্বি-ঠাঠা যেন কতকগুলি প্রাণহীন সন্তান প্রসব করিবার যন্ত্রমাত্র ছিল। তাহাদের না ছিল ব্যক্তিত্ব, না ছিল রূপ। তাহাদের ঘিরিয়া কল্পনা উদ্দাম হইয়া উঠিত না, এমন কি কৌতূহলও জাগরিত হইত না। তাহাদের সংস্পর্শে যে ক্ষুধা অনুভব করিয়াছি তাহা নিতান্তই পাশবিক ক্ষুধা। জোলমা আমার মনে যে ভাব উদ্দীপ্ত করিয়াছে তাহার স্বাদ ইতিপূর্বে কখনও পাই নাই। জোলমাকে আমার চাই। আমার সমস্ত সত্তা উন্মুখ হইয়া এই চিন্তাতেই নিবদ্ধ ছিল। জিকাটু পাহাড়ের ভীতিও আমার মন হইতে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। আমি স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো জোলমার অনুসরণ করিতেছিলাম।...

'ওই জিকাটু পাহাড়।'

জোলমার কথায় আমার চমক ভাঙিল। চাহিয়া দেখিলাম, রুক্ষ একটা প্রস্তরস্তূপ অভ্রভেদী হইয়া অনতিদূরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পাদদেশ দেখা যাইতেছে না। ঘননিবদ্ধ শ্যামল তরুশ্রেণীতে দৃষ্টি ব্যাহত হইতেছে। জোলমা এবং আমি উভয়েই রুক্ষ পর্বতচূড়াটার দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। একটা অদ্ভুত নীরবতায় চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন। পশু পক্ষীর কোনো শব্দ নাই, গাছের পাতাও নড়িতেছে না। দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রও যেন পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করিয়াছে। মনে হইতেছে মৃত্যু কাছে-পিঠে কোথাও যেন ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে।

'এইবার কি করিবে?'

জোলমাই প্রশ্ন করিল। প্রশ্নটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। এতক্ষণ যেন যন্ত্রচালিত মূঢ়বৎ জোলমার অনুসরণ করিতেছিলাম, প্রশ্নের আঘাতে জাগরিত হইলাম। চতুর্দিকে চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে ঠিক করিলাম, জিকাটু পাহাড়ের দিকে আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়ার পূর্বে চতুর্দিকটা একবার পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

'এইবার একটা গাছে উঠিতে চাই।'

'আমাকেও কি উঠিতে হইবে?'

'সেটা তোমার ইচ্ছা।'

'আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়াছ, এখন একথা বলিতেছ কেন?'

'প্রথমে জোর করিয়াছিলাম বটে, এখন কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছি, তোমাকে বশ্যতা স্বীকার করাইবার মতো শক্তি আমার নাই। তুমি যদি ইচ্ছা কর চলিয়া যাইতে পার। জিকাটু পাহাড়ে আমি একাই যাইব। যদি বাঁচিয়া থাকি কাল তোমার সহিত দেখা হইবে।'

জোলমার অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া সত্যই আমি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। যে পেশী-শক্তির বলে বলীয়ান হইয়া এতদিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়াছি সহসা তাহার উপর আস্থা হারাইয়া সমস্ত চিত্ত যেন বিকল হইয়া পড়িয়াছিল। থানকুর নিকট যে সব রূপকথা শুনিয়াছিলাম তাহা বাস্তবে যে রূপ পরিগ্রহ করিবে তাহা কখনও কল্পনা করি নাই। বনের ময়ূরকে জোলমা কি করিয়া বশ করিল— ঘুরিয়া ফিরিয়া এই কথাটাই আমার মনকে আকুল করিয়া তুলিতেছিল, অথচ সাহস করিয়া তাহা জোলমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিলাম না। মনে হইতেছিল জিজ্ঞাসা করিলে সে হয়তো এমন একটা কিছু করিয়া বসিবে, যাহা

আরও বিস্ময়কর, হয়তো সে প্রজাপতি বা পাখি হইয়া উড়িয়া যাইবে, আর কখনও তাহাকে পাইব না, চিরকালের মতো সে আমার নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইবে। পাছে অশোভন কিছু করিয়া ফেলি এই ভয়ে তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলাম। তাহার সম্মুখে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া তাহার হৃদয় জয় করিবার আশা বহুক্ষণ পূর্বেই বিসর্জন দিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাকে পাইবার আশা বিসর্জন দিই নাই, কিন্তু কি করিয়া যে তাহাকে পাইব তাহাও ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। বস্তুত আমি দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম। জোলমাকে চলিয়া যাইতে বলিলাম—কিন্তু যদি জোলমা সত্যই চলিয়া যায় এই আশঙ্কায় পরমুহূর্তেই আবার ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলাম। পরাজিত পশু-শক্তি অসহায়ভাবে দৈবীশক্তির দিকে চাহিয়া রহিল।

জোলমা গেল না। সে যাহা করিল তাহাও অপ্রত্যাশিত। সে জানু পাতিয়া আমার সম্মুখে বসিয়া পড়িল। আমার দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, 'তুমি জোর করিও না। জোর করিলে আমাকে কখনও পাইবে না। আমাকে আদেশ করিও না, আমাকে স্বেচ্ছায় চলিতে দাও, আমি স্বেচ্ছায় তোমারই পথে চলিব। আমার মা ওহালি মেঘবাহিনী, আকাশচারিণী। ওহালি কন্যা কাহারও বন্দিনী হইবে না। বিদেশি, তোমাকে আমার ভাল লাগিয়াছে, তোমার সঙ্গিনী হইতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু বৃহাকে আমি ত্যাগ করিতে পারিব না। তুমি...'

জোলমা কিন্তু কথা শেষ করিতে পারিল না। পরমুহূর্তে তরুশ্রেণীর মধ্যে হুড়মড় করিয়া একটা শব্দ হইল। আমিও চমকাইয়া উঠিলাম এবং পরমুহূর্তেই একটা গাছে চড়িতে শুরু করিয়া দিলাম। জোলমাও আমার অনুসরণ করিতে লাগিল। গাছের উপর উঠিয়া দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড বল্‌গা-হরিণ তরুশ্রেণী ভেদ করিয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে। ছুটিয়া আসিয়া হরিণটা একটা প্রান্তরে পড়িল, কিন্তু বেশি দূর যাইতে পারিল না, মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। আর উঠিল না, হাত পা টান করিয়া শুইয়া রহিল। আমি কিছুক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিয়া রহিলাম, তাহার পর গাছ হইতে নামিয়া গেলাম। দ্রুতবেগে কাছে গিয়া দেখিলাম হরিণটা মরিয়া গিয়াছে। উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিলাম মৃত্যুব কারণ কি। প্রথমে কিছু বুঝিতে পারিলাম না, তাহার পর সহসা নজরে পড়িল। লোমের জন্য প্রথমটা বুঝিতে পারি নাই। পৃষ্ঠের একধারে পাশাপাশি দুইটি রক্তাক্ত বিন্দু বহিয়াছে। বুঝিলাম সাপে কামড়াইয়াছে। সর্পদষ্ট হরিণের মাংস খাওয়া বিপজ্জনক, তাই সেটাকে আর টানিয়া আনিলাম না, ফেলিয়া আসিলাম।

পুনরায় গাছে উঠিয়া কিন্তু জোলমাকে দেখিতে পাইলাম না। কোথায় গেল সে? পাশাপাশি বৃক্ষশ্রেণী ঘনসন্নিবদ্ধ, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। জোলমা কি অন্য বৃক্ষে চলিয়া গেল? চারিদিকে চাহিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সহসা সমস্ত হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল, জোলমাব সন্ধানে আমি বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এক বৃক্ষ হইতে আর এক বৃক্ষ তাহার পর আর এক বৃক্ষ, ক্রমাগত বৃক্ষের পর বৃক্ষ অতিক্রম করিয়া চলিলাম। মহীরুহশ্রেণী মহাশূন্যে শাখাপত্রজটিল এক অদ্ভুত পথ সৃজন করিয়াছিল। তাহা কখনও নিবিড়, কখনও শ্যামল, কখনল পুষ্পাকীর্ণ, কখনও আকাশচুম্বী, কখনও ভূমি-মুখী, কখনও আলোকোদ্ভাসিত, কখনও অন্ধকারময়। এই পথে আত্মহারা হইয়া আমি জোলমাকে খুঁজিতেছিলাম। মনে হইতেছিল এই পথ যেন আমার মানসিক অবস্থারই প্রতিচ্ছবি! কতক্ষণ চলিয়াছিলাম মনে নাই। কখনও গাছের শাখায় ঝুলিয়া কখনও হামাগুড়ি

দিয়া, কখনও আরোহণ করিয়া কখনও অবরোহণ করিয়া আরও অনেকক্ষণ হয়তো চলিতাম কিন্তু বাধ্য হইয়া আমাকে অবশেষে থামিয়া যাইতে হইল। কারণ গাছ আর ছিল না বৃক্ষশ্রেণীর শেষ বৃক্ষে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম। এতক্ষণ জিকাটু পাহাড়ের কথাও মনে ছিল না। এইবার দেখিলাম নিজের অজ্ঞাতসারেই জিকাটু পাহাড়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি। সম্মুখেই প্রান্তর এবং প্রান্তরের অপর পারেই জিকাটু পাহাড়। পাহাড়ের পাদদেশ বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। বিস্ফারিত চক্ষে তাহাই দেখিতে লাগিলাম। একটা নিষ্করুণ রুক্ষতা যেন মূর্ত হইয়া রহিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে শ্যামলতার কোনো চিহ্ন নেই। পাহাড়ের গায়ে শ্যামলতাব কোনো চিহ্ন না থাকিলেও তাহার ঠিক পাশেই যে জলাশয়টা দেখিতে পাইলাম তাহা শৈবালাচ্ছন্ন। তাহার চারিদিকে বহুবিধ আগাছাও জন্মিয়াছে। তখন জলাশয় কেহ খনন করিত না, বুঝিলাম পাহাড়ের কোনো স্থানে উৎস বা ঝরনা আছে। ইহাও মনে হইল নিশ্চয়ই তাহা ক্ষীণধারা, তাহা না হইলে নদী হইয়া বহিয়া যাইত। জোলমা কোথায় গেল? গাছ হইতে নামিয়া পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেল নাকি! পাহাড়টার চতুর্দিক আবার ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। আমার আকুল দৃষ্টি সেই নিষ্ঠুর প্রস্তরস্তূপের প্রতি অংশে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। জোলমাকে দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু একটা জিনিস আবিষ্কাব করিলাম। পাহাড়ের দক্ষিণ অংশে অর্থাৎ জলাশয়টার দিকে বেশ বড় একটা গুহা আছে। পাহাড়ের খানিকটা অংশ বারান্দার মতো বাহির হইয়া আসিয়াছে, ঠিক তাহারই সংলগ্ন গুহাটি। ঠিক মনে হইতেছে গুহা-দ্বারের সম্মুখেই কে যেন একটি বারান্দা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। বাস করিবার মতো গুহা সন্দেহ নাই। পরমুহূর্তেই কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহাতে গুহার বাসোপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিল। গুহার কিছু উপরে বিশাল একটা পাথর রহিয়াছে। মনে হইতেছে পাহাড়ের উপব হইতে বিরাট একটা মুণ্ড যেন হুমড়ি খাইয়া গুহাটা দেখিবার চেষ্টা করিতেছে। মাথার উপর ওই বিরাট পাথর লইয়া বাস কবা মোটেই নিরাপদ নয়। মাথার উপর যদি পড়িয়া যায় নিমেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবে। হইতে পারে পাথরটা পাহাড়েরই একটা অংশ, কখনও বিচ্ছিন্ন হইবে না। কিন্তু ওটা যদি আলাদা পাথর হয়, তাহা হইলে খুবই বিপজ্জনক। তবু ওই গুহাটাকে কেন্দ্র করিয়াই মন স্বপ্ন রচনা করিতে লাগিল। জোলমা কি ওখানে বাস কবিতে চাহিবে? সে তো বলিল বৃহাকে সে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিবে না। তবে? . সহসা খট্ করিয়া একটা শব্দ হওয়াতে চমকাইয়া উঠিলাম। যেন চুরি করিয়া কি একটা অপরাধ করিতেছিলাম, শব্দটা আমাকে সতর্ক করিয়া দিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, কিছুই দেখিতে পাইলাম না। মনে হইল জোলমাই কি কোথাও লুকাইয়া আছে? আমাকে ভয় দেখাইবাব জন্য সে-ই কি শব্দ করিল? জলাশয়টার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই শিহরিয়া উঠিলাম। বিরাট এক কৃষ্ণসর্প ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পরমুহূর্তেই সে ছোবল মারিল, আবার ফট করিয়া শব্দ হইল। আর তাহাকে দেখা গেল না।

সমস্ত ব্যাপারটা এইবার যেন পরিষ্কার হইয়া গেল। বাল্যকালে আমাদের দলপতি আবারাবার মুখে শঙ্খচূড় সাপের গল্প শুনিয়াছিলাম। শঙ্খচূড় সাপ নির্জন অরণ্যে বাস করে। শঙ্খচূড় যেখানে থাকে সেখানে অন্য কোনো জন্তু থাকিতে পারে না, এমন কি সাপ পর্যন্ত নয়। ইহাদের দংশন সাংঘাতিক, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়। জলের ধারে ধারে ঘুরিয়া ইহারা শামুক আহার করে। ইহাদের ছোবলের আঘাতে শামুকের খোলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। ইহাদের ফণা

হাতুড়ির মতো, যেখানে আঘাত করে সেখানটার আর কিছু থাকে না। ইহাদের দৃষ্টিপথে পড়িলে আর রক্ষা নাই। ইহারা তীব্রবেগে ক্রোশের পর ক্রোশ ছুটিয়া আততায়ীকে আক্রমণ করে। ব্যাঘ্র, সিংহ, হস্তী সকলেই শঙ্খচূড়ের ভয়ে ভীত।

শ্যেন সম্প্রদায়ের ভয়ের কারণ এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম। টাহার কথা মনে পড়িল, 'নাগদের দলপতি প্রেত হইয়া জিকাটু পাহাড়ের গুহায় বসিয়া আছে। শ্যেনবংশীয় কেহ গেলেই তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। কোনো পশুকে সে নিজের কাছে ঘেঁষিতে দেয় না...'

সত্যই কি ওই শঙ্খচূড় সাপটা নাগ-দলপতির প্রেতমূর্তি? না, ওটা সাধারণ সাপ মাত্র? প্রেতমূর্তি যদি হয় পূজা করিলে নিশ্চয়ই প্রসন্ন হইবে। দোম্বির নিকট প্রেত-পূজার পদ্ধতি কিছু শিখিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার জন্য দুইটি কৃষ্ণ কপোত, একটি শ্বেত প্রজাপতি, তিনটি রক্তবর্ণ ফুল এবং একটি বহুরূপী গিরগিটি চাই। এইগুলিকে একসঙ্গে গাঁথিয়া একটি জীবন্ত মৃগের গলায় বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। ছাড়িয়া দিবামাত্র মৃগ যদি উত্তর দিকে ছুটিতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রেত প্রসন্ন হইয়াছে। যদি অন্য দিকে ছোটে তাহা হইলে সেই মৃগকে শিকার করিয়া তাহার মাংসের সহিত কপোত প্রজাপতি ফুল ও গিরগিটি মিশাইয়া উত্তর দিকে মুখ করিয়া প্রেতের উদ্দেশ্যে উপাচার দিতে হইবে। বেশ জটিল পদ্ধতি। সহসা সব উপকরণ সংগ্রহ করাও মুশকিল।

...অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। আবার ফট করিয়া শব্দ হইল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম শঙ্খচূড় আবার ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। এবার আরও খানিকটা কাছে আসিয়াছে। তাহার হিংস্র চক্ষু এবং লকলকায়িত জিহ্বা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম।

সহসা আমার মনের মধ্যে যেন একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। সংস্কারকে পরাভূত করিয়া সহজ বুদ্ধি সহসা প্রাধান্য লাভ করিল। মনের ভিতর কে যেন বলিল, 'প্রেত হউক, সাপ হউক, ও তোমার শত্রু, উহাকে নিপাত করিতে পারিলে জোলমাকে পাইবে, আঘাত কর, তোমার কাছে তীর-ধনুক আছে, চেষ্টা করিয়া দেখ না, ঠিক যদি মারিতে পার, এখনই সব সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে।'

ভূত-প্রেতে বিশ্বাস হারাই নাই। পরে বহুকাল পর্যন্ত এই বিশ্বাস আমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। তোমাদের অনেকের জীবনকে এখনও হয়তো নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, কিন্তু তখন—ঠিক সেই মুহূর্তে—আমার সহজ বুদ্ধি আমাকে যুক্তিযুক্ত কাজ করিতে প্রবুদ্ধ করিল। ওই সাপটা যদি প্রতিশোধকামী নাগ-দলপতির প্রেত হয়, তাহা হইলে সামান্য একটা প্রস্তরনির্মিত তীর যে উহার কিছুই করিতে পারিবে না, বরং অচিন্তপূর্ব ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটিয়া যে আমার সর্বনাশ হইয়া যাইতে পারে, একথা আমি সেই মুহূর্তে ভুলিয়া গেলাম। যে বুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারা চালিত হইয়া মানুষ যুগে যুগে অনিশ্চিত পথে পা বাড়াইয়াছে, সত্য সন্ধানে যাত্রা করিয়াছে, চিরাচরিত প্রথা ত্যাগ করিয়া নব নব প্রথার প্রবর্তন করিয়াছে, সেই বুদ্ধি ও যুক্তির বশে আমি প্রেত-ভয় তুচ্ছ করিয়া শরসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম।

শঙ্খচূড়ের ফণা লক্ষ্য করিয়া শরটা ছুঁড়িয়া দিলাম। কিন্তু ঠিক লাগিল না। সামান্য একটু আঘাত করিয়া তীর দূরে ছিটকাইয়া পড়িল। ইহার ফল হইল অতি ভয়ানক। শঙ্খচূড় যেন ক্ষেপিয়া গেল। প্রথমে তীরটার সঙ্গে সঙ্গে সে কিছুদূর ছুটিয়া গেল, তাহার পর সমস্ত জলাশয়টা মন্থন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার তর্জন-গর্জনে প্রস্তরময় জিকাটু

পাহাড়ও শিহরিয়া উঠিল। আমার কিন্তু আর ভয় করিতেছিল না। আমি একাগ্রচিত্তে সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলাম, কখন দ্বিতীয় তীরটি ছুঁড়িব। শঙ্খচূড় আর একবার যদি ফণা তুলিয়া একটু স্থির হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই লক্ষ্যভেদ করিতে পারিব। ধনুতে শর-যোজনা করিয়া রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। জলাশয় আলোড়নের ফলে কিন্তু লক্ষ লক্ষ মশা উড়িতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, জলাশয় হইতে ধূম উত্থিত হইতেছে। মশকের দল ঝাঁকে ঝাঁকে ক্রমশ আমার দিকে উড়িয়া আসিতে লাগিল। তাহাদের কামড়ে অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিলাম। ধনুতে বা তীরে নিবিষ্টচিত্ত থাকা আর সম্ভবপর হইল না। দেখিলাম, যেখানে বসিয়া আছি, সেখানে বসিয়া শরসন্ধান করা সহজ হইলেও মনঃসংযোগ করা কঠিন। অবিলম্বে পত্রবহুল একটা ডালের উপর উঠিয়া বসিলাম।

একটু পরেই শঙ্খচূড় আবার ফণা তুলিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে আমি তীর ছুঁড়িলাম। এবারও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। এবার তীরটা শঙ্খচূড়ের কাছ পর্যন্তও পৌঁছাইল না। আমি যে গাছে বসিয়াছিলাম তাহারই সম্মুখস্থ খোলা জায়গায় তাহা মাটিতে পড়িয়া গেল। এইবারেই সত্যকার বিপদে পড়িলাম। কারণ শঙ্খচূড় সবেগে এবং সগর্জনে তীরটার দিকেই কেবল ছুটিয়া আসিল না আমি যে গাছে বসিয়াছিলাম সেই গাছটার দিকেও ছুটিয়া আসিল। তীরটা কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা এবার তাহার লক্ষ্য এড়ায় নাই। শঙ্খচূড় গাছে উঠিতে পারে আবারাবার মুখে শুনিয়াছিলাম। সুতরাং প্রমাদ গণিতে হইল। স্বয়ং মৃত্যু তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া যদি দৌড়াই তাহাতেও নিস্তার পাইব না। অনতিবিলম্বেই শঙ্খচূড় আমাকে ধরিয়া ফেলিবে। কিছুক্ষণ আগে বল্‌গা-হরিণটার যে পরিণাম হইয়াছে আমারও তাহাই হইবে।

আরও খানিকটা উপরে উঠিয়া ঘনপত্রপল্লবে আত্মগোপন করিয়া রহিলাম। একটু পরেই অনুভব করিলাম শঙ্খচূড় গাছ বাহিয়া উপরে উঠিতেছে। তাহার রুষ্ট তর্জন শুনা যাইতে লাগিল। আমি তখন রুদ্ধনিঃশ্বাসে সন্তর্পণে গাছের একটা ডাল ধরিয়া পাশের গাছে গিয়া আশ্রয় লইলাম। যদিও যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলাম তবু কিন্তু একটু শব্দ হইল। পাশের গাছে বসিয়া বসিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলাম শঙ্খচূড় আমার সন্ধানে শাখায় শাখায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমি যে বৃক্ষান্তরে আছি তাহা সে তখনও টের পায় নাই। সহসা সে আমার খুব কাছে আসিয়া পড়িল, আমি আর নিজেকে স্থির রাখিতে পারিলাম না প্রস্তর কুঠারটা সজোরে তাহার শির লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িলাম। এবার কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হই নাই, কুঠারটা সমেত শঙ্খচূড় ছিটকাইয়া নিচে পড়িয়া গেল। সভয়ে লক্ষ্য করিলাম পড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু কাবু হয় নাই, সরোষে কুঠার-ফলকে ছোবল দিতেছে, মুখ রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে, তবু ফণা তুলিতেছে। আবার সে গাছের দিকে ছুটিয়া আসিল, আমি যে গাছটায় ছিলাম সেই গাছে চড়িতে শুরু করিল, আততায়ী কোথায় বসিয়া আছে তাহা যেন সে বুঝিতে পারিয়াছে। আমি ত্বরিত গতিতে তৃতীয় বৃক্ষে গিয়া বসিলাম। আমার কাছে যে দুইটি তীর ছিল, সে দুইটি পূর্বেই ব্যবহার করিয়াছি। কুঠারটি হস্তচ্যুত হইয়াছে, প্রস্তর-ছুরিকাটিও জোলমাকে দিয়াছিলাম, আমার কাছে সুতরাং ধনুকটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মাত্র ধনুক লইয়া কি করিয়া ওই বিষধরের সঙ্গে যুঝিব? মটাৎ করিয়া গাছের একটা ডাল ভাঙিয়া লইলাম। যদিও একটা অস্ত্র হস্তগত হইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিপদেও পড়িয়া গেলাম। শব্দে আকৃষ্ট হইয়া সাপ ফণা

তুলিল এবং আমাকে দেখিতে পাইল। তাহার হিংস্র চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হইয়া আমাকে যেন আঘাত করিল। দেখিলাম আর রক্ষা নাই, কাছে আসিয়া পড়িল বলিয়া! আর একটা শাখা পার হইলেই আমাকে দংশন করিবে। দুই হাতে গাছের ডালটা তুলিয়া সজোরে তাহার ফণায় আঘাত করিলাম। আঘাতের চোটে আবার সে নীচে পড়িয়া গেল, কিন্তু এবারেও দমিল না, আবার দেখিলাম গাছের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। ডালটা ছুঁড়িয়া মারিলাম, তবু আসিতেছে। আর একটা ডাল ভাঙিলাম, আবার ছুঁড়িলাম। আর একটা ভাঙিলাম...উন্মাদের মতো কতক্ষণ ধরিয়া যে কত ডাল ভাঙিয়াছি তাহা খেয়াল ছিল না। প্রতিবার আঘাত করিয়া যদিও তাহার গতি ব্যাহত করিতেছিলাম, কিন্তু তাহাকে নিরস্ত করিতে পারি নাই, হত্যাও করিতে পারি নাই, নিষ্ঠুর নিয়তির মতো আমাকে গ্রাস করিবার জন্য বারংবার সে গাছের দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল। আমার আশেপাশে ভাঙিবার মতো আর ডাল ছিল না, আতঙ্কে শ্রান্তিতে আমার হাতও অবশ হইয়া আসিতেছিল, বিষাক্ত মৃত্যুর হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে তবু প্রস্তুত ছিলাম না। ঠিক করিয়াছিলাম অবশেষে সাপটার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া তাহার টুঁটি কামড়াইয়া ধরিব। যদি মরিতেই হয় একসঙ্গেই মরিব।

...এমন সময় এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিল। কেকারবে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দেখিলাম ঝাঁকে ঝাঁকে ময়ূর উড়িয়া আসিতেছে। জোলমাও কেকারব করিতে করিতে একটা গাছে আসিয়া উঠিল।

'জোলমা! কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ?'

'আমার ময়ূরদের ডাকিতে গিয়াছিলাম। তুমি যখন বল্‌গা-হরিণের দিকে চলিয়া গেলে তখন আমি বিরাট একটা সাপ দেখিতে পাইয়াছিলাম। মনে হইল এই সাপের জন্যই বোধহয় জিকাটু পাহাড় ভয়ানক। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল ময়ূরেরা সাপের শত্রু, তাই ময়ূরদের ডাকিয়া আনিলাম। তুমি কি সাপটা দেখিয়াছ?'

'সাপটার সঙ্গেই এতক্ষণ যুদ্ধ করিতেছিলাম। ওই যে—'

দেখিলাম সাপটা ময়ূরদের সাড়া পাইয়া বৃক্ষশ্রেণী হইতে অনেক দূরে সরিয়া ফাঁকা মাঠের মাঝখানে ফণা উদ্যত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে যদি এভাবে সরিয়া না যাইত তাহা হইলে ময়ূরের দল তাহাকে হয়তো দেখিতেই পাইত না। এবার শঙ্খচূড়কে রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতে হইল। ময়ূরের দল ছোঁ মারিতে মারিতে তাহাকে তাড়া করিয়া লইয়া চলিল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। শঙ্খচূড় ফণা তুলিয়া, মাঝে মাঝে শূন্যে লাফাইয়া উঠিয়া, ময়ূরদের কামড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, ময়ূরের দলও তারস্বরে চিৎকার করিয়া তাহার নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়া পরমুহূর্তেই আবার উদ্যত-নখচঞ্চু হইয়া বিদ্যুদ্বেগে নামিয়া আসিতেছে এবং তাহাকে আঘাত করিতেছে। সহসা শঙ্খচূড় পাহাড় লক্ষ্য করিয়া অতি দ্রুতগতিতে ছুটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সে পাহাড়ের গা বাহিয়া উঠিয়া সেই গুহাটার ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। ময়ূরের দল চক্রাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেকারবে চতুর্দিক পূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। আর তাহার নাগাল পাইল না।

আমরা উভয়েই নির্বাক হইয়া এতক্ষণ এই দৃশ্য দেখিতেছিলাম। শঙ্খচূড়কে গুহার মধ্যে অন্তর্ধান করিতে দেখিয়া আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। জোলমার দিকে চাহিয়া দেখিলাম সে তন্ময় হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। মুখ তুলিয়া দেখি পালক মেঘে আকাশ পরিপূর্ণ।

'কি দেখিতেছ?'

'ছবি। ওহালির ছবি। ভাল করিয়া দেখ, একটু পরে আর থাকিবে না। আশ্চর্য, নয়? ওহালি ছবির পর ছবি আঁকিতেছে, কিন্তু দুইটা ছবি কখনও এক রকম হয় না। একটা ছবিই ধীরে ধীরে আর একটা ছবি হইয়া যায়, তাহার পর আর একটা, তাহার পর আর থাকে না!'

মুগ্ধ দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া সে বসিয়া রহিল। তাহার নীল চক্ষুর দৃষ্টি আকাশের বিরাট নীলে নিমগ্ন হইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল তাহার দেহটাই যেন আমার পাশে বসিয়া আছে, মন নাই। মন অসীম শূন্যে পক্ষ বিস্তার করিয়াছে, শঙ্খচূড়, ময়ূর, জিকাটু পাহাড় ছাড়িয়া নামহীন এক সুদূরলোকে কিসের যেন সন্ধান করিতেছে। আমি অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম। সত্যই মনে হইতেছিল জোলমা বুঝি এ জগতের নয়। আমি কিন্তু বেশিক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিলাম না, শঙ্খচূড় এখনও জীবিত আছে এই ধারণাটা সাপের মতোই আমার মনে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল। তাহাকে নিঃশেষ না করা পর্যন্ত আমার কর্তব্য অসমাপ্ত থাকিবে এই ধরনের একটা বোধ আমাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিতেছিল। পালক মেঘের মনোরম বিন্যাস আমাকে মুগ্ধ করিলেও তাহা লইয়া আর সময়ক্ষেপ করা অনুচিত মনে হইতেছিল। এখনই বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া গুহার দিকে যাওয়া উচিত একথা বার বার মনে হইলেও কেন জানি না মুখ ফুটিয়া তাহা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলাম। মনে হইতেছিল, কথা বলিলেই যেন একটা পবিত্র কিছু নষ্ট হইয়া যাইবে। সেই অসভ্য যুগেও বিরাটের মহত্ত্ব নিগূঢ়ভাবে আমাদের চিত্তকে স্পর্শ করিত। যাহা অসাধারণ, যাহা দৈনন্দিন জীবনযাত্রা হইতে বিভিন্ন তাহাকে আমরা শুধু ভয় নয়, শ্রদ্ধাও করিতাম। জোলমার যতই পরিচয় পাইতেছিলাম ততই তাহার প্রতি শ্রদ্ধা হইতেছিল। মনে হইতেছিল সে দৈবীশক্তির অধিকারিণী।

জোলমা সহসা বলিল, 'ওহালি আকাশে আজ এমন সুন্দর ছবি কেন আঁকিয়াছে জান? লাফাই পাহাড়ে বৃহা আজ বল্‌গা-হরিণদের পূজা করিবে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি ফিরিতে হইবে, চল।'

'আমি কিন্তু ওই সাপটাকে শেষ না করিয়া ফিরিব না।'

'কি করিয়া শেষ করিবে?'

'দেখ না।'

আমি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম জোলমাও আমার অনুসরণ করিতেছে। প্রান্তরে নামিয়া আমি দ্রুতবেগে জিকাটু পাহাড়ের দিকে চলিতে লাগিলাম। শঙ্খচূড়কে আর দেখিতে না পাইয়া ময়ূরদল অনেকটা শান্ত হইয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহাদের কেকাধ্বনি যদিও জিকাটু পাহাড়ের ভয়ঙ্কর শান্তিকে আরও ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিতেছিল, কিন্তু তাহারা আর উড়িয়া বেড়াইতেছিল না। বৃক্ষশ্রেণীর শীর্ষে শীর্ষে বসিয়া তাহারা সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। আমাকে প্রান্তরমধ্যে দেখিয়া আবার তাহারা সমবেতভাবে চিৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু জোলমা পিছনে ছিল, সে আবার গ্রীবালগ্ন চামড়ার থলি হইতে খাবার বাহির করিয়া তাহাদের দিতে লাগিল। ময়ূরের দল তাহাকে ঘিরিয়া আহারে মাতিল। আমি একবার ফিরিয়া এই দৃশ্য দেখিলাম, তাহার পর আবার

চলিতে লাগিলাম। গতিবেগ বাড়াইয়া দিলাম। অন্তরের অন্তস্তলে আমি কেমন যেন একটা লজ্জা বোধ করিতেছিলাম। জোলমার ময়ূরবাহিনীই যে আমাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছে, আমার নিজের শক্তিবলে আমি যে কিছুই করিতে পারি নাই একথা অস্বীকার করিতে পারিতেছিলাম না বলিয়া মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিছুক্ষণ পূর্বে জোলমার নিকট বীরত্ব আস্ফালন করিয়া তাহাকে 'তাক' লাগাইয়া দিব বলিয়া টানিয়া আনিয়াছিলাম। সে বীরত্বের কোনো মর্যাদাই রক্ষা করিতে না পারাতে আমার পৌরুষ আমার নিজের কাছেই হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। যেমন করিয়া হউক তাহাকে স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। নিজের শক্তিতে জোলমার কোনো সাহায্য না লইয়া ওই শঙ্খচূড়কে বধ করিতেই হইবে। তাহা করিতে গিয়া যদি আমার প্রাণ যায় তাহাও শ্রেয়। আমি যে নির্ভীক বীর একথা অন্তত জোলমা বুঝুক। নারীর চক্ষে নিজেকে এত দিন বড় প্রতিপন্ন করিবার যে চেষ্টা করিয়াছি তাহা নিতান্তই দৈহিক। পুরুষ-পশু বা পুরুষ-পাখি সহচরীর মনোরঞ্জন করিবার জন্য যে প্রকার দৈহিক আস্ফালন করে আমিও এতকাল তাহাই করিয়া আসিয়াছি। প্রেয়সীর চক্ষে নিজের মানসিক উৎকর্ষ সপ্রমাণ করিবার জন্য সুনিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ধাবিত হওয়ার প্রেরণা আমার জীবনে এই প্রথম। একটা অদ্ভুত উন্মাদনায়, একটা অপূর্ব আনন্দে উদ্বুদ্ধ হইয়া আমি ছুটিতেছিলাম, আমার ভয় কবিতেছিল না। মনে অনা কোনো অনুভূতিও ছিল না। একমাত্র জোলমার প্রভাবেই আমার সমস্ত চিত্ত পরিপ্লুত হইয়াছিল। যতই মনে হইতেছিল সে আমার নাগালের বাহিরে, ততই তাহাকে পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিতেছিলাম, মনে হইতেছিল তাহার কাছে নিজেকে বীর প্রতিপন্ন করিতে পারিলে সে আমাকে বরণ করিবে। ইহাই তাহাকে পাইবার একমাত্র উপায়।

...পাহাড়ের অনেক উপরে উঠিয়া গিয়াছিলাম। আমার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল, শ্বাসকষ্ট হইতেছিল, তবু থামিতে পারিতেছিলাম না। জোলমা আমার অনুসরণ করিতেছিল কি না জানি না। তাহাকে আর দেখা যাইতেছিল না। বাঁকা পথ ধরিয়া উপরে উঠিতেছিলাম, প্রান্তরটা দৃষ্টির আড়ালে পড়িয়াছিল। জোলমা আসুক ইহা আমি চাহিতেও ছিলাম না। এই দুঃসাধ্য সাধন আমি একাই করিব। আমার লক্ষ্য ছিল গুহার ঊর্ধ্বে স্থাপিত সেই বড় গোল পাথরটা, যেটা দেখিয়া মনে হইয়াছিল কেহ যেন উপর হইতে হুমড়ি খাইয়া গুহাটাকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছে। আর একটু উঠিয়াই পাথরটা দেখিতে পাইলাম। দেখিতে পাইবামাত্র আমার দেহে যেন নববল সঞ্চারিত হইল। ওই পাথরটাই আমার একমাত্র আশা। ওটাকে যদি উপর হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে পারি গুহার মুখটা বন্ধ হইয়া যাইবে। বন্দী শঙ্খচূড়কে হত্যা করা তখন কঠিন হইবে না। গুহার যদি আর একটা মুখ থাকে, শঙ্খচূড় যদি সেদিক দিয়া ইতিমধ্যেই বাহির হইয়া গিয়া থাকে, এ সকল সম্ভাবনা যে ছিল না তাহা নয়, কিন্তু এসব কথা আমি ভাবিতেও চাহিতেছিলাম না। আশা করিতেছিলাম ময়ূরের ভয়ে ভীত শঙ্খচূড় এখন কিছুক্ষণ গুহা হইতে বাহির হইবে না, পাহাড়ের গায়ে দ্বিতীয় কোনো ছিদ্রও হয়তো নাই। সুতরাং আমার সমস্ত ভরসা ও স্বপ্ন এখন নিবদ্ধ হইয়াছিল ওই পাথরটার উপর। পাথরটার কাছে আসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম। আনন্দে উত্তেজনায় আমার সর্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল। পাথরটা সম্পূর্ণ আলাদা, পাহাড়ের অংশবিশেষ নহে। পাহাড়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন হইয়াও নাই। মাত্র এক জায়গায় সামান্য একটু সংযোগ আছে।

ঠেলিয়া দিলে নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইবে। প্রাণপণে ঠেলিলাম, পাথর কিন্তু নড়িল না। আবার ঠেলিলাম, কিন্তু না, কোনো ফল হইল না। আবার ঠেলিলাম?...

...অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বহুবার ঠেলিয়াও পাথরকে একচুল নড়াইতে পারি নাই। পাথরটাকে ধরিয়াই বসিয়া বসিয়া হাঁপাইতেছিলাম। প্রখর রৌদ্রে সমস্ত পাহাড়টা উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল, মনে হইতেছিল মৃত্যুর নবতর একটা রুদ্র রূপ যেন ধীরে ধীরে মূর্ত হইয়া উঠিতেছে। জিকাটু নূতন অস্ত্র বাহির করিয়াছে।

সহসা জোলমার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, 'বিদেশি তুমি কোথায়, সাড়া দাও।'

মনে হইল শব্দটা যেন আকাশ হইতে ভাসিয়া আসিতেছে। ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম দক্ষিণ দিকে পর্বতের সানুদেশে অবস্থিত শুষ্কপত্র একটা গাছের উপর হইতে জোলমা আমাকে ডাকিতেছে। সাড়া দিলাম। সাড়া পাইয়াই সে গাছ হইতে নামিয়া আমার দিকে আসিতে লাগিল। দেখিলাম আমার কুঠারখানা সে কুড়াইয়া আনিয়াছে।

'ওটা ফেলিয়' দাও। সাপের বিষে ওটা মাখা। শঙ্খচূড় ওটাতে বহুবার ছোবল দিয়াছে।'

'ধুইয়া আনিয়াছি। বাড়ি চল, এখানে কি করিতেছ? আমাকে এতক্ষণ দেখিতে না পাইয়া বৃহা নিশ্চয়ই খুব উদ্বিগ্ন হইয়াছে। তা ছাড়া আজ লাফাই পাহাড়ে উৎসব, আমাকে এখনই যাইতে হইবে। তুমিও চল।'

'আমি পাথরটাকে ঠেলিয়া নীচে ফেলিয়া দিতে চাই। গুহামুখ বন্ধ হইলে শঙ্খচূড় মরিবে। শঙ্খচূড়কে না মারিয়া আমি যাইব না। তুমি চলিয়া যাইতে পার। আমি কাজ শেষ না করিয়া ফিরিব না।'

জোলমা ঘুরিয়া ফিরিয়া পাথরটাকে দেখিল। একবার ঠেলিবার চেষ্টা করিল।

'আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছি, অত সহজে হইবে না।' জোলমা ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, 'চল তাহা হইলে ওই গাছটা হইতে গোটা দুই মোটা ডাল কাটিয়া আনি। পাথরের নিচের দিকে ডাল ঢুকাইয়া চাড় দিলে হয়তো কাজ হইবে।'

তাহাই করিলাম। প্রায় সমস্ত গাছটাই কাটিয়া টানিতে টানিতে সেটা উপরে লইয়া আসিলাম। বেশি বড় গাছ নয়, সহজেই কাটা গেল। যদিও খুব ক্লান্ত ছিলাম কিন্তু জোলমার সান্নিধ্যে দেহে নূতন বল সঞ্চারিত হইল। জীবনে বহুবার ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, নূতন প্রেরণা ক্লান্ত দেহকেও উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে, দেহের অভ্যন্তরে সহসা নূতন শক্তির উৎস খুলিয়া যায়। মধ্যাহ্ন রৌদ্রে চতুর্দিক পুড়িয়া যাইতেছিল, জিকাটু পর্বতের নিরুদ্ধ উষ্মা প্রকট হইতে প্রকটতর হইতেছিল, আমি ত্বরিতহস্তে কুঠার চালাইয়া গাছটাকে পরিষ্কার করিতেছিলাম, জোলমা চুপ করিয়া বসিয়াছিল, অতিশয় নির্বিকারভাবে চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। প্রখর রৌদ্রকে উপেক্ষা করিয়া গাছের ফুল যেমন অতিশয় স্বাভাবিক ঔদাসীন্যভরে গাছের শাখায় ফুটিয়া থাকে, জোলমাও যেন তেমনিভাবে বসিয়াছিল। ওই বিষধর সর্প, দ্বিপ্রহরের রৌদ্র বা আমার এই পাথর ফেলিবার আয়োজন কিছুই যেন তাহার চিত্তকে স্পর্শ করিতেছিল না। মাঝে মাঝে আকাশের পালক মেঘের দিকে চাহিয়া তাহার চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল মাত্র। মনে হইতেছিল আকাশে সে যেন কোনো পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইতেছে।

...গাছের কাণ্ডটার এক প্রান্ত সূচালো করিয়া পাথরটার তলায় ঢুকাইবার পূর্বে পাথরের যে অংশটা পাহাড়ের গায়ে লাগিয়াছিল সেই অংশটার চারিদিক প্রস্তর-ছুরিকা ও কুঠারের

সাহায্যে বেশ পরিষ্কার করিয়া লইয়াছিলাম। পাথরের তলায় গাছের ডালটা বেশ ভালভাবে ঢুকিয়াছিল। সজোরে চাড় দিলাম, কিন্তু পাথরটা নড়িল না। আর একবার দিলাম, তবু কিছু হইল না। প্রাণপণ শক্তিতে ডালটা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িলাম, পাথর নড়িল না। কোনো এক অদৃশ্য শক্তি আমার পৌরুষের অহঙ্কারকে যেন বার বার পর্যুদস্ত করিয়া দিতে লাগিল। সেদিন সেই নিদাঘতপ্ত দ্বিপ্রহরে রুক্ষ জিকাটু পাহাড়ের শীর্ষে মর্মান্তিক রূপে পুনরায় অনুভব করিতে হইল যে আমার একক প্রয়াস নিতান্তই সীমাবদ্ধ। সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি, মানব-মানবীর সম্মিলিত মনীষাই যে মনুষ্য জাতিকে জয়-যাত্রার পথে আগাইয়া লইয়া গিয়াছে তাহার ইঙ্গিত অসভ্য যুগেও আমরা বারংবার পাইয়াছি। দৈনন্দিন জীবনের ছোটোখাটো ব্যাপারেই আমাদের একক অহঙ্কার বারংবার পরাজিত হইয়াছে। সংকল্প করিয়াছিলাম জোলমার সাহায্য লইব না, কিন্তু সে সংকল্প টিকিল না। জোলমা নিজেই অগ্রসর হইয়া আসিল।

'দুইজনে মিলিয়া চাড় দিলে হয়তো পাথরটা নড়িবে। সাহায্য করিব?'

'বেশ, এস।'

জোলমা এবং আমি দুইজনে মিলিয়া চাড় দিতে লাগিলাম। একটু পরেই পাথবটা স্থানচ্যুত হইল এবং সশব্দে গড়াইয়া নিচে পড়িয়া গেল। যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। গুহার মুখটা বন্ধ হইয়া গেল। আপাতদৃষ্টিতে শঙ্খচূড়ের নির্গমনের আর কোনো পথ রহিল না। পাথরটা সরিয়া যাওয়াতে কিন্তু আর একটা গর্ত বাহির হইয়া পড়িল। উঁকি মারিয়া দেখিলাম। অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখা গেল না। গর্তের মুখে কান পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করিলাম যদি কিছু শোনা যায়। যাহা শোনা গেল তাহাতে কিন্তু শিহরিয়া উঠিলাম। শঙ্খচূড়ের তর্জন-গর্জন শোনা যাইতেছে। নিচের গুহার সহিত তাহা হইলে ইহার যোগ আছে! কাছেই একটা ছোট গোল পাথর ছিল, সেটা গড়াইয়া আনিয়া গর্তের মুখটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া দিলাম। জোলমা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল।

'শঙ্খচূড়ের তর্জন শোনা যাইতেছে। হয়তো এই গর্ত দিয়া ও আবার বাহির হইয়া আসিবে। এক কাজ করা যাক্—'

'কি?'

'তুমি গাছের শুষ্কপত্র ও ডালগুলি এদিকে লইয়া এস। ওগুলিতে আগুন লাগাইয়া গুহার ভিতরে ফেলিয়া দেওয়া যাক। শঙ্খচূড় পুড়িয়া মরুক—'

আমাদের সকলের সঙ্গেই তখন চকমকি পাথর থাকিত। পাথরে পাথরে ঘষিয়া আমরা আগুন জ্বালাইতে পারিতাম। আমাদের দুইজনের কাছেই চকমকি পাথর ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুষ্ক ডাল-পালাতে আগুন ধরিয়া উঠিল। গর্তের মুখ হইতে পাথরটি সরাইয়া একে একে সেগুলি গুহার মধ্যে ফেলিয়া দিলাম। তাহার পর পাথর দিয়া গর্তের মুখটি যখন বন্ধ করিতেছি তখন জোলমা সহসা বলিল—'এই গুহায় নিশ্চয় আগে মানুষ বাস করিত। তাহারাই বোধহয় ওই বড় পাথরটা দিয়া এই ছিদ্রটা বন্ধ করিয়াছিল। নাগবংশীয়দের সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে তাহা হয়তো মিথ্যা নয়। হয়তো এই শঙ্খচূড় তাহাদেরই কাহারও রূপান্তরিত মূর্তি। তাহাকে এমনভাবে দগ্ধ করাটা কি ভাল হইল? ও কি বল্‌গা-হরিণদের মতো স্বেচ্ছায় আমাদের সকলের জন্য আত্মবিসর্জন করিল? চল, বৃহাকে সব কথা খুলিয়া বলি। আমার কেমন যেন ভয় করিতেছে।'

আমি জোলমার সব কথা ভাল বুঝিতে পারিতেছিলাম না। অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। জোলমা কিন্তু আর কিছু বলিল না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্রুতপদে নামিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল একটা দুর্নিবার আকর্ষণ যেন তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, ইচ্ছা করিলেও সে যেন আর থামিতে পারিবে না। দেখিতে দেখিতে সে অনেক দূর নামিয়া গেল। আমিও নামিতে লাগিলাম। প্রান্তরে নামিয়া দেখিলাম জোলমা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতেছে।

'জোলমা—জোলমা—'

জোলমা ফিরিয়া চাহিল না, দেখিতে দেখিতে বৃক্ষশ্রেণী পার হইয়া আমার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল। আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ছিলাম, তাহার সহিত পাল্লা দিয়া ছুটিবার সামর্থ্য আমার ছিল না, তবু যথাসম্ভব দ্রুতবেগেই তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। জিকাটু পর্বতের সীমা সেই বৃক্ষ-বীথিকা যখন পার হইয়া গেলাম তখনও জোলমাকে দেখিতে পাইলাম না। কোন্ দিকে যাইব? বৃহার আস্তানার দিকে যাওয়া নিরাপদ মনে হইল না। টাহা, গৌ, বিতং এবং জোলমার মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহা হইতে আমার প্রতি বৃহার মনোভাব যে কি তাহা স্পষ্ট হইয়াছে। আমি জোলমার সহিত কোনো প্রকার ঘনিষ্ঠতা করি ইহা বৃহার অভিপ্রেত নয়। আমাকে নিঃশেষ করিবার জন্যই সে আমাকে জিকাটু পাহাড়ের গুহা অন্বেষণ করিতে বলিয়াছিল। এখানে থাকিতে হইলে বৃহার নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। আমি বনের দিকেই অগ্রসর হইলাম। চলিতে চলিতে নানা কথা মনে হইতেছিল। নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে পর্বত-দেবতার যে নিগূঢ় আদেশ আমি শুনিয়াছিলাম তাহা অমান্য করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবার সাহস আমার ছিল না। আমরা সে যুগে এইরূপ অদ্ভুত সংস্কারের দ্বারাই চালিত হইতাম। জোলমাকে দেখিবার পর হইতে বিশেষত তাহার অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া, এ স্থান ত্যাগ করিবার বাসনাও ত্যাগ করিয়াছি। জোলমাকে লাভ করিবার আশা আমি কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না। শক্তিশালী বৃহাব বিরুদ্ধ মনোভাবকে অগ্রাহ্য করিয়াও আমাকে এখানে থাকিতে হইবে। জোলমার মনোভাব কিন্তু ঠিক বুঝিতে পারি নাই। সে আমার সঙ্গিনী হইতে চায়; কিন্তু বৃহাকেও সে ছাড়িবে না বলিয়াছে। বৃহা যদি আমার সান্নিধ্য পছন্দ করিত, জোলমার প্রতি আমার এই মনোভাবকে সমর্থন করিত, তাহা হইলে কোনো গোল থাকিত না। কিন্তু বৃহা আমাকে বিনাশ করিতে চায়। আমি আর একটা ব্যাপারও ভাল বুঝিতে পারিতেছিলাম না। বৃহা শ্যেন সম্প্রদায়ের দলপতি, ইচ্ছা করিলেই সে আমাকে নিজের এলাকা হইতে দূর করিয়া দিতে পারে। প্রথম দিন যখন তাহার কাছে গিয়াছিলাম, কিংবা যে মুহূর্তে সে জোলমার প্রতি আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছিল তখনই সে আমাকে স্পষ্ট ভাষায় বলিল না কেন—তোমাকে এখানে থাকিতে দিব না, এখানে তোমার স্থান নাই। ইহা বলিলে আমাকে চলিয়া যাইতে হইত। স্পষ্টভাবে আমাকে চলিয়া যাইতে না বলিয়া আমাকে এভাবে জিকাটু পাহাড়ে পাঠাইয়া বিষধর শঙ্খচূড়ের কবলে ফেলিবার কি প্রয়োজন ছিল? তখনও বুঝি নাই যে, বৃহা সহজ-সরল বন্য প্রকৃতির এক ধাপ ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। সে নিয়ম করিয়াছে যে গৌ যদি কোনো আগন্তুকের আগমনে কোনো দুর্লক্ষণ দেখিতে না পায় তাহা হইলে সে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া অভ্যর্থনা করিবে। আগন্তুক যদি শ্যেন সম্প্রদায়ের মধ্যে বসবাস করিতে চায় বৃহা

তাহার বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিবে। যে নিয়ম নিজেই সে প্রবর্তন করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা তাহার পক্ষে অশোভন। তাই সে কৌশল করিয়া বাঁকাপথে আমাকে সরাইতে চাহিয়াছিল। প্রথমে কিন্তু এত কথা আমি বুঝিতে পারি নাই। কিংবা জানি না, হয়তো সে আমাকে পরীক্ষা করিতেছিল।

...বনে আমার সেই পুরাতন বৃক্ষকোটরের সমীপবর্তী হইয়া দেখিলাম পলিতকেশা গৌ বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চোখে মুখে উৎকণ্ঠা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমাকে দেখিতে পাইয়া সে ছুটিয়া আসিল।

'তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'জিকাটু পাহাড়ে।'

'জিকাটু পাহাড়ে? সর্বনাশ, সেখানে তোমাকে যাইতে মানা করিয়া গেলাম তবু গেলে কেন? সত্যই সেখানে গিয়াছিলে? সেখানে গেলে তো কেহ ফেরে না।'

আমি স্মিতমুখে কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম, তাহার পর বলিলাম, 'কিন্তু আমি ফিরিয়াছি। যে বিরাট শঙ্খচূড় নাগ এ অঞ্চলে সকলের মনে ত্রাস সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল তাহাকে বধ করিয়াও আসিয়াছি।'

'বল কি! সেই সাংঘাতিক নাগরূপী প্রেতকে তুমি বধ করিয়াছ! এ অসম্ভব কি করিয়া সম্ভব হইল! বল, বল, সব খুলিয়া বল। একথা আমি যে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। বিদেশি, তুমি মানুষ না ছদ্মবেশী দেবতা—'

গৌ সহসা আমার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আমার দুই জানু জড়াইয়া ধরিল। অনুভব করিলাম তাহার সর্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, ভয়ে না আনন্দে তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আমি তাহাকে দুই হাত বাড়াইয়া তুলিয়া ধরিলাম। তাহার পর হাসিয়া বলিলাম—

'আমি তোমাদেরই মতো মানুষ। যাহা করিয়াছি, তাহা তোমাদেরই জোলমার সাহায্যে করিয়াছি। জোলমা না থাকিলে একা আমি পারিতাম না।'

'জোলমা তোমার সঙ্গে ছিল?'

'হ্যাঁ।'

গৌ-কে তখন আনুপূর্বিক সমস্ত কথা সবিস্তারে বলিলাম। সমস্ত শুনিয়া গৌ প্রগল্‌ভা বালিকার মতো হাসিয়া উঠিল, তাহার পর হাততালি দিয়া নাচিতে নাচিতে আমাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল, বলিতেও লাগিল, 'এইবার বন-ময়ূরীর মন ফিরিয়াছে, এইবার সে ময়ূরের পেখমের শোভা দেখিয়াছে, এইবার সে নীড় বাঁধিবে।' তাহার পর সহসা আবার থামিয়া গেল, আমার সম্মুখে বসিয়া আমার চিবুক ধরিয়া বলিল, 'কিছু খাইয়াছ কি? মুখটি যে শুকাইয়া গিয়াছে।'

'না, এখনও কিছু খাই নাই।'

'চল, তোমার জন্য একটা নেউল মারিয়া রাখিয়াছি। আর একটা চমৎকার খাবারও তোমাকে খাওয়াইব। চল—'

হাত ধরিয়া গৌ আমাকে নিবিড়তর অরণ্যে লইয়া গেল। একটা গাছের তলায় দেখিলাম, মাটি খোঁড়া রহিয়াছে, কেহ যেন গর্ত করিয়া আবার গর্তটা বুজাইয়া দিয়াছে। গর্তের মাটি

সরাইয়া গৌ মৃত নেউলটাকে বাহির করিল। তাহার পর নিজেই সে ত্বরিতহস্তে কিছু শুষ্কপত্র জড়ো করিয়া চকমকি পাথর ঠুকিয়া আগুন জ্বালাইয়া ফেলিল।

'এটাকে ঝলসাইয়া তুমি ততক্ষণ খাও। আমি আসিতেছি।'

তাহাকে কিছু বলিবার পূর্বেই সে বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমারও বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। আর কালবিলম্ব না করিয়া আমি আহারে প্রবৃত্ত হইলাম। নেউলটিকে যখন প্রায় নিঃশেষ করিয়াছি, তখন গৌ ফিরিয়া আসিল, তাহার হাতে দেখিলাম, পাতায় মোড়া কি যেন রহিয়াছে।

'এগুলোকেও আগুনে একটু সেঁকিয়া লও চমৎকার লাগিবে।'

দেখিলাম, গৌ পাতায় মুড়িয়া প্রচুর পিপীলিকার ডিম লইয়া আসিয়াছে। বহুদিন পিপীলিকার ডিম খাই নাই, এতগুলি ডিম দেখিয়া রসনা লালায়িত হইয়া উঠিল। গৌ নিজেই সেগুলিকে আবার পাতা দিয়া মুড়িয়া লতা দিয়া জড়াইয়া বাঁধিল এবং আগুনের উপর ধরিয়া সেঁকিতে লাগিল .

...আহার শেষ করিয়াছি, সহসা টাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম।

'জোলমা, জোলমা—'

গৌ তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।

'আমি চলিলাম। আমার সঙ্গে যে তোমার দেখা হইয়াছে, একথা টাহাকে বলিও না। জোলমা যে তোমার সঙ্গে জিকাটু পাহাড়ে গিয়াছিল, একথা বলিবারও দরকার নাই। টাহা এখনই গিয়া সব কথা বৃহাকে বলিয়া দিবে। জোলমা নিজে গিয়া বৃহাকে কি বলে, তাহাই লক্ষ্য করা এখন দরকার। তুমি মুখ বুজিয়া থাক।'

গৌ চলিয়া গেল। আমিও উঠিয়া পড়িলাম এবং যেদিক হইতে টাহার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিয়াছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। কিছুদূর গিয়া আবার তাহার ডাক শোনা গেল।

'জোলমা, জোলমা, কোথায় তুমি—'

আমি দ্রুতপদে আগাইয়া গিয়া তাহার সম্মুখীন হইলাম। আমাকে দেখিতে পাইয়া টাহা আমার দিকে ছুটিয়া আসিল।

'জোলমা কোথায়? জোলমাকে দেখিয়াছ?'

আমি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উত্তর দিলাম, 'জোলমার তো বৃহার কাছে থাকা উচিত।'

'জোলমা সকালে এই বনের দিকে আসিয়াছিল, আর ফেরে নাই। তাহাকে দেখিতে না পাইয়া বৃহা ক্ষেপিয়া গিয়াছে। যত লাল রং ছিল, সব বাহির করিয়া ওহালির কাঠে মাখাইতেছে। পাগলের মতো মাখাইয়া চলিয়াছে। ওহালির কাঠ বিরাট একটা রক্তপিণ্ডের মতো দেখাইতেছে। আমি বড় ভয় পাইয়া গিয়াছি। জোলমা যদি এখনও না ফিরিয়া থাকে, সর্বনাশ হইয়া যাইবে। আজ লাফাই পাহাড়ে মহা-উৎসব, বহু হরিণ মারা পড়িয়াছে, কিন্তু বৃহা যদি ক্ষেপিয়া যায়—'

টাহা আর কিছু বলিতে পারিল না, টাহার বিবর্ণ মুখ ও উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি বাকিটা প্রকাশ করিল।

'তুমি কতক্ষণ জোলমাকে খুঁজিতেছ?'

'অনেকক্ষণ। সমস্ত বন তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছি। কোথাও সে নাই।'

'এতক্ষণে হয়তো সে ফিরিয়া গিয়াছে। বাড়িতে গিয়া খোঁজ কর।'

আমার কথায় তাহার মনে যেন নূতন আলোকপাত হইল, আপন মনে মাথা নাড়িয়া সে বিড় বিড় করিয়া কি যেন বলিল বুঝিতে পারিলাম না।

'কি বলিতেছ?'

'কিছু নয়, তোমার কথাটা ভাবিয়া দেখিতেছি। তুমি ঠিকই বলিয়াছ, হয়তো সে এতক্ষণে ফিরিয়া থাকিতেও পারে। ঠিক। আচ্ছা, তুমিই বা এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তোমাকেও তো দেখিতে পাই নাই। তুমি জিকাটু পাহাড়ে যাইবে বলিয়াছিলে—'

'জিকাটু পাহাড় হইতেই আসিতেছি।'

টাহার চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত হইয়া গেল।

'হ্যাঁ, সেখানে একটা গুহাও দেখিয়া আসিয়াছি।'

'গুহা? আর কিছু দেখ নাই? সেখানে শুনিয়াছি—'

'যাহা শুনিয়াছ তাহা মিথ্যা নয়। বিরাট একটা শঙ্খচূড় সাপ সেখানে ছিল, তাহারই ভয়ে কেহ সেখানে যাইতে পারিত না, তাহারই কামড়ে বহু পশু প্রাণ হারাইয়াছে। আমার চোখের সামনেই বলগা-হরিণকে মরিতে দেখিলাম। কিন্তু শঙ্খচূড় আর নাই, তাহাকে নিধন করিয়াছি।'

'কি করিয়া?'

আমি স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলাম। জোলমার কথা বলিতে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু গৌ মানা করিয়া গিয়াছিল, বলিতে সাহস করিলাম না। টাহা আমার নীরবতার যে অর্থ করে করুক। টাহা কিন্তু ইহার একটি অর্থই করিল। তাহার মনে হইল যেহেতু আমি চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী সেই হেতু আমি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সেই জন্যই আমি জিকাটু পাহাড় হইতে জীবন্ত ফিরিতে পারিয়াছি। আমাকে নীরব দেখিয়া তাই সে নিজেই উত্তরটা দিয়া দিল।

'ও, তুমি তো পারিবেই। কুঠারের হাতলে যে অমন সুন্দর হরিণের মুখ আঁকিতে পারে, তাহার অসাধ্য কিছু নাই। আমাকে শিখাইয়া দিবে বলিয়াছিলে, মনে আছে তো?'

'আছে। শিখাইয়া দিব।'

কথাটা বলিয়াই কিন্তু আমি অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল আমি টাহাকে শিখাইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিব সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও যদি টাহা শিখিতে না পারে তখন কি হইবে? সে নিশ্চয় মনে করিবে আমি যে বিশেষ মন্ত্রবলে চিত্রকর হইয়াছি সেই বিশেষ মন্ত্রটি তাহাকে শিখাইতেছি না। আমি যে দলে পূর্বে ছিলাম সেই দলেও এইরূপ সঙ্কটে মাঝে মাঝে আমাকে পড়িতে হইয়াছে। সকলে চিত্রকর হইতে পারে না, কিন্তু চিত্রকর হইবার সাধ অল্প-বিস্তর সকলের মনেই জাগে। তখন তাহারা চিত্রকরের খোশামোদ করে, তাহাকে নানা রকম লোভ দেখায়। অনেক প্রকৃত চিত্রকর এই সব অপটু অক্ষম শিষ্যদের নানাভাবে ভুলাইয়া নিজেদের আয়ত্তাধীন রাখিবার চেষ্টা করেন। যাদুবিদ্যা, মন্ত্র, বিশেষ রকম লতাপাতার সংমিশ্রণ প্রভৃতির দোহাই দিয়া আসল কথাটা চাপিয়া যান। বিধিদত্ত ক্ষমতা না থাকিলে যে চিত্রকর হওয়া অসম্ভব এ কথাটা কেহ তাই মানিতে চায় না, মনে করে যে বিশেষ একটা তুক্‌তাক্ মন্ত্র বা উপকরণের সন্ধান পাইলেই ছবি বুঝি আঁকিতে পারা যাইবে এবং গুণী চিত্রকর ইচ্ছা করিলে সে সবের সন্ধান দিতে পারে। সে যুগে চিত্রকরের খুব

সম্মান ছিল, বহুলোক তাহাকে দেব-অনুগৃহীত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি মনে করিত, বহুলোক তাহার বশীভূত থাকিত। কিন্তু এজন্য তাহাকে নানারূপ সঙ্কটেও পড়িতে হইত। টাহার সম্পর্কে এইসব কথা মনে হওয়াতে বেশ একটু অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিলাম। টাহা আমার মুখের দিকে ভক্তি গদগদ নেত্রে তাকাইয়াছিল। তাহার মনকে প্রসঙ্গান্তরে লইয়া যাইবার জন্য প্রশ্ন করিলাম, 'লাফাই পাহাড়ে উৎসব কখন হইবে?'

'একটু পরেই।'

'চল, সেইখানেই যাওয়া যাক—'

'কিন্তু জোলমা যদি না ফিরিয়া থাকে—'

'চল, সে খবরটাও লওয়া দরকার।'

বাধ্য বালকের মতো টাহা আমার অনুসরণ করিতে লাগিল।

।। পাঁচ ।।

লাফাই পাহাড়ের নিম্নদেশে বহু বল্‌গা-হরিণ পড়িয়াছিল। কাহারও পা ভাঙিয়া গিয়াছে, কাহারও ঘাড় মটকাইয়া গিয়াছে। কাহারও মস্তক বিদীর্ণ। একটা হরিণের শিং আর একটা হরিণের উদরে প্রবেশ করিয়াছে। স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে নানাভাবে আহত, মৃত, নানা বয়সের হরিণ-হরিণীর দল। আহত হরিণগুলি করুণস্বরে চিৎকার করিতেছে। হরিণের স্তূপ হইতে একাধিক রক্তের ধারা সম্মুখে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণকে রক্ত-চর্চিত করিয়াছে। প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে প্রকাণ্ড জনতা। নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে সকলে। আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারও মধ্যে কোনো চঞ্চলতা নাই। প্রাঙ্গণের চতুর্দিকের বৃক্ষশ্রেণীও জনপূর্ণ। আমি একটি বৃক্ষের উচ্চ-চূড়ায় বসিয়া আছি। টাহা আমাকে বসাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমি আকুল নয়নে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছি জোলমা কোথায়। কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইতেছিলাম না, আমার সম্বন্ধে বৃহাকে সে কিছু বলিয়াছে কি না জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়াছিলাম।

......সহসা অনুভব করিলাম, দূর হইতে একটা মৃদু শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। মৃদু কিন্তু অবিচ্ছিন্ন। ক্রমশ তাহা স্পষ্টতর হইতে লাগিল। হুম, হুম, হুম, হুম এই জাতীয় একটানা শব্দ একটা। সমবেত জনতার আগ্রহ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। আকাশ বাতাস সেই শব্দের ছন্দে স্পন্দিত হইতে লাগিল। ছন্দের মোহে আমি অবশেষে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। জোলমার প্রতি আমার গভীর আকর্ষণ যেন শব্দে রূপান্তরিত হইয়া দিগন্তসীমায় দিশাহারা হইয়া ফিরিতে লাগিল। আমার স্থূল দেহটাই যেন বৃক্ষশাখায় বসিয়া রহিল, আমার মন ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল শব্দের তরঙ্গে তরঙ্গে নামহীন সমুদ্রের তটে তটে। পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে আমার বোধ অবলুপ্ত হইয়া গেল। হুম হুম হুম হুম—ক্রমবর্ধমান এই শব্দের মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া আমি স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ বসিয়া রহিলাম, অকস্মাৎ সমবেত কণ্ঠের হর্ষধ্বনিতে আমার আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া গেল। দেখিতে পাইলাম পাহাড়ের গা বাহিয়া বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত একটা শোভাযাত্রা মন্থরগতিতে প্রাঙ্গণের দিকে অগ্রসর হইতেছে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে একটা চলন্ত বৃক্ষ। সেই বৃক্ষের চূড়ায় বসিয়া আছে একটি শ্যেনপক্ষী। তাহার পিছনে আসিতেছে দুইটি নরনারীর শ্রেণী, একটা নরের পাশে একটি নারী, এইরূপ যুগল মূর্তির যুগ্মধারা নামিয়া

আসিতেছে। প্রত্যেকেরই মাথায় শ্যেনপক্ষীর পাখা গোঁজা, প্রত্যেকেরই হস্তে কিশলয়-সমন্বিত ছোট একটি বৃক্ষশাখা, প্রত্যেকেরই কটিতে লতার বেষ্টনী, সেই বেষ্টনী হইতে ঝুলিতেছে কচি কচি ডালপালা, বিচিত্র আকারের পত্র, বহুবর্ণের পুষ্প। ইহাতে কটি হইতে উরুর মধ্যভাগ পর্যন্ত ঢাকা পড়িয়াছে, দেহের অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ অনাবৃত। তাহারও পিছনে একদল হরিণী সাজিয়া আসিতেছে। তাহাদের মাথায় হরিণের শিং বাঁধা। ইহাদের মধ্যে বিতংকে চিনিতে পারিলাম। জোলমা কোথায় গেল? শোভাযাত্রার শেষভাগে দেখিলাম বৃহা আসিতেছে। দীর্ঘ বলিষ্ঠকায়, মাথায় দীর্ঘ কেশ চূড়ানিবদ্ধ, চূড়ার উপর একগুচ্ছ পলাশ ফুল, দেহের সম্মুখভাগে মৃগচর্ম-বিলম্বিত, স্কন্ধে প্রকাণ্ড একটা প্রস্তরকুঠার, কৃষ্ণকুঞ্চিত শ্মশ্রু-গুম্ফে মুখমণ্ডল সমাচ্ছন্ন, রক্তাভ আয়ত চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত, চক্ষুর দৃষ্টিতে এক অদ্ভুত জ্যোতি। দলপতি হইবার উপযুক্ত চেহারা বটে। সহসা আমার সমস্ত বুকটা জ্বালা করিয়া উঠিল, মনে হইল বৃহার রক্ত ব্যতীত সে জ্বালা প্রশমিত হইবে না। অন্তরের মধ্যে যে আগুন জ্বলিতেছে, বৃহার রক্তেই সে আগুন নিভিতে পারে। কিন্তু তাহা কি করিয়া সম্ভব? কোন্ অজুহাতে আমি জোলমার পিতাকে হত্যা করিব? হত্যা করিয়াই বা লাভ কি হইবে? জোলমার কথাগুলি মনে পড়িল—'বৃহাকে আমি কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না। তুমি জোর করিও না, আমাকে নিজের পথে চলিতে দাও—'

হঠাৎ দেখিলাম বৃহারও পশ্চাতে টাহা আসিতেছে, টাহার স্কন্ধে রহিয়াছে গৌ। গৌ-এর দুই হাতে বদ্ধপদ কয়েকটি তিত্তিরপক্ষী ছটফট করিতেছে। জোলমাকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। সে কোথায়?... শোভাযাত্রা পর্বত হইতে নামিয়া ক্রমশ প্রাঙ্গণের মধ্যবর্তী হইল। চলন্ত বৃক্ষটিকে ঘিরিয়া নবনারীর শ্রেণী বৃত্তাকারে দাঁড়াইল। বহু কণ্ঠনিঃসৃত হুম হুম শব্দ সমস্ত প্রকৃতিকে স্পন্দিত করিতে লাগিল। মনে হইল একটা অস্পষ্ট বেদনা যেন বাঙ্ময় হইতেছে, এইবার বুঝি কিছু একটা ফাটিয়া যাইবে। হঠাৎ শব্দটা থামিয়া গেল, দেখিলাম প্রাঙ্গণ-সীমায় যে পাথরটা ছিল, তাহার উপর বৃহা দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চলন্ত বৃক্ষের উপর যে শ্যেন পক্ষীটি ছিল, তাহা পাখা ঝটপট করিয়া উড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহার পা বৃক্ষশীর্ষে বাঁধা ছিল। টাহার স্কন্ধ হইতে অবতরণ করিয়া গৌ চলন্ত বৃক্ষটির পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইল। চলন্ত বৃক্ষ আর চলন্ত ছিল না, বৃত্তের মধ্যস্থলে তাহা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। একটি মানুষেরই চতুর্দিকে ডাল-পালা ঘিরিয়া যে এই চলন্ত বৃক্ষ সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা এইবার বেশ বোঝা যাইতে লাগিল। খুব ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, কিন্তু তাহার মুখ দেখিতে পাইলাম না। শাখাপত্রের ভিতর হইতে একটা রক্তবর্ণের আভা কেবল দেখা যাইতেছিল।

...নিস্তব্ধতাকে সচকিত করিয়া গৌ সহসা অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। দেখিলাম হস্তধৃত তিত্তিরপক্ষী গুলিকে সবেগে ঘুরাইতে ঘুরাইতে সে উন্মাদিনীর মতো নৃত্য করিতেছে। তাহার মাথার পলিত কেশদাম যেন সর্প-শিশুর ন্যায় ফণা ধরিয়াছে, চক্ষুর দৃষ্টি স্ফুলিঙ্গবর্ষী। নাচিতে নাচিতে সহসা সে থামিয়া গেল এবং একটা তিত্তিরপক্ষীর টুঁটি কামড়াইয়া ধরিল। পরমুহূর্তেই দেখিলাম ছিন্নমুণ্ড তিত্তিরপক্ষী ধূলায় পড়িয়া ছটফট করিতেছে। টাহা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, সে তিত্তিরটিকে তুলিয়া শ্যেনপক্ষীর সম্মুখে আস্ফালন করিল, তাহার পর তাহা দূরে ছুঁড়িয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হইয়া উঠিল শ্যেনপক্ষীটা, গৌ খল খল করিয়া

হাসিয়া উঠিল। আবার শুরু হইল তাহার উন্মাদ নৃত্য, আবার সে আর একটা তিত্তিরপক্ষীর মুণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিল, টাহা আবার সেই রক্তাক্ত পাখিটা বৃক্ষচূড়াবদ্ধ শ্যেনকে দেখাইয়া দূরে ছুঁড়িয়া দিল। বিরাট জনতা রুদ্ধ-নিশ্বাসে গৌ-এর কার্যকলাপ দেখিতেছে, আহত হরিণদেব ক্ষীয়মাণ আর্তনাদ ছাড়া, আর কোনো শব্দ নাই। গৌয়ের অট্টহাস্যে মাঝে মাঝে সে আর্তনাদ ডুবিয়া যাইতেছে। অতি অদ্ভুত একটা জগৎ চতুর্দিকে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে জগৎ যেন পুরাতন জগৎ নয়, তাহা মানুষের সৃষ্টি, সম্পূর্ণ নূতন অভূতপূর্ব একটা পরিবেশ।

...গৌ একে একে সমস্ত তিত্তিরগুলিকে হত্যা করিল। টাহাও প্রত্যেকটি তিত্তির শ্যেনকে দেখাইয়া দেখাইয়া দূরে ফেলিয়া দিল। শেষ তিত্তিরটিকে ফেলিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্যেনপক্ষীর পায়ের বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হইল। নিমেষের মধ্যে সে আকাশে উড়িল এবং পরমুহূর্তেই একটি মৃত তিত্তিরকে ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া গেল। যে জনতা এতক্ষণ চিত্রার্পিতবৎ নীরব ছিল, এইবার তাহা উদ্দাম হইয়া উঠিল, শত শত কণ্ঠের হর্ষধ্বনি ও উৎক্ষিপ্ত বাহু উড্ডীয়মান শ্যেনপক্ষীকে অভিনন্দিত করিতে লাগিল।

...বৃহা কিন্তু বিচলিত হয় নাই, সে বাহু উত্তোলন করিয়া প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়াছিল। এইবার দেখিলাম ধীরে ধীরে সে স্কন্ধ হইতে কুঠারখানি নামাইয়া পাশে রাখিল। তাহার পর কৃতাঞ্জলি হইয়া আকাশের দিকে চাহিল। সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্তে ঢলিয়া পড়িয়াছে। আকাশের মেঘে মেঘে বর্ণের মহোৎসব শুরু হইয়াছে। বৃহা সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বৃহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বিশাল জনতা সহসা যেন আবিষ্কার করিল যে, আকাশপটেও নীরবে একটা উৎসব শুরু হইয়াছে। ইহার অভিনবত্ব যেন নূতন বিস্ময়ে তাহাদের নির্বাক করিয়া দিল। তাহারাও নীরব হইয়া গেল।

...কৃতাঞ্জলিবদ্ধ বৃহা কখন যে কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, আমি বুঝিতে পারি নাই। অভিনব ঘটনাপরম্পরার চমৎকারিত্বে আমি সত্যই হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম, মনে হইতেছিল, ইহা যেন বাস্তব নয়, আমি কোনো স্বপ্নলোকে নীত হইয়াছি। এই অসম্ভব স্বপ্নলোকে আমার ব্যক্তিগত কৃতিত্বের কোনো মূল্য আছে কি না, সম্ভবত নিজের অজ্ঞাতসারে তাহাই মনে মনে নির্ধারণ করিতেছিলাম, বৃহা কখন কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে টের পাই নাই।

..সহসা শুনিতে পাইলাম, বৃহা গম্ভীর কণ্ঠে বলিতেছে, "আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য দিবারাত্রি অনন্যকর্মা হইয়া অন্ধকারে গুহা-গাত্রে ছবির পর ছবি আঁকিয়া হরিণ-দেবতার যে অর্চনা করিয়াছিলাম, সে অর্চনা যে বিফল হয় নাই, তাহার প্রমাণ আমাদের সকলের সম্মুখে আজ স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে, আমাদের জীবন রক্ষা করিবার জন্য দেবতা হরিণরূপে আসিয়া আত্মদান করিয়াছেন; একা নয়, দলে দলে আসিয়াছেন, লাফাই পাহাড়ের শিখর হইতে পড়িয়া নিজেকে আহত করিয়াছেন, নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছেন, নিজেকে বিনাশ করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা আমরা তাঁহার মাংসে পুষ্ট হইয়া তাঁহারই আরাধনা করি। ওই মৃত মৃগস্তূপের মধ্যে যে সব মৃগ এখনও মরে নাই, তাহাদের করুণ কণ্ঠস্বর শোন। করুণ সুরে স্বয়ং দেবতাই বলিতেছেন—'আমাকে বধ করিয়া আমার মাংস আহার কর। আমাকে কেহ বধ করিতে পারে না, আমি নব নব রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমাদের হিতার্থে স্বেচ্ছায় নিজেকে বিলাইয়া দিই। যাহারা আমাকে পূজা করে, তাহাদের নিকট আমি আত্মদান করি। যে

রূপে যে মূর্তিতে আমাকে অর্চনা করিবে সেই রূপে সেই মূর্তিতেই আমি তোমাদের কাছে ধরা দিব। তোমরা হরিণের ছবি আঁকিয়া আমাকে আহ্বান করিয়াছ, হরিণরূপেই তোমাদের নিকট ধরা দিয়াছি। আমাকে বধ করিয়া ভক্ষণ কর।' আমরা যদি মন দিয়া শুনি আহত হরিণের কণ্ঠস্বরে এই কথাই শুনিতে পাইব। আজ আর একটা অদ্ভুত কথাও তোমাদের বলিতে চাই। যে আকাশকন্যা ওহালি অহোরাত্র আকাশে নিত্যনূতন চিত্রের নমুনা দিয়া আমাকে উৎসাহ দিতেছে, এই মুহূর্তেও আকাশের মেঘে মেঘে যাহার চিত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহারই প্রেরণায় আমি কিছুদিন পূর্বে দেবতার নবরূপ কল্পনা করিয়া বন্য মহিষের ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আজ খবর পাইয়াছি দেবতা আমার অর্চনায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমাদের বনে বন্য-মহিষের দল আসিয়াছে। বন্য-মহিষ কিন্তু বল্‌গা-হরিণ নহে। বীরত্বের পরিচয় না পাইলে মহিষ-দেবতা আত্মদান করেন না। আমার অর্চনায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি আমাদের কাছে আসিয়াছেন, শৌর্যের পরিচয় দিলে তিনি আত্মদান করিবেন। সে পরিচয় আমাকেই দিতে হইবে, আমি অবসরমতো সে পরিচয় একদিন দিব। তোমরা যথাকালে তাহার সংবাদ পাইবে। আর একটি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া আমার কার্য আরম্ভ করিব। যে ছবির প্রভাবে আমরা দেবতার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়াছি, সে ছবির প্রেরণা দিয়াছিল আকাশ-কন্যা ওহালি, তাহার প্রেরণা এখনও আমাকে উদ্বুদ্ধ করে; কিন্তু ওহালি-কন্যা জোলমা যদি না থাকিত কেবলমাত্র প্রেরণা লইয়া আমি ছবি আঁকিতে পারিতাম না। গুহার অন্ধকারে জোলমা প্রদীপ হস্তে দিনের পর দিন আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে। তাহার সান্নিধ্য, তাহার পবিত্র সৌন্দর্য, তাহার নীরবতা, আমার অন্তরে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, তাহাই আমার ছবির প্রাণ। জোলমা আমার পার্শ্বে না থাকিলে আমি ছবি আঁকিতে পারিব না। শ্যেন সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য চিরকুমারী জোলমাকে আমার পার্শ্বে আলো ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। জোলমা তাহাতে সম্মত আছে। ওহালি-কন্যা জোলমা দেবী। তোমরা দেবীরূপে তাহাকে বন্দনা কর, দেবীরূপে তাহাকে রক্ষা কর, কাহারও লালসা যেন তাহাকে স্পর্শ করিতে না পারে। কোনো পুরুষের লালসা যদি তাহাকে কলঙ্কিত করে, তাহার আলো আর আমার ছবিকে উজ্জ্বল করিবে না, তাহার সান্নিধ্য আর আমাকে উৎসাহ দিবে না। এই কথা তোমাদের মনে জাগরূক রাখিবার জন্য জোলমাকে দেবীরূপে আজ তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি, দেবীরূপেই তোমরা তাহাকে পূজা কর।"

বৃহা ধীরে ধীরে প্রস্তরবেদী হইতে অবতরণ করিয়া বৃত্তমধ্যবর্তী সেই চলন্ত বৃক্ষের নিকটে আসিল। তাহার পর কটিবন্ধন হইতে একটি প্রস্তর-ছুরিকা বাহির করিয়া তাহার ডালপালাগুলি কাটিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে সমস্ত গাছটাই মাটিতে পড়িয়া গেল। সবিস্ময়ে দেখিলাম জোলমা দাঁড়াইয়া আছে। জোলমার সেকি অদ্ভুত মূর্তি! তাহার সর্বাঙ্গ নানা বর্ণে রঞ্জিত। বাহু এবং উরু দুইটিতে টকটকে লাল রং, কনুই হইতে হাত পর্যন্ত এবং জানু হইতে পা পর্যন্ত সবুজ, গ্রীবা হইতে কোমর পর্যন্ত ঘন কৃষ্ণবর্ণ। সমস্ত মুখমণ্ডলে লাল এবং কেলোর ডোরাকাটা। সম্পূর্ণ উলঙ্গিনী জোলমা প্রসারিত করপল্লবে একটি প্রদীপ ধরিয়া নিমীলিত নয়নে দাঁড়াইয়া আছে। সহসা লক্ষ্য করিলাম বিরাট জনতা শ্রদ্ধায় শির অবনত করিয়াছে। সেই শ্রদ্ধাপ্লুত নীরবতা কিন্তু একটা তীক্ষ্ণ অট্টহাস্যে বিঘ্নিত হইল। চাহিয়া দেখিলাম গৌ হাসিতেছে। আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া কোমরে দুই হাত দিয়া হাসিতেছে।

হাসি না আর্তনাদ? ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। গৌ আর সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল না, হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল, জোলমা দেখিলাম নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, যেন রক্ত-মাংসের মানুষ নয়, মৃন্ময় প্রতিমা। সকলেই দেখিলাম নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে, এমন কি বৃহা পর্যন্ত। বৃহা যাহা বলিয়াছিল, তাহার তাৎপর্য আমি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি নাই। যে দর্শন পরবর্তী যুগে সর্বদেশের ধর্ম-বিশ্বাসকে প্রভাবিত করিয়াছে, যাহা তোমাদের বেদে উপনিষদে বিশদতররূপে ব্যক্ত, সেই অসভ্য যুগেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল। অসভ্য মানবের মানসপটেই দেবতা প্রথমে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। তাহারাই বৃক্ষে, নদীতে, পর্বতে, প্রস্তরে, পশুতে, পক্ষীতে, সূর্যে, চন্দ্রে এমনকি মৃত্যুর ভয়াবহতার মধ্যেও দেবতার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া তদনুসারে সমাজ ও জীবন নিয়ন্ত্রিত করিত। তবু আমি বৃহার কথার তাৎপর্য ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলাম না, আমার মনে হইতেছিল—কি যে মনে হইতেছিল, তাহাও ঠিক প্রকাশ করিতে পারিব না—বৃহার কথা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, বৃহা যে ভণ্ডামি করিতেছে, একথা সজ্ঞানে ভাবিবার সাহসও আমার ছিল না, কিন্তু তবু মনে হইতেছিল কোথায় যেন কি একটা গলদ আছে। বল্‌গা-হরিণের দলকে ফাঁদে ফেলিয়া তাহার পব সেটাকে দেবতার নামে চালানো কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকিতেছিল। মনে হইতেছিল, শ্যেন সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজের প্রভুত্ব অটুট রাখিবার জন্য বৃহা নিজেই নিজেকে ভুলাইতেছে, তাহার ছবি আঁকিবার ক্ষমতাই তাহার চোখে মোহের অঞ্জন পরাইয়াছে। সে ভণ্ডামি করিতেছে না, সে যাহা বলিল তাহার প্রত্যেক কথাটি সে নিজে বিশ্বাস করে। তাহার ধারণা জোলমা চিরকুমারী না থাকিলে শ্যেন সম্প্রদায় ধ্বংস হইয়া যাইবে। আমি নিজে দেবতায় কম বিশ্বাসী ছিলাম না, পর্বত-দেবতার আদেশ শুনিয়াই আমি এই দেশে বসবাস করিব স্থির করিয়াছিলাম। তবু কিন্তু বৃহার কথায় আমার কেমন যেন অবিশ্বাস হইতেছিল; মনে হইতেছিল, বৃহার নিজের শিল্প-প্রেরণার মোহে জোলমার জীবন ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। আমি আমার অবিশ্বাস অনুসারেই চলিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য হই নাই। আমার বিফলতার জন্য যে দুর্ঘটনাকে দায়ী করিয়ছিলাম, এখন মনে হয় তাহার পিছনে বিধাতার ইঙ্গিত ছিল। মনে হয়, আমার নিজের মোহ, জোলমার প্রতি আমার অন্ধ আসক্তি হয়তো আমাকেও ভুল পথে চালিত করিয়াছিল।

...গৌ চলিয়া যাইবার পর নীরবতাটা পীড়াদায়ক হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল যেন দুই বিভিন্ন মনোবৃত্তি নীরব হিংস্রতায় পরস্পরের সহিত পাঞ্জা লড়িতেছে। বিরাট জনতা যেন রুদ্ধশ্বাসে ফলাফলের জন্য উৎসুক হইয়া আছে। বৃহা সহসা নীরবতা ভঙ্গ করিল। গম্ভীর কণ্ঠে সে বলিল—'শ্যেন বংশের স্থাপয়িত্রী গৌ অট্টহাস্য করিয়া আমার ইচ্ছাকে সমর্থন করিয়া গেল ইহাতে আমি আনন্দিত। এইবার আমাদের উৎসব শুরু হউক।'

তাহার পর নৃত্য শুরু হইল। যে নর-নারীরা যুগ্ম-শ্রেণীতে বৃক্ষরূপিণী জোলমার অনুসরণ করিয়াছিল, তাহারা ধীরে ধীরে অঙ্গ হিল্লোলিত করিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। নাচিতে নাচিতে ক্রমশ তাহারা জোলমার নিকট আসিল এবং বৃহা যে গাছের শাখাগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল, সেইগুলি একে একে তুলিয়া আবার লতা দিয়া বাঁধিতে লাগিল। বৃক্ষবীথির ভিতর দিয়া বেগে বায়ু বহিলে যে ধরনের মর্মরধ্বনি হয়, সেই ধরনের শব্দ শুনিয়া আমি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম ঝড় উঠিতেছে কি না। ক্ষণপরেই আমার ভুল ভাঙিল। বুঝিতে পারিলাম নর্তক-নর্তকীরাই মুখে ওইরূপ শব্দ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে জোলমা পুনরায়

চলন্ত বৃক্ষে রূপান্তরিত হইল। আবার সে পর্বত অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিল। নরনারীর দল নাচিতে নাচিতে আবার তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। লক্ষ্য করিলাম তাহাদের মুখনিঃসৃত মর্মরধ্বনি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। আশা করিয়াছিলাম ইহারা বোধহয় পুনরায় পাহাড়ের গা বাহিয়া উপরে উঠিবে, কিন্তু তাহা উঠিল না। পাহাড়ের সানুদেশে যে প্রকাণ্ড ফাটলটা ছিল, তাহার ভিতরই জোলমা অদৃশ্য হইয়া গেল। যে অন্ধকার গুহায় বৃহা ছবি আঁকে, এই ফাটলটা যে তাহার আর একটা প্রবেশপথ, তাহা পরে আবিষ্কার করিয়াছিলাম। আমার সহিত বৃহার প্রথম যে স্থানে সাক্ষাৎ হয়, তাহা ওই গুহা-প্রবেশের আর একটা দ্বার। সেখান হইতে লাফাই পাহাড়ের গায়ে এই ফাটল পর্যন্ত সমস্তটাই গুহা। চলন্ত বৃক্ষরূপী জোলমা ফাটলের ভিতর অন্তর্ধান করিবার সঙ্গে সঙ্গে নৃতপরা নরনারীর দল আবার ফিরিল। এবার তাহাদের নাচের ভঙ্গি ও গানের সুর কিন্তু বদলাইয়া গিয়াছে। এতক্ষণ সর্বাঙ্গে ছিল মৃদু হিল্লোল, মুখে ছিল মর্মরধ্বনি, এবার দেখিলাম উদ্বাহু হইয়া প্রত্যেকে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, প্রত্যেকের কণ্ঠে কলহাস্য ছন্দিত হইয়া উঠিতেছে, মনে হইতেছে যেন এক ঝাঁক কলহংস আকাশকে সচকিত করিয়া উড়িয়া আসিতেছে। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা আসিয়া আবার প্রাঙ্গণে সমবেত হইল, এবার আর বৃত্তাকারে দাঁড়াইল না, জনতার মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। বৃহা এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়াছিল—বস্তুত তাহার এই নীরবতা, এই নির্বাক নিয়মানুবর্তিতা,—আমাকে শুধু বিস্মিত নয়, আতঙ্কিতও করিতেছিল। তাহার এই যন্ত্রবৎ ব্যবহারই সকলের মনে সভয় সম্ভ্রম বিস্তার করিয়া তাহাকে অসাধারণ স্তরে উন্নীত করিয়াছিল, সকলের ধারণা হইয়াছিল সে মানুষ নয়, দেবতা। মানুষ এত স্থির, ধীর, অচঞ্চল, মিতবাক হইতে পারে না। আমি অনুভব করিতেছিলাম কেবলমাত্র শিল্প-প্রতিভার জন্য নয়, এই অসাধারণ সংযমের জন্যই বৃহা আজ শ্যেন সম্প্রদায়ের দলপতি। পরবর্তী জীবনেও বারংবার আমি ইহা অনুভব করিয়াছি। কেবল প্রতিভা নয়, অসাধারণ চরিত্রই মানুষকে শ্রদ্ধাস্পদও করে। বৃহার চরিত্র শ্যেন সম্প্রদায়েব সকলের মধ্যেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাহার প্রমাণ সেই বিরাট জনতায় কোনো উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না, সমস্তই যেন সুনিয়ন্ত্রিত। অদৃশ্য এক দেবতার পূজায় সকলেই যেন সংযত, সশ্রদ্ধ। বৃহা কুঠারটি তুলিয়া লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। হরিণস্তূপের ভিতর হইতে যেই একটি আহত হরিণ করুণকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল, অমনই বৃহা কথা কহিল। "ওই শোন, দেবতা আবার বলিতেছেন, 'আমাকে বধ করিয়া আমার মাংস তোমরা ভক্ষণ কর।' দেবতার আদেশ পালন করিতে আর আমি বিলম্ব করিব না।"

বৃহা কুঠার হস্তে সেই হরিণস্তূপের উপর উঠিয়া গেল এবং যে হরিণগুলি মরে নাই, আহত হইয়া চিৎকার করিতেছিল, তাহাদের একে একে হত্যা করিতে লাগিল। কুঠারের প্রতি আঘাতের সহিত জনতার ভিতর হইতে সমস্বরে রব উঠিতে লাগিল—হে দেবতা, তুমিই ধন্য! হে দেবতা, তুমিই ধন্য! হে দেবতা, তুমিই ধন্য!

...বৃক্ষের কাণ্ডে ঠেস দিয়া আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, কতকগুলি পেচকের কর্কশ কোলাহলে জাগরিত হইয়া দেখিলাম সকলে চলিয়া গিয়াছে। চারিদিকে অন্ধকার, বিশেষ কিছু দেখা যাইতেছে না, লাফাই পাহাড়টা কেবল বিরাট একটা অন্ধকার পিণ্ডের মতো আকাশকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিশেষ কিছু শোনাও যাইতেছে না, এমন কি, কীটপতঙ্গের

শব্দ পর্যন্ত নয়। যে বিরাট এবং ব্যাপক হত্যাকাণ্ড এখানে কিছুক্ষণ আগে সংঘটিত হইয়া গিয়াছে তাহার ভীষণতায় সমস্ত প্রকৃতি যেন আতঙ্ক-বিহ্বল। পেচকগুলা বোধহয় পথ ভুল করিয়া আসিয়াছিল, আসিয়াই ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল। আমি প্রস্তরযুগের অসভ্য মানুষ, পশু হত্যা করিয়া জীবন ধারণ করিতেই আমি অভ্যস্ত, পশুর প্রতি সদয় হইবার নীতি তখনও আমি শিখি নাই, কিন্তু যে অনুভূতি হইতে এই নীতির জন্ম সেদিন অন্ধকারে একা বৃক্ষচূড়ায় বসিয়া অস্পষ্টভাবে যেন সেই অনুভূতির সান্নিধ্য অনুভব করিয়াছিলাম। মনে হইতেছিল বৃহার কথা যদি সত্য না হয়, তাহার লোভই দেবতার ছদ্মবেশে সকলকে ভুলাইতেছে আমার এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দেবতা কি তাহাকে ক্ষমা করিবেন? বৃহা কি নিস্তার পাইবে? অন্ধকারের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম, মানসপটে ধীরে ধীরে যে ছবি ফুটিয়া উঠিল তাহা ইতিপূর্বে আর কখনও ফোটে নাই—অসংখ্য আহত হরিণের অসহায় মুখচ্ছবি, চোখের দৃষ্টিতে করুণ মিনতি। সহসা শিহরিয়া উঠিলাম। অন্ধকার যেন হাসিয়া উঠিল। নারীকণ্ঠের হাসি! উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিলাম ক্ষণকাল। আবার হাসির শব্দ পাওয়া গেল, মনে হইল দূরে অন্ধকারে কাহারা যেন চাপা-কণ্ঠে কথাও কহিতেছে। আমি আর গাছে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, কেমন ভয়-ভয় করিতে লাগিল, তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম। নামিয়াই দেখিলাম ঠিক গাছের তলায় কাহারা যেন ছিল আমাকে দেখিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, মনে হইল মৃত হরিণদের প্রেতাত্মারা বোধহয় অন্ধকারে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। পায়ের নীচের মাটি মনে হইল ভিজা, বেশ যেন কাদা-কাদা, বৃষ্টি তো হয় নাই, তবে...সহসা বুঝিতে পারিলাম...হরিণের রক্তে কাদা হইয়া গিয়াছে। বৃহার পেশীসমৃদ্ধ সুদীর্ঘ মূর্তিটা চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল—বিশাল প্রস্তরকুঠার তুলিয়া হরিণের পর হরিণ কাটিয়া চলিয়াছে...কর্তিত মুণ্ড দূরে ছিটকাইয়া পড়িতেছে—উৎসাকারে রক্তধারা নিঃসৃত হইতেছে—লুব্ধ জনতা সাগ্রহে চিৎকার করিতেছে, 'হে দেবতা, তুমিই ধন্য, হে দেবতা, তুমিই ধন্য।' হাসির শব্দ অন্ধকারকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। এবার কাছে নয়, বেশ একটু দূরে। উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ কিছু শোনা গেল না। অগ্রসর হইব ভাবিতেছি এমন সময় নারীকণ্ঠে কে যেন প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—না, না, আমাকে ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও। প্রতিবাদের সুর পরমুহূর্তে হাসির হিল্লোলে ভাসিয়া গেল। কে যেন হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

...চাঁদ উঠিয়াছে। আমি চন্দ্রালোকে একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। হাসির কারণ আবিষ্কার করিয়াছি। শ্যেন সম্প্রদায়ের সমস্ত নর-নারী মিলনোৎসবে মাতিয়াছে। প্রত্যেকের হাতে এক এক টুকরা হরিণের মাংস, প্রত্যেকের সঙ্গে একজন সঙ্গী বা সঙ্গিনী। পাহাড়ের সানুদেশে, উপত্যকায়, গুহায়, বৃক্ষবীথিকায় আলো-আঁধারিতে সর্বত্র ওই এক দৃশ্য। আমি পাগলের মতো একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। টাহা যে পথে আমাকে বন হইতে এখানে লইয়া আসিয়াছিল তাহা খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না, যে পথ দিয়াই অগ্রসর হইতেছিলাম তাহাই আমাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লাফাই পর্বতের কাছে লইয়া আসিতেছিল। একটা অদ্ভুত মায়াপুরীর অদৃশ্য জালে আমি যেন আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। জোলমার জন্য সমস্ত চিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল, মনে হইতেছিল বনে গিয়া যদি আমার সেই পুরাতন বৃক্ষকোটরে বসিতে পারি জোলমার দেখা পাইব, জোলমা নিশ্চয় সেখানে আমার প্রতীক্ষা করিতেছে। বনে ফিরিবার পথ

কিন্তু খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না, লাফাই পাহাড়ের চতুর্দিকে একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। মিলনোন্মত্ত নর-নারীরা হাসি, তর্জন, কলোচ্ছ্বাস আমাকে আরও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল। আমাকে কেহ গ্রাহ্যও করিতেছিল না, আমি কাছে গেলে কেহ দূরে সরিয়া যাইতেছিল, কেহ বা যাইতেছিল না, আমি নিজেই তখন সরিয়া যাইতেছিলাম। নিজের আচরণে নিজেই আমি বিস্ময় বোধ করিতেছিলাম। আমার চরিত্রে যে এত শক্তি প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল তাহা আমি জানিতাম না, জীবনে যে কোনো দিন এমন আত্মসংযমের পরিচয় দিতে পারিব তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। অসম্ভব কিন্তু সম্ভব হইয়াছিল জোলমার জন্য। আমার কেমন যেন দৃঢ় ধারণা হইয়া গিয়াছিল অসংযমের স্রোতে গা ভাসাইলে জোলমাকে পাইব না। জোলমা দেবকন্যা, তাহাকে পাইতে হইলে সংযত হইতে হইবে। তাই সেদিন চন্দ্রালোকিত রজনীতে লাফাই পাহাড়ের আকাশে-বাতাসে যখন লালসার বিদ্যুৎ সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল তখন আমি আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম। প্রেমই আমাকে রক্ষা করিয়াছিল।

...সহসা লক্ষ্য করিলাম একটা বৃক্ষের অন্তরাল হইতে কে যেন আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। আমি দাঁড়াইয়া পড়িলাম। আর একটু নিকটে আসিতে বুঝিতে পারিলাম লোকটি পুরুষ, দেখিলাম একটি নারীও তাহার কণ্ঠলগ্না হইয়া রহিয়াছে। পুরুষটি তাহার দুই বলিষ্ঠ বাহুতে নারীটিকে শিশুর মতো ধরিয়া রাখিয়াছে। আমার কাছাকাছি আসিয়া নারীটি পুরুষের বাহুবন্ধন ছাড়াইয়া মাটিতে লাফাইয়া পড়িল। তাহার পর খিল খিল করিয়া হাসিয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিল। সবিস্ময়ে দেখিলাম গৌ।

গৌ বলিল, 'তুমি একা ঘুরিতেছ যে? জোলমাকে খুঁজিতেছ বুঝি? আজ জোলমাকে পাইবে না। তাহাকে বৃহা আজ দেবী বানাইতেছে। আজ আর তাহার নাগাল পাইবে না, আর কাহাকেও জুটাইয়া লও। আজ আমাদের লাফাই পাহাড়ে অনেক সম্প্রদায়ের লোক আসিয়াছে। হংস, ডাহুক, শঙ্খচিল, শজারু, শশক—লোকের অভাব নাই। কাহারও সঙ্গে ভাব করিয়া ফেল। আজ রাত্রে একা থাকিতে নাই। এই দেখ না, আমার তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকিয়াছে আমিও একজন সঙ্গী জুটাইয়া লইয়াছি। এটি কে জান? আমার বড় দৌহিত্রীর বড় দৌহিত্র। সারস বংশের দলপতি। একপাল হংসীকে লইয়া মাতিয়াছিল, আমি ডাক দিতেই আমাকে আসিয়া কোলে তুলিয়া লইল। ছোকরার গায়ে অসুরের শক্তি। আমাকে লইয়া গাছে উঠিতেছিল এমন সময় আমি তোমাকে দেখিতে পাইলাম, দেখিলাম তুমি একা,— ও কি তুমি অমন করিয়া চাহিয়া আছ কেন, বৃহার ভূত তোমার ঘাড়ে চাপিয়াছে নাকি—এই রে তবেই সারিয়াছে, দাঁড়াও তোমার ভূত ছাড়াই'—গৌ অনর্গল বকিয়া চলিয়াছিল। বকুনি থামাইয়া সহসা সে ছুটিয়া আসিয়া বাম হস্তে আমার কোমর জড়াইয়া ধরিল এবং ভঙ্গিভরে দক্ষিণ হস্তটি মাথার উপর রাখিয়া কোমর দুলাইয়া গান ধরিল—'গাছের ডালে ফুল ধরিয়াছে। সূর্য রোজ আসিয়া খবর লয়, চাঁদ রোজ আসিয়া উঁকি দেয়, ফল কবে ধরিবে। ফল আন, ফল আন, ওগো ফুল ফল আন, ফুলের কানে কানে বাতাস বলে। সূর্য খবর লয়, চাঁদ উঁকি দেয়—বাতাস কানে কানে বলে—ওগো ফুল ফল চাই, ফল ফল ফল'—বলিতে বলিতে সহসা আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল। তাহার পর বলিল, 'চল তোমাকে হংসীদের সহিত আলাপ করাইয়া দিই। আমার মনের মানুষটির সঙ্গেও আলাপ কর, ঝিণ্টু, আমাদের বিদেশি অতিথিকে গান শোনাও তুমি—তোমার সেই সারস পাখি গানটা—'

ঝিংটু একটু হাসিয়া আমার দিকে চাহিল, তাহার পরে তারস্বরে গলা ছাড়িয়া গান ধরিয়া দিল—'সারস আকাশে ওড়ে চাঁদের আলোতে, দিনের বেলা ছবি দেখে নদীর জলেতে, নিজের নয় হংসীর, ডাহুকীর, ময়ূরীর, কপোতীর, রাতের বেলা উড়ে বেড়ায় চাঁদের আলোতে, সারস আকাশে ওড়ে—'

তাহার পর সে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসির সহিত মিশিল গৌ-এর খিলখিল হাসি। দূর হইতে কাহাদের কলহাস্য ভাসিয়া আসিল, দেখিলাম একদল নরনারী পাহাড়ের সানুদেশ বাহিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। গৌ বলিল—'চল আমরাও যাই।' আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলাম। গৌ বলিতে বলিতে চলিল—'জোলমা তোমার বিরুদ্ধে বৃহাকে কিছু বলে নাই, সুতরাং তোমার আশা আছে। তুমি যদি লাগিয়া থাক ওর দেবীত্ব বেশি দিন টিকিবে না। তুমি যখন শঙ্খচূড়কে কাবু করিয়াছ, উহাকেও কাবু করিতে পারিবে। কিন্তু খুব সাবধানে অগ্রসর হও। বৃহা শক্তিশালী শ্যেনপক্ষী, অন্ধ বলিয়া আরও ভয়ঙ্কর। ওহালি উহাকে অন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ভুল পথে ভীষণ বেগে বৃহা উড়িয়া চলিয়াছে, উহার সামনে পড়িয়া গেলে তীক্ষ্ণ নখচঞ্চু দিয়া তোমাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিবে, উহার পাখার ঝাপটা সহ্য করিতে পারিবে না। তোমাকে খুব সাবধানে চলিতে হইবে।'

'আমি যে বনে ছিলাম সে বনের পথটা কোন্ দিকে? কিছুতেই খুঁজিয়া পাইতেছি না।'

'আর একটু গেলেই দেখিতে পাইবে। আমার কথাগুলি মন দিয়া শোন। বৃহার ওসব আজগুবি কথায় বিশ্বাস করিও না, কিন্তু অবিশ্বাস করিতেছ ইহাও বৃহাকে বুঝিতে দিও না। বৃহা পাগল, অন্ধ এবং পাগল, সেই জন্যই ভয়ানক। জোলমাকে চিরকুমারী করিয়া রাখিতে চায়। বলে কি না জোলমা কুমারী না থাকিলে ছবি আঁকা হইবে না। জোলমার মা ওহালি তো কুমারী ছিল না, সে তবে কি করিয়া বৃহাকে ছবি আঁকা শিখাইল। আর ছবি না আঁকিলে হরিণ আসিবে না, এই বা কেমন কথা! ঝিংটু তো ছবি আঁকে না, তাহাদের কাছে কি হরিণেরা যায় না? যত সব আজগুবি কাণ্ড। বৃহার বাপ ছিল পাগল। সে প্রতিটি পাথরে দেবতা দেখিত আর তাহার উপর মাথা কুটিত। মাথা কুটিতে কুটিতে শেষকালে মাথা ফাটিয়া মরিয়াই গেল। আর টাহার বাবা ছিল বোকা। কিছু বলিলেই ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিত আর ফিক ফিক করিয়া হাসিত। আমার দুই ছেলে তাই দুই রকমের অদ্ভুত হইয়াছে। একটা পাগল আর একটা বোকা। টাহা বোকা হোক তাহার ছেলেমেয়ে হইয়াছে, বংশ থাকিবে। কিন্তু বৃহা এ কি করিতেছে? এ আমি কিছুতেই সহ্য করিব না। শোন, জোলমাকে তুমি ভোলাও। তুমি বীরত্বের পরিচয় দিয়াছ, তুমি ছবি আঁকিতে পার, তুমি পারিবে। বৃহাকে ভুলাইবার আয়োজন আমি নিজে করিতেছি। দেখি সে কতক্ষণ নারীকে উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে। হরিণ দেবতা নয়, শিশুই দেবতা, হতভাগাটা একথা কিছুতেই বুঝিবে না। শিশু দেবতা বলিয়াই যে নারীর গর্ভে শিশু আসে, সে নারী উপেক্ষণীয় নয়। একথা তাহাকে বুঝাইয়া তবে আমি ছাড়িব। আমি ক'দিন বাঁচিব? টাহা-বৃহার বংশধরেরা যদি সংখ্যায় বেশি হয় তবেই না তাহারা তিত্তিরদের নিঃশেষ করিতে পারিবে। বৃহা অপুত্রক থাকিবে এ চিন্তাও আমার পক্ষে অসহ্য। ঝিংটু, তোমার দলের মেয়েরা প্রস্তুত আছে তো?'

ঝিংটু উত্তর দিল, 'আছে। তাহারা গোপনে গোপনে বৃহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। ওই বোধহয় একজন এই দিকেই আসিতেছে।'

'ডাক উহাকে—'

ঝিংটু সারসের ডাক ডাকিয়া উঠিল। ডাক শুনিয়া দূরে যে ছায়ামূর্তিটি গাছের আলো-আঁধারিতে দাঁড়াইয়াছিল সে আগাইয়া আসিল। দেখিলাম সম্পূর্ণ নগ্না একটি যুবতী। তাহার চোখের দৃষ্টিতে, চলিবার ভঙ্গিতে কামনা উদগ্র হইয়া রহিয়াছে। আমাকে অপাঙ্গে একবার দেখিয়া ঝিংটুর দিকে চাহিল।

'বৃহার খবর কি?'—ঝিংটু প্রশ্ন করিল।

'বৃহা নিজের আস্তানা ছাড়িয়া কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে কেহ জানে না। খি, পুরা, নিংকা, নোনা চারিদিকে তাহার খোঁজে বাহির হইয়াছে। খবর পাইলেই তাহারা আমাকে এবং টুংগাকে খবর দিবে। টুংগা পাহাড়ের ধারে অপেক্ষা করিতেছে।'

'বেশ, তুমিও অপেক্ষা কর। কাজ হাসিল করা চাই কিন্তু।'

মেয়েটি আমার দিকে অপাঙ্গে একবার চাহিয়া মৃদু হাসিল। তাহার পর আবার গিয়া গাছের ছায়ায় দাঁড়াইল। কিছু দূর গিয়া দেখিলাম বিতং হরিণ সাজিয়া ছুটিতেছে, তাহার পৃষ্ঠে একটি মেয়ে তাহার গলা জড়াইয়া রহিয়াছে। আমার শিরায় উপশিরায় রক্তস্রোত উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল আমি যেন এক সু-উচ্চ পর্বতশিখরের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছি, নীচেই অতলস্পর্শী গহ্বর, একটু বিচলিত হইলেই পড়িয়া যাইব। পড়িয়া গেলে কিন্তু জোলমাকে আর পাইব না, এই ধারণাটা যেন আমাকে আগলাইয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রতি মুহূর্তে তবু মনে হইতেছিল, আর বোধ হয় পারিলাম না, এইবার বোধ হয় পা ফসকাইয়া গেল।

'এই তোমার বনে যাইবার পথ'—গৌ সহসা কথা কহিয়া উঠিল। অনর্গল কথা কহিবার পর গৌ কিছুক্ষণ নীরব ছিল। সম্ভবত আপন মনে কিছু ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিল। আমরাও নীরবে তাহার অনুসরণ করিতেছিলাম। গৌ-এর কথা শুনিয়া আমি থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। সম্মুখে দেখিলাম একটি পথ বিসর্পিত রেখায় চলিয়া গিয়াছে। আমি গৌকে আর কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়া সোজা সেই পথ দিয়া ছুটিতে লাগিলাম। সহসা মনে হইল এই মায়াপুরী হইতে পলায়ন না করিলে আমার পতন অবশ্যম্ভাবী এবং পতন হইলে জোলমাকে আমি আর পাইব না, কিছুতেই পাইব না। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিলাম।

নিজের সেই পুরাতন বৃক্ষকোটরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। বৃহার উদাত্ত আহ্বানে ঘুম ভাঙিয়া গেল।

'বিদেশি, বিদেশি, কোথায় আছ তুমি, সাড়া দাও—' বৃক্ষকোটর হইতে মুখ বাড়াইয়া কিন্তু বৃহাকে দেখিতে পাইলাম না। প্রথমেই চোখে পড়িল বনের যে বৃক্ষহীন অংশটুকু চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল সেই অংশে হামাগুড়ি দিয়া কাহারা যেন সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছে। মুখ তুলিতেই চিনিতে পারিলাম। ঝিংটুর সেই নারীবাহিনী। প্রত্যেকেরই চোখ জ্বল জ্বল করিতেছে। চোখের তারায় প্রতিফলিত চন্দ্রালোকে কামনার লেলিহান দীপ্তি। মানবী নয়, যেন বাঘিনী।

'বিদেশি কোথায় তুমি'—আবার বৃহার কণ্ঠস্বর শুনিলাম। বৃক্ষকোটর হইতে বাহির হইয়া নীচে নামিতে নামিতে আশঙ্কা হইল বৃহার সহিত এখনই হয়তো বোঝাপড়া হইবে। প্রস্তর-কুঠারের হাতলটা চাপিয়া ধরিয়া রহিলাম, কি জানি বৃহা আচমকা যদি আক্রমণ করিয়া বসে

নীচে নামিবামাত্র বৃহাকে দেখিতে পাইলাম। সে ঠিক গাছের নীচেই ছিল। বৃহা যাহা বলিল, তাহাতে আমি কিন্তু অবাক হইয়া গেলাম। তাহার নিকট এ আচরণ প্রত্যাশা করি নাই।

বৃহা বলিল, 'বিদেশি, তোমার বীরত্বে এবং ব্যবহারে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। জিকাটু পাহাড়ে গিয়া বিষধর শঙ্খচূড়কে বধ করিয়া তুমি শ্যেন সম্প্রদায়কে বিভীষিকামুক্ত করিয়াছ। তোমাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। জোলমার প্রতি তুমি যে ভদ্র ব্যাবহার করিয়াছ, তাহাতেও আমি আনন্দিত। আজ তাই এমন একটা কার্যের ভার তোমার উপর দিতে আসিয়াছি, যাহা পাইলে শ্যেন সম্প্রদায়ের যে কোনো লোক নিজেকে ধন্য মনে করিত। এই কার্য যদি তুমি সুসম্পন্ন করিতে পার, শ্যেন সম্প্রদায় তোমাকে আত্মীয়রূপে গণ্য করিবে। দলপতিরূপে আমিও তোমার যে কোনো প্রার্থনা পূর্ণ করিব।'

'আমাকে কোন্ কার্য করিতে হইবে, বলুন—'

'এই বনে বন্য-মহিষের দল আসিয়াছে। আমি কাল সশস্ত্র হইয়া তাহাদের সম্মুখীন হইব। তোমাকে আমার সঙ্গে থাকিতে হইবে।'

'আর কে থাকিবে?'

'টাহা।'

'আমি নিশ্চয় যাইব। আমার কিন্তু একটি নিবেদন আছে, শুনিবেন কি?'

'শুনিবার প্রয়োজন নাই। তুমি কি চাও, তাহা আমি জানি। জোলমার কাছে সব শুনিয়াছি। জোলমাকে চিরকুমারী থাকিতে হইবে, শ্যেন সম্প্রদায়ের জীবনমরণ ইহার উপর নির্ভর করিতেছে। এই অমোঘ বিধান মানিয়াও যদি তুমি জোলমাকে সঙ্গিনীরূপে পাইতে চাও, আমার আপত্তি নাই। তোমার চরিত্র, তোমার বীরত্ব, তোমার ছবি আঁকিবার ক্ষমতা জোলমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। আমিও মুগ্ধ হইয়াছি। আমি যখন থাকিব না তখন তুমিই দলপতি হইবে। সে যোগ্যতা তোমার আছে। তখন কুমারী জোলমা হয়তো, হয়তো একদিন তোমারই পার্শ্বে অন্ধকার গুহায় প্রদীপ ধরিয়া তোমার ছবিকে উজ্জ্বল করিবে। আমার ইহাতে আপত্তি নাই—'

আমি নির্বাক হইয়া রহিলাম।

'কাল আমার সহিত যাইতেছ তাহা হইলে?'

'যাইব।'

বৃহা আর কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। তাহার বিশাল মূর্তি বৃক্ষের অন্তরালে নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইল। আমিও নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার সমস্ত সত্তা যেন উন্মুখ হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল এখনই একটা অঘটন ঘটিবে। পরমুহূর্তেই বৃহার চিৎকার শুনিতে পাইলাম।

'একি একি একি করিতেছ! ছাড়িয়া দাও আমাকে, ছাড়। কাল আমাকে মহিষ-দেবতার সম্মুখীন হইতে হইবে। আমাকে নষ্ট করিও না, আমি অপবিত্র হইয়া যদি দেবতার কাছে যাই, তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন না; আমার মৃত্যু হইবে—ছাড়, ছাড়—'

সম্মিলিত নারীকণ্ঠের কলকাকলিতে বৃহার কণ্ঠস্বর নিমজ্জিত হইয়া গেল। তাহার কোনো কথা আর আমি শুনিতে পাইলাম না।

...পরদিন বৃহা, টাহা এবং আমি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বনপথ অতিক্রম করিতেছিলাম। বৃহার স্কন্ধে

ছিল ধনুক এবং হস্তে ছিল সেই বিরাট প্রস্তর কুঠারটা, যাহা দিয়া সে অবলীলাক্রমে শত শত হরিণ কাটিয়াছে, টাহার স্কন্ধেও ধনুক ছিল, তাহা ছাড়া হাতে ছিল একটা বর্শা এবং বর্শা ছুঁড়িবার একটা যন্ত্র, আমার ছিল প্রস্তর কুঠার এবং ধনুর্বাণ। জোলমা যে বৃক্ষশীর্ষে বসিয়া মহিষের দলটিকে দেখিয়াছিল, আমরা সেই দিকেই অগ্রসর হইতেছিলাম। কাহারও মুখে কোনো কথা ছিল না। চক্ষু, কর্ণ এবং নাসিকার সাহায্যে আমরা একাগ্রচিত্তে কেবল পারিপার্শ্বিক পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে চলিয়াছিলাম। কথা বলিবার অবসর ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। আমরা প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা করিতেছিলাম দুর্ধর্ষ মহিষের দল অতর্কিতে যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো দিক হইতে আসিয়া আমাদের আক্রমণ করিতে পারে। নিরাপদে কোনো বৃক্ষে আরোহণ না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাইতেছিলাম না। কিন্তু কোথায় গিয়া কোন্ বৃক্ষে আরোহণ করিব, তাহা ঠিক করিবার পূর্বে মহিষের দলটি কোথায় আছে, জানা প্রয়োজন। জোলমা যে বৃক্ষ হইতে তাহাদের দেখিয়াছিল, সেই বৃক্ষ অভিমুখেই তাই আমরা চলিয়াছিলাম। বৃক্ষতলে আসিয়া বৃহা আমাদের দিকে একবার চাহিল, তাহার পর নিঃশব্দে নিজেই বৃক্ষে আরোহণ করিতে লাগিল। আমার দুইজন নীচে দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে লক্ষ্য রাখিতে লাগিলাম। একটু পরেই বৃহা নামিয়া আসিল এবং মাথা নাড়িল। বুঝিলাম, বৃহা মহিষের দলকে দেখিতে পায় নাই। বৃহা আবার চলিতে আরম্ভ করিল। আমরা তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। নিঃশব্দে অনেকক্ষণ চলিবার পরও কিন্তু শিকারের সন্ধান মিলিল না। বৃহা দাঁড়াইয়া পড়িল এবং আমরা পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল বৃহার চোখের জ্যোতি যেন ম্লান দেখাইতেছে। তাহার পরই লক্ষ্য করিলাম তাহার ভ্রূযুগল ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। সে একবার টাহার দিকে চাহিয়া পুনরায় আমার দিকে চাহিল। মনে হইল যেন কোনো গুহ্য খবর সে ব্যক্ত করিতে চায়, কিন্তু কথা বলিয়া তাহা প্রকাশ করা নিরাপদ মনে করিতেছে না। আমরাও সে খবরটা জানিতে পারিয়াছি কি না তাহাই সে ভুরু নাচাইয়া অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু আমরা কেহই কিছু বুঝিতে পারি নাই। বৃহা কিছুক্ষণ এইভাবে আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া যখন আমাদের পর্যবেক্ষণ শক্তির অভাবের সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইল তখন খবরটি ব্যক্ত করিল। ভাষার দ্বারা নয়, ইশারায়। আঙুল দিয়া কয়েকটি পশু-পদচিহ্ন দেখাইয়া দিল। আমরা এগুলি দেখিতে পাই নাই। ঝুঁকিয়া দেখিলাম, কিন্তু সেগুলি যে কোন্ পশুর পায়ের চিহ্ন তাহা বোধগম্য হইল না। আমি অন্তত এরূপ পদ-চিহ্ন পূর্বে দেখি নাই। টাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল টাহাও দেখে নাই।

বৃহা তখন চুপি চুপি বলিল, 'দেবতা আবার আর এক রূপে আমাদের দেখা দিতেছেন। আমি একদিন দূর হইতে লক্ষ্য করিয়াছি দাড়িওয়ালা একদল ঘোড়া মধ্যে মধ্যে এই বনে যাতায়াত করিতেছে। এগুলি তাহাদেরই পায়ের দাগ। মনে হইতেছে ইহারাই মহিষের দলকে দূরে তাড়াইয়া লইয়া গিয়াছে।'

বৃহার কথাটা তুচ্ছ করিবার মতো নহে।

বলিলাম—'তাহা খুবই সম্ভব। ম্যামথরা বল্‌গা-হরিণের দলকে তাড়াইয়া দেয়। আর একটু আগাইয়া দেখা যাক তাহা হইলে। হয়তো আর একটু গেলে তাহাদের সন্ধান মিলিবে—'

আমরা আবার চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে অরণ্যের এক বৃক্ষবহুল স্থানে আসিয়া

পড়িলাম। সেখানে যেন আকাশচুম্বী মহীরুহদল পরামর্শ করিয়া সমবেত হইয়াছে। অবর্ণনীয় গাম্ভীর্যে সমস্ত স্থানটা পরিপূর্ণ। শাখাপত্রের মধ্যে প্রবহমান বাতাসও যেন উচ্চ শব্দ করিতে সাহস করিতেছে না। মৃদু মর্মর ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। সহসা টাহা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম সে বর্শাটা ফেলিয়া দিয়া মাটিতে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বৃহাও শুইয়া পড়িল। তাহাদের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিতে পাইলাম, তাহারা একটা দেবদারু গাছের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া বিড় বিড় করিয়া কি যেন বলিতেছে। আমিও কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলাম, তাহার পর আমিও দেখিতে পাইলাম। দেবদারু শীর্ষে একটি শ্যেনপক্ষী বসিয়া রহিয়াছে। বুঝিলাম কুলদেবতাকে ইহারা সম্মান প্রদর্শন করিতেছে। আমার কি করা উচিত সহসা ঠিক করিতে পারিলাম না। অপরের কুলদেবতাকে ইতিপূর্বে কখনও প্রণাম করি নাই। থানকু বলিয়াছিল করিলে আমাদের কুলদেবতা ব্যাঘ্র ক্ষুণ্ণ হইবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইল যখন শ্যেন সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়রূপে বসবাস করিব ঠিক করিয়াছি তখন ইহাদের কুলদেবতাকে অবহেলা করাও কি ঠিক হইবে? জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িলাম এবং শ্যেনপক্ষীটিকে প্রণাম করিলাম। অন্তরের অন্তস্তলে কিন্তু একটা অপমানের কাঁটা যেন খচখচ করিতে লাগিল, মনে হইল জোলমাকে পাইবার জন্য এই হীনতা স্বীকার করিতে হইতেছে। নিজের অজ্ঞাতসারেই বৃহার প্রতি মন বিরূপ হইয়া উঠিল। মনে হইল বৃহা যেন আমাকে একটা উদ্ভট ফাঁদে ফেলিয়া আমার ধর্ম নষ্ট করিতেছে, আমার ব্যাঘ্র দেবতাকে যেন শ্যেনপক্ষীর নিকট নতি স্বীকার করাইতেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শ্যেনপক্ষী কর্কশ ভাষায় কি যেন একটা বলিয়া উড়িয়া গেল। দেখিলাম বৃহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, অপরাধীর মতো সে বার বার সেই উড্ডীয়মান শ্যেনকে প্রণাম করিতে লাগিল। তাহার পর আমরা তিনজনেই তাহার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া রহিলাম। বৃহার ভ্রূযুগল আবার একটু একটু কম্পিত হইতে লাগিল। টাহার দিকে চাহিয়া নিম্নকণ্ঠে সে বলিল—'কুলদেবতা হয়তো ইঙ্গিত করিয়া গেলেন। চল উহাকেই আমরা অনুসরণ করি।'

...আমরা পূর্বদিকে যাইতেছিলাম, শ্যেনপক্ষীকে অনুসরণ করিয়া দক্ষিণদিকে চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর চলিবার পর ছোট ছোট গাছের ঘন জঙ্গল আরম্ভ হইল। সেই জঙ্গলের ভিতরই পথ করিয়া আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলাম, সহসা তিনজনকেই যুগপৎ থামিয়া যাইতে হইল। পশুরা চরিবার সময় ঘাস ছেঁড়ার যে রকম শব্দ হয় ঠিক সেই রকম শব্দ পাওয়া গেল। কাছেই ছিল কয়েকটা বড় গাছ। আমি একটা গাছে উঠিয়া পড়িলাম। বৃহা এবং টাহাও এক একটা গাছে উঠিল। গাছের শীর্ষদেশে উঠিয়া আমি একটা বন্য-মহিষকে দেখিতে পাইলাম। জঙ্গলের ঠিক ওপরেই তৃণাচ্ছাদিত একটা মাঠ রহিয়াছে। মাঠের ওপারে নদী। মাঠটা ঢালু হইয়া নদীর দিকে নামিয়া গিয়াছে। সেই ঢালুর উপর পুরুষ মহিষটা চরিতেছে। ভীষণদর্শন স্বয়ং কালান্তক যম যেন! আশেপাশেই দলটাও আছে নিশ্চয়। বৃহা এবং টাহাও মহিষ দেখিতে পাইয়াছিল। তাহারা তরতর করিয়া গাছ হইতে নামিয়া আসিল। সবিস্ময়ে দেখিলাম মাটিতে নামিয়াই তাহারা আনন্দাবেগে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল। তাহাদের কুলদেবতা ইঙ্গিতে তাহাদের যে ঠিক স্থানটিতে লইয়া আসিয়াছেন এই আনন্দেই তাহারা আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়াছিল। আমার দিকে ফিরিয়া বৃহা আমাকে গাছ হইতে নামিতে ইঙ্গিত করিল। মনে হইল আমার প্রতি তাহার প্রসন্নতা যেন আর একটু বাড়িয়া গিয়াছে।

...নিম্নকণ্ঠে তিনজনে মিলিয়া পরামর্শ করিলাম। ঠিক হইল তিন দিক হইতে আক্রমণ করিতে হইবে, যে মাঠে মহিষগুলি চরিতেছে সেই মাঠ হইতে জঙ্গলে প্রবেশ করিবার একটি পথ নিশ্চয়ই আছে। একাধিক পথও থাকিতে পারে, কিন্তু একটি পথ নিশ্চয়ই আছে, সেই পথ দিয়াই মহিষের দল জঙ্গল হইতে বাহির হয় এবং জঙ্গলে ঢোকে। আমাকে সেই পথটি আবিষ্কার করিয়া সেই পথের ধারে কুঠার হস্তে লুকাইয়া থাকিতে হইবে। তাড়া খাইয়া মহিষের দল যদি জঙ্গলে ঢোকে আমি তাহাদের আক্রমণ করিব। টাহা পূর্বদিকে এবং বৃহা পশ্চিমদিকে গিয়া নানারূপ শব্দ করিতে করিতে জঙ্গল হইতে বাহির হইবে। শব্দ শুনিয়া মহিষের দল তাহাদের আক্রমণ করিতে পারে, তখন তাহারা কুঠার ও বর্শা লইয়া তাহাদের সম্মুখীন হইবে। আক্রমণ না করিয়া মহিষেরা জঙ্গলে ঢুকিতে পারে, কিংবা নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে। জঙ্গলে আমি কুঠার হস্তে অপেক্ষা করিব, নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িলে তিনজনে মিলিয়া তীর ছুঁড়িব। এই পরামর্শ করিয়া তিনজনে তিনদিকে অগ্রসর হইলাম।

...মাঠের দিক হইতে জঙ্গলে প্রবেশ করিবার পথটা খুঁজিয়া বাহির করিতে বেশ কিছু সময় লাগিল। পথের ধারেই কিন্তু বেশ একটি বড় গাছ পাওয়া গেল, আমি অবিলম্বে তাহাতে উঠিয়া পড়িলাম। উঠিয়া সানন্দে দেখিলাম গাছের একটি মোটা ডাল ঠিক পথের উপরই বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। যদি মহিষরা এই দিকেই আসে গাছের ডালে বসিয়াই কুঠার চালাইতে পারিব, নীচে নামিতে হইবে না।

...গাছে উঠিয়া মহিষগুলিকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম। পুরুষ মহিষটি সত্যই ভীষণ-দর্শন। কুঠারের আঘাতটা যদি সজোরে ঠিক উহার মাথার উপর না পড়ে তাহা হইলে উহাকে কাবু করা যাইবে না। দুইটি মহিষী এবং দুইটি বাছুরও আছে দেখিলাম। বাছুরদের মধ্যে একটা যদি আসে এক আঘাতেই শেষ করিতে পারিব। মহিষী দুইটিও বেশ বলিষ্ঠকায়া। উহাদের সহজে কায়দা করা যাইবে না। মাথায়, কোমরে কিংবা পিছনের পায়ে মারিতে না পারিলে, অর্থাৎ এক আঘাতেই চলচ্ছক্তিহীন করিয়া ফেলিতে না পারিলে অভিযান ব্যর্থ হইবে। অনেক দিন পূর্বে একবার মহিষের মাংস খাইয়াছিলাম, বড় ভাল লাগিয়াছিল। মহিষগুলির সুপুষ্ট কান্তি আমার রসনাকে লালায়িত করিয়া তুলিল। হঠাৎ বোহিলার কথা মনে পড়িয়া গেল। বোহিলাই আগুন জ্বালিয়া মহিষের রাংটা ঝলসাইয়া দিয়াছিল। বোহিলার কালো মুখে ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুইটা যেন মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। বোহিলা শুধু আমার নয়, আমাদের দলের সকলেরই প্রেয়সী ছিল। তাহার ক্ষুদে চোখে বিদ্যুৎ খেলিত। বোহিলার কথা ভাবিতে ভাবিতে লুব্ধ দৃষ্টিতে মহিষগুলিকে দেখিতেছিলাম। নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে চরিয়া বেড়াইতেছে। একটা মহিষী বোধ হয় প্রহরায় নিযুক্ত আছে। সে মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। বৃহা বা টাহার কোনো সাড়াশব্দ নাই। মাঠটাকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য গাছের আরও খানিকটা উপরে উঠিলাম। উঠিয়া দেখি অরণ্য পশ্চিম দিকেও মাঠকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, পূর্বদিক হইতে টাহার তাড়া খাইয়া মহিষের দল পশ্চিম দিকের জঙ্গলেও ঢুকিয়া পড়িতে পারে। পশ্চিম দিকে অবশ্য বৃহা আছে। কিন্তু বৃহার চিৎকার অগ্রাহ্য করিয়া কিংবা বৃহাকে বিধ্বস্ত করিয়াও তো ঢুকিতে পারে। এই সম্ভাবনাতে মনটা বিষণ্ন হইয়া গেল। বন্য মহিষের মাংস অনেক দিন খাই নাই, আমাদের ও অঞ্চলে ক্বচিৎ উহাদের দেখা মেলে। শুধু এই জন্যই যে বিষণ্ন বোধ করিতেছিলাম তাহাও নয়, মনে

হইতেছিল অদ্যকার এই অভিযানের সাফল্যের উপর নির্ভর করিতেছে আমি জোলমাকে পাইব কি না। বৃহাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। যে কারণে সেদিন বৃহা আমাকে বিষধর শঙ্খচূড়ের মুখে পাঠাইয়াছিল ঠিক সেই কারণেই হয়তো আজ হিংস্র বন্য মহিষের সম্মুখে আনিয়াছে। যেমন করিয়া হউক আমাকে বিনাশ করাই তাহার উদ্দেশ্য, আমার মধ্যে সে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, বুঝিয়াছি আমাকে জীবন্ত রাখিলে তাহার চলিবে না। শঙ্খচূড়কে বধ করিয়াছি, বন্য মহিষদেরও যদি বধ করিতে পারি তাহা হইলে শক্তি পরিক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হইব। ইহার পরেও বৃহা হয়তো আরও নানা প্রকার কৌশল করিবে—তা করুক, জোলমা আমার স্বপক্ষে আছে—আজ কিন্তু অন্তত একটা বন্য মহিষ শিকার করিয়া তাহার কৌশল ব্যর্থ করিয়া দিব আশা করিয়া আসিয়াছিলাম। মহিষগুলি হয়তো পশ্চিম দিকের জঙ্গলে ঢুকিয়া হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে এই সম্ভাবনায় তাই বিমর্ষ বোধ করিতে লাগিলাম।

...অরণ্যের যে অংশটা মাঠের পশ্চিমদিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে সেই অংশটুকুই ভাল করিয়া দেখিতেছিলাম। দেখিতেছিলাম ওই অংশে জঙ্গলে প্রবেশ করিবার কোনো পথ আছে কি না। বৃহা হয়তো এখনই ওই দিক হইতে বাহির হইবে। ভাল করিয়া দেখিতে গিয়া হঠাৎ কিন্তু যাহা দেখিয়া ফেলিলাম তাহাতে শরীরের রক্তস্রোত ক্ষণিকের জন্য থামিয়া গেল। দেখিলাম পশ্চিম দিকের জঙ্গলের যে অংশটুকু নদীর তীর পর্যন্ত আসিয়াছে, নদী ও অরণ্যের সেই সঙ্গমস্থলে, বিরাট একটা ব্যাঘ্র ওৎ পাতিয়া আছে। রৌদ্র ছায়া ও জঙ্গলের সহিত তাহার গায়ের রং এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, প্রহরারত মহিষী তাহাকে দেখিতে পায় নাই। গন্ধও পায় নাই, কারণ বাতাস উল্টা দিকে বহিতেছিল। দেখিলাম বাঘের লক্ষ্য ওই মহিষগুলি। বাঘ না হইয়া যদি অন্য কোনো জন্তু হইত আমি চিৎকার করিয়া বৃহা টাহাকে সাবধান করিয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু ব্যাঘ্র যে আমার কুলদেবতা! তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা আমার সাধ্যাতীত। সুতরাং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম এবং রুদ্ধশ্বাসে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম পুরুষ মহিষটা চরিতে চরিতে বাঘের দিকেই আগাইয়া যাইতেছে। নিঃসংশয়ে অনুভব করিতে লাগিলাম যে, স্বয়ং কুলদেবতা যখন মহিষগুলি দেখিয়া প্রলুব্ধ হইয়াছেন আমার আর কোনো আশা নাই। আমার ভবিষ্যতের ছবিটাই যেন দেখিতে দেখিতে বদলাইয়া গেল। আজ যদি মহিষ-শিকারে ব্যর্থকাম হই বৃহার জয় হইবে। আমাকেই সে হয়তো এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী করিয়া এখান হইতে দূর করিয়া দিবে। বলিবে এই বিদেশির জন্যই মহিষ-দেবতা আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন। বৃহার জয় হইবে, জোলমাকে আর পাইব না, একথা মনে হওয়া মাত্র শরীরের সমস্ত রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, রগের শিরাগুলা দপদপ করিতে লাগিল। গাছের উপর উঠিয়া চতুর্দিকে পর্যবেক্ষণ করিবার বাসনা না জাগিলে এ উভয়-সঙ্কটে পড়িতাম না! কৌতূহলের আতিশয্যে জীবনে অনেকবাব বিপদে পড়িয়াছি, এবারও পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে অবশেষে তাহাই করিলাম নিরুপায় হইয়া তোমরা আজও যাহা করিয়া থাক। দেবতার নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম। কুলদেবতা ব্যাঘ্রকে মনে মনে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলাম, 'তুমি স্বয়ং যখন দেখা দিয়াছ আমার আর কিছুই করিবার নাই। আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই তুমি জান। তোমাকে বাল্যকাল হইতে পূজা করিয়াছি, চিরকাল পূজা করিব। তোমাকে চিরকাল রক্ষা করিয়াছি, চিরকাল রক্ষা করিব। আমার

ভবিষ্যতের ভালমন্দ সব তোমার হাতে অর্পণ করিতেছি, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।' আমার প্রার্থনার জন্য কিনা জানি না, কিন্তু ঠিক পরমুহূর্তেই বাঘ পুরুষ মহিষের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল, দারুণ চিৎকার করিয়া মহিষটাও লাফাইল। পরমুহূর্তেই দেখিলাম বাঘ মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে এবং মহিষ তাহাকে গুঁতাইবার জন্য মাথা নিচু করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। মহিষী দুইটিও মাথা নিচু করিয়া বাঘের দিকে ছুটিতেছে । নিমেষের মধ্যে ভূপাতিত বাঘ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বিরাট গর্জনে অরণ্যভূমি প্রকম্পিত করিয়া পুরুষ মহিষটার ঘাড়ে প্রচণ্ড এক থাবা মারিল। মহিষ ছিটকাইয়া পড়িল, কিন্তু মরিল না। আবার ছুটিয়া আসিয়া আক্রমণ করিল। মহিষী দুইটিও ইতিমধ্যে বাঘের পিছন দিক হইতে আসিয়া তাহাকে গুঁতাইতে শুরু করিয়াছিল। প্রচণ্ড গর্জন করিয়া বাঘ আবার শূন্যে লাফাইয়া উঠিল এবং অরণ্যের প্রান্ত ঘেঁষিয়া এমন জায়গায় আসিয়া বসিল যেখানে পিছন দিক হইতে মহিষরা তাহাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। মহিষের দল অর্ধ-বৃত্তাকারে মাথা নিচু করিয়া বাঘের দিকে আবার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাঘ থাবা গাড়িয়া বসিয়া ল্যাজ আছড়াইতেছিল, সহসা আবার লাফাইয়া উঠিয়া পুরুষ মহিষটির পিঠে বসিয়া ঘাড়টা কামড়াইয়া ধরিল। মহিষও এক ঝটকায় আবার মাটিতে ফেলিয়া দিল তাহাকে। সঙ্গে সঙ্গে বাঘ আবার লাফাইয়া উঠিল এবং এবার অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রমণ করিল একটা বাছুরকে। থাবার এক আঘাতে বাছুরটাকে বোধহয় মারিয়াই ফেলিল, কারণ আর সে উঠিল না। পুরুষ মহিষটা একটু দূরে দাঁড়াইয়া সম্মুখের পা দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে গজরাইতেছিল। হয়তো আবার তাহাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হইত, কিন্তু আর একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। দেখিলাম বৃহা বনের ভিতর হইতে বাঘকে লক্ষ্য করিয়া তাহার কুঠার উত্তোলন করিয়াছে। দেখিবামাত্র আমার মধ্যে একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। বৃহার হাতে আমার কুলদেবতার জীবন বিপন্ন দেখিয়া আমি ভুলিয়া গেলাম যে, আমি বৃহার অতিথি, ভুলিয়া গেলাম যে বৃহা জোলমার পিতা। আমার অতি-অতি-বৃদ্ধা-মাতামহী, যিনি ব্যাঘ্রমাংস আহার করিয়া ব্যাঘ্রকে আমাদের কুলদেবতা করিয়াছিলেন, যাঁহাকে আমি কখনও দেখি নাই—তিনিই সহসা যেন আমার অন্তরতম সত্তায় কথা কহিয়া উঠিলেন। সেই বন্য ব্যাঘ্রিনী-রূপিণী নগ্না রাক্ষসীর আর্তকণ্ঠ যেন শুনিতে পাইলাম, 'তোমার বংশমর্যাদা নষ্ট হইতেছে দেখিতেছ না? চুপ করিয়া বসিয়া আছ? চক্ষুর সম্মুখে তোমার বংশের প্রতীককে এমনভাবে লাঞ্ছিত হইতে দিবে? ও যে তোমার শত্রু, এখনও চিনিতে পার নাই। জোলমাকে পাইতে হইলেও যে উহাকেই নিপাত করিতে হইবে তাহা কি এখনও বোঝ নাই? এই সুযোগ, কুলদেবতাকে রক্ষা কর, জোলমাকে অধিকার কর, আত্মসম্মান বাঁচাও। ওঠ, ওঠ, ওঠ—'

আমার সমস্ত সত্তা ব্যাপিয়া শতকণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল— ওঠ, ওঠ, ওঠ। নিমেষের মধ্যে আমি ধনুতে শর যোজনা করিলাম এবং পরমুহূর্তেই আমার বাণ বৃহার মস্তক বিদীর্ণ করিল। ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় বৃহা পড়িয়া গেল। বৃহার আর্তনাদে সচকিত হইয়া বাঘ আবার লাফাইয়া উঠিল এবং বৃহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। বৃহা তারস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল একবার, তাহার পরই থামিয়া গেল। বৃহার চিৎকারে মহিষরাও ভীত হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা বৃহাকে দেখিতে পাইল না। বাঘ তাহাকে লইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। আর একটা চিৎকার শুনিয়া বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ তাহারা পূর্বমুখে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

দ্বিতীয় চিৎকারটা টাহার। টাহা শুধু চিৎকার করে নাই, মহিষদের লক্ষ্য করিয়া সে বর্শাও নিক্ষেপ করিয়াছিল। ঝড়ের বেগে ক্ষিপ্ত মহিষের দল তাহার দিকে ছুটিয়া আসিল। টাহাকে বাঁচাইবার জন্য এবার আমি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলাম। যে বিবেক সেদিন আমার মধ্যে জাগরিত হইয়াছিল তাহারই আলোকে আমি সেদিন কর্তব্যের এক অভিনব মূর্তি দেখিয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল কুলদেবতাকে রক্ষা করিবার জন্য বৃহাকে হত্যা করা যেমন আমার কর্তব্য, এই শিকার-অভিযানে ইহাদের আমি সাহায্য করিব এই প্রতিশ্রুতি পালন করাও তেমনি আমার কর্তব্য, এক ভাইকে হত্যা করিয়া আর এক ভাইকে বাঁচাইবার চেষ্টা তোমরা আজও কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছ না কি? আমিও আমার সেদিনকার বিবেকের আলোকে তাহাই মনে করিয়াছিলাম। অকৃত্রিম আগ্রহ-সহকারেই আমি টাহাকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইলাম।

...দ্রুতবেগে বন হইতে বাহির হইয়া মাঠে পড়িলাম। মাঠে গিয়া দেখি মহিষের শৃঙ্গাঘাতে টাহা ভূশায়ী হইয়াছে। আরও দেখিলাম টাহার বর্শা পুরুষ মহিষটার পার্শ্বদেশ বিদ্ধ করিয়া তাহাকে অক্ষম করিয়া ফেলিয়াছে। বাঘের আক্রমণে সে ইতিপূর্বেই আহত হইয়াছিল, টাহার বর্শার আঘাত তাই আর সহ্য করিতে পারে নাই, চলচ্ছক্তিহীন হইয়া বসিয়া পড়িয়াছে। টাহাকে ভূপাতিত করিয়াছিল একটি মহিষী। দ্বিতীয় মহিষীটি দূরে মৃত বৎসটিকে ঘিরিয়া নিষ্ফল আক্রোশে ঘুরিতেছিল। বৎসটি সম্ভবত তাহারই। আর একটা বাছুর আরও দূরে ছুটাছুটি করিতেছিল, মাঝে মাঝে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইযা পড়িতেছিল। এ বাছুরটি নিতান্তই শিশু, এরূপ ভয়ঙ্কর ঘটনা তাহার জীবনে ইতিপূর্বে বোধহয় আর ঘটে নাই।

...টাহা ভূপাতিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধ থামায় নাই। সবেগে প্রস্তর-কুঠার চালাইতেছিল। আমি ছুটিয়া গিয়া পিছন দিক হইতে মহিষীর কোমরে সজোরে কুঠারঘাত করিলাম। মহিষী সঙ্গে সঙ্গে বসিয়া পড়িল। বসিয়া পড়িতেই কুঠারটা তুলিয়া লইয়া আবার তাহার মাথায় আঘাত করিলাম। টাহার কুঠারাঘাতে তাহার মুখের সম্মুখভাগটা ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল, আমার কুঠারাঘাতে তাহার মৃত্যু হইল। টাহা নিজে কিন্তু সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিল। মহিষী তাহার পেট চিরিয়া দিয়াছিল, অন্ত্রগুলা বাহির হইয়া ঝুলিতেছিল। বুঝিলাম সে আর বাঁচিবে না। আমাকে দেখিয়া মরণোন্মুখ টাহার মুখ আশায় আশ্বাসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া বলিল :

'বিদেশি, তুমি আসিয়াছ, তোমার ওই ছবি-আঁকা কুঠারখানা আমাকে একবার দাও। ওটা দিয়া আমি একবার মহিষটাকে আঘাত করি। আহা, একটা ছবি-আঁকা কুঠার যদি আমার থাকিত মহিষ আমার কিছু করিতে পারিত না।'

আমি আমার কুঠারখানা তাহার হাতে দিতে মৃত মহিষীকে সে একবার আঘাত করিল। আঘাত করিতে গিয়া সে বুঝিল যে শরীরে শক্তি নাই, হাত উঠিতেছে না। তখন আমার দিকে করুণনেত্রে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'বিদেশি, ইহজন্মে আর তোমার নিকট ছবি-আঁকা বোধ হয় শেখা হইল না। চোখে অন্ধকার দেখিতেছি। আমাকে বাড়ি লইয়া চল। বৃহা কোথায়—'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। আমি যে বৃহাকে বিনাশ করিয়াছি এ সত্য কথা বলিবার সাহস ছিল না। বৃহা যে মারা গিয়াছে এ কথা বলিতেও বাধিতেছিল।

'বৃহা কোথায়?'

আবার টাহা প্রশ্ন করিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উত্তর দিলাম, 'বৃহা মারা গিয়াছে—'

'মারা গিয়াছে! শ্যেনবংশও এবার ধ্বংস হইবে। রাক্ষসী গৌ চক্রান্ত করিয়া এই সর্বনাশ করিল। বৃহা জানিত সে আর ফিরিবে না, আসিবার সময় একথা সে আমাকে বলিয়াছিল—'

আমি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সহসা একটা নূতন ধরনের যুক্তি মনে হওয়াতে আশ্বস্তও হইলাম। বৃহাকে হত্যা করিয়া সত্যই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। কুলদেবতাকে রক্ষা করিবার জন্য কর্তব্যবোধেই এই নৃশংস কার্য করিয়াছিলাম, মনের ভিতর কিন্তু কেমন যেন খচখচ করিতেছিল, মনে হইতেছিল এই অজুহাতে জোলমার অধিকার করিবার পথ সুগম করিবার জন্যই আমি এই কৃতঘ্ন আচরণ করিলাম। টাহার কথায় কিন্তু মনে হইল আমি হয়তো উপলক্ষমাত্র, স্খলিতচবিত্র বৃহা নিজের মরণ নিজেই ডাকিয়া আনিয়াছে এবং তাহার সহায়ক হইয়াছে তাহার মা। মানসপটে সেই ছবিটা ভাসিয়া উঠিল—চন্দ্রালোকিত অরণ্যের আড়ালে উলঙ্গিনী মায়াবিনীর দল হামাগুড়ি দিয়া বাঘিনীর মতো নিঃশব্দে অগ্রসর হইতেছে। উহারাই বৃহার মৃত্যুর কারণ, আমি নয়। সহসা মনোযোগ অন্যদিকে আকৃষ্ট হইল। একটা ঘড়ঘড় শব্দে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম আমাকে দেখিয়া পুরুষ মহিষটা প্রাণপণে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার চোখের দৃষ্টি হইতে আগুন ছুটিতেছে। যদিও তাহার নাক দিয়া গলগল করিয়া রক্ত বাহির হইতেছিল, উঠিতে গিয়া যদিও মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল, তবু মনে হইল সে নিরস্ত হইবে না, প্রাণপণে শেষ চেষ্টা করিয়া আমাকে আক্রমণ করিবেই। আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া টাহার কুঠারটা লইয়া ছুটিয়া গেলাম এবং যেমন করিয়া কাঠ চেলায় তেমনিভাবে তাহার মাথার উপর কুঠার চালাইতে লাগিলাম। মাথা চৌচির হইয়া গেল। যে বাছুরটা দূরে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল এই দৃশ্য দেখিয়া সে এক ছুটে বনের ভিতর অন্তর্ধান করিল। যে মহিষীটি তাহার মৃত বৎসকে ঘিরিয়া আক্রোশে গর্জন করিতেছিল সে-ও সবেগে তাহার অনুসরণ করিল। উপর্যুপরি তিন তিনটি মৃত্যু দেখিয়া তাহারা বোধহয় অনুভব করিল যে আপাতত এখন রণে ভঙ্গ দিয়া আত্মরক্ষা করাই সমীচীন। কিন্তু বাছুরটি যে আত্মরক্ষা করিতে পারিল না তাহা পরমুহূর্তেই দেখিতে পাইলাম। আমার কুলদেবতা ব্যাঘ্র বনের ভিতর হইতে আবার গর্জন করিয়া উঠিল এবং তাহার পরই দেখিতে পাইলাম মহিষ-শাবকটিকে মুখে লইয়া সে নদীর তীর-লগ্ন ঝোপের অন্তরালে এক লম্ফে অদৃশ্য হইয়া গেল।

'ওটা কিসের গর্জন? বাঘের মনে হইল'—টাহা ক্ষীণকণ্ঠে বলিল।

'বাঘেরই।'

'আমাকে বাড়ি লইয়া চল।'

আমি একটু মুশকিলে পড়িলাম। তিন তিনটি মৃত মহিষকে অরণ্য প্রান্তে এমন অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে মন সরিতেছিল না। অন্য কোনো জন্তু আসিয়া গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারে। আর কেহ না আসুক, শকুনি গৃধিনী তো নিশ্চয় আসিবে। অথচ টাহার এই অনুরোধ রক্ষা না করিয়াও যে উপায় নাই। মরণোন্মুখ মানুষের শেষ ইচ্ছা পালন করা উচিত থানকু বলিয়াছিল। না করিলে প্রেতরূপে সে আসিয়া প্রতিশোধ লইবে। প্রত্যেক মানুষই যে মরিবার পর প্রেত রূপ ধারণ করে এ ধারণা আমাদের সকলের মনে বদ্ধমূল ছিল। এই

ধারণার বশবর্তী হইয়াই আমরা মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে শিখিয়াছিলাম। ভক্তিতে নয়, ভয়ে। আমরা কি করিয়া যেন বুঝিয়াছিলাম যে আমাদের জীবন্ত পেশী-শক্তি বা বুদ্ধি ছাড়াও আর একটা এমন শক্তি আছে যাহা দেহাতীত, যাহা অদৃশ্যচারী, যাহা মৃত্যুর সহিত জড়িত এবং সেই জন্যই যাহা ভয়ঙ্কর। টাহা একটু পরেই মরিবে, মরিয়া এমন শক্তি লাভ করিবে যাহা মানুষের শক্তির চেয়ে অনেক বেশি, যাহা আমার ভবিষ্যৎকে নির্মাণ অথবা ধ্বংস করিতে পারে।

'বিদেশি, আমাকে বাড়ি লইয়া চল—'

'এখনই লইয়া যাইতেছি—'

...মৃত মহিষগুলির একটা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলাম। আজকাল তোমরা যাহাকে 'তুক' বল আমাদের বিপদসঙ্কুল জীবনে তখন তাহাই আমাদের সহায় ছিল। থানকুর নিকটই জানিয়াছিলাম এবং অনেক সময় পরীক্ষা করিয়াও দেখিয়াছি যে, কুলদেবতার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া দিলে অপহরণের আশঙ্কা থাকে না। আমার কুলদেবতা তো নিকটেই বনের মধ্যে রহিয়াছেন তাঁহাকেই মনে মনে স্মরণ করিয়া বলিলাম—আমার জিনিসগুলি তোমার কাছে রাখিয়া গেলাম, ফিরিয়া আসিয়া আবার যেন পাই। আমার অতি-বৃদ্ধা মাতামহী যিনি এই ব্যাঘ্রবংশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহার মূর্তিও মনে মনে স্মরণ করিলাম। তাঁহাকে দেখি নাই, তাঁহার কথা শুনিয়াছি। তাঁহার মূর্তি কিরূপ ছিল আমাদের বংশের প্রত্যেকের মানসপটে তাহা অঙ্কিত আছে। সে মূর্তি মানবীর নয়, রাক্ষসীর, তাহা মানবী ও ব্যাঘ্রিনীর সমন্বয়। মানবীর দেহে ব্যাঘ্রিনীর মুণ্ড বসানো। হস্তপদের উপরাংশ মানুষের হস্তপদের মতোই, আঙুলের স্থানে কিন্তু নখসমন্বিত থাবা। বক্ষ, উদর, উরু মানুষের মতোই, বুকে বিরাট দুইটা স্তনও ঝুলিতেছে, পশ্চাদ্দেশে কিন্তু ব্যাঘ্রপুচ্ছ। কুলদেবতার এই ভীষণ অস্বাভাবিক মূর্তিই আমরা কল্পনা করিতে শিখিয়াছিলাম। মনে মনে ইঁহাকেও স্মরণ করিলাম, বলিলাম এগুলিকে রক্ষা করিও। মনে হইল বাক্ষসী যেন হাসিল।

...টাহা আমার ছবি-আঁকা কুঠারটা দৃঢ়বদ্ধ দক্ষিণ মুষ্টিতে ধরিয়াছিল, মনে হইতেছিল, জীবনের শেষ কামনাটাকে জীবনের শেষ মুহূর্তে সে যেন আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। কিছুতেই আর ছাড়িবে না। তাহার অন্ত্রগুলা বাহির হইয়া আমার বুকের সম্মুখে দুলিতেছিল। আমি তাহাকে স্কন্ধে করিয়া বহিয়া লইয়া চলিয়াছিলাম। তাহার কণ্ঠ হইতে ঘড়ঘড় করিয়া যে শব্দটা হইতেছিল, হঠাৎ সেটা থামিয়া যাইতেই বুঝিলাম, টাহা মারা গেল। তবু তাহাকে বহন করিয়া লইয়া চলিলাম। তাহার শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিব না। ...বন-জঙ্গল ভেদ করিয়া চলিয়াছি। যতক্ষণ বনের আড়ালে ছিলাম, বিশেষ কোনো অসুবিধা ছিল না। উন্মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া মুশকিলে পড়িলাম। হঠাৎ চমকাইয়া উঠিলাম, যখন আমার কাঁধের উপর পাখা ঝটপট করিয়া একটা শকুনি বসিল। ঠিক আমার কাঁধের উপর নয়, টাহার শবের উপর। বসিয়াই নাড়িভুঁড়িগুলা ধরিয়া টানাটানি শুরু করিয়া দিল। আমার হাতে অস্ত্র ছিল, শকুনি তাড়াইতে বেগ পাইতে হইল না, কুঠারটা আস্ফালন করিবামাত্র উড়িয়া গেল। কিন্তু আস্ফালন বন্ধ করিবামাত্র আবার বসিল। ঘাড় তুলিয়া দেখিলাম, আকাশে অনেক শকুনি উড়িতেছে। দক্ষিণহস্তে টাহার শবটা আঁকড়াইয়া ধরিয়া বাম হস্তে কুঠার আস্ফালন করিতে করিতেই পথ অতিবাহন করিতে লাগিলাম। পিছনের দিকে দুইটা শৃগাল কলহ করিয়া

উঠিল। ফিরিয়া দেখিলাম, একদল শৃগালও আমার অনুসরণ করিতেছে। আমাকে দেখিয়া শৃগালের দল থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, কিন্তু পলাইয়া গেল না, লুব্ধ দৃষ্টিতে টাহার মৃতদেহের দিকে তাকাইয়া রহিল। আমি কুঠারটা আস্ফালন করিতে যদিও একটু সরিয়া গেল, কিন্তু চলিয়া গেল না, তাহারা বুঝিয়াছিল যে তাহাদের শাস্তি দিবার ক্ষমতা এখন আমার নাই। ...শকুনি এবং শৃগাল তাড়াইতে তাড়াইতে চলিয়াছিলাম। যে আমি একদিন নিজের স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে হত্যা করিয়া আহার করিয়াছি, যে কোনো প্রকারে হোক, যে কোনো রকম মাংস সংগ্রহ করাই যাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সে-আমি কালস্রোতে কোথায় হারাইয়া গিয়াছি। এতখানি বিপ্লব সম্ভব হইয়াছে কি করিয়া? কে জানে।...

'বিদেশি, বিদেশি, তুমি কোথায়—'

জোলমার আকুল কণ্ঠস্বর শুনিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। শকুনির দল আবার আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। কুঠার আস্ফালন করিতে করিতে আমি চিৎকার করিলাম—'আমি এখানে, বড় বিপদে পড়িয়াছি, তুমি শীঘ্র এস—'

প্রান্তরের প্রান্তবর্তী জঙ্গল ভেদ করিয়া জোলমা ছুটিয়া বাহির হইল। জোলমাব চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, সে যেন বুঝিতে পারিয়াছিল, কি ঘটিয়াছে। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে সে কাছে আসিয়া পড়িল।

'ও কি, কাঁধে ও কে?'

'টাহা—'

'বৃহা কোথায়?'

'বৃহাকে বাঘে লইয়া গিয়াছে।'

'কোন্ দিকে গিয়াছিলে তোমরা?'

অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিলাম।

'নদীর ধারে যে মাঠটা আছে, সেখানে তিনটি মৃত বন্য মহিষ পড়িয়া আছে দেখিতে পাইবে। সেই বনের পশ্চিম দিকে যে বন আছে, তাহারই ভিতর বাঘ বৃহাকে লইয়া ঢুকিয়াছে।'

জোলমা আর অপেক্ষা করিল না, ছুটিয়া চলিয়া গেল।

...টাহা বৃহার সমাধি মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বৃহার দেহটা জোলমা জঙ্গল হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিল। ব্যাঘ্র দেবতা তাহার হাতের খানিকটা চিবাইয়াছিল মাত্র বাকি শরীরটা ঠিকই ছিল, মহিষ-শাবককে আয়ত্তের মধ্যে পাইয়া মনুষ্যশবের প্রতি বাঘের আর লোভ ছিল না সম্ভবত।

...টাহা বৃহার মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া শ্যেনপক্ষী সমাজে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা মন্দীভূত হইয়াছে। নূতন একটা উত্তেজনা শ্যেনপক্ষী সমাজে নূতন একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করিতেছিল। বৃহার মৃত্যুর পর কে দলপতি হইবে তাহা সর্বসম্মতিক্রমে কিছুতেই স্থির হইতেছিল না। অনেকে বলিতেছিল শ্যেনপক্ষী সমাজের বৃদ্ধতম শিকারী খোতারি দলপতি হউক। আর এক দল বলিতেছিল খোতারি ছবি আঁকিতে জানে না, সে দলপতি হইলে বল্‌গা-হরিণ আর আসিবে না। বিতং চেষ্টা করিতেছিল যাহাতে সে দলপতি হয়। সে

সকলকে আশ্বাস দিতেছিল যে যদিও সে ছবি আঁকিতে জানে না কিন্তু বল্‌গা-হরিণের দলকে সে লাফাই পাহাড়ের শিখরে নিশ্চয়ই লইয়া আসিবে। ছবি আঁকিতে না জানিলেও হরিণকে ভুলাইবার মন্ত্র সে জানে। তৃতীয় আর এক দল চাহিতেছিল ওহালি-কন্যা জোলমাই দলের নেত্রী হোক। কারণ প্রথমত সে বৃহার কন্যা, দ্বিতীয়ত সে-ই প্রদীপহস্তে এতকাল বৃহার ছবিতে আলোকপাত করিয়াছে। ওহালি যেমন বৃহাকে ছবি আঁকা শিখাইয়াছিল জোলমাও তেমনি কাহাকেও ছবি-আঁকা শিখাইবে। এ ক্ষমতা তাহার নিশ্চয় আছে। বৃহা সেদিন সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিয়াছে যে জোলমা না থাকিলে সে কিছুতেই ছবি আঁকিতে পারিত না। জোলমা দেবী, শ্যেন সম্প্রদায়ের জন্য সে চিরকুমারিত্ব স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছে। তাহাকেই নেত্রীপদে বরণ করা উচিত।

...আমার সহিত মাত্র চারিটি লোকের পরিচয় হইয়াছিল। বৃহা, টাহা, জোলমা এবং গৌ। বিতংকেও চিনিতাম। বৃহা, টাহা মারা গিয়াছে। জোলমা এবং গৌ বৃহা টাহার সমাধির পর আর গুহা হইতে নাকি বাহির হয় নাই। আমি আর তাহাদের দেখাই পাইতেছিলাম না। বিতংও আমাকে এড়াইয়া চলিতেছিল, যখনই সে বুঝিয়াছিল যে আমি জোলমার পাণিপ্রার্থী তখন হইতেই সে আমাকে এড়াইয়া চলিতেছিল। আমি সুতরাং একা একা শ্যেন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। আমার মনের অভিপ্রায় কাহারও নিকট ব্যক্ত করি নাই, ব্যক্ত করিবার সাহসই ছিল না। ইহাদের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে একটা জিনিস কিন্তু লক্ষ্য করিলাম—সকলেই আমাকে সম্ভ্রম করিতেছে। জিকাটু পাহাড়ের কাহিনী পল্লবিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। সম্ভবত টাহা এবং গৌ কাহিনীটি প্রচার করিয়াছে। যে বন্য মহিষ শিকার করিতে গিয়া বৃহা টাহা মারা গেল সে শিকার হইতে আমি যে জীবন্ত ও জয়ী হইয়া ফিরিয়াছি—রিক্ত হস্তে ফিরি নাই, তিনটি মৃত মহিষ লইয়া ফিরিয়াছি—এ ঘটনাও সকলকে আমার প্রতি সশ্রদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। বিশেষত আমি স্বেচ্ছায় আমার হরিণের-মুখ-আঁকা কুঠারটি টাহার সমাধিতে সমর্পণ করিয়াছিলাম বলিয়া সকলে আমার মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া আমাকে খুবই সমীহ করিয়া চলিতেছে। আমি বিদেশি হইয়াও যে লাফাই পাহাড়ে আসিয়া শ্যেন সম্প্রদায়ের মধ্যে বসবাস করিতে ইচ্ছুক এবং আমার সে ইচ্ছা যে বৃহা গৌ উভয়েই সমর্থনও করিয়াছে এ সংবাদ দেখিলাম গোপন নাই। লক্ষ্য করিলাম সকলেই ইহাতে আনন্দ প্রকাশও করিতেছে, এমন কি, টাহা যে গুহায় যে রমণীদল লইয়া বাস করিত সেই গুহায় সেই রমণীদল আমাকে থাকিবার জন্য আগ্রহও প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু আমাকে দলপতিরূপে কেহই কল্পনা করে নাই, তাহার কারণ প্রথমত আমি বিদেশি, দ্বিতীয়ত আমি ভিন্ন বংশীয়।

...আমি টাহার গুহায় যাই নাই। আমি সেই বনে একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, সেই বৃক্ষকোটরে রাত্রিবাস করিতেছিলাম, স্বহস্তে শিকার করিয়া খাদ্যসংগ্রহ করিতেছিলাম। আর অনন্যমনে চিন্তা করিতেছিলাম জোলমা আমাকে পরিত্যাগ করিল কেন, গৌ কোথায়...।

...সহসা একদিন শ্যেন সম্প্রদায়ের এলাহির সহিত দেখা হইল। দেখিলাম সে আমার বৃক্ষটাকে কেন্দ্র করিয়াই ঘুরিতেছে, কখনও কাঠ কুড়াইতেছে, কখনও কোনো গাছে চড়িয়া ফুল পাড়িতেছে। একটা বন্য শশককে তাড়া করিয়া কিছুদূর ছুটিয়া গেল আবার ফিরিয়া আসিল, আমার দিকে অপাঙ্গে দুই একবার চাহিয়া মৃদু হাসিল, কিন্তু কোনো কথা বলিল না।

বুঝিলাম আমার সহিত আলাপ করিতে চায়, কিন্তু তাহার ইচ্ছা আমিই আলাপটা শুরু করি। তরুণী এলাহি ইতিপূর্বেও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু আমি জোলমার কথা ভাবিয়া কোনো নারীর প্রতিই মনোযোগ দিই নাই। ব্যাপারটা আমার নিজের নিকটই কেমন অস্বাভাবিক মনে হইতেছিল, কিন্তু মনে হইতেছিল এই অস্বাভাবিকতাকে আঁকড়াইয়া থাকাই জোলমাকে পাইবার একমাত্র উপায়। জোলমাও অস্বাভাবিক, তাহাকে অস্বাভাবিক উপায়েই লাভ করিতে হইবে। এলাহি আর একবার আমার দিকে চাহিল। মনে করিলাম শ্যেন সম্প্রদায়ের খবরটা ইহার নিকট জানিয়া লইলে ক্ষতি কি? তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিলাম। ডাকিবামাত্র সে ছুটিয়া পলাইল, পলাইতে পলাইতে পিছু ফিরিয়া চাহিল, ইচ্ছাটা আমিও ছুটিয়া তাহার অনুসরণ করি। কিন্তু আমি তাহা করিলাম না। একটু পরে দেখি আবার সে পাশের ঝোপ ভেদ করিয়া উঁকি দিতেছে।

'শোন, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমাদের দলপতি কে হইবে, কিছু ঠিক হইল?'

'কিছু ঠিক হয় নাই। শুনিলাম গৌ যাহাকে ঠিক করিবে সে-ই হইবে। গৌ এখনও কিছু ঠিক করে নাই।'

'গৌ কোথায়?'

'এখনও সে গুহার ভিতরই আছে। সে নাকি বৃহার প্রেতাত্মার সহিত পরামর্শ করিতেছে। বৃহা যাহাকে দলপতি করিতে বলিবে গৌ তাহারই নাম করিবে।'

'তাই নাকি!'

'তাই তো শুনিতেছি। জানি না গৌ কাহার নাম করিবে।'

'গৌ-এর কথা সকলে মানিয়া লইবে?'

'নিশ্চয়। দেখ না, গৌ আমার কি দুর্দশা করিয়াছে। আমার কোনো সন্তান হয় নাই, সে কি আমার দোষ! গৌ সকলকে বলিয়া দিয়াছে আমার পেটে নাকি আগুন জ্বলিতেছে, তাই আমার সন্তানেরা পেটেই পুড়িয়া যায়। এ কথা শুনিবার পর কোনো পুরুষ আমার কাছে আসে না। শনকার সঙ্গে ভাব হইয়াছিল, কিন্তু গৌ নিজেই শনকাকে আমার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে। গৌকে কেহ অমান্য করিতে সাহস করে না। একটা কথা বলিতেছি গৌকে বলিও না যেন। গৌ রাক্ষসী, ডাইনি—ওই শ্যেনবংশকে ছারখার করিবে। তিত্তির পাখি মারিলে কি হইবে, নিজের ছেলেগুলি তো একে একে সব মরিয়া গেল। আমি এবার যাই, আমার কাজ আছে—' ব্যস্ততার ভান করিয়া এলাহি চলিয়া যাইতে লাগিল, যাইতে যাইতে কয়েকবার পিছু ফিরিয়া চাহিল, আমি নির্বাক হইয়া রহিলাম। সহসা মনে হইল জোলমার খবর তো লওয়া হইল না।

'শোন—'

এলাহি আবার ফিরিয়া আসিল।

'জোলমা কোথায়? তাহাকেও তো বাহিরে দেখিতে পাই না আজকাল—'

'সে-ও গুহার ভিতরে আছে। বৃহার শেষ ছবিটি শেষ হয় নাই, জোলমাই নাকি সেটি শেষ করিতেছে। বড় ভাল মেয়ে জোলমা, সত্যই দেবী। আমি তাহার প্রদীপের জন্য শ্যাওলা সংগ্রহ করিয়া আনি। জোলমা বলিয়াছে ইহার জন্য সে আমাকে একটা পুরস্কার দিবে।'

'কি পুরস্কার?'

'যাহা চাহিব তাহাই দিবে বলিয়াছে।'

'কি চাহিবে এখনও ঠিক কর নাই বুঝি?'

'না।'

মুচকি হাসিয়া এলাহি এবার এক ছুটে বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল, আর ফিরিল না।

...অন্ধকার অরণ্যে একা একা বৃক্ষকোটরে বসিয়া ভাবিতেছিলাম। নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে পর্বত-দেবতার যে বাণী আমি সেদিন শুনিয়াছিলাম তাহার অর্থ কি আমার বুঝিতে ভুল হইয়াছিল? তিনি সত্যই কি আমাকে আমার পুরাতন সমাজ পরিত্যাগ করিয়া এই নূতন সমাজে বাস করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন? না, জোলমাকে দেখিয়া আমার মনের কামনা আমার কানে কানে ওই কথা বলিয়াছিল? জোলমাকে দেখিয়া আমি যে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার সহিত পর্বত-দেবতার আদেশ জড়াইয়া গেল কি করিয়া! নদীর কলধ্বনিতে আমি পর্বত-দেবতার আদেশ স্পষ্ট শুনিয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। সহসা দেখিলাম অন্ধকার আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া প্রকাণ্ড একটা উল্কাপাত হইল। মনে হইল আকাশ হইতে আলোকরূপে পৃথিবীর দিকে ও কে ছুটিয়া আসিল? ও কি আবার আকাশে ফিরিয়া যাইবে? দেবতা কি আবার কোনো ইঙ্গিত করিলেন? নিস্তব্ধ হইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। বৃহার মুখটা মনে পড়িল। সত্যই তাহার দৈবীশক্তি ছিল। সত্যই যদি সে নারী-সম্পর্ক-বিবর্জিত জীবন যাপন করিতে পারিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে আরও অনেক শক্তির অধিকারী হইত। শিকার অভিযান হইতে সে যে আর ফিরিবে না তাহা সে জানিত, টাহাকে সে কথা বলিয়াছিল, নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও সে নিরস্ত হয় নাই। কেন হয় নাই? কর্তব্যবোধে, না ঘৃণায় অভিমানে স্বেচ্ছায় সে এই সমাজ ত্যাগ করিয়া গেল? প্রেতরূপে সে কি প্রতিশোধ লইবে। অন্ধকারকে চিরিয়া একটা পেচক কর্কশকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল, মনে হইল বৃহাই বুঝি আমার প্রশ্নের উত্তর দিল। আমি শিহরিয়া উঠিলাম এবং প্রস্তর কুঠারটাকে চাপিয়া ধরিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলাম, ভয় হইতে লাগিল শব্দটা বুঝি মূর্তি ধরিয়া এখনই আমাকে আক্রমণ করিবে। পরমুহূর্তেই মনে হইল বৃহাকে প্রস্তর তীর দিয়া নিধন করিয়াছি বটে, কিন্তু বৃহার প্রেতকে প্রস্তর কুঠার দিয়া হনন করিতে পারিব না। সহসা সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল, কাতরভাবে আমার কুলদেবতাকে ডাকিতে লাগিলাম—হে দেবতা, তোমার জন্যই আমি বৃহাকে বধ করিয়াছি, তুমি আমাকে রক্ষা কর। পর্বত-দেবতার উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলাম—হে দেবতা, তোমারই আদেশে আমি এদেশে বসবাস করিতে চাহিয়াছি, তুমি আমাকে রক্ষা কর।

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। আচমকা ঘুমটা ভাঙিয়া গেল। কে যেন আমার গলায় কামড়াইয়া ধরিয়াছে। মানুষ! মাথায় চুল রহিয়াছে! ছাড়াইতে চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না। ধস্তাধস্তি করিতে করিতে দুইজনেই নিচে পড়িয়া গেলাম। তবু সে আমাকে ছাড়ে না, গাছের নীচে ঘন অন্ধকার, সেই অন্ধকারে প্রাণপণে তাহার গলার টুটিটা চাপিয়া ধরিতে তবে তাহার কামড় আলগা হইল, এক ঝটকায় তাহাকে দূরে ছুঁড়িয়া দিলাম। তাড়াতাড়ি গলায় হাত দিয়া দেখিলাম গলায় কোনো ক্ষত হয় নাই, সমস্ত গলাটা লালায় পিচ্ছিল হইয়া গিয়াছে মাত্র। গাছের তলা হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলাম, বাহিরে জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটিতেছে,

গাছের তলায় যদিও নিবিড় অন্ধকার। কোথায় গেল সে? পরমুহূর্তেই দেখিলাম বিস্রস্ত-কেশা স্ফুরিতাধরা গৌ আমার দিকে সর্পিণীর মতো নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে।

'পুত্রহন্তা শয়তান! বৃহাকে বাঘে খাইয়াছে আর যেই বিশ্বাস করুক, আমি করিব না। আমি তাহার মাথায় তীরের আঘাত দেখিয়াছি। এ তীর কার? বৃহার মৃতদেহের পাশে এই তীর ছিল, জোলমা কুড়াইয়া আনিয়াছে। শ্যেন সম্প্রদায়ের তীরের গড়ন এমন নয়—'

বনের ভিতর হইতে একটা তীর আনিয়া গৌ সেটা আমার দিকে ছুঁড়িয়া দিল। রক্তাক্ত তীর। রক্ত শুকাইয়া গিয়াছে কিন্তু বিলুপ্ত হয় নাই। তীরটার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলাম, 'উহা আমারই তীর। বাঘকে লক্ষ্য করিয়া আমি এই তীর ছুঁড়িয়াছিলাম।'

'মিথ্যা কথা। বৃহা এখনই আসিয়াছিল, সে আমাকে সত্য কথা বলিয়া গিয়াছে, উঃ, কি আফসোস যে আমার একটাও দাঁত নাই, তোমার টুঁটিটা কামড়াইয়া ছিঁড়িতে পারিলাম না। কিন্তু বৃহা বলিয়া গিয়াছে তুমি নিস্তার পাইবে না। কিছুতেই নিস্তার পাইবে না—হা হা হা হা—বৃহা বলিয়া গিয়াছে তুমি কিছুতেই নিস্তার পাইবে না।...

গৌ উন্মাদিনীর মতো হাসিতে হাসিতে নাচিতে লাগিল। আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বৃহা আসিয়াছিল! আমার মনে হইল আত্মসমর্পণ করা ছাড়া এখন আর কোনো উপায় নাই। আমি জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িলাম। বলিলাম—'আমি বিদেশি, তোমাদের অনুমতি লইয়াই তোমাদের দেশে বাস করিয়াছি; যথাসাধ্য তোমার আদেশ পালন করিয়াছি, নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কিছু করি নাই, তবু যদি না জানিয়া কোনো অপরাধ করিয়া থাকি তাহার শাস্তি আমাকে দাও, মাথা পাতিয়া লইব'—সত্য-সত্যই আমি মাথা পাতিয়া দিলাম। গৌ থামিয়া গেল। আমার সম্মুখে উবু হইয়া বসিয়া ঝুঁকিয়া আমার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তাহার পর আবার সহসা হা হা করিয়া উঠিল।

'বৃহা তোমার শাস্তি ঠিক করিয়া দিয়াছে। কি করিয়াছে জান? বৃহাটা চিরকালই পাগল, সে বুঝিল না যে এটা শাস্তি না হইয়া পুরস্কার হইবে। সে তোমাকে শ্যেন সম্প্রদায়ের দলপতি হইতে বলিয়াছে। বলিয়াছে দলপতি হইয়া তুমি গুহায় ছবি আঁকিবে আর চিরকুমারী জোলমা অন্ধকার গুহায় তোমার পাশে আলো ধরিয়া থাকিবে। অন্ধকার গুহায়, চিরকুমারী জোলমা—হা, হা, হা—'

আমি মুখ তুলিয়া বলিলাম—'আমি বৃহার আদেশ পালন করিব।'

গৌ-এর চক্ষুর দৃষ্টি জ্বলিয়া উঠিল। নিম্নকণ্ঠে ফিসফিস করিয়া তর্জন করিয়া উঠিল সে।

'বৃহার নয়, আমার আদেশ পালন করিতে হইবে। বৃহার আদেশে তুমি দলপতি হও আমার আপত্তি নাই, আমি কালই সে আদেশ ঘোষণা করিয়া দিব। কিন্তু আমার আদেশে তুমি জোলমাকে বিবাহ করিবে। জোলমা বৃহার একমাত্র সন্তান, সে চিরকুমারী থাকিবে ইহা আমার পক্ষে অসহ্য। আমি তাহার কোলে শিশু দেখিতে চাই। অনেক শিশু—'

'কিন্তু বৃহার প্রেতাত্মা যদি ইহাতে রুষ্ট হয়, যদি কোনো বিপদ ঘটে—'

'সে বিপদ তোমাকে বরণ করিতে হইবে। প্রতি মুহূর্তে সে বিপদের সম্ভাবনা সম্মুখে রাখিয়া আমার আদেশ তোমাকে পালন করিতে হইবে এই তোমার শাস্তি। তুমি রাজি আছ?'

আমি নির্বাক হইয়া রহিলাম।

গৌ আবার বলিল—'যদি রাজি না হও তোমার শাস্তি মৃত্যু। তুমি যে বৃহাকে হত্যা

করিয়াছ একথা আমি ছাড়া আর কেহ জানে না। বৃহার মস্তকের আঘাতকে আর সকলেই ব্যাঘ্রদংশন ভাবিয়াছে, এমন কি জোলমা পর্যন্ত। আমি যদি আজ সত্য কথা প্রকাশ করিয়া দিই সকলে মিলিয়া তোমাকে মারিয়া ফেলিবে। কেহই তোমাকে বাঁচাইতে পারিবে না। বৃহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া আমি নিজেই আজ তোমায় হত্যা করিতাম, কিন্তু আমার দাঁত নাই। আমার দন্তহীন মাড়ি দিয়া আমি তিত্তির পক্ষীর মুণ্ড ছিঁড়িয়া লইতে পারি, কিন্তু হায়, হায়, তোমার কিছু করিতে পারিলাম না! নিজে যদি তোমার রক্তপান করিতে পারিতাম আমার এই জ্বালা, এই অসহ্য জ্বালা, হয়তো খানিকটা কমিত। তাহা যখন হইল না তখন অপরকে দিয়া তোমাকে হত্যা করাইয়া কোনো সুখ হইবে না। বৃহার কথাই থাক, তুমি দলপতি হও, জোলমা তোমার ছবির পাশে আলো ধরুক আমার আপত্তি নাই। বৃহার বংশ কিন্তু লোপ হইতে দিব না, কিছুতেই না, জোলমার কোলে শিশু দেখিতে চাই। বৃহার প্রেতাত্মা হয়তো ইহার প্রতিশোধ লইবে, হয়তো সে প্রতিশোধ অতি ভয়ঙ্কর এ কথা জানিয়াও যদি তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি হও, কাল আমি তোমাকে দলপতি মনোনীত করিব। যদি রাজি না হও সত্য কথা প্রকাশ করিয়া দিব। সকলে যখন তোমাকে হত্যা করিবে তখনই তোমার রক্তপান করিব।'

আমার, কেন জানি না, হঠাৎ মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, 'আমার রক্তপান করিলে যদি তোমার মনের জ্বালা কমে এখনই তোমাকে রক্তপান করাইতে পারি।'

'কিরূপে?'

আমার প্রস্তর ছুরিকা কাছেই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ তর্জনীর অগ্রভাগে একটি ছিদ্র করিয়া দিলাম। ফিনিক দিয়া রক্ত ছুটিয়া বাহির হইল।

'এই যে—'

গৌ সাগ্রহে আমার আঙুলটি মুখে পুরিয়া চুষিতে লাগিল। কিছুতেই ছাড়ে না। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, তবু ছাড়ে না। ক্রমশ আমার হাতটা যেন অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। এক ঝটকায় শেষে হাতটা তাহার মুখ হইতে খুলিয়া লইলাম। গৌ কিন্তু ইহাতে রুষ্ট হইল না। দেখিলাম, সে হাসিতেছে। চন্দ্রালোকে সেই রক্তাক্ত হাসি যেন নীরব ভাষায় বলিতেছে—'আমি তৃপ্ত হইয়াছি।' গৌ সত্যই তৃপ্ত হইয়াছিল, খুশিও হইয়াছিল।

বলিল, 'আনন্দ পাইলাম। বহুকাল আগে, বাল্যকালে একবার মনুষ্যরক্ত পান করিয়াছিলাম। আমার মা তাহার সতীনকে হত্যা করিয়া তাহার রক্ত পান করিয়াছিল, মায়ের সঙ্গে আমরাও করিয়াছিলাম; যাক সে কথা, আমার প্রস্তাবে রাজি আছ কি না বল—'

ক্ষণকাল চুপ করিয়া বলিলাম—'আছি।'

গৌ উঠিয়া আসিয়া আমাকে চুম্বন করিল।

গৌ তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিল।

পরদিন বৈকালে লাফাই পাহাড়ের উপত্যকায় সমবেত শ্যেনপক্ষী সম্প্রদায়ের সভায় গৌ ঘোষণা করিল—'গত রাত্রে আমি বৃহাকে দেখিয়াছি, বৃহার কথা শুনিয়াছি। বৃহা কাল তোমাদের দলপতিও নির্বাচন করিয়া দিয়াছে। কিন্তু যাহাকে নির্বাচন করিয়াছে সে তোমাদের দলের কেহ নয়, সে বিদেশি, সে ব্যাঘ্রবংশীয়।' গৌয়েরই নির্দেশ অনুসারে আমি একটি বৃহৎ পর্বতের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া সব শুনিতেছিলাম। ইহার ঠিক পরেই গৌ যাহা

বলিল তাহাতে চমৎকৃত হইলাম। যাহা ঘটিয়াছে তাহাকে এমন সুন্দরভাবে যে কাজে লাগানো যাইতে পারে তাহা আমার ধারণার অতীত ছিল। গৌ-এর কল্পনাশক্তিকে প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না। তখন এটা কল্পনাশক্তি বলিয়াও আমার মনে হয় নাই, আমার মনে হইতেছিল কোনো এক অদৃশ্য শক্তি বুঝি গৌ-এর উপর ভর করিয়া অনিবার্য ঘটনাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিতেছে। এবং সে অদৃশ্য শক্তি হয়তো আমার কুলদেবতার।

গৌ বলিল—"বৃহা বলিয়াছে, 'দেবতার ইচ্ছা এবার ব্যাঘ্র সম্প্রদায়ের কেহ আমাদের দলের নেতৃত্ব করুক। তাই তিনি ব্যাঘ্ররূপে আসিয়া আমাকে নিধন করিয়াছেন। দেবতার ইচ্ছা যে শ্যেন সম্প্রদায়ের দলপতি চিত্রাঙ্কন করিয়া দেবতার আরাধনা করুক, তবেই তিনি তুষ্ট হইয়া আমাদের আহারের ব্যবস্থা করিবেন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে ঠিক এমনি একটি বিদেশি কিছু দিন পূর্বে আসিয়াছেন। তিনি একাধারে ব্যাঘ্রবংশীয় এবং চিত্রশিল্পী। আমার ইচ্ছা তিনিই এবার শ্যেন সম্প্রদায়ের দলপতি হউন। আমি যখন বাঁচিয়াছিলাম তখনই তিনি আসিয়াছিলেন। জিকাটু পাহাড়ে নাগরাজ শঙ্খচূড়কে হত্যা করিয়া তিনি অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বন্য-মহিষ শিকারেও তাঁহার কৃতিত্ব যে কম নয় তাহা সকলেই জানে। তিনি উপযুক্ত ব্যক্তি, তিনি শ্যেন সম্প্রদায়ের দলপতি হউন। জোলমা তাঁহারই পার্শ্বে প্রদীপ ধরিয়া তাঁহার ছবিতে আলোকপাত করুক। তিনি যদি ইচ্ছা করেন জোলমাকে বিবাহও করিতে পারেন। বিবাহ করিবার কোনো বাধা আর নাই। জোলমা যতদিন আমার পার্শ্বে প্রদীপ ধরিয়া ছিল ততদিনই তাহার কুমারী থাকার সার্থকতা ছিল। এখন আমি নাই সে সার্থকতাও নাই। পিতার অবর্তমানে স্বামীই নারীর রক্ষক। ওই বিদেশি শিল্পী জোলমাকে বিবাহ করুক ইহাই আমার ইচ্ছা।' কাল রাত্রে বৃহা যেসব কথা বলিয়াছে তাহা তোমাদিগকে সবিস্তারে বলিলাম, এখন তোমাদের যদি কিছু বলিবার থাকে বলিতে পার।"

গৌ সভার চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। সমস্ত সভা নীরব। আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হইল। ভাবিলাম অসম্ভব বোধ হয় সম্ভব হইবে। সহসা বিতংয়ের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম।

'দলপতি বৃহার যদি ইহাই নির্দেশ হয় তাহা আমরা নিশ্চয় মানিব। জিকাটু পাহাড়ের সম্বন্ধে কিন্তু আমার একটু বক্তব্য আছে। আমার বিশ্বাস নাগরাজ শঙ্খচূড়কে বিদেশি হত্যা করিতে পারে নাই। সে ওই পর্বতগুহার মধ্যে বন্দী হইয়া আছে। কাল আমি জিকাটু পাহাড়ে গিয়াছিলাম, গুহার মুখে যে পাথরটা আছে সেখানে কান পাতিয়া শুনিলাম, শঙ্খচূড় এখনও সেখানে তর্জন করিতেছে। মহিষ-শিকার অভিযানেও বিদেশির কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমাদের কিছু সন্দেহ আছে। টাহার অস্ত্রই মহিষীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছিল। মহিষ এবং মহিষ শাবকটিকে হত্যা করিয়াছে বাঘ। বিদেশির বীরত্বের বিশেষ পরিচয় ইহাতে নাই।'

বিতং থামিয়া গেল। গৌ-এর চক্ষু স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতেছিল।

গৌ বলিল—'শঙ্খচূড় যদি না মরিয়া থাকে তাহাকে মারিবার দায়িত্ব বিদেশি লইবে। মহিষ শিকার করিতে বৃহা গিয়াছিল, বিতং যায় নাই। বৃহার কথাই আমি বেশি বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করি। আর কাহারও কিছু বলিবার আছে?'

বৃদ্ধ খোতারি উঠিয়া বলিল—'দলপতি বৃহার আদেশ আমি নতশিরে মানিয়া লইলাম। আগন্তুক বিদেশিই আমাদের দলপতি হউক।'

গৌ-এর নির্দেশেই আমি বৃহার গুহায় একা বসিয়াছিলাম। প্রতি মুহূর্তেই আশা করিতেছিলাম জোলমা এবার আসিবে। বৃহার মৃত্যুর পর তাহার সহিত একবারও দেখা হয় নাই। আমি দলপতি নির্বাচিত হইলাম, জোলমার সহিত আমার বিবাহ হইবে ঠিক হইয়া গেল, কিন্তু জোলমা তো এখনও আসিল না। কোথায় সে? ...গৌ-এর কুকুরটা অবিরাম ডাকিতেছিল। গৌ তাহার নাগালের বাহিরে অথচ দৃষ্টির সম্মুখে একটি তিত্তির পক্ষী বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছিল। বলিয়া গিয়াছিল সে লাফাই পাহাড়ে যাইতেছে, আমার বিবাহের আয়োজনের জন্যই যাইতেছে; রাত্রে আর ফিরিবে না। এখানে বিবাহের নিয়ম কেমন কে জান। আমাদের ব্যাঘ্র-সমাজে বিবাহ হয় পরিবর্তন করিয়া। আমার দশটি ভগ্নীর পরিবর্তে আমি দশটি স্ত্রী পাইয়াছিলাম। আমার ভগ্নীগুলিকে যাহারা স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের ভগ্নীরাই আমার স্ত্রী হইয়াছিল। আমার, মানে অবশ্য আমাদের গোষ্ঠীর সকলের। জামাইকিনাকে কেবল আমি একটি কুঠারের বদলে পাইয়াছিলাম। ইহাদের বিবাহের নিয়ম কিরূপ? ইহারাও তো কেহ এক-পত্নীক নয়। একাধিক পুরুষের সংস্রবে আসাও ইহাদের নারীদের পক্ষে দোষাবহ নয়, পুরুষরা শ্যেনপক্ষী না হইলেই হইল। জোলমা কি একাধিক পুরুষকে প্রশ্রয় দিবে? জোলমা কোথায়! সহসা মনে হইল জোলমা বোধ হয় আর আসিবে না। আমার মিথ্যাচারণ ও গৌ-এর চক্রান্ত বোধ হয় সে টের পাইয়া গিয়াছে। সে হয়তো তাহার ময়ূরবাহিনীর পিঠে চড়িয়া বৃহার খোঁজে ওহালির দেশে চলিয়া গিয়াছে। কল্পনা করিতে লাগিলাম যেন পাশাপাশি সার বাঁধিয়া ময়ূরদল উড়িয়া চলিয়াছে, তাহাদের পিঠের উপর বসিয়া আছে জোলমা। ময়ূর মানুষকে বহন করিতে সক্ষম কি না এ প্রশ্ন মনে জাগিল না। সেই অন্ধকার গুহায় একা বসিয়া এই অসম্ভব কল্পনায় অনেকক্ষণ মগ্ন হইয়া রহিলাম। পক্ষ-বিধূননের শব্দে চমকাইয়া উঠিলাম সহসা। মনে হইল ময়ূরের দল বুঝি নিকটবর্তী হইয়াছে। কুকুরের চিৎকারে পরমুহূর্তেই কিন্তু ভুল ভাঙিল, বদ্ধ তিত্তির পাখিটাই পাখা ঝটপট করিতেছে। এই অদ্ভুত পরিবেশে এমন করিয়া আর কতক্ষণ বসিয়া থাকিব? ইচ্ছা করিতেছিল বনে ফিরিয়া গিয়া আবার আমার সেই বৃক্ষকোটরটিতে বসিয়া থাকি। কিন্তু গৌ-এর আদেশ অমান্য করিতে সাহস হইতেছিল না, ভয় হইতেছিল চলিয়া গেলে হয়তো কোনো অঘটন ঘটিয়া যাইবে। গৌকে আর সামান্য মানবী বলিয়া উপেক্ষা করিবার সাহস ছিল না, দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলাম সে মানবী নয়, পিশাচী। অসম্ভবকে সে সম্ভব করিতে পারে তাহার প্রমাণ তো প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বৃহার হত্যাকারী জানিয়াও আমাকে সে শ্যেনপক্ষী সমাজের দলপতি করিয়া দিল। যে জোলমাকে পাইবার জন্য আমি এত কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছি, আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির বাধা বৃহাকে হত্যা করিয়াও যে জোলমাকে আমি আয়ত্তাধীন করিতে পারি নাই, গৌ অবলীলাক্রমে সেই জোলমার সহিত আমার বিবাহের আয়োজন করিয়া ফেলিল। কিন্তু কেন? আমার প্রতি এত সদয় হইবার কি হেতু আছে তাহার? ছিন্ন তিত্তিরমুণ্ডের আকাশমুখী দৃষ্টিতে এমন কি সূচিত হইয়াছিল যাহা পুত্রহত্যার অপরাধকেও লঘু করিয়া দিতে পারে? কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না, সেই জন্যই ভয় করিতেছিল, গৌ-এর নির্দেশ অমান্য করিয়া অন্যত্র যাইবার মতো সাহস পাইতেছিলাম না, মনে হইতেছিল গুহা ছাড়িয়া চলিয়া গেলে হয়তো...সহসা একটা কথা মনে হওয়াতে কিন্তু তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সমস্তটাই আমাকে হত্যা করিবার একটা ষড়যন্ত্র নয় তো? মিথ্যা সভা করিয়া হয়তো আমাকে ভুলানো হইয়াছে, হয়তো আমাকে একটা বিশেষ দিনে বিশেষ স্থানে (হয়তো বা বৃহার এই গুহাতেই)

বিশেষ লোক দিয়া হত্যা করা হইবে। আজ হয়তো সেইদিন, গৌ আমাকে বসাইয়া সেই বিশেষ হত্যাকারীদের ডাকিতে গিয়াছে। নিস্তব্ধ উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিত্তির পক্ষীর পক্ষবিধূনন উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, সে আর থামিতেছে না। প্রলুব্ধ কুকুরটার চিৎকার অন্ধকারকেই যেন দংশন করিয়া চলিয়াছে। মনে পড়িল আমাদের সমাজে একবার এইরূপে একটা লোককে হত্যা করা হইয়াছিল।পার্মা যে বৃক্ষতলে কিকনকে খুন করিয়াছিল ঠিক সেই বৃক্ষতলেই কিকনের আত্মীয়রা পার্মাকে হত্যা করে। পার্মাকে সেই বৃক্ষতলে গভীর রাত্রে ভুলাইয়া আনিয়াছিল পার্মার প্রণয়িনী বোহিলা, আমার স্ত্রী বোহিলা। আমিও সে ষড়যন্ত্রে ছিলাম। পার্মা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বলিয়াই আমি তাহার মৃত্যুকামনা করিয়াছিলাম। গৌ বিতংকে ডাকিতে গিয়াছে নাকি? কুকুরটা বেশি জোরে ডাকিয়া উঠিল। বাতাসে ভাসিয়া আসিল একটা তীব্র গন্ধ, মাংসপোড়া গন্ধ, গৌ গুহার পিছনে বসিয়া তিত্তির পোড়াইতেছে না তো? হয়তে পিশাচী আমার নিধনের জন্যই কোনো মন্ত্র পাঠ কবিতেছে। অন্ধকার গুহায় এমনভাবে একা দাঁড়াইয়া থাকা আর নিরাপদ বলিয়া মনে হইল না, গা ছমছম করিতে লাগিল। বাহির হইয়া যাইতেছিলাম অকস্মাৎ একটা আলোক-রেখা আসিযা অন্ধকারকে বিদ্ধ কবিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, লম্বা গুহার দক্ষিণ-প্রান্ত আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে, আলোটা যেন ভূগর্ভ হইতে ধীরে ধীরে উপরে উঠিতেছে। পরমুহূর্তেই দেখিলাম, জোলমা প্রদীপহস্তে ভূগর্ভ হইতে ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া আসিতেছে। গুহার দক্ষিণ প্রান্ত যে ভূগর্ভে নামিয়া গিয়াছে তাহা আমার জানা ছিল না. নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। জোলমা প্রদীপ হস্তে আমার দিকেই আগাইয়া আসিল। যে গোলাকৃতি প্রস্তরখণ্ডের উপর খাবার রাখিয়া আমি প্রথম দিন বৃহার সহিত আহার করিয়াছিলাম সেই প্রস্তরখণ্ডের উপর প্রদীপটি রাখিয়া জোলমা আমার মুখের দিকে চাহিল। অদ্ভুত সে চাহনি। বিষণ্ণ কিন্তু শান্ত । তাহাতে কোনো উষ্মা নাই, হিংসা নাই, এমনকি শোকের উগ্রতাও নাই। মনে হইল সে সব জানে, কিন্তু সব ক্ষমা করিয়াছে, নিয়তির অমোঘ বিধানকে অনিবার্য জানিয়াই সে তাহা মানিয়া লইয়াছে, এজন্য কাহারও উপর তাহার যেন রাগ নাই। জোলমার অঙ্গে কোনো আবরণ ছিল না, আলুলায়িত কেশভার পৃষ্ঠে লুটাইতেছিল। শান্তভাবে আমার দিকে চাহিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার নীল নয়নে একটা প্রচ্ছন্ন মিনতি নীরব ভাষায় কি যে বলিতে চাহিল বুঝিতে পারিলাম না। কয়েক মুহূর্ত পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমাকেই শেষে নীরবতা ভঙ্গ করিতে হইল।

'সব কথা শুনিয়াছ?'

'শুনিয়াছি।'

'তোমার কি কিছু বলিবার আছে?'

'আমার বক্তব্য অনেক পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি। তোমার মতো বীরের সঙ্গিনী হইতে পাইলে আমি কৃতার্থ হইব। কিন্তু আমায় শ্যেন সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য আমাকে চিরকুমারী থাকিতে হইবে। বৃহা চলিয়া গিয়াছে কিন্তু বৃহার নির্দেশ চলিয়া যায় নাই। তাহার ইচ্ছা, তাহার আদেশ আমার মনে সর্বদা জাগরূক আছে। বিদেশি, তুমি গুহার প্রাচীর নব নব চিত্রে অলঙ্কৃত কর, আমি তোমার পার্শ্বে আলো ধরিয়া ধন্য হই, কিন্তু তুমি শপথ কর যে আমার অঙ্গ স্পর্শ করিবে না—'

'কিন্তু গৌ যে বলিল—'

'গৌ মিথ্যা কথা বলিয়াছে। গৌ শিশু ছাড়া আর কিছু চায় না। তাহার ধারণা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইলেই বুঝি শ্যেনপক্ষী সমাজ উন্নতি করিবে। বৃহার ধারণা কিন্তু অন্যরূপ ছিল। আমার ধারণাও অন্যরূপ। সকলের অগোচরে আমাদের সহিত গৌ-এর একটা নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। সেই দ্বন্দ্বের ফলেই বৃহা প্রাণ হারাইয়াছে। হয়তো আমিও হারাইব। কিন্তু তাহাতে আমি ভীত নই। তুমি যদি আমার সহায়তা কর, বৃহার ইচ্ছা এখনও ফলবতী হইবে। বল, তুমি কি আমার সহায় হইবে?'

সেই অসভ্য যুগে যুবতী নারীর মুখে এরূপ উক্তি যে কত অশোভন তাহা তোমরা যেমন অনুভব করিতেছ আমিও তেমনি অনুভব করিতেছিলাম। প্রথম হইতেই বৃহা এবং জোলমার চবিত্র, আচরণ, কথাবার্তা আমাকে বিস্মিত করিয়াছিল। আমি বরাবরই ভাবিয়াছিলাম, বৃহা হয়তো নিজের স্বার্থের জন্য জোলমাকে অন্য কোনো পুরুষের সংস্রবে আসিতে দিতে চাহিতেছে না। বৃহার ভয়ে জোলমাও চিরকুমারী থাকিতে চাহিতেছে, বৃহার অবর্তমানে তাহার মত পরিবর্তিত হইবে। কিন্তু এখনও জোলমা একথা বলিতেছে কেন? তাহার প্রশ্নের উত্তরে কি বলিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না, নির্বাক বিস্ময়ে শুধু চাহিয়া রহিলাম। এখন মনে হয় মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ফাঁকে ক্ষণকালের জন্য চাঁদ উঁকি দিয়া যেমন অন্তর্হিত হয় সেই অন্ধকার অসভ্য যুগের মধ্যেও তেমনি বর্ণবহুল একটা সুন্দর সভ্য যুগ কিছুদিনের জন্য আসিয়া আবার অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বৃহা জোলমা সেই যুগের প্রতীক। আমরা তাহাদের বুঝিতে পারি না। বুঝিতে পারি নাই বটে, কিন্তু আমি অন্তত প্রকাশ্যে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেও পারি নাই। জোলমাকে পাইবার আশায় নারীসঙ্গ বর্জন করিয়া আমি কঠিন সংযমে নিজেকে সম্বৃত করিয়া রাখিয়াছিলাম। গৌ-এর কুহকিনীরা আমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই, এলাহির ইঙ্গিতও আমি অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল, ইহার পুরস্কার পাইব। জোলমা নিশ্চয়ই আমার বাহুপাশে ধরা দিবে। কিন্তু জোলমা এ কি বলিতেছে!

'বল, তুমি আমার সহায় হইবে?'

জোলমা পুনরায় প্রশ্ন করিয়া সোৎসুক নয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, 'কিন্তু গৌ যদি তোমার কোলে শিশু না দেখিতে পায় আমাব মৃত্যু সুনিশ্চিত। ছলে বলে কৌশলে সে আমাকে সংহার করিবে। তোমার কোলে শিশু আসিবে এই আশাতেই সে আমাকে দলপতি করিয়াছে, এই আশাতেই তোমার সহিত বিবাহ দিতেছে—'

জোলমা ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, 'গৌ-এর আশা অপূর্ণ থাকিবে না, তাহাকে আমি শিশু দিব।'

'কিরূপে? তুমি যে চিরকুমাবী থাকিতে চাও।'

'দেবতা যদি ইচ্ছা করেন কুমারীর কোলেও শিশু আসিতে পারে। বৃহা আমাকে বলিয়াছিল যে দেবতা শ্যেনপক্ষী সম্প্রদায়কে সন্তান দান করেন, তিনি আমাদের অরণ্যেই থাকেন। অরণ্যপ্রান্তবর্তী বিশাল দেবদারু বৃক্ষে তাঁহার বাস। ওহালি একটি পাথরে ছবি আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছে। সেই পাথর লইয়া দেবদারু বৃক্ষের নিকট অন্ধকার রাত্রে গিয়া কোনো কুমারী যদি সন্তান প্রার্থনা করে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে।'

'কোথায় সে পাথর।'

'আমার কাছে আছে।'

আমি নীরব হইয়া রহিলাম। আমার চোখের দৃষ্টিতে বোধ হয় অবিশ্বাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

জোলমা বলিল, 'দেখিবে?'

'কোথায় আছে?'

'আমার সঙ্গে এস।'

জোলমা প্রদীপটি তুলিয়া লইল। আমি তাহাকে অনুসরণ করিয়া ভূগর্ভে অবতরণ করিলাম। মাটির নীচে যে এত বড় একটা গুহা আছে বাহির হইতে তাহা কল্পনা করা যায় না। আমি কিন্তু বিস্মিত হইয়া গেলাম গুহা দেখিয়া নয়, গুহার গায়ে ছবির সারি দেখিয়া। জীবন্ত বল্‌গা-হরিণের দল যেন সারি দিয়া চলিয়াছে। নানা ভঙ্গীর বল্‌গা হরিণ। কেহ ছুটিতেছে, কেহ বসিয়া আছে, কাহারও পিঠে তীর বিঁধিয়া আছে...

'সব বৃহার আঁকা?'

'ওহালিও আঁকিয়াছে কিছু আসলে সবই ওহালির।'

'আমি এমন সুন্দর করিয়া আঁকিতে পারিব কি?'

'তুমি তো আঁকিবে না, ওহালি আঁকিবে। তুমি যদি নিজেকে পবিত্র রাখিতে পার ওহালি তোমার মধ্যে আসিবে, তোমার হাত দিয়া ওহালির ছবি আঁকিবে।'

'কেমন করিয়া নিজেকে পবিত্র রাখিব?'

'ওহালি মানুষ ভালবাসে। তুমি যত কম পশু হইবে, ওহালি তত তোমার কাছে আসিবে।'

জোলমার বিষণ্ণ মুখে একটা মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সশঙ্ক হাসি। তাহাব যেন আশঙ্কা হইতেছিল তাহার এই অদ্ভুত অনুরোধ আমি রাখিতে পারিব কি না।

'তোমার সে পাথর কোথায়?'

জোলমা প্রদীপ লইয়া গুহার এক প্রান্তে চলিয়া গেল, আমি অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল যেন বল্‌গা-হরিণের দল অন্ধকারে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদেব দ্রুত লঘু পদশব্দ যেন শুনিতে পাইলাম, তাহারা যেন ঘাস ছিঁড়িয়া খাইতেছে, পুরুষ হরিণটি কি ডাকিয়া উঠিল? প্রদীপের আলো দেখা গেল আবার। চাহিয়া দেখিলাম দেওয়ালেব বল্‌গা-হরিণদের চোখে-মুখে যেন একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুক ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহারা আবার ছবি হইয়া গিয়াছে।

'এই দেখ—'

দেখিলাম জোলমা বহুবর্ণ-বিচিত্র একটি মসৃণ প্রস্তরখণ্ড হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পাথরের গায়ে নানা বর্ণের নানা পরিধির অনেক বৃত্ত আঁকা, বৃত্তগুলিকে ঘিরিয়া সরল ও বক্ররেখার বহু বিচিত্র জটিলতা। মনে হইল ওই ছোট পাথরটির উপর শিল্পী যেন রেখার সাহায্যেই সৃষ্টি-রহস্য ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছে। বহুবর্ণের বিবিধ সমন্বয়ে কি এক নিগূঢ় ইঙ্গিত যেন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

'এ কি ওহালির আঁকা?'

'বৃহার মুখে তাহাই শুনিয়াছি।'

'এ পাথর লইয়া কেহ কি দেবদারু বৃক্ষের নিকট গিয়া সন্তান পাইয়াছে?'

'এ পাথর আমারই জন্য ওহালি রাখিয়া গিয়াছে। আমি যদি কোনো দিন সন্তান কামনা করি, পাইব। এ পাথর আর কেহ ব্যবহার করে নাই, করিলেও বোধহয় ফল ফলিবে না। ওহালিই বৃহাকে অনুরোধ করিয়া গিয়াছিল আমি যেন চিরকুমারী থাকি। হয়তো সে আশঙ্কা করিয়াছিল যে গৌ একদিন আমার নিকট সন্তান দাবি করিবে, তাই এই পাথর বৃহাকে সে দিয়া গিয়াছে। গৌ যদি আমার কোলে শিশু দেখিতে চায় দেখিতে পাইবে, সেজন্য তুমি চিন্তিত হইও না। তুমি কেবল আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও যে তুমি আমার অঙ্গ স্পর্শ করিবে না।'

'দিলাম।'

আমার ভিতর হইতে আর একজন কে যেন কথা বলিল। পরক্ষণেই কিন্তু আবার আমি সুস্থ হইলাম। বলিলাম—'আমি কিন্তু সংযম করিতে অভ্যস্ত নই। এতদিন আমি যে জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে সংযমের কোনো স্থান ছিল না। জানি না, এরূপ অস্বাভাবিক অনভ্যস্ত জীবন যাপন করিতে পারিব কি না। চেষ্টা করিব।'

জোলমার বিষণ্ণ চোখে আবার একটু হাসির আলোক আভাসিত হইল।

'চেষ্টা কর। নিতান্তই যদি না পার, অন্য কাহাকেও বিবাহ করিও। একাধিক স্ত্রী তো সকলেরই আছে।'

'আবার কাহাকে বিবাহ করিব?'

'আমিই বাছিয়া দিব।'

পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। জোলমা আমার মধ্যে কি দেখিতেছিল জানি না, কিন্তু আমি তাহার মধ্যে এক অসীম করুণাময়ী নারীকে প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম। মনে হইতেছিল আমাকে খঞ্জ জানিয়াও সে আমাকে দুরারোহ পর্বত-শিখরে আরোহণ করিতে উৎসাহ দিতেছে, প্রয়োজন হইলে সে আমাকে সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছে, কিন্তু শিখরে আমাকে সে লইয়া যাইবেই। ইহাতে তাহার নিজের কোনো লাভ নাই, লাভ আমার, শিখরে উঠিয়া আমি বিরাট দিগ্বলয় দেখিতে পাইব। পর্বত-শিখরের উপমাটা মনে পড়িল, কারণ সত্যই এক বলিষ্ঠা নারী একদা আমাকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া পর্বত-শিখরে লইয়া গিয়াছিল আমার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও। পর্বত-শিখরে উঠিয়া চক্রবালরেখার সুদূরপ্রসারী মহিমা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। সেই বলিষ্ঠা নারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করিয়াছিলাম। বলিষ্ঠা নারীটি আর কেহ নয়, আমারই মা। আমি ভয়ে পাহাড়ে উঠিতে চাহিতাম না, মা-ই আমার ভয় ভাঙাইয়া দিয়াছিল। জোলমা আমাকে কোন্ পর্বত-শিখরে লইয়া যাইতে চায়?...

'চল।'

আবার জোলমাকে অনুসরণ করিয়া ভূগর্ভ হইতে উপরে উঠিয়া আসিলাম। কুকুরের চিৎকার এবং তিত্তিরের পক্ষ-আক্ষেপ তখনও নৈশ-নীরবতাকে ক্ষুব্ধ করিতেছিল। পোড়া মাংসের গন্ধটাও উগ্রতর হইয়াছে মনে হইল।

'মাংস কোথায় পোড়ানো হইতেছে?'

'লাফাই পাহাড়ে। সেদিন সহস্রাধিক হরিণ মরিয়াছে। তাহাদের মাংস আগুনে সেঁকিয়া

ফুটন্ত চর্বিতে ভিজাইয়া রাখা হইতেছে। মাংসের অভাব ঘটিলে ওই মাংস কাজে লাগিবে। তা ছাড়া, কাল আমাদের বিবাহ, সেজন্যও বোধ হয় কিছু আহারের আয়োজন হইতেছে।'

'এখানে বিবাহ কিরূপে হয়?'

জোলমা হাসিয়া বলিল, 'দেখিতেই পাইবে। আমার হাতটা কিন্তু কিছুতেই ছাড়িও না, ছাড়িয়া দিলেই বিবাহ পণ্ড হইবে।'

পরদিনই আমাদের বিবাহ হইয়া গেল।

লাফাই পাহাড়ের উপত্যকায় শ্যেনপক্ষী সম্প্রদায়ের সকলে সমবেত হইয়াছিল। অনেকেই দেখিলাম সশস্ত্র হইয়া আসিয়াছে। গৌ আমাকে লইয়া উপত্যকার প্রান্তদেশে উপস্থিত হইল। বামহস্তে গৌ একটি জীবন্ত শ্যেনপক্ষীকে ধরিয়াছিল এবং মাঝে মাঝে তাহার কানে কি বলিতেছিল। উপত্যকায় উপস্থিত হইয়া সে আমার কানে কানে বলিল, 'তুমি ছুটিয়া গিয়া জোলমার হাতটা বাম হাত দিয়া চাপিয়া ধর, আর দক্ষিণ হস্ত দিয়া চাপিয়া ধর তোমার কুঠারটা। জোলমার হাত চাপিয়া ধরিলেই অনেকে তোমাকে আক্রমণ করিবে, তুমি তখন কুঠার দিয়া আত্মরক্ষা করিও। জোলমার হাত কিন্তু ছাড়িও না।

দেখিলাম নানাবর্ণে চর্চিত বহু যুবতী একস্থানে বসিয়া হাসাহাসি করিতেছে। জোলমাও তাহাদের মধ্যে আছে। তাহার সর্বাঙ্গও নানাবর্ণে রঞ্জিত। সে কিন্তু হাসিতেছে না। নিস্তব্ধ হইয়া দিগন্তলগ্ন শুভ্র মেঘস্তূপের দিকে চাহিয়া আছে। পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সে যেন সচেতন নয়। লক্ষ্য করিলাম এলাহিও তাহার পাশে বসিয়া আছে।

গৌ আমার কানের কাছে তর্জন করিয়া উঠিল—'যাও, যাও, আর দেরি করিও না।' পরবর্তী যুগে আমরা শিকারের দিকে যেমন কুকুর লেলাইয়া দিতাম গৌ ঠিক তেমনিভাবেই যেন আমাকে উৎসাহিত করিল, জোলমা যেন তাহার শিকার।

আমি ছুটিয়া গিয়া জোলমার হাত চাপিয়া ধরিলাম। দশ-বারোজন যুবক সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিল। তাহার পর কিছুক্ষণ আমি নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসব পাই নাই, চক্ষু বুজিয়া কেবল কুঠার চালাইয়া গিয়াছি। আমার স্কন্ধদেশে একটা বর্শার খোঁচা বেশ একটু জোরে লাগিয়াছিল, তাহারই বেদনাটা অনুভব করিতেছিলাম। ছোটখাটো যে সব ক্ষত আমার সর্বাঙ্গে হইয়াছিল তাহা গ্রাহ্যের মধ্যে আনি নাই। অবসরই ছিল না।

সহসা গৌ চিৎকার করিয়া উঠিল, 'এইবার থাম, শ্যেনপক্ষী চলিয়া গিয়াছে।'

আক্রমণকারীরা সঙ্গে সঙ্গে নিরস্ত হইল। দেখিলাম আমার কুঠারাঘাতে তিনজন নিহত হইয়াছে, আরও তিনজন খুব বেশি আহত হইয়াছে। বাকি কয়জনের আঘাত সামান্য। জোলমার হাত কিন্তু আমি ছাড়ি নাই। জোলমার কোনো আঘাত লাগিয়াছে কিনা দেখিতে গিয়া দেখিলাম জোলমা এলাহির হাত ধরিয়া আছে। ইহার অর্থ এলাহির সহিতও আমার বিবাহ হইয়া গেল। এলাহি যদি আর কাহারও হাত ধরিত তাহার সহিতও হইয়া যাইত। তখন কিন্তু বুঝিতে পারি নাই।

গৌ আমার কাছে আসিয়া বলিল, 'শ্যেনপক্ষী তোমার উপর দয়া করিয়াছে। তুমি ছুটিবার সঙ্গে সঙ্গে আমি উহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। ও যদি এখানেই কোনো গাছে বসিত বা উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইত তাহা হইলে তোমাদের যুদ্ধ চলিতেই থাকিত। কিন্তু শ্যেন এক পাক ঘুরিয়াই উড়িয়া গেল। এ কি এলাহিটাও জুটিয়া গেল নাকি! কি আপদ! বিলচু, খানা, গোলগোল মারা

গিয়াছে দেখিতেছি। আমাদের নিয়ম জান তো? উহাদের পরিবারের ভারও তোমাকে লইতে হইবে। কয়টাকে সামলাইবে তুমি! তোমার বেশ চোট লাগিয়াছে দেখিতেছি। চল, চল—'

জয়ধ্বনি করিতে করিতে আমাকে সকলে কাঁধে করিয়া বৃহার গুহায় পৌঁছাইয়া দিল।

রক্তক্ষয়ের ফলে আমি সম্ভবত অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম। বৃহার গুহায় আমার যখন জ্ঞান হইল তখন প্রথমটা বুঝিতেই পারিলাম না আমি কোথায় আছি। ঘুমের ঘোরে মনে হইল আমি কি আবার আমাদের সেই পুরাতন সমাজে ফিরিয়া আসিয়াছি নাকি? চারিদিকে হাত বুলাইয়া দেখিতে গেলাম, কাঁধে ব্যথা লাগিল। বুঝিলাম, আমি শয্যার উপর শুইয়া আছি, ভস্মশয্যায়, আমাদের সমাজেও আমরা স্তূপীকৃত ভস্মের উপর শুইতাম...সহসা কে যেন আমার হাতটা চাপিয়া ধরিল।

'কে বোহিলা?'

'না, আমি এলাহি।'

ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেল। নিমেষের মধ্যে মনে পড়িল আমি এখন শ্যেনপক্ষী সম্প্রদায়ের দলপতি, বৃহার উত্তরাধিকারী, জোলমার স্বামী। উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু এলাহি আমাকে বাধা দিল। বিস্মিত হইয়া ভাবিলাম, এলাহি এখানে কেন?

'এখন উঠিও না, চুপ করিয়া শুইয়া থাক। আমি তোমার কাঁধে পাতা ছেঁচিয়া লাগাইয়া দিয়াছি, হাত নাড়িলে সেটা পড়িয়া যাইবে। তুমি শোও।'

এলাহি জোর করিয়া আমাকে শোয়াইয়া দিল।

'পাতা? কিসের পাতা?'

'তা তোমাকে বলিব কেন? কেমন তাড়াতাড়ি ঘা সারিয়া যাইবে দেখিও।'

'তাই নাকি! কিন্তু পাতার নামটা বলিতে বাধা কি?'

'ও পাতার নাম আমি কাহাকেও বলি না। ওইটুকুই তো আমার সম্বল। আমার একটিও সন্তান হয় নাই, গৌ হয়তো সমাজ হইতে আমাকে তাড়াইয়া দিত, কেবল কোন্ পাতায় তাড়াতাড়ি ঘা সারে তাহা জানি বলিয়া আমাকে তাড়ায় না। অনেকেই এইজন্য খাতির করে আমাকে।'

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রহিলাম। তাহার পর এলাহি বাহু দিয়া আমার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া আমার কানে বলিল, 'মরিবার পূর্বে তোমাকে বলিয়া যাইব।'

'ছাড় ছাড়।'

আমি নিজেকে তাহার বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। ভয় হইতেছিল জোলমা যদি আসিয়া পড়ে। তখনও জানিতাম না যে জোলমার আদেশেই সে আমার পরিচর্যা করিতেছে। সে যে আমার স্ত্রী-পদবাচ্য হইয়াছে তাহাও তখন জানিতাম না।

'ছাড়িব কেন, আমাকে বিবাহ করিয়াছ জান না?'

'কই, না।'

'জোলমা যে আমার হাত ধরিয়াছিল দেখ নাই?'

'দেখিয়াছি। তাহাতেই কি বিবাহ করা হইল।'

'নিশ্চয়। তুমি যদি তখন আপত্তি করিতে, কিংবা জোলমা যদি আমার হাত ছাড়িয়া দিত তাহা হইলে হইত না। কিন্তু তুমিও আপত্তি কর নাই, জোলমাও হাত ছাড়ে নাই।'

গ্রীবা হইতে এলাহির বাহুপাশ মুক্ত করিতে পারিলাম না।

'জোলমা তোমার হাত ধরিয়াছিল কেন?'

'সে যে আমাকে পুরস্কার দিবে বলিয়াছিল। আমি তোমাকে চাহিয়া লইয়াছি।'

'জোলমা কোনো আপত্তি করিল না?'

'না। বড় ভাল মেয়ে সে।'

'জোলমা কোথায়?'

'কি জানি। গুহার ভিতর কোথাও নিশ্চয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তোমাকে শোওয়াইয়াই গুহার ভিতর চলিয়া গিয়াছে।'

'গুহাটা কত বড়?'

'প্রকাণ্ড। এখান হইতে লাফাই পাহাড় পর্যন্ত। সমস্তটাই ফাঁপা। ভিতরে ভিতরে কত গুহা যে আছে এক জোলমা ছাড়া আর কেহ জানে না বোধহয়।'

'গৌ কোথায় থাকে?'

'যেখানে যখন খুশি। লাফাই পাহাড়ের পিছনে প্রকাণ্ড একটা পাথর আছে দেখিয়াছ? দূর হইতে অনেকটা মানুষের মুখের মতো দেখিতে। গৌ সেখানে প্রায়ই যায়।'

'কেন?'

'কি জানি! মনে হয় ওই পাথরটার সহিত কি যেন কথা কয়, পাথরের উপর তিত্তিরের রক্ত মাখায়। নিশ্চয় কিছু আছে একটা ব্যাপার, ঠিক জানি না। জানিতে ইচ্ছাও করে না।'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। দুর্বল বোধ করিতেছিলাম। এলাহি ধীরে ধীরে আমার কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। আবার আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুমের মধ্যেও কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। মনে হইতেছিল জোলমাকে পাইয়াও বোধ হয় পাইলাম না। মনে হইতেছিল, প্রথম তাহার সহিত একা যেদিন আলাপ হইয়াছিল—সেই নৃত্যচঞ্চল ময়ূরবেষ্টিত জোলমা—সেদিনও সে যেমন দূরে ছিল আজও তেমনি দূরে আছে। একটুও কাছে আসে নাই। ক্ষুধিত পশুটার সম্মুখে খানিকটা খাদ্য ধরিয়া দিয়া যেন আরও দূরে সরিয়া গিয়াছে।

...গুহার অন্ধকারে জোলমার নিকট বসিয়া ছবি-আঁকা শিখিতেছিলাম। একটি ছোট প্রস্তরখণ্ডের উপর জোলমা দেখাইয়া দিতেছিল ছবিতে কি করিয়া রং দিতে হয়। আমি আর একটি ছোট প্রস্তরখণ্ডে তাহার অনুকরণ করিতেছিলাম। জোলমার মধ্যে কোনো চঞ্চলতা ছিল না, আমি যে তাহার স্বামী এ বোধই যেন ছিল না, আমার সহিত তাহার দেখা হইত কেবল ছবি-আঁকার সময়। অন্য সময় সে যে কোথায় থাকিত আমি জানি না। অতি প্রত্যূষে প্রত্যহ একবার সে বনে যাইত জানি। রাত্রে কোথায় থাকিত জানি না। রাত্রে আমার কাছে থাকিত এলাহি এবং বিলচুর স্ত্রী টিনা। খানা এবং গোলগোলের স্ত্রীদের দখল করিয়াছিল বিতং। আমি আপত্তি করিলে দখল করিতে পারিত না, কিন্তু আমি আপত্তি করি নাই। এলাহি এবং টিনাও যদি না থাকিত আমি নির্ভয়ে আমার নব সাধনায় অগ্রসর হইতাম। সত্যই আমি কম-পশু হইতে চেষ্টা করিতেছিলাম। জোলমার নিকট বসিয়া ছবি-আঁকা শিখিতেই বেশি ভাল লাগিত। রেখার ফাঁদে বর্ণের জালে বড় বড় হরিণ ধরা পড়িয়া যাইতেছে! কি অদ্ভুত! ওহালির মোহ আমার মনকেও আচ্ছন্ন করিতেছিল। ধীরে ধীরে একটা নূতন জগতে যেন আমি প্রবেশ করিতেছিলাম, যে জগতে জ্যোৎস্নার স্পর্শে কৃষ্ণমেঘের ভয়াবহতা স্বপ্নে

রূপান্তরিত হয়, যে জগতে ছবির বল্‌গা-হরিণ রক্ত মাংসের বল্‌গা-হরিণকে ডাকিয়া আনে যে জগতে মাটির রং প্রস্তর-প্রাচীরকে প্রাণবন্ত করে চিত্রগৌরবে, কণ্টকবৃক্ষকে মহিমান্বিত করে পুষ্পশোভায়।

...বল্‌গা-হরিণের পেটের কাছে যেখানে পেটের হরিদ্রাভ বাদামি রং শাদায় আসিয়া মিশিয়াছে, সেখানটায় আমার বর্ণবিন্যাস ঠিক হইতেছিল না। জোলমা ঝুঁকিয়া নিজেই সেটা ঠিক করিয়া দিতেছিল। খিলখিল হাসির শব্দে উভয়েই চমকাইয়া উঠিলাম। নিঃশব্দচরণে গৌ কখন আসিয়াছে বুঝিতে পারি নাই। ঈষদালোকিত অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে দেখিলাম।

'কি ছবি হইতেছে দেখি?'

আবছা অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিল, 'এ সব তো নকল ছবি। আসল ছবি কবে হইবে?'

জোলমা কোনো উত্তর না দিয়া উঠিয়া গেল এবং গুহার অন্ধকারে অন্তর্ধান করিল। গৌ কাছে আসিলেই সে চলিয়া যাইত।

'কত দূর?'

ভ্রূ নাচাইয়া গৌ আমার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল। আমার উত্তরের উপর যেন তাহার জীবনমরণ নির্ভর করিতেছে। আমি মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

'অপদার্থ অকর্মণ্য পাথর—'

দুই হস্তের দশ অঙ্গুলি বক্র করিয়া সে আমার দিকে ছুটিয়া আসিল, মনে হইল বুঝিবা আমার মুখটা আঁচড়াইয়া দিবে। কিন্তু সে কিছুই করিল না, আমার মুখের কাছে আসিয়া তাহার বক্র অঙ্গুলি সোজা হইয়া গেল, হাসিতে হাসিতে সে আমার গালে হাত বুলাইতে লাগিল।

'হইবে হইবে সব হইবে, অধীর হইও না। এখন উপরে চল। শ্যেন সম্প্রদায়ের বহু লোক বাইরে জমা হইয়াছে। বিতং একটা দল পাকাইয়া আনিয়াছে। জিকাটু পাহাড়ে শঙ্খচূড় নাকি মরে নাই, গুহার মধ্যে এখনও তাহার তর্জন শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। উহারা জানিতে আসিয়াছে ইহার কি ব্যবস্থা তুমি করিবে। লাফাই পাহাড়ে আর স্থান নাই। জিকাটু পাহাড় যদি নিরাপদ হয়, শ্যেনপক্ষী সম্প্রদায়ের অনেকে গিয়া সেখানে বাস করিবে।'

'উহারাই গিয়া সাপটাকে মারিয়া ফেলুক না।'

'সাপ বলিয়া মানিলে পূর্বেই মারিয়া ফেলিত। উহাদের ধারণা অন্যরূপ। আমারও। শ্যেন সম্প্রদায়ের কেহ উহার গায়ে অস্ত্রাঘাত করিবে না। তোমাকেই ব্যবস্থা করিতে হইবে।'

'কি করিব?'

'তুমিই ঠিক কর।'

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম বিরাট জনতা আমার প্রতীক্ষা করিতেছে। আমাকে দেখিয়াই তাহাদের কলরব থামিয়া গেল। আমি নীরবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম খানিকক্ষণ। কি যে বলিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। সহসা মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল।

বলিলাম, 'জিকাটু পাহাড়ে তোমরা যে যত পার শুষ্ক কাষ্ঠ লইয়া চল তাহার পর আমি ব্যবস্থা করিব। শুষ্ক কাষ্ঠ পাহাড়ে জমা হইলেই আমাকে খবর দিও।'

জনতা ছত্রভঙ্গ হইতেছিল, বিতং সহসা জনতার ভিতর হইতে উচ্চকণ্ঠে বলিল, 'ছবি আঁকা কেমন চলিতেছে? বল্‌গা-হরিণ কিন্তু আজকাল আর আসিতেছে না।'

বলিয়াই সে জনতার মধ্যে মিলাইয়া গেল, তাহাকে আর দেখিতে পাইলাম না।

গৌ আমার কানে কানে ফিসফিস করিয়া বলিল। 'বিতংকে সাবধান। ও যে কেবল ভাল হরিণের ডাক ডাকিতে পারে তাহা নয়, ভাল তীরও ছুঁড়িতে পারে। জোলমাকে না পাওয়ার অপমান ও ভোলে নাই, শীঘ্র ভুলিবেও না। মনে রাখিও, তোমার মাথাটাই উহার লক্ষ্য।'

আমার আত্মসম্মান আহত হইল।

বলিলাম, 'আমি ব্যাঘ্র, শ্যেনপক্ষী আমার কিছু করিতে পারিবে না। বড় জোর একটু আঁচড়াইয়া দিবে, তাহাতে আমার বিশেষ কিছু হইবে না।'

গৌ-এর চক্ষু নিষ্পলক হইয়া গেল। তাহার চোখের তারা দুইটির দিকে চাহিয়া আমি ভয় পাইয়া গেলাম। মনে হইল যেন দুইটি রক্তখদ্যোত জ্বলিতেছে। গৌ সেই ভয়ঙ্কর নিষ্পলক দৃষ্টি আমার মুখের উপর কিছুক্ষণ নিবদ্ধ রাখিয়া তাহার পর বলিল, 'তুমি যাহা বলিলে তাহা আর কখনও বলিও না। তুমি যদি জোলমার স্বামী না হইতে, জোলমার কোলে শিশু দিয়া বৃহার বংশরক্ষা করিবে এ আশ্বাস যদি তোমার নিকট না পাইতাম, তাহা হইলে তোমার এই উক্তির জন্য তোমাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিতে হইত। তোমার ব্যাঘ্র-পরাক্রম তোমাকে রক্ষা করিতে পারিত না। আর একটা কথা মনে রাখিও, বিতং শ্যেনপক্ষী নয়, বিতং সিংহ, সিংহ হইয়াও সে আমাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে জোলমার জন্য। জোলমার জন্যই সে বনে বনে হরিণের ডাক ডাকিয়া বেড়াইয়াছে এতকাল। বৃহার পাগলামির জন্যই বিতংয়েব সহিত জোলমার বিবাহ হয় নাই, হইলে হয়তো জোলমার কোলে এতদিন শিশু দেখিতে পাইতাম।'

আমার উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া গৌ তরতর কবিয়া নামিয়া গেল। আমি নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমারও রক্তে আগুন জ্বলিতেছিল, কানে কানে কে যেন বলিতেছিল, 'এত অপমান সহ্য করিবে? কেন, আর কিসের ভয়, জোলমাকে তো পাইয়াছ!' আমার কুলদেবতা ধীরে ধীরে চোখের সম্মুখে মূর্ত হইয়া উঠিলেন। দেখিলাম ব্যাঘ্রবেদনা মানবীর নয়নযুগলে ধক্ ধক্ করিয়া কালাগ্নি জ্বলিতেছে। মনস্থ করিলাম বিতংকে অবিলম্বে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিব।

...এলাহি এবং টিনা দুইজনেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আমি আমার বর্শা ও ধনুর্বাণ লইয়া নিঃশব্দে গুহা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। বিতং কোথায় আছে খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত হইবে না। খানা এবং গোলগোলের পরিবারবর্গের ভার সে যখন লইয়াছে তখন তাহাদের গুহায় গেলেই বিতংয়ের ঠিকানা পাইব। ঠিকানা যদি না-ও পাই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিব, সমস্ত লাফাই পাহাড়, সমস্ত বন তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিব। বিতং সিংহ? সিংহের আস্ফালনে ব্যাঘ্র ভয় পাইবে? এ যে কল্পনাতীত! দেহের শিরার উপশিরায় আমার ক্ষুব্ধ বন্য আভিজাত্য যেন তাণ্ডব নৃত্য করিতেছিল। বিতংয়ের সহিত একটা বোঝাপড়া করিতেই হইবে। নিবিড় অন্ধকারে নিঃশব্দ চরণে বাহির হইয়া পড়িলাম।

...অন্ধকারে সেদিন বন্য শ্বাপদের মতোই আমি সন্তর্পণে বহুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইলাম। যদি বিতংয়ের দেখা পাইতাম—শ্বাপদের মতোই তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িতাম। কিন্তু তাহার দেখা পাইলাম না। যখন ক্রোধভরে বাহির হইয়া আসিয়াছিলাম তখন খেয়াল ছিল না যে, এত রাত্রে কেহই গুহার বাহিরে থাকিবে না, সকলেই ঘুমাইয়া পড়িবে। লাফাই পাহাড়ে গিয়া দেখিলাম সমস্ত গুহার মুখে ঝাঁপ লাগানো এবং প্রত্যেক গুহার সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে।

জন্তু-জানোয়ারের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিবার ইহাই তখন একমাত্র উপায় ছিল। কেহ জাগিয়া নাই দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম খানিকক্ষণ। নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেই অবাক হইয়া গেলাম। যদি ইহারা জাগিয়াই থাকিত তাহা হইলেই বা কি হইত? ইহাদের নিকট হইতে বিতংয়ের খোঁজ লইয়া গিয়া তাহাকে হত্যা করিতাম? দলপতির পক্ষে এ আচরণ কি শোভন হইত? এ সমাজের দলপতি থাকা কি আর সম্ভব হইত সে ঘটনার পর? তাহাকে যদি হত্যা করিতেই হয়, গোপনে করিতে হইবে, যেন কেহ জানিতে না পারে। সহসা চমকাইয়া উঠিলাম।

'হোই, হোই, হোই—'

ক্রমবর্ধমান উচ্চৈঃস্বরে তিনবার শব্দ হইয়া থামিয়া গেল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর নজর পড়িল দূরে অবস্থিত একটা বৃক্ষ হইতে কে যেন লাফাইয়া নীচে নামিল। আমি নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। দেখিলাম সে আমার দিকেই আগাইয়া আসিতেছে। একটু কাছে আসিতে দেখিলাম তাহার হাতে বর্শা রহিয়াছে। স্কন্ধে ধনু ঝুলিতেছে।

'কে?'

আমিই প্রথমে প্রশ্ন করিলাম।

একটি যুবক আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং আমাকে চিনিতে পারিয়া বর্শ সন্নত করিল। শ্যেন সম্প্রদায়েরই যুবক একটি।

'তুমি কি করিতেছ?'

'পাহারা দিতেছি।'

'তিত্তির সম্প্রদায়ের একদল লোক একবার গভীর রাত্রে আমাদের আক্রমণ করিয়াছিল। তখন হইতেই গৌ পাহারা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। আজ আমার পালা।'

'তিত্তির সম্প্রদায় কি এখনও নিঃশেষ হয় নাই?'

'না, কিছু বাকি আছে এখনও। তাহাদের দলপতি মুনজট্ খুব বড় যাদুকর। তাহারই শক্তির জোরে কিছু এখনও টিকিয়া আছে। সে না থাকিলে গৌ এতদিন সকলকেই শেষ করিয়া দিত—'

'কি করে সে?'

'ঠিক জানি না, তবে শুনিয়াছি সে শ্যেনপক্ষীদের জীবন্ত পোড়াইয়া মারে। তাহার পর সেই ভস্মে মন্ত্রপাঠ করিয়া তাহা মাটির নিচে পুঁতিয়া ফেলে।'

আমি নীরব হইয়া রহিলাম। আমার ক্রোধ সহসা যেন খানিকটা কমিয়া গেল। আমি যে সম্প্রদায়ের দলপতি হইয়াছি সেই সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার জন্য এই যুবক একাকী রাত্রি জাগরণ করিতেছে, আর আমি...

'আপনি কি কাহাকেও খুঁজিতেছেন?'

'না, আমিও তোমাদের পাহারা দিতেছি। তোমাকে দেখিয়া খুব খুশি হইলাম। যাও, তুমি নিজের কাজ কর।'

যুবক চলিয়া গেল। আমি একাকী অন্ধকারে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। আমার আর ক্রোধ ছিল না বটে, যে উত্তেজনার তাড়নায় নির্বোধের মতো ছুটিয়া বাহির হইয়া

আসিয়াছিলাম সে উত্তেজনাও অপনোদিত হইয়াছিল কিন্তু অপমানের জ্বালাটা কমে নাই। আমি যে সমাজে এতকাল বাস করিয়া আসিয়াছি সে সমাজে কুলদেবতার অপমান সহ্য করা নিয়ম নয়। সে সমাজে কোনো পুরুষ কুলদেবতার নিন্দা শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহার প্রতিশোধ না লয় তাহাকে সকলে মিলিয়া শাস্তি দেয়। এজন্য এক অদ্ভুত শাস্তি প্রচলিত আছে আমাদের সমাজে। তাহাকে সকলে মিলিয়া চিৎ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া রাখে এবং আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে তাহার মুখে লাথি মারে। আমি অন্ধকারে ভ্রমণ করিতে করিতে চিন্তা করিতেছিলাম। বিতং আমার কুলদেবতার অপমান করে নাই, অপমান করিয়াছে গৌ। শাস্তি দিতে হইলে গৌকেই শাস্তি দিতে হয়। তাহার পাকা চুলের ঝুঁটি ধরিয়া কুঠার দিয়া তাহার মাথাটা কাটিয়া ফেলিতে আমার আপত্তি নাই, তাহার পা দুইটি ধরিয়া পাথরের উপর আছড়াইয়াও তাহাকে আমি অনায়াসে মারিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু সেটা কি সমীচীন হইবে? সমস্ত শ্যেনপক্ষী সমাজ তাহা হইলে যে ক্ষেপিয়া যাইবে! জোলমাকে ফেলিয়া পলায়ন করা ছাড়া যে তখন আর গত্যন্তর থাকিবে না। আমার চিন্তাধারা ব্যাহত হইল। বল্‌গা-হরিণের ডাক শুনিতে পাইলাম। দাঁড়াইয়া এদিকে ওদিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমি বনের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। লাফাই পাহাড় ছাড়িয়া আসিয়া কখন যে বনের ভিতর ঢুকিয়াছি, তাহা জানি না। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। চাঁদ উঠিয়াছে, নৈশ অরণ্যের বিচিত্র শব্দে চতুর্দিক পরিপূর্ণ। যে চাঁদ এবং যে শব্দ এতকাল আমাদের বন্য জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে সেই চাঁদ এবং সেই শব্দ মনে হইল আজ যেন কি একটা অভিনব বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছে। কাহার বার্তা? ওহালির, না, আমার কুলদেবতার? সহসা মনে হইল জোলমা যেন আমাকে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছে। অসংখ্য ঝিল্লির ঝঙ্কারে, জ্যোৎস্নার শান্ত আবেদনে সে যেন বলিতেছে—ফিরিয়া এস, ফিরিয়া এস। মনে হইতে লাগিল শত শিখীকণ্ঠে বুঝি এইবার ওই কথা বিঘোষিত হইবে। উৎকর্ণ হইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু ময়ূরের ডাক শুনিতে পাইলাম না। ধীরে ধীরে আমার সেই পুরাতন বৃক্ষকোটরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ওই বৃক্ষকোটরকে কেন্দ্র করিয়াই আমার এই সম্পূর্ণ নূতন জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল, এত কাছে আসিয়া তাহাকে একবার না দেখিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল না। কিছু দূর গিয়া আবার বল্‌গা-হরিণের ডাক শুনিতে পাইলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার। এবার খুব কাছে। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতেছি সহসা বিতং একটা ঝোপ হইতে তুড়ুক তুড়ুক করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

'বিতং!'

ডাক শুনিয়া বিতং ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, তাহার পর আমাকে চিনিয়া তুড়ুক তুড়ুক করিয়া আমার দিকে আগাইয়া আসিল। কাছে আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিল।

'বিতং, আমি তোমাকে খুঁজিতেই আজ রাত্রে বাহির হইয়াছি।'

'কেন?'

'তোমার সহিত একটা বোঝাপড়া করিতে চাই। তুমি সুযোগ পাইলেই আমাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছ কেন? যদি আমার প্রতি তোমার কোনো আক্রোশ থাকে, সম্মুখ যুদ্ধে তাহা প্রকাশ কর। আমি সর্বদাই প্রস্তুত আছি।'

বিতং তুড়ুক করিয়া আর একটু আগাইয়া আসিল এবং আমার দিকে চোখ মিটমিট করিয়া চাহিতে লাগিল।

'আমি জোলমাকে চাহিয়াছিলাম—পাই নাই, তুমি তাহাকে পাইয়াছ। তোমার প্রতি আমার কিছু আক্রোশ থাকা স্বাভাবিক, আছেও, কিন্তু সে জন্য আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত নই। আমাকে হত্যা করিবার যদি বাসনা থাকে মাথা পাতিয়া দিতেছি, কুঠার বা খড়্গ যাহা চালাইতে চাও চালাও, কিন্তু ইহাও বলিয়া দিতেছি, বৃহা চলিয়া গিয়াছে, আমিও যদি না থাকি, বনে একটি হরিণ আর আসিবে না।'

এই বলিয়া সে সত্য সত্যই মাথা পাতিয়া দিল। পরমুহূর্তেই মাথাটা তুলিয়া বলিল, 'মাথাটা স্কন্ধচ্যুত হইবার পূর্বে আর একটা কথা বলিয়া যাই। আমি সভায় তোমার বিরুদ্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা গৌ-এর আদেশ অনুসারে। গৌ-এর আদেশ অমান্য করিবার সাহস আমার নাই, কারণ সে পিশাচী। আমি মৃত্যুভয় করি না, কিন্তু গৌ যদি আমাকে আজন্ম রুগ্ন করিয়া দেয়? লাফাই পাহাড়ের ফানঝাকে দেখিয়াছ? গালটা পচিয়া দাঁতগুলা বাহির হইয়া পড়িয়াছে? কারণ কি জান? গৌ উহার উপর চটিয়াছিল, এলাহির একটি ছেলেও ভূমিষ্ঠ হয় নাই, খাম্বার চোখ পচিয়া গিয়াছে, সব গৌ-এর অভিশাপ। উহাকে চটাইবার সাহস নাই। উহারই আদেশে তোমাকে কটুকথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি। নাও, এইবার মার

আবার বিতং মাথা পাতিয়া দিল। আমি বিস্ময়ে যেন পাথর হইয়া গিয়াছিলাম, আমাব সর্বাঙ্গ অবশ হইয়া গিয়াছিল, আমি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

'মারিবে না?'

'না। সব কথা না জানিয়া তোমার প্রতি অবিচার করিয়াছি, কিছু মনে করিও না। একটা কথা শুনিলে, হয়তো তুমি সান্ত্বনা পাইবে, জোলমাকে আমি পাইয়াও পাই নাই। সে তখনও যেমন দূরে ছিল, এখনও তেমনি দূরেই আছে। আমি নামে মাত্র তাহার স্বামী—'

'তাই না কি?'

বিতং হরিণের ডাক ডাকিয়া তুড়ুক করিয়া আবার ঘুরিয়া বসিল।

'চলিয়া যাইতেছ?'

'হ্যাঁ, বনের ওধারটায় এখনও যাওয়া হয় নাই।'

'আচ্ছা, গৌ আমার সহিত এমন রহস্যময় ব্যবহার করিতেছে কেন বলিতে পার?'

'না। তবে একটা কথা জানি, তাহা গোপনে তোমাকে বলিতেও আপত্তি নাই। গৌ জোলমাকে বিনাশ করিতে চায়; কিন্তু গৌ যে পিশাচ-মন্ত্র জানে, তাহা আকাশ-কন্যা জোলমাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাই গৌ অহরহ অন্য উপায়ে সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। আমার বিশ্বাস তোমাকে হয়তো অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেছে। আর কিছু জানি না, চলিলাম।'

'শোন, শোন।'

বিতংয়ের নির্বিকার ভাব দেখিয়া সত্যই আমি বিস্ময় বোধ করিতেছিলাম, এমন আর কখনও দেখি নাই। আমার কুঠারের তলায় নির্বিকারভাবে মাথা পাতিয়া দিয়াছিল, আমি কিছু করিলাম না দেখিয়া ঠিক তেমনি নির্বিকারভাবে চলিয়া যাইতেছে। আশ্চর্য কাণ্ড!

'কি—'

'তুমি যে আমার কাছে মাথা পাতিয়া দিয়াছিলে যদি সত্যই আমি মারিতাম—'

বিতং হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

'আমি জানিতাম, তুমি মারিবে না। আমি মানুষ চিনি। অন্য লোক হইলে তাহাকে এত কথা বলিতাম না। সাবধান, কিন্তু যাহা বলিলাম তাহার প্রতি কথাটি সত্য।'

বিতং হরিণের ডাক ডাকিতে ডাকিতে চলিয়া গেল। তাহার প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আমি প্রথম যেন সত্যভাবে অনুভব করিলাম যে আমি বিদেশি, ইহাদের আমি বুঝিতে পারি নাই। বৃহা, গৌ, জোলমা, বিতং প্রত্যেকেই আমার কাছে রহস্যাবৃত, আমাকে দলপতি সাজাইয়া কেন যে ইহারা এই অভিনয় করিতেছে, তাহাও রহস্যাবৃত।

...বৃক্ষকোটরে গিয়া দেখিলাম সেখানে স্থানাভাব। একটি প্রকাণ্ড পেচক আমার স্থানটি দখল করিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া আছে। তাহাকে অনায়াসে তাড়াইয়া অথবা শিকার করিয়া নিজের কোটর দখল করিতে পারিতাম, তাহার মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তিও হইত, কিন্তু তাহা করিতে প্রবৃত্তি হইল না। প্রবৃত্তির চেহারাই যেন বদলাইয়া গিয়াছিল। সমস্ত অন্তর দিয়া তখন যাহা কামনা করিতেছিলাম তাহা যে ঠিক কি তাহাও বুঝিতে পারিতেছিলাম না, কিন্তু তাহা আর যাহাই হউক বৃক্ষকোটর অথবা পেচক-মাংস নহে। ধীরে ধীরে আবার লাফাই পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইলাম। হঠাৎ জ্যোৎস্নাটা নিবিয়া গেল। চাহিয়া দেখিলাম প্রকাণ্ড একটা কালো মেঘ চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কালো মেঘ ঘিরিয়া জ্যোৎস্নার জরি জ্বলিতেছে। অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। সত্যই কি ওহালি দিবারাত্রি আকাশ-পটে নিত্য নব ছবি আঁকিয়া চলিয়াছে? কেহ দেখুক বা না দেখুক, তাহার ছবি আঁকার কি সত্যিই বিরাম নাই? সত্যই কি ওহালি পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়া বৃহাকে বরণ করিয়াছিল? জোলমা সত্যই কি ওই ওহালির কন্যা? সেদিন সেই জ্যোৎস্নামণ্ডিত কালো মেঘ দেখিয়া আমার মনে যেন প্রশ্নের বান ডাকিয়া গেল। নিমেষের মধ্যে কত কথাই যে মনে হইল । মনে হইল বৃহা শুধু হরিণের ছবি আঁকিয়া হরিণদলকে আহ্বান করিত, ওহালি এত অসংখ্য ছবি আঁকিয়া কাহাদের আহ্বান করিতেছে? ভাবিতে ভাবিতে পুনরায় সেই উপল-বন্ধুর পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। একটু পরে মনে হইল অন্ধকারে বোধহয় পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি। পাহাড়ে উঠিয়াছি, কিন্তু জনমানবের কোনো চিহ্ন নাই, কোথাও আগুন দেখা যাইতেছে না। কৃষ্ণ মেঘ সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বিদ্যুৎ চমকাইতেছে মাঝে মাঝে। ওহালি নূতন ছবি আঁকিতেছে। স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, লাফাই পাহাড়টা কোন্ দিকে? পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইল, বিদ্যুতালোকে দেখিলাম দূরে দুইজন দাঁড়াইয়া আছে। একটি দীর্ঘকায় পুরুষ আর একটি নারী। দূরে একটি প্রস্তরের স্তূপ রহিয়াছে, তাহারই উপর দাঁড়াইয়া আছে দুইজনে। পুনরায় বিদ্যুৎ চমকাইতে দেখিলাম প্রস্তরস্তূপ হইতে তাহারা অবতরণ করিতেছে। নারীটিকে চিনিতে পারিলাম । গৌ। নিমেষের মধ্যে আমি শুইয়া পড়িলাম এবং বুকে হাঁটিয়া তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলাম। এলাহির কথা নিমেষে মনে পড়িয়া গেল। লাফাই পাহাড়ের পিছনে মানুষের মুখের মতো দেখিতে যে প্রকাণ্ড পাথরটা আছে সেখানে গৌ যেন কি করে।

...পাথরটার কাছে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। মেঘ ফাটিয়া চাঁদ বাহির হইল, চতুর্দিক জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গেল, চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। কোথাও কেহ নাই। সেই মনুষ্য-মুখাকৃতি পাথরটার পাশেই আমি দাঁড়াইয়াছিলাম। সহসা পাথরটাই পুরুষ কণ্ঠে কথা কহিয়া উঠিল।

'গৌ, আমি তোমার সহিত সন্ধি করিতে আসিয়াছি। তিত্তির সম্প্রদায়ের দলপতি কখনও

কাহারও নিকট নতজানু হয় নাই। আমি তোমার নিকট নতজানু হইয়াছি, ইহাতেও কি তুমি তুষ্ট হইবে না?'

'দেখ মুনজট্, আমার নাম গৌ, আমি বারংবার মত পরিবর্তন করি না। প্রথম যৌবনে তোমার সহিত আমার যখন প্রথম ভাব হইয়াছিল তখন যদি তুমি নতজানু হইতে এসব হয়তো কিছুই হইত না। কিন্তু তখন তুমি শ্যেন পক্ষী, আমাকে ত্যাগ করিয়া তিত্তির পক্ষী রুরাকে বিবাহ করিলে। সে অপমান আমি ভুলি নাই, কখনও ভুলিব না।'

'কিন্তু তাহাতে লাভ কি হইয়াছে? তোমার একটি পুত্রও তো বাঁচিয়া নাই।'

'থাকিবে কি করিয়া? আমার একটি পুত্রও কি মানুষের মতো হইয়াছিল? ইহার জন্য তুমিই দায়ী। তাহার পর যতগুলি পুরুষের সংস্রবে আমি আসিয়াছিলাম তাহাদের প্রত্যেকটি ছিল কাপুরুষ। আমার তাই একটাও ভাল ছেলে হয় নাই। গিয়াছে ভাল হইয়াছে। বৃহাটাকে আমিই হত্যা করিয়াছি, জোলমাকেও শেষ করিব। কিন্তু তিত্তির বংশের কাহাকেও আমি রাখিব না। গৌ নির্বংশ হইয়াছে, রুরাও হইবে। তুমি নতজানু নতমস্তক যাহাই হও না কেন, আমার এ মত পরিবর্তিত হইবে না।'

বুঝিলাম পাথরটা ফাঁপা, ভিতরে বসিবার স্থান আছে। প্রবেশপথও আছে নিশ্চয়ই কোথাও। পাথরের ছায়ায় গুঁড়ি মারিয়া বসিলাম।

'জোলমা শুনিয়াছি আকাশ-কন্যা। তাহাকে কি কুঠার দিয়া হত্যা করিবে? তোমার মন্ত্রে তো তাহার কিছু হইবে না, সে তো তিত্তির পক্ষী নয়।'

'তাহার মারণ মন্ত্র কি তাহাও আমি জানি। ওহালি বৃহাকে বলিয়া গিয়াছিল, আমি আড়ি পাতিয়া লুকাইয়া শুনিয়াছি একদিন।'

'কি সেটা?'

'তোমাকে বলিব কেন?'

যদিও গৌ-কে আমি দেখিতে পাইতেছিলাম না, কিন্তু কল্পনা করিতেছিলাম যে, গৌ-এর নয়নে রক্ত-খদ্যোত জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

'আমাকে বলিবে কারণ আমি মুনজট্। ও কি, ও কি, আমাকে মারিতেছ কেন? রাক্ষসী, পিশাচী—'

পাথরের ভিতর একটা হুড়মুড় শব্দ হইতে লাগিল। তাহার পরই গৌ-এর আর্ত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, 'ছাড়, ছাড় বলিতেছি।'

'তুই আগে বল্ তবে ছাড়িব। না বলিলে তোকে টুঁটি টিপিয়া এখনই শেষ করিয়া দিব ডাইনি—'

'প্রতিজ্ঞা কর কাহাকেও একথা বলিবে না।'

'করিলাম। বল এবার।'

'ওহালি বলিয়াছিল জোলমা যদি কোনো দিন কোনো পুরুষের সংস্রবে আসে ভাসিয়া যাইবে।'

'ভাসিয়া যাইবে মানে?'

'মানে, মরিয়া যাইবে। মানুষ আর কতক্ষণ ভাসিয়া থাকিতে পারে। ওহালির ভাষাই ওই রকম অদ্ভুত ছিল। ছাড়।'

'আমি যে অনুরোধ আজ করিয়াছি তাহা রাখিবে না?'

'না।'

'যদি মারিয়া ফেলি।'

'তবু না। তিত্তির বংশ ধ্বংস না করিয়া আমি মরিব না। আমাকে যদি মারিয়াও ফেল আমি প্রেতিনী হইয়া রুরার বংশ লোপ করিব। মার আপত্তি নাই।'

মুনজটের পুরুষ কণ্ঠস্বর কোমল হইয়া আসিল।

'গৌ, ক্ষমা কর আমাকে। সন্ধি কর—'

'না, না, না, না—'

গৌ-এর চিৎকার এত তীব্র হইয়া উঠিল যে মনে হইতে লাগিল পাথরটা বুঝি চৌচির হইয়া ফাটিয়া যাইবে। সেখানে বসিয়া থাকা আর নিরাপদ মনে হইল না, উহারা যে কোনো মুহূর্তে বাহির হইয়া আসিতে পারে। নিঃশব্দে সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

আমার এই নৈশ অভিযানের কথা কাহাকেও বলি নাই, এমনকি জোলমাকেও নয়। এখন মনে হইতেছে জোলমাকে যদি বলিতাম তাহা হইলে হয়তো যাহা ঘটিয়াছিল তাহা ঘটিত না। সে হয়তো ইহার কোনো প্রতিবিধান করিতে পারিত। কিন্তু তাহাকে বলি নাই। বলি নাই তাহার কারণ তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারি নাই। আমার বন্য প্রকৃতি তখনও অসাধারণ চরিত্রকে বিশ্বাস করিতে শিখে নাই। দেবতায় বিশ্বাস করিতাম, ভূত প্রেতে বিশ্বাস করিতাম ভয়ে। তাহারা অদৃশ্যচারী। মনে করিতাম সেই জন্যই বুঝি তাহারা অপরিমিত শক্তির অধিকারী। তাহাদের বিশ্বাস করিলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই এই ধারণাও আজন্ম মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। জোলমার অসাধারণত্ব সহজ আড়ম্বরহীন ছিল বলিয়াই ভাবিয়াছিলাম তাহা বুঝি অসাধারণ নয়, মনে হইত কোনো বিশেষ কারণে ও একটা বিশেষ ধরনের জীবন-যাপন করিতেছে, কিছুদিন পরে আবার আমাদের মতো হইয়া যাইবে। বৃহাকেও বিশ্বাস করি নাই। বৃহা জোলমা যে জগতের জীব ছিল সে জগতে আমরা তখনও প্রবেশ করিতে পারি নাই। গৌ সে জগতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই ঘোষণা করিয়াছিল। তাহার হিংস্র প্রকৃতি নানাভাবে ষড়যন্ত্র করিয়া বৃহার আদর্শকে ধূলিসাৎ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। তাহার মনে হইয়াছিল চিরাচরিত পথ ত্যাগ করিয়া উহারা যে পথে পা বাড়াইতেছে তাহা ধ্বংসের পথ। লতা বৃক্ষ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ—দৃশ্যমান সমস্ত জীবজগৎ—যে চিরন্তন উপায়ে অবিরত বংশবৃদ্ধি করিয়া জীবনযুদ্ধে জয়ী হইতেছে তাহাই সনাতন পথ। সংযম, ব্রহ্মচর্য, ছবির ধ্যানে জীবনকে নিঃসন্তান নিষ্ফল করিয়া দেওয়া, ইহা অন্যায় অসঙ্গত, অস্বাভাবিক এবং সেই জন্যই ইহা মৃত্যুরই নামান্তর। বৃহার সংযমকে সে কাপুরুষতা মনে করিয়াছিল, ভাবিয়াছিল ওহালি বুঝি তাহাকে নপুংসক করিয়া দিয়াছে, তাই ওহালি কন্যা জোলমাকে সে সুচক্ষে দেখে নাই। তাই বোধহয় তাহাকে বিনষ্ট করিতে চাহিয়াছিল।

...না, জোলমাকে আমি আমার নৈশ অভিযানের কথা বলি নাই। তবে একটি বিষয়ে আমি দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিলাম। জোলমা আর যে কোনো পুরুষের সংস্রবে আসে আসুক, আমি তাহাকে স্পর্শ করিব না। আমি তাহাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি তাহা পালন করিব। আমি তাহার মৃত্যুর কারণ হইব না। অন্ধকার গুহায় ন্যুব্জ পৃষ্ঠ হইয়া একটি হরিণের শিং-এ রং লাগাইতেছিলাম। জোলমা আমার পাশে আলো ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মাঝে মাঝে মৃদু স্বরে

উপদেশও দিতেছিল। আমি সাগ্রহে চেষ্টা করিতেছিলাম ছবিটি যাহাতে নিখুঁত হয়। সেদিন বিতং জনতার ভিতর হইতে যে কথাটা বলিয়াছিল তাহা আমি ভুলি নাই। বৃহার মৃত্যুর পর হইতে বনে আর বল্‌গা-হরিণ আসিতেছে না...বৃহার জন্যই বল্‌গা-হরিণ আসিত কি? ..বৃহার ছবির মতো ছবি আঁকিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে সেটা। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলিতে দুলিতে ছবি আঁকিতেছিলাম, তাই বোধহয় ছবিও ঠিক হইতেছিল না।

জোলমা মৃদুস্বরে বলিল, 'ওইখানে আর একটু গাঢ় করিয়া রং দাও।'

গাঢ় করিয়া রং দিতে লাগিলাম। রং দিতে দিতে অবান্তর একটা কথা মনে হইল।

'আচ্ছা, জোলমা, ময়ূরদের সঙ্গে তোমার ভাব হইল কি করিয়া?'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জোলমা বলিল, 'কাহারও সহিত তো আমার ঝগড়া নাই। তবে ময়ূরদের আমি বেশি ভালবাসি।'

'কেন বল তো?'

'উহাদের রূপের জন্য। উহাদের প্রত্যহ না দেখিলে আমার সমস্ত দিনটা যেন ব্যর্থ হইয়া যায়।'

'আজও তুমি বনে গিয়াছিলে?'

'রোজই যাই।'

'আহা আমিও যদি ময়ূর হইতাম!'

ঘাড় ফিরাইয়া জোলমার দিকে চাহিলাম। দেখিলাম জোলমার নীল চক্ষু দুইটি হাসিতে ঝলমল করিতেছে।

'এ কথা বিতং বলিতে পারে, তুমি কেন বলিতেছ? আমি তো তোমারি সঙ্গিনী হইয়াছি।'

'কিন্তু তবু তোমাকে যেন পাই নাই। কেন বল তো?'

জোলমা চুপ করিয়া রহিল।

'বলিবে না?'

'যাহা বলিতে চাই তাহা তুমি বিশ্বাস করিবে না।'

'বলিয়াই দেখ।'

'আমাকে তুমি পাও না কেন জান? আমাকে তুমি যেখানে চাও আমি সেখানে থাকি না। 'ওহালি আকাশে যখন ছবি আঁকে তুমি যদি সেখানে যাও আমাকে ঠিক পাইবে, ফুলের পাপড়িতে যখন রং ফোটে আমি সেখানে থাকি, তুমি তো তখন সেখানে থাক না, তাই আমাকে পাও না।'

পরমুহূর্তেই অন্ধকার শিহরিয়া উঠিল। গৌ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে নিঃশব্দ-চরণে কখন কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল বুঝিতে পারি নাই।

'পাইবে, পাইবে, এইখানেই, এই অন্ধকার গুহাতেই পাইবে। ফুলের পাপড়িতে যাইবার দরকার নাই, ফুলের পাপড়িতে দুইজনের কুলাইবেও না। হি, হি, হি—'

জোলমার মুখের উপর সর্পদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গৌ হাসিতে লাগিল। জোলমা প্রদীপটি নামাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আমি একটু ইতস্তত করিয়া জোলমার অনুসরণ করিতেছিলাম। গৌ বাধা দিল।

'ফুলের পাপড়ির আলোচনা পরে করিলেও চলিবে, এখন বাহিরে চল, খোতারি আসিয়াছে, সে তোমাকে কিছু বলিতে চায়।'

'কি?'

'আমি জানি না। আমি দলপতি নই, আমাকে সে বলিবে কেন। আমি জানিতেও চাহি না। আমি যাহা জানিতে চাই তাহা এই'—আমার কানে কানে গৌ ফিস ফিস করিয়া প্রশ্ন করিল, 'জোলমার মন পাইয়াছ কি?'

আমার মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। গৌয়ের কথায় সহসা যেন লজ্জিতও হইলাম। আমার পৌরুষই যেন আমাকে ধিক্কার দিল। গৌ প্রশ্ন করিয়া তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাইয়াছিল, আমি তাহার চোখের দিকে চাহিতে পারিলাম না, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলাম। যে আমি কিছুক্ষণ আগে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে জোলমাকে কিছুতেই স্পর্শ করিব না সেই আমিই এখন এই সঙ্কল্পকে অযৌক্তিক মনে করিয়া অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম। মনে হইতে লাগিল জোলমার সম্বন্ধে আমার এই সঙ্কোচ হয়তো আমার অক্ষমতারই পরিচয়। দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া কেমন যেন অসহায় বোধ করিতে লাগিলাম।

'ভাল করিয়া খাওয়া দাওয়া করিতেছ তো? লাফাই পাহাড় হইতে তোমার জন্য মাংস প্রচুর পরিমাণে আসে তো?'

'আসে।'

'আচ্ছা, আমি কাল নিজে তোমার খাওয়াব ব্যবস্থা করিব। তোমার জন্য নিজ হাতে মাংস সেঁকিয়া আনিব। এক রকম ফলও আনিব, খাইয়া দেখিও কেমন চমৎকার। এখন চল, খোতারি কি বলিতেছে শুনিবে চল—'

গুহার বাহিরে আসিয়া দেখিলাম খোতারি দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখ ভাবলেশহীন। আমাকে দেখিয়া সে বলিল—

'জিকাটু পাহাড়ে প্রচুর শুষ্ক কাঠ সংগ্রহ করা হইয়াছে। এইবার কি করিব?'

'শঙ্খচূড়ের গর্জন কি এখনও শোনা যাইতেছে?'

'যাইতেছে। ভাভা, বিতং, লোলো এবং আমি শুনিয়াছি। মনে হইতেছে পাহাড়ের ভিতর সে যেন তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে। ওই ক্রুদ্ধ নাগ-প্রেতকে যদি অবিলম্বে শান্ত না করা যায় ভীষণ একটা কিছু অমঙ্গল ঘটিবে। শ্যেন সম্প্রদায়ের সকলেই খুব ভয় পাইয়াছে।'

আমি গম্ভীর হইয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলাম। তাহার পর বলিলাম, 'ভয়ের কোনো কারণ নাই। আমি কাল জিকাটু পাহাড়ে যাইব। তোমরা কিছু আগুন লইয়া সেখানে উপস্থিত থাকিও।'

খোতারিও গম্ভীরভাবে আমার আদেশটা কিছুক্ষণ ধরিয়া প্রণিধান করিল তাহার পর চলিয়া গেল।

গৌ প্রশ্ন করিল, 'সাপটাকে কি পোড়াইয়া মারিবে?'

'দেখি—'

'একটা কথা কিন্তু মনে রাখিও ও সাপ সাধারণ সাপ নয়। ও নাগরূপী প্রেত। উহাকে কি করিয়া তুমি যে গুহার ভিতরে বন্দী করিয়াছ তাহা জানি না। হয়তো স্বেচ্ছায় ও বন্দীত্ব বরণ করিয়াছে, ভীষণ কোনো প্রতিশোধ লইবে বলিয়া। উহাকে সন্তুষ্ট করিবার একটি উপায় আমি জানি, কিন্তু তাহা তো হইবার নয়।'

'কি উপায়?'

'জোলমাকে লইয়া গিয়া যদি উহার মুখে সমর্পণ করিয়া দাও ও খুশি হইবে। একদিন স্বপ্নে দেখিয়াছি ও যেন আসিয়া আমাকে বলিতেছে—আমি জোলমাকে চাই, আর কিছু চাই না। জোলমাকে পাইলে আমি জিকাটু পাহাড় ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।'

সহসা আমার সেই ময়ূরবাহিনীর কথা মনে পড়িয়া গেল। সত্যই তো, জোলমার ময়ূরেরাই তো উহাকে বন্দী করিয়াছে, জোলমার উপর উহার রাগ হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক। গৌ স্বপ্ন দেখিয়াছে? তাহা হইলে কি...। একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম, গৌ-এর কথায় আবার স্বস্থ হইলাম।

'জোলমাকে ছাড়িতে রাজি আছ?'

'না।'

গৌ আবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

'আমিও ছাড়িতে রাজি নই। আগে জোলমার কোলে একটি সন্তান দেখিতে চাই, বেশি নয় একটি, তাহার পর জোলমা যদি না-ও থাকে আপত্তি নাই, আমি সেই শিশুকে মানুষ করিব। কুকুরছানাকে মানুষ করিয়াছি, মানুষের শিশুকে পারিব না? নিশ্চয় পারিব। শিশুর অধর স্পর্শে আমার শুষ্ক স্তনে দুধ উথলাইয়া উঠিবে। উঠিবে না?'

গৌ-এর হিংস্র চোখের তীব্র দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা আকুল প্রত্যাশায় যেন তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিল। সে আমার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তীক্ষ্ণ অথচ নিম্নকণ্ঠে বলিল, 'আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছ, তাহা যেন মনে থাকে। সে প্রতিশ্রুতি যদি পালন করিতে না পার তোমার অশেষ দুর্গতি হইবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা, এলাহি আর টিলাকে আমি এখান হইতে দূর করিয়া দিয়াছি।'

'কেন?'

'আমার খুশি।'

স্পর্ধিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া গৌ বলিল, 'বৃহা যখন দলপতি ছিল, তখনও আমি যা খুশি করিতাম, এখনও করিব, যতদিন বাঁচিয়া আছি আমাব খুশি অপ্রতিহত থাকিবে।'

আমাকে কিছু বলিবার অবসর না দিয়া গৌ চলিয়া গেল। পরমুহূর্তে ফিরিয়া আসিল আবার।

'মনে থাকে যেন আমি কাল সন্ধ্যায় তোমার জন্য মাংস আনিব। আগেই যেন পেট ভরাইয়া ফেলিও না, পেটে স্থান রাখিও, খুব ভাল খাবার আনিব, তেমন খাবার জীবনে কখনও খাও নাই।'

বলিয়াই আবার চলিয়া গেল। আমি সেই অন্ধকার গুহায় স্তিমিত দীপালোকে নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ক্রীড়াচঞ্চল যে হরিণটি আঁকিতেছিলাম তাহার চোখের দৃষ্টিতে একটা শঙ্কা ঘনাইয়া আসিয়াছে মনে হইল। মনে হইল সে বুঝি আমার কানে কানে কিছু বলিবে। তাহার মুখের কাছে কানটা লইয়া গেলাম, কিন্তু সে কিছুই বলিল না।

...প্রদীপ হাতে করিয়া অন্ধকার গুহায় জোলমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম। কোথায় গেল সে? প্রদীপের চকিত আলোকে প্রাচীরগাত্রে কখনও বাইসন, কখনও বন্য মহিষ, কখনও বল্‌গা-হরিণ, কখনও বন্য শূকর মূর্ত হইয়া মিলাইয়া যাইতেছিল, গুহার অলিতে গলিতে বৃহার

শিল্পী-জীবনের আয়োজনসম্ভার ক্ষণিক আলোকে প্রকাশিত হইয়া আবার অন্ধকারে লুপ্ত হইতেছিল, আলো-আঁধারিতে মনে হইতেছিল আমাকে দেখিয়া বুঝি বা কেহ সরিয়া গেল, মনে হইতেছিল বৃহার ছায়ামূর্তি হয়তো এখনই আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে। প্রদীপ হস্তে গুহার পর গুহা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছিলাম কিন্তু জোলমাকে দেখিতে পাইতেছিলাম না। কোথায় গেল সে...।

জিকাটু পাহাড়ে খোতারির দল সত্যই প্রচুর শুষ্ক কাষ্ঠ আনিয়া স্তূপীকৃত করিয়াছিল। আমি যখন গেলাম তখন দেখি প্রায় শতাধিক লোকও সেখানে উপস্থিত হইয়াছে। অনেকের হস্তে মশাল জ্বলিতেছে। আমাকে দেখিয়া খোতারি অগ্রসর হইয়া আসিল।

'আপনার আদেশ অনুসারে আগুনও আনা হইয়াছে। এইবার কি করিব বলুন?'

'শঙ্খচূড় গর্জন করিতেছে কি না স্বকর্ণে শুনিতে চাই।'

আমি পর্বতারোহণ কবিতে লাগিলাম। সকলে নীরবে আমার অনুসরণ করিল।

...পর্বতশৃঙ্গ হইতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া যে গুহামুখ আমি বন্ধ করিয়াছিলাম সেই গুহামুখে আসিয়া অবশেষে উপস্থিত হইলাম। গুহার মুখটি দেখিলাম সম্পূর্ণরূপে বন্ধই আছে। প্রস্তরে কর্ণসংলগ্ন করিয়া বসিলাম। বেশিক্ষণ বসিতে হইল না, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শঙ্খচূড়েব তর্জন শুনিতে পাইলাম। খোতারি ঠিকই বলিয়াছিল। মনে হইতেছে পাহাড়েব ভিতরটা কে যেন তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে। আমার সন্দেহ হইতে লাগিল বোধহয় একাধিক শঙ্খচূড় ওই গুহায় বন্দী হইয়াছে। একটি শঙ্খচূড়ের পক্ষে এত তর্জন কবা কি সম্ভব? আমি কি করিব পূর্বেই ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলাম।

'চল, একেবারে পাহাড়ের চূড়ায় উঠিতে হইবে।'

পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া ঠিক সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম—যে স্থান হইতে বৃহৎ প্রস্তরটিকে স্থানচ্যুত করিয়া নীচে ফেলিয়া দিয়াছিলাম। তোমাদের বোধহয় মনে আছে প্রস্তরটি স্থানচ্যুত করার ফলে একটা গর্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, সেই গর্তে কান দিয়া আমি শঙ্খচূড়ের তর্জন শুনিতে পাইয়াছিলাম। তাহাতেই বুঝিতে পারি যে, নীচের গুহার সহিত এই গর্তের যোগ আছে। শঙ্খচূড় পাছে এই গর্ত দিয়া বাহির হইয়া আসে সেজন্য এই গর্তটিও দ্বিতীয় একটি প্রস্তর দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। বন্ধ করিবার পূর্বে জ্বলন্ত শুষ্ক কাষ্ঠও উহার ভিতর ঢুকাইয়া দিয়াছিলাম শঙ্খচূড়কে পোড়াইয়া মারিবার জন্য। কিন্তু দেখিতেছি সে মরে নাই।

'এই প্রস্তরটিকে এইবার সরাও।'

প্রস্তরটি ছোট ছিল, অনায়াসেই সরানো গেল।

'এইবার ওই শুষ্ক কাষ্ঠগুলিতে আগুন ধরাইয়া গর্তের ভিতর ঢুকাইয়া দাও।'

প্রচুর শুষ্ক কাষ্ঠ সংগৃহীত হইয়াছিল। সেগুলিতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া গর্তের ভিতর ফেলিতে অনেক সময় লাগিল। প্রায় সমস্ত দিনই লাগিয়া গেল। সমস্ত জ্বলন্ত কাষ্ঠগুলি গর্তে ঢুকাইয়া গর্তের মুখ আবার পাথর দিয়া ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিলাম।

খোতারির দিকে চাহিয়া বলিলাম, 'কাল তোমরা আসিয়া শুনিও শঙ্খচূড়ের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাইতেছে কিনা। আমার বিশ্বাস আজই সে সবংশে নিহত হইল, আব সে তোমাদের ভয় দেখাইতে পারিবে না। এইবার আমরা জিকাটু পাহাড় অধিকার করিয়া বসবাস করিতে পারিব।'

খোতারি কিন্তু বিশেষ কিছু বলিল না। তাহার ভ্রূর ঈষৎ স্পন্দন হইতে অনুমান করিলাম যে, আমার কথার উপর সে খুব বেশি আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছে না। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আরও অনেকের ভ্রূ স্পন্দিত হইতে লাগিল। যাহারা অল্পবয়স্ক যুবক তাহারাই কেবল হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘমালায় আগুন জ্বলিতেছে। প্রথম যেদিন বৃহার নিকট গিয়াছিলাম সেদিনও মেঘে এইরূপ অগ্নিশিখা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। আজ আবার করিলাম। রক্তের রঙে ওহালি এ কোন্ ছবি আঁকিতেছে? জোলমা কোথায়? তাহার পর হইতে জোলমার আর দেখা পাই নাই। অনেকক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া সেই রুক্ষ পর্বতশিখরে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

...জিকাটু পর্বত হইতে বৃহার গুহায় যখন ফিরিলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। একটা অজানা আশঙ্কায় আমার সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। আমি জোলমাকে খুঁজিতেছিলাম, মনে হইতেছিল তাহাকে আর বুঝি পাইব না। চতুর্দিকে অদ্ভুত একটা নীরবতা ঘনাইয়া আসিয়াছিল। গৌ বলিয়া গিয়াছে, আমার জন্য মাংস আনিবে, কিন্তু কোথায় সে? ঝাউঝাউটা পর্যন্ত নাই, গৌ তাহাকে লইয়া গিয়াছে। গুহার ভিতরটা অন্ধকার। জোলমা তাহার প্রদীপটা কোথায় রাখিয়া গিয়াছে কে জানে! অন্ধকারকে এতদিন অসহ্য মনে হয় নাই, সেদিন মনে হইতে লাগিল আর যেন অন্ধকারকে সহ্য করিতে পারিতেছি না। গুহার ভিতর হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া প্রদীপটা খুঁজিতেছিলাম, হঠাৎ কাহার গায়ে হাত ঠেকিল, চমকাইয়া উঠিলাম।

'কে?'

'আমি এলাহি। বেশি জোরে কথা বলিও না। গৌ হয়তো শুনিতে পাইবে। এটা রাখ।'

'কি?'

'সেই গাছের পাতা, যাহা দিয়া তোমার ঘা সারিয়াছিল। পাতাটা ভাল করিয়া চিনিয়া রাখিও, খুব উপকারী পাতা।'

'এখন হঠাৎ পাতা আনিবার মানে? আমার ঘা তো সম্পূর্ণ সারিয়া গিয়াছে।'

'পাতাটা তোমাকে চিনাইবার জন্য আনিয়াছি। সেদিন তুমি যে পাতাটার নাম জানিতে চাহিয়াছিলে, মনে নাই? ইহার নাম আমি জানি না।'

'কাল দিনের বেলা চিনাইয়া দিলেই হইত।'

'কাল আমি থাকিব না।'

'কোথায় যাইবে?'

'যেদিকে দুই চক্ষু যায়। এখানে গৌ আমাকে থাকিতে দিবে না। আমি আজই লাফাই পাহাড় ত্যাগ করিব। এটা রাখ, ভবিষ্যতে অনেক কাজে লাগিবে, তা ছাড়া এটার জন্যই হয়তো আমাকে মনে পড়িবে মাঝে মাঝে। আমি যাই—গৌ আসিতেছে—'

ত্রস্ত এলাহি সভয়ে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। আমি কয়েকটা পাতা হাতে করিয়া মূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া রহিলাম। ঝাউঝাউয়ের ডাক শোনা যাইতেছিল। একটু পরেই গৌ আসিল। তাহার সাড়া পাইয়া আমি গুহা হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম আকাশে চাঁদ উঠিতেছে। জ্যোৎস্নার পটভূমিকায় জোলমাকেও সহসা দেখিতে পাইলাম। সে ওহালির কাঠে হেলান দিয়া চন্দ্রোদয় দেখিতেছিল। নিস্পন্দ নীরব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল সে। তাহাব অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গে জ্যোৎস্না, তাহার দৃষ্টি আকাশে নিবদ্ধ। গৌ ঝাউঝাউকে পাথরে বাঁধিয়া আমার দিকে ফিরিয়া চাহিল।

'তোমার জন্য খাবার আনিয়াছি। জোলমা কোথায়?'

অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া দিলাম। গৌ ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার চোখের দৃষ্টি ক্ষণিকের জন্য নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্যই। নিজেকে সম্বরণ করিয়া স্বাভাবিক কণ্ঠেই গৌ জোলমাকে আহ্বান করিল।

'জোলমা খাইবে এস।'

'আমার এখন খাইতে ইচ্ছা করিতেছে না।'

'কেন?'

'জানি না।'

গৌ-এর চক্ষুর দৃষ্টিতে আবার আগুন ধরিয়া গেল। নীরবে সে জোলমার দিকে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ। জোলমার কিন্তু কোনো ভাবান্তর হইল না, সে যেমন দাঁড়াইয়াছিল তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

'ও থাক, তুমি চল।'

আমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে গৌ আমাকে গুহার ভিতর লইয়া গেল। চকমকি ঠুকিয়া আলো জ্বালিল। তাহার কটি-সংলগ্ন চর্মপেটিকা হইতে কিছু মাংস বাহির করিয়া আমার মুখে গুঁজিয়া দিল। চিবাইয়া বুঝিতে পারিলাম শুধু মাংস নয়, মাংসের সহিত আরও কি যেন রহিয়াছে। কি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। বুঝিতে না পারিলেও চিবাইয়া খাইতে লাগিলাম, এত সুস্বাদু মাংস ইতিপূর্বে কখনও খাই নাই।

'কেমন লাগিতেছে?'

'খুব ভাল। মাংসের সহিত আর কি আছে?'

'তিত্তিরের ডিম আর মধু। খাও, সবটাই তোমার জন্য আনিয়াছি।'

গৌ আমার মুখে মাংস তুলিয়া দিতে লাগিল, আমি লোভীর মতো গ্রাস করিতে লাগিলাম। গৌ-এর চোখেমুখে যে ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল তাহা অবর্ণনীয়। হিংস্রতা, কোমলতা, বুদ্ধিমত্তা এবং বিহ্বলতার সে এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ!

'এইবার এই ফলগুলি খাও।'

'কি ফল?'

'মহুয়া। খাইয়াছ কখনও।'

'না।'

'খাইয়া দেখ, চমৎকার লাগিবে।'

খাইতে লাগিলাম। গৌ অনেকগুলি ফল আনিয়াছিল, সব নিঃশেষ হইয়া গেল। আরও থাকিলে তাহাও নিঃশেষ হইয়া যাইত। সমস্ত দেহ-মনে ক্ষুধার অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ক্রমশ অপূর্ব একটা উন্মাদনায় দেহের অণু-পরমাণু স্পন্দিত হইতে লাগিল। গৌ আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতেছিল। বাহিরে জ্যোৎস্নাও হাসিতেছিল। সহসা জোলমা ভিতরে ঢুকিল, আমার দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার পর গুহার অপর প্রান্তে অদৃশ্য হইয়া গেল। ভূগর্ভেই নামিয়া গেল সম্ভবত।

'তুমিও যাও।'— গৌ হাসিয়া বলিল।

'জোলমা না ডাকিলে—'

আমি ইতস্তত করিয়া থামিয়া গেলাম। জোলমা না ডাকিলে জোলমার কাছে যাইব না—জোলমার অনুরোধেই এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলাম।

'জোলমা না ডাকিলে যাইবে না?'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। গৌ-এর চক্ষুর দৃষ্টি ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

'কাপুরুষ, নপুংসক—'

গৌ আমার দুই গণ্ডে দুইটি প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া বাহির হইয়া গেল। আমি ক্ষণিকের জন্য অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই লাফাইয়া উঠিলাম। সেই মুহূর্তে যদি গৌকে নাগালের মধ্যে পাইতাম হয়তো তাহাকে শেষ করিয়া দিতাম। কিন্তু বাহিবে আসিয়া গৌকে দেখিতে পাইলাম না। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম।

...গুহার ভিতর ঢুকিয়া দেখিলাম ভূগর্ভ হইতে মৃদু আলোর আভা গুহার অপর প্রান্তের অন্ধকারকে স্বচ্ছ করিয়াছে। বাহিরে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ নিজের সহিত যে তর্কে লিপ্ত ছিলাম ওই আলোর আভায় সেটা যেন স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। জোলমা আমার স্ত্রী। তাহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে আমার বাধিতেছে কেন? ইহা কি সত্যই আমার কাপুরুষতা? একটা অজ্ঞাত ভয়ের বশবর্তী হইয়াই যে আমি এই অস্বাভাবিক আচরণ করিতেছি, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। কিসের ভয়? ব্যাঘ্র-সমাজের কোনো নিয়ম অমান্য করিলে ভয়ের কারণ ছিল, শ্যেনপক্ষী সমাজের নিয়মবিরুদ্ধ যদি কিছু করিতাম তাহা হইলেও হয়তো শ্যেনপক্ষী দেবতা অসন্তুষ্ট হইতে পারিতেন, কিন্তু জোলমার সম্পর্কে এ পর্যন্ত আমি যাহা করিয়াছি তাহার হেতু জোলমার মধ্যেই আছে। জোলমাকেই কি আমি ভয় করিতেছি? জোলমার ক্ষমতা আছে তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। বিশেষত সে যখন বনে থাকে তখন তাহার ময়ূরের দল সত্যই ভীতপ্রদ, কিন্তু এখানে, এই অন্ধকারে গুহার মধ্যে, কিসের ভয়? জামাইকিনার সঙ্গে যখন বিবাহ হইয়াছিল সে-ও কাছে ঘেঁষিতে দিত না। আঁচড়াইয়া দিত, কামড়াইয়া দিত, দূর হইতে পাথর ছুঁড়িত। বলপ্রয়োগ করিয়া তাহাকে বশ করিতে হইয়াছিল। জোলমাও নারী, সে-ও হয়তো নূতন রকম অস্ত্র ব্যবহার করিয়া আমাকে প্রতিহত করিতেছে... তা ছাড়া গৌকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি...সহসা মনে হইল জোলমাকেও কি প্রতিশ্রুতি দিই নাই? ...জোলমা বলিয়াছিল প্রয়োজন হইলে গৌকে সে শিশু আনিয়া দিবে, ওহালির আঁকা সেই প্রস্তরখণ্ড লইয়া...হঠাৎ আবার একটা কথা মনে হইল...জোলমা লুকাইয়া কাহাকেও ভালবাসে না তো... হয়তো সেই জন্যই ছলনা করিয়া আমাকে দূরে সরাইয়া রাখিতেছে, হয়তো পাথর লইয়া গভীর নিশীথে বৃক্ষতলে গিয়া সেই প্রণয়ীর সহিতই মিলিত হইবে?...গৌ ঠিকই বলিয়াছে, আমি নির্বোধ নপুংসক। কথাটা মনে হইবামাত্র শরীরের শিরায়-উপশিরায় রক্তস্রোত উন্মাদ হইয়া উঠিল।

...ভূগর্ভে নামিয়া দেখিলাম জোলমা নাই। প্রদীপটি জ্বলিতেছে। প্রাচীরে বিশালশৃঙ্গ একটা বল্‌গা-হরিণ প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া যেন বলিল—এই তো এইবার ঠিক পুরুষের মতো আচরণ করিতেছ!

'জোলমা!'

বিরাট গুহায় আমার চিৎকার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। প্রাচীর গাত্রে অঙ্কিত পশুর দলে একটা সাড়া পড়িয়া গেল যেন। তাহারা জীবন্ত হইয়া যেন আমাকে ঘিরিয়া ধরিল, তাহাদের সহিত একাত্মতা অনুভব করিতে লাগিলাম। নীরব ভাষায় তাহারা যেন বলিল, 'রেখার বর্ণে আমাদের ইহারা বন্দী করিয়াছে, আমাদের বন্দীত্ব মোচন কর, তুমিও মুক্ত হও, চল আবার আমরা সেই উদ্দাম আরণ্য জীবনে ফিরিয়া যাই। এই মোহ-কারাগার চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দাও...'

'জোলমা!'

গুহা-প্রান্তের অন্ধকারটা যেন একটু নড়িয়া উঠিল। তাহার পরই দেখিলাম জোলমা আগাইয়া আসিতেছে। তাহার অঙ্গে কোনো আবরণ নাই, ওহালির সেই বর্ণবিচিত্র পাথরটা কেবল সে বুকের কাছে ধরিয়া আছে। আমার কাছে আসিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, 'এখন আসিলে কেন, আমি তো তোমায় ডাকি নাই।'

'তুমি কোথা ছিলে? কি করিতেছ?'

'আমি এই পাথরটা লইয়া বনে যাইতেছিলাম।'

'কেন?'

'তোমার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য। আমার কোলে গৌ যদি শিশু না দেখে তাহা হইলে—'

'তাহার জন্য তোমাকে বনে যাইতে হইবে না।'

আগাইয়া গিয়া আমি তাহার হাত ধরিলাম।

'ইহার অর্থ?'

তাহার হাত হইতে পাথরটা লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম।

'এ কি? ছি, ছি, ছাড়, ছাড়—'

আমার আলিঙ্গন বদ্ধ হইয়া জোলমা ছটফট করিতে লাগিল। আমার মনে হইতে লাগিল, যেন আমাকে ঘিরিয়া হরিণ, বাইসন, মহিষ, শূকরের দল জয়ধ্বনি দিতেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা ভীষণ শব্দ হইল। সেরূপ ভীষণ শব্দ আমি জীবনে কখনও শুনি নাই। তাহার পরই চতুর্দিক কাঁপিতে লাগিল, মনে হইল পাহাড়টা বুঝি এখনই ধসিয়া যাইবে। জোলমাকে ছাড়িয়া আমি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। বাহিরে আসিয়াও দেখিলাম চতুর্দিক কাঁপিতেছে। আবার ভীষণ শব্দ হইল একটা। তাহার পর আবার। মুহুর্মুহুঃ যেন বজ্রপাত হইতে লাগিল। ছুটিয়া পাহাড় হইতে নামিতে গেলাম, কিন্তু নামিতে পারিলাম না। মাটি এত কাঁপিতেছিল যে, দাঁড়াইয়া থাকা সম্ভব ছিল না, নামিতে গিয়া মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেলাম। শেষে গড়াইয়া গড়াইয়া হামাগুড়ি দিয়া যখন সমতলে পৌঁছিলাম তখন দেখি সম্মুখেই বড় একটা গাছ রহিয়াছে। তাহাতেই আরোহণ করিতে লাগিলাম। সর্বপ্রকার আপদে বিপদে যে বৃক্ষদেবতা চিরকাল আমাদের আশ্রয় দিয়াছে তাহার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গতি ছিল না।

...অন্ধকারের মধ্যেই একটা কলকল ধ্বনি শুনিতে পাইতেছিলাম। প্রভাতেব আলোকে যাহা দেখিলাম তাহা বিস্ময়কর। চতুর্দিক জলে ডুবিয়া গিয়াছে। বহু দূরে একটা পাহাড়ের চূড়া জাগিয়া আছে কেবল, আর কিছু নাই। লাফাই পাহাড়, বৃহার গুহা সমস্ত জলমগ্ন। চক্রবালরেখা পর্যন্ত কেবল জল, জল, জল। বহু জন্তুজানোয়ার ভাসিয়া যাইতেছে। বন্য মহিষ, বাইসন, শূকর, বল্‌গা-হরিণ...। সহসা গাছের চূড়া হইতে বল্‌গা-হরিণের ডাক শুনিতে

পাইলাম। ভাসমান বল্‌গা-হরিণেরা সে ডাক শুনিয়া ইতস্তত চাহিতে লাগিল। বিতং নাকি? উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—হাঁ, বিতংই বটে। আমাকে দেখিয়া বিতং নামিয়া আসিল।

'বিতং, সহসা এ কি হইল?'

'জিকাটু পাহাড় কাল রাত্রে ফাটিয়া গিয়াছে। তাহার পর হইতে এই কাণ্ড। তোমরা নাগ-প্রেতকে পোড়াইয়া মারিবে ভাবিয়াছিলে। অত সহজ নয়। পাতাল হইতে জল উঠিয়া তোমাদের আগুন নিভাইয়া দিল। শ্যেনপক্ষীরা নাগদের ধ্বংস করিয়াছিল, নাগ দলপতি তাহার প্রতিশোধ লইয়া ছাড়িয়াছে। আমি এবার চলি—'

'কোথায়?'

'ওই বল্‌গা-হরিণদের সঙ্গে। উহারা যেখানে যাইবে আমিও সেখানে যাইব। চলি—'

বিতং ঝপাং করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে সে দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। আমি কি করিব? কতদিন এই বৃক্ষশাখায় বসিয়া থাকিব? সহসা দেখিতে পাইলাম জোলমা ভাসিয়া চলিয়াছে। ঘোর রক্তবর্ণ ওহালির গাছের উপর নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে সে। তাহার দৃষ্টি আকাশে নিবদ্ধ। গৌ মুনজট্‌কে যাহা বলিয়াছিল তাহা মনে পড়িল। ওহালির ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে, জোলমা ভাসিয়া চলিয়াছে। আমি নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলাম। আমার সমস্ত চেতনা অসাড় হইয়া গিয়াছিল। আমিও জলে লাফাইয়া পড়িয়া অনায়াসেই জোলমার অনুসরণ করিতে পারিতাম কিন্তু তাহা করিতে আর প্রবৃত্তি হইল না। জীবনে যে অনুভূতি ইতিপূর্বে কখনও আমাকে বিহ্বল করে নাই সেই অনুভূতি আমার সমস্ত চিত্তকে বিকল করিয়া দিয়াছিল। আমি লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। যে জোলমাকে লাভ করিবার জন্য আমি মিথ্যাচরণ, প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ, এমন কি হত্যা পর্যন্ত করিতে ইতস্তত করি নাই, যাহাকে লাভ করিলে আমার জীবন ধন্য হইয়া যাইত, সেই জোলমা চোখের সম্মুখে ভাসিয়া চলিয়া গেল, আমি তাহার কাছে গিয়া তাহার চোখের দিকে তাকাইবার সাহস পর্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। আমার বন্য জীবনে যে অপূর্ব স্বপ্ন বর্ণসমারোহে কিছুকালের জন্য মূর্ত হইয়াছিল দেখিতে দেখিতে তাহা মিলাইয়া গেল, তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না, ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা পর্যন্ত করিলাম না। কেবল অস্পষ্টরূপে অনুভব করিতে লাগিলাম স্থূল হস্ত দিয়া জোলমাকে ধরা যায় না। আমি আকাশ-কন্যাকে বাসনার ফাঁদে বন্দিনী করিতে গিয়া কেবল অপ্রস্তুত হইয়াছি মাত্র। নিজের এই শোচনীয় পরাভবের জন্য মনে কোনো গ্লানিও হইতেছিল না। অন্তরের অন্তস্তলে মনে হইতেছিল ঠিকই হইয়াছে। জোলমা যদি সামান্য রমণীর মতো আমার বাহুপাশে ধরা দিয়া আমার লালসায় ইন্ধন জোগাইত তাহা হইলে কেমন যেন ছন্দপতন হইত, দেবতার অপমান হইত। একথা সেই অসভ্য যুগেও আমার বর্বর হৃদয়ে অস্পষ্টভাবে অনুভব করিতেছিলাম। আকাশ যেখানে আসিয়া পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াছে, জোলমা দেখিতে দেখিতে সেই দিগন্ত-রেখায় বিলীন হইয়া গেল। হয়তো বৃহা এবং ওহালি সেখানে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল।

...আমি অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। আরও হয়তো অনেকক্ষণ থাকিতাম, কিন্তু জলের বেগ বাড়িয়া গাছটা নড়িতে লাগিল। গাছে বসিয়া থাকা আর নিরাপদ মনে হইল না। জলে লাফাইয়া পড়িলাম এবং সেই দূরবর্তী পর্বতচূড়া লক্ষ্য করিয়া সন্তরণ দিতে লাগিলাম।

...পর্বতচূড়ায় উপস্থিত হইয়া দেখি বিরাট একটা গুহা মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করিয়া তাহারই ভিতর অবশেষে অবতরণ করিলাম। সেই গুহার সুড়ঙ্গ পথে কতকাল যে চলিয়াছি তাহার ঠিক নাই। কত শতাব্দীর পর শতাব্দী। সেই অন্ধকার যাত্রার স্মৃতি অস্পষ্টভাবে কিছু মনে আছে। সমস্তই মুছিয়া গিয়াছে, মাঝে মাঝে কেবল এক-একটা ছবি স্পষ্ট হইয়া আছে। যদিও আমি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জীবন অতিবাহিত করিয়াছি কিন্তু আমার মনে হইতেছে, আমি যেন সেই গুহার সুড়ঙ্গপথেই যুগযুগান্ত ধরিয়া চলিয়াছি। সুড়ঙ্গপথের বাঁকে বাঁকে যেন নূতন নূতন লোক ভিড় করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের সহিত কিছুকাল কাটাইয়া আবার আমার নূতন যাত্রা শুরু হইয়াছে। সমস্তটাই যেন স্বপ্নের মতো মনে হইতেছে।

...আবার সেই তুষার দেশ। এবার আমি পুরুষ নই। আমি ঝিলমের স্ত্রী জিতা। ঝিলম 'কোয়াক' নামক নৌকায় চড়িয়া সমুদ্রে তিমি শিকার কবিতে গিয়াছে, আমি হরিণ-চর্মনির্মিত তাঁবুর সম্মুখে বসিয়া চাটিয়া চাটিয়া আমার সন্তানদের অঙ্গ পরিষ্কার করিতেছি। আমার পরিধানে শীল চর্মের পরিচ্ছদ। আমার স্বামীর সহিত আরও জন কয়েক গিয়াছে। তিমি মাছ দেখা গেলে সকলে একসঙ্গে হার্পুন নিক্ষেপ করিবে, তাহার পর তিমিকে তাড়াইয়া অগভীর জলে লইয়া গিয়া তাহাকে শিকার করিবে। তিমি একটা নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের শীত-ভবন এখনও প্রস্তুত হয় নাই, কুকুরের গাড়িটাও ভাঙিয়া গিয়াছে। তিমি পাওয়া গেলে শুধু যে তাহার মাংস এবং চর্বি আমাদের কাজে লাগিবে তাহা নয়, তাহার পঞ্জর দিয়া আমাদের শীত-ভবনের কড়ি-বর্গা হইবে, তাহার চোয়ালের হাড় দিয়া আমরা আমাদের কুকুরের গাড়ি নির্মাণ করিব। পুঠার কাছে শুনিয়াছিলাম টিট্রিভ সম্প্রদায়ের লোকেরা কুকুরের গাড়ি চড়িত। আমি এখন যে সমাজে আছি সে সমাজের সহিত টিট্রিভ সম্প্রদায়ের কোনো সম্পর্ক ছিল কি কোনো কালে? কে জানে। বল্‌গা-হরিণ এখনও আমাদের প্রধান খাদ্য। কিন্তু তাহাদের আমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রাচীর-গাত্রে আর ছবি আঁকিতে হয় না। ঝিলম এবং তাহার সঙ্গীরা তাহাদের গমনাগমনের পথে ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে। গ্রীষ্ম আরম্ভ হইবার ঠিক পূর্বে বল্‌গা-হরিণের দল অরণ্যভূমি ত্যাগ করিয়া তুন্দ্রা পার হইয়া বরফের উপর দিয়া উত্তর দিকে চলিতে থাকে। তাহারা যখন আমাদের এলাকায় আসে তখন ঝিলম এবং তাহার সঙ্গীরা তাহাদের শিকার করে। গ্রীষ্ম পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বরফ গলিয়া যায়। বল্‌গা-হরিণের দল যে দ্বীপগুলিতে গিয়া আশ্রয় লয় সেগুলি তখন আমাদের তটভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তখন আমার বল্‌গা-হরিণদের নাগাল আর পাই না। গ্রীষ্মকালে দ্বীপগুলি তৃণাচ্ছাদিত হইয়া যায়, বল্‌গা-হরিণরা তখন সেখানে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করে। সে সময় আমরা মাছ শিকার করি। জাল দিয়া অনেক রকম মাছ ধরিতে শিখিয়াছি। আমরাই, মানে মেয়েরাই, মাছ ধরি। ছেলে-মেয়েরাও আমাদের সাহায্য করে। কিনাপা (আমার বড় ছেলে) এ বিষয়ে খুব পারদর্শী। অনেক রকম মাছ পাওয়া যায়। এক রকম শাদা মাছ আমাদের খুব প্রিয়। আমরা উহাদের নাম দিয়াছি 'জলের বল্‌গা-হরিণ'। পুরুষরা পাখিও শিকার করে। উড়ন্ত পাখিকে বর্শা দিয়া গাঁথিয়া ফেলে। ভীষণ-দর্শন লোমশ কস্তুরী-বৃষও তাহারা শিকার করে। গ্রীষ্মের পরে শীত আসে। সমুদ্রের জল আবার জমিয়া যায়। দ্বীপগুলিতে তৃণগুল্মও থাকে না। বল্‌গা হরিণের দল তখন আবার অরণ্যে ফিরিয়া আসে। ফিরিবার মুখে ঝিলমের দল আবার

তাহাদের শিকার করে। পাথর গাঁথিয়া গাঁথিয়া প্রকাণ্ড দুইটি প্রাচীর হ্রদের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত করা আছে। ঝিলমের দল তাড়া দিয়া হরিণদের সেই প্রাচীরদ্বয়ের মধ্যে ঢুকাইয়া দেয়। ঝিলম হ্রদের উপর নৌকায় বসিয়া থাকে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া। হরিণের দল হ্রদের সমীপবর্তী হইলেই তাহাদের শিকার করে। এইভাবে দিনের পর দিন কাটিতেছে, শীতের পর গ্রীষ্ম। এই ছবিটুকুই শুধু মনে আছে, আর সব ঝাপসা হইয়া গিয়াছে।

ইহার পর যে চিত্রটি মনে ফুটিয়া উঠিতেছে তাহার পটভূমি তুষারের দেশে নয়। পর্বতও নয়, অরণ্যও নয়। আমি ক্ষুদ্র একটি গ্রামে রহিয়াছি। এবার আমি পুরুষ, কিন্তু যুবক নহি। আমার বয়স মাত্র দশ বৎসর। যে বিশেষ দিনটির কথা মনে পড়িতেছে সেদিন আমার দীক্ষা। সেইদিনই আমি সমাজের দায়িত্ববোধসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে গৃহীত হইব। আমি আমার মায়ের দ্বিতীয় সন্তান। আমি যে সমাজে আছি সে সমাজে প্রথম সন্তানকে বাঁচিতে দেওয়া হয় না। ইহাদের ধারণা প্রথম সন্তানের দেহ অপুষ্ট থাকে, তা ছাড়া তাহার পিতার পরিচয়ও সুনির্দিষ্ট থাকে না অনেক সময়। সেই জন্য প্রথম সন্তান সম্বন্ধে কাহারও বিশেষ আগ্রহ নাই। জন্মগ্রহণ করিবামাত্র তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হয়। সেই প্রথম সন্তানই দ্বিতীয় সন্তানরূপে মাতৃগর্ভে আবার আবির্ভূত হয় ইহাই সকলের বিশ্বাস এবং জননীর সান্ত্বনা। আমি সেই দ্বিতীয় সন্তান। আমি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত জননীর স্তন্য পান করিয়াছি। আমাকে আনন্দ দান করিবার জন্য আমার পিতামাতা কত কি যে করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। পাখি ধরিয়া দিয়াছেন, কড়ির মালা কিনিয়া দিয়াছেন, ছাগলের চামড়া দিয়া টুপি করিয়া দিয়াছেন। আমাকে পিঠে করিয়া বেড়াইয়াছেন, আমার সহিত ছাগল-ভালুক খেলা করিয়াছেন। দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত আমি যাহা চাহিয়াছি পাইয়াছি, যাহা খুশি করিয়াছি, কেহ বাধা দেয় নাই।

এইবার কিন্তু আমাকে নিয়মের বশবর্তী হইতে হইবে। দীক্ষা লইতে হইবে। আজ আমার সেই দীক্ষা দিবস। প্রভাতেই গ্রামের লোকেরা আসিয়া আমাকে আমার মায়ের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া গিয়াছে। গান গাহিয়া বলিয়াছে, 'ওগো মা, তোমার ছেলেকে আর খোকা করিয়া রাখিও না, এবার সে পুরুষ হোক, এবার সে সমাজের হোক, এবার সে ভার বহিতে শিখুক, কষ্টসহিষ্ণু হোক, শিকারি হোক।' মা আমাকে কোলে করিয়া বসিয়াছিলেন, মায়ের কোল হইতে তাহারা আমাকে তুলিয়া লইয়া গেল। তাহাদের সহিত গিয়া নদীতে স্নান করিলাম। সকলে মিলিয়া আমাকে স্নান করাইল। আমার সমবয়সী বালিকারা জলে নামিয়া আমার অঙ্গ মার্জনা করিয়া দিল। আমার দীক্ষার পর তাহাদেরই ভিতর হইতে আমাকে ভাবী বধূ নির্বাচন করিতে হইবে।

স্নান শেষ করিয়া গ্রামপ্রান্তের বিরাট প্রান্তরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রান্তর পূর্বেই পরিষ্কৃত হইয়াছিল। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম গ্রামের যুবকদল আমার অপেক্ষায় সমবেত হইয়া বসিয়া আছে। আমাকে দেখিতে পাইবামাত্র তাহারা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহার পর আমাকে মধ্যস্থলে বসাইয়া তাহারা প্রত্যেকে কুকুর সাজিয়া আমাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। প্রত্যেকেই হামাগুড়ি দিয়া চতুষ্পদ কুকুরের মতোই চলিতেছিল, ছোট ছোট লাঠি কোমরে বাঁধিয়া প্রত্যেকে একটা করিয়া ল্যাজও বানাইয়া লইয়াছিল, মুখে কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ শব্দও করিতেছিল। আমি মধ্যস্থলে নীরবে বসিয়া রহিলাম, মানুষ-কুকুরের দল আমাকে ঘিরিয়া প্রদক্ষিণ করিতে

লাগিল। আমি তখন যে সমাজে ছিলাম সে সমাজে সকলের ধারণা ছিল যে, এরূপভাবে প্রদক্ষিণ করিলে কুকুরের সমস্ত সদ্‌গুণ আমার মধ্যে প্রবেশ করিবে। আমিও কুকুরের মতো শিকারি ও সাবধানী হইব। আমার ঘ্রাণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তিও কুকুরের মতো তীক্ষ্ণ তীব্র হইবে। প্রদক্ষিণকারীরা কুকুরের সমস্ত প্রকার হাবভাবের অনুকরণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ প্রদক্ষিণ করিবার পর মানুষ-কুকুরেরা চলিয়া গেল, আসিল মানুষ-ক্যাঙারুরা। তাহারাও ক্যাঙারুর ল্যাজের অনুকরণে খড়ের ল্যাজ পরিয়া আসিয়াছিল, ক্যাঙারুর মতো হাবভাব করিতে করিতে তাহারও আমাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। ইহার পর যাহা ঘটিল তাহা অতিশয় বেদনা-দায়ক ব্যাপার। একজন বৃদ্ধ আমাকে স্কন্ধে তুলিয়া লইল। আমি তাহার কাঁধের উপর বসিয়া তাহার বুকের দুইধারে পা ঝুলাইয়া দিয়া তাহার মাথাটি ধরিয়া বসিয়া রহিলাম। আর একজন পিছন দিক হইতে আমার মাথাটা টানিয়া ধরিল। তৃতীয় এক ব্যক্তি একটি পাথরের ছোট নোড়া আনিয়া আমার সম্মুখের দন্তে আঘাত করিতে লাগিল। দুই-তিন আঘাতেই আমার দাঁত ভাঙিয়া গেল এবং আমি তারস্বরে চিৎকার করিতে লাগিলাম। বৃদ্ধ তখন বলিতে লাগিল—'কাঁদিও না, বেদনা সহ্য কর, বেদনায় অধীর হয় নারীরা, তুমি পুরুষ, তুমি সহ্য কর।'

ইহার পর তাহারা আমাকে একটা ঘন ঝোপের মধ্যে বসাইয়া দিয়া গেল। আমি ভগ্ন দন্তের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম, প্রচুর রক্তপাতও হইতেছিল, কিন্তু আমি ভয়ে কাঁদিতে পারিতেছিলাম না। যে বৃদ্ধের স্কন্ধে আমি বসিয়াছিলাম সেই বৃদ্ধও নিষ্পলক নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আমার সম্মুখে বসিয়াছিল। তাহার ঠোঁট দুইটা নড়িতেছিল, কিন্তু সে কি বলিতেছিল তাহা বুঝিতে পারিতেছিলাম না। বৃদ্ধ লেহন আমাদের গ্রাম-পতি, সকলে তাহাকে ভয় করে। যখন তাহার ঠোঁট নড়ে অথচ কথা শোনা যায় না তখন সে নাকি মনে মনে মন্ত্রপাঠ করে এবং সে মন্ত্র নাকি ভয়ানক। বৃদ্ধ লেহন যখন চটিয়া যায় তখনই নাকি ওইভাবে মন্ত্র পড়ে। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার উদ্‌গত অশ্রু চোখেই শুকাইল। খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া লেহন চলিয়া গেল। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমার চোখের পাতা ভারী হইয়া আসিতে লাগিল। আমি অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুম হইতে উঠিয়া দেখি আমাদের গ্রামের পুরোহিত-চিকিৎসক ঝলক্‌নীল আমার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। ঝলক্‌নীলের নাকের ডগায় বিরাট একটা কালো আঁচিল, দুই কানে দুইটা বাঘের দাঁত গোঁজা, কপালে, গালে নানা বর্ণের চিত্রবিচিত্র করা। তাহাকে দেখিয়া আমি ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিলাম। বাল্যকালে আমার অসুখের সময় সে একবার আসিয়াছিল, আসিয়া আমাকে একটা গাছের ডাল দিয়া আপাদমস্তক প্রহার করিয়াছিল। মারের চোটে আমার অসুখ সারিয়া যায়। ঝলক্‌নীল বলিল, 'ভয় নাই। আমি যাহা বলিতেছি তাহা মন দিয়া শোন। এ উপদেশ যদি পালন করিতে পার জীবনে কখনও কষ্ট পাইবে না, মৃত্যুর পরও সুখে থাকিবে। শোন, খুব বেশি স্বার্থপর হইও না, যাহা শিকার করিবে তাহা একা ভোগ করিও না। সকলে মিলিয়া ভোগ করিলে বেশি আনন্দ পাইবে। কলহ করিও না, শান্তিতে থাকিবার চেষ্টা করিবে। মিথ্যা কথা বলিবে না, চুরি করিবে না। গুরুজনের কথা মান্য করিবে। তোমাদের কুলদেবতা বানরের মাংস কখনও খাইবে না। বানরের যাহাতে অপকার হয় তাহাও কখনও করিবে না। স্ত্রীলোকদের বেশি প্রশ্রয় দিও না। বেশি স্ত্রীলোকের সংস্রবেও আসিও না। গ্রামের সমস্ত লোককে নিজের লোক মনে করিবে।

জানিবে তাহাদের সম্মানে তোমার সম্মান, তাহাদের অপমানে তোমার অপমান। যাহা বলিলাম, তাহা যদি পালন কর হোমভু তোমার সহায় হইবেন। হোমভু সর্বত্র আছেন। আকাশে তাঁহার বাড়ি, কিন্তু থাকেন তিনি সর্বত্র, কে কি করিতেছে সব লক্ষ্য করেন। পাপ করিয়া তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারিবে না। যত লুকাইয়াই পাপ কর না কেন হোমভু দেখিতে পাইবেন। সুতরাং সাবধান। আমি যাহা বলিলাম তাহা মনে গাঁথিয়া লও। ভাল করিয়া গাঁথিয়া লও। একা একা বসিয়া প্রত্যেক কথাটি ভাব। আমি আবার কাল আসিব।...

ঝলক্‌নীল চলিয়া গেল। তাহার পর আসিল আমার মা, আমার খাবার লইয়া। খাবার আমার কাছে রাখিয়াই মা চলিয়া গেল। আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল না পর্যন্ত। দেখিবার নিয়ম নাই। আমি একা বসিয়া বসিয়া ঝলক্‌নীলের কথাগুলি মনে মনে রোমন্থন করিতে লাগিলাম। সহসা চোখে পড়িল একটি কাক সম্মুখের বৃক্ষে বসিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে। আমি তাহার দিকে চাহিতেই সে বলিযা উঠিল—কা, কা। আমি শুনিলাম সে যেন খা খা বলিতেছে। কেন জানি না একটা অদ্ভুত কথা মনে হইল। মনে হইল মায়ের মনের কথা বোধহয় কাকের মুখে ব্যক্ত হইতেছে। আমি যতদিন এই ঝোপে থাকিব মা আমার সহিত বাক্যালাপ পর্যন্ত করিতে পাইবে না। এই কাক বোধহয় তাই...। বিস্মিত দৃষ্টিতে কাকের দিকে আবার চাহিলাম। কাক আবার বলিল, 'খা খা।' আহারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে কিছু খাবার লইয়া কাককে ছুঁড়িয়া দিলাম। কাক মহানন্দে নামিয়া মাংসের টুকরাটি লইয়া ডালে বসিল এবং ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতে লাগিল। ঝলক্‌নীলের কথাগুলি আবার যেন শুনিতে পাইলাম, 'খুব বেশি স্বার্থপর হইও না। সকলে মিলিয়া ভোগ করিলে বেশি আনন্দ পাইবে—।' সত্যিই আমার খুব আনন্দ হইতেছিল। আর এক টুকবা মাংস কাককে দিলাম। আমি যতদিন ঝোপে ছিলাম কাকটা রোজ আসিত। ঝলক্‌নীলও আসিত এবং আমার মুখের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিয়া যাইত—'ভয় নাই। আমি যাহা বলিতেছি মন দিয়া শোন। এ উপদেশ যদি পালন করিতে পার জীবনে কখনও কষ্ট পাইবে না, মৃত্যুর পরও সুখে থাকিবে। শোন, খুব বেশি স্বার্থপর হইও না...'

এই এক কথা এক সুরে দিনের পর দিন সে আমাকে শুনাইয়া যাইত। আমি সেই ঝোপের মধ্যে তিন মাস ছিলাম। একা ছিলাম। রৌদ্র বৃষ্টি ঝড় ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া একা সেই ঝোপের মধ্যে বসিয়া ঝলক্‌নীলের উপদেশগুলি অন্তরে গাঁথিয়া লইতেছিলাম। দ্বিতীয় কোনো মানুষের কণ্ঠস্বর আর শুনি নাই। পাখির স্বর শুনিতাম, তাহাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতাম। একদল বক রোজ ঝাঁক বাঁধিয়া সন্ধ্যার পূর্বে উড়িয়া যাইত, একটা নীলকণ্ঠ প্রতিদিন বৈকালে সজিনা গাছের উচ্চতম শাখাটায় বসিয়া ল্যাজ দোলাইয়া ড্য ড্য শব্দ করিত, আকাশে মেঘের রূপ দেখিতাম। রাত্রে শ্বাপদেরা চিৎকার করিত। গ্রামের ভিতর ঢুকিতে সাহস করিত না। আমার কাছে কোনো দিন আসে নাই। পরে শুনিয়াছিলাম যে গ্রামের যুবকেরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রতি রাত্রে আমাকে পাহারা দিত, কিন্তু একথা আমাকে তখন কেহ জানায় নাই। ঝলক্‌নীল আমার নিকট কিছু অস্ত্র রাখিয়া গিয়াছিল। বলিয়াছিল, বিপদে পড়িলে আমি যেন নিজেই আত্মরক্ষা করি। বলিয়াছিল, 'তুমি নিজে যদি নিজের সহায় হও, হোমভু তোমার সহায় হইবেন। যাহারা পরমুখাপেক্ষী তাহাদের হোমভু সাহায্য করেন না।' তোমরা যাহাকে ভগবান বল আমরা তখন তাহাকেই হোমভু বলিতাম। এই তিন মাস ধরিয়া হোমভুরই চিন্তা করিয়াছি। আকাশের দিকে

চাহিয়া ভাবিয়াছি হোমভু যদি এখন একবার নামিয়া আসেন বড় ভাল হয়, তাহার সহিত আলাপ করি। পরমুহূর্তেই স্তূপীকৃত মেঘের রাশিতে অস্তমান সূর্যের রক্তিমাভা দেখিয়া মনে হইয়াছে হোমভু এখন মেঘ রাঙাইতে ব্যস্ত, আমার নিকট আসিবার তাঁহার বোধহয় অবসর নাই। ঝোপের ভিতর বসিয়া কত কি ভাবিতাম। টোনটু এবং লিমার কথাও মনে হইত। টোনটু এবং লিমা দুই জনকেই আমার ভাল লাগে। ইহাদের মধ্যে কাহাকে বিবাহ করিব জানি না। আমার দুজনকেই বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে। লিমার বাবা গরিব। সে দুইটি শঙ্খের মালা এবং একটি শৃগালের চর্ম দিতে পারে। আমার মা চারিটি শঙ্খের মালা এবং একটি ব্যাঘ্রচর্ম দাবি করিয়াছেন। টোনটুর বাবা হয়তো মায়ের দাবি মিটাইতে পারিবে। লিমার চোখ দুইটি মানসপটে জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল। লিমার চোখের তারায় আকাশের তারা জ্বলিত। কিন্তু মনে হইত—হায়, তাহাকে পাইব না বোধহয়।

...এখন কোথায় টোনটু, কোথায় লিমা, কোথায় ঝলক্‌নীল, কোথায় বা সেই গ্রাম? সব হারাইয়া গিয়াছে। সামান্য ছবির টুকরাটুকু স্মৃতির কোঠায় পড়িয়া আছে। দুদিন পরে হয়তো ইহাও থাকিবে না।

...অন্ধকার গুহাপথে বিরামহীন চলিয়াছি। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইতেছে।

...নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি। নৌকার উপর বর্শা হস্তে একা দাঁড়াইয়া আছি। জোরে বাতাস বহিতেছে। হ্রদের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাষা জাগিয়াছে। ঘো আমার পাশে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঘো মানুষ নয়, কুকুর। আমরা কুকুর পুষিতে শিখিয়াছি। আগুন এবং পাথরের মতো কুকুরও আমাদের জীবন-সংগ্রামের সহায় হইয়াছে। জীবন-সংগ্রাম এত উগ্র হইয়া উঠিয়াছে যে, অহরহ সচেষ্ট না থাকিলে প্রাণধারণ করা দুষ্কর। শিকার কমিয়া গিয়াছে। যথেচ্ছ শিকার করিবার সুযোগও নাই। যে সব বনে শিকার পাওয়া যায়, সবল মানুষেরা তাহা অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। আমরা বিদূরিত হইয়াছি। আত্মরক্ষা করিবার জন্য হ্রদের মধ্যস্থলে বড় বড় নৌকায় বাস করিতেছি। হ্রদের মধ্যস্থলে নৌকার গ্রাম। সেই গ্রামের আমি দলপতি। নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে ঘো-কে সঙ্গে লইয়া প্রত্যহ গোপনে শিকার করিয়া বেড়াই। ভৃঙ্গ সম্প্রদায় সমস্ত বনটা দখল করিয়া রাখিয়াছে। রাত্রে তাহারা উৎসবে মাতিয়া থাকে সেই সময় আমি আর ঘো গিয়া তাহাদের বনে হানা দিই। ঘোর দৃষ্টি ও ঘ্রাণশক্তির সাহায্য না পাইলে শিকার করিতে পারিতাম না। বনের মধ্যে কোথায় হরিণ লুকাইয়া আছে ঘো তাহা ঠিক বাহির করিতে পারে, তাহার পর সেটাকে তাড়াইয়া আমার নাগালের মধ্যে লইয়া আসে। ঘো এখন আমার জীবনে অপরিহার্য। ঘোর পূর্বে আমার যে কুকুরটি ছিল তাহার নাম ছিল জিঘা। ভৃঙ্গ সম্প্রদায়ের শরাঘাতে জিঘা প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তাহার দাঁতগুলি মালা করিয়া আমি গলায় পরিধান করিয়া রহিয়াছি।

....বাতাসের বেগ বাড়িতেছে। গোধা, অবহি, চোনা এখনও বাহির হইতেছে না কেন? গোধা, অবহি আমার দুই পুত্র। তাহারাও আমার সঙ্গে শিকারে বাহির হইবে। গোধার বয়স তেরো, অবহির এগারো। ভৃঙ্গ সম্প্রদায়কে ফাঁকি দিয়া কতরূপে তাহাদের বন হইতে শিকার

সংগ্রহ করা যায় তাহার কৌশল তাহাদের শিখাইতেছি। চোনা আমার কন্যা, বয়স যোল। সে-ও আমাদের সহিত বাহির হইবে। ঘোর মতো সে-ও আমাদের শিকারের একজন প্রধান সহায়। সে কিন্তু সহায়তা করে অন্য প্রকারে। সে শঙ্খের গহনা পরিয়া, কড়ির মেখলা দুলাইয়া, সর্বাঙ্গ নানাবর্ণে রঞ্জিত করিয়া, চোখে মুখে হাবভাব ফুটাইয়া ভৃঙ্গ সম্প্রদায়ের বন-রক্ষকদের ভুলাইতে যায়। চোনা গান গাহিতে পারে, নাচিতেও পারে। ভৃঙ্গ সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের দূর করিয়া দিয়াছে বটে, আমাদের সম্প্রদায়ের কোনো পুরুষকে তাহারা সহ্য করিতে পারে না, কিন্তু আমাদের মেয়েদের সম্বন্ধে তাহাদের মোহের অন্ত নাই। আমরা তাহাদের এই দুর্বলতার সুযোগ লইতে ছাড়ি না। বনরক্ষক ভুরুষ ভয়ানক লোক। তাহার দৃষ্টি যেমন তীক্ষ্ণ, শক্তিও তেমনি প্রচুর। অব্যর্থ হাতের লক্ষ্য। ভুরুষই জিঘাকে শেষ করিয়াছিল। ভুরুষ কিন্তু চোনাকে দেখিলে আত্মহারা হইয়া পড়ে। চোনা তাহাকে লইয়া যাহা খুশি করিতে পারে। এখনও কিন্তু উহারা বাহির হইতেছে না কেন? চোনার সাজসজ্জা করিতে দেরি হইতেছে নাকি। চোনা কিন্তু সাধারণত দেরি করে না। তবে কি গোধা অবহি ভয় পাইয়াছে? দুই দিন পূর্বে শিকার করিতে গিয়া আমার জ্যেষ্ঠপুত্র লোহা ভুরুষের বর্শার আঘাতে নিহত হইয়াছে। ভুরুষের বর্শা তাহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়াছিল। কালই তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া সেই মুণ্ডটি আমরা সমাধিস্থ করিয়াছি। দেহটি ভস্মীভূত করিয়া ভস্মগুলি হ্রদের জলে ছড়াইয়া দিয়াছি। গোধা অবহি নিজেরাই এসব করিয়াছে। লোহার মৃত্যু কি তাহাদের কর্তব্যে বাধা দিতেছে? লোহার প্রেতাত্মা তাহাদের কি শিকারে যাইতে বারণ করিয়া গিয়াছে? বহু প্রকার সম্ভাবনা মনের মধ্যে ভিড় করিয়া আসিল। বাতাসের বেগ বাড়িয়া উঠিল। 'ঘউ, ঘউ, ঘউ'—ঘো অধীর হইয়া উঠিয়াছে। উহারা কেন বিলম্ব করিতেছে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য আমিই হয়তো ফিরিয়া যাইতাম, কিন্তু আমার ফিরিবার উপায় ছিল না। আমি কুলদেবতাকে প্রণাম করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছিলাম শিকারের সঙ্কল্প লইয়া। শিকার লইয়া না ফিরিলে কুলদেবতা অসন্তুষ্ট হইবেন। যতক্ষণ শিকার করিতে না পারিব ততক্ষণ ঘরে ফিরিব না এই সঙ্কল্প লইয়া গৃহ ছাড়িয়া বাহির হই, শিকার লইয়া তবে গৃহে ফিরি। অনেক সময় দিনের পর দিন বাহিরে থাকিতে হয়, শিকার লইয়া তবে গৃহে ফিরি। অনেক সময় দিনের পর দিন বাহিরে থাকিতেহয়। জঙ্গলে বা গুহায় লুকাইয়া থাকি। সুতরাং উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

...ওই যে চোনা আসিতেছে। গোধা, অবহি কোথা? চোনার পিছু পিছু চোনার মা শীলিনাও আসিতেছে দেখিতেছি। শীলিনা কখন ফিরিল? সে হরিণের শিং লইয়া নাভা গ্রামে গিয়াছিল। তাহার বদলে রঙিন ঝিনুক কড়ি এবং শঙ্খ আনিয়াছে নিশ্চয়। তাহারা কাছে আসিতেই জিজ্ঞাসা করিলাম, 'গোধা, অবহি কোথা? তাহারা আসিতেছে না কেন?'

শীলিনা বলিল, 'তাহাদের বদলে আজ আমি যাইব।'

'তুমি চল আপত্তি নাই। কিন্তু গোধা অবহি যাইবে না কেন?'

শীলিনা চুপ করিয়া রহিল। শীলিনার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম সে-ও রণসজ্জায় সাজিয়া আসিয়াছে। তাহারও চোখে মুখে বর্ণের সমারোহ। কণ্ঠে হস্তে কটিদেশে রঙিন ঝিনুকের গহনা। কোমরে একটা ছোরা গোঁজা।

'গোধা অবহি কোথা?'

'তাহাদের আমি বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। যে যম আমার লোহাকে হরণ করিয়াছে, তাহার সহিত আগে বোঝাপড়া করিতে চাই—'

'ঘউ ঘউ ঘউ—'

ঘো পুচ্ছ আন্দোলন করিয়া যেন শীলিনাকে সমর্থন করিল।

'তাহাদের বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছ? তাহারা কি এখনও শিশু আছে যে জলে পড়িয়া যাইবার ভয়ে তাহাদের বাঁধিয়া রাখিতে হইবে! লোহার বুকে যখন ভুরুষের বর্শা বিদ্ধ হয় তখন গোধা অবহি নিকটেই ছিল। লোহার মৃত্যু তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। সে মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার সুযোগ তাহারাই বা পাইবে না কেন? উহাদের ডাকিয়া আন।'

শীলিনা তবু দাঁড়াইয়া রহিল।

'যাও।'

শীলিনা তবু গেল না। আমার মুখের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে অনুভব করিতেছিল যে শেষ পর্যন্ত তাহাকে হার মানিতেই হইবে, তবু দাঁড়াইয়া রহিল। আমি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না, সজোরে তাহার গণ্ডে চপেটাঘাত করিলাম। আর্তনাদ করিয়া শীলিনা হ্রদের জলে পড়িয়া গেল। সেদিকে আমি ভ্রূক্ষেপ করিলাম না। চোনার দিকে চাহিয়া বজ্রকণ্ঠে আদেশ করিলাম, 'শীঘ্র উহাদের ডাকিয়া আন।' চোনা ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল, তাহার পর ছুটিয়া চলিয়া গেল। একটু পরেই দেখিলাম সে গোধা ও অবহিকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিতেছে। গোধাব চোখে জল, অবহির মুখ বিবর্ণ। চোনা যদিও মুচকিমুচকি হাসিতেছিল, কিন্তু তাহার হাসির অন্তরালে যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম। ভুরুষকে ভুলাইতে যাইবার ইচ্ছা তাহারও ছিল না। আমার ভয়েই সে সাজসজ্জা কবিয়া আসিয়াছিল।

তোমরা আগে আগে চল।'

অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমি সরিয়া দাঁড়াইলাম। তাহারা অগ্রবর্তী হইলে ঘো এবং আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি এমন সময় সাঁ করিয়া একটা ছোরা আমার পাশ দিয়া ছুটিয়া গেল। আর একটু হইলেই আমার পাঁজরে বিঁধিয়া যাইত। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম শীলিনা হ্রদের জল হইতে উঠিয়াছে। তাহার মুখের রং উঠিয়া গিয়া তাহাকে বীভৎস দেখাইতেছে। আমাকে ঘাড় ফিরাইতে দেখিয়া সে চিৎকার করিয়া উঠিল—

'আমি হরিণের মাংস চাই না, আমরা মাছ খাইয়াই থাকিব, আমার ছেলেমেয়েদের ফিরাইয়া দাও, উহাদের আমি যাইতে দিব না—'

উন্মাদিনীর কথায় কর্ণপাত করিয়া বৃথা সময়ক্ষেপ করিতে প্রবৃত্তি হইল না। অগ্রসর হইয়া গেলাম। বাতাসের বেগ আরও বাড়িল।

... প্রবল বেগে ঝড় উঠিয়াছে। আকাশে মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। বিরাট একটা বটবৃক্ষের তলায় গোধা, অবহি, ঘো এবং আমি বসিয়া আছি। চোনা ভুরুষের সন্ধানে চলিয়া গিয়াছে। সহসা দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল। ঘো উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। আমিও সন্তর্পণে দাঁড়াইয়া উঠিলাম। মনে হইল কে যেন আমাদের দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। হরিণের দল কি? না, তাহাদের পদশব্দ অন্যপ্রকার। ঝড়ের বেগে শীলিনা আসিয়া প্রবেশ করিল। আবার সে নূতন করিয়া সাজসজ্জা করিয়াছে, নূতন করিয়া রং মাখিয়াছে।

'চোনা কোথা?...'

'ভুরুষের সন্ধানে গিয়াছে।'

'আমিও চলিলাম।'

শীলিনা ছুটিয়া চলিয়া গেল। বিস্মিত হইলাম। মনে হইল, শীলিনার সহিত এতকাল বাস করিয়াছি তবু তাহাকে বোধ হয় আমি ভাল করিয়া চিনি না। সে রাক্ষসী, না জননী, না অভিসারিকা, না গৃহিণী? সহসা চতুর্দিক প্রকম্পিত করিয়া বজ্রাঘাত হইল। শিহরিয়া উঠিলাম।

...না, নারীকে চিনিতে পারি নাই। নারীকে কেন্দ্র করিয়াই যুগে যুগে আমার জীবন সুখদুঃখের ঘূর্ণায় আবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাকে চিনিতে ঠিক পারি নাই। বহু যুগ-যুগান্তরের পটভূমিকায় আজ তাহার যে মূর্তি দেখিতেছি তাহা রহস্যময়ী মূর্তি। সে কখনও কামিনী, কখনও জননী, কখনও রমণী, কখনও নারী। কখনও অবলা, কখনও শক্তিরূপিণী। কখনও মধুরা, কখনও ভীষণা, বিচিত্ররূপিণী পৃথিবীর মতোই নানা প্রয়োজনে তাহার নানা অভিব্যক্তি। একটি চিত্র মনে পড়িতেছে। তোমাদের পুরাণে অন্নপূর্ণার একটি চিত্র আছে। শিব অন্নপূর্ণার নিকট অন্ন ভিক্ষা করিতেছেন। আমিও সেদিন রাহুলার নিকট ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম কিন্তু অন্ন নয়, বিষ। সে রাহুলাকে আমি কিছু দিন পূর্বে দূর করিয়া দিয়াছিলাম প্রয়োজনের তাগিদে সেই রাহুলরাই দ্বারস্থ হইতে হইয়াছিল। রাহুলা ছিল বিদ্রোহিনী। সে আমাদের সমাজের চিরাচরিত প্রথা মানে নাই। আমরা তখন হস্তী শিকার করিতাম। হস্তীই ছিল আমার প্রধান উপজীব্য। হস্তীর মাংস আহার করিতাম, হস্তীর দন্ত ও অস্থি দিয়া নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিতাম, তাহার বদলে ঝিনুক, মৎস্য, শঙ্খ, চকমকি পাথর প্রভৃতি সংগ্রহ করিতাম। হস্তীর চর্মে আমাদের পরিচ্ছদ হইত, তাহা দিয়া আমরা তাঁবুও প্রস্তুত করিতাম। এই হস্তী সহসা সংখ্যায় হ্রাস পাইতে লাগিল। যে দুই-চারিটি রহিল তাহারা এমন দুর্গম স্থানে আশ্রয় লইল যে, তাহাদের আমরা নাগাল পাইতাম না। আমাদের পুরোহিত জোনাফুদিন বলিল পূজা করিতে হইবে। হস্তীর যাহাতে বংশবৃদ্ধি হয়, এ দেশের জলহাওয়ায় যাহাতে তাহারা স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে পূজা-দ্বারা তাহার ব্যবস্থা করিলে আমাদের আর কোনো অভাব থাকিবে না। আমরা সকলেই পূজা করিতে সম্মত হইলাম। রাহুলা হইল না। সে বলিল, 'পূজা করিয়া হাতি বশ মানিবে না। তীর মারিয়া তাহাকে বশ করিতে হইবে। দুর্গম স্থানে আমরা পৌঁছিতে না পারিলেও তীর পৌঁছিবে। সে তীর এমন হওয়া চাই যে হাতির গায়ে বিঁধিলে হাতি আর নড়িতে পারিবে না। যদি বা নড়ে বেশি দূর যাইতে পারিবে না, আমাদের এলাকার মধ্যেই মুখ থুবড়াইয়া মরিবে।'

জোনাফুদিন প্রশ্ন করিল, 'তাহা কি করিয়া সম্ভব?'

'সম্ভব বই কি। আমাকে যদি পুরোহিত করিয়া দাও, আমি দেখাইয়া দিতে পারি—'

রাহুলার প্রদীপ্ত দৃষ্টির সম্মুখে জোনাফুদিন সেদিন সহসা যেন ম্লান হইয়া গিয়াছিল। পরদিন কিন্তু জোনাফুদিনের আদেশে আমি অশিষ্টা রাহুলাকে ত্যাগ করিলাম। না করিলে জোনাফুদিনকে ত্যাগ করিতে হইত। তাহা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। জোনাফুদিনকে ত্যাগ করিলে জোনাফুদিন যে সমাজের পুরোহিত সে-সমাজও ত্যাগ করিতে হইত। সে সাহস আমার ছিল না। রাহুলাকেই ত্যাগ করিতে হইল। রাহুলা আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

...জোনাফুদিনের পূজা-পদ্ধতিতে কিন্তু কোনো সুফল ফলে নাই। তোমাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সে পূজা-পদ্ধতির কিছু বর্ণনা দিতেছি। সুদীর্ঘ পূজা, বহুদিন ধরিয়া করিতে হইত।

...আমাদের এলাকায় প্রকাণ্ড কালো একটা পাথর ছিল। দূর হইতে দেখিলে সহসা মনে হইত একটা হাতি বুঝি দাঁড়াইয়া আছে। যদিও ওই একটি পাথরকেই হাতি বলিয়া ভ্রম হইত কিন্তু ওই রকম সাতটি কালো পাথরের চাঙড় আমাদের এলাকায় ছিল। জোনাফুদিন বলিল, উহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই হস্তী-দেবতার সত্তা প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। উহাদের পূজা করিতে হইবে। নরনারী সকলকেই এই পূজায় যোগ দিতে হইবে। পূজার পদ্ধতি জোনফুদিনই ঠিক করিয়া দিল। পূজার পূর্বরাত্রে আমরা সকলে উলঙ্গ হইয়া উন্মুক্ত প্রান্তরে আকাশের নীচে শয়ন করিয়া রহিলাম। জোনাফুদিন প্রত্যেক পুরুষের কানে কানে বলিয়া গেল, 'তুমি মনে মনে কেবল হস্তিনীর রূপ চিন্তা কর।' জোনাফুদিনের প্রধানা পত্নী অংঘী প্রত্যেক স্ত্রীলোকের কানে কানে বলিয়া গেল, 'তুমি মনে মনে কেবল পুরুষ হস্তীর রূপ চিন্তা কর।' সকলে তাহাই করিতে লাগিল। অতি প্রত্যূষে জোনাফুদিনের আহ্বানে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহার আদেশে আমরা সারিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইলাম। জোনাফুদিন বলিতে লাগিল, 'আমরা এইবার সকলে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিব। যে জঙ্গলে হস্তীরা একদা বাস করিত কিন্তু সে জঙ্গল এখন ত্যাগ করিযাছে, সেই জঙ্গলে হস্তী ও হস্তিনী সাজিয়া আমরা প্রবেশ করিব। সেই হস্তী-শূন্য অরণ্য আমাদের বৃংহিতে মুখরিত হইয়া উঠিবে। হস্তীর মতো আমরাও গাছের ডালপালা আহার করিব। মদমত্ত হস্তীরা হস্তিনীর নিকট যেভাবে প্রণয় নিবেদন করে আমরাও তাহার অনুকরণ করিব। আমরা আর মানুষ থাকিব না, আমরা সকলে হস্তী হইয়া যাইব। আজ সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি আমাদের অরণ্যেই কাটিবে। আমাদের এই অরণ্যবাসের মুহূর্তগুলিতে আমরা কায়মনোবাক্যে যেন হস্তী-হস্তিনী হইয়া যাই। আমরা উলঙ্গ অবস্থাতেই অরণ্যে প্রবেশ করিব। গ্রামের বালক-বালিকারা আমাদের গাত্রের চর্মাবরণ অরণ্যের প্রান্তে রাখিয়া আসিবে। অরণ্য হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় সেগুলি আমাদের কাজে লাগিবে। চল এখন অরণ্য অভিমুখে অগ্রসর হই!'

মিছিল করিয়া সকলে আমরা অরণ্য অভিমুখে অগ্রসর হইয়া গেলাম। সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি সেই অরণ্যে হস্তী-হস্তিনীর অভিনয় করিয়া আমাদের কাটিয়া গেল। সত্যই সেদিন আমরা মদমত্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। পরদিন প্রভাতে জোনাফুদিন আমাদের সকলকে পাথরা নদীতে লইয়া গেল। পাথরা নদী উপল-বহুল। জোনাফুদিন প্রত্যেক স্ত্রীলোককে একটি করিয়া বড় উপলখণ্ড কুড়াইয়া লইতে বলিল। একটি করিয়া উপলখণ্ড হস্তে লইয়া জোনাফুদিনের আদেশে তাহারা আবার অরণ্য অভিমুখে চলিতে লাগিল। আমরা, অর্থাৎ পুরুষরা গান গাহিতে গাহিতে তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলাম। জোনাফুদিন গানের একটি কলি গাহিতেছিল আমরা সেইটি সমস্বরে আবৃত্তি করিতেছিলাম। গানের ধুয়া—'প্রতি হস্তিনীর গর্ভে এবার হস্তী-শাবক আসিয়াছে, এস এইবার আমরা আনন্দ করি। মনুষ্য হস্তিনীর গর্ভে এবার প্রস্তর-হস্তী-শাবক আসিয়াছে, আর আমাদের ভয় নাই, এস আমরা আনন্দ করি।' প্রভাত আলোকে আমাদের সমবেত কণ্ঠের এই গান আর্তনাদের মতো শুনাইতেছিল। আসন্ন

অনশনের ভয়ে ভীত হইয়া আমরা চিৎকার করিতে করিতে চলিয়াছিলাম। জোনাফুদিন আশা দিয়াছিল ইহাতে সুফল ফলিবে। অরণ্যপ্রান্তে আসিয়া দেখিলাম বালকেরা আমাদের হস্তী-চর্মনির্মিত গাত্রাবরণগুলি এক স্থানে স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়াছে।

জোনাফুদিন বলিল, 'প্রতি স্ত্রীলোকের পেটে একটি করিয়া চর্ম বাঁধিয়া দেওয়া হোক। সেই চর্মের ভিতর প্রত্যেকে নিজের নিজের উপলখণ্ড রাখিয়া দাও। তাহার পর হস্ত ও পদের সাহায্যে চতুষ্পদ হস্তীর মতো হাঁটিতে হাঁটিতে আমার অনুসরণ কর। আমরা এইবার সেই হস্তী-প্রস্তরের নিকট যাইব।'

প্রায় শতাধিক স্ত্রীলোক উদরসংলগ্ন চর্মাবরণের ভিতর উপলখণ্ড লইয়া চতুষ্পদ হস্তীর মতো জোনাফুদিনের অনুসরণ করিতে লাগিল। জোনাফুদিন গান গাহিতেছিল—'হস্তিনীরা এইবার হস্তিশাবক প্রসব করিবে, এস এইবার আমরা আনন্দ করি। মনুষ্য-হস্তিনীরা এইবাব প্রস্তর-হস্তী-শাবক প্রসব করিবে, আর আমাদের ভয় নাই, এস আমরা আনন্দ করি। হস্তী-প্রস্তর তাহার শাবকগুলির জন্য ধৈর্যভরে নীরবে অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। চল, চল, আমরা শীঘ্র যাই।' চিৎকার করিতে করিতে জোনাফুদিনের স্বরভঙ্গ হইয়াছিল, তাহার রুক্ষ কেশ, জটিল শ্মশ্রু বিস্রস্ত অবিন্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার রগের শিরাগুলি স্ফীত, চক্ষু রক্তবর্ণ, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া তাহাকে উন্মত্তবৎ দেখাইতেছিল। তাহাব অনুকরণ করিযা আমরাও গান গাহিতেছিলাম। গান গাহিতে গাহিতে আমবা জোনাফুদিনকে এবং হস্তী-রূপিণী নারীযূথকে প্রদক্ষিণও করিতেছিলাম।

অবশেষে আমরা যখন হস্তীবৎ সেই কৃষ্ণ প্রস্তরটার নিকটবর্তী হইলাম জোনাফুদিন আদেশ করিল, 'হস্তিনী যেমন তাহাদের শাবককে প্রসব করে, তোমরাও তেমনি ওই উপলখণ্ডগুলি প্রসব কর। প্রসববেদনাতুরা হস্তিনীর অনুকরণ কর সকলে। ঠিকমতো যদি করিতে পার হস্তীর মতো বলশালী পুত্রলাভ করিবে।...'

সমস্ত স্ত্রীলোকেরা তখন সেই বৃহৎ কৃষ্ণ-প্রস্তরের পাদমূলে সমবেত হইয়া কুন্থন করিতে করিতে উপলখণ্ডগুলি প্রসব করিবার ভান করিল। একটি প্রস্তরের পাদমূলেই আমাদের তিন দিন কাটিয়া গেল।

তাহার পর পুনরায় আমরা গান গাহিতে গাহিতে সে উন্মুক্ত প্রান্তরে গেলাম, আবার তেমনি খোলা আকাশের নীচে শয়ন করিলাম। জোনাফুদিন ও অংঘী আবার আমাদের কানে কানে হস্তীর রূপ চিন্তা করিবার নির্দেশ দিয়া গেল, পুনরায় আমরা অরণ্যে গেলাম, অর্থাৎ প্রথমবার যাহা যাহা হইয়াছিল দ্বিতীয়বারও ঠিক সেই সবই হইল। তফাতের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা এইবার দ্বিতীয় কৃষ্ণপ্রস্তরের পাদমূলে সমবেত হইয়া উপল-প্রসব করিল। আমাদের এলাকায় সাতটি কৃষ্ণ প্রস্তর ছিল। সাতটিকেই কেন্দ্র করিয়া আমরা ওই একই ধরনের পূজা সাতবার করিলাম। কিন্তু কোনো ফল হইল না। হস্তী আরও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। মাঝে মাঝে তাহাদের দূরে দেখা যাইত, কিন্তু আমাদের দেখিলেই তাহারা দুর্গম অরণ্যের ভিতর অন্তর্ধান করিত। আমরা তীর এবং বর্শার দ্বারা দুই-একবার দুই-একটা হাতিতে আঘাতও করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আঘাতে তাহারা কাবু হয় নাই। পূর্বে তাহারা সংখ্যায় অনেক ছিল, একটা না একটাকে আমরা ঘিরিয়া ফেলিতে পারিতাম এবং একটা বড় হাতি শিকার করিতে পারিলে আমাদের অনেক দিন চলিয়া যাইত। কিন্তু এখন তাহাদের

সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল, ক্ষুধার তাড়নায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া আমরা চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিলাম।

অবশেষে একদিন একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটিয়া গেল। ক্ষুধিত জনতা জোনাফুদিনকে হত্যা করিয়া ফেলিল। শুধু জোনাফুদিনকে নয়, অংঘীকেও, তাহার পুত্রকন্যাদেরও। তাহাদেরই মাংস আমরা ভোজন করিলাম। তাহার পর সমবেত জনতা আমাকে দলপতি করিয়া বলিল, 'রাহুলা জোনাফুদিনকে চিনিতে পারিয়াছিল। সে বলিয়াছিল পূজা করিলে হাতি বশ মানিবে না। তাহাকে তীর মারিয়া বশ করিতে হইবে। সে তীর এমন হওয়া চাই যে, হাতির গায়ে বিঁধিলে হাতি আর নড়িতে পারিবে না। আমাকে যদি পুরোহিত করিয়া দাও আমি দেখাইয়া দিতে পারি। রাহুলার এসব কথা মনে আছে?'

বলিলাম, 'মনে আছে—'

'তাহা হইলে চল আমরা রাহুলার শরণাপন্ন হই। আমাদের হইয়া তুমিই তাহার কাছে যাও। সে শকুন পাহাড়ের গুহায় বাস করে শুনিয়াছি। অধিঙ্গা সম্প্রদায়ের লোকেবা বাহুলাব নিকট হইতে তীর লইয়া হস্তী শিকার করিতেছে। রাহুলা নিশ্চয়ই কোনো নূতন প্রকার তীব আবিষ্কার করিয়াছে। তুমি তাহার নিকট যাও, আর বিলম্ব করিও না।'

দশ দিন দশ রাত্রি অবিরাম হাঁটিয়া শকুন পাহাড়ে উপস্থিত হইলাম। পাহাড়েব পাদদেশ ঘন-বন-সমাচ্ছন্ন। কাছাকাছি মনুষ্যের বসতি আছে বলিয়া মনে হয় না, মাঝে মাঝে দুই একটা পাখির ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নাই। পাহাড়ের চূড়ার দিকে চাহিয়া মনে হইল একটা গুহার মতো কি যেন দেখা যাইতেছে। একটা পথও যেন বিসর্পিত রেখায় উঠিয়া গিয়া গুহার দ্বারে শেষ হইয়াছে। ভাবিলাম, পাহাড়ের পাদদেশে ওই পথের আরম্ভ নিশ্চয়ই কোথাও আছে। চতুর্দিকে ঘুরিয়া কিন্তু তাহার কোনো সন্ধান পাইলাম না। পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইতে গেলেই কণ্টকময় দুর্ভেদ্য অরণ্য পথরোধ করে। তবু ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, কারণ নিরস্ত হইলে চলিবে না। সহসা দেখিলাম একটু দূরে রক্তবদনা রুক্ষকেশিনী একটি নারী গুঁড়ি মারিয়া ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল শোণিতবর্ণে রঞ্জিত, মস্তকের চুল চমরী-পুচ্ছের ন্যায়। আমিও নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে সেই ঝোপের সমীপবর্তী হইলাম। সন্তর্পণে গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, মেয়েটি মাকড়সা ধরিতেছে। ঝোপের মধ্যে অসংখ্য মাকড়সার জাল। দুইটি কাঠির সাহায্যে মেয়েটি অতি নিপুণতার সহিত মাকড়সা ধরিয়া একটি চামড়ার থলিতে পুরিতেছিল। আমি কোনো শব্দ করি নাই, কিন্তু তবু কি করিয়া জানি না সে আমার সান্নিধ্য টের পাইল। হঠাৎ ঘাড় ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিয়া তাহার পর কথা বলিল।

'কে তুমি?'

'আমি জলৌকা সম্প্রদায়ের দলপতি। রাহুলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। তুমি কে?'

'আমি দুস্তীর্ণা। রাহুলার সহিত দেখা করিতে হইলে দুইটি বন্য মোরগ, ছয়টি বন্য কপোত এবং কিছু মধু দিতে হইবে।'

'কাহাকে দিতে হইবে?'

'আমাকে। আমার সাহায্য ব্যতীত কেহ রাহুলার নিকট যাইতে পারে না।'

'কেন?'

'কারণ আমি ছাড়া আর কেহ পথ জানে না।'

একবার ইচ্ছা হইল বলি, 'রাহুলাকে গিয়া বল যে তাহার স্বামী তাহার সহিত বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করিতে আসিয়াছে'—কিন্তু পরমুহূর্তেই সে ইচ্ছা দমন করিলাম। আশঙ্কা হইল ইহাতে বিপরীত ফল ফলিতে পারে।

বলিলাম, 'যাহা তুমি চাহিতেছ তাহা দিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমি বিদেশি, সহসা বন্য কপোত, বন্য মোরগ, মধু কি করিয়া সংগ্রহ করিব?'

'উপায় বলিয়া দিতেছি। পাহাড়ের ওপারে খঞ্জন সম্প্রদায়ের গ্রাম আছে। তাহারা কপোত, মোরগ ও মধু আমার জন্যই সংগ্রহ করিয়া রাখে। তুমি যদি তোমার কণ্ঠের ওই ঝিনুকের মালা দুইটি তাহাদের দাও এখনই কপোত, মোরগ ও মধু পাইবে।'

'তাহাতে কিন্তু বিলম্ব হইবে। আমি রাহুলার সহিত অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিতে চাই। আমি আমার ঝিনুকেব মালা দুইটি তোমাকেই দিতেছি, তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সংগ্রহ করিয়া লইও।'

দুস্তীর্ণার নাকের ভিতর হইতে ঘড় ঘড় করিয়া একটা শব্দ হইল, তাহার পর দন্তবিকাশ করিয়া সে হাসিয়া ফেলিল।

'সংগ্রহ করিয়া লইবার অবসর আমারও নাই। রাহুলার জন্য পোকা-মাকড় সংগ্রহ করিতেই আমার সমস্ত দিন কাটিয়া যায়। লেধুকে পাঠাইতে পারি, কিন্তু সে কিছু না দিলে যাইতে চাহিবে না। তোমার বাহুলগ্ন মালা দুইটিও তাহা হইলে দাও।'

'লেধু কে?'

'আমার পুরুষ।'

তৎক্ষণাৎ ঝিনুকের মালাগুলি তাহাকে খুলিয়া দিলাম। লোভীর মতো হাত বাড়াইয়া দুস্তীর্ণা সেগুলি লইল এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিধান করিল।

'চল এইবার তোমাকে রাহুলার নিকট লইয়া যাই। তুমি বুকে ভর দিয়া হাঁটিতে পারিবে তো?'

'পারিব।'

'আমার অনুসরণ কর।'

কিছুদূর গিয়া দুস্তীর্ণা বলিল, 'দাঁড়াও, এইবার তোমার চোখ বাঁধিয়া দিব।'

'কেন?'

'পথের সন্ধান কাহাকেও জানাইবার ইচ্ছা নাই।'

একটি গাছে বৃহৎ পত্রসমন্বিত একটি লতা উঠিয়াছিল। দুস্তীর্ণা সেই লতা ছিঁড়িয়া আনিল। লতার বড় বড় পাতায় আমার চক্ষু দুইটি ঢাকিয়া দিয়া লতা দিয়া সেগুলি বাঁধিয়া দিল।

'এইবার আমার হাত ধরিয়া চল।'

চলিলাম। বড় অদ্ভুত মনে হইতে লাগিল। এরূপ পরিস্থিতিতে জীবনে আর কখনও পড়ি নাই। কিছু দূরে গিয়া একটা কথা মনে হইল। সে জন্য এত কষ্ট, এত হীনতা স্বীকার করিতেছি সে সম্বন্ধে দুস্তীর্ণাকে তো কোনো কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

'রাহুলা যে বিশেষ রকম তীর প্রস্তুত করিয়াছে শুনিয়াছি তাহা কি উপায়ে পাওয়া যায়?'

'রাহুলার নিকট ভিক্ষা করিতে হইবে। রাহুলার যদি ইচ্ছা হয়, দিবে। অধিকাংশ লোককেই দেয় না। অধিঙ্গা সম্প্রদায়ের দলপতি কিছু দিন আগে কয়েকটা তীর লইয়া গিয়াছে।'

'কি করিয়া সে তীর প্রস্তুত করিতে হয় জান তুমি?'

'কিছু কিছু জানি, সবটা জানি না।'

'যতটুকু জান বল না, শুনি।'

'বলিব না।'

বিদ্যার বলে সেদিন দুস্তীর্ণা আমাকে পরাভূত করিয়াছিল। আমি দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ, আমার গায়ে অসুরের শক্তি। দুস্তীর্ণা তন্বী। তাহার ধৃষ্টতার জন্য একটি চপেটাঘাতেই তাহাকে চিরদিনের মতো নীরব কবিয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু সে সাহস ছিল না, বাধ্য হইয়া তাহার স্পর্ধা সহ্য করিতেছিলাম, কারণ যে জ্ঞানের ওপর আমাদের সম্প্রদায়ের জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছিল, সে জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি ছিল দুস্তীর্ণাব হাতে। তাহাকে হত্যা করিলে নিজেরই সমূহ ক্ষতি।

'তোমাকে যদি আরও ঝিনুকের মালা আনিয়া দিই, তাহা হইলেও বলিবে না?'

'একথা প্রকাশ করিলে রাহুলা আমাকে হত্যা করিবে। এইজন্যই সে উৎকটাকে হত্যা করিয়াছে।'

'হত্যা করিয়াছে? কি প্রকারে?'

'তীর মারিয়া। রাহুলার তীর অব্যর্থ এবং অমোঘ।'

'বাহুলা এসব কোথায় শিখিয়াছে?'

'জানি না।'

'রাহুলা তাহাব এ বিদ্যা কাহাকেও শিখাইবে না?'

'একটি মাত্র লোককে সে শিখাইবে বলিয়াছে।'

'কে সে?'

'তাহার স্বামী, যে স্বামী তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছিল। সে যদি আসিয়া তাহার গুহাদ্বারে নতজানু হইয়া ভিক্ষা করে...'

'তাহার স্বামী কোথায় থাকে জান তুমি?'

'জানি না। রাহুলা কাহাকেও সে কথা বলে না।'

'রাহুলা আর বিবাহ করে নাই?'

'না। কোনো পুরুষের সংস্রবেই সে আসে না। সে ওই গুহায় একা একা থাকে আর তীরে মাখাইবার ঔষধ প্রস্তুত করে। আমরা তাহাকে সাহায্য করি, উৎকটা তো মরিয়া গিয়াছে, এখন আমি একাই সাহায্য করি।'

'তোমাদের সহিত রাহুলার সম্পর্ক কি?'

'কোনো সম্পর্ক নাই। আমরা পাহাড়ের ওপারে থাকি, রাহুলার ফরমাশ খাটি...'

'কেন?'

'এমনি।'

বুঝিলাম আসল কারণটা দুস্তীর্ণা প্রকাশ করিবে না।

আরও কিছুক্ষণ পথ অতিবাহন করিবার পর দুস্তীর্ণা বলিল, 'এইবার থাম, তোমার চোখ খুলিয়া দিই।'

খুলিয়া দিল। দেখিলাম বনের ভিতর অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত একটা স্থানে দাঁড়াইয়া আছি। তাহার পর আবার বন শুরু হইয়াছে। দুস্তীর্ণা বলিল, 'ওই বনের ভিতর সোজা হাঁটিবার উপায় নাই। অত্যন্ত ঘন কুলবন। গিরগিটির মতো বুকে হাঁটিয়া ওই বনটুকু পার হইয়া যাও, তাহা হইলে পাহাড় পাইবে। পাহাড়ের কাছাকাছি আসিলে পাহাড়ে উঠিবার পথও দেখিতে পাইবে। যাও—'

'তুমি আসিবে না?'

'না। আমি যে তোমাকে পথ বলিয়া দিয়াছি একথা যেন রাহুলাকে বলিও না। বলিবে না তো?'

দুস্তীর্ণাব চোখের দৃষ্টি শঙ্কাতুর হইয়া উঠিল।

'তুমি যখন ব'রণ করিতেছ বলিব না। কিন্তু কেন বল তো?'

'রাহুলা চায় না যে লোকে গিয়া তাহাকে বিরক্ত করুক। যেদিন অধিঙ্গা সম্প্রদায়ের দলপতিকে পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিলাম, সেইদিনই রাহুলা আমাকে বারণ করিয়া দিযাছিল। তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করে, তুমি বলিও যে উৎকটার প্রেতাত্মা আসিয়া তোমাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছে। আমার নাম বলিও না।'

'রাহুলার বারণ সত্ত্বেও তুমি পথ দেখাইলে কেন?'

'আমি পথ না দেখাইলে তুমি রাহুলার নিকট পৌঁছিতে পারিতে কি? আর আমিও কি বন্য মুরগি, বন্য কপোত, মধু পাইতাম?'

দুস্তীর্ণার হাসি সহসা আকর্ণবিস্তৃত হইয়া উঠিল।

'রাহুলাকে আমার কথা বলিও না কিন্তু।'

'বেশ, বলিব না। গুহার নিকট গেলেই কি তাহার সহিত দেখা হইবে?'

'তাহার সহিত দেখা হইবে না। গুহার বেশি নিকটেও যাইও না। বিযাক্ত সাপ, বিছে, মাকড়সা প্রভৃতি গুহার কাছে ছড়ানো আছে।'

'জীবন্ত?'

'জীবন্ত নয়, কিন্তু পায়ে যদি হাড়-টাড় ফুটিয়া যায়, অসুস্থ হইযা পডিবে, তাই সাবধান করিয়া দিলাম।'

'তুমি কি রাহুলার জন্যই মাকড়সা ধরিতেছিলে?'

দুস্তীর্ণার চোখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল।

'তুমি দেখিয়া ফেলিয়াছ নাকি! হ্যাঁ, রাহুলার জন্যই।'

'ইহার বদলে রাহুলা তোমাকে কি দেয়?'

'তীর। সেই তীর লইয়া লেধু হস্তী শিকার করে।'

'ও।'

কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলাম। ব্যাপারটা ক্রমশ যেন স্পষ্টতর হইতেছিল।

'সাপ আর বিছে কি রাহুলা নিজেই ধরে?'

'না। সাপ আগে উৎকটা ধরিত, এখন হংকী ধরে।'

'কি করিয়া সাপ ধরে সে? ফাঁদ পাতে নাকি!'

'সে এক অদ্ভুত উপায়ে ধরে। তাহার হাত দুইটাই সাপের মতো লিকলিকে। তাহাতে সে যখন রং মাখায় তখন ঠিক সাপের মতোই দেখিতে হয়। হংকী ঘাসের মধ্যে লম্বা হইয়া শুইয়া তাহার হাত দুইটা ঠিক সাপের মতো আঁকাইতে বাঁকাইতে থাকে আর মুখে সাপের মতো শব্দ করে। কাছাকাছি সাপ থাকিলে সে সাপ তাহার হাতের কাছে আসিয়া পড়ে, তাহারা তাহার হাত দুইটাকে সাপই মনে করে। হংকী হাত দিয়া সাপের ফণার অদ্ভুত নকলও করিতে পারে। হাতের কাছে সাপ আসিলেই টপ করিয়া ধরিয়া ফেলে সে..'

এই পর্যন্ত বলিয়া দুস্তীর্ণা থামিয়া গেল।

'তুমি ভয়ানক লোক তো। কথার পিঠে কথা বলিয়া আমাদের ভিতরের খবর সব জানিয়া লইতেছ। যাও, আব তোমার কথার জবাব দিব না। যাও, পাহাড়ে উঠিয়া যাও।'

'রাহুলা যদি আমার সহিত দেখা না করে কি করিয়া তাহার সহিত আলাপ কবিব?'

"তুমি গুহার কাছাকাছি আসিয়া চিৎকাব করিয়া বলিও, 'রাহুলা, রাহুলা, বড় বিপদে পড়িয়া তোমার কাছে আসিয়াছি, আমার কথা দয়া করিয়া শোন।' গুহার ভিতর হইতে রাহুলা উত্তর দিবে। গুহার দেওয়ালে একটা ছিদ্র আছে সেই ছিদ্র দিয়া রাহুলা তোমাকে দেখিতেও পাইবে।"

'রাহুলা যদি উত্তর না দেয়?'

'অনেক সময় রাহুলা ঘুমাইয়া থাকে। কয়েকবার ডাকাডাকি করিয়াও যদি উত্তর না পাও বুঝিবে রাহুলা তোমার সহিত কথা কহিবে না। তোমাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে।'

'যদি না ফিরি?'

'রাহুলার অমোঘ তীর তোমাকে ফিরিতে বাধ্য করিবে।'

'ফিরিয়া তোমাকে আবার এইখানেই পাইব তো?'

'পাইবে।'

পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। দুস্তীর্ণার কথাগুলি কানে বাজিতেছিল—'তাহার যে স্বামী তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছিল সে যদি আসিয়া গুহাদ্বারে নতজানু হইয়া ভিক্ষা করে...'

'রাহুলা'—গুহাদ্বারে পৌঁছিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলাম। ভিতর হইতে কোনো সাড়া আসিল না।

'রাহুলা—'

কোনো সাড়া নাই, ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম সাপের চামড়া, মৃত কাঁকড়াবিছা, গাছের শিকড় প্রভৃতি চতুর্দিকে ছড়ানো রহিয়াছে। হঠাৎ চমকাইয়া উঠিলাম। গুহার ভিতর হইতে একটা তীর শাঁ করিয়া আমার পাশ দিয়া চলিয়া গেল, দেখিলাম পাহাড়ের উপত্যকায় গিয়া একটি রোমশ পাহাড়ি ছাগের গায়ে সেটি বিদ্ধ হইল। ছাগটাকে প্রথমে আমি দেখিতে পাই নাই, তীর দেখিয়া আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। দেখিলাম তীরটি তাহার পিছনের একটা পায়ে গাঁথিয়া গিয়াছে এবং সে চিৎকার করিতে করিতে ছুটিতেছে। বেশি দূর কিন্তু ছুটিতে পারিল না, কিছু দূর গিয়া পড়িয়া গেল।

'আমি জানিতাম তোমাকে আসিতে হইবে।'

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম গুহাদ্বারে রাহুলা দাঁড়াইয়া আছে। কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম, বাম হস্তে

ধনু, দক্ষিণ হস্তে একটা তীর। শরীরের উপরার্ধ আবরণহীন। লক্ষ্য করিলাম তাহার নারীত্বের সমস্ত চিহ্ন অবলুপ্ত হইয়াছে। স্তনযুগল শুষ্ক, মুখভাবে নারীসুলভ কমনীয়তা নাই, মাথার চুল চূড়ার মতো করিয়া বাঁধা, চক্ষুর দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক তীব্রতা। আমি বিহ্বল হইয়া চাহিয়া রহিলাম।

'কেন আসিয়াছ তাহাও জানি'—রাহুলাই পুনরায় কথা বলিল। আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

'জোনাফুদিন মরিয়াছে?'

'হ্যাঁ।'

'মরিবে জানিতাম। কি করিয়া মরিল? অনাহারে?'

'সকলে তাহাকে হত্যা করিয়াছে।'

'বেশ করিয়াছে। এখন দলপতি কে?'

'আমি। তোমার সাহায্য পাইব এই আশাতেই উহারা আমাকে দলপতি কবিয়াছে। হস্তী শিকার করিবার কৌশল তুমি যদি আমাকে না শিখাইয়া দাও আমাকেও হয়তো উহারা মারিয়া ফেলিবে।'

রাহুলা চুপ করিয়া রহিল। তাহার চোখের তীব্র দৃষ্টিতে একটা চাপা কৌতুক মিশিয়া তাহাকে যেন আরও শাণিত করিয়া তুলিল।

'অধিঙ্গা সম্প্রদায়ের দলপতি তোমার নিকট হইতে কিছু তীর লইয়া গিয়া হস্তী শিকার করিতেছে। আমাকেও যদি সেই প্রকার তীর কিছু দাও—'

'অধিঙ্গা সম্প্রদায়ের দলপতি নিতান্ত না-ছোড়-বান্দা বলিয়া কয়েকটি তীর দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়াছি। সেই তীরগুলি নিঃশেষ হইয়া গেলে তাহাকে আবার বিপন্ন হইতে হইবে। কয়েকটি তীর লইয়া বিশেষ কিছু লাভ হয় না। তীর প্রস্তুত করিবার প্রণালী জানিলেই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।'

'সেই প্রণালীটিই তাহা হইলে আমাকে শিখাইয়া দাও।'

রাহুলার দৃষ্টি হইতে পুনরায় কৌতুকবহ্নি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাহুলা বলিল, 'সামান্য কুক্কুরীর মতো তুমি আমাকে দূব করিয়া দিয়াছিলে। মনে আছে?'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

'কথার উত্তর দাও। মনে আছে?'

'আছে। আমি ঘোর অপরাধ করিয়াছিলাম রাহুলা। কিন্তু কেন করিয়াছিলাম তাহাও তুমি জান। জোনাফুদিনকে চটাইবার উপায় আমার ছিল না। প্রকৃত অপরাধী জোনাফুদিন, তাহাকে আমরা শাস্তি দিয়াছি। তুমি প্রসন্ন হও—'

'তুমি আসিবে তাহা আমি জানিতাম। আমার মা পুরোহিত ঘোনজার নিকট বিষক্রিয়ার রহস্য কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন। তাঁহার নিকটেই আমি শুনিয়াছিলাম তীরে বিষ মাখাইয়া দিলে বড় বড় জন্তুকে অনায়াসে কাবু করা যায়। তোমার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া আমি নানাপ্রকার বিষ লইয়া পরীক্ষা করিয়াছি, পুরোহিত ঘোনজার বহু সেবা করিয়া তাঁহার নিকট হইতেও বহু জিনিস পাইয়াছি। তুমি আসিবে তাহা আমি জানিতাম, তাই আমি শিখিয়াছি

কোন্ বিষ দিয়া হস্তীকে চলচ্ছক্তিহীন করিয়া ফেলা যায়, কোন্ বিষ দিয়া হস্তীকে হত্যা করা সম্ভব। সামান্য একটু বিষ তীরের মুখে লাগাইয়া দিলেই হইল। সে বিষ হস্তীকে মারিবার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু সে বিষে মানুষের কিছু হইবে না। তুমি আসিবে তাহা আমি জানিতাম, তাই ইহা যত্ন করিয়া এতদিন শিখিয়াছি। ওই ছাগটাকে দেখ, ওটা মরে নাই, চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে, ওটাকে এখন অনায়াসে টানিয়া আনা যাইবে। বাঘে লইয়া যাইবার পূর্বে চল আমরাই গিয়া ওটাকে লইয়া আসি...'

রাহুলা ত্বরিতপদে পাহাড় বাহিয়া নামিতে লাগিল। আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম।

...জীবন্ত ছাগটাকে টানিতে টানিতে লইয়া আসিতেছিলাম। রাহুলা আমার পিছনে পিছনে আসিতেছিল। এতক্ষণ উভয়েই কোনো কথা বলি নাই। এইবার আমি কথা বলিলাম।

'রাহুলা, আমাকে শিখাইয়া দিবে না?'

'যদি বলি দিব না?'

আমরা গুহার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। রাহুলা প্রশ্নটা করিয়া আমার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। অর্ধমৃত চলচ্ছক্তিহীন ছাগটাকে একধারে রাখিয়া আমি রাহুলার মুখের দিকে চাহিলাম। রাহুলার দৃষ্টিতে যেন ব্যঙ্গ ও কৌতুকের বহ্ন্যুৎসব হইতেছিল। সে দৃষ্টি যেন নীরব ভাষায় বলিতেছিল—'আমার কাছে না আসিয়া তুই যাইবি কোথায়? আসিতেই হইবে। একবার নয়, বার বার আসিতে হইবে।'

তাহার দৃষ্টির সম্মুখে আমার পৌরুষ যেন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। মনে মনে অপমানিত বোধ করিলাম। কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশ করিবার উপায় ছিল না।

বলিলাম, 'আমার অবস্থা এখন এই চলচ্ছক্তিহীন ছাগের মতো। ইচ্ছা করিলে তুমি আমাকে মারিতেও পার, রাখিতেও পার।'

রাহুলা কোনো উত্তর দিল না।

'শিখাইয়া দিবে না?'

রাহুলা সহসা চিৎকার করিয়া উঠিল, মনে হইল যেন আর্তনাদ করিতেছে। কোনো কথা নাই, কেবল চিৎকার। পর্বত বিদীর্ণ করিয়া ঝরনাধারা যেমন নির্গত হয়, মনে হইল, তেমনি একটা কিছু বিদীর্ণ হইয়া যেন এই শব্দধারা বাহির হইতেছে। সমস্ত আকাশ-বাতাস যেন কাঁপিতে লাগিল।

'অমন করিতেছ কেন রাহুলা? কি বলিবে, বল। কথা বল, আমাকে কি শিখাইয়া দিবে না?'

•

সহসা যেমন সে চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, সহসা তেমনি আবার প্রকৃতিস্থও হইল। তীব্র দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'তোমাকে শিখাইব বলিয়াই তো যত্ন করিয়া নিজে শিখিয়াছি। কিন্তু অত সহজে শিখাইব না। তোমার জন্য যে নিদারুণ কষ্ট আমি ভোগ করিয়াছি, যে অপমান, যে লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছি তাহার কিছুটা তোমাকেও ভোগ করিতে হইবে।'

'কি করিতে হইবে বল?'

আদেশের ভঙ্গিতে তীক্ষ্ণকণ্ঠে রাহুলা বলিল, ''নতজানু হও। গুহার সম্মুখে হাত জোড় করিয়া ক্রমাগত অহোরাত্র বলিতে থাক—'রাহুলা, দয়া কর, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, তুমি

দয়া না করিলে আমি বাঁচিব না, দয়া কর, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমাকে শিখাইয়া দাও। আর কখনও তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করিব না, আমাকে বাঁচাও।' তোমার এই প্রার্থনা শুনিয়া যদি আমার দয়া হয় শিখাইয়া দিব, যদি না হয় দিব না—"

রাহুলা গুহার মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

আমি গুহার সম্মুখে নতজানু হইয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলাম, 'রাহুলা, দয়া কর, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, তুমি দয়া না করিলে আমি বাঁচিব না...'

কোথায় সেই রাহুলা, কোথায় সেই হস্তী-যূথ, কোথায় সেই বিষের থলি যাহা লইয়া আমি একদা দিগ্বিজয় করিয়াছিলাম? কেহ নাই, কেহ থাকিবে না। থাকিব কেবল আমি। আমি! আমিই বা কে? তাহা জানি না। শুধু জানি আমিই চলিয়াছি। আমাকে কেন্দ্র করিয়া এক এক দল নর-নারী আসিয়াছে আবার চলিয়া গিয়াছে। অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ কখনও সঙ্কীর্ণ কখনও প্রশস্ত হইয়াছে। কখনও পর্বত, কখনও নদী, কখনও অরণ্য, কখনও হ্রদ...প্রস্তরের অস্ত্রশস্ত্রের নানা বিবর্তন, পরিবর্তন...জোলমার স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু অবলুপ্ত হয় নাই...অন্ধকার গুহা-পথে জোলমাকেই যেন খুঁজিতেছি, জোলমাকে লাভ করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতেছি, জ্ঞাতসারে না অজ্ঞাতসারে...।

...নূতন বাঁকে নূতন জীবন শুরু হইয়াছে আবার।

'হো, হো, হৈইই—হো-ও-ও।'

অন্ধকার রাত্রিকে সচকিত করিয়া অরণ্যপ্রান্তে দাঁড়াইয়া চিৎকার করিতেছি। আমি যেই থামিলাম, অমনি কিছু দূরে আর একজন শুরু করিল, 'হো, হো, হৈইই—হো-ও-ও।' সে থামিলে আর একজন শুরু করিবে। সমস্ত বন ঘিরিয়া আমাদের দল দাঁড়াইয়া আছে। বন্য গরুর দল তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছি। বন বলিতেছি বটে, কিন্তু বন বলিতে যাহা বুঝায় ইহা ঠিক তাহা নয়। এ বনে বৃক্ষ নাই। ঘাসের বন। লম্বা লম্বা ঘাসে দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর পরিপূর্ণ। বনের মধ্যে গরুর দল রহিয়াছে, আর তাহাদের ঘিরিয়া রহিয়াছি আমরা। গরুগুলি সাধারণ গরু নয়, মহা-গরু। উচ্চতায় প্রায় হাতির সমান। প্রকাণ্ড শিং দুইটি মাথার উভয় দিকে। আমরা দিনের পর দিন মাসের পর মাস ইহাদের অনুসরণ করিতেছি। আমাদের কৌশল আমরা ইহাদিগকে ক্রমাগত তাড়াইয়া লইয়া যাইব, একদণ্ড স্থির থাকিতে দিব না। অবিরাম চলিতে চলিতে এক একটা গরু পরিশ্রান্ত হইয়া দল ছাড়া হইয়া যায়, ক্রমশ সে আর চলিতে পারে না, তখন সেটাকে আমরা দখল করি।

'হো-হো-হৈইই—হো-ও-ও।'

চিৎকার করিয়া আমি উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। আমার পরেই যাহার চিৎকার করিবার কথা সে কিন্তু এবার আর চিৎকার করিল না। আমি তখন আর একবার চিৎকার করিয়া ছুটিয়া গেলাম অনুসন্ধান করিবার জন্য। গিয়া দেখিলাম পরিশ্রান্ত নাভিলা শুইয়া পড়িয়াছে। তাহার মুখ দিয়া আর কথা সরিতেছে না। ইহাই আশঙ্কা করিয়াছিলাম। পরমুহূর্তেই শুনিতে পাইলাম· 'হো-হো-হৈই—আগাও—আগাইয়া চল—আগাইয়া চল।' দলপতির কণ্ঠস্বর। তাহার আদেশ মুখে মুখে চতুর্দিকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নাভিলা করুণ-দৃষ্টিতে আমার মুখের

দিকে চাহিল একবার। বুঝিল তাহাকে ফেলিয়া আমরা এবার চলিয়া যাইব। সে-ও অনেককে ফেলিয়া আসিয়াছে। আমাদের থামিবার উপায় নাই। আমরা নিজেরাও থামিব না, গরুর দলকেও থামিতে দিব না। যে দুর্বল, যে অসমর্থ (মানুষই হোক বা গরুই হোক) সে পথের প্রান্তে পড়িয়া থাকিবে। মৃত্যুই তখন তাহার একমাত্র গতি। যাহারা শক্তিমান তাহারা আগাইয়া যাইবে। অনুসৃত ও অনুসরণকারী এই একই নীতির খরস্রোতে সেদিন ভাসিয়া চলিয়াছিলাম। থামিবার উপায় ছিল না।

'হো-হো-হৈই—আগাও—আগাইয়া চল'—নাভিলাকে ফেলিয়া আগাইয়া গেলাম। খিংখু ও নিমার কথা মনে পড়িল। তাহাদেরও ফেলিয়া আসিয়াছি। খিংখু আমার ভাই, নিমা আমার স্ত্রী।

...সমস্ত রাত্রি চিৎকার করিতে করিতে আগাইয়া গেলাম। প্রভাতে আসিয়া যেখানে উপস্থিত হইলাম সেখানে দেখিলাম কিছু গাছও আছে। নিশ্চিন্ত হইলাম। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে পারা যাইবে। দলপতি কাংড়া তাহার সহচরদের লইয়া প্রতি গাছে গাছে উঠিয়া এখন বিতাড়িত পশুর দলকে পর্যবেক্ষণ করিবে। তাহার পর তাহার নির্দেশ অনুসারে আমরা হয় এখানে অপেক্ষা করিব, কিংবা পুনরায় চলিতে শুরু করিব। মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম দুই-চারিটা আসন্ন-প্রসবা গাভী যেন কাংড়ার চোখে পড়ে। আসন্ন-প্রসবা গাভী থাকিলে কাংড়া অপেক্ষা করিবে। বাছুরগুলি একটু বড় হইয়া ছুটিতে না পারা পর্যন্ত আমরা এখানে বিশ্রাম করিতে পাইব। আমরা সমস্ত স্থানটা ঘিরিয়া রাখিয়া তাহাদের আগলাইয়া রাখিব, রাত্রে মাঝে মাঝে আগুন জ্বালিয়া তাহাদের পাহাবা দিব, কিন্তু আর চলিতে হইবে না। ক্রমাগত হাঁটিয়া সকলে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

'হো-হৈ-ই—হো-ও—হো-ও-ও—'

একস্থানে বসিয়াই মাঝে মাঝে চিৎকার করিতেছি। সহসা বিদা ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল যে উলুমের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সে এখনই একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিয়াছে, কিন্তু তাহার বাঁচিবার আশা নাই। শ্বাস উঠিয়াছে। বলিয়াই সে চলিয়া গেল, আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম। গিয়া দেখিলাম উলুম মারা গিয়াছে। পাশেই সদ্যোজাত শিশুটা পড়িয়া চিৎকার করিতেছে। এরূপ ঘটনা পূর্বেও ঘটিয়াছে, ইহার পর যে কি করিতে হইবে তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। একটি গর্ত খুঁড়িয়া উলুমকে যথাবিধি কবর দিতে হইবে, সদ্যোজাত শিশুটাকেও তাহার বুকের উপর দিয়া দিতে হইবে। সেই ভ্রাম্যমাণ জীবনে একটা সদ্যোজাত মাতৃহীন শিশু লইয়া বিব্রত হইবার কল্পনাও কেহ করিত না। বিদা কিন্তু একটা অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিল। সে শিশুটাকে বুকে তুলিয়া লইয়া বলিল, 'ইহাকে আমি ছাড়িব না। এ যতক্ষণ বাঁচিয়া আছে, আমারই বুকে থাকিবে।' আমরা বিদার এই অসমসাহসিকতায় ভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম মনে আছে। দলপতি কাংড়ার নির্দেশ অগ্রাহ্য করা অতিশয় কঠিন ব্যাপার ছিল। দলের জন্য সে যে সব নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছিল তাহার ব্যতিক্রম হইতে বড় একটা দেখা যায় নাই। কাংড়া বলিত, 'আমার নিয়ম যদি না মানিতে পার দল ছাড়িয়া চলিয়া যাও। নিয়ম বদলাইবে না।' দলবদ্ধ হইয়া না থাকিলে সে যুগে জীবনধারণ করা অসম্ভব ছিল। একটা দল ত্যাগ করিয়া অন্য দলে ঢোকাও সহজ ছিল না। কারণ কোনো দলই আগন্তুককে সহসা প্রশ্রয় দিত না। বহু দূর উত্তরে শীতপ্রধান অঞ্চলে মীহার দল বাইসন শিকার করে।

তাহার দলে ঢোকা না কি সহজ, কারণ বাইসনদের তাড়াইয়া লইয়া যাইতে বহু লোকের প্রয়োজন হয়, অনেক লোক মারাও যায়। কিন্তু মীহা কাংড়ার দলের কোনো লোককে লইতে চায় না। মীহার ধারণা যাহারা গরু তাড়াইয়া বেড়ায় বাইসন তাড়ানো তাহাদের কর্ম নয়। সুতরাং কাংড়ার দল ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে সহজ ছিল না। বিদাব মুখেব দিকে আমরা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। সে এ কি করিতে উদ্যত হইয়াছে! তাহাকে এ পাগলামি করিতে আমরা সকলেই বারণ করিতে লাগিলাম। ঝুঝু বলিল, 'স্ত্রীলোকের যখন অভাব নাই, সন্তানেরও অভাব হইবে না। ওটাকে কবরে ফেলিয়া দাও। উলুমের সন্তান উলুমের কাছেই থাকুক।' বিদা কিন্তু আমাদের কথা শুনিল না, কোনো প্রত্যুত্তব কবিল না, সদ্যোজাত শিশুটাকে বুকে আঁকড়াইয়া অবুঝের মতো বসিয়া রহিল। তাহার পর সহসা উঠিয়া বনের মধ্যে আত্মগোপন করিল। আমরা তাড়াতাড়ি গর্ত খুঁড়িয়া উলুমকে কবরস্থ করিলাম। কাংড়া ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই ব্যাপারটা সমাধা হইয়া গেল। তখন আমরা সকলে মিলিয়া স্থির করিলাম, কাংড়ার নিকট বিদার আচরণ আমরা গোপন রাখিব। কাংড়া নিজেই যদি আবিষ্কার করে করুক, আমরা কেহ বিদার নামে নালিশ করিব না। আমাদের মনে হইল দুই-একদিনের মধ্যেই শিশুটা অনাহারে মারা যাইবে, তখন তাহাকে লুকাইয়া পুঁতিয়া ফেলিলে কাংড়া জানিতে পাবিবে না। যে বিরাট অরণ্য-পরিবেশে যেভাবে আমরা ছড়াইয়া থাকিতাম তাহাতে সামান্য একটা শিশুকে লুকাইয়া রাখা মোটেই অসম্ভব ছিল না। অনেক সময় দিনের পর দিন আমাদের কাংড়ার সহিত দেখাই হইত না। অনেকের সহিতই হইত না। অদৃশ্য শব্দের বন্ধনে আমরা বাঁধা ছিলাম। হো—হৈ-ই—হো-ও—হো-ও-ও—এই ডাক আমাদের বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। এই ডাক শুনিলেই আমাদের প্রত্যেককেই একে একে অনুরূপভাবে সাড়া দিতে হইত। সাড়া শুনিয়া আমরা বুঝিতাম কে সাড়া দিল। সকলের কণ্ঠস্বর আমবা সকলে চিনিতাম। কাংড়ার শ্রবণশক্তি এ বিষয়ে অতিশয় প্রখর ছিল। আমাদের ওই বিবাট দলের মধ্যে কেহ সাড়া না দিলে কাংড়া তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিত।

...কিছুক্ষণ পরে কাংড়া ও তাহার প্রধান অনুচরেরা ফিরিয়া আসিয়া যাহা ব্যক্ত করিল তাহাতে আমরা খুশি হইলাম। কাংড়া বলিল, 'অনেকগুলি আসন্ন-প্রসবা গাভী আমরা দেখিতে পাইয়াছি। তাহাদের তাড়া দিয়া লইয়া গেলে একটাও বাঁচিবে না। তাহারা তো মরিবেই, তাহাদের পেটের বাছুরগুলাও বাঁচিবে না। অকারণে এতগুলি গাভী হত্যা করিবার প্রয়োজন নাই। একটি আসন্নপ্রসবা গাভী শ্রান্ত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে দেখিলাম। সেটাকে টানিয়া আনিতে হইবে। সেটা যদি মরিয়া যায়, তাহার মাংসটা আমরা সঞ্চয় করিয়া রাখিব। এখন আমাদের খাইবার মতো মাংস প্রচুর আছে। এই বনে দুই-চারিটা শশক এবং হরিণও আছে দেখিতেছি। সেগুলিও আমাদের কাজে লাগিবে। আমি ঠিক করিয়াছি যতদিন আসন্ন-প্রসবা গাভীগুলি প্রসব না করিতেছে, ততদিন আমরা এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইব না। বাছুরগুলি যখন ছুটিতে পারিবে, তখন আমরা আবার তাহাদের তাড়া দিব। আপাতত যে গাভীটা শুইয়া পড়িয়াছে, সেটাকে দখল করিয়া আমরা এই স্থানটাকে ঘিরিয়া রাখি এবং শশক-হরিণ শিকাব করিয়া আমাদের অবসর বিনোদন করি।'

আমরা সকলে হর্ষধ্বনি করিয়া কাংড়ার প্রস্তাব সমর্থন করিলাম।

...অর্ধমৃত গরুকে কবলিত করিবার জন্য আমরা শক্ত লতা পাকাইয়া খুব মজবুত ধরনের

লম্বা দড়ি প্রস্তুত করিতাম। তাহাতে একটা ফাঁসের মতো করিয়া দূর হইতে গরুর গলা লক্ষ্য করিয়া দড়িটা ছোঁড়া হইত। ফাঁসটা গরুর গলায় লাগিয়া গেলে আমরা সকলে মিলিয়া টানিতাম। অধিকাংশ সময়ে দমবন্ধ হইয়াই গরুটা মারা যাইত। কাংড়ার নির্দেশ অনুসারে সেদিন যখন আসন্ন-প্রসবা গাভীটাকে আমরা আনিতে গেলাম সেদিন ফাঁসটা দৈবাৎ গলায় না লাগিয়া পিঠ এবং সম্মুখের পদদ্বয় বেষ্টন করিয়া রহিল। টানিতেই ফাঁসটা পিঠ এবং কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে লাগিয়া গেল, গলায় লাগিল না। টানিতে টানিতে তাহাকে যখন আমরা নিজেদের আস্তানায় লইয়া আসিলাম তখনও দেখি সে জীবিত আছে। কাংড়া বলিল, 'উহাকে এখন মারিও না। ও যদি বাছুর প্রসব করে তাহা হইলে বাছুরটাকে আমরা সঙ্গে রাখিব। একটা বাছুরকে সঙ্গে রাখা খুব বেশি অসুবিধাজনক হইবে না। একটু বড় করিয়া বাছুরটাকে যদি মারি বেশি মাংস পাওয়া যাইবে। গাভীটার পায়ে শিঙে কোমরে ভাল করিয়া দড়ি জড়াইয়া এই গাছের সহিত বাঁধিয়া রাখ। দেখাই যাক না কি হয়।' প্রতিভাবান কাংড়া যে ব্যবস্থা করিয়া গেল সেই ব্যবস্থাটা যে ভবিষ্যতে মানব-সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবে, সেদিন তাহা আমরা কেহ কল্পনা করি নাই। বন্য গরু যে আমাদের আত্মীয় হইবে, তাহাকে হত্যা না করিয়া পালন করিলে যে আমরা আরও বেশি লাভবান হইব, তাহাকে ঘিরিয়া যে নব নব ধর্ম, নীতি, সমাজ গঠিত হইবে একথা মনে করিবার তখন কোনো হেতুও ছিল না। দলপতির আদেশ অমান্য করিবার সাহস ছিল না বলিয়াই সেই গাভীটিকে সেদিন আমরা হত্যা করি নাই, কাংড়ার এই অদ্ভুত খেয়ালে ববং বিস্ময়বোধই করিয়াছিলাম, অনেকে গোপনে হাস্যও কবিয়াছিল।

.গাভীটি কিন্তু জীবন্ত বাছুর প্রসব করিল না। কিছুক্ষণ ছটফট কবিবার পর গভীর রাত্রে সে প্রসব করিল বটে, কিন্তু বৎসটি জীবন্ত নহে, মৃত। মৃত বৎসটিকে আগুনে ঝলসাইয়া আমরা পবিতৃপ্তি সহকারে আহার করিলাম। কাংড়া বলিল, 'গাভীটা যতক্ষণ বাঁচিয়া থাকে থাক। এখন উহাকে হত্যা করিবার প্রয়োজন নাই। যতক্ষণ বাঁচিয়া থাকিবে ততক্ষণ মাংসটা পচিবার ভয় থাকিবে না।'

সে যুগে পশু-মাংসই ছিল আমাদের প্রধান খাদ্য। সেই খাদ্যকে যথাসম্ভব সাবধানে আমরা খরচ করিতাম। পশু পাইলেই তাহাকে হত্যা করার প্রবৃত্তি আমাদের তত ছিল না। তাহাকে ঘিরিয়া আগলাইয়া রাখিবার প্রবৃত্তিই প্রবলতর ছিল। সুতরাং কাংড়ার এই আদেশে আমরা তেমন বিস্ময়বোধ করিলাম না। বিস্মিত হইলাম আরও কিছুক্ষণ পরে।

...কাংড়া এবং তাহার অনুচরেরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। পশু-চর্মনির্মিত তাহার তাঁবুর সম্মুখে পাহারা দিতেছিল নাটা। আমি এবং আমার বন্ধুবান্ধবেরা সেই গাভীটাকে পাহারা দিতেছিলাম। হা হা হা হা হা শব্দ করিয়া দূরে হায়েনা ডাকিতেছিল। তীক্ষ্ণকণ্ঠ দুইটি নৈশ কীট অন্ধকারকে সচকিত করিয়া পরস্পর আলাপ কবিতেছিল। আমরা উৎকর্ণ সশস্ত্র হইয়া বসিয়াছিলাম। গাভীটিকে গ্রাস করিবার জন্য যে কোনো শ্বাপদ যে কোনো মুহূর্তে আসিয়া পড়িতে পারে, এই সম্ভাবনা আমাদের তন্দ্রা হরণ করিয়াছিল। দীর্ঘ ঘাসের জঙ্গল চতুর্দিকে, আশেপাশেই হয়তো কোনো ভীষণ জন্তু ওৎ পাতিয়া আছে। খস খস করিয়া একটা শব্দ হইল। তাহার পর একটা কান্না শুনিতে পাইলাম, পরমুহূর্তেই কান্নাটা চাপা কান্না হইয়া গেল। মনে হইল ক্রন্দমান ব্যক্তিটির মুখটা কে যেন চাপিয়া ধরিল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া

দাঁড়াইলাম। বাঘ বা নেকড়ে আসিল না, বিদা আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহাব বুকে সেই সদ্যোজাত শিশুটা। বিদা হাত দিয়া তাহার মুখটা চাপিয়া বহিয়াছে। তাহার চোখে মুখে একটা অসহায় ভীত ভাব।

'ব্যাপার কি বিদা?'—সকলে প্রায় এক সঙ্গেই আমরা প্রশ্নটা করিলাম।

'ইহার কান্না কিছুতেই থামাইতে পারিতেছি না।'

ঝুঝু বলিল, 'থামাইতে পারিবেও না। একটি মাত্র লোক উহাব কান্না থামাইতে পাবে।'

'কে?'

'উলুম। তাহার কাছেই উহাকে দিয়া দাও।'

বিদা বলিল, 'মুশকিল হইয়াছে কাংড়া যদি ইহার কান্না শুনিতে পায় ধরা পড়িয়া যাইব। ইহাকে যদি দুধ খাওয়াইতে পারিতাম তাহা হইলে কাঁদিত না। আহা, আমাদের দলে দুধ দিতে পারে এমন একটি মেয়েও যদি থাকিত!'

নীবারা আমাদের কাছে বসিয়াছিল। কিছুদিন আগে তাহার একটি সন্তান হইয়া মাবা গিয়াছে। বিদা তাহার দিকে চাহিতেই সে বলিল, 'আমার দুধ শুকাইয়া গিযাছে, তবু দাও দেখি।'

বক্ষের চর্মাবরণ খুলিয়া ফেলিয়া সে সদ্যোজাত শিশুটাকে স্তন্য পান করাইবার চেষ্টা কবিল। কিন্তু তাহাতে শিশুর ক্রন্দন থামিল না, বরং বাড়িয়া গেল। নীবাবাব স্তনে দুধ ছিল না। বিদা বলিল, 'জোহু, টালা, বিজঘারা, টিমানী, কিরখো, বুভা সকলেব কাছে আমি গিয়াছিলাম, কেহই ইহার কান্না থামাইতে পারিল না।'

ঝুঝু বলিল, 'উলুম পারিবে।'

বিদা নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শিশুর ক্রন্দন কিন্তু উত্তরোত্তব বৃদ্ধি পাইতেছিল, আমরা সকলেই মনে মনে অস্বস্তি-বোধ করিতেছিলাম, কাংড়া যদি জানিতে পাবে সর্বনাশ হইয়া যাইবে।

ঝুঝু বলিল, 'পাগলামি করিও না, ওটাকে উলুমেব কবরের ভিতর পুবিয়া মাটি চাপা দিয়া উহাকে নিশ্চিন্ত কর, উলুমকে নিশ্চিন্ত কর, আমাদের নিশ্চিন্ত কর। চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাইতেছি...'

বিদার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইযা গেল, চোখের দৃষ্টিতে ধক্ ধক্ করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। এক চপেটাঘাতে ঝুঝুকে সে ভূশায়ী করিয়া ফেলিল। ঝুঝুও ছাড়িবার পাত্র নয়, সে-ও নিমেষের মধ্যে উঠিয়া আক্রমণ করিল বিদাকে। বিদার বক্ষ হইতে শিশুটা ছিটকাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মশালটা নিবিয়া গেল। শিশুটা কোথায় যে পড়িল তাহা আমরা কেহ লক্ষ্য করিলাম না, বস্তুত শিশুটার সম্বন্ধে আমাদের তেমন আগ্রহই ছিল না, ঝুঝু ও বিদার দ্বন্দ্বটাই আমরা উপভোগ করিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু মশালটা নিবিয়া যাওযাতে চতুর্দিকে অন্ধকার হইয়া গেল। সকলে আমরা নীবারাকে অনুরোধ করিলাম।

'নীবারা মশাল আন একটা।'

দূরে দূরে মশাল জ্বলিতেছিল। তাহারই একটা হইতে আমাদেব মশালটা জ্বালাইয়া আনিবার জন্য নীবারা উঠিয়া গেল। ঝুঝু ও বিদা অন্ধকারেই ঝুটাপুটি কবিতে লাগিল। শিশুর ক্রন্দন কিন্তু বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, মনে হইতেছিল সে আর বাঁচিয়া নাই।

'কাংড়া আসিতেছে, কাংড়া, কাংড়া—'

মশাল হস্তে নীবারা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়াছিল। ঝুঝু ও বিদা নিমেষের মধ্যে পরস্পরকে ছাড়িয়া দিল। নিজেদের মধ্যে মারামারি করা কাংড়ার আইনে ভীষণতম অপরাধ। এবং সে অপরাধের শাস্তি মৃত্যু। নীবারা মশালটা আনিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিল। মশাল-আলোকে কিন্তু আমরা যাহা দেখিলাম তাহা সত্যই অদৃষ্টপূর্ব। বিদার শিশুটা সেই বন্য গাভীর স্তনে মুখ লাগাইয়া দুগ্ধপান করিতেছে। গাভীটাও ছটফট করিতেছে না, অর্ধনিমীলিত নেত্রে চুপ করিয়া শুইয়া আছে। তাহার পিছনের একটা পা আমরা দড়ি দিয়া গাছের ডালের সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছিলাম। সুতরাং তাহার স্তন উন্মুক্তই ছিল, বিদার শিশু ছিটকাইয়া বোধহয় তাহার স্তনের উপরেই পড়িয়াছিল। আমরা সকলেই বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া এই অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম। এমন সময় কাংড়া আসিয়া প্রবেশ করিল।

'কিছুক্ষণ হইতে একটা শিশুর ক্রন্দন শুনিতে পাইতেছি, কাহারও ছেলে হইয়াছে নাকি?'

আমরা সকলেই প্রমাদ গণিলাম। নীবারা কাংড়াব প্রিয়প্রাত্রী, তাহারই মুখের দিকে আমবা মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। সে দৃষ্টির অর্থ—তুমি আমাদের উদ্ধার কর। কোনো একটা ছুতা করিয়া কাংড়াকে এখান হইতে সরাইয়া লইযা যাও।

নীবারা বুদ্ধিমতী। কাংড়ার মুখের দিকে সহাস্য দৃষ্টি মেলিয়া সে বলিল, 'একটা শিশু আমরা কুড়াইয়া পাইয়াছি। ঘাসের মধ্যে পড়িয়া কাঁদিতেছিল। আমরা ওই গাভীটার স্তনে শিশুর মুখটা লাগাইয়া দেখিতেছিলাম দুধ খায় কি না। চমৎকার খাইতেছে। তুলিয়া লইব?'

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে কাংড়া শিশুটার দিকে চাহিয়াছিল। নির্বাক হইয়া অনেকক্ষণ চাহিয়াই রহিল, তাহার পর সহসা লাফাইয়া উঠিল। নীবারার কথা সে বোধহয় শুনিতেই পায় নাই।

'বাঃ, বাঃ চমৎকার, চমৎকার! এ ঘটনা যদি আগে ঘটিত অনেক শিশুকে আমরা বাঁচাইতে পারিতাম। কত শিশু যে অকালে মরিয়াছে। গাভীটাকে ভাল করিয়া খাইতে দাও, ওটাকে আমরা মারিব না, পুষিব। চল নীবারা সকলকে খবরটা দেওয়া যাক, কি আশ্চর্য!'

আনন্দের আতিশয্যে কাংড়া নীবারাকে তাহার পেশীসমৃদ্ধ বাহুদ্বয়ের উপর তুলিয়া লইল এবং হর্ষধ্বনি করিতে করিতে বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

...আর একটি ছবিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে ফুটিয়া উঠিতেছে। মানবজীবনের আদিম সভ্যতার পত্তন হইয়াছিল যে দুইটি আবিষ্কারের ফলে তাহার একটি ঘটিয়াছিল কাংড়ার নেতৃত্বে, আর একটি ওবুকীর। তখন আমরা রিয়া নদীর তীরে বাস করিতাম। আমাদের দলপতি ছিল ওবুকী, ওবুকী নিতান্তই ভাল মানুষ লোক ছিল। প্রায় সমস্ত দিনই সে সূর্য পূজা করিত। সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আকাশের দিকে চাহিয়াই বসিয়া থাকিত সে। মধ্যে মধ্যে রিয়া নদীর জল অঞ্জলি ভরিয়া তুলিয়া আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া দিত। তাহার ধারণা ছিল আকাশ এই জল শতগুণ করিয়া বৃষ্টিরূপে ফিরাইয়া দিবে। বৃষ্টি হইলে আমরা তখন যে ঘাসের বীজ খাইয়া জীবন ধারণ করিতাম সেই ঘাস বেশি করিয়া জন্মিবে, আমাদের আর অন্নাভাব থাকিবে না। ওবুকী নাকি খুব বড় শিকারি ছিল এককালে। বন্য গরু শিকার করিত। যে বন্য গরুর দলকে ঘিরিয়া তাহার শিকার চলিত একবার অনাবৃষ্টির ফলে সে দল নাকি নিঃশেষ হইয়া যায়। ওবুকী এবং তাহার সহচরেরা গরুর দলকে যদি ঘিরিয়া না রাখিত

তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই কোনো নদী বা ঝরনার নিকট গিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে সক্ষম হইত। কিন্তু গরুর দলকে ঘিরিয়া রাখাই তখন নিয়ম ছিল। ওবুকী সে নিয়ম লঙঘন করিতে সাহস করে নাই। ফলে সমস্ত গরু তৃষ্ণায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল। শুধু তাহাই নয়, ওবুকী একদিন প্রভাতে উঠিয়া আবিষ্কাব করিল যে, তাহার সহচরেরাও তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে কিন্তু অরণ্য ত্যাগ করিল না। তৃণাচ্ছাদিত বিরাট অরণ্যে একা একা পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ওবুকী কতদিন যে এরূপভাবে একা একা ছিল তাহা কেহ জানে না। লিনাপা বলে, এই সময়ই সে নাকি সূর্যদেবের সাক্ষাৎ পাইয়াছিল। সূর্যদেব তাহাকে বলেন, 'তুমি রিয়া নদীর তীরে যে বড় বড় ঘাস আছে তাহার বীজ আহার কবিয়া জীবন ধারণ কব।' ওবুকী নিজে কিন্তু বলে অন্য বকম। সে বলে যে কয়েক দিন অনাহারে থাকিবার পর সহসা তাহার মনে একটা প্রেরণা জাগিয়াছিল। তাহার মনে হইয়াছিল যে গরুরা তো মাংস খাইয়া জীবন ধাবণ করে না, তাহাবা ঘাস খাইয়াই বাঁচে। ঘাসের মধ্যেও তাহা হইলে নিশ্চয় এমন জিনিস আছে যাহা জীবের প্রাণরক্ষা করিতে পারে। প্রবল ক্ষুধার তাড়নায় ওবুকী অবশেষে ঘাস খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিছুদিন ঘাস খাইয়াই বাঁচিয়াছিল সে। ক্রমশ ঘাস খাইযা তাহাব দেহে শক্তিও সঞ্চারিত হইয়াছিল। এইভাবে কিছুদিন কাটিবার পর ওবুকীর জীবনে একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। কিছুদিন হইতে তাহার উদরে সামান্য বেদনা হইতেছিল, একদিন সে বেদনা এমন নিদারুণ হইয়া উঠিল যে ওবুকী অস্থির হইয়া পড়িল। ওবুকী বলে যে চিৎকার করিতে করিতে সে নাকি সারা বনে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছিল। তাহার পর সে অজ্ঞান হইয়া যায়। যখন তাহার জ্ঞান হইল তখন সে দেখিল যে বৃষ্টি হইতেছে। বহুকাল অনাবৃষ্টির পর এই বৃষ্টি তাহার সর্বাঙ্গে যেন অমৃত সিঞ্চন করিতে লাগিল। সে উদ্বাহু হইযা নাচিতে শুরু করিল, নাচিতে নাচিতে বদন ব্যায়ত করিয়া জল-ধারা পান করিতে লাগিল। সহসা সে দেখিতে পাইল, একস্থানে মেঘ ফাটিয়া গিয়াছে এবং সেই ফাটল দিযা একটা আলোক-রেখা নামিয়া আসিয়া তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের খানিকটা অংশকে আলোকিত করিয়াছে। ওবুকী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, আলোকিত অংশের তৃণগুলির প্রত্যেকটির মাথায শীষ রহিয়াছে। তাহার মনে হইল আকাশ হইতে সূর্যদেব যেন আঙুল দিয়া ওই পক্ক তৃণশীর্ষগুলির দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। তাহার ক্ষুধাব উদ্রেক হইযাছিল। সে ছুটিয়া গেল এবং শীষগুলি ভক্ষণ করিতে লাগিল। ওবুকী বলে যে গরুদের ভক্ষ্য ঘাস লতাপাতা যদৃচ্ছ আহার করিয়া এতদিন সে কোনোক্রমে জীবনধারণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু পক্ক শীযগুলি আহার করিয়া একটা বিশেয স্বাদ ও তৃপ্তি যেন সে অনুভব করিল। তাহার পর হইতে সে শীষ ছাড়া আর কিছু আহার করে নাই। শীর্ষসমন্বিত তৃণ অনুসন্ধান করিতে করিতেই অবশেষে সে রিয়া নদীর তীরে আসিয়া লিনাপাকে দেখিতে পায়। কিশোরী লিনাপা রিয়া নদীর জলে তখন মৎস্য শিকার করিতেছিল।

..বহুকাল পূর্বে এই লিনাপাকে লইয়া রিয়া নদীর তীরে ওবুকী যে শফরী সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিল আমরা সেই সম্প্রদায়ভুক্ত। মেয়েরা নদীর জলে মাছ ধরিত, আমরা তৃণশীর্ষ আহরণ করিয়া আনিতাম। মাঝে মাঝে শিকারও করিতাম। কিন্তু শিকার করা আমাদের অবশ্য-কর্তব্য প্রাত্যহিক কর্ম ছিল না। শিকারও বেশি মিলিত না সে সময়। শশক, শূকর,

শজারু, পাখি মাঝে মাঝে আমরা শিকার করিয়া আনিতাম। কিন্তু ঘাসের বীজই আমাদের প্রধান খাদ্য ছিল। ওবুকী যদিও কাহাকেও শিকার করিতে বারণ করিত না, কিন্তু শিকার করাটা সে খুব পছন্দও করিত না। সে বলিত, 'যে বীজ আহার করিয়া প্রাণীরা বাঁচিয়া আছে সেই সহজলভ্য বীজ আহার করিয়া আমাদেরও বাঁচিয়া থাকা উচিত। পশুর পিছনে ছুটিয়া ছুটিয়া সময় নষ্ট করার কোনো অর্থ হয় না।' লিনাপার কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ ছিল। লিনাপা বলিত, 'সহজলভ্য তৃণবীজ আহার করিলে আমরাও ক্রমশ ওই তৃণদলের মতো সহজলভ্য হইয়া পড়িব। তখন গরুরাও আসিয়া আমাদের মুড়াইয়া খাইবে!' ওবুকী আকাশের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া উত্তর দিত, 'হস্তীকে গরু মুড়াইয়া খাইয়াছে এরূপ খবর তো কখনও শোনা যায় নাই। হস্তীরা শক্তি সংগ্রহ করিবার জন্য শশক বা শজারুর পিছনে ছুটিয়া বেড়াইতেছে এরূপ খবরও কখনও শুনি নাই।' লিনাপাও হটিবার পাত্রী ছিল না। সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিত, 'তাহা শোনা যায় নাই বটে, কিন্তু বিশালকায় হস্তীর মাথার উপর বসিয়া সিংহ যে তাহার মস্তক বিদীর্ণ করে এ খবর কাহারও অজানা নয়। আমরা হস্তী হইতে চাই না, আমরা সিংহ হইতে চাই।' ওবুকী একথা শুনিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিত, দিনের পর দিন কোনো উত্তর দিত না। তাহার সে দৃষ্টি দেখিয়া আমরা ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িতাম, অনুভব করিতাম, শিকার না করিয়া তৃণবীজ সংগ্রহ করিয়া আনিলেই ওবুকী খুশি হইবে, আবার হয়তো কথা কহিবে। লিনাপারও তাহাই মনে হইত, সে তখন আমাদের তৃণবীজ সংগ্রহ করিয়া আনিতে উৎসাহ দিত, নিজেও সংগ্রহ করিয়া আনিত। কয়েকদিন পরে ওবুকীর দৃষ্টি আকাশ হইতে নামিয়া হঠাৎ আবার নিবদ্ধ হইত লিনাপার মুখের উপর। সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ লিনাপার দিকে চাহিয়া থাকিয়া ওবুকী বলিত, 'মাংস অনেকদিন খাওয়া হয় নাই। লিনাপা, তুমি অনেকদিন মাছও তো ধরিতেছ না। তোমার সিংহ হইবার বাসনাটা কি তবে নিছক ভণ্ডামি নাকি.' লিনাপা হাসিত, ওবুকীও হাসিত। আমরা শিকারে বাহির হইয়া পড়িতাম। খুব সুখেই ছিলাম আমরা। রিয়া নদীর তীরে শাখা-প্রশাখা লতা পাতা ঘাস দিয়া আমরা ছোট ছোট কুটির প্রস্তুত করিয়াছিলাম, সেই সব কুটিরে আমরা তৃণবীজ সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম। অনাবৃষ্টির সময় ঘাস যখন শুকাইয়া যাইত, রিয়া নদী যখন শীর্ণকায়া হইয়া আসিত, পশুপক্ষীরাও যখন অন্তর্ধান করিত তখন ওই সংগৃহীত তৃণবীজের সাহায্যে আমরা জীবন ধারণ করিতাম। আমাদের তখন আর একটা কাজ ছিল, রিয়া নদীর তীরে তীরে ঘুরিয়া ঝিনুক সংগ্রহ করা। ঝিনুক সংগ্রহ করিবার জন্য আমরা অনেক সময় বহুদূরে চলিয়া যাইতাম। বহু বর্ণের বহু রকম ঝিনুক আমরা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এই সব ঝিনুক দিয়া মেয়েরা নিজেদের অলঙ্কার প্রস্তুত করিত। ঝিনুকের বিনিময়ে আমরা প্রয়োজনীয় নানারকম দ্রব্যও সংগ্রহ করিতাম। অরণ্যবাসী তরক্ষু সম্প্রদায়ের লোকেরা পশুচর্মের বিনিময়ে ঝিনুক লইয়া যাইত। আমরা পশুচর্ম দিয়া নিজেদের গাত্রাবরণ প্রস্তুত করিতাম। এইভাবেই আমাদের দিন কাটিয়া যাইতেছিল। একদিন রিয়া নদীর জলে সাঁতার দিতে দিতে অপরূপ লাবণ্যময়ী এক তরুণী আসিয়া আমাদের মধ্যে সহসা উপস্থিত হইল। সেরূপ লাবণ্যময়ী রমণী আমরা কেহই দেখি নাই। যে রমণীদের লইয়া আমরা ঘর করিতাম তাহাদের ক্ষুদ্র নাসা, ক্ষুদ্র চক্ষু, বৃহদ্দন্তশোভিত মুখমণ্ডলে আকর্ণবিস্তৃত হাসি ছাড়া আনন্দজনক আর কিছুই যে ছিল না বংশীনাসা, আয়তনয়না, কুন্দদন্তী লীরাকে দেখিবার পর

শফরী সম্প্রদায়ের সমস্ত পুরুষেরা তাহা যুগপৎ অনুভব করিলাম। লীবাকে ঘিরিয়া আমাদের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। লীরা কিন্তু আমাদের ভাষা বুঝিত না, আমরাও তাহার ভাষা বুঝিতাম না। তাহার নাম লীরা না আর কিছু তাহাও ঠিক জানিতাম না আমরা। আমরা তাহাকে লীরা নামে অভিহিত করিয়াছিলাম, কারণ নদীর জল হইতে উঠিয়া সে নিজের বুকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়াছিল—লীরা। ওই একটিমাত্র শব্দই সে উচ্চারণ করিয়াছিল। যতদিন আমাদের মধ্যে ছিল আর দ্বিতীয় কোনো কথা সে বলে নাই। আমরা তাহাকে লীরা বলিয়াই ডাকিতাম, আমাদের ডাকে সে ঘাড় ফিরাইয়া মুচকি হাসিয়া সাড়াও দিত। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের সে বশ করিয়া ফেলিয়াছিল, এমন কি ওবুকী পর্যন্ত তাহার মোহিনী শক্তিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই। প্রায়ই দেখা যাইত তাহার আকাশমুখী দৃষ্টি আর আকাশমুখী নাই, তাহা লীরাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছে। লীবা প্রত্যেকের কুটিরে যাইত প্রত্যেকের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিত প্রত্যেককে হাতছানি দিয়া ডাকিয়া অরণ্যাভিমুখে লইয়া যাইত।

...একদিন গভীর নিশীথে নিদারুণ চিৎকার শুনিয়া ঘুম ভাঙিয়া গেল। উঠিয়া দেখি শফরী সম্প্রদায়ের সমস্ত নারীরা একত্রিত হইয়া রোষভরে চিৎকার করিতেছে। চক্রাকারে দাঁড়াইয়া হস্তপদ আস্ফালন করিয়া বলিতেছে, 'শেষ করিয়া ফেল, টুকরা টুকরা করিয়া ফেল, কুটি কুটি কর।' চক্রের মধ্যস্থলে কয়েকজন নারী দেখিলাম ধস্তাধস্তি করিতেছে। মনে হইল একটা বিরাট নারী-পিণ্ড যেন ইতস্তত সঞ্চালিত হইতেছে। সহসা সেই পিণ্ড ভেদ কবিয়া লীরা ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। সবিস্ময়ে দেখিলাম তাহার মাথার কুঞ্চিত কেশ-দামে ছিন্নভিন্ন একটি স্তন নাই, সমস্ত বক্ষঃস্থল রক্তাপ্লুত। লীরা ছুটিয়া গিয়া রিয়া নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহাকে অনুসরণ করিয়া কয়েকটি শফরী-রমণীও রিয়া নদীর জলে ঝাঁপ দিয়াছিল, কিন্তু তাহারা লীরাকে আর ধরিতে পারে নাই।

...আমাদের জীবন যেমন চলিতেছিল, আবার তেমনি চলিতে লাগিল। ওবুকীর দৃষ্টি পূর্ববৎ আকাশমুখী হইয়া সূর্যবন্দনায় নিবিষ্ট হইল, অঞ্জলি ভরিয়া সে আবার আগের মতো মেঘের প্রত্যাশায় দিন যাপন করিতে লাগিল। আমরাও আবার শিকার ও তৃণবীজ সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলাম। লীরার স্মৃতি ক্রমশ অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া আসিল। লীরাকে ক্রমশ আমরা ভুলিয়াই গেলাম।

...সহসা আবার একদিন নৈশ নীরবতা একটা তীক্ষ্ণ চিৎকারে বিঘ্নিত হইল। শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিলাম—রিয়া নদীর জলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি ভাসিতেছে এবং প্রত্যেক গুঁড়ির উপর সশস্ত্র বহু লোক। পরে জানিয়াছিলাম ওগুলি নৌকা। গাছের গুঁড়িকে পোড়াইয়া তাহার মধ্যে খোলের মতো করা হইয়াছে। সর্বপ্রথম নৌকায় দেখিলাম মশালহস্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এক-স্তনী লীরা। তাহার চোখের দৃষ্টিতেও আগুন জ্বলিতেছে। দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত। আমাদের কুটিরগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে কি যে বলিতেছিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সভয়ে চাহিয়া রহিলাম। সেই মোহিনী লীরা যে এমন ভয়ঙ্করী হইতে পারে তাহা কল্পনাতীত ছিল। বেশিক্ষণ কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকিবার অবসর পাইলাম না। সশস্ত্র পুরুষগুলি সগর্জনে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতার দিয়া তীরে উঠিল এবং আমাদের কুটিরগুলি আক্রমণ করিল। আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিলাম। কিছুদূরে একটা গাছ ছিল

আমি তাড়াতাড়ি সেই গাছের উপরে উঠিয়া পড়িলাম। বৃক্ষশীর্ষে বসিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার সর্বাঙ্গ বারংবার শিহরিয়া উঠিল। দেখিলাম সেই সশস্ত্র পুরুষগুলি আমাদের কুটিরের ভিতর ঢুকিয়া মেয়েদের চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া বাহির করিতেছে এবং লীরার পদপ্রান্তে লইয়া গিয়া বিরাট প্রস্তর কুঠারাঘাতে তাহাদের হত্যা করিতেছে। দেখিলাম উৎসাকারে উৎসারিত তাহাদের শোণিতধারা অঞ্জলি ভরিয়া লইয়া লীরা তাহা নিজের বক্ষঃস্থলে সাগ্রহে লেপন করিতেছে। নারীকণ্ঠের আর্তনাদে রিয়া নদীর তীর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে শত শত মশাল জ্বলিতেছে, সেই মশাল আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম লীরাকে ঘিরিয়া নারী-মুণ্ড স্তূপীকৃত হইয়া উঠিতেছে, আক্ষিপ্ত নারীকবন্ধ শূন্যে লাফাইয়া উঠিয়া পুনরায় ভূশায়ী হইতেছে। সবিস্ময়ে ইহাও লক্ষ্য করিলাম যে, প্রত্যেক কবন্ধে একটি করিয়া স্তন নাই। সশস্ত্র পুরুষগুলি আমাদের সংগৃহীত ঝিনুকগুলিও বহন করিয়া নৌকায় তুলিতেছে দেখিলাম। সহসা আমার আত্মসম্মান বোধ জাগ্রত হইল। গাছের একটা ডাল ভাঙিয়া লইয়া তরতব করিয়া গাছ হইতে নামিযা পড়িলাম এবং উন্মাদের মতো ছুটিযা গিয়া শত্রুবাহিনীকে আক্রমণ করিলাম। কিছুক্ষণ পরেই মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিল। অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলাম। তাহার পর কি ঘটিয়াছে জানি না।

...যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিলাম আমি ঘন ঘাসের বনে শুইয়া আছি। চতুর্দিকে কোনো শব্দ নাই, প্রখর রৌদ্রে চরাচর যেন পুড়িয়া যাইতেছে। ধীবে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। উঠিবার সময় লক্ষ্য করিলাম আমার পায়ে একটা দড়ি বাঁধা রহিয়াছে। আমার পায়ে দড়ি বাঁধিল কে? কখন বাঁধিল? ধীরে ধীরে ঘাসের বন হইতে বাহিব হইয়া আসিলাম। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, নির্জন প্রান্তর, দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, জন-মানবেব চিহ্ন পর্যন্ত নাই। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর বসিয়া পায়ের দড়িটা খুলিয়া ফেলিলাম। ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। ঘাসের বনে ঢুকিয়া পড়িলাম আবার। তৃণবীজ সংগ্রহ কবিতে হইবে। ওবুকী যে তৃণবীজ আমাদের সংগ্রহ করিতে শিখাইয়াছিল সে তৃণ দেখিতে পাইলাম না। অন্য আর এক প্রকার তৃণে প্রচুর শীষ ধরিয়াছিল কিন্তু তাহা খাইতে সাহস হইতেছিল না। যদি খাদ্য না হইয়া বিষ হয়? আমাদেব দলেব টিনা ভুল কবিয়া অন্য কি একটা গাছের পাতা খাইয়াছিল। ফলে তাহার মৃত্যু হয। আমি লুব্ধ দৃষ্টিতে শীষগুলিব দিকে চাহিয়া চাহিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম এমন সময় 'কুক' করিয়া একটা শব্দ হইল। এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। কিছুদূব অগ্রসর হইয়া গিয়াছি আবাব শব্দ হইল। পাখির ডাক নয়, মানুষের কণ্ঠস্বর। সবিস্ময়ে চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলাম কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। আবার অগ্রসর হইতে যাইতেছি আবার শব্দ হইল। কিছুদূরে প্রকাণ্ড একটা গাছ ছিল, মনে হইল শব্দটা সেই গাছের উপর হইতে আসিতেছে। ভাবিলাম তাহা হইলে নূতন ধরনের কোনো পাখিই হইবে। কিন্তু যেই আবার অগ্রসর হইবার জন্য পা বাড়াইয়াছি আবার শব্দ হইল। কেহ আমাকে লক্ষ্য করিতেছে নাকি? গাছটার দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। কুক্ কুক্ উপর্যুপরি দুইটি শব্দ হইল এবাব। কৌতূহলী হইয়া তখন গাছের দিকেই অগসর হইলাম। গাছের যত নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম শব্দটা তত যেন ঘন ঘন হইতে লাগিল। নিকটে গিয়া দেখি শাখাপত্রবহুল প্রকাণ্ড গাছ। প্রথমে কিন্তু কিছুই দেখিতে পাই নাই, তাহার পর গাছের নীচে গিয়া যখন দাঁড়াইলাম তখন লালচুমের

বাসাটা চোখে পড়িল। শবরী লালচুমকেও দেখিতে পাইলাম। গাছের কয়েকটি শাখাকে ঘাস পাতা দিয়া ঘিরিয়া, চমৎকার একটি ঘর প্রস্তুত করিয়াছিল সে। তাহাতে একটি বাতায়নও ছিল। বাতায়ন হইতে মুখ বাড়াইয়া লালচুম আমাকে দেখিতেছিল। তাহার মাথায় নানাবর্ণের বহুরকম পাখির পালক, অঙ্গেও পাখির পালকের আবরণ। আমার সহিত চোখাচোখি হইবামাত্র লালচুম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কুক্ কুক্ কুক্ শব্দে কলকাকলি করিয়া উঠিল যেন। আমি সবিস্ময়ে উর্ধ্বমুখ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। লালচুম তরতর করিয়া গাছ হইতে নামিয়া আসিল এবং আমার দুই হাত ধরিয়া ইঙ্গিত করিল—চল, উপরে চল। কি একটা বলিল, কিন্তু আমি বুঝিতে পারিলাম না। আমি উত্তরে বলিলাম, 'কোথায় যাইব?' লালচুমও আমার কথা বুঝিতে পারিল না। হাসিমুখে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর হাত ধরিয়া পুনরায় আমাকে আকর্ষণ করিয়া আঙুল দিয়া গাছের উপর তাহার বাসাটি দেখাইল। তাহাকে অনুসরণ করিয়া বৃক্ষে আরোহণ করিলাম। সেই যে আরোহণ করিলাম, বহুকাল আর নামি নাই। নামিবার প্রয়োজনই হয় নাই। যদিও আমরা পরস্পরের ভাষা বুঝিতাম না তবু অতিশয় ঘনিষ্ঠভাবে বহুকাল একসঙ্গে বাস করিয়াছিলাম। পরস্পরের মনোভাব সহজেই আমরা বুঝিতে পারিতাম। মনে হয় পরস্পরের ভাষা জানা থাকিলে হয়তো এত সহজে বুঝিতে পারিতাম না। কারণ ভাষার দ্বারা আমরা মনোভাব প্রকাশও করি, আড়ালও করি। লালচুমের মনের ভাব মুখের মুকুরে স্পষ্ট প্রতিফলিত হইত, আমারও হয়তো হইত। লালচুমের সঙ্গে অতিশয় অভিনব সুন্দর জীবন যাপন করিয়াছিলাম। ভাষা বাধা সৃষ্টি করে নাই।

...লালচুম ছিল শবরী। গাছের উপরই নানারকম ফাঁদ পাতিয়া সে পাখি ধরিত। কাক, বক, টিয়া, শালিক, হাঁস, কত রকম পাখিই যে তাহার ফাঁদে পড়িত তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রায় প্রতিদিন আট-দশটা বড় পাখি ধরা পড়িত। তাহাতেই আমাদের দুইজনের স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। লালচুম গাছ হইতে নামিয়া গিয়া ফল এবং জলও সংগ্রহ করিয়া আনিত মাঝে মাঝে। জল আনিত মানুষের মাথার খুলিতে। আমাকে কিন্তু সে কিছুতেই নামিতে দিত না। আমি নামিবার উপক্রম করিলেই দুই হাত বাড়াইয়া সে পথরোধ করিত। শুধু তাই নয়, ক্রোধে উত্তেজনায় তাহার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিত। কয়েকদিন চেষ্টা করিয়া আমি শেষে আর নামিবার চেষ্টাই করিতাম না। লালচুম কিন্তু নামিয়া যাইত। শুধু যে জল ও ফল সংগ্রহ করিবার জন্যই লালচুমকে নামিতে হইত তাহা নয়, ফাঁদের জন্য একরকম আঠাও সে সংগ্রহ করিয়া আনিত। আর একটা কারণেও সে নামিয়া যাইত মাঝে মাঝে। দূরে ঘাসের জঙ্গলে, বা আরও দূর প্রান্তরে মানুষ দেখিলে সে কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিত না। দ্রুতবেগে নামিয়া গিয়া সে তাহাদের কি যে বলিত জানি না, কিন্তু দেখিতাম যে তাহার সহিত কথা কহিবার পর আগন্তুকের দল আরও দূরে চলিয়া যাইতেছে। যতক্ষণ তাহারা দৃষ্টির সীমা পার হইয়া চলিয়া না যাইত লালচুম ফিরিত না। কখনও কখনও দেখিতাম লালচুমও তাহাদের সহিত চলিয়া যাইতেছে, তাহাদের সহিত হাসিতেছে, তাহাদের নাচও দেখাইতেছে। কি যে ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। লালচুমের সহিত দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার জীবনের অধিকাংশ রহস্যই আমি সমাধান করিতে পারি নাই। লালচুম যখন গাছ হইতে নামিয়া দূরে চলিয়া যাইত তখন আমি অনায়াসে পলায়ন করিতে পারিতাম। পাছে আমি

পলায়ন করি সেইজন্য লালচুম অদ্ভুত একটা 'তুক' করিয়া যাইত প্রতিবার। একটি জীবন্ত পাখিকে আমার সর্বাঙ্গে ছোঁয়াইয়া পাখিটা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত। তাহার 'তুক' সত্ত্বেও হয়তো আমি পলায়ন করিতে পারিতাম, কোথাও কোনো বাধা অন্তত ছিল না, লালচুম অনেক সময় সমস্ত দিন অনুপস্থিত থাকিত, আমি একাই গাছের উপর বসিয়া থাকিতাম, কিন্তু আমার পলাইতে ইচ্ছাই করিত না। লালচুমের আন্তরিক যত্নই যে শুধু আমাকে বশ করিয়াছিল তাহা নয়, গাছের ডালে ডালে তাহার পাখি ধরিবার ফাঁদগুলিও আমাকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। সেই বিশাল মহীরুহের কোন্ শাখায় কোন্ পত্রগুচ্ছের অন্তরালে সে যে কখন ফাঁদ পাতিয়া রাখিত তাহা আমাকে জানিতে দিত না। গাছের উপর যতক্ষণ থাকিত অধিকাংশ সময়ই গাছের শাখায় শাখায় ঘুরিয়া বেড়াইত সে। তাহার পর সে যখন চলিয়া যাইত আমি উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া থাকিতাম কোন্ ফাঁদে কোন্ পাখি পড়িয়া চিৎকার করিয়া উঠিবে এই আশায়। কখনও দেখিতাম তীক্ষ্ণ নখ-চঞ্চু শ্যেনপক্ষী একটা শাখায় আটকাইয়া ঝটপট করিতেছে, কখনও মরকতাঙ্গী শুক, কখনও দুগ্ধ-ধবল বক। কখন কে যে কোথায় ধরা পড়িবে তাহার নিশ্চয়তা ছিল না। নিশ্চয়তা ছিল না বলিয়াই ঔৎসুক্য প্রবল ছিল। প্রত্যাশিত অথচ অপ্রত্যাশিত, সুনিশ্চিত অথচ অনিশ্চিত এই ঘটনা-পরম্পরা আমাকে যেন মোহজালে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। লালচুমের যত্নও ছিল আর একটা মোহ। লালচুম আমাকে যে সেবাটা করিত তেমন সেবা জননীও বোধ হয় সন্তানকে করে না। যে খাদ্য সে সংগ্রহ করিয়া আনিত তাহার অধিকাংশই আমাকে খাইতে হইত, আপত্তি করিবার উপায় ছিল না, আপত্তি করিলে সে জোর করিয়া মুখে পুরিয়া দিত, আমি চিবাইতে অপারগ হইতে অনেক সময় চিবাইয়াও দিত। ইহা ছাড়া আর একটা জিনিসও সে করিত যাহার সম্বন্ধে আমার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। সে আমার সর্বাঙ্গ টিপিয়া দিত। ইতিপূর্বে এরূপভাবে কেহ আমার অঙ্গসেবা করে নাই, অননুভূত একটা আরামে সর্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিত। প্রতিদিন আমি মনে মনে অপেক্ষা করিয়া থাকিতাম কখন সে আমার অঙ্গসেবা করিবে।

...একদিন লক্ষ্য করিলাম মাতৃত্বের সমস্ত লক্ষণ লালচুমের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরিস্ফুট হইয়াছে। লালচুম সন্তানসম্ভবা। আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করিলাম, লালচুম আমার সম্বন্ধে একটু যেন উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। যত দিন যাইতে লাগিল তাহার ঔদাসীন্য বাড়িতে লাগিল। যে আগ্রহ লইয়া পূর্বে সে আমার সেবা করিতে উৎসুক হইত, দেখিলাম সে আগ্রহ তাহার আর নাই। গাছ হইতে নামিয়া যাইবার পূর্বে সে যে 'তুক' করিত ক্রমশ তাহাও করা ছাড়িয়া দিল। আমার চিন্তা হইত গাছের সংকীর্ণ নীড়ে লালচুম সন্তান প্রসব করিবে কি করিয়া! কিন্তু আমার চিন্তার কথা তাহাকে আমি বুঝাইয়া বলিতে পারিতাম না, আমার ভাষা সে বুঝিত না। তথাপি অঙ্গভঙ্গী করিয়া তাহাকে একদিন বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম তাহাতে সে মৃদু হাসিয়াছিল মাত্র। তাহার সেই বিষণ্ণ মৃদু হাসির অর্থ তখন বুঝিতে পারি নাই। পারিলাম কয়েকদিন পরে। লালচুম যখন আসন্ন-প্রসবা তখনও সে প্রতিদিন গাছ হইতে নামিয়া যাইত। সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরিয়া আসিত আবার। একদিন কিন্তু সে ফিরিল না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হইতে লাগিল, কিন্তু লালচুম আর ফিরিল না। আমি চিন্তিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। সমস্ত রাত্রিই হয়তো বসিয়া থাকিতাম কিন্তু আমার ঠিক মাথার উপরেই একটা পেচক হঠাৎ ফাঁদে আটকাইয়া গেল। তাহার পক্ষ-বিধূনন ও কর্কশ

আর্তনাদ আমাকে যেন ঘাড় ধরিয়া গাছ হইতে নামাইয়া দিল। মনে হইতে লাগিল সমস্ত বৃক্ষটাই যেন বাঙ্ময় হইয়া আমাকে লালচুমের সন্ধানে প্ররোচিত করিতেছে।

লালচুম যে পথ দিয়া রোজ চলিয়া যাইত, সে পথ আমার অজানা ছিল না। গাছের উপর বসিয়া বসিয়া রোজই লালচুমকে চলিয়া যাইতে দেখিতাম। ঘন দীর্ঘ ঘাসের মধ্য দিয়া তারার অস্পষ্ট আলোকে আন্দাজে সেই পথ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ চলিবার পর ঘাসের বন শেষ হইয়া গেল, আমি একটা প্রান্তরে আসিয়া পড়িলাম। বিরাট প্রান্তর। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, নির্মেঘ আকাশে অগণিত নক্ষত্র উঠিয়াছে। মনে হইল তাহারা যেন আমার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে, তাহাদের হাসিভরা দৃষ্টি যেন ভাষাময়, কিন্তু সে ভাষা আমি বুঝিতে পারিলাম না। অনেকক্ষণ তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আবাব চলিতে শুরু করিয়া দিলাম। বহুক্ষণ চলিবার পর প্রান্তর শেষ হইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল রাত্রিও বোধ হয় এইবার শেষ হইয়া যাইবে। প্রান্তরের পব আবার অরণ্য আরম্ভ হইয়াছিল। ছোট ছোট ঝোপ ও গুল্মই বেশি, মাঝে মাঝে এক-একটা বড় গাছ। পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, একটা গাছে উঠিয়া পড়িলাম। ভাবিয়াছিলাম একটু বিশ্রাম করিয়া পুনরায় অগ্রসর হইব। কিন্তু বিশ্রাম কপালে লেখা ছিল না। গাছে উঠিয়া দেখিতে পাইলাম অনতিদূরে কতকগুলি মশাল জ্বলিতেছে। মনে হইল কাহাকে ঘিরিয়া যেন কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়া আছে। গাছ হইতে নামিয়া সরীসৃপের মতো বুকে হাঁটিয়া নিঃশব্দে তাহাদের নিকটবর্তী হইলাম। ঘন ঘাস থাকাতে কোনোরূপ অসুবিধা হইল না। ঘাসের ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া প্রথমেই লালচুমকে দেখিতে পাইলাম। সে উপুড় হইয়া কাতর শব্দ করিতেছিল, তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলাম প্রসব-বেদনাতেই সে কাতর হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহাদের মুখের দিকে তখন একে একে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। প্রদীপ্ত মশাল আলোকে দেখিলাম অধিকাংশ লোকের চোখেমুখে একটা তীব্র লালসার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটা লোভনীয় কিছুর প্রত্যাশায় সকলেই যেন সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। হঠাৎ শোংছাকে দেখিতে পাইলাম। শোংছা আমাদের দলের লোক, ওবুকীর দৌহিত্র। এখানে কি করিয়া আসিল? শোংছার মুখের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলাম। লক্ষ্য করিলাম একমাত্র তাহারই চোখেমুখে লালসার কোনো চিহ্ন নাই, বরং সমস্ত মুখমণ্ডলে একটা বিষণ্ণতার ছাপই রহিয়াছে, সে যেন বাধ্য হইয়া ইহাদের সঙ্গে দাঁড়াইয়া আছে, স্বেচ্ছায় বা সানন্দে নহে। শোংছার মুখের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়াছিলাম, যদি সে আমাকে দেখিতে পায়, কিন্তু তাহার মুখভাব দেখিয়া মনে হইল না যে সে আমাকে দেখিতে পাইয়াছে। লালচুম সহসা নিদারুণ চিৎকার করিয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই দেখিলাম তাহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু যাহা ঘটিল তাহার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। লালচুমের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সকলে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। কেবল শোংছাই প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া কোনো শব্দ নির্গত হইল না। একজন মশালধারী দেখিলাম ছুটিয়া আসিয়া সদ্যোজাত শিশুটাকে তুলিয়া লেহন করিতেছে। পরমুহূর্তেই দেখিলাম আর একজন তাহার হাত হইতে শিশুটাকে ছিনাইয়া লইল। তাহার পর কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। দেখিলাম জীবন্ত শিশুটাকে সকলে মিলিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া আহার করিতেছে। লালচুম নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছিল, বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া

গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সদ্যোজাত শিশুটার আর্ত চিৎকার সহসা থামিয়া গেল, দেখিলাম একজন তাহার গলাটা কামড়াইয়া ধরিয়াছে। আমি নিজেও যে একদিন নরভুক ছিলাম, ঠিক ওইভাবেই আমিও যে বহু শিশুমাংস আহার করিয়াছি তাহা আর স্মরণ ছিল না। জন্মজন্মান্তরের আবর্তে আবর্তিত হইয়া আমি যে নবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলাম, যে নবচেতনা লাভ করিয়াছিলাম তাহার সহিত ওই নরভুক পশুগুলার কোনো সাদৃশ্যই ছিল না। আমার সর্বাঙ্গে একটা শিহরন বহিয়া গেল, চক্ষু বুজিয়া আমিও নিস্পন্দের মতো পড়িয়া রহিলাম। নরভুক পশুগুলা শিশুমাংস লইয়া কোলাহল করিতেছিল। অনুভব করিলাম কোলাহলটা ক্রমশ দূরে চলিয়া যাইতেছে। চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম সকলেই চলিয়া গিয়াছে লালচুমও নাই। একটু উঁচু হইয়া দেখিলাম লালচুমকে কয়েকজন লোক স্কন্ধে বহন কবিয়া লইয়া যাইতেছে। উহাকেও উহারা আহার করিবে নাকি? সহসা ভীত হইয়া পড়িলাম। আমাকে যদি দেখিতে পায় তাহা হইলে...মাথাটা পুনরায় নামাইয়া লইয়া সভয়ে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলাম, কিছু দূর গিয়া কিন্তু থামিয়া গেলাম। শোংছার কথা মনে পড়িল, তাহার বিষণ্ণ মুখটা মনে পড়িল। মনে হইল শোংছার সহিত যদি কোনো রকমে একবার দেখা করিতে পারি সমস্ত সমস্যাটার হয়তো সমাধান হইয়া যাইবে। এই অদ্ভুত নিষ্ঠুর পরিবেশ পরিত্যাগ করিবার উপায়ও হয়তো সে বলিয়া দিতে পারিবে। সরীসৃপের মতো বুকে হাঁটিয়া যেখানে ছিলাম আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিলাম। মনে করিয়াছিলাম যতক্ষণ না শোংছার দেখা পাই ততক্ষণ জাগিয়া থাকিব, অনেকক্ষণ জাগিয়াও ছিলাম, কিন্তু কখন যে চোখের পাতা বুজিয়া আসিয়াছে জানি না, সেই ঘন ঘাসের বনেই হাতের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সহসা কাহার স্পর্শে ঘুমটা ভাঙিয়া গেল, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম, মুখের উপব তর্জনী স্থাপন করিয়া শোংছা দাঁড়াইয়া আছে। বুঝিলাম কোনো কথা বলিতে বারণ করিতেছে। নির্বাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। শোংছা ইঙ্গিত কবিয়া আমাকে তাহার অনুসরণ করিতে বলিল। শোংছাও আমারই মতো বুকে ভর দিয়া সরীসৃপের মতো হাঁটিতেছিল। কিছুক্ষণ পরেই আমরা প্রান্তরের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নিকটেই একটা বড় গাছ ছিল। শোংছা এক ছুটে গিয়া সেই গাছটার উপর উঠিয়া পড়িল। একটু পরে আমিও গিয়া উঠিলাম।

'শোংছা তুমি এখানে কি করিয়া আসিলে?'

'লীরার দল আমাকে এবং আমাদের দলের অনেককে এই নরমাংসভুক পশুদের মুখে সমর্পণ করিয়া গিয়াছে।'

'প্রতিশোধ কামনায়?'

'সম্ভবত আমাদের পরিবর্তে তাহারা অনেক ঝিনুক এবং কড়ির মালাও পাইয়াছে।'

'তোমাদের কি করিয়া এখানে লইয়া আসিল?'

'পায়ে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে টানিতে লইয়া আসিয়াছে।'

আমার তখন মনে পড়িল আমার পায়েও তো একটা দড়ি বাঁধা ছিল। আমার দড়িটা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল সম্ভবত। তাই আমি রক্ষা পাইয়াছিলাম।

শোংছা প্রশ্ন করিল, 'তুমি কি করিয়া এখানে আসিলে?'

আমার কাহিনী আনুপূর্বিক তাহাকে বলিলাম।

'তুমিই লালচুমের সহিত ছিলে?'

আমার বৃক্ষবাসিনী সঙ্গিনীর নাম যে লালচুম তাহা শোংছার নিকটই সেদিন প্রথম শুনিলাম।

'হ্যাঁ। ব্যাপার কি বল তো? লালচুমের ধরনধারণ কিছুই বুঝিতে পারি নাই।'

'লালচুম কে, কোন্ সম্প্রদায়ের লোক, তাহা আমিও জানি না। শুধু এইটুকু জানি, মাঝে মাঝে একটি শিশু এবং একটি বয়স্ক মানব ইহাদের উপহার দিবে এই শর্তে লালচুম ওই বৃক্ষ এবং বৃক্ষের চতুর্দিকের জমি ভোগদখল করিতে পায়। অর্থাৎ গর্ভস্থ শিশুটিকে এবং শিশুর জন্মদাতাটিকে লালচুম মাঝে মাঝে আসিয়া ইহাদের মুখে সমর্পণ কবিয়া যায়। লালচুমের মতো আরও কয়েকটি বৃক্ষবাসিনী নারী এ অঞ্চলে আছে।'

'ইহারা বৃক্ষে বাস করে কেন?'

'অনেক দূর হইতে মানুষ দেখিতে পাইবে বলিয়া!'

'তাহা হইলে ইহারা তো এইবার আমার সন্ধানে বাহির হইবে নিশ্চয়ই।'

'হইবে না, হইয়াছে। মূর্ছিতা লালচুম ছাড়া কেহই এখন এ অঞ্চলে নাই। আমি সেইজন্যই ভরসা করিয়া তোমার খোঁজে বাহির হইতে পারিয়াছি। তুমি যখন ঘাসের মধ্যে লুকাইয়াছিলে তখনই আমি তোমাকে দেখিয়াছিলাম, তখন হইতে আমি আশা করিয়া আছি—তোমার সঙ্গে আজ এখান হইতে সরিয়া পড়িব। সরিয়া পড়িবার এ রকম সুযোগ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, কিন্তু একা এদেশ হইতে পলায়ন করা সম্ভব নয়। চতুর্দিকেই নদী, কিছু দূরে সমুদ্র। নদীতে নৌকা আছে, গাছের বড় বড় গুঁড়ি কুরিয়া ইহারা নৌকা প্রস্তুত করিয়াছে। সেই নৌকায় একজন বা একজন লোক সদাসর্বদা বসিয়া থাকে। তাহার চক্ষু এড়াইয়া নদী পার হওয়া অসম্ভব। তাহাকে হত্যা করিতে হইবে। কিন্তু একা তাহাকে হত্যা করাও সম্ভব নয়। অন্তত আব একজন লোক চাই। তুমি যখন ভাগ্যক্রমে আসিয়া পড়িয়াছ চল আর দেরি কবা ঠিক হইবে না। আমি কিছু অস্ত্রশস্ত্রও গোপনে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। সেগুলি লইয়া চল বাহির হইয়া পড়ি। চল চল—'

শোংছার চোখে মুখে একটা ত্রস্ত ভীত ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমিও কম ভীত হই নাই, তবু আমি প্রশ্ন করিলাম, 'তোমার সঙ্গে আরও যাহারা ছিল তাহারা কোথায়?'

'তাহারা কেহ বাঁচিয়া নাই। ওই রাক্ষস-রাক্ষসীরা তাহাদের একে একে নিঃশেষ করিয়াছে। আগামী পূর্ণিমায় আমাকেও শেষ করিয়া ফেলিবে। আমি কয়েকবার পলায়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু বলিলাম তো একা এখান হইতে পলায়ন করা সম্ভব নয়। চল, দুইজনে মিলিয়া চেষ্টা করিয়া দেখি যদি নৌকার লোকটাকে হত্যা করিতে পারি। ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই। চল...'

...নৌকার লোকটিকে হত্যা করা অসম্ভব হয় নাই। শোংছা যে প্রস্তর কুঠারটি গোপনে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল তাহার এক আঘাতেই তাহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল, সে চিৎকার করিবার অবকাশ পর্যন্ত পাইল না। তাহার নৌকাতে আরোহণ করিয়াই আমরা নদী পার হইলাম। আমরা তখনও নৌকা বাহিতে শিখি নাই। নৌকা জলের স্রোতে আপনি ভাসিয়া চলিল, আমরা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ ভাসিবার পরে আমরা জলে লাফাইয়া পড়িয়া সন্তরণ করিতে লাগিলাম। বেশ খানিকক্ষণ সাঁতরাইবার পর প্রভাত হইয়া

গেল। শোংছা বলিল, 'আর জলে থাকা নিরাপদ নয়, চল আমরা তীরে উঠিয়া পড়ি।' তীরে উঠিয়া শোংছা ছুটিতে লাগিল, আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম। মধ্যে মধ্যে একটু বিশ্রাম করিয়া আমরা সমস্ত দিনই ছুটিয়াছিলাম। ছুটিয়া কোথায় চলিতেছিলাম তাহা তখনও জানিতাম না, আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ওই নরভুক রাক্ষসদের নিকট হইতে পলায়ন করা। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল তাহারা বোধ হয় আমাদের অনুসরণ করিতেছে, আমাদের পিছনে বহুদূরে তাহাদের চিৎকার যেন শোনা যাইতেছে। সুতরাং দাঁড়াইবার বা বিশ্রাম করিবার অবসর বড় একটা পাই নাই। নিতান্ত শ্বাসকষ্ট যখন হইতেছিল তখন কোনো ঝোপের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতেছিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন গাঢ় হইয়া আসিল, তখন এক স্থানে একটা বেড়ায় দুইজনেই আটকাইয়া গেলাম। শোংছা হোঁচট খাইয়া পড়িয়াই গেল। হাত দিয়া অনুভব করিয়া দেখিলাম গাছের বড় বড় ডাল পুঁতিয়া একটা সুদীর্ঘ বেড়া কে যেন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। মানুষ নিশ্চয়ই। বিস্মিত হইলাম। এত বড় দীর্ঘ বেড়া তো কোনো মানুষকে কখনও দিতে দেখি নাই! কোনও ফাঁদ নয় তো! আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া নিরাপদ বলিয়া মনে হইল না। নিকটেই যে বড় গাছটি ছিল তাহাতেই আরোহণ করিয়া রাত্রিবাস করিব ঠিক করিলাম। শোংছা বলিল, 'এক সঙ্গে দুইজনেই ঘুমানো চলিবে না। একজনকে জাগিয়া থাকিতে হইবে। তুমি আগে ঘুমাও, আমি জাগিয়া থাকিব। নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত আমার চোখে ঘুম আসিবে না।'

...শোংছা আমাকে একবারও জাগায় নাই। আমার যখন ঘুম ভাঙিল তখন প্রভাত হইয়া গিয়াছে। দেখিলাম শোংছা পাশে নাই। সম্মুখের দিকে চাহিয়া যাহা নজরে পড়িল তাহা এখন হয়তো কাহারও মনে বিস্ময় উৎপাদন করিবে না, কিন্তু আমাকে তখন তাহা শুধু বিস্মিতই করিল না, মুগ্ধও করিল। আমি চমৎকৃত হইয়া বেড়া-দেওয়া শ্যামল ক্ষেতটির দিকে চাহিয়া রহিলাম। মনে হইতেছিল যেন চোখ জুড়াইয়া গেল। কিছুক্ষণ পূর্বে পিশাচ-পিশাচীদের নিষ্ঠুরতা মনে যে ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছিল এই দৃশ্য সেই ক্ষতস্থানে যেন স্নিগ্ধ প্রলেপ দিয়া দিল। প্রকৃতির স্বাভাবিক শ্যামল বন্যশোভা বহুবার দেখিয়াছি, কিন্তু এই ক্ষেতটির শোভা সে সব হইতে এত পৃথক, এত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে আমি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। চতুর্দিকে বেড়া দিয়া ঘিরিয়া এমন সুবিন্যস্ত করিয়া ঘাসের সারি কে লাগাইয়াছে? নিশ্চয় মানুষ। কে সে? শোংছা কোথায় গেল? অনুসন্ধান করিবার জন্যই নিশ্চয় সে নামিয়া গিয়াছে। আমিও নামিয়া পড়িলাম। বেড়ার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ওবকী যে তৃণবীজ আমাদের সংগ্রহ করিতে শিখাইয়াছিল দেখিলাম সমস্ত ক্ষেত ভরিয়া সেই তৃণই রহিয়াছে। সহসা দূরে একজন মানুষ দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম তাহার স্কন্ধে একটি প্রস্তর-কুঠার রহিয়াছে। সে হস্ত উত্তোলন করিয়া আমাকে কি যেন একটা বলিল, দূর হইতে ভাল শুনিতে পাইলাম না। আমার নিকটও একটা প্রস্তর-কুঠার ছিল। মনে হইল যদি লোকটা আমাকে আক্রমণই করে আত্মরক্ষা করিতে পারিব। দাঁড়াইয়া রহিলাম। ভয়ও করিতেছিল না। সেই শ্যামল তৃণক্ষেত্র আমার মনে এমন একটা স্নিগ্ধ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, নিজের অজ্ঞাতসারেই কেমন করিয়া যেন নির্ভয় হইয়াছিলাম, মনে হইতেছিল যে আসিতেছে সে শত্রু নয়, মিত্র। কাছাকাছি আসিয়া লোকটি উপর্যুপরি তিনটি প্রশ্ন করিল, 'তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ, কি চাও?' বহুকাল পরে নিজের ভাষা শুনিয়া মনে হইল দীর্ঘ বিচ্ছেদের

শেষে যেন পরম আত্মীয়ের দেখা পাইলাম। এ লোকটি যখন আমার ভাষা বলিতেছে তখন নিশ্চয়ই আত্মীয়। ভাল করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, পরিচিত মনে হইল না। শফরী সম্প্রদায়ের সকলকেই আমি চিনিতাম। এ লোকটি তাহা হইলে শফর সম্প্রদায়ের নয়।

বলিলাম, 'আমি একজন শফরী, ওবুকীকে খুঁজিতেছি। সে কি এখনও বাঁচিয়া আছে? তাহার কোনো খবর কি দিতে পার?'

'নিশ্চয় দিতে পারি। ওবুকী তো আমাদের দলপতি। তুমি একজন শফরী? ওবুকীর মুখে শুনিয়াছি। লীরার দল আসিয়া শফরী বংশকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে।'

লোকটি বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

বলিলাম, 'ঠিকই শুনিয়াছ। আমি আর শোংছা কেবল বাঁচিয়া আছি। আর কেহ আছে কিনা জানি না। তুমি কি শফরী নও?'

'না, আমি নীলগাই। ওবুকী আমার মাকে বিবাহ করিয়া এখানে নূতন দলেব পত্তন করিয়াছে। আমা: মা মৃন্তা নীলগাই। আমরা সকলে নীলগাই। ওবুকীর নির্দেশ অনুসারে আমরা এখানে ঘাসের চাষ করি।'

'ওবুকী কোথায়? তাহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চাই।'

'ওবুকী মাটির নীচে গুহায় বাস করে। ক্ষেতের ওপারে ওই যে কুটিরের মতো দেখিতেছ, ওইটাই গুহার প্রবেশ পথ। দুইজন সশস্ত্র নীলগাই ওই গুহামুখে প্রহরায় নিযুক্ত আছে। তাহাদের নিকট গিয়া তোমার পরিচয় দাও, তাহারা ওবুকীকে খবর দিবে। ওবুকী যদি তোমার সহিত দেখা করিতে চায় তাহা হইলে দেখা হইবে।'

'পূর্বে তো এরূপ ছিল না। পূর্বে ওবুকী রিয়া নদীর তীরে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া সূর্যপূজা করিত। রিয়া নদীর জল অঞ্জলি ভরিয়া তুলিয়া আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া দিত, তাহার নিকটে আমরা যখন খুশি যাইতে পারিতাম, কোনো মানা ছিল না।'

'এখনও ওবুকী সূর্যপূজা করে, এখনও রিয়া নদীর জল সে আকাশের দিকে নিক্ষেপ করে, কিন্তু এখন তাহার চতুর্দিকে সশস্ত্র প্রহরী থাকে। লীরার দল আক্রমণ করাব পর হইতে ওবুকী এই সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছে। ওবুকীরই নির্দেশ অনুসারে আমরা সশস্ত্র হইয়া এই তৃণক্ষেত্রের চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াই। লীরার দল শফরী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়াছিল, কিন্তু নীলগাইদের কিছু করিতে পারিবে না। তুমি যদি ওবুকীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাও, ওই কুটির অভিমুখে যাও।'

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম শোংছা আসিতেছে। শোংছা হাত তুলিয়া আমাকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিল, আমি তখন নীলগাই যুবককে বলিলাম, 'ওই আর একজন শফরী। বোধহয় ওবুকীর খোঁজ পাইয়াছে। কি বলিতেছে শুনিয়া আসি।'

নিকটে যাইতেই শোংছা বলিল, 'ওবুকী ডাকিতেছে, চল।'

'তুমি কি করিয়া ওবুকীর সন্ধান পাইলে?'

নীলগাই যুবকটি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল, সে বলিল, 'আমিই উহাকে সন্ধান দিয়াছি।'

শোংছার সহিত আমি ওবুকীর গুহার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। গুহার নিকট গিয়া দেখিলাম, ওবুকী গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। যে কুটিরটি দূর হইতে দেখিতে

পাইয়াছিলাম, তাহারই ছায়ায় সে আমাদের অপেক্ষায় বসিয়া আছে। তাহার পার্শ্বে দেখিলাম, একটি বলিষ্ঠকায়া নারীও একটি সদ্যোজাত শিশু ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছে। নীলগাই মৃন্তা। আমাদের দেখিয়া ওবুকী বলিল, 'তোমরা যে আবার ফিরিয়া আসিবে, তাহা আশা করি নাই। আমি নিজেই যে ফিরিব, সে আশাও তো ছিল না। ফিরিয়া আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাও অপ্রত্যাশিত এবং তাহা আমার মনে যে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল, সে প্রেরণাও অদ্ভুত। আমাদের আশা-প্রত্যাশা অতিশয় সীমাবদ্ধ, আমাদের কল্পনাও অতিশয় সঙ্কীর্ণ। সেই সঙ্কীর্ণ সীমার বাহিরে বিরাট একটা জগৎ আছে, সেই জগতে বহু অচিন্ত্যপূর্ব ঘটনা অহরহ ঘটিতেছে। মাঝে মাঝে সেই জগতের দুই-একটা ঘটনা আমাদের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে ছিটকাইয়া আসিয়া পড়ে, তখন আমরা অপ্রত্যাশিত নূতন আলোক প্রত্যক্ষ করি। লীরা অপ্রত্যাশিতভাবেই আমাদের মধ্যে আসিয়াছিল, অপ্রত্যাশিতভাবেই শফরী সম্প্রদায়কে বিনষ্ট করিয়া চলিয়া গেল। নূতন আলোকে আমরা নিজেদের অসংযম, নিজেদের অক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিলাম। লীরার দল আক্রমণ করিতেই আমি পলায়ন করিয়াছিলাম। দুই দিন, দুই রাত্রি অবিরাম হাঁটিবার পর তৃতীয় সন্ধ্যায় যে স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করিব মনস্থ করিলাম, সে স্থানে বিশ্রাম করা সম্ভবপর হইল না। একটা করুণ ক্রন্দন দূর হইতে ভাসিয়া আসিয়া আমাকে উতলা করিয়া তুলিল। যদিও অতিশয় ক্লান্ত ছিলাম, তথাপি সেই করুণ শব্দ অনিবার্যভাবে আমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। অন্ধকাবে সেই শব্দকে অনুসরণ করিয়া শিংশপা-বৃক্ষ-পরিবেষ্টিত এক প্রান্তরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রান্তরের মধ্যস্থলে শাখা-প্রশাখাবহুল একটি বটবৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষতলে একটি অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখিলাম। দেখিলাম, ঊর্ধ্বমুখ হইয়া একটি নারী ক্রন্দন করিতেছে, হাঁ, অপ্রত্যাশিতভাবেই সেদিন নীলগাই মৃন্তার সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম—'

এই পর্যন্ত বলিয়া ওবুকী মৃন্তার দিকে চাহিল। মৃন্তা শিশুটিকে স্তন্যদান করিতেছিল, দেখিলাম তাহার অধরে মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। আরও দেখিলাম শিশুটি তাহার যে স্তনটি পান করিতেছিল না, সেই স্তন হইতেও দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছে এবং মৃন্তা বাম হস্ত দিয়া তাহা প্রতিরোধ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে।

ওবুকি বলিল, 'মৃন্তা সেদিনের সমস্ত ঘটনা কি ইহাদের বলিব? ইহারা আমার আপন লোক। লিনাপার বংশ ইহারা। ইহাদের নিকট কোনো কথা গোপন করিবার প্রয়োজন নাই। তবে তোমার যদি আপত্তি থাকে, বলিব না।'

মৃন্তা বলিল, 'তোমার যদি আপত্তি না থাকে, আমারও আপত্তি নাই। তোমরা কথা বল, আমি ছেলেটাকে ঘুম পাড়াইয়া আসি।' মৃন্তা উঠিয়া গুহার ভিতর চলিয়া গেল।

ওবুকী বলিল, 'বটবৃক্ষতলে বসিয়া ঊর্ধ্বমুখে এই মৃন্তাই সেদিন ক্রন্দন করিতেছিল। কিছুদিন পূর্বে তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছিল। উহাদের সামাজিক নিয়ম অনুসারে তাহার স্বামীর শবদেহ বটবৃক্ষের শাখায় বাঁধা ছিল এবং উহাদের সামাজিক নিয়ম অনুসারেই মৃন্তা গভীর রাত্রিতে আসিয়া ঊর্ধ্বমুখে কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর নিকট অনুমতি ভিক্ষা করিতেছিল যে সে পুনরায় বিবাহ করিবে কিনা। মৃন্তাদের পুরোহিত জাঋক্ষ বলিয়াছিলেন যে তাহার স্বামীর প্রেতাত্মা যদি অনুমতি দেয়, তাহা হইলে ওই গভীর রাত্রেই ওই বটবৃক্ষতলেই তাহার নূতন স্বামী আবির্ভূত হইবে। আমাকে দেখিয়া মৃন্তা ক্রন্দনাবেগ সম্বরণ করিল, তাহার পর

নতমুখে বলিল, 'বিদেশি, আমার গৃহে আজ আতিথ্য-গ্রহণ করিবে কি? আমি অনাথা হইয়াছি, জানি না, তুমি আমার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব লইতে পারিবে কিনা।'

এই পর্যন্ত বলিয়া ওবুকী আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিল। আমরাও নীরব রহিলাম। তাহার পর ওবুকী আমাদের দিকে চাহিয়া বলিল, 'নীলগাই মৃন্তার চারিটি পুত্র ও দুইটি কন্যা ছিল। আমি ইহাদের সকলেরই ভার লইতে সম্মত হইলাম। ভাবিয়া দেখিলাম, রিয়া নদীর তীরে ফিরিয়া আসিয়া যদি নূতন সমাজ পত্তন করিতে হয়, একাকী তাহা সম্ভব হইবে না। জনবল চাই। নীলগাই মৃন্তার চারিটি পুত্রই বলিষ্ঠ, অস্ত্রশস্ত্র চালনায় নিপুণ। তাহারাও আমার সঙ্গে আসিতে সম্মত হইল! অপ্রত্যাশিত ভাবে নীলগাই মৃন্তার সহিত সেদিন যদি আমার সাক্ষাৎ না ঘটিত, তাহা হইলে আমি রিয়া নদীর তীরে, আমার পূর্ব বাসস্থানে, আর প্রত্যাবর্তন করিতে পারিতাম না। অপ্রত্যাশিতভাবেই আমি একদিন নীলগাই মৃন্তার পরিবারবর্গকে লইয়া রিয়া নদীর তীরে ফিরিয়া আসিলাম। ফিরিয়া আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাও অপ্রত্যাশিত। আশা করি তোমাদের মনে আছে যে আমারই নির্দেশে তোমরা কুটিরে কুটিরে তৃণবীজ সংগ্রহ করিয়া আনিতে। মায়াবিনী লীরার নেতৃত্বে যে দস্যুদল আসিয়াছিল, তাহারা আমাদের সকলকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল, তোমাদের ঝিনুক ও রঙীন প্রস্তরগুলি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সংগৃহীত তৃণবীজগুলি তাহারা স্পর্শও করে নাই। তাহারা মাংসাশী, তৃণবীজের মর্ম তাহাদের নিকট অজ্ঞাত। আমি আসিয়া দেখিলাম, আমাদের কুটির একটিও নাই, কিন্তু যে যে স্থানে সেই তৃণবীজগুলি স্তূপীকৃত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে লক্ষ লক্ষ তৃণ অঙ্কুরিত হইয়াছে। আমি সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম। সেই লক্ষ লক্ষ তৃণাঙ্কুর যেন আমাকে বলিতে লাগিল, 'একদিন আমরা বীজ ছিলাম, এখন তৃণ হইয়াছি, পুনরায় বীজ হইব, পুনরায় সেই বীজ তৃণে রূপান্তরিত হইবে। আমাদের তোমরা যদি রক্ষা কর, তোমাদেরও আমরা রক্ষা করিব।' আমার মনে হইল, দেবতাই বোধ হয় আমাকে নবজীবনের পথ প্রদর্শন করিতেছেন। নীলগাই মৃন্তার পুত্রচতুষ্টয়কে বলিলাম, 'এস আমরা এই ভূমি খনন করিয়া তাহাতে তৃণবীজ বপন করি। একটি বীজ শত শত বীজ প্রসব করিবে, আমাদের খাদ্য-সমস্যা আর থাকিবে না।' মৃন্তার পুত্র-চতুষ্টয়কে সঙ্গে লইয়া একদিন আমিই নিজে উৎসাহী হইয়া ভূমি খনন আরম্ভ করিয়াছিলাম, আজ তোমরা স্বচক্ষেই দেখিয়াছ, তাহার ফল কি হইয়াছে। এখন আমাদের আর খাদ্য-সমস্যা নাই। বন্যজন্তুর পিছনে পিছনে ঘুরিয়া এখন আমাদের আর অনিশ্চিত শিকারি জীবন যাপন করিতে হয় না। তৃণের লোভে বন্য গরু, বন্য ঘোড়া, বন্য মহিষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বরং মাঝে মাঝে আমাদের তৃণক্ষেত্রে আসিয়া হানা দেয়, তাহাদের বধ করিবার জন্য আমাদের কোথাও যাইবার প্রয়োজন হয় না। তাহাদের আক্রমণ হইতে আমাদের ক্ষেত্রগুলিকে রক্ষা করিবার জন্যই আমরা গাছের ডাল কাটিয়া বেড়া দিয়াছি। শুধু তাহাদের আক্রমণ নয়, মানুষেরও আক্রমণ আছে। নীলগাই মৃন্তার পুত্রগুলি দিবারাত্রি সেইজন্য কুঠার স্কন্ধে পাহারা দিতেছে। তোমরা আসাতে আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। নীলগাই মৃন্তার কন্যা দুইটি এখনও অনূঢ়া আছে। তোমরা তাহাদের লইয়া এখানেই নূতন গৃহস্থালি স্থাপন কর। যাহারা চলিয়া গিয়াছে, আর কখনও ফিরিবে না, তাহাদের জন্য দুঃখ করিতে হয় কর। লিনাপার জন্য আমি মাঝে মাঝে দুঃখ বোধ করি, নীলগাই মৃন্তা তাহার বিগত দুই স্বামীর জন্য মাঝে মাঝে অশ্রুপাত করে।

তোমরাও ইচ্ছা করিলে তাহা করিতে পার। কিন্তু যাহারা চলিয়া গিয়াছে, আর কখনও ফিরিবে না, তাহাদের প্রত্যাশায় বসিয়া অমূল্য জীবন নিষ্ফল করিও না। রিয়া নদীর তীরে প্রত্যাবর্তন করিয়া অঙ্কুরিত তৃণবীজগুলির নিকট আমি যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি তাহা এই— যাহা পুরাতন তাহাই আবার নূতন আকারে রূপান্তরিত হইয়া ফিরিয়া আসে। সেই রূপান্তরিত পুরাতনকে নবরূপে স্বীকার করিয়া লইতে পারিলেই জীবন সার্থক হয়। আর একটা কথা শুনিলেও তোমরা বোধ হয় আশ্বস্ত হইবে। নীলগাই মৃন্‌তার জননী নীলগাই কাঙ্খী একদা শফরী জম্লুককে বিবাহ করিয়া নীলগাই সম্প্রদায়ের সূচনা করিয়াছিল। আমার প্রথম যৌবনে অনাবৃষ্টির ফলে আমাদের শিকার জীবনের যখন অবসান ঘটিল, যে বনে আমরা শিকার করিতাম জলাভাবে সেই বন যখন পশুপক্ষী শূন্য হইল তখন শফরী সম্প্রদায়ের বহুলোক বহু স্থানে চলিয়া গিয়াছিল। জম্লুক তাহাদেরই একজন। নীলগাই কাঙ্ক্ষীর সহিত মিলিত হইয়া সে গুল্ম ও কন্দ ভোজন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। শফরী সম্প্রদায়ের লিনাপাকে লইয়া আমি নূতন সমাজের পত্তন করিয়ছিলাম, তোমরা তাহারই ফল। আশ্চর্যের বিষয় শফরী জম্লুকের বংশ আজ আবার নীলগাইরূপে আমার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে। দেখিতেছ আমাদের ভাষা এক, আচরণও বিভিন্ন নহে। আমি তাহাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছি। আমার ইচ্ছা তোমরাও কর। নীলগাই রুমিলা, নীলগাই শোহিলা উভয়েই স্বাস্থ্যবতী তোমরা তাহাদের বিবাহ করিয়া তৃণবীজ উৎপাদনে মনোনিবেশ কর। নীলগাই মৃন্‌তার ভ্রাতাগণ ভগিনীগণ সকলেই আসিয়া আমার এই কৃষিকার্যে যোগদান করিয়াছে। শুনিতেছি ছাগ সম্প্রদায়ের লোকেরাও আসিবে। আমাদের বৃহৎ গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিবে; আমরা আমাদের সমবেত শক্তি দিয়া একটি তৃণবীজকে বহু তৃণবীজে রূপান্তরিত করিব, আমাদের খাদ্যাভাব আর থাকিবে না।'

ওবুকী আবার তাহার দৃষ্টি আকাশের দিকে নিবদ্ধ করিল। মনে পড়িল এই দৃষ্টি দেখিয়া আমরা পূর্বে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িতাম। বুঝিলাম আমাদের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত ওবুকী তাহার দৃষ্টি আকাশ হইতে নামাইবে না।

আমরা উভয়েই প্রায় যুগপৎ বলিয়া উঠিলাম, 'তাহাই হইবে। রুমিলা শোহিলাকেই আমরা বিবাহ করিব।'

ওবুকী তখন তাহার উর্ধ্বমুখী দৃষ্টি গুহার দিকে ফিরাইয়া ডাক দিল—'রুমিলা, শোহিলা, বাহিরে আসিয়া দেখ কাহারা আসিয়াছে।'

দুইটি পুষ্টকায়া যুবতী গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিল। ওবুকী বলিল, 'ইহারা তোমাদের বিবাহ করিবে।'

শুনিবামাত্র তাহারা আমাদের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। ওবুকী তখন আমাদের দিকে চাহিল। তাহার দৃষ্টি কৌতুকদীপ্ত।

'এইবার তোমরা কে কোনটিকে লইবে বল। শোংছা তুমি যাহাকে চাও, তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াও।'

শোংছা একজনের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।

ওবুকী তখন আমাকে বলিল, 'শোংছা শোহিলাকে পছন্দ করিয়াছে, তুমি তাহা হইলে রুমিলাকে গ্রহণ কর। আশা করি ইহাতে তোমার আপত্তি নাই।'

'না।'

আমি গিয়া রুমিলার পিছনে দণ্ডায়মান হইলাম। আবার আমার নূতন জীবন আরম্ভ হইয়া গেল।

...জোলমাকে হারাইয়া যে সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সে সুড়ঙ্গপথ তখনও শেষ হয় নাই, জোলমাকে কেন্দ্র করিয়া যে আশ্চর্য কল্পনা আমার পশুচিত্তকে বিচিত্রিত করিয়াছিল সে কল্পনারও অবসান ঘটে নাই। জন্মজন্মান্তর আমি বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন জীবনের আবর্তে আবর্তিত হইয়াছি, কখনও পুরুষরূপে, কখনও নারীরূপে বহু বিচিত্র নরনারীর সঙ্গ-স্বাদ অনুভব করিয়াছি কিন্তু জোলমাকে ভুলি নাই। জোলমা নামক বিশেষ ব্যক্তিটিকে হয়তো ভুলিয়াছি কিন্তু জোলমার আদর্শ আমার চেতনায় যে বর্ণবহুল ছাপটি আঁকিয়া দিয়াছিল তাহা লুপ্ত হয় নাই। জন্মজন্মান্তরের নানা স্বপ্নে নানা প্রেরণায় তাহা কেবল নানারূপে রহস্যময় হইয়া উঠিতেছিল মাত্র। দৈনন্দিন জীবনের অতি স্বাভাবিক গতিপথে প্রতি জন্মেই নিজের অজ্ঞাতসারে আমি যেন অলৌকিক অস্বাভাবিক জোলমার আবির্ভাব প্রত্যাশা করিতেছিলাম। শিল্পীমনের মানসীকে স্থূল দৈহিক সীমায় প্রত্যক্ষ করিতে চাহিতেছিলাম। একদিন যাহাকে পাইয়াও হারাইয়াছিলাম, কামনার গভীর স্তরে আশা ছিল আবার তাহাকে পাইব। বস্তুত তাহাকে পাইবার আশাই যেন যুগে যুগে আমার অন্তর্জীবনে কাব্যশিল্পসুষমায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, অসম্ভবকে সম্ভাবনার সীমায় মূর্ত করিয়া কল্পলোকে রূপকথা রচনা করিয়াছে। কামনার কলুষ যাহাকে ম্লান করিয়া দেয় তাহাকেই কামনা করিয়া আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, আশা করিয়াছি যে কামনার পঙ্ককুণ্ডে পঙ্কজের মতোই সে একদিন ফুটিয়া উঠিবে। ইহাই অব্যবহিত পরবর্তী জীবনে তাহার আভাস পাইয়াছিলাম শিলাঙ্গীর মধ্যে।

...অনাবৃষ্টি চলিতেছিল।

উন্নগা পর্বত হইতে যে ঝরনাধারা নামিয়া শীর্ণধারায় কন্যা নদীরূপে বহিয়া গিয়াছিল আমরা তখন সেই কন্যা নদীর তীরে বাস করি। ওবুকী একদা যে নবজীবনের প্রবর্তন করিয়াছিল, সেই জীবনধারাই আমরা তখন অনুসরণ করিতেছি। ওবুকীর কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু কৃষিকার্য ভুলি নাই, বস্তুত কৃষিকর্মই আমাদের জীবনের প্রধান কর্ম হইয়া উঠিয়াছিল। এইজন্যই আমরা নদীর তীরে বসতি করিয়াছিলাম। অনাবৃষ্টির ফলে আর একটা কাণ্ড ঘটিয়াছিল। প্রাণীমাত্রেরই জলের প্রয়োজন হয়। পিপাসার তাড়নায় সর্বপ্রকার প্রাণীই কন্যা নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইত। গরু, মহিষ, বাইসন, ব্যাঘ্র, সিংহ, শৃগাল, ভল্লুক, ছাগ, মেষ, অশ্ব, সর্প, নকুল, শজারু, শশক প্রভৃতি বহুবিধ প্রাণী উন্নগা পর্বতের অরণ্যে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইত জলের আশায়। কন্যা নদীর শীর্ণ ধারা এই বিভিন্ন জাতীয় পরস্পর শত্রু পশুদলকে যেন বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। আমরা, নিঃস্ব সম্প্রদায়ের লোকেরা কন্যা নদীর উভয় তীরে বাস করিতাম। মধ্যে মধ্যে কন্যা নদীর শীর্ণধারা স্ফীত হইয়া উভয় কূল প্লাবিত করিয়া দিত। এই প্লাবন যে আমাদের চাষের পক্ষে হিতকর তাহা আমরা বুঝিয়াছিলাম। প্লাবন হইয়া যাইবার পর উভয় তীরে যে পলি পড়িত তাহাতে আমাদের ফসল ভাল হইত। তাই আমরা কন্যা নদীর তীরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বসিয়া প্রার্থনা করিতাম—'হে নদী, তুমি স্ফীত

হও, অঙ্গ বিস্তার কর।' কন্যা নদীর সহিত আমাদের যেন একটা আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। আমরা তাহাকে নিজের লোক মনে করিতাম। তাহার বিভিন্ন মনোভাবও যেন আমরা বুঝিতে পারিতাম। কখনও মনে হইত সে আনন্দিত, কখনও ভাবিতাম সে অভিমান করিয়াছে, কখনও অনুভব করিতাম তাহার শীর্ণধারায় তাহার রোষবহ্নি বিচ্ছুরিত হইতেছে। তাহার কলধ্বনিতে কখনও আশ্বাস, কখনও তর্জন, কখনও ঔদাসীন্যের সুর শ্রবণ করিয়া আমরা কখনও পুলকিত, কখনও আতঙ্কিত হইতাম। অঞ্জলি ভরিয়া আমাদের তৃণবীজের ফসল তাহার তরঙ্গধারায় নিক্ষেপ করিয়া, ঋতুতে ঋতুতে অরণ্য কুসুমের অর্ঘ্য দিয়া আমরা কন্যা নদীকে সম্বোধন করিয়া বলিতাম—'হে নদী, তুমি প্রসন্ন হও, প্রশস্ত হও, প্রসারিত হও। তোমার জলধারা জননীর স্তন্যধারার মতো আমাদের ক্ষেত্রকে সঞ্জীবিত করুক।' নিম্ব-জননীরা নিজেদের স্তন্যদুগ্ধ নিঙড়াইয়া কন্যা নদীর জলে নিক্ষেপ করিত। নিম্ব-পুরুষরা নিজেদের শরীর হইতে রক্ত বাহির করিয়া শোণিত-অর্ঘ্যে কন্যাকে সন্তুষ্ট করিবার প্রয়াস পাইত। নিম্ব-দলপতি ধবল কন্যার তীরে তীরে অহরহ পর্যটন করিয়া বেড়াইত কন্যার মনোভাব জানিবার আশায়। তাহার আর কোনো কাজ ছিল না। প্রখর দ্বিপ্রহরের তপ্ত রৌদ্রে, গভীর নিশীথের সূচীভেদ্য অন্ধকারে সে একা একা কন্যার তীরে ঘুরিয়া বেড়াইত কন্যার সূক্ষ্ম কলধ্বনির ভাষ্য করিবার জন্য। মধ্যে মধ্যে সে কন্যার মনের গোপন বাসনা বুঝিতেও পারিত। তদনুসারে আমাদের অদ্ভুত নির্দেশও দিত। আমরা হয়তো জমি খুঁড়িতেছি (তখন আমরা গাছের মজবুত শাখা সূক্ষ্মাগ্র করিয়া লইয়া তাহা দিয়াই মাটি খুঁড়িতাম) দলপতি ধবল উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিল, 'আজ চল আমরা পাহাড়ে গিয়া পলাশ ফুল সংগ্রহ করি। কন্যার পলাশ ফুলে সাজিবার সাধ হইয়াছে। আজ ভূমি খনন করিবার প্রয়োজন নাই।' দলপতির আদেশে আমরা সকলে পাহাড়ে গিয়া রাশি রাশি পলাশ ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। কিছুক্ষণের জন্য কন্যার তরঙ্গে সহস্র সহস্র পলাশ ফুল ফুটিয়া উঠিল। সমস্ত নদীটাই যেন লাল হইয়া গেল। ধবল আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলিতে লাগিল। 'কন্যা এইবার আমার দুকূলপ্লাবিনী হইয়া উঠিবে, আর আমাদের কোথাও যাইতে হইবে না, কন্যা তাহার তীরে আমাদের বাঁধিয়া রাখিবে...'

এই উক্তির একটা বিশেষ অর্থ ছিল। বাধ্য হইয়া কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর আমাদের স্থান পরিবর্তন করিতে হইত। আমরা তখন জমিতে সার দিতে জানিতাম না। কিছুকাল চাষ করিবার পর জমি বন্ধ্যা হইয়া পড়িত, আর ফসল ফলিত না, আমরা বাধ্য হইয়া তখন অন্যত্র চলিয়া যাইতাম। অন্যত্র চলিয়া যাওয়া মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। কারণ চাষ করিবার উপযোগী জমি সেকালে প্রায়ই অনধিকৃত থাকিত না। জমির সন্ধানে আমাদের বহুদিন ধরিয়া বহু পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। অনাহারে জলাভাবে পথে অনেকে মারা পড়িত। চাষ করিতে শিখিয়া আমরা খাদ্য উৎপাদন করিতে পারিতাম, আগেকার মতো অনিশ্চিত শিকারের আশায় আমরা ছুটিয়া বেড়াইতাম না, সুতরাং আমাদের বংশবৃদ্ধি হইয়াছিল। আমাদের শিকারজীবনে বংশবৃদ্ধি হইলে আমরা বিব্রত হইয়া পড়িতাম। সীমাবদ্ধ এবং অনিশ্চিত পশুমাংসে নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি প্রতিপালিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। শিকারজীবনে তাই আমাদের বংশবৃদ্ধি তেমন হয় নাই। অনেক সময় সদ্যোজাত শিশুকে আমরা ফেলিয়া দিতাম। কৃষিজীবন আরম্ভ করিবার পর হইতেই শিশু আমাদের প্রিয়

হইয়াছিল, তাহাদের আমরা সযত্নে লালন করিতাম, কারণ একটু বড় হইয়া তাহারা আমাদের কৃষিকর্মে সহায়তা করিত। সুতরাং এক একটা দলে বহু বৃদ্ধ, বহু নারী, বহু শিশু থাকিত সে যুগে। এই বিরাট পরিবার লইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়ানো মোটেই সহজ ছিল না, তাই জমির ফসল কমিয়া গেলে আমরা ভীত হইয়া পড়িতাম। আশঙ্কা হইত দেবতা বুঝি বিরূপ হইয়াছেন। বিরূপ দেবতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আমরা পূজা করিতাম, প্রার্থনা করিতাম। কখনও দেবতা প্রসন্ন হইতেন, কখনও হইতেন না। তখন আমাদের স্থানত্যাগ করিতে হইত। কন্যা নদীর তীরে আসিয়া বসবাস করিবার পূর্বে আমরা জোলাবাহা নামক অরণ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে বাস করিতাম। তাহার নিকটে কোনো নদী ছিল না। অনেক দূরে হ্রদ ছিল একটা। জলাভাবেই আমাদের সে স্থান ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কন্যা নদীর সন্ধান দিয়াছিল মীংরা। বাসোপযোগী জমি সন্ধান করিবার জন্য কিছুদিন অন্তর আমাদের এক একটা ছোট ছোট দল বাহির হইত। আমাদের মধ্যে যাহারা ছিল সাহসী এবং বলিষ্ঠ তাহারাই হইত এইসব দলের নেতা। অজানার সন্ধানে অনিশ্চিত পথে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাহির হইয়া পড়িত তাহারা। বহুদিন পরে কেহ কেহ সুসংবাদ লইয়া আসিত, কেহ আবার ফিরিতও না। মীংরা কন্যা নদীর সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু কন্যা নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিতে আমাদের কতদিন যে লাগিয়াছিল তাহা গণনা করিবার মতো বুদ্ধি আমাদের তখন ছিল না, কিন্তু অনেকদিন লাগিয়াছিল। কত দিন কত রাত্রি যে আমরা হাঁটিয়াছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। পথ চলিতে চলিতে বহু রমণী সন্তান প্রসব করিয়াছিল, পথেই তাহারা বড় হইয়াও উঠিয়াছিল। ধবলের তৃতীয় পত্নী গহীনা এই সময়ই মারা যায়। একটা পর্বতের উপত্যকায় আমরা বিশ্রাম করিতেছিলাম, একটা বাঘ আসিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল। আমাদের দলেই দুইজন প্রবীণ ব্যক্তি—জাম্বীরা এবং খুখনও এই সময়ই মারা যায়। পথের কষ্ট তাহারা সহ্য করিতে পারে নাই, বিশেষ করিয়া উপর্যুপরি কয়েকদিন জলাভাব ঘটাতে তাহারা বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। একস্থানে কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া বিশ্রামের সুযোগ দিলে তাহারা হয়তো মরিত না, কিন্তু পথে সময় নষ্ট করিবার সাহস ধবলের ছিল না। বিলম্ব হইয়া গেলে অন্য কোনো দল আসিয়া কন্যা নদীর তীর দখল করিয়া ফেলিতে পারে এ সম্ভাবনাটা যে তুচ্ছ করিবার মতো নহে একথা আমরাও সকলে অনুভব করিতেছিলাম। জাম্বীরা খুখনও করিতেছিল। একটা নদীর তীরে আসিয়া বসবাস করিবার সুযোগ পাওয়া একটা দুর্লভ সুযোগ ছিল সে যুগে। উন্মুখ আগ্রহে আমরা সকলেই মীংরাকে অনুসরণ করিতেছিলাম। থামিবার অবকাশ ছিল না। দুই-একটা মৃত্যু বা ছোটোখাটো বাধা আমরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনি নাই।

আমাদের লক্ষ্য ছিল যত শীঘ্র সম্ভব কন্যা নদীর তীরে উত্তীর্ণ হওয়া। বহু কষ্ট সহ্য করিয়া অবশেষে আমরা লক্ষ্যে পৌঁছিয়াছিলাম। আমাদের সমস্ত শ্রম যেন সার্থক হইয়া গিয়াছিল। ধবল বলিয়াছিল, 'একটা নদীর তীরে যখন আশ্রয় পাইয়াছি তখন আমাদের আর কোথাও নড়িতে হইবে না। নদীতীরে জমি কখনও নিষ্ফলা হয় না শুনিয়াছি। মীংরা স্বচক্ষে দেখিয়াছে, কপোত সম্প্রদায়রা বাহা নদীর তীরে পুরুষানুক্রমে বসবাস করিতেছে। কন্যা নদীর তীরে আমরাও পুরুষানুক্রমে বাস করিব। কি বল মীংরা?' মীংরা নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। সে কোনো উত্তর দিল না, মৃদু হাসিল মাত্র। মীংরা বহুদর্শী লোক, বহুদিন ধরিয়া বহু দেশ পর্যটন

করিয়াছে, এ বিষয়ে তাহার যাহা বাস্তবিক অভিজ্ঞতা তাহা সর্বসমক্ষে সেদিন সে ব্যক্ত করে নাই। যাইবার পূর্বে ধবলকে গোপনে বলিয়া গিয়াছিল। মীংরা, নীহু, রাবো, ঘংকা ইহারা আমাদের দলের পর্যটক ছিল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত এবং মাঝে মাঝে আসিয়া সংবাদ দিত চাষ করিবার মতো জমি আর কোথাও আছে কিনা। ইহাদের আমরা অত্যন্ত খাতির করিয়া চলিতাম, কারণ ইহারাই ছিল বহির্জগতের বার্তাবহ। আমরা সীমাবদ্ধ স্থানে চাষ লইয়া ব্যস্ত থাকিতাম, ইহারা নানা দেশ হইতে নানা খবর সংগ্রহ করিয়া আনিত। ইহারা ছিল স্বাবলম্বী সন্ন্যাসী প্রকৃতির লোক, নিজেরাই শিকার করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিত, খাদ্যের জন্য আমাদের উপর নির্ভরশীল ছিল না, মাঝে মাঝে অকস্মাৎ আসিত, কিছুদিন আমাদের মধ্যে বাস করিত, আবার চলিয়া যাইত। তাহাদের আগমনের জন্য মনে মনে আমরা সকলেই উন্মুখ হইয়া থাকিতাম। আজকাল গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র তোমাদের যে পিপাসা মিটায় উহারাও আমাদের সেই পিপাসা মিটাইত। অনেক নূতন সংবাদ, অনেক কল্পনার খোরাক তাহাদের মাধ্যমেই আমরা পাইতাম। তাহা ছাড়া, সর্বাপেক্ষা বড় কথা তাহারা অনধিকৃত নূতন জমির সন্ধান আনিয়া দিত। মীংরা কন্যা নদীর সংবাদ আমাদের আনিয়া দিয়াছিল বলিয়াই আমরা প্রাণে রক্ষা পাইয়াছিলাম। কারণ সেই অনাবৃষ্টির যুগে শিকারও সুলভ ছিল না, আমরা অনেকে শিকার করিবার দক্ষতাও হারাইয়াছিলাম।

...আমরা যখন কন্যা নদীর উভয় তীরের সমস্ত জমি দখল করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলাম তখন মীংরা একদিন চলিয়া গেল। যেদিন চলিয়া গেল তাহার আগের দিন রাত্রে সে আর ধবল অনেক রাত্রি পর্যন্ত বসিয়া কি সব পরামর্শ করিয়াছিল। গোপন পরামর্শ। আমরা কেহ কিছুই জানিতাম না। আমাদের তৃতীয় ফসল যখন আশানুরূপ হইল না, তখন আমরা ইহার আভাস পাইলাম।

প্রথম দুই বৎসর ফসল আমাদের খুব ভাল হইয়াছিল। আমরা নদীর উভয় তীরই খুঁড়িয়া বীজ বপন করিয়াছিলাম, এত ফসল ফলিয়াছিল যে, আমাদের সকলের আহারের সংস্থান হইয়াও প্রচুর উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। মাটি খুঁড়িয়া মাটির নীচে সেই উদ্বৃত্ত শস্য আমরা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলাম। মাটির নীচে শস্য অতি চমৎকার থাকিত। আমাদের পর্যটক নীহু সঞ্চয় করিবার এই কৌশলটি আমাদের শিখাইয়া দিয়াছিল। গর্তের মেঝেতে আমরা পুরু খড়ের আস্ত'রণ বিছাইয়া দিতাম, গর্তের দেওয়ালেও আমরা কাদা দিয়া লেপিয়া সেই কাদায় সারি সারি নলখাগড়ার নল এমনভাবে বসাইয়া দিতাম যে, শস্য মাটির সংস্পর্শে আসিত পারিত না। সেই গর্তে শস্য জমা করিয়া তাহার উপর পুরু করিয়া শুষ্ক খড় চাপা দিয়া গর্তের মুখটা আমরা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া দিতাম। শস্য একটুও নষ্ট হইত না। নীহু কোথা হইতে এই বিদ্যা শিখিয়া আসিয়া আমাদের শিখাইয়া দিয়া গিয়াছিল।

...কন্যা নদীর তীরে প্রথম কিছুদিন আমরা অতিশয় আনন্দে কালাতিপাত করিয়াছিলাম। শুধু আনন্দ নয়, নিত্য নব বিস্ময়ও আমাদের জীবনকে বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছিল। উন্নগা পর্বতের সানুদেশ অরণ্যময় ছিল এবং সেই অরণ্যে আমাদের পরিচিত-অপরিচিত বহুবিধ পশুপক্ষী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। এজন্য আমাদের অসুবিধাও কম ভোগ করিতে হয় নাই, বন্য গরু ছাগল মহিষের দল আসিয়া আমাদের ক্ষেত নষ্ট করিত, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা আসিয়া আমাদের তৃণশীর্ষগুলি খাইয়া ফেলিত। তাহাদের তাড়াইবার জন্য অথবা শিকার

করিবার জন্য আমাদের সম্প্রদায়ের বহু লোককে সতর্ক হইয়া থাকিতে হইত, কিন্তু তবু ইহাতে একটা নূতন ধরনের বিস্ময় আমরা অনুভব করিতাম। ইতিপূর্বে এতগুলি পশুপক্ষীকে এত নিকট হইতে পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ আমরা পাই নাই। তাহাদের যে সব সময় তাড়াইতে হইত বা শিকার করিতে হইত তাহা নয়, আমাদের ক্ষেতগুলি সু-উচ্চ বেড়া দিয়া ঘেরা ছিল, সব সময়ে তাহারা আমাদের ক্ষেতে প্রবেশ করিতে পারিত না। মাঝে মাঝে যখন তাহারা বেড়া ভাঙিয়া ঢুকিয়া পড়িত তখনই আমরা তাহাদের আক্রমণ করিতাম, মাংসের প্রয়োজনেও মাঝে মাঝে শিকার করিতে হইত, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই আমরা তাহাদের নজরে নজরে রাখিতাম। কন্যা নদীর তীরে দেবদারু বৃক্ষ অনেক ছিল। দেবদারুশীর্ষে বসিয়া বসিয়া আমরা ইহাদের উপর লক্ষ্য রাখিতাম। তাহারাও আমাদের উপর লক্ষ্য রাখিত। বিশেষ করিয়া তাহারা, যাহারা আমাদের অন্যমনস্কতা অসাবধানতার সুযোগ লইয়া আমাদের শস্যে ভাগ বসাইত। সেকালের কয়েকটি চিত্র এখনও মনে আছে।

...উন্নগা পর্বতের উপত্যকা রৌদ্র ঝলমল করিতেছে। উপত্যকা সন্নিহিত অরণ্য হইতে একদল গরু বাহির হইল। বিরাট কুকুৎ ও গলকম্বল সমন্বিত একটি ষণ্ডের সমভিব্যাহারে কয়েকটি গাভী। ষণ্ডটি একবার ঘাড় তুলিয়া আমাদের ক্ষেতের দিকে চাহিল। আমাদের ক্ষেতে বালকবালিকারা সব সময়ই পাহারা দিত। সম্ভবত সে তাহাদের দেখিতে পাইল, বুঝিল এখন ওদিকে যাওয়া নিরাপদ হইবে না। দুষ্ট বালকরা শিক্ষকের সাড়া পাইয়া যেমন পড়ায় মনোযোগ দেয় অনেকটা সেইভাবেই সে উপত্যকায় চরিতে আরম্ভ করিল। তাহার দেখাদেখি গাভীরাও তাহাকে কেন্দ্র করিয়া উপত্যকার চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং উপত্যকার ঘাসেই মনোনিবেশ করিল। গাভীদের সঙ্গে নানা বয়সের বাছুরও ছিল। নিতান্ত শিশু যাহারা তাহারা মাতৃস্তন্য পান করিতেছিল। মাতৃস্তন্য-পাননিরত গোবৎস ইতিপূর্বে আর কখন দেখি নাই। দেখিতে বড়ই ভাল লাগিত। পিছনের পা দুইটির মধ্যে মুখ ঢুকাইয়া তাহারা স্তন্যপান করিতে করিতে মায়েদের পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইত। কুকুর-শাবককে স্তন্যপান করিতে দেখিয়াছি, কারণ কুকুর আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের সঙ্গেই অনেক কুকুর ছিল। তাহারা কি করিয়া কবে যে আমাদের জীবনের সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছিল তাহা মনে নাই। গৌ প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া অথবা স্নেহের তাড়নায় কেন যে ঝাউঝাউকে পুষিয়াছিল জানি না। তাহার পর হইতেই কিন্তু কুকুর আমাদের জীবনে সঙ্গী হইয়া আছে। দেবদারু বৃক্ষের শীর্ষে বসিয়া পাননিরত গোবৎসগুলিকে দেখিয়া তাহাদেরও পুষিতে ইচ্ছা করিত। সে ইচ্ছা যে কেবল আমারই হইত তাহা নয়, অনেকেরই হইত। কিন্তু সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিবার সঙ্গতিও আমাদের তখন ছিল না, সাহসও ছিল না। তাহারা আমাদের খাদ্যে ভাগ বসাইত বলিয়া তাহাদের সম্বন্ধে বিরূপতাও যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তবু তাহাদের নিকটে পাইবার জন্য একটা লোলুপতা জাগিত, নিছক সৌন্দর্য প্রীতির জন্যই জাগিত বোধ হয়। সুন্দর ফুল তুলিয়া আমরা মাথায় পরিতাম, রঙীন পাথর এবং ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া অলঙ্কার প্রস্তুত করিতাম। যাহা কিছু সুন্দর তাহাকে আয়ত্ত করিবার আকাঙ্ক্ষাই আমাদের জীবনকে নিত্য নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। আমার মনে হয়, পরবর্তী যুগে আমরা যে গোপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম আপাতদৃষ্টিতে তাহার অন্য কারণ থাকিলেও আসল কারণের বীজ বোধ হয় আমাদের অজ্ঞাতসারে প্রচ্ছন্ন চেতনায় তখনই উপ্ত

হইতেছিল। ক্রীড়াশীল গোবৎসগুলির দিকে আমরা ক্রীড়নকলুব্ধ শিশুর মতোই চাহিয়া থাকিতাম। এই আগ্রহ, এই সৌন্দর্যপ্রীতি, দুর্লভকে লাভ করিবার এই আকাঙ্ক্ষা অবশেষে আমাদের জয়ী করিয়াছে, শত্রুকেও আমরা মিত্র করিয়াছি। আর একদিনের একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। মনে হয় সেদিন আমি আমার জীবনের চরমতম আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম। কোনো কিছু আবিষ্কার করার চেয়ে বড় আনন্দ তখন আমাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল। সেদিন আমি যাহা আবিষ্কার করিয়াছিলাম তাহা এখন অতিশয় সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু তখন তাহা আমার অতিশয় অভিনব মনে হইয়াছিল। সেদিন শিকারের আশায় উন্নগা পাহাড়ের উপর উঠিয়াছিলাম। আমিই তখন আমাদের দলের মধ্যে সেরা শিকারি ছিলাম। গরুর মাংসে আমাদের অরুচি ধরিয়া গিয়াছিল, ধবলের নূতন প্রিয়তমা নিনানির আদেশে আমি পাহাড়ী ছাগল শিকার করিতে বাহির হইয়াছিলাম। পাহাড়ী ছাগল শিকার করা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। পাহাড়ী ছাগলের মতো অমন চতুর এবং পলায়নদক্ষ জানোয়ার খুব কম দেখিয়াছি। পারতপক্ষে তাহারা সমতলভূমিতে নামিত না, পর্বতের দুর্গম স্থানেই অতিশয় স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। খাড়া পাহাড় সোজা উঠিয়া গিয়াছে, তাহারও গায়ে পাহাড়ী ছাগলকে উঠিতে দেখিয়াছি। পাশাপাশি দুইটি পর্বতশৃঙ্গ, তাহার মধ্যস্থলে অতি সঙ্কীর্ণ পথ, পাহাড়ী ছাগল তাহার ভিতর অনায়াসে ঢুকিয়া পড়ে। বহুদূর হইতেই তাহারা শত্রুর আগমন টের পায় এবং টের পাইলে এমনভাবে আত্মগোপন করে যে শত্রুকে হার মানিতে হয়। অতর্কিতে তাহাদের নিকটবর্তী হইতে না পারিলে তাহাদের শিকার করা যায় না। হাওয়ায় তাহারা মানুষের গন্ধ টের পায় এবং টের পাইলে তাহাদের দলের নেত্রী (ছাগীরাই প্রায় দলের নেত্রী হয়) সামনের পাটি ঠুকিয়া সামান্য একটু শব্দ করে, আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দলটি অদৃশ্য হইয়া যায়। আমি পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে লক্ষ্য করিলাম উপত্যকার বাম ধারে পর্বতশৃঙ্গের ঈষৎ নিম্নে বারান্দার মতো যে স্থানটুকু বাহির হইয়া রহিয়াছে তাহার উপর দুইটি ছাগশিশু দ্বন্দ্বে ব্যাপৃত। পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া তাহারা পরস্পরকে ঢুঁ মারিতেছে। একটু পা ফসকাইয়া গেলেই সুনিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু উহাদের কখনও পা ফসকাইতে দেখি নাই। ছাগশিশু দেখিয়া বুঝিলাম যে দলটিও তাহা হইলে নিকটেই কোথাও আছে। কিছুদূর গিয়াই কিন্তু থামিয়া গেলাম। হাওয়া ওই দিকেই বহিতেছিল। মনে হইল এখন আর অগ্রসর হওয়া উচিত নয়, হয়তো ইতিমধ্যেই উহারা আমার আগমন টের পাইয়া গিয়াছে। কোথাও কিছুক্ষণ আত্মগোপন করিয়া থাকা যাক, হাওয়া ঘুরিলে তাহার পর অগ্রসর হওয়া যাইবে। উহারাও হয়তো নামিয়া আসিতে পারে। তীব্রবেগে হাওয়া বহিতেছিল। হাওয়া এড়াইবার জন্য আমি বৃক্ষবেষ্টিত একটা ঘন ঝোপে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম তাহা দেখিয়া দ্রুতগতিতে প্রথমেই একটি গাছে উঠিয়া পড়িতে হইল। ঝোপের অন্তরালে একটি বন্য গরু বসিয়াছিল। কোনো বন্য জন্তুর খুব কাছে থাকা নিরাপদ নয়, এই বোধটা আমাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। বন্য গরুর সম্মুখীন হইবার মতো ভারী অস্ত্রও আমার কাছে ছিল না, তীর ধনুক লইয়া বাহির হইয়াছিলাম। গাছে উঠিয়া দেখিলাম গরুটা চলিয়া গেল না, বসিয়াই রহিল। আমাকে সে দেখিতে পাইয়াছিল, উঠিবার চেষ্টাও করিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঠিল না, বসিয়া রহিল। তখন ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলাম ওটা একটা গাভী এবং তাহার পিছনের দিক হইতে কি যেন একটা বাহির হইয়া আছে।

চকিতের মধ্যে ব্যাপারটা আমার নিকট স্পষ্ট হইয়া গেল—গাভীটি প্রসব করিতেছে। বিস্ময় ও আনন্দের একটা অদ্ভুত অনুভূতি আমার সমস্ত চিত্তকে যেন অভিভূত করিয়া দিল। সেই বৃক্ষশাখায় চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া নীরবে রুদ্ধশ্বাসে আমি সমস্ত ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করিলাম। মনে হইল অপরূপ একটা কিছু দেখিতেছি। মনুষ্যসন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে বহুবার দেখিয়াছি, আমাদের বৃহৎ গোষ্ঠীতে এ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, তাহাতে কোনো অভিনবত্ব আছে বলিয়া কখনও মনে হয় নাই। কিন্তু এ গো-জননীর প্রসব ব্যাপারটা আমাকে সেদিন বড়ই অভিভূত করিল। তাহার কারণ বোধ হয় আমাদের দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবনে নূতনত্ব কিছুই ছিল না। জমি চাষ করিয়া বীজ বপন করা, বীজ অঙ্কুরিত হইলে পাহারা দেওয়া, তাহার পব শস্য পাকিলে সেগুলি ঝাড়িয়া সঞ্চয় করা এবং এই সবেরই পুনরাবৃত্তি আমাদের কৌতূহলকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিত। যদিও কন্যা নদীকে প্রসন্ন করিবার জন্য নানাবিধ নৃত্য গীত পূজা উৎসব আমাদের জীবনকে বিচিত্র করিত কিন্তু সে সবও একটা বিশেষ পদ্ধতির গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া অভিনবত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছিল। যে অপ্রত্যাশিত নূতনত্বের সংঘাতে সমস্ত সত্তা অপূর্ব পুলকে মাতিয়া ওঠে আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমরা সেই অজানা বিস্ময়ের জন্য মনে মনে উন্মুখ হইয়া থাকি। আজ তোমাদের কবি ও বৈজ্ঞানিকরা নিত্য নূতন সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া যে আনন্দে অভিভূত হন আমিও তখন ঠিক সেই আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। সেইদিন আর একটা বিস্ময়ও আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সেই দিনই আমি প্রথম শিলাঙ্গীকে দেখিয়াছিলাম। ওই সদ্যপ্রসূতা গাভীটিই শিলাঙ্গীকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল। বাছুরটি তখন সম্পূর্ণরূপে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, গাভীটি চাটিয়া চাটিয়া তাহার অঙ্গ পরিষ্কার করিতেছে, এমন সময় ঠিক আমার সম্মুখের একটি বৃক্ষ হইতে একবোঝা কচি ঘাস গাভীটির মুখের সম্মুখে পড়িল। গাভীটি এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় প্রথমটা একটু সচকিত হইয়া উঠিলেও বিশেষ বিচলিত হইল না, বরং মুখের কাছে খাদ্য পাইয়া অবিলম্বে তাহাতেই মনোনিবেশ করিল। বলা বাহুল্য, আমি খুবই বিস্মিত হইয়াছিলাম। আমার বিস্ময় আরও বাড়িয়া গিয়াছিল ওই কচি ঘাসের বোঝাটার দিকে চাহিয়া। ওগুলি যে আমাদেরই ক্ষেতের তৃণশস্য, ওগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য আমাদের সমস্ত দলটার যে সর্বদা সজাগ হইয়া আছে। যে গরুকে আমাদের ক্ষেত হইতে দূরে রাখিবার জন্য আমরা নানাভাবে সচেষ্ট হইয়া রহিয়াছি সেই গরুর মুখেই আমাদের তৃণশস্য এমনভাবে কে আনিয়া দিল। অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া সম্মুখের বৃক্ষটির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর লক্ষ্য করিলাম নিকষ কৃষ্ণাঙ্গী একটি কিশোরী অতি সন্তর্পণে বৃক্ষের কাণ্ড বাহিয়া নামিতেছে। নিমেষের মধ্যে নিঃশব্দে নামিয়া সে বনান্তরালে মিলাইয়া গেল। আমিও পরমুহূর্তে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া তাহাকে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আর তাহাকে দেখিতেই পাইলাম না। মনে হইল ঝোপের আড়ালেই সে কোথাও আছে, কিন্তু অনেক খুঁজিয়াও তাহাকে আবিষ্কার করিতে পারি নাই। ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় সেই বৃক্ষে আরোহণ করিলাম। সদ্যোজাত গো-শাবকটি আমাকে যেন চুম্বকের মতো আকর্ষণ করিতেছিল। দেখিলাম তাহার মা তাহাকে চাটিয়া চাটিয়া প্রায় পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে, সে উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা কবিতেছে। আমি মুগ্ধনেত্রে বসিয়া বসিয়া দেখিতেছিলাম। সহসা একটা অসমসাহসিক স্পৃহা আমাকে পাইয়া বসিল। বাছুরটাকে

চুরি করিয়া লইয়া গেলে কেমন হয়! উহাকে যদি আমরা পুষি, ধবল কি খুব আপত্তি করিবে? ধবল যদি আপত্তি করে তখন না হয় ওটাকে মারিয়া আহার করিয়া ফেলিলেই চলিবে। কিন্তু এখন যদি একটা জীবন্ত বাছুর কাঁধে করিয়া হাজির হইতে পারি আমাদের দলের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া যাইবে। কিন্তু কি করিয়া ধরা যায়! উহার মায়ের নিকট যাওয়া তো অসম্ভব। একটা চিল আসিয়া একটু দূরে বসিয়াছিল, গাভীটা এমন তাড়া করিয়া গেল যে সে পলাইবার পথ পাইল না। ভাবিলাম সন্ধ্যার অন্ধকার নামিলে হয়তো নিঃশব্দচরণে উহার নিকটবর্তী হইতে পারিব। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করা নিরাপদ নয়। উন্নগা পর্বতের আশেপাশে বহুরকম হিংস্র শ্বাপদ আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। বাঘের গর্জন, এমন কি সিংহের গর্জনও মাঝে মাঝে শুনিয়াছি। হায়েনার ডাক তো প্রায়ই শোনা যায়। তাছাড়া আমাদের দলের জিজা বন্যকুক্কুরও দেখিয়াছে নাকি। বন্যকুক্কুরের মতো ভয়ানক প্রাণী আর কিছু নাই। একবার তাহাদের কবলে পড়িলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। একা আসিয়াছি, একটা উদ্ভট খেয়ালের বশীভূত হইয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত হইবে কিনা ভাবিতেছিলাম, এমন সময় এক কাণ্ড ঘটিল। বাছুরটা উঠিয়া টলিতে টলিতে ঠিক আমার গাছটার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মা যদিও তাহার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছিল কিন্তু ঠিক কাছটিতে ছিল না, শিলাঙ্গী গাছের উপর হইতে তাহাকে যে ঘাসেব বোঝা দিয়া গিয়াছিল সেইটিই সে তখন শেষ করিতেছিল। আমি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না, আমার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইল, আমি টপ করিয়া গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বাছুরটিকে কাঁধে তুলিয়া লইলাম এবং মুখ দিয়া তাহার একটা পা কামড়াইয়া ধরিয়া তাড়াতাড়ি আবার গাছে উঠিয়া গেলাম। যতক্ষণ আমি গাছে উঠিতেছিলাম ততক্ষণ বাছুরটা আমার মুখ হইতে ঝুলিতেছিল। চকিতের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটিযা গেল। গাছে উঠিয়া বাছুরটাকে ভাল করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিলাম। কিন্তু সে এত ছটফট এবং চিৎকার করিতেছিল যে তাহাকে সামলানো শক্ত হইয়া উঠিল। তাহার মাও গাছেব নীচে ছুটিয়া আসিয়াছিল এবং ঊর্ধ্বমুখ হইয়া হাম্বারব করিতেছিল। বাছুরটাকে এক হাতে আঁকড়াইয়া বুকের কাছে ধরিয়াছিলাম, আর এক হাত দিয়া ধরিয়াছিলাম একটা গাছের ডাল। ভয় হইতেছিল যদি গাছের ডালটা ভাঙিয়া যায় তাহা হইলে নীচে পড়িয়া যাইব এবং নীচে পড়িয়া গেলেই সুনিশ্চিত মৃত্যু। বাছুরটাকে ফেলিয়া দিলেই সব গোল চুকিয়া যাইত, কিন্তু বাছুরটাকে কিছুতেই ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছিল না, আসন্ন বিপদকে তুচ্ছ করিয়া প্রাণপণে আমি তাহাকে আঁকড়াইয়া বসিয়া রহিলাম। সহসা লক্ষ্য করিলাম কোথা হইতে ধোঁয়া আসিতেছে, এখানে আগুন জ্বালাইল কে? কাছে-পিঠে তো কোনো মানুষ আছে বলিয়া জানা নাই। পরমুহূর্তেই সেই কৃষ্ণাঙ্গী কিশোরীর কথা মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে একটা অজানা আশঙ্কাও ঘনাইয়া আসিল মনের ভিতর। উন্নগা পর্বত যদি মনুষ্য অধ্যুষিত হয় তাহা হইলে চিন্তার কথা। যে কোনো দিন অতর্কিতে তাহারা আসিয়া হানা দিতে পারে। ফিরিয়া গিয়াই ধবলকে কথাটা বলিতে হইবে। আমার চিন্তাধারা আর অগ্রসর হইবার অবসর পাইল না, কারণ পরমুহূর্তেই একটা বর্শা আসিয়া মাথার ঠিক উপরের ডালটাতে বিঁধিল, একটুর জন্য আমার মাথাটা বাঁচিয়া গেল। কাহারও বর্শার লক্ষ্যস্থল হইয়া বসিযা থাকা নিরাপদ নহে মনে করিয়া যে-ই স্থান পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করিলাম অমনি বাছুরটা আমার কোল হইতে

নীচে পড়িয়া গেল। বড়ই দুঃখ হইল, কিন্তু একটা গো-শাবকের জন্য নিজের প্রাণ বিপন্ন করা চলে না। গাছের আরও উপরে উঠিয়া ঘনপত্রপল্লবাচ্ছন্ন একটা স্থানে গিয়া আশ্রয় লইলাম। অনেকক্ষণ আর কোনো কিছু ঘটিল না। সন্তর্পণে একবার উঁকি দিয়া দেখিলাম বাছুরটার কি হইল। কিছুই হয় নাই, দেখিলাম তাহার মা একটু দূরে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিয়া দিতেছে। সে দিব্য মায়ের আশেপাশে ঘুরিতেছে, মাঝে মাঝে লাফাইবার চেষ্টাও করিতেছে। তাহাদের দিকে কিন্তু ভাল করিয়া আর মন দিতে পারিতেছিলাম না। বর্শাটা শুধু যে গাছের ডালেই বিঁধিয়াছিল তাহা নয়, আমার মনেও বিঁধিয়াছিল। বর্শাটা কে নিক্ষেপ করিল না জানা পর্যন্ত স্বস্তি পাইতেছিলাম না। আস্তে আস্তে আবার উপর হইতে নীচে নামিলাম এবং বর্শাটা বৃক্ষশাখা হইতে খুলিয়া লইয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। চমৎকার পালিশ করা পাথরের বর্শা, খুব বড় নয়, কিন্তু বেশ তীক্ষ্ণ। সে যুগে আমরা সকলেই পালিশ করা অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতাম, কিন্তু এমন চমৎকার পালিশ করা অস্ত্র আমাদের ছিল না। আমি সবিস্ময়ে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অস্ত্রটিকে বারংবার নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, এমন একটা চমৎকার অস্ত্র হস্তগত হওয়াতে অতিশয় পুলকিতও হইয়াছিলাম। একবার ইচ্ছা হইল এই অস্ত্রের দ্বারাই গাভীটাকে হত্যা করিয়া গো-শাবকটিকে হরণ করি। গাভীর কপালের ঠিক মধ্যস্থলে যদি এই বর্শা বিদ্ধ করিতে পারি তাহা হইলে তাহাকে আর উঠিতে হইবে না। আর একবার উঁকি দিয়া দেখিলাম তাহারা কোথায় কিভাবে আছে। এবার কিন্তু তাহাদের আর দেখিতে পাইলাম না। আরও খানিকটা উপরে উঠিয়া দেখিলাম, তাহারা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। সেই বৃক্ষবেষ্টিত ঝোপের বাহিরে বেশ খানিকটা বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠের মতো স্থান ছিল। দেখিলাম, তাহারা সেই মাঠের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। মাঠের অপর পারে একদল গরু চরিতেছে। সেই দিকেই তাহারা চলিয়াছে। একটা জীবন্ত গো-শাবক লইয়া গিয়া আমাদের দলের মধ্যে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিব আশা করিয়াছিলাম তাহা বিসর্জন দিতে হইল। নামিতে যাইব এমন সময় দেখি নীচের একটা ডালে সেই কৃষ্ণা কিশোরীটি আমার দিকে নির্নিমেষে তাকাইয়া বসিয়া আছে। তাহার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, চোখের পলক পড়িতেছে না। আমিও নির্নিমেষে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। অমন নিখুঁত চোখমুখের গড়ন ইতিপূর্বে দেখি নাই। তাহা এতই অপূর্ব যে সহসা আমি ভয় পাইয়া গেলাম। মনে হইল মানুষ নয়, কোনো দেবতা, বা অপদেবতা। অপদেবতার ভয়টাই আমাদের বেশি ছিল সে যুগে। উন্নগা পর্বতে যে একাধিক অপদেবতা নিশ্চয়ই আছে এ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে আলাপ আলোচনাও হইয়াছিল। একদিন ধবলের বৃদ্ধা জননী শানগিজাকি বলিতেছিল উড্ডীয়মান শকুনদের ভাবগতিক দেখিয়া তাহার মনে হয় যে, উন্নগা পর্বতে প্রেতিনীরা বাস করে। আমাদের দলের আর একজন শিকারি রুতারু একদিন স্বচক্ষে নাকি একটা মায়ামৃগও দেখিয়াছিল। রুতারু মৃগটিকে অনুসরণ করিতেছিল, কিছু দূর যাইবার পর মৃগটি তাহার চোখের সামনেই নাকি অদৃশ্য হইয়া গেল, পরমুহূর্তে রুতারু দেখিতে পাইল, অদূরবর্তী ঝোপটা নড়িতেছে। রুতারু ভাবিল হরিণটাই হয়তো সেই ঝোপে ঢুকিয়াছে, ছুটিয়া সেখানে গেল কিন্তু হরিণ দেখিতে পাইল না, দেখিল বৃহচ্চক্ষু একটা বিরাট পেচক বসিয়া আছে। রুতারুর দৃঢ় ধারণা মৃগটাই পেচকে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। শিলাঙ্গীকে দেখিয়া আমিও তাই প্রথমটা ভীত হইয়াছিলাম। আরও ঘাবড়াইয়া গেলাম যখন সে কোনো কথা না বলিয়া আমার দিকে হস্ত দুইটি প্রসারিত করিয়া দিল।

'কে তুমি, কি চাও?'

আমার মুখ দিয়া কথাগুলি বাহির হইয়া পড়িল। অনেকটা ধমকের মতো শুনাইল। কথাগুলি বলিয়া আমি আরও ভয় পাইয়া গেলাম, যদি প্রেতিনীই হয়, ধমক সহ্য করিবে না, হয়তো—।

'আমার বর্শা ফিরাইয়া দাও।'

শুনিয়া তাক লাগিয়া গেল! এ যে আমাদের ভাষায় কথা কহিতেছে!

'কে তুমি?'

'আমি শম্ভীর কন্যা শিলাঙ্গী।'

'কোথায় থাক তুমি?'

'উন্নগা পর্বতের অপর পারে। আমার বর্শা দাও—'

'তুমি বর্শা ছুঁড়িয়াছিলে কেন?'

'তোমাকে আঘাত করিবার জন্য।'

'আমার অপরাধ?'

'তুমি আমার বাছুর চুরি করিয়াছিলে।'

'তোমার বাছুর? বাছুরটিকে তো আমি ভূমিষ্ঠ হইতে দেখিলাম। তোমার হইল কখন?'

'উহার জন্মের পূর্ব হইতেই। ও যখন মায়ের পেটে আসে নাই, তখন হইতে। উহার মা যে আমার—'

'পুষিয়াছ?'

'না। উহাকে আমি অনেকদিন হইতেই পছন্দ করিয়াছি। সেইজন্য আমাদের দলের কেহ উহাকে কিছু বলে না। উহার নাম কি জান? দুধুনী, উহার বাছুরের নাম রাখিব মধুনী। আমার বর্শাটা দাও, আমি চলিয়া যাই।'

'তোমারা কাহার দল? দলপতির নাম কি?'

'রোহা।'

'তোমার কে হয়।'

'বাবা।'

'তোমরা কি চাষ কর?'

'না, আমরা গরু পালন করি। আমাদের গরুর দল এখন উন্নগা পাহাড়ে আসিয়াছে, তাই আমরা এখানে আসিয়াছি।'

'পালন কর, মানে? পোষ না অথচ পালন কর কিরূপে?'

'আমরা একদল গরুকে আগলাইয়া বেড়াই। কোনো গাভীর যখন বাছুর হয়, তখন ফাঁস লাগাইয়া সেই গাভীটিকে আমরা ধরি, ধরিয়া তাহার দুধ খাই। দুধুনীকে কিন্তু কেহ ধরিবে না বলিয়াছে।'

'দুধ খাও!'

খবরটা শুনিয়া সত্যই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। খাদ্য হিসাবে বহুপ্রকার জিনিসের ব্যবহার আমরা নিজেরা করিতাম, অপরকেও করিতে শুনিয়াছি, একজন মানুষ আর একজন মানুষকে আহার করে, এ সংবাদও বিস্ময়কর ছিল না। কিন্তু মানুষ গরুর দুধ

খাইতেছে, এ সংবাদ ইতিপূর্বে আর শুনি নাই। বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া শিলাঙ্গীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

'আমার বর্শাটা দাও!'

'তোমরা গরুর দুধ খাও কি করিয়া? গাভীর বাঁটে মুখ লাগাও নাকি! তাহাই বা কি করিয়া সম্ভব?'

শিলাঙ্গী হাসিয়া ফেলিল, কিন্তু কোনো উত্তর দিল না।

'বল না, কি করিয়া দুধ খাও তোমরা?'

'নিজেই আসিয়া দেখিয়া যাও।'

পরমুহূর্তেই তাহার চোখে শঙ্কা ঘনাইয়া আসিল। বলিল, 'না, আসিবার দরকার নাই। আমাদের দলের ঝোন্‌ঝিরা বড় ভয়ানক লোক। বাহিরের কাহাকেও সে সহ্য করিতে পারে না। একবার একজন বিদেশি আমাদের এলাকায় আসিয়া পড়িয়াছিল, ঝোন্‌ঝিরা বর্শার এক আঘাতে তাহাকে মারিয়া ফেলে। তাহার যেমন আকৃতি, তেমনি প্রকৃতি। তোমার যাইবার দরকার নাই। আমার বর্শাটা দাও, আমি চলিয়া যাই এবার।'

আমার আত্মসম্মান আহত হইয়াছিল। মনস্থ করিলাম, ঝোন্‌ঝিরা যত ভয়ানক লোকই হোক না কেন, শিলাঙ্গীদের আস্তানাটা একবার দেখিয়া আসিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে ঝোন্‌ঝিরার সম্মুখীনও হইব, তখন কিন্তু প্রকাশ করিয়া কিছু বলিলাম না। কেবল বলিলাম, 'আমাকে আগে বল, কি করিয়া তোমরা দুধ খাও। আমার তো কিছুতেই মাথায় ঢুকিতেছে না।'

'তুমি বোকা তাই ঢুকিতেছে না। গরুর পা চারিটি খুঁটিতে ভাল করিয়া বাঁধিয়া তাহার পর বাঁট হইতে টানিয়া টানিয়া আমরা দুধ বাহির করি।'

'দুধ মাটিতে পড়িয়া যায় না?'

'মাটিতে পড়িবে কেন? বাঁশ কাটিয়া জীবা যে চমৎকার কেঁড়ে প্রস্তুত করে। তাহাই একজন ধরিয়া থাকে, দুধ তাহাতেই পড়ে।'

রূপকথা শুনিয়া তোমরা যে আনন্দ পাও, আমি তখন সেই আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম। আমরা তখনও পাত্র প্রস্তুত করিতে শিখি নাই। ঘাংকো অনেকদিন পরে সহসা একদিন আসিয়া আমাদের শিখাইয়া দিয়াছিল কি করিয়া মাটি হইতে পাত্র প্রস্তুত করিতে হয়। সে সঙ্গে করিয়া একটা লাউ এবং কিছু লাউয়ের বীজও আনিয়াছিল। মাটি হইতে পাত্র প্রস্তুত করিতে হইলে লাউয়ের খোলার প্রয়োজন। এইজন্যই কিছুদিন পরে আমাদের লাউ চাষও করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বাঁশ কাটিয়া যে দুধের কেঁড়ে প্রস্তুত হইতে পারে, একথা শিলাঙ্গীর মুখেই প্রথম শুনিলাম এবং শুনিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম। একটা অপূর্ব পুলকও আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। বাঁশ ইতিপূর্বে আমিও বহুবার দেখিয়াছি, বাঁশ দিয়ে বেড়া প্রস্তুত করিয়াছি, ঘরের চাল বানাইয়াছি, কিন্তু বাঁশের যে এ-সম্ভাবনা ছিল, তাহা কোনো দিন ভাবি নাই। মনে হইল, সত্যই তো, একটা গ্রন্থির সহায়তা লইলেই তো চমৎকার একটি পাত্র হয়। এই সহজ সত্যটি যাহারা আবিষ্কার করিয়াছে, গাভীর বাঁট হইতে দুগ্ধ আহরণ করিয়া যাহারা পান করিতেছে, তাহারা নিশ্চয়ই আশ্চর্য লোক। তাহাদের সহিত যেমন করিয়া হউক আলাপ করিতে হইবে। কোনো অজানা সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হওয়াই তখন নিয়ম ছিল, তাহারা

যে মিত্রভাবাপন্ন, ইহার নিঃসংশয় প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাহাদিগকে শত্রু মনে করিতে হইবে, এই নীতি পালন করিয়াই আমরা চলিতাম, কিন্তু এই অজানা সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ না হইয়া পারিলাম না। সেকালে শ্রদ্ধার সহিত ভয়ও জড়িত হইয়া থাকিত। শিলাঙ্গীর মুখের দিকে আমি সভয় সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। কোন্ সূত্রে ইহাদের সহিত বন্ধুত্ব করা সম্ভব, মনে মনে তাহাও চিন্তা করিতেছিলাম, সহসা একটা কথা মনে পড়িয়া গেল।

'এইবার আমার বর্শাটা দাও—'

শিলাঙ্গী উঠিয়া আসিয়া বর্শাটা ধরিয়া টান দিল।

'দিতেছি। আমার আর একটি কথার জবাব দাও। গাছের উপর হইতে ওই গাভীটির মুখের সামনে ঘাসের বোঝা কে ফেলিয়াছিল? তুমি কি?'

'হ্যাঁ, আমিই।'

'ওই ঘাস কোথা হইতে পাইলে? ও-ঘাস তো পাহাড়ে কোথাও হয় না।'

'কেন, তোমাদের ক্ষেতেই তো প্রচুর হয়।'

'আমাদের ক্ষেত হইতে আনিয়াছ?'

শিলাঙ্গী মুচকি হাসিয়া মাথা নাড়িল।

'কি করিয়া আনিলে, আমাদের ক্ষেতে তো সর্বদা পাহারা থাকে।'

শিলাঙ্গী স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'ওটা তোমার ভুল ধারণা। সর্বদা পাহারা থাকে না। গভীর রাত্রে সকলেই তোমরা ঘুমাইয়া পড়।'

'কি করিয়া জানিলে?'

'আমি যে রোজ যাই।'

'রোজ যাও! বল কি!'

শিলাঙ্গীর চক্ষু দুইটি হাস্য-দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে কোনো উত্তর দিল না।

'রোজ যাও? কোন্ পথ দিয়া যাও? বেড়া ডিঙাইয়া?'

এবারও শিলাঙ্গী কোনো উত্তর দিল না। তাহার হাস্য-দীপ্ত চক্ষু দুইটি কেবল জ্বলজ্বল করিতে লাগিল। পরমুহূর্তেই সে যাহা করিল, তাহার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। ফস্ করিয়া আমার হাত হইতে বর্শাটা কাড়িয়া লইয়া তরতর করিয়া সে গাছ হইতে নামিয়া গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুসরণ করিলাম। এবারও কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারিলাম না। আশ্চর্যভাবে সে যেন কোথায় অন্তর্হিত হইল। ঝোপের চতুর্দিকেই উন্মুক্ত উপত্যকা, লুকাইয়া থাকিবার মতো কোনো আড়াল ছিল না, অল্প সময়ের মধ্যে অত বড় প্রান্তর ছুটিয়া পার হওয়াও সম্ভব নয়। গেল কোথায়? চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। সহসা সেই ধোঁয়াটা আবার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ঝোপের মধ্যে পুনরায় ঢুকিয়া দেখিলাম, শুষ্ক খড়ের বাণ্ডিলটা তখনও জ্বলিতেছে। পূর্বে তো এটা এখানে ছিল না, শিলাঙ্গীই নিশ্চয় আনিয়াছে। চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইলাম, কিছু দূরে দূরে দগ্ধ খড়ের অঙ্গার ও ভস্ম পড়িয়া রহিয়াছে। সেইগুলিকে অনুসরণ করিয়া অবশেষে একটি গর্তের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গর্তের মুখটি পাথর দিয়ে ঘেরা। দূর হইতে সহসা বুঝিতে পারা যায় না যে এই স্থানে একটা গর্ত আছে, মনে হয়, ছোট-বড় কতকগুলি পাথর বুঝি স্বাভাবিকভাবেই স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম। সন্দেহ রহিল না যে, শিলাঙ্গী

এই পথেই অন্তর্ধান করিয়াছে। নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম খানিকক্ষণ। দেখিতে পাইলাম, গরুর দল চরিতে চরিতে আরও দূরে চলিয়া গিয়াছে। মনে হইল, দক্ষিণ দিকে পর্বতের সানুদেশে কয়েকটি ছাগলও নামিয়া আসিয়াছে। ধবলের প্রিয়তমা পত্নী নিনানির আবদার-মাখা আদেশ মনে পড়িল। নিনানি কখনও রূঢ়ভাবে আদেশ করিত না; তাহার আদেশ অনুরোধের মতো শুনাইত। 'দেখ না বাপু, একটা ছাগল যদি পাও, গরুর মাংস আর ভাল লাগে না।'—তাহার এই কথাগুলির সঙ্গে নয়নের দৃষ্টি ও অধরের ভঙ্গিমা মিলিয়া যাহা হইত, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার ক্ষমতা আর যাহারই থাক আমার ছিল না। নিনানি ধবলের প্রিয়তমা পত্নী ছিল বটে, কিন্তু সে আমাকে ভালবাসিত। আমিও তাহার জন্য বহু অসাধ্য সাধন করিতাম। কন্যা নদীর অভিমুখে যখন আমরা আসিতেছিলাম, তখন মাঝে মাঝে নিনানি এত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল যে, তাহাকে স্কন্ধে বহন করিয়া না আনিলে ফেলিয়া আসিতে হইত। মীংরা, ঘিসু এবং আমি—আমরা তিনজনই তাহাকে বহন করিতে সম্মত হইয়াছিলাম। নিনানি কিন্তু আমার স্কন্ধেই উঠিয়াছিল, যেন কৃপাপরবশ হইয়াই উঠিয়াছিল। ধবল নিনানিকে পত্নীরূপে দাবি করিয়াছিল বলিয়া আমি তাহাকে পাই নাই (দলপতির দাবি অগ্রাহ্য করিবার উপায় ছিল না) কিন্তু সে যে আমাকেই চায়, তাহার অজস্র প্রমাণ দিতে সে কখনও কুণ্ঠিত হইত না। ছাগলগুলির দিকে আর একবার চাহিয়া দেখিলাম। মনে হইল, একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব নাকি যদি একটাকেও অন্তত মারিতে পারা যায়, কিন্তু পরমুহূর্তেই একটা অদ্ভুত যুক্তি আমাকে নিরস্ত করিল। ভাবিলাম, এই অপরিচিতা মেয়েটির সংবাদ যতটা পারি সংগ্রহ করিয়া না লইয়া গেলে দলপতি ধবলের নিকট আমি অপরাধী হইব। বিশেষত ইহারা যখন আমাদের ক্ষেত হইতে ফসল চুরি করিয়া লইয়া যায়, তখন ইহাদের সম্বন্ধে অবহিত হওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তখন এইরূপ ভাবিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এখন ইহা অকপটে স্বীকার করিতেছি যে, শিলাঙ্গী যদি পুরুষ হইত তাহা হইলে আমার কর্তব্যবোধ আমাকে ওই গর্তে প্রবেশ করিতে প্ররোচনা দিত না। আমি বড় জোর সংবাদটা ধবলের কর্ণগোচর করিয়া দিয়া তাহার নির্দেশের অপেক্ষা করিতাম। সেযুগেও আমরা মোহের কবলে পড়িয়া মনকে চোখ ঠারিতে শিখিয়াছিলাম। শিলাঙ্গীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তাই নিনানির অনুরোধের মূল্যটা আমার নিকট কমিয়া গিয়াছিল।

...গর্তের ভিতর অবতরণ করিলাম। গর্তের মুখটা বেশ বড় ছিল, কিন্তু কিছুদূর গিয়াই দেখিলাম তাহা ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইতেছে। সর্পের মতো বুকে হাঁটিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, আমার ধনুক লইয়া তাহা অসম্ভব। ফিরিয়া আসিলাম। যে বৃক্ষগুলি সেই ঝোপটাকে বেষ্টন করিয়াছিল, তাহারই একটাতে আরোহণ করিয়া আমার তীরগুলি ও ধনুকটি লুকাইয়া রাখিলাম। একটা লতা দিয়া একটা গাছের ডালে বেশ দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া দিলাম সেগুলিকে। পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া গর্তে প্রবেশ করিলাম। খেয়াল হইল না যে সন্ধ্যা আসন্ন, সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে। গর্তের ভিতর কতক্ষণ যে বুকে হাঁটিয়াছিলাম, তাহা জানি না, ঘণ্টা মিনিটের কোনো আন্দাজাই ছিল না তখন আমাদের। আকাশ দেখিয়া সময় নির্ণয় করিতাম, কিন্তু অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে সে সুযোগও ছিল না। তবে বহুক্ষণ যে লাগিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল, শ্বাসকষ্ট হইতেছিল। সুড়ঙ্গের অপর প্রান্তে যখন উপস্থিত হইলাম কোনো আলো দেখিতে পাইলাম না, কারণ রাত্রির

অন্ধকার নামিয়াছিল। অসংখ্য ঝিল্লী-ধ্বনি শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম সুড়ঙ্গপথ শেষ হইয়াছে। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়াও আমাকে সে-কথা জানাইয়া দিল। তাহার পর সহসা মনুষ্যকণ্ঠ শুনিতে পাইলাম। কে যেন আমাদের ভাষাতেই কথা বলিতেছে। আবার মনে বিস্ময় জাগিল। ইহারা আমাদের ভাষা জানিল কি করিয়া। ইহাদের সহিত কোনো সম্পর্ক কি ছিল কখনও? স্মরণ করিতে পারিলাম না। এখন যে শক্তির বলে আমি জন্ম-জন্মান্তরের ঘটনা বিবৃত করিয়া চলিয়াছি তখন সে শক্তি থাকিলে যাহা শুনিলাম তাহাতেই সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাইতাম। কিন্তু তখন সে শক্তি ছিল না। জন্মান্তরে যে কাংড়ার দলে আমি নিজেই একদিন ছিলাম, বারংবার সেই কাংড়ার নাম শুনিয়াও আমি বুঝিতে পারিলাম না যে, আমরা এবং ইহারা একটি গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা মাত্র। সেই জন্যই আমাদের ভাষা এক। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে আমরা বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছি, ভাষা বিশেষ বদলায় নাই।

...সুড়ঙ্গ মুখে উৎকর্ণ হইয়া শুইয়াছিলাম। মনে হইতেছিল, কে যেন রূপকথা বলিতেছে, অনেকে বসিয়া শুনিতেছে। যদিও আমি কাহারও মুখ দেখিতে পাইতেছিলাম না, কিন্তু একটা অস্ফুট কলরব হইতে বোধ হইতেছিল যে, কোনো কথক একদল লোকের সম্মুখে কথকতা করিতেছে।

কথক বলিতেছিল, 'সাকুণ্ডা অরণ্যের প্রান্তে একটা পাথর আছে অবিকল গাভীর মতো দেখিতে। আমাদের পূর্বপুরুষ কাংড়া সেই প্রস্তর-গাভীর পঞ্জর ভেদ করিয়া পাতাল হইতে উঠিয়াছিল। তাহার হস্তে ছিল শ্যামল তৃণগুচ্ছ।' ...কথক এইবার গান গাহিয়া উঠিল। 'কাংড়ার হাতে ছিল শ্যামল তৃণগুচ্ছ। যে গাভী তাহাকে প্রসব করিয়াছিল, সেই গাভীর প্রাণই ছিল তাহার হস্তে শ্যামল তৃণগুচ্ছের রূপ ধরিয়া। যে শ্যামল তৃণগুচ্ছ গাভীর স্তনে শুভ্র দুগ্ধে রূপান্তরিত হয়, সেই শ্যামল তৃণগুচ্ছ ছিল কাংড়ার হস্তে। যে হস্তে কাংড়া পরে দলপতির নিষ্ঠুর দণ্ড ধারণ করিবে, সেই হস্তে সে তখন ধরিয়াছিল শ্যামল তৃণগুচ্ছ। যে শ্যামল তৃণগুচ্ছের সন্ধানে সমস্ত দলকে একদা ব্যাপৃত হইতে হইবে, সেই শ্যামল তৃণগুচ্ছ ছিল কাংড়ার হস্তে' ...এই একই কথা নানাভাবে সুর করিয়া কথক বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিল, লক্ষ্য করিলাম, তাহার সহিত আরও অনেকে যোগ দিয়া তাহার কথার পুনরাবৃত্তি করিতেছে। অবিশ্রান্ত ঝিল্লী-ধ্বনির সহিত মিশিয়া সমবেত কণ্ঠের সুরলহরী অন্ধকার পর্বতের সানুদেশে এক অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি করিল। কিছুক্ষণ পরে গান থামিয়া গেল। কথক আবার বলিতে লাগিল, 'সেই প্রান্তর-গাভীর ঠিক পাশেই ছিল একটি গর্ত। সেই গর্ত হইতে বাহির হইল একটি জীবন্ত গাভী এবং তাহার পিছু পিছু একটি গো-শাবক। গাভীটি ছিল ঘটোধ্নি, তাহার স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছিল। কাংড়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,- আমি তোমার জন্য ঘাস আনিয়াছি, তুমি আমাকে তোমার দুধ দাও। গাভী বলিল, 'ঘাস তোমার নয়, ঘাস ভূমির। ভূমি হইতে তুমিও যেমন ছিঁড়িয়া আনিয়াছ, আমিও তেমনি ছিঁড়িয়া লইতে পারি। কেবল ঘাসের জন্য তোমাকে দুধ দিব না, যে দুধ আমার বাছুরের জন্য সে দুধ আমি তোমাকে ঘাসের বদলে দিব না।' কথকের এই কথা শেষ হইতে না হইতে সমবেত নারীরা গান গাহিয়া উঠিল, 'দুধ দিব না, বাছুরের জন্য যে দুধ রাখিয়াছি তাহা দিব না, তাহা দিব না।' এক কলি গাহিয়াই তাহারা থামিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত কথকও কিছু বলিল না। ঝিল্লীর ঐক্য-ঝঙ্কারটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল সহসা। মনে হইল তাহারাও এ বিষয়ে তাহাদের বক্তব্য যেন বলিতেছে। একটু পরে কথক পুনরায় আরম্ভ করিল

তাহার কথকতা। কাংড়া উত্তর দিল, 'আমি তোমার দুধ লইবই। ঘাসের বদলে তাহা যদি না দিতে চাও, কিসের বদলে দিবে বল। দুধ আমার চাই। তোমার শাবককে আমি বঞ্চিত করিব না, তোমার বিশাল স্তনে এত দুধ আছে, তোমার শাবককে দিয়াও অনেক উদ্বৃত্ত থাকিবে। তোমার সেই উদ্বৃত্ত দুধ আমি চাই। কিসের বদলে দিবে বল।' গাভী উত্তর দিল, 'তোমার শক্তির বদলে। আমাকে যদি জয় করিতে পার, তাহা হইলেই দুধ পাইবে, তাহা হইলেই তোমার আহরিত তৃণ আমি ভোজন করিব।'

আবার কথক গান গাহিয়া উঠিল, 'আমাকে জয় কর। তোমার শক্তির পরিচয় দিয়া আমাকে নতি স্বীকার করাও, আমাকে জয় কর। তোমার শক্তির বন্ধনে আমাকে বাঁধ, তোমার শক্তির আকর্ষণেই আমার স্তন হইতে দুগ্ধ দোহন কর, আমাকে জয় কর, হে কাংড়া, শক্তির পরিচয় দাও, আমাকে জয় কর।' এবারও কথকের সহিত শ্রোতাবা গাহিতে লাগিল। এবার কিন্তু লক্ষ্য করিলাম, একবার পুরুষেরা একবার মেয়েরা গাহিতেছে। সঙ্গীতের সহিত মধ্যে মধ্যে হুড়াহুড়ি এবং কলহাস্যধ্বনিও শুনা যাইতেছে। সন্তর্পণে মাথা আর একটু তুলিয়া দেখিলাম শুধু গান নয়, গানের সহিত অভিনয়ও যুক্ত হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা উঠিয়া দাড়াইয়া পুরুষদের দিকে দুই হাত প্রসারিত করিয়া যখন গান গাহিতেছে 'আমাকে জয় কব, আমাকে জয় কর'—তখন পুরুষদের মধ্যে দুই-চারিজন উঠিয়া তাহাদের জয় করিবার জন্যই সচেষ্ট হইতেছে। কলহাস্যধ্বনি এবং হুড়াহুড়ি ইহারই ফল। আবার পুরুষরা যখন উঠিয়া মেয়েদের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া গাহিতেছে—'আমাদের জয় কর, আমাদের জয় কর'—তখন মেয়েরাও তাহাদের আক্রমণ করিতে ছাড়িতেছে না। সমস্ত সভায় একটা আনন্দের হিল্লোল বহিতেছে। আমার সর্বাঙ্গও অবর্ণনীয় পুলকে বারংবার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইভাবে চলিয়া গান ও অভিনয় থামিয়া গেল। কথক তাহার গল্প আরম্ভ করিল আবার।

কাংড়া বলিল, 'তুমি যাহা দাবি করিয়াছ, তাহা পাইবে, আমি যাহা দাবি করিয়াছি, তাহাও আমি অর্জন করিব।' কাংড়া গাভীর দিকে অগ্রসর হইল, গাভী ঊর্ধ্বপুচ্ছে পলাইতে লাগিল। গো-শাবকটি কিন্তু কিছুদূর ছুটিয়া আর ছুটিতে পারিল না। কাংড়া তখন তাহাকে নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইল। গো-শাবককে স্কন্ধে লইয়াও পূর্ব্ববৎ বেগে ছুটিতে লাগিল সে। গাভীটি পিছন ফিরিয়া দেখিল যে, তাহার বৎসটি কাংড়ার বলিষ্ঠ স্কন্ধের উপর নিরাপদে রহিয়াছে, তখন সে নিশ্চিন্ত হইল। নিশ্চিন্ত হওয়াতে তাহার গতিবেগ আরও বাড়িয়া গেল যেন। কাংড়া তাহার গতিবেগ বাড়াইয়া দিল। কত দিন তাহারা যে ছুটিয়াছিল, তাহার হিসাব রাখিয়াছিল আকাশেব সূর্য, চন্দ্র আর নক্ষত্রেরা দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন একে একে আসিল এবং চলিয়া গেল। ক্লান্তির পর বিশ্রাম এবং বিশ্রামের পর উদ্যম আসিল এবং চলিয়া গেল। আশার পর নিরাশা এবং নিরাশার পর নূতন আশা আসিল এবং চলিয়া গেল। অবশেষে তাহারা যে স্থানে উপস্থিত হইল, সে স্থানের চতুর্দিক পর্বত-প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রবেশের একটি মাত্র সঙ্কীর্ণ পথ ছিল, সেই পথ দিয়া তাহারা এক পর্বত-পরিবৃত উপত্যকায় প্রবেশ করিল। চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কাংড়া নিমেষের মধ্যে বুঝিতে পারিল আর ছুটিতে হইবে না। গো-বৎসটিকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া কাংড়া ছুটিয়া একটি পর্বতের উপর উঠিয়া গেল এবং সেখান হইতে বিশাল একটি প্রস্তরখণ্ড ঠেলিতে ঠেলিতে আনিয়া সেই সঙ্কীর্ণ প্রবেশপথটি অবরুদ্ধ করিয়া দিল। গাভী বন্দিনী হইল।'

কথক গান শুরু করিল আবার।

'গাভী বন্দিনী হইল। যে পর্বত-দেবতা চিরকাল মানুষের সহায়তা করিয়াছেন, তিনিই কাংড়ার সহায় হইলেন। দুরারোহ দুর্গম হইয়া তিনিই গাভীর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। নির্গমনের একমাত্র পথটি বন্ধ করিবার জন্য প্রস্তরখণ্ডও তিনি দিলেন। সেই পথটি বন্ধ করিবার বুদ্ধিও তিনি জাগাইয়া দিলেন কাংড়ার মস্তিষ্কে। কাংড়ার দুর্দম অধ্যবসায়ে প্রীত হইয়া স্বয়ং পর্বত-দেবতা তাহাকে সাহায্য করিলেন। গাভী বন্দিনী হইল।'

কথক গান থামাইয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিল কিছুক্ষণ। শ্রোতারাও নির্বাক হইয়া রহিল। প্রকট হইয়া উঠিল কেবল ঝিল্লী-ধ্বনি। সেই ঝিল্লী-ধ্বনি ভেদ করিয়া একটা হাম্বারব পরিস্ফুট হইয়া উঠিল সহসা। কথক সঙ্গে সঙ্গে কথকতা শুরু করিল।

'গাভী বন্দিনী হইল বটে, কিন্তু সহজে ধরা দিল না। কাংড়া ধরিতে গেলেই ছুটিয়া দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। সাত দিন সাত রাত্রি অবিশ্রান্ত ছুটাছুটি করিয়াও কাংড়া গাভীর নাগাল পাইল না। গাভী যখন ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়ে, কাংড়াকেও তখন বসিয়া পড়িতে হয়। কাংড়া দেখিল এভাবে গাভীকে জয় করা যাইবে না। একাধিক লোক থাকিলে হয়তো যাইত, কিন্তু একা সম্ভব নয়। কাংড়া তখন একটা বুদ্ধি বাহির করিল। গাভীকে দেখাইয়া দেখাইয়া সে তাহার শাবককে প্রহার করিতে লাগিল। প্রহার মানে প্রহারের অভিনয়। বস্তুত শাবকের কোনোরূপ আঘাত লাগে নাই। সন্ধ্যা পর্যন্ত এইভাবে প্রহার করিয়া কাংড়া অবশেষে শাবকটিকে জড়াইয়া একটি বৃক্ষতলে শয়ন করিযা ঘুমের ভান করিতে লাগিল। যাহা প্রত্যাশিত তাহাই ঘটিল। গভীর রাত্রে গাভীটি চুপি চুপি কাংড়ার কাছে আসিযা শাবকটিকে শুঁকিয়া শুঁকিয়া দেখিতে লাগিল, যে সত্যই সে বাঁচিয়া আছে কিনা। কাংড়া ঘুমায় নাই। গাভীটি নিকটে আসিতেই সে একলম্ফে তাহার স্কন্ধদেশে আরোহণ করিয়া বসিল এবং শিং দুইটি দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল। কাংড়াকে কাঁধে করিয়াই গাভীটি পরমুহূর্তেই ছুট দিল। লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া কাঁধ ঝাড়া দিয়ে নানাভাবে সে চেষ্টাও করিল কাংড়াকে ফেলিয়া দিতে। কিন্তু পারিল না। কাংড়া বজ্রমুষ্টিতে তাহার শিং দুইটি ধরিয়াছিল। অনেকক্ষণ এইভাবে ছুটিয়া গাভী অবশেষে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। কাংড়া সবলে তখন তাহার শিং দুইটা ধরিয়া পিছন দিকে টান দিতেই গাভীর মুণ্ডটি পৃষ্ঠের দিকে নীত হইল। তাহার চোখে চোখ রাখিয়া কাংড়া তখন প্রশ্ন করিল, 'বল, এইবার তোমাকে জয় করিয়াছি কিনা।' গাভী উত্তর দিল, 'করিয়াছ। আমি তোমার নিকট হার মানিলাম।' কাংড়া বলিল, 'এইবার তবে আমাকে দুধ দাও। বলিয়া দাও কি করিয়া আমি তোমার দুগ্ধ পান করিব। তোমার শাবক যেভাবে দুগ্ধ পান করিয়া থাকে, সেইভাবেই করিব কি?' গাভী বলিল, 'কর। কিন্তু তাহার পূর্বে আমাকে শাবকের কাছে লইয়া চল। কারণ শাবকের ওষ্ঠ-স্পর্শ ব্যতিরেকে আমার স্তনে দুগ্ধ ক্ষরিত হইবে না। আমার স্তনের দুগ্ধ শুকাইয়া গিয়াছে। শাবক পান করিতে আরম্ভ করিলে আবার স্তনে দুগ্ধ আসিবে। আমাকে শাবকের নিকট লইয়া চল।' কাংড়া গাভীকে শাবকের নিকট লইয়া গেল। শাবক আর শাবক ছিল না, তথাপি সে জননীকে দেখিয়া চিনিতে পারিল এবং তাহার স্তন্যপান করিতে লাগিল। দশ দিন দশ রাত্রি স্তন্যপান করিবার পর গাভীর স্তনে দুগ্ধ ক্ষরিত হইল। কাংড়াকে সম্বোধন করিয়া গাভী তখন বলিল, 'হে কাংড়া, এইবার তুমি আমার দুগ্ধ পান কর।' গো-শাবকের ন্যায়ই

কাংড়া প্রথমে গাভীর দুগ্ধ পান করিয়াছিল। দুগ্ধ পান করিয়া বলিয়াছিল, 'আমি তৃপ্ত হইলাম। আজ হইতে আমি তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিব, তোমার খাদ্য সংগ্রহের ভার লইব, পরিবর্তে তুমি আমাকে দুগ্ধ দিও।' গাভী উত্তর দিয়াছিল, 'দিব। কিন্তু আমাকে একেবারে বন্দিনী করিও না, আমাকে বনে বনে বিচরণ করিবার অধিকার দিও। আমি তোমারই অধীনে থাকিব, কিন্তু একেবারে আমার স্বাধীনতা হরণ করিও না। আমাকে যখন চাহিবে ফাঁদ পাতিও, আমি আসিয়া ধরা দিব। যখন আমার দুগ্ধ চাহিবে আমার পদচতুষ্টয়কে খুঁটিতে বাঁধিয়া দিও, আমি দুগ্ধ দিব। হে কাংড়া, আমি হার মানিয়াছি, কিন্তু আমার স্বাধীনতা একেবারে হরণ করিও না।' কাংড়া বলিল, 'বেশ তাহাই হইবে। তোমার যথেচ্ছ ভ্রমণের স্বাধীনতা আমি হরণ কবিব না, কিন্তু আমার দুগ্ধপানের স্বাধীনতাও তুমি হরণ করিও না। হে গাভী, শিকারের পিছনে পিছনে ছুটিয়া আমি আর খাদ্য সংগ্রহ করিতে চাহি না, তুমি দুগ্ধ দান করিয়া আমার খাদ্য সমস্যাব সমাধান কর। হে গাভী, আমাকে দুগ্ধ দাও—'

কথক গান আরম্ভ করিল।

'হে গাভী, আমাকে দুগ্ধ দাও, দুগ্ধ দাও। জ্যোৎস্নার মতো শুভ্র, ঝরনার মতো ফেনিল তোমার দুগ্ধ-ধারায় আমার দুঃখ দূর কর। আমাকে দুগ্ধ দাও। আমি তোমাব সেবা করিব, তুমি আমাকে দুগ্ধ দাও, আমি তোমার পূজা করিব, আমাকে দুগ্ধ দাও। তোমার দুগ্ধের শুভ্রতা আমার সমস্ত মলিনতাকে শুভ্র করিয়া দিক, আমাকে দুগ্ধ দাও...'

শুনিতে শুনিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সুড়ঙ্গের মুখটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ছিল, শীতল বাতাস বহিতেছিল, গানের সুরে আমার ক্লান্ত দেহ কখন যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা আমি বুঝিতেও পারি নাই। তন্দ্রার ঘোরেও আমি অস্পষ্টভাবে উহাদের সমবেত সঙ্গীত শুনিতে পাইতেছিলাম, মনে হইতেছিল বহু দূর হইতে ঝরনার অস্ফুষ্ট কলধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। আমি যেন সেই ঝরনার উদ্দেশ্যে চলিয়াছি, এই ধরনেব একটা এলোমেলো স্বপ্নও যেন তন্দ্রার ঘোরে আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। আচমকা শ্বাসবোধ হইয়া ঘুমটা ভাঙিয়া গেল। কে যেন আমার মুখের উপর চাপিয়া বসিয়াছে।

'কে, কে তুমি?'

'আমি শিলাঙ্গী। তুমি কে?'

শিলাঙ্গী তাড়াতাড়ি গর্তের মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল। আমিও বাহির হইয়া পড়িলাম। গভীর রাত্রি, চতুর্দিকে নির্জন, আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া শিলাঙ্গী বলিল, 'ও, তুমি! এখানে কি করিয়া আসিলে?'

'সুড়ঙ্গ পথে।'

'কেন আসিয়াছ?'

'তোমাকে দেখিব বলিয়া।'

'মিথ্যা কথা। তুমি আমার বাছুর চুরি করিতে আসিয়াছ। কিন্তু বৃথা আসিয়াছ, বাছুর এখানে নাই। সে এমন জায়গায় আছে যে সহজে খুঁজিয়া পাইবে না।'

তাহার সরল চক্ষু দুইটি হাস্য-দীপ্ত হইয়া উঠিল।

'বাছুর চুরি করিতে আসি নাই, সত্যই তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। তোমাকে আমার বড় ভাল লাগিয়াছে।'

শিলাঙ্গী নির্নিমেষে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে হইল আমার কথাগুলি সে বিশ্বাস করিয়াছে।

'আমি তাহা হইলে যাহা চাহিব দিবে?'

নিতান্ত সরলভাবে কথাগুলি বলিয়া সে সোৎসুকে আমার মুখের দিকে আবার চাহিল।

'কি চাও বল, যদি অসম্ভব না হয় নিশ্চয়ই দিব।'

'মোটেই অসম্ভব নয়।'

'কি?'

'তোমাদের ক্ষেতের ঘাস। আমার দুধুনী মধুনীকে খাইতে দিব। তুমি যদি দাও, তাহা হইলে রোজ আমাকে কষ্ট করিয়া আর চুরি করিতে হয় না।'

'তুমি কি রোজ চুরি করিয়া আন?'

'রোজ। এখনই তো চুরি করিতে যাইতেছিলাম।'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

'বল, দিবে?'

তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া আমি তাহাকে পাল্টা আর একটা প্রশ্ন করিলাম। বস্তুত এ বিষয়ে আমার মনে কৌতূহলও কম হয় নাই।

'তুমি আমাদের ক্ষেতে যাও কি করিয়া?'

শিলাঙ্গী সরল সত্য কথাই বলিল। তাহাকে মিথ্যা বলিতে কখনও শুনি নাই।

'আমি সুড়ঙ্গ পথেই যাই। ইঁদুরের মতো আমরা মাটির নীচে গর্ত করিয়াছি। ইঁদুরের গর্তগুলিকেই বড় করিয়া লইয়াছি। এই সুড়ঙ্গ পথে গিয়া আমি পাহাড়ের উপত্যকায় উপস্থিত হইব। সেখানে আর একটি সুড়ঙ্গ আছে কিছু দূরে। সেই সুড়ঙ্গটি একেবারে তোমাদের ক্ষেতের মাঝখানে গিয়া পড়িয়াছে। এই সুড়ঙ্গটি খরগোশরা করিয়াছিল, তাহারা তোমাদের ক্ষেতের মাঝখানে গিয়া কচি কচি ঘাস খাইয়া আসিত। আমিই প্রথমে সেটা আবিষ্কার করি, তারপর ঝোনঝিরা, রাঠা, বানন্দা এবং আরও অনেকে মিলিয়া গর্তটাকে বড় করিয়া দিয়াছে, এখন বেশ সহজে যাওয়া যায়। আমি রোজ যাই।'

আমি অবাক হইয়া শিলাঙ্গীব কথা শুনিতেছিলাম। আমাদের সতর্ক প্রহরাকে ফাঁকি দিয়া এই তস্করী প্রত্যহ আমাদের খাদ্য চুরি করিয়া আনে এবং তাহা এমনভাবে বলিতেছে যেন তাহা কোনো অন্যায় কার্য নহে! পরে জানিয়াছিলাম, তাহার ন্যায়-অন্যায়ের বোধটা একটা স্বতন্ত্র ধরনের।

'কাজটা কি ভাল কর?'

'কোন কাজটা—'

তাহার কথা শেষ হইবামাত্র আমি আবার প্রশ্ন করিলাম।

'এমন ভাবে আমাদের ঘাস চুরি করিয়া আনা।'

'চুরি করিয়া না আনিলে দুধুনী মধুনীকে খাওয়াইব কি করিয়া? তুমি আমাকে যদি রোজ কিছু কিছু দাও, আমি আর চুরি করিব না। দিবে?'

'ওই ক্ষেত যদি আমার একার হইত, নিশ্চয় দিতাম। কিন্তু উহা যে সকলের। সকলের মত না লইয়া কি করিয়া দিব বল? আমাদের দলপতি ধবলকে যদি তোমাদের দলপতি গিয়া

ব'লে এবং সে যদি রাজি হয়, তাহা হইলে নিয়মিতভাবে ঘাস পাইবে। কোনো গোলমাল হইবার সম্ভাবনা নাই।'

'রোহা কাহারও নিকট ভিক্ষা করে না। আমার দুধুনী মধুনীর জন্য, কেনই বা সে নিজেকে নিচু করিবে? আমি যদি তোমাদের দলপতিকে গিয়া বলি, সে কি রাজি হইবে?'

'বোধ হয় না। এক টুকরা ঘাসও সে নষ্ট করিতে চায় না। উহাই যে আমাদের খাদ্য। উহার বীজ আমরা সংগ্রহ করিয়া রাখি—'

'আমি বলিব অন্যায় কর। যাহা গরুর খাদ্য তাহাকে যদি তোমরা নিজেদেব খাদ্যে পরিণত কর, গরুরা কি খাইবে?'

প্রশ্নটা এভাবে কোনো দিন ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করি নাই। তবু উত্তর দিলাম, 'গরুরা কি খাইবে বা পাখিরা কি খাইবে, তাহা তো আমাদের সমস্যা নয়। তাহা লইয়া আমরা কখনও মাথাও ঘামাই নাই। আমরা কি খাইব, সেই সমস্যা সমাধান করিতেই আমরা ব্যস্ত।'

'তোমরা কি মাংস খাও না?'

'খাই বই কি। কিন্তু আমাদের দলে কত লোক, অত মাংস পাইব কোথায়?'

'আমরা যাহা করি, তাহাই করিলে পার। আমরা মাংস খাই, গরুর দুধও খাই। আমরা ঘাস খুঁজি গরুকে খাওয়াইব বলিয়া। তোমরা যখন আস নাই, তখন কন্যা নদীর তীরে আমাদের গরুরা আনন্দে চরিয়া বেড়াইত। তোমরা আসাতে মুশকিল হইয়াছে। বাধ্য হইয়া চুরি করিতে হইতেছে। আচ্ছা, গরুর বেলায় আমরা যাহা করি, তোমরা তাহা করিলেও তো পার।'

'কি?'

'কোনো গরুর সব দুধটা আমবা খাই না, বাছুরের জন্যও রাখিয়া দিই, কারণ গরুব দুধ তো বাছুরের জন্যই, তোমরাও তাই কর না। ঘাস তো গরুর জন্যই, গরুর জন্য কিছু ঘাস তোমরা ছাড়িয়া দাও। তোমাদের দলপতিকে আমি যদি গিয়া বলি, তিনি কি রাজি হইবেন না?'

'তুমি বলিলে হইবেন না। তোমার বাবা রোহা যদি যান, তাহা হইলে কি করিবে বলা যায় না। নিতান্ত অসম্ভব না হইলে একজন দলপতির অনুরোধ আর একজন দলপতি উপেক্ষা করেন না। তোমার বাবাকে একদিন আসিতে বল—'

'রোহা কখনও কাহারও কাছে ভিক্ষা করিবে না। সে আমাদের কন্যা নদীর তীরে যাইতে বারণ করিয়া দিয়াছে। আমাদের গরুরা এখন নিগম বনে আছে, সেখানে খাদ্যেরও অভাব নাই, আমরা কয়েকজন লুকাইয়া তোমাদের ক্ষেতে যাই আমাদের নিজেদের প্রিয় গরুগুলির জন্য ঘাস আনিতে। আমি যাই দুধুনীর জন্য। ঝোনঝিরার একটি প্রিয় ষাঁড় আছে পিঙ্গল, ঝোনঝিরাও তাহার জন্য মাঝে মাঝে তোমাদের ক্ষেতে গিয়া ঘাস আনে। বানন্দা রাঠাও যায়। তাহাদেরও নিজের নিজের গরু আছে। চার-পাঁচটি গরুর মতো ঘাস তুমি ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবে না?'

আমি মাথা চুলকাইতে লাগিলাম। শিলাঙ্গী সোৎসুকে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শিলাঙ্গীর অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলে আমি খুবই আনন্দিত হইতাম। কিন্তু তাহা অসম্ভব ছিল। ধবলের অজ্ঞাতসারে এ ধরনের কিছু করিবার কল্পনাও আমরা করিতে পারিতাম না।

ধবলকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিলেও কিছু হইবে না, তাহাও আমি জানিতাম। খানিকক্ষণ মাথা চুলকাইয়া তাই সত্য কথাটাই বলিতে হইল।

'আমি কোনো ব্যবস্থা করিতে পারিব না।'

'তবে যে বলিলে আমাকে তোমার ভাল লাগিয়াছে?'

'সে কথা মিথ্যা নয়। সত্যই খুব ভাল লাগিয়াছে। তোমাকে দেখিতেই এত কষ্ট করিয়া আসিয়াছি। তুমি আমাকে বর্শা ছুঁড়িয়া মারিয়া ফেলিতে পার, তাহা জানিয়াও আসিয়াছি।'

'তুমি যদি আমার বাছুর চুরি না করিতে আমি বর্শা ছুঁড়িতাম না। শুধু শুধু তোমাকে মারিতে যাইব কেন। তবে শেষ পর্যন্ত তোমাদের সহিত বোধ হয় যুদ্ধই করিতে হইবে। ঝোনঝিরার তাহাই ইচ্ছা, সে তোমাদের কন্যা নদীর তীর হইতে তাড়াইয়া দিতে চায়। তোমাদের বিরুদ্ধে সে একটা দল গঠন করিতেছে। রোহাকেও একথা বলিয়াছে। কিন্তু রোহা এখনও সম্মতি দেয় নাই। রোহা কাহারও সহিত ঝগড়া করিতে চায় না। কিন্তু ঝোনঝিরা যদি ক্রমাগত রোহাকে বলিতে থাকে, তাহা হইলে সে একদিন হয়তো রাজি হইয়া যাইবে। নিগম বনে এখন গরুদের প্রচুর খাদ্য আছে, সে খাদ্য যখন ফুরাইয়া যাইবে, তখন রোহাকে রাজি হইতে হইবে, কন্যা নদীর তীরে তখন গরুর দলকে লইয়া না গেলে তাহারা কি খাইয়া বাঁচিবে? তাই বলিতেছি ভাল ভাবে আমাদের সহিত যদি একটা রফা করিয়া ফেল, তাহা হইলে উভয় পক্ষই শান্তিতে থাকিতে পারিব, তাহা না হইলে যুদ্ধ অনিবার্য।'

'বেশ, আমি আমাদের দলপতি ধবলকে একথা বলিব। চেষ্টা করিব যাহাতে সে তোমাদের কিছু ঘাস দিতে রাজি হয়।'

'এখান হইতে তাহা হইলে সব, আমি যাই।'

'কোথায়?'

'এই সুড়ঙ্গে ঢুকিব। এখন তোমাদের ক্ষেতের প্রহরীরা ঘুমাইতেছে, এই সময় চুরি করিবার সুযোগ।'

'আমি যদি তোমাকে বাধা দিই?'

'আমি জানি, তুমি দিবে না।'

'দিব না! কেন?'

'তুমি যে বলিতেছ, আমাকে তোমার ভাল লাগিয়াছে।'

মুচকি হাসিয়া সে সুড়ঙ্গে গিয়া ঢুকিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম।

...গর্তের অপর প্রান্তে যখন উপনীত হইলাম তখন প্রভাতের আর বেশি দেরি নাই, পূর্ব দিগন্তে উষার রক্তিমাভা দেখা যাইতেছে। অন্ধকার সরিয়া গিয়াছে। চন্দ্র অস্তমিত। ঝিল্লী-ধ্বনিও নাই। একটা তীব্র হাওয়ায় সমস্ত উপত্যকা আলোড়িত হইতেছে। চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলাম, শিলাঙ্গীকে দেখিতে পাইলাম না। যতক্ষণ সুড়ঙ্গের মধ্যে ছিলাম ততক্ষণও তাহার নাগাল, এমন কি সাড়া-শব্দ পর্যন্ত পাই নাই। অতিশয় দ্রুতগতিতে সে আগাইয়া গিয়াছিল। ঠিক করিলাম কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিব। কোন্ সুড়ঙ্গ দিয়া সে আমাদের মাঠের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হয় তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। সেই গাছে উঠিয়া আমার ধনুর্বাণ পাড়িয়া আনিলাম

এবং সেই ঈষৎ অন্ধকারে প্রেতের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। বারংবার মনে হইতে লাগিল ওই কিশোরী মেয়েটির নিকট আমি পরাজিত হইয়া গিয়াছি।

...সহসা নিনানির কথা মনে পড়িল। মনে হইল সে হয়তো আমার পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। অন্ধকার ক্রমশ স্বচ্ছতর হইতেছিল। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলাম যদি পাহাড়ী ছাগল দেখিতে পাই, কিন্তু একটাও দেখা গেল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরও দেখা গেল না। নিনানির আবদার-মাখা মুখটা মনে পড়িল। তাহার বাসনা কখনও অপূর্ণ রাখি নাই। শিলাঙ্গীর আবির্ভাবে সব যেন গোলমাল হইয়া গেল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও শিলাঙ্গীকে আর সেদিন দেখিতে পাইলাম না। নিজেদের আস্তানার অভিমুখেই রওনা হইলাম অবশেষে।

..নিনানি পথের ধারেই অপেক্ষা করিতেছিল। আমাকে দেখিতে পাইয়া আগাইয়া আসিল।

'তোমার এত দেরি হইল যে—'

'পাহাড়ী ছাগল খুঁজিতেছিলাম।'

'আন নাই তো একটাও।'

'পাইলাম না। কাল পাহাড়ী ছাগল একটাও বাহির হয় নাই।'

'ঘিসু কিন্তু দুইটা ছাগল কাল মারিয়া আনিয়াছে।'

'ঘিসু? সে কখন গিয়াছিল?'

'তুমি যাইবার একটু পরেই। তুমি আমার জন্য ছাগল মারিতে গিয়াছ শুনিয়া সে কি স্থির থাকিতে পারে?'

নিনানির চোখে মুখে একটা দুষ্ট হাসি চকমক করিয়া উঠিল।

'কাল সমস্ত রাত্রি কোথায় ছিলে?'

'একটা গাছেব উপর।'

'একা ছিলে?'

'দ্বিতীয় ব্যক্তি কোথায় পাইব?'

'মনে হইতেছে সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছ, চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে—'

'তাই নাকি! জাগিয়াই ছিলাম, ভাল ঘুম হয় নাই।'

'তোমার জন্য কিছু ছাগলের মাংস রাখিয়াছি, চল, আগে সেটা খাইয়া লও। ঘিসু জানিতে পারিলে আর থাকিবে না।'

'ঘিসুর মাংস ঘিসুই খাক, আমার প্রয়োজন নাই।'

নিনানির মুখে আবার সেই দুষ্টু হাসিটা ফুটিয়া উঠিল।

'ঘিসুকে দিলেই ঘিসু খাইবে. কিন্তু আমার ইচ্ছা তুমি খাও।'

নিনানি আমার দিকে একটু ঢলিয়া এক হাত দিয়া আমার কোমর জড়াইয়া ধরিল। নিনানি এরূপ করিলে আমি একটু অস্বস্তি বোধ করিতাম। আমার ভয় হইত যদি ধবল দেখিতে পায় মুশকিলে পড়িব। আইনত যদিও ধবলের স্ত্রীর উপর আমার অধিকার ছিল, কিন্তু কার্যত সে অধিকার আমরা ত্যাগ করিয়াছিলাম। অপরের স্ত্রীর বিষয়ে উদাসীন থাকাটাই ক্রমশ আমাদের মধ্যে শোভন বিবেচিত হইতেছিল। দল বাঁধিয়া যখন থাকিতে হইবে তখন নিজেদের

মধ্যে মনোমালিন্য যাহাতে না হয় সে বিষয়ে ক্রমশ আমরা সচেতন হইতেছিলাম। নিনানি কিন্তু ধবলকে অপমান করিবার জন্যই যেন তখন আমাকে জড়াইয়া ধরিত। দলপতির বিশেষ অধিকারের জোরে বৃদ্ধ ধবল নিনানিকে বিবাহ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার হৃদয় জয় করিতে পারে নাই। এ কথাটা নানা ছলে নিনানি ধবলকে জানাইয়া দিতে ছাড়িত না। মুশকিলে পড়িতাম আমি। কারণ দলপতির বিরাগভাজন হইয়া থাকা নিরাপদ ছিল না।

'কোমরটা ছাড়। ধবল যদি দেখিতে পায়—'

'পাইলেই বা। আমি যতক্ষণ আছি ধবল তোমার কিছু করিতে পারিবে না।'

'তবু ছাড়। ঘিসুকে চটাইয়াও লাভ নাই।'

'আসল কথাটা বলিতেছ না কেন?'

'কোন্ কথাটা?'

'আমাকে আর তোমার ভাল লাগিতেছে না। কাল পাহাড়ে অনেক ছাগল নামিয়াছিল, ইচ্ছা করিলেই তুমি মারিয়া আনিতে পারিতে। কিন্তু কাল তুমি অন্য ব্যাপাবে মাতিয়াছিলে, আমার কথা মনে ছিল না।'

'কি যা-তা বলিতেছ?'

'ঠিকই বলিতেছি।'

নিনানির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। যদিও সে হাসিতেছিল, কিন্তু সে হাসির ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুৎ চমক দেখিয়া বুঝিলাম তাহার মনের ভিতব অগ্নিগর্ভ মেঘ জমিয়াছে। কিছুক্ষণ নীরবে পথ অতিবাহন করিবার পর স্থির করলাম সমস্ত ঘটনাটা নিনানির কাছে গোপন করা সমীচীন হইবে না। তাহাকে খানিকটা অন্তত বলা উচিত।

'চুপ করিয়া আছ যে'—নিনানিই আবার প্রশ্ন করিল।

'ভয় হইতেছে সত্য কথা বলিলে তুমি বিশ্বাস করিবে না।'

'ভণিতা ছাড়িয়া কি বলিতে চাহ বল।'

'কাল আমি আবিষ্কার করিয়াছি যে উন্নগা পাহাড়ের অপর পারে একটা অদ্ভুত জাতি বাস করে। আমাদের মতো তৃণবীজ খাইয়া থাকে না, গরুর দুধই তাহাদের প্রধান খাদ্য।'

'গরুর দুধ? পায় কি করিয়া?'

'ফাঁদ পাতিয়া গরুকে ধরে, তাহার পর তাহার বাঁট হইতে দুধ টানিয়া বাঁশের কেঁড়েতে ভরিয়া লয়, সেই দুধ তাহারা পান করে।'

'বল কি! কি করিয়া তুমি উহাদের সন্ধান পাইলে?'

এই প্রশ্নে একটু বিব্রত হইলাম। শিলাঙ্গীর কথাটা নিনানিকে বলিবার ইচ্ছা ছিল না।

বলিলাম, 'ছাগলের খোঁজে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে পাহাড়ের গায়ে একটা প্রশস্ত সুড়ঙ্গ পথ দেখিলাম। কৌতূহল হইল ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি কি আছে। আশা করিয়াছিলাম শজারু শশক অথবা শৃগালের সন্ধান পাইব। কিন্তু কিছু দূর গিয়াই বুঝিতে পারিলাম ইহা মনুষ্য চলাচলের পথ। সেই পথ অনুসরণ করিয়া অবশেষে পর্বতের অপর প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে বিরাট এক সভায় একজন কথক কথকতা করিতেছিল। সে কথকতা অতি চমৎকার। সেই কথকতার মধ্যেই উহাদের পরিচয় পাইলাম। উহাদের পূর্ব-পুরুষ কাংড়া পাতাল হইতে উঠিয়াছিল একটি প্রস্তর ভেদ করিয়া।

তাহার ঠিক পাশেই ছিল আর একটি গর্ত। সেই গর্ত হইতে উঠিয়াছিল একটি সদ্যপ্রসূতা গাভী ও তাহার বৎস। কি করিয়া কাংড়া সেই গাভীকে বশ করিয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ কথক কখনও বক্তৃতা করিয়া, কখনও গান করিয়া বলিতে লাগিল। আমি শুনিতে লাগিলাম। সেই সভায় আর একটি ভয়ানক কথাও শুনিলাম। উহারা শীঘ্রই নাকি আমাদের আক্রমণ করিবে।'

'কেন?'

নিনানির চোখের দৃষ্টিতে আগ্রহ ফুটিয়া উঠিল। যে-কোনো প্রকার হুজুকে মাতিবার জন্য নিনানি সতত উৎসুক হইয়া থাকিত।

'তাহাদের গরুর জন্য ঘাস চাই। পূর্বে তাহাদের গরুরা কন্যা নদীর তীরে চরিত, এখন আমরা সেখানে ঘাস বুনিয়াছি। হয় তাহাদের গরুর ঘাস দিতে হইবে, নতুবা যুদ্ধ করিতে হইবে।'

'আমরা ঘাস দিব না। যুদ্ধ করিব। আমাদের সহিত উহারা পারিবে কি?'

'চল, ধবলের সহিত পরামর্শ করিয়া দেখা যাক।'

'ইহাতে আবার পরামর্শ কবিবার কি আছে? যুদ্ধই করিতে হইবে এবং সে যুদ্ধে আমরা জিতিবই। আমাদেব দলের মেয়েবা যদি পবিত্রভাবে অগ্নিপূজা কবিয়া যুদ্ধের নাচ নাচিতে পারে কাহাবও সাধ্য নাই যে তোমাদের হারাইয়া দেয়, খঞ্জনদের সহিত যুদ্ধেব কথা মনে নাই?'

'আমরা অল্পদিন মাত্র এখানে আসিয়াছি। এ অঞ্চলেব পথ-ঘাটও আমাদের ভাল করিয়া চেনা হয় নাই, এ অবস্থায় যুদ্ধ করাটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না।'

'উহাদের হুমকি সহ্য করিয়া থাকাটাও কি বুদ্ধিমানেব কাজ হইবে? আজ যদি উহাদের ঘাস দাও, কাল জমি চাহিবে।'

'দেখাই যাক না কি করে। তবে উহাদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখা উচিত। ধবল কি বলে শোনা যাক।'

'ধবল যুদ্ধ করিতে চাহিবে না, কারণ সে বুড়া হইয়াছে। তোমরা তাহার কথায় সায় দিও না। অপমান আমরা সহ্য করিব না।'

নিনানি যদিও একটু আদুরে আবদেরে গোছের ছিল, কিন্তু উত্তেজিত হইলে সে ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিত। খঞ্জনদের সঙ্গে যখন আমাদের যুদ্ধ হইয়াছিল তখন নিনানি কুঠার ও বর্শা লইয়া রণক্ষেত্রে ছুটিয়া গিয়াছিল। তাহার মধ্যে কোমল ও কঠিনের একটা অদ্ভুত সমন্বয় আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। সে জন্যই নিনানিকে চটাইতে সাহস করিতাম না।

তাহার প্রশ্নের উত্তরে তাই বলিলাম, 'ঠিকই তো, অপমান সহ্য করিতে যাইব কোন্ দুঃখে? তবে ধবল যখন আমাদের দলপতি, তাহার অভিজ্ঞতা যখন আমাদের অপেক্ষা অধিক, তখন তাহার মতামত আমাদের শুনিতেই হইবে।'

'তবে তাই শোন গিয়া। ওখানে আবার ভিড় জমিয়াছে দেখিতেছি।' আমরা আমাদের আস্তানার সমীপবর্তী হইয়াছিলাম। দেখিলাম ধবলের কুটির-প্রাঙ্গণে অনেক লোক সমবেত হইয়াছে। তাহাদের ঠিক মধ্যস্থলে শালপ্রাংশু মহাভুজ এক দীর্ঘকায় ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে কি যেন বলিতেছে। কাছে গিয়া দেখিলাম লোকটি আগন্তুক, তাহাকে ইতিপূর্বে আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না।

লোকটি ধবলকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিল, 'আমাদের দলপতি উলম্ভন এই সমস্ত প্রদেশের অধিপতি। এ প্রদেশের সমস্ত নদী, বন, পর্বত, জমি, পশুপক্ষী তাহার অধিকারভুক্ত। উলম্ভনের প্রপিতামহ বন্‌জিরা নিজের বাহুবলে একদা এই সমস্ত অঞ্চলে একাধিপত্য করিয়া বেড়াইত। তাহারই বংশধর উলম্ভন এখন সরসরা নদীর তীরে বাস করিতেছে। উলম্ভনের আদেশ অনুসারে আমি তোমাকে বলিতে আসিয়াছি যে কন্যা নদীর তীরে এতদিন কেহ বসবাস করিতে আসে নাই বলিয়াই ইহা অনধিকৃত ছিল, তোমরা আসাতে উলম্ভন অতিশয় আনন্দিত হইয়াছে, তোমরা কৃষিকর্ম করিয়া এখানে সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত কর ইহাই উলম্ভনের ইচ্ছা। কিন্তু একটি শর্ত আছে। তোমাদের উলম্ভনের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে।'

'বশ্যতা স্বীকার? সে আবার কি?'

ধবল সত্যই ব্যাপারটা বুঝিতে পারে নাই। আমরা কেহই পারি নাই। দীর্ঘকায় লোকটি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, 'এ প্রদেশের সকল লোকই উলম্ভনকে দলপতি বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, তোমাদের মানিয়া লইতে হইবে।'

'তাহাতে আমাদের লাভ?'

'লাভ আছে। তোমরা যদি কোনোপ্রকার বিপদে পড় উলম্ভন সদলবলে আসিয়া তোমাদের সাহায্য করিবে। উলম্ভন বিপদে পড়িলে তাহাকেও তোমাদের সাহায্য করিতে হইবে। ইহারই নাম বশ্যতা স্বীকার। অবশ্য ইহার পরিবর্তে তোমাদের উলম্ভনকে মধ্যে মধ্যে কিছু উপহারও প্রেরণ করিতে হইবে।'

'কি উপহার?'

'পশুপক্ষী শিকার করিয়া পাঠাইতে পার। তোমাদের তৃণবীজ দিতে পার। প্রয়োজন হইলে তোমাদের বাড়তি যুবক-যুবতীদের দান করিতে পার।'

ধবল নির্বাক হইয়া রহিল। আগন্তুক ভীষণদর্শন এবং বলিষ্ঠ, তাহার কথা বলিবার ভঙ্গিও স্পর্ধা-ব্যঞ্জক, সহসা তাহার কথার প্রতিবাদ করা নিরাপদ নহে ভাবিয়াই সে চুপ করিয়া ছিল। ভিড় ঠেলিয়া নিনানি কিন্তু আগাইয়া গেল এবং আগন্তুকের মুখের দিকে নির্ভয়দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল, 'আমরা যদি বশ্যতা স্বীকার না করি উলম্ভন কি করিবে?'

আগন্তুক নিনানির দিকে প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল তাহার পর বলিল, 'উলম্ভন কি করিবে তাহা উলম্ভনই জানে। আমি তাহার আদেশ তোমাদের শুনাইয়া দিলাম। তোমরা প্রত্যুত্তরে যাহা বলিবে তাহাও তাহাকে গিয়া বলিব। তবে এটা ঠিক, তোমরা যদি বশ্যতা স্বীকার না করিতে চাও, উলম্ভন তোমাদের সহিত শত্রুতা করিবে, অবশেষে তোমাদের এ স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে।'

নিনানি বলিল, 'বেশ, আমরা উলম্ভনের সহিতই গিয়া এ বিষয়ে আলাপ করিব। উলম্ভনের নিকট আমাদের প্রতিনিধি যাইবে। তুমি যখন এ বিষয়ে সঠিক কিছুই বলিতে পারিতেছ না তখন তোমার সহিত আলাপ করিয়া লাভ নাই। তুমি আসিয়াছ ইহাতে অবশ্য আমরা খুবই আনন্দিত হইয়াছি। এস, আমাদের আতিথ্য গ্রহণ কর। প্রতাপশালী উলম্ভনের প্রতিনিধিকে সমাদর করিবার মতো উপকরণ আমাদের নাই, তবু যাহা আছে তাহা দিয়াই তোমাকে অভ্যর্থনা করিব।'

নিনানি চিরকালই সপ্রতিভ। সকলে যেখানে ইতস্তত করে নিনানি সেখানে আগাইয়া গিয়া

স্পষ্ট কথা সহজভাবে বলিতে পারে। ধবল পর্যন্ত তাহার ভয়ে ভীত। পাছে নিনানি অপর কাহাকেও বিবাহ করিয়া সমস্ত দলের উপর কর্তৃত্ব করে সেই আশঙ্কাতেই ধবল তাহাকে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিল। নিনানি অপরাজিতা বংশের মেয়ে। আমাদের দলের কলঞ্জা দূর দেশ হইতে একদা তাহাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিল। বিবাহ করিবার কিছুদিন পরেই সে মারা যায়। আমাদের মধ্যে অনেকেই নিনানিকে বিবাহ করিতে উৎসুক ছিলাম কিন্তু ধবল অবশেষে তাহাকে দাবি করিল বলিয়া আমরা বঞ্চিত হইলাম। বস্তুত নিনানিই আমাদের দলের প্রাণ ছিল। ধবল দলপতি ছিল বটে, কিন্তু নিনানির ইচ্ছাতেই সমস্ত হইত। নিনানির দিকে চাহিয়া ধবল মদু হাস্যসহকারে ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে লাগিল। ভাবটা আমার মনের কথাগুলি তুমি ঠিক গুছাইয়া বলিয়াছ।

আগন্তুক নিনানির মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। নিনানির বক্তব্য শেষ হইলে বলিল, 'তোমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার পূর্বে তুমি কে তাহা জানিতে পারি কি?'

'আমি? ইহাদের নিকট প্রশ্ন করিলেই জানিতে পারিবে।'

নিনানি মৃদু হাস্যসহকারে আমাদের দিকে হস্ত সঞ্চালন করিয়া কুরঙ্গীর মতো লীলায়িত গতিতে নিজের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

ঘিসু আগন্তুকের প্রশ্নের জবাব দিল।

'নিনানি আমাদের দলপতির প্রিয়তমা পত্নী।'

'ও! তাহা হইলে তো আমি পরম সম্মানিত হইলাম। নিশ্চয়ই উহার আতিথ্য গ্রহণ করিব।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয।'

ধবল সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

আমরা সকলে নিনানির ঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম।

...শালপাতার উপর কিছু তৃণবীজ-চূর্ণ, আগুনে-ঝলসানো ছাগলের রাং, নারিকেলের খোলে কিছু মধু, কন্দ ও ফল সাজাইয়া দিয়া নিনানি আগন্তুককে অভ্যর্থনা করিল। নিনানির অভ্যর্থনা পদ্ধতিতে আমরা সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেলাম। আগন্তুক সমস্ত খাদ্যগুলি একে একে পর্যবেক্ষণ করিয়া আমাদের প্রত্যেকের হাতে একটু একটু করিয়া তুলিয়া দিয়া বলিল, 'আপনারা অগ্রে আহার করুন, তাহার পর আমি আহার করিব। অপরিচিত স্থানে অপরিচিত লোকের গৃহে যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করি, তাহার অগ্রভাগে অন্নদাতাকে না খাওয়াইয়া আমরা খাইতে পারি না। ইহাই আমাদের নিয়ম। আপনারা খাদ্যগুলি গলাধঃকরণ করুন, তাহার পর আমি খাইব।'

নিনানি বলিল, 'ইহাই যদি আপনাদের নিয়ম হয়, সে নিয়মের মর্যাদা আমরা নিশ্চয়ই রক্ষা করিব। কিন্তু এই নিয়মের পশ্চাতে যে অবিশ্বাস রহিয়াছে, তাহা আমাদের সম্মানকে আঘাত করিতেছে। অতিথিকে বিষ-প্রয়োগ করিয়া হত্যা করিবার প্রথা আমাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। যাই হোক, আপনাদের নিয়ম আপনি পালন করুন। আমাকেও কিছু দিন—'

নিনানি দুই হস্ত পাতিয়া আগন্তুকের মুখের উপর তাহার ব্যঙ্গদীপ্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। আগন্তুক নিনানির প্রসারিত হস্তে একটু মধু ঢালিয়া দিয়া বলিল. 'আমাকে ব্যঙ্গ অথবা ভর্ৎসনা করা বৃথা, কারণ আমি আমাদের দলপতি উলগুনের নির্দেশ পালন করিতেছি মাত্র।'

'ঠিক ঠিক।'

ধবল সোৎসাহে তাহাকে সমর্থন করিল।

নিনানি নিপুণতার সহিত মধু চাটিতে চাটিতে প্রশ্ন করিল, 'তোমার নামটি জানিতে পারি কি?'

"আমার নাম গজন্ধর।"

গজন্ধর উবু হইয়া বসিয়া আহারে মনোনিবেশ করিল এবং যতক্ষণ আহারে ব্যাপৃত রহিল, একটি কথা বলিল না। আহারান্তে ধবলের দিকে চাহিয়া মন্তব্য করিল, 'বহুদিন এ ধরনের খাদ্য আহার করি নাই। আহার করিতে করিতে মনে হইতেছিল, আবার যেন শৈশবে ফিরিয়া গিয়াছি।'

ইহার উত্তরে কি বলা উচিত ধবল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিতেছিল। আমরাও ইঙ্গিতটা ঠিক বুঝিতে পারি নাই।

নিনানি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলিল, 'আমি তো পূর্বেই বলিয়াছিলাম, প্রতাপশালী উলম্ভনের প্রতিনিধিকে সম্যকরূপে সম্বর্ধনা করিবার মতো উপকরণ আমাদের নাই। এখন কি কি দ্রব্য কি ভাবে ভক্ষণ করা তোমার অভ্যাস তাহা জানিতে পারিলে ভবিষ্যতে তদনুযায়ী আয়োজনের চেষ্টা করিব।'

গজন্ধর বলিল, 'আমরা এই সব জিনিসই আহার করি, কিন্তু আমরা রন্ধন করিতে শিখিয়াছি। মাটির পাত্র প্রস্তুত করিবার রীতি আমাদের মধ্যে বহুকাল পূর্বে প্রচলিত হইয়াছে। সেই সব মাটির পাত্রে আমরা তৃণবীজ সিদ্ধ করিয়া খাই। শাক-পাতা, কন্দ, ফল-মূলও সিদ্ধ করি। মাংসও সিদ্ধ করিলে সুপাচ্য ও সুস্বাদু হয়। তোমরা যদি উলম্ভনের নিকট যাও, সবই দেখিতে পাইব।'

'আমরা যাইব'—ধবল সোৎসাহে বলিল।

'তোমরা যদি আমার সঙ্গে যাইতে চাও, তাহা হইলে অদ্যই সন্ধ্যার পর যাত্রা করিতে হইবে। কারণ আমি আগামীকল্য সন্ধ্যায় উলম্ভনের সহিত সাক্ষাৎ করিব এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছি।'

ধবল ঘিঁসুর দিকে চাহিয়া বলিল, 'ঘিসু, তুমি, আমি এবং ভঙ্গা চল যাই।'

ঘিসু এবং ভঙ্গা নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা আপত্তি করিল না। আমার ভয় হইতেছিল, পাছে ধবল আমাকেও যাইতে বলে। কিন্তু বলিল না। বলিলে মুশকিলে পড়িতাম, কারণ সেই রাত্রেই আমি শিলাঙ্গীর সহিত সাক্ষাৎ করিব ঠিক করিয়াছিলাম। কি ভাবে যে তাহার সাক্ষাৎ পাইব তাহা জানিতাম না, কিন্তু তবু অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতেছিলাম যে নিশ্চয়ই তাহার দেখা পাইব।

গজন্ধর নিনানির দিকে চাহিয়া বলিল—'দলপতির প্রিয়তমা পত্নীও যদি স্বামীর সঙ্গে গমন করে উলম্ভন অতিশয় প্রীত হইবে।'

'বিনা আমন্ত্রণে আমি কোথাও যাই না', নিনানি গম্ভীরভাবে উত্তর দিল।

'আমি তো আমন্ত্রণ করিতেই আসিয়াছি। আমি সাদর নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিতেছি।'

ধবল ভীত হইয়া পড়িল। নিনানিকে লইয়া গজন্ধরের দেশে যাইবার সাহস তাহার ছিল না। সে তাড়াতাড়ি বলিল, 'আমরা দুইজন অনুপস্থিত থাকিলে এখানে কাজের ক্ষতি হইবে।'

আমাদের দলের সমস্ত নারীরা একত্রিত হইয়া গজন্ধরকে দেখিতেছিল। গজন্ধর তাহাদের দিকে দেখাইয়া বলিল, 'এতগুলি স্ত্রীলোক তো রহিয়াছে, ইহারা কি দুই-চারি দিনের জন্য কাজ চালাইয়া লইতে পারিবে না?'

ধবলের প্রবীণা পত্নী ইলচি আগাইয়া আসিয়া বলিল, 'নিনানি যখন আসে নাই তখন সমস্ত কাজ আমিই তো নির্বাহ করিতাম। জমির সমস্ত কাজ এখনও আমিই চালাই।'

নিনানি হাসিয়া বলিল, 'এসব আলোচনা অতিশয় অবান্তর। আমাদের দলপতির সহিত উলম্ভন কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা এখনও অনিশ্চিত, উলম্ভনের সহিত আমাদের শত্রু-সম্পর্ক অথবা মিত্র-সম্পর্ক হইবে, তাহা এখনও নির্ধারিত হয় নাই। এ অবস্থায় আমি তোমার সহিত যাইতে পাবি না। উলম্ভন যদি আমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করে তখন তোমার আমন্ত্রণ রক্ষা করিব।'

গজন্ধর ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, 'বেশ তাহাই হইবে।'

...সেই দিনই সন্ধ্যার প্রাক্কালে গজন্ধরের সহিত ধবল, ঘিসু, ভঙ্গা চলিয়া গেল। যাইবার পূর্বে আমাদের প্রথামতো আমাদের কুলদেবতা নিম্ব-বৃক্ষের নিকট তিনটি পারাবত বলি দেওয়া হইল। বলি দিবার জন্য আমরা বন্য পারাবত ধরিয়া রাখিতাম। ইহা ব্যতীত প্রত্যেকের গলায় এবং হাতে কুমীরের এবং কাছিমের হাড়ের টুকরাও বাঁধিয়া দেওয়া হইল। আমাদের বিশ্বাস ছিল যে কুমীর এবং কাছিম যেমন আত্মরক্ষায় দক্ষ, কেহ যদি তাহাদের অস্থি অঙ্গে ধারণ করে, সে-ও অনুরূপ দক্ষতা লাভ করিবে। কেহ বিদেশে গেলে আমরা তাহাদের গলায় হাতে তাই কুমীর এবং কাছিমের হাড় বাঁধিয়া দিতাম। এই বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য কুমীর এবং কাছিমের হাড়ও সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম, ধবল, ঘিসু এবং ভঙ্গা অস্ত্রশস্ত্রও প্রচুর লইয়া গেল। তাহারা যখন চলিয়া গেল, তখন হইতে ধবলের প্রবীণা পত্নী ইলচি, ঘিসুর প্রবীণা পত্নী নারো এবং ভঙ্গার প্রবীণা পত্নী সাংরা উপবাস করিতে লাগিল। তাহাদের স্বামীরা না ফিরিয়া আসা পর্যন্ত তাহারা অন্ন গ্রহণ করিবে না—ইহাই আমাদের নিয়ম ছিল। তাহারা চলিয়া যাইবার পর নিনানি আর একটা কাজও করিল। আমাদের দলে চন্মনা নামে একটি দুঃসাহসিক যুবক ছিল। নিনানির আদেশে সে ধবল, ঘিসু ও ভঙ্গার অনুসরণ করিল। নিনানি তাহাকে বলিল, 'তুমি দূরে দূরে উহাদের অনুসরণ করিবে। উহাদের গতিবিধি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিবে। গজন্ধরের আচরণে যদি কোনো প্রকার দুরভিসন্ধির প্রমাণ পাও, কিংবা ধবল, ঘিসু বা ভঙ্গার যদি কোনো বিপদ হইয়াছে বোঝ তৎক্ষণাৎ আসিয়া আমাদের খবর দিও। সর্বদা সজাগ থাকিও।' চন্মনা চলিয়া গেল। আমরা সকলেই নিনানির বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতে লাগিলাম। চন্মনা চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু আমাদের দলের বিঘাও এমন একটি কাণ্ড করিয়া বসিল যাহাতে আমরা সকলেই চঞ্চল হইয়া পড়িলাম। বিঘাও সহসা মূর্ছিত হইয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিল। তাহার উপর মধ্যে মধ্যে উপদেবতা ভর করিত। ইতিপূর্বে মূর্ছিত অবস্থায় সে দুই-একবার আতঙ্কজনক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল। সেগুলি ফলিয়া যাওয়াতে আমরা তাহার মূর্ছাকে অত্যন্ত ভয় করিতাম। ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্লেষণ করিবার মতো বুদ্ধি আমাদের তখন ছিল না। প্রথমবার বিঘাও বলিয়াছিল, 'জিনার দিন ফুরাইয়াছে। অশ্বত্থদেবতা তাহাকে যদি সাহায্য না করে সে বাঁচিবে না।' জিনা ছিল আমাদের দলের একটি বৃদ্ধা। ভবিষ্যদ্বাণী করিবার কিছুদিন পরে সে মরিয়া গেল। যদি সে না মরিত বিঘাও নিশ্চয়ই

বলিত যে অশ্বত্থদেবতার সহায়তাতেই সে বাঁচিয়া গিয়াছে। কিন্তু এভাবে বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতাই আমাদের তখন ছিল না। আমরা প্রত্যেকে ভূত প্রেতের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করিতাম। শুধু যে তাহাদেরই ভয় করিতাম পূজা করিতাম তাহা নয়, যাহার যাহার মুখ দিয়া তাহারা নিজেদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিত তাহাদেরও আমরা ভয় করিতাম, তাহাদেরও আমরা সন্তুষ্ট রাখিবার প্রয়াস পাইতাম। সে যুগে একটা অদৃশ্য প্রবল শক্তির নিকট আমরা সকলে যেন দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছিলাম। তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার কল্পনা কেহ করিতে পারিত না। এইজন্যই নিনানি ধবলকে বিবাহ করিয়াছিল কারণ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল দলপতির কথা অমান্য করিলে কানা ভীষণ প্রতিশোধ লইবে। ধবলের প্রমাতামহ কানা ছিল, তাহার প্রেতাত্মা ধবলের রক্ষণাবেক্ষণ করে ইহা সকলে জানিত এবং মানিত। ক্ষেতে ফসল না হইলে আমরা মনে করিতাম সেই একচক্ষু উপদেবতা রুষ্ট হইয়া আমাদের ফসল নষ্ট করিয়া দিতেছেন। রুষ্ট উপদেবতাকে তুষ্ট করিবার নানাবিধ পদ্ধতি ধবলের জানা ছিল বলিয়াই ধবল আমাদের দলপতি হইয়াছিল। রুষ্ট দেবতা কিছুতেই তুষ্ট না হইলে অবশেষে আমরা সে জমি পরিত্যাগ করিয়া অন্য জমিতে চাষ করিতাম, ভাবিতে পারিতাম না যে জমির উৎপাদিকা শক্তি কমিয়া গিয়াছে। ধবলের কথাই সত্য বলিয়া মনে হইত। মনে হইত জমিতে উপদেবতার যে পাপদৃষ্টি লাগিয়াছে তাহা দূর করা মানুষের সাধ্যাতীত। ধবলের অলৌকিক শক্তির উপর আমরা অগাধ বিশ্বাস পোষণ করিতাম। আমাদের দলে এ বিষয়ে ধবলের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বিঘাও। কারণ তাহারও অলৌকিক শক্তি ছিল। সুতরাং বিঘাও মূর্ছিত হইয়া পড়াতে আমরা সকলেই খুব ভীত হইয়া পড়িলাম। আমাদের মধ্যে তখন প্রেতকে শান্ত করিবার যে উপায়টি সাধারণ লোকে জানিত সেই উপায়টিই আমরা অবিলম্বে অবলম্বন করিলাম। বিঘাওকে ঘিরিয়া সকলে মিলিয়া গান করিতে লাগিলাম। আমাদের মধ্যে সুকণ্ঠী যে সকল রমণী ক্ষেতে কাজ করিতেছিল (তখন মেয়েরাই প্রধানত ক্ষেতের কাজ করিত) তাহাদেরও ডাকিয়া আনা হইল। তাহারা কন্যা নদীতে স্নান করিয়া আসিল এবং আলুলায়িত সিক্ত কেশে বিঘাওকে ঘিরিয়া গান গাহিতে লাগিল। তাহারাই হইল মূল গায়িকা, আমরা সকলে তাহাদের দোহারকি করিতে লাগিলাম। গায়িকাদের মধ্যে নিনানিও ছিল। কিছুক্ষণ গান চলিবার পর বিঘাও বিকৃতকণ্ঠে বলিল, 'আমি ধবলের প্রমাতামহ। আমার ইচ্ছা নিনানি সিক্ত কেশ দিয়া আমার পা মুছাইয়া দিক। তাহার পর আমি ব্যক্ত করিব কেন আমি বিঘাওয়ের উপর ভর করিয়াছি।'

নিনানির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। বিঘাওয়ের দুই পায়ে কুষ্ঠের মতো একপ্রকার ঘা ছিল। কেশ দিয়া সেই পা মুছাইয়া দেওয়া সত্যই কঠিন কাজ। কিন্তু যতই কঠিন হউক নিনানি আপত্তি করিতে পারিল না। কোনো প্রেতাত্মার অনুরোধ উপেক্ষা করিবার সাহস কাহারও তখন ছিল না। মনে মনে থাকিলেও সে তাহা ব্যক্ত করিবার সাহস পাইত না। আপত্তি করিলে সমস্ত দলের আক্রোশ তাহার উপর গিয়া পড়িবে। সমস্ত দলের হিতাহিত প্রেতাত্মারাই নিয়ন্ত্রণ করে এ বিশ্বাস আমাদের মনে তখন বদ্ধমূল ছিল। সুতরাং দলের মঙ্গলের জন্য প্রেতাত্মার আদেশ আমাদের সকলকেই শিরোধার্য করিতে হইত। এখনও তোমরা সমাজের হিতার্থে যেমন অনেক অপ্রিয় আদেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য হও আমরাও তেমনি হইতাম। পরলোকই তখন ইহলোককে শাসন করিত এবং পরলোকের প্রতিনিধি ছিল বিঘাওয়ের মতো অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বুদ্ধিমান লোকেরা।

বিঘাওয়ের রক্ত পুঁজমাখা চরণ দুইটি নিনানি তাহার সিক্ত কেশ দিয়া মুছাইয়া দিল। তাহার পর সে মূর্ছিত বিঘাওকে প্রশ্ন করিল, 'এবার আমি স্নান করিয়া আসিব কি?'

'না। ধবল না ফিরিয়া আসা পর্যন্ত তুমি তোমার কেশ ধৌত করিবে না।'

আমরা সকলে নির্বাক হইয়া রহিলাম।

বিঘাও বলিতে লাগিল, 'তোমার অহঙ্কৃত উক্তিই ধবলকে উলম্ভনের নিকট যাইতে বাধ্য করিয়াছে। ধবল যতক্ষণ না নিরাপদে ফিরিয়া আসে ততক্ষণ তোমাকে অস্নাত থাকিতে হইবে। এইবার আমি কেন আসিয়াছি শুন। আমি সাবধান করিতে আসিয়াছি। তোমাদের সর্বনাশ রাত্রির অন্ধকারের সহিত মিশিয়া ধীরে ধীরে তোমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তোমাদের নিকট সে কবে আসিবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে তোমাদেরই চক্ষু। তাহার পদধ্বনি অভ্রান্তভাবে শ্রবণ করিতে পারে তোমাদেরই কর্ণ। তোমরা চক্ষু কর্ণ খুলিয়া রাখ, তোমাদের সাবধান করিয়া দিতেছি, রাত্রির অন্ধকারের সহিত মিশিয়া তোমাদের সর্বনাশ ধীরে ধীরে তোমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে।' এই পর্যন্ত বলিয়া বিঘাও নীবব হইল। আমরা আবার গান গাহিতে লাগিলাম, কারণ তখনও পর্যন্ত বিঘাওয়ের মূর্ছা ভঙ্গ হয় নাই। কিছুক্ষণ পরে বিঘাও আবার বিড়বিড় করিয়া কথা বলিতে লাগিল। উলম্ভনের সহিত ধবল বন্ধুত্ব করিতে গিয়াছে বলিয়া তোমরা উল্লসিত হইও না। বন্ধুত্ব এবং দাসত্বের প্রভেদ অতি অল্প। স্বাধীনতার মূল্যে বন্ধুত্ব লাভ করিতে হয়, স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়া লোকে দাসত্বও বরণ করে। ধবলের স্বাধীন বুদ্ধি যাহাতে আচ্ছন্ন না হয় তাহার জন্য তোমরা নিম্ব-দেবতাকে রক্তচর্চিত কর। আবার বলিতেছি, চক্ষু কর্ণ খুলিয়া রাখ, রাত্রির অন্ধকারের সহিত মিশিয়া তোমাদের সর্বনাশ ধীরে ধীরে তোমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে।'

বিঘাও আবার নীরব হইল। নিনানি এতক্ষণ নিস্তব্ধ ছিল, এইবার সে চিৎকার করিয়া উঠিল। সে চিৎকারের কোনো ভাষা নাই, তাহা কেবল চিৎকার মাত্র। মনে হইল, আকাশ বাতাস যেন সশব্দে ফাটিয়া গেল। আমরা সকলে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে দুই হস্তে তাহার মাথার চুল মুঠি করিয়া ধরিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। তাহার চোখের দৃষ্টিতে মধুর বহ্নিদীপ্তি নাই, তাহা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার অন্তরের স্বতোৎসারিত প্রতিবাদ যেন চোখের ভাষায় বলিতে চাহিতেছে—এ অন্যায় আদেশ আমি মানিব না। চিৎকার করিতে করিতে নিনানিও অজ্ঞান হইয়া গেল। আমরা যন্ত্রচালিতবৎ পুনরায় গান গাহিতে উদ্যত হইয়াছিলাম—কেহ অজ্ঞান হইয়া গেলে গান গাওয়াই নিয়ম ছিল—আমরা মনে মনে ইহাও প্রত্যাশা করিতেছিলাম যে নিনানির মুখ দিয়া আমরা হয়তো অন্য কোনো প্রেতাত্মার নির্দেশ শুনিতে পাইব, কিন্তু বিঘাও সহসা বলিল, 'উহাকে তোমরা ঘরের ভিতরে লইয়া যাও।' সবিস্ময়ে দেখিলাম, বিঘাও উঠিয়া বসিয়াছে, তাহার চোখে মুখে এক অদ্ভুত ক্রূর হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার সে হাসি দেখিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিলাম। বিঘাওকে আমরা সকলেই ভয় করিতাম। কারণ সে ছিল যাদুকর। যাদুশক্তিবলে সে অঘটন ঘটাইতে পারে এই বিশ্বাস সে আমাদের সকলের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিল। ধবলের সহিত তাহার মূলত বিরোধও ছিল এইখানে। ধবলেরও অলৌকিক ক্ষমতায় আমরা বিশ্বাস করিতাম, কিন্তু তাহাকে আমরা ভালবাসিতাম, ভক্তি করিতাম, তাহাকে লইয়া উপহাস বিদ্রূপ করিতেও আমাদের বাধিত না, তাহাকে কখনও ভয় করি নাই। কারণ ধবল কখনও নিজের শক্তির আস্ফালন করিত না।

এক অদৃশ্য অমোঘ শক্তিকে প্রার্থনা করিয়া সে সমস্ত দলের কল্যাণ সাধন করিত। বিঘাও কিন্তু নিজেই ছিল শক্তিমান। নিজের যাদুশক্তি বলেই সে যে কোনো লোকের ইষ্ট বা অনিষ্ট করিতে পারে এই বিশ্বাস থাকাতে আমরা তাহার ভয়ে ভীত হইয়া থাকিতাম। মনে হইত, সে যেন মনুষ্যরূপী সর্প বা ব্যাঘ্র। ধবলকে সে মনে মনে অবজ্ঞা করে ইহাও আমরা জানিতাম। একদা সে গোধিকা-সম্প্রদায়ের দলপতি ছিল শুনিয়াছিলাম। ইহাও শুনিয়াছিলাম যে তাহারই অভিশাপে নাকি গোধিকা-সম্প্রদায় মহামারী রোগে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর পর্যটক মীংরার সহিত ইহার দেখা হয়। মীংরাই ইহাকে আমাদের দলে আনিয়াছিল, ধবলকে বলিয়াছিল, 'বিঘাও শক্তিশালী লোক, ইহাকে দলে রাখিলে অনেক আপদ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবে, ইহার যাদুশক্তি তুচ্ছ করিবার মতো নহে, ইহাকে আশ্রয় দাও।' মীংরার কথাতেই ধবল বিঘাওকে আশ্রয় দিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশ আমরা অনুভব করিতে লাগিলাম যে, বিঘাও ধবলকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছে। অনেকের কাছে সে বলিত, 'যে লোক নিজে শক্তিমান নয়, কেবলমাত্র প্রার্থনা করিয়া দেবতার শক্তিকে কাজে লাগাইতে চায়, তাহার নেতৃত্ব নিরাপদ নয়। অক্ষম লোককে দেবতা দয়া করেন না, দেবতা কাহাকেও স্বেচ্ছায় দয়া করেন না, নিজের শক্তিবলে দেবতার দয়া আদায় করিয়া লইতে হয়। ধবলের সে শক্তি আছে কি-না সন্দেহ।' তাহার কথাবার্তা আমরা সভয় বিস্ময়ের সহিত শুনিতাম। অনেকের মধ্যে এ ধারণাও হইয়াছিল যে ধবলের পরিবর্তে সে যদি আমাদের দলপতি হয় তাহা হইলে আমরা বোধ হয় নিরাপদ হইব। ধবল কিন্তু এসব বিষয়ে সচেতন ছিল না। সে ছিল আনমনা আপনভোলা লোক। কন্যা নদীর তীবে তীরে আপন মনে ঘুরিয়া বেড়ানোই ছিল তাহার প্রধান কাজ। পূর্বেই বলিয়াছি, সে কন্যা নদীর মনের ভাব বুঝিবাব চেষ্টা করিত। তাহার আর একটি আকর্ষণও ছিল। নিনানি। নিনানিকে তাহার ভাল • 'গিয়াছিল, নিনানিকে সে ভয়ও করিত, তাই নিনানির সম্বন্ধে তাহাব কৌতূহলেরও অন্ত ছিল না। বিঘাও ঠিকই ধরিয়াছিল। নিনানির সম্মান রক্ষা করিবার জন্যই সে উলম্ভনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। ...নিনানিকে ধরাধরি করিয়া আমরা কুটিরের ভিতর লইয়া গেলাম। কয়েকটি রমণী তাহাকে ঘিরিয়া গান গাহিতে লাগিল। আমিও কিছুক্ষণ তাহাদের সহিত গান গাহিয়াছিলাম, কিন্তু আমি বেশিক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। সন্ধ্যার অন্ধকার নামিতেছিল। শিলাঙ্গীর সন্ধানে আমি বাহির হইয়া পড়িলাম।

...আকাশে অগণিত নক্ষত্র উঠিয়াছিল। আকাশে যে এত নক্ষত্র আছে নিবিষ্টচিত্তে এমনভাবে তাহা বোধ হয় আর কখনও দেখি নাই, কারণ এমনভাবে আর কখনও একাকী আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিবার সুযোগই মেলে নাই জীবনে। উন্মুক্ত প্রান্তরে ইতিপূর্বে বহুবার শয়ন করিয়াছি, কিন্তু একা নয়, সঙ্গে কেহ না কেহ থাকিত, তাহাকে লইয়াই মগ্ন থাকিতাম, আকাশের দিকে চাহিবার অবকাশ পাই নাই। সেদিন আকাশের দিকে চাহিয়া মনে হইল ধবল উহাদের দিকে চাহিয়া গভীর রাত্রে প্রার্থনা করে, কিন্তু সে প্রার্থনা কি কখনও সফল হওয়া সম্ভব? ধবলের ভাষা কি অতদূর পর্যন্ত পৌঁছায়? পৌঁছাইলেও কি তাহারা আমাদের মঙ্গল করিতে সক্ষম? অতগুলি নক্ষত্রের মধ্যে কে আমাদের বন্ধু কে শত্রু তাহা ধবল ঠিক করিতে পারে কি করিয়া? উহারা কত দূরে আছে কে জানে। উহারা কি আমাদের পরিচিত সূর্যের সগোত্র? সূর্যেরই কি সন্তান-সন্ততি উহারা? তাহা হইলে দিনের বেলা কোথা

থাকে। বৃদ্ধা জিনা একটা গল্প বলিত তাহা মনে পড়িল। সে বলিত, সূর্যের দুইটি বিবাহ। তাহার একটি পত্নী দিবস। তাহার কোনো সন্তানাদি হয় নাই বলিয়া সে সূর্যকে ছাড়িতে চাহে না, সন্তানকামনায় সর্বদাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। দ্বিতীয় পত্নী রাত্রি, তাহার অনেক সন্তান, সন্তানদের লইয়াই সে এত ব্যস্ত যে সূর্যের দিকে তাকাইবার অবসর পায় না। মাঝে মাঝে কিন্তু সূর্যকে দাবি করে সে। সন্ধ্যায় বা ঊষায় ঘনঘটা করিয়া ঝড়বৃষ্টি হইলে জিনা বলিত রাত্রির সহিত দিবসের কলহ বাধিয়াছে, রাত্রি দিবসের নিকট হইতে সূর্যকে ছিনাইয়া লইতে আসিয়াছে। জিনার গল্পটা বড় ভাল লাগিত, ভাল লাগিত বলিয়াই বোধ হয় বিশ্বাস করিতাম। বহু জন্ম পূর্বে আর একটা যে গল্প শুনিয়াছিলাম, ধর্ষিতা শবরী ওকার অশ্রুবিন্দুগুলি আকাশের গায়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইয়া জাগিয়া আছে, সে গল্প আব মনে ছিল না। নূতন গল্পে নূতন আস্থা স্থাপন করিয়া নূতন স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল, বিঘাও যাহা বলে তাহাই হয়তো ঠিক। গাছের শাখা ধরিয়া সজোরে টান দিলেই গাছ অবনত হইতে পারে, প্রার্থনা করিলে হইবে না। বহুকাল পূর্বে রাহুলাও ঠিক এই যুক্তি অনুসরণ করিয়া বিয়ের সন্ধানে যাত্রা করিয়াছিল। কিন্তু সে কথা মনে ছিল না। জোনাফুদিনের বিফলতাকে আমবা ক্ষমা করি নাই, কিন্তু সে কথাও মনে ছিল না। রাহুলা-জোনাফুদিনের মনে না থাকিলেও জীবনযুদ্ধের তাড়নায় যুগে-যুগে জন্মজন্মান্তরে বারংবার আমরা যে দুইটি পথের সম্মুখীন হইতেছিলাম সে পথ দুইটিকে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব ছিল না। স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া ক্রমশ তাহা মানব-সভ্যতার দুইটি দিক অলঙ্কৃত করিয়াছে। কোন্ পথটা সত্য তাহা আজও বোধ হয় সুনির্দিষ্টরূপে চিহ্নিত হয় নাই। একটি পথ শক্তির, আর একটি ভক্তির। এক পথের পথিক রাহুলা, কাংড়া, বিঘাওরা, আর এক পথের পথিক জোনাফুদিন, ওবুকী, ধবলরা। কখনও রাহুলারা জিতিয়াছে কখনও জোনাফুদিনরা। কখনও মনে হইয়াছে পুরুষকারই সত্য, কখনও আবার আমরা দৈবকে সত্যরূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি। সেদিন গভীর নিশীথে আকাশের দিকে চাহিয়া মনে হইতেছিল ওই অগণিত নক্ষত্রদলে ক্ষীণকণ্ঠ ধবলের প্রার্থনা কি দিশাহারা হইয়া পড়িবে না? মনে হইতেছিল ধবল বোধ হয় ভুল পথে আমাদের লইয়া চলিয়াছে। মনে হইতেছিল শক্তিশালী বিঘাওই বোধ হয় চালক হিসাবে অধিকতর সক্ষম। তাহার ক্ষমতা আছে। বৃদ্ধা জিনার মৃত্যুসংবাদ সে পূর্বেই টের পাইয়াছিল। আজই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম, সে অহঙ্কৃতা নিনানির মস্তক তাহার কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত চরণের উপর টানিয়া আনিয়াছে। অভিশাপ দিয়া গোধিকা সম্প্রদায়কে সে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। তাহার ক্ষমতা আছে স্বীকার করিতেই হইবে। ক্ষমতাবান নেতারই তো প্রয়োজন আমাদের। আরও কিছুদিন পূর্বে যদি বিঘাও আসিত তাহা হইলে হয়তো আমাদের এত কষ্ট করিয়া কন্যা নদীব তীরে আসিতে হইত না। সে হয়তো মন্ত্রবলে সেই সব জমিতে আবার শস্যপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিত।

...আমি মাঠের মাঝখানে ঘন ফসলের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া শুইয়াছিলাম। আকাশের দিকে চাহিয়া যদিও নানারূপ অসংলগ্ন চিন্তার ধারা মনের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল কিন্তু একটি চিন্তা অনড় হইয়া মনের কেন্দ্রে বসিয়াছিল। ঠিক চিন্তা নয়, আকাঙ্ক্ষা। মার্জার যেমন মূষিকের গর্তের নিকট ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে আমিও তেমনি আমাদের ক্ষেত্রমধ্যস্থ গর্তটির পাশে ওৎ পাতিয়া শুইয়াছিলাম। প্রতি মুহূর্তে আশা করিতেছিলাম শিলাঙ্গী ওই গর্ত দিয়া বাহির হইয়া আসিবে। আমার সমস্ত অন্তর ওই নিকষ-কৃষ্ণাঙ্গী আয়ত-নয়না উজ্জ্বল-দৃষ্টি সরলা

কিশোরীকে ঘিরিয়া যেন স্বপ্নলোকে আরতি করিতেছিল। গরবিনী বুদ্ধিদীপ্তা নিনানির মধ্যে নারীত্বের যে স্বাদ পাইয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম তাহাও অপরূপ, তাহার মাদকতায় আমার সমস্ত সত্তা অভিভূত হইয়া পড়িত, কিন্তু শিলাঙ্গীকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল এ রকমটি আর কখনও দেখি নাই। তাহার সরল সাহস, তাহার অকপট সত্যভাষণ, বন্য গাভীর মুখে সবুজ ঘাস তুলিয়া দিবার জন্য দুরূহ অভিযান, সর্বোপরি আমার পৌরুষ সম্বন্ধে তাহার ঔদাসীন্য তাহাকে এমন একটা মহিমা দান করিয়াছিল যাহা আমি আর কখনও দেখি নাই। ইচ্ছা করিলে সে আমার পশু প্রবৃত্তিকে অনায়াসে উত্তেজিত করিতে পারিত কিন্তু সেদিকে তাহার যেন লক্ষ্যই ছিল না। মনে হইতেছিল সে যেন তাহার আসন্ন যৌবন বিষয়ে সচেতন নয়। তাহার মুঞ্জরিত দেহশ্রীর সহিত বালিকাসুলভ একটা উৎসুক কৌতুকশীলতা যুক্ত হইয়া এমন একটা অনন্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল যে আমার বন্য প্রকৃতি তাহাকে অধিকার করিবার জন্য অধীর উন্মুখ না হইয়া পারে নাই। আমার প্রকৃতির মধ্যেও একজন উৎসুক বালক বাস করিত। যে কারণে আমি সদ্যোজাত গোবৎসটি লাভ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলাম ঠিক সেই কারণেই আমি শিলাঙ্গীকেও চাহিয়াছিলাম। আমার ক্রীড়াপ্রবণ চরিত্র তাহার মধ্যে একজন ক্রীড়াসঙ্গিনীকে আবিষ্কার করিয়াছিল, যে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ নয়, পাশবিক ক্ষুধার ক্রীড়নক মাত্র নয়, যাহার মন নিত্য নব ঔৎসুক্যে নিত্য নব উৎসাহভরে দৈনন্দিন জীবনের অতিপরিচিত সীমা-রেখা অতিক্রম করিয়াই আনন্দলাভ করে।

...কন্যা নদীর পশ্চিম তীরে আমাদের তৃণক্ষেত্রটি উন্নগা পর্বতের পাদমূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরিসরে নিতান্ত কম ছিল না। এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া অপর প্রান্ত পর্যন্ত দেখা যাইত না। এই সুবিস্তৃত ক্ষেত্রের মধ্যে শিলাঙ্গীর গর্তটি খুঁজিয়া বাহির করিতে আমাকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল। শশক অথবা শজারুর গর্ত অনুসন্ধান করিতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম, শিলাঙ্গীর গর্তের মুখ নিতান্ত ছোটও ছিল না, তবু তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে অনেক সময় লাগিল, কারণ মুখটি তৃণাচ্ছাদিত ছিল, এক বোঝা সবুজ ঘাস দিয়া মুখটি কে যেন বন্ধ করিয়া দিয়া গিয়াছিল, যাহাতে সহসা দেখিলে মনে হয় উহা ক্ষেতেরই একটা অংশ। বোঝার তৃণগুচ্ছ কিন্তু জীবন্ত তৃণের মতো সতেজ ছিল না, তাহাদের ম্রিয়মাণ মূর্তি দেখিয়াই আমি সেইদিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। শিলাঙ্গীর চাতুরী আমার নিকট ধরা পড়িয়া যাওয়াতে খুবই কৌতুকবোধ করিয়াছিলাম, ইহাতে তাহাকে পাইবার আগ্রহটা আরও যেন বাড়িয়া গিয়াছিল।

...রাত্রি কত হইয়াছিল জানি না। অপেক্ষা করিতে করিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। শিলাঙ্গীর স্পর্শেই আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল, আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম।

শিলাঙ্গী হাসিয়া বলিল, 'আমাকে ধরিবে বলিয়াই এখানে আসিয়া শুইয়াছ নিশ্চয়। কিন্তু আমি যদি চলিয়া যাইতাম তুমি জানিতেও পারিতে না। এই তো তোমাদের পাহারা দেওয়ার নমুনা—'

দেখিলাম শিলাঙ্গী কয়েকটি ছোট ছোট তৃণগুচ্ছ আলাদা আলাদা বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তাহার কোমরে একটা বড় লতা জড়ানো ছিল। সেই লতায় তৃণগুচ্ছগুলি সে পৃথক পৃথক ভাবে বাঁধিতে লাগিল।

'অমন করিয়া বাঁধিতেছ কেন?'

'বোঝা বড় হইয়া গেলে গর্তের ভিতর ঢোকে না। এইভাবে বেশ সহজে লইয়া যাওয়া

যায়। লতাটা কোমরে বাঁধা থাকে, সুড়ঙ্গের ভিতর আমি যখন বুকে হাঁটিয়া চলি ঘাসের ছোট ছোট বোঝাগুলি আমার পিছনে পিছনে আসে। আজ দেখিলাম বাছুরটাও একটু একটু ঘাস খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার জন্য কচি কচি ঘাস লইয়াছি কিছু। এই দেখ।'

তিনটি ছোট ছোট ঘাসের বোঝা সে তুলিয়া ধরিল। এমন সহজ আনন্দে সে কথাগুলি বলিয়া যাইতেছিল যেন সে আমাদের তৃণশস্য এমনভাবে অপহরণ করিয়া কোনো অন্যায় করে নাই। আমি যে তাহার শত্রুপক্ষ, ইচ্ছা করিলে এখনই যে আমি তাহাকে বন্দী করিতে পারি বা মারিয়া ফেলিতে পারি এসবের আভাসমাত্রও তাহার চোখের দৃষ্টিতে বা কণ্ঠস্বরে ছিল না। পরিচিত বন্ধুর নিকট সে যেন মনের আনন্দে গল্প করিয়া চলিযাছে। আমার কথায় সে কিন্তু বিস্মিত হইল। আমি বলিলাম, 'এ ঘাস কিন্তু তোমাকে লইয়া যাইতে দিব না।'

'কেন?'

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। তাহার বিস্মিত নয়নযুগল হইতে চন্দ্রালোকও যেন প্রতিফলিত হইয়া নীরব ভাষায় আমাকে প্রশ্ন করিতেছিল—কেন?

'তুমিই বল না আমাদের ঘাস তোমাকে লইয়া যাইতে দিব কেন? এ ঘাস সাধারণ ঘাস নয়। ইহারা আপনাআপনি হয় নাই। ইহাদের উৎপন্ন করিতে আমাদের মেয়েদের যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তাহারা এই বিস্তৃত ভূমি খুঁড়িয়াছে—একবার নয়, বার বার খুঁড়িযাছে—তাহার পর বীজ বুনিয়াছে । বীজ যাহাতে অঙ্কুরিত হয় তাহার জন্য উপবাস করিয়া পূজা করিয়াছে। বীজ অঙ্কুরিত হইলে আমরা বেড়া দিয়া সমস্ত মাঠটা ঘিরিয়াছি, দিবারাত্রি পাহারা দিতেছি। সেই ঘাস তুমি আসিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া যাইবে এ তো বড় অদ্ভুত কাণ্ড!'

আমার কথা শুনিয়া সে একটুও অপ্রতিভ হইল না। বরং তাহার কণ্ঠস্বরে একটা তর্কের সুর ফুটিয়া উঠিল।

'অদ্ভুত কাণ্ড তো তোমরাই করিয়াছ। কোথা হইতে আসিয়া আমাদের গরুদের জমিগুলিতে বেড়া ঘিরিয়া নিজেদের দখল জমাইয়া বসিয়াছ। তাহারা এখন খাইবে কি বল? তুমি কি বলিতে চাও আমার দুধুনী মধুনী না খাইয়া মারা যাইবে? এ জমি তাহাদের, এ জমির ঘাসও তাহাদের। তাহারাই জমির আদিম মালিক। তোমরা হঠাৎ কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছ বলিয়া কি তাহাদের দাবি লোপ পাইবে?'

আমি হাসিয়া উত্তর দিলাম, 'যাহার জোর বেশি তাহারই দাবি টিকিবে। গরুর দাবির চেয়ে মানুষের দাবি যে অনেক বেশি একথা কি তুমি জান না?'

'জানিলেও মানিতে রাজি নই'—শিলাঙ্গী হাসিয়া উত্তর দিল, 'তা ছাড়া, আর একটা কথাও তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে দাবিটা ঠিক গরুর নয়, দাবিটা মানুষেরই। ওই গরুর দলের পিছনে আমরা আছি। আজ তুমি যদি আমার ঘাস কাড়িয়া লও এবং সে কথা আমি যদি রোহাকে গিয়া বলি রোহা তোমাদের আসিয়া আক্রমণ করিবে, হয়তো তোমাদের এখান হইতে তাড়াইয়া দিবে। তোমাকে তো বলিয়াছি যে তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের মধ্যে একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। আমি গিয়া যদি আজ বলি—'

'মনে কর তোমাকেই যদি যাইতে না দিই—'

'আমাকে ধরিয়া রাখিবে? বেশ তো!'

শিলাঙ্গীর চোখের দৃষ্টি আগ্রহে আনন্দে ঝলমল করিয়া উঠিল। বিপজ্জনক একটা ব্যাপারে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনায় তাহার সমস্ত প্রাণশক্তিই যেন উন্মুখ একাগ্র হইয়া উঠিল। আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা হইল না। শিলাঙ্গী একটুও ভয় পাইল না। আমার আশা ছিল ভয় পাইলে সে হয়তো আমার নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। শিলাঙ্গীর প্রদীপ্ত চক্ষু দুইটির দিকে চাহিয়া আমার এত ভাল লাগিল যে আমি আর কোনো কথা বলিতে পারিলাম না, মুগ্ধ বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম কেবল।

শিলাঙ্গী বলিল— 'বেশ চল, তোমাদের দলপতির সহিত আলাপ করিয়া ফেলি। এখন ফিরিয়া যাওয়া খুব নিরাপদ নয়। চল তোমাদের কাছেই রাতটা কাটাইয়া যাই।'

'ফিরিয়া যাওয়া নিরাপদ নয় কেন?'

'একটু আগেই যে ভীষণ শব্দ হইল তাহা শুনিতে পাও নাই?'

'না। কিসের শব্দ?'

শিলাঙ্গী হাসিয়া ফেলিল।

'বাঘের গর্জনেও তোমার ঘুম ভাঙে নাই। সমস্ত পাহাড়টা কাঁপিয়া উঠিল আর তুমি ঘুমাইতেছিলে! চল, তোমাদের দলপতিকে গিয়া বলি যে, তোমার মতো নিদ্রালু লোক যদি ক্ষেত পাহারা দেয় তাহা হইলে ক্ষেতের ফসল একটিও থাকিবে না। আমরাই আসিয়া সমস্ত চুরি করিয়া লইয়া যাইব।'

আমি মনে মনে সত্যই অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিলাম। তবু বলিলাম, 'আজ আমার পাহারা দেওয়ার পালা নয় তাই আমি ঘুমাইতেছিলাম। এখানে আসিয়া শুইয়াছিলাম তোমাকে ধরিব বলিয়া।'

'কিন্তু আমি তোমাকে না জাগাইলে কি আমাকে ধরিতে পারিতে?'

'আমি জানিতাম, তুমি আমাকে জাগাইবে।'

'কি করিয়া জানিলে?'

'এ খবর তোমার চোখের দৃষ্টিতে কাল দেখিয়াছিলাম।'

'সত্য নাকি!'

তাহার বিস্ফারিত নয়নে সরল বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। তাহার পর সহসা আমার হাত দুইটি ধরিয়া অকৃত্রিম আনন্দ সহকারে সে বলিল, 'তুমি ঠিক ধরিয়াছ কিন্তু। তোমাকে আমার এত ভাল লাগিয়াছে যে আজ বাহির হইবার পূর্বেই আমি মনে মনে ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম যে যেমন করিয়া হউক তোমার সহিত আমি দেখা করিবই। তোমাকে যদি এখানে না পাইতাম তাহা হইলে হয়তো তোমাদেরই পল্লীতে গিয়া তোমার অনুসন্ধান করিতাম। এ কথা আমার চোখ দেখিয়াই তুমি কাল বুঝিতে পারিয়াছিলে?'

'না পারিলে এমনভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতাম না। আমি ইহাও আশঙ্কা করিয়াছিলাম যে আমাকে এখানে না পাইলে তুমি হয়তো পল্লীর ভিতরে যাইবে। তাই এখানে আসিয়া শুইয়াছিলাম।

'তোমাদের পল্লীর ভিতরে গেলে ক্ষতি কি? তোমাদের দলপতি লোক ভাল নয়?'

'ধবল লোক ভাল, কিন্তু দলপতি ছাড়াও আরও নানা ধরনের লোক আছে তো! কাহার মাথায় কি কুমতলব জাগিবে কে বলিতে পারে। তোমার এমন রূপ, আমাদের দলে অবিবাহিত যুবকের সংখ্যাও কম নয়, কেহ হয়তো তোমাকে দখল করিয়া বসিবে।'

'ইস, আমাকে দখল করা অত সহজ নয়। আমি বাঘকে পর্যন্ত ভয় করি না। এখনই তো বাঘের ঠিক পাশ দিয়া চলিয়া আসিলাম, বাঘ আমার দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কিছু বলিল না। এমন আরও অনেকবার ঘটিয়াছে।'

'এখন তুমি বাঘের পাশ দিয়া আসিয়াছ? বল কি! কোথায় বাঘ—'

'উন্নগা পাহাড়ের উপত্যকায়। এই সুড়ঙ্গের অপর মুখটা যেখানে আছে ঠিক তাহার পাশেই একটা বাঘ হরিণ মারিয়াছে। আমি যখন উপত্যকার ঠিক মাঝখানে তখন চাঁদও ঠিক পাহাড়ের মাথায়। জ্যোৎস্নায় সমস্ত উপত্যকাটা ভরিয়া গিয়াছিল। আমি দেখিলাম সুড়ঙ্গের কাছে একদল হরিণ চরিতেছে। আমি গাছের ছায়ায় ছায়ায় আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অনেকদিন হইতেই আমার একটি হরিণ শাবক পুষিবার ইচ্ছা আছে, ভাবিলাম যদি উহাদের দলে হরিণ শাবক থাকে তাড়া কবিব। কচি শিশু নিশ্চয়ই আমার সহিত ছুটিয়া পাল্লা দিতে পারিবে না। ঠিক ধরিয়া ফেলিব। প্রায় যখন উহাদের কাছাকাছি আসিয়াছি তখন একটা গাছের উপর হইতে বাঘটা উহাদের মধ্যে ়াফাইয়া পড়িল এবং একটা হরিণকে ঘায়েল করিল। তাহাব পর হরিণটাকে টানিতে টানিতে সুড়ঙ্গের ধারে আনিয়া ভীষণ গর্জন করিল একটা। তুমি নিশ্চয়ই অঘোরে ঘুমাইতেছিলে তাই গর্জনটা শুনিতে পাও নাই। গর্জন করিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল বাঘটা, বসিয়া হরিণের রক্ত পান করিতে লাগিল। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, বাঘ কিছুতেই ওঠে না। আমি দেখিলাম দাঁড়াইয়া থাকিলে সময়মতো এখানে পৌঁছিতে পারিব না, সকাল হইয়া যাইবে। তখন আমি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বাঘের কাছাকাছি যখন আসিয়াছি তখন বাঘটা ঘাড় তুলিয়া আমার দিকে একবার তাকাইল, আমিও চোখে চোখ রাখিয়া তাকাইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বাঘটা আবার আহারে মনোনিবেশ করিল। আমি ঠিক তাহার পাশ দিয়া আসিয়া সুড়ঙ্গে ঢুকিয়া পড়িলাম। আরও কয়েকবার বাঘের সামনে পড়িয়াছি। দেখিয়াছি তাহাদের ভয় না করিলে তাহারা কিছু বলে না।'

বলিতে বলিতে গর্বে তাহার চক্ষু দুইটি যেন আরও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'মানুষ কিন্তু বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর। বাঘকে বিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু মানুষকে বিশ্বাস করিও না।'

'নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিব। বিশ্বাস করিয়া দুই-একবার ঠকিয়াছি বটে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দিতেও ছাড়ি নাই।'

তাহার কালো চোখের তারায় প্রতিফলিত জ্যোৎস্নালোক যেন কৌতুকে নাচিতে লাগিল।

'শাস্তি দিবার শক্তি তোমার আছে? কিন্তু মনে হয় না। ধর, আমি যদি এখন তোমাকে আক্রমণ করি তুমি কি করিবে?'

বহু জন্ম পূর্বে জোলমাকেও ঠিক এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। জোলমা সমুচিত উত্তরও দিয়াছিল। কিন্তু সে প্রশ্ন আর সে উত্তর বিস্মৃতির অতলে হারাইয়া গিয়াছিল। সেই পুরাতন আমি যে নূতন মঞ্চে পুরাতন নাটকেরই নব-রূপ দান করিতেছি তাহা মনে ছিল না। তন্বী শিলাঙ্গীকে দেখিয়া মনে হইতেছিল উহার গায়ে আর কত শক্তি থাকিতে পারে? হাতটা যদি সজোরে চাপিয়া ধরি, ছাড়াইয়া লইতে পারিবে না।

'করিয়াই দেখ না।'

মৃদু হাসিয়া শিলাঙ্গী উত্তর দিল।

উত্তর দিবার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাহার হাতটা সজোরে চাপিয়া ধরিলাম। পর মুহূর্তে কিন্তু যাহা ঘটিল তাহার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। এক ঝটকায় হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া শিলাঙ্গী ছিটকাইয়া সরিয়া গেল এবং পর মুহূর্তেই দেখিলাম একটা ফাঁস আমার গলদেশে লাগিয়া আমার শ্বাসরোধ করিতেছে।

'কি করিতেছ, ছাড় ছাড়, আমার দম বন্ধ হইয়া যাইতেছে।'

শিলাঙ্গী দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল।

'আর একটু জোরে যদি টানি চিরকালের মতো দম বন্ধ হইয়া যাইবে। বড় বড় গরু আমাদের এই ফাঁসে আটকাইয়া কাবু হইয়া পড়ে।'

'খুলিয়া দাও, বড় কষ্ট হইতেছে।'

'শপথ কর আর কখনও আমার গায়ে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাত দিবে না।'

'শপথ করিলাম।'

'তিনবার কর।'

তিনবার করিলাম। তবু শিলাঙ্গী আমাকে বন্ধনমুক্ত করিবার কোনো লক্ষণ দেখাইল না, দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল। ফাঁসটা এমনভাবে আটকাইয়া গিয়াছিল এবং দড়িটা এত শক্ত যে আমি চেষ্টা করিয়াও তাহা খুলিতে পারিলাম না। আমার ব্যর্থ প্রয়াস শিলাঙ্গীর হাসির খোরাক জোগাইতে লাগিল কেবল। অবশেষে করুণকণ্ঠে আবার মিনতি করিতে হইল।

'শপথ তো করিয়াছি, এইবার খুলিয়া দাও।'

'তোমাকে আর একটা শপথ করিতে হইবে।'

'কি বল?'

'শপথ কর যে তুমি চিরকাল আমার বন্ধু থাকিবে।'

'তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার জন্য আমি নিজেই উৎসুক, ইহার জন্য শপথ করিবার প্রয়োজন নাই।'

'তবু শপথ কর। মুখের বন্ধুত্ব আমি চাই না, সেরকম বন্ধুত্ব অনেকের সহিত আছে, আমি তোমার প্রকৃত বন্ধুত্ব চাই।'

সেদিন গভীর রাত্রে চন্দ্রালোকিত শ্যামল ক্ষেত্রে বসিয়া শিলাঙ্গীর এই দাবি বড় অদ্ভুত মনে হইয়াছিল। আজও অদ্ভুত মনে হইতেছে। মনে হইতেছে ইহা বোধ হয় পুরুষের কাছে নারীর চিরন্তন দাবি। তখনকার দিনে মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠ কীর্তি শস্যক্ষেত্র, তাহারই মধ্যস্থলে আমি বন্দী হইয়া বসিয়াছিলাম, আমার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছিল একটি অপরিচিতা তন্বী কিশোরীর উপর, আর সে আমার জীবনের বিনিময়ে দাবি করিতেছিল প্রকৃত বন্ধুত্ব। আজও কি অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটিয়াছে?

'প্রকৃত বন্ধুত্ব বলিতে তুমি ঠিক কি বোঝ তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমি সত্যই তোমার বন্ধু হইতে চাই তাহা শপথ করিয়া বলিতেছি। আমার কথা তুমি বিশ্বাস কর।'

'আমার যাহাতে অপমান বা অমঙ্গল হয় তাহা তুমি ইচ্ছা করিয়া কখনও করিবে না—ইহাকেই আমি প্রকৃত বন্ধুত্ব বলি। এরকম বন্ধু আমার একজনও নাই। অনেকেই আমাকে বিবাহ করিতে চায়, অনেকে আমাকে লইয়া একটু মজা করিতে চায়, কিন্তু প্রকৃত বন্ধু আমার একজনও নাই। তুমি হইবে?'

'হইব। তোমার নিকটও আমি এই দাবি করিতে পারি কি?'

'নিশ্চয়—।'

শিলাঙ্গী আসিয়া আমার গলার ফাঁস খুলিয়া দিল। শুধু তাই নয়, ছুটিয়া আসিয়া বাহুদ্বারা কণ্ঠবেষ্টন করিয়া সে আমার ক্রোড়ের উপর উপবেশন করিল। দেখিলাম তাহার চোখের দৃষ্টিতে, মুখের ভাবে এক অপূর্ব কোমলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। জোলমার নিস্পৃহতা আমার পৌরুষকে একদিন কৌতূহলী করিয়া তুলিয়াছিল। শিলাঙ্গীর আগ্রহ সেদিন আমাকে আকুল করিয়া তুলিল। জোলমার নিস্পৃহতা তাহাকে রহস্যময়ীও করিয়াছিল, শিলাঙ্গীর অতি সরলতাও তাহাকে কম রহস্যময়ী করে নাই। আমি তাহার সম্বন্ধে আকুল হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহাকে ঠিক বুঝিতে পারি নাই। কারণ সে যুগেও যে মানব-চরিত্রের সহিত আমরা পরিচিত ছিলাম তাহাতেও কপটতার খাদ থাকিত। পশুত্বের স্তর হইতে যতই আমরা সভ্যতার স্তরে উন্নীত হইতেছিলাম ততই আমাদের সারল্য অবলুপ্ত হইতেছিল। আমাদের জীবনধারণ পদ্ধতির সহিত তাল রাখিয়া আমাদের চরিত্রও জটিল হইতেছিল। কাহাকেও ভাল লাগিলে সে যুগেও আমরা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে পারিতাম না—'আমি তোমার বন্ধুত্ব কামনা করি।' কাহারও উপর ক্রোধ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণও আমরা করিতাম না। শত্রুর সহিতও হাসিমুখে আলাপ করিবার পদ্ধতি আমরা শিখিয়াছিলাম। তাই শিলাঙ্গীকে ঠিক বুঝিতে পারি নাই, তাহার সবলতার পূর্ণ মূল্য দিতে পারি নাই। শিলাঙ্গী যদি নারী না হইয়া পুরুষ হইত, তাহা হইলে তাহার এই আচরণে হয়তো আমি বিস্মিত হইতাম, হয়তো ভয় পাইতাম, হয়তো তাহাকে কোল হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতাম। শিলাঙ্গী নারী বলিয়া তাহার আচরণের একটি অর্থ সেদিন আমার চক্ষে প্রতিভাত হইল — সে আমার পৌরুষকে কামনা করিতেছে। প্রকৃত বন্ধুত্বের অন্য কোনো অর্থ করিতে পারি নাই সেদিন। তাই পুলকিত হইয়া বলিয়াছিলাম, 'তোমাদের দলের লোক যদি আমাদের সহিত শত্রুতা করে তাহা হইলেও তুমি আমার বন্ধু থাকিবে তো?'

শিলাঙ্গী বলিল, 'নিশ্চয়। আমাদের দলের সহিত তোমাদের যাহাতে শত্রুতা না হয় সেই ব্যবস্থাই করিতে হইবে। রোহার সহিত যদি ভাব করিতে পার তাহা হইলে সহজেই তাহা হইয়া যাইতে পারে। রোহার কাছে চল না একদিন। রোহা যখন একা থাকিবে তখন তাহার সহিত দেখা করিলে ভয়ের কোনো কারণ নাই। রোহা লোক খুব ভাল।'

'কি করিয়া জানিব কখন কোথায় সে একা থাকে।'

'সেটা জানা মুশকিল বটে। তবে প্রত্যহই সে খানিকটা সময় একা থাকে। আমাদের গরুরা নিগম বনে এখন আছে, সেখানে একা একা সে প্রায়ই যায়। সেইখানে আমি তোমাকে একদিন লইয়া যাইব। কিন্তু কোথায় তোমাকে খবর দিব? উন্নগা পাহাড়ে যেখানে তোমার সহিত প্রথম দেখা হইয়াছিল সেইখানে তুমি যদি দুপুরে যাও, আমিও আসিব। দূরে কে যেন আসিতেছে একজন-—'

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম। সত্যই দূরে একটি মনুষ্যমূর্তি দেখা যাইতেছিল। সন্দেহ হইল হয়তো নিনানি।

শিলাঙ্গীকে বলিলাম, 'তুমি এখন চলিয়া যাও। আমি কাল তোমার সহিত দেখা করিব।'

'যে আসিতেছে তাহার সহিত যদি আলাপ করি ক্ষতি কি? তুমি যদি আমাকে নিজের বন্ধু বলিয়া পরিচয় দাও—'

আমি শিলাঙ্গীকে কথা শেষ করিতে দিলাম না।

'কে আসিতেছে ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি এখন যাও। আলাপের ব্যবস্থা পরে করিব। আমাদের দুই দলের মধ্যে যদি বন্ধুত্ব হয় আলাপ তো হইবেই। এখন কিন্তু ও যদি তোমাকে আমাকে এইভাবে দেখে—বিশেষত তুমি আমাদের শস্য কাটিয়া লইয়াছ—তাহা হইলে সমূহ গোলযোগের সম্ভাবনা। তুমি এখন যাও—।'

'বেশ। তুমি তাহা হইলে ঘাস দিয়া গর্তের মুখটা বন্ধ করিয়া দাও।'

একটু অনিচ্ছাভরেই শিলাঙ্গী চলিয়া গেল। সরীসৃপের মতো গর্তের মধ্যে ঢুকিল, ছোট ছোট তৃণগুচ্ছগুলিও তাহার অনুসরণ করিল। যে ঘাসের বোঝাটা দিয়া আগের দিন গর্তের মুখ ঢাকা ছিল সেইটা দিয়াই মুখটা বন্ধ করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু মনে হইল তাহা সমীচীন হইবে না, মুখটা খোলাই থাক। গভীর রাত্রে আমার এখানে অবস্থানের কারণটা তাহা হইলে দেখাইতে পারিব।

...নিনানিই আসিতেছিল। সে কাছাকাছি আসিতেই আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। নিনানির চুল আলুলায়িত। আমাকে দেখিয়া সে সবিস্ময়ে বলিল, 'তুমি এখানে! আমি কতক্ষণ ধরিয়া তোমাকে খুঁজিতেছি। তুমি এত রাত্রে এখানে কেন?'

বলিলাম, 'দেখিলাম এখানকার তৃণগুসি খুব বেশি নড়িতেছে। ভাবিলাম হয়তো ছাগল বা গরু ঢুকিয়াছে। কিন্তু আসিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কেবল এই গর্তটা দেখিতেছি। বোধ হয় ইঁদুর কিংবা খরগোসের গর্ত!'

নিনানি গর্তের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করিল না।

বলিল, 'আমি কন্যা নদী হইতে স্নান করিয়া আসিয়াছি। ধবলের প্রমাতামহের আদেশ আমি মানিতে পারিলাম না। জানি সে প্রতিশোধ লইবে, তবু মানিতে পারিলাম না। বিঘাওয়ের পায়ের পুঁজরক্ত আমি মাথায় করিয়া থাকিতে পারিব না। ইহার অপেক্ষা মৃত্যুও ভাল। যে-কোনো মুহূর্তেই হয়তো আমার মৃত্যু হইবে, তাই যতক্ষণ বাঁচিয়া আছি তোমার কাছেই থাকিব।'

এই বলিয়া সে আমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। দেখিলাম সে কাঁপিতেছে।

'কখন তুমি স্নান করিলে?'

'একটু আগে।'

'আর কেহ কি তোমাকে স্নান করিতে দেখিয়াছে?'

'না। আমার যখন মূর্ছা ভাঙিল তখন উঠিয়া দেখি সকলে ঘুমাইতেছে। তোমাকে খুঁজিলাম কিন্তু পাইলাম না। একাই তখন বাহির হইয়া আসিলাম। কেবল জিগা আমার সঙ্গে ছিল।'

ধবলের কুকুরের নাম জিগা।

'জিগা কোথায়?'

'তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। জিগার সঙ্গও আমার ভাল লাগিল না। বিঘাওয়ের পুঁজরক্ত মাথায় মাখিয়া আমি খোলা আকাশের নীচে আসিয়া দাঁড়াইলাম। মনে হইল আকাশের জ্যোৎস্নাও আমার কেশ স্পর্শ করিতে ঘৃণাবোধ করিতেছে, মনে হইল পৃথিবীর সর্বত্রই চাঁদের আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে আর সমস্ত অন্ধকার আসিয়া পুঞ্জীভূত হইয়াছে

আমার মাথায়, আমার পুঁজরক্তমাখা কেশে। মনে হইল ইহার অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। ধবলের প্রমাতামহ যদি আমাকে মারিয়া ফেলিতে চায় মারিয়া ফেলুক। অপরাজিতা বংশের কন্যা আমি, এত গ্লানি বহন করিয়া বাঁচিতে চাই না। এই কথা মনে হওয়ামাত্র আমি কন্যা নদীতে অবগাহন করিলাম। এইবার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছি। তুমি আমাকে ত্যাগ করিবে না তো?'

'না—'

নিনানি উৎসুক নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিলাম তাহার অধরে আবার মৃদু মৃদু হাসি ফুটিতেছে।

'আমার চুলে হাত দিয়া দেখ, একটুও পুঁজরক্ত নাই। কন্যা নদীর জলে বার বার ধুইয়াছি। হাত দিয়া দেখ না একবার।'

তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। তাহার পর বলিলাম, 'চল, এবার ফিরি —'

'কোথায় ফিরিব?'

'ঘরে চল—'

'সকলে যদি জানিতে পারে যে আমি বিঘাওয়ের নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া স্নান করিয়াছি, তাহা হইলে কি তাহারা আমাকে ঘরে থাকিতে দিবে?'

'তুমি যদি ঘরে থাকিতে চাও তাহা হইলে তাহাতে আপত্তি করিবার সাহস কাহারও হইবে না। তুমি দলপতি ধবলের পত্নী একথা ভুলিয়া যাইতেছ কেন?'

'ভানা, টুলা, কিম্বা, বেসু—ইহারাও ধবলের পত্নী। তোমরা ইহাদের যে বিশেষ মর্যাদা দিয়াছ তাহা মনে হয় না। সেদিন ঠেঠরা ধবলের সম্মুখেই টুলাকে প্রহার করিল ধবল তো কিছুই বলিল না। তোমরাও সকলে চুপ করিয়া ছিলে। একমাত্র আমিই প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাকে নির্যাতন করিলে কেহই প্রতিবাদ করিবে না জানি। কারণ আমি সকলেরই চক্ষুশূল।'

'আমি প্রতিবাদ করিব। আমি বাঁচিয়া থাকিতে কেহই তোমাকে অপমান করিতে পারিবে না। তা ছাড়া, আর একটা কথা। তুমি যে স্নান করিয়াছ একথা কাহাকেও বলিবার প্রয়োজন কি। কেহ যখন তোমাকে স্নান করিতে দেখে নাই তখন চুপচাপ থাকাই ভাল। দেখাই যাক না কি হয়।'

'আমার মাথার চুলই যে সব কথা প্রকাশ করিয়া দিবে। আমার চুল দেখিবামাত্র সকলে বুঝিতে পারিবে যে আমি স্নান করিয়াছি।'

সহসা আমার মাথায় একটা প্রেরণা আসিল।

আমি বলিলাম, 'চল, তোমার মাথার চুল আমি ঢাকিয়া দিব—'

'ঢাকিয়া দিবে? কিরূপে তাহা সম্ভব!'

'গাছের সরু সরু ডাল ও পাতার সাহায্যে।'

কথাটা বলিয়া আমি নিজেই অবাক হইয়া গেলাম। সহসা-উদ্বুদ্ধ কল্পনা আমাকে নিমেষে যেন নূতন লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিল। কল্পনানেত্রে আমি নিনানির মস্তকে শাখা-পত্র-নির্মিত শিরস্ত্রাণটা যেন দেখিতে পাইলাম। নিনানিকে আমি যে ভালবাসি, শিলাঙ্গীকে ভাল লাগিয়াছে

বলিয়া সে ভালবাসা যে এতটুকু ম্লান হয় নাই সহসা তাহা যেন উপলব্ধি করিলাম। তাহার দুঃখ, তাহার আতঙ্ক, তাহার বিচূর্ণিত আত্মসম্মান, আমার উপর তাহার আকুল নির্ভরশীলতা আমার পৌরুষকে একাগ্র করিয়া তুলিল। সেই একাগ্রতাই বোধ হয় আমাকে স্রষ্টাপদেও উন্নীত করিল। প্রেমের প্রেরণায় আমি এমন একটা সৃষ্টিকর্মে মাতিয়া উঠিলাম যাহা ভবিষ্যতে যুগান্তকারী বলিয়া বিঘোষিত হইবে। তখন কিন্তু চুপড়ি বা ঝুড়ির সম্ভাবনা আমার সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না। অপমানিতা নিনানিকে রক্ষা করিবার জন্য আমার কল্পনা তখন উপায় উদ্ভাবন করিতেছিল, তাহার সম্বৃত কেশপাশ বেষ্টন করিয়া শাখা-পত্রের আবরণ সৃজন করিতেছিল, তাহার পরিণামের কথা ভাবে নাই। উন্নগা পর্বতের সানুদেশে আমাদের জমির প্রান্তভাগে প্রকাণ্ড একটা গাছ ছিল। সেই গাছটা দেখাইয়া নিনানিকে বলিলাম, 'চল, আমরা ওই গাছের তলায় যাই, ওখানে গিয়া এখনই তোমার মাথা ঢাকিয়া দিব।'

নিনানি আবদার-মাখা কণ্ঠে উত্তর দিল, 'আমি আর হাঁটিতে পারিতেছি না। আমাকে তুমি তুলিয়া লইয়া চল।'

নিনানিকে স্কন্ধে তুলিয়া লইলাম। হাঁটিতে হাঁটিতেই ঠিক করিয়া ফেলিলাম কি করিয়া তাহার মাথার চুল ঢাকিব। চুলগুলি প্রথমে চূড়া করিয়া বাঁধিয়া লইতে হইবে। তাহার পর তাহার কপালে একটা লতার বেষ্টনী দিব, তাহার পর চুলের চূড়ায় সরু সরু গাছের ডাল বাঁধিয়া সেই ডালগুলি নোয়াইয়া আনিয়া সেই লতা-বেষ্টনীতে আটকাইয়া দিব। খুব ঘন ঘন করিয়া দিতে হইবে, যাহাতে চুল না দেখা যায়। ডালের ফাঁকে ফাঁকে পাতা গুঁজিয়া দিলে একেবারেই দেখা যাইবে না। কল্পনার উন্মাদনায় আমি অতিশয় দ্রুতবেগে গাছের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। গাছের তলায় পৌঁছিতে খুব বেশি সময় লাগিল না, স্কন্ধারূঢ়া নিনানির ভার আমাকে ক্লান্তও করে নাই, আমি স্বপ্নের পাখা মেলিয়া যেন উড়িয়া চলিয়া গেলাম। গাছের তলায় দেখিলাম ঘন অন্ধকার। কেবল একটি স্থানে চাঁদের আলো পড়িয়াছে। নিনানিকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া বলিলাম, 'তুমি ওই চাঁদের আলোয় বস। আমি গাছের উপর উঠিয়া শাখা-পত্র সংগ্রহ করি। একটা লতাও সংগ্রহ করিতে হইবে।'

'লতা? লতা লইয়া কি করিবে?'

'দেখিতেই পাইবে।'

'ও বুঝিয়াছি।'

নিনানির চোখে হাসির দীপ্তি ফুটিল। আমি গাছে উঠিয়া পড়িলাম। গাছে এক ঝাঁক বক বসিয়াছিল। আমি গাছে উঠিতেই তাহারা 'ওয়াক্ ওয়াক্' শব্দ করিতে করিতে উড়িয়া গেল। বৃক্ষশীর্ষে উঠিয়া দেখি তাহারা মাথার উপর চক্রাকারে উড়িতেছে। কৃষ্ণ-আকাশের পটভূমিকায় চন্দ্রালোকে সেই শ্বেতপক্ষ বিহঙ্গম দল আমার মনে এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার করিল। আমি মুগ্ধনেত্রে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলাম। একটা উদ্ভট উপমাও মনে জাগিল। হঠাৎ মনে হইল জ্যোৎস্না বোধ হয় বিহঙ্গ-রূপ ধরিয়া এই বৃক্ষে আসিয়া বসিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে বকের দল দিগন্তে বিলীন হইয়া গেল। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া আমি ডাল ও পাতা সংগ্রহে মন দিলাম। ডাল ও পাতার বোঝা লইয়া নীচে নামিয়া দেখি নিনানি নাই।

'নিনানি—'

কোনো সাড়া পাইলাম না।

'নিনানি—'

তবু কোনো সাড়া নাই। কোথায় গেল সে? সহসা শিলাঙ্গীর কথা মনে পড়িল। কাছেই কোথায় যেন বাঘ বাহির হইয়াছে!

'নিনানি—'

'আঃ, অত চিৎকার করিতেছ কেন। আমি লতা সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলাম। দেখ, এই লতায় হইবে কিনা।'

'কোথায় গিয়াছিলে?'

'পাহাড়ের উপর। নীচে কোথাও পাইলাম না। পাহাড়ের উপরও পাই নাই, একটি মেয়ে আমাকে দিল।'

'মেয়ে? কাহাদের মেয়ে?'

'তুমি যাহাদের কথা বলিতেছিলে, পাহাড়ের ওপারে যাহারা থাকে, যাহারা গরুর দুধ পান করে তাহাদের মেয়ে। নাম বলিল শিলাঙ্গী। মেয়েটি একটি লতায় ঘাসের কয়েকটি ছোট ছোট আঁটি বাঁধিয়া টানিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, আমাকে দেখিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, তাহার পর আমার কাছে আগাইয়া আসিল। আসিয়া প্রশ্ন করিল—আমি এমনভাবে একা দাঁড়াইয়া আছি কেন। আমি বলিলাম—আমার একটা লতার দরকার, তাহাই খুঁজিতে আসিয়াছি। সে বলিল—এখন পাহাড়ে লতা খোঁজা নিরাপদ নয়। বাঘ বাহির হইয়াছে। তোমার যদি বিশেষ দরকার থাকে আমার এই লতার খানিকটা অংশ লও। এই বলিয়া সে দাঁত দিয়া খানিকটা লতা ছিঁড়িয়া আমাকে দিল। দিয়াই ছুটিয়া চলিয়া গেল। বেশ মেয়েটি। দেখ, এই লতায় হইবে কিনা।'

আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। শিলাঙ্গীর সহিত নিনানির দেখা হইয়াছে। এখন হইলে বলিতাম বিধাতার কি অদ্ভুত পরিহাস! কিন্তু তখন বিধাতার সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না, তাই এই ধরনেব কথা মনে হইল না, কিন্তু এই অদ্ভুত যোগাযোগের বিস্ময়টা আমার চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল, মনে হইল একটা অজানা ইঙ্গিত আমাকে কি যেন বলিতে চাহিতেছে, কিন্তু তাহার অর্থ তখন বুঝিতে পারি নাই। বহুকাল পরে বুঝিয়াছিলাম, তাহাও অস্পষ্ট ভাবে।

'অমন করিয়া চাহিয়া আছ কেন?'

'বাঘ বাহির হইয়াছে না কি?'

আমার নীরব বিস্ময়ের হেতুটা বাঘের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া চক্ষু দুইটি আর একটু বিস্ফারিত করিলাম।

'তোমার তো বাঘকে ভয় পাইবার কথা নয়। তুমি বাহির হইয়াছ শুনিলে বাঘেরই বরং ভয় পাইবার কথা। কন্যা নদীর তীরে আসিবার পথে কুঠারের এক আঘাতে তুমি যে প্রকাণ্ড বাঘটাকে মারিয়াছিলে তাহার প্রেতাত্মা নিশ্চয়ই তোমার সম্বন্ধে সমস্ত বাঘদের সাবধান করিয়া দিয়াছে। নাও, এখন কি করিবে কর, আমার বড় ক্লান্ত লাগিতেছে।'

'যেখানে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে ওইখানে বস।'

নিনানি গিয়া সেই আলোকিত স্থানটিতে উপবেশন করিল। সেই বিরাট অশ্বত্থবৃক্ষতলে গভীর রাত্রে জমাট অন্ধকারের পটভূমিকায় নিনানিকে বড় অদ্ভুত দেখাইতেছিল। মনে হইতেছিল, সে-ই যেন মূর্তিমতী আলোক, জমাট অন্ধকারের বুকে বসিয়া তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা

করিতেছে। কন্যা নদীতে অবগাহন করিয়া সত্যই সেদিন সে অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়াছিল। তাহা যে কত বড় বিদ্রোহী মনের পরিচয় তাহার স্বরূপ কল্পনা কর৷ আজ হয়তো তোমাদের পক্ষে শক্ত। মানব-মনের সৌন্দর্যপ্রিয়তার নিগূঢ় প্রেরণায় সে স্বয়ং মৃত্যুকেই বরণ করিয়াছিল। বিঘাওয়ের আদেশ উপেক্ষা করিলে যে কানা ভীষণ প্রতিশোধ লইবে এ বিশ্বাস তাহার ছিল, তবু সে মাথায় পুঁজরক্ত মাখিয়া থাকিতে পারে নাই। তাহার অন্তরের শুচিতাবোধ তাহাকে বিদ্রোহিনী করিয়া তুলিয়াছিল। অন্ধকার-পরিবেষ্টিতা জ্যোৎস্নালোকিতা নিনানির দিকে চাহিয়া আমি যে বিস্ময় অনুভব করিতেছিলাম তাহার মধ্যে ভয়ও ছিল। কারণ আমিও বিশ্বাস করিতেছিলাম যে নিনানির অবাধ্যতার ভয়ঙ্কর পরিণাম এবার আসন্ন, কানা তাহাকে কিছুতেই ক্ষমা করিবে না। নিনানি মৃত্যুর পর প্রেতিনী হইয়া হয়তো আমাদের কাছাকাছি কোথাও আশ্রয় লইবে। আমি যদি এখন নিনানিকে তুষ্ট করিতে পারি নিনানির প্রেতিনীও আমার প্রতি তুষ্ট থাকিবে। আমি যে ঠিক জ্ঞাতসারে এসব কথা ভাবিতেছিলাম তাহা নয়। নিনানির প্রতি প্রেমই প্রধানত আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল ইহাই সত্য, কিন্তু আজ আমার সন্দেহ হইতেছে যে নিনানিকে সন্তুষ্ট করিবাব জন্য আমি সেদিন যে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহার অন্তরালে হয়তো ভয়ও ছিল। কারণ, সে যুগে আমাদের সমস্ত কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রক ছিল পরলোক। যে পরলোকে বিদ্রোহী প্রেতাত্মারা অসীম শক্তিলাভ করিয়া প্রতিহিংসাপরায়ণ হইযা ওঠে, যে পবলোকেব রহস্য উদ্ভেদ করিয়া ইহলোকে বিঘাওরা আধিপত্য করে, সে পরলোককে উপেক্ষা কবিয়া অথবা তাহার সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া সে যুগে কোনো কার্যই আমরা করিতে পারিতাম না।

'তুমি মাথাটা একটু নিচু কবিয়া বস। তোমার চুলগুলো আগে চূড়া করিয়া বাঁধিয়া লইতে হইবে।'

নিনানি মাথা নিচু করিল। আমি আমার শাখাপত্রেব বোঝাটা লইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিলাম। বাধ্য বালিকার মতো নিনানি মাথা নিচু করিয়া রহিল।

...নিনানির মাথাটুকু ঢাকিতে আমার অনেকক্ষণ সময় লাগিল। তাহার মাথার কেশরাশি যে কত বার কত প্রকারে বাঁধিলাম ও খুলিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই। নিনানি কিন্তু ধৈর্যভবে বসিয়া রহিল, একটুও প্রতিবাদ করিল না। চন্দ্রালোকিত অংশটুকু ক্রমে ক্রমে স্থান পরিবর্তন করিতেছিল, আমরাও সরিয়া সবিয়া বসিতেছিলাম, উন্মুক্ত প্রান্তরে গিয়া বসিবার সাহস আমাদের ছিল না, সে যুগে আড়ালে প্রচ্ছন্ন থাকিযাই আমরা নিরাপদ বোধ করিতাম।

...নিনানির মস্তকের আবরণটা যখন শেষ হইল তখন নিজের কারুকর্ম দেখিয়া নিজেই অবাক হইয়া গেলাম। শাখাপত্রের শিরস্ত্রাণ পরিয়া নিনানিকে নূতন দেখাইতেছিল। রাত্রি শেষ হইয়া গিয়াছিল। প্রভাতের কোমল আলোকে শ্যাম-শিরোভূষণ-শোভিতা নিনানিকে যেন অবাস্তব বলিয়া মনে হইতেছিল। কল্পনায় আমি যে চিত্র দেখিয়াছিলাম বাস্তবে তাহাই যেন অবাস্তব হইয়া গেল। অপূর্ব পুলকে ও গর্বে আমার সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল আমি যেন নিনানিকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিলাম। এ নিনানি আমার, একান্তভাবেই আমার। ইহাকে আমি ধবলের কাছে আর ফিরাইয়া দিব না। সহসা আবেগভরে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম, তাহার পর স্কন্ধে তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলাম। আদরে নিনানির কখনও অরুচি ছিল না, সে পর্যন্ত বলিল, 'জংলা, তুমি কি পাগল হইয়া গেলে নাকি! আমাকে নামাইয়া দাও, চল এবার ফিরিয়া যাওয়া যাক।'

'তোমাকে আমি ফিরিতে দিব না। তুমি এইখানেই থাক—'

'মানে—?'

'এখন এইখানে থাক, তাহার পর তোমার জন্য আমি অন্য একটা বাসা ঠিক করিব। সকলে জানুক যে তুমি মরিয়া গিয়াছ, বিঘাওয়ের উপর ভর করিয়া কানা যে নিদারুণ আদেশ তোমাকে দিয়াছে সেই আদেশের ফলে তোমাব মৃত্যু হইয়াছে। এই কথা আমি গিযা এখনই সকলকে বলিয়া দিতেছি। আমি বলিব যে বিঘাওয়ের কথা অমান্য করিয়া তুমি কন্যা নদীতে স্নান করিতে নামিয়াছিলে, কানা ক্রোধে অধীর হইয়া তোমাকে জলে ডুবাইয়া মারিয়াছে। তুমি আর ফিরিয়া যাইও না।'

নিনানি বলিল, 'মৃত্যু তো আমাব হইবেই। তখনই সকলে দেখিবে। এখন হইতে মিথ্যার আশ্রয় লইয়া লাভ কি?'

'লাভ এই যে যতক্ষণ তুমি বাঁচিয়া থাকিবে একান্তভাবে আমারই থাকিবে। বিঘাও জানুক যে তুমি আর নাই।'

'তাহাতেই বা লাভ কি তোমার।'

নিনানির চোখে এক ঝলক আলো চকমক করিয়া উঠিল, মুখে মৃদু হাসি ফুটিল।

'তোমাব মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া বিঘাও কি করে দেখা যাক না। তোমার অন্তর্ধানে তাহার মনে কি-ভাব জাগে দেখিতে চাই। লাভ হয়তো তেমন কিছু হইবে না, তবু কৌতূহল হইতেছে।'

নিনানি আমার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। ব্যাপারটার অভিনবত্ব আমাকে ক্রমশ যেন পাইয়া বসিল। নিনানির মস্তক ঘিরিয়া শাখা-পত্রের যে শিরস্ত্রাণ শোভা পাইতেছিল, আমিই যে তাহার স্রষ্টা এই বোধ আমাকে যেন নির্ভীক করিয়া তুলিয়াছিল, মনে হইতেছিল, আমি যাহা খুশি কবিতে পারি, জীবন্ত নিনানিকে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করার দুঃসাহসিকতাও অসম্ভব নয় আমার পক্ষে। ইহার মধ্যে যে অভিনবত্ব ছিল তাহাই আমাকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। নিনানি কিন্তু একটা অদ্ভুত খবর দিল। যদিও ঘটনাটা আমার নিকট স্বাভাবিক মনে হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু অদ্ভুত ঠেকিল।

মৃদু হাসিয়া নিনানি বলিল, 'এ খবর শুনিয়া বিঘাওয়ের মনে কি ভাব হইবে তাহা আমি জানি।'

'জান?'

'হাঁ জানি। বিঘাও হতাশ হইবে।'

'হতাশ হইবে? কেন?'

'কারণ সে একাধিকবার আমার নিকট প্রণয় নিবেদন করিয়াছে। তাহার আশা আছে যে আমি একদিন তাহার নিকট ধরা দিব। তাহার আকাঙ্ক্ষা ধবলকে সরাইয়া আমাকে বিবাহ করিয়া সে-ই একদিন নিম্ন-সম্প্রদায়ের দলপতি হইবে। সে এখনও বোধ হয় আশা করে যে আমি তাহার সহায়তা করিব। সুতরাং আমার মৃত্যুসংবাদ শুনিলে সে হতাশই হইবে।'

'তবে সে তোমাকে এমনভাবে অপমান করিল কেন?'

কথাটা বলিয়াই আমি বুঝিলাম যে, ভুল বলিয়াছি। নিনানি আমাকে সংশোধন করিয়া দিল সঙ্গে সঙ্গে।

'সে তো আমাকে অপমান করে নাই। আমাকে শাস্তি দিয়াছে ধবলের প্রমাতামহ কানা। বিঘাওয়ের উপর যদি কোনো প্রেতাত্মা ভর করিয়া কোনো কথা বলে তাহার জন্য বিঘাওকে দায়ী করা চলে না।'

'ঠিক ঠিক।'

সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার ভুল বুঝিতে পারিলাম। প্রেতাত্মাদের অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তি সম্বন্ধে আমরা সকলেই নিঃসন্দেহ ছিলাম। বিঘাও-জাতীয় যাদুকরদের মারফতই যে তাহারা নিজেদের অভিপ্রায় কখনও সরল ভাষায় কখনও নিগূঢ় ইঙ্গিতে প্রকাশ করে, ইহাতেও আমাদের কাহারও সন্দেহ ছিল না। তবু ওই ধরনের কথা আমার মুখে যে কেন আসিল তাহা জানি না।

'বিঘাও তোমার কাছে প্রণয় নিবেদন করিয়াছিল, একথা আমাকে তো বল নাই—'

নিনানির চোখেমুখে দুষ্টামিমাখা হাসি ঝলমল করিয়া উঠিল।

'অনেক পুরুষের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। কত লোকে কত কথা বলে। সব কথা কি সকলকে বলিতে পারি? বলিলে তোমাদের নিম্ব-সম্প্রদায় এতদিন ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যাইত।'

আমি নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার মাথায় শাখা-পত্রময় শিরোভূষণটা আবার আমাকে উদ্দীপ্ত করিল, আবার আমার মনে হইল আমি অসাধ্য সাধন করিতে পারি। বিঘাওকে কঠোর শাস্তি দিবার অসমসাহসিক কল্পনাও একবার মনের মধ্যে খেলিয়া গেল।

'বিঘাও যখন তোমার নিকট প্রণয় নিবেদন করিয়াছিল তখন তুমি কি উত্তর দিয়াছিলে?'

'তাহা তোমাকে বলিব কেন?'

'বলিতেই হইবে।'

আগাইয়া গিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে আমি নিনানির হাত দুইটি চাপিয়া ধরিলাম। আমার মূর্তি দেখিয়া নিনানির মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

'বল তুমি কি উত্তর দিয়াছিলে!'

'বলিয়াছিলাম যে তোমার পায়ের ঘা আগে সারুক তাহার পর তোমার কথার জবাব দিব।'

'এই জবাব দিয়াছিলে? পায়ের ঘায়ের কথা বলিয়াছিলে?'

'হ্যাঁ।'

নিনানির চোখের দৃষ্টি ভাষাময় হইয়া উঠিল। আমার চোখেও হয়তো ভাষা ফুটিয়াছিল। আমরা পরস্পরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার মনে যাহা জাগিতেছিল, তাহা মুখ ফুটিয়া উচ্চারণ করা দূরে থাক ভালভাবে চিন্তা করিতেও সাহস পাইতেছিলাম না। ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া অবশেষে ঠিক করিয়া ফেলিলাম, নিনানিকে আর ফিরিয়া যাইতে দিব না, লুকাইয়াই রাখিব। বিঘাওকে পরীক্ষা করিতে হইবে।

'সত্যই তাহা হইলে আমরা আর ফিরিয়া যাইব না?'

'না, আপাতত তুমি এখানে গাছের উপর লুকাইয়া থাক। আমি উন্নগা পর্বতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখি, যদি থাকিবার মতো গুহা পাওয়া যায় একটা। একটা নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে।'

'গুহা? আমি গুহায় একা থাকিতে পারিব না।'

'একা থাকিবে কেন, আমিও তোমার সঙ্গে থাকিব। আমার তো ঘরে বউ নাই যে তাহার জন্য প্রত্যহ ঘরে ফিরিতে হইবে। আমি দিনের বেলায় মাঠে কাজ করিব, তাহার পর রাত্রে পাহারা দিবার ছুতায় বাহির হইয়া পড়িব। তখন তোমার কাছে যাইব।'

'সমস্ত দিন আমি একা গুহায় বসিয়া বসিয়া করিব কি?'

'শিকার করিবে। তোমার হাতের লক্ষ্য তো অব্যর্থ। আমি তোমাকে তীর ধনুক দিয়া আসিব। চকমকি ও কিছু কাঠও লইয়া যাইব। তুমি শিকার করিয়া রাখিবে, আমি রাত্রে গিয়া সেগুলি ঝলসাইব। তাহার পর দুইজনে মিলিয়া আনন্দ করিয়া খাওয়া যাইবে। ইহাতে ভয় পাইতেছ কেন? নূতন ধরনের জীবন যাপন করিয়া দেখা যাক না কি হয়।'

নিনানির মন যে এই অভিনবত্বের প্রলোভনে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা তাহার চোখের দৃষ্টি দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। মুখে সে আপত্তি করিতেছিল ছলনার বশে। তাহার মতো ছলনাময়ী রমণী আমাদের দলে আর ছিল না।

'ধবল ঘিসু যদি ইতিমধ্যে ফিরিয়া আসে?'

'ফিরিয়া আসিলে তাহারাও তোমার মৃত্যু-সংবাদ শুনিবে, তখন বোঝা যাইবে তাহারা তোমাকে কতটা ভালবাসে।'

নিনানির চক্ষু দুইটি আর একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

'ভানা টুলা কিম্বা বেসুও আমার মৃত্যু-সংবাদে কি করে তাহাও একটু লক্ষ্য করিও। আমার মনে হয় টুলাটা কাঁদিবে।'

'লক্ষ্য করিব। তুমি তাহা হইলে গাছে উঠিয়া বসিয়া থাক, আমি গুহার সন্ধানে চলিলাম।'

...উন্নগা পর্বতে গুহার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে আমার মন আর একটি প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করিতেছিল। শিলাঙ্গীর কথা নিনানিকে বলিব কিনা, নিনানির কথাও শিলাঙ্গীকে বলা সমীচীন হইবে কিনা। একাধিক স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক রাখা, এমন কি অপরের বিবাহিত স্ত্রীর সহিত যৌন-সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়া সে যুগে পাপ বলিয়া গণ্য হইত না। জননীর পরিচয়েই তখন পুত্রের পরিচয় হইত। আমার বয়সও তখন বেশি নয়, যে বালিকাটির সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল সে বহুকাল পূর্বে মারা গিয়াছে, সুতরাং একাধিক স্ত্রীর সহিত যে আমি সংশ্লিষ্ট থাকিব ইহা স্বাভাবিক বলিয়াই সকলে মনে করিবে, ইহার বিরুদ্ধে প্রবল সামাজিক আপত্তি উঠিবে না তাহা আমি জানিতাম। কিন্তু তবু নিনানির প্রতি আমার যে দুর্বলতা আছে তাহা প্রকাশ্যে স্বীকার করিবার সাহস আমার ছিল না, ধবলের নিকট এ কথাটা গোপন করিয়া রাখিবার যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করিতাম। কারণ আমি জানিতাম—আমরা সকলেই জানিতাম যে, সামাজিক নিয়ম যাহাই থাক ঈর্ষা নামক সহজাত প্রবৃত্তিটি সকল বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া নিজের নিয়মেই চলে। ধবল যদি টের পায় যে আমি নিনানির প্রতি আসক্ত সে কিছুতেই আমাকে ক্ষমা করিবে না। সুযোগ পাইলেই সে প্রতিশোধ লইবে। নিনানি অথবা শিলাঙ্গীর মনোভাব যে ইহা হইতে বিভিন্ন হইবে সে প্রত্যাশা ছিল না। নিনানির সহিত শিলাঙ্গীর যোগসূত্রের কথা আমি চিন্তা করিতেছিলাম প্রয়োজনের খাতিরে। নিনানিকে যদি উন্নগা পর্বতের গুহায় থাকিতে হয় তাহা হইলে শিলাঙ্গীর সহায়তা অতিশয় সুবিধাজনক হইবে। নিনানির সহিত পাহাড়ে একটু আগে শিলাঙ্গীর পরিচয় হইয়াছে, নিনানিকে গিয়া যদি বলি যে,

শিলাঙ্গীর সহিত পাহাড়ে আমারও হঠাৎ দেখা হইয়া গেল তাহা হইলে নিনানি কোনো সন্দেহ করিবে না। শিলাঙ্গীকে কিন্তু কি বলিব? শিলাঙ্গীর সহিত আমার যে পূর্বে আলাপ হইয়াছে একথা শিলাঙ্গীকে যদি নিনানির নিকট গোপন রাখিতে বলি সে কি রাজি হইবে? এইসব কথা চিন্তা করিতে করিতে উন্নগা পর্বতের বিস্তীর্ণ উপত্যকা অতিক্রম করিয়া দূরে অবস্থিত পর্বতস্তূপগুলির দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম। দূর হইতে পাঁচটি শৃঙ্গ দেখিতে পাইতেছিলাম। মনে হইতেছিল বিরাটকায় উন্নতশীর্ষ পাঁচটি দৈত্যভ্রাতা যেন ঠেসাঠেসি করিয়া পাশাপাশি বসিয়া আছে। ইতিপূর্বে উপত্যকার অপর পারে কখনও যাই নাই, যাইবার প্রয়োজনও হয় নাই, একা যাইতে একটু ভয়-ভয়ও করিতেছিল, কারণ সঙ্গে একটি প্রস্তর ছুরিকা ব্যতীত অন্য অস্ত্র ছিল না। বাধ্য হইয়া তবু যাইতে হইতেছিল, কারণ উপত্যকার এধারে কোনো গুহা দেখিতে পাইলাম না। উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্তে দেখিলাম গরুর দল চরিতেছে, মনে হইল শিলাঙ্গীর দুধুনী মধুনীও যেন উহাদের মধ্যে রহিয়াছে। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশাও উঁকি দিতেছিল যদি শিলাঙ্গীকে সহসা দেখিতে পাই। তাহার নিকট উন্নগা পাহাড়ের অনেক খবর পাওয়া যাইবে নিশ্চয়। শিলাঙ্গীকে কিন্তু দেখিতে পাইলাম না। একাই অগ্রসর হইয়া গেলাম।

...পঞ্চ-পর্বতের সন্নিকটে আসিয়া দেখিলাম একটি ঝরনা রহিয়াছে। ঝরনাটা প্রথমে ঠিক দেখিতে পাই নাই, শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম। দুইটি পাহাড় পাশাপাশি খাড়া উঠিয়া গিয়াছে, তাহাদের মাঝে রহিয়াছে প্রকাণ্ড একটা ফাটল, তাহার ভিতর দিয়া একটা জলস্রোতও বাহির হইতেছে একটু পরে দেখিতে পাইলাম। জলধারা পাহাড় বেষ্টন করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া দূরবর্তী একটা ঘন অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মনে হইল, ইহাই তাহা হইলে কন্যা নদীর উৎস। ইহার নাম কন্যা নদী কে দিয়াছিল জানি না, মীংরার মুখে শুনিয়াছিলাম নদীটির নাম কন্যা। উৎসের কাছাকাছি কন্যা নদীকে দেখিয়া মনে হইল নামটি সার্থক। দুরন্ত কিশোরীর মতোই কন্যা যেন পাহাড়ের ফাটল হইতে বাহির হইয়া অরণ্যে গিয়া ঢুকিয়াছে। মনে হইল, সে যেন লুকোচুরি খেলিতেছে। জলস্রোতের দুই তীর শ্যাম তৃণাচ্ছাদিত। অনেক বৃক্ষ, অনেক গুল্ম, বহুপ্রকার লতা ও পুষ্পে উভয় তীর অলংকৃত। বৃক্ষের শাখায় শাখায় নানা বর্ণের নানা আকৃতির পক্ষী বসিয়া আছে। গত রাত্রে যে বকের দলকে দেখিয়াছিলাম তাহাদের আবার এখানে দেখিতে পাইলাম। মাছরাঙা পাখিও ছিল কয়েক রকম। আরও অনেক পাখি ছিল যাহাদের আমি চিনি না, ইতিপূর্বে দেখি নাই। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল একটা নূতন দেশে আসিয়াছি যেন। একটা অদ্ভুত বাসনাও মনের মধ্যে উঁকি দিয়া গেল। সেই আদিম যুগে যখন আমি সাধারণ বন্য পশুমাত্র ছিলাম তখন ইকাকে সবলে হরণ করিয়া নির্জন গুহায় নিজস্ব গৃহ-স্থাপনের প্রেরণা যে স্বার্থবুদ্ধি আমার মধ্যে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল সেই বুদ্ধি আবার মনে নূতন বাসনারূপে আবার আবির্ভূত হইয়া কহিল, 'এই স্থানে তুমি যদি নিনানি ও শিলাঙ্গীকে লইয়া নিজের ঘর বাঁধ কেমন হয়।' ইকার কথা আমার মনে ছিল না কিন্তু সেই প্রবৃত্তিটা অন্তরের মধ্যে সুপ্ত ছিল, সহসা যেন আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কথাটা ভাবিয়াই কিন্তু আমি হাসিয়া উঠিলাম। সমাজ ছাড়িয়া একা বাস করিব কিরূপে? যে জীবনে আমি এখন অভ্যস্ত হইয়াছি সকলের সমবেত চেষ্টা ছাড়া সে জীবন যাপন করা যায় না। একা আমি চাষ

করিতে পারিব না। শিকার হয়তো করিতে পারি কিন্তু শিকারের মাংস ঝলসাইয়া দিবে কে? আমাদের দলের কতকগুলি নারী এই কার্যের জন্যই নিযুক্ত আছে। আরও কতকগুলি নারী পশুচর্ম পরিষ্কার করে। পশুচর্মগুলি চামড়ার সুতা দিয়া সেলাই করিবার দক্ষতা অর্জন করিয়াছে কয়েকজন। তাহারা সকলের জন্য অঙ্গচ্ছদ প্রস্তুত করে। তাছাড়া অস্ত্র পাইব কোথায়? আমাদের সম্প্রদায়ের বিবা, কাটমা, শাম্বো, তিনা, রিখ্‌লি, বিন্‌ধা দিবারাত্রি বসিয়া পাথর ঘষিতেছে, পাথর ফুরাইলে পাথর খুঁজিয়া আনিতেছে, পশুচর্মের বিনিময়ে, তৃণবীজের বিনিময়ে অন্যত্র হইতে অস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে, ইহা কি আমার একার দ্বারা সম্ভব? তা ছাড়া যে অগ্নি-পূজা, প্রস্তর-পূজা, বৃক্ষ-পূজা, ভূমি-পূজা, নদী-পূজা আমাদের জীবনের প্রধান নির্ভর তাহা করিবে কে? ধবল নিশ্চয় আসিবে না। অদৃশ্যালোক-নিবাসী ভূতপ্রেতদেরই বা কে শান্ত করিয়া রাখিবে? প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যখন বিপন্ন হইব তখন যাদুবিদ্যাবিৎ বিঘাও কি আমাকে রক্ষা করিতে আসিবে? না, একা বাস করা আর সম্ভব নয়। সহসা তখন মনে হইল তবে কি জন্য আমি গুহা খুঁজিয়া বেড়াইতেছি? মাত্র কয়েকদিনের জন্য নিনানিকে লুকাইয়া রাখিয়া কি লাভ হইবে? নিনানি যখন কানার আদেশ অবহেলা করিয়াছে তখন তো তাহার নিস্তার নাই। তাহাকে মরিতেই হইবে। তাহার মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে একান্তভাবে কয়েকদিন পাইবার জন্যই কি আমি তাহাকে লুকাইয়া রাখিতে চাই? লুকাইয়া না রাখিলেও তো তাহা অসম্ভব হইত না। নিশীথ রাত্রিই যে আমাদের জীবনে প্রত্যহ গোপনতার সৃষ্টি করে। এতদিন যে নিনানির সঙ্গ লাভ করিয়াছি তাহা কি কম নিবিড় কম ঘনিষ্ঠ ছিল?

যে প্রশ্নটাকে মন এড়াইয়া যাইতে চাহিতেছিল আত্মবিশ্লেষণ করিতে করিতে অবশেষে তাহারই সম্মুখীন হইতে হইল। তবে কি বিঘাওয়ের ভবিষ্যদ্বাণীতে আমি সন্দিহান হইয়াছি? নিনানিকে লুকাইয়া রাখিয়া আমি কি দেখিতে চাই যে বিঘাও সত্যই শক্তিশালী কিনা? ধবলের প্রমাতামহ কানার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও আমি সন্দিহান নাকি· কথাটা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি পাখি একযোগে চিৎকার করিয়া উড়িতে লাগিল, চতুর্দিকে যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল, আমি ভয় পাইয়া গেলাম, আমার আশঙ্কা হইল আমার অবিশ্বাসের কথা কানা বোধ হয় টের পাইয়াছে, অভাবিত উপায়ে এখনই হয়তো শাস্তিও দিবে। একবার ইচ্ছা হইল ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করি। নিনানিকে গিয়া বলি যে গুহা পাওয়া গেল না, সে ফিরিয়া যাইতে চাহিয়াছিল ফিরিয়া যাক। আমার পলাইবার ইচ্ছা হইল বটে কিন্তু আমি নড়িতে পারিলাম না। আর একটা প্রবলতর প্রবৃত্তি আমাকে সেইখানে অনড় করিয়া রাখিল। ভয়কে পরাভব করিয়া কৌতূহল জয়ী হইল। আমি সভয়ে এদিক ওদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম পাখিরা সহসা এমনভাবে ডাকিয়া উঠিল কেন। দেখিলাম, পাখিগুলি যে গাছ হইতে উড়িয়াছিল সে গাছে গিয়া আর বসিল না। কতকগুলি দূরের গাছে বসিল, কতকগুলি উড়িতেই লাগিল। তাহার পর একটা চাপা গোঁ গোঁ শব্দ শুনিতে পাইলাম। মনে হইল একটা নিষ্পিষ্ট আর্তনাদ যেন ধীরে ধীরে বাঙ্ময় হইবার চেষ্টা করিতেছে। আবার ভয় হইল, এসব কানার কারসাজি নয় তো! উৎকর্ণ হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অনিবার্য কৌতূহল আমাকে যেন ভীত শিশুর মতো টানিয়া লইয়া চলিল। সন্তর্পণে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অবশেষে সেই জল-ধারার তীরে উপস্থিত হইলাম। তখনও ব্যাপারটা দেখিতে পাই নাই।

পরমুহূর্তেই কিন্তু দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, একটা ময়াল সাপ একটা হরিণকে জাপটাইয়া ধরিয়াছে। এ অঞ্চলে যে হরিণ আছে তাহা জানিতাম না। নির্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম। আরও বিস্ময়ের হেতু বনান্তরালে অপেক্ষা করিতেছিল। বৃদ্ধা যক্ষিণীকে তখনও দেখিতে পাই নাই। একটু পরেই সে বনের আড়াল হইতে এক বোঝা শুষ্ক খড় হইয়া বাহির হইল। আবার চলিয়া গেল, একটু পরে আর এক বোঝা শুষ্ক খড় লইয়া আসিল। আবার গেল, আবার খড় আনিল। কয়েকবার গিয়া অনেক খড় সে জমা করিয়া ফেলিল। আমার বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছিল, কিন্তু তাহা যেন সীমা অতিক্রম করিয়া গেল যখন দেখিলাম সে খড়ের বোঝাগুলি সাপটার চারিদিকে বৃত্তাকারে সাজাইতেছে। ময়াল সাপটা হরিণের সর্বাঙ্গে নিজেকে জড়াইয়া একটা স্তূপে পরিণত হইয়াছিল। সেই স্তূপকে কেন্দ্র করিয়া বুড়ি বোঝাগুলি সাজাইয়া ফেলিল।

নির্ভয়ে সে ময়াল সাপটার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোঝাগুলি সাজানো হইয়া গেলে সে কোমরের চর্মপেটিকা হইতে চকমকি বাহির করিয়া আগুন জ্বালিল এবং একটি খড়ের স্তূপে আগুন ধরাইয়া দিল। তাহার পর আর একটা স্তূপে ধরাইল। তাহার পর পা দিয়া ঠেলিয়া সেই জ্বলন্ত স্তূপ দুইটি ময়াল সাপটার কাছে আগাইয়া দিতে লাগিল। বৃদ্ধার মুখটা প্রকাণ্ড, নাকটা খড়োর মতো, চিবুকের নীচে গলা পর্যন্ত একটা চামড়ার মতো ঝুলিতেছে। গরুদের যেমন গলকম্বল থাকে, অনেকটা তেমনি। কোনো কালে বোধ হয় চিবুকের নীচে প্রচুর চর্বি ছিল, এখন চর্বি নাই, লোলচর্মটা ঝুলিতেছে। তাহার পলিতকেশ পীতাভ হইয়া গিয়াছে। চক্ষু দুইটি কোটরগত। দাঁত আছে। প্রকাণ্ড কয়েকটা দাঁত বাহিরে প্রকট হইয়াছে, ঠোঁটে ঢাকা পড়ে নাই। আমি রুদ্ধশ্বাসে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিলাম। মনে হইল সে কি যেন বলিল। বলিয়া খড়ের জ্বলন্ত স্তূপ দুইটিকে আর একটু আগাইয়া দিল। দেখিলাম ময়াল সাপ ধীরে ধীরে তাহার বন্ধন শিথিল করিতেছে। বৃদ্ধা ভর্ৎসনার সুরে আবার তাহাকে কি যেন বলিল, জ্বলন্ত খড়ের স্তূপ আর একটু আগাইয়া দিল। সবিস্ময়ে দেখিলাম, ময়াল সাপ হরিণটিকে ছাড়িয়া ধীরে ধীরে বনান্তরালে চলিয়া যাইতেছে। মৃত হরিণটা পড়িয়া রহিল। বৃদ্ধা তখন মৃত হরিণকে টানিয়া আনিয়া জ্বলন্ত খড়ের স্তূপের ভিতর ফেলিয়া আরও শুষ্ক খড় তাহার উপর চাপাইয়া দিল। দগ্ধ হরিণ-চর্মের গন্ধে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দেখিলাম বৃদ্ধার জিহ্বাগ্র মধ্যে মধ্যে ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। ময়াল সাপটা যেদিকে চলিয়া গিয়াছিল, সেদিকে চাহিয়া বৃদ্ধা মৃদুস্বরে মাঝে মাঝে কি যেন বলিতেছিল, সহসা একটি গাছের দিকে চাহিয়া সে চিৎকার করিয়া উঠিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, সু-উচ্চ বৃক্ষশাখায় একদল শকুনি বসিয়া রহিয়াছে। আমার এইবার ভয়-ভয় করিতে লাগিল, আশঙ্কা হইল, এ আমাকে যদি দেখিতে পায়, হয়তো...। সন্তর্পণে সেখান হইতে পলায়ন করিলাম। কিছুদূর গিয়া গতিবেগ দ্রুত করিয়া দিলাম। উন্মুক্ত উপত্যকায় গিয়া যখন পড়িলাম, তখন আমি ছুটিতেছি। রৌদ্রের স্বর্ণকিরণে চতুর্দিক ঝলমল করিতেছিল, নির্মেঘ নীল আকাশে চক্রকারে চিলের দল উড়িতেছিল, একটা নামহীন পাখি তালে তালে চিৎকার করিতেছিল, দূরে বন্য গরুর দল চরিতেছিল, পাহাড়ের সানুদেশে পাহাড়ী ছাগলেরা নামিয়া আসিয়াছিল, আমার কিন্তু এসব দিকে তেমন লক্ষ্য ছিল না, আমি সেই বৃক্ষবেষ্টিত ঝোপটা লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছিলাম। আমার আশঙ্কা হইতেছিল, শিলাঙ্গী হয়তো আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছে। শিলাঙ্গীকে সমস্ত কথা খুলিয়া না বলিলে যে সমস্যার সমাধান হইবে না, তাহা আমি অনুভব

করিতেছিলাম। ঠিক করিয়াছিলাম, তাহার নিকট কিছুই গোপন করিব না। নিনানি-সম্পর্কিত সমস্ত কথা তাহার কাছে অকপটে বলিয়া তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিব। সে আমার বন্ধু হইয়াছে। সে নিশ্চয়ই আপদে-বিপদে আমার সহায় হইবে, কখনও এমন কিছু করিবে না, যাহাতে আমার অপমান বা অমঙ্গল হয়...

...শিলাঙ্গী আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া প্রথমে আমি তাহাকে দেখিতে পাই নাই। আমি দাঁড়াইয়া এদিক-ওদিক চাহিতেছিলাম, হঠাৎ সে একটা গাছের ডাল হইতে লাফাইয়া নীচে নামিল।

'তুমি অত হাঁফাইতেছ কেন'—নামিয়াই প্রশ্ন করিল সে।

'ছুটিয়া আসিয়াছি।'

মনে হইল কথাটা শুনিযা শিলাঙ্গী খুশি হইল। তাহার সরল চোখের দৃষ্টিতে আনন্দের ছটা দেখিতে পাইলাম।

'ছুটিয়া আসিয়াছ? কি দরকার ছিল?'

'আমার ভয় করিতেছিল, যদি তুমি চলিয়া যাও।'

'বাঃ, আমি যখন কথা দিয়াছি তোমার জন্য এখানে অপেক্ষা করিব, তখন কি চলিয়া যাইতে পারি? আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার জন্য অপেক্ষা করিতাম। তোমার জন্য একটা জিনিস আনিয়াছি—এই দেখ—'

শিলাঙ্গী তর তর করিয়া গাছে উঠিয়া গেল এবং একটি ছোট বাঁশের কেঁড়ে লইয়া নামিয়া আসিল।

'দুধ। খাইয়া দেখ।'

দুধ পূর্বে কখনও পান করি নাই। কেঁড়েটা মুখে তুলিয়া একটু চাখিয়া দেখিলাম প্রথম। স্বাদটা কেমন যেন অদ্ভুত মনে হইল, খুব ভাল লাগিল না।

'কেমন লাগিতেছে?'

'খুব ভাল নয়। কেমন যেন মিষ্টি মিষ্টি ফলের স্বাদ—মনে হইতেছে যেন তরল কোনো ফল'—আমি চাখিয়া চাখিয়া সন্দিগ্ধভাবে দুগ্ধ পান করিতে লাগিলাম।

'শরীরের তেজ কিন্তু খুব বাড়ায়। ঝোনঝিরা প্রচুর দুধ খায় রোজ। তাই উহার গায়ে খুব জোর। ঝোনঝিরা মাংসও কম খায় না। ওটা একটা রাক্ষস। বাঃ, তুমি সবটা খাইও না, আমার জন্যও একটু রাখ। আমি আমার অংশের দুধটুকু তোমার জন্য আনিয়াছিলাম—আমাকে একটু দাও।'

আমার হাত হইতে দুধের কেঁড়েটা কাড়িয়া লইয়া বাকি দুধটুকু সে ঢক ঢক করিয়া পান করিয়া ফেলিল।

'আজ রোহার নিকট যাইবে? আজ রোহা বোধ হয় একা আছে। কারণ আসিবার সময় দেখিলাম ঝোনঝিরার দল অস্ত্রে শান দিতে বসিয়াছে।'

'আজ আমার কোথাও যাইবার উপায় নাই। সর্বপ্রথম আমাকে তুমি একটা গুহা খুঁজিয়া দাও।'

'গুহা? তার মানে! গুহা লইয়া কি করিবে?'

'নিনানিকে রাখিব।'

'সে আবার কে?'

'তাহা হইলে চল এক জায়গায় বসি। সমস্ত কথা তোমাকে খুলিয়া বলিতেছি। কিন্তু তোমাকে শপথ করিতে হইবে যে একথা আর কাহাকেও বলিবে না। নিনানির কাছেও না। নিনানি যেন জানিতে না পারে যে, তোমার সহিত আমার ভাব হইয়াছে, তাহা হইলে সর্বনাশ হইয়া যাইবে।'

'নিনানি কে?'

'চল সব বলিতেছি।'

সেই ঝোপের ধারে একটি বিস্তৃত প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া শিলাঙ্গীকে আনুপূর্বিক সমস্ত খুলিয়া বলিলাম। কিছুই গোপন করিলাম না। সমস্ত কথা শুনিয়া শিলাঙ্গী ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। মনে হইল, সে যেন একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পর আমাব মুখের উপর সবল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিল, 'নিনানিকে তুমি বুঝি খুব ভালবাস?'

'তোমার কাছে মিথ্যা বলিব না, বাসি। ধবল দলপতির অধিকার লইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছে, তাহা না হইলে আমাকেই সে বিবাহ করিত।'

'সে-ও তোমাকে খুব ভালবাসে তাহা হইলে?'

'বাসে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে কানা তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। তাই সে জীবনের শেষ কয়টা দিন একা আমার কাছে থাকিতে চায়। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়াছি যে তাহাকে একটা গুহা খুঁজিয়া দিব। এ প্রতিশ্রুতি আমাকে রক্ষা করিতেই হইবে। তুমি আমাকে সাহায্য কর।'

'তাহা না হয় করিব। একটা গুহাব খবর আমি জানিও। কিন্তু আগে তুমি আমার আর একটা কথার জবাব দাও।'

'বল—'

'আমাকে তুমি নিনানির নিকট হইতে লুকাইয়া রাখিতে চাহিতেছ কেন? তুমি তো আমাকেও ভালবাস, আমাকে দেখিয়া সে রাগ করিবে কেন?'

'নিনানি বড় হিংসুক। আমি যে আর কাহাকেও ভালবাসি ইহা সে সহ্য করিতে পারে না—'

শিলাঙ্গী সহসা উভয় বাহু দিয়া আমার গলাটা জড়াইয়া ধরিল।

'আমিও হিংসুক। নিনানির উপর আমারও হিংসা হইতেছে। কিন্তু আমি কখনও তাহার অনিষ্ট করিব না, কারণ তুমি যে তাহাকে ভালবাস।'

আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। সে যুগে এমন কথা কাহারও মুখে শুনি নাই। শুনিব বলিয়া প্রত্যাশাও করি নাই। আমার পূর্ব জীবনে জোলমার আবির্ভাবও এমনি অপ্রত্যাশিত ছিল। সে-ও আমাকে ভালবাসিয়াছিল—কেন সে বাসিয়াছিল তাহা জানি না—হয়তো বা আমার মধ্যেও এমন একটা বিশিষ্ট রূপ ছিল যাহার সম্বন্ধে আমি নিজে সচেতন ছিলাম না—কিন্তু আমি তাহাকে বুঝিতে পারি নাই, কারণ তখন সেরূপ অপ্রত্যাশিত ব্যক্তিত্ব আমার ধারণার অতীত ছিল। বুঝিতে পারি নাই বলিয়া তাহাকে পাইয়াও পাই নাই। অপ্রত্যাশিতকে বুঝিতে সময় লাগে, যখন তাহাকে বোঝা যায় তখন সে আয়ত্তাতীত হইয়া যায়। আমার অজ্ঞাতসারে আমার মনুষ্যত্ব জন্ম-জন্মান্তরে জোলমাকেই কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। আজ এতদূরের ব্যবধানে সেই প্রাগৈতিহাসিক অনুসন্ধানকে সমগ্রভাবে দেখিয়া

আমার মনে হইতেছে আজও আমি সেই অনুসন্ধানেই ব্যাপৃত আছি। আমি জোলমাকে নানারূপে বারংবার পাইয়াছি এবং হারাইয়াছি। শিলাঙ্গীর মধ্যেই জোলমা ফিরিয়া আসিয়াছিল কিন্তু তাহাকে আমি চিনিতে পারি নাই। তাহার মুখে এই অদ্ভুত অস্বাভাবিক উক্তি শুনিয়া আমি অভিভূত চিত্তে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম, আমার সন্দেহও হইল তাহার এ যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য কিনা। প্রথম দর্শনে তাহার সম্বন্ধে যে কথা মনে হইয়াছিল আবার সে কথা মনে হইল। সত্যই এ মানবী তো, না কোনো উপদেবতা আমার সহিত ছলনা করিতেছে। কিন্তু আমার সমস্ত বিস্ময়, সন্দেহ, ভয়কে ছাপাইয়া অপূর্ব আনন্দ একটা আমার অন্তরে উথলিয়া উঠিল! আমার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব যেন ক্ষণিকের জন্য শিলাঙ্গীকে চিনিতে পারিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল, আমি তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম।

আমার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া শিলাঙ্গী প্রশ্ন করিল, 'তোমার নিনানি দেখিতে কেমন?'

'তুমি তাহাকে দেখিয়াছ। কাল রাত্রে তুমি যে মেয়েটিকে লতা দিয়াছিলে সেই নিনানি।'

'সেই নিনানি।

শিলাঙ্গী তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।

'হাঁ, সেই নিনানি। অমন করিয়া উঠিলে যে?'

'সে তো অপরূপ সুন্দরী। আমি তো প্রথমে তাহাকে জ্যোৎস্নাপরী ভাবিযাছিলাম। আমাদের কথক মিনাহা বলে জ্যোৎস্নাপরীরা গভীর রাত্রে পৃথিবীতে ফুলের মধু খাইবার জন্য আসে। আমি ভাবিয়াছিলাম মধু খাইবার লোভেই কোনো জ্যোৎস্নাপরী বোধ হয় মহুয়া বনে আসিযাছে। কিন্তু সে যখন আগাইয়া আসিয়া লতার খোঁজ করিল তখন অবাক হইয়া দেখিলাম অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়ে। তাহার সহিত আলাপ করিয়াও বড় ভাল লাগিল। তাহার পর মনে পড়িল বাঘের কথা, আমার কাছে যে লতা ছিল তাহারই খানিকটা অংশ দিয়া তাহাকে বাড়ি ফিরিয়া যাইতে বলিলাম। নিনানি তো চমৎকার মেয়ে। আমার সেই লতা দিয়াই তাহার মাথার আবরণ প্রস্তুত করিয়াছ?'

'হ্যাঁ।'

শিলাঙ্গীর মুখভাবে আবার বিমর্ষতা ফুটিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, 'নিনানিকে যখন তুমি ভালবাস তখন কি আর আমাকে তোমার ভাল লাগিবে?'

'নিশ্চয় লাগিবে। তুমি নিনানি নও, কিন্তু তুমিও অপরূপ'—আমার আবেগপূর্ণ এই কথাগুলি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শিলাঙ্গী শুনিল। মনে হইল সে যেন বিস্ময়কর কিছু একটা শুনিতেছে। তাহার পর সহসা আবার সে আমার কণ্ঠলগ্না হইল।

'নিনানির সহিত আমার আলাপ করাইয়া দাও।'

'না, তাহা নিরাপদ নয়। নিনানি বড় হিংসুক, বড় প্রতিহিংসাপরায়ণ। হয়তো তোমার কোনো অনিষ্ট করিতে পারে। তা ছাড়া সে তো আর বেশি দিন বাঁচিবে না। যে কয়টা দিন বাঁচে তাহার মনে কষ্ট দিয়া লাভ কি। তোমার সহিত আমার ভাব হইয়াছে জানিতে পারিলে সে কষ্ট পাইবে। তাহার জন্য একটা গুহা দেখিয়া দাও। খালি গুহা আছে কি কোথাও?'

'আছে। উপত্যকার পরপারে পুঞ্জ-পর্বতে যক্ষিণী বুড়ীর দখলে কয়েকটা খালি গুহা আছে। বুড়ী আমাকে ভালবাসে খুব। আমি যদি বলি একটা গুহা দিতে পারে—'

পঞ্চ-পর্বতে আমার অভিযানের কথা তখনও শিলাঙ্গীকে আমি বলি নাই। শিলাঙ্গীর কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। শিলাঙ্গী ওই বৃদ্ধাকে চেনে নাকি।

'গুহার খোঁজে আমিও পঞ্চ-পর্বতের দিকে গিয়াছিলাম। যক্ষিণী বৃদ্ধাকে দেখিয়াছি। বড় অদ্ভুত মনে হইল। একটা ময়াল সাপ হরিণ ধরিয়াছিল—'

'ও, ময়াল সাপটাকেও তুমি দেখিয়াছ। ওটা ওর পোষা ময়াল সাপ। আমরা যেমন কুকুরের সাহায্যে শিকার ধরি যক্ষিণী তেমন ময়াল সাপের সাহায্যে শিকার ধরে। ময়াল সাপটাকে শিশু অবস্থা হইতে ও নাকি পুষিয়াছে। ময়াল সাপের জন্য ফাঁদ পাতিয়া ও খরগোস, পাখি প্রভৃতি ধরিয়া রাখে। উহার জন্য একটা গুহা ও আলাদা করিয়া রাখিয়াছে। যক্ষিণী বড় অদ্ভুত লোক। উহার ভাষাও অদ্ভুত। অধিকাংশ কথা ইঙ্গিতে বলে। মনে হয় ও জন্তু-জানোয়ারের ভাষা বোঝে। তাহাদের সহিত তাহাদের ভাষাতেই কথাও কয় মাঝে মাঝে।'

'তুমি উহার কথা বুঝিতে পার?'

'পারি বই কি। তুমিও একটু চেষ্টা করিলে পারিবে।'

'তোমার সহিত উহার আলাপ হইল কি করিয়া? ও কে?'

'ও কে তা জানি না। দুধুনীর জন্য ঘাস খুঁজিতে একদিন পঞ্চ-পাহাড়ে গিয়াছিলাম, তখন উহার চেহারা দেখি। প্রথমটা ভয় হইয়াছিল, তাহার পর ক্রমশ ভাব করিয়া ফেলিয়াছি। মাঝে মাঝে উহাকে দুধ দিয়া আসি। যক্ষিণী যদিও মাংসাশী, কিন্তু দুধও খুব ভালবাসে।'

'উন্নগা পাহাড়ে ও কোথা হইতে আসিল, উহার বংশপরিচয় কি তাহা জান না?'

'না, তবে আমার মনে হয় ময়াল সাপই উহার বংশদেবতা। কারণ ও ময়াল সাপ ছাড়া আর সমস্তরকম জন্তু আহার করে। যত্ন করে কেবল ময়াল সাপকে।'

'উহার অধিকারে খালি গুহা আছে তুমি জান?'

'উহার অধিকারে কয়েকটি গুহাই আছে। একটিতে ও থাকে। আর একটিতে থাকে দুইটি ময়াল সাপ। তৃতীয় গুহাটিতে যক্ষিণী শশক, শৃগাল প্রভৃতি জন্তুদের বন্দী কবিয়া রাখে। মাঝে মাঝে এক-একটি জন্তু বাহির করিয়া ময়াল সাপদের খাইতে দেয়। এই তিনটি গুহা প্রায় পাশাপাশি আছে। আব একটু দূরে বেশ বড় গুহা আছে, সেটি খালি।'

'এই ভয়াবহ পরিবেশে নিনানি কি থাকিতে পারিবে?'

'যক্ষিণী যদি থাকিতে দিতে রাজি হয় অনায়াসেই পারিবে। কারণ যক্ষিণী লোক ভাল। সে নিনানিকে যত্নেই রাখিবে। কিন্তু যক্ষিণী যদি রাজি না হয় তাহা হইলে অন্য গুহার সন্ধান করিতে হইবে। আমি ঠিক যক্ষিণীকে রাজি করাইতে পারিব। চলই না চেষ্টা করিয়া দেখা যাক।'

'বেশ চল।'

'ব্যাপারটা তুমি উহাকে বুঝাইতে পারিবে তো?'

'আশা করি পারিব।'

...আমরা পুনরায় সেই উপত্যকা অতিক্রম করিতেছিলাম। শিলাঙ্গী ঠিক যেন হরিণীর মতো চলিতেছিল। তাহার সহিত কুরঙ্গিণীর অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল। তাহার চক্ষু দুইটি ঠিক যেন কুরঙ্গ-নয়ন। তাহার চাল-চলন গতিভঙ্গি সমস্তই হরিণের মতো। চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে সে আমার স্কন্ধ ধবিয়া ঝুলিয়া পড়িতেছিল, লাফাইয়া নামিয়া আবার ছুটিয়া চলিতেছিল।

মাঝে মাঝে ছুটিয়া গিয়া নিকটস্থ কোনো ঝোপে আত্মগোপন করিয়া আমাকে নাকাল করিবার চেষ্টাও করিতেছিল। ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া আমি যখন তাহাকে খুঁজিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছি তখন সহসা তাহার কলহাস্য শুনিয়া বুঝিতে পারিতেছিলাম যে সে আমাকে ঠকাইয়াছে। আমি তাহাকে যেখানে খুঁজিতেছি সেখানে সে নাই, অনেক দূরে আর একটা ঝোপের অন্তরাল হইতে সে উঁকি দিতেছে। এইভাবে আমরা যখন অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি তখন একটা কথা কেন জানি না আমার মনে হইল। যে প্রশ্নের উত্তর কেহ কখনও দিতে পারে নাই সেই প্রশ্নটাই শিলাঙ্গীকে আমি করিলাম।

'আচ্ছা, শিলাঙ্গী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে, ঠিক উত্তরটি চাই কিন্তু।'

'কি কথা?'

'তোমার আমাকে ভাল লাগিল কেন?'

'কি জানি।'

টপ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া সে আমার কাঁধ ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল। টপ করিয়া ঝুলিয়া নামিয়া পড়িল আবার। দুরন্ত বালক যেন।

'মনে পড়িয়াছে কেন তোমাকে ভাল লাগিয়াছিল। তুমি যখন সেদিন গাছ হইতে লাফাইয়া মধুনীকে তুলিয়া গাছে উঠিয়া গেলে, তাহার একটা পা কামড়াইয়া ধরিয়া অবলীলাক্রমে শাখা ধরিয়া আরও উপরে চলিয়া গেলে তখনই তোমাকে আমাব ভাল লাগিয়াছিল।'

'কিন্তু তুমি তো আমাকে মারিবার জন্য বর্শা ছুঁড়িয়াছিলে—'

'বাঃ ছুঁড়িব না? আমার মধুনীকে তুমি তুলিয়া লইয়া গেলে, তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিব না? কিন্তু যখন দেখিলাম তুমি অনায়াসে আত্মরক্ষা করিতে পারিলে, এমন কি আমার বর্শাটাও হস্তগত করিলে তখন তোমাকে আরও ভাল লাগিয়া গেল।'

শিলাঙ্গী ঘাড় ফিরাইয়া আমার মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি ক্ষণিকের জন্য নিবদ্ধ করিয়া আবার কিছুদূর ছুটিয়া গেল।

'শোন, শোন—'

'কি?'

'তোমাদের ঝোনঝিরাও তোমাকে খুব ভালবাসে নাকি?'

'খুব।'

'তুমিও তাহাকে ভালবাস?'

'মোটেই না। ঝোনঝিরার ইচ্ছা আমাকে বিবাহ করিয়া আমাদের দলের দলপতি হইবে। আমি কিন্তু তাহাকে বিবাহ করিব না।'

'তোমার ইচ্ছার উপরই তোমার বিবাহ নির্ভর করে নাকি? আমাদের সমাজে তো মেয়ের মা-ই এ বিষয়ে কর্ত্রী, ছেলের মা-ও।'

'আমাদের সমাজেও তাই। আমি কিন্তু দলপতি রোহার কন্যা, আমার মা শঙ্খী রোহাকে বলিয়া গিয়াছে আমার অমতে রোহা যেন কাহারও সহিত আমার বিবাহ না দেয়। রোহাও শঙ্খীকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে!'

'শঙ্খী কোথায় গিয়াছে?'

'পরলোকে। সেইজন্যই তো আমার জোর আরও বেশি। শঙ্খী হয়তো মত পরিবর্তন করিতে পারিত। কিন্তু এখন আর উপায় নাই। এখন রোহাকে তাহার প্রতিশ্রুতি পালন করিতেই হইবে। রোহা লোকও খুব ভাল। সে আমার মতের বিরুদ্ধে কিছু করিবে না।'

ইহার পর ঠিক যে প্রশ্নটি আমার মনে জাগিতেছিল তাহা কিন্তু আমি আর মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলাম না। শিলাঙ্গীও কিছু বলিল না, সে কেবল আমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

...পঞ্চ-পর্বতের নিকট সেই স্থানটিতে পৌঁছিয়া দেখিলাম যক্ষিণী নাই, ময়াল সাপ নাই, হরিণও নাই। খড়ের স্তূপগুলি ভস্মে পরিণত হইয়াছে, কোনো কোনোটার ভিতর হইতে ধূমও বাহির হইতেছে। পাখিগুলিও আর কলরব করিতেছে না। সকলেই স্ব স্ব স্থানে আবার নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছে দেখিলাম।

শিলাঙ্গী বলিল, 'যক্ষিণী তাহা হইলে বোধ হয় ঝলসানো হরিণটা লইয়া নিজের গুহায় গিয়াছে। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি খোঁজ লইয়া আসি। আমি ডাকিলে তাহার পর তুমি যাইও। এখন এইখানেই দাঁড়াইয়া থাক।'

শিলাঙ্গী চলিয়া গেল। আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একটা কথাই আমার মনে হইতে লাগিল। শিলাঙ্গী যদি আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হয়, রোহাকেও সে যদি সম্মত করাইতে পারে, তাহা হইলে এই অভিনব গো-দুগ্ধপায়ী সম্প্রদায়ের সহিত আমাদের বন্ধুত্ব হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু বন্ধুত্ব হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে কি? সে কথা স্থির করিবে ধবল কিংবা বিঘাও। তাহারা যদি আপত্তি করে, তাহা হইলে বিবাহ হইবে না। নিতান্তই যদি বিবাহ করিতে হয়, দল ত্যাগ করিতে হইবে। রোহার দল কি আমাকে আশ্রয় দিবে? আশ্রয় পাইলেও কি শান্তিতে থাকিতে পারিব? ঝোনঝিরার কথা মনে পড়িল। ঝোনঝিরা যদি কিছু না-ও বলে তাহা হইলেও কি সুখে থাকিতে পারিব? আমাদের এই পুরাতন দল, যে দলের সহিত আমি আজন্ম সংশ্লিষ্ট রহিয়াছি, যে দলের জন্য যুদ্ধ করিতে গিয়া আমার পিতা সম্মুখযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, যে দলে আমার মায়ের একদা একাধিপত্য ছিল, যে দলে আমার সহোদর-সহোদরার সংখ্যা বাইশজন, যে দলের সহিত আমি কত দেশ-দেশান্তর পর্যটন করিয়াছি, আমার সর্বপ্রকার শিক্ষা-দীক্ষা যে দলের মধ্যে হইয়াছে, যে দলের কত কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়ার সহিত আজও আমার সম্বন্ধ নিবিড়, সে দল ত্যাগ করিয়া আমি কি থাকিতে পারিব? তাছাড়া নিনানি, নিনানির যদি মৃত্যু না হয়, তাহা হইলে কি হইবে? আর একটা কথাও মনে পড়িল। ধবল উলন্তনের সহিত দেখা করিতে গিয়াছে, তাহার ফলাফল কি হইবে, তাহা অনিশ্চিত। যদি যুদ্ধ বাধে, সে যুদ্ধে আমাকেও যোগ দিতে হইবে। এ অবস্থায় দলত্যাগের কথা ভাবাই অনুচিত। শিলাঙ্গীকে স্ত্রীরূপে লাভ করিবার জন্য কিন্তু সমস্ত চিত্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। পঞ্চ-পর্বতের শিখরলগ্ন একখণ্ড শুভ্র মেঘের মতো তাই আমার চিন্তা নানাভাবে নিজেকে প্রসারিত করিয়া আমার মনের মধ্যে নানা মূর্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিল। সহসা শিলাঙ্গীর ডাক শুনিতে পাইলাম। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে পাইলাম, শিলাঙ্গী একটি বৃক্ষের উপরে উঠিয়াছে। বৃক্ষশীর্ষ হইতেই সে আমাকে ডাকিতেছিল। সেই দিকেই অগ্রসর হইলাম। কিছুদূর গিয়া দেখিতে পাইলাম, শিলাঙ্গী আমার দিকে আসিতেছে। ছুটিয়া আসিতেছে।

'যক্ষিণীর সহিত দেখা হইয়াছে?'

'হইয়াছে।'

'তাহাকে সব কথা বলিয়াছ?'

'বলিয়াছি। সে নিনানির জন্য গুহা দিতে রাজি আছে। নিনানি আসিবে শুনিয়া সে খুব খুশি। বলিতেছিল একা-একা তাহার আর ভাল লাগে না। একজন সঙ্গিনী যদি তাহার কাছে থাকে, সে তাহাকে যত্ন করিয়া রাখিবে। তুমি চল না, আলাপ করিবে।'

যক্ষিণীর গুহাটি বেশ বড় এবং সুরক্ষিত। আমি গিয়া দেখিলাম, সে আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঝলসানো হরিণের মাংস ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে। আমার দিকে সে একবার মাত্র চাহিয়া দেখিল, তাহার পর শিলাঙ্গীর দিকে চাহিয়া অদ্ভুত ভাষায় কি বলিল, বুঝিতে পারিলাম না।

শিলাঙ্গী বলিল, 'যক্ষিণী জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি কি হরিণের মাংস খাইবে? খাইতে চাহিও না। চাহিলে হয়তো ও তোমাকে একটু মাংস দিবে, কিন্তু খাদ্যে ভাগ বসাইলে যক্ষিণী মনে মনে খুব চটিয়া যায়। কারণ বড় পশুর মাংস ও আজকাল বড় একটা পায় না। ময়াল সাপ যদি কোনও দিন কিছু ধরে তবেই পায়। ফাঁদ পাতিয়া খরগোস ইঁদুর ধরে, তাহারও ভাগ ময়াল সাপকে দিতে হয়। আমি মাঝে মাঝে ইহাকে খাদ্য আনিয়া দিই, তাই ও আমার উপর খুব খুশি।'

শিলাঙ্গীর কথা শুনিয়া যক্ষিণীর দিকে চাহিয়া আমি মাথা নাড়িয়া জানাইয়া দিলাম যে, মাংস আমার চাই না। যক্ষিণী আপন মনে মাংস খাইতে খাইতে শিলাঙ্গীর সহিত মাঝে মাবে কথা বলিতে লাগিল। বানরের কিচিব-মিচিরের সহিত শালিকের ভাষা মিশিলে যেমন শোনায়, যক্ষিণীর ভাষা অনেকটা সেইরূপ শুনাইতে লাগিল। দেখিলাম, শিলাঙ্গীও সে ভাষা কিছু কিছু শিখিয়াছে। বলিতে না পারিলেও বুঝিতে পারে। কথা বলিতে বলিতে যক্ষিণী সহসা ভীত শালিকের মতো চিৎকার করিয়া উঠিল। তাহার পর শিলাঙ্গীকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া পাহাড়ের গায়ে কি দেখাইতে লাগিল।

...আস্তানায় ফিরিয়া দেখিলাম, বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের অনুপস্থিতির জন্য ততটা নয় যতটা ধবল এবং চন্মনা ফিরিয়া আসিয়াছিল বলিয়া। তাহারা যে সংবাদ আনিয়াছিল তাহা সত্যই চাঞ্চল্যকর। ধবলকে ঘিরিয়া সকলে দাঁড়াইয়াছিল।

ধবল বলিতেছিল, ''আমরা যখন এখান হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, তখন কিছুক্ষণ গজন্ধর কোনো কথা বলে নাই। কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটিবার পর গজন্ধর অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করিল। আমার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেহ মরিয়া গেলে আমরা কিভাবে শব সৎকার করি। আমি উত্তর দিলাম, 'আমরা মৃতদেহকে পুঁতিয়া ফেলি। মৃতদেহের সহিত খাদ্যদ্রব্য এবং অস্ত্রশস্ত্রও দিই! বিশেষ করিয়া যে জিনিস তাহার প্রিয় ছিল, সেই জিনিসগুলি আমরা যত্নের সহিত শবের নিকটে রাখিয়া দিই। তাহার পর প্রতি মাসে মাসে তাহার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা সেই কবরের পাশে বসিয়া প্রার্থনা করে যেন তাহার প্রেতাত্মা নিম্ব-সম্প্রদায়ের সহায়ক হয়। তাহাদের তুষ্ট রাখিবার জন্য আমরা তাহার কবরের পাশে পশুবলিও দিয়া থাকি।' আমার কথা শুনিয়া গজন্ধর একটু হাসিল মাত্র, কিছু বলিল না। ঘিসু নিম্নকণ্ঠে আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল, সহসা এসব কথা তুলিবার অর্থ কি। ভংগা ফিসফিস

করিয়া বলিল, মৃত্যু-প্রসঙ্গ বড়ই অমঙ্গলসূচক। আমি কি বলিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। আবার কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটিবার পর গজন্ধর বলিল, 'নিম্ব-সম্প্রদায় অনেক বিষয়ে এখন অনেক পিছাইয়া আছে। তাহার প্রথম প্রমাণ পাইয়াছি তোমাদের খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া, দ্বিতীয় প্রমাণ পাইলাম তোমাদের শব-সৎকারের ব্যবস্থা শুনিয়া। প্রেতাত্মার প্রতি কি করিয়া সম্যক সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়, তাহা এখনও তোমরা শিখ নাই। শবদেহকে কেবল মাটিতে পুঁতিয়া দিলেই প্রেতাত্মা শান্ত হয় না, অশান্ত হয়। মাটির কীটপতঙ্গ যখন তাহার দেহ কুরিয়া কুরিয়া খায়, তখন প্রেতাত্মা অস্থির হইয়া ওঠে। তাহারা অস্থির হইয়া উঠিলে চতুর্দিকে অমঙ্গল হয়। এই যে দেশব্যাপী অনাবৃষ্টি চলিয়াছে, তাহার কারণ ইহাই। অশান্ত ক্রুদ্ধ প্রেতাত্মাদের উষ্ণ নিঃশ্বাসে দেশ জ্বলিয়া যাইতেছে। সেইজন্য উলম্ভন নিয়ম করিয়াছে যে, মাটির নিচে পাথরের ঘর প্রস্তুত করিয়া সেই ঘরে শবদেহকে স্থাপন করিতে হইবে, তবে সে শান্ত থাকিবে। মাটির কীটপতঙ্গ-দল যখন তাহার দেহ কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছে, তখন তাহার কবরের পার্শ্বে পশুবলি দিলে তাহার অশান্তি কমিবে না, বাড়িবে। সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও অশান্তি বাড়িবে। দলপতি উলম্ভন, সেইজন্য স্থির করিয়াছে যে, তাহার রাজত্বে কাহাকেও সে শবদেহ মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিতে দিবে না। কি করিয়া শবদেহকে সৎকার করিতে হয়, তাহা হাতে-কলমে সে সকলকে শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। তোমরাও তাহা শিখিয়া আসিবে।'—এই পর্যন্ত বলিয়া গজন্ধর আবার চুপ করিয়া গেল। এসব আলোচনার কোনো তাৎপর্য আমি ধরিতে পারিলাম না। নীরবে গজন্ধরের অনুসরণ করা ছাড়া অন্য উপায়ও ছিল না, মনে মনে নিম্ব-দেবতাকে স্মরণ করিয়া তাহাই করিতে লাগিলাম। বড়ই অস্বস্তি হইতে লাগিল। বহুক্ষণ চলিবার পর দিগন্তবিস্তৃত এক বিরাট অরণ্য দেখা গেল। সে অরণ্য শুধু বিরাট নয়, তাহা অদ্ভুত। তাহা জীবন্ত নয়, মৃত। বিশালাকৃতি গগনচুম্বী মহীরুহদল প্রেতের মতো সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে। চতুর্দিকে রাশি রাশি শুষ্কপত্র স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে মাটিও ফাটিয়া গিয়াছে। মাটির বর্ণ কৃষ্ণ নয়, পিঙ্গল। কোথাও কোথাও বালুকা ধূ ধূ করিতেছে। আর একটু অগ্রসর হইয়া একটা চাপা কান্নার মতো শব্দ শুনিতে পাইলাম। মনে হইল, বহুদূর হইতে বহুলোক যেন আর্তনাদ করিতেছে। তাহার পরই একটা হাওয়া উঠিল, শুষ্কপত্রের রাশি হাওয়ায় আবর্তিত হইতে লাগিল, দেখিলাম বিরাটাকৃতি বৃক্ষ-কঙ্কালগুলি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। তখন বুঝিতে পারিলাম হাওয়ার জন্য অরণ্যের ভিতর হইতে ওই প্রকার শব্দ হইতেছে। কিন্তু তাহা মর্মরধ্বনি নহে। তাহা মৃত অরণ্যের দীর্ঘশ্বাস। গজন্ধর সেই অরণ্যের ভিতর প্রবেশ করিল। একটু ইতস্তত করিয়া আমরাও করিলাম। মৃত অরণ্যে আর কখনও প্রবেশ করি নাই। মনে হইল যেন, মৃত্যুপুরীতে প্রবেশ করিয়াছি। অরণ্যের ভিতর অন্ধকার, সেই অন্ধকারে মনে হইল কাহারা যেন ফিসফিস করিয়া কথা কহিতেছে। শিহরিয়া উঠিলাম। পরক্ষণেই গজন্ধরের কথা শুনিতে পাইলাম। গজন্ধর বলিল, 'তোমাদের অনাচারের জন্যই নিদারুণ অনাবৃষ্টি হইয়াছে, সেই অনাবৃষ্টির ফলে এই বিরাট অরণ্যের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার জন্য তোমরাই দায়ী। এই মৃত অরণ্যের ভিতর দাঁড়াইয়া আজ তোমরা শপথ কর যে, এইবার মৃতের প্রতি তোমরা সদ্ব্যবহার করিবে। শপথ কর যে উলম্ভনের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তোমরা তাহার নিকট হইতে কবর-প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিবে। যাহারা তোমাদের শিক্ষা দিবে, তাহারা তোমাদের লইতে আসিয়াছে, তোমরা ইহাদের সঙ্গে যাও।

আমি দুই দিন পরে গিয়া তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব।' তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে কয়েকটি মনুষ্যমূর্তি অরণ্যের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আমাদের তিনজনকে ঘিরিয়া ফেলিল। দেখিলাম প্রত্যেকটি লোকই বলিষ্ঠ, দীর্ঘাকৃতি। সংখ্যাতেও তাহারা অনেক। যদিও আমরা তিনজনই সশস্ত্র ছিলাম, কিন্তু তবু দেখিলাম, ইহাদের সহিত কলহে প্রবৃত্তি হইলে মৃত্যুকেই বরণ করিতে হইবে। গজন্ধর বলিল, 'কোনো ভয় নাই, ইহাদের অনুগমন কর। আপাতত তোমাদের প্রস্তর বহন করা ছাড়া আর কিছু করিতে হইবে না।' আমি বলিলাম, 'তোমার উপর বিশ্বাস করিয়া আমরা আসিয়াছিলাম তোমাদের দলপতি উলম্ভনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে। এখন আমাদের প্রস্তর বহন করিতে বলিতেছ কেন?' গজন্ধর বলিল, 'প্রস্তর বহন না করিলে উলম্ভন কাহারও সহিত দেখা করে না। তোমরা প্রস্তর বহন করিয়া লইয়া গেলেই সে তোমাদের সহিত আলাপ করিবে।' ঘিসু এতক্ষণ নীরব ছিল। সে বলিল, 'প্রস্তর লইয়া উলম্ভন কি করিবে বুঝিতে পারিতেছি না।' গজন্ধর উত্তর দিল, 'প্রস্তর দিয়া সে নিজের কবর প্রস্তুত করিতেছে। তাহা দেখিয়াই তোমরা শিক্ষালাভ করিবে কি করিয়া কবর প্রস্তুত করিতে হয়। যাও, শোহান্‌কি পর্বত হইতে প্রস্তর বহন করিয়া লইয়া যাও, তাহা হইলেই সব বুঝিতে পারিবে।' ঘিসু প্রশ্ন করিল, 'প্রস্তর কি আমাদের মাথায় করিয়া বহন করিতে হইবে?' গজন্ধর বলিল, 'না, টানিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে হইবে। শোহান্‌কি পর্বতে বহু কর্মী পর্বতগাত্র হইতে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড কাটিয়া কাটিয়া বাহির করিতেছে। সেই বিরাট প্রস্তরখণ্ডগুলিতে দড়ি বাঁধিয়া বহুলোক মিলিয়া টানিয়া টানিয়া লইয়া যায়। যাও, তোমরা গিয়া সেই দলে যোগদান কর।' ভংগা এতক্ষণ কোনো কথা বলে নাই। সে দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, 'যদি আমার না যাই—' গজন্ধর উত্তর দিল, 'তাহা হইলে ইহারা বলপূর্বক তোমাদের বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। নির্বোধের মতো আচরণ করিও না। ইহাদের অনুগমন কর।' গজন্ধরের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিয়া বাহির হইল। আমি মনে মনে নিম্ব-দেবতাকে ডাকিতেছিলাম। চক্ষুর ইশারায় ভংগাকে প্রতিবাদ করিতে বারণ করিলাম। কারণ নির্বোধের মতো বাদানুবাদ করিয়া লাভ হয় না, ক্রোধের বশবর্তী হইয়া আকস্মিক কিছু করিলে ক্ষতিই হয়। গজন্ধর আর কিছু না বলিয়া বনান্তরালে অন্তর্ধান করিল। তাহার পর সেই লোকগুলি আমাদের কোমরে দড়ি বাঁধিতে উদ্যত হওয়াতে আমি আপত্তি করিলাম। বলিলাম, আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তোমাদের অনুসরণ করিব, দড়ি বাঁধিবার প্রয়োজন নাই। আমার এই কথায় তাহারা নিবৃত্ত হইল, নিম্ব-দেবতাই বোধ হয়, তাহাদের নিবৃত্ত করিলেন। তাহার পর তাহাদের অনুসরণ করিয়া আমরা গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার প্রার্থনা বিফল হয় নাই। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরই ব্যাঘ্রের গর্জন শোনা গেল। নিম্ব-দেবতাই ব্যাঘ্ররূপ ধরিয়া বোধ হয় গর্জন করিলেন। সহসা দেখিলাম সেই বলিষ্ঠ দীর্ঘাকৃতি লোকগুলি সভয়ে ইতস্তত পলায়ন করিতেছে। আমরাও সকলে পলায়ন করিতে লাগিলাম। সেই গভীর অরণ্যে ছত্রভঙ্গ হইয়া কে যে কোথায় ছড়াইয়া পড়িল বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, আমি একা একটা কণ্টকবনের ভিতর আটকাইয়া পড়িয়াছি। চতুর্দিকে কেহ নাই। ভংগা ঘিসুর নাম ধরিয়া তিনবার ডাকিলাম, কোনো উত্তর পাইলাম না। অতিকষ্টে আমি তখন নিজেকে সেই কণ্টকবন হইতে উদ্ধার করিলাম। সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। আবার ভংগা এবং ঘিসুকে ডাকিলাম, কিন্তু কোনো উত্তর পাইলাম না। তখন একাই নিম্ব-দেবতাকে স্মরণ করিতে

করিতে বনের মধ্যে যদৃচ্ছ চলিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ চলিবার পর সহসা দেখিলাম বন শেষ হইয়া গিয়াছে, প্রান্তরে আসিয়া পড়িয়াছি। প্রান্তরের অপর প্রান্তে অপ্রত্যাশিতভাবে চন্মনাকে দেখিতে পাইলাম। চন্মনাকে আমাদের অনুসরণ করিতে বলিয়া নিনানি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছে। তখন যদি আমি চন্মনাকে দেখিতে না পাইতাম তাহা হইলে হয়তো এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে পারিতাম না। গজন্ধরের সহিত কথা কহিতে কহিতে আসিয়াছিলাম, রাত্রিও অন্ধকার ছিল, প্রান্তরের পর প্রান্তর পার হইয়াছি, এইটুকু মনে ছিল শুধু, চন্মনাকে না পাইলে আমি হয়তো পথই চিনিতে পারিতাম না। নিনানি কোথায়, তাহাকে দেখিতেছি না—''

ধবল সকলের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল কিন্তু কেহই কোনো উত্তর দিতে সাহস করিল না। অবশেষে ধবলের দৃষ্টি আমার মুখের উপর নিবদ্ধ হইল এবং নিবদ্ধ হইয়াই রহিল।

আমি বলিলাম, 'নিনানি আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। কাল রাত্রিতে সে কন্যা নদীতে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।'

'কেন?'

ধবলের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। আমি তখন তাহাকে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। সমবেত সকলেই রুদ্ধশ্বাসে আমার বর্ণনা শুনিল। জনতার মধ্যেও বিঘাও ছিল, সে-ও শুনিল। দেখিলাম তাহার চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া গিয়াছে, বিভিন্ন ভাবের সংমিশ্রণে তাহার মুখমণ্ডল হইতে এক অস্বাভাবিক দ্যুতি বিচ্ছুরিত হইতেছিল। আবার বর্ণনা শেষ হইলে ধবল বিঘাওয়ের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল, কোনো কথা বলিল না। বিঘাওয়ের আচরণের প্রতিবাদ করিতে কেহই সাহস করিত না, এমনকি দলপতি ধবলও না। ধবলের মৌন দৃষ্টি কিন্তু নীরব ভাষায় যাহা বলিল কথা দ্বারা তদপেক্ষা বেশি সে বলিতে পারিত না। সে চাহনি বিঘাওকেও বিচলিত করিল।

বিঘাও বলিল, 'তুমি চলিয়া যাইবার পর আমি মূর্ছিত হইয়া পড়ি। তাহার পর আমার মধ্যে তোমার প্রমাতামহ আসিয়া আমার মুখ দিয়া কি অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আমি জানি না। আমার মূর্ছা যখন ভাঙিল তখন দেখিলাম নিনানিও মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সকলে তাহাকে ঘিরিয়া গান করিতেছে। আমি তাহাকে ঘরে লইয়া যাইতে বলিলাম। সকলে তাহাকে ধরাধরি করিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল। তাহার পর কি ঘটিয়াছে আমিও জানি না। জংলা যাহা বলিতেছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর এবং মর্মান্তিক। জংলা, তুমি কি স্বচক্ষে দেখিলে সে ডুবিয়া গেল?'

আমি তখন মিথ্যা কাহিনীটা বিশদতর করিয়া বর্ণনা করিতে লাগিলাম।

বলিলাম, 'আমি গভীর রাত্রে একটা শব্দ শুনিয়া শয্যাত্যাগ করিলাম। মনে হইল আমাদের ক্ষেতে বোধ হয় কোনো জানোয়ার আসিয়াছে। বাহির হইয়া কিন্তু কোনো জানোয়ার দেখিতে পাইলাম না। ক্ষেতের যে অংশটুকু আমাদের আস্তানা ছাড়াইয়া কন্যা নদীর বাঁকের নিকট পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, মনে হইল সেই অংশে কি যেন নড়িতেছে। আমার সন্দেহ হইল হয়তো খরগোসের দল আসিয়াছে। ক্ষেতের ভিতর দিয়াই আমি আগাইয়া যাইতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে সহসা কন্যা নদীর জলে একটা আলোড়ন শুনিতে পাইলাম। মনে হইল কে যেন ঝপাং করিয়া জলে লাফাইয়া পড়িল। সন্দেহ হইল—হয়তো

উদবিড়াল বা অন্য কোনো জলজন্তু। ছুটিয়া কাছে গিয়া কিন্তু দেখিলাম নিনানি। নিনানিও আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে বলিল—'কানার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া আমি স্নান করিতে আসিয়াছি। বিঘাওয়ের ঘায়ের পুঁজরক্ত মাথায় করিয়া আমি থাকিতে পারিব না। ইহার জন্য কানা যদি আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয় দিক।' এইটুকু বলিয়াই কিন্তু পরমুহূর্তে সে চিৎকার করিয়া উঠিল, 'আমাকে জলের তলায় কে যেন টানিতেছে, আমি তলাইয়া যাইতেছি, গেলাম গেলাম।' নিমেষের মধ্যে সে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলাম কিন্তু নিনানিকে আর পাইলাম না। বহুবার ডুবিয়া ডুবিয়া তাহার অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু তাহাকে আর ধরিতে পারিলাম না। একবার ইচ্ছা হইল ছুটিয়া আসিয়া সকলকে খবর দিই, কিন্তু আবার মনে হইল খবর দিতে গেলে দেরি হইয়া যাইবে, নিনানিকে পাইবার আশা তাহা হইলে একেবারেই আমার থাকিবে না। আমার চক্ষুর সম্মুখে সে যে স্থানে ডুবিয়া গিয়াছে আমিই বরং সেই স্থানটা ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখি। পাগলের মতো আমি ক্রমাগত ডুবিয়া ডুবিয়া তাহাকে খুঁজিতে লাগিলাম। ক্রমশ মনে হইল, কন্যা নদীর স্রোতের বেগ বাড়িতেছে, তাহা যেন আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে চাহিতেছে। সেই স্রোতের বেগে গা ভাসাইয়া দিলে নিনানি যে স্থানে ডুবিয়া গিয়াছে সে স্থান হইতে দূরে চলিয়া যাইতে হইবে এই আশঙ্কায় আমি স্রোতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলাম। কন্যা নদীর সহিত কাল সমস্ত রাত্রি মল্লযুদ্ধ করিয়াছি, আমার হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। কিন্তু কন্যা যে অবশেষে আমাকে পরাস্ত করিয়াছিল একটু আগে তাহার প্রমাণ পাইলাম। ওই বাঁকের মুখে যে গাছ তিনটি জলের উপর ঝুঁকিয়া আছে চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম আমি সেই গাছের তলায় পড়িয়া আছি। ও স্থানে যে কি করিয়া আসিলাম তাহা জানি না। মনে হয় আমি অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলাম; আমার দেহটাকে কন্যা নদী ভাসাইয়া আনিয়া তীরে নিক্ষেপ করিয়াছিল। আমি এতক্ষণ মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলাম।'

সকলে আমার এই কল্পিত কাহিনী নিস্পন্দ হইয়া শুনিতেছিল, আমার নিজের কাহিনী শুনিয়া আমি নিজেই মনে মনে মুগ্ধ হইতেছিলাম। আমি যে রূপকথা সৃষ্টি করিতে পারি তাহা আমি নিজেও জানিতাম না। আমার কাহিনী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলে একটা ভয়সূচক আর্তধ্বনি করিল। মেয়েদের মধ্যে অনেকে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল, পুরুষদের মধ্যে অনেকে বুক চাপড়াইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল। সকলেই যে শোকাক্রান্ত হইয়াছে তাহা মনে হইল না, ধবলের তুষ্টি বিধানের জন্যই অনেকে শোকের অভিনয় করিতেছে তাহা বুঝিতে পারিলাম। ধবল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার প্রবীণা পত্নী ইলচি আসিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল এবং বলিল, 'তুমি যখন ওই অজ্ঞাতকুলশীলা বিধবাকে বিবাহ করিতে উৎসুক হইয়াছিলে তখনই আমি তোমাকে মানা করিয়াছিলাম। অপরাজিতা বংশের নামও আমরা কেহ কখনও শুনি নাই। আমাদের কলঞ্জা জমির সন্ধানে বাহির হইয়া কোথা হইতে যে উহাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিল তাহা কাহাকেও বলে নাই। উহাকে বিবাহ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কলঞ্জা মারাও গেল। আমার বিশ্বাস নিনানি মায়াবিনী ছিল, এখন তোমার না কোনো অমঙ্গল হয়। তাহার প্রেতাত্মার তৃপ্তির জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা কর। ওঠ—'

ধবল উঠিয়া দাঁড়াইল, ইলচির জ্যেষ্ঠপুত্র মোকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'নিনানি ফুল

ভালবাসিত। তাহার তৃপ্তির জন্য তোমরা আজ কন্যা নদীকে ফুল দিয়া সাজাও। তুমি সকলকে লইয়া যাও ফুল সংগ্রহ করিয়া আন।'

ঘিসুর প্রবীণা পত্নী নারো এবং ভংগার প্রবীণা পত্নী সাংরা ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া আসিল।

নারো বলিল, 'ঘিসু কবে ফিরিবে—?'

সাংরা বলিল, 'আমি আর কতদিন উপবাস করিব?'

ধবল বিপন্ন বোধ করিলে চক্ষু বুজিয়া ফেলিত। সে কোনো উত্তর না দিয়া চক্ষু বুজিয়া রহিল।

নারো বলিল, 'আমি গোক্ষুর বংশের মেয়ে। আমি প্রতিশোধ লইব। ঘিসু দুই-এক দিনের মধ্যে যদি ফিরিয়া না আসে আমরা সকলে উলম্ভনের দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিব, উলম্ভনকে রীতিমতো শিক্ষা দিয়া আসিব।'

'আমরাও তোমার সঙ্গে যাইব।'

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম ঘিসুর দ্বাদশ পত্নী এবং চল্লিশটি পুত্র কন্যা নারো-র পিছনে সমবেত হইয়াছে। তাহাদের সকলেরই দক্ষিণ বাহু ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত এবং হস্ত মুষ্টিবদ্ধ। পরমুহূর্তেই সাংরা এবং সাংরার সপত্নীগণ পুত্র-কন্যাসহ নারোর দলে আসিয়া যোগদান করিল এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিল, 'আমরাও তোমার সঙ্গে যাইব।'

ধবল চক্ষু বুজিয়া ছিল, বুজিয়াই রহিল। তাহার পর কলরব যখন একটু প্রশমিত হইল তখন ধীরে ধীরে বলিল, 'ঘিসু এবং ভংগার জন্য আমিও কম চিন্তিত নই। তাহাদের মঙ্গলের জন্য আমিও নিম্ব-দেবতার নিকট প্রতিমুহূর্তে প্রার্থনা প্রেরণ করিতেছি। চিন্তাও করিতেছি তাহারা যদি না ফেরে কি উপায়ে তাহাদের ফিরাইয়া আনা সম্ভব। কিন্তু গজন্ধরের আচরণ হইতে এবং অরণ্যমধ্যস্থ ওই লোকগুলির আকৃতি প্রকৃতি হইতে এইটুকু আমি বুঝিয়াছি যে, হঠকারিতা করিলে আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইব। উলম্ভন শক্তিশালী দলপতি, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে শক্তি সংগ্রহ করিতে হইবে। সর্বপ্রথম আমার প্রমাতামহ কানাকে তুষ্ট করা প্রয়োজন। বিঘাওয়ের ওপর ভর করিয়া নিনানিকে তিনি যে শাস্তিদান করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার রোষেরই পরিচয় পাইতেছি। তিনি কেন রুষ্ট হইয়াছেন তাহা আগে আমাকে জানিতে দাও। আমাকে কিছু সময় দাও তোমরা। তোমরা যদি শোকাবেগে অধীর হইয়া এখনই উলম্ভনের উদ্দেশ্যে যাত্রা কর তাহার একটি মাত্রই সুনিশ্চিত ফল হইবে। কয়েকদিন পরে তোমাদের জন্যও আমাদের শোক করিতে হইবে। তোমরা ধৈর্য ধরিয়া কিছুকাল অপেক্ষা কর। যে বৃক্ষ আমাদের কুলদেবতা তিনি ধৈর্যের প্রতিমূর্তি, তাই তিনি ফলবান। তোমরা অধীর হইও না। নিনানির প্রেতাত্মাকে তৃপ্ত করিবার জন্য মোকা ফুল সংগ্রহ করুক, কানাকে তুষ্ট করিবার জন্য এস আমরা সকলে নিজ নিজ শরীর হইতে রক্তমোক্ষণ করিয়া নিম্ব-বৃক্ষতলে উপহার দিই। ইহাতেই সুফল ফলিবে। অধীর হইলে কোনো লাভ হইবে না। তোমরা এই সবেরই আয়োজন কর। আমি একবার আমাদের ক্ষেতগুলি পরিদর্শন করিয়া আসি।'

দলপতি ধবলের এই কথাগুলিতে কাজ হইল। সাংরা এবং নারোর দল ধীরে ধীরে নিজেদের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। বিঘাও এতক্ষণ একটি কথাও বলে নাই। সে জ্বলন্ত

দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। ধবল উঠিয়া যখন ক্ষেতের দিকে চলিয়া গেল তখন সে এক কাণ্ড করিয়া বসিল। হঠাৎ মাটির উপর সে ভেকের মতো শুইয়া পড়িল এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া অদ্ভুত একটা শব্দ করিতে লাগিল—'ঘেক ঘেক ঘেক ঘেক।' বালক-বালিকারা তাহাকে ভয় করিত, তাহারা পলায়ন করিল। আমরাও অনেকে ভীত হইলাম, আবার কোনো উপদবতা আসিয়া ভর করিলেন নাকি! বিঘাও কিন্তু একটা কথাও বলিল না। সে কেবল ঘেক ঘেক ঘেক ঘেক শব্দ করিয়া চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। তাহার পর ভেকের মতোই লাফাইতে লাফাইতে সে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। আমরা সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম। বিঘাও যে শব্দ করিতেছিল তাহা অনেকটা কুকুরের ডাকের মতো, কিন্তু ভেকের অনুকরণে সে কেন যে লাফাইতেছিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমি ভীত হইয়া পড়িলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কন্যা নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে পুষ্পসম্ভার দুলিতে লাগিল। যে ক্ষুদ্র নিম্ব-বৃক্ষটি আমরা দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতাম সেই বৃক্ষের তলদেশ, কাণ্ড, এমন কি শাখা-প্রশাখা পর্যন্ত আমাদের রক্তে চর্চিত হইয়া গেল। আমরা যখন পুরাতন বাসস্থান ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম তখন কয়েকটি নিম্ব-বৃক্ষের চারা এবং বীজ সঙ্গে আনিয়াছিলাম। সেগুলি আমাদের ক্ষেতের ধারে ধারে রোপণ করা হইয়াছিল। আমাদের আশঙ্কা ছিল নূতন স্থানে নিম্ব-বৃক্ষ যদি না থাকে আমরা মুশকিলে পড়িব। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হইয়াছিল, উন্নগা পর্বতের সানুদেশে একটি ক্ষুদ্র নিম্ব-বৃক্ষ আবিষ্কার করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। বিপদে পড়িলে এই বৃক্ষতলেই আসিয়া আমরা পূজা করিতাম। আমাদের ক্ষেতের ধারে যে ছোট ছোট চারাগুলি আমরা পুঁতিয়াছিলাম ধবলের নির্দেশ অনুসারে সেগুলিকেও রক্ত-সিক্ত করা হইল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অঙ্গুলি বিদ্ধ করিয়া যে রক্ত বাহির হইল সেই রক্তবিন্দুগুলি তাহাদের শাখায় পত্রে চন্মনা লাগাইয়া দিল। চন্মনার উপরই এই ভার পড়িয়াছিল। সে-ই তীক্ষ্মমুখ এক প্রস্তর-ছুরিকা দিয়া সকলের অঙ্গুলি হইতে রক্তমোক্ষণ করিতেছিল। লক্ষ্য করিলাম এই সুযোগে সে কয়েকটি আসন্ন-যৌবনা কিশোরীর নিকট প্রণয় দাবি করিতেছে, বলিতেছে তাহারা যদি অসম্মত হয় তাহা হইলে সে তাহাদের অঙ্গুলিতে এমনভাবে ছুরিকাঘাত করিবে যে রক্ত আর বন্ধ হইবে না। উন্নগা পর্বতের সানুদেশে ক্ষুদ্র নিম্ব-বৃক্ষটিকে ঘিরিয়া যে বিরাট জনতা সমবেত হইয়াছিল সেখানে রক্তমোক্ষণ করিতেছিল ধবলের পত্নীরা। তাহাদের সহায়তা করিতেছিল সাংরা এবং নারো।

...নিম্ব-বৃক্ষতলে রক্তদান করিয়া আমি তাড়াতাড়ি ভিড় হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। উন্নগা পাহাড়ে ফিরিয়া গিয়া শিলাঙ্গীর সহিত দেখা করিবার জন্য আমার সমস্ত চিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার দেখা পাইব কিনা কিছুই ঠিক ছিল না, তবু সেই উদ্দেশ্যেই আমি উন্নগা পর্বতের দিকেই চলিয়াছিলাম। যাইতে যাইতে সহসা আবার বিঘাওয়ের কথা মনে হইল। সে ওরূপ করিল কেন? আমার মিথ্যাচরণ সে কি যাদুশক্তি বলে জানিতে পারিয়াছে? ভেকের মুখে কুকুরের ভাষা দিয়া সে কি এই কথাই বলিতে চাহিল, ভেকের মুখ হইতে কুকুরের ডাক বাহির হওয়া যেমন অসম্ভব, বিঘাওকে প্রতারণা করাও তেমনি অসম্ভব। সে কি যাদুশক্তি বলে সব জানিতে পারিয়াছে? ধবল চলিয়া যাইবার পরই সে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল —'তোমাদের সর্বনাশ রাত্রির অন্ধকারের সহিত মিশিয়া ধীরে ধীরে তোমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে'—তাহা তো নিতান্ত মিথ্যা নয়। গজন্ধরের আচরণ,

ঘিসু-ভংগার অন্তর্ধান সত্যই অমঙ্গল-সূচক। খঞ্জনদের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমরা প্রায় সর্বস্বান্ত হইয়াছিলাম। যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করিয়াছিলাম বটে কিন্তু যে ক্ষতি আমাদের হইয়াছিল তাহাও ভয়াবহ। আবার যদি যুদ্ধ বাধে আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব। মনে হইল বিঘাওয়ের খবরটা একবার লওয়া যাক। দেখা যাক আমাকে দেখিয়া সে কিছু বলে কিনা। এখন তাহার কুটিরের কাছে কেহ নাই (তাহার কুটিরের কাছে কেহ থাকিতেও চাহিত না) আমাকে দেখিলে হয়তো সে কিছু বলিতে পারে। বিশেষত তাহার অদ্যকার অদ্ভুত আচরণের কারণ যদি আমিই হই নিশ্চয় কিছু বলিবে। উন্নগা পর্বতে কিছুদূর উঠিয়া গিয়াছিলাম পুনরায় নামিয়া আসিলাম।

...বিঘাও কুটিরের বাহিরে বসিয়াছিল, তাহার হস্তে ছিল মৃত বাঘের থাবাটা। এটি তাহার অতিশয় প্রিয় বস্তু ছিল। কবে কোথা হইতে কোন্ মৃত বাঘের দেহ হইতে যে সে ইহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল তাহা কেহ জানে না। বাঘের সম্মুখের একটা পা-কে সে যষ্টির মতো ব্যবহার করিত। তাহার ভিতরের মাংস ছিল না। হাড়টা ছিল, চামড়াটা ছিল আর ছিল নখগুলি। চামড়ার খোলটার ভিতর বিঘাও নানাপ্রকার মাটি, পাথরের টুকরা, গাছের শিকড় প্রভৃতি পুরিয়া রাখিত। অদ্ভুত জিনিস ছিল সেটা একটা। আমি দূর হইতে দেখিলাম বিঘাও নিবিষ্ট চিত্তে বাঘের নখগুলি পর্যবেক্ষণ করিতেছে। নখগুলিকে সে সূক্ষ্ম লতা দিয়া এমনভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল যে সেগুলি খুলিয়া পড়িয়া যায় নাই। আমি গিয়া তাহার সম্মুখে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলাম। শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিকে এইভাবেই তখন আমরা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতাম। তাহার পর উঠিয়া অদূরে উপবেশন করিলাম। বিঘাও কিন্তু এমনভাবে ব্যাঘ্রনখগুলি পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল যেন সে আমাকে দেখেই নাই। কিছুক্ষণ নীরবতার পর অবশেষে আমি কথা কহিলাম।

বলিলাম, 'আমাদের এই বিপদে আপনার উপদেশ প্রার্থনা করি।'

বিঘাও ভ্রূকুঞ্চিত করিল। তাহার পর উত্তর দিল, 'প্রস্তরের উপর বীজ বপন করিলে তাহা অঙ্কুরিত হয় না। প্রস্তরের নিকট করজোড়ে প্রার্থনা করিলেও হয় না। প্রস্তরকে বাহুবলে সরাইয়া দিয়া মাটি খুঁড়িয়া বীজ বপন করিলে অঙ্কুর হইবার সম্ভাবনা আছে।'

এই কথা কয়টি বলিয়া আবার সে বাঘের থাবাটা উলটাইয়া দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আমি আবার একটি প্রশ্ন করিলাম।

'নিনানির প্রেতাত্মা কিসে তৃপ্ত হইবে? শুধু ফুল দিলেই হইবে কি?'

'নিনানির মৃতদেহ যতক্ষণ না দেখা যাইবে ততক্ষণ তাহার প্রেতাত্মা বিষয়ে কোনো আলোচনা করা বৃথা। আমার বিশ্বাস তাহার যদি কোনো কারণে অতৃপ্ত হয় সে নিজেই আসিয়া তাহা ব্যক্ত করিবে।'

তাহার পর সহসা সে আমার মুখের উপর অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বাঘের থাবাটি তুলিয়া ধরিল এবং নখরগুলি দেখাইয়া বলিল, 'ইহাদের তীক্ষ্ণতার মধ্যেই আমি প্রতিকারের উপায় সন্ধান করিতেছি। ইহারা মৃত নয়, জীবন্ত। ইহাদের নির্দেশ অমোঘ, লক্ষ্য সুনিশ্চিত।' আমি সভয়ে বাঘের থাবাটির দিকে চাহিয়া রহিলাম, মনে হইল সেগুলি নড়িতেছে। আর সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, দ্রুতবেগে উঠিয়া পলায়ন করিলাম। বিঘাও অট্টহাস্য করিতে লাগিল।

...দূর হইতে দেখিতে পাইলাম ধবল নদীতীরে একা বসিয়া আছে। তন্ময় একাগ্র হইয়া বসিয়া আছে, কন্যা নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে যে কলধ্বনি জাগিয়াছে তাহারই নিগূঢ় অর্থ আবিষ্কার করিবার প্রয়াস করিতেছে মনে হইল। আর একটু কাছে আসিয়া দেখিলাম সে প্রার্থনা করিতেছে। তাহার চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত, পাণিদ্বয় যুক্ত। ধবলও প্রতিকারের উপায় সন্ধান করিতেছিল, কিন্তু ভিন্নপথে।

...শিলাঙ্গীর সন্ধানে উন্নগার উপত্যকায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। তখন সুড়ঙ্গের যে মুখটি দিয়া প্রবেশ করিয়া আমি কথকের অদ্ভুত কথকতা শুনিয়াছিলাম সেই মুখের ভিতর ঢুকিয়া বসিয়া রহিলাম। ঠিক করিলাম কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যদি তাহার দেখা না পাই নিনানির কাছে যাইব। নির্জন সুড়ঙ্গমুখে বসিয়া বসিয়া বিগত কয়েক দিনের ঘটনাবলীর কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। মনে হইল কন্যা নদীর তীরে প্রথম ফসল বেশ নির্বিঘ্নে হইয়াছিল, ফলিয়াছিলও প্রচুর। কিন্তু দ্বিতীয় ফসলের বেলায় একটা না একটা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। অনাবৃষ্টির জন্য কন্যা নদীতে বান হয় নাই, ফসলও তাই এবাব কম ফলিয়াছে। সহসা মনে হইল নিনানিকে এমনভাবে লুকাইয়া রাখা কি ঠিক হইয়াছে? তাহাকে কেন্দ্র করিয়া একটু আগে যে মিথ্যার জাল রচনা করিলাম সেই জালে নিজেই জড়াইয়া পড়িব না তো? আমাদের সমস্ত সম্প্রদায় জড়াইয়া পড়িবে না তো? বিঘাওয়ের কথা শুনিয়া মনে হইল নিনানির মৃত্যুসংবাদ সে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে নাই। বাঘনখের মধ্যে সে কিসের প্রতিকার সন্ধান করিতেছিল? আমাকে সন্দেহ করে নাই তো? একটা অনির্দিষ্ট ভয় আমার সমস্ত চেতনাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। ভয় হইতে লাগিল কানা যদি ভীষণ প্রতিশোধ লয়? নিনানিকে এমনভাবে শুধু শুধু লুকাইয়া রাখিতে গেলাম কেন! ধবল এবং বিঘাওয়ের নিকট যদি সত্য কথা সরলভাবে স্বীকার করি তাহা হইলে কি হয়? তাহারা এখন এই সত্যের মূল্য দিবে কি? নানা প্রশ্ন মনের মধ্যে ভিড় করিয়াছিল। সহসা শিলাঙ্গীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। সে তাহার গাভীর নাম ধরিয়া ডাকিতেছিল।

'দুধু—নী, দুধু—নী—'

মনে হইতেছিল কোনো অচেনা পাখির ডাকে সমস্ত উপত্যকাটাই যেন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আমি সুড়ঙ্গমুখ হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। দেখিলাম শিলাঙ্গী এক বোঝা সবুজ ঘাস লইয়া একটা গাছের ডালে বসিয়া আছে। সবৎসা গাভীটি মাঝে মাঝে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে কিন্তু কাছে আসিতেছে না।

'আমি তাহা হইলে ঘাস এইখানে ফেলিয়া দিয়া চলিলাম। অন্য গরু যদি খাইয়া যায় আমি জানি না।'

শিলাঙ্গী তখনও আমাকে দেখিতে পায় নাই। গাভীর উদ্দেশ্যে উক্ত কথাগুলি বলিয়া সে অধীরভাবে পা দুইটি দোলাইতে লাগিল। গাভী আর একবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কাছে আসিল না।

'দুধুনী—আহ্—আহ্—আহ্। মধুনী, মধুনী—'

সহসা দুধুনী মধুনী ঊর্ধ্বপুচ্ছে পলায়ন করিল। তাহারা আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল। শিলাঙ্গীও ঘাড় ফিরাইয়া আমাকে দেখিতে পাইল এবং টপ করিয়া গাছ হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িল। ঘাসের বোঝাটাও নীচে পড়িয়া গেল।

'উহাদের অদৃষ্টে আজ আর ঘাস নাই দেখিতেছি। এখনই অন্য গরু আসিয়া খাইয়া যাইবে।'

'তুমি গাছে উঠিয়াছিলে কেন? উহাদের কাছে গিয়া দিলেই পারিতে—'

'কাছে গেলে গুঁতাইতে আসে।'

'তুমি ঘাস দাও তবু গুঁতাইতে আসে?'

'বোকা যে।'

হাসির আভা তাহার চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়িল। মনে হইল ভিতর হইতে কে যেন আলো জ্বালিয়া দিল। পর মুহূর্তে কিন্তু আবার গম্ভীর হইয়া গেল সে। চোখে শঙ্কার ছায়া ঘনাইয়া আসিল। বলিল, 'একটা ভয়ানক কাণ্ড হইয়াছে, জান? আমাদের হয়তো এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে।'

'কেন?'

'উলম্ভন নামে এখানে কোথায় যেন একজন রাজা আছে। সে নাকি এ অঞ্চলের সমস্ত বন পাহাড় প্রান্তর নদীর অধিপতি। রোহার নিকট সে লোক পাঠাইয়াছিল বশ্যতা স্বীকার করাইবার জন্য। রোহা বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহে না। রোহা বলিতেছে যদি প্রয়োজন হয় এস্থান পরিত্যাগ করিব তবু বশ্যতা স্বীকার করিব না। ঝোনঝিরা বলিতেছে, এস্থান পরিত্যাগই বা করিব কেন, যুদ্ধ করিব। রোহা কিন্তু যুদ্ধ করিতে চাহে না। রোহা বলিতেছে আমাদের জনবল কম, অস্ত্রশস্ত্রও প্রচুর নাই, যুদ্ধ করিতে গেলে আমাদের গরুর দল এদিক ওদিক ছড়াইয়া পড়িবে--'

'উলম্ভন আমাদের নিকটও লোক পাঠাইয়াছিল। লোকটির নাম গজন্ধর। ভীষণাকৃতি দৈত্য একটা। আমাদের দলপতি ধবল আমাদের দলের ঘিসু ও ভংগাকে হইয়া গজন্ধরের সহিত গিয়াছিল উলম্ভনের সহিত এ বিষয়ে আলাপ করিবার জন্য। কিন্তু গজন্ধর তাহাদের উলম্ভনের কাছে না লইয়া গিয়া লইয়া গেল একটা গভীর অরণ্যের মধ্যে। সেখানে আরও কয়েকজন দৈত্যাকৃতি লোক লুকাইয়াছিল। তাহারা ধবল ঘিসু ভংগাকে কোমরে দড়ি বাঁধিয়া বন্দী করিতে চাহিল। বলিল তাহাদের কোনো পাহাড় হইতে নাকি পাথর বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। উলম্ভন নাকি দেশের মঙ্গলের জন্য প্রস্তর-নির্মিত কবর প্রস্তুত করাইতেছে। বনের মধ্যে হঠাৎ একটা বাঘ বাহির হইয়া পড়াতে সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। ধবল কোনোক্রমে প্রাণে বাঁচিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ঘিসু ভংগার এখনও কোনো পাত্তা নাই।'

শিলাঙ্গী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আমার কথা শুনিতেছিল।

'তোমরা এবার কি করিবে?'

'এখনও কিছুই ঠিক হয় নাই। ধবল বলিতেছে, কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া দেখা যাক কি হয়। যুদ্ধ করা তাহারও ইচ্ছা নয়। খঞ্জনদের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলাম। আমাদের লোকবলও প্রচুর নয়। ক্ষেতের কাজ করিতেই বহু লোকের প্রয়োজন, যুদ্ধ করিবার লোক কই?'

শিলাঙ্গী বলিল, 'আমরা দুই দল যদি একত্রিত হই তাহা হইলে কি হয়? তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা উলম্ভনকে রীতিমতো শিক্ষা দিতে পারি। তাহার এই স্পর্ধা সহ্য করা উচিত নয়। ধবল যদি রোহার কাছে যায়—'

'ধবল কোথাও যাইবে না; তুমি যদি রোহাকে আনিতে পারো—'

'রোহাও আসিবে না—'

আমরা পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর হাসিয়া উঠিলাম সহসা। জগদ্দলবৎ অনড় সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে আজও উদীয়মান যৌবন যে অট্টহাস্য করে আমাদের মুখ দিয়াও সেদিন সেই হাসি নির্গত হইল।

শিলাঙ্গী বলিল, 'তুমিও রোহার কাছে চল, আমিও ধবলের কাছে যাই।'

'তাহার পর?'

'তুমি রোহাকে গিয়া সোজা বলিবে আমরা তোমাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে চাই। বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ তোমাদের শিলাঙ্গীকে আমি বিবাহ করিব। উলম্ভন আমাদেরও অপমান করিয়াছে, প্রয়োজন হইলে আমরা উভয় দল একত্রিত হইয়া তাহাকে শিক্ষা দিয়া আসিব।'

'কিন্তু সব শুনিয়াও রোহা যদি আমাকে দূর করিয়া দেয়?'

'চলিয়া আসিবে।'

শিলাঙ্গীর চোখের দৃষ্টিতে হাসি ঝলমল করিয়া উঠিল।

'ধবলের কাছে যাইতে তোমার ভয় করিবে না?'

'একটুও না।'

'তুমি আমাকে বিবাহ করিতে চাও এ কথা তুমি ধবলকে বলিতে পারিবে?'

'স্বচ্ছন্দে। আমাকে বিবাহ করিলে তোমাদের কি কি সুবিধা হইবে তাহাও তাহাকে বুঝাইয়া দিতে পারিব। তোমাদের ধবল লোক কেমন?'

'লোক খুব ভাল। রোহা?'

'রোহাও ভাল। তাহাকে একটা কথা বলিও তাহা হইলে সে খুব খুশি হইবে।'

'কি কথা?'

'বলিও যে তোমার বিশ্বাস গরুই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী। ঝোনঝিরা এ কথা স্বীকার করে না বলিয়া রোহা ঝোনঝিরার উপর মনে মনে অসন্তুষ্ট। ঝোনঝিরা বলে কোনো প্রাণীকে ছোট করিয়া দেখা বুদ্ধিহীনতার লক্ষণ, প্রত্যেক প্রাণীই নিজ নিজ গুণে শ্রেষ্ঠ। বাঘের যে গুণ আছে তাহা গরুর নাই। শশকের যে গুণ আছে তাহা আবার বাঘেরও নাই, গরুরও নাই। গরুকে শ্রেষ্ঠ বলার কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু এসব কথা বলিয়া রোহার মনে কষ্ট দেওযা কি ঝোনঝিরার উচিত? তুমিই বল।'

আমি একটু মুচকি হাসিলাম শুধু।

শিলাঙ্গী বলিল, 'এই সবের জন্য ঝোনঝিরাকে আমার ভালও লাগে কিন্তু। ঝোনঝিরা বেশ নূতন রকম করিয়া সব জিনিস ভাবিতে পারে। খুব বুদ্ধিমান—'

'ঝোনঝিরা তোমাকে তো বিবাহও করিতে চায়।'

'চায়। কিন্তু শুধু আমাকে নয় আরও অনেককে। টংখীরা, মাজুম, মাদারী এই তিনজনকে সে ইতিমধ্যে বিবাহ করিয়াছে। ভিদা, হৈনু, জাংটির সঙ্গেও বেশ ভাব হইয়াছে তাহার। হয়তো সে তাহাদেরও বিবাহ করিবে। আমি রাজি হইলে আমাকেও করিবে। কিন্তু আমি ওই ভিড়ে যাইতে রাজি নই।'

এ যুগের পক্ষে কথাটা অদ্ভুত। এক পুরুষের বহু স্ত্রী থাকাই নিয়ম ছিল সে যুগে।

'আমার যে স্ত্রী নাই তাহা তুমি জানিলে কিরূপে?'

'খবর লইয়াছি।'

'কি করিয়া খবর পাইলে?'

'তোমাদের দলের সকলকে আমি চিনি। খুব ভোরে দেবদারু গাছের উপর উঠিয়া আমি তোমাদের প্রত্যেকের কুটির লক্ষ্য করিয়াছি। কে কে কোন কুটিরে থাকে সব জানি। তোমার সহিত আলাপ হইবার পূর্বেও জানিতাম তুমি কোন্ ঘরটিতে থাক। তোমার ঘরে কখনও কোনো স্ত্রীলোক দেখি নাই। তুমি বিবাহিত হইলে নিশ্চয় স্ত্রীলোক থাকিত।'

ভুরু নাচাইয়া শিলাঙ্গী হাসিয়া উঠিল, তাহার পর লাফাইয়া আমার গলদেশে দুই বাহু বেষ্টন করিয়া ঝুলিতে লাগিল।

'সব জানি, 'তোমার সম্বন্ধে সব জানি।'

'কিন্তু আমি যে নিনানিকে ভালবাসি।'

'বাসিলেই বা। তাহাকে বিবাহ তো করিতে পারিবে না।'

'তোমাকে বিবাহ করিলে আর কখনো বিবাহ করিতে পারিব না বলিতে চাও?'

'না। আমি বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না। তোমার ইচ্ছাও হইবে না। আমি একাই তোমার চতুর্দিক পূর্ণ করিয়া রাখিব।'

'একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকাই তো নিয়ম। তুমি ইহাতে আপত্তি কেন করিতেছ?'

'বড় ঝগড়া হয়। টংখীরা, মাজুম, মাদারী অহোরাত্র কলহ করিতেছে। কাল মাজুম টংখীরার নাক কামড়াইয়া ধরিয়াছিল, জান?' শিলাঙ্গী আমার কণ্ঠ ছাড়িয়া নীচে নামিয়া পড়িল এবং হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

'সে যে কি কাণ্ড যদি দেখিতে! মাজুম কিছুতেই টংখীরার নাক ছাড়ে না। ঝোনঝিবাও হিমসিম খাইয়া গেল। শেষ পর্যন্ত প্রহার করিতে তবে ছাড়িল। টংখীরার নাকের খানিকটা একেবারে ছিঁড়িয়া লইয়াছে! তোমাদের নিনানিরও নিশ্চয় সপত্নী আছে?'

'আছে বই কি।'

'মারামারি করে?'

'করে। সকলেরই নিনানির ওপর আক্রোশ।'

'হইবেই। সে যে দেখিতে সুন্দর। টংখীরাও খুব রূপসী, তাই বেচারীর নাকটি গেল। আমি ওসবের মধ্যে কখনও যাইব না। আমার মনে হয় তোমার নিনানিও পলাইয়া আসিয়াছে সপত্নীদের জ্বালায়—'

'সে স্বেচ্ছায় আসে নাই, আমিই তাহাকে আনিয়াছি। আমারই অনুরোধে সে যক্ষিণীর গুহায় আশ্রয় লইয়াছে।'

'সে কি আসিয়া গিয়াছে?'

'হাঁ। যক্ষিণীর সহিত তাহার ভাবও হইয়া গিয়াছে। যক্ষিণী তাহার দিদিমা হয়—'

'বল কি?'

শিলাঙ্গী ক্ষণকাল বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, 'চল তাহার সহিত ভাব করিয়া আসি।'

'আমি আগে যাই, তুমি একটু পরে আসিও। দুইজনকে এক সঙ্গে দেখিলে নিনানির মনে সন্দেহ জাগিবে। সে বড় হিংসুক।'

'আমি তাহা হইলে কিছু দুধ আনি। যক্ষিণীকে তো আমি প্রায়ই দুধ দিতে যাই, সেইভাবেই যাইব। আজ কিছু বেশি দুধ আনিব যাহাতে নিনানিও একটু ভাগ পায়। দেখিও, দুধ খাওযাইয়া ঠিক তাহাকে বশ করিয়া ফেলিব।'

'বেশ।'

'তুমি রোহার নিকট কখন যাইবে?'

'নিনানিকে আগে দেখিয়া আসি।'

'তোমার দেখা কখন পাইব?'

'সন্ধ্যায়।'

'কোথায়?'

'ওই ঝোপের নিকটই আমি দেখা করিব।'

'আমি এখন যাই তাহা হইলে। রোহাকে তোমার কথা বলিয়া রাখিব। নিগম বন হইতে রোহা আজ আসিয়াছে। আবার হয়তো সেখানে ফিরিয়া যাইবে। তোমাকে হয়তো নিগম বনেই যাইতে হইবে। বেশি দূর নয়—'

'যত দূরই হোক যাইব। কিন্তু তাহার আগে ধবলের সহিতও এ বিষয়ে আলাপ করিতে হইবে একটু। তোমাদের দলের সহিত যোগ দিয়া আমরা উলন্তনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কবিব কিনা তাহা ধবলই ঠিক করিবে, কারণ সে-ই আমাদের দলপতি। ঘিসু এবং ভংগা যদি ফিরিয়া না আসে তাহা হইলে যুদ্ধ একটা করিতেই হইবে। ফিরিয়া আসিলেও হয়তো করিতে হইবে, কারণ উলন্তন যে আমাদের সহজে নিস্তার দিবে তাহা মনে হয় না।'

'দেখ, দেখ দুধুনী মধুনী ফিরিযা আসিয়া ঘাস খাইতেছে। প্রায় সবটাই খাইয়া ফেলিযাছে। কখন চুপিচুপি আসিয়াছে আমরা জানিতেও পারি নাই।'

শিলাঙ্গী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। যে যুদ্ধপ্রসঙ্গ আমি তুলিয়াছিলাম মনে হইল তাহা তাহাকে মোটেই বিচলিত করে নাই। সহসা বলিল—'খুব সুন্দর, নয়?'

'উহাদের ধরিয়া রাখিলেই পার।'

'ঝোনঝিরা ধরিয়া দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু আমি রাজি হই নাই। ধরিলে কষ্ট হইবে না উহাদের? তাছাড়া আর একটা কথাও মনে হয় আমার।'

'কি?'

'ধরিলেই উহারা ফুরাইয়া যাইবে। এখন যেমন সকালে উঠিয়াই খোঁজে বাহির হই, কোথায় আছে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াই, উহাদের জন্য ঘাস সংগ্রহ করি, দূর হইতে ঘাস ছুঁড়িয়া দিয়া দেখি উহারা খাইতেছে কিনা—তখন আর এসব হইবে না। উহারাও ফুরাইয়া যাইবে, আমারও কাজ থাকিবে না।'

আমার মনে একটা কথা সঙ্গে সঙ্গে উদিত হইল।

বলিলাম, 'আমার সহিত তোমার যদি বিবাহ হয় তাহা হইলে আমিও তো তোমার কাছে ফুরাইয়া যাইব!'

'তুমি কি গরু নাকি। তুমি যে মানুয।'

'হইলই বা।'

'মানুয অত সহজে ফুরায় না। প্রত্যেক মানুষ এক একটি ধাঁধা। তাহাকে চিনিতেই অনেক

দিন লাগে, বুঝিতে আরও বেশি দিন লাগে, তাহার আদি অন্ত জানিতে জানিতে জীবনই শেষ হইয়া যায়।'

শিলাঙ্গীর চক্ষু দুইটি হাসিতে লাগিল।

'এসব কথা আমার নয় কিন্তু, আমাদের কথক নীল-মিল একদিন বলিয়াছিল। আমার মনে হয় নীল-মিল ঠিকই বলিয়াছে। তোমাকে আমি মোটেই চিনিতে পারি নাই। ভাল লাগিয়াছে, কিন্তু চিনিতে পারি নাই। তুমি আমাকে পারিয়াছ কি?'

'না—'

'কিন্তু একদিন আমরা পরস্পরকে চিনিতে পারিব। পারিব না?'

শিলাঙ্গী সোৎসুকে চাহিয়া রহিল।

'নিশ্চয়ই পারিব।'

সেদিন একথা বলিয়াছিলাম বটে কিন্তু সত্যই কি শিলাঙ্গীকে চিনিতে পারিয়াছিলাম? পারি নাই। আমার ভোগের নাগালের মধ্যে তাহাকে যতটুকু পাইয়াছিলাম ততটুকুই তাহাকে চিনিয়াছি। কিন্তু আমার ভোগের নাগাল কতটুকু? সেই ক্ষুদ্র পরিধিকে অতিক্রম করিয়া যে মহিমময়ী শিলাঙ্গী আমার ভোগাতীত লোকে প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল তাহাকে আমি চিনিতে পারি নাই। তাহার আভাসমাত্র পাইয়াছিলাম যখন সে আমার নাগালের বাহিরে চলিয়া গেল।

'তুমি তাহা হইলে নিনানির কাছে যাও। আমিও একটু পরে আসিতেছি। তুমি কতক্ষণ থাকিবে?'

'বেশিক্ষণ নয়। তাহার খবরটা লইয়া চলিয়া যাইব। আমাকে আজই আবার ধবলের সহিত দেখা করিতে হইবে। কাল সময় পাওয়া যাইবে না, কারণ, কাল আমাদের খনিত্র পূজা, ধবল ব্যস্ত থাকিবে।'

'খনিত্র পূজা কি?'

'আমরা গাছের শাখা সূচালো করিয়া তাহা দিয়াই জমি খুঁড়ি। কাল সেইগুলিকে একত্রিত করিয়া আমরা তাহাদের পূজা করিব। মেয়েরাই করিবে, আমরা কেবল উপবাস করিয়া থাকিব। আমাদের মেয়েরা এতক্ষণ বোধ হয় ইঁদুর খুঁজিতে বাহির হইয়াছে। এবার আমাদের ফসল তেমন ভাল হয় নাই। প্রথম বৎসর খুব ভাল হইয়াছিল। এবার তাই পূজাটা ভাল করিয়া করিতে হইবে—কাল ধবল হয়তো সমস্ত দিনই প্রার্থনা করিবে। আজই তাহার সহিত কথাবার্তা বলিব। নিনানির কাছে বেশিক্ষণ থাকা চলিবে না?'

'আমি সন্ধ্যার আগেই কিন্তু ঝোপের মধ্যে আসিয়া বসিয়া থাকিব। তুমি যেন বেশি দেরি করিও না।'

'না, দেরি করিব না। আমি তাহা হইলে যাই এখন।'

'বেশ—'

যক্ষিণীর গুহার উদ্দেশ্যে আমি যাত্রা করিলাম। শিলাঙ্গী কিন্তু গেল না। সে তাহার দুধুনী মধুনীকেই দেখিতে লাগিল। আমি চলিতে চলিতে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম সে তাহাদের কি যেন বলিতেছে, মাঝে মাঝে দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাদের ডাকিতেছে, কিন্তু দুধুনী মধুনী কিছুতেই কাছে আসিতেছে না।

...যক্ষিণীর গুহার কাছাকাছি আসিয়া দেখিলাম যক্ষিণী একদল কাকের সহিত কাকের ভাষায় কথোপকথন করিতেছে। যক্ষিণী আমার আগমন টের পায় নাই, আমি একটা ঝোপের আড়ালে

দাঁড়াইয়া তাহার কাণ্ড দেখিতে লাগিলাম। এমন বিস্ময়কার ব্যাপার আমি আর কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই। মনে হইল কাকগুলি হরিণের মাংসে ভাগ বসাইতে আসিয়াছে। বিদ্রোহী জনতা রাজশক্তির নিকট যেমন খাদ্যের দাবি করে তাহারাও যেন ঠিক তেমনিভাবে যক্ষিণীর নিকট দাবি জানাইতেছে। যক্ষিণীও তাহাদের দাবির উত্তরে 'কা কা' 'ক-আ' 'ক্যাক্ ক্যাক্' শব্দ করিয়া বায়স ভাষায় বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দেখিলাম তাহার গুহার সম্মুখে অনেক কাক উড়িতেছে, আশেপাশে যে সব বৃক্ষ ছিল তাহাদের শাখায় শাখায় বহু কাক বসিয়াছিল এবং প্রত্যেকেই চিৎকার করিতেছে। যক্ষিণীও চিৎকার করিতেছে। আমি যেস্থানে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেস্থান হইতে যক্ষিণীর গুহার ভিতরটা সব দেখা যাইতেছিল না, যক্ষিণীর মুখের খানিকটা অংশ কেবল দেখিতে পাইতেছিলাম। মনে হইতেছিল তাহার চোখের দৃষ্টি ভীত ত্রস্ত, তাহাতে ক্রোধ বা স্পর্ধার প্রকাশ নাই, তাহা যেন আর্ত অসহায়। যক্ষিণী কাকগুলিকে তাড়াইয়া দিতেছে না কেন এই কথাই বারংবার আমাব মনে হইতেছিল। তাহার কাছে কি কোনো অস্ত্র নাই? এমনকি লাঠি পর্যন্ত নাই নাকি? যদি না-ও বা থাকে কাক তাড়াইবার মতো অস্ত্র সংগ্রহ করিতে কতটুকু সময় লাগে? উঠিয়া একটা গাছের ডাল ভাঙিয়া লইলেই তো হইল। তা ছাড়া নিনানি কোথায় গেল? সে কি তাহাব নিজেব গুহায় চলিয়া গিয়াছে? সে থাকিলে নিশ্চয় কাকগুলাকে তাড়াইয়া দিত। এইসব চিন্তা-পরম্পরায় মগ্ন হইয়া আমি দূর হইতে কাক-কোলাহল শুনিতেছিলাম এমন সময় আর একটা কাণ্ড ঘটিল। একটা প্রকাণ্ড শকুনি শোঁ করিয়া উপর হইতে নামিয়া আসিল এবং ডানা ঝটপট করিয়া যক্ষিণীর গুহার ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। যক্ষিণীর আর্ত চিৎকারে মনে হইল পঞ্চ-পর্বত বুঝি বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। কাকেরা মহা উৎসাহে কলরব করিতে লাগিল। মনে হইল তাহারা যেন একজন নেতা পাইয়াছে। আমি আর নিষ্ক্রিয় দর্শকরূপে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, ছুটিয়া গিয়া একটা গাছের ডাল ভাঙিয়া লইয়া যক্ষিণীর গুহাদ্বারে উপস্থিত হইলাম। শকুনি এবং কাকের দল নিমেষে ছত্রভঙ্গ হইয়া উড়িয়া গেল। তখন আমি দেখিলাম যক্ষিণী হরিণের কঙ্কালটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। আমাকে দেখিয়া সে আবার তারস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল, আরও জোরে কঙ্কালটাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। আমি যে তাহার উপকারী বন্ধু এ কথা সে যেন বুঝিতেই পারিল না। মনে করিল আমিও একজন আততায়ী, তাহার হরিণটাকে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছি। আমি সবিস্ময়ে যক্ষিণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার মুখের চতুর্দিকে রক্ত লাগিয়া রহিয়াছে, দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে আটকাইয়া আছে মাংস অস্থি এবং চর্বির টুকরা। তাহার ওষ্ঠ এবং অধরের আশেপাশে রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্নও দেখা যাইতেছিল। আমি সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম, এমন অদ্ভুত বীভৎস দৃশ্য আমি আর কখনও দেখি নাই। হয়তো আমার কোনো পূর্বজন্মে এতদপেক্ষা বীভৎসতর কোনো দৃশ্যের আমি সাক্ষী ছিলাম, হয়তো বা কারণও ছিলাম কিন্তু সে কথা আমার মনে ছিল না, মনে হইতেছিল এ দৃশ্য আর দেখি নাই, মনে হইতেছিল ইহা আকস্মিক এবং অভূতপূর্ব, ইহা যে আমারই অতীত জীবনের প্রেত-মূর্তি একথা কল্পনা করা অসম্ভব ছিল আমার পক্ষে তখন। আমি সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম। দেখিলাম যক্ষিণীর অঙ্গে কোনো আবরণ নাই, তাহার বৃহদাকৃতি স্তনযুগল স্ফীত উদরের উপর প্রলম্বিত হইয়া রহিয়াছে। স্তনযুগলও হরিণরক্তে রঞ্জিত, হরিণ-বসায় পিচ্ছিলীকৃত। তাহার উদরদেশ অস্বাভাবিক রকম স্ফীত মনে হইল। তাহা শরীরের একটা অংশ বলিয়া মনে হইতেছিল না। মনে হইতেছিল কে যেন বাহির হইতে একটা বোঝা বা স্তূপ তাহার বুকের নীচে বসাইয়া দিয়া গিয়াছে। তাহার

উপর রক্ত এবং চর্বির দাগ। সহসা ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিলাম, যক্ষিণী এত খাইয়াছে যে নড়িতে পারিতেছে না। প্রায় একটা গোটা হরিণ গলাধঃকরণ করিয়া সে চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। কাক এবং শকুনির নিকট তাই তাহাকে হার মানিতে হইয়াছে। আমার আচরণে যক্ষিণী কিন্তু একটুও আশ্বস্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। আমি যতক্ষণ তাহার কাছে ছিলাম সে চিৎকার করিতেছিল। কি যে বলিতেছিল তাহা বুঝিতে পারিতেছিলাম না, কিন্তু তাহার চোখমুখের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল, সে আমাকে গালি দিতেছে। নিনানি কোথায় গেল? ময়াল সাপটাই বা কোথায়? এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। শেষে গুহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম, ভয় হইল ময়াল সাপটা নিনানিকে আক্রমণ করে নাই তো। তাড়াতাড়ি গুহার নিকট হইতে নামিয়া গেলাম, নামিয়া যাইবামাত্র কিন্তু কাকের দল আবার আসিয়া গুহামুখে হানা দিল, তাহারা নিকটেই বৃক্ষশাখায় বসিয়াছিল। দেখিলাম শকুনিটাও অপেক্ষা করিতেছে। তাহার পর সহসা আগড়টা নজরে পড়িল। সেটা নীচে পড়িয়া গিয়াছিল। আগড়টা তুলিয়া যক্ষিণীর গুহামুখ বন্ধ করিয়া দিলাম। আগড়টা পড়িয়া গিয়াছিল বলিয়াই যক্ষিণী বিপদে পড়িয়াছিল। হয়তো নিনানিই আগড়টা খুলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে গেল কোথায়? তাহার পর মনে পড়িল ময়াল সাপের গুহাও তো যক্ষিণী আগড় দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। উঁকি দিয়া দেখিলাম, সেটা বন্ধই আছে। ময়াল সাপ তাহা হইলে বাহির হয় নাই। নিঃসংশয় হইবার জন্য তবু সে গুহাটার কাছে গেলাম একবার, ভিতরে উঁকি দিয়া দেখিলাম সাপটা স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে, একটা মৃদু শোঁ শোঁ শব্দও শোনা যাইতেছে। নিশ্চিন্ত হইয়া তখন নিনানির খোঁজে বাহির হইয়া পড়িলাম। নিনানির গুহায় গিয়া দেখিলাম সেখানে সে নাই। কোথায় গেল? যে শুষ্ক খড়ের বোঝা রাখিয়া গিয়াছিলাম সেগুলি দেখিয়া মনে হইল না যে নিনানি তাহার উপর শুইয়াছে। সহসা মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। মনে হইল কে যেন গান গাহিতেছে। উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। নিনানি কি? কিন্তু সেই দূরাগত সঙ্গীত এত মৃদু যে ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। প্রবলবেগে বাতাস বহিতেছিল, সেই বাতাসে সেই মৃদু সঙ্গীত ভাসিয়া যাইতেছিল। মাঝে মাঝে ভ্রম হইতেছিল তাহা মানুষের কণ্ঠস্বর কিনা। বাতাসের আলোড়নে অরণ্যানি গর্জন করিতেছিল, সেই গর্জনের ফাঁকে ফাঁকে এক একবার মৃদু সঙ্গীত শুনিতে পাইতেছিলাম। সহসা একটা অদ্ভুত কথা মনে হইল। মনে হইল উন্নতশীর্ষ পাষাণময় গম্ভীর পঞ্চ-পর্বতই কি গান গাহিতেছে? তাহার আপাতকঠিন মূর্তির অন্তরালে যে কোমল হৃদয় প্রচ্ছন্ন আছে, এই মৃদু সঙ্গীত হয়তো সেই হৃদয়েরই প্রকাশ। বিস্মিত-উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম খানিকক্ষণ। সে যুগে আমরা বিশ্বাস করিতাম যে সমস্ত জগৎই প্রাণময়। জড় ও জীবের বিশেষ পার্থক্য ছিল না আমাদের কাছে। পঞ্চ-পর্বতের নিগূঢ় বাণী হয়তো শুনিতে পাইলাম এই ধারণাটা কিছুক্ষণ আমাকে অভিভূত করিয়া রাখিল, নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর সঙ্গীতটাকে ধীরে ধীরে অনুসরণ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ অনুসরণ করিবার পরই কিন্তু ভুল ভাঙিল, নিনানির কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিলাম, আর একটু অগ্রসর হইয়া তাহার গানের কথাগুলিও শুনিতে পাইলাম। কন্যা নদীর তীরে নিম্ব-সম্প্রদায়ের মেয়েরাও আজ এই গান গাহিতেছে। আজ খনিত্র পূজা। নিনানিও সেই পূজা করিতেছে নাকি? নিশ্চয়ই করিতেছে। নিনানি চরিত্রের একটা নূতন দিক সহসা আমার কাছে পরিস্ফুট হইল। বিদ্রোহ করিয়া সে দল ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে বটে কিন্তু দলের সহিত তাহার আন্তরিক যোগ ছিন্ন হয় নাই। দলের মঙ্গলের জন্য সে গোপনে গোপনে পূজাও করিতেছে। বিস্মিত হইলাম।

...একটা ঝোপের আড়ালে বসিয়া আমি নিনানির পূজা দেখিতেছিলাম। সে খনিত্র পূজাই করিতেছিল, কিন্তু নিজের পদ্ধতিতে করিতেছিল। খনিত্র পূজায় ইঁদুর বলি দেওয়া হয় কারণ ইঁদুর মাটিতে গর্ত খনন করে। খনিত্রের সঙ্গে ইঁদুরের রক্ত লাগাইয়া দিলে তাহাও ইঁদুরের মতোই খননশীল হইবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস ছিল। তখন আমাদের খনিত্র ছিল সূচাগ্র গাছের ডাল। খনিত্র পূজার দিন প্রত্যেক নারীই একটি সূচাগ্র বৃক্ষশাখাকে মূষিকরক্ত-চর্চিত করিয়া পূজা করিত। গানও গাহিত। নিনানিও একটি মোটা গাছের ডালকে পূজা করিতেছিল। দেখিলাম ডালটি সে একটি প্রস্তরের গায়ে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে, কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডের সাহায্যে তাহার পাদদেশে ছোট একটা বেদীর মতোও করিয়াছে। সেই বেদীর উপর দেখিলাম কয়েকটি ছিন্ন-মুণ্ড মূষিক ও শশক স্তূপীকৃত রহিয়াছে। দেখিলাম বৃক্ষশাখাটি শুধু রক্ত-রঞ্জিতই হয় নাই তাহার উপরিভাগে কয়েকটি রক্তবিন্দু দিয়া নিনানি সেটিকে মনুষ্য-মুখাকৃতি করিবার চেষ্টাও করিয়াছে। মূষিক এবং শশক-শবগুলির পার্শ্বে কিছু সবুজ তৃণগুচ্ছ এবং বন্য পুষ্পও বেদীটির উপর সজ্জিত রহিয়াছে দেখিলাম। সেই পুষ্পগুলিকে ঘিরিয়া কয়েকটি মধুকর গুঞ্জন করিতেছিল। রক্তাক্ত বৃক্ষদণ্ডটির উপর রক্তলোভী পতঙ্গ ও মক্ষিকা দল বসিতেছিল এবং উড়িয়া যাইতেছিল। দূরে শোনা যাইতেছিল একটা ঝরনার ঝরঝর শব্দ। এই পটভূমিকায় নিনানি নাচিয়া নাচিয়া গান করিতেছিল। তাহার অঙ্গে কোনো আবরণ ছিল না, এমন কি আমি তাহার জন্য যে শিরস্ত্রাণটি করিয়া দিয়াছিলাম সেটিও তাহার মাথায় ছিল না। তাহার কুঞ্চিত কেশদাম নৃত্যবেগে ইতস্তত সঞ্চালিত হইতেছিল। মনে হইতেছিল কোনো বৃহৎ বন্য পুষ্পের অসংখ্য কেশর যেন তাহার মস্তক ঘিরিয়া আস্ফালন করিতেছে। আমাদের দলের পরিচিত সঙ্গীতটিই নিনানি গাহিতেছিল।

'ওগো, বৃক্ষশাখা, যে শক্তিবলে তুমি একদিন বীজের কঠিন আবরণ বিদীর্ণ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলে, তোমার যে শক্তি তোমাকে মাটির অন্ধকার হইতে আকাশের আলোকের দিকে লইয়া আসিয়াছিল, তোমার সেই শক্তি শতগুণ বৃদ্ধি হোক। সেই শক্তি দিয়া আবার তুমি মৃত্তিকার কঠিন বক্ষ কর্ষণ কর। তাহাকে বিদ্ধ কর, তাহাকে চূর্ণ কর, তাহাকে শিথিল কর। আলোকের প্রত্যাশায় অসংখ্য বীজ মাটির অন্ধকারে এখনও অপেক্ষা করিতেছে, ওগো বৃক্ষশাখা, তুমি তাহাদের পথ সুগম করিয়া দাও। তুমি অগ্রণী, তুমি প্রবীণ, তুমি দলপতি, তুমি বনস্পতি, পথভ্রান্ত শিশু তরুদের তুমি পথ দেখাও। মৃত্তিকার বাধা অপসারিত করিয়া দাও। তাহাকে কর্ষণ কর, বিদ্ধ কর, চূর্ণ কর, শিথিল কর—'

নিনানি নাচিতে নাচিতে মধ্যে মধ্যে বৃক্ষশাখাটি তুলিয়া লইতেছিল। তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছিল। তাহা দিয়া নিজের সর্বাঙ্গ বিদ্ধও করিতেছিল। মনে হইতেছিল সে যেন নিজেকেই মৃত্তিকার প্রতীকরূপে কল্পনা করিতেছে। তাহার অঙ্গের নানাস্থানে রক্তের দাগ লাগিয়াছিল, কিছু কিছু ক্ষতও হইয়াছিল, নিনানির কিন্তু সে-সব দিকে লক্ষ্য ছিল না। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মাদিনীর মতো নাচিয়া গাহিয়া খনিত্র পূজা করিতেছিল সে। আমি নির্বাক বিস্ময়ে বসিয়াছিলাম। পূর্বেও নিনানিকে খনিত্র পূজা করিতে দেখিয়াছি। তখন সে সকলের মতো চিরাচরিত রীতিতেই পূজা করিয়াছে। সে পূজাতে বৃক্ষশাখা, মূষিকরক্ত এবং সঙ্গীত ছিল, কিন্তু তাহাতে এ মহিমা ছিল না।

...নিনানির পূজা শেষ হইল। মনে হইল সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। নৃত্য বন্ধ করিয়া সে

স্খলিতচরণে পাশের ঝোপটার ভিতর ঢুকিল এবং দুইটি জীবন্ত মূষিক লইয়া বাহির হইয়া আসিল। মূষিক দুইটির মুণ্ড ছিন্ন করিয়া সে বৃক্ষশাখাটিকে শেষবার রক্তে স্নান করাইল। স্নান করাইয়া জানু পাতিয়া লুটাইয়া পড়িল সেই রক্তাক্ত বৃক্ষশাখার সম্মুখে। ঝরনার ঝরঝর শব্দটা সহসা বেশি স্পষ্ট হইয়া উঠিল। দেখিলাম ফুলের উপর মধুকরবৃন্দও নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে।

'নিনানি—'

আমার ডাক শুনিয়া নিনানি উঠিয়া বসিল।

'তুমি কতক্ষণ আসিয়াছ?'

'অনেকক্ষণ। বসিয়া বসিয়া তোমার পূজা দেখিতেছিলাম।'

'আমি ঝরনায় স্নান করিব। আমাকে তুমি কোলে করিয়া লইয়া চল। বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।'

আমার দিকে দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া দিল। আমি উঠিয়া গিয়া তাহাকে তুলিয়া লইলাম।

আমার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া সে বলিল, 'আমার ভয় হইতেছিল তুমি বুঝি আর আসিবে না।'

'কাল কি তুমি সমস্ত রাত যক্ষিণীর কাছেই ছিলে?'

'হ্যাঁ শালমিটিনাকে কোলে করিয়াই বসিয়াছিলাম। কাল কিছুক্ষণের জন্য অতীত আমার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছিল, আমার কোলের উপর আসিয়া বসিয়াছিল। তাহার পর সহসা চাঁদ উঠিল, আবার বর্তমানে ফিরিয়া আসিলাম, মনে পড়িল আজ আমাদের খনিত্র পূজা। সেই মুহূর্তে শালমিটিনাও আমার কানে কানে বলিল,—যাও, খরগোস ধরিয়া আন। ময়াল সাপটাকে কিছু খাইতে দিতে হইবে। না দিলে ও শেষে আমাকেই খাইয়া ফেলিবে। শালমিটিনা আমাকে শিখাইয়া দিল কি করিয়া কোথায় আত্মগোপন করিয়া ফাঁদ পাতিতে হইবে। তাহার নিজের গাত্রাবরণটাও খুলিয়া আমাকে দিল। বলিল, ঝোপের ধারে এইটা টাঙাইয়া রাখিলে খরগোসেরা সেদিকে যাইবে না, ফাঁদের দিকে যাইবে। খরগোস ধরিতে গিয়া ইঁদুরও অনেক ধরিয়াছি। শালমিটিনার ফাঁদগুলি চমৎকার। তুমি কাল রাত্রে কোথায় ছিলে?'

'আমি ফিরিয়া দেখিলাম ধবল আসিয়াছে।'

'তাহার পর?'

যাহা ঘটিয়াছিল সমস্তই বিশদরূপে বর্ণনা করিলাম।

'আমার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া ধবল কাঁদিল না?'

'না।'

'কেহই কাঁদিল না?'

'মেয়েদের মধ্যে অনেকে আর্তনাদ করিয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহাদের এ শোকোচ্ছ্বাস আন্তরিক কিনা বলা শক্ত। দলপতির প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুসংবাদে শোকপ্রকাশ না করিলে দলপতিকেই অপমান করা হয় যে—'

নিনানি চুপ করিয়া রহিল। তাহার মৃত্যুসংবাদ কাহাকেও বিশেষ বিচলিত করে নাই, এ সংবাদটা তাহাকে যেন বিচলিত করিল। তাহার নীরবতা হইতেই তাহা বুঝিতে পারিলাম। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিনানি বলিল—'ঘিসু থাকিলে ঘিসু ঠিক কাঁদিত।'

'সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।'

'আমি যখন মরিয়া যাইব, তুমি কাঁদিবে?'

'কি যে বল—'

নিনানি দুই বাহু দিয়া আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিল। আরও কিছুক্ষণ নীরবতার পর বলিল—'আমার মৃত্যুসংবাদ শুনিলে আর একজনও কাঁদিত। সে কিন্তু নাই।'

'মীংরার কথা বলিতেছ?'

'না, কলঞ্জা, যে আমাকে তোমাদের দলে আনিয়াছিল।

একটা অদ্ভুত কথা সহসা মনে হইল। কলঞ্জার বিধবা, ধবলের পত্নী, ঘিসুর প্রণয়িনীকে আমি কাঁধে করিয়া বহিয়া লইয়া চলিয়াছি। নারী সম্বন্ধে আজ তোমাদের যে শুচিতা-বোধ প্রবল হইয়াছে তখন তাহা তত প্রবল ছিল না, কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে ছিল। যে প্রয়োজনের দাবি আমাদের পরস্ত্রীর সম্বন্ধে সংযত করিতেছিল সেই প্রয়োজনের দাবিই ক্রমশ ধর্মরূপ পরিগ্রহ করিতেছিল। প্রয়োজনের দাবিতেই আমরা একদিন প্রস্তরকে বৃক্ষকে পূজা করিতাম, প্রয়োজনের দাবিই তাহাদের দেবতা পদে উন্নীত করিয়াছিল। তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের শুচিতাবোধ জাগ্রত করিয়াছিল। পর-স্ত্রী সম্বন্ধেও আমরা ক্রমশ তেমনি সচেতন হইতেছিলাম। আমার অন্তরের অন্তস্তলে কে যেন বলিয়া উঠিল—তুমি অন্যায় করিতেছ। তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছ। ধবলের সহিত মিথ্যাচারণ করিয়া তুমি পাপ করিতেছ। এখনও সময় আছে, এখনও নিনানিকে ত্যাগ কর, এখনও গিয়া ধবলকে সত্য কথা খুলিয়া বল...।

'তুমি চুপ করিয়া আছ কেন, কথা বল। আমার সম্বন্ধে সকলেই তো চুপ করিয়া গেল, আমার মৃত্যুসংবাদে কেহ কাঁদিল না পর্যন্ত। তুমি চুপ করিও না, তুমি কথা বল। আমার ভয় হইতেছে তুমিও আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। তুমি কথা বল, চুপ করিয়া থাকিও না—'

'কি কথা বলিব?'

'আমার নিকট হইতে চলিয়া যাইবার পর তুমি কি কি করিয়াছ সমস্ত বল—'

'সমস্তই তো বলিলাম।'

'মনে হইতেছে তুমি কিছু গোপন করিতেছ।'

'না, কিছুই তো গোপন করি নাই। তোমার ঝরনা কত দূরে?'

'এই চড়াইটা শেষ হইলেই দেখিতে পাইবে।'

'তুমি ঝরনাটা আবিষ্কার করিলে কিরূপে?'

'কাল রাত্রে শালমিটিনার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া সমস্ত রাত্রি আমি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। ঘুরিতে ঘুরিতে সহসা ঝরনার শব্দ শুনিতে পাইলাম। মনে হইল ঝরনা আমাকে যেন ডাকিতেছে। জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক ভরিয়া গিয়াছিল। মনে হইতেছিল জ্যোৎস্না কিরণের মধ্যেও যেন সেই ডাক সঞ্চারিত হইয়াছে। আমার সর্বাঙ্গে যেন ঝরনার আহ্বান জ্যোৎস্নারূপে জড়াইয়া ধরিল। আমি অভিভূতের মতো শব্দ অনুসরণ করিয়া ঝরনার কাছে উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া কি দেখিলাম জান?'

'কি—'

'দেখিলাম আমাদের কুল-দেবতা সেখানে বসিয়া আছেন। ঝরনার দুই পাশে অপরাজিতার কুঞ্জ আর তাহাতে অজস্র অপরাজিতা ফুল। দেখিলাম জ্যোৎস্নালোকে দেবতা ঘুমাইতেছেন, মনে হইল চক্ষু বুজিয়া কি যেন ভাবিতেছেন। ধবলকে মনে পড়িল। তাহাকেও

কন্যা নদীর তীরে গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নালোকে চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলাম। ভাবিতে লাগিলাম এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দেবতা আমাকে দেখা দিলেন কেন, ঝরনার অশ্রান্ত শব্দে জ্যোৎস্নাকে আকুল করিয়া আমাকেই কি তিনি ডাকিতেছিলেন? কেন! দেখিলাম তাঁহাকে ঘিরিয়া ঝরনার বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা আবর্তিত হইতেছে, প্রতিটি বুদ্বুদে জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হইয়াছে। মনে হইল, আকাশের চন্দ্র যেন লক্ষ লক্ষ রূপে নামিয়া আসিয়া আমার দেবতাকে পূজা করিতেছে। আমিও প্রণত হইলাম। তুমি যে শিরস্ত্রাণটি আমার মাথায় পরাইয়া দিয়াছিলে তাহা খুলিয়া পড়িল, দেখিলাম তাহা জলস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। আমি আর তাহা তুলিবার চেষ্টা করিলাম না। শিরস্ত্রাণ পরিয়া থাকিবার আর প্রয়োজনও তো নাই। সেইজন্য হয়তো দেবতাই উহা আমার মাথা হইতে খুলিয়া দিলেন—'

আমরা ঝরনার সমীপবর্তী হইয়াছিলাম। ঝরনা খুব বড় নয়, কিন্তু উচ্চ পর্বত শিখর হইতে নামিতেছিল বলিয়া শব্দ বেশি হইতেছিল। ঝরনাধারা যেস্থানে সমতলে নামিয়াছে তাহার আশেপাশে দেখিলাম সত্যই অনেক অপরাজিতা লতা। ফুলও অনেক ফুটিয়াছে। পর্বতগাত্রে ঝরনাধারায় দুইপাশেও অপরাজিতা দুলিতেছিল। সহসা মনে হইল এই অপরাজিতার দলই যেন পথ দেখাইয়া ঝরনাধারাকে পর্বতশিখর হইতে নামাইয়া আনিয়াছে। যতদূর দেখিতে পাইলাম, ঝরনাধারার উভয় তীরে অপরাজিতার বনই দেখিলাম। কিছুদূর গিয়া জলস্রোত দিক পরিবর্তন করিয়া পাহাড় হইতে নামিয়া গিয়াছিল। তখন জানিতাম না যে ইহাই কিছুদূরে গিয়া সরসরা নদীতে পরিণত হইয়াছে, যে সরসরা নদীর তীরে গজন্ধরের দলপতি উলম্ভন রাজত্ব করে।

'আমাকে তুমি নিজ হাতে স্নান করাইয়া দাও—'

আবদারমাখা কণ্ঠে নিনানি অনুরোধ করিল। স্নান শেষ হইলে সে বলিল—'আমার মাথায় অপরাজিতা ফুল পরাইয়া দাও।' তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিবার শক্তি আমার ছিল না।

নিনানিও আমায় মাথার কানে ফুল পরাইয়া দিল।

আমি বলিলাম—'উলম্ভনের সহিত আমাদের হয়তো যুদ্ধ বাধিবে। পাহাড়ের অপর পারে যে জাতি থাকে—যাহারা গরুর দুধ খায়—তাহাদের সহিতও উলম্ভনের যুদ্ধ বাঁধিতে পারে!'

কথাটা অন্যমনস্কভাবে বলিয়াছিলাম, বলিয়াই কিন্তু বিপদে পড়িলাম। নিনানি পর-মুহূর্তে প্রশ্ন করিল, —'তুমি কেমন করিয়া জানিলে—'

ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া সত্য কথাই বলিলাম।

'সেই মেয়েটির সহিত দেখা হইয়াছিল।'

'কোন্ মেয়েটির?'

'যে তোমাকে সেদিন রাত্রে লতা দিয়াছিল।'

নিনানির মুখটা বিবর্ণ হইয়া গেল সহসা।

'ও, কখন দেখা হইল তাহার সহিত?'

'যখন এখানে আসিতেছিলাম।'

নিনানি আমার মুখের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়াছিল, সহসা মুচকি হাসিয়া বলিল, 'মেয়েটি বেশ সুন্দর দেখিতে, নয়?'

'সুন্দর বটে, কিন্তু তোমার চেয়ে নয়।'

আজ মনে হইতেছে, সেই মুহূর্তে নিনানিকে যদি সরল সত্য কথা খুলিয়া বলিতাম, তাহা

হইলে হয়তো যাহা ঘটিয়াছিল তাহা ঘটিত না। তাহাকে অনায়াসেই বলিতে পারিতাম—'হ্যাঁ, শিলাঙ্গী খুবই সুন্দর, তাহাকে আমার খুব ভাল লাগিয়াছে। হয়তো তাহার সহিত আমার বিবাহ হইবে।' সে যুগে একথা বলা মোটেই অশোভন ছিল না। সে যুগে প্রত্যেক পুরুষই প্রকাশ্যে একাধিক রমণীর প্রণয় কামনা করিত। আমি তাহা হইলে শিলাঙ্গীর কথা গোপন করিয়াছিলাম কেন? আজ বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে পারিতেছি কারণ ছিল। সে যুগেও আমার অন্তরতম সত্তা অনুভব করিয়াছিল যে প্রেমাস্পদা একজনই হয়। যৌন-লালসায় আমি একাধিক স্ত্রীলোককে কামনা করিতে পারি কিন্তু ভালবাসিতে পারি মাত্র একজনকে। আমি নিনানির কাছে ভালবাসার ভান করিতেছিলাম, তাই তাহার কাছে শিলাঙ্গীর কথা বলিতে পারি নাই। আমার নিজের অজ্ঞাতসারেই আমি ভান করিতেছিলাম, কারণ ভালবাসার ভান না করিলে গরবিনী নিনানিকে লাভ করা সম্ভব ছিল না। নিনানি তাহার দেহ দান করিয়া বিনিময়ে ভালবাসাই চাহিয়াছিল। ভালবাসার সন্ধানেই সে পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কলঞ্জা তাহাকে লাভ করিয়াছিল প্রেমের অভিনয় করিয়াই। তাহাকে বিবাহ করিবার কিছুদিন পরে কলঞ্জার হৃদয় আমাদের দলের কাংকা নাম্নী যুবতীটির প্রতি আকৃষ্ট হয়। আকৃষ্ট হইবার পর কিন্তু কলঞ্জা বেশিদিন বাঁচিয়া থাকে নাই। সহসা একদিন তাহার মৃত্যু হয়। অনেকে সন্দেহ করে নিনানি কলঞ্জাকে বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করিয়াছে। কাংকাও বাঁচে নাই, তাহারও কিছুদিন পরে মৃত্যু হইয়াছিল। বিঘাও বলিয়াছিল কণ্টক কণ্টককে উৎপাটিত করিল। ছলনাময়ী নিনানিকে ঘিরিয়া যে রহস্যালোক আমি কল্পনায় সৃজন করিয়াছিলাম, সে রহস্যালোকে দ্বিতীয় কোনো রমণীর অস্তিত্ব আমি কল্পনা করিতে পারি নাই। শিলাঙ্গীর কথা তাই তাহার নিকট হইতে সযত্নে গোপন করিয়াছিলাম।

নিনানি আমার দিকে চাহিয়া ওষ্ঠভঙ্গি সহকারে বলিল, 'তুমি তো আমার চেয়ে সুন্দর কাহাকেও দেখ না, কিন্তু আমি যদি মরিয়া যাই?'

'ও কথা বলিও না।'

'আমি তো মরিয়াই গিয়াছি। তুমি নিজেই তো আমার মৃত্যু-সংবাদ প্রচার করিয়াছ।'

নিনানির চোখের দৃষ্টিতে একটা সকৌতুক ভয় পরিস্ফুট হইল। দেখিলাম মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হওয়াতে সে কৌতুকান্বিত হইয়াছে, ভীতও হইয়াছে। মৃত্যুকে লইয়া মিথ্যা রসিকতা করিতে আমরা ভয় পাইতাম তখন। নিনানি অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিল বলিয়াই কৌতুকও অনুভব করিতে পারিয়াছিল। তাহার এইসব গুণের জন্যই সে সকলকে আকৃষ্ট করিত।

'ওসব কথা ছাড়িয়া দাও। চল এবার ফেরা যাক। তুমি নিশ্চয় যক্ষিণীর কাছে ফিরিবে। বেচারীকে কাকের দল আবার হয়তো বিরক্ত করিতেছে!'

'হ্যাঁ, চল। ময়াল সাপটার জন্য কয়েকটা খরগোসও ধরিয়া রাখিয়াছি। সেগুলোকে লইয়া যাইতে হইবে।'

'কোথায় খরগোস?'

'ঝোপের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।'

সহসা আমি কয়েকটা পদচিহ্ন দেখিতে পাইলাম। মনুষ্য পদচিহ্ন। মনে হইল একাধিক মনুষ্যের। কারণ কয়েকটা চিহ্ন বড় বড়, কয়েকটা ছোট ছোট।

'এসব পদচিহ্ন কাহার?'

নিনানির চোখের দৃষ্টি হইতে হাস্য বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল।

'কাল রাত্রে গজন্ধর এখানে আসিয়াছিল। আমি যখন ঝোপের মধ্যে খরগোসের ফাঁদ পাতিতেছিলাম তখন দেখি বিরাট প্রেতের মতো সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—'

'বল কি! সে তোমাকে দেখিতে পাইয়াছিল?'

'আমি নিজেই আগাইয়া গিয়া তাহার সহিত আলাপ করিয়াছি।'

'তাই নাকি, এতক্ষণ তো এসব কথা বল নাই।'

মুচকি হাসিয়া নিনানি উত্তর দিল—'সব কথা কি সবসময় বলিতে আছে? আলাপ করিয়া দেখিলাম, গজন্ধর লোক ভাল—'

'এখানে সে কি করিতে আসিয়াছিল?'

'এখানে আসিয়াছিল পাথরের খোঁজে। তাহাদের দেশে নাকি পাথরের বড় বড় মন্দির হইতেছে—'

'তোমাকে দেখিয়া কি বলিল?'

'খুব ভাল কথাই বলিয়াছে।'

'কি?'

নিনানি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। আমরা দুইজনে পাশাপাশি হাঁটিতেছিলাম। কিছুক্ষণ নীরবে পথ অতিবাহন করিবার পর নিনানি বলিল—'যাহা বলিব তাহা আর কাহাকেও বলিও না। শুনিয়া তুমি বিচলিত হইবে না তো?'

'শুনিই না।'

''আমাকে দেখিয়া গজন্ধরও কম বিস্মিত হয় নাই। ভয়ও পাইয়াছিল। ভাবিয়াছিল কোনো প্রেতিনী বোধ হয়। চিনিতে পারিবামাত্র কিন্তু হাসিমুখে আগাইয়া আসিল। বলিল—'ধবলের প্রিয়তমা পত্নী এত রাত্রে এখানে কি করিতেছ?' আমি উত্তর দিলাম, 'স্বামীর মঙ্গলের জন্য আমি উন্নগার পূজা করিতে আসিয়াছি, প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি বিপদের সময় ধবল যেন উন্নগার মতো ধৈর্যশীল ও শক্তিশালী হয়। ধবল কোথায়, সে কি ফিরিয়া আসিয়াছে?' গজন্ধর বলিল—'ধবলের ফিরিতে এখনও কিছুদিন বিলম্ব আছে। আমার অনুচরেরা তাহাকে উলম্ভনের নিকট লইয়া গিয়াছে। উলম্ভনের সহিত আলাপ শেষ হইলে ধবল ফিরিবে। তাহার জন্য তোমার চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই।' এই কথাগুলি বলিয়া গজন্ধর খানিকক্ষণ নীরব রহিল তাহার পর আবার বলিল, 'যদি তুমি রাগ না কর একটা কথা বলি।' আমি বলিলাম—'কথাটা না শুনিয়াই কি করিয়া বলিব যে, রাগ করিব কিনা।' গজন্ধর তখন এক কাণ্ড করিয়া ফেলিল। সহসা আগাইয়া আসিয়া আমার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িল। বলিল, 'ধবলের মতো দুর্বল ভীরু বৃদ্ধ তোমার উপযুক্ত স্বামী নয়। সে দলপতি বলিয়াই বোধ হয় তোমাকে দখল করিয়া রাখিয়াছে। তুমি আমাদের দেশে চল। উলম্ভন তোমাকে মাথায় করিয়া রাখিবে। উলম্ভন তোমাকে এ প্রদেশের রানি করিয়া দিবে। যে তিনশত রমণী তাহাকে পতিত্ব বরণ করিয়াছে, তাহারা তোমারই দাসী হইবে। তুমি যদি সম্মত হও, এখনই তোমাকে আমি স্কন্ধে করিয়া তুলিয়া লইয়া যাইব। আমার অকপট বিশ্বাসই তোমার নিকট ব্যক্ত করিতেছি। তুমি অপূর্ব রূপসী, তুমি সুলক্ষণা, তুমি যে পুরুষের নিকট থাকিবে তাহার সৌভাগ্য বর্ধিত হইবে। ধবল তোমার উপযুক্ত নয়, তুমি উলম্ভনের কাছে চল।' এই কথাগুলি বলিয়া গজন্ধর আমার মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

আমি উত্তর দিলাম—'তোমার স্পর্ধা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইতেছি। এ বিষয়ে আমি তোমার সহিত আর অধিক বাকবিতণ্ডা করিতে চাহি না। তোমাকে অনুরোধ করিতেছি তুমি ওই অসঙ্গত প্রস্তাব আর উত্থাপন করিও না। তুমি কি এই কথা বলিবার জন্যই আবার ফিরিয়া আসিয়াছ?' গজন্ধর বলিল, 'একথা বলিবার জন্য একদিন তোমার নিকট আসিব ঠিক করিয়াছিলাম, এখন আসিয়াছি প্রস্তরের সন্ধানে, ভাগ্যক্রমে তোমার দেখা পাইয়া গেলাম।' তাহার পর গজন্ধর সাড়ম্বরে বর্ণনা করিতে লাগিল প্রস্তর দিয়া উলন্তন কেমন বড় বড় সমাধি-গৃহ বড় বড় মন্দির প্রস্তুত করাইতেছে। ধবলের মুখে তোমরা যাহা শুনিয়াছ, গজন্ধরের মুখে আমিও তাহাই শুনিলাম।''

এই পর্যন্ত বলিয়া নিনানি চুপ করিয়া গেল।

আমি আবার প্রশ্ন করিলাম—'বড় বড় পায়ের দাগগুলি গজন্ধরের। কিন্তু ছোট ছোট পায়ের দাগগুলি কাহার?'

'ওগুলি আমার। গজন্ধর আর এক কাণ্ড করিয়াছিল।'

'কি?'

'আমি যখন কিছুতেই তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না তখন সে বলপ্রকাশ করিয়াছিল, হঠাৎ আমাকে জাপটাইয়া ধরিয়াছিল।'

'বল কি। তাহার পর?'

নিনানি হাসিতে লাগিল। তাহার তীক্ষ্ণ দন্তগুলি সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দন্তগুলি আরও বিকশিত করিয়া সে বলিল, 'আমার এই দন্তের সাহায্যে আমি আত্মরক্ষা করিয়াছি। গজন্ধরকে রক্তাক্ত হইয়া পলায়ন করিতে হইয়াছে।'

নিনানির চোখে, মুখে, আলুলায়িত কেশপাশে, নগ্নদেহের বন্যশ্রীতে ক্ষণিকের জন্য যাহা প্রতিভাত হইয়া উঠিল তাহা ভয়ঙ্কর। মনে হইল কোনো পুরুষের শৌর্যই তাহাকে পরাভূত করিতে পারিবে না। এই মূর্তি যে কোনো পুরুষকে দুর্বল করিয়া ফেলিবে। পরমুহূর্তেই কিন্তু তাহার রূপান্তর ঘটিল। আমার কটি-বেষ্টন করিয়া কোমলকণ্ঠে সে কহিল—'আমি বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি জংলা। আমার ঘুম পাইতেছে। আমি আর চলিতে পারিতেছি না।'

আমি আবার তাহাকে বুকে তুলিয়া লইলাম। সে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আমার স্কন্ধের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতে লাগিল। একটু পরেই কিন্তু সে নামিয়া পড়িল আবার।

'ঝোপের মধ্যে খরগোসগুলাকে রাখিয়া আসিয়াছি। অন্য কোনো জানোয়ার আসিয়া আবার লইয়া না যায়। গর্তের মধ্যে রাখিয়াছি অবশ্য, কিন্তু শৃগালগুলো বড় চতুর—'

দ্রুতপদে সে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। কে বলিবে একটু আগে সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল!

খরগোসগুলি লইয়া কিছুক্ষণ পরেই আমরা যক্ষিণীর গুহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম গুহার মুখ বন্ধ। কাকের দল উড়িয়া গিয়াছে। হরিণ-কঙ্কালটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া যক্ষিণী ঘুমাইতেছিল, নিনানি চুপি চুপি বলিল—'এখন উহার ঘুম ভাঙাইবার প্রয়োজন নাই। ময়াল সাপটাকে খরগোসগুলো দিয়া চল আমরা আমাদের গুহায় যাই।'

ময়াল সাপের গুহায় উঁকি দিয়া দেখিলাম সে আর কুণ্ডলী পাকাইয়া নাই, দেহ বিস্তর করিয়াছে এবং আগড়টাকে ঠেলিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের দেখিয়া তাহার চক্ষু দুইটিতে একটা হিংস্র দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। নিনানি ছয়টি খরগোস আনিয়াছিল। তিনটি খরগোসকে আমরা গুহার মধ্যে ছুঁড়িয়া দিলাম। বাকি তিনটিকে নিনানি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিল।

'চল এবার যাওয়া যাক—'

...নিনানির গুহার ভিতর খড় বিছাইয়া আমরা শয্যা রচনা করিয়াছিলাম। তাহার উপরেই পাশাপাশি শুইয়াছিলাম দুইজনে। নিনানি আমাকে দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া আমার কর্ণমূলে গুঞ্জন করিতেছিল, 'আমাকে তুমি ছাড়িয়া যাইও না জংলা। দেখ, আমি তোমার জন্য সব ছাড়িয়াছি। গজন্ধরের প্রলোভনপূর্ণ প্রস্তাবও উপেক্ষা করিয়াছি তোমারই জন্য। তুমি আমাকে ছাড়িবে না তো?

বলিলাম—'না—'

শিলাঙ্গীর মুখটা সঙ্গে সঙ্গে মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। সত্য কথাটা কিন্তু কিছুতেই বলিতে পারিলাম না। শিলাঙ্গী যে আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে এ কথাটা আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না বটে, কিন্তু নিনানিকে দেখিয়া কে বা কাহারা আকৃষ্ট হইয়াছে তাহা বলিতে নিনানির তো একবারও বাধিতেছিল না। তাহা লইয়া সে বরং আস্ফালনই করিতেছিল। ভাবটা যেন—'দেখ, ইহারা সকলেই আমাকে চায়, কিন্তু আমি তোমার জন্য ইহাদের প্রত্যাখ্যান করিয়াছি।' আমিও তো বলিতে পারিতাম—'দেখ শিলাঙ্গী আমাকে চায় কিন্তু আমি তাহাকে ছাড়িয়া তোমার কাছে আসিয়াছি। কিন্তু আমি এ কথা বলিতে পারি নাই। বলিতে পারি নাই কারণ তাহা সত্য নহে। সত্যই আমি শিলাঙ্গীকে ত্যাগ করিয়া নিনানির কাছে আসি নাই। নিনানি কি সত্য কথা বলিতেছিল? তাহার পরবর্তী আচরণ দেখিয়া আমারও পরে সন্দেহ হইয়াছিল যে, নিনানি মিথ্যাবাদিনী। আজ কিন্তু আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি। আজ বুঝিয়াছি যে নিনানি একান্তভাবে আমাকেই চাহিয়াছিল। আমাকে পাইবার জন্যই সে কখনও কোমলা কখনও নিষ্ঠুরা হইতেছিল। আমি তাহার আন্তরিকতা অনুভবও করিয়াছিলাম, কিন্তু লোভের বশবর্তী হইয়া তাহার সম্পূর্ণ মূল্য দিতে পারি নাই। নিনানি কেবল আমাকেই চাহিয়াছিল, বহু-বল্লভ-প্রার্থিতা সে একমাত্র আমাকেই নির্বাচন করিয়াছিল, আমাকে পাইবার জন্য সে নিজেকে নির্যাতিত নিপীড়িত করিয়াছিল। আমিও তাহাকে চাহিয়াছিলাম কিন্তু আমি শিলাঙ্গীকেও চাহিয়াছিলাম। শিলাঙ্গীও আমাকে কম মুগ্ধ করে নাই। শিলাঙ্গীর উল্লেখ নিনানি সহ্য করিতে পারিবে না আমি জানিতাম, তাই সত্য গোপন করিতে হইতেছিল। নিনানির সে প্রয়োজন ছিল না, শিলাঙ্গীরও ছিল না।

'আমি এবার যাই, অনেকক্ষণ বাহির হইয়াছি। সকলে হয়তো আমাকে খুঁজিতেছে। খনিত্র পূজায় আমি অনুপস্থিত থাকিলে ইলচি দুঃখিত হইবে।'

আমরা উভয়েই হাসিয়া উঠিলাম। ধবলের প্রবীণা পত্নী ইলচিরও আমার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দুর্বলতা ছিল। সুযোগ পাইলেই সে আমার ঘরে আসিয়া আমাকে খাওয়াইত, আমার পরিচর্যা করিত।

নিনানি বলিল, 'তুমি যাইবার সময় ওই খনিত্রটিকে লইয়া যাও, আমি যেটির পূজা করিয়াছি, তুমি গিয়া ইলচিকে বলিও যে, আমি উন্নগা পর্বত হইতে এই খনিত্রটি মূষিকরক্ত মাখাইয়া আনিয়াছি, তোমরা এইটির পূজা কর। মূষিক খুঁজিতেছিলাম বলিয়াই এত দেরি হইয়াছে।'

'কিন্তু নিয়ম যে অন্যরকম। মেয়েরা নিজের হাতে মূষিক ধরিয়া—'

অধীরভাবে নিনানি বলিল—'তাহা জানি। কিন্তু আমি চাই যে খনিত্রটি আমি পূজা করিয়াছি ইলচি সেইটিরই পূজা করুক। আমি যদি থাকিতাম নিম্ন-সম্প্রদায়েরই সমস্ত নারী

আসিয়া আমার খনিত্রকে পূজা করিত, এমন কি ইলচিও। ধবলের প্রিয়তমা পত্নীর খনিত্রকে অবহেলা করিবার সাহস কাহারও হইত না। আমার ইচ্ছা এবারও আমার খনিত্র যেন অবহেলিত না হয়। তুমি ওটিকে লইয়া যাও। হয়তো আগামীবারে আমি আর খনিত্র পূজা করিতে পাইব না—'

কথাটা বলিয়াই নিনানি থামিয়া গেল। আমার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল—'আচ্ছা, কানা তো আমার কিছু করিল না। আমি তাহার আদেশ অমান্য কবিলাম কিন্তু আমাকে কোনো শাস্তিই তো সে দিল না। সকলে জানে কানার আদেশ অমান্য করিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয়, কেহই তাহা রোধ করিতে পারে না। কিন্তু আমার তো কিছুই হইল না—'

যে সন্দেহ আমি মনে মনে পোষণ করিতেছিলাম, যাহার জন্য আমি নিনানিকে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার মৃত্যু-সংবাদ রটনা করিয়াছিলাম নিনানির কথায় তাহা যেন দৃঢ়তর হইল।

বলিলাম, 'আমার বিশ্বাস তোমার কিছুই হইবে না, কারণ মূর্ছিত বিঘাওয়ের মুখ হইতে যে সব কথা আমরা সেদিন শুনিয়াছিলাম তাহা কানার আদেশ নয়, তাহা বিঘাওয়ের আদেশ। বিঘাও তোমাকে শাস্তি দিয়াছে, কারণ বিঘাওয়ের বাসনা তুমি চরিতার্থ কব নাই।'

নিনানির চোখের দৃষ্টি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমার কথার তৎপর্য যে তাহার মর্ম স্পর্শ করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম। ছলনাময়ী মুখে কিন্তু বলিল, 'না, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা ঠিক নয়। বিঘাও শক্তিশালী লোক। তাহার অনেক ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়া গিযাছে। মনে নাই সে বলিয়াছিল যে, অন্ধকারের সহিত মিশিয়া নিম্ব-সম্প্রদায়ের সর্বনাশ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে? উলম্ভন যদি নিম্ব-সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে তাহা হইলে তাহার কথা ঠিক ফলিয়া যাইবে। কানা কবে কি ভাবে আমাকে শাস্তি দিবে তাহা কে বলিতে পারে! না, না, বিঘাওকে অমনভাবে অবিশ্বাস করিও না, তাহা হইলে হয়তো আমাদের আরও অমঙ্গল হইবে—'

নিনানি শিহরিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমি বলিলাম—'যদি ফিরিয়া গিয়া দেখি যে সত্যই উলম্ভনের সহিত যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে, অবিলম্বে আমাকে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে তখন তুমি কি করিবে?'

'আমি ওই দেবদারু বৃক্ষের নীচে আগুন জ্বালাইয়া যুদ্ধের নাচ নাচিব। ওই দেবদারু বৃক্ষকে উলম্ভন কল্পনা করিয়া তাহার বুকে তীর হানিব, অগ্নিদেবতার নিকট প্রার্থনা করিব ধবল যেন জয়ী হয়—'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'কিন্তু প্রার্থনা করিবার পূর্বে অগ্নিদেবতাকে তোমার প্রণয়ীর নামগুলি উপহার দিতে হইবে তাহা মনে আছে তো?'

'আছে বই কি। এই দেখ—নামের মালা আমি গাঁথিয়া রাখিয়াছি, এইটিই আমি অগ্নিকে উপহার দিব—'

নিনানি যে কড়ির মালাটি পরিত সেইটিই তুলিয়া দেখাইল।

হাসিয়া বলিল—'জীবনে আমার যতগুলি প্রণয়ী জুটিয়াছে প্রত্যেকের নামে এক একটি কড়ি গাঁথিয়া রাখিয়াছি। অগ্নিদেবতাকে এইটিই সমর্পণ করিয়া দিয়া বলিব—ইহারা আমাকে ভালবাসিয়াছিল, ইহাদের স্মৃতি তোমার কাছে গচ্ছিত রাখিতেছি। এই স্মৃতিগুলিই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ, এইগুলি তোমাকে দিতেছি, ইহার বিনিময়ে হে দেবতা, তুমি ধবলকে জয়ী কর। আমাকে কিন্তু আরও কিছু কড়ি আনিয়া দিও, আর একটা মালা গাঁথিয়া রাখিব—'

পাথরের সূচ দিয়া মেয়েরা সেকালে কড়ির মালা, ঝিনুকের মালা গাঁথিত। সূত্রের পরিবর্তে ব্যবহার করিত লতা বা পশুর অন্ত্র।

'কড়ি কোথায় পাইব?'

নিনানির চক্ষু দুইটি আবার হাসিতে লাগিল।

'পাহাড়ের কাছে যে বড় নিমগাছটি আছে, তাহারই তলায় খুঁড়িয়া দেখিও, সেখানে কিছু কড়ি আমি লুকাইয়া রাখিয়াছি।'

'তুমি কড়ি কোথায় পাইলে?'

নিনানি আমার দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

'সত্য কথা যদি বলি রাগ করিবে না তো?'

'না—'

'বিঘাও দিয়াছিল। মীংরাও দিয়াছিল কিছু। কড়িগুলি আমাকে আনিয়া দিও তুমি।'

'আচ্ছা।'

'তুমি আবার কখন ফিরিবে?'

'যত শীঘ্র পারি।'

'অনর্থক দেরি করিও না। তুমি কাছে না থাকিলে একটুও ভাল লাগে না। আমার মৃত্যু-সংবাদ রটাইয়া দিয়া তুমি জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছ। তাহা না হইলে তোমার সঙ্গে ফিরিয়া যাইতাম। এভাবে কতদিন থাকিব? সত্যই যদি আমার মৃত্যু না হয়, সত্যই যদি কানা আমাকে ক্ষমা করে তাহা হইলে এই গুহাতেই চিরকাল বাস করিব নাকি?'

'করিলেই বা ক্ষতি কি। তুমি আবার একা হইয়া থাকিবে।'

'না, একা আমি বেশিদিন থাকিতে পারিব না। কোনও বুদ্ধি করিয়া তুমি আবার আমাকে বাঁচাইয়া দাও, আমি আবার ফিবিয়া যাই।'

'যক্ষিণীর কি দশা হইবে?'

'আমি যদি ফিরিয়া যাই যক্ষিণীকেও লইয়া যাইব। ধবল আপত্তি করিবে না।'

'দেখি এখন ওদিকের অবস্থা কি রকম। তাহার পর যেমন বুঝি ব্যবস্থা করিব।'

...ফিরিয়া দেখিলাম ধবল কন্যা নদীর তীরে লম্বা হইয়া শুইয়া রহিয়াছে। তাহার মুণ্ডটা জলের দিকে। চক্ষু দুইটি নিমীলিত। মনে হইল নিবিষ্টচিত্তে সে কন্যা নদীর ভাষা শুনিতেছে। কন্যা নদীতে পুষ্পগুচ্ছ ভাসিয়া চলিয়াছে। ধবলের কাছে কেহ নাই। নদীর বাঁকে একাই সে শুইয়া আছে। আমার বর্ণনা অনুসারে এখানেই নিনানির মৃত্যু হইয়াছিল। দূরে ক্ষেতের ভিতর মেয়েরা কাজ করিতেছে দেখিতে পাইলাম। নীরবেই কাজ করিতেছে। কোথাও কোনো কলরব নাই। এমন কি, শিশুদেরও গোলমাল নাই। সকলেই নিজ নিজ কুটিরের ভিতর ঢুকিয়াছে। একটা অজ্ঞাত ভয়ে চারিদিক যেন থমথম করিতেছে। আমি নীরবে ধবলের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলাম। ধবলের কিন্তু কোনো ভাবান্তরই লক্ষ্য করিলাম না। মনে হইল। সে যেন কন্যা নদীর কলকলধ্বনিতে নিজেকে নিমগ্ন করিয়া দিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, তাহার ঠোঁট দুইটি নড়িতেছে, কিন্তু কোনো কথা শোনা যাইতেছে না। মনে হইল, নীরব ভাষায় সে যেন কাহারও সহিত কথা কহিতেছে। সহসা সে চক্ষু মেলিয়া চাহিল। তাহার পর আমাকে দেখিতে পাইয়া উঠিয়া বসিল।

'জংলা, তুমি কতক্ষণ এখানে বসিয়া আছ?'

'অনেকক্ষণ—'

'খনিত্র পূজার সময় তুমি কোথায় ছিলে, সকলেই তোমাকে খুঁজিতেছিল।'

'আমি ইঁদুরের সন্ধানে উন্নগা পাহাড়ে উঠিয়াছিলাম। ইঁদুর-রক্ত মাখাইয়া একটি খনিত্র প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি, ইলচিকে পূজা করিবার জন্য দিব।'

নিনানির সেই রক্তমাখা শাখাটি সঙ্গে আনিয়াছিলাম। সেটি ধবলকে দেখাইলাম।

ধবল সেটির দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, আমার মনে হইল সে যেন অন্য কিছু ভাবিতেছে। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কিছু একটা বলিতে হয় বলিয়াই সে যেন বলিল, 'চমৎকার হইয়াছে। ইলচিকেই দিও। সে তোমাকে খুঁজিতেছিল।'

তাহার পর সে আবার নীরব হইয়া গেল। আমিও নীরবে বসিয়া রহিলাম।

'ঘিসু বা ভংগার কোনো খবর কি পাওয়া গিয়াছে'—কিছুক্ষণ পরে আমি প্রশ্ন করিলাম।

'ভংগা ফিরিয়াছে, ঘিসু ফেরে নাই। ঘিসুর মৃত্যু হইয়াছে। সেই অরণ্যে গজন্ধরের অনুচরেরা ঘিসু ও ভংগাকে পুনরায় বন্দী করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ঘিসু যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ দিয়াছে। ভংগা আহত হইয় ফিরিয়া আসিয়াছে। ভংগা বলিতেছে উলন্ডনের দল যে কোনো মুহূর্তে আমাদের আক্রমণ করিতে পারে। সে আরও বলিতেছে যে তাহাদের আক্রমণের জন্য অপেক্ষা না করিয়া আমাদেরই গিয়া তাহাদের আক্রমণ করা উচিত। তাহারা যখন ঘিসুকে হত্যা করিয়াছে তখন সে অধিকার আমাদের অবশ্যই হইয়াছে। আমি এতক্ষণ কন্যা নদীর নির্দেশ শুনিবার জন্য কান পাতিয়াছিলাম। নির্দেশ পাইয়াছি' এই পর্যন্ত বলিয়া ধবল চুপ করিল এবং অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

'কন্যা নদী কি নির্দেশ দিল?'

'কন্যা যাহা বলিল তাহা গভীর অর্থপূর্ণ। কন্যা বলিল, মূল্য না দিলে কোনো কিছুই পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। তোমরা নিনানির সম্যক মূল্য দাও নাই তাই নিনানি তোমাদের ছাড়িয়া গিয়াছে। যে জমি তোমরা ভোগদখল করিতেছ তাহারও মূল্য দিতে হইবে। মূল্য না দিলে তাহা তোমাদের থাকিবে না, থাকিলেও তাহা তোমাদের ফসল দিবে না। বিনামূল্যে কিছুই পাওয়া যায় না। আমি কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ধরনের মূল্য দিতে হইবে। কন্যা তাহার ছল ছল কলকলধ্বনিতে কি যে উত্তর দিতে লাগিল প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। অনেকক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে কান পাতিয়া রহিলাম, তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার. অর্থ বুঝিতে পারিলাম; শুনিলাম, কন্যা বলিতেছে—যাহা তোমার প্রিয়তম মূল্যস্বরূপ তাহাই তোমাকে দিতে হইবে। প্রাণ দিতে হইবে, কারণ প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়তম মানুষের আর কিছু নাই। যাহা চাও তাহার জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত হও তবেই তাহা পাইবে। পাহাড় সমুদ্রকে কামনা করিয়াছিল, আমি তাহারই ফল। আমি জল-ধারা নই, আমি পাহাড়ের বুকের রক্তধারা, আমিই তাহার প্রাণ। আমাকে সে ত্যাগ করিয়াছে, আমাকে সে বিলাইয়া দিয়াছে তাই আমিই তাহাকে সমুদ্রের সহিত যুক্ত করিয়াছি। তোমাদের প্রাণ দিতে হইবে, রক্ত দিতে হইবে। কন্যার কলকলধ্বনিতে আমি ইহাই শুনিলাম।'

'তাহা হইলে আমাদের কি যুদ্ধই করিতে হইবে?'

'যুদ্ধই করিতে হইবে।'

'আমরাই প্রথমে আক্রমণ করিব?'

'ভংগা তাহাই বলিতেছে। কিন্তু আমি ভাবিতেছি যুদ্ধ করিবার মতো অস্ত্রশস্ত্র আমাদের তো প্রচুর নাই। সমর্থ পুরুষের সংখ্যাও আমাদের দলে বেশি নাই। আমরা সকলে যদি যুদ্ধে চলিয়া যাই আমাদের ক্ষেতের ফসল নষ্ট হইয়া যাইবে, এমনিই তো ফসল খুব বেশি হয় নাই।'

আমি তখন বলিলাম—'উন্নগা পর্বতের অপর পারে কিছুদিন হইতে একটা নূতন সম্প্রদায় আসিয়া বসবাস করিতেছে। তাহারা গোদুগ্ধ পান করে। একদল বন্য গরুকে ঘিরিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধান করিয়া তাহারা বন হইতে বনান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদের দলের একটি মেয়ের সহিত আজ আমার দেখা হইয়াছিল। শুনিলাম, গজন্ধর তাহাদের দলেও হানা দিয়াছে। হয়তো তাহাদের সহিতও উলম্ভনের যুদ্ধ বাধিবে। সেই মেয়েটি বলিতেছিল, আমাদের মধ্যে কেহ গিয়া যদি তাহাদের দলপতি রোহার সহিত দেখা করিয়া এ বিষয়ে আলাপ করে রোহা হয়তো আমাদের সহিত যোগদান করিবে। আমরা উভয় সম্প্রদায় যদি সম্মিলিত হই তাহা হইলে উলম্ভনকে এখনই আমরা আক্রমণ করিতে পারি।'

ধবল সবিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

'তাহারা গোদুগ্ধ পান করে? কি করিয়া?'

শিলাঙ্গীর নিকট যাহা শুনিয়াছিলাম ধবলকে বলিলাম। ধবল আরও বিস্মিত হইল। তাহার পর বলিল, 'তাহাদের সহিত মিত্রতা করা কি সম্ভব? গরু তৃণভোজী, আমরাও তৃণভোজন করিয়া থাকি। সে হিসাবে গরু আমাদের শত্রু। সেই গরু যাহারা পালন করে তাহাদের সহিত মিত্রতা হইবে কিরূপে?'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

ধবল বলিল—'তাছাড়া তাহাদের নিকট এ প্রস্তাব লইয়া যাইবে কে?'

'আমি যাইতে পারি।'

'যে মেয়েটির সহিত তোমার আলাপ হইয়াছে তাহার সহিত ওই সম্প্রদায়ের সম্পর্ক কি?'

'সে দলপতি রোহার কন্যা।'

'বিবাহিতা?'

'না।'

'বিবাহযোগ্যা?'

'হাঁ।'

ধবল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, 'যুবতী দেখিয়া আকৃষ্ট হওয়া পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তুমি যুবক তোমার পক্ষে আরও স্বাভাবিক। কিন্তু একটি কথা মনে রাখিও, যাহা স্বাভাবিক তাহাই নিরাপদ নয়। বজ্র স্বাভাবিক, সর্পও স্বাভাবিক, ঝঞ্ঝা, বন্যা ইহারাও স্বাভাবিক কিন্তু ইহারা সব সময় নিরাপদ নয়। ইহাদের রূপ ধরিয়া অনেক সময় দেবতার রোষ আত্মপ্রকাশ করে, ক্ষুব্ধ প্রেতাত্মারা অনেক সময় ইহাদের রূপ ধরিয়া আমাদের শাস্তি দেয়। সুতরাং স্বাভাবিক বাসনার স্রোতে অবগাহন করিবার পূর্বে চিন্তা করিয়া রাখা উচিত তাহা নিরাপদ হইবে কিনা, তাহা কোনো দেবতার বা অপদেবতার বিশেষ ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে কিনা।'

আমি বলিলাম—'আমি সমস্তই অকপটে বলিয়াছি। তোমরা আমাকে যেরূপ নির্দেশ দিবে সেইরূপই আমি করিব। তবে আমার মনে হয়, রোহার সহিত আলাপ করিলে বিপদের

কোনো সম্ভাবনা নাই। ওই মেয়েটিকেও দেবতার ছদ্মবেশী রোষ বলিয়া মনে হয় না আমার। মেয়েটি খুবই সরল—'

ধবল বলিল—'চল ভংগাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাক সে কি বলে। একাধিক লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া অগ্রসর হওয়াই ভাল।'

ভংগার পরামর্শ দিবার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না। পৃষ্ঠের কয়েকটি নিদারুণ ক্ষত তাহাকে কাতব করিয়াছিল। নিজের কুটিরে চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল সে, তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল তাহার পত্নীরা। সকলেই নিমপাতা চিবাইতেছিল। সেই চিবানো নিমপাতাগুলি লইয়া ভংগার প্রবীণা পত্নী সাংরা ক্ষতের উপর প্রলেপ দিতেছিল।

ধবলের কথা শুনিয়া ভংগা আর্তনাদ করিয়া শুধু একটি বাক্যই বলিল—'প্রতিশোধ চাই—'

ভংগার পত্নীরাও চিৎকার করিয়া উঠিল, 'প্রতিশোধ চাই—'

ঘিসুর পত্নীদের মধ্যেও কয়েকজন ভংগার নিকটে বসিয়াছিল, তাহারাও বলিল, 'প্রতিশোধ চাই—'

বিব্রত ধবল ভংগার কুটির হইতে বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা হইল ইলচির সঙ্গে।

ইলচি ধবলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'আমার মনে হয় তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। তুমি নিজের বুদ্ধিতে আমাদের এখন চালিত করিতে চাহিও না। তুমি বিঘাওয়ের পরামর্শ লও। সে যাহা করিতে বলে তাহাই কর।'

ধবল চকিতে আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কবিল। তাহার পর বলিল, 'বেশ তাহাই হইবে। জংলা পাহাড় হইতে তোমার জন্য এই খনিত্রটি মূষিক-রক্ত মাখাইয়া আনিয়াছে। তাহার ইচ্ছা তুমি ইহার পূজা কর—'

'তাই নাকি, তাই নাকি!'

বৃদ্ধা ইলচি যেন বিগলিত হইযা গেল। তাড়াতাড়ি আসিয়া আমার হাত হইতে শাখাটি লইয়া বলিল—'আজ সকাল হইতে আমার কেবলই জংলার কথা মনে হইতেছিল, কেবলই ভাবিতেছিলাম, আমাব জংলা কোথায় গেল। জংলা যে আমার জন্য পাহাড়ে গিয়াছে তাহা কি জানিতাম—'

ইলচি আমার থুতনিতে হাত দিয়া আদর করিতে লাগিল।

...বিঘাও তখনও সেই বাঘের থাবাটি হাতে করিয়া বসিয়াছিল। দেখিলাম সেটির সাহায্যে সে মাছি মারিতেছে। মাছি তাহাকে বড় জ্বালাতন করিত। পায়ের ক্ষতগুলি সর্বদাই সে চামড়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিত তবু তাহাকে ঘিরিয়া একদল মাছি ভনভন করিত সর্বদা। অন্যান্য দিন সে গাছের পত্রসমেত ছোট একটা ডাল ভাঙিয়া কাছে রাখিত এবং তাহা দিয়া মাছি তাড়াইত। সেদিন দেখিলাম বাঘের থাবা দিয়া মাছি মারিতেছে। মৃত মক্ষিকাগুলিকে সে কোথাও বৃত্তাকারে, কোথাও ত্রিভুজাকারে সাজাইয়া রাখিয়াছিল। পিপীলিকার দলও আসিয়া জুটিয়াছিল প্রচুর। তাহারা বিঘাওয়ের বৃত্ত এবং ত্রিভুজ নষ্ট করিয়া মৃত মক্ষিকাগুলিকে টানিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। বিঘাও তাহাদের বাধা দিতেছিল না, পুনরায় নূতন মাছি মারিয়া বৃত্ত এবং ত্রিভুজ গঠন করিতেছিল। ধবল এবং আমি যখন তাহার নিকট গেলাম তখন সে একবার মাত্র আমাদের দিকে চাহিয়া দেখিয়া পুনরায় বৃত্তগঠনে মন দিল। আমরা উভয়েই অদূরে উপবেশন করিলাম। বিঘাও আর একবার আমাদের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কোনো কথা বলিল না। লক্ষ্য করিলাম, তাহাব নাসিকাগ্র কম্পিত হইতেছে। কিছুক্ষণ নীরবতার পর ধবলই কথা কহিল। বলিল, 'বিঘাও,

আমাদের এই বিপদের সময় তোমার উপদেশ প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। মীংরা যখন তোমাকে আমাদের মধ্যে আনিয়া দিয়াছিল তখন বলিয়াছিল যে, তুমি একজন শক্তিশালী ব্যক্তি, বলিয়াছিল যে আমাদের বিপদের সময় তুমি সাহায্য করিবে। আজ বিপদে পড়িয়া তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। উলম্ভনের সহিত আমাদের যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। জংলা বলিতেছে যে, উন্নগা পর্বতের অপর পারে একটি গো-পালক সম্প্রদায় আসিয়া বসবাস করিতেছে। তাহারা নাকি গো-দুগ্ধ-পায়ী। তাহাদের সহিতও উলম্ভনের বিবাদ বাধিয়াছে। হয়তো যুদ্ধও বাধিবে। জংলা বলিতেছে যে আমরা যদি তাহাদের সহিত সম্মিলিত হই তাহা হইলে সুবিধা হইবে। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র কম। আমাদের লোকেরা এখনও কোনো বৃহৎ প্রস্তরখনি আবিষ্কার করিয়া দখল করিতে পারে নাই। প্রস্তর খনির সন্ধানে যাহারা বাহির হইয়াছে তাহারাও এখনও ফিরিয়া আসে নাই। সুতরাং ইদানীং নূতন কোনো প্রস্তরের অস্ত্রই আমরা প্রস্তুত করিতে পারি নাই, পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র লইয়াই চালাইতেছি। খঞ্জনদের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া কিছু অস্ত্র আমাদের নষ্টও হইয়াছে। আমাদের লোকবলও কম। সুতরাং ইহাদের সহিত সম্মিলিত হইতে পারিলে আমাদের লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। আমাদের এই প্রস্তাব লইয়া জংলা উহাদের দলপতি রোহার নিকট যাইতেও প্রস্তুত আছে। কিন্তু আমার একটা ভয় হইতেছে। উহারা গো-পালক আমরা তৃণ-পালক। তৃণের সহিত গরুর ভক্ষ্য-ভক্ষক সম্পর্ক। সেইজন্য আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, উহাদের সহিত আমাদের বন্ধুত্ব নিরাপদ হইবে কিনা। আমি কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না, বিঘাও, তুমি উপদেশ দাও, কি করিব।'

বিঘাও নীরবে বৃত্ত রচনা করিতে লাগিল, অনেকক্ষণ কোনো উত্তর দিল না। মাঝে মাঝে কেবল বাঘের থাবা দিয়া মাছি মারিতে লাগিল। ধবল এবং আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম। বৃত্তের পরিধিতে একটি মক্ষিকা নিপুণভাবে বসাইয়া সহসা বিঘাও ধবলের দিকে চাহিল এবং বৃত্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিল—'ইহার ভিতর কিছু দেখিতে পাইতেছ কি?'

'আমি মৃত মক্ষিকা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।'

'মৃত মক্ষিকারা তো বাহিরে রহিয়াছে। এই বৃত্তের ভিতরে কিছু দেখিতে পাইতেছ কিনা?'

ধবল এবং আমি উভয়েই মনোনিবেশ সহকারে বৃত্তের অভ্যন্তরভাগ দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু বিশেষ কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

ধবল বলিল, 'আমি তো ধূলি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।'

'সামান্য ধূলিই যদি তোমার চক্ষু আচ্ছন্ন করিয়া রাখে তাহা হইলে তোমার পক্ষে দেখা শক্ত—ভাল করিয়া দেখ—'

'কি দেখিতে পাইব?'

'তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ তাহার উত্তর; আমি এতক্ষণ সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া তোমার প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করিতেছিলাম। সহসা লক্ষ্য করিলাম, এই বৃত্তের মধ্যস্থলে তাহা মূর্ত হইয়াছে। ওই দেখ, ভাল করিয়া দেখ—'

বিঘাও জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বৃত্তের দিকে চাহিয়া রহিল। আমরাও চাহিয়া রহিলাম। আমি কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ধবলও পাইল না, কারণ সে ক্ষণকাল পরে বিমর্ষকণ্ঠে বলিল, 'আমি তো ধূলি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না—'

বিঘাও যেন সর্পের মতো তর্জন করিয়া উঠিল।

বলিল, 'কিন্তু আমি পাইতেছি। আমি দেখিতেছি, যেন বিরাট বন্যায় চতুর্দিকে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। কোথাও স্থল নাই, কোথাও কোনো বৃক্ষ বা গুল্ম দেখা যাইতেছে না। চতুর্দিকেই কেবল জল। সেই জলের ভিতর হইতে একটিমাত্র শাখা বিরাট অঙ্গুলির মতো উত্থিত হইয়া আকাশের দিকে কি যেন নির্দেশ করিতেছে। শাখাটি সম্ভবত কোনো ভূপতিত বৃক্ষের। আমি দেখিতেছি, সেই শাখার উপর একটি মূষিক এবং সর্প রহিয়াছে। মূষিকটি সর্পের মুখের নিকটই বসিয়া রহিয়াছে কিন্তু সর্প তাহাকে ভক্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে না।...'

বিঘাও চুপ করিল। আমরাও চুপ করিয়া রহিলাম।

সহসা ধবল আমার দিকে চাহিয়া বলিল—'বিঘাওয়ের উপদেশের মর্ম বুঝিতে পারিয়াছি। জংলা তুমি অবিলম্বে রোহার নিকট গিয়া প্রস্তাব কর যে আমরা তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব কামনা করিতেছি—'

ধবল এবং আমি উঠিয়া পড়িলাম। বৃত্তের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বিঘাও বসিয়া রহিল। কিছুদূর গিয়া শুনিতে পাইলাম, বিঘাও অট্টহাস্য করিতেছে।

...শিলাঙ্গী আমার অপেক্ষায় ঝোপের ভিতর বসিয়াছিল। কতক্ষণ হইতে বসিয়াছিল জানি না। কারণ যখন ঝোপে উপস্থিত হইলাম তখনও সন্ধ্যা হয় নাই, আমার কথা ছিল সন্ধ্যাবেলা আসিব, একটু আগেই আসিয়া পড়িয়াছিলাম। আমি ঝোপে প্রবেশ করিবামাত্র শিলাঙ্গী একটা গাছ হইতে লাফাইয়া নীচে নামিল।

'তুমি আসিয়াছ? বাঁচা গেল। আমি ভাবিতেছিলাম না-জানি কতক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। নিনানিকে কেমন দেখিলে? সে ভালো আছে তো? আমি ভাবিয়াছিলাম, তাহার জন্য দুধ লইয়া যাইব কিন্তু গিয়া দেখি দুধ নাই, আমার দুধটা পর্যন্ত চিহাই খাইয়া বসিয়া আছে—'

'চিহাই আবার কে?'

'চিহাই আমার একজন সৎমা। ভাবিলাম দুধ যখন পাওয়া গেল না তখন যক্ষিণীর কাছে যাওয়া বৃথা। যক্ষিণী কেমন আছে?'

'যক্ষিণী মহা বিপদে পড়িয়াছিল।'

'কি?

তাহাকে আদ্যোপান্ত সব বলিলাম।

'ওরকম বিপদে যক্ষিণী মাঝে মাঝে পড়ে'—শিলাঙ্গী হাসিয়া বলিল—'আমি একদিন গিয়া উহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম। সেদিনও যক্ষিণী একটা আস্ত ছাগল গিলিয়া নড়িতে পারিতেছিল না। সেদিন কাক আর শকুনির দল উহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল। নিনানি কেমন আছে?'

'বেশ ভাল আছে। যক্ষিণীর সঙ্গে বেশ ভাব হইয়া গিয়াছে।'

'আমার সঙ্গেও ভাব হইয়া যাইবে। তুমি রোহার সঙ্গে দেখা করিতে কখন যাইবে? ধবল কি বলিল?'

'ধবল রাজি হইয়াছে। তুমি আমাকে রোহার নিকট লইয়া চল, আমি ধবলের প্রতিনিধিস্বরূপ তাহার নিকট যাইব এবং গিয়া বন্ধুত্বের প্রস্তাব করিব।'

'রোহা নিগম বনেই আছে। তাহাকে তোমার কথা বলিয়া রাখিয়াছি। তুমি এখনই কি যাইবে?'

'যাইতে পারি।'

'তাহা হইলে চল। ঝোনঝিরা এখন নাই, এখনই যাওয়া ভাল।'

সুড়ঙ্গপথে শিলাঙ্গীর অনুসরণ করিলাম। সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইয়া যখন উন্নগার অপর পারে উপস্থিত হইলাম তখন শিলাঙ্গী আমার কানে কানে বলিল, 'তোমাকে কেহ যদি প্রশ্ন করে তুমি কেবল বলিও আমি নিম্ন-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি রোহার নিকট বন্ধুত্ব কামনায় যাইতেছি, শিলাঙ্গী সব কথা জানে। ইহার বেশি আর কিছু বলিও না।'

পথে বিশেষ কাহারও সহিত দেখা হয় নাই। দেখা হইবার সম্ভাবনাও ছিল না, কারণ শিলাঙ্গী আমাকে গাছের আড়ালে আড়ালে লইয়া যাইতেছিল। একটা ছোটখাটো বনের মধ্যে আমরা প্রবেশ করিয়াছিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়াছিল। সে স্থানে সেসময়ে কাহারও থাকিবার কথা নয়। শিলাঙ্গী ছুটিয়া চলিয়াছিল। আমি অন্ধকারে তাহার অনুসরণ করিতে পারিতেছিলাম না।

'শিলাঙ্গী একটু ধীরে ধীরে চল, আমি অন্ধকারে পথ দেখিতে পাইতেছি না, তুমি কোথায়—'

'এই যে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। এই যে গাছের তলায়।'

গাছের তলায় উপস্থিত হইবামাত্র শিলাঙ্গী আমার হাত ধরিল।

'আমি তোমার হাত ধরিতেছি, এইবার চল। একটু তাড়াতাড়ি চল, ঝোনঝিরা আসিয়া পড়িতে পারে যে কোন মুহূর্তে। ঝোনঝিরা আসিয়া পড়িলে সব গোলমাল করিয়া দিতে পারে। কিন্তু রোহা যদি একবার তোমার প্রস্তাবে রাজি হইয়া যায় তাহা হইলে ঝোনঝিরা আর কিছু করিতে পারিবে না। রোহার কথা মানিতে হইবে। ঝোনঝিরা নাই, এই সুযোগ। চল, চল—'

আমার হাত ধরিয়া শিলাঙ্গী আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। এখন মনে হইতেছে শিলাঙ্গী এখনও থামে নাই। আমার হাত ধরিয়া এখনও সে ছুটিয়া চলিয়াছে, কিন্তু অন্ধকারে তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না। তাহার স্পর্শটুকু আমার হাতে লাগিয়া আছে, তাহার অস্ফুট 'চল চল' ধ্বনি এখনও শুনিতে পাইতেছি, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না। সে অন্ধকারে হারাইয়া গিয়াছে আজও তাহাকে আমি খুঁজিতেছি। ঝোনঝিরা আসিয়া তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। ঝোনঝিরা আসিয়াছিল ভিন্নরূপে, ঝোনঝিরারূপে নয়, তাই তাহাকে আমি চিনিতে পারি নাই। শিলাঙ্গীও পারে নাই।

...অন্ধকার পরিপূর্ণ করিয়া ঝিল্লীধ্বনি স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল, মনে হইতেছিল, আমার বিক্ষুব্ধ চিত্তের আলোড়ন যেন বাঙ্ময় হইয়া উঠিতেছে। সহসা একটা নূতন ধরনের তীক্ষ্ণ শব্দ অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিয়া দিল। শিলাঙ্গী দাঁড়াইয়া পড়িল সহসা।

'মনে হইতেছে হাতি আসিয়াছে। নিগম বনে মাঝে মাঝে হাতির দল আসে। হাতি আসা খুব সুলক্ষণ। চল, চল, এখনও অনেকটা পথ যাইতে হইবে।'

আবার শিলাঙ্গী ছুটিতে লাগিল।

কিছুদূর গিয়া শিলাঙ্গী বলিল, 'রোহা কিন্তু যাহা বলিবে তাহাতে তুমি আপত্তি করিও না। করিবে না তো?'

'রোহা কি বলিবে তাহা না শুনিয়াই কি করিয়া প্রতিশ্রুতি দিব! তাহার প্রস্তাব যদি আপত্তিজনক হয়—'

'আপত্তিজনক হইবে না—'

'কি করিয়া জানিলে?'

'আমি জানি।'

শিলাঙ্গীর চোখের দৃষ্টি নিশ্চয়ই হাস্য-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু অন্ধকারে আমি তাহা দেখিতে পাই নাই।

'তাহা হইলে বল, শুনি—'

'আমি বলিব না, রোহার মুখে শুনিও।'

...রোহা চতুর্দিকে মশাল জ্বালিয়া বসিয়াছিল। একা বসিয়াছিল সে। তাহার সম্মুখে বাঁধা ছিল একটি গাভী, তাহাকেই সে পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। শিলাঙ্গী আমাকে দূর হইতে দেখাইয়া দিল, তাহার পর আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, 'ওই রোহা। আমি তোমাকে রোহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া চলিয়া আসিব। তাহার পর তুমি তোমার বক্তব্য বলিও। বেশি জোরে কথা বলিও না যেন, গাভীটি তাহা হইলে ভয় পাইবে, রোহাও চটিয়া যাইবে। জোরে কথা বলা রোহা পছন্দ করে না। ঝোনঝিরার উপর এইজন্যই রোহা চটা, সে বেশি চিৎকার করে—'

লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, নিগম বনের চতুর্দিকে মশাল জ্বলিতেছে এবং প্রত্যেক মশালকে কেন্দ্র করিয়া সশস্ত্র একদল লোক নীরবে বসিয়া আছে।

শিলাঙ্গী চুপি চুপি বলিল—'উহারা আমাদের গরুর দলকে পাহারা দিতেছে।'

দেখিলাম শিলাঙ্গীকে সকলেই চেনে। সকলেই তাহার সহিত সহাস্য দৃষ্টি বিনিময় করিল। আমার দিকে চাহিয়া দুই-একজন ভ্রূকুটি করিল বটে, কিন্তু শিলাঙ্গীর সঙ্গে ছিলাম বলিয়া কেহ কোনো প্রশ্ন করিল না। রোহার নিকট গিয়া শিলাঙ্গী জানু পাতিয়া বসিল এবং নিম্নকণ্ঠে বলিল, 'নিম্ব-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি তোমার সহিত কথা কহিতে আসিয়াছে। উহারাও উলম্ভনের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত। উলম্ভন উহাদের দলের একজনকে মারিয়া ফেলিয়াছে, আর একজনকে নিদারুণ প্রহার করিয়াছে। উহারা আমাদের সহিত মিলিত হইয়া উলম্ভনকে আক্রমণ করিতে চায়। তোমার সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিবার নিম্ব-সম্প্রদায়ের দলপতি ধবল এই যুবকটিকে পাঠাইয়াছে। তুমি ইহার সহিত কথা বল।'

রোহা গাভীটির দিকে যেমন চাহিয়াছিল তেমনি চাহিয়াই রহিল। শিলাঙ্গী আমাকে ইঙ্গিতে সম্মুখে আসিতে বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। কোথায় গেল ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আমিও রোহার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিলাম এবং অনুচ্চকণ্ঠে আমার বক্তব্য নিবেদন করিলাম।

রোহা গাভীটির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তাহার পর ধীরকণ্ঠে উত্তর দিল। মনে হইল চুপি চুপি সে যেন কোনো গোপন কথা বলিতেছে।

বলিল, 'আমি শান্তিপ্রিয় লোক। অশান্তকে শান্ত করাই আমার ধর্ম। আমি বন্য গাভীকে ঘিরিয়া রাখিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া শান্ত করিতে চাই। ওই গাভীটিকে প্রথম যেদিন বন্দী করিয়াছিলাম সেদিন ও খুব বেশি ছটফট করিতেছিল। এখন আর তত ছটফট করিতেছে না। কিন্তু আহার ত্যাগ করিয়াছে। কাল উহাকে ছাড়িয়া দিব, আবার কিছুদিন পরে ধরিব। আমার বিশ্বাস বন্দী অবস্থাতে ক্রমশ ওই গাভী আমাদের প্রদত্ত খাদ্য আহার করিবে। আমার বিশ্বাস ক্রমশ উহার অশান্ত প্রকৃতি শান্ত হইবে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই আমি এই নির্জন নিগম বনে গরুদের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিতেছি। তাহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতেছি। আমি কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে চাহি না। ভাবিয়াছিলাম উলম্ভন যদি আমাকে বেশি বিরক্ত করে আমি এ স্থান ত্যাগ করিয়া গরুর দল লইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইব। কিন্তু অন্য কারণে এখন আবার অন্য প্রকার ভাবিতেছি। আমার কন্যা

শিলাঙ্গীকে লইয়া আমি একটু বিব্রত হইয়াছি। তাহার জন্য আমার শান্তি বারংবার বিঘ্নিত হইতেছে। প্রথমত আমার পত্নীদের মধ্যে যাহারা শিলাঙ্গীর সমবয়সী তাহারা কেউ উহাকে সুচক্ষে দেখে না। শিলাঙ্গী সুন্দরী এবং আমার প্রিয়পাত্রী বলিয়াই সম্ভবত তাহারা ঈর্ষান্বিতা। শিলাঙ্গীকে প্রায়ই তাহারা কষ্ট দেয়, প্রহার পর্যন্ত করে। দ্বিতীয়ত, শিলাঙ্গীকে ঘিরিয়া আমাদের দলের একদল যুবক উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য তাহাদের মধ্যে প্রায়ই রক্তারক্তি হইতেছে। শিলাঙ্গী কিন্তু উহাদের কাহাকেও বিবাহ করিতে চায় না। শিলাঙ্গীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইবার ইচ্ছা আমারও নাই। আমার জননী যমক্ষী বলিত যদি কোনো মেয়ে সমাজে অশান্তির সৃষ্টি করে তাহা হইলে তাহাকে হত্যা করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়াই দলপতির কর্তব্য; যমক্ষী তাহার নিজের একটি কন্যাকে এজন্য হত্যাও করিয়াছিল। আমি কিন্তু যমক্ষীর এ নির্দেশ মানিতে পারিব না। শিলাঙ্গীকে হত্যা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাহাকে লইয়া বড়ই দুশ্চিন্তায় ছিলাম, কিন্তু কাল তাহার মুখে একটি সংবাদ শুনিয়া মনে হইতেছে যে হয়তো আমার মানসিক উৎকণ্ঠা বিদূরিত হইবে, হয়তো আবার শান্তি ফিরিয়া পাইব। শিলাঙ্গী নাকি তোমাকে পছন্দ করিয়াছে, তোমাকেই বিবাহ করিতে চায়। সেইজন্য আমি ঠিক করিয়াছি যে তোমরা সত্যই যদি আমাদের সহিত মিলিত হইতে চাও দুইটি শর্তে মিলিত হইতে পার। প্রথম শর্ত তুমি শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিবে। দ্বিতীয় শর্ত আমাদের গরুর জন্য তোমাদের তৃণশস্য দিতে হইবে। তোমরা যদি এই দুইটি শর্তে সম্মত থাক আমি তোমাদের সহিত মিলিত হইয়া উলম্ভনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব। আমি নিজে করিব না, আমার সম্প্রদায়ের যুবকেরা করিবে। ঝোনঝিবার নেতৃত্বে একদল যুবক যুদ্ধ করিবার জন্য সর্বদা উন্মুখ হইয়া আছে। তাহারা সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হইবে। তুমি তোমার দলপতিকে গিয়া এই সকল কথা বল, তিনি যদি এই প্রস্তাবে সম্মত হন আমরাও সম্মত আছি জানিবে। আগামী পরশু পূর্ণিমা। সেই দিনই তাহা হইলে তোমার সহিত শিলাঙ্গীর বিবাহ দিব।'

রোহা নীরব হইল। আমিও নীরব হইয়া রহিলাম। আমি কি যে বলিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। এত সহজে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে যে শিলাঙ্গীকে পাইব তাহা কল্পনা করি নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাহাকে পাইলে যে আনন্দলাভ করিব ভাবিয়াছিলাম তাহা যেন পাইলাম না, বরং মনে হইল একটা নিগূঢ় ষড়যন্ত্রের জালে বোধহয় জড়াইয়া পড়িতেছি। ভয় হইল। সহসা নিনানির বিবর্ণ মুখটা মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। তাহার কথাগুলি আবার যেন আমি শুনিতে পাইলাম—'আমার ভয় হইতেছে তুমিও আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। তুমি কথা বল, তুমি চুপ করিয়া থাকিও না—।'

রোহা ফিসফিস করিয়া বলিল, 'তোমার আর যদি কিছু বক্তব্য না থাকে তুমি যাইতে পার—আমি একা থাকিতে চাই।'

আমি উঠিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম। বাহিরে আসিয়া শিলাঙ্গীকে দেখিতে না পাইয়া আমার অন্তরাত্মা যেন কাঁপিয়া উঠিল। একটু আগে আমার মনে যে ভয় জাগিয়াছিল তাহা প্রবলতর হইয়া আমাকে চলচ্ছক্তিহীন করিয়া ফেলিল। সেই অন্ধকারে মূঢ়ের মতো একা দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল শিলাঙ্গীকে আমি কয়দিন দেখিয়াছে? তাহার কতটুকু চিনি আমি? সে যে আমাকে ভুলাইয়া আনিয়া একটা গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করিতেছে না তাহার প্রমাণ কি? তখন বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতা আমার ছিল না। নানারূপ অহেতুক ভয়ে ভীত হইয়া আমি জড়বৎ দাঁড়াইয়া রহিলাম। আজ বুঝিতে পারিতেছি ভয়ের কোনো হেতু ছিল না,

আমি ভয় পাইতেছিলাম শিলাঙ্গীকে বিশ্বাস করিতে পারি নাই বলিয়া। কাহাকেও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিবার শক্তি আমরা তখনও অর্জন করি নাই। আমরা সকলকেই সন্দেহ করিতাম, সকলকেই স্বার্থপর মনে করিতাম, এমন কি দেবতাকেও। পুরোহিতের সহায়তায় স্বার্থপর দৈবী শক্তিকে প্রলুব্ধ করিয়া আমাদের নিজেদের কার্যসিদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইতাম। দেবতার মহত্ত্বেও আমরা আস্থাবান ছিলাম না, মানুষের মহত্ত্বেও ছিলাম না। যে শিলাঙ্গীকে কয়েক মুহূর্ত পূর্বে এত ভাল লাগিতেছিল তাহাকে ঘিরিয়া নানাবিধ বিভীষিকা আমাকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পথ যদি জানা থাকিত আমি হয়তো পলায়ন করিতাম। কিন্তু অন্ধকারে অপরিচিত পথে যাইবার সাহস ছিল না। দাঁড়াইয়া রহিলাম। বিঘাওয়ের বর্ণিত চিত্রটি মনে পড়িল—বন্য-বিধ্বস্ত মূষিক সর্পের মুখের নিকট আসিয়া পড়িয়াছে। শিলাঙ্গী কি সত্যই মনুষ্যরূপিণী সর্পিণী? আর আমি মূষিক?

শিলাঙ্গী কিন্তু একটু পরেই ফিরিয়া আসিল।

'জংলা, জংলা, কোথায় গেলে তুমি—।'

'এই যে এখানে তোমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি। তুমি কোথায় গিয়াছিলে?'

'তোমার জন্য দুধ আনিতে গিয়াছিলাম। নাও, একটু দুধ খাও, চল একটা মশালের কাছে যাই।'

শিলাঙ্গী একটা বাঁশের কেঁড়ে করিয়া আমার জন্য দুধ আনিয়াছিল। পান করিয়া শরীরে যেন নূতন শক্তি সঞ্চার হইল। শুধু শক্তি নয় একটা অনুভূতির বন্যায় আমার মনের সমস্ত গ্লানিও যেন ভাসিয়া গেল। শিলাঙ্গীকে ঘিরিয়া যে ভয় ভাবনা সন্দেহ আমাকে এতক্ষণ আকুল করিতেছিল তাহা যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হইয়া গেল। যে শিলাঙ্গীকে আমি ভালবাসিয়াছিলাম, সেই শিলাঙ্গীকে আবার যেন ফিরিয়া পাইলাম। মশালের নিকট কয়েকজন সশস্ত্র যুবক দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রসর হইয়া আসিল এবং আমাকে প্রশ্ন করিল—'উলম্ভনের দূত কি তোমাদের কাছেও আসিয়াছিল?'

'হ্যাঁ।'

'তোমরা কি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে ঠিক করিয়াছ?'

'আমাদের দলপতি তোমাদের দলপতির নিকট প্রস্তাব করিয়াছে যে আমরা উভয় দল মিলিত হইয়া যদি উলম্ভনকে আক্রমণ করি তাহা হইলে উভয় দলেরই সুবিধা হয়। রোহা দুইটি শর্তে এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে রাজি আছে। আমাদের দলপতি ধবলকে গিয়া শর্ত দুইটি বলিব, ধবল যদি আপত্তি না করে আমরা সম্মিলিতভাবে উলম্ভনকে আক্রমণ করিব।'

'শর্ত দুইটি কি—'

'প্রথম শর্ত—'

শিলাঙ্গী ছুটিয়া আসিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরিল।

'না না, বলিও না।'

তাহার চোখের দৃষ্টি হইতে হাসি উপচাইয়া পড়িতে লাগিল।

যুবকটির দিকে ফিরিয়া আমি বলিলাম—'ধবল যদি রাজি হয় কালই আমি আবার আসিব, তখন সমস্ত কথাই জানিতে পারিবে। আমার বিশ্বাস ধবল আপত্তি করিবে না, কারণ উলম্ভনের স্পর্ধা আমাদের ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে।'

'আমাদেরও করিয়াছে। ধবল বা রোহা যদি যুদ্ধ না করে আমরা যুদ্ধ করিব।'

'আমাদেরও তাহাই ইচ্ছা। দেখা যাক কতদূর কি হয়।'

শিলাঙ্গী বলিল—'চল, তোমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসি। বেশি রাত হইয়া গেলে আবার মুশকিল হইবে।'

'চল—'

কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরই আমরা আবার বনের ভিতরে পড়িলাম। মনে হইল যেন সুর-লোকে প্রবেশ করিলাম, ঝিল্লীদলের সম্মিলিত ঝঙ্কার যেন আমাদের সম্বর্ধনা করিবার জন্য অরণ্যের অন্তরালে অপেক্ষা করিতেছিল। খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। চমকাইয়া উঠিলাম যখন আমাকে শিলাঙ্গী জড়াইয়া ধরিল।

'রোহা কি শর্ত করিয়াছে আমি জানি। বলিব? প্রথম শর্ত আমাকে বিবাহ করিবে, দ্বিতীয় শর্ত আমাদের গরুর জন্য ঘাস দিতে হইবে। তুমি রাজি আছ তো?'

'আমি রাজি থাকিলে তো হইবে না, ধবল যদি রাজি হয় তবেই তো।'

'ধবল নিশ্চয় রাজি হইবে।'

'কি করিয়া জানিলে?'

'দেখিও।'

কিছুক্ষণ পাশাপাশি হাঁটিবার পর শিলাঙ্গী আবার বলিল—'ধবল ঠিক রাজি হইবে। সে ব্যবস্থা আমি করিয়াছি।'

'কি ব্যবস্থা?'

'আমাদের পুরোহিত নম্বরুকে সব কথা খুলিয়া বলিয়াছিলাম। নম্বরু একটা তুক করিয়াছে। একটা বন্য মোরগ এবং একটা বন্য মুরগীর কানে কানে কি বলিয়া তাহাদের একসঙ্গে বাঁধিয়া পোড়াইয়াছে। নম্বরু বলিল ইহাতেই কাজ হইবে, ধবল আর অমত করিবে না। বন্য মোরগ এবং বন্য মুরগীর মিলন অগ্নিশিখার মধ্যে চিরস্থায়ী হইয়াছে। তোমাদের মিলনও হইবে।'

শিলাঙ্গী আবার আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, আমিও তাহাকে আবেগভরে জড়াইয়া ধরিলাম। সেদিন সেই ঝিল্লীমন্দ্রিত পরিবেশে অরণ্যের অন্ধকারে আমরা যেন পরস্পরের অন্তরতম সত্তাকে প্রত্যক্ষ করিলাম।

শিলাঙ্গী বলিল, 'ইহাতে তুমি সুখী হইয়াছ তো? তোমার ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতেছে আমি যেন জোর করিয়া তোমাকে নিনানির নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতেছি। আমি জীবনে যাহা চাহিয়াছি চিরকালই তাহা জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়াছি, রোহা আমার কোনো বাসনা কখনও অপূর্ণ রাখে নাই কিন্তু তুমি যদি সুখী না হও তোমাকে আমি বিবাহ করিব না। বল, তুমি সুখী হইয়াছ তো?'

শিলাঙ্গীকে আলিঙ্গন বদ্ধ করিয়া তাহার কানে কানে বলিলাম—'খুব সুখী হইয়াছি। তোমাকে যে পাইব ইহা আমার আশার অতীত ছিল—।'

শিলাঙ্গীকে মিথ্যা কথা বলি নাই। সত্যই আমি সুখী হইয়াছিলাম। আমার অন্তরতম সত্তা শিলাঙ্গীর অন্তরতম সত্তাকে আপন বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিল। যেদিন শিলাঙ্গীকে প্রথম দেখি সেই দিনই পারিয়াছিল। একটা কথা সেদিন কিন্তু বুঝিতে পারি নাই। আমার অন্তরতম সত্তাকে ঘিরিয়া যে আর একটা প্রবলতর পশু-সত্তা আছে যাহা লোভে লালায়িত হয়, ভয়ে ভীত হয়, স্বার্থে বিচলিত হয়, যাহা অন্তরতম সত্তার প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে যে কোনো দিকে চালিত করিতে পারে তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সেদিন আমি সচেতন ছিলাম না, তাই শিলাঙ্গীর

পরবর্তী প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে আমার দ্বিধা হইল না। শিলাঙ্গী বলিল, 'আমি পূর্বে যে কথা তোমাকে বলিয়াছিলাম তাহা আশা করি ভুলিয়া যাও নাই।'

'কি কথা?'

'আমি তোমার বন্ধু হইতে চাই, কেবল স্ত্রী নয়। আরও চাই যে তুমি কেবলমাত্র আমার স্বামী হইও না, আমার বন্ধুও হও। এস আমরা শপথ করি যে সুখে দুঃখে সুদিনে দুর্দিনে আমরা কেহ কাহাকেও ত্যাগ করিব না। সাধারণত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বড় শিথিল কেহ কাহারও মঙ্গলের জন্য স্বার্থত্যাগ করে না, বিপদের সময় পরস্পরকে ত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাইতে ইতস্তত করে না। তাহারা পরস্পরের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু নয়, তাহারা কেবল স্বামী-স্ত্রী মাত্র। একজন স্বামীব বহু স্ত্রী থাকে, একজন স্ত্রীলোকের বহু পুরুষ থাকে, তাহারা কেহ কাহারও বন্ধু নয়। আমার ইচ্ছা আমাদের সম্পর্ক আরও নিবিড় হোক। তুমি যদি ইচ্ছা কর, আরও বিবাহ করিতে পার আপত্তি করিব না। তুমি নিনানিকে ভালবাস তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, আমি কেবল তোমার বন্ধুত্ব কামনা করি। তুমি আমার কাছে তোমার কোনো কথা গোপন করিও না, আমিও তোমার কাছে কোনো কথা গোপন করিব না। তোমার বিপদে আমি তোমাকে কখনও ত্যাগ করিব না, আমার বিপদের সময় আমাকেও তুমি কখনও ত্যাগ করিও না। আমাদের সম্পর্ক শুধু যেন দেহের সম্পর্ক না হয়। ইহাতে তুমি রাজি আছ তো?'

'যদি রাজি না হই তুমি কি করিবে?'

'আমি উন্নগার শিখর হইতে লাফাইয়া প্রাণত্যাগ করিব। বুঝিব এ সমাজে আমার স্থান নাই, আমার সরিয়া যাওয়াই ভাল।'

শিলাঙ্গীর মুখে এ কথা শুনিয়া আমি সেদিন বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গিয়াছিলাম। স্বেচ্ছায় কেহ যে প্রাণত্যাগ করিতে পারে ইহা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল তখন। যে জীবন রক্ষা করিবার জন্য এত আয়োজন, এত কৃচ্ছ্রসাধন, এত আরাধনা, এত যুদ্ধবিগ্রহ—সেই জীবন স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে চাহিতেছে আমাকে পাইবে না বলিয়া? কি এমন আছে আমার মধ্যে? কি চাও? অন্ধকারে সেদিন তাহার মুখ দেখিতে পাই নাই, বলিতে পারি না তাহার মুখে কি ভাব সেদিন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতেছিল। তাহার কথা শুনিয়া আমারও মনের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব অবর্ণনীয় ভাব সঞ্চারিত হইতেছিল। মনে হইতেছিল আমি যেন এক নূতন দেশে সহসা নীত হইয়াছি, যেখানে আত্মত্যাগ করাই নিয়ম। মনে হইতেছিল আদর্শের জন্য আমিও হয়তো উন্নগার শিখর হইতে লাফাইয়া পড়িতে পারিব। সেই ঝিল্লীমুখরিত অন্ধকারে ক্ষণিকের জন্য এক অনাস্বাদিত-পূর্ব রস আমার চিত্তকে আপ্লুত করিয়া দিল। চকিতের মধ্যে আমি যেন এক নূতন জগতের আভাস পাইলাম।

'উত্তর দিতেছ না কেন? বল না তুমি রাজি আছ কিনা?'

লক্ষ্য করিলাম শিলাঙ্গীর স্বর কাঁপিতেছে।

'নিশ্চয় রাজি আছি।'

পরমুহূর্তেই শিলাঙ্গী আমাকে জড়াইয়া ধরিল, আমিও তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম। মনে হইল যাহাকে খুঁজিতেছিলাম তাহাকেই পাইয়াছি, বহুদিন পরে পাইয়াছি, জোলমার কথা তখন মনে থাকিবার কথা নয়, জোলমাই যে শিলাঙ্গীরূপে ফিরিয়া আসিতে পারে একথা মনে আসিবার কোনো সম্ভাবনাই তখন ছিল না, তখন অস্পষ্টভাবে এইটুকুই শুধু মনে হইয়াছিল

যাহার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলাম তাহাকেই পাইয়াছি। আজ মনে হইতেছে যে, জোলমা ওহালির রঙীন বৃক্ষকাণ্ডে বসিয়া ভাসিতে ভাসিতে দিগন্তসীমায় বিলীন হইয়া গিয়াছিল সেই জোলমাই বহু শতাব্দী পরে অন্ধকারে সেদিন শিলাঙ্গীর মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহাকে সেদিন আমি চিনিতে পারি নাই।

আমরা কতক্ষণ আলিঙ্গন বদ্ধ হইয়াছিলাম জানি না, ব্যাঘ্রের নিদারুণ গর্জনে আমাদের চমক ভাঙিল। নিগম বনের মশালধারী প্রহরীরাও চিৎকার করিতেছে শুনিতে পাইলাম।

শিলাঙ্গী বলিল, 'সেই বাঘটা বোধহয় আজও বাহির হইয়াছে। গরু মারিবার জন্য নিগম বনে আসিয়া প্রায়ই হানা দেয়। কিন্তু রোহার প্রহরীরা খুব সতর্ক, এখনও পর্যন্ত একটাও গরু মারিতে পারে নাই। চল আমরা যাই।'

'যদি বাঘের মুখে পড়ি?'

'বাঘ আমাদের কিছু বলিবে না। চল না, আমি তোমাকে পাশ কাটাইয়া ঠিক লইয়া যাইব। একবার সুড়ঙ্গে ঢুকিতে পারিলে বাঘ আমাদের আর কি করিবে।'

শিলাঙ্গীর অনুসরণ করিতে লাগিলাম। আর আমাদের মধ্যে কোনো বাক্য বিনিময় হইল না। বাঘের ভয়েই যে আমি কথা কহি নাই তাহা নয় একটা অভূতপূর্ব অনুভূতি আমাকে নির্বাক করিয়া দিয়াছিল, মনে হইতেছিল কথা কহিলেই তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। শিলাঙ্গীর হয়তো তাহাই মনে হইতেছিল। সে-ও একটা কথা বলে নাই। কিন্তু আমাদের নীরবতা আমাদের উভয়ের অন্তরে যে বার্তা বহন করিয়া আনিতেছিল বাক্য দ্বারা তাহা সম্ভব হইত না। একটু পরে আমরা উভয়ে আসিয়া সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিলাম। সুড়ঙ্গের ভিতরও আমাদের একটিও কথা হইল না। শিলাঙ্গী প্রথম কথা কহিল সুড়ঙ্গের অপর প্রান্ত হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর যাইবার পর। চাঁদ উঠিয়াছিল, জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক ভাসিয়া যাইতেছিল। সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইবার পরও আমরা নীরবে পাশাপাশি হাঁটিয়া চলিয়াছিলাম। শিলাঙ্গী বাম বাহু দ্বারা আমার কটি বেষ্টন করিয়াছিল। সহসা শিলাঙ্গী দাঁড়াইয়া পড়িল।

'গাছের উপর ও কে! মানুষ কি?'

তাহার অঙ্গুলি-নির্দেশ অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, একটি বৃক্ষচূড়ায় সত্যই মনুষ্য-মূর্তির মতো কি যেন দেখা যাইতেছে। আমরা দাঁড়াইয়া পড়িতেই কিন্তু তাহা অন্তর্হিত হইল।

শিলাঙ্গী বলিল, 'বোধহয় কোনও শিকারি হরিণের জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে।'

'আমাদের দেখিয়া তবে লুকাইয়া পড়িল কেন?'

'আমাদের বোধহয় হরিণ ভাবিয়াছিল, কিন্তু আমরা হরিণ নয় দেখিয়া আবার আত্মগোপন করিয়াছে। আমরা হরিণ হইলে তীর ছুঁড়িত। আমাদের দলের ঘীটা প্রায়ই হরিণ-শিকার করিতে আসে—হয়তো ঘীটাই গাছে চড়িয়া বসিয়া আছে।'

'তবু চল, একবার দেখিয়া আসি।'

গাছটা খুব কাছে ছিল না। তাহার নিকট পৌঁছিতে বেশ কিছু সময় লাগিয়া গেল। শিলাঙ্গী হরিণীর মতো ছুটিয়া চলিতেছিল, পাহাড়ের চড়াই উতরাই অবলীলাক্রমে পার হইয়া যাইতেছিল। আমিও তাহাকে অনুসরণ করিয়া ক্ষিপ্রগতিতেই চলিয়াছিলাম, তবু সেই বৃক্ষতলে পৌঁছতে অনেকটা সময় লাগিল। সেখানে গিয়া কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। গাছের উপরে উঠিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম, কোথাও কেহ নাই। শিকারিই যদি হয়, কোথায় সে

আত্মগোপন করিল? কেনই বা করিল? আমরা পরস্পরের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। শিলাঙ্গী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, 'তাহা হইলে ভূত বোধহয়। চল পালাই—। তুমি তোমার ধবলের কাছে যাও, আমি রোহার কাছে যাই। রোহা আমার প্রত্যাশায় বসিয়া আছে। এবার বোধহয় তুমি একা যাইতে পারিবে?'

'পারিব।'

আবার দুইজন পাশাপাশি হাঁটিতে লাগিলাম। বৃক্ষ-চূড়ালগ্ন সেই মনুষ্য-মূর্তিটা কিন্তু আমার মনের মধ্যে অনড় হইয়া রহিল। শিলাঙ্গীর কথাই যদি সত্য হয়, উহা যদি ভূতই হয়, তবে কাহার ভূত, কেন এভাবে দেখা দিল, বৃক্ষচূড়ায় আবির্ভূত হইল কেন, নানা প্রশ্ন মনে জাগিতে লাগিল, কিন্তু কোনোটারই সদুত্তর আমার মাথায় আসিল না।

'কি ভাবিতেছ'—শিলাঙ্গী প্রশ্ন করিল সহসা।

'ওই ভূতটার কথা। কেমন যেন ভয়-ভয় করিতেছে। তোমার?

'আমার ভয় করে না। কেন করে না জান? আমি মরণকে মানিয়া লইয়াছি। মরণকে যখন কিছুতেই এড়ানো যাইবে না, তখন তাহাকে মানিয়া লওয়াই ভাল। মানিয়া লইলে আ· ভয় থাকে না। দেখ, দেখ, কি সুন্দর ফুলগুলি! জ্যোৎস্না উঠিলে ওগুলি ফোটে বলিয়া আমি উহাদের নাম জ্যোৎস্নামণি দিয়াছি—।

শিলাঙ্গী লাফাইয়া লাফাইয়া ফুলগুলি পাড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। আমি তখন গাছে উঠিয়া লতাসুদ্ধ ফুলগুলি তাহাকে পাড়িয়া দিলাম।

'আমাকে পরাইয়া দাও।'

আমি তাহার চুলে, গলায়, বাহুমূলে, কোমরে ফুলের অলঙ্কার পরাইয়া দিলাম। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে অলঙ্কারগুলি পরিল। তাহার পর বলিল—'এস তোমার মাথাতে আমি ফুলের চূড়া করিয়া দিই—।'

আমি মাথা পাতিয়া বসিলাম। সে আমার মাথায় পুষ্পচূড়া রচনা করিতে লাগিল। সহসা আমার মনে হইল, কয়েকদিন পূর্বে নিনানির মাথাতেও আমি শাখাপত্র দিয়া আবরণ রচনা করিয়াছিলাম এমনি জ্যোৎস্নালোকে, এই উন্নগা পাহাড়েই। তাহার সে শিরস্ত্রাণ নদীর জলে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। নিনানিও কি ভাসিয়া যাইতেছে না? সে-ও কি আমার নাগালের বাহিরে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাইবে? নিনানির জন্য সমস্ত চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সহসা মনে হইল সে আমার জন্য তাহার স্বামী, তাহার প্রতিপত্তি, তাহার সমাজ ত্যাগ করিয়া নির্জন গুহায় আসিয়া বাস করিতেছে কিন্তু আমি কি করিতেছি? এমন সময় আর একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল, শিলাঙ্গী কি করিয়া জানি না আমার মনের কথা টের পাইয়া গেল।

বলিল, 'তুমি কি ভাবিতেছ বলিব? নিনানির কথা। নয়?'

'তুমি কি করিয়া টের পাইলে?'

'এমনি মনে হইল। নিনানির সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়া দাও, আমি ঠিক তাহার সঙ্গে ভাব করিয়া ফেলিব—।'

'আমাদের বিবাহ হইয়া যাক তখন দিব।'

'এইবার চল, আমরা যাই। রোহা নিশ্চয় আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে।'

আমরা উঠিয়া দাঁড়াইতেই একদল হরিণ সচকিত হইয়া ছুটিয়া পলাইল। তাহারা বোধহয়

কিছু দূরে দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে আমাদের নিরীক্ষণ করিতেছিল। নিমেষের মধ্যে তাহারা আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল।

...ধবল আমার অপেক্ষায় সাগ্রহে বসিয়াছিল। ঠিক পথের ধারেই বসিয়াছিল। আমাকে দেখিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অগ্রসর হইয়া আসিল।

'জংলা, শীঘ্র বল তুমি কি সংবাদ আনিয়াছ। তুমি চলিয়া যাইবার পর উলন্তনের নিকট হইতে আর একজন লোক আসিয়াছিল। সে আসিয়া দাবি করিতেছিল, শোহান্কি পর্বতে প্রস্তর বহন করিবার জন্য আরও লোক দিতে হইবে। এ লোকটিও দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ। আমি তাহাকে বলিয়াছি কয়েকদিন পরে লোক পাঠাইতে পারিব। এখন আমাদের মাঠের কাজ আছে। মাঠের কাজ শেষ হইলে লোক দিব। আমার স্তোকবাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া লোকটি চলিয়া গিয়াছে। ঘিসু এবং ভংগার পরিবারবর্গ উন্মত্তবৎ আচরণ করিতেছে। তাহারা উলন্তনের লোকটিকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আমি অনেক বুঝাইয়া তাহাদের নিরস্ত কবিয়াছি। আমি এখন দেখিতেছি, যুদ্ধ না করিয়া উপায় নাই। নিম্ব-দেবতারও হয়তো ইহাই ইচ্ছা। কারণ আমি লক্ষ্য করিলাম, বাতাসের বেগে নিম্ব-বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা হইতে যে ধরনের শব্দ উত্থিত হইতেছে তাহা শান্তিসূচক নয়। কিছু পূর্বে তাহার মধ্যে আমি তর্জন-গর্জনের আভাস পাইয়াছি। তুমি কি সংবাদ আনিয়াছ শীঘ্র বল।'

আমি সমস্ত কথা ধবলকে খুলিয়া বলিলাম। ধবল কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, 'রোহাব প্রথম শর্তে আমি সম্মত আছি। তুমি ইচ্ছা করিলে শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিতে পার, আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমাদের তৃণশস্য তাহাদের গরুর মুখে সমর্পণ করিব কি করিয়া? তুমি তো জান, আমাদের শস্য এবার ভাল জন্মায় নাই। প্রথম ফসলের সঞ্চিত শস্য আহার করিয়াই হয়তো আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইবে। ইহার উপর যদি উহাদের গরুদের জন্য শস্য দিতে হয় একদিনেই হয়তো আমাদের ক্ষেতগুলি শস্যশূন্য হইয়া যাইবে। আমরা তখন কি আহার করিব?'

আমি বলিলাম, 'সে কথা আমিও চিন্তা করিয়াছি। কিন্তু রোহার সহিত আলাপ করিয়া আর একটি কথাও আমার নিকট স্পষ্ট হইয়াছে। রোহা কিছুতেই তাহার মত পরিবর্তন করিবে না। আমরা যদি যুদ্ধ করিবার জন্য তাহার সাহায্য চাই, এই দুইটি প্রস্তাবেই আমাদের রাজি হইতে হইবে। রোহার চরিত্রে আর একটি আশ্বাসজনক বৈশিষ্ট্যও আমি লক্ষ্য করিলাম, সে শান্তিপ্রিয় লোক। কাহারও সহিত কলহ করিবার প্রবৃত্তি তাহার নাই। আমার যদি আমাদের প্রকৃত অবস্থা তাহার নিকট খুলিয়া বলি সে আমাদের ক্ষেত্রগুলি শস্যশূন্য করিয়া দিবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস। তবে আমাদের তৃণশস্যের কিছু অংশ তাহাকে দিতেই হইবে। পরিবর্তে সে হয়তো তাহার দুগ্ধের কিছু অংশ আমাদের দিতে পারে—।'

ধবল অসহায়ভাবে বলিল—'দুগ্ধ আমরা কখনও খাই নাই। দুগ্ধ খাইয়া কি আমরা বাঁচিতে পারিব?'

'উহারা তো বাঁচিয়া আছে।'

'কি জানি।'

ধবল অসহায় দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম—'আর একটা কথাও আমাদের মনে রাখা উচিত। রোহার প্রিয়তমা কন্যা

শিলাঙ্গী যখন আমাদের আপন লোক হইতেছে, তখন রোহা এমন কিছু করিবে না যাহাতে আমাদের অনিষ্ট হয়—।'

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া ধবল সহসা প্রশ্ন করিল—'শিলাঙ্গী দেখিতে কেমন?'

'সুন্দরী।'

'বয়স কত?'

'অল্পই হইবে। নিনানির অপেক্ষাও ছোট মনে হয়।'

ধবলের চোখের অসহায় দৃষ্টি সহসা জীবন্ত হইয়া উঠিল।

'আমি একটা কথা ভাবিতেছি—।'

'কি?'

'আমি যদি তাহাকে বিবাহ করি কেমন হয়? নিনানি তো চলিয়া গেল। শিলাঙ্গী যদি আমার পত্নী হয়, উহাদের উপর তাহার প্রভাব বেশি হইবে।'

এইবার বাধ্য হইয়া আমাকে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইল।

বলিলাম—'সে প্রস্তাব আমি করিয়াছিলাম, কিন্তু রোহা তাহাতে সম্মত নয়। শিলাঙ্গীর মতের বিরুদ্ধে রোহা কাহারও সহিত তাহার বিবাহ দিবে না। উহাদের দলেরই বহু যুবক শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিবার জন্য উৎসুক, কিন্তু এই কারণেই রোহা কাহারও সহিত শিলাঙ্গীর বিবাহ দেয় নাই। শিলাঙ্গী বলিয়াছে, আমাকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না।'

ধবল নির্নিমেষে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমার মনে হইল তাহার শান্ত দৃষ্টির অন্তরালে একটা প্রচ্ছন্ন বহ্নির আভাস যেন ফুটিয়া উঠিতেছে।

কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ধবল অবশেষে বলিল—'চল, বিঘাওয়ের সহিত পরামর্শ করি। সে কি বলে শোনা যাক।'

আমরা বিঘাওয়ের কুটিরের দিকে অগ্রসর হইলাম।

আমার বিঘাওয়ের নিকট যাইবার ততটা ইচ্ছা ছিল না, কারণ বিঘাওয়ের রহস্যময় কথাবার্তা হয়তো সমস্ত ব্যাপারটাকে আরও জটিল করিয়া তুলিবে আমার এইরূপ একটা আশঙ্কা হইতেছিল। তবে একটা আশা আমার ছিল, হয়তো গিয়া দেখিব বিঘাও ঘুমাইতেছে। নিদ্রিত বিঘাওকে তুলিয়া তাহার সহিত আলাপ করিবার সাহস ধবলের হইবে না। কারণ ধবল বিঘাওকে মনে মনে বেশ ভয় করিত। কিন্তু গিয়া দেখিলাম, বিঘাও জাগিয়া আছে। আগুনের ধারে বসিয়া একটা কাঠবিড়ালী পুড়াইতেছে তাহার পুচ্ছটাকে কাটিয়া মাথার চুলে পরিয়াছে দেখিলাম। তাহার কথা শুনিয়া বুঝিলাম, তাহার মেজাজটাও ভাল আছে। আমাদের সে সাদর সম্ভাষণ করিল।

'এস, এস, তোমরা যে আসিবে তাহা পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, সেইজন্য তোমাদের অপেক্ষায় জাগিয়া আছি।'

'কি করিয়া বুঝিতে পারিলে?'

'এই যে—'

কাঠবিড়ালীর কর্তিত পুচ্ছটি সে মাথা হইতে নামাইয়া দেখাইল।

'অনেক কষ্টে আজ জানোয়ারটিকে ধরিয়াছি। ইহারা পুচ্ছের সাহায্যে অনেক দূরের খবর পায়, সেইজন্য পুচ্ছটিকে সর্বদাই তুলিয়া রাখে। ইহার পুচ্ছ যাহার মাথায় থাকে সে-ও

অনেক দূরের খবর পূর্বাহ্ণেই জানিতে পারে। আর একটা যদি ধরিতে পারি তোমাকেও একটা পুচ্ছ দিব। মাথায় পরিয়া থাকিও, তাহা হইলে তোমার বুদ্ধি আর একটু খুলিবে।'

অবজ্ঞাভরে হাসিয়া বিঘাও ধবলের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, 'কাঠবিড়ালীর মাংস একটু খাইবে? খাও। জংলাকেও একটু দাও।'

অগ্নিকুণ্ড হইতে সে ঝলসানো কাঠবিড়ালীটিকে টানিয়া বাহির করিয়া বলিল—'মুণ্ডটি এবং বুকটি আমি খাইব, বাকিটা তোমরা দুজনে ভাগ করিয়া খাও।'

ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীটি খাইতে বেশি সময় লাগিল না। আহার শেষ করিয়া ধবল বলিল, 'একটি বিশেষ প্রয়োজনে তোমার নিকট আসিয়াছি। জংলা রোহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছে। তাহার মুখ হইতে সব কথা শোন, শুনিয়া এখন কি করা উচিত তাহা বল।'

'রোহা কে?'

'উন্নগার অপর পারে যাহারা থাকে তাহাদের দলপতির নাম রোহা। তাহারা গরুর দুধ খায়। তোমার পরামর্শ অনুসারেই তো জংলা সেখানে গিয়াছিল। জংলা সব কথা বিঘাওকে বল।'

আমি সমস্ত ঘটনা বিঘাওকে পুনরায় বিবৃত করিয়া বলিলাম। বিঘাও বিস্ফারিত নেত্রে সমস্ত শুনিল। শুনিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ধবল পুনরায় প্রশ্ন করিল—'বল, এখন কি করা উচিত?'

বিঘাও সহসা মাটিতে দুই বাহু বিস্তারিত করিয়া আবার ভেকের মতো বসিল এবং বলিতে লাগিল —'ঘেক্ ঘেক্ ঘেক্ ঘেক্ ঘেক্ ঘেক্।'—বলিতে বলিতে সে ঘুরিতেও লাগিল।

ধবল ভয় পাইয়া গেল, চক্ষু দিয়া আমাকে ইঙ্গিত করিল, চল আমরা সরিয়া পড়ি। আমরা উভয়ে পরমুহূর্তে তাহার কুটির হইতে বাহিরে চলিয়া আসিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বিঘাও অট্টহাস্য করিয়া উঠিল. তাহার কথাও শোনা গেল।

'ধবল শোন শোন, ভয় পাইও না, আমার উত্তরটা বুঝিতে পারিলে কিনা বলিয়া যাও।'

আমরা পুনরায় তাহার কুটিরে প্রবেশ করিলাম। ধবলের কথা শুনিয়া মনে হইল, সে একটু চটিয়াছে।

ধবল বলিল, 'এইটুকু শুধু বুঝিতে পারিয়াছি যে, বিপদের সময় তোমার পরামর্শ চাহিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি ভয় দেখাইয়া আমাদের তাড়াইয়া দিতেছ।'

বিঘাও আবার অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

'ভয় দেখাই নাই, উত্তরই দিয়াছি। আমি যে সম্প্রদায়ে মানুষ হইয়াছিলাম সেখানে ইঙ্গিতের ভাষায় গোপন কথাবার্তা বলা নিয়ম ছিল। ভেকের অনুকরণ করিয়া আমি তোমাদেরই জানাইয়াছিলাম যে, ভেকের মতো আচরণ করাই এখন আমাদের পক্ষে সমীচীন হইবে। স্থলে যদি অসুবিধা হয় জলে নামিতে হইবে। জলে অসুবিধা হইলে স্থলে উঠিব। কিন্তু ভেকের মতো আচরণ করিয়াও আমাদের কুকুরের মতো সতর্ক থাকিতে হইবে—ঘেক্ ঘেক্ শব্দ করিয়া আমি ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছি।'

'রোহার শর্তে তাহা হইলে আমি সম্মত হই?'

বিঘাও নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কি যেন শুঁকিতে লাগিল।

'বাতাসে আমি যেন বিপদের গন্ধ পাইতেছে। কিন্তু এখন অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে যুগপৎ ভেক এবং কুকুর না সাজিলে উপায় নাই।'

পুনরায় সে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বাতাস শুঁকিতে লাগিল। আমার কোনো উত্তর দিল না। আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

ধবল বলিল, 'যতদূর বুঝিতেছি বিঘাও সম্মত আছে। কিন্তু আর একটা কথা তো বিঘাওকে জিজ্ঞাসা করা হইল না—'

ধবল আবার বিঘাওয়ের কুটিরে প্রবেশ করিল।

'আচ্ছা বিঘাও, জংলার পরিবর্তে আমি যদি শিলাঙ্গীকে বিবাহ করি তাহা হইলে শর্তটা কি আর একটু জোরালো হইবে না? শিলাঙ্গী যদি দলপতির পত্নী হয় তাহা হইলে তাহার প্রভাব আরও বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা।'

বিঘাও পুনরায় অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

'প্রস্তরকে যাহারা আরও কঠিন করিতে চায় তাহারা মূর্খ। জলকে যাহারা আরও তরল করিতে চায় তাহারাও মূর্খ। শিলাঙ্গীর কথা ভাবিবার আগে চিন্তা কর নিনানি কোথায় গেল? কেনই বা গেল?'

বিঘাও আবার হাসিয়া উঠিল।

পাংশুমুখে ধবল বাহিরে আসিয়া বলিল, 'ইহার নিকট আসাই অবিবেচনার কার্য হইয়াছে। লোকটা পাগল। মীংরা যে কোথা হইতে এটাকে আনিয়া জুটাইয়া দিয়া গেল জানি না! চল, এখন বিশ্রাম করা যাক, কাল সকালে উঠিয়া যাহা হয় ঠিক করিয়া ফেলিব।'

আমি ঘরে গিয়া দেখি প্রৌঢ়া ইলচি আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। আমার জন্য আহার শয্যা সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে।

'আমি জানিতাম তুমি আসিবে, সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। ধবলের জন্য খাটিয়া খাটিয়া তুমি সারা হইয়া গেলে। দিবারাত্রি ক্রমাগত পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিতেছ। এখন খাইয়া একটু বিশ্রাম কর। আমার নিজের ভালুকের চামড়াটা তোমাকে পাতিয়া দিয়াছি। ওটা যেমন নরম তেমনি গরম। আরামে ঘুমাইবে। এখন খাও কিছু। কন্যা নদী আজ আমাকে একটা কাছিম উপহার দিয়াছে। সেটা তোমার জন্য ঝলসাইয়াছি। উহাদের সহিত কি ঠিক হইল?'

'উহারা আমাদের সহিত যোগ দিতে রাজি আছে, কিন্তু দুইটি শর্তে।'

শর্ত দুইটি বলিলাম।

'ধবল কি বলে?'

'ধবল নিজেই শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিতে চায়।'

'তাই নাকি!'

ইলচির চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত হইল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে বলিল, 'তুমি এক কাজ করিতে পার?'

'কি?'

'একটা পাথর বাঁধিয়া আমাকে কন্যা নদীতে ডুবাইয়া দাও। এ দুর্বহ জীবন আমি আর বহিতে পারিতেছি না।'

ইলচি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আকুল নয়নে কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, 'ধবল শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিতে পারিবে না। কারণ, শিলাঙ্গী তাহাকে বিবাহ করিবে না।'

'কিন্তু শিলাঙ্গী তোমাকে তো বিবাহ করিবে? তাহাও কি আমার পক্ষে কম মর্মান্তিক?'

ইলচির কান্না কিছুতেই আর থামে না।

তাহার নিকট বারংবার শপথ করিতে হইল যে শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিলেও তাহাকে আমি অবজ্ঞা করিব না।

'নিম্ব-দেবতার নামে শপথ করিতেছ?'

'তাহাই করিতেছি।'

ইলচির মুখে হাসি ফুটিল। তাহার পীতবর্ণ অসম বৃহদ্দন্তগুলি মশাল আলোকে চকচক করিয়া উঠিল। আমাকে সযত্নে সে আহার করাইতে লাগিল।

'সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিশ্চয় তোমার পায়ে খুব ব্যথা হইয়াছে।'

'না, তেমন ব্যথা হয় নাই।'

'নিশ্চয় হইয়াছে। আমার কাছে কি লুকাইতে পারিবে? তুমি খাইয়া শোও আমি তোমার পা টিপিয়া দিতেছি।'

...কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, নিদারুণ কোলাহলে ঘুম ভাঙিয়া গেল। চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম ইলচি পাশে নাই, ভোর হইতেছে। কোলাহলের কারণ কি জানিবার জন্য ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলাম। দেখিলাম, কন্যা নদীর তীরে একটা ভিড় জমিয়াছে, এবং উত্তেজিতভাবে অনেকেই চিৎকার করিতেছে। আমিও সেদিকে গেলাম। আমাকে দেখিয়া ধবল তাড়াতাড়ি ভিড়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

'আজ সকালে কন্যা আমাদের কি উপহার দিয়াছে, দেখ।'

নিনানির জন্য শাখাপত্র দিয়া আমি যে শিরস্ত্রাণটি রচনা করিয়াছিলাম সবিস্ময়ে দেখিলাম, ধবলের হাতে সেই শিরস্ত্রাণটি রহিয়াছে। আমার সৃষ্টি আমার কাছেই ফিবিয়া আসিয়াছে আবার। নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। মনে হইল নিনানিও কি ফিরিয়া আসিবে আবার? অনেকক্ষণ নিনানির সহিত দেখা হয় নাই। সে এখন কি করিতেছে! তাহার জন্য মনটা উন্মুখ হইয়া উঠিল। অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম, সহসা কানে গেল ধবল বলিতেছে, 'ইচ্ছা করিলে শাখাপত্র দিয়া আমরাও এইরূপ জিনিস প্রস্তুত করিতে পারি, ইহাতে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য রাখিতে পারি।'

ঘেসু বলিল, 'ইহার চতুর্দিকে যদি কাদার প্রলেপ দেওয়া যায় চমৎকার একটি পাত্র হইবে।'

আর একজন বলিল, 'ঠিক বলিয়াছ—!'

আমাদের সমাজে এই শিরস্ত্রাণই বাসন সৃষ্টির প্রেরণা জোগাইয়াছিল। ধবলের কল্পনা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। সহসা সে শিরস্ত্রাণটি মাটির উপর রাখিয়া করজোড়ে তাহার সম্মুখে বসিয়া পড়িল। তাহার দেখাদেখি সকলেই করজোড়ে বসিল। আমিও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, আমিও নিজের সৃষ্টির সম্মুখে করজোড়ে বসিয়া পড়িলাম। কন্যার তরঙ্গে তরঙ্গে একটা মৃদু কলতান জাগিয়া উঠিল।

ধবল বলিতে লাগিল—'নিগূঢ় ইঙ্গিত করিয়া কন্যা আজ আমাদের একটি সুপরামর্শ দিয়াছে। শাখাপত্রময় এই বস্তুটি শুধু যে আমাদের পাত্র প্রস্তুত করিবার নির্দেশ দিতেছে তাহা নয়, আমাদের এই বিপদের সময় কন্যা আমাদের যেন বলিতেছে, একত্রিত হইলে সামান্য শাখাপত্রও যেমন অসামান্য বস্তুতে রূপান্তরিত হইতে পারে একত্রিত হইলে তোমরাও সেইরূপ অসাধ্য সাধন করিতে পার। উলম্ভনের যে শক্তি তোমরা দুর্জয় মনে করিতেছ একত্রিত হইলে তাহা আর দুর্জয় থাকিবে না। কলস্বরা কন্যা যেন বলিতেছে, তোমরা একত্রিত হও, একত্রিত হও, তাহা হইলে আর কোনো ভয় থাকিবে না।'

আমি চক্ষু বুজিয়া বসিয়াছিলাম। মনে হইল, সুদূর অতীত হইতে কে যেন কথা বলিতেছে। তোমরা একত্রিত হও, একত্রিত হও, এই বাণী যেন নূতন নয়। মনে হইল, এই বাণী আশ্রয় করিয়া আমরা কবে কোথায় যেন কোনো দুস্তর সমুদ্র পার হইয়াছিলাম। তুষার যুগের কথা মনে ছিল না, কাচিনের স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরস্পরের সাহায্য ব্যতিরেকে যে আমরা বাঁচিতে পারি না এই সত্য মনের প্রচ্ছন্ন স্তরে যেন সুপ্ত ছিল, ধবলের কথায় তাহা যেন আবার জাগ্রত হইল। পুরাতন কথা যেন নূতন করিয়া শুনিলাম।

ধবল সহসা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'ওই দেখ, কন্যার পরপারে যে কুয়াশা জমিয়াছিল তাহা ধীরে ধীরে কেমন কাটিয়া যাইতেছে। ওই শোন, কলস্বরা কন্যা বলিতেছে তোমরা যদি একত্রিত হও তোমাদের ভয়ও কাটিয়া যাইবে।'

চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম, সত্যই নদীর পরপারে কুহেলি-যবনিকা ধীরে ধীরে অপসারিত হইতেছে। আমরা সকলেই সবিস্ময়ে সেইদিকে চাহিয়া রহিলাম। প্রত্যহ যেমন হয় প্রভাত সূর্যের স্বর্ণ-কিরণ-জালে সেদিনও ধীরে ধীরে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সেদিন তাহা অপূর্ব মনে হইল। একটু পরেই কিন্তু সভয়ে আমরা চিৎকার করিয়া উঠিলাম। কুহেলিকা সম্পূর্ণ অপসারিত হইলে আমরা দেখিতে পাইলাম, পরপারের অরণ্য-প্রান্তে দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠদেহী এক ব্যক্তি বিরাট একটা প্রস্তরশূল হস্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। লোকটি যে উলস্তনের চর তাহাতে কাহারও সন্দেহ রহিল না। লোকটি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাদের নিরীক্ষণ করিয়া সহসা অরণ্যমধ্যে অন্তর্হিত হইল। আমরা সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। নারীরা আর্তনাদ করিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত পরিবেশটি যেন পরিবর্তিত হইয়া গেল।

'জংলা, আমি মতিস্থির করিয়া ফেলিয়াছি। রোহার শর্তে আমি রাজি আছি। তুমি এখনই গিয়া তাহাকে সংবাদ দাও। আমরা সম্মিলিতভাবে অবিলম্বে উলস্তনকে আক্রমণ করিব। তুমি এখনই চলিয়া যাও—জংলা, আর দেরি করিও না—' ধবল আমার দুই হাত ধরিয়া অনুনয় করিতে লাগিল। দলপতি হিসাবে সে আমাকে আদেশ করিতে পারিত, কিন্তু তাহা না করিয়া অনুনয় করিতে লাগিল। শুধু সে নয়, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বীর হিসাবে দলের মধ্যে আমার খ্যাতি ছিল, ধবলের আচরণ দেখিয়া সকলে মনে করিল, বর্তমান বিপদে আমিই বোধ হয় একমাত্র উদ্ধারকর্তা। সকলেই যুগপৎ বলিতে লাগিল—'জংলা, আর দেরি করিও না, চলিয়া যাও।' আমি আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, উন্নগা পর্বতের উদ্দেশ্যে আমাকে যাত্রা করিতে হইল।

...উন্নগা পর্বতে উঠিতেছিলাম। কিছুদূর উঠিয়া দেখিলাম পাহাড়ী ছাগলের দল উপত্যকায় নামিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নিনানির কথা মনে পড়িল। কিছুক্ষণ পূর্বে যেমন শরীরী জনতা আমাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল অশরীরী স্মৃতিসমূহ তেমনি আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। নিনানির অসংখ্য স্মৃতি আমার মানসপটে অসংখ্য মূর্তি ধরিয়া যেন বলিতে লাগিল—'জংলা, তুমি এ কি করিতেছ! আমাকে এমনভাবে ফেলিয়া কোথায় চলিয়াছ তুমি? তোমার জন্যই যে আমি সমাজ পরিত্যাগ করিয়া নির্জন গুহায় বাস করিতেছি তাহা কি ভুলিয়া গেলে? শিলাঙ্গী কি আমার চেয়েও বেশি সুন্দর? সে কি তোমার প্রতিশ্রুতির চেয়েও বড়?'

রোহার কাছে যাইব বলিয়া বাহির হইয়াছিলাম, কিন্তু চলিতে লাগিলাম পঞ্চ-পর্বতের উদ্দেশ্যে। ঠিক করিলাম, নিনানির সঙ্গে দেখা করিয়া তাহার পর রোহার সহিত দেখা করিব।

ইহাও ঠিক করিয়া ফেলিলাম নিনানিকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিব, শিলাঙ্গীর কথাও তাহার কাছে গোপন করিব না, তাহাকে বলিব যে আমাদের দলের হিতার্থে উলম্ভনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বাধ্য হইয়া আমি শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিতেছি। কথাটা মিথ্যা হইবে না এবং দলের জন্য বাধ্য হইয়া কিছু করিলে নিনানি আপত্তিও করিতে পারিবে না। আজও যেমন তোমরা সত্যকে নানা মুখোশ পরাইয়া আবৃত করিবার প্রয়াস পাও আমরাও ঠিক তেমনই পাইতাম। আমরা আরও বেশি করিয়া পাইতাম, কারণ যে ষড়রিপু আমাদিগকে সত্য পথ হইতে বারংবার ভ্রষ্ট করে সে যুগে আমরা সে ষড়রিপুর দাস ছিলাম। তাহাদেরই নির্দেশে আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হইত। সামাজিক প্রয়োজনে আত্মত্যাগমূলক যে সকল আইন আমরা করিয়াছিলাম সেই আইনকেই অনেক সময় আমরা মুখোশ করিতাম, তখন আমি যেমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। সমাজের কল্যাণের জন্য যখন শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিতে হইতেছে তখন নিনানি আইনত কিছুই বলিতে পারিবে না। তাহার অন্তর্যামী মন হয়তো সব কথা জানিতে পারিবে। কিন্তু সে মনকেও কালক্রমে আমি প্রতারিত করিতে পারিব এ বিশ্বাস আমার ছিল। কি করিয়া তাহার কাছে কথাটা পাড়িব, তাহাকে কি কি বলিব, তাহার প্রতি আমার ভালবাসা যে অটুট আছে এবং চিরকাল যে অটুট থাকিবে তাহার কি প্রমাণ দিব, এইসব ভাবিতে ভাবিতেই আমি উন্নগা পর্বতের চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করিয়া চলিয়াছিলাম। সহসা একটা অপ্রত্যাশিত বাসনা আমার গতিরোধ করিল। মনে হইল, নিনানি ছাগলের মাংস খুব ভালবাসে। তাহার জন্য একটা ছাগল শিকার করিয়া লইয়া গেলে কেমন হয়। যদিও সঙ্গে তীরধনুক ছিল না, তবু মনে হইল পর্বতের সানুদেশে যে অরণ্য আছে তাহার ভিতর ঢুকিয়া সংগোপনে যদি ওই পর্বতের নাতি-উচ্চ চূড়াটার উপর উঠিতে পারি তাহা হইলে প্রস্তর ছুঁড়িয়াই একটা ছাগলকে বোধ হয় ঘায়েল করিতে পারিব। একটা ছাগলের মাথায় কিংবা পায়ে যদি মারিতে পারি...। সঙ্গে সঙ্গে বসিয়া পড়িলাম এবং লোলুপ সরীসৃপের মতো পর্বতের সানুদেশের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

...আমার চেষ্টা বিফল হয় নাই। প্রস্তরের আঘাতেই একটা বড় ছাগলকে চলচ্ছক্তিহীন করিয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। ছাগলটা মরে নাই। তাহাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছিলাম। তাহার আর্তস্বর পার্বত্য বনস্থলীকে সচকিত করিয়া তুলিতেছিল। আমার অন্তরে পুলক সঞ্চারিত হইতেছিল, আমি আশা করিতেছিলাম, আমার অদর্শনে নিনানির মনে যদি কোনো ক্ষোভ সঞ্চিত হইয়া থাকে এই পুষ্টদেহ বন্য ছাগলটি তাহা নিশ্চয়ই নিঃশেষে বিদূরিত করিবে। সে যখন প্রসন্ন হইবে তখনই শিলাঙ্গীর সহিত বিবাহের প্রসঙ্গটা তাহার নিকট উত্থাপন করিব। সমস্ত কথা শুনিয়াও কি সে আপত্তি করিবে? হয়তো সে মুখে কিছুই বলিবে না, কিন্তু ভয় হইতে লাগিল, তাহার অনুরাগ-ভরা চাহনি, আবদারমাখা ওষ্ঠভঙ্গী নীরব ভাষায় হয়তো এমন কিছু বলিবে যে আমি বিপন্ন হইয়া পড়িব। শিলাঙ্গী আমার মনের কথা বুঝিয়াছে, তাহারও প্রথমে ইচ্ছা ছিল না যে আমি একাধিক স্ত্রীর সহিত যুক্ত থাকি, কিন্তু এখন সে মত পরিবর্তন করিয়াছে। বলিয়াছে, আমি যদি নিনানিকে বিবাহ করি তাহাতে সে আপত্তি করিবে না, নিনানিকে সে সহ্য করিতে প্রস্তুত আছে। নিনানিই বা শিলাঙ্গীকে সহ্য করিবে না কেন? নিনানি অবুঝ, তাহাকে বুঝাইতে হইবে। যেমন করিয়া হউক বুঝাইতে হইবে যে শিলাঙ্গী যদিও আমার জীবনে অপরিহার্য কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়াও আমি থাকিতে পারিব না। তাহাকে বুঝাইতে হইবে শিলাঙ্গীকে আমি বাধ্য হইয়া নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দলপতি ধবলের আদেশে বিবাহ করিতেছি, কিন্তু আমি তাহাকেই ভালবাসি।

শিলাঙ্গী নামে মাত্র আমার পত্নী থাকিবে, নিনানিই হইবে আমার হৃদয়েশ্বরী। এই সব তাহাকে বুঝাইতে হইবে। কত কথাই সেদিন ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সমস্ত ভয়-ভাবনা আশঙ্কা-সংশয়ের মধ্যে একটা বিশ্বাস অবিচলিত ছিল—নিনানি আমার প্রস্তাবে রাজি হইবে, সে রাগ করিবে, কাঁদিবে, অসম্মত হওয়ার ভান করিবে, হয়তো আমাকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া দিবে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজি হইবে সে।

যক্ষিণীর গুহার নিকটবর্তী হইয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম খানিকক্ষণ। প্রথম দিন গিয়া গাছে-গাছে যে বিচিত্রবর্ণ পক্ষীকুল দেখিয়াছিলাম সেদিনও তাহারা ঠিক তেমনিভাবে বসিয়াছিল। আর কাহাকেও কিন্তু দেখিতে পাইলাম না, এমন কি ময়াল সাপটাকেও না, এলোমেলো হওয়ায় দেবদারু বৃক্ষশ্রেণীর শাখাপত্রে একটা অদ্ভুত মর্মরধ্বনি উঠিতেছিল, মনে হইতেছিল বহুদূরে কে রোদন করিতেছে। অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় আমার সমস্ত চিত্ত আকুল হইয়া উঠিল, আমি দ্রুতপদে যক্ষিণীর গুহার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলাম। গুহারে দ্বারের কাছে আসিতেই দুইটি শকুনি ডানা ঝটপট করিয়া গুহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া গেল। গুহার ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম যক্ষিণী নাই। মৃত হরিণের কঙ্কাল ও অন্ত্রগুলা চতুর্দিকে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। শকুনি দুইটা এইগুলার লোভেই আসিয়াছিল। কিন্তু যক্ষিণী কোথায় গেল? ময়াল সাপের গুহার আগড়টাও দেখিলাম খোলা রহিয়াছে। সেখানে গিয়া দেখি, ময়াল সাপটাও নাই। কোথায় গেল সব? তাড়াতাড়ি ছুটিয়া নিনানির গুহার কাছে গেলাম। নিনানিও নাই। গুহার ভিতব ঢুকিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম। খড়ের স্তূপ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, নিনানি নাই।

'নিনানি—'

কেহ সাড়া দিল না।

'নিনানি—'

পরিচিত উত্তরের আশায় উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, কিন্তু কোনো উত্তর আসিল না।

'নিনানি—নিনানি—নিনানি—'

আমারই আহ্বানের প্রতিধ্বনি বারংবার আমার কাছে ফিরিয়া আসিল, নিনানি আসিল না।

উন্মত্তবৎ চতুর্দিকে সন্ধান করিতে লাগিলাম, কিন্তু নিনানিকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। যেখানে নিনানি খনিত্র পূজা করিয়াছিল সেখানে গেলাম। ভূমিতে প্রস্তরে মূষিকরক্তের চিহ্ন লাগিয়া রহিয়াছে, দুই একটা শুষ্ক ফুলের পাপড়িও পড়িয়া আছে, কিন্তু নিনানি নাই। যে ঝরনায় নিনানিকে স্নান করাইবার জন্য লইয়া গিয়াছিলাম, ছুটিয়া সেখানে গেলাম, কিন্তু সেখানেও নিনানি ছিল না। অপরাজিতা পুষ্পদল আমার মুখের দিকে চাহিয়া এক রহস্যময় হাসি হাসিতে লাগিল। মনে হইল তাহারা বুঝি নিনানিকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। অপরাজিতা কুঞ্জ ছিন্নভিন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু নিনানিকে পাইলাম না। নদীতট অরণ্য উপত্যকা সর্বত্র খুঁজিলাম কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান মিলিল না। যক্ষিণী অথবা নিনানী কাহারও সন্ধান না পাইয়া শুধু যে বিস্মিত হইয়াছিলাম তাহা নয়, ভীতও হইয়াছিলাম। মনে হইতেছিল, যে অনির্দিষ্ট অদৃশ্য শক্তি নিনানিকে এমনভাবে অপহরণ করিয়াছে, সে কি আমাকেও নিস্তার দিবে? দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে লাগিলাম। কিছুদূর ছুটিয়া আবার দাঁড়াইয়া পড়িলাম। সহসা মনে হইল নিনানিকে এই নির্জন অরণ্যে ফেলিয়া রাখিয়া কোথায় যাইতেছি। আমিই যে তাহাকে এ স্থানে আনিয়াছিলাম, আমারই প্ররোচনায় সে যে এই ভয়াবহ স্থানে নির্জন গুহায়

বাস করিতে সম্মত হইয়াছিল। এখন তাহাকে ফেলিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছি? আবার ফিরিলাম। নিনানির গুহায় ফিরিয়া আসিলাম আবার।

'নিনানি—নিনানি—নিনানি—নিনানি—নিনানি—'

আমার চিৎকারে বনভূমি প্রকম্পিত হইতে লাগিল। পক্ষীকুল চঞ্চল হইয়া কলরব করিয়া উঠিল। কিন্তু নিনানির সাড়া পাইলাম না। আমি তখন সেই শূন্য গুহায় সেই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শুষ্ক খড়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। মনে হইল, আমার হৃৎপিণ্ডটিকে দুই হাতে কে যেন মুচড়াইয়া দিতেছে, কোনো অদৃশ্য হস্ত আমাকে যেন নির্মমভাবে প্রহার করিতেছে। অসহায়ভাবে আমি সেই পরিত্যক্ত গুহায় লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কতক্ষণ কাঁদিয়াছিলাম জানি না, তর্জন শুনিয়া আবার আমাকে তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া বসিতে হইল। দেখিলাম, গুহার সম্মুখে গাছের যে প্রকাণ্ড শিকড়টা বাহির হইয়াছিল সেই শিকড়টাকে বেষ্টন করিয়া ময়াল সাপটা আমার দিকে নিষ্পলক হিংস্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। পর মুহূর্তেই আমি আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইলাম। গুহার মধ্যে কয়েকটা প্রস্তর খণ্ড পড়িয়াছিল সেগুলি তুলিয়া তুলিয়া আমি তাহার দিকে সজোরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। ময়ালের মুখে কয়েকটা লাগিল কিন্তু তাহাতে সে নিরস্ত হইল না। দেখিলাম, ধীরে ধীরে সে গুহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমি এক লম্ফে গুহা হইতে বাহির হইয়া ছুটিতে লাগিলাম। কিছুদূর গিয়া আবার একটা সোঁ সোঁ শব্দ শুনিয়া আমাকে থামিয়া যাইতে হইল। আহত ময়ালটা আমাকে অনুসরণ করিতেছে নাকি? ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া প্রথমটা কিছুই দেখিতে পাই নাই, তাহার পর পাইলাম। দেখিলাম, আর একটা ময়াল। আমি যে ছাগলটাকে যক্ষিণীর গুহার সম্মুখে ফেলিয়া গিয়াছিলাম দেখিলাম আর একটা ময়াল সেইটাকে পাকে পাকে জড়াইয়া নিষ্পিষ্ট করিতেছে। আমি আবার ছুটিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল, আশেপাশে বোধ হয় আরও ময়াল সাপ আছে, তাহারা হয়তো এইবার আমাকে আক্রমণ করিবে।

...সুড়ঙ্গের অপর পারে শিলাঙ্গী আমার অপেক্ষায় বসিয়াছিল। আমি বাহির হইতেই সাগ্রহে সে ছুটিয়া আসিল।

'তুমি কত দেরি করিলে! কতক্ষণ যে তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছি—'

আমি যে নিনানির খোঁজে গিয়াছিলাম সেকথা তাহাকে আর বলিলাম না। এখন ভাবিতেছি, কেন বলি নাই?

'চুপ করিয়া আছ যে? ধবল কি বলিল?'

'রোহার শর্তে ধবল রাজি হইয়াছে।'

'হইয়াছে?'

শিলাঙ্গী হাততালি দিতে দিতে আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া নাচিতে লাগিল। তাহার পর সহসা আমাকে জড়াইয়া ধরিল।

'ঝোনঝিরা এখনও ফেরে নাই। চল, রোহার কাছে যাওয়া যাক। রোহা নিশ্চয় তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে।'

'চল।'

...রোহা আমার প্রতীক্ষা করিতেছিল। সমস্ত শুনিয়া সে চুপি চুপি বলিল, 'সুখী হইলাম। কাল তোমার সহিত শিলাঙ্গীর বিবাহ হইয়া যাক। তাহার পর আমাদের লোক তোমাদের ক্ষেত হইতে তৃণশস্য কাটিয়া আনিতে যাইবে।'

'তাহারা কত তৃণশস্য কাটিবে তাহা কি ঠিক হইয়াছে?'

'হইয়াছে। আমাদের দুইজন লোক সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যত তৃণ কাটিয়া আনিতে পারে প্রতি পূর্ণিমায় তত তৃণ তোমাদের দিতে হইবে, আপাতত ইহাই আমি ঠিক করিয়াছি। ইহাতে ধবল আশা করি আপত্তি করিবে না। সমস্ত দিনে দুইজন লোকে কত তৃণই বা সংগ্রহ করিবে। তোমাদের কথা ভাবিয়াই আমি এই ব্যবস্থা করিয়াছি। তোমার আশা করি ইহাতে আপত্তি নাই।'

'না।'

'বেশ, তাহা হইলে আমি বিবাহের আয়োজন করি। আমাদের বিবাহের একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইবে। তুমি ধবলকে লইয়া কাল সকালেই এখানে চলিয়া আসিও। শিলাঙ্গী কিন্তু কাল সকাল হইতে লুকাইয়া থাকিবে। তুমি আসিয়া খুঁজিয়া বাহির করিবে তাহাকে। যতক্ষণ না খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে ততক্ষণ বিবাহ হইবে না। এই ব্যাপারটাতেই একটু বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা আছে। শিলাঙ্গীকে খুঁজিয়া পাইবার পর অবশ্য বেশি বিলম্ব হইবে না। তোমরা তখন উভয়ে এক পাত্র হইতে দুগ্ধ পান করিবে। তাহার পর আমি এবং তোমাদের দলপতি ধবল উভয়ে মিলিয়া তোমাদের এক সঙ্গে বাঁধিয়া দিব। দীর্ঘ বন্যলতা দিয়া তোমার হাতের সঙ্গে শিলাঙ্গীর হাত, তোমার কোমরের সঙ্গে শিলাঙ্গীর কোমর, তোমার পায়ের সঙ্গে শিলাঙ্গীর পা বাঁধিয়া দিয়া আমরা দুইজনে সরিয়া যাইব। তাহার পর আমাদের পুরোহিত নম্বরু আসিয়া তোমাদের কানে কানে কি বলিবে। কি যে বলিবে তাহা নম্বরু ছাড়া আর কেহ জানে না, জানিবেও না, কারণ, নম্বরু তাহা তোমাদের প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিবে। তাহার নিষেধ অমান্য করিলে অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। নম্বরু বেশি সময় লইবে না। তাহার পর আসিবে কথক এবং আমাদের দলের যুবক যুবতীরা। তাহারা তোমাদের ঘিরিয়া নৃত্য গীত করিবে। তোমাদেরও তাহাদের সহিত নৃত্য গীত করিতে হইবে। নৃত্য গীত শেষ হইলে তাহারা মশাল জ্বালিয়া তোমাদের সঙ্গে করিয়া কন্যা নদীর তীরে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে। ইহাই হইল আমাদের বিবাহের পদ্ধতি। কাল একটু সকাল সকাল আসিও।'

আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া রোহা ফিসফিস করিয়া কথাগুলি বলিল। মনে হইল সে যেন বিবাহের কথা বলিতেছে না, কোনো ষড়যন্ত্রের কথা বলিতেছে। আমি রোহার কাছে একাই ছিলাম, শিলাঙ্গী বাহিরে কোথাও অপেক্ষা করিতেছিল। হঠাৎ আর একটি কিশোরী ছুটিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল এবং আমার উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া রোহার কোলের উপর গিয়া বসিল। তাহার পর এক হাত দিয়া রোহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাহাকে চুম্বন করিল সে। রোহা বিব্রত বোধ করিতেছিল, কিন্তু শান্তিপ্রিয়তার জন্যই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক, সে মেয়েটির এই আচরণের কোনো প্রতিবাদ করিল না।

মেয়েটি বলিল— 'রোহা, শুনিতেছি নাকি শিলাঙ্গীর বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে?'

'হাঁ। এই যুবকটির সহিত কাল তাহার বিবাহ হইবে।'

মেয়েটি এমনভাবে আমার দিকে চাহিল যেন এতক্ষণ সে আমাকে দেখিতে পায় নাই। একবার মাত্র আমাকে দেখিয়া তাহার পর এমন বিশ্রী মুখভঙ্গি করিল যাহার অর্থ ভাষায় অনুবাদ করিলে দাঁড়ায়—'আহা, কি পছন্দ!'

রোহা আমার দিকে চাহিয়া বলিল—'এটি আমার কনিষ্ঠা পত্নী হিং।'

হিং তর্জন করিয়া উঠিল, 'কেবল কনিষ্ঠা পত্নী? আর কিছু নই নাকি?'

'হ্যাঁ, প্রিয়তমা পত্নীও।'

হিং আবার তাহাকে চুম্বন করিল। এবং পরমুহূর্তে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

রোহা তখন চুপি চুপি বলিল, 'ইহারাই শিলাঙ্গীর শত্রু। তুমি ইহাদের সহিত সাবধানে কথাবার্তা বলিও।'

'আমি কোনো কথাই বলিব না।'

'সেই ভাল। নীরবতাই শান্তিলাভের সহজ উপায়।'

আমি তখন রোহাকে একটি প্রশ্ন করিলাম। কারণ ফিরিয়া গেলেই ধবল আমাকে এই প্রশ্নটি করিবে।

'বিবাহ হইয়া গেলেই কি আমরা সম্মিলিতভাবে উলন্তনকে আক্রমণ করিব?'

'সেটা নির্ভর করিতেছে ঝোনঝিরার উপর, সে ফিরিয়া আসুক, তখন এ বিষয়ে আলোচনা হইবে। আমি নিজে যুদ্ধের পক্ষপাতী নই। তুমি কি যুদ্ধ চাও?'

'না। এখন যুদ্ধ হইলে শিলাঙ্গীকে ফেলিয়া আমাকে যুদ্ধে যাইতে হইবে। তাহা আমার ইচ্ছা নয়।'

গম্ভীর রোহাকে এতক্ষণে হাসিতে দেখিলাম। আমার এই কথায় তাহার দন্তরাজি নীরবে বিকশিত হইল এবং কিছুক্ষণ বিকশিত হইয়াই রহিল।

'আমি চেষ্টা করিব যাহাতে যুদ্ধ এখন না হয়। ঝোনঝিরা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত তো কিছুই স্থির হইবে না।'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। হিং আর একবার উঁকি দিয়া চলিয়া গেল।

রোহা বলিল, 'তোমার আর যদি কোনো বক্তব্য না থাকে, তুমি যাইতে পার। ধবলকে লইয়া কাল খুব ভোরেই এখানে চলিয়া আসিবে। কারণ শিলাঙ্গী যে কতক্ষণ আত্মগোপন করিয়া থাকিবে তাহার স্থিরতা নাই।'

আমি উঠিয়া চলিয়া আসিলাম। শিলাঙ্গী বাহিরে আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। আমাকে দেখিয়াই তাহার সমস্ত মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

'রোহার নিকট সমস্ত শুনিলে তো? কাল সকাল সকাল আসিও, আমি এমন জায়গায় লুকাইব যে সহজে আমাকে খুঁজিয়া পাইবে না, তোমাকে নাকাল করিয়া তাহার পর ধরা দিব।'

'ঠিক তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া ফেলিব, দেখিও।'

'আচ্ছা দেখা যাইবে। শেষে খোশামোদ করিতে হইবে। শিলাঙ্গী কোথায় আছ দেখা দাও, যাহা চাও তাহাই দিব, দেখা দাও।'

'তোমাকে খোশামোদ করিতে আমার আপত্তি নাই। তুমি কি চাও বল না, তাহাও তোমাকে আনিয়া দিব। মীংরা এবার আসিবার সময় আমার জন্য কুমীরের দাঁতের হার আনিবে বলিয়া গিয়াছে। যদি আনে তাহাই তোমাকে দিব।'

'তাহা দিও। কিন্তু সত্যসত্যই যে জিনিসটি আমি প্রাণ দিয়া চাই তাহা দিবে তো?'

'কি সেটি?'

'তোমার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব।'

'নিশ্চয় দিব।'

'কাল আমাকে খুঁজিবার সময় বারংবার এই প্রতিশ্রুতিটি চিৎকার করিয়া বলিতে হইবে

কিন্তু। নিগম বনের বৃক্ষলতা পশুপক্ষী সকলে সাক্ষী থাকিবে, উন্নগা পর্বত সাক্ষী থাকিবে, আমাদের দলের সকলেও সাক্ষী থাকিবে। বলিবে তো?'

'নিশ্চয় বলিব।'

'কাল কখন আসিবে তোমরা?'

'ধবলকে গিয়া বলি। তাহাকে সঙ্গে করিয়া যখন আনিতে হইবে তখন তাহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কিছুই বলিতে পারিতেছি না। তবে চেষ্টা কবিব খুব সকাল সকাল যাহাতে আসিতে পারি। আর একটা কথা, ধবল ওই সুড়ঙ্গ পথ দিয়া কি আসিতে পাবিবে? এখানে আসিবার আর কোনো পথ আছে?'

'আছে। কিন্তু তাহাতে অনেকটা ঘুরিতে হইবে। চল, সেটাও তোমাকে দেখাইয়া দিতেছি।'

আমরা উভয়ে উন্নগা পর্বতের দিকে অগ্রসর হইলাম।

...আমি চলিয়া আসিবার পর কন্যা নদীর পরপারে শূলধাবী ব্যক্তিটিকে আবার নাকি দেখা গিয়াছিল। আমি গিয়া দেখিলাম, নিম্ব-সম্প্রদায়ের সকলেই উত্তেজিত হইয়া রহিয়াছে। আমাকে দেখিয়া সকলেই ছুটিয়া আসিল। ধবলের মুখ দেখিলাম ভয়ে পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

'কি হইল? রোহা কি বলিল?'

ধবল ছুটিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল আমাকে।

'রোহা সম্মত হইয়াছে। কাল প্রত্যুষে উঠিয়া আমাদের দুইজনকে রোহার নিকট যাইতে হইবে। কালই সে শিলাঙ্গীর সহিত আমার বিবাহ দিতে চায়। আমাদের শস্যও সে অধিক লইবে না। তাহাদের দলের দুইজন লোক প্রতি পূর্ণিমায় আসিবে। আমার মনে হইল এ দাবি অন্যায় নয়, তাই আমি সম্মত হইয়া আসিয়াছি।'

'আমিও সম্মত। কালই বিবাহ হোক। আমাকেও যাইতে হইবে?'

'তাহাদের বিবাহের পদ্ধতি অনুসারে দলপতির থাকা প্রয়োজন।'

'কিন্তু উলম্ভনের লোক যেরূপ ঘন ঘন হানা দিতেছে তাহাতে আমার অনুপস্থিত থাকা কি সঙ্গত হইবে?'

এমন সময় বোঁ বোঁ বোঁ বোঁ করিয়া একটা শব্দ হইল। এরূপ শব্দ আমরা আর কখনও শুনি নাই, সকলেই ভীত হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিলাম। শব্দটা ক্রমশ নিকটবর্তী হইতে লাগিল। মেয়েরা এবং শিশুরা সবেগে নিজ নিজ কুটিরের দিকে ধাবিত হইল। ধবল আদেশ করিল—'সকলে নিজ নিজ কুটিরের দ্বারে গিয়ে অবস্থান কর। বিপদ কোন্ দিক হইতে আসিতেছে সন্ধান করিয়া দেখি। তোমরা সকলে প্রস্তুত হইয়া থাক।'

ধবল সবেগে নিম্ব-বৃক্ষটির দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল। বিপন্ন হইলে সে নিম্ব-দেবতারই আশ্রয় লইত। আমিও আমার নিজের কুটিরের দিকে চলিয়া গেলাম। গিয়া দেখিলাম সেখানে ইলচি এবং ধবলের অন্যান্য পত্নীগণও সন্তান-সন্ততিসহ সমবেত হইয়াছে। সকলেরই মুখে এক কথা,—'এইবার আমাদের সর্বনাশ হইল, এইবার আমরা সদলে সবংশে নিহত হইলাম। আর ধবল আমাদের বাঁচাইতে পারিল না। জংলা, চল তোমার সহিত পলায়ন করি।'

বিশেষ করিয়া ইলচি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া ক্রমাগত এই কথা বলিতে লাগিল। আমি দ্বারপ্রান্তে বিব্রত বিপন্ন হইয়া সবলে প্রস্তর কুঠারটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া ছিলাম। আমার মনে হইতেছিল এইবার বুঝি সব শেষ হইয়া গেল। শিলাঙ্গীকে আর দেখিতে পাইব না।

নিনানির মুখটাও মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। মনে হইল সে যেন সুদূরলোকে বসিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহস্যময় হাসি হাসিতেছে। যেন বলিতেছে— 'আমাকে প্রতারণা করিয়া শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিতে যাইতেছিলে, দেখ এইবার কি হয়! বিঘাওয়ের ভবিষ্যদ্বাণীকে অবিশ্বাস করিয়া আমাকে লুকাইয়া রাখিয়া আমার মৃত্যু-সংবাদ প্রচার করিয়াছিলে, ভাবিয়াছিলে যে, আমার কিছু হইবে না, কানা কিন্তু আমাকে শাস্তি দিতে ভোলে নাই, আমার মৃত্যুই হইয়াছে। এইবার তুমি শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও। তোমার এবার আর শিলাঙ্গীকে লাভ করা হইল না। শিলাঙ্গীর পরিবর্তে কঠোর মৃত্যু তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। প্রস্তুত হও।'

হঠাৎ বোঁ বোঁ শব্দটা থামিয়া গেল। আমার হৃৎস্পন্দনও সহসা থামিয়া গেল যেন। কুঠারের হাতলটা আরও জোরে চাপিয়া ধরিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়াছিল, কিছুই দেখা যাইতেছিল না। কাহারও মুখ দিয়া একটি শব্দ নির্গত হইতেছিল না, অন্ধকার ঘরে আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আমরা নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। একটু পরেই একটা হাসির শব্দ শোনা গেল। মনে হইল গল্প করিতে করিতে কাহারা যেন আমাদের কুটিরের দিকেই আসিতেছে। ধবলের কণ্ঠস্বব শুনিতে পাইলাম। আর একটু পবেই ধবল আমার কুটিরের সম্মুখে আসিয়া ডাক দিল।

'জংলা, বাহির হইয়া এস। মীংরা আসিয়াছে—'

আশঙ্কা মুহূর্তেই আনন্দে রূপান্তরিত হইল। আমরা সকলে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

ধবল বলিল, 'এখন মীংরা আসাতে আমার একটা সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। কাল আমাকে রোহার নিকট যাইতে হইবে, ভাবিতেছিলাম কাহাকে এখানে বাখিয়া যাইব। মীংবা থাকিলে চিন্তার কোনো কারণ নাই। তোমরা মশাল জ্বাল, মীংরাকে খাবার দাও—'

মীংরাকে ঘিরিয়া আমাদেব উৎসব জমিয়া উঠিল। আমাদের প্রত্যেকের জন্যই মীংরা কিছু না কিছু উপহার আনিয়াছিল। কাহারও জন্য রঙীন ঝিনুক, কাহারও জন্য কড়ি, কাহারও জন্য অদ্ভুতাকৃতির প্রস্তরখণ্ড, কাহাব জন্য পাখির পালক, কাহারও জন্য পশু-চর্ম। আমার জন্য কুম্ভীর দন্তের মালা আনিতে সে ভোলে নাই। নিনানির জন্য সে একটি ভল্লুক-চর্ম আনিয়াছিল, কিন্তু ইলচি সেটি অধিকার করিল।

মীংরা প্রশ্ন করিল, 'তোমাদের ফসল কেমন হইতেছে?'

'প্রথম প্রথম ভাল হইয়াছিল। এবার কিন্তু তেমন ভাল হয় নাই। আমি চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি।'

ধবলের মুখের দিকে নীরবে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া মীংরা বলিল, 'চিন্তার কোনো কারণ নাই। জমিকে ভাল করিয়া পূজা করিতে হইবে। পূজা করিবার নূতন পদ্ধতি আমি তোমাকে শিখাইয়া দিয়া যাইব। আমি নানাস্থানে ঘুরিয়া অনেক নূতন জিনিস শিখিযা আসিয়াছি।'

আমরা সকলে সবিস্ময়ে মীংরার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মশাল আলোকে তাহার চোখের দৃষ্টিতে যে চতুরতা সেদিন পরিস্ফুট হইয়াছিল তাহার অর্থ সেদিন বুঝিতে পারি নাই। অনেক পরে পারিয়াছিলাম।

'বোঁ বোঁ করিয়া শব্দটা কিসের হইতেছিল—'

আমি আর কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

ধবলর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া মীংরা বলিল, 'ওটি একটি প্রেতাত্মা, উহাকে আমি বশ করিয়াছি। উহার অদ্ভুত ক্ষমতা, উহা তোমাকে নির্ভুলভাবে চালিত করিতে পারে। আমি এখানে আসিবার পথ ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ওই প্রেতাত্মাই শব্দ করিতে করিতে আমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছে।

উহার শব্দ অনুসরণ করিলে ভুল হইবার উপায় নাই। ওটি আমি ধবলকে উপহার দিয়া যাইব। আমি আর একটিকে বশ করিয়া লইব। বশ করিবার মন্ত্রটি আমি শিখিয়াছি—।'

মীংরা বলিল— 'অনেক নূতন জিনিস আমি শিখিয়াছি, সব তোমাদেব শিখাইয়া দিব। ঝিনা নদীর তীরে যে শাল সম্প্রদায় বাস করে তাহারা চমৎকার বাসন প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে। কয়েক দিন তাহাদের মধ্যে বাস করিয়া প্রণালীটি আয়ত্ত করিয়াছি। অনেকেই আজকাল বাসন প্রস্তুত করিতেছে। নীহু, রাবো, ঘংকাও হয়তো ইহা শিখিয়াছে। তাহারাও হয়তো একদিন আসিয়া তোমাদের ইহা শিখাইতে চাহিবে। তৎপূর্বে আমিই তোমাদের শিখাইয়া দিব, একটি পাথরের খনির সন্ধানও আনিয়াছি। কিন্তু সর্বপ্রথমে উলম্ভনের সহিত বিবাদের একটা নিষ্পত্তি হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। আরও অনেক স্থানে উলম্ভনের কথা আমি শুনিয়াছি। মৃত্যুভয়ে ভীত হইযা বিরাট বিরাট প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া সে নিজের কবর প্রস্তুত করিতেছে। যাদুকর টম্ভা তাহাকে বলিয়াছে সে যদি শৃঙ্গধী পর্বতের উপর প্রস্তরনির্মিত একটি কবরগৃহ নির্মাণ করিতে পারে তাহা হইলে সে দীর্ঘায়ু হইবে: সে আরও বলিয়াছে সেই কবরগৃহের প্রাচীরে এমন একটি ছিদ্র যদি থাকে যে ছিদ্র দিয়া প্রভাতের প্রথম সূর্যালোক তাহাব সমাধি-গহ্বরে প্রবেশ করিতে পারিবে তাহা হইলে উলম্ভন অমব হইবে। যাদুকর টম্ভা বলে যদি কোনো আবৃত স্থানে কেহ নিজের কবর খনন কবিয়া রাখে এবং সেই কবরে যদি প্রথম সূর্যালোক প্রত্যহ প্রবেশ করে তাহা হইলে সেখানে আর কোনো মনুষ্যের শবদেহ স্থান পাইবে না, কারণ স্বযং সূযদেবতা ওই স্থানটি নিজের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। টম্ভার পরামর্শ অনুসাবে উলম্ভন তাই নিজেব জন্য ওইরূপ একটি কবরগৃহ প্রস্তুত করিতেছে। টম্ভার নির্দেশে সে দূরবর্তী এক পর্বত হইতে বড় বড় প্রস্তর-খণ্ড সংগ্রহ কবিবাব জন্য উন্মত্ত হইযা উঠিয়াছে। সেই প্রস্তরগুলি কাটিয়া শৃঙ্গধী-পর্বত-শীর্ষে হইযা যাইতে হইলে অনেক লোক চাই। সেইজন্য উলম্ভন লোকের সন্ধান করিতেছে। ছলে বলে কৌশলে যেমন করিযা হউক বহুলোক তাহাকে একত্রিত করিতে হইবে। সেইজন্য সে তোমাদের এখানে হানা দিয়াছিল। আবও অনেক সম্প্রদায়ে সে হানা দিয়াছে। শুনিয়াছি লোকটি অত্যন্ত বলশালী এবং অত্যন্ত কামুক। বহু সুন্দরী নারীকেও সে হরণ করিয়াছে। তোমরা উহার কবলে পড়িও না, পড়িলে তোমাদের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। রোহার সহিত মিলিত হইয়া অবিলম্বে উহাকে আক্রমণ করাই উচিত। রোহা যে সব শর্ত করিয়াছে তাহা যদিও আমাদের অনুকূল নহে, শিলাঙ্গী মেয়েটি অপয়া হইবে কিনা তাহাও আমাদের জানা নাই, তথাপি বাধ্য হইয়া আমাদের এখন রাজি হইতে হইবে। রোহার গরুর জন্য কিছু তৃণ-শস্য দিলে আমরা তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হইব না। আরও বেশি জমি চাষ করিয়া আমরা সে ক্ষতি পূরণ করিয়া লইতে পারিব। কিন্তু মুশকিল হইবে শিলাঙ্গী যদি অপয়া হয়। কিছুদিন পূর্বে আমি ঈগল সম্প্রদায়ের বর্তমান দলপতি মংখীর সহিত আলাপ করিয়াছিলাম। ভালভিরা অরণ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে ঈগল সম্প্রদায় বাস করে। মংখী খুব ভাল লোক। মংখীর মুখে শুনিলাম তাহার পুত্র টাকা শিকারে বাহির হইয়াছিল। দুই দিন পরে সে একটি মৃত ব্যাঘ্র এবং জীবন্ত যুবতী লইয়া প্রত্যাবর্তন করিল। বসিল, যুবতীটি তাহার মোহিনীশক্তি দ্বারা ব্যাঘ্রটিকে অবশ করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই টাকা ব্যাঘ্রটিকে শিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। সে নাকি অঙ্গভঙ্গী সহকারে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক ব্যাঘ্রের গুহার সম্মুখে নৃত্য করিয়াছিল, তাহাতে ব্যাঘ্র এমন মুগ্ধ হইয়া যায় যে টাকা কুঠারাঘাত করিবার পরও সে কিছুমাত্র শব্দ করে নাই। যুবতীটি পাপিয়া সম্প্রদায়ভুক্তা। গভীর জঙ্গলে বড় বড় বৃক্ষেই তাহারা সাধারণত বাস করে, ফলমূল পোকামাকড় ধরিয়া খায়।

যুবতীর নাম হুঁহুঁ। অপরূপ রূপসী। মংখী বলিল, হুঁহুঁ কেবল ব্যাঘ্রকেই মুগ্ধ করে নাই, তাহার শার্দুল-পরাক্রম পুত্রকেও বশ করিয়াছিল। মংখী এই অজ্ঞাতকুলশীলার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত ছিল না। টাকার আগ্রহাতিশয্যেই অবশেষে বিবাহ হইল। বিবাহের পর কিন্তু যাহা ঘটিল তাহা শোচনীয়। বিবাহের পরদিন বজ্রাঘাতে টাকার মা মারা গেল। তাহার কয়েকদিন পরে মংখীর কুকুর ঘর্ঘট পাগল হইয়া দলের কয়েকজনকে দংশন করিল। যাহাদের দংশন করিল তাহারাও পাগল হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অজ্ঞাতকুলশীলাকে বিবাহ করা বিপজ্জনক। রাক্ষসী প্রেতিনীরা অনেক সময় মানবীর ছদ্মবেশে বিচরণ করিয়া নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লয়। এই শিলাঙ্গী যে কেমন হইবে তাহা আমাদের জানা নাই, তথাপি আমাদের এখন বিঘাওয়ের ইঙ্গিতপূর্ণ উপদেশ মানিয়া চলিতে হইবে। কুকুরের মতো সতর্ক থাকিয়া ভেকের মতো যখন যাহা সুবিধা তখনই তাহা করিতে হইবে। ধবল, তুমি কাল প্রত্যুষেই জংলাকে লইয়া চলিয়া যাও। ইহার পর যদি আমবা কোনো বিপদে পড়ি আমি যে প্রেতাত্মাটিকে আনিয়াছি সে আমাদের নির্ভুল পথে চালিত করিবে। কোনো ভয় নাই, নিম্ব-দেবতা আমাদের ঠিক মঙ্গল করিবেন।'

...সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত মীংরা নানারূপ গল্প করিল। তাহাকে ঘিরিয়া মশাল আলোকে সেদিন আমরা অনেক অদ্ভুত কথা শুনিলাম। বিঘাও মীংরাকে পাইয়া খুবই খুশি হইয়াছিল। সে তাহার ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় জানাইতেছিল যে মীংবা যখন আসিয়া পড়িয়াছে তখন আর চিন্তার কোনো কারণ নাই। সে কখনও বলিতেছিল—'হাওয়া যখন আসিয়াছে, তখন গাছেব পাতা এবার নিশ্চয় নড়িবে।' কখনও বলিতেছিল—'সূর্য যখন দেখা দিয়াছে তখন অন্ধকার আর থাকিবে না।'

...পরদিন প্রত্যুষেই আমরা বোহার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। সমস্ত পথ ধবল আমার সহিত একটি কথা বলিল না। আমি নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তাহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতে চাহিতেছিলাম, কিন্তু ধবল আমার কথার উত্তরে যতটুকু কথা না বলিলে নয় ততটুকু কথাই বলিতেছিল। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একটি কথাও বলে নাই। রাত্রে আমরা সকলে ঘুমাইয়া পড়িবার পর বিঘাওয়ের কুটিরে গিয়া মীংরা, বিঘাও এবং ধবল আরও অনেক গল্প করিয়া নানারূপ পরামর্শ করিয়াছিল। তাহারই ফলে সম্ভবতঃ ধবল গম্ভীর হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তখন আমি তাহা অনুমান করিতে পাবি নাই। ধবলের গাম্ভীর্যে আমি মনে মনে হাসিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম নিনানিকে হারাইয়া ধবল শিলাঙ্গীর মধ্যে আর একটি তরুণী ভার্যা লাভ করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কিন্তু কার্যতঃ সে স্বপ্ন সফল না হওয়াতে সে মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাই গম্ভীর হইয়া গিয়াছে।

উন্নগার উপত্যকা অতিক্রম করিতে করিতে দেখিলাম বন্য গরুর দল চরিতেছে। মনে হইল শিলাঙ্গীর দুধুনী মধুনীও উহার মধ্যে আছে। ধবলের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করিলাম। ধবল কিন্তু বিশেষ কোনো উত্তর দিল না। গরুগুলির দিকে চাহিতে চাহিতেই আমি পথ অতিবাহন করিতেছিলাম, গরুগুলি আমার মনে এক অপূর্ব ভাব সঞ্চার করিতেছিল। এতদিন গরু দেখিয়া মনের মধ্যে হিংসা ছাড়া অন্য কোনোপ্রকার ভাব উদ্রিক্ত হয় নাই, এখন কিন্তু তাহাদের দেখিয়া মন স্নেহ-সিক্ত হইতে লাগিল। মনে মনে এ বাসনাও জাগিল যে শিলাঙ্গীর মতো আমিও একটি গরু পুষিব। আমার মনের এই কোমল ভাব বেশিক্ষণ কিন্তু স্থায়ী হইতে পাইল না। আমরা একটি তরু-বীথির ভিতর দিয়া চলিতেছিলাম অকস্মাৎ একটি গাছের উপর হইতে কুঠারপানি এক যুবক লাফাইয়া পড়িল এবং আমাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল মানুষ নয়, যেন মনুষ্যাকৃতি একটি নেকড়ে বাঘ। ভ্রূকুটি কুটিল মুখে আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল সে খানিকক্ষণ,

তাহার পর বলিল, 'আমি ঝোনঝিরা। আমাকে হত্যা না করিয়া কেহ শিলাঙ্গীকে লাভ করিতে পারিবে না।'

আমাদের কথা বলিবার পর্যন্ত অবসর না দিয়া ঝোনঝিরা আমাকে আক্রমণ করিল। সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের সহিতও কুঠার ছিল এবং আমরা দুইজন ছিলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া আমাদের কুঠারযুদ্ধ হইল। ঝোনঝিরা আমাকেই আক্রমণ করিয়াছিল, আমিই তাহার সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম। দেখিলাম ঝোনঝিরা কুঠার চালনায় খুবই দক্ষ। আমারও এ বিষয়ে পারদর্শিতা কম ছিল না। সুতরাং অনেকক্ষণ কেহই কাহাকেও আঘাত করিতে পারিলাম না। ধবল একটু দূরে দাঁড়াইয়া নীরবে আমাদের যুদ্ধ দেখিতেছিল, সহসা সে পিছন দিক হইতে আসিয়া ঝোনঝিরার মস্তকের ঠিক মধ্যস্থলে সজোরে কুঠারাঘাত করিল। তাহার মস্তক চৌচির হইয়া গেল। ধবলের হাতের কব্জিতে যে এত শক্তি আছে তাহা আমার ধারণা ছিল না। তাহার মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিতেই সে বলিল, 'আমি কখনও দুইবার আঘাত করি না। এখন চল, তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া শীঘ্র ফিরিতে হইবে। ইহার দেহটাকে আপাতত ওই ঝোপের মধ্যে গুঁজিয়া রাখ। কেহ যেন দেখিতে না পায়। কোনো জন্তু-জানোয়ারে যদি টানিয়া লইয়া যায় তাহা হইলে তো চুকিযাই গেল, তাহা না হইলে উহাকে কবর দিবার ব্যবস্থা কাল কোনো সময় আসিয়া করিতে হইবে। এ যুদ্ধের কথা তুমি যেন কাহাকেও বলিও না।' ঝোনঝিরার রক্তাক্ত দেহটাকে টানিয়া একটা ঝোপের মধ্যে ফেলিয়া দিলাম। তাহার পর আবার আমরা রোহার উদ্দেশ্যে পথ চলিতে লাগিলাম। ধবল পুনরায় মৌন হইয়া গেল।

...শিলাঙ্গীকে খুঁজিয়া বাহির করা সত্যই একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে যে কোথায় লুকাইয়াছিল কিছুতেই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছিলাম না। রোহা ধবলের সহিত আলাপ করিতেছিল, আমি একা একা শিলাঙ্গীর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। জটিল অরণ্যের ভিতর ঢুকিয়া চিৎকার করিতেছিলাম—'শিলাঙ্গী তুমি কোথায়, বাহির হইয়া এস, আমি শপথ করিতেছি যে আমি চিরকাল তোমার বন্ধু থাকিব।' আমার চিৎকার শুনিয়া কখনও একঝাঁক সচকিত টিয়া কলরবে চতুর্দিক মুখরিত করিয়া উড়িয়া গেল, কখনও কয়েকটা শৃগাল একটা ঝোপ হইতে বাহির হইয়া আর একটা ঝোপে অন্তর্ধান করিল, কখনও ঘনপত্রপল্লবের একটা অদ্ভুত মর্মরে দূরাগত রোদন-ধ্বনির মতো কিসের যে আভাস দিতে লাগিল তাহা তখন বুঝিতে পারিলাম না। অরণ্যের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিতে পাইলাম একটি জলাশয় রহিয়াছে, তাহাতে অসংখ্য জলজ পুষ্প ফুটিয়া আছে। জলাশয়ের এক অংশ মরকত-শ্যাম শৈবালে আচ্ছন্ন, তাহাতেও স্বর্ণকান্তি অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছে। জলাশয়ের অপর পারে সারস জাতীয় এক পক্ষী-দম্পতি ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়াছিল। আমার চিৎকার শুনিয়া তাহারা প্রথমে বিচলিত হয় নাই। বরং মনে হইল আমার বক্তব্যটা তাহারা প্রণিধান করিতেছে। একটি সারসের মুখভাবে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গও যেন আমি লক্ষ্য করিলাম। আমি ক্রমাগত চিৎকার করিতেছিলাম—'শিলাঙ্গী তুমি কোথায় ফিরিয়া এস, আমি শপথ করিতেছি যে চিরকাল তোমার বন্ধু থাকিব, তোমাকে বিপদে ফেলিযা কখনও পলায়ন করিব না। আমি শপথ করিতেছি, শোন, তুমি দেখা দাও, বড়ই বিলম্ব হইয়া যাইতেছে, আমাদের তাড়াতাড়ি ফিরিতে হইবে—' আমার চিৎকারে বিরক্ত হইয়াই সারস-দম্পতি অবশেষে বোধ হয় উড়িয়া গেল। জলাশয়ের পুষ্পগুলি আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। অরণ্যে বহুক্ষণ আমি ঘুরিয়া বেড়াইলাম, কিন্তু শিলাঙ্গীর দেখা পাইলাম না। অরণ্য পার হইয়া

গিয়া পর্বত-সংলগ্ন একটি প্রান্তরে উপস্থিত হইলাম, দূরে দেখিতে পাইলাম কয়েকটি বন্য গরু চরিতেছে। একটি বলিষ্ঠাকৃতি ষণ্ড আমার চিৎকার শুনিয়া তাড়া করিয়া আসিল। একটি বৃক্ষে আরোহণ করিয়া আমাকে আত্মরক্ষা করিতে হইল। ষণ্ডটি যে ঝোনঝিরার প্রিয় ষণ্ড তাহা তখন জানিতাম না, পরে শিলাঙ্গীর মুখে শুনিয়াছিলাম। আমিই যে ঝোনঝিরার মৃত্যুর কারণ ষণ্ডটি কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল? অরণ্যে প্রবেশ করিয়া পুনরায় চিৎকার করিতে লাগিলাম। অরণ্যের প্রতিটি বৃক্ষ লতা গুল্ম, প্রতিটি পশু পক্ষী আমার শপথ একাধিকবার শ্রবণ করিল। শিলাঙ্গী কিন্তু দেখা দিল না। সহসা আমার ভয় হইল শিলাঙ্গী বোধ হয় আর আসিবে না। ঝোনঝিরার মৃত্যু-সংবাদ সম্ভবতঃ তাহার কর্ণগোচর হইয়াছে। আমার নিষ্ঠুর আচরণে মর্মাহত হইয়া সে হয়তো আমাকে চিরকালের জন্য ত্যাগ করিয়াছে। আর হয়তো তাহার দেখা পাইব না। কথাটা মনে হইবামাত্র আমার সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া গেল। চলচ্ছক্তিহীন হইয়া আমি একটি বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলাম। সহসা আমাব দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। আমি নীরবে বসিযা বোদন করিতে লাগিলাম। এখন ভাবিতেছি আমি রোদন কবিয়াছিলাম কেন? শিলাঙ্গীকে না পাওয়ার দুঃখটা কি শিলাঙ্গীর অভাবে, না আমার আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ হইল বলিয়া? আমার সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিয়াও কি আমি শিলাঙ্গীকে চাহিয়াছিলাম? ইহাব সত্য উত্তর কয়েকদিন পরেই মূর্ত হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়াছিল। কিন্তু তখনও তাহাকে চিনিতে পারি নাই।

.. আমি কতক্ষণ বোদন করিযাছিলাম জানি না, সহসা পিছন হইতে কে যেন আমাকে জড়াইযা ধরিল। ফিরিয়া দেখি শিলাঙ্গী। 'ছি, ছি, তুমি কাঁদিতেছ? চল, আর বিলম্ব হইবে না। তুমি কোথায় কোথায় গিয়াছ আমি জানি, কি কি বলিয়াছ তাহাও আমি শুনিয়াছি। আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলাম, কেবল লুকাইযাছিলাম। ধবল বোহা বোধ হয এতক্ষণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। চল, এবাব যাই।'... বোহা-বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারেই শিলাঙ্গীর সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল। ধবল কিন্তু সমস্ত ক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, একটি কথাও বলিল না। রোহাও বিশেষ কিছু বলে নাই। আমাব মনে হইল উভয়ের মধ্যে অপ্রীতিকব কি যেন একটা হইয়াছে। ব্যাপারটা স্পষ্ট হইল পরদিন। রোহা ধবলকে দুগ্ধ পান করিতে অনুরোধ করিযাছিল, কিন্তু ধবল সে অনুবোধ রক্ষা কবে নাই। ধবল বলিল যে পানীয় সে স্পর্শ কবিবার কল্পনা পর্যন্ত কবে নাই তাহা পান কবিতে অনুরোধ করিয়া রোহা তাহাকে অপমান করিয়াছে। রোহা ক্ষুব্ধ হইয়াছিল ধবল তাহার অনুরোধ রক্ষা না করাতে। উভয় দলপতির মনোমালিন্যের পটভূমিকাতেই সেদিন আমার সহিত শিলাঙ্গীর সামাজিক মিলনের চিত্রটি অঙ্কিত হইয়াছিল। প্রথা অনুসরণ করিয়া মেয়েরা যদিও নৃত্য গীত করিয়াছিল, কথক গানের সুরে সুরে লাল পাখির সহিত নীল পাখির প্রণয় কাহিনী বর্ণনা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু মৌন দুই দলপতির সৌহার্দ্যের অভাব একটা অজানিত আশঙ্কায় সমস্ত উৎসবকে যেন ম্রিয়মাণ করিয়া রাখিল। এই আশঙ্কা আতঙ্কে পরিণত হইল আর একটু পরে, যখন আমি শিলাঙ্গীকে লইয়া নিজেদের আস্তানার উদ্দেশ্যে পর্বত আরোহণ কবিতেছিলাম।

উহাদের প্রথা অনুযায়ী উহারা আমাদের সঙ্গে নিজেদের সীমানার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আসিল। রোহা নিজের সীমানায় শিলাঙ্গীকে স্কন্ধে বহন করিয়া আনিয়াছিল। সীমানার শেষ প্রান্তে আসিয়া সে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'এইবার তুমি শিলাঙ্গীর ভার বহন কর।' আমি শিলাঙ্গীকে স্কন্ধে তুলিয়া লইলাম। রোহা তখন ধবলের হস্তে একটি জ্বলন্ত মশাল দিয়া বলিল, 'অন্ধকারে তুমি উহাদের পথ দেখাও—'

...জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। একটা পার্বত্য পেচকেব চিৎকার মধ্যে মধ্যে নৈশনিস্তব্ধতাকে বিঘ্নিত করিতেছিল। শিলাঙ্গী আমার স্কন্ধারূঢ়া থাকিয়াই আমাদের পথ নির্দেশ করিতেছিল। প্রথা অনুসারে তাহার নামিবার উপায় ছিল না। রাত্রে আমরা পার্বত্য পথ ভাল চিনিতে পারিতেছিলাম না। কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর ধবল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, 'রোহা নিজে উলম্ভনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চাহে না। সে বলিল ঝোনঝিরা ফিরিয়া আসিলে সে-ই যুদ্ধের ব্যবস্থা করিবে। রোহার নিজের যুদ্ধ করিবার স্পৃহা নাই। উলম্ভন যদি তাহাকে বেশি বিরক্ত করে সে স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে বলিতেছে। রোহাব নিকট হইতে এ আচবণ প্রত্যাশা করি নাই। সে অবিলম্বে যুদ্ধে আমাদের সহায়তা করিবে এই আশাই কবিয়াছিলাম। ঝোনঝিবাব সহিত আমাদের শর্তের কি কোনো সম্পর্ক ছিল?'

'বোহা আমাকে বলিয়াছিল যে ঝোনঝিরা আসিলে যুদ্ধের ব্যবস্থা হইবে।'

'তাহা হইলে তো মুশকিল হইল। তুমি তো একথা আমাকে ঘুণাক্ষরে বল নাই।'

আমি চুপ করিয়া বহিলাম, শিলাঙ্গীও কিছু বলিল না। নীরবে আমবা পথ অতিবাহন কবিতে লাগিলাম। উন্নগা পর্বতের উপত্যকার অরণ্যে বৃক্ষশীর্ষে জ্যোৎস্না রহস্যময়ী হইয়া উঠিল। মনে হইল সে কি যেন একটা গোপন করিয়া রাখিয়াছে, আর ওই কর্কশ-কণ্ঠ পার্বত্য পেচকেব চিৎকার যেন হাতুড়ির মতো তাহার রহস্যপুরীর দ্বারে আঘাত হানিতেছে। আমরা একটা ঘন তরুশ্রেণীব ভিতব দিয়া চলিতেছিলাম, সহসা ধবল মশালটা ঊর্ধ্বে তুলিয়া আতঙ্কিত কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল—'নিনানি, নিনানি—'

আমিও মুখ তুলিয়া দেখিতে পাইলাম একটি বৃক্ষের চূড়া হইতে ঘন পত্রপল্লব ফাঁক করিয়া নিনানি যেন আমাদের দেখিতেছে। নিমেষের মধ্যেই কিন্তু সে অন্তর্হিত হইয়া গেল। শিলাঙ্গীও তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল।

'নিনানিব প্রেতাত্মা আমাদের অনুসরণ করিতেছে। আর বোধ হয় আমাদের নিস্তার নাই। সমস্ত অত্যাচারের প্রতিশোধ সে এইবার লইবে...'

ধবল মশাল লইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। আমিও কম ভীত হই নাই, আমিও ছুটিতে লাগিলাম।

শিলাঙ্গী কেবল একবার বলিল—'আমাকে কাঁধে করিয়া ছুটিতে তোমার কষ্ট হইতেছে, আমাকে নামাইয়া দাও' কিন্তু তাহাকে আমি নামাইয়া দিলাম না, আমার ভয় হইতে লাগিল নামাইয়া দিলে নিনানির প্রেতাত্মা হয়তো তাহাকে আক্রমণ করিবে। আমার সঙ্গে শিলাঙ্গীর প্রকৃত সম্পর্ক যে কি হইয়াছে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্যই যে নিনানির প্রেতাত্মা ওই বৃক্ষে ওত পাতিয়া বসিয়াছিল তাহাতে আর আমার সন্দেহ ছিল না। নিনানির আকস্মিক অন্তর্ধানে আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। এখন মনে হইল সে মারাই গিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই দেখা দিত। কোনো বন্য পশুই হয়তো তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। কিংবা সেই সর্বগ্রাসী ময়াল সাপগুলা...। যক্ষিণীও কি মরিয়াছে? ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছিলাম। মনে হইতেছিল শুধু শিলাঙ্গী নয়, নিনানিও যেন আমার স্কন্ধের উপর উঠিয়া চাপিয়া বসিয়াছে এবং শিলাঙ্গীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

...পরদিন প্রভাতে রোহার প্রেরিত দুইজন লোক আসিয়া আমাদের তৃণশস্য কাটিয়া লইয়া গেল। সমস্ত দিন তাহারা অনেক তৃণশস্য সংগ্রহ করিল। নিম্ন-সম্প্রদায়ের সমস্ত নর-নারী ইহাতে

বেশ অসন্তুষ্ট হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম। ধবল নিম্ব-বৃক্ষের নিম্নে সমস্ত দিন বসিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। শিলাঙ্গীর দিকে বা আমার দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিল না। মীংরা প্রভাতে উঠিয়াই যে কোথায় চলিয়া গিয়াছিল সমস্ত দিন তাহার আর সাক্ষাৎ পাই নাই। শিলাঙ্গী হাসিমুখে আগাইয়া গিয়া সকলের সঙ্গে আলাপ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কেহই তাহাকে আমল দিল না। ইলচির চোখের দৃষ্টি হিংস্র হইয়া উঠিল। সাংরা প্রকাশ্যেই বলিল—একটা পাহাড়ী ডাইনি আমাদের জংলার উপর ভর করিয়াছে। কেবল কয়েকটি শিশু-শিলাঙ্গীকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মায়েরা তাহাদের তাহার নিকট আসিতে দিল না। আমি একটু অপ্রস্তুত বোধ করিতেছিলাম। কিন্তু শিলাঙ্গী মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল কেবল। মনে হইল এরূপ ব্যবহারে সে অভ্যস্ত। এখন মনে হইতেছে সে যেন সারাজীবন ধরিয়াই সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিল কিন্তু কেহই তাহার মর্মকথা শুনিতে চাহে নাই। তাহার শ্রীমণ্ডিত দেহটাই হইয়াছিল ইহার প্রধান অন্তরায়। তাহার আসন্ন যৌবনপুষ্ট দেহটা কাহাকেও মুগ্ধ, কাহাকেও লুব্ধ, কাহাকেও ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। সেই মোহ, লোভ অথবা ক্ষোভের ফেনিল স্রোতে আসল শিলাঙ্গী বারংবার ভাসিয়া গিয়াছিল, শিলাঙ্গীর স্বরূপ কাহারও চোখে পড়ে নাই। তাহার জীবনে একমাত্র আমিই বোধ হয় তাহার বন্ধুত্বের দাবি মানিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু আমিও কি সত্যই তাহা মানিয়াছিলাম? আমি মানিবার ভান করিয়াছিলাম মাত্র। অরণ্যে অরণ্যে ঘুরিয়া উচ্চকণ্ঠে আমি যে শপথ উচ্চারণ করিয়াছিলাম সে শপথের মর্যাদা রক্ষা করিবার ক্ষমতা আমার ছিল না। আমিও তাহার দেহটা দেখিয়াই প্রলুব্ধ হইয়াছিলাম, প্রলোভনের বশবর্তী হইয়াই তাহার নিকট মিথ্যা শপথ করিয়াছিলাম, তাহাকে পাইবার জন্যই নিনানির সহিতও মিথ্যাচরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাকে পাই নাই, সেদিন বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না আজ কিন্তু বুঝিয়াছি শঠতার দ্বারা মহৎ কিছু লাভ করা যায় না। নাগালের মধ্যে পাইয়াও তাহাকে হারাইতে হয়। শিলাঙ্গী বিঘাওয়ের নিকটও আলাপ জমাইতে গিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে পলাইয়া আসিতে হইল। বিঘাও তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। শিলাঙ্গী আসিয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিল—'ও বিঘাও নয়, বাঘ। এখনই আমাকে খাইয়া ফেলিত। চল আমরা দুধুনী মধুনীকে দেখিয়া আসি—।'

'চল।'

... যে ঝোপে শিলাঙ্গীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল সেই ঝোপের ভিতর আমরা দুইজন সেই গাছের উপরই পাশাপাশি বসিয়াছিলাম। দুধুনী মধুনীর দেখা পাওয়া যায় নাই। দুধুনী মধুনী এ ঝোপটিতে প্রায়ই নাকি আসিয়া ঢোকে। তাই আমরা আশা করিয়া বসিয়াছিলাম। নিনানির কথা হইতেছিল। শিলাঙ্গীও তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল।

'আমি স্পষ্ট দেখিলাম নিনানি গাছের ডাল ফাঁক করিয়া আমাদের দেখিতেছে। সত্যই কি নিনানি মরিয়া গিয়াছে? আমার বিশ্বাস হয় না।'

'কিন্তু সে গেল কোথায়? যক্ষিণীও নাই।'

'খুবই আশ্চর্য ব্যাপার। ঝোনঝিরাও উলম্ভনের নিকট হইতে এখনও ফিরিল না কেন বুঝিতে পারিতেছি না। এক হিসাবে অবশ্য ভালই হইয়াছে, ঝোনঝিরা থাকিলে নির্বিঘ্নে বিবাহ হইত না, একটা না একটা ঝঞ্ঝাট বাধাইত সে।'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। ঝোনঝিরার মৃত্যু-সংবাদটা তাহাকে দিতে পারিলাম না। একটা শাখা আমার চোখের সম্মুখে বাতাসে দুলিতেছিল। মনে হইল সে যেন দুলিয়া দুলিয়া নীরব ভাষায়

আমাকে বলিতেছে—'এই কি তোমার বন্ধুর মতো আচরণ? প্রথম দিন হইতেই কপটতার আশ্রয় লইলে!' সহসা আর একটা কথা মনে হওয়াতে ভীত হইয়া পড়িলাম। ঝোনঝিরার প্রেতাত্মা আসিয়া ওই শাখাটা আশ্রয় করে নাই তো? ওই শাখাটাই এত বেশি দুলিতেছে কেন? শিলাঙ্গীর দিকে ফিরিয়া চাহিলাম, দেখিলাম তাহার দৃষ্টি দূর দিগন্তে নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহার চোখের দৃষ্টি স্বপ্নময়, অধবে স্মিত মৃদু হাসি। আমি নির্নিমেষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। যে আকস্মিক ভয়ে ভীত হইয়াছিলাম তাহা যেন আকস্মিকভাবেই অপনোদিত হইল। মনে হইল শিলাঙ্গী যতক্ষণ আমার কাছে আছে ততক্ষণ কেহই আমার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আমার নির্নিমেষ দৃষ্টিব আকর্ষণেই শিলাঙ্গী যেন মুখ ফিরাইল, আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, 'কি দেখিতেছ?'

'তোমাকে।'

শিলাঙ্গীও আমার মুখের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল, তাহার পর সহসা আমাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া বলিল, 'জংলা, বল, তুমি চিরকাল আমার বন্ধু থাকিবে তো?'

'থাকিব।'

কম্পমান শাখাটা দেখিলাম নিষ্কম্প হইয়া গিয়াছে। আমি নির্ভয় হইলাম। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই ভয় নূতন মূর্তিতে দেখা দিল আবার। আকাশ হইতে উড়িয়া আসিল। একটা সোঁ সোঁ শব্দ ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। তাহার পর দেখিলাম পঞ্চ-পর্বতের শিখর অতিক্রম করিয়া একটা মেঘ দ্রুতবেগে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মনে হইল ঝড় আসিতেছে নাকি?

'পঙ্গপাল, পঙ্গপাল—!'

শিলাঙ্গী আতঙ্কিত কণ্ঠে চিৎকার করিযা উঠিল।

'চল, বাড়ি যাই, চল, চল, পঙ্গপাল বড় ভয়ানক পতঙ্গ।'

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে আমরা যখন উন্নগা পর্বত হইতে নামিয়া আসিলাম তখন দেখিলাম লক্ষ লক্ষ পঙ্গপাল আমাদের তৃণক্ষেত্রে আসিয়া বসিয়াছে। ধবল, মীংরা উন্মাদের মতো চিৎকার করিতেছে—'মার, মার, নিঃশেষ কর।' আমাদের দলের সকলে—এমন কি ছোট ছোট শিশুরা পর্যন্ত—পঙ্গপাল-নিধনে ব্যাপৃত হইয়াছে। বিঘাও দেখিলাম জীবন্ত পঙ্গপাল মুখে পুরিয়া চর্বণ করিতেছে। আমাদের দেখিয়া বিঘাও দন্ত বাহির করিয়া হাসিল। বলিল, 'কানা এইবার প্রতিশোধ লইতেছে। দেখা যাক কতক্ষণে তাহার রাগ কমে। তোমরা দাঁড়াইয়া আছ কেন? এক একটাকে ধর আর খাও—।'

...আমাদের সমস্ত তৃণশস্য নিঃশেষ করিয়া পঙ্গপালের দল উড়িয়া গেল। আমরা সকলে মিলিয়া তাহাদের কয়েক সহস্রকে হয়তো নিধন করিতে পারিয়াছিলাম কিন্তু তাহারা সংখ্যায় এত বেশি ছিল যে, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও আমরা আমাদের তৃণশস্যগুলি বাঁচাইতে পারিলাম না। সমস্ত মাঠ শূন্য হইয়া গেল। নিম্ব-সম্প্রদায়ের আবালবৃদ্ধবনিতা কন্যা নদীর তীরে সমবেত হইয়া হাহাকার করিতেছিল। ধবল বলিতেছিল, 'এবার আমাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত। কন্যা আমাদের উপর বিরূপ হইয়াছে। জমি আর তেমন শস্য দিতেছে না। এবার একে শস্য কম হইয়াছিল তাহার উপর পঙ্গপাল আসিল। কোন পাপে নিম্ব-দেবতা আমাদের এ শাস্তি দিল? বিঘাও বলিতেছে কানা প্রতিশোধ লইতেছে। কিন্তু কানার ক্রোধেরই বা হেতু কি? আমি তো কোনো অপরাধ করি নাই। তোমরা কেহ যদি কোনো পাপ কোনো মিথ্যাচারণ করিয়া থাক, বল, অকপটে স্বীকার কর। আমাদের জীবনমরণ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, এখন কেহ কপটতার আশ্রয় লইও না। যদি কেহ

কিছু করিয়া থাক স্বীকার করিতে ভয় পাইও না, আমি তাহার হইয়া কানার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিব, আমি নিজে তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিব। কেহ যদি কিছু করিয়া থাক, স্বীকার কর—।' কেহ কোনো উত্তর দিল না। কেবল বিঘাওয়ের অট্টহাস্যে সান্ধ্য অন্ধকার প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। মীংরা ভিড়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ধবলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা লইয়া আর বিলাপ করিবার প্রয়োজন নাই। এইবাব আমরা ভবিষ্যতে কি করিব তাহাই স্থিব করা প্রয়োজন। আমি কাল প্রভাতেই উঠিয়া নূতন স্থানের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িব, তৎপূর্বে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া আমি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিযাছি তাহা তোমাকে বলিয়া যাইতে চাই। নাঙ্গা নদীব তীরে নকুল সম্প্রদায়েরা বাস করে। তাহাদের ক্ষেত্রগুলি যখন শস্য দান করিতে পরাঙ্মুখ হইল তখন এক অভিনব উপায়ে নকুল-দলপতি ডোডো ক্ষেত্রগুলিকে পুনবায় উর্বব করিয়া তুলিযাছিল। ধবল, সে উপায় আমি তোমাকে বলিযা যাইব। তুমি বিচলিত হইও না, আবার সব ঠিক হইয়া যাইবে। এখন চল আমবা নিজ নিজ কুটিবে যাই। কন্যা নদীব তীরে দাঁড়াইযা এমনভাবে সকলে যদি হাহাকার করি কন্যাব শান্তি বিঘ্নিত হইবে, তাহাতে আমাদেব আরও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।'

মীংরার কথা শুনিয়া আমরা সকলে নিজ নিজ কুটিরে ফিরিয়া গেলাম। রাত্রির অন্ধকাব ক্রমশ ঘনাইয়া আসিল। আর একটু পরে সে অন্ধকাব জ্যোৎস্নালোকে আলোকিত হইল। সে আলোক কিন্তু আমাদেব অন্তরকে স্পর্শ করিতে পারিল না। একটা নামহীন অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমরা মুহ্যমান হইয়া রহিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল আমিই যেন সমস্ত ব্যাপারটার জন্য দায়ী। আমাব কপটতা, আমাব মিথ্যা আচরণ, আমার শঠতাই আমাদের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে। যেদিন হইতে আমি শিলাঙ্গীকে দেখিয়াছি সেইদিন হইতেই আমি সরলতা পরিত্যাগ করিয়াছি। এমন কি যে নিনানিব মিথ্যা মৃতুসংবাদ প্রচার কবিয়া আমি ধবলের সহিত প্রতারণা করিয়াছিলাম সেই নিনানির সহিতও আমি সরল ব্যবহার করি নাই। শিলাঙ্গীর কথা তাহাকে বলিবার সাহস সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তাহাকে ক্রমাগত মিথ্যা স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া বাখিবার চেষ্টা করিয়াছি।

...গভীর রাত্রি। কেন জানি না সহসা ঘুমটা ভাঙিয়া গেল। উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিলাম। চতুর্দিক নীরব। কেবল বহুদূবে একটা টিট্টিভ পক্ষী চিৎকার কবিতেছিল। আর কোথাও কোনো শব্দ ছিল না। মনে হইল টিট্টিভের অশ্রান্ত চিৎকার আমাকে যেন কি বলিতে চাহিতেছে, একটা আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে আমাকে যেন সাবধান করিতেছে। কম্পিত হৃদয়ে বসিয়া বসিয়া সেই দূরাগত চিৎকারধ্বনি শুনিতে লাগিলাম। শিলাঙ্গী পাশেই শুইয়া ঘুমাইতেছিল। একবাব ইচ্ছা হইল তাহাকে জাগাই কিন্তু কি মনে করিয়া আর জাগাইলাম না। টিট্টিভ ক্রমাগত বলিতে লাগিল—'কি-যে-করিস, কি-যে-করিস, কি-যে-করিস।' মনে হইল সে যেন আমাকে বলিতেছে ঘরের ভিতর বসিয়া বসিয়া কি করিতেছিস, বাহিরে আসিয়া দেখ কি হইতেছে। তবু আরও খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। শেষে পাখির ডাকটা আমাকে যেন পাইয়া বসিল। সম্মোহিত হইয়া আমি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলাম। শিলাঙ্গী একা শুইয়া ঘুমাইতে লাগিল।

...কন্যা নদীর তীরে সেদিন অদ্ভুত জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন জীবন্ত। মনে হইতেছিল কোনো যাদুকরী যেন সম্মোহন-মন্ত্র বলে সকলের নয়নপল্লবে কালনিদ্রা বিছাইয়া দিয়া সঙ্গোপনে নিগূঢ় কিছু করিতেছে। টিট্টিভ পক্ষীটা যেন সে কথা জানে, তাই সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছে। চতুর্দিক রহস্যে পরিপূর্ণ। আমি আমাদের শস্যশূন্য মাঠের দিকে

চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল ধর্ষিতা নারীর মতো সে যেন মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার সর্বাঙ্গ যেন নীরব ভাষায় আমাকে বলিতে লাগিল—'আমার এ দুর্দশা কেন হইয়াছে জান? শিলাঙ্গীর জন্য। ধবলই ঠিক বলিয়াছিল, তৃণভোজী গরুরা আমাদের শত্রু, সেই গরু যাহারা পালন করে, তাহারা কখনও আমাদের মঙ্গল করিতে পারে না। শিলাঙ্গী এখানে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাই পঙ্গপালের দল আসিয়া আমাদের লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গেল। শিলাঙ্গী অপয়া, শিলাঙ্গী অলক্ষ্মী, শিলাঙ্গী ছদ্মবেশিনী প্রেতিনী। তুমি এখনও সাবধান হও। তুমি নিম্ব-সম্প্রদায়ের সমর্থ যুবক, ভবিষ্যতে হয়তো তুমিই দলপতি হইবে, তুমি সামান্য একটা নারীর জন্য সকলের স্বার্থকে বিনষ্ট করিও না। যে অত্যাচার আমরা সহ্য করিলাম তোমার নিকট তাহার প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছি। এ অপমানের প্রতিশোধ চাই'।

...ঘিসু এবং ভংগার স্ত্রীরাও বলিয়াছিল 'প্রতিশোধ চাই।' তাহাদেরই সরব দাবি যেন জ্যোৎস্নালোকে নীরব ভাষায় আমার অন্তরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সহসা দেখিতে পাইলাম দূরে নিম্ব-বৃক্ষতলে কাহারা যেন বসিয়া আছে। স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ সেই দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। নিম্ব-বৃক্ষটির ঠিক পশ্চাতেই একটি ঘন ঝোপ ছিল। ঠিক করিলাম সেই ঘন ঝোপেব ভিতর হইতে প্রথমে দেখিব কাহারা বসিয়া আছে, তাহার পর যদি প্রয়োজন মনে কবি আত্মপ্রকাশ করিব। সঙ্গে সঙ্গে মাটির উপর শুইয়া পড়িলাম এবং সরীসৃপের মতো বুকে হাঁটিয়া ঘন ঝোপের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। টিট্টিভ অবিচ্ছিন্ন সুরে বলিতে লাগিল—'কি-যে-কবিস', 'কি-যে-করিস', 'কি-যে-করিস'। স্বপ্নের ঘোরেই আমি সরীসৃপের মতো সেই ঝোপেব ভিতর আসিয়া প্রবেশ কবিলাম। কোনো এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে যেন এক নিদারুণ সত্যের সম্মুখীন করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। স্বপ্নের ঘোর বেশিক্ষণ কিন্তু রহিল না।

...নিম্ব-বৃক্ষতলে ধবল, মীংরা এবং বিঘাও বসিয়াছিল। ঝোপের মধ্যে সন্তর্পণে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই ধবলের যে কথাগুলি আমার কর্ণগোচর হইল তাহা এতই ভীতকর যে, ঝোপের মধ্যে একা বসিয়া থাকাই শেষ পর্যন্ত আমার পক্ষে শক্ত হইল। ধবল বলিতেছিল—'আমি একটু আগে স্বচক্ষে আবার নিনানির প্রেতাত্মাকে দেখিয়াছি, স্বকর্ণে তাহাব কথাও শুনিয়াছি। নিনানি বলিল, 'শিলাঙ্গীকে তোমরা যদি অবিলম্বে দূব করিয়া না দাও, তাহা হইলে তোমাদের আরও বিপদ হইবে। শিলাঙ্গী মানবী নয়, রাক্ষসী।'

বিঘাও বলিল, 'সাধারণ মানবী যে নয় তাহার প্রমাণ আমি পাইযাছি।'

'কি প্রমাণ?'

'তাহা এখন বলিব না।'

'কিন্তু কি করিয়া এখন উহার কবল হইতে আমরা উদ্ধার পাই তাহা বল।'

মীংরা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। সে এইবার কথা বলিল। সে বলিল, 'তোমার ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি কি করিয়া বৃদ্ধি করিতে হইবে তাহা তো তোমাকে বলিয়াছি। শিলাঙ্গীকে তুমি ব্যবহার করিতে পার।'

'তাহা তো পারি কিন্তু সে কথা শিলাঙ্গীকে বলিব কি করিয়া?'

'শিলাঙ্গীকে পৃথক করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তুমি কাল সকালে ঘোষণা করিয়া দাও যে কন্যা নদীর কলকলধ্বনিতে তুমি কর্তব্যের নির্দেশ পাইয়াছ। তুমি আমাকে যাহা বলিতেছিলে সকলকে তাহাই বল। বল কন্যা বলিতেছে বিনামূল্যে কিছুই পাওয়া যায় না। উপর্যুপরি শস্য দান

করিয়া জমি ক্লান্ত ক্ষুধিত ও পিপাসিত হইয়াছে। নর-রক্ত না দিলে সে তৃপ্ত হইবে না, সঞ্জীবিত হইবে না। তাহার পর তুমি ঘোষণা কর যে মীংরা যে ভূতটি আমাকে দিয়া গিয়াছে সেই ভূতটির উপরই আমি নির্বাচনের ভার দিলাম। সেই ঠিক করিবে কাহার রক্ত আমরা ভূমিতে সেচন করিব। তাহার পর গভীর রাত্রে সকলে যখন ঘুমাইয়া পড়িবে তখন যে রজ্জুবদ্ধ কাষ্ঠখণ্ডটি তোমাকে উপহার দিয়াছি সেইটি মাথার উপর বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরাইতে ঘুরাইতে শিলাঙ্গীর কুটিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে টানিয়া বাহির করিবে।'

ধবল ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল—'জংলা যদি বাধা দেয়?'

'জংলাকেও হত্যা করিবে—সঙ্গে অস্ত্র লইয়া যাইও। বিঘাওকে সঙ্গে রাখিও।'

বিঘাও বলিল, 'জংলাকে হত্যা করিতে আমাব আপত্তি নাই। আমার ধারণা জংলাই নিনানির মৃত্যুর কারণ। ন্যায়ত এইজন্যই তাহার মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত।'

একথা শোনার পর আমি সেই ঝোপের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমাব পৃষ্ঠে যেন কাহার স্পর্শ অনুভব করিলাম, মনে হইল অশরীর নিনানি আমাকে যেন উহাদের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। ঘাড় ফিরাইয়া নিনানিকে কিন্তু দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু যাহা দেখিতে পাইলাম তাহাতেই আমার সর্বাঙ্গে একটা শিহরন বহিয়া গেল। ঘনপত্রপল্লবাচ্ছন্ন একটি চারার পত্র-পল্লবের মধ্যে দুইটি ছোট ছোট ফাঁক ছিল। তাহার ভিতর জ্যোৎস্না প্রবেশ করাতে মনে হইতেছিল যেন দুইটি জ্বলন্ত চক্ষু আমার দিকে চাহিয়া আছে, এক পায়ে দাঁড়াইয়া কোনো প্রেতিনী ঝুঁকিয়া যেন আমাকে নির্নিমেষে দেখিতেছে। আমি আর সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। বুকে ভর দিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলাম। কিছুদূর গিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং ছুটিতে লাগিলাম। প্রাণভয়ে ভীত হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিলাম। শিলাঙ্গীর কথা আর মনে রহিল না, তাহার নিকট যে শপথ করিয়াছিলাম সে কথাও আর মনে রহিল না।

...উন্নগা পর্বতের যে গুহায় যক্ষিণী থাকিত সেই গুহায় আত্মগোপন করিয়া বসিয়া ছিলাম। প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা হইতেছিল ময়াল সাপের মূর্তি ধরিয়া মৃত্যু বুঝি অতর্কিতে পিছন হইতে আসিয়া আক্রমণ করিবে। গুহার ভিতর খস খস শব্দ শুনিয়া বার বার ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই আবার গুহায় প্রবেশ করিতে হইতেছিল, ভয় হইতেছিল বাহিরে কেহ যদি আমাকে দেখিতে পায়। অনাবিল জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে আলোকে বাহির হইবার সাহস আমার ছিল না। গুহার অন্ধকারেও আমি স্বস্তি পাইতেছিলাম না। আলোক অন্ধকার উভয়ই আমার নিকট ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। আমি খস খস শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিতেছিলাম, আবার একটু পরেই গুহার ভিতরে প্রবেশ করিতেছিলাম। সমস্ত রাত্রি এইরূপ ছুটাছুটি করিয়াই কাটিয়া গেল। ভোরের দিকে গুহার ভিতরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সহসা সমবেত একটা কলরবে ঘুম ভাঙিয়া গেল। তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিলাম। বুঝিতে পারিলাম, মানুষ নয়, পাখি ডাকিতেছে লক্ষ লক্ষ পক্ষীর প্রভাতী কলরবে চতুর্দিক মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। গুহার ভিতর আবার খস খস শব্দ হইল, ঘাড় ফিরাইয়া এইবার দেখিতে পাইলাম সর্প নয়— শশক। অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। তাহার পর দেখিতে পাইলাম আগড়টা। ঠিক নীচেই পড়িয়াছিল। তাড়াতাড়ি নামিয়া গিয়া সেটাকে তুলিয়া গুহামুখে লাগাইয়া ভিতরে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিবার চেষ্টা করিলাম। ভয় কিন্তু মানুষকে কখনও নিশ্চিন্ত হইতে দেয় না। মনে হইল আগড়ে ফাঁক আছে, সেই ফাঁক দিয়া কেহ হয়তো আমাকে দেখিতে পাইবে, ফাঁক

দিয়া সাপও ঢুকিতে পারে। আবার বাহির হইলাম, গাছের ডালপালা সংগ্রহ করিয়া আগড়ের ফাঁক বন্ধ করিতে ব্যাপৃত হইলাম। আমার মধ্যে যে ভীত পশুটা আত্মরক্ষার জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল, অনেকক্ষণ সে নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত হইয়া রহিল। শিলাঙ্গীর কথা একবারও তাহার মনে পড়িল না যতক্ষণ না সে নিরাপদ হইয়া বসিল। তুষার যুগে যে পশু আত্মরক্ষার জন্য নিজের সঙ্গিনীকে হত্যা করিয়া আহার করিয়াছিল, সে পশু আমার মধ্যে তখনও বাঁচিয়া ছিল। আমার মানসপটে শিলাঙ্গীর যে ছবিটি ফুটিয়া উঠিল তাহাতে বহুকাল বিস্মৃত আমার সেই অন্ধ সঙ্গিনীর আর্ত আকুলতাও নিশ্চয় ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহা অনুভব কবিতেও পারি নাই। বরঞ্চ ইহাই আমার মনে হইতেছিল যে শিলাঙ্গী কোনো মোহিনী প্রেতিনী, আমাকে মুগ্ধ করিয়া আমাদেব সর্বনাশ করিবার জন্য আসিয়াছে। মনে হইতেছিল তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার পর হইতেই যেন আমাদের সমাজে উপর্যুপরি দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। ইহাও মনে পড়িল প্রথম দিন সে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিয়াছিল। তাহার বর্শা লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইলে সেইদিনই আমার মৃত্যু হইত। মনে হইল শিলাঙ্গী বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিল যে সাধারণ অস্ত্র দিয়া সহজে আমাকে কাবু করা যাইবে না, তাই সে মোহিনী অস্ত্র ব্যবহার করিয়া আমাকে নিধন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। ধবল বুদ্ধিমান দূরদর্শী লোক, সে ঠিকই বুঝিয়াছিল যে যাহাদেব গরু পালন করাই ধর্ম, তৃণ-পালকদের সহিত তাহাদের বন্ধুত্ব হইতে পারে না। আর একটা কথা মনে হওয়াতে আমার ধাবণা আরও বদ্ধমূল হইল যে শিলাঙ্গী নিশ্চযই প্রেতিনী। সাধারণত যুবকেরাই যুবতীদের প্রণয় কামনা করিয়া তাহাদের খোশামোদ করে, যুবতীরা তাহাদের এই প্রচেষ্টায় হয় বাধা দেয়, না হয় বিরক্তি প্রকাশ করে। কিন্তু শিলাঙ্গী ঠিক বিপরীত আচরণ করিয়াছে। সে নিজেই যাচিযা আমাব সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছে। আমার সহিত কি উপায়ে তাহার বিবাহ হইতে পাবে তাহা আমি আবিষ্কার করি নাই, শিলাঙ্গীই করিয়াছে। কাঙালিনীর মতো সে বারংবার আমার বন্ধুত্ব প্রার্থনা করিয়াছে। মনে হইল ইহা মানবী যুবতীর পক্ষে স্বাভাবিক নয়, ইহা ঠিক প্রেতিনীর কারসাজি। নিনানিকেও হয়তো ওই প্রেতিনী কোনো অচিন্তপূর্ব উপায়ে নিধন করিয়াছে। এইভাবে নির্জন গুহায় বসিয়া পলাতক কাপুরুষ আমি আমার ভীরুতার সমর্থনে নানা যুক্তির জাল বয়ন করিতে লাগিলাম, মনে হইল আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে নিজেকে ত্রাণ কবিয়া কিছুমাত্র অন্যায় করি নাই। সেই অসভ্য প্রস্তর যুগে আমি যাহা করিয়াছিলাম আজও তোমাদের মধ্যে অনেক কি তাহাই করিতেছ না? ভীরুতার সহিত অহমিকা যুক্ত হইয়া আজও কি তোমাদের পথভ্রান্ত করিতেছে না? যে নারী সভ্যতার জননী, যাহাকে ঘিরিয়া পুরুষের সর্ববিধ প্রচেষ্টা যুগে যুগে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার প্রেমে মানবজীবন ধন্য, মানবসভ্যতার পুষ্টি, সেই নারীকে সম্যকরূপে চিনিবার শক্তি আমার তখন ছিল না, আজও তোমাদের অনেকের নাই। আজ কিন্তু আমি জানিয়াছি নারীই শক্তি। পুরুষের ভোগ-লালসার শিখায় নিজেদের সমর্পণ করিয়াও নারীরা যুগে যুগে অগ্রগতির পথ আলোকিত করিয়াছে। পুরুষেরা যাহা কিছু করিয়াছে নারীর জন্যই করিয়াছে। তাহার উৎসাহ, তাহার প্রেরণা, তাহার প্রতিভা উদ্দীপ্ত হইয়াছে নারী-প্রেমেই। পুরুষের ভোগ-লালসার শিখায় বারংবার পুড়িয়া ওই নারীরাই অবশেষে পুরুষদের ভোগের কবল হইতেও উদ্ধার করিয়াছে। নারীর সহায়তা না পাইলে পুরুষেরা নিরাসক্ত হইতেও পারিত না। যাঁহারা শক্তিকে নারীরূপে পূজা করিয়াছেন তাঁহারাই সত্যদ্রষ্টা ঋষি। কিন্তু আমার এ জ্ঞান তখনও হয় নাই, তাই আমি জোলমাকে পাইয়াও হারাইয়াছিলাম, শিলাঙ্গীকে চিনিতে পারি নাই।

...কত রাত্রি হইয়াছিল জানি না, হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল। অন্ধকার গুহায় উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিলাম। মনে হইল একটা আর্তনাদ যেন চতুর্দিকে গুমরিয়া উঠিতেছে। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি অন্ধকারে মুখ ঢাকিয়া যেন কাঁদিতেছে। আর্তধ্বনি ক্রমশ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, মনে হইল ওই আর্তধ্বনির প্রবল বন্যায় আমার অস্তিত্ব বুঝি এবার ভাসিয়া যাইবে, আমি কিছুতেই তাহা রোধ করিতে পারিব না। কিসের শব্দ কোথা হইতে আসিতেছে, অনেকক্ষণ তাহা বুঝিতে পারি নাই। বুঝিতে পারিবামাত্র কিন্তু একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। আমার মনের মধ্যে যেন একটা বিপ্লব ঘটিয়া গেল। মনে হইল যে বদ্ধ ঘরে আমি এতক্ষণ বন্দী হইয়া বসিয়াছিলাম সেই বদ্ধ ঘরটা যেন হুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া পড়িল, যে বন্ধন আমাকে চলচ্ছক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছিল সেই বন্ধনটা যেন হঠাৎ ছিঁড়িয়া গেল। আমার অন্তর নিবাসী যে নির্ভীক সত্তা পশুত্বের কারাগারে ছটফট করিতেছিল, যে সত্তা জোলমা-শিলাঙ্গীর স্বরূপ চিনিতে পারিয়াছিল, যে সত্তা সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ করিয়া সমস্ত স্বার্থকে বিসর্জন দিয়া মহত্তর প্রেরণায় যুগে যুগে কর্তব্যের দিকে ধাবিত হইয়াছে আমার সেই সত্তা সহসা যেন মুক্তি পাইল। আমি যে-মুহূর্তে বুঝিতে পারিলাম যে শব্দটা মীংবার মেকি-প্রেতিনীর শব্দ, ধবল ষড়যন্ত্র অনুসারে রজ্জুবদ্ধ কাষ্ঠখণ্ডটাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে কুটিরের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সেই মুহূর্তে কেমন করিয়া জানি না আমি নিঃশঙ্ক হইলাম, শিলাঙ্গীর সহিত বহুদিন পূর্বে আমার যে কথোপকথন হইযাছিল তাহা যেন সহসা আবার সজীব হইয়া আমার শ্রবণে ধ্বনিত হইল।

'শপথ কর যে তুমি চিরকাল আমার বন্ধু থাকিবে!'

'তোমাব সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার জন্য আমি নিজেই উৎসুক, ইহার জন্য শপথ করিবার প্রয়োজন নাই।'

'তবু শপথ কর। মুখের বন্ধুত্ব আমি চাই না, সে রকম বন্ধুত্ব অনেকেব সহিত আছে, আমি তোমার প্রকৃত বন্ধুত্ব চাই।'

মনে পড়িল আমি শপথ করিয়াছিলাম। একবার নয় বার বার করিয়াছিলাম, তারস্বরে করিয়াছিলাম। আমার শপথ এ অঞ্চলের তরুলতা পশুপক্ষী পর্বত-উপত্যকা সকলেই শুনিয়াছিল। আমি গুহা হইতে বাহির হইয়া আমাদের পল্লীর দিকে ছুটিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পূর্বে যে শশকটিকে ভক্ষণ করিযাছিলাম সে-ই আমাকে শক্তি জোগাইতে লাগিল।

...অন্ধকারে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছিলাম। তখনও চাঁদ ওঠে নাই। উন্নগা পর্বতেব উপত্যকায় অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। ভাল করিয়া পথ দেখিতে পাইতেছিলাম না, তবু ছুটিতেছিলাম। প্রস্তরে কঙ্করে কণ্টকে পদদ্বয় রক্তাক্ত হইয়া যাইতেছিল, পদস্খলিত হইয়া দুই-একবার পড়িয়াও গেলাম, তবু কিন্তু থামিতে পারিলাম না। একটা অদৃশ্য শক্তি আমাকে অন্ধকারের মধ্যে টানিয়া লইয়া চলিল। আমার মনে হইতে লাগিল সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতি যেন সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার আচরণ লক্ষ্য করিতেছে। মনে হইল আমার এই মহৎ অভিযান আকাশের লক্ষ লক্ষ তারা উদ্ভাসিত নয়নে দেখিতেছে, ঝিল্লীর ঝঙ্কারে তাহা সঙ্গীতে রূপায়িত হইতেছে। অন্ধকারকে সচকিত করিয়া একটা ব্যাঘ্র গর্জন করিয়া উঠিল, আমি ক্ষণিকের জন্য থামিয়া গেলাম, কিন্তু ভীত হইলাম না। আমার মনে হইল শক্তিমান শার্দূল যেন আমাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছে—'সাবাস!' আরও কিছুক্ষণ ছুটিবার পর হায়েনার হা হা ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল, অন্য সময় হইলে হয়তো আমি অবিলম্বে কোনো বৃক্ষে আরোহণ করিতাম, কিন্তু তখন

আমার মনে হইল হায়েনার দল বলিতেছে—'বাহা, বাহা, বাহা।' বোঁ-বোঁ শব্দটা লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছিলাম। সহসা শব্দটা থামিয়া গেল। আমি আমার গতিবেগ বাড়াইয়া দিলাম।

...চাঁদ উঠিয়াছিল। আমি আমাদের শস্যশূন্য ক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া একটা গাছের আড়ালে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। চতুর্দিক নীরব, নির্জন। আকাশে বাতাসে একটা নির্বাক আতঙ্ক যেন মূর্ত হইয়াছিল। যে গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়াছিলাম একটু পরে সেই গাছের তলায় একফালি জ্যোৎস্না আসিয়া প্রবেশ করিল। সহসা মনে পড়িয়া গেল এই গাছের তলাতে ওই জ্যোৎস্নালোকেই আমি নিনানির মাথায় শাখা-পত্রের মুকুট পরাইয়া দিয়াছিলাম। একথা মনে হইবার পর আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলাম না। সেই জ্যোৎস্নার ফালির মুখে যে ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ হাসি ফুটিয়া উঠিল তাহা যেন আমাকে তিরস্কার করিয়া সে স্থান হইতে দূর করিয়া দিল। আমার মনে হইল আর কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া জ্যোৎস্নার টুকরাটি বোধ হয় প্রশ্ন করিবে—'সেদিনের কথা কি মনে পড়ে?' গাছেব তলা হইতে বাহির হইয়া আমি আমাদের শস্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম। কোথাও কেহ নাই, চতুর্দিকে ধু ধু কবিতেছে মনে হইল তবে কি কাল আমার শুনিতে ভুল হইয়াছিল? কিন্তু বোঁ বোঁ শব্দটা তো একটু আগেই শুনিয়াছি। আর একটু অগ্রসর হইলাম। সেই টিট্টিভ পক্ষীটা কোথা হইতে সহসা চিৎকার করিয়া উঠিল—'কি যে করিস', 'কি যে করিস', 'কি যে করিস!' নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম কিছুক্ষণ। তাহার পর আর একটু অগ্রসর হইলাম এবং পরমুহূর্তেই দেখিতে পাইলাম শিলাঙ্গীর ছিন্ন মুণ্ডটা একটু দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। ক্ষেত্রের অপর প্রান্তে কবন্ধটাও রহিয়াছে। বুঝিলাম কবন্ধটাকে টানিয়া টানিয়া ধবল ক্ষেত্রের প্রতি অংশে শিলাঙ্গীর উষ্ণ রক্তধারা সেচন করিয়াছে।

...তখনও রাত্রি শেষ হয় নাই, দূরে দূরে তখনও হায়েনার হা হা ধ্বনি শোনা যাইতেছিল, আমি সহসা স্থির করিলাম প্রতিশোধ লইব। ধবলকে হত্যা করিব। ছিন্নমুণ্ডটি একটি গাছের কোটরে লুকাইয়া রাখিয়া সন্তর্পণে বাহির হইয়া পড়িলাম। টিট্টিভ পক্ষীটা তখনও বলিতেছিল—'কি যে করিস, কি যে করিস, কি যে করিস।' প্রভাতের অরুণাভা তখনও পূর্বদিগন্ত রঞ্জিত করে নাই, জ্যোৎস্না-স্নিগ্ধ অন্ধকার তখনও উন্নগার উপত্যকাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। সেই অন্ধকারে হিংস্র শ্বাপদের মতো আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। ইচ্ছা ছিল অন্ধকারেই কাজ শেষ করিয়া সকলের অগোচরে আবার শিলাঙ্গীর কাছে ফিরিয়া আসিব। শিলাঙ্গীর ছিন্নমুণ্ড আমার নিকট আর শবমুণ্ড মাত্র ছিল না। তাহা আমার কল্পলোকে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আমি অনেকক্ষণ তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিলাম। আমি তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছিলাম, ধবলকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ লইব। আর একটা অদ্ভুত বাসনাও আমার মনে জাগিয়াছিল। বাল্যকালে ধবলের মাতামহীর মুখে একটা গল্প শুনিয়াছিলাম। জিহ্না পর্বতের কন্দরে নাকি এক যাদুকরী আছে। সে নাকি কাটামুণ্ড কবন্ধের সহিত জোড়া লাগাইতে পারে। ঠিক করিয়াছিলাম, ধবলকে হত্যা করিয়া শিলাঙ্গীর কবন্ধটাকে কাঁধে করিয়া লইয়া আসিব। তাহার পর যাত্রা করিব জিহ্না পর্বতের উদ্দেশ্যে, যেমন করিয়া পারি, সেই ক্ষমতাময়ী যাদুকরীকে খুঁজিয়া বাহির করিবই।

...ধবলকে হত্যা করিতে হইলে প্রথমেই আমার প্রস্তর কুঠারটা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কুঠারটা ছিল আমার কুটিরে। আমি যখন কুটির ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিলাম, সঙ্গে কোনো অস্ত্র লই নাই। আমি সেই জন্য দ্রুতপদে আমার কুটিরের উদ্দেশ্যেই ধাবিত হইতেছিলাম। কুটির পর্যন্ত কিন্তু পৌঁছিতে পারিলাম না। উন্নগা পর্বতের পাদদেশেই উলম্ভনের লোকেরা আমাকে বন্দী করিল।

বলিষ্ঠাকৃতি আট-দশজন লোক আমাকে ঘিরিয়া নিমেষের মধ্যে আমার হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিল, তাহার পর আমাকে স্কন্ধে তুলিয়া ছুটিতে লাগিল। আমি শুনিতে পাইলাম কন্যা নদীর তীরে হাহাকার উঠিয়াছে। বহনকারীদের আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমরা কে?'

'আমরা উলম্ভনের লোক, উলম্ভনের আদেশে আমরা তোমাদের আক্রমণ করিয়াছি।'

'আমাকে এখন কোথায় লইয়া যাইতেছ?'

'পাহাড়ে। তোমাকে প্রস্তর বহন করিতে হইবে।'

আরও কিছুক্ষণ পরে আমি প্রশ্ন করিলাম—'কিন্তু এমনভাবে আক্রমণ করিবে উলম্ভনের দূত গজন্ধর তো সে কথা বলে নাই!'

'আক্রমণের ইচ্ছা উলম্ভনের ছিল না। সহসা উলম্ভন মত পরিবর্তন করিয়াছে।'

'কেন?'

'ঠিক জানি না।'

ইহার পর আমি অনেক প্রশ্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু আর একটারও উত্তর পাই নাই।

...প্রস্তর বহন করিতেছিলাম। সে যে কি ভীষণ ব্যাপার, তাহা আজ তোমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। আজকাল পশুকেও তোমরা বোধ হয় অত কষ্ট দাও না। বড় বড় বৃক্ষকাণ্ডকে মসৃণ করিয়া তাহার উপব বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড চাপাইয়া আমাদের সেগুলি টানিয়া টানিযা লইয়া যাইতে হইতেছিল। প্রস্তর খণ্ডে এবং বৃক্ষকাণ্ডগুলিতে চর্মনির্মিত বহু রজ্জু সংলগ্ন ছিল। সেই রজ্জুগুলি আমাদেব কোমরে এবং বক্ষে বাঁধিয়া দেওয়া হইল, আমরা টানিতে লাগিলাম। ঠিক টানিতেছি কিনা তদারক করিবার জন্য আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক পর্যবেক্ষক ছিলেন, তাঁহাদের হস্তে চাবুকও ছিল এবং সে চাবুকের ব্যবহার করিতে তাঁহারা কার্পণ্য করে নাই। অন্তত পাঁচশত লোক মিলিয়া আমরা একটি বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড টানিযা লইয়া চলিয়াছিলাম। আমাদের প্রত্যেকের সর্বাঙ্গ কশাঘাতে রক্তাক্ত হইযা গিয়াছিল। মাঝে মাঝে এক একজন মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইতেছিল, তখন তাহাকে সরাইয়া পর্যবেক্ষকগণ আর একজনের কোমরে এবং বুকে চর্মরজ্জু বাঁধিয়া দিতেছিলেন। আমি মূর্ছিত হইয়া পড়ি নাই, দন্তে দন্ত চাপিয়া আমি নীরবে সেই গুরুভার টানিয়া লইয়া চলিয়াছিলাম। উপর্যুপরি অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা পরম্পরায় আমি শুধু একটি জিনিসই প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম। দেবতার রোষ। সমস্ত অন্তর দিয়া আমি অনুভব কবিতেছিলাম, যে শাস্তি আমি ভোগ করিতেছি তাহা ন্যায়ত আমার প্রাপ্য। আমি বিঘাওয়ের ভবিষ্যদ্বাণী অবিশ্বাস করিয়াছি, ধবলকে ঠকাইয়াছি, নিনানির সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি, শিলাঙ্গীর নিকট বারংবার যে শপথ করিয়াছি সে শপথের মর্যাদা রক্ষা করি নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, সকলকে ফাঁকি দিয়া নিজের লালসাময় স্বার্থকে চরিতার্থ করিতে পারিব, ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, সর্বদ্রষ্টা দেবতাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। সুতরাং পর্যবেক্ষণকারীদের কশা যখন আমার নগ্ন পৃষ্ঠের উপর পড়িতেছিল তখন আমি বিদ্রোহ করি নাই। অবনত মস্তকে সমস্ত সহ্য করিতেছিলাম। একটিমাত্র ক্ষীণ আশা কেবল মনের মধ্যে জাগিয়াছিল, প্রায়শ্চিত্ত অবসানে দেবতা হয়তো প্রসন্ন হইবেন।

...সারসরা নদীর তীরে উলম্ভনের রাজধানীতে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন রাত্রির অন্ধকার নামিয়াছে। দেখিলাম একটি নাতি-উচ্চ পর্বতের উপর বিরাটকায় প্রস্তর খণ্ড সকল একত্রিত হইয়াছে। মশাল জ্বলিতেছে। সেই মশাল-আলোকে বহু শ্রমিক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্ত খনন করিতেছে, শুনিলাম সেই সব গর্তে এই প্রস্তরগুলি নাকি প্রোথিত হইবে। পর্যবেক্ষণকারীদের কশাঘাতের শব্দে নৈশ অন্ধকার

শিহরিয়া উঠিতেছিল। শ্রমিকদের আর্তনাদে চতুর্দিক পরিপূর্ণ। বাল্যকালে এক বৃদ্ধার মুখে নরকের বর্ণনা শুনিয়াছিলাম, মনে হইল, সেই নরকে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

'উলম্ভন তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর সহিত শ্রমিকদের পরিদর্শন করিতে আসিতেছেন, তোমরা সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াও।'

পর্বতের উপর হইতে একজন পর্যবেক্ষণকারী উচ্চকণ্ঠে এই আদেশ ঘোষণা করিবামাত্র মুখে মুখে তাহা চতুর্দিকে প্রচারিত হইল। আমরা সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলাম। একটু পরেই দেখিতে পাইলাম মশাল-আলোকে পরিবৃত হইয়া উলম্ভন দম্পতি পর্বত হইতে অবতরণ করিতেছে। তাহারা যখন নিকটস্থ হইল, তখন আমার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। আমার নিজের চক্ষুকেই আমি যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। গজন্ধরই যে উলম্ভন এবং নিনানিই যে উলম্ভনের প্রিয়তমা পত্নী, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াও সন্দেহাকুল হইতেছিলাম। তাহারা যখন আরও নিকটে আসিল, তখন আর সন্দেহ রহিল না। সবিস্ময়ে দেখিলাম প্রায়-নগ্না নিনানির দক্ষিণ বাহু গজন্ধরের কটি বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। নিনানির দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য আমার মুখের উপর নিবদ্ধ হইল, তাহার পর আবার সরিয়া গেল। অনেকক্ষণ ধরিয়া পরিদর্শন করিয়া উলম্ভন অবশেষে আমাদের বিশ্রাম করিতে আদেশ দিল। অল্পক্ষণ পরেই আমি একটি ক্ষুদ্র কুটিরে নীত হইলাম। উলম্ভনের অনুচরেরা আমাকে কিছু খাদ্য ও পানীয় দিয়া গেল। আমার সমস্ত দেহমন অবশ হইয়া গিয়াছিল। খাদ্য পানীয় আমি স্পর্শ পর্যন্ত করিলাম না। আমি চক্ষু বুজিয়া কেবল প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—'হে দেবতা, আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না, মৃত্যুদণ্ড দিয়া আমার পাপের চরম শাস্তি দাও এবার। আমি পাপী, ক্ষমা প্রার্থনা করিবার অধিকারও আমার নাই, আমাকে তুমি চরম শাস্তি দাও, মৃত্যুর জন্যই আমি প্রস্তুত হইয়াছি...'

...কাহার স্পর্শে গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেল। চাহিয়া দেখি, নিনানি বসিয়া আছে। দূরে মশাল জ্বলিতেছিল, সেই মশাল-আলোকে দেখিতে পাইলাম, নিনানির অধরে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটিয়াছে।

'তুমি ভাবিয়াছিলে আমাকে সরাইয়া দিয়া শিলাঙ্গীর সহিত ঘর করিবে, কিন্তু জানিয়া রাখ, আমি বাঁচিয়া থাকিতে তাহা হইবে না। যক্ষিণীর মুখে প্রথম যখন কথাটা শুনিয়াছিলাম বিশ্বাস করি নাই। তাহার পর স্বচক্ষে দেখিলাম, তুমি শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিয়াছ। এ অপমান সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই আমি প্রেতিনী সাজিয়া ধবলকে প্ররোচিত করিয়াছি যাহাতে সে শিলাঙ্গীকে দূর করিয়া দেয়, তাই আমি উলম্ভনের লালসাবহ্নিতে নিজেকে আহুতি দিয়া তাহাকে উত্তেজিত করিয়াছি, যাহাতে সে তোমাদের আক্রমণ করিয়া তোমাদের বন্দী করিয়া আনে। আমি জানিতাম, বন্দী করিয়া না আনিলে তোমার নাগাল পাইব না। এইবার আমার কামনা সিদ্ধ হইয়াছে। যক্ষিণীর প্রতি আমার কর্তব্যও শেষ হইয়াছে। আমার অনুরোধে উলম্ভন তাহার ভার লইয়াছিল, গতকল্য তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আমার আর কোনো বন্ধন নাই। তোমাকে চাহিয়াছিলাম, পাইয়াছি—অধিকার করিয়াছি। চল—'

'কোথায়?'

'আমার সঙ্গে। আমি এখনই তোমাকে সঙ্গে লইয়া উলম্ভনের এলাকা ত্যাগ করিব। এস—'

নিনানি হাত বাড়াইয়া দিল।

...নিনানি আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল। কত প্রান্তর, কত অরণ্য, কত পর্বত যে পার হইলাম! জোলমা শিলাঙ্গীরাও যুগে যুগে আমার দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া আমাকে

ডাকিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের হাত ধরিয়া চলিবার যোগ্যতা আমার ছিল না, তাই বারবার তাহাদের পাইয়াও হারাইয়াছি। নিনানি কিন্তু আমাকে ছাড়ে নাই, যুগে যুগে নব নব রূপে সে-ই আমাকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। তাহার ঈর্ষা-লোভ-কামনা-কণ্টকিত সর্বগ্রাসী প্রেমের নিকট বারংবার আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তাহার উদ্ধত অহঙ্কারের মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়াছি, তাহার যুক্তিহীন দাবিকে বারংবার মানিয়া লইয়াছি। আমার প্রচণ্ড পৌরুষ বারংবার তাহার পেলব যৌবনের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আমি যুগে যুগে তাহার মায়াজালে বন্দী হইয়াছি। ইকাকে আমি একদিন সবলে অধিকার করিয়াছিলাম বটে, ক্ষুধার তাড়নায় একদিন আমি জীবন-সঙ্গিনীকে আহারও করিয়াছি। কিন্তু আমার এই অপ্রতিহত প্রতাপ বেশি দিন অক্ষুণ্ণ থাকে নাই। জুমনির হস্তে পৌরুষের লাঞ্ছনা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। পুঠা এবং লুংয়ের হস্তে আমি নিজে ক্রীড়নক মাত্র হইয়াছিলাম, গৌয়ের প্রবল ব্যক্তিত্বের নিকট আমাকে হার মানিতে হইয়াছিল। শীলিনা, রাহুলা, লীরা, লালচুমের নিকট আমি বারংবার নতশির হইয়াছি। মাঝে মাঝে মনে হইতেছে যে শক্তি একদা সশঙ্ক মিনতির মূর্তি ধরিয়া কাচিন, এলাহি, টিনা, নিমার রূপে আমার নিকট করুণা ভিক্ষা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছিল, নিনানি সেই শক্তিরই প্রখর প্রকাশ। আমি নিজেও মাঝে মাঝে নারী-জীবন যাপন করিয়াছি, অস্পষ্টভাবে তাই নিনানির মনোভাব যেন বুঝিতে পারি। মাঝে মাঝে জোলমা, শিলাঙ্গীর কথা মনে পড়ে, স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। মনে হয় আমার অন্তরতম সত্তা যেন জন্ম হইতে জন্মান্তরে নিনানির হাত ধরিয়া জোলমা-শিলাঙ্গীকেই অনুসন্ধান করিতেছে, আর সেই অনুসন্ধানের ফলেই বুঝি মানব-সভ্যতা বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। আশা করিয়া আছি, সে বিকাশ সম্পূর্ণ হইবে, যেদিন নিনানির সহিত জোলমা-শিলাঙ্গীর প্রভেদ থাকিবে না, নিনানিই যেদিন বিবর্তিত হইয়া জোলমা-শিলাঙ্গীতে পরিণত হইবে, কল্পলোকের স্বপ্নসঙ্গিনী যেদিন মর্ত্যলোকের মানবীরূপে দেখা দিবে। কিন্তু সে যুগ এখনও আসে নাই। সেই অনাগত যুগের উদ্দেশ্যেই আমার যাত্রা। আমার যাত্রার যতটুকু ছবি কালের পটভূমিকায় স্থাবর হইয়া রহিয়াছে, তাহারই সামান্য একটু অংশ বীভৎসতায়, নগ্নতায়, নিষ্ঠুরতায়, ছন্দে, গানে, শিল্পে তোমাদের ইতিহাস রচনা করিয়াছে, কিন্তু সে ইতিহাস অতিশয় সীমাবদ্ধ ইতিহাস। আমার যাত্রাপথ অনন্ত অসীম। আমি চলিয়াছি, চলিতেছি এবং চলিব—ইহাই সত্য। আমি মরি নাই, আমি মরিব না। নিনানিকে লইয়া আমি নীলাম্বু নদীর তীরে বিশাল অপরাজিতা বংশ স্থাপন করিয়াছিলাম। নিনানির পরও আরও কত নারী আসিয়াছিল, আরও কত নারীর তীব্র মধুর সঙ্গ-মদিরা আমার কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল, কিন্তু মনে মনে আমি ধরিতে চাহিয়াছিলাম সেই অধরাকে, যাহাকে আমি পাইয়াও পাই নাই। আজও তাহাকেই চাহিতেছি। দূরদিগন্ত সীমায় দেখিতে পাইতেছি জোলমা ভাসিয়া যাইতেছে, বুঝিতে পারিতেছি বৃক্ষকোটরে শিলাঙ্গীর ছিন্নমুণ্ড আমার পথ চাহিয়া আছে, নিনানি কিন্তু আমার হাত ধরিয়া রহিয়াছে, কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেছি না। কিন্তু আশা আছে, মুক্তি একদিন আসিবেই আসিবে। হয়তো অভাবিতরূপে, কিন্তু আসিবে।

